১৭ বর্ষ
৩৫ সংখ্যা
৬ মাঘ
১৩৮৪
20th Jan. 1978

আগামী সংখ্যায়

পুরসভা সমাচার

অবশেষে কলকাতা পুরসভা নিয়েও একটি তদন্ত কমিশন গঠিত হতে যাচ্ছে। অবশেষে বলা হল এই কারণে যে, পুরসভার অব্যবস্থায় বহুকাল ধরেই পুরবাসীরা নাজেহাল হচ্ছে, প্রতিবাদ ও প্রতিকারের প্রতিশ্রুতিও বহুকালের, কিন্তু তখন-তখন খুব একটা কর্মব্যস্ততা দেখা গেলেও পরিণামে সবকিছু একই রকম থেকে যাচ্ছে। ফলে এ-শহরের অধিবাসীরা প্রায় ধরেই নিয়েছিলেন কিছুতেই কিছু হবার নয়। এতদিনে একটা অন্য পদ্ধতির কথা শোনা গেল।

অভিযোগ নানা দিকেই।

এই শহরে রাস্তার সংখ্যা অনেক। তার সবগুলোই যে সমান জরুরী তা নয়। কিন্তু যেসব পথ দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার যানবাহনের চলাচল, যেগুলো জীবিকা সংগ্রহের জন্যে পরিহার্য, সেসব রাস্তাঘাট অব্যবহার্য থাকলে পুরবাসীদের জীবনযাত্রাই বিশৃংখল হয়ে ওঠে। দুঃখের বিষয়, এই ঘটনাটি প্রতি বছরই ঘটে থাকে। বিশেষ করে বর্ষাকালে তো বটেই।

অন্যতম শোচনীয় অভিজ্ঞতা হল আবর্জনার পাহাড়। ঝাড়ুদারদের হাজিরা খাতায় ভুতুড়ে নাম, অচল গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি অনেক অভিযোগই শোনা যায়। তা নিয়ে শোরগোল হয়, লেখালেখিও হয়। ফলে তখনকার মত লরির চাকা নড়ে, রাস্তার পাশ থেকে আবর্জনার স্তূপও সরে। কিন্তু আবার কিছুকাল পরেই যে-কে সেই।

পুরসভা থেকে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে বলে শোনা যায়। এখানে-ওখানে দু'-চারটে ইশকুলবাড়িও যে না দেখা যায় তা নয়। কিন্তু সকলের কথা বাদ দিলেও নিতান্ত যারা অভাবগ্রস্ত, তেমন পরিবারের ছেলেমেয়েদেরও শতকরা ক'জনকে ঠাঁই দেবার মত ব্যবস্থা আছে সেসব ইশকুলে? প্রয়োজনের তুলনায় এক অতি নগণ্য সংখ্যার বেশি নয় নিশ্চয়ই। অথচ ন্যায়ত এবং কর্তব্যের দিক দিয়ে পুরসভা সে-দায়িত্ব এড়াতে পারে না, এটা সকলেই জানেন।

ব্যর্থতার তালিকা এভাবে আরো অনেক বাড়ানো যেতে পারে। যেমন বছরের পর বছর বাজেট নিয়ে টানাটানি, অথচ অন্যদিকে অজস্র বড় অট্টালিকার নামমাত্র ট্যাক্সের এসেসমেণ্ট। মনে পড়ে, বহুকাল আগে কে যেন একবার দুর্নীতির পাঁকে ডোবা পুরভবনকে অজিয়ান আস্তাবলের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তদন্ত কমিশনরূপী হারকিউলিস সেই আস্তাবলকে কলঙ্কমুক্ত করাতে পারলে পুরবাসীরাও মুক্তির নিশ্বাস ফেলবে।

সাহিত্য

একখানি চিঠি

প্রিয় পাঠক,

দীর্ঘদিন আপনি আমার বৈকুন্ঠ পাঠক সহ্য করেছেন। গত এক বছরের কিছু বেশি সময় ধরে আমি অমৃতের খানিকটা জায়গা নষ্ট করেছি বলে অনেকে কটু-কাটব্য করে আমায় লিখেছেন। এই সঙ্গে মনে করি—অনেকে অবিমিশ্র সাধুবাদ দিয়েছেন। এই কলমে যখনই কোন উত্তাপ সৃষ্টি করেছে—তা কখনোই কারও বিরুদ্ধে নয়। স্বাস্থ্যকরভাবে প্রথা বা প্যাটার্নকেই সমালোচনা করেছি। কোন ব্যক্তি-বিশেষকে নয়।

নতুন প্রতিভাকে স্বাগত জানাতে গিয়ে সব সময় সব নাম হাতের কাছে পাইনি। তার মানে এই নয়—তাঁদের স্বাগত জানাইনি। তাঁদের প্রতিও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিয়ে এই সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়ে আসছে।

গত এক বছরের কিছু বেশি সময় ধরে এত বেশি সংখ্যায় নতুন গল্পকার ও কবিকে অমৃতের আগে আর কেউ পাঠকের সামনে আনেনি। এঁদের অনেকে লিখবেন। অনেকে পরে লিখবেন না। এইভাবেই জোয়ারের ফেনা কেটে গিয়ে পলি এসে জমা হয়।

পাঠকের জন্যে উন্মুক্ত স্বারস্বত অঙ্গন, লেখকের জন্যে পূর্ণ মর্যাদায় প্রকাশ—সর্বদাই কাম্য। এ-ব্যাপারে অমৃত শুরু থেকেই সাধ্যমত চেষ্টা করে আসছে।

বহুতা জীবন থেকে ঘটনার নির্যাস সাহিত্যে তুলে আনেন কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, ছবি আঁকিয়ে। সামাজিক ন্যায়নীতি ও সহাবস্থানের সহনশীলতা ও পুনর্বিন্যাস রুদ্ধ পরিস্থিতিতেও অবস্থার খানিকটা উন্নতি করতে পারে। সেই পথেই অমৃত যাবার চেষ্টা করে আসছে। রুচি ও মতামত অনুযায়ী পরস্পরের মন বিনিময় জরুরী। তাই বৈকুন্ঠের কঠোর-তম সমালোচককেও যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে চিঠি প্রকাশ করা হয়েছে। সেই তুলনায় ভূয়সী প্রশংসায় চিঠিগুলি আমরা আদৌ প্রকাশ করিনি। ভিন্নমত জানার জন্যেই এ-পথ নেওয়া হয়েছে। শুধু সায় জানানো চিঠি প্রকাশের কোন মানে হয় না।

সবাই নিজের লেখা ভালোবাসেন। সেই লেখাটি প্রকাশিত না হলে অমরত্বের বাস মিস হয়ে গেল। এমন ব্যগ্র আগ্রহসম্পন্ন লিপিকারকে সব সময় সাদর আহ্বান জানাতে পারিনি। দৈবত সঙ্গীত চিরকালই দৈত্যসঙ্গীত বলে ... ভোটবলে সাহিত্য নির্বাচন ... না। কান একজনকে এক ... বাতিল করতেই হয়। এছাড়া রাস্তা ...

উষ্ণ উত্তাপ ছড়ানো চিঠিগুলোর ... ধন্যবাদ। বৈকুন্ঠও একজন মানুষ ... উত্তাপে তারও জীবন অনেক স্বাদু ... ভালবাসার চিঠিগুলোর কথা ... তুললাম।

শনি সত্যনারায়ণের সিন্নিতেও ... কয়েকজন নিয়মিত ভক্ত জুটে ... সাহিত্য পত্রিকায় কয়েকটি পৃষ্ঠা ... সমালোচনার সংরক্ষিত করতে হলে ... লেখক দরকার। কারণ, প্রেম ও ... খিদে ভয়ংকর। কে আসবে বলে যে ... যায় না। সময়মত খাদ্যের জোগান ...

কোন কিছু জানি না বলে ... তাই বলতে চেয়েছি। ... ওকালপো জানি না। জানি না অনেক ... নানা মতের পূর্ণ প্রকাশকে ... আদর্শ রেখে সংক্ষিপ্ত হবার চেষ্টা ক... সব সময় হয়তো পারিনি। পাঠক। ... করি নিজগুণে মার্জনা করবেন। ... ছুটিতে যাচ্ছি।

বিনী...

বৈকুন্ঠ ...

১২।১।৭৮

মল্লিক বাড়ির ভিতরে

৪ নভেম্বর ১৯৭৭ অমৃতে প্রকাশিত 'মল্লিক বাড়ির ভেতরে' কিছু ভুল আছে। লেখক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, রামগড় থেকে সনকের সঙ্গে এসেছিলেন ষোল ঘর প্রধান বৈশ্য এবং অনুগত তিরিশ ঘর অপ্রধান বৈশ্য। এঁরাই বাংলাদেশকে দিয়েছেন ঃ দে, (পরে দে-মল্লিক), দত্ত, চন্দ্র, আঢ্য, শীল, (পরে শীলমল্লিক) সিংহ, ধর, বড়াল, পাল, নাথ, মল্লিক, নন্দী, বর্ধন, দাস, লাহা, সেন।

ভুল এখানেই। সুবর্ণ বণিক তথা বণিক-কুলে 'নাথ' পদবী আছে বলে আমাদের জানা নেই। যদিও বল্লালসেনের রাজত্বকালে সুবর্ণ বণিকদের মত নাথেরাও লাঞ্ছিত হয়েছিলেন ঠিক একই সময়ে এবং ঠিক একই সঙ্গে। সম্ভবত লেখক ব্যাপারটা গোলমাল করে ফেলেছেন বুঝতে। তাছাড়া মল্লিকদের আত্মীয় কলকাতার বিখ্যাত শীল পরিবারের একজন বংশধরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাঁদের মধ্যে নাথ পদবী আছে কিনা।

বলেছিলেন, জানা নেই।

আমার যতদূর জানা আছে, নাথ বলতে একমাত্র যোগী জাতিকেই বোঝায়। যোগীদের সাধারণ পদবী নাথ। নববিধান অভিধানে এদেরই 'যুগী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং এদের বলা হয়েছে তন্তুবায় জাতি। সঠিক পরিচয় তা নয়। বল্লালসেন এবং ব্রাহ্মণদের যৌথ অত্যাচারে নিজেদের ধর্ম থেকে বঞ্চিত হয়ে তাঁরা এই পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হন। নাথেরা কখনোই বৈশ্য ছিলেন না। নাথেরা ছিলেন উদার-পন্থী সন্ন্যাসী। রুদ্র ব্রাহ্মণ বলে এঁদের পরিচয় ছিল। এঁদের ধর্মের আলাদা মত-বাদ ছিল। হডসন সাহেব এই নাথইজম-কেই 'নাথপন্থ' নামে অভিহিত করে-ছিলেন। বুকানন, হ্যামিলটন, গ্রীয়ারসন এবং আমাদের দেশের ঐতিহাসিক ডঃ কল্যাণী মল্লিক, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এ বিষয়ের ওপর অনেক গবেষণামূলক লেখা আছে। তাছাড়া মৎসেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গীনাথের কথা তো অনেকেরই জানা আছে। এই চৌরঙ্গীনাথের নামেই কলকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চল।

আরেকটি কথা। বল্লালভানদের ব্যাপারটা এত হাল্কা করে দেখা লেখকের উচিত হয় নি। আর বল্লালসেনের যত গুণই থাক, তার এত প্রশংসা করাও উচিত হয় নি। বলছি এই কারণে, এতে পাঠকরা বুঝতে ভুল করবেন। ইতিহাসের বিকৃতি ঘটবে।

নাথেরা যে সুবর্ণ বণিক ছিলেন না তার আর একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 'রাজ... যোগীবংশের' নামক অধ্যায়ে আছে 'বর্তমান নাথবংশ বা যোগীজাতি যে ... মার্গের ঋষিদিগের বংশজাত বলিয়া কী...' (দৈনিক বসুমতী — ২২ জুন, ১... সাল)। —গোপাল নাথ, হরিব... নাথপাড়া, দাঁয়া।

(২)

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'ম... বাড়ির ভেতরে' (৭ঠা নভেম্বর ১৯... পড়ে মুগ্ধ হলাম, বুক ভরে গেল, ... মাথা নত হল শ্রদ্ধায়। সঞ্জীববাবুর লে... স্টাইলও কি অপূর্ব প্রসাদগুণসম্পন্ন, প... বসলে শেষ না করে ওঠা যায় না। ... লেখা পাঠকদের উপহার দেবার জন্যে ... ও 'অমৃত' সম্পাদক উভয়েই আমা... কৃতজ্ঞতাভাজন। রাইটার্স ওয়ার্ল্ড বইখানি রিচার্ড রোজার্স লিখেছে...

"Only a few people expre... themselves, take the time ... write, but they may be e... pressing the thoughts of a l... of people".

মনে হয় 'অমৃত'-এর সকল পাঠক না ... অধিকাংশেরই অভিমত অধমাধমেরই ... হওয়া বিচিত্র নয়।

অনিল সোম; ই।২০ এন এম এল জামসেদপুর-১।

সমালোচনা

জিজ্ঞাসাকে ধন্যবাদ

সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৭৬, পৃঃ ৯০, মূল্য চার টাকা।

ঈশ্বর সন্ধানে, প্রবাসজীবন চৌধুরী, ১৯৭৬, পৃঃ ৬৪, মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, অতুল সুর, ১৯৭৭, পৃঃ ৬২, মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

রামকথার প্রাক্-ইতিহাস, সুকুমার সেন, ১৯৭৭, পৃঃ ৭৮, মূল্য চার টাকা।

কলিকাতায় বিদ্যাসাগর, রাধারমণ মিত্র, ১৯৭৭, পৃঃ ৬৮, মূল্য চার টাকা।

স্বর্গলোক ও দেবসভ্যতা; রাজেশ্বর মিত্র, ১৯৭৭, পৃঃ ৯০, মূল্য পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে বিশ্বভারতীর 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' পর্যায়ের শুরু হয়েছিল। ঐ পর্যায়ে অনেক মূল্যবান বই প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন জটিল বিষয় সম্বন্ধে সহজভাবে বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করেছেন। তার দ্বারা বাঙালী পাঠকসমাজ বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছে। সম্প্রতি 'জিজ্ঞাসা' নামক প্রকাশন সংস্থা 'বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা' পর্যায় আরম্ভ করেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য 'জ্ঞান-বিজ্ঞান ধর্ম-দর্শন ভাষা - সাহিত্যমূলক প্রবন্ধ - নিবন্ধের অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তনের গ্রন্থ প্রকাশ।' ইতিমধ্যেই তাঁরা এই পর্যায়ে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। উপর্যুক্ত গ্রন্থগুলিও এই পর্যায়ভুক্ত। গ্রন্থকারেরা সকলেই বিশিষ্ট লেখক ও পণ্ডিত। এঁদের সহযোগিতায় বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা প্রত্যাশিত মর্যাদা অর্জন করেছে সন্দেহ নেই। এই প্রচেষ্টার জন্য জিজ্ঞাসা আমাদের সকলের ধন্যবাদার্হ।

এই ধরনের গ্রন্থমালা বিদেশের বহু প্রকাশকই প্রকাশ করেছেন। তার পেছনে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকে। এই পরিকল্পনা গ্রন্থমালা পর্যায়ের একটি চরিত্র স্থির করে দেয়। আমরা বুঝতে পারি কি ধরনের গ্রন্থ এইসব পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। এতে কি থাকবে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা লিখিত সাধারণ পাঠকের জন্য বই, টেকনিক্যাল বিষয়কে সহজবোধ্য করে লেখা বই, যে-বই পড়ে পাঠক সেই বিষয়ে প্রাথমিক দীক্ষা লাভ করবেন? কিংবা এই পর্যায়ে ছাপা হবে মূলত গবেষণাধর্মী গ্রন্থ যা প্রধানত সেই বিষয়ে অগ্রসর পাঠকের আগ্রহের সামগ্রী? বইগুলি কি বিশেষভাবে এই পর্যায়ের জন্য লিখিত হবে, না, পূর্বপ্রকাশিত বই বা প্রবন্ধ-সংকলনও প্রয়োজনে এর অন্তর্ভুক্ত হবে? এইসব প্রশ্ন উঠছে, কারণ যে ক'টি বই আমাদের হাতে এসেছে, তার থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রকাশক এ-বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট পন্থা নেননি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থটি বিভিন্ন সময়ে লেখা পাঁচটি প্রবন্ধের সংকলন, অতুল সুরের বইটি পূর্বপ্রকাশিত একটি বই-র সংবর্ধিত পুনর্মুদ্রণ এবং রাধারমণ মিত্রের বইটি ইতিপূর্বে প্রকাশিত প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ। পূর্বপ্রকাশিত প্রবন্ধের গ্রন্থাকারে প্রকাশ ব্যাপারে অবশ্যই কোন আপত্তি করছি না। কিন্তু প্রবন্ধগুলি যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে, তখন কয়েকটি ব্যাপারে সতর্ক থাকলে ভাল হয়। প্রথমত, বিষয়গুলির মধ্যে একটি ধারাবাহিকতা এবং যৌক্তিক পরম্পরা থাকলে পাঠকের সুবিধে হয়। দ্বিতীয়ত, প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশিত হবার ফলে পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা থাকে। সুনীতিকুমারের অতি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ সংকলনটির মধ্যে একই বক্তব্য, একই তথ্য, একই উদ্ধৃতির পুনরাবৃত্তি তাই চোখে পড়ে। যেহেতু গ্রন্থটি একটি প্রবন্ধ সংকলন মাত্র নয়, একটি পর্যায়ভুক্ত গ্রন্থ এবং সেই পর্যায়ের পেছনে একটি পরিকল্পনা আছে, তাই পুনরুক্তি না থাকলে এই গ্রন্থের বিষয়গত অখণ্ডতা ক্ষুণ্ণ হত না এবং এর উপভোগ্যতা আরো বাড়ত। স্বতন্ত্রভাবে দেখলে অবশ্য প্রত্যেকটি প্রবন্ধই মূল্যবান, সুনীতিকুমারের মনীষায় উজ্জ্বল এবং প্রকাশভঙ্গীর অন্তরঙ্গতায় স্নিগ্ধ।

শ্রীযুক্ত অতুল সুরের 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' গ্রন্থটি পড়ে মনে হয়, বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা এই ধরনের গ্রন্থ প্রকাশ করলে সাধারণ পাঠক অত্যন্ত লাভবান হবে। প্রকাশক দাবী করেছেন 'নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে বাংলাভাষায় বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার সূত্রপাত এই গ্রন্থের মাধ্যমেই শুরু হয়েছে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান সংস্করণে লেখক নতুন তথ্য যোগ করেছেন এবং একটি অধ্যায় নতুন করে লিখেছেন। পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই বইটিতে বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, আদিবাসী ও উপজাতিদের নিয়ে বাঙালী সমাজের সামগ্রিক নৃতাত্ত্বিক বনিয়াদ, বাঙালীর জাতিবিন্যাস, ও তাদের আদি নিবাস এবং বাঙালী মুসলমান সমাজের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় দিয়েছেন। পরিচ্ছন্ন ও সহজ ভাষায় একটি জটিল বিষয়ের তথ্যনির্ভর বিবৃতি বাংলার সাহিত্যশাখার জ্ঞানকাণ্ডকে সমৃদ্ধশালী করবে সন্দেহ নেই।

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের 'রামকথার প্রাক্-ইতিহাস' এবং শ্রীরাজেশ্বর মিত্রের 'স্বর্গলোক ও দেবসভ্যতা' গ্রন্থদুটি গবেষণাধর্মী। এইসব বিষয়ে পূর্ব-প্রস্তুতি না থাকলে পাঠক তাঁদের বক্তব্যের সূক্ষ্মতা এবং যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে নাও পারেন। বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালার মধ্যে স্পষ্টই দুটো ধারা দেখতে পাচ্ছি, একটির প্রতিনিধি বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, অন্যটির 'রামকথার প্রাক্-ইতিহাস'। এই দুটি ধারার পুষ্টিতেই বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালার নিজস্ব চরিত্র বিকশিত হবে এরকম আশা করা অসঙ্গত হবে না। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন রামকথার ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে রাম-উপাসনা প্রবর্তিত হবার আগে কীভাবে রামকথার জন্ম ও বিস্তার সেই প্রাক্-ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। এবং এই আলোচনায় তিনি প্রতি মুহূর্তেই আমাদের কৌতূহলকে যেমন উদ্দীপ্ত করেছেন, তেমনই এই অন্ধকার অধ্যায়টিকে যুক্তি ও অনুমানের সাহায্যে আলোকিত করেছেন। তাঁর নানা বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই পণ্ডিতমহল সহজে মেনে নেবেন না কিন্তু তাঁদের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। পাঠকের ক্ষোভ শুধু এই যে, গ্রন্থটি বড়ই সংক্ষিপ্ত, অনেক ক্ষেত্রে আলোচনা প্রায় সূত্রাকারে

বিন্যস্ত। আশা করি এই বিষয়ে অধ্যাপক সেন আরো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে আমাদের বহু জিজ্ঞাসার নিরসন করবেন।

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্রের স্বর্গলোক ও দেবসভ্যতার সমস্ত তথ্যই বৈদিক সংহিতা থেকে সংগৃহীত। বৈদিক যুগের মানুষের ও তাদের সমাজ ও ধর্মজীবনের নানা বৈচিত্র্যের কথা বলেছেন লেখক। এক প্রাচীন মানবগোষ্ঠীর সংস্কৃতির পরিচয় ফুটে উঠেছে নিরাভরণ বর্ণনাভঙ্গীতে। বৈদিক জীবন ও সভ্যতা সম্বন্ধে এই সরল ও নিরহঙ্কার গ্রন্থটি আমাদের মত সাধারণ পাঠক মাত্রেরই কাছে বরণীয়।

শ্রীযুক্ত রাধারমণ মিত্রের কলিকাতায় বিদ্যাসাগর বইটিতে নানা তথ্য আছে কিন্তু এর পরিকল্পনাটি অপরিচ্ছন্ন। বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন কলকাতায় কেটেছে কাজেই কলকাতার নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন এবং স্বভাবতই কলকাতার মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর সেই সংযোগের কাহিনী গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যাসাগরের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য, যেমন, তিনি সামান্য তোতলা ছিলেন, কিংবা তাঁর মাকে তুই সম্বোধন করতেন—ইত্যাদি কেন অন্তর্ভুক্ত হল বোঝা কঠিন। বিদ্যাসাগরের আত্মসম্মানবোধ বা বিদ্যাসাগর ও বাংলা ভাষা, বিদ্যাসাগরের ধর্মমত ইত্যাদি প্রসঙ্গই বা এল কেন? বইটি শুরু হচ্ছে সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠার বিবরণ দিয়ে আর বইটির ৬৪ পৃষ্ঠায় বিদ্যাসাগরের 'কলিকাতায় আগমন' প্রসঙ্গ। বইটি সুসম্পাদিত হয় নি। এর অনেকগুলি অংশ নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক এবং বহু পরিচিত তথ্যের সংকলন।

প্রবাসজীবন চৌধুরীর 'ঈশ্বর সন্ধানে' গ্রন্থটিকে মুখবন্ধে লেখকের 'অন্তর্লোক বিহারের অসমাপ্ত ডায়েরি' বলে পরিচিত দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর চিন্তা বা এক ধরনের মিস্টিক অনুভূতি (বা অভিজ্ঞতা)-র ভাবাকুল প্রকাশ এই লেখাটিতে। স্বতন্ত্র রচনা হিসেবে এর উপভোগ্যতা সন্দেহ করি না। কিন্তু বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালায় এই ধরনের মিস্টিক অনুভূতির বিহ্বল রচনার অন্তর্ভুক্তিতে একটু বিস্ময় বোধ করছি।

শিশিরকুমার দাশ

অর্থনীতির পথে ঃ ভবতোষ দত্ত, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৯৭৭, পাঃ ১০৭, মূল্য ৫ টাকা।

অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত 'অর্থনীতির পথে' পুস্তিকায় রাজা রামমোহন থেকে শুরু করে বিনয়কুমার সরকার পর্যন্ত প্রায় দুইশত বৎসরের অর্থনৈতিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত আটজন মনস্বী ব্যক্তির চিন্তাধারার মাধ্যমে দক্ষ শিল্পীর ন্যায় অনায়াস চিত্রায়ণ করেছেন।

রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩) তাঁর অর্থনৈতিক প্রবন্ধগুলি লেখেন ১৮৩১ থেকে ১৮৩২-র মধ্যে। তখন তাঁর বয়স প্রায় ষাট বৎসর। ইতিমধ্যে তিনি ভারতে ভূমি রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বৃটিশ শাসনের বায়ভারের মধ্যে ঔপনিবেশিক শোষণপন্থা লক্ষ্য করেছিলেন। সাধারণ ভারতবাসীর আর্থিক দুরবস্থা সম্বন্ধে অনেক খুঁটিনাটি তথ্য তিনি বিলাতে সিলেকট কমিটির কাছে উল্লেখ করেন। ভবতোষবাবু এসব কথা উল্লেখ করে বলেন যে পরবর্তীকালে 'ইকনমিক ড্রেন' ও দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা 'ভারতীয়করণ' আলোচনার সূত্রপাত রামমোহনই করেন। রামমোহনের অর্থনৈতিক আলোচনার উৎস খুঁজতে গিয়ে ভবতোষবাবু একথা বলার চেষ্টা করেছেন যে অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো ও মলথাসের লেখার সঙ্গে রামমোহনের পরিচয় থাকা সম্ভব ছিল। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, ১৮৩০ সালের ১৫ই নভেম্বর রামমোহন ইংল্যান্ড যাত্রা করেন এবং ১৮৩১, এপ্রিল হতে ১৮৩৩, সেপ্টেম্বর, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ২ বৎসর ৬ মাস (তিন মাস ফ্র্যান্সে বসবাস করেন) ইংল্যান্ডে বাস করেন। এই সময়ে ইংল্যান্ডে ও ফ্র্যান্সে তিনি কোন অর্থনীতিবিদগণের সংস্পর্শে আসেন কি-না জানা দরকার। একথাও উল্লেখযোগ্য যে রামমোহন ভারতের অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত মতগুলি ইংল্যান্ডে বসেই লিখেছিলেন। ভারতীয় শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থার তথ্যগুলি কি তিনি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন না ইংল্যান্ডেই পেয়েছিলেন?

দাদাভাই নওরোজীর (১৮২৫-১৯১৭) অর্থনীতিমূলক লেখা প্রথম প্রকাশ হয় ১৮৭০ সালে—রামমোহনের মৃত্যুর ৩৭ বৎসর পর। নওরোজী ভারতবাসীর দারিদ্র্যের পরিমাপ, ভারতীয় সম্পদ শোষণ ও সরকারি বায়বাহুল্য নিয়ে লেখেন। ১৮৫৫ সালে তিনি ব্যবসাপোলক্ষে ইংল্যান্ডে যান। ১৮৬৫ সালে ডবলিউ সি বোনার্জির সহায়তায় দি লন্ডন ইন্ডিয়ান সোসাইটী স্থাপনা করেন। ১৮৯২-১৮৯৫ সাল তিনি বৃটিশ পার্লামেন্টের 'লিবারেল' সদস্য

ছিলেন। রামমোহনের মৃত্যুর ৪০ বৎসর পর তিনি ফসেট সিলেকট কমিটির কাছে ভারতীয় অর্থব্যবস্থা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেন। রামমোহনও হাউস অব কমন্স-এর সিলেকট কমিটির কাছে সাক্ষ্য দেন। দাদাভাই নওরোজী কি রামমোহনের কাজের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন? দাদাভাই নওরোজীর ৯২ বৎসর জীবনের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার বহু পরিবর্তন ঘটে। সেই পরিবর্তনের সঙ্গে তাঁর অর্থনৈতিক আলোচনার কি যোগ ছিল তা জানা দরকার। এসব তত্ত্ব ভবতোষবাবুর লেখায় পাই না।

মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে (১৮৪২-১৯০১) ও রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) দুজনেই নওরোজীর অনেক কনিষ্ঠ এবং তাঁর জীবদ্দশায়ই এঁদের দেহান্ত হয়। রাণাডে অর্থনীতি বিষয়ে জর্মন লেখক ফ্রেডরিখ লিস্ট দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন একথা ভবতোষবাবু উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর উপর নওরোজীর কোন প্রভাব ছিল কিনা তা ভবতোষবাবুর লেখায় পাই না। রমেশচন্দ্র ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস থেকে ১৮৯৭ সালে পদত্যাগ করে ইংল্যান্ডে বসবাস করেন। তিনি লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের বিশেষ অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই সময় দাদাভাই নওরোজী লর্ড ওয়েলবির সভাপতিত্বে রয়াল কমিশনের কাছে ভারতে সরকারি খরচের উপর সাক্ষ্য দিচ্ছেন। রমেশচন্দ্র ইংল্যান্ডে বসে নিশ্চয়ই তা লক্ষ্য করেছেন। রমেশচন্দ্রের উপর নওরোজী ও রাণাডের প্রভাব নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এ বিষয়ে ভবতোষবাবু কোন প্রশ্ন করেন নি। অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আর্থিক ইতিহাস ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ইতিহাস কি সমআঙ্গিকে লেখা যায়। ভবতোষবাবু, কিন্তু, অর্থনীতির পথে একথা লিখেছেন যে রমেশচন্দ্রের আর্থিক ইতিহাস প্রায় বিস্মৃতির গর্ভে। কারণ তিনি নিজস্ব কয়েকটি ধারণা প্রমাণ করার জন্য সমগ্র চিত্র অসম্পূর্ণ রেখেছিলেন। ভবতোষবাবু ভারতের একটি সম্পূর্ণ আর্থিক ইতিহাস লেখার পরিকল্পনা এই প্রবন্ধে পেশ করেছেন আজ থেকে ২৪ বৎসর আগে। কিসের অভাবে এ-কাজ এখনও শুরু হোল না জানতে ইচ্ছে করে।

এ তো গেল মোটামুটি ঊনবিংশ শতাব্দীর কথা। এর পর ভবতোষবাবু যে চারজন মনস্বী ব্যক্তির অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, জাহাঙ্গীর কুবেরজী কয়াজী ও বিনয়কুমার সরকার—তাদের লেখাকে বিংশ

শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকের মধ্যে বলে চিহ্নিত করা যায়। এঁদের মধ্যে শেষোক্ত দু'জন অর্থনীতির অধ্যাপক হিসাবে সম্মানের উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অবশ্য অর্থনীতির অধ্যাপকদের নিয়ে লিখতে গেলে অন্য অনেকের সম্বন্ধেও লেখা উচিত। বিনয়কুমার সরকার একজন বহুমুখি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় অনাবশ্যক। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর অহিংস রাজনীতি আজ পৃথিবীর আদর্শপথ। দেশের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে এদের প্রত্যেকেরই সুচিন্তিত ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মত থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ লিখতে গিয়ে কোন মাপকাঠির বিচারে এই মতগুলি গ্রহণ করা যায় তার আলোচনা হওয়া দরকার। ভবতোষবাবু সেই আলোচনা করেন নি বলেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমবায় পদ্ধতি নিয়ে লেখাটি খুবই অব্যাপ্ত। এবং গান্ধীজির পরস্পরবিরোধী মতের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে না পেয়ে তিনি তাঁর কিছু কিছু মত দেশের পক্ষে উপযোগী বলে মনে করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর কুড়ির দশক থেকে যাঁরা অর্থনীতির নানা সমস্যা নিয়ে গবেষণা করছেন তাঁদের অনেকের নাম ভবতোষবাবু এই পুস্তিকার 'পটভূমিকায়' উল্লেখ করেছেন। আশা করছি ইন্ডিয়ান ইকনমিক এসোসিয়েশনের অনুরোধে ভবতোষবাবু বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশক পর্যন্ত ভারতে অর্থনীতি চর্চার যে ইতিহাস লিখতে রাজী হয়েছেন সেই পুস্তকে এইসব গবেষকদের লেখার বিশ্লেষণ পাব।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করে এই পর্যালোচনায় যতি টানতে চাই। রামমোহনের লেখায় পাদটীকা ছিল না বলে আজ জানা যায় না যে তিনি তাঁর পূর্বসূরী বা সমকালীন বৃটিশ ও ফরাসী লেখকদের লেখা অর্থনীতি বিষয়ে পুস্তকাদি পড়েছিলেন কিনা। ভবতোষবাবুর 'অর্থনীতির পথে' অনেক পুস্তক নির্দেশ থাকলেও গ্রন্থশেষে একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থপঞ্জী যাতে পুস্তকে উল্লিখিত ব্যক্তিদের অর্থনীতি বিষয়ে লেখা এবং তাঁদের অর্থনীতি সম্বন্ধে অন্যের লেখা পুস্তকের উল্লেখ থাকলে বাংলা ভাষায় লেখা পুস্তকের মর্যাদা বাড়তো। এ বিষয়ে প্রকাশকেরও কিছু দায়িত্ব আছে। 'বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা'— সামগ্রিক মালা হিসাবে এবং তার প্রত্যেকটি গ্রন্থ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা আছে এরকম একজন সম্পাদক দরকার যিনি পুস্তকের বক্তব্য বিষয় ও অবয়ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের ও নিজের কুশলী মত একত্র করে পুস্তকের প্রকাশ-মর্যাদা বাড়াতে পারেন। তবে একথা মানতেই হবে যে, এক্ষেত্রে প্রকাশক সস্তায় গবেষণামূলক পুস্তিকা প্রকাশ করার যে সংকল্প করেছেন তা আজকের বাজারে নিঃসন্দেহে দুঃসাহস।

গৌরীশঙ্কর রায়চৌধুরী

চিঠিপত্র

খোলাখুলি

উজ্জ্বল মূর্তিতে পাওয়া গেল না

গত ১৪ অকটোবর অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত 'বরং খোলাখুলি অসৎ হওয়া ভাল' শীর্ষক চিঠিখানি পড়েছিলাম। তার পর সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম যাঁকে নিয়ে এই পত্র তাঁর প্রতিক্রিয়া জানার জন্য। কারণ সমালোচনার প্রতিক্রিয়ার ভোট দিয়েই সমালোচিত ব্যক্তির স্বরূপ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দুঃখের কথা ১৬ ডিসেম্বরের অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে বাংলা নাট্য জগতের উজ্জ্বল পুরুষ উৎপল দত্তকে ঠিক উজ্জ্বল মূর্তিতে পাওয়া গেল না। তার পরিবর্তে পেলাম এক অসহিষ্ণু এবং অযথা উত্তেজিত মানুষকে, যিনি সামান্যতম সমালোচনাকেও 'গালাগাল' ভেবে নিয়ে ক্ষুব্ধ হন।

বস্তুতঃ আলোচ্য বিতর্কিত পত্রটির লেখিকা শ্রীমতী সুজাতা বসু তাঁর নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি দিয়ে যা বুঝেছেন তা প্রকাশ করেছেন অত্যন্ত অকপটে। এবং এই অপ্রিয় কাজটি তিনি করেছেন অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে কোন ছলনার আশ্রয় না নিয়েই। তাঁর বক্তব্য ঠিক কি বেঠিক সে বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় যে, শ্রীমতী বসু তাঁর মত প্রকাশের ব্যাপারে খুবই অকপট এবং সে কারণেই তাঁর মধ্যে এক ধরনের সততা আছে। সুখী হতাম, উৎপলবাবুকেও এই সমালোচনার মুখোমুখি সততার সঙ্গে দাঁড়াতে দেখলে। কিন্তু, পরিবর্তে, অসহিষ্ণুতা, রূঢ়তা এবং আত্মম্ভরিতায় তিনি সটান এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন তাঁর সম্পর্কে বক্তব্যের বিরুদ্ধে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে আত্মবিশ্বাসে শ্রীমতী বসু উৎপলবাবুর বিরুদ্ধে অসততার অভিযোগ আনতেও কুণ্ঠিত হন নি, সেই আত্মবিশ্বাসে নিজেকে সৎ প্রতিপন্ন করার শক্তি বোধহয় উৎপলবাবুর নেই। সে শক্তি থাকলে নিশ্চয়ই উৎপলবাবু তাঁর বিরুদ্ধে শানিয়ে ওঠা অভিযোগগুলির খোলাখুলি জবাব দিতে পারতেন এবং পত্র-লেখিকা তাঁকে নিয়ে আলোচনা করার মত স্টেজে আসেন নি—এ রকম একটা ধারণার বশবর্তী হয়ে আত্মতৃপ্তি বোধ করতেন না।

শ্রীমতী সুজাতা বসু উৎপলবাবুকে 'খোলাখুলি অসৎ' হতে বলেছেন। আমরা তাঁকে 'খোলাখুলি সৎ' দেখতে চেয়েছিলাম। দুঃখের কথা তাঁর সাক্ষাৎকারের মধ্যে তাঁকে আমরা সেই বাঞ্ছিত চেহারায় পাই নি। এই অনুন্নত দেশের কটা মানুষ উৎপলবাবুর নাটকের প্রেরণা নিয়ে ভাবেন জানি না, কিন্তু তাঁর বাহ্যিক আচরণ যে তাঁর বৈপ্লবিক আদর্শবাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়—শ্রীমতী বসুর এই ধারণাকেই পরোক্ষে মদত দিলেন উৎপলবাবু তাঁর এই সাক্ষাৎকারে। —মেঘনাদ সিংহ, ৪৬, মিডল রোড, বারাকপুর, ২৪ পরগণা।

মর্মাহত হলাম

১৬ ডিসেম্বর ৭৭ সংখ্যায় শ্রীনির্মলকুমার দাসের 'আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত' পড়ে অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্মাহত হলাম। 'গ্রুপ থিয়েটারের' তথাকথিত পথিকৃত হয়েও (নিজেকে উৎপল দত্ত যা মনে করেন।) তাঁর অন্তরঙ্গ চেহারাটা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য নির্মলবাবু ধন্যবাদার্হ। উক্তিটিতে উৎপল দত্তের দম্ভ ও উন্নাসিক চরিত্রের প্রকাশ পায় না কি? জাতীয় নাট্যশালার দাবী জোরদার হলেও এক দল (উৎপল দত্তের মত) প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের শিল্পীদের এরূপ অসহযোগী মনোভাব (মনোভাবটা তাচ্ছিল্য ও বিদ্রূপে ভরপুর), অসৎ মনোবিকার এক রকম বাধাদানেরই নামান্তর। ব্যথাটা বুকে বেশী বাজে এই জেনে যে, কি করে যে পরাধীনতার নাগপাশে বাঁধা থেকেও, অর্থকষ্ট পেয়েও স্বাধীন নাট্যশালার চিন্তা ও স্বপ্ন দেখাতেন প্রাতঃস্মরণীয় শিশির ভাদুড়ী।—ব্রজেন্দ্রনাথ সাপুই সম্পাদক—মিলনী ক্লাব ও লাইব্রেরী, ফোর্টগ্লস্টার, হাওড়া।

উত্তর পেলাম না

১৪ অকটোবর আমাদের প্রিয় অমৃত পত্রিকায় লেখা সুজাতা বসুর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ১৬ ডিসেম্বরের অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত বিখ্যাত পরিচালক ও অভিনেতা শ্রদ্ধেয় উৎপল দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীনির্মলকুমার দাসের আলোচনা খুব আগ্রহসহকারে পড়লাম কিন্তু দুঃখের বিষয়, সঠিক প্রশ্নের সদুত্তর না পেয়ে আমাকে শেষ পর্যন্ত নিরাশ হতে হল। কারণ উক্ত আলোচনায় '...বিরূপ মন্তব্য করা সত্ত্বেও কেন আপনি তৃতীয় শ্রেণীর হিন্দী ছবিতেও অভিনয় করেন?' এর প্রকৃত জবাব শ্রদ্ধেয় উৎপল দত্ত মহাশয়ের বক্তব্যে প্রতিফলিত হয় নি। একজন সাধারণ পাঠক হিসাবে উক্ত বিষয়ে আমি তাঁর মতামত প্রার্থনা করি। —পার্থসারথী সেনগুপ্ত, মাণ্ডলা, পোঃ নববারাকপুর, ২৪ পরগণা।

উত্তমকুমার

বাংলা চলচ্চিত্র ও গুরুবোধ আলোচনাটি পড়ে ভাল লাগল। আলোচনাটি সময়োপযোগী। বাংলা চলচ্চিত্রের ক্রমাবনতি সত্যিই দুঃশ্চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখনই এবিষয়ে তৎপর হওয়া প্রয়োজন।

সত্যি কথাই নামমাত্র কয়েকজন পরিচালক ছাড়া আর কোন পরিচালকের ছবিতে কোন পরিণতির ছাপ দেখতে পাওয়া যায় না। কাহিনীর মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব।

বাংলা চলচ্চিত্রের এই অসারতা অপরিপূর্ণতার জন্য কিন্তু কেবলমাত্র অভিনেতা উত্তমকুমারকেই দায়ী করা যুক্তিযুক্ত হবে না। এতবড় ইণ্ডাস্ট্রিটা নিশ্চয়ই একা একজন অভিনেতার দ্বারা চালিত হয় না। এছাড়া আজকাল এমন সব ছবিতে উত্তমকুমার অভিনয় করেন, যেখানে তাঁর প্রকৃত প্রতিভা প্রকাশ করবার সুযোগ যৎসামান্যই থাকে। আমার মনে হয়, বাংলা চলচ্চিত্রের বর্তমান দুর্দশার জন্য একা দায়ী নন। তবে একথাও ঠিক এই ইণ্ডাস্ট্রির জন্য তাঁরও কিছু ভাবনাচিন্তা করা উচিত। সুধীরকুমার মণ্ডল, শ্যামনগর, ২৪ পরগণা।

প্রশংসনীয়

আমি 'অমৃতের' নিয়মিত গ্রাহক। 'অমৃতে' প্রকাশিত নানারকমের রচনা তার পাঠকদের আনন্দ দে[illegible] প্রচুর। গত ৯ ডিসেম্বর সংখ্যায় শ্রীতারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'লোকাল ট্রেন চলন্ত পৃথিবী' শিরোনামে প্রকাশিত রচনায় আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে। এটি সন্দেহাতীতভাবে একটি ভিন্ন স্বাদের রচনা। প্রতিনিয়ত আমাদের চারপাশে সাধারণ মানুষের শোক, দুঃখ, শঠতা ঘটে যাচ্ছে—কিন্তু শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তার মননশীল দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে, সহানুভূতি দিয়ে যেভাবে সাধারণ পাঠকের সামনে তা তুলে ধরেছেন—তাতে তিনি অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার। অজয় রায়, অঞ্জনগড়, পোঃ শ্যামনগর, ২৪-পরগণা।

১৯৩৫ সালের জুন মাস।

মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে সুভাষচন্দ্রের দেহে বড় রকমের অপারেশন হয়ে গিয়েছে। নার্সিং-হোম থেকে ছাড়া পেয়ে ভিয়েনার 'হোটেল দ্যা ফ্রান্স'-এ চলে এসে উনি বিশ্রাম নিচ্ছেন। এই রকম সময়ে লণ্ডনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ভাষা-বিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্ব কংগ্রেসে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদানের পথে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আসেন ভিয়েনা। উনিও এসে উঠেছেন 'হোটেল দ্যা ফ্রান্স'-এ। হোটেলে পেঁছেই অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় অসুস্থ সুভাষচন্দ্রকে দেখতে গেলেন।

অধ্যাপক ডঃ চট্টোপাধ্যায় সেবার ভিয়েনায় ছিলেন এগার দিন। প্রায় প্রতিদিনই সুনীতিকুমার ও সুভাষচন্দ্র এক সঙ্গে অনেকক্ষণ অতিবাহিত করতেন; দুজনের মধ্যে আলোচনা চলতো নানা বিষয়ে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে স্বাধীন-ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে দুজনের মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছিল। সুনীতিকুমার ছিলেন ভারতে সকল আঞ্চলিক ভাষায় রোমান হরফ প্রবর্তনের পক্ষে। তিনি কিছুদিন আগেই "এ রোমান এলফাবেট ফর ইণ্ডিয়া" নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রকে পুস্তিকার এক কপি উপহার দিলে এ আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। নৈশভোজ টেবিলের এক সন্ধ্যায় আলোচনা থেমেছিল গিয়ে মধ্যরাতে। সুনীতিকুমারের ধারণা হয় সেই রাতের আলোচনার ফলেই উনি সুভাষচন্দ্রকে রোমান হরফে দেবনগরী ও উর্দু প্রবর্তনের পক্ষে দলে টানতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কয়েক দিন পরে, আলোচনা প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার জানালেন, ইওরোপের বিভিন্ন শহরে ভারতের শিল্পকলার ওপর বক্তৃতা দেবার উদ্দেশ্যে তিনি সঙ্গে অনেক ম্যাণ্টার্ন স্লাইড নিয়ে এসেছেন। শোনামাত্র সুভাষচন্দ্র অনুযোগ করলেন একথা এতদিন ডঃ চট্টোপাধ্যায় তাকে বলেন নি কেন? আর একই সঙ্গে অনুরোধ করলেন ভিয়েনাতে একটি বক্তৃতা দেবার। সুনীতিকুমারের ভিয়েনা চলে যাবার আর মাত্র কদিন বাকী। হাতে সময় নেই বললেই হয়। তবু সুভাষচন্দ্র নাছোড়বান্দা। ভিয়েনার ভারত-প্রেমীদের ভারতের শিল্প-সংস্কৃতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করার এমন সুবর্ণ সুযোগ তিনি কিছুতেই হাতছাড়া করতে রাজী নন।

সুনীতিকুমারের ডায়েরী মিলিয়ে, তখুনি তিনি বক্তৃতার, বিষয়, দিন, ক্ষণ, স্থান সব কিছুই স্থির করে ফেললেন। বক্তৃতা হবে—ভিয়েনাস্থ ভারতীয় ছাত্র-সমিতির উদ্যোগে, 'হোটেল দ্যা ফ্রান্সের' হলে, সময় সন্ধ্যা আটটা। বিষয় 'ভারতের জাতীয় চিত্রকলার ক্রমবিকাশ'; সভাপতি-সুভাষচন্দ্র বসু। সব কিছুই সুনীতিকুমারের সামনে স্থির করে জানালেন যদি কোন কিছু ব্যাপারে অদল-বদলের প্রয়োজন হয় তাহলে পরের দিন সন্ধ্যার মধ্যে ডঃ চট্টোপাধ্যায়কে জানিয়ে দেবেন।

সুনীতিকুমার সুভাষচন্দ্রের কক্ষ ছেড়ে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে একটুকরো কাগজে আমন্ত্রণলিপির খসড়া লিখে নিয়ে সুভাষচন্দ্র ফোন করে কয়েকজন ভারতীয় ছাত্রকে আসতে অনুরোধ জানালেন। কিছুক্ষণের মধ্যে দুজন ভারতীয় ছাত্র এসে উপস্থিত। তাদের সঙ্গে বসে কাদের কাদের বক্তৃতা অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করা যেতে পারে সে তালিকা তৈরি করলেন। ব্যবস্থা হলো কয়েকটি দৈনিক সংবাদপত্রে বক্তৃতা সম্পর্কে উপযুক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের। ভারত-সুহৃদ অস্ট্রিয়ান অধ্যাপক, শিক্ষক, শিল্পী ও শিল্পকলার ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে উপস্থিত থাকেন সে বিষয়ে সম্ভাব্য ব্যবস্থাদির জন্য সুভাষচন্দ্র ছাত্রদের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

নির্দিষ্ট দিন সকালে সুভাষচন্দ্র সুনীতিকুমারের কক্ষে গিয়ে জানালেন সন্ধ্যা নাগাদ তৈরি থাকতে; উনি এসে বক্তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন বক্তৃতাস্থলে। ব্যবস্থামত আট-টা বাজতে কয়েক মিনিট বাকী এমন সময়ে সুনীতিকুমারের ঘরের দরজায় টোকা পড়লো। বক্তা প্রস্তুত হয়েই আছেন। দরজা খুলে দিলেন। সুনীতিকুমারের পরনে পাট-ভাঙ্গা সুতীর লাউঞ্জ-সুট। সুভাষচন্দ্র বক্তাকে আপাদমস্তক একবার ভালভাবে দেখে নিয়েই যেন হতবাক হয়ে গেলেন। মাথা নাড়লেন দুবার। ভাবটা না, না—এ পোষাক চলবে না। উনি একজন খাঁটি ভারতীয়; বক্তৃতা দেবেন সম্পূর্ণ ভারতীয় বিষয়-এ। বিষয় হচ্ছে আবার চারুশিল্প, চিত্রকলা। সুতরাং বিদেশী পোষাক অচল। যতদূর সম্ভব ভারতীয় হতে হবে বক্তাকে। সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত বিনীতভাবে অনুরোধ করলেন সুনীতিকুমারকে পোষাক বদলের জন্য। প্রস্তাব করলেন ও'র কালো শেরোয়ানী ও চুস্ত পা-জামা পরার জন্য। সেই সঙ্গেই জিগ্যেস করলেন মাথায় দেবার ভারতীয় ঢং-এর কোন টুপি আছে কিনা। নেই শুনে সুভাষচন্দ্র অন্য কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বাইরে চলে গেলেন। যাবার সময়ে বলে গেলেন উনি ফিরে না আসা পর্যন্ত যেন অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় অপেক্ষা করেন।

সুভাষচন্দ্রের অনুরোধ ভাষাচার্যের কাছে নেহাৎ-ই ছেলেমানুষী বলে মনে হলো। প্রথমে একটু আপত্তি জানাবার চেষ্টা করেছিলেন। কারণ, হাতে আর সময় নেই অথচ পোষাক বদল মানেই কিছু সময় চলে যাবে। দ্বিতীয়তঃ অস্ট্রিয়ার গ্রীষ্মে টাইট পা-চাপা পাজামা হবে বেশ অস্বস্তিকর। তিনি মনে মনে একটু বিরক্ত-ই হয়েছিলেন। কিন্তু, পরক্ষণেই মনে হলো—সভায় পৌরোহিত্য করছেন যিনি, তিনি বয়সে নবীন, দুবছরের ওপর ওদেশে থেকেও যখন নিজেকে ভারতীয় পোষাকে আবৃত্ত করেছেন তখন তাঁর পক্ষে লাউঞ্জ-সুট বেমানান হবে বৈকি। অগত্যা সুভাষের ইচ্ছানুযায়ী নিজেকে সজ্জিত করলেন। আবার দরজায় আওয়াজ হলো। এবার সুভাষচন্দ্র ঘরে ঢুকেই খুব খুশী। হাত বাড়িয়ে ভাষাচার্যকে দিলেন একটি গান্ধী টুপি। এই টুপি আনতেই তিনি চলে গিয়েছিলেন নিজের কক্ষে।

বক্তাকে সঙ্গে নিয়ে সভাপতি ঘরে ঢুকলেন। বেশ কয়েকজন পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার পর সুভাষচন্দ্র জার্মান ভাষায় ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় দিয়েছিলেন। আশাতীত জনসমাগম হয়েছিল। বক্তা বলেছিলেন এক ঘন্টা। তারপর আরও এক ঘন্টা চলে প্রশ্নোত্তরের পালা। শ্রোতাদের আগ্রহ ও ভারত সম্পর্কীয় জ্ঞান সুনীতিকুমারকে অবাক করেছিল। পরে তিনি বার বার বলেছেন বিষয়বস্তু ও পরিবেশ বিচারে সুভাষচন্দ্র পোষাক বদলের ঠিক পরামর্শই দিয়েছিলেন। তাঁর নিজের কথায়—

"He was in a way right for I was speaking on an important expression of Indian Culture, and it was in the fitness of things that I should be dressed al' indienne".

শিবব্রত ঘোষ

তোমার নতমুখ

বাসুদেব দেব

তোমার নতমুখ ইতিহাসের ওপর
শেষ বিকেল লতার মত উঠেছে গাঁথা বেয়ে
হাওয়া হেঁটে আসছে বিষণ্ণ
কাগজের কুচি বাদামের খোলা কুড়িয়ে কুড়িয়ে

আমার কলম ক্যামেরা রেখেছি নামিয়ে
তোমার পায়ের কাছে
গাছের পাতা বেয়ে টুপ টুপ করে
ঝরে পড়ছে স্মৃতি
একদিন প্রখর দুপুর ছিল তোমার চোখে
আশ্চর্য তলোয়ার ত্বকের খুব কাছে

ইতিহাস থেকে দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে
বসন্তকালের অশ্বারোহী
ধুলো ওড়ানো মাঠের মার্জিনে
গ্রন্থাগার থেকে দূরে
বসে থাকে সেই নারী খোলা চুল

বিনিময়ে

মৃণাল বসুচৌধুরী

শুধু কি ধ্বংসের পায়ে মাথা রেখে
মুক্তি চেয়েছিলে
চেয়েছিলে নির্মেঘ আকাশ
অনাবিল স্বপ্নের সুষমা
শুধু কি যুদ্ধের জন্য প্রেম চেয়েছিলে
চেয়েছিলে স্বাধীনতা
জলবায়ু
উপেক্ষিত মৃত অধিকার

স্থির চরাচরে
এখনও নির্ভয়ে ওড়ে মাছরাঙা
নীলবর্ণ ধর্মের নিশান
বিনিময়ে কিছু কি দেবার ছিল
নাকি রিক্ত হাত
এখনও শেখে নি তার ব্যবহার
ভাষার ভেতরে কোন ভাষা
এখনও দেয়নি গূঢ় মন্ত্রের আভাস
বিনিময়ে ছায়াখণ্ড

নির্ভরতা
কিছু কি রাখার নেই
অন্তরঙ্গ আঙুর পাতায়

বাঁচা

অনন্ত দাস

প্রতিদিন টের পাচ্ছি নতমুখে লবণাক্ত জ্বালা
দূরে যায় বৈভব, ব্যসন
কম্পিত আঙুলে আমি এতটুকু রৌদ্রশিখা চেয়ে
গভীর বিষাদে জ্বলে যাই।
আরোগ্য চাইতে গিয়ে যেন এক দুরারোগ্য ব্যাধি
সারা দেহ ঘিরে ফেলছে
অজানা আশঙ্কা দোলে করবীতে, বৃক্ষের শাখায়
অবিরল শোকদুঃখ
ছোবলে ছোবলে দিন নীল হয়ে যায়
শূন্য থেকে মাটি খাবলে কতদিন বাঁচা?
আমার অস্তিত্ব আমি এই নখে ধরে আছি
কোন এক ক্রোধান্ধ দুপুরে
ধমনী বিদীর্ণ করে ছেড়ে দেব রক্তের ফোয়ারা

স্বপ্ন

সুরজিৎ ঘোষ

আমার স্বপ্নকে আমি পাথরের ঠাকুরের পাশে বসিয়েছি
তারায় তারায় যখন উৎসবের মালা গাঁথা হয়
তখন অঞ্জলির ফুল তাকে ছুঁয়ে যায়
সন্ধ্যা আরতির বাতাস এত কষ্টের মাঝেও তাকে শীতল রাখে।

কিন্তু সে জন্য নয়, একদিন এই শহরের বুকে নদী নামবে।
জলের ঢল আমাদের উঠোন ভাসিয়ে দেবে—
পায়ে পায়ে যেমন আসবে বুনো আকন্দ আর শ্যাওলার গন্ধ
তেমনি নিঃশ্বাসের মতো জড়ো হবে মানুষ;
আর সব ভাসাব তারা যখন একই নীল ছাউনির নীচে এসে দাঁড়াবে
পিঠোপিঠি ওঠা শীতে এ ওর গায়ে গা ঠেকিয়ে
তখন তাদের আমার স্বপ্নের কথা বলতে গিয়ে
আমি আকাশের দিকে তাকাতে শিখব।

পাথরের ঠাকুর যে অনেক উঁচুতে থাকেন।

সিদ্ধার্থ

কবিরুল ইসলাম

না, কোনো অহং নয়, শুধু প্রেমে নতজানু হও
শব্দকে অর্জন করো সাগর সঙ্গমে

না, কোনো চাতুরী নয়, না, অপহরণও নয়,
বন্দিনী শব্দকে আনো পরম উদ্ধারে
অর্থের সাজানো গণ্ডী ভেঙে, অতিক্রমে
ধনুকে পরাও গুণ

লক্ষ্যের শরকে বিদ্ধ করো
সেই মাছ।।

শৈলেন মিত্রের ছবি

ছোট পরিবার সুখী পরিবার

অমল আচার্য

কোচবিহার থেকে দিনহাটা যাচ্ছি, সকাল নটা। প্রসঙ্গ বন্ধুর কানে দেখা। রোদ্দুর উপচে পড়েছে সাপের চামড়ার মত চকচকে পীচঢালা রাস্তায়। দুপাশে ধানক্ষেত বাহারি সবুজে একাকার। আকাশের পেটে থোক থোক সাদা মেঘ। হুহু করে ছুটছে ফিকে নীল অ্যামব্যাসাডার। চাকার খাঁজে ঘোরতর গতির বিপুল শীৎকার। আমরা চার বন্ধু দারুণ জমে আছি। হঠাৎ সামনে সেতু। সেতুর নিচে তোরসা। গাড়ির গতি পাঁচ কিলোমিটারে নেমে আসে। মুখোমুখি ছুটে আসা মেরুন রঙের মিনি, তাড়াখাওয়া বুনো মোষের মত ট্যাক ভুল করে। আমাদের গাড়ি জিরো পয়েন্টে ঠান্ডা হয়ে যায়। প্রবল উত্তেজনায় বন্ধুরা পাথর, মুখে ফিটকোরিলা রঙ। আমি বরং ছিটিয়ে হেসে উঠি। আঙুল দিয়ে দেখাই পাশের বিশাল কৃষ্ণচূড়া গাছটা। একটা সাইনবোর্ড সাঁটা তাতে। সাইনবোর্ডে আঁকা আছে একটা পুরুষ একটা নারীর মুখ। তাদের দুপাশে দুটো মুখ—বাচ্চা ছেলেমেয়ের। নিচে লেখা : ছোটো পরিবার সুখী পরিবার।

গাড়ির চাকা পাকে পাকে ঘুরে যেতে শুরু করে আবার।

কলকাতার থলথলে শরীরে এ বিজ্ঞাপন তো হামেশাই দেখে থাকি বা পোস্টার, খবরের কাগজ, দেয়াল, সিনেমার পর্দা, ট্রামবাসের গায়ে কতই না পড়েছি 'ছোটো পরিবার সুখী পরিবার,' কিন্তু ভাবিনি কখনো—ছোটো পরিবার কি সত্যিই সুখী পরিবার ?

পরিবার পরিকল্পনার বিজ্ঞাপনের ছবি-ছটা দেখে মনে হয় ছোটো পরিবার বলতে স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের দুই ছেলে-মেয়েকে বোঝায়। এছাড়া রক্তের সম্পর্কে যারা থাকে, যেমন মা-বাবা, ভাইবোন—তারা বাদ। বিয়ের পর বোন অন্য সংসারে চলে যায়, ভাই আলাদা সংসার না হয় পাতল—কিন্তু বুড়ো বাবা-মা ? তাঁরাও কি বাজার মন্দা বলে ছাঁটাই হয়ে যাবেন ? তাঁরা কি অপরাধ করেছিলেন তাঁদের সন্তানদের লালন করে অপরিসীম ক্লেশের বিনিময়ে ? গভীর কষ্টের সময় কার কোলে মাথা গুঁজে শান্তি খুঁজি—সে মা না ? বিশ্রীরকম ভাঙচুরের সময় কার বুকের শিথিল চামড়ায় মাথা ঠেকিয়ে নির্ভরতার স্বাদ নিই—সে বাবা না ? এগুলো যদি সংসারে না থাকে তাহলে কি সত্যিই সুখ থাকে ? সুখ বেগুনফুল হলেই ভাবে ভাল। নাগাড়ে রসগোল্লা সাঁটিয়ে গেলে অরুচি ধরে যায়, কাঁচা লংকায় কামড় দিতে ইচ্ছে করে। নাকি কাঁচা লংকাও বিদেশে চালান হয়ে যাচ্ছে ?

আমার এক সহকর্মী অফিস কামাই ... ঘন ঘন। তার সংসারে দুই মেয়ে আর বউ। বড় মেয়ের বয়েস এগার, ফাইভে পড়ে। ছোটোটা টু এর ছাত্রী—বয়েস সাত। দুজনেই টনসিলের রুগী—ঠান্ডা গরমের হেরফের হলেই অসুখ হয়ে পড়ে। যখনি হয় দু'একদিনে যায় না, বিস্তর ভোগান্তির পর রোগ ছাড়ে। বন্ধুটি নার্ভাস টাইপের। মেয়েদের অসুখবিসুখ করলে সে পাগল হয়ে যায়। খায় না, ঘুমোয় না। ঘড়ি দেখে ওষুধ দেয়, পালস বীট গোনে, টেম্পারেচারের চার্ট মেইনটেইন করে। সারারাত জেগে বসে থাকে। তার নির্দেশে বাড়িতে রেডিও চলা বন্ধ হয়ে যায় তখন, এমন কি হাসি পর্যন্ত। রান্নাবান্না যতটুকু না হলে নয়, ততটুকু। কখনো তাও বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। তার যুক্তি : বাড়িতে অসুখ-বিসুখ থাকলে খাওয়াদাওয়া হবে কেন ? বউয়ের সঙ্গে এ নিয়ে খিটি-মিটি করে সে। অফিসে ডুব মারে। এ-ডাক্তার ও-ডাক্তার করে অজস্র টাকা খরচ করে, ধারদেনা কর্জ করেও। ডাক্তারকে রিপোর্ট দেয়া, ওষুধ কেনা, ঠিক ঠিক ওষুধ খাওয়ানো, এছাড়া সংসারের নৈমিত্তিক কাজকর্ম সবকিছুই তাকে একলা করতে হয়। যেহেতু বউ ছাড়া সংসারে তার আর কেউ নেই। ফলে অফিস কামাই করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। অফিসের মেজোবাবু এজন্যে তার ওপর বেজায় খাপ্পা।

একদিন ওকে বললাম : এত অফিস কামাই কি ভাল ?'

আমার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে সে বলল : কি করব বল্‌ ? ছোটো মেয়েটার বিশ্রিরকম কাশি হয়েছে। এত ডাক্তার দেখাচ্ছি, ওষুধ খাওয়াচ্ছি—কিছুতেই যাচ্ছে না। এক্সরে করালাম, ব্লাড করালাম, থ্রোট সোয়াব কালচার করালাম—কোনো দোষ নেই, অথচ কাশি সারছে না কি যে ফ্যাসাদ! আমি ছাড়া করবেই বা কে? কেউ কি পারে এসব ?

আজকালকার ছোটো পরিবারে এ সমস্যাগুলো থেকেই যায়। বড় সংসার হলে অসুবিধেগুলো থাকে না। বাড়ির কর্তা ক অসুস্থ হলে খ বাজার করতে পারে, রেশন তুলতে পারে, গম ভাঙাতে পারে। গ ঘ'কে নিয়ে ডাক্তারখানা যেতে পারে, ওষুধ আনতে পারে ও ছ জ'কে নিয়ে ইস্কুলে যেতে পারে নিয়ে আসতে পারে। বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন এলে ঘ ছুটতে পারে দোকানে। কোনো বিপদ হলে খ গ দ ও বুদ্ধিপরামর্শ দিতে পারে, সহযোগিতা করতে পারে। এরকম অনেক কিছুই হতে পারে। সমস্যা তখন একজনকে বয়ে বেড়াতে হয় না। ভাগজোক হয়ে যায় অনেকের মধ্যে। এতে স্বস্তি থাকে, শান্তি থাকে।

বিনয় আমাকে একদিন নেমন্তন্ন করল। ভাল চাকরি করে বিনয়। সাউথে ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে। খাওয়ার আয়োজন করেছিল এলাহি। পোলাও, মুরগীর মাংস, তেলকই—তাছাড়া আরো টুকিটাকি। কব্জি ডুবিয়ে খাচ্ছিলাম। বিনয়ের বউ মীনা পরিবেশন করছিল। বিনয়ও খেতে পারে খুব। মন্দ চালাচ্ছিল না। হঠাৎ এক সময় বিনয়কে গম্ভীর হয়ে যেতে দেখলাম। আঙুলের ফাঁকে পোলাও নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, মুখে তুলছিল না। 'খেতে খারাপ হয়েছে নাকি ? শরীর খারাপ লাগছে ? এটুকু খেয়েই হয়ে গেল ?' নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল মীনা। বিনয় পেটে হাত বুলিয়ে বোঝাল, ভরে গেছে। খাওয়ার পর সিগারেট টানছিলাম সোফায় বসে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম বিনয়ের সাজানো গোছানো সংসার। খাট, আলমারি, ফ্রিজ, রেডিওগ্রাম, গ্যাস, টেলিভিশান সংসারে সবই আছে। দরজা জানলায় সুন্দর সুন্দর পর্দা। স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী বউ। ফুলের মত ফুটফুটে ছেলেমেয়ে আর কি ?

বিকেলে চা খেয়ে বাড়ি ফিরছি, সঙ্গে বিনয় বাস স্টপ পর্যন্ত।

জিজ্ঞেস করলাম বিনয়কে : খেতে খেতে গম্ভীর হয়ে গেলি কেন রে ?

বিনয় সিগারেট ধরাল। অন্যমনস্ক থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল : দাদার কথা মনে হচ্ছিল। পোলাও খেতে ভালবাসে খুব।

আমি বিনয়ের দাদাকে চিনি। চটকলে কাজ করেন ভদ্রলোক। ভাইবোনদের মানুষ করার জন্যে কম বয়েসেই কাজে ঢুকতে হয়েছিল। বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। ভাইরাও দাঁড়িয়ে গেছে। দাঁড়ানোর পর সটকে পড়েছে নিজেরটা দেখে। কিন্তু তিনি যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে গেলেন শেষ অবদি। ছোটো সুখী পরিবারের মধ্যে থেকেও বিনয়কে ভাবতে হয়, দাদা পোলাও খেতে ভালবাসে খুব। অথচ তেমন করে খেতে পায় না। তাই তার আঙুলের ফাঁকে পোলাও ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

হিসেবমত বিনয়ের দাদার পরিবারও ছোটো পরিবার, ইদানীং। দাদা বউদি, দুই ছেলেমেয়ে। মেজছেলে ছ'বছর বয়েসে মারা যায়। বড় ছেলের সঙ্গে ছোটো মেয়ের বয়েসের তফাৎ দশ। বাবা-মা তো আগেই গত হয়েছেন। ভাইবোনদের ভিন্ন সংসার। সুতরাং বিনয়ের দাদার সংসারে সুখ থাকার কথা ছিল। কিন্তু সুখ বড় ধুরন্ধর, কারো দিকে সহজে বড় চোখে তাকায় না। বিনয়ের দাদার সংসারে সুখের পাট চুকে গেছে দীর্ঘকাল। শরীরশরাগত চৌপাট হয়ে গেছে দাদার। বউদির চোখের কোলে ক্লেশের ছাপ। ছেলেমেয়েদের দু'বেলার পরিবর্তে ভাত বরাদ্দ হয়েছে একবেলা। দু'দিন অন্তর বাজার। অসুখবিসুখ হলে ই এস আই'র ডাক্তার, অথবা কাছাকাছি আধা হাসপাতাল। দিনে স্বামী-স্ত্রীতে কথা কাটাকাটি কিছুক্ষণ, কখনো কান্নাকাটি। অথচ এরকম ছিল না আগে। এমনভাবে ছিল না। এখন বেড়ে যাওয়ার কারণ—অভাব। লোকে বলে 'অভাবে স্বভাব নষ্ট।' সকলেরই স্বভাব নষ্ট না হলেও, ভারসাম্য টলে যায়। অহরহ অভাব অনটন মানুষের রক্তে লিউকেমিয়া ধরিয়ে দেয়। তখন প্রেমটেম থাকে না, ফালুক-ফুলুক তাকিয়ে একসময় উর্ধ্বশ্বাসে পাখীর মত ছুটে পালায় প্রেম। সুখটুখের গোড়ার কথা হল অর্থ, অন্তত বড় উপকরণ তো বটেই। সংসারে এক ছেলে এক মেয়ে নিয়েও কত লোক হালে পানি পাচ্ছে না আজকাল। ক্রমশ গেড়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। সুতরাং 'ছোটো পরিবার সুখী পরিবার'কে ধ্রুবসত্য বলে মেনে নেয়ার ভ্রান্তি থেকে যায়। যার মাস গেলে মাত্র দেড়শ - দুশো টাকা উপার্জন সে কি করে সুখী হবে, তার পরিবার যতই ফর্মুলা মাফিক ছোটো পরিবার হোক

না কেন? আর আমাদের দেশে শতকরা কতজন লোক মাসে দেড়শ-দুশো টাকার বেশি আয় করে? ষাট কোটি লোকের তুলনায় তার হিসেব আঙুলের খাঁজে আটকে যায়। তাই বলছিলাম, ছোটো পরিবার মানেই সুখী পরিবার একথা সূর্যের মত সত্যি নয়। বিনয় তার ছোটো পরিবার নিয়ে যতখানি সুখী বিনয়ের দাদা কি ততখানি সুখী? নিশ্চয়ই নয় এই কারণে যে, মোটামুটিভাবে বাঁচতে গেলে যে সঙ্গতি থাকা দরকার সে-সঙ্গতি বিনয়ের থাকলেও তার দাদার নেই।

পিঠোপিঠি এখানে আরেকটা কথা এসে যায়। কিছুদিন আগেও আমাদের দেশে একান্নবর্তী পরিবারের চল ছিল। একেকটা পরিবার ছিল ছোটোখাটো ক্লাব। দশ-বারোটা সন্তানের পিতা হও রীতিমত এলেমদারীর ব্যাপার ছিল। তাঁরা কি খুব অ-সুখে বেঁচেবর্তে ছিলেন? ঘি-দুধ-মাছ-মাংস খেয়ে, নকসাপাড় ধুতি পরে কচমচে পাম্পসু পায়ে গলিয়ে, বাহারি গোঁফে তা দিতে দিতে তাঁরা তো বেশ ফুর্তিফার্তা করেই জীবনটা কাটিয়ে যেতে পারতেন। কেবলমাত্র ভোগ করেই গেলেন না, বংশধরদের জন্যে রেখেও গেলেন কিছু। তখন কিন্তু এরকম জোর প্রচার চলেনি, ছোটো পরিবার সুখী পরিবার, বা ধরেবেঁধে ব্যাচুং ঘুচুংও হয়নি। না হওয়ার কারণ ওই একটাই—তখন অর্থনীতি বলে কিছু ছিল। কিন্তু এখনকার অর্থনীতি ক্লাউন সেজে দড়ির পর ব্যালান্স-শো করছে—ও কাঁপছে টলটল করে, আর দর্শকদের মধ্যে সবসময় উত্তেজনা 'এ

ঘরে ঘরে

নকুল প্লেট সাজিয়ে দিয়ে সুপ আনতে গেছে, অপলা একটু ঝুঁকে আয়নাইকায় আবদ্ধ নিজেকে দেখছিল, মা বললেন, অপা, এই জামাটা তুমি আর পরবে না। শাড়ির নিচে তবু একরকম, স্কার্টের সঙ্গে এমন আঁটো জামা তোমাকে মানায় না।

—আমার এখনো চোদ্দও হয়নি মামণি! তুমি কি এখন থেকেই আমাকে শাড়ি পরতে বলো? সেই যে শিয়ালদায় দেখেছিলাম—রিফিউজি মেয়েদের মতন?

—তর্ক কোরো না অপা। শাড়ির কথা হচ্ছে না। স্কার্টের সঙ্গে ওরকম আঁটো ব্লাউজ তোমার আর পরা উচিত নয়।

স্বচ্ছ খাবার টেবিলে প্রতিবিম্বিত নিজের বুকের গড়নে চোখ রেখে অপলা বললো, আজকাল সব মেয়েরাই টাইট পরে।

মুখে-মুখে উত্তর। বিরক্তিতে সীমার ভুরু কঁচকে যায়। নকুল সুপ দিয়ে গিয়েছিল, সুপ একটু ঠাণ্ডা হলে নীলাক্ষ খেতে পারে না, সীমা গলা তুলে ডাকলো, কই, খেতে এসো।

সাড়া না পেয়ে সীমা চেয়ারে শব্দ করে উঠে গেলো।

নীলাক্ষ ড্রয়িংরুমে হেডলি চেজ নিয়ে ডুবে আছে। অফিসের ঝামেলা থেকে ফিরে আজকাল যে-কয়েকটি উপায়ে সে রিল্যাক্স করে, হেডলি চেজের নতুন আমদানিতে চোখ বুলোনো তারই একটি। সিরিয়াস সাহিত্য-ফাহিত্য কেন যে লোকে লেখে, কেন-ই বা পড়ে, সে কিছুতেই ভেবে পায় না। সেক্স, মার্ডার, উত্তেজনা, এসব মানুষের একেবারে ভেতরের ব্যাপার, যাকে বলে রক্তে মিশে আছে। দ্য রিয়াল থিং। এসব ছেড়ে প্রেমের প্যানপ্যানানি, ভাবনার ভ্যানভ্যানানি কাঁহাতক পড়া যায়! এটা তার গত কয়েক বছরের সাহিত্যচিন্তার গ-সা-গু।

বিখ্যাত প্রোডিউসারের ছেলে সমুদ্রতীরে প্রথম দর্শনেই সুন্দরী তরুণীকে খুন করার সংকল্প করেছে, ক'দিন পটিয়ে পাটিয়ে মেয়েটিকে হোটেলের ঘরে নিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় সীমা এক ঝটকায় বইটা ছিনিয়ে নেয়।

—এগুলোতে অতো কী পাও বলো তো? কখন থেকে ডাকছি, সুপ যে জুড়িয়ে যাচ্ছে—

নীলাক্ষ উঠে দাঁড়িয়ে সীমার নিটোল বাহুতে আলতো চাপ দেয়, সুপ জুড়োক, তুমি না জুড়োলেই হলো! ওই যাঃ, আজ আনতে বলেছিলে, একদম ভুলে গেছি।

—কী?

কিঞ্চিৎ কৌতুকে, গলা নামিয়ে, সুখী পরিবারের চাবিকাঠি। ইলেকট্রনি-ক্যালি টেস্টেড।

—আস্তে। অপা খাবার টেবিলে।

সুপ খেতে খেতে নীলাক্ষ দেখলো, অপলার মুখ থমথমে। রাগ আর জেদ টসটস করছে।

স্বরে নকল উদ্বেগ, মুখে মৃদু হাসি, নীলাক্ষ বললো, অপা, তোমার সেই সুইজারল্যাণ্ডের পেন ফ্রেণ্ডের চিঠি আসতে দেরি হচ্ছে, না? তোমার ওই বন্ধুটি কিন্তু বড্ড নিষ্ঠুর।

অপলা মুখ নিচু করে খাবার নাড়াচাড়া করছে, কথা বললো না।

—আচ্ছা অপা, আজ যে স্টিকার-গুলো এনে দিলুম, তোমার পছন্দ? তোমার প্রেসক্রিপশনটা আমি কোথায় যে হারালাম!

সীমা মুখ তোলে, অতো প্রশ্রয় দিয়ো না তো। ডোন্ট টিজ মি, কিস মাই রোজেজ—এসব কী? দেখলে গা জ্বলে যায়। অতো বড়ো মেয়ে, ওইসব গায়ে সেঁটে আমি ঘুরে বেড়াতে দেবো ভেবেছো

অপলা মায়ের চোখে চোখ রাখে, মামণি, ওগুলো তোমার জন্যে নয়। আমার যদি ভালো লাগে, আমি লাগাবো। বাপি তা-ও তো সবগুলো আনে নি, আমি যেগুলো লিখে দিয়েছিলাম।

সীমা গম্ভীর। নিজেকে কোনো রকমে সামলায়, খেয়ে নাও।

এরকম করলে খাওয়া যায়? আমি খাবো না! ব'লে অপলা খাওয়া শেষ না করেই চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ে।

—অপা! অপা, শিগগির এসে খেয়ে যাও বলছি!

নীলাক্ষ বাড়িতে কোনো রকম অশান্তি পছন্দ করে না। বললো, থাক সীমা, জোর কোরো না।

নকুলকে ডেকে বললো, একটু পরে দিদিমণির ঘরে একটু বেশি করে কাস্টার্ড দিয়ে [illegible]।

নকুল ফ্রিজ খুলে কাস্টার্ডের বাটি পরখ করে বললো, ভালো জমেনি। দিদি-মণি আবার খুব বেশি না জমলে কাস্টার্ড মুখে তোলে না।

—ফ্রুটস আছে কিছু? একটা স্যালাড বানিয়ে দাও।

অপা পাশের ঘরে রেডিয়ো নিয়ে পড়েছে। বি-বি-সি, ভয়েস অব আমেরিকা, রেডিয়ো পিকিং, রেডিয়ো অস্ট্রেলিয়া, গোটা পৃথিবীটাই তার তিন আঙুলে। একটা স্টেশন এক মিনিটও শুনছে না, শুধু একটা থেকে আরেকটায় নব ঘুরিয়ে চলেছে।

সীমা এক চামচ কাস্টার্ড আলতো মুখে ফেলে বললো, রাগ দেখাচ্ছে! এই বয়সেই যা জেদী হয়েছে! একটা কথা বলার উপায় নেই।

বুঝি গেল, এই বুঝি গেল?' এই চাপা 'গেল গেল' রবেরই সোচ্চার রূপই 'ছোটো পরিবার সুখী পরিবার।'

হয়ত 'ছোটো পরিবার সুখী পরিবার' শ্লোগানের মধ্যে অন্য একটি ইঙ্গিত আছে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ফিবছর সাত আট দিনের জন্যে হাসপাতালে গিয়ে ওঠা, স্বাস্থ্য বা মনের দিক থেকে নিশ্চিতভাবেই কাম্য নয়। মাতৃত্ব নিঃসন্দেহে নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কিন্তু সেই মাতৃত্ব যদি ঘন ঘন প্রকাশ পায় শারীরিক জ্যামিতিতে এবং তার জন্যে প্রয়োজন হয় হাসপাতালের ফ্রি বেড, প্রচুর রক্তক্ষরণ, তাহলে সেই মাতৃত্বের সংখ্যা অবশ্যই ছোটো অঙ্কে বেঁধে ফেলা ভাল। জীবনে মা হওয়া ছাড়া আরো অনেক ব্যাপার আছে, যা একেবারে গৌন নয়। সৌন্দর্য জীবনের আরেকটা দিক। সেই সৌন্দর্য শরীর, মন এবং পরিবেশের পর দাঁড়িয়ে তিলোত্তমা হয়। একজন স্বামী নিশ্চিতভাবেই একজন স্বাস্থ্যবতী নীরোগ স্ত্রী পছন্দ করে। স্বাস্থ্যবতী স্ত্রী লাবণ্য কোন পুরুষকে না কাহিল করে ফেলে? স্ত্রীর ভাঙ্গাচোরা শরীর, অ্যানেমিক চোখ, শিরাওঠা হাতের রুগ্ন আঙুল স্বামীর স্নায়ুতে হাজার বছরের ক্লান্তি ছড়িয়ে দেয়, কিংবা খেপা কুকুরের স্বভাব জাগিয়ে তোলে। আমি দেখেছি এরকম। স্ত্রীর শরীর-স্বাস্থ্য ভেঙে যাওয়ার, হতশ্রী হবার প্রধানতম কারণ ঘন ঘন মা হওয়া। সুতরাং ঘন ঘন মা হওয়ার গা-ছেড়ে দেয়া অভ্যাস সংযত করার জন্যেই 'ছোটো পরিবার সুখী পরিবার' এ রকম মন্ত্র জরুরী হয়ে পড়েছে। অবশ্য শহর-নগরের মানুষ

—শুধু ওকেই দোষ দিয়ে লাভ নেই। কী করবে বেচারা! সঙ্গী নেই, সাথী নেই। আমার ছেলেবেলায় খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো মিলিয়ে আমরা কুড়ি-বাইশজন ভাইবোন এক বাড়িতে থাকতুম। সারাদিন হৈ-হৈ। কলঘরে জালির মুখ এঁটে সবাই মিলে জল ছিটিয়ে চান করার কথা ভাবলে আমার এখনো সুখ হয়। রোদ পড়লে উঠোনে আমরা নিজেরাই ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান হয়ে যেতুম। কেউ কোনো দোষ করলে, কারো পড়া মুখস্থ না হলে, বড়োরা তাকে কী শাস্তি দেবে ভেবে আমরা সব ভাইবোন কাঁটা হয়ে থাকতুম। অপা কী পায় বলো। তুমি আস্তে আস্তে খাও। আমি একটু দোকান থেকে ঘুরে আসছি।

সীমা সত্যিকার অবাক, ধন্য তোমার উৎসাহ! এখুনি বৃষ্টি নামবে, আজ কি না বেরোলেই নয়?

নীলাক্ষ টুথপিক নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল, বসে পড়ে বললো, আচ্ছা যাবো না। তুমি অপাকে একটা ভাই দিতে রাজি? অনেক দিন তো হয়ে গেলো।

—আবার! ও বাবা, না, তুমি দোকানেই যাও। সীমা হাসলো, নীলাক্ষ মুখ ফিরিয়ে মেঘ লুকোয়।

দোকানে না-গিয়ে সে চুপি-চুপি ছাদে উঠে গেলো। দোতলা থেকে পাঁচ-তলা। সিঁড়ি ভাঙতে হাঁপ ধরে।

ছাদ অন্ধকার। আকাশে একটাও তারা নেই। নীলাক্ষ সিগারেট ধরিয়েছিল, বিস্বাদ। ফেলে দেয়। বুকে হাঁপ ধরলে সিগারেট ভালো লাগে না। নিচে নেমে গিয়ে সেই গল্পটা দেখলে হয়। হায়, ঠাণ্ডা মাথার খুনও তাকে টানলো না।

ছাদের এ-মাথা থেকে ও-মাথা বার-কয়েক পায়চারি করে, বৃষ্টি নামবার মুখে নীলাক্ষ পরিস্কার বুঝতে পারলো, তারও কোনো সঙ্গী নেই, সাথী নেই।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে নীলাক্ষ বাঁ হাতে চিনচিনে ব্যথা টের পায়। বাঁদিকে ব্যথা ভালো নয়। হার্ট অ্যাটাক নয় তো? দূর! তেতাল্লিশে তেত্রিশের মতন স্বাস্থ্য তার। আরো পনেরো-কুড়ি বছর নিশ্চয়ই হৃদয় নিয়ে তাকে মাথা ঘামাতে হবে না। অবিশ্যি ই সি জি একটা করে দেখালে হয়। শনিবার ছুটি, তখন দেখা যাবে।

শোবার ঘরে ঢুকে দেখলো, সীমা ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে যত্ন করে চুল ব্রাশ করছে। তার টকটকে লাল নাইটিতে নীলাক্ষর চোখ আটকে যায়। শরীরের ঢেউগুলো এখনো সতেজ, টলটলে। বাঁকা খাঁজে কোথাও তেমন পলি পড়েনি। মসৃণ সেই গড়নে চোখ রেখে একটু আগের মৃদু মৃত্যু-ভয়কে দারুণ অবাস্তব মনে হলো নীলাক্ষর। এক হাতে সীমার কোমর জড়িয়ে অন্য হাতে তার চুলের ঢল পিছন থেকে সামনে এনে নীলাক্ষ তার ফর্সা ঘাড়ে চুমু খেলো।

হঠাৎ নীলাক্ষকে ঘরের বাইরে যেতে দেখে সীমা ঘাড় ঘুরিয়ে বললো, কোথায় যাচ্ছো?

—দোকানে।

—গেলে যে তখন, পাওনি?

—ছাদে গিয়েছিলাম। আমি যাবো আর আসবো।

—তোমার জন্যে এতো রাতে দোকান খুলে বসে আছে!

—মোড়ের ডিসপেনসারিতে পাবো।

নীলাক্ষ ফিরলো ঘন্টাখানেক পর। মোড়ের দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ট্যাক্সি করে তাকে পার্ক স্ট্রিট যেতে হয়। ফিরে নীলাক্ষ এক গ্লাস জল চাইলো। বাঁ হাতে মৃদু ব্যথা। জল খেয়ে, সিগারেট খেয়ে সে বিছানায় যায়। সীমা একটা প্যাকেট হাতে নিয়ে উঠে পড়ে।

রাত দুটোয় নীলাক্ষর ঘুম ছোটে। বুকের মাঝখানে কেউ গজাল বিঁধিয়ে উল্টো পাল্টা চাড় দিচ্ছে! কপালে, মাথায়, সারা শরীরে কুল-কুল ঘাম। বিছানায় উঠে বসে বুক চেপে ধরে। তার গলার স্বর বিকৃত। কোনো রকমে চেঁচায়, সীমা! এক্ষুনি ডাক্তারকে ফোন করো। আমি কোলাপ্স করছি।

সীমা ঘুম ভেঙে প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা। পরের মুহূর্তে কেঁদে ওঠে।

তার হাতে রিসিভার কাঁপে। তাদের বাড়ির ডাক্তারের লাইন এনগেজড। নীলাক্ষর অফিসের ডাক্তারের নম্বর দুবার ভুল ডায়াল করে তৃতীয়বারে পেলো, বেজেই চলেছে। আবার বাড়ির ডাক্তার। এনগেজড। অফিসের ডাক্তার বেজেই চলেছে।

ওঘর থেকে নীলাক্ষ প্রাণপণে বললো, হিরুকে ফোন করো!

হিরু মানে হিরণ্যাক্ষ, নীলাক্ষর ছোটো ভাই। বড়ো ডাক্তার। সীমা ভয়ে কেঁপে ওঠে, সে জানে, সে ডাকলে হিরু কিছুতেই আসবে না। ঝগড়া হয়েছিল তার সঙ্গে, সেই থেকে দাদার সঙ্গেও মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

সীমা আর একবার অফিস, বাড়ি চেষ্টা করে বিফল হয়। হিরুর নম্বর কতো? কিছুতেই মনে পড়ছে না। দাদা মারা যাচ্ছে শুনেও ও কি চুপ করে থাকবে? ওকে ফোন করা ছাড়া আর কী সে করতে পারে। এরকম বিপদে সে কখনো পড়েনি।

ড্রয়িং রুমের আলো জ্বালিয়ে ছোটো ডায়রি থেকে নম্বর খুঁজে সীমা যখন হিরুকে ডায়াল করছে, নীলাক্ষ ততোক্ষণে ছোটো পরিবারের সুখে ডুবে গিয়ে শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

অনেক সচেতন। তাঁরা প্রচার প্রোপাগাণ্ডার অপেক্ষা করেন না।' বা বসেও থাকেন নি। অনেক আগে থেকেই তলে তলে কলাকৌশল করে গেছেন তাঁরা। তবে একটা অংশ থেকে গেছেন, যাঁরা এখনো অমনোযোগী।

বড়দিনে ছেলেমেয়ে বউকে নিয়ে চিড়িয়াখানা যাচ্ছিলাম।' বাসে আমার মত আরো অনেকে ছিল। বিশেষ করে একটি পরিবার অন্য যাত্রীদের নজর কেড়েছিলেন। ভদ্রলোকের বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি। আধুনিক পোশাক পরা। শহুরে লেখাপড়া জানা লোক। স্ত্রী-ভদ্রমহিলা ছোটখাট। শারীরিক গড়নে থলথলে এলোমেলো। তাঁর কোলে বছরখানেকের বাচ্চা। বড়জোর বছর-খানেকের আগুপিছু আরো পাঁচটা বাচ্চা তাদের, আশেপাশে বসে আছে। এ দৃশ্য দেখে দু'তিনজন তরুণী মুখে রুমাল চাপা দিয়ে ক্রমাগত হাসছিল। কলেজের ছাত্রছাত্র হবে এরকম কিছু তরুণ নানারকম আকার-ইঙ্গিত এবং মন্তব্যে সরগরম করে তুলেছিল বাস। স্ত্রী-ভদ্রমহিলা লজ্জায় মুখ নিচু করে বসে ছিলেন। স্বামী ভদ্রলোক ভেতরে ভেতরে নিশ্চয়ই খেপে যাচ্ছিলেন খুব, কিন্তু কিছু করার ছিল না। অন্যমনস্কভাবে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম, উনি নিজেকে অপরাধী ভাবছিলেন খুব। অথচ যতখানি অপরাধী ভাবছিলেন ততখানি অপরাধ আদৌ করেন নি তিনি। স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলন থেকেই সন্তান-সন্ততির জন্ম হয় এবং এ-মিলন বিশ্বের প্রতিটি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায় সমান অনুপাতে ঘটে থাকে। সন্তান-সন্ততির সংখ্যা দিয়ে তার হিসেব কষা অসম্ভব। কোনো দম্পতির সন্তান-সন্ততি না হলে এটাও প্রমাণ হয়ে যায় না যে তারা দৈহিক সম্পর্কে লিপ্ত নয়। অনেক ছেলেমেয়ে হওয়া বাবা-মা'রা যে লজ্জা পেয়ে থাকেন তা এই বোধাবোধ থেকেই গড়ে ওঠে, আমার বিশ্বাস।

আমার স্ত্রী ছোটো মেয়ে হওয়ার সময় খুব লজ্জায় পড়েছিল। বড়োর থেকে ছোটোর বয়েসের তারতম্য সাতবছর।'

স্ত্রী বলেছিল : ধ্যাৎ, কি লজ্জা।
আমি বলেছিলাম : কিসের লজ্জা ?

এই সাত বছর বাদে আবার! লোকে কি ভাববে বল তো ?' আমি বুঝেছিলাম ও একথা বলেছিল কেন। বাসের ভদ্রলোক এই একই লজ্জা থেকে নিজেকে ভয়ানক অপরাধী ভেবেছিলেন সেদিন। আসলে তাঁর অপরাধ অন্য কারণে। এই দুর্দিনের বাজারে তিনি পৃথিবীতে ছ'টা জীবন এনেছেন, যে জীবন ছ'টা যথেষ্ট প্রোটিনের অভাবে, বিশুদ্ধ আলোবাতাসের অভাবে হয়ত অকালে বিবর্ণ হয়ে যাবে।

গ্রামাঞ্চলে 'ছোটো পরিবার সুখী পরিবার' তত্ত্ব প্রচণ্ড মার খাচ্ছে। তার প্রধান কারণ শিক্ষার অভাব। তারা বিশ্বাস করে বাচ্চা কাচ্চার' জন্ম মানবিক কারণে ঘটে না, ঘটে দেবতার মর্জি' মত। সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মে সন্তান-সন্ততির জন্মে বাধা সৃষ্টি করলে ভগবান নির্ঘাৎ খেপে যাবেন এবং নরকবাস অবধারিত। তাই তারা পাপের ভাগী হতে চায় না কিছুতেই। ফলে গ্রামে-গঞ্জে পিল পিল করে বেড়ে যায় মানুষ, পরিবারের জনসংখ্যা বিস্তরভাবে ফুলে ওঠে। আর খাবি খেতে হয় পরিবারের কর্তাকে। কেননা তাদের আর্থিক সঙ্গতি ফ্রিজিং পয়েন্টের নিচে থেমে থাকে বরাবর। অসুখ-বিসুখ মৃত্যু অভাব-অনটন অশিক্ষা এই নিয়ে সুন্দরবনীয় মনুষ্যোত্তম জীবের মত দিন গুজরাণ করতে হয় তাদের ? অন্তত এদের ক্ষেত্রে 'ছোটো পরিবার সুখী পরিবার' তত্ত্ব ব্যাপকভাবে খাটে।

বিভিন্ন কাগজপত্রে মাঝে মাঝে দেখা যায়—পৃথিবীর জনসংখ্যা এত দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে যে, এমন একদিন আসবে যখন মানুষ দাঁড়ানোর জায়গা পাবে না। বাসে ট্রামে প্রায়ই মন্তব্য করতে শোনা যায় : শালা, মানুষ যেভাবে জন্মাচ্ছে, সেভাবে মরছে না। এই মন্তব্যের পেছনেও ওই একই কারণ—দাঁড়ানোর জায়গার অভাব। অথচ তাঁরা পড়ে দেখেন না, ওই বাসের গায়েই লেখা থাকে টু সীট ৩২+১—অথচ তাঁরা একশো থেকে দেড়শো জন দিব্যি চড়ে যাচ্ছেন বাসে। আসলে সবই সয়ে যায়। নৌকোয় ঘর-সংসার পেতেও মানুষ তোফা কাটিয়ে দিতে পারে আমৃত্যু।

সুতরাং 'ছোটো পরিবার মানেই সুখী পরিবার' এরকম মনে করাতে বিস্তর অসুবিধে আছে। সুখটা ছোটো বড়োর পর নির্ভর করে না। সুখ মনের ব্যাপার। আর সে মন তৈরি হয় আর্থিক স্বচ্ছলতা ও অনুকূল পরিবেশের ভেতর। যতক্ষণ সেরকম অবস্থা না হচ্ছে, সুখ নেই। তবে ছোটো পরিবারের প্রয়োজনীয়তা অন্য কারণে আছে। সেকথা ভেবেই ট্রামে-বাসে টেনে, দেয়ালে দেয়ালে, ডাইনিং টেবিলে বালিশের ঢাকনায়, শার্টিং স্যুটিং-শাড়ির প্রিন্টে, কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়ার গাছে গাছে লটকে দেয়া ভাল 'সুখী যদি হতে হয়, দু'টির বেশি মোটেই নয়।'

আমার কালের কবিরা

মণীন্দ্র রায়

আগে হাতে পেয়েছিলাম 'পরিচয়', কালের সেই ত্রৈমাসিক কাগজ। একেবারে রকম দেখতে, শুধু সাইজ নয় ধারাতেও। মলাটের ওপর শুধু নাম লেখা, কোনো ছবি-টবি নেই। ফর্মাগুলো জ করে সেলাই করা। ছাঁটাও হয় নি কাগজ। তবে ছাপা বেশ ঝকঝকে আর পার কাগজটাও বোধহয় ছিল বিলাতী ন্টিক।

এরই ক'মাস পর সম্পাদক সুধীনবাবুর জের কবিতার বই পেলাম—অর্কেস্ট্রা। ধীনবাবু নামের আগে শ্রী দিতেন নামটাও লখতেন আধুনিকদের মতো এডিট না রে। অর্থাৎ সুধীন্দ্র দত্ত নয়, শ্রীসুধীন্দ্র-াথ দত্ত।

বছর চল্লিশেক আগের কথা। থাকতাম খন মফস্বল শহরে। পরিচয় এবং কের্স্ট্রা মস্ত একটা ধাক্কা দিয়েছিল, ষ্ট মনে আছে। আমাদের সময়ে ঠিক জকের মতো অবস্থা ছিল না। এখন মন আধুনিক ছাড়া কবিতা নেই, তখন বার বেশির ভাগ কবিতাই ছিল াধুনিক, বড়ো কাগজগুলোতে দেখা তে রবীন্দ্রনাথের সস্তা পচা অনুকরণ। াধুনিক কবিতা ছিল ভয়ানক রকম ইনর্বিটি। তাকে তখন নিজের জোরে যাগ্য করে নিতে হচ্ছিল। তাই ভেতরের া আর বাইরের খোলস দুটোই হতো র অন্য রকম। সুধীনবাবুর নিজের কাগজ র কবিতার মধ্যেও সবার আগে চোখে ড়েছিল এই জিনিসটাই।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই অর্কেস্ট্রার বতা বেশীর ভাগই তখন বুঝতে পারি । কিন্তু পাশ কাটিয়ে যাবারও উপায় ল না। বোঝা-না-বোঝার আলো-াধারি বেশ একটা চ্যালেঞ্জের মতো হয়ে ঠেছিল।

না হবার কারণ নেই। বয়সটা অল্প ল যদিও (কিংবা কে জানে হয়তো রকম বয়স ছিল বলেই) এইসব লাইন

মৃত্যুর পাথেয় দিতে কাণাকড়ি
মিলিবে না যবে
রূপান্ধ যুবার ভ্রান্তি
সেইদিন মহাসত্য হবে।।

লের মতো বুকে বিঁধেছিল। াড়া সুধীনবাবুর যে সব লাইন এখনো ঝ মাঝে মনে পড়ে তার মধ্যে—

একটি কথার দ্বিধা থরোথরো চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী,
একটি নিমেষ দাঁড়ালো সরণি জুড়ে,
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি;

যে কোনো বয়সের যে কোনো মানুষকেই নাড়া দিতে পারে।

তবে ঐ বইয়ের অনেকগুলো কবিতায় অনেক নতুন শব্দ ছিল; অনেক শব্দ ছিল যা প্রয়োগ করা হয়েছিল অন্য অর্থে, অথবা সেগুলোকে নতুন করে তৈরী করা হয়েছিল। যেমন বৈদেহী, অবল, উল্বণ, প্রবর্তনা, অনাদ্যন্ত—ইত্যাদি। ফলে সদ্য রবীন্দ্রনাথ পড়া মানুষের পক্ষে অচেনা মনে হচ্ছিল। পরে জেনেছি, সুধীনবাবুর উদ্দেশ্যও ছিল সেই রকম। আমিও হয়তো বাঁধা পড়েছিলাম এই অচেনার টানেই।

আলাপ হলো আরো বছর দুয়েক বাদে। মাঝে আরো কিছু কবির লেখা পড়েছি। ইস্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকেছি। নিজের একটা লেখাও বেরিয়ে গেছে 'পরিচয়ে'। হাতিবাগানের সেই পুতুলে সাজানো বাড়িতে সুধীনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বুকে যে একটা বুক ধড়ফড় করছিল তা নয়। কিন্তু সুধীনবাবু যখন সিগারেট অফার করে নিজে দেশলাই জেলে ধরিয়ে দিলেন বেশ একটু লজ্জা-লজ্জাই করছিল। চেয়ে দেখলাম সিগারেটটা একটু অন্য রকম চ্যাপ্টা ধরনের। স্বাদও একেবারে ... পরে তার নামও জেনে গিয়েছিলাম—মুরাদ, টার্কিশ ব্লেন্ড সিগারেট।

সেকালে হলেও কলেজে ছাড়পত্র পেয়ে থাকিনি। ... তখন। সিগারেট খুব একটা অচ্ছুৎ ছিল না। কিন্তু তাই বলে একজন বিখ্যাত কবির

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সামনা-সামনি বসে? বয়সে যিনি আমার চেয়ে আঠারো বছরের বড়। সুধীনবাবু সেদিকে লক্ষ্য না দিয়ে লেখা-টেখার কথা শুরু করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে বয়সের বাধাটা বেমালুম ভুলেই গেলাম।

আসলে এটাই ছিল আধুনিকদের ধরন। পরে বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র সকলের মনোভাবই দেখেছি একই জাতের। বয়সের কথা ধর্তব্যে না এনে ছোটদের সঙ্গেও এঁরা সমানে সমানে মিশতেন।

তবু ওরই মধ্যে সুধীনবাবু ছিলেন আরও একটু অন্য ধাঁচের মানুষ। সাজ-সজ্জায় ও অনর্গল ইংরেজিতে কথাবার্তা বলায় এবং জীবনযাত্রাতেও আগাগোড়া তিনি ছিলেন ইউরোপীয়। কিন্তু গলার স্বর, কথার সুর আর সবিনয় ভদ্রতায় টের পাওয়া যেত পুরোপুরি সেই জমিদারী স্টাইলের ট্র্যাডিশান।

তাঁর চেহারাও ছিল চোখে পড়ার মত। শরীরে মেদবাহুল্য ছিল না, গায়ের রঙও ছিল অসম্ভব ফর্সা। চোখের ঈষৎ তীর্যক দৃষ্টিতে থাকত অন্তর্ভেদী, কিন্তু সস্নেহ দৃষ্টি। আর ঠোঁটের কোণে লেগে থাকত এমন একটা সূক্ষ্ম বঙ্কিমতা যাকে আর কোন লাগসই কথা মনে না পড়ায় বলা যেতে পারে সফিসটিকেশান।

তখন সুধীনবাবুর বয়স ছিল চল্লিশ বছরের এদিকেই। তারপরও প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। দেখা-সাক্ষাৎও হয়েছে প্রায় শেষ পর্যন্তই। প্রথমে হাতিবাগানের বাড়ীতে, তারপর হাজরা রোডের বাড়ীতে, সবশেষে রাসেল স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে। দিনে-দিনে তিনি বড় হয়েছেন, গভীর হয়েছেন, বদলে গেছেন। কিন্তু তাঁর বিষয়ে মূল ধারণাটা আমার প্রায় একই থেকে গেছে।

তাঁর মত সম্ভ্রান্ত মনের মানুষ কমই দেখেছি। তর্কের সময়ে অন্যের মতামতে অসহিষ্ণু প্রতিবাদ জানানো ছিল তাঁর চরিত্রগত স্বভাব কিন্তু, কখনোই তিনি কাউকে দূরে সরিয়ে দিতেন না। বরং কাছেই টানতেন।

অল্প বয়সী অনভিজ্ঞতায় আমি একবার তাঁকে কঠিনভাবে সমালোচনা করে প্রবন্ধ লিখেছিলাম 'পরিচয়ে'। তখন অবিশ্যি তিনি 'পরিচয়ে'র সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন। কিন্তু পড়েছিলেন তিনি লেখাটা। পরে ক্ষুব্ধও হয়েছিলেন। গিরিজাপতি ভট্টাচার্যের বাড়ীতে 'পরি-

চয়ে'র এক সাপ্তাহিক সান্ধ্য বৈঠকের পর ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ই জানিয়েছিলেন সেকথা। ধূর্জটিবাবু আমাকে তাঁর ছেলের বাড়ীতে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন সেদিন সুধীনবাবুর সম্পর্কে। তিনি লুকাচের সাহিত্য-তত্ত্বের কথাও উল্লেখ করেছিলেন। সেই রাত্রির দীর্ঘ-স্থায়ী আলাচনায় তাঁর মনীষার চমৎকারিত্বে বিস্মিত হয়েছি বার বার। কিন্তু নিজের মত থেকে সরি নি। ফলে সুধীনবাবুর সঙ্গে দেখা-শোনা করতে সংকোচ এসে গেল।
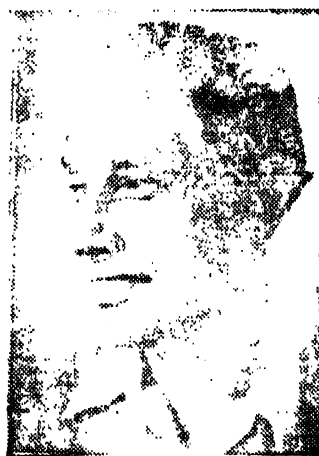
অনেক দিন পরের কথা। অন্য এক উপলক্ষে যেতে হল আবার সুধীনবাবুর কাছে। তখন তিনি রাসেল স্ট্রীটের বাড়ীতে। ঠিক আগের মতই সেই সস্নেহ হাসি তাঁর মুখে, আগের মতই কফি-খাওয়া, গল্প করা। একটি কথাও বললেন না তিনি প্রবন্ধের বিষয়ে। তাঁর ভদ্রতার কাছে পরাজিত হলাম।

সুধীনবাবুর অনেক দিনের বন্ধু এবং পরিচয় যখন মাসিকপত্রে রূপান্তরিত হল তখনকার সহযোগী সম্পাদক হিরণকুমার সান্যাল অর্থাৎ আমাদের হাবলদা সুধীনবাবুর বিষয়ে গল্প করতেন কখনো-সখনো। এইভাবেই কথা প্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন যে সুধীনবাবু নাকি কবিতা লেখার প্রথম দিকে স্বাভাবিকভাবে যেমন আসে তেমনিভাবে লিখে পরে কবিতার শব্দগুলো বদলে বদলে অন্য রকম চেহারা করে দিতেন।

কথাটা বিশ্বাস করা শক্ত। তাছাড়া হাবলদাকে যাঁরা জানেন তাঁদের অজানা থাকার কথা নয়, কৌতুকরস তাঁর মজ্জাগত। এমন খুবেই হতে পারে যে, মজা করে বলেছিলেন কথাটা। কিন্তু না হতেও তো পারে? এ সন্দেহের কারণ অনেকগুলি।

এক কলকাতার বাইরে থাকতে আমার ইস্কুল জীবনে সুধীনবাবুর যে দুটি চিঠি আমি পেয়েছিলাম তার ভাষা ও বাক্য গঠন ছিল খুবেই সাধারণ ও স্বাভাবিক। পরবর্তী কালে সুধীন দত্তীয় স্টাইলের সঙ্গে তার অনেক তফাৎ। দুই, সুধীনবাবুর প্রথম বই তন্বী তো বটেই পরের বই অর্কেস্ট্রাতেও রবীন্দ্রিক প্রভাব কেবল ভাবে নয়, ছন্দে আর শব্দ চয়নেও সহজে চোখে পড়ার মত। তবে কবির নিজের ধাঁচটাও গড়ে উঠতে শুরু করেছে বোঝা যায়। তাছাড়া এই সঙ্গে আরও একটা কথা মনে করা যেতে পারে। সুধীনবাবু ছিলেন মালার্মে-শিষ্য। একজন স্থপতি যেমন করে ইঁটের পর ইঁট সাজিয়ে তাঁর ইমারত গেঁথে তোলেন, শব্দকেও প্রয়োগ করতে চাইতেন তিনি সেইভাবেই। কাজেই আগে কবিতা লিখে তারপর শব্দগুলোকে বদলে দিলে দোষ কি?

অবিশ্যি অন্য কবিরাও যে খসড়াতে কিছুটা কাটাকুটি না করেন তা নয়। তবে গোটা কবিতাটি লিখে ফেলার পর শুধু চেহারা বদলানোর জন্যে কেউ শব্দ পাল্টান কিনা জানি না।

কিন্তু সুধীনবাবু যে খুবই তাড়াতাড়ি তার নিজের পথ পেয়ে গিয়েছিলেন তা সকলেই জানেন। তিনি একজন বড় কবি, বাংলা সাহিত্যের এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।

পরবর্তীদের ওপর তাঁর প্রভাবও কম নয়। তাঁর শেষ দিকের বন্ধু বুদ্ধদেব বসুর গদ্য রচনায়, এবং কবিতাতেও রচনা-রীতির যে ক্লাসিক বিন্যাস চোখে পড়ে, তাঁর সঙ্গে সুধীনবাবুর মিল খুব অস্পষ্ট নয়। তাছাড়া অনেক শব্দ ও শব্দগোষ্ঠী যা এখন শিক্ষিত বাঙালীরা হামেশাই ব্যবহার করেন, সেগুলো সুধীনবাবুরই টাকশালে তৈরী। যেমন— অনস্বীকার্য, আত্মজৈবনিক নিম, অনীহা, কলাকৈবল্য ইত্যাদি। তাঁর 'উট পাখি' কবিতাটির অনেকগুলি লাইন তো এখন সকল বাঙালীর সম্পদ হয়ে গেছে। যেমন—

ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে?
মনস্তাপেও লাগবে না ওতে জোড়া।
অখিল ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকে খাবে?
কেবল শূন্যে চলবে না আগাগোড়া।

কিম্বা এই সব পংক্তির কথা ভাবুন—

তাই অসহ্য লাগে ও আত্মরতি
অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?
আমাকে এড়িয়ে বাড়াও নিজেরই ক্ষতি।
ভ্রান্তিবিলাস সাজে না দুর্বিপাকে।

কলেজের প্রথম ধাপ মফঃস্বলে পার হয়ে ভর্তি হলাম এসে কলকাতার কলেজে। ততদিনে 'কবিতা' পত্রিকা বেরিয়ে গেছে, আমি তা দেখেওছি। কলকাতায় এসে যে কলেজে ভর্তি হলাম তার অধ্যাপক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু এবং বিষ্ণু দে-ও। দুজনই ছিলেন আমার নিজের সাবজেক্টের শিক্ষক। ফলে আলাপ হতে দেরি হল না।

বুদ্ধদেববাবু ছিলেন খাটখাটে চেহারার লাজুক প্রকৃতির মানুষ। অন্তত কলেজে তখন তাঁকে লাজুকই মনে হয়েছিল। পণ্ডিত মানুষ ছিলেন, অনার্স ক্লাসে পড়াতেনও তিনি ভালই। কিন্তু ওসব দিকে খেয়াল ছিল না তখন, তাঁর মাস্টারির ফলে উপকৃত হতে পেরেছি তা বলা যাবে না। অবিশ্যি সেটা হয়ত আমারই অক্ষমতা।

তবে কবি হিসেবে এবং একজন যোগ্য সম্পাদক হিসেবে আমার কাছে তাঁর আকর্ষণ ছিল প্রবল। বিশেষ করে ঐ বয়সটাতে।

বিষ্ণু দে-ও ঠিক লাজুক না হলেও শান্ত প্রকৃতির কমকথার মানুষ ছিলেন। গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ, একহারা লম্বা চেহারার মানুষ, মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো, চোখের দৃষ্টি গভীর এবং মায়াময়। কথা বলতেন স্পষ্ট উচ্চারণ, মৃদু গলায়। পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল তাঁর এমন কি অধ্যাপক মহলেও। কিন্তু সবিনয় স্বীকার করছি, তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁর কথাগুলো শুনতে যত ভাল লাগত, তার সিকি ভাগও মাথার মধ্যে নিতে ইচ্ছে হত না। বলাই বাহুল্য, এ অক্ষমতা আমারই।

কবি-অধ্যাপক দুজনের মধ্যে ভাল করে আলাপ হয়েছিল কিন্তু প্রথমে বিষ্ণুদের সঙ্গেই। 'পরিচয়ে' ইনি গ্রন্থই লিখতেন। কবিতা এবং বইয়ের সমালোচনা। এঁর লেখাতেও ছিল দুর্বোধ্যতার ছাপ। অনেকটা সুধীনবাবুর মতই। কিন্তু অনেক বেশী সুরেলা এবং দ্রুত চালে লেখা। দুজনেই শব্দকে প্রয়োগ করতেন ভেবে চিন্তে। কিন্তু সুধীনবাবুর হাতে বাজত তারা দুন্দুভি কিংবা চার্চ অরগানের মত গম্ভীর সুরে। বিষ্ণু দের শব্দ আর ছন্দ ছিল তবলা লহরা কিম্বা পিয়ানোর মত। যেমন সুধীন্দ্রনাথ বলেন এইভাবে—

আত্মরক্ষা হাস্যকর,
সুসংকল্প যৌথিক বড়াই
জীবনের সার কথা
পিশাচের উপজীব্য হওয়া,
নির্বিকারে নির্বিচারে সওয়া
শবের সংসর্গ আর শিবার সম্ভাব।
মানসীর দিব্য আবির্ভাব
সে শুধু সম্ভব স্বপ্নে,
জাগরণে আমরা একাকী,

কিন্তু বিষ্ণু দের কথার ধরণ অন্য রকম—

কৈশোরে ছিলো ধর্মঘটের শখ,
যৌবনে নয় মাস্টার কেরাণীও,
বাস্তুঘুঘুরই অম্লধ্বংস সার।
মুরুব্বি সেই গ্যাম্য সে উমেদার।

তার পরে যদি ক্যান্তিই বাঁধে বাসা
রেডিও সচল ধোঁয়ায় আকাশ ঢাকা

....

তবু বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর
কোরো না অন্ধ বন্ধ ডানায় পাখা।

কিন্তু 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটি পড়েছিলাম মফস্বলে থাকতেই। তার সে প্রচণ্ড প্রভাব কিছুতেই আমাকে দূরে থাকতে দেয় নি। কবিতাটির প্রথম লাই থেকেই ভাষার জাদু আর আবেগের টা লক্ষ্য করার মত—

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার
হৃদয়ে আমার চড়া।
চোরাবালি আমি দূর দিগন্তে ডাকি।
কোথায় ঘোড়সওয়ার।

এইখানে একটা অন্য কথা বলে নিই। সমর সেন একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করে 'জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার' ব্যাপারটা মানে কি। সরল বিশ্বাসে আমি যা বুঝে জানালাম তাঁকে।— জনতার ভিড় জোয়ারে জলোচ্ছ্বাসের মতো উপচে পড়েছে। সমরবাবু জানালেন, তিনিও এত কাল সে রকমই ভেবেছিলেন। কিন্তু সেটা ভু বিষ্ণুবাবু কবিতাটির একটি ইংরেজী অনু বাদ করেছেন, সেটা ছাপাও হয়েছে। দেখে সমরবাবুর খটকা লাগায় তিনি নিজে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কবিকে। তি বলেছেন, ঠিক অনুবাদই ছাপা হয়েছে 'জোয়ার নেমেছে' মানে জোয়ার দে

অর্থাৎ ভাটা এসেছে। আর সেই ঠিক পরেই রাখা হয়েছে, হৃদয়ে ড়া—যেটা জোয়ার চলে যাওয়ারই ঘটেছে।

থাটা তুচ্ছ, কিন্তু বলে নিলাম, লে ধারণা কাটানোর জন্যে। অনেক ক্ষ্য করেছি, নানা কাগজে 'জন-নেমেছে জোয়ার' কথাটা অন্য অর্থে করা হয়েছে, যেটা কবির অভিপ্রেত । তবে তাতে খুব একটা দোষ তাও বলা যায় না। কবিতার কবির মতটাই তো চূড়ান্ত নয়।

দেবদেববাবু কবিতা পত্রিকার ছিলেন। স্বনামধন্য কাগজ। বাংলা ক কবিতার ইতিহাসে এই কাগজটির দিন লেখা থাকবে। চার দিকের বরূপতাকে গণ্ডীর মধ্যেই আনেন ধদেব বসু, অসীম আগ্রহে তিনি টেনে নিয়েছিলেন সব ধরনের সমস্ত ক কবিকেই। এর মধ্যে প্রেমেন্দ্র আর সদ্য নামকরা তরুণ কবি সমর তা 'কবিতা'র সংযুক্ত সম্পাদকই । তা ছাড়াও নিয়মিত পাওয়া যেত দে, জীবনানন্দ দাশ, অজিত দত্ত, ীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং আরও র কবিতা। রবীন্দ্রনাথের কবিতাও 'কবিতা'য়। তবে আধুনিক র বিষয়ে তখন অন্তত তাঁর ধারণা ৎসাহ পাওয়ার মত ছিল না। আর ও পদক্ষেপে তাঁকে এড়িয়ে । বলা যায়, তাঁদের গোটা অধ্যা-ই ছিল তখন রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বেরিয়ে আসার দিকে।

কলকাতার কলেজে পড়ার সময়ে ক বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে লেখক র আমার যা যোগাযোগ তা সারা হত র কাঁডের বা অধ্যাপকদের বসবার গয়েই। তিনি মুখচোরা মানুষ বলে কথাবার্তা আন্তরিক হলেও ত সংক্ষেপের মধ্যে। সে তুলনায় বাবু ছিলেন অনেক সহজ ধরনের। বলতেন মুখের দিকে তাকিয়ে, ভাব-ও খুব একটা তাড়াহুড়োর ভাব না। একদিন নিজে থেকেই ডাকলেন বাড়িতে যেতে।

বিষ্ণুবাবু তখন থাকতেন গোলাম রোডের পুরোন বাড়িতে। ঘরোয়া শে গিয়ে বিষ্ণুবাবুকে প্রায় একই দেখলাম। সেই রকমই ছিমছাম, নিলপ্ত। কথাও বলেন ঈষৎ হাসির পন্ট কিন্তু অনুচ্চ স্বরে। তবে মাঝে তাঁরা রসিকতার মশলা দিয়ে শটাকে বেশ হাল্কা করে নিতে । রসিকতার মধ্যে কখনো-সখনো হলেও অগোচর থাকে না। তুলনায় বাবু কথাবার্তা বলতেন বেশ ভাবে। (আর সুধীনবাবু তো রীতিমত সীরিয়াস মানুষ। তাঁর ছিল সে রকমই।)

একবার ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বা, আর সুধীনবাবুর কবিতার করে লিখেছিলেন, সুধীনবাবু আর বিষ্ণুবাবু দুজনেরই উদ্দেশ্য—জীবনযাত্রার ছাঁচকে ভেঙে ফেলা এবং তার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া। তফাৎ এই যে, সুধীন-বাবুর হাতে গদা আর বিষ্ণুবাবুর হাতে কাঁচি।

চোরাবালি বইটি আগেই পড়া ছিল। তার অনেক কবিতার চটুল টিপ্পনি ও রসিকতা এবং বিদ্রূপ ভাল লেগেছিল। কিন্তু এ ধরনের কবিতার চেয়ে অনেক বেশী ভাল লেগেছিল ঘোড়সওয়ার এবং বিশেষ করে ক্রেসিডা আর ওফেলিয়া। আরও অনেক ভাল কবিতা আছে বইয়ে, যেমন 'মহাশ্বেতা'। কিন্তু ক্রেসিডা সত্যিই অতুলনীয়। বেদনায় ক্ষোভে, আত্মাভিমানে, বিষাদে এবং ছন্দের দোলায় আর চিত্রকল্প রচনার অনর্গল ঐশ্বর্যে এ কবিতা পড়ার পর মনের মধ্যে সঞ্চারিত হয় এক্টা গোটা মহাকাব্য পড়ার অভিজ্ঞতা।

মনে পড়ে যামিনী রায় একবার কথা বলতে বলতে বলেছিলেন, বিষ্ণুবাবুর সঙ্গে তাঁর অনেক দিনের যোগাযোগ কিন্তু বিষ্ণু-বাবুর কবিতা যে তিনি বোঝেন তা নয়। শুধু এইটে তাঁকে বেশী করে টানে যে, এই সব কবিতার ধ্বনি একেবারে অন্য রকম, রবীন্দ্রনাথের থেকে অন্য রকম। ঠিক এই ধ্বনি কথাটিই ব্যবহার করেছিলেন যামিনীবাবু, কী অর্থে জানিনে। কেননা বিখ্যাত প্রাচীন আলংকারিক অভিনব গুপ্ত তো 'ধ্বনি' শব্দটাকে ব্যবহার করেছেন 'ব্যঞ্জনা' অর্থে। যাই হোক, ঠিকই বলে-ছিলেন শিল্পী। বিষ্ণু দের রচনার মত রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত কবিতা, এক জীবনা-

নন্দ দাশ ছাড়া সেকালে অন্তত আর কেউ লিখেছেন কিনা বলা শক্ত।
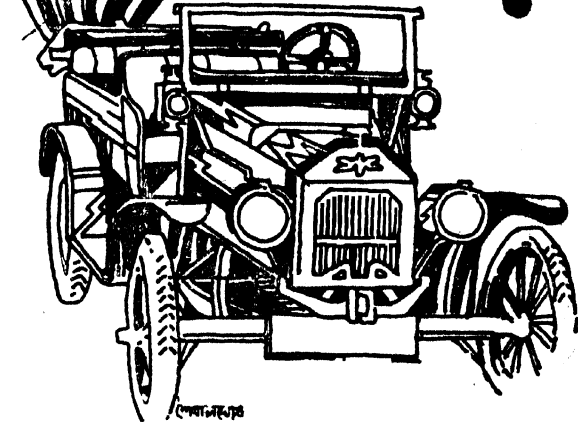
আগে বিষ্ণু দে সিগারেট তো খেতেনই পানও খেতেন। তাঁর এম-এ ক্লাসের বন্ধু এবং আমার আত্মীয় কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কাছে শুনেছি ক্লাসেও তিনি পান নিয়ে আসতেন পকেটে করে। কিন্তু আমি যখন দেখেছি তিনি পান ছেড়ে মশলা শুরু করেছেন। বসবার ঘরেই ডিবে ভর্তি মশলা থাকত। আর যিনি আসতেন তিনিই ভাগ পেতেন সে মশলার।

বিষ্ণু দে'র সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল খুবই গভীর। ছিল কেন, আজও আছে। তাঁর সঙ্গেই যামিনী রায়ের বাড়িতে যাই প্রথম। সেই বাগবাজারের গলির বাড়িটা। যার পাশে ছিল তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। সামনেই অমৃতবাজার পত্রিকার আপিস ও প্রেস। কে জানতো তখন, সেই আপিসেই কাজে যোগ দেব আমি, প্রতিদিন আসব।

বিষ্ণু দে'র বাড়িতে সত্যেন বসুকেও দেখি। সেখান থেকেই চেনা হয়, সেজন্যে পরে তাঁর ঈশ্বর মিল লেনের বাড়িতে যাতায়াত করা সহজ হয়ে উঠেছিল।

এ ছাড়া অনেক শিল্পী যাঁরা তখন তরুণ ছিলেন এবং নিজেরা একদল হয়ে যাঁরা ক্যালকাটা গ্রুপ তৈরি করেন, তাঁদের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল বিষ্ণু দের বাড়িতেই। যেমন নীরদ মজুমদার, গোপাল ঘোষ, প্রাণকৃষ্ণ পাল, পরিতোষ সেন এবং খ্যাতনামা ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্ত। পরে এঁদের সঙ্গে সম্পর্ক আরো পাকা হয়েছে, আমার আত্মীয় এবং শিল্পী রথীন মৈত্রের মারফৎ।

কিন্তু শুধু শিল্পীরা নন, বিষ্ণু দে'র ছিল ব্যাপক ও বহুমুখী আগ্রহ। কবিতা ও চিত্রকলা তো ছিলই, ইউরোপীয় সঙ্গীত, স্থাপত্য, নাটক, সিনেমা, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি নানাদিকেই তীব্র কৌতূহল ছিল তাঁর। এজন্যে তাঁর গোলাম মহম্মদ রোডের দ্বিতীয় আস্তানা, যেখানে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে বাস করছেন তিনি সেটা হয়েছিল ছোটখাটো একটা সংস্কৃতি কেন্দ্র। অনেকটা সতেরো আঠারো শতকের কোনো বিলাতী ইন-এর মতো।

বলা বাহুল্য, এই পরিবেশ থেকে আমি তো বটেই অন্য সকলেও উপকৃত হতেন। এমন কি স্বয়ং বিষ্ণু দে-ও। তাঁর পূর্বলেখা বইটির পরবর্তী অনেক কবিতায়, বিশেষ করে 'সন্দীপের চর', 'অন্বিষ্ট', স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যতে' তার ছাপ সুস্পষ্ট। এইসব কবিতার ভেতর দিয়েই বিষ্ণু দে, রবীন্দ্রোত্তর যুগের একজন উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট কবির স্তর থেকে উত্তীর্ণ হন একজন শ্রেষ্ঠ কবির পর্যায়ে।

বিষ্ণু দের আরম্ভও অন্যান্য আধুনিক কবিদের মতো রবীন্দ্র বিরোধিতা দিয়ে। না, কথাটায় কিছুটা বাড়াবাড়ি থেকে গেল। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ব্যাপারটা অন্যরকম: রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুধীনবাবুর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে তার কুড়ি বছর বয়স হবার আগেই ঐ বয়সেই কবির সঙ্গে তিনি একবার বিদেশেও পাড়ি দিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম দিকের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাবই ছিল মূল সুর। কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি তাঁর কবিতার আঙ্গিক আর বক্তব্যে একেবারে আলাদা হয়ে যান। এত দূরে চলে যান তিনি রাবীন্দ্রিক জগৎ থেকে যে তিনি হয়ে ওঠেন প্রায় বিপরীত মেরুর মানুষ। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল পুরোপুরিভাবে হাঁ-ধর্মী, অর্থাৎ বিশ্ব বিধানে আস্থা, জীবনের প্রতি আসক্তি এবং মানুষের ভবিষ্যতের বিষয়ে প্রগাঢ় একটি নির্ভরতা। কিন্তু সুধীনবাবু হয়ে ওঠেন নাস্তিবাদী। জীবন সম্বন্ধে হন বীতস্পৃহ আর বিরক্ত এবং মানুষের ভবিষ্যতের বিষয়ে একান্তভাবে হতাশ। বেঁচে থাকার অর্থ তাঁর কাছে হয়ে দাঁড়ায় 'আবর্তন পুনরাবর্তন', যা অর্থহীন। সভ্যতাও কোনো ধারাবাহিক ব্যাপার নয়, আকস্মিকভাবে আসে আর মিলিয়ে যায় নিখিল নাস্তিতে। সমাজের মধ্যে ব্যক্তি-মানুষেরা বাস করে বিচ্ছিন্ন কতকগুলো দ্বীপের মতো।

কিন্তু, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ এবং অবিশ্বাস দিয়ে শুরু করলেও বিষ্ণু দে চেষ্টা [illegible] থাকেন একটা হাঁ-ধর্মী বিশ্বাসে [illegible] হতে। এবং এই পদ্ধতিতে তাঁর চোখ [illegible] ব্যক্তি মানুষের বাইরে সমাজের [illegible] ইতিহাসের দিকে, নিজের দেশের [illegible] দিকে। আর সে চেষ্টায় সফলও হন [illegible] —তাঁর 'জল দাও' কবিতাটিতে তার [illegible] পাওয়া যায়। আরো অজস্র কবিতায় [illegible] সচেতনভাবে মানবকল্যাণে বিশ্বাসী। ক্রমেই তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি [illegible] আসেন। অর্থাৎ সুধীনবাবুর ঠিক [illegible] ব্যাপার ঘটে তাঁর বেলায়। সু[illegible] গেলেন 'হাঁ' থেকে 'না'-এর দিকে। বিষ্ণুবাবু এলেন 'না' থেকে 'হাঁ'-এর [illegible]

জীবনানন্দ দাশ

এই প্রসঙ্গে আরেকজন প্রধান [illegible] কথাও বলে নেওয়া ভালো। তিনি জী[illegible] দাশ। তাঁর কবিতা প্রথম [illegible] অ-রাবিন্দ্রীক। কোনো সোরগোল না [illegible] স্বভাবসিদ্ধভাবেই তিনি ছিলেন অ[illegible] তাঁর কবিতায় বাংলার পল্লী-প্রকৃতি[illegible] পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে রবীন্দ্রনাথে[illegible] নেই। রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত কোনো [illegible] ফুল, বা অন্য কোনো অনুষঙ্গই পাও[illegible] না তাঁর কবিতায়। চিল, প্যাঁচা, নক্ত[illegible] প্যাঁচা কুমড়ো, ইঁদুর, ফড়িং, শরবন, [illegible] ফুল, খঞ্জনা, গাঙুর, হেমন্তের ধানকাট[illegible] এইসব অ-কাব্যিক শব্দ ও চিত্র বারবার [illegible] এসেছে তাঁর কবিতায়। তাঁর 'বোধ' ন[illegible] তাঁর বিচ্ছিন্নতাবোধ—'নিজের মুদ্রা[illegible] আলাদা হয়ে যাবার কথা, অপরিসীম [illegible] অবসাদ ও শূন্যতার কথা পাওয়া যায়। [illegible] বছর আগের একদিন' কবিতার নায়[illegible] জীবনের অস্তিত্বের বিষয়ে অসম্ভব [illegible] একটা অসহায়তা, ব্যাখ্যার অতীত, [illegible] বিষয়ের' শিকার হয়ে আত্মহননের দিকে [illegible] বাধ্য হল সেটা রবীন্দ্রলালিত মানসি[illegible] বাইরের ব্যাপার।

যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের —মানুষে[illegible]
সঙ্গে তার হয় নাকো দেখা
এই জেনে।

- - - - - - - - - - - - - -

জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়— প্রেম—শিশু —গৃ[illegible]
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয়—[illegible]
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে;

এরপর জীবনানন্দ যখন কল[illegible] এলেন তখন নিজের এই ব্যক্তিগত [illegible] লব্ধির প্রতিফলনই দেখতে পেলেন [illegible] বাইরের সমাজে, 'রাত্রি'র মতো কবিতা [illegible] সাক্ষী। নাগরিক জীবন ও বর্তমান স[illegible] বিষণ্ণতা ও অমানুষিকতার এক [illegible] কারারূপ এই কবিতা। সেই সঙ্গে [illegible] নিজের চিন্তা-ভাবনার উত্তরণেও এক [illegible] দলিল। কেননা ক্রোধ এবং ধিক্কার [illegible] তীব্র হোক, এ কবিতা থেকে এটা বো[illegible] যে কবি আর সেই 'বোধ' কবিতার [illegible]

অমিয় চক্রবর্তী

নেই। নিজের তথাকথিত 'মুদ্রাদোষে' অন্যের থেকে আলাদা হয়ে নেই, সমাজের দিকে চোখ ফেরাচ্ছেন কবি। ফলে তাঁর কাব্যজীবনের শেষের দিক যখন তিনি লেখেন,

আমি সেই মহাতরু-লাবণ্যসাগর থেকে নিজে
জাগিয়েছ তুমি অনাদির সূর্য-নীলিমায়,
পৃথিবীর ভয়াবহ কোলাহল ভেদ করে
অবিনাশ স্বর
আমাদের আলোকের অন্ধকার বিহ্বলতায়
অন্তহীন হরিতের মর্মরিত লাবণ্যসাগর।

তখন এমন গভীর ও মহান আস্তিক্য-বোধের জগতে পৌঁছান—যার থেকে রবীন্দ্র-নাথের জগৎ খুব দূরে নয়।

জীবনানন্দবাবুর সঙ্গে আমার ব্যক্তি-গত পরিচয় ঘটেছিল অনেক পরে। তিনি বরিশাল ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছেন তখন। কিন্তু সে কথা বলার আগে বিষ্ণু-বাবুর বাড়ির সেই আড্ডার গল্প বলে নিই দু-একটা।

বিষ্ণু দে কম কথা বললেও ঘরোয়া আড্ডায় অনেক সময় বেশ মজার মজার গল্প শোনাতেন। 'পরিচয়' কাগজটির একটা বৈঠক বসত প্রত্যেক সপ্তাহে। সুধীনবাবুই বেশীর ভাগ সময় আমন্ত্রণ কর্তা হতেন। সেই আড্ডারই প্রথম যুগের গল্প বলতেন বিষ্ণুবাবু। একবার নাকি সত্যেন বসু তাঁর পাশে বসে থাকতে থাকতে অন্যমনস্কভাবে তাঁর মাথার চুলের ভিতর আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। সেদিন আড্ডা থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফেরার সময় ধূর্জটিবাবু তাঁর সঙ্গী হন। বাসস্টপে দাঁড়িয়ে তিনি বিষ্ণু-বাবুকে বলেছিলেন, বিষ্ণুবাবু যদি মনে করে থাকেন যে জন্ম থেকেই ধূর্জটিবাবুর মাথায় টাক ছিল তাহলে ভুল করেছেন। কেননা তাঁর মাথাতেও বিষ্ণুবাবুর মতোই বড়ো বড়ো চুল ছিল, আর সত্যেনবাবুও ঠিক আজকের মতোই তাঁর সে চুলে আঙুল চালিয়ে খেলা করতেন। তারপর, বসন্তরঞ্জন মল্লিকের গল্প। মল্লিকদা খুব জ্ঞানী আর তার্কিক মানুষ ছিলেন। একবার নাকি তিনি দেওঘরে গিয়ে ত্রিকূট পাহাড়ের দিকে বেড়াতে যান এবং ফিরতে দেরী করতে থাকেন। ত্রিকূটে তখন জঙ্গল ছিল, বাঘটাঘও ছিল। বাড়ির লোকরা নাকি ভয় পেয়ে লন্ঠন লাঠি লোকজন নিয়ে সেদিকে খোঁজ করতে গিয়ে মল্লিক-দাকে আবিষ্কার করেন—একটা মরা বাঘের সামনে উবু হয়ে বসে তর্জনী আন্দোলিত করে বাঘের পক্ষে মানুষ খাওয়া ন্যায় কি অন্যায় বুঝিয়ে বলছিলেন। লোকজন দেখে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে জানান যে ঘন্টা পাঁচ-ছয় আগে বাঘটা তাঁর পথ আটকে দাঁড়ালে, তিনি আলোচনা শুরু করেন, তারপর বাঘটা প্রথমে দাঁড়িয়ে থেকে, পরে বসে এবং শেষে শুয়ে শুয়ে শুনতে শুনতে কখন যেন মারা গেছে।

মজাদার হলেও এসব গল্প গল্পই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে বিষ্ণু দে যা বলেছিলেন তা একটু অন্যরকমই। তখন তিনি সবে পাশ করে বেরিয়েছেন। রবীন্দ্র-

বুদ্ধদেব বসু

নাথ কলকাতায় এলে তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন একদিন। সেদিন আর কেউ ছিলেন না সেখানে। অনেকক্ষণ কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। কথাবার্তার ফাঁকে বিষ্ণুবাবু নাকি রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কবিতা পড়ার সময় কবি এমন অস্বাভাবিকভাবে সুরেলা নাটকীয়তার সঙ্গে আবৃত্তি করেন কেন? উত্তরে নাকি রবীন্দ্রনাথ জানিয়ে-ছিলেন নিজে তো তিনি স্বাভাবিকভাবে পড়তেই ভালোবাসেন, কিন্তু ওরা যে ঐরকম চায়।

এসব কথার সত্যি মিথ্যে যাচাই করা শক্ত। কিন্তু এই ধরনের হালকা কথা মাঝে মাঝে বলতেন বলেই অতো বড়ো পণ্ডিত কবির সঙ্গও নীরস বা ভারিক্কী হয়ে উঠত না। তাঁর স্বভাবের মধ্যে দূরত্ব একটা সবসময়েই থাকত, সেটা হয়তো তাঁর বৈদগ্ধ্য এবং আত্মচেতনার জন্যে। কিন্তু মূলত তিনি ছিলেন মধ্য কলকাতার নাগরিক ভদ্রলোক। যে জন্যে বাঙালী ট্র্যাডিশনের বৈঠকী মেজাজটা তাঁর ভালোভাবেই ছিল।

বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা হয় প্রায় একই সময়ে। তাঁর সেই ২০২ নম্বর রাসবিহারী এভিনিউ-এর 'কবিতা ভবন' তখন জমজমাট হয়ে উঠতে শুরু করেছে। সেই সময়েই কবিতা হাতে নিয়ে একদিন হাজির হয়েছিলাম তাঁর দোতলার ফ্ল্যাটে।

বুদ্ধদেববাবু সিগারেট খেতেন ঘনঘন। আর চা। বাড়ির কাজের লোকটি টি-পটে চা ভিজিয়ে ট্রে এনে রাখত গোল টেবিলের ওপর। তিনি কাপে ঢেলে দুধ চিনি মিশিয়ে নিতেন। অতিথিদেরও দিতেন। বেশ একটা অন্তরঙ্গ পরিবেশ তৈরি হয়ে যেত। কথা বলতে বলতে একটু আড়ভাবে হেলান দিয়ে বসে পা ছড়িয়ে দিতেন সামনের দিকে, পা দোলাতেন। কখনো কারো নিন্দে শুনিনি তাঁর মুখে, মন্তব্য যেটুকু যা করতেন তা সাহিত্যিক ব্যাপারে এবং বেশ ইম্‌পার্সোনাল-ভাবে।

বাংলা কবিতার একজন অত্যন্ত মরমী যোদ্ধা ছিলেন বুদ্ধদেববাবু। রাজনীতি তিনি পছন্দ করতেন না। বিশেষ করে বাম-পন্থী রাজনীতি তো বটেই। তবু বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর সমর্থন, সহমর্মিতা পেয়েছেন। একেবারে শেষের দিকে হয়তো তিনি দূরে সরে গেছেন অনেকের কাছ থেকে, একটু বিচ্ছিন্নও হয়ে পড়েছেন। কিন্তু কারোর প্রতি বিরূপতা বা বিদ্বেষ প্রকাশ পেত না তাঁর কথাবার্তায়।

তাঁর বাড়িতে সেকালের ছোটোবড় প্রায় সব কবিই আসতেন সে সময়ে। তাঁদের মধ্যে বিষ্ণুবাবু, সমরবাবু, কামাক্ষীপ্রসাদ যেমন ছিলেন, তেমনি দেখা যেত কলকাতার বাইরের কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, অশোকবিজয় রাহাকেও। কবিরা ছাড়াও আসতেন সুর-সাধক হিমাংশু দত্ত, 'উদয়ের পথে'র লেখক

জ্যোতির্ময় রায়, যতীন মজুমদার। মাঝে মাঝে কবির বাল্যবন্ধু এবং প্রখ্যাত কবি অজিত দত্ত আসতেন, দেখা যেত অমিয় চক্রবর্তীকেও। সুধীনবাবুকে সে সময়ে দেখেছি বলে মনে পড়ে না, যদিও পরে যেতেন শুনেছি।

বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে বেশ একটু ঘনিষ্ঠতা জন্মে গিয়েছিল সে সময়ে। তাঁর স্ত্রী প্রতিভা বসু তখনও লিখতে শুরু করেন নি বোধহয়। একদা গান গাইতেন খুবই ভালো। তখন গানের পাট শেষ হয়েছে। প্রতিভা দেবীর আচরণে আন্তরিকতা ছিল। ফলে যাতায়াত খুবই সহজ হয়ে উঠেছিল।

মনে পড়ে, একবার এঁদেরই একটি ছোটো দলের সঙ্গে হাজির হয়েছিলাম যতীন মজুমদার মশায়ের চৌরঙ্গীর টেরাসের বাড়িতে। তখন সন্ধ্যে উৎরে গেছে। বুদ্ধদেববাবু গৃহস্বামীকে জানালেন, রাতে আমরা ওখানেই থাকব, সারা রাত জেগে আড্ডা দেব। তারপর যে কথা সেই কাজ। সারা রাত গল্পগুজব, ঘনঘন চা-সিগারেট এবং কবিতা পড়া। বুদ্ধদেববাবু 'কংকাবতী' থেকে অনেকগুলো কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন। যেমন একটি কবিতার কয়েকটি লাইন—

নেমেছে হাজার আঁধার রজনী,
তিমির তোরণে চাঁদের চূড়া
হাজার চাঁদের গুঁড়া ভেঙে ভেঙে
হয়েছে ধূসর স্মৃতির গুঁড়া।
চলো চিরকাল জ্বলে যেথা চাঁদ, চির-
চির-আঁধারের আড়ালে বাঁকা।

অনুচ্চ রোমান্টিক তাঁর কণ্ঠস্বর। বাইরে নীলাভ রাত্রির নিদ্রিত নীরবতা আর ঢাকা বারান্দায় আমরা কটি প্রাণী। সে সব রাত্রি বারবার আসে না।

এর কিছুদিন পরই আধুনিক কবিতাকে আরো বেশী পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে 'এক পয়সায় একটি' নামে কবিতার বইয়ের সিরিজ বার করেন বুদ্ধদেব বসু। এক ফর্মা, মানে ১৬ পৃষ্ঠার কাগজ, দাম ১৬ পয়সা, অর্থাৎ সেকালের অর্ধেক চার আনা। এধরণের চেষ্টা বিলেতে চালু ছিল তখন, কিন্তু এদেশে একেবারেই নতুন। বেশ জমে উঠেছিল সিরিজটি। তারপর সব নতুন জিনিসেরই যা হয় আস্তে আস্তে ভাঁটা পড়ে এল উৎসাহে।

আধুনিক কবিতাকে নিয়ে আন্দোলন করার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি কোনো এক বিশিষ্ট প্রকাশক প্রতিষ্ঠানের দিকে সরে গেল।

বুদ্ধদেববাবুর গদ্য ছিল অসাধারণ। প্রত্যেকটি শব্দকে তিনি ওজন করে ব্যবহার করতেন। তাঁর মনের ভেতরকার অস্পষ্ট বক্তব্যটি যতক্ষণ না শব্দের শরীরে ধরা দিত ততক্ষণ নিজেকে তিনি রেহাই দিতেন না। সেই সঙ্গে তিনি সচেতন থাকতেন, বাক্য গঠনের দিকেও। প্রতিটি বাক্যের নিজের ছন্দ যাতে পরবর্তী বাক্যের ছন্দের সঙ্গে শত্রুতা না করে। বরং বন্ধুর মতো বচনার প্রসাদগুণকে বাড়িয়ে দিতে থাকে, সেদিকে

প্রেমেন্দ্র মিত্র

তাঁর নজর ছিল খুবই সজাগ।' কিন্তু কবিতার মধ্যে তাঁকে পাওয়া যায় অন্যভাবে। সেখানে তিনি তুলনামূলকভাবে অনিশ্চিত, নিজেরই এক অন্য অপ্রতিভার কাছে নিষ্প্রভ। প্রথমদিকে তাঁর সহায় ছিল বয়ঃসন্ধির অস্থির চঞ্চলতায় উদ্দীপ্ত রোমান্টিক আবেগ—পেয়েছি আমরা বন্দীর বন্দনা' আর 'কঙ্কাবতী'র কবিতা। পরে অনেক পরে, প্রায় প্রৌঢ়ত্বের সীমান্তে এসে তাঁর মধ্যে দেখা দেয় আত্মসচেতনার এক নতুন স্তর, তাঁর কবিতা হয়ে ওঠে অনেক বেশী ঘনবদ্ধ এবং গভীর। এ পর্যায়ের সব থেকে ভালো ফসল 'শীতের প্রার্থনা বসন্তের উত্তর' এবং কয়েকটি সনেট। যেমন, ঋতুর উত্তরে' সনেটের শেষ লাইন কটি—

আমার হৃদয় আজ চিরন্তন
হেমন্তে বিলীন;
কুয়াশা, চাঁদের প্রেত, রশ্মি-জ্বলা
পশ্চিমের স্মৃতি—

বিষ্ণু দে

সব মিশে অন্ধকার স্তরে দেয়
আমার পুলিন!

শুধু স্বপ্নে শুনে শুনে একতান,
অন্তহীন সমুদ্রের স্বর—
নিঃসঙ্গতা! জেনেছি তোমারই নাম
শীত, গ্রীষ্ম, বসন্ত বৎসর।

এই প্রসঙ্গে একটা অন্য কথা মনে পড়ছে। আমি তখন সনেট লেখার দিকে ঝুঁকেছি, বুদ্ধদেববাবু একদিন বললেন, সনেট লেখাকে তিনি খুব অস্বাভাবিক কাজ মনে করেন। আবেগকে ঐভাবে বেড়ী পরিয়ে দেবার মানে কি? কেনইবা তাকে চৌদ্দ লাইনেই শেষ হতে হবে—আগে কী পরেও তো শেষ হতে পারে। ব্যাপারটা কি আর্টিফিশিয়াল নয়?

মনে নেই সেদিন কি উত্তর দিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর ঐ আপত্তির মুখের মতো জবাব দিলেন তিনি নিজেই—নিজে সনেট লিখে। তখনই বোঝা গেল, এমন কোনো কোনো আবেগ আছে, যা চৌদ্দ অক্ষরেই বাঁধা পড়তে চায়, আগে বা পরে নয়। অন্য যেকোনভাবে শেষ করলেই সে কবিতা হয়ে যেত আর্টিফিশিয়াল।

ঐ সময়েই আলাপ হয়েছিল সমর সেনের সঙ্গে। যদ্দুর মনে পড়ে বুদ্ধদেববাবুর বাড়িতেই। কিংবা বিষ্ণুবাবুর বাড়িতেও হতে পারে। কিন্তু প্রথম পরিচয়ের পর কাছাকাছি আসতে খুব দেরী হয়নি। তার একটা বড় কারণ তাঁর নামের সঙ্গে পরিচয় ছিল আগেই। শুধু কবি হিসেবে নয়, সম্পাদক হিসেবেও। সেকালে 'শ্রীহর্ষ' বলে ছাত্রদের একটি কাগজ ছিল। কিংবা একটি না বলে বলা উচিত দুটি কাগজ। কেননা পরে ইংরেজী ও বাংলা দুই ভাষাতেই আলাদা দুটি কাগজ বেরিয়েছে।

যাইহোক তখনকার বাংলা শ্রীহর্ষের সম্পাদক ছিলেন সমর সেন। ব্যবস্থাপনা ছিল ছাত্রগোষ্ঠীর হাতে। ফলে শ্রীহর্ষের সেই রমানাথ মজুমদার স্ট্রীটের অফিসে আনাগোনা ছিল সমস্ত মতের ছাত্রেরই, সকলেই স্বেচ্ছায় সাহায্য করতেন। আমিও ছিলাম তাদেরই একজন।

এই জন্যে সমরবাবুর সঙ্গে আলাপটা জমতে দেরী হয়নি। তাই কিছুকাল পরে আমি যখন পড়াশোনায় পাট চুকিয়ে চাকরির চেষ্টায় দিল্লীর সেক্রেটারিয়েটে তদারক করতে যাই, তখন সে সময়কার দিল্লী প্রবাসী কবির পক্ষে হোটেল থেকে ডেকে নিয়ে বাড়িতে তোলাও হয়ে উঠেছিল সহজ ব্যাপার। সমরবাবু তখন দিল্লীর রামযশ কলেজে অধ্যাপনা করতেন, থাকতেন দরিয়াগঞ্জে।

কামাক্ষীপ্রসাদও দিল্লীতে কাজ করতেন সেই সময়ে। সেক্রেটারিয়েটে গিয়ে আবিষ্কার করি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও আমারই মতো এক উদ্দেশ্য নিয়ে হাজির হয়েছেন সেখানে। কামাক্ষীবাবু খবর পেয়ে মানিকবাবুকে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে। দিন কয়েক সমস্ত সন্ধ্যা ধরে চলল অন্তরঙ্গ আড্ডা

আড্ডা। সকলকেই রীতিমত কাছে থেকে দেখা গেল, প্রতিদিনের খুঁটিনাটির ভেতর দিয়ে চেনা গেল।

মানিকবাবু ছিলেন একরোখা ধরনের মানুষ। স্পষ্ট কথায়, সংক্ষিপ্তভাবে মতামত প্রকাশ করতেন, বাধা পেলে তর্ক করতেন। অন্যের মত শুনতেন, কিন্তু নিজের অবস্থান থেকে একচুল সরে দাঁড়াতেন না। সমরবাবু কথা বলতেন কম, কিন্তু যখন বলতেন, তার মধ্যে ঠাট্টার আমেজ থাকত, ঈষৎ শ্লেষ এবং একটা ক্যাজুয়াল ভাবও ফুটে বেরোত। ...মাক্ষীপ্রসাদ ছিলেন পুরোপুরি আড্ডা-বাজ মানুষ, হাসিখুশি এবং আতিথ্যে ত্রুটিহীন।

ব্যক্তিগতভাবে সমরবাবুও ছিলেন খুবই সহৃদয় মানুষ। তখন গরমকাল, দিল্লীতে লু চলছে। সমরবাবুর সেই এক-তলা বাড়িতে শুতে হত চাতালের ওপর বাইরে, নেওয়ারের খাটে। পাশাপাশি শুতাম দুজন দুখানা আলাদা খাটে। মাথার কাছে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় সারারাত চলত টেবিল ফ্যান। একদিন রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে অন্ধকারের মধ্যে চেয়ে দেখি, আমার গরম লাগছে মনে করে সমরবাবু টেবিল ফ্যানটি পুরোপুরি ঘুরিয়ে দিচ্ছেন আমার দিকে। মানুষের সত্যিকারের মনটাকে জানার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিলাম সেদিন।

সমর সেন আধুনিক বাংলা কবিতার এক অতি উজ্জ্বল নাম। এত কম লিখে এত বেশী প্রতিষ্ঠা এক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ছাড়া আর কোনো কবিই পান নি। প্রায় ছাত্র বয়সেই কিংবদন্তীর মতো জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন সমরবাবু। 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনের প্রথম সংস্করণের অন্যতম সম্পাদক আবু সয়ীদ আইয়ুব সমর-বাবুর কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন, সেই বয়সেই সমর সেন কবিতা রচনার একটি নতুন স্কুল তৈরি করে ফেলেছেন। সত্যি বলতে কি নতুন কবি যশঃপ্রার্থীদের ওপর তাঁর প্রভাব ছিল প্রায় ছোঁয়াচে অসুখের মতো।

সমর সেনের সমস্ত কবিতাই লিখিত হয়েছে গদ্যরীতিতে। এটা অবিশ্যি ঠিকই যে গদ্য কবিতা প্রথম লিখতে শুরু করে-ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু কী আশ্চর্য প্রতিভা ছিল ঐ তরুণ কবির, কলম ধরেই তিনি রবীন্দ্রনাথের থেকে "অন্য ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করলেন গদ্য কবিতার শরীরে।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা গীতি-কবিতারই যমজ বোন, কবিতার সুর ও আবেগই তার একান্ত নির্ভর। কিন্তু সমর-বাবুর গদ্য কবিতা গদ্যেরই এক্রমালি শরিক, তাতে গীতিকবিতার সুরেলা আবেগের চেয়ে বেশী করে কানে বাজে নাটকীয়তার বক্রোক্তির সুর। কখনো তিনি তাই বিষণ্ণ গভীর, কখনো তীব্র বিদ্রূপে ক্ষমাহীন। কিন্তু সব সময়েই বোঝা যায়, নিজেকেও তিনি বাদ দিচ্ছেন না। জীবনের স্খলনপনা ও অবক্ষয়ের ছবি তাঁর কবিতায় এক বিশেষ চরিত্রলক্ষণ বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। এবং এই ছবিগুলি নিতান্ত ছবিই নয়, কবিরও মন্তব্যও। যেমন ধরুন—

তোমার ক্লান্ত উরুতে
একদিন এসেছিলো
কামনার বিশাল ইশারা!
ট্যাকেতে টাকা নেই
রঙিন গণিকার দিন হলো শেষ,.......
কাঁচা ডিম খেয়ে প্রতিদিন দুপুরে ঘুম,
স্ফীতোদর দাম্ভিক স্বামীর পিছনে
গর্ভবতী সতীসাবিত্রী,
আর বন্যার মতো পুত্র-কন্যা,
অরণ্যে রোদন;
হে ঈশ্বর, এ কী অপরূপ!

এবং এরই সঙ্গে লক্ষ করুন নিচের লাইনগুলোও, সমর সেনকে চেনা অনেকটা সহজ হয়ে যাবে।—

তোমার বিষাণ বজ্রে বাজে।
নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত দুর্ভিক্ষের ধূপে।
কৃষ্ণবর্ণ, লোলজিহ্বা, করালবদন।
পদপ্রান্তে নিরুদ্দেশ ধান আর গম,
আর পুঞ্জীভূত পুরুষের প্রাণহীন দেহ,
ছিন্ন শিশুর রক্তজবা।
ঘূর্ণিঝড়ে, বন্যায়, বিস্ফোরকে
জয়বাদ্য বাজে।

সমর সেনের কবিতায় উপমা বা অলঙ্কারের জাঁকজমক খুবই কম। তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব, টানটান গদ্যে নতুন ধরনের বিশেষণের চকিত দীপ্তি। যেমন—রাত্রির ঝাপসা গন্ধ, চৌরকাটা মসৃণ মানুষ, সবুজ গাছের নরম অপরূপ শব্দ, দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদ, অনুর্বর আত্মার উচ্ছ্বাস, তপ্ত মুহূর্তের খড়্গ ইত্যাদি।

সেকালের এক কৃতী পুরুষ দীনেশ-চন্দ্র সেন ছিলেন সমরবাবুর পিতামহ। সমরবাবুর মুখে শুনেছি, দীনেশচন্দ্র তাঁর খ্যাতনামা পৌত্রের কবিতার বিষয়ে নীরব থাকলেও গদ্যের খুব প্রশংসা করতেন।

সমরবাবু তাঁর বন্ধু মহলে তো বটেই পারিবারিক গণ্ডিতেও রীতিমত স্নেহ ও মর্যাদার আসন পেয়েছেন। শোনা যায় তাঁর অধ্যাপক পিতা অরুণ সেন নিজের এই তৃতীয় পুত্রের বিষয়ে উল্লেখ করে বলতেন, আমি হলাম একজন জিনিয়াস পিতার মিডিওকার ছেলে, এবং একজন জিনিয়াস ছেলের মিডিওকার পিতা।

জীবনানন্দ দাশকে আমি রাস্তায় দেখেছি বার পাঁচ ছয়, এবং মুখোমুখি কথা বলেছি মাত্র দুবার। প্রথম দিন রাস্তাতে দাঁড়িয়ে দুচার মিনিটের জন্যে। কথাবার্তা নিতান্ত আলাপ পরিচয়ের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। সেদিনই তিনি বাড়ির ঠিকানা দিয়ে বাড়িতে যেতে বলেন, বেশিক্ষণ আলাপ করার জন্যে। দ্বিতীয় এবং শেষ আলাপ তাই দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

তাঁর শরৎ বসু এবং রাসবিহারী এভেনিউয়ের মোড়ের সেই একতলায় যাঁরা মাঝে মাঝে যেতেন আমি তাঁদের দলে ছিলাম না। হয়তো সেইজন্যেই অথবা তাঁর কথা বলার ধরনটাই হয়তো ছিল ঐরকম, প্রত্যেকটি বাক্যের পরেই নীরবতা নেমে

আসছিল বারবার, কচুরিপানার গাঙে নৌকো বাইবার মতো আলোচনায় এগোনো বেশ কষ্টকরই হয়ে উঠেছিল।

তবু তাঁর ব্যক্তিত্বের টান ছিল দুর্নিবার। উঠে আসবার উপায় ছিল না। কথা বলার সময় বেশিরভাগ সময়েই তাকিয়ে থাকছিলেন তিনি অন্যদিকে, মাঝেমাঝে কোনাচেভাবে আমার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন বারবার।

সেদিন ঠিক কী কী কথা হয়েছিল, মনে নেই তার সবটা। তখন তো জানতাম না সেইটেই আমার শেষ দেখা। কথা প্রসঙ্গে একবার তিনি বলেছিলেন, কোনো কবিতা লিখেই তিনি তৃপ্তিবোধ করেন না, নিশ্চিন্ত বোধ করেন না। একই কবিতা নানা-ভাবে লেখার চেষ্টা করেন কখনো কখনো, কাটাকুটি করেন। লেখার পর অনেক কবিতাই তিনি ছাপতে দেন না। তাছাড়া আরো বলেছিলেন, কলকাতার জীবন তাঁর খুব অস্বাভাবিক মনে হয়। অবিশ্যি গ্রামে বা মফস্বলেও যে এখন ভালো লাগত, তা নয়। সময়টাই কেমন বদলে যাচ্ছে।....ইত্যাদি।

তাঁকে তখন বেশ বিষণ্ণ, চিন্তিত এবং নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল। কথার মধ্যে উদাসীনতার সুর স্পষ্ট হয়ে উঠলেও একটা গোপন অভিমানের রেশও দুর্লক্ষ্য ছিল না। মাঝে মাঝে কেমন যেন বিরক্তিও প্রকাশ পাচ্ছিল, ঠিক কার ওপর তা বোঝা যাচ্ছিল না। কোনো একটা বিষয়ে খানিকটা বলতে বলতেই হঠাৎ থেমে গিয়ে খাটের ওপরকার এটা-ওটা জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন।

মৃত্যুর পর বাঙালিরা তাঁকে শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু জীবিতকালে তাঁর প্রতি সুবিচার করা হয় নি। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্যে প্রতিদিনই তাঁকে যথেষ্ট পরিমানে মর্মযাতনা ভোগ করে যেতে হয়েছে।

প্রথম জীবনে তাঁর কবিতার মধ্যে ছিল আশ্চর্য এক রোমানটিক বিষাদ, দৃশ্য স্পর্শ-ময়, আবেগে তিনি কীটসের মতো সেন্সুয়াস। আর রোমান্টিক কুহক রচনায় তাঁর পছন্দের মানুষ এডগার অ্যালেন পো এবং ইয়েটস। শেষের দিকে অর্থাৎ কলকাতায় আসার পর তাঁর কবিতার মধ্যে দেখা যায় এক কঠিণ এবং নিরাভরণ দীপ্তি। এ-সব কবিতা মাঝে মাঝে বিতৃষ্ণায় ধিক্কারে এবং ব্যাখ্যার অতীত এক অসহায় যন্ত্রনায় কবি জীবনানন্দকে নতুন মহিমায় অনন্য করে তুলেছে। যেমন—

অদ্ভুত আঁধার এক
এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,

এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ
চোখে দ্যাখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—
প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ
তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।

সমর সেন

যাদের গভীর আস্থা আছে আজো
মানুষের প্রতি
এখনো যাদের কাছে
স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি,
কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের
খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

এই এক আশ্চর্য ঘটনা আমার জীবনে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় হয় বেশ কিছুকাল পরে। আশ্চর্য এই জন্যে যে, তাঁর কবিতা ও গল্প পড়েছিলাম মফস্বলে থাকতেই। কিন্তু কলকাতায় এসেও প্রায় বছর কুড়ি ধরে তাঁর সঙ্গে তেমন কোনো ব্যক্তিগত যোগাযোগ ঘটল না। অথচ ঘটা উচিত ছিল। এখানে ওখানে দেখা তো হয়েছে কতোবারই।

প্রেমেন্দ্র মিত্র আমাদের ভাষার একজন প্রধান কবি, বাংলা ছোটো গল্পের জগতে তাঁর নাম সোনার জলে লেখা থাকবে, কিন্তু তাঁর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব এসবের চেয়েও অনেক বড়। আধুনিক কবিদের মধ্যে একমাত্র তিনিই সমানভাবে মিশতে পারেন সকলের সঙ্গে।—পণ্ডিত থেকে মূর্খ, উন্নাসিক কোনো সংস্কৃতিবান ব্যক্তি থেকে পাটের দালাল অবধি সকলের সঙ্গেই তিনি সমানভাবে মেশেন। তাঁর মতো এত ক্ষুরধার বুদ্ধির আত্মসচেতন কবি কী করে যে দিনের পর দিন যে-কোনো লোকের সঙ্গে তারই মতো স্তরে নেমে কথাবার্তা বলেন, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এত বিচিত্র পেশার বিচিত্র ধরনের মানুষের সঙ্গে এমন-ভাবে মিলিয়ে দিতে পারা কেবল সত্যিকারের একজন বড় মাপের মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

চরিত্রের মধ্যে এই বহু কৌনিক বিচ্ছুরণের জন্যে প্রেমেন্দ্রবাবুর কবিতা-গুলোও হয়েছে নানা ধরনের। প্রথম দিকে ছিল নতুন ধরনের এক রোমান্টিক বিস্ময়— 'এ মাটির ঢেলা কবে কে ছুঁড়িল' ইত্যাদিতে তার ছাপ সুস্পষ্ট। পরে এল 'আমি কবি যত কামারের' কিংবা 'ফেরারী ফৌজের' কবিতা-গুলোর মতো প্রত্যক্ষ বাস্তবতার স্মরণীয় শিল্পরূপ। তারই সঙ্গে পাই 'নীল দিন' এবং 'ছাদে যেও নাকো' ধরনের প্রেমের কবিত এবং 'কাক ডাকে' বা 'জং' শ্রেণীর নিঃস উপলব্ধির রচনা। কিন্তু এখানেই শেষ নয় পাই 'পথ' নামক কবিতার 'ইতিহাস'-চেত 'নীলকণ্ঠ' কবিতার দার্শনিক বোধ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা-সম্ভার সত্যিই বহু বর্ণম ঝাড়লণ্ঠনের মতো।

প্রেমেনবাবু কথা বলেন খুবই অন্তরঙ্গ ভাবে। মাঝে মাঝেই অন্যদিকে চোখ সরিয় যেন এবং অনিশ্চিতভাবে একটু হাসেন চোখমুখ তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত; কিন্ত হাসিটি আশ্চর্য রকম সরল ও সহজ। আগে নস্যি নিতেন মাঝে মাঝে। নেবার আগে আঙুলের ডগাগুলোতে একটু অগু লাগিয়ে নিতেন, শিশি তাঁর সঙ্গেই থাক কেন এই অভ্যাসটি তা স্পষ্ট করে জানতে চাইনি। তবে অনুমান করি, আঙুল থেকে রোগবীজাণু দূর করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য কেননা পরে টের পেয়েছি, তাঁর মধ্যে (আমার মতোই!) রোগভীতি আছে যথেষ্ট এখন অবিশ্যি বেশ কয়েক বছর নস্যি নেওয় ছেড়ে দিয়েছেন প্রেমেনবাবু। সেই সঙ্গে এখ বেপাত্তা হয়েছে অগুরুও।

বাড়িতে গেলে সকলকেই তিনি দেন। সকলের সঙ্গেই তিনি দেখা করে বাড়িতে যা পরে থাকেন সেইভাবেই, গেঞ্জি গায়ে দিয়ে। মেলামেশায় এবং পোশাকে পরিচ্ছদে আর তাঁর কোনো ভড়ং নেই ইংরেজীতে যাকে বলে 'এয়ার' তা তাঁর স্বভাবের মধ্যেই নেই। অথচ তিনি য বড়ো তাও বোঝা যায় তাঁকে দেখলে প্রতিভা তাঁর এতো সহজাত যে তাতে কোন ধোঁয়া নেই, দাগ নেই, আছে শুধু দীপ্তি এবং স্নিগ্ধ বিচ্ছুরণ। এই ধরনের কালচার এর সংজ্ঞা দিয়েই তো ম্যাথু আর্নল্ড বলে ছিলেন—সুইটনেস অ্যান্ড লাইট। এই বিচ্ছুরণ দিয়ে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র, গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং প্রকৃতি প্রেমেন্দ্র মিত্র এত বিভিন্ন ধারে... মানুষকে স্পর্শ করে আছেন যে রবীন্দ্রপরবর্তীকালে এক নজরুল ইসলাম ছাড়া আর কোনো কবিরই বোধহয় তেমন সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু এত কিছুর পরেও তিনি একজন বড় কবি এবং সজাগ কবি বলেই জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁকে নিঃসঙ্গ বিষাদের সুরে উচ্চারণ করতে শোনা যায়—

হাওয়া বয় শনশন্
তারারা কাঁপে,
হৃদয়ে কি জং ধরে
পুরনো খাপে।...ইত্যাদি

বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার অল্প কিছুদিন পরেই অমিয় চক্রবর্তী পড়াতে আসেন আমাদের। রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব হিসেবে নাম শুনেছি তাঁর অনেক দিন আগেই। কিন্তু আধুনিক কবিতা লেখা ব্যাপারে তিনি আমাদের সিনিয়ার ছিলেন বলা যায় না। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তখন কবি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত, সমর সেন তো বটেই সমরবাবু আমার তিন বছরের বড়, সুভাষ সমবয়সী। কিন্তু অমিয়বাবু আমার চেয়ে আঠার বছরের বড় হলেও কবি হিসেবে বরং তিনেকের জুনিয়র।

অবিশ্যি এসব নিতান্তই চুলচেরা
৷ব। প্রথম বই 'খসড়া'র মধ্যে খানিকটা
গানবাঁশীর ভাব থাকলেও দ্বিতীয় বই
মুঠো'তেই অমিয়বাবু বিশিষ্ট কবির
দা পেয়ে যান।

অমিয়বাবুর প্রথম দিকের কবিতা ভালো
ত না আমার। ছাত্রদের কাগজ 'শ্রীহর্ষ'তে
কড়া রিভিউ করেছিলাম কিছুদিন
গই। সেটা নজরে পড়েছিল অমিয়বাবুর
ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

একদিন ক্লাসের পর করিডোরে তাঁর
থামুখি পড়ে যাওয়ায় তিনি একটু পা
নয়ে আমার কাছাকাছি এসে বাড়িতে দেখা
তে বললেন।

শ্রীহর্ষে ঠিক কী লিখেছিলাম মনে
ছে না এখন। তবে তাঁর প্রথম দিকের
তায় যে একটা চমক সৃষ্টির চেষ্টা ছিল,
া ভালো লাগেনি আমার। কেমন যেন
নিকসর্বস্ব এবং আর্টিফিশিয়াল মনে
। অমিল গদ্যে জোরালোভাবে অ্যাকসেন্ট
য়ে যে চালটা রপ্ত করেছিলেন তিনি,
ভেতর হপকিনসের প্রভাব অতি স্পষ্ট
। যদিও হপকিনস এই স্প্রাং রীদম্
হার করতেন অমিয়বাবুর মতো
কা মেজাজ প্রকাশ করার জন্যে নয়,
নকটা নাটকীয় সলিলকির মতো অন্তরের
চট ও প্রত্যয়ের বাহন হিসেবেই।

অমিয়বাবু তাঁর হালকা মেজাজের ফলে
কিনসীয় স্প্রাং রীদম্ ব্যবহার করলেও
যন্ত্র বাজত তাঁর হাতে ডি এল রায়ের
সর গান এবং অবনীন্দ্রনাথের পালা-
ব্যর ছাঁদে।

বয়সটা তখন কম ছিল বলেই অমিয়-
র আমন্ত্রণে এসব কথা বলার জন্যে হাজির
ছিলাম গিয়ে একদিন তাঁর এলগিন
ডের সেই ফ্ল্যাটে। বোকামিই করেছিলাম।
। ঘন্টা দুয়েক বসার পরেও আমাদের
নের বক্তব্য সমান্তরাল রেখাতেই চলতে
াল। ইতিমধ্যে কফি এবং বিস্কুটও খাবার
। কিন্তু সৌজন্য বজায় থাকলেও
র মিল হলো না।

পরে 'চেতন স্যাকরা' কবিতাটি ছাপা
য়ার পর কোথায় বেরিয়েছিল প্রথম ?
ত্তার কোনো বিশেষ সংখ্যায়, না পরি-
।?) অমিয়বাবু একদিন জিজ্ঞাসা করলেন,

দিনেশ দাশ

'কেমন লেগেছে।' ভালো লেগেছে বললাম।
পুরোনো অভিজ্ঞতায় সতর্ক হয়েছি বলেই
বললাম। কেননা ভালো, খুবই ভালো লেগে-
ছিল যদিও কবিতাটি, কিন্তু বক্তব্যটি
বড্ডোই রাবীন্দ্রিক মনে হয়েছিল, যা সেকালে
আমাদের কারোরই খুবই পছন্দসই ছিল না।

এরপর অমিয়বাবু তাঁর হালকা মেজাজ
ত্যাগ করে গভীর হয়েছেন, ছন্দও ব্যবহার
করেছেন নানারকম ট্র্যাডিশন্যাল ছাঁদে।
কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে এড়াতে পারেন নি।
তাঁর কবিতায় ইয়েটস্ পাউণ্ডের কাব্যের
প্রভাব খুঁজে থাকেন কেউ কেউ। কিন্তু
অমিয়বাবুর কবিতা আসলে রবীন্দ্রনাথেরই
বাঁকা প্রতিফলন।—যেন একটি কাঠিকে
জলের তলায় খানিকটা ডুবিয়ে দেবার ফলে
ওপরের রেখার চেয়ে নিচের রেখাটি ঈষৎ
বেঁকে গেছে।

তাই বলে এ নয় যে অমিয়বাবু ভালো
কবি নয়, বিশিষ্ট কবি নন। অবশ্যই তিনি
একজন সার্থক অর্থাৎ সিগনিফিক্যান্ট কবি।
তাঁর শেষের দিকের কবিতা অবিশ্যি মাঝে
মাঝে বড়বেশী বক্তব্যপ্রধান মনে হয়;
কখনোবা মনে হয় রীতিমত কর্তব্য পালনের
মতো দায়সারা ব্যাপার। কিন্তু তাঁর 'বৃষ্টি
পড়ে' কেঁদেও পাবে না তারে, বড়বাবুর
কাছে নিবেদন, ভারতবর্ষ বিষয়ক এবং
দুর্ভিক্ষের সময়কার বেশ কয়েকটি কবিতা
বারবার করে পড়ার মতো। তাঁর ইমেজগুলি
মনে রাখার মতো। শব্দ নির্বাচনেও তিনি
সতর্ক। ফলে তিনি যে একজন স্বতন্ত্র কবি
এবং সৎ কবি, সে পরিচয় তাঁর প্রায় সব
কবিতাতেই পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের এতো
ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে বাস করেও তাঁর মতো
এতো সার্থকভাবে আর কেউ আধুনিক
চিন্তাধারার এতো কাছে আসতে পারেননি।
হয়তো শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথের মনে যে
আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য, বিশেষ করে
কবিতার প্রতি আগ্রহ দেখা দিয়েছিল তাও
কিছুটা ঘটেছিল অমিয়বাবুর সাহচর্যের
জন্যেই। সুধীনবাবু এবং বিষ্ণুবাবুর (বিশেষ
করে এলিয়েটের সেই বিখ্যাত তর্জমার
সময়ে) সঙ্গে আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ যে
কিছুটা হাওয়া-বদলের খবর পেয়েছিলেন,
এর প্রমাণ কবি নিজেই রেখে গেছেন। অমিয়-
বাবুর ব্যাপারে অনুসন্ধান চলতে পারে।

ছাত্র থাকার সময়ে অমিয়বাবুর কবিতার
বিষয়ে কিছু স্পর্ধিত উক্তি এবং সে
ব্যাপারে মতের অমিল হলেও মনের যোগা-
যোগ কিন্তু তাঁর সঙ্গে বরাবরই থেকে
গেছে। সেদিনের আলোচনার পরেও দুচার-
বার দেখা করতে গেছি তাঁর সঙ্গে। আগের
মতোই দেশের গল্প হয়েছে, (তাঁর বাড়ি
আমার জেলাতে এবং সেকথা তিনি ভোলেন
নি কখনো!) অগ্রজ বন্ধুর মতো সাহিত্যের
বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য সে তাঁর
অগাধ, এ তো আমরা সকলেই জানি। কিন্তু
অনেকেই জানেন না। কত সহজভাবে তিনি
জটিল কথা বুঝিয়ে বলতে পারতেন। তাঁর
মতো এত মৃদুভাষী স্নিগ্ধ স্বভাবের পণ্ডিত
ব্যক্তি আমি কমই দেখেছি।

অমিয়বাবু বোধ করি প্রায় তিরিশ বছর
ধরে মার্কিনপ্রবাসী। * মাঝে মাঝে খবর পাই
তিনি দেশে এসেছেন, কিন্তু দেখা হয় কম।
শেষবার দেখা হয়েছিল রবীন্দ্রসদনে, কী
এক অনুষ্ঠানের সময়ে। ঢুকেছিলাম হলের
মধ্যে বাতি নিভে যাবার পর। কিছুক্ষণ
অনুষ্ঠান চলার পর হঠাৎ একবার সামনে

* এখন শান্তিনিকেতনে আছেন।—স

চেয়ে তিনচার রো পরে আধো অন্ধকারের মধ্যে একটি মানুষের মাথার পেছন দিকটা এবং কাঁধের ভঙ্গি দেখে কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হতে লাগল। অত্যন্ত চেষ্টায় স্মৃতির ওপর চাপ দিয়ে হঠাৎই মনের মধ্যে একবার ঝিলিক দিয়ে উঠল, অমিয়বাবু নয়তো? পরক্ষণেই মনে পড়ল তিনি তো আমেরিকায়। কিন্তু চোখের দৃষ্টি তবু বারে বারেই চলে যেতে লাগল ঐদিকে। একটু পরে ছায়ামূর্তি উঠে দাঁড়ালেন, সঙ্গে আরো এক ব্যক্তি। এগোতে লাগলেন তাঁরা সামনের দিকে। কাছে আসতেই স্পষ্ট করে চিনলাম, ঐ তো তিনি। পেছনে পেছনে বাইরে এলাম আমিও। মিনিট পাঁচেকের জন্যে কথা হলো সেদিন। সঙ্গে বোধহয় ছিলেন নরেশ গুহ, নিমন্ত্রণে যাচ্ছেন তাঁরা।

ঠিক আগের মতোই প্রসন্ন আলাপ, যেন রোজই দেখা হয় তাঁর সঙ্গে। মনের ঐশ্বর্য সত্যি অসাধারণ অমিয়বাবুর।

এরপর থেকে অমিয়বাবুর কবিতা দেখি মাঝে মাঝে। কিন্তু কবিকে দেখতে পাইনি। অমিয়বাবুর কি এখনো মনে আছে তিনি একদিন লিখেছিলেন, 'আকাশ চাদরটা ময়লা, নুরনবীর মাস পয়লা', কিংবা 'বৃষ্টি পড়ে ছাতাওলা গলির ভিতরে, বৃষ্টি পড়ে মনের মাটিতে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ে আলাপ পরিচয় হয় আরেক কবির সঙ্গে, যদিও তিনি তখন কবিতার রাজ্য থেকে সরে গেছেন, এবং রাজনীতি নিয়ে ব্যাপৃত হতে শুরু করেছেন। তিনিও আমার অধ্যাপকই ছিলেন, কিন্তু পরিচয় হয়েছিল 'চতুরঙ্গের' সম্পাদক হিসেবে। আমি হুমায়ুন কবিরের কথা বলছি। কবির সাহেব আমাদের ইংরেজী রোমান্টিক কবিতা পড়াতেন। একই সঙ্গে তিনি দর্শন বিভাগেও ক্লাস নিতেন। তাঁর মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধি মানুষ আমি কমই দেখেছি। আর তাঁর কথাবার্তা, চলাফেরা সবই ছিল এত চটপটে ধরনের যে দেখা মাত্র তাঁকে প্রতিভাবান মানুষ বলে চেনা যেত।

দুঃখ এই যে কবির সাহেব তাঁর এই প্রতিভাকে সাহিত্য বা অধ্যাপনার মধ্যে নিবদ্ধ রাখলেন না। প্রথমে করলেন রেল-কর্মীদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের কাজ, পরে করলেন রাজনীতি এবং মন্ত্রিত্ব। কোনোটাই বোধহয় তাঁর স্বাভাবিক ক্ষেত্র ছিল না। ফলে তিনি এমন কিছু করলেন যা তাঁর না করলেও চলত, অথচ যা তাঁর দেবার ছিল তা দিতে পারলেন না।

কবির সাহেব কবি এবং সাহিত্যিক হিসেবে স্থায়ী স্বাক্ষর রাখতে পারতেন। কিন্তু তিনি স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজে সময় নষ্ট করলেন।

আলাপ হওয়ার আগেই দেখেছিলাম তাঁকে একবার কলেজেরই এক অনুষ্ঠানে। তাঁর বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। অবাক হয়েছিলাম তাঁর সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী স্বচ্ছ দৃষ্টি দেখে। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে তিনি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে পরাধীন দেশের মুক্তির কাজে সবাইকে একসঙ্গে এগিয়ে আসতে বলেছিলেন।

সভার শেষে মান্যগণ্য অতিথি আর অধ্যাপকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে কোথায় যে তিনি হারিয়ে গেলেন দেখতে পেলাম না।

ছাত্র হিসেবে কবির সাহেবের উঁচু দরের খ্যাতি ছিল। এদেশে এবং ওদেশেও। পড়াশোনা ছিল তাঁর ব্যাপক ও গভীর। একই সঙ্গে সাহিত্য এবং দর্শনশাস্ত্রে সমান স্বচ্ছন্দ ছিলেন। শুনেছি দেশে ফিরে আসার পর সেকালের সেই পরিচয়ের সাপ্তাহিক বৈঠকেও যোগ দিতেন মাঝে মাঝে। আধুনিক চিন্তা এবং আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ ছিল।

পরে তিনি পরিচয়ের ভরা যৌবনের দিনেই বার করেন তাঁর নিজের সম্পাদিত ত্রৈমাসিক চতুরঙ্গ। প্রথমে বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদনায়, কিন্তু দু-এক সংখ্যা পর থেকেই একা। এবং অচিরে তিনি 'চতুরঙ্গ'কে সত্যিকারের একটি নতুন ও আধুনিক কাগজ হিসেবে সার্থক করে তোলেন।

কিন্তু তারপরই ঘটল দ্রুত পট-পরিবর্তন। কবির সাহেব রাজনীতিকে তাঁর পূর্ণ সময়ের পেশা করে নেন। দেশ স্বাধীন হবার পর প্রথমে হন মৌলানা আজাদের অধীন শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী এবং মৌলানা সাহেবের মৃত্যুর পর শিক্ষা-বিভাগেরই পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী।

কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে তিনি অনেকদিন ছিলেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পর অন্যান্য দপ্তরের দায়িত্ব আসে তাঁর ওপর। কিন্তু মন্ত্রী হন আর যাই হন, লেখার কাজ তিনি একেবারে ছেড়ে দেন নি, লেখকদের কাছ থেকে দূরে সরে যান নি। কলকাতায় এলে লেখকদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করতেন। অনেককে তিনি দেখা করতে অনুরোধ করতেন। আমার সঙ্গেও দেখা হয়েছে তাঁর। লক্ষ্য করেছি, অজস্র ধরনের রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক উমেদারদের ভিড়ের মধ্যেও কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে তিনি কতো আন্তরিক আগ্রহে আলাদাভাবে কথা বলতেন, তাঁদের সাহিত্যকর্মের বিষয়ে খবর নিতেন।

মনে পড়ে দিল্লী গিয়ে একবার তাকে ফোন করার পর তিনি জানিয়েছিলেন, পরেরদিন সকালেই দশটা নাগাত তিনি দক্ষিণ ভারত সফরে যাবেন, কিন্তু আমি যদি একটু কষ্ট করে আটটা নাগাত যাই কথা হতে পারে। দুরন্ত শীত ছিল যদিও তখন, তাঁর আগ্রহের কাছে শীতের ভয়কে হার মানতে হয়েছিল। গিয়ে তাঁর কর্মোদ্যোগ ও মানসিক সজীবতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। সারাক্ষণ তিনি কলকাতা ও কলকাতার সাহিত্যিকদের কথা বললেন। তিনি যে একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী, তিনি যে কিছুক্ষণ পরেই গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কাজে দিল্লীর বাইরে যাচ্ছেন, তার কোন চিহ্নই দেখতে পেলাম না তখন।

প্রথম জীবনের পর কবিতা লেখা তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সাহিত্যের অন্য বিভাগের চেয়ে কবিতার দিকেই ছিল তাঁর বেশী টান। অন্ততঃ সেদিনের কথা-বার্তায় আমার সেই রকমই মনে হয়েছে।

কবিতা লেখেন না, কিন্তু কবিতার ব্যাপারে উৎসাহী আরেকজন খ্যাতিমান অধ্যাপকের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়েই আলাপ হয়েছিল, তিনি নীহাররঞ্জন রায়। সেকালের লাইব্রেরী হলের পাশে তাঁর সেই কাঠের পার্টিশান দেওয়া চীফ লাইব্রেরিয়ানের ঘরটিতে অনেকদিন তাঁর সঙ্গে বসে গল্পসল্প করেছি, চা খেয়েছি। আমার প্রথম দিকের একটা বইয়ের রিভিউও করেছিলেন তিনি মনে পড়ে। পাণ্ডিত্য তাঁকে কঠিন করে নি, বরং তাঁকে সরস অনুভূতিশীল এক প্রসন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী করেছে।

নীহারবাবুকে তখন মাঝে মাঝে বুদ্ধদেববাবুর বাড়ীতে দেখেছি। যদ্দুর মনে পড়ে 'কবিতা'-য় তিনি রিভিউও করেছেন কয়েকবার। কিন্তু কবিদের মধ্যে প্রেমেনবাবু এবং সুভাষের সঙ্গেই বোধহয় তাঁর বেশী যোগাযোগ ছিল। তিনিই একদিন বলেছিলেন, ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ে প্রেমেনবাবুর পড়াশোনা খুবই ব্যাপার।

এখন যেমন সারা দেশেই কবি সম্মেলন হয়, আগে তেমন হতো না। আধুনিক কবিতার তখন এত প্রচার ছিল না। জনপ্রিয়তাও ছিল না। কবি সম্মেলনের প্রথম অনুষ্ঠান হয় পুরনো সেই সিনেট হলে। আধুনিক কবিতার ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় দিন।

সভাপতি হয়েছিলেন নীহারবাবু। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন দিলীপকুমার গুপ্ত। সঙ্গে ছিলেন বোধহয় বাংলা বিভাগের প্রধান শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

যদ্দুর মনে পড়ে, বাংলার প্রায় সমস্ত আধুনিক কবিই যোগ দিয়েছিলেন সম্মেলনে। জীবনানন্দবাবু কবিতা পড়তে আপত্তি করছিলেন, খুবই নার্ভাস লাগছিল তাঁর। শেষে দিলীপ গুপ্ত মশাই অনেক করে বলে তাঁকে রাজি করান একটি মাত্র কবিতা পড়ার শর্তে। দিলীপ গুপ্ত দাঁড়িয়ে রইলেন কবির পাশে তাঁকে ভরসা দেবার জন্যে। কিন্তু প্রথম কবিতা পড়ার পর শ্রোতাদের পক্ষ থেকে উৎসাহী সাড়া লক্ষ্য করে জীবনানন্দবাবু তাঁর শর্তের কথা ভুলে গেলেন, অনর্গল কবিতা পড়ে যেতে লাগলেন প্রায় দশ মিনিট ধরে। সমর সেন উপস্থিত ছিলেন সম্মেলনে, কিন্তু জীবনানন্দের এই অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্য করার পরেও কিছুতেই তিনি কবিতা পড়তে রাজি হলেন না। সেদিনকার অনুষ্ঠানে সব থেকে মনে রাখার মতো হয়েছিল সুধীনবাবুর আবৃত্তি। খানিকটা পেছনে হেলে দাঁড়ানোর এক বিশেষ ভঙ্গিতে তাঁর সেই নিজস্ব ধরনের ঝোঁক দিয়ে দিয়ে শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে যতিপাতের মুখে এসে শরীরটাকে হঠাৎ দুলিয়ে দেবার কায়দা, আবৃত্তি শুরু করা মাত্রই হৃদয় জয় করে নিয়েছিল সেদিন সকলের। তাঁর আবৃত্তির ধরন ছিল একই সঙ্গে রাজকীয় এবং

কীর।' এখনো কানে বাজে তাঁর সেই ...ক্তি—'তোমার যোগ্য গান বিরচিত বলে/ ...ছি বিজনে / নবনীপবনে , পুষ্পিত ...বনে।

এই সময়েরই কিছু আগে-পরে দিনেশ ...দার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছিল আমার। ...থায় এবং কেমন করে তা মনে করতে ...ছি না। কিন্তু প্রথম পরিচয়ে তাঁকে ...' বানানে দন্ত্য স দেন কেন জিজ্ঞাসা ...রেছিলাম মনে পড়ছে। সেকালে দাস এবং ...গুপ্ত লেখার সময় সকলেই তালব্য-শ ...খতেন, বোধকরি দাস শব্দটির মানে ...ম্বন্ধে সচেতন হয়েই। (কিন্তু দাশ মানে ...? নাকি প্রপার নাউন!) দিনেশবাবু ...র স্বভাবসিদ্ধ সরল বিনয়ের সঙ্গে ...নালেন। নিরুপায় হয়ে এ রকম বানান ...রেছেন। কেননা 'কল্লোল'-সম্পাদক ...দীনেশরঞ্জন দাশের নাম সেকালে সুপরিচিত ...ছল। ভুল বোঝাবঝির ভয়ে দাস থেকে দাশ ...রা যায় নি। নিজের আসল নাম দীনেশকেও ...ল্তে হয়েছে দিনেশ।

দিনেশবাবু প্রথম দিকে 'ভবিষ্যৎ' এবং অগ্রগতি'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ...রও ছিলেন বিরাম মুখোপাধ্যায় ও হীরা-...লাল দাশগুপ্ত। পরে দিনেশবাবু লিখতে ...কেন প্রধানত পূর্বাশা ও নিরুক্ত নামে ...সেই 'কবিতা' পত্রিকার প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজে'

কবিতার হাতটি দিনেশবাবুর মিষ্টি। ...মর্শক তিনি যখন সমাজ সমালোচনা করে কবিতা লেখেন তখনও লেখার মধ্যে মিষ্টতা ...থাকে। এইটিই তাঁর বিশিষ্টতা, এখানেই ...তিনি সার্থক।

তাঁর 'কাস্তে' কবিতাটি তো এখন ...সর্বজন পরিচিত। আগেও এ নিয়ে কম আলোচনা হয় নি। সুধীনবাবু এবং বিষ্ণু-...বাবুর মত প্রবীণ দুজন কবি 'এ যুগের ...চাঁদ হল কাস্তে' এই লাইনটি ব্যবহার করে কবিতা'র একই সংখ্যায় দুটি কবিতা লেখেন—তাতে আসল মজাটা ছিল 'কাস্তে' এই শব্দটির 'স্ত' ব্যবহার করে আলাদা আলাদা মিল দেবার প্রতিযোগিতা।

দিনেশবাবু লেখেন কম, কিন্তু ভাল লেখেন। তাঁর কবিতার এক প্রধান ঐশ্বর্য ...চোরা ধরনের উপমা। আধুনিক মান-...সিকতার অধিকারী হলেও তিনি যে একজন ...বাঙালী কবি এ পরিচয়ের স্বাক্ষর তাঁর ...কবিতার সর্বাঙ্গে। বাংলার সেই সুখ্যাত ...ম্বন্তরের সময়ে তাই তাঁর কবিতাগুলি ...য়ে উঠেছিল এত বেশী আন্তরিক।

যাঁর কথা বলে এ প্রসঙ্গের শেষ টানব ...তিনি আমার সমবয়সী বন্ধু সুভাষ মুখো-...পাধ্যায়। অনেক আগেই হয়ত তাঁর প্রসঙ্গ ...তোলা উচিত ছিল, কেননা সুধীনবাবু বিষ্ণু-...বাবু ও বুদ্ধদেববাবুর পর তাঁরই সঙ্গে ...আমার প্রথম আলাপ হয়। আজ থেকে ...য় চার দশক আগে। চল্লিশ সালের কাছাকাছি বোধহয়। তখনই তিনি খ্যাতিমান কবি এবং ছাত্র আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট কর্মী। দু-দিন বর ধরে কবিতা বেরোচ্ছে 'কবিতা' পত্রিকাতে, 'পদাতিক' বইটিও বেরিয়ে গেছে। সুভাষ তখন বাংলা কবিতার যুবরাজ।

বুদ্ধদেববাবুও মনে পড়ছে বিষ্ণু-বাবুর চোরাবালি বইটির রিভিউ প্রসঙ্গে এই রকমই একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। বিষ্ণু-বাবুকে খোলা চিঠির আকারে লিখিত সেই রিভিউয়ে তিনি বোধহয় এইরকমভাবে বলে-ছিলেন, বেশ কিছুকাল আগে বাংলার তরুণতম কবি ছিলাম আমি, তারপর তরুণতম কবি হলেন আপনি, এবং সেই আসনেই থাকলেন, যতদিন না সুভাষ এসে আপনার জায়গা দখল করে নিল।

রাজনৈতিক পক্ষপাত সুভাষের কবিতায় অব্যর্থভাবে ঘোষিত হলেও, রচনার গুণে সেগুলো সকলের কাছেই প্রিয় হয়ে ওঠে। কোথাও কোন শিক্ষানবীশীর ছাপ নেই, কুড়ি বছর বয়স থেকেই তিনি সুপরিণত। ছন্দকে তিনি নিজের ইচ্ছেমত খেলাতে পারেন, বক্রোক্তির ব্যঞ্জনায় তিনি অনন্য। তাঁর মত এত ভাল রাজনৈতিক স্যাটায়ার আর কেউ লিখেছেন কিনা বলা শক্ত। জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে ও সমর সেনের প্রবল ব্যক্তিত্বের পাশেও ইমেজ ব্যবহারের মুন্সীয়ানায় তিনি বিশিষ্ট।

সময়টা ছিল তখন পরাধীন ভারতের এক তুঙ্গ মুহূর্তের প্রাক-সীমানায়। কিছু দিনের মধ্যেই শুরু হতে যাচ্ছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, ৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন এবং একটানা বিক্ষোভ। সুভাষের রাজনৈতিক মেজাজের কবিতা যে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল তার কারণ হয়ত তাই, কিছুটা অন্তত ছিল সেকালের সেই মানসিক প্রস্তুতির মধ্যেও। কিন্তু এর অন্য অসুবিধেও ছিল। প্রত্যাশা পূরণের পর সুভাষের কবিতা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য 'পিরিয়ড পীস'ও হয়ে থাকতে পারত। কিন্তু সুভাষ যে শুধু একজন সার্থক, অর্থাৎ সিগনিফিক্যান্ট কবিই নন, তিনি যে একজন সত্যিকারের বড় কবি, সে পরিচয় পাওয়া গেল দেশ স্বাধীন হবার পর ৫০-এর আগে-পিছের কতকগুলি নতুন মেজাজের নতুন ধরনের কবিতায়।

এক জীবনেই সুভাষ জন্মান্তর গ্রহণ করতে পারলেন। নিজেকে তিনি ভেঙে গড়লেন। মিছিলের মুখ, একটি কবিতার জন্যে, সুন্দর, ফুল ফুটুক না ফুটুক, সোলেমনের মা, আমি যত দূরেই যাই ইত্যাদি কবিতা চিরদিন মনে রাখার মত।

সুভাষের সঙ্গে লেখা মারফৎ পরিচয় ছিল প্রথম থেকেই, আলাপ হল পদাতিক বেরোনর পর। আমারও 'একচক্ষু' বইটি বেরিয়ে গেছে তখন। কী এক উপলক্ষে তিনি কলেজ স্ট্রীটে এসেছিলেন, সেখানে দেখা হবার পর তিনি আমাকে তাঁর বই উপহার দিলেন, আমিও দিলাম নিজের বই। বন্ধুত্ব জমে উঠতে দেরি হল না।

কিন্তু ছাত্র রাজনীতিতে তিনি ছিলেন তখন আকণ্ঠ নিমগ্ন। দেখা হত হঠাৎ-হঠাৎই। মনে হত যেন তিনি সব সময়েই আছেন স্রোতের মধ্যে, কোথাও যেন দাঁড়াবার সময় নেই। কিন্তু তাই বলে তিনি যে খুব কাঠকোট্টা ধরনের মানুষ, তা মনে করলে ভুল হবে। এখনকার মতই তখনও তিনি ছিলেন সরস প্রকৃতির বন্ধু। টিকা-টিপ্পনী ও উইটসম্বলিত মন্তব্যে ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ যাতায়াত।

সুভাষ বেশ খেয়ালী মানুষ। একটু অন্যমনস্ক প্রকৃতিরও। কথা বলতে বলতে অনেক সময় তিনি নতুন করে ভাবতে থাকেন। ফলে খেই হারিয়ে ফেলেন মাঝে মাঝে। আসল কথাটি যেন গুছিয়ে বলা হয় না। বক্তৃতা দেবার সময়ও ভেবে-ভেবে

থেমে-থেমে বলেন। স্মরণীয় উক্তি তাতে কমই থাকে।

অথচ তাঁর কবিতা এবং গদ্য রচনা একেবারে অন্য জাতের জিনিস। স্বচ্ছন্দ, মার্জিত এবং বুদ্ধিদীপ্ত এই সব রচনা যে একই মানুষের সৃষ্টি তা বোঝাই যায় না। সুভাষের ব্যক্তিত্বের ভেতরকার এই আপাত বৈপরীত্য আমার চিরকালের বিস্ময়। অথবা এমন কী সম্ভব, এই পরস্পর বিরোধী স্বভাবই তাঁকে বড় করেছে ?

আরও একটা মজার ব্যাপার। মাসের মধ্যে পনেরো দিন যিনি বাইরে থাকেন, সারা ভারতে যাঁর আমন্ত্রণের সংখ্যা অজস্র, বিদেশেও যাতায়াত করেন তিনি বছরে অন্তত দু-তিনবার করে, সেই রকম একজন সচল স্বভাবের মানুষ যে কী করে সুযোগ পেলেই ঘন্টার পর ঘন্টা এঁদো পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরার নেশায় স্ট্যাচু হয়ে বসে সেও এক দুজ্ঞেয় রহস্যই।

একালের বাঙালী কবিদের মধ্যে তিনিই বোধহয় গোটা বাংলাদেশের গ্রামজীবনের সঙ্গে বেশী পরিচিত। অথচ কবিতার বাঁধুনিতে এবং কাব্যরুচির পরিচ্ছন্নতায় তিনি পুরোপুরি নাগরিক। যখন তিনি বেশ কয়েক বছর ধরে বজবজের কাছে আধা-গ্রাম্য পরিবেশে বাস করেছেন, তখন তাঁর কবিতায় গ্রামীণ ইমেজ এসেছে কিন্তু গ্রাম্য আবেগ প্রশ্রয় পায় নি।

এমন কি আবেগের ব্যাপারটাও সুভাষের কবিতায় আসে খুবই রয়েসয়ে। ব্যক্তিগত আবেগের প্রেমের কবিতা তো প্রায় নেই বললেই চলে। সমর সেনও তাঁরই মত ব্যঙ্গ-নিপুণ সিরিয়াস স্বভাবের কবি, কিন্তু প্রথম দিকে অন্তত তিনিও কিছু বিষণ্ণ প্রেমের রোমান্টিক কবিতা লিখেছেন। সুভাষ সেভাবেও শুরু করেন নি। এবং পরিণত যৌবনে তিনি দু-একটি যাওবা লিখেছেন সেগুলো দেশপ্রেম না ব্যক্তিগত প্রেমের কবিতা তা জানার জন্যে কবিতা পাঠই যথেষ্ট নয়, কবির জীবনীপঞ্জীর বিষয়েও ওয়াকিবহাল হতে হয়।

ব্যক্তিগতভাবে সুভাষ খুবই বন্ধু-বৎসল এবং স্নেহপ্রবণ মানুষ। বাড়িতে তিনটি মেয়ে থাকা সত্ত্বেও সুভাষ এবং তাঁর স্ত্রী গীতার বেড়ালের সংখ্যা ১২, কুকুরের সংখ্যা ২ এবং শোনা যায় একটি ভাল্লুক ছানা সংগ্রহের জন্যেও তাঁরা প্রাণপণে চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

আমাদের কালে একটা বড় চেষ্টা ছিল, কবিতাকে গদ্যের কাছাকাছি আনা, এবং তা সত্ত্বেও কবিতার প্রাণধর্মকে টিকিয়ে রাখা।

চল্লিশের দশকেরই মাঝামাঝি থেকে যাঁরা কবিতার ক্ষেত্রে এসেছেন তাঁদেরও অনেকের চেষ্টা এদিকে অব্যাহত আছে।

যেমন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। অবিশ্যি নীরেন সুরেলা কবিতাও একদা লিখেছেন, এবং সেসব রচনাও মনে রাখবার মতো। কিন্তু হালে কয়েক বছর ধরে তাঁর কবিতা অলংকারের বাহুল্য বর্জন করে সুন্দর একটি ঋজু দীপ্তি অর্জন করেছে। তাঁর বলবার কথা চমৎকারভাবে গুছিয়ে বলতে পারেন নীরেন, বলার মধ্যেও থাকে খুবই অন্তরঙ্গ একটি সুর। এজন্যে নীরেন তাঁর সমসাময়িক কবিদের মধ্যে সব থেকে জনপ্রিয়। সেইসঙ্গে আরো একটি গুণ নীরেনকে বড় করে তুলেছে। সেটা হল মানুষের প্রতি ভালোবাসা। তাঁর এই মানবমুখিতা আগের কবিতাতেও ছিল, ইদানীং অভিজ্ঞতার আলোতে বিষণ্ণ গভীর এক নতুন চেহারা দেখা দিয়েছে। তাঁর বহুল আলোচিত কলকাতার যীশু নামে সেই বিখ্যাত কবিতাটিতেই শুধু নয়, আরো অনেক কবিতাতেই এগুণ পুরো মাত্রায় বজায় আছে।

নীরেনের ছন্দের হাতটি খুবই সুদক্ষ। ইদানীং মাঝে মাঝে পয়ারের মধ্যে পংক্তি থেকে পংক্তিতে বাক্যের গতি প্রবাহিত করে যেমনভাবে অন্ত্য-মিলের চমক আনেন তা খুবই তৃপ্তি-দায়ক হয়ে ওঠে।

নীরেনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে অনেক কাল আগেই। সেই যখন তিনি তাঁর বৈঠকখানার পুরনো বাড়িতে থাকতেন তখন থেকে। মনে পড়ে, একদিন বিকেলে তাঁর বাড়িতেও গিয়ে-ছিলাম। সেদিন তাঁর শিশুপুত্র কৃষ্ণরূপ (বয়স তখন বছর দেড়েক হবে)। শুধু মাত্র একটি জাঙ্গিয়া পরে বাড়ির ভেতর থেকে এসে আমাদের আড্ডায় যেমন রূপে দেখা দিয়েছিল তার সেই চেহারাটি স্পষ্ট মনে পড়ে এখনো।

অবিশ্যি নীরেনকে বন্ধু হিসেবে পেয়েছি আরো অনেক পরে। যখন তিনি সিঁথিতে ডেরা বাঁধলেন সেই সময়ে। সে চেনাশোনা এখন এতোই পাকা হয়ে বসে গেছে মনে যে ইদানীং দেখাশোনা কিঞ্চিৎ কমে গেলেও মনের টান একই রকমই থেকে গেছে।

মনে হচ্ছে সূচনার মত সমাপ্তিটাও টানতে হবে আকস্মিকভাবে। পুরনো দিনে যোগাযোগ ছিল যাঁদের সঙ্গে তাঁদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কথা আগে একবার বলেছি। অরুণ মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ এবং মঙ্গল ভট্টাচার্যের প্রসঙ্গ অকথিত থেকে গেল।

বলা হল না আরও কত কবির কথা। সুকান্ত ভট্টাচার্য বয়সে ছোট হলেও আমাদের কালেরই কবি। তাঁর সঙ্গে আলাপ ছিল অল্প, তাঁর প্রধান যোগাযোগ ছিল সুভাষের সঙ্গে। সুকান্তকে আমি ৪৬নং ধর্মতলায় দেখেছি, কথাও হয়েছে দু-চারবার। তাঁর গলার সুরে এবং মুখে চোখে এমন একটা ভাব ফুটত যাকে ইংরেজীতে সিন্সিয়ারিটি বললেও বাংলাতে আন্তরিকতা না বলে বলা উচিত ঐকান্তিকতা। একবার বোধহয় আকাল নামে দুর্ভিক্ষবিষয়ক কবিতা সংকলনের (সম্পাদক ছিলেন তিনিই) প্রসঙ্গ নিয়েও আলোচনা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার বিষয়ের আগে বার কয়েক বলেছি, পরেও বলার ইচ্ছে আছে। কিন্তু এভাবে নয়।

চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি আরও কত কবির মুখ—রাম বসু, অরুণকুমার সরকার, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শংখ ঘোষ, কৃষ্ণ ধর, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

ঐ তো ওখানে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, অমিতাভ দাশগুপ্ত, প্রণব মুখোপাধ্যায়। ঐ তো আমার আগে আগে চলেছেন ষাটের দশকের শান্তনু দাস, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, রত্নেশ্বর হাজরা, মৃণাল বসু-চৌধুরী। আরও আগে ঐ তো আমার থেকে কত দূরে এগিয়ে চলেছেন সত্তরের দশকের নতুন কবিরা। অন্তহীন যন্ত্রণা, অন্তহীন উত্তরণ। মুহূর্তগুলোকে মশালের মত জ্বালিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন কেউ দূরে, সরে আসছেন কাছে। মশালের অস্থির আলোয় চকিত দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে তাঁদের মুখ, মিলিয়ে যাচ্ছে আবার অন্ধকারে।

আছেন তবু তারা আছেন। যখনই তাঁদের কবিতা পড়ি, গায়ে এসে লাগে তাঁদের নিশ্বাস।

তাঁরা আছেন।

া প্রেক্ষাগৃহের উদ্বোধন করলেন ব এন সরকার মহাশয় শ্রীসুভাষ-এনে....এবং শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের চিত্রে তা উদ্বোধিত হলো.... সেই

ময়র মল্লিক মশাই শ্রীবীরেন সরকার র প্রায় ডান হাত ছিলেন বলা ঃ বুড়োদা ওঁদের চিত্র-পরিচালক ত্রার পাব্লিসিটি অফিসারের কাজ তখন প্রেক্ষাগৃহের ম্যানেজার মিঃ হাফেজী (যিনি পরে মেট্রোর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন) কাজেই ও মল্লিক মশাই-এর সূত্র ধরে প্রক্ষাগৃহ চিত্রাতেই আমাদের ছবি ব্যবস্থা করে ফেললাম।

লাম—শ্রীকান্ত ছবির পরই নাকি লেখা ও পরিচালনায় 'চাষার মেয়ে' বে....আমাদের ছবি তার পরই পাবে।

5 সময় পেয়ে মাথায় একটা বুদ্ধি াল।........তখনকার দিনের নির্বাক চিত্রে ছবির সঙ্গীত রেখে পিয়ানো য়ালিন বাজানোর রীতি ছিল। এটা খুবই ভাল লাগতো।

র বুকিং করে এসে আমি সুবোধ-লাম—'আমাদের ছবির পেছনে যদি ঙ্গীত রচনা করে দৃশ্যানুযায়ী । গঠন করে বাজাই, আপনার াগে ?'

আমার মুখের পানে অনেকক্ষণ কে বলেন—'স্পেলেনডিড!' আমার লটা শুধু সুবোধদা কেন সুধীর াই-এর এতই মনঃপূত হলো যে, ামায় প্রতিমুহূর্তে উৎসাহ দিতে

ারফিক ক্ল্যাবের পরিচয় আমি আগেই —আমি ওদের ক্ল্যাবে গিয়ে সব সামনে আমার এই নবতম পরি-ব্যক্ত করি। ওঁরা প্রায় লাফিয়ে যোগে আমায় সমর্থন জানালেন।

হালায় শ্রীযুত তারক দে (গীটার সাবেও ভারতে প্রথম ইনি গীটার শেখেন), শ্রীজগন্নাথ দে (ম্যাণ্ডোলা), শ্রীযুক্ত সুরেন পাল (ম্যাণ্ডোলিন), শ্রীযুক্ত প্রবল দে (ক্ল্যারিও-নেট) শ্রীমন্টি সেন (অরগ্যান), শ্রীধীরেন দাস (ট্রাম্পেট ও কর্ণেট), শ্রীশান্তি বসু (চেলো), শ্রীপঞ্চানন ঘড়াল (ডবলবেস) প্রভৃতিদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাঝে আমি ছবির গল্পাংশ অনুযায়ী আবহ-সংগীত রচনা করলাম—ভাগ করে....অর্থাৎ হাসি, কান্না, মান-অভিমান, প্রেম-সৌহার্দ—সুখ-দুঃখের প্রতিটি অনুভাবনায় সঙ্গীত রূপ গড়ে তার নোটেশন লিপিবদ্ধ করে রিহার্সাল বসিয়ে দিলাম। বাংলাদেশে তথা ভারতে এই সর্বপ্রথম আবহ সঙ্গীতের শুরুয়াৎ বলতে পারেন।

শ্রীমল্লিক ও বুড়োদার সাহচর্যে শ্রীযুক্ত বীরেন সরকার মহাশয়ের চিত্রা প্রেক্ষাগৃহের ওপরের বকসে আমাদের অর্কেস্টা পার্টির বসার স্থান নিরূপিত করলাম....দেরি কেবল মুক্তি-দিবসের অপেক্ষায়।

হাস চুপের মুক্তি-দিবসে (তারিখটা ভাই মনে পড়ছে না—কারণ ৪৭ বছর আগের কথা তো....তবে পুরাতন ফিল্ম-পত্রিকা বা 'রলীজ ডাইরিতেই তারিখ পাবেন) তবে ১৯৩০ সালের বোধকরি পূজোর পর। চিত্রা প্রেক্ষাগৃহে নির্বাক চিত্রে—এইরকম অর্কেস্ট্রা যোগে আবাহসঙ্গীত শুনে যেমন দর্শকবৃন্দ নির্বাক বিস্ময়ে সুর-লহরীতে অবগাহন করেছিলেন তেমনি করেছিলেন—ইণ্টার ন্যাশনালের অধিকর্তা শ্রীবীরেন সরকার মশাই ও তাঁর বিভিন্ন বিভাগের কর্মীরা।

অরফিক ক্ল্যাবের সভ্য সুহৃদবৃন্দ—যতদিন চিত্রায় ছবিখানি চলেছিল ততদিন, নিত্য দুটি করে শোতে তাঁদের এই সঙ্গীত পরিবেশন করে দর্শকমণ্ডলীর আনন্দবর্ধন করেছিলেন।....শুধু এক নতুনত্বের নেশায় বন্ধুপ্রীতির খাতিরে এঁরা এ অসাধ্য সাধন ঘটিয়েছিলেন....যার জন্যে এক পয়সা দক্ষিণা পর্যন্ত গ্রহণ করেন নি। তার জন্য আজও আমি অরফিক ক্ল্যাবের প্রতিটি সভ্যের কাছে ঋণী ও অনুগত।

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় এই আবহ-সঙ্গীতে এতই উদ্বুদ্ধ হয়ে-ছিলেন যে 'হাস্-চুপ' ছবির পর তাদের শ্রীচারু রায় পরিচালিত 'চোর-কাঁটা' নির্বাক ছবিতেও শ্রীযুত নাটাচাঁদ বড়ালের অধিনায়কত্বে—এই অরফিক ক্ল্যাবের সভ্যবৃন্দদের দিয়ে এই প্রথার পুনরাবৃত্তি করান। ....এবং এদের কয়েকজনকে পরে নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গীত বিভাগে নিযুক্ত করে নেন।

আমাদের ছবি রিলিজের দিন হওয়ার পরে, মেসার্স অরোরার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অনাদি বসুর কাছ থেকে একটি ভদ্রলোক আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত হন এবং অনাদি বসুর বাগবাজারের বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানান। আমি সে নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য করে সদাহাস্যময় মিষ্টভাষী অনাদি বসুর সঙ্গে দেখা করি। তাঁর ছবির ডিস্ট্রিবিউশন সর্তাবলী শুনে—আমার অংশীদারের মতা-মতের খবর দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলাম।

বাড়ি ফিরে দেখি কোট্‌প্যান্টধারী একটি গুজরাটি যুবক আমার প্রত্যাবর্তনের পথ চেয়ে প্রমোদের সামনে বসে আছেন। ভদ্রলোকের নাম মিঃ 'পারেখ'। তিনি মেসার্স মানসাটা ডিস্ট্রিবিউটার-এর প্রতি-নিধি। আমার ছবিখানি ডিস্ট্রিবিউশন সর্ত জানবার অপেক্ষায় বসে আছেন।

বাংলা দেশে ভীমজিভাই মানসাটা তখন ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবসার এক নবীন যাত্রী। মাত্র দু-তিন খানি চিত্রের পর আমাদের ছবি নেবার তাঁর অভিপ্রায়। চিৎপুরে ঠাকুরবাড়ির নিকটে তাঁর বাস-স্থান ও অফিস অর্থাৎ গদি। আজকের জ্যোতি-সিনেমার মালিক হমুনাভাই, ভীমজি ভাই-এর কৃতী সন্তান। ওখানেই আমাকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে মিঃ পারেখ বিদায় নিলেন।

ভীমজিভাই-এর সর্ত আমরা অনু-মোদন করলাম—তবে চিত্রায় রিলীজ আমদানী বাদ রেখে।

এদিকে এইচ-এম-ভির রেকর্ডিং-এর রিহার্সাল পুরোদমে চলেছে....ত্রিতলের ডানদিকের ঘরখানি খালি দেখে সেখানে হারমোনিয়ম নিয়ে নিরালায় বসে সুরের সঙ্গে লিখতে শুরু করি—'ঢং করে তুই নাচিস নে মা কালী, তোর রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে—আবার নয়ন বারি ঢালি'........ কমলদার শ্যামাসঙ্গীত। এমন সময় হঠাৎ ধীরেন এসে ঘরে ঢোকে, সঙ্গে তার এক ভদ্রলোক। ভদ্রলোক সুপুরুষ। পরিচয় করিয়ে দিলে বীরেন—বললে, 'এঁর নাম জয়নারায়ণ মুখুজ্যে—আমাদের থিয়েটারের উঠতি অভিনেতা এবং ম্যাডান কোম্পানীর সবাক ফিল্মের আপাতত হিরো।' ভদ্র-লোক আমায় বলেন—শুনলাম আপনি সুগায়ক—সুলেখক এবং সুরকার। তাই,

এমন সময় কাজীদা ঘরে ঢুকলেন—আরও গুণ আছে ওর—হার্মাফিল্ উনিও নির্বাক চিত্রের হিরো।

জয়নারাণ বলেন—কাজীদা— আপনি কখন এলেন ?

কাজীদা বলেন—কেন— তোমাদের সামনেই তো এলাম।

জয়নারায়ণ বলেন—একা বিপদে পড়ে এসেছিলাম ধীরেনের কাছে—ধীরেন রাজী হচ্ছে না—বলছে এ সময় গ্রামোফোন রিহের্সাল কামাই করলে ওর চাকরী চলে যাবে। তাই আমাকে হীরেনবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছিল—এমন সময় আপনি ঢুকে হীরেনবাবুর সম্বন্ধে আরও একটা সুখবর শোনালেন। এখন হয়েছে কি, আমাকে একটি চার রীলার বইএ হিরোর পার্ট করতে হচ্ছে—ওপোজিটে শ্রীমতি কানন। বইটি হচ্ছে টকীতে—'জোরবরাত নাটকের গল্প'। এখন তাতে হিরোকে একটি গান গাইতে হবে—অথচ আমি গাইতে জানি না। তাই এসেছিলাম একটি গাইয়ের অনুসন্ধানে, যিনি আমার হয়ে গানটি গেয়ে দেবেন। ওরা ঠিক করেছেন অরগ্যান বাজিয়ে আমি গাইব—ব্যাকসটে আমি যেন গাইছি—অথচ গাইয়ে গানখানি মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে নেপথ্যে গাইবেন। তাই এসেছিলাম ধীরেনের কাছে। ও বলছে........

কাজীদা কথা কেটে বলে ওঠেন—'ও যা বলছে—আমিও তাই বলছি—হীরেনকে নিয়ে যাও....ওই ঠিক এ সব ম্যানেজ করতে পারবে, কারণ ও ছবিও বোঝে—রেকর্ডিংও বোঝে।

আমার তখন মনে হচ্ছে,—যা হবার হোক—ভদ্রলোকের সঙ্গে গিয়ে একবার টকীর ব্যাপারটা তো বুঝে আসি। কেঁড়েলি না করে এক কথাতেই রাজী হয়ে বললাম—ও'রা যখন বলছেন—তখন যেতেই হবে—কবে বলুন?
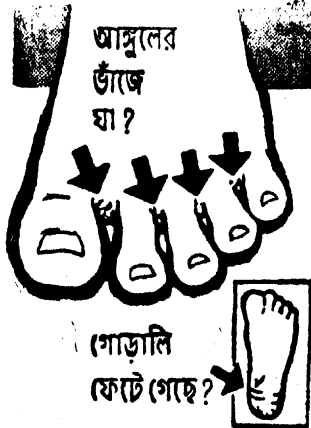
জয়নারায়ণ বসু বলেন—কবে মা—এখনি যেতে হবে—উঠে পড়ুন। শ্যামা সঙ্গীতের কাগজখানা পকেটে ফেলে উঠে দাঁড়ালাম।

নীচে নেমে এসে দেখলাম গাড়ী দাঁড়িয়ে—জয়নারায়ণ বসু বলেন—উঠুন।

গাড়ীতে একটি মহিলা বসেছিলেন—তাঁকে সরে বসতে বলে আমায় উঠিয়ে নিয়ে পাশে বসলেন। গাড়ী চলতে শুরু করে। জয়নারায়ণ বসু বলেন—দেখো ভাই হীরেন ওসব বাবুটাবু ছেড়ে দিয়ে নাম ধরেই ডাকাডাকি করি—ওতে দুপক্ষেরই সুবিধে—এই মহিলাটি হচ্ছে আমাদের ছবির হিরোইন কানন—আর কানন! এ হচ্ছে তোমার অরিজিনাল হিরোর গাইয়ে সংস্করণ।

তিনজনেই হেসে উঠি। ....গাড়ী মিনার্ভা থিয়েটারের সামনে দিয়ে চলেছে.... পাশ দিয়ে জোড়া মড়া ডাকতুলে চলে গেল। জয়নারায়ণ হেসে বলে—এইরে—যে শুভক্ষণের মাঝে তোমাদের পরিচয় হলো—অরিজিনাল ছেড়ে তোমার না গাইয়ে সংস্করণকে বেশী পছন্দ হয়ে যায়।

কানন—আবার হেসে ওঠে।

টালিগঞ্জে স্টুডিওতে ঢুকে জয়নারায়ণ আমায় আবার জোড়া জ্যোতিষবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো। ডিরেক্টর জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় তস্য এডিটার জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়। মুখোপাধ্যায় মশাই আমার পূর্ব জানিত। বলতে ভুলেছি আমি মাঝে মাঝে শখের যাত্রায় অভিনয় করতাম—সেই সূত্রে মুখুজ্যে মশাই এর সঙ্গে জয়নগরে 'সীতা নাটকে একই সঙ্গে যাত্রাভিনয় করেছিলাম। মুখুজ্যে বলেন—হীরেনকে ধরে এনেছিস—খুব ভাল করেছিস, ওর গলা অপূর্ব। বন্দোপাধ্যায় মশাই বলেন—তাহলে জ্যোতিষ, তুমি হীরেনকে বুঝিয়ে দাও—জয়নারায়ণের হয়ে কিভাবে কি করতে হবে।'

মুখুজ্যে-জ্যোতিষকে বললাম— জয়নারায়ণ সবই বলেছে কাজেই চলো রিহার্সাল ঘরে বসে—জয়নারায়ণকে গানখানি শুনিয়ে দুচারবার রিহার্সাল করে নি।

জয়নারায়ণ আমায় ম্যাডাম কোম্পানীর পেছনের বাড়ীর দোতলায় একটি সোফা-সজ্জিত ঘরে নিয়ে বসালো এবং সেখানেই হারমোনিয়মের সঙ্গে রিহার্সাল দেবার চেষ্টা করতে শুরু করলো। কিন্তু ও হরি—ও যে গানের 'গ'-ও জানে না—কি করি? একটু ভেবে বললাম—আচ্ছা জয়নারায়ণবাবু পদ্য বলতে পারবেন তো—তবে আমি স্ক্যান-শ্যানিং করে পদ্য ছড়ার মত করে বলি—আপনি আমার সঙ্গে সঙ্গে বলুন।

জয়নারায়ণ বলে—আবার 'আপনি-আপনি'—যাক কিভাবে স্ক্যানশানে পদ্য বলাতে চাও—।

আমি বার বার ছড়ার ছন্দে একটি দাঁড়ানো সুরে গানখানিকে আবৃত্তি করতে থাকি—জয়নারায়ণ হুবহু আমায় নকল করে চলতে থাকে। এইভাবে সামনাসামনি যখন দুজনে একসঙ্গে ছড়াগানের রিসাই চলেছে আমি লক্ষ্য করলাম দুজনের ঠোঁ ওঠানামা একইভাবে সংগঠিত হচ্ছে—মগজের দরজাখানা হঠাৎ খুলে গে গানের ছড়া জয়নারায়ণকে একেবারে কবিয়ে নিয়ে—নীচে নেমে এলাম। জয়না মেক-আপে গেল। নীচে নেমে জো মুখুজ্যেকে বললাম—হয়ে গেছে, এ তুমি আমায় টকী সুটিং দেখাও। ও হয়ে আমায় স্টুডিওতে নিয়ে গেল। চার বড় বড় লাইট জ্বলছে— শিল্প রিহার্সাল চলেছে.... বলার ভঙ্গী শেখ পর—শিল্পীদের বক্তব্য শুনে স ইঞ্জিনিয়ার ওকে বলছে—ক্যামেরার নির্বাক চিত্রের মত স্লেটে নম্বর নম্বরের ছবি তুলে তারপর শট্ হবার আগে দুটি কাটে সংযোগ করে করে একটা আওয়াজ করে সরে যাচ্ছে তখন শিল্পীরা তাদের অভিনয়াংশ অ করছে।

সাট হয়ে যেতে ছোট জ্যোতি জিজ্ঞেস করলাম—কাঠের আওয়াজ বে বললো—ওটার নাম ক্ল্যাপস্টিক। করে সাউন্ড ফিল্ম আর পিকচার যি শুরুয়াৎ ঠিক করা হয়।

দুটো তিনটে সাট টেকিং দেখে নিলাম—কাঠ দুখানিকে কব্জা দিয়ে —ফাঁক করে হঠাৎ একসঙ্গে জোড় বলে 'ফট' করে আওয়াজ হচ্ছে। ছবিতে যখন কাঠ দুটি জুড়ে যাচ্ছে তখনই আওয়াজটা ফুটে বেরুচ্ছে। ক ছবি ও শব্দের নেগেটিভের শু সংযোগটা কোথায় হচ্ছে বুঝে ফেল

ইতিমধ্যে জয়নারায়ণ মেক-আপ স্টুডিওতে এলো। জ্যোতিষবাবু বলে মারকনি সাহেব এর হিরোর গানে নিন। —মারকনি সাহেব লাইটিংএ হয়ে পড়লেন। মিঃ মারকনি ছিলেন লিয়ন ক্যামেরায় যেমন পটু তেমনি গাটার বাদ্যে।

ইতিমধ্যে ছোট জ্যোতিষ আ একটি মাইকের সামনে দাঁড় করিয়ে শুরু করতে বললেন—দুলাইন গা পরই আর সি এর সাউন্ড, ইঞ্জি সি আরমার্ড বললেন—ও-কে, ও দাঁড়িয়েই গাইবেন।

আমি তখন ছোট জ্যোতিষকে বলি—দেখো ভাই তোমরা হিরোর শট্ নিচ্ছ নাও—তবে আমার জন্যে হিরোর সামনের মিড্ শট—এবং শটও নেবে। কারণ আমি যখন স্ক্যানশান শিখাচ্ছিলাম তখন দেখেছি আমার ঠোটের ওঠা-নামার সঙ্গে ওর ঠোঁ ওঠানামা একবারে হুবহু মিলে য কাজেই গান তুমি ছবির মুখে নিতে পারবে। ও বলে, কিন্তু ক্ল্যাপ পড়ার পর স্টার্টিং কোনখানতে হ স্টার্টিং পয়েন্ট এক না হলে —ছবিতে গানেতে মিলবে না।

আমি একটু ভেবে নিয়ে বলি—ধর
ক্ল্যাপ দিয়ে চলে যাবার ১ মুহূর্ত পরে
মি ১-২-৩ চেঁচিয়ে গুনে ৪ থেকে গান
র ও ধরাই—তুমি মিলিয়ে নিতে
রবে না?

ও বলে তাহলে তো অনায়াসেই
রবো।

আমি বলি—দেখা যাক না মেলে
না—না মিললে ব্যাক শট তো আছেই।...

সেইভাবেই ছবি তোলা হোলো—এবং
নারায়ণবাবুর মিড-শট, ক্লোজ শটের
পমুভমেন্ট আমার গানের সঙ্গে হুবহু
ক হয়েই ক্যামেরায় প্রকাশিত হয়েছিল
াই ১৯৩১ খৃীঃ ২৭ জুন 'জোর বরাতের'
ুক্তির সঙ্গেই প্লেব্যাক পদ্ধতির প্রথম
ৃষ্টি হয়—যদিও সেটি ডাইরেক্ট সিস্-
টমে—যন্ত্রচালিত লাউড স্পীকারের গাওয়া
ানের সঙ্গে ঠোঁট নাড়া পদ্ধতিতে নয়।
—বা আবার আমরাই সৃষ্ট ১৯৩৫-এর
ব্রুয়ারিতে সাগর মুভিটনে। ....সেকথা
রে আসছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে এখানে কয়েকটি
থার উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ছে...
.৯৭৩ দেশ পত্রিকার বিনোদন সংখ্যায়—
ঙ্কজবাবু বলেছেন (এমন কি বরাবর
ীতিনবাবুও বলে আসছেন) যে ভাগ্যচক্র
ত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশে তথা ভারতে
্লে-ব্যাক পদ্ধতি চালু হয়েছিল। অথচ
বীণ নট জয়নারায়ণবাবু নবকল্লোল
ত্রিকার ১৩৮১ ফাল্গুন সংখ্যায় লিখছেন
—'ওই সময় টকী এলো কলকাতায়।
ার বরাত বলে একটি ৪।৫ রীলের ছবিতে
ামি নায়ক করি। কাননদেবী ছিলেন
ামার বিপক্ষে। বন্ধু হীরেন (অর্থাৎ চিত্র-
রিচালক হীরেন বসু) আমার হয়ে এই
ই ছবিতে গান গেয়েছিলেন। বোধহয়
ারতবর্ষে ওইটাই প্রথম প্লে-ব্যাক।'
ৃঃ ৯৪৫)

সঙ্গীত পত্রিকা সুরছন্দা দেশের
নোদন সংখ্যায় পঙ্কজবাবুকে প্রতিবাদ
নিয়ে লিখেছিলেন (ফাল্গুন ১৩৮২,
ব্রুয়ারী ৭৬ বর্ষ, ২২ সংখ্যা-২, ১৬
ঃ)।

'পর্দায় দৃশ্যমান অভিনেতার অভি-
ীর গান নেপথ্য থেকে অন্য শিল্পীর
ওয়াকে যদি প্লে-ব্যাক বলা হয় তাহলে
া যাচ্ছে—সে পদ্ধতির প্রথম প্রবর্তক
াবে কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন
রেনবাবু, আর অন্য কেউ নন। কাজেই
ঙ্কজবাবুকে বা 'ভাগ্যচক্র' চিত্রের পরি-
লক নীতিন বসু কিংবা সেই
ত্রের সঙ্গীত পরিচালক রাই-
াদ বড়াল কাউকেই প্লে-ব্যাকের
থকৃৎ রূপে স্বীকার করা যাচ্ছে না
ন দুঃখিত। পঙ্কজবাবু বর্ণিত ভাগ্যচক্র
ক্তি লাভ করেছিল ৩রা অক্টোবর
৩৫ খৃীঃ—আর জোর বরাত-এর মুক্তি
৷ ২৭ জুন, ১৯৩১ খৃীঃ। ....আগেই

বলেছি ভাগ্যচক্র (নিউ থিয়েটারের ছবি)
মুক্তিলাভ করেছিল ৩ অকটোবর ১৯৩৫—
ঐ বছরের মার্চ মাসে বোম্বের মেহবুব
পরিচালিত হিন্দী ছবি 'মনমোহন' রিলিজ
হয়েছিল। এই ছবিতে নায়কের গানটি
(১ম গান) সে সময় বিশেষ জনপ্রিয়তা
অর্জন করেছিল—সেই 'তুমহিনে মুঝকো
প্রেম শিখায়া' গানটি প্লে-ব্যাকে গৃহীত
হয়েছিল। প্লে-ব্যাকে গেয়েছিলেন সুরেন্দ্র
নায়ক।....সুরেন্দ্র একথা কয়েকবারই
ঘোষণা করেছেন বিবিধ ভারতী মারফৎ।
বোম্বেতেও প্রথম প্লে-ব্যাকের কৃতিত্বের
জন্য পরিচালক মেহবুব উল্লসিত হয়ে
হীরেন বসুকে যে প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন
তার সারাংশ দেখুন:

"I know Mr Hiren Bose, Director and Music Director since 1935, when I was working in Sagar Movietone as a Director. He is the first man to introduce play back system in Bombay with it all devices..... Sri Anil Biswas was his pupil and assistant......"

Sd/- M. R. Khan
(Mehboob Khan)

প্রসঙ্গত কয়েক সাল বেশ এগিয়ে নিয়ে
এসেছি— আপনাদের ফের ফিরিয়ে নিয়ে
যাচ্ছি আবার—১৯৩০ সালেই।
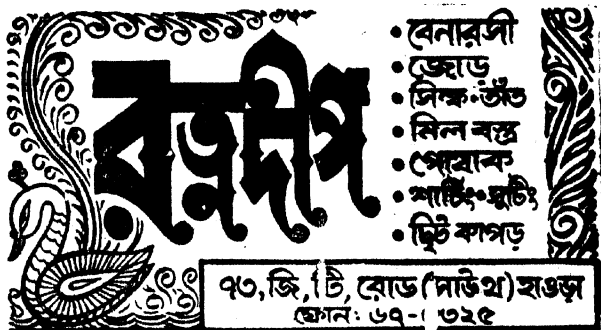
জোর বরাত ছবির প্লে-ব্যাকে আমার
কণ্ঠ শুনে জ্যোতিষ বন্দোপাধ্যায়মশাই
আমার প্রতি এমনি আকৃষ্ট হলেন যে
সারা ছবির সঙ্গীত পরিচালনার ভার আমার
উপর ন্যস্ত করেন এবং ওঁর এ ছবির
প্রস্তাবনা দৃশ্যের জন্যে একটি গান শিখিয়ে
মিস শেফালিকাকে দিয়ে গাইয়ে নিলেন।
দৃশ্যের পরিকল্পনাও করিয়ে নিলেন আমায়
দিয়েই। ইংরাজী চিত্রকরের বিখ্যাত 'হোপ'
ছবির অনুরূপ রূপসজ্জায় আমি মিস
শেফালিকাকে একটি উজ্জ্বল গোলকের ওপর
বসিয়ে চোখ বেঁধে—একটি হার্পের মত
যন্ত্র হাতে দিয়ে এই গানখানিকে গাইয়ে-
ছিলাম। বোঝানোর চেষ্টা হয়েছিল যে
লাভ ইজ ব্লাইন্ড। গানখানি ছিল—'আজ
চক্রী করে ঘোরে চক্র'! এ দৃশ্যটি এতই
মনোরম হয় যে জোড়া জ্যোতিষবাবু
দুজনেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় আমার

কল্পনাকে অভিনন্দিত করেন এবং জ্যোতিষ
বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই অনুরোধ করেন ওঁর
পরের সবাক চিত্রে হিরোর ভূমিকায়
অভিনয় করতে। এডিটার জ্যোতিষ আমাকে
দিয়ে জোরবরাতেই আরও তিনখানি গান
গাইয়ে নেন—এক ভিখারির রূপসজ্জায়।
মঞ্চে কলিকাতা সেন্ট্রাল ক্যাবের মন্ত্র-
শক্তি অভিনয়ে অনুরূপ রূপসজ্জায় আমি
একখানি গান করেছিলাম। ২০ নভেম্বর
১৯৩০ সালের দীপালি পত্রিকায় যার সমা-
লোচনা বেরিয়েছিল। লিখেছিল—'মাত্র
একবার অবতীর্ণ হইয়া অপরূপ রূপসজ্জায়
একখানি মাত্র গানে ভিক্ষুক রূপে শ্রীমান
হীরেন্দ্রকুমার বসু দর্শকগণের চিত্ত হরণ
করিয়া লইয়াছেন।' এ অভিনয় ছোট
জ্যোতিষও দেখেছিলো তাই আমার এ জোর-
বরাতে সেই বেশেই নামিয়েছিলেন।

বড়ুয়া তাঁর অপরাধ ছবির পরই টকী
শুরু করবেন। (এইখানেই বলে রাখি যে
অপরাধ ছবির কাজের মাঝামাঝি ওদের
সতীর্থ দেবকী বোস এসে অপরাধ ছবির
পরিচালনার ভার নিয়ে—মিঃ বড়ুয়াকে
খানিকটা কর্মের চাপ থেকে মুক্তি দিয়ে-
ছিলেন। কাজেই মিঃ বড়ুয়াই ছবির
রিলিজে মিঃ দেবকীকুমারকেই এ ছবির
পরিচালক হিসাবে ঘোষণা করেন)।

অপর দিকে কানে আসছে শ্রীবীরেন
সরকার মশাই চোরঙ্গকাটার পরই বিরাট
স্টুডিও গড়ে তুলেছেন টালিগঞ্জে—তার
কনস্ট্রাকশন চলেছে। আপনারা বোধহয়
জানেন না মিঃ বি এন সরকার ওরফে
সাহেব—সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে
প্রথম শুরু করেন বিরাট কনস্ট্রাকশন
কোম্পানী। সে কোম্পানীতে মিঃ হাফেজীও
কাজ করেছিলেন। কাজেই স্টুডিও কন-
স্ট্রাকশানের ভার মিঃ হাফেজীর ওপরই
ন্যস্ত ছিল। ওঁরা রিকো নামে একটি টকি
মেশিনও আনিয়ে ফেলেছেন এবং শ্রীনীতিন
বসুর ভাই শ্রীমুকুল বসুকে রেকর্ডিং
ইঞ্জিনীয়ার নেবার সাব্যস্ত করেছেন।
সংস্থারও নামকরণ হয়েছে (হাতী মার্কা)
নিউ থিয়েটার্স।

(চলবে)

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর অভাব বোধ করছিলাম....

আমীর খাঁ সাহেবের ছায়া মনের কোণে থাকলেও কোমল রেখাবের ওপর বেশী জোর দিয়ে নিজের ছাঁচে ফেলে

মারবা বাজিয়েছিলেন।......

মল্লিকার্জুনের রাগের রূপ সাধারণের থেকে আলাদা কিন্তু একটি বড় ঘরানার ধারাবাহক হিসাবে তাতে কোন খাদ নেই।....

....ভাতখণ্ডের যুগের সকলের থেকে আলাদা হয়েও খুব বড় দরের শিল্পী....

বিসমিল্লা....খুব মিষ্টি করে ধুন বাজালেন যাতে কখনো কখনো পুরোন বিসমিল্লার কথা মনে পড়ছিল।....

পিতৃস্মৃতি ঃ সঙ্গীত ও সুরের তর্পণ

প্রতি বছরে আমজাদ আলী খান নিজের বাবার স্মৃতিতে একটি অনুষ্ঠান করে থাকেন। কখনো কলকাতা, কখনো বম্বে, কখনো দিল্লি। যে শহরেই করেন, সেখানেই বেশ আলোড়নের সৃষ্টি হয়। কারণ, এতো বড় বিরাট খরচের অনুষ্ঠান আমাদের দেশে বড় একটা হয় না। এই ব্যাপারে আমজাদ আলীকে বাহবা দিতেই হবে। কারণ, সামর্থ্য ও সংগঠন ছাড়াও এখানে আরো একটা ব্যাপার আছে—পিতৃভক্তি। পিতার প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা হয়তো সকলেরই থাকে কিন্তু তাকে এতটা বাস্তব রূপ দিতে, একটা বড় সংগীতানুষ্ঠান করতে যে কি বিপুল পরিশ্রম প্রয়োজন এবং এই ধরনের পরিশ্রম রেওয়াজে পরিশ্রান্ত একটি মার্গ যন্ত্রীর পক্ষে যে কী কষ্টকর এটা একমাত্র আরেকজন মার্গ যন্ত্রীই বুঝতে পারবেন।

ওস্তাদ হাফিজ আলী খান মেমোরিয়াল ফেস্টিভ্যালের তরফ থেকে স্বর্গত ওস্তাদ কেরামতুল্লা খান ও কানাই দত্তের পরিবারকে পাঁচ হাজার টাকা করে দেওয়ার ব্যাপারেও তরুণ শিল্পী আমজাদ আলী বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখেন।

রাইচাঁদ বড়াল ও রাধিকামোহন মৈত্র এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। স্বর্গত হাফিজ আলী খাঁর জীবনকালে এঁরা তাঁর গুণগ্রাহী ছিলেন। আসরের এই পর্যায়ে আমরা গৌরীপুরের স্বর্গত বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের অভাব বোধ করছিলাম। খাঁ সাহেবের প্রতি তাঁর ছিল ছেলেমানুষের মত সরল ভালবাসা।

আমজাদ আলীর সরোদ দিয়েই এক সপ্তাহব্যাপী সংগীত অনুষ্ঠানের শুরু হয়। ইনি প্রথমে বাজালেন রাগ 'মারবা'। আমীর খাঁ সাহেবের ছায়া মনের কোণে থাকলেও, কোমল রেখাবের ওপর বেশি জোর দিয়ে নিজের ছাঁচে ফেলে মারবা বাজিয়েছিলেন। আলাপ, জোড় ও ঝালা অত্যন্ত উচ্চ মানের হয়েছিল, সরোদের টেকনিকের দিক দিয়ে। মারবার গত শ্যামাপ্রসাদের অতি সাধারণ তবলা সংগতের সঙ্গে আলাপের তুলনায় গত খুব সাধারণ হয়েছিল। পরে বসন্ত, দরবারী কানাড়া ও সাহানায় আমজাদ আলী প্রমাণ করে দেন যে, তিনি শুধু তাঁর পিতার ধারাবাহকই নন, তাঁর পিতার বাজনার আয়তনও বৃদ্ধি করেছেন কণ্ঠসংগীতের ধারা অনুসরণ করে, অথচ হাতের মিষ্টত্ব বজায় রেখে।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম শিল্পী ছিলেন মল্লিকার্জুন মনসুর। এঁকে সাধারণ শ্রোতাদের থেকে সংগীত শিল্পীরাই বেশি শুনতে ভালবাসেন। মল্লিকার্জুনের রাগের রূপ সাধারণের থেকে আলাদা কিন্তু একটি বড় ঘরানার ধারাবাহক হিসাবে তাতে কোন খাদ নেই। আমার মনে আছে একবার তিনি ইমানের খেয়ালে সম কড়ি মাধ্যমে দিয়ে আমাদের খুব চিন্তায় ফেলেছিলেন। আর একবার পূর্বা গাইবার সময় কোমল নিখাদ দিয়ে এমন একটি সুরের বার বার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন, যা শুনলে হঠাৎ সকালের রামকেলী মনে হয়। পুরোন অনেক ধ্রুপদ গান ঘেঁটে তবেই আমি বুঝতে পারলাম যে, সেনী ঘরের গোয়ালিয়র শাখায় এই ধরনের রামকেলী অঙ্গ প্রয়োগ করা হয় পূর্বাতে।

ভারতীয় সংগীতে রাগের রূপ এক রকম হয় না। কিছু প্রচলিত চলন ছাড়া একজনের মতে আর একজন ভুল। যে রকম রামপুরে অবস্থিত সেনী ঘরের কয়েকজন বিখ্যাত ধ্রুপদিয়ার ধ্রুপদ গানে মেঘের চার-পাঁচটি রূপ পাওয়া যায়। কোনটিতে কোমল গান্ধার আছে যা আগ্রা ঘরানা মেনে নিয়েছে। কোনটিতে কোমল গান্ধার নেই, যা আমীর খাঁ সাহেব মানতেন। কোনটিতে শুদ্ধ ধৈবত আছে যা সেতারবাদক নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় মানেন। এমনকি আলাউদ্দিন খাঁর হাতে লেখা খাতায় মেঘ রাগের অন্তরায় শুদ্ধ নিখাদেরও স্পর্শ আছে। যে সংগীতে রাগরূপ নিয়ে এত মতভেদ আছে, সেখানে শিল্পী উঁচু দরের কিনা সেটা একটা ব্যাপারেই বুঝতে হবে—প্রথম থেকে শেষ অবধি তাঁর গানে বা বাজনায় রাগের একই রূপ থাকছে কিনা। এক কথায় কোন রাগে যদি কোমল রেখার শতকরা দশ ভাগ ব্যবহার করা হয়, তাহলে আলাপ, তান, ঝালা সবেতেই শতকরা দশ ভাগ লাগাতে হবে। এই কারণেই মল্লিকার্জুন, ভাতখণ্ডের যুগের সকলের থেকে আলাদা হয়েও খুব বড় দরের শিল্পী। এই প্রমাণ তিনি রাখেন সেদিনকার তাঁর গাওয়া শাওনী নট, নট কামোদ, নট বেহাগ ও মালবীতে।

দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় শিল্পী

এস বালচন্দ্র অপূর্ব বীণা বাজিয়ে কলকাতার সঙ্গীত রসিকদের মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন।....প্রমাণ করে দিয়েছিলেন সঙ্গীত একটি আন্তর্জাতিক ভাষা।........

বিরজু মহারাজের নৃত্য সেদিন ভাল হলেও তার মধ্যে কোন নতুনত্ব ছিল না।....

আলি আকবর খান হলেন জাতশিল্পী। উনি যখন দরবারী কানাড়া বাজালেন, তখন মনে হচ্ছিল কবিতা।....

ভীমসেনের বড় গুণ ওঁর সৌন্দর্য বোধ।

কুমার গন্ধর্বের গানও ভাবপ্রধান, কিন্তু তা রোমান্টিক নয়, আধ্যাত্মিক।... ....

রবিশংকর....ভাল বাজানো সত্ত্বেও; শ্রোতাদের মনে কোন রেখাপাত করতে পারেন নি।....

ছিলেন বিসমিল্লা খান। এঁর এত ভালো বাজনা শুনেছি যে সেদিন বাজনা শুনে মন খারাপ হয়ে গেল। একই সুরের পুনরাবৃত্তি শুনে মনে হল বয়সের চাপে তাঁর কল্পনা শক্তি কমে আসছে। এই কারণেই বোধ হয় বিশ্রামের জন্য তবলা-বাদককে এত বেশী বাজাতে দিচ্ছিলেন। তিনি প্রথমে বাজালেন হংসনারায়ণী যার পূর্বাঙ্গ পুরিয়া ধানেশ্রীর মত হলেও উত্তরাঙ্গে 'প' 'ন' 'স' ব্যবহার হয়। পরে খুব মিষ্টি করে ধুন বাজালেন যাতে কখনো কখনো পুরোন বিসমিল্লার কথা মনে পড়ছিল।

তৃতীয় দিনে দক্ষিণ ভারতের এস বালচন্দ্র অপূর্ব বীণা বাজিয়ে কলকাতার সংগীত রসিকদের মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। শ্রোতারা কিছুটা আশ্চর্যও হয়েছিলেন কারণ তাঁরা কখনো দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত মন দিয়ে শোনেন না—ভাবেন এই ধরনের সংগীত বোধ হয় আমরা বুঝতে পারবো না, বোধ হয় ভাল লাগবে না। কিন্তু যেরকম সোনার কদর সব জায়গায় সমান ভাল সংগীতের কদরও সর্বত্র সমান। এস বালচন্দ্র শ্রোতাদের হৃদয় জয় করে সেদিন আবার প্রমাণ করে দিলেন যে সংগীত একটা আন্তর্জাতিক ভাষা। তাতে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম বলে কিছু নেই। আসল হল হৃদয়, সেই হৃদয় স্পর্শ করলে সব সংগীতকেই নিজের ভাষা মনে হয়। তিনি বাজিয়েছিলেন রাগ ঋষভপ্রিয়া যার পূর্বাঙ্গ ইমনের মতো ও উত্তরাঙ্গ দরবারী কানাড়ার মতন।

আর একটা বিশেষ জিনিস তাঁর বাজনায় লক্ষ্য করলাম—তার মডার্ন অ্যাপ্রোচ, বীণের আওয়াজকে আরো সুন্দর করবার জন্য নানা রকম কলকব্জা তাঁর যন্ত্রে লাগিয়েছেন। এক কথায় তিনি দুই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জিনিসের মিশ্রণ— পাশ্চাত্য সাউন্ড টেকনিকের অগ্রগতি ও নিজের দেশের সংগীতের পুরোন গোঁড়া রাগ রূপ উভয়ের সম্বন্ধেই সমান সচেতন। এম এস গোপালকৃষ্ণর বেহালা সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। আমরা সংগীতের ভাবের দিক নিয়ে এত ব্যস্ত যে একমাত্র দু-একজন ছাড়া উত্তর ভারতের কোনো শিল্পীই এসব নিয়ে চিন্তা করেন নি।

বিরজু মহারাজের নৃত্য সেদিন ভালো হলেও তার মধ্যে কোন নতুনত্ব ছিল না। প্রতি বছর যা করেন তাই করলেন। 'লয়'-এর ব্যাপারে ওর তুলনা নেই আর পারফেকশন সে তো থাকবেই, প্রতি বছর যদি এক জিনিস দেখান। বরং যেটা সত্যি সেদিন দুর্দান্ত হয়েছিল সেটা হোল কিষণ মহারাজের অপূর্ব তবলা সঙ্গত। এরকম বাজনা ভারতের এই শ্রেষ্ঠ লয়দার তবলিয়া নিজেও কয়েক বছরের মধ্যে বাজিয়েছেন কিনা সন্দেহ।

তৃতীয় দিন আমিনুদ্দিন ডাগরের ইমন-এ আলাপ ও ধ্রুপদের পর আলি-আকবর খান তাঁর অপূর্ব সরোদ বাদনে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। আলি আকবর খান হলেন জাতশিল্পী। ভাল বাজালে যেরকম ওঁর পাশে দাঁড়ানোর সাধ্য কারও থাকে না, খারাপ বাজালে ওঁকে আবার চেনাই যায় না। বিশেষ করে গত দু বছর তো আমরা প্রায় ওঁর ভাল বাজনা শুনিনি বললেই চলে। এই শীতকালে তাই পরপর দুটো ভাল বাজনা শুনেও মনে মনে একটু ভয় নিয়েই সেদিন ওঁকে শুনতে এসেছিলাম রবীন্দ্রসদনে। সরোদের তার খুব সুন্দর মিলেছিল এবং প্রথম স্বর প্রয়োগেই বুঝলাম উনি দারুণ বাজাবেন। পিতার তৈরি 'হেম বেহাগ'-এ আলাপ করে একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করবার পর শ্যামকল্যাণ বাজিয়ে নিজের ৫৮ সালের ইমেজকে আবার বাঁচিয়ে তুললেন। প্রমাণ করলেন ওঁর কল্পনা শক্তির তুলনা নেই। কেবল সুরের জাল বোনায় নয়, লয় ভাগের ব্যাপারেও। কিষণ মহারাজের মত লয়দার তবলিয়ারও চিন্তা করে সচেতন হয়ে বাজাতে হচ্ছিল। আলি আকবরের লয় কোন হিসাবে ফেলা যায় না। যেখানে থেকে সেখান থেকে তেহাই বাজিয়ে সমে আসতে পারেন এবং এর মধ্যে থাকে অদ্ভুত রোমাঞ্চ।

এইসব মারপ্যাঁচ ও ব্যাকরণের ঊর্ধ্বে পেঁছে উনি যখন দরবারী কানাড়া বাজালেন তখন মনে হচ্ছিল কবিতা। এরকম বাজনা গত দশ বছরে শুনি নি। দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক হলেও ওর সুর লাগানোর কায়দায় আমরা বীণের অঙ্গ পাই। আলাউদ্দিন খাঁ বছর বছর কঠোর পরিশ্রম করে যে বিরাট ক্যানভাস বানালেন তার ওপর ছবি আঁকার বয়স ওঁর পার হয়ে গিয়েছিল। উনি হয়তো একটা ছবি কল্পনা করেছিলেন। আলি আকবরের বাজনা হল সেই কল্পনা। মিশ্র কিরবানিতে এগারোটা সুর প্রয়োগ অবশ্য এই কল্পনার মধ্যে আসে না— এখানে আমরা আধুনিক আলি আকবর-কেই পাই।

কণ্ঠসংগীতে শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান ছিল

ভীমসেন যোশীর। ইনি পরপর পুরিয়ায় খেয়াল, পিলু ঠুংরী, ভৈরবীতে ভজন ও শেষে শ্রোতাদের বারবার অনুরোধে যোগীয়া গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। এঁর গলা সেদিন খুব পরিষ্কার ছিল, বিশেষ করে তার সপ্তকে গলা আরও সুন্দর লাগছিল। ভীমসেনের সব থেকে বড় গুণ ওঁর সৌন্দর্যবোধ। বিষয়বস্তু যতই থাক না কেন যে জিনিস উনি রচনা করেন তা অত্যন্ত সুখশ্রাব্য। সময় সময় মনে হয় যেন গলা থেকে মধু ঝরছে। আবদুল করিম খাঁকে নিজের আদর্শ করে ভীমসেন শুধু করুণ রসের ওপর সম্পূর্ণ জোর দেন না, পাশাপাশি বীর রসের গমক অঙ্গে কিছু কাজ করে শ্রোতাদের হৃদয় ও মন স্পর্শ করেন।

এই কন্ট্রাস্ট কখনো আস্তে কখনো জোরে এমন সুন্দরভাবে উনি শ্রোতাদের সামনে সাজিয়ে দেন যে তারা মুগ্ধ না হয়ে পারে না। সেদিনও তাই হয়েছিল।

কুমার গন্ধর্বর ক্ষেত্রেও একই কথা বলা হয়, যদিও স্টাইল সম্পূর্ণ আলাদা। কুমার গন্ধর্বর গানও ভাব প্রধান, কিন্তু *তা রোম্যান্টিক নয়, আধ্যাত্মিক। বারবার একই সুরের সামান্য পরিবর্তন করে করে পুনরাবৃত্তি করেন যেন স্তব পাঠ করছেন। ওঁর শুদ্ধ কল্যাণ ও ভজন শ্রোতাদের মনে বিশেষভাবে রেখাপাত* করে।

গাঙ্গুবাই-এর গান ও রবিশংকরের সেতার দিয়ে সাত দিনব্যাপী সঙ্গীতানুষ্ঠানের শেষ হয়। সময় অল্প হলেও গাঙ্গুবাই মারবা এবং আভোগী গেয়ে আসর জমিয়ে দেন। তাঁর বলিষ্ঠ ও সুরেলা কন্ঠের আওয়াজ শোনার ক্ষুধা শ্রোতাদের মিটে যাবার আগেই তিনি তাঁর গান শেষ করেন, বোধ হয় রবিশংকরকে বেশি সময় দেবার জন্য।

রবিশংকর নিজের বাজনা শুরু করেন মুদ্রাকি-কানাড়া দিয়ে। সেনী মতে সব কিছু চুলচেরা হিসাবে হলেও, সেতার তাঁর সঙ্গে সেদিন শত্রুতা করে। এতবার তিনি সুর মেলান, যে ভাল বাজানো সত্ত্বেও, শ্রোতাদের মনে কোন রেখাপাত করতে পারেন নি।

এরপর বাজালেন সিন্ধুরা, সেতারের *আচরণ একই রকম থাকলেও প্রচলিত নিখাদের সিন্ধুরা না বাজিয়ে, বারো বাঁচিয়ে উনি আবার প্রমাণ করে দেন আমাদের শাস্ত্রীয় সংগীতের পুনরুপের উনিই কর্ণধার।*

বিরতির পর নিজের তৈরি তিলক-শ্যাম-এর সুর ও ছন্দের বৈচিত্র্যে শ্রোতাদের আনন্দ দেন। বাঁধা লয়ে ওঁর জুড়ি ভারতে নেই। বাজনা সাজানোর ব্যাপারে ওঁর কাছে যে কোন শিল্পীর অনেক শেখার আছে।

পঞ্চম সে গারা বাজিয়ে তিনি বাজনা শেষ করেন।

তবলায় আল্লারাখা ও পাখওয়াজে অর্জুন-সেজওয়াল তাঁদের অপূর্ব বাজনা শ্রোতাদের আনন্দ দেন।

এছাড়া ভাল বাজিয়ে ছিলেন তবলায় শ্যামল বসু, সাবির খান, বসন্ত আচারেকর লালজি গোখলে, এস কে হাজরা, পাখওয়াজে রাজীবলোচন দে, মৃদঙ্গমে এস শেখর, সারেঙ্গিতে সাগির উদ্দিন ও হারমোনিয়ামে সোহনলাল শর্মা।

তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন

উৎপলকুমার বসু

একদা এই মহানগরে সঙ্গীত সম্মেলনগুলির যথেষ্ট সমাদর ছিল। সে-সময় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সাধারণ লোকের মনোহরণের জন্য, এসে বসেছিল পার্কে, স্কোয়ারে, মাঠে-ময়দানে। সে আর তখন বৈঠকী নয়—স্বল্প মানুষের নিরন্তর বিচার বিশ্লেষণেরও উপলক্ষ্যমাত্র নয়। সে এসেছিল হাততালি কুড়াতে—তাই তাকে খানিকটা সমালোচনাও শুনতে হয়েছিল। অনেকে বলেছিলেন উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের জাত গেল।

ভারতীয় রাগসঙ্গীতকে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন থেকে যতটা দূরে ভাবি—ততটা দূরত্ব এখনো তৈরী হয় নি। আধুনিক বাংলা গান ও হিন্দী সিনেমার গান—যাকে যথার্থই জনপ্রিয় বলা চলে—মূলত ভারতীয় লোকসঙ্গীত বা রাগসঙ্গীতেরই সহজ, কখনো বা বিকৃত প্রকাশ। তাতে মালিন্য আছে প্রচুর—কিন্তু মুখাবয়বটি অতিপরিচিত।

কলকাতা শহরে যাঁরা বাৎসরিক সঙ্গীত সম্মেলনগুলির আয়োজন করেন তাঁদের ধন্যবাদ কেননা তখন সাময়িকভাবে আমাদের ঐতিহ্যেরই সঙ্গে যেন আমাদের নতুন করে পরিচয় হয় এবং অনেক অতিব্যবহৃত রাগ-রাগিণীকে আমরা পুনর্বিবেচনা করে দেখি। এবারের সর্বভারতীয় তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টা সে-বিচারে সার্থক হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, পাঁচ সন্ধ্যাব্যাপী (একটি নৈশ অনুষ্ঠান সমেত) এই সম্মেলনের সর্বনিম্ন সিজন টিকিটের হার ছিল কুড়ি টাকা—যা আজকের দিনে খুবই সামান্য বলা চলে।

প্রথম সন্ধ্যায় প্রথম শিল্পী শম্পা চক্রবর্তী। ইনি গাইলেন রাগ হংসধ্বনি। এই যুবতীর কণ্ঠস্বর বেশ আকর্ষণীয়—কিছুটা বা পুরুষালী। বেশ স্বাভাবিক ও সাবলীল তাঁর ভাবভঙ্গি। কিন্তু তবলাবাদকের সহযোগিতায় খানিকটা আড়ষ্টতা ছিল।

পরবর্তী শিল্পী প্রফেসর বংশীধর লাল। ইনি মেঝের উপর পেতে বসলেন একটি জাপানী যন্ত্র। অতিরিক্ত তার সংযোজিত হওয়ায় ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জটিলতা ও সুরবিন্যাস এই যন্ত্রে ধরা পড়ল। রাগ বাগেশ্রী শনুলাম।

তারপর আশিস গোস্বামী ও শ্যামল অধিকারী যুগ্মকণ্ঠে পরিবেশন করলেন মালকোষ। এই দ্বৈত প্রচেষ্টা বিশেষ জমল না। কারণ হয়ত দুজনের গলা ও গায়কি ভিন্ন প্রকৃতির। আশিসবাবুর কণ্ঠস্বরে গভীরতা ও বিস্তার লক্ষণীয়। সে-তুলনায় শ্যামলবাবুর গলা ক্ষীণ ও নিষ্প্রভ।

এবার এলেন কৌস্তুভ রায়। এঁর কোলে শরদ। তিনি তরুণ ও সুদর্শন। সভাপতি জানালেন, বর্তমানকালের মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন বাঙালি যন্ত্রশিল্পীদের মধ্যে ইনি একজন। তাঁর শিল্প-সৌন্দর্য প্রকাশ পেল যোগ রাগে। এই রাগে একটি পুরনো বাংলা গানের কথা মনে পড়ল : ছিল চাঁদ মেঘের পারে।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের শেষ অংশগ্রহণকারী অধ্যাপক এম আর গৌতম (বারাণসী)। ইনি কাফি-কানাড়া রাগে খেয়াল ও ঠুংরি পরিবেশন করলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও দক্ষতা ফুটে উঠল তান বিস্তারে। যথার্থ শিক্ষক বলেই হয়ত তিনি টেপ-রেকর্ডার সামনে নিয়ে বসলেন—অপরের তানপুরা বেঁধে দিলেন—মস্তিষ্ক দুলিয়ে ঘন ঘন ইশারা করলেন সহযোগীদের। কাফি ও কানাড়ার সংমিশ্রণ খুব বিশেষ প্রচলিত নয়—তাই এর অভিনবত্ব আমাদের অপরিচিত ঠেকল। লোকে বলে ঠুংরি গান খেয়াল ধ্রুপদের মতো

জবন্দী অনুষ্ঠানে কণ্ঠ সঙ্গীতাচার্য শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সানাইয়ে প্রখ্যাত শিল্পী মিঞা বিসমিল্লা খাঁ।
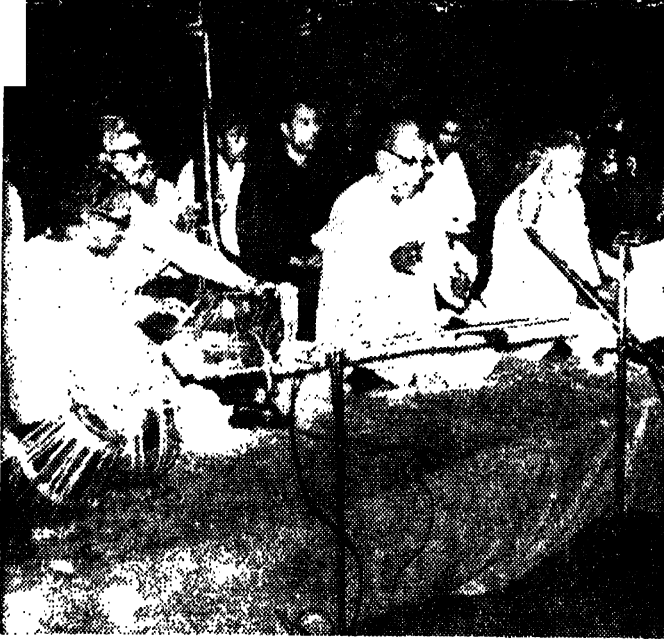
অত ভারিক্কি নয়। তা হোক, এর আবেদন বড়ই হৃদয়গ্রাহ্য। সহজেই বোঝা গেল একটি প্রোষিতভর্তৃকার আকুলতা যে বলছে : আপ তো সঁইয়া বিদেশয়ামে ছানু, নাহি লিখে পাতিয়া। উদাসীন পত্রলেখকের কর্তব্যে অবহেলায় হয়ত ক্রুদ্ধ হওয়া যেত। কিন্তু ভারতীয় শিল্প বিষয়টিকে এমন এক অতিজাগতিক বস্তুহীন ক্ষোভের জগতে নিয়ে গেল যে কেবলমাত্র প্রিয়জনের কুশল সংবাদে ঐ নিরন্ধ্র দুঃখের মীমাংসা হবে বলে মনে হল না।

দ্বিতীয় দিনের উল্লেখযোগ্য দুজন শিল্পী হলেন বুধাদিত্য মুখোপাধ্যায় (ভিলাই) যিনি সেতারে পূরিয়াকল্যাণ বাজালেন এবং ঐ সন্ধ্যায় শেষ গায়ক সরাফৎ হুসেন খান (আলিগড়) যিনি দরবারি কানাড়া রাগে খেয়াল পরিবেশন করলেন। বুধাদিত্য কুশলী ও সূক্ষ্মতাবোধসম্পন্ন যন্ত্রবিদ্। পূরিয়াকল্যাণ সুরটিও আমাদের অর্থাৎ বাঙালীদের অতি প্রিয়। বহু গান রচিত হয়েছে এর উপর। যদিও কেউ কেউ মনে করেন পূর্বাঙ্গে পূরিয়ার রূপটি ঠিক আছে কিন্তু উত্তরাঙ্গে যে রাগটি মিশ্রিত হয় তা হল আসলে ইমন।

সরাফৎ হুসেন খান একজন বিশিষ্ট গায়ক। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ-র গীত-ভঙ্গিমার সঙ্গে এর তানবিস্তার, গমক ও গিটকিরীর সাদৃশ্য আছে। খানিকটা চাঞ্চল্যও প্রকাশ পেল তাঁর পরিবেশনে যা হয়ত দরবারি কানাড়ার ভাবরূপের বিরুদ্ধাচারী। তাঁর সঙ্গীতে বলিষ্ঠতা ও মাধুর্যের সহজ সংমিশ্রণ ঘটল।

তৃতীয় সন্ধ্যার অংশগ্রহণকারী-দের মধ্যে ছিলেন কৌশিক বসাক যিনি সেতারে বিলাসখানি কল্যাণ পরিবেশন করলেন। কিন্তু ঐ সন্ধ্যায় আমাদের মনোহরণ করলেন সুনন্দা পট্টনায়ক। কানাড়া নির্ভর সঙ্গীতের একটি গম্ভীর, মধ্যরাত্রিসম রূপ আছে। প্রথমে সে ভাবেই শুরু হয়েছিল শ্রীমতী পট্টনায়কের পরিবেশন। কিন্তু অচিরে এর রূপ হয়ে দাঁড়াল আনন্দময় এবং সারেঙ্গি ও তবলার সঙ্গে ভাব বিনিময়ে এর উচ্ছ্বাসী নৃত্যপরবশ চিত্রটি আত্মপ্রকাশ করল, গায়িকা ভাবাবেশে বিহ্বল হয়ে পড়লেন এবং আমরা লক্ষ্য করলাম এঁর কণ্ঠস্বর চড়তে চড়তে এমন একটি পর্বতশৃঙ্গে উঠে দাড়ায় যেখানে আমাদের মতো বস্তুবাদী মানুষের নিশ্বাস নেওয়ার উপযুক্ত বায়ুর অভাব। দ্রুত, ধাপে ধাপে, সুরনির্ভর পদক্ষেপে নেমে আসেন তিনি। আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। প্রভু, ঈশমনীশ নামক যে চমৎকার ভজনটি ইনি পরিবেশন করলেন তাকে বস্তুত শিবস্তোত্র বলাই যুক্তিসঙ্গত।

চতুর্থ দিনে বিসমিল্লা খান ও সম্প্রদায় সানাই বাজিয়ে শোনালেন। সম্মেলনের সভাপতি শৈলেনবাবু একত্রে, কণ্ঠসঙ্গীতে অংশগ্রহণ করলেন।

পঞ্চম অনুষ্ঠান, যা সারা রাত ধরে চলল, সত্যি জমে উঠেছিল। প্রাপ্ত-বয়স্করা ছাড়াও, কিছু সংখ্যক বালক-বালিকা, ঐ দীর্ঘ সময় মন দিয়ে গান বাজনা শুনছে, এ দৃশ্যটি বিস্ময়কর। মণিলাল নাগের নাম প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। ইনি সেতারে সুহাগ কানাড়া বাজিয়ে শোনালেন। কানাড়া রাগের আসল নাম কাহ্নার অর্থাৎ কৃষ্ণের সুর। অনেক দিন পর একটি রাগের সঙ্গে যথার্থ পরিচয় বা ইংরেজিতে যাকে বলে ইনভলভমেন্ট ঘটল। মণি-লালবাবুর বাজানোর ভঙ্গি অতি সুন্দর ও সাবলীল। অপ্রচলিত তাল অবলম্বনে শেষের অংশটুকু পরিবেশিত হল বলে তিনি সেটি ব্যাখ্যা করে দিলেন। তুলনায় সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় গীত কানাডা খেয়াল ও ঠুংরি গভীরতাহীন ও ম্লান। মন্টু ও মহারাজ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের হার্মোনিয়াম বাদন চমকপ্রদ। পদ্মাবতী গোখেল (বোম্বাই)-এর কণ্ঠ-সঙ্গীত মামুলি। শেষ রাত্রে অধ্যাপক বিজভূষণ কাবরা (আমেদাবাদ) গীটার নিয়ে বসলেন। পরিবেশিত হল নট ভৈঁরো। যদিও যন্ত্রটি গীটার কিন্তু এঁকে শরদের ভঙ্গিতে বাঁধা হয়েছে। তা সত্ত্বেও কোথাও একটা সূক্ষ্ম বৈসাদৃশ্য থেকে যায়। বিশেষত, যখন ফেটবোর্ডের নিম্ন অংশ থেকে উঁচুতে আঙুল চলে যায় তখন যন্ত্রকৌশল বিস্ময়কর বলে মনে হতে পারে, কিন্তু মানুষের কণ্ঠস্বরে ঐ আরোহণ-অবরোহণ অস্বাভাবিক তাই যন্ত্রেও সেটি বিশ্বাসযোগ্যরূপে প্রতিফলিত হল না।

অনুষ্ঠানের শেষ শিল্পী পণ্ডিত যশরাজ (বোম্বাই)। এঁর গলায় ললিত খেয়াল ও টোড়ি ভজন শোনার ফলে আমাদের রাত্রি জাগরণজনিত অবসাদ দূর হল। লক্ষ্য করলাম, আবেগ ও দক্ষতার অকল্পনীয় সহাবস্থান। এঁর কণ্ঠস্বর একই সঙ্গে মধুর ও রুক্ষ, গম্ভীর ও নাটকীয়। মারাঠি সঙ্গীতজ্ঞদের কথা, যথা পালুস্কর বা পটবর্ধনের, সঙ্গীত মনে পড়ে। এরূপ সঙ্গীত শোনার জন্য আমি আরো বহু রাত্রি জেগে থাকতে সম্মত আছি।

কাজেই জাহাজগুলোর দুর্গন্ধ ছড়াতো জাহাজ বন্দরে আসতে না আসতেই। বলতো 'স্লেভার-গন্ধ'। দুর্গন্ধের ধাক্কায় খালাসীরা তলায় গিয়ে জাহাজ ধুতেই চাইতো না। চাইবে কেন? মোমবাতি জ্বালিয়ে নীচে যেতে গেলে গ্যাসের তাড়ায় মোমবাতিই নিবে যেতো।

(It was sometimes difficult to persuade a prize crew of blue jackets to go on board of an illicit slaver because of the dreadful stink of excrements vomitus and corruption — Ransford).

এতে রোগ হবে না তো কী। আমাশা, বসন্ত, চোখ-ওঠা লেগেই থাকতো। মড়া পড়ে থাকতো যাবৎ না কাঠ হয়ে যায়। রক্তআমাশার রক্ত পুঁজে পেছল হয়ে থাকতো পাটাতন, মনে হোতো জবাইখানার মেঝে। ফ্যালকনবিজ;১ সবার বড়ো মারাত্মক ব্যাধি ছিলো 'বিষণ্ণতা।' —ফলে যেনতেন প্রকারেন সুবিধা পেলেই আত্মহত্যা ব্যাধির মতো লেগে থাকতো। যারা লাফিয়ে জলে ডুবে মরতে পারতো তাদের অন্যেরা হিংসেই করতো। শতকরা ১২টা মৃত্যু তো বাঁধা-ধরা ছিলো। এমনিতেই বা বাঁচতো কজন? একটি পরিসংখ্যানে দেখছি—

১ রান্সফোর্ডের উদ্ধৃতি, ইংরেজ ক্যাপ্টেনের ডায়েরী থেকে।

আর যারা বাঁচতো তাদের দেখে কেউ বলতে পারতো না যে এরা জীবিত। তেলে জলে ঘষে মেজে চান করিয়ে এমন কী কলপ লাগিয়ে তবে মালকে বাজারে ছাড়া যেতো। তবুও লাভ, তবুও লাভ। দাসের কংকাল বেচেও লাভ!

ক্যাপ্টেন ডেক্রক তাঁর কড়চায় লিখেছেন, 'আফ্রিকা ছেড়ে নড়ার পর জাহাজখানা আধা পাগলা গারদ আর আধা বেশ্যাবাড়ী হয়ে উঠত।' মেয়েদের খালাসীরা যখন টেনে নিয়ে আসত ঐ সময়টুকুর মতই তারা একটু যা তবু খোলা সমুদ্রের বাতাসে হাত-পা ছড়াবার অবকাশ পেতো। তবুও সতীত্ব তো আর ফালতু মাল নয়। অনেকে খুন করেছে আততায়ীকে। মারপিট কলহ তো ছিলই। উলঙ্গ ধর্ষণের মধ্যেই লম্পটের কণ্ঠনালী কামড়ে ছিঁড়ে ফেলার দরুণ আখ্যা পেয়েছে নরমাংসভুক। হায় সমুদ্র, হায় আকাশ! তোমরা ভুলে যাও এই সব কালো কন্যা-জায়ার ইতিবৃত্ত।.... আর শাদা কড়চা ফলাও করে লেখে নিগ্রোগুলো যৌন লালসায় ধ্বকধ্বক করে জ্বলে যেন তাতা মালসা!

এদের মধ্যে অন্তঃসত্ত্বাও অনেকে। 'একই শেকলে বাঁধা একটা মানুষ মরছে, অন্যটা দিচ্ছে নবজীবনের জন্ম। এমন ঘটনা চোখে দেখা। আরও দেখেছি জীবিতকে চেঁচাতে 'জল-জল'! কিন্তু না মৃত্যুপথযাত্রীকে, না সদ্যপ্রসূতাকে দেওয়া হচ্ছে বরাদ্দের বাইরে একটি ফোঁটাও।' এমন ঘটনা এক আমেরিকান খালাসীর ডায়েরীতে পাওয়া গেছে।

বার বার সমর্থনের নজীর তুলে লাভই বা কী? এক দফায় কোলকাতায় তিনশো কত-না-কত ইংরেজ বিদ্রোহীদের সিরাজের অফিসাররা নাকি দমবন্ধ করে মেরেছিল গুলি! তার দলিল কোথায়? কে চাইছে? অথচ পলাশী তো সেই অজুহাতেই। ভারতবর্ষই হড়প হয়ে গেল। আজও হড়প হল চিলি। হড়প হতে চলেছে জামাইকা, গায়ানা, তামাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। দলিল চাইছে কে?

অবশ্য খালাসীরা শাদা হলেও যা ব্যবহার তারা পেত তা নিকৃষ্ট। দাসেরা সে হিসেবে ভাগ্যবানই ছিল। জাহাজে ভর্তি হবার পর তাদের দুর্গতির আর পারাপার থাকত না। সেই 'মাঝের ধারা'র মধ্যে দাস ছিল 'মাল'। তার তবু যত্ন ছিল, খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা ছিল। খালাসীদের তাও থাকত না। মরো তো মরলে। তারা দাসেদের কাছে খাদ্য চাইত এবং আশ্চর্য, করুণায় গলে দাসেরা তা দিতও। অথচ বিভু নাকি এদের মানুষ করে সৃষ্টিই করেন নি!

নিউটনের কড়চায় এ বিষয়ে বহু তথ্য পাচ্ছি। নিউটন হৃদয়বান লোক ছিলেন। জাহাজ ক্যারাবিয়ানের বন্দরে পৌঁছল ব্যস, খালাসীরাও ছুট। তাদের ধান্দা তারাই দেখবে, আর দেখনেওলা কেউ নেই।

মদে, মেয়েমানুষে ডুবে যেত। এক বোতল মদের জন্য একটা মানুষকে খুন করা বাধত না। এরাই, খোঁজ করলে দেখা যাবে,—আজকের অর্বুদপতির পূর্ব-পুরুষ। এদের রক্তেই জন্মেছে বহু এম-পি, জজ ডাকতার, ব্যারিস্টার।

ডিসিপ্লিন আনার জন্য যে সব উৎকট সাজা ছিল বুড়ো আঙুল বেঁধে টাঙিয়ে রাখা তার একটা। ভুখা হরতাল করেছে কেউ। তার ঠোঁটে চেপে ধরা হল জ্বলন্ত কয়লা। যেই সে চেঁচায়, গলায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয় চামচের হাতল। জিভ-টাগরা ফাঁক হয়ে যায়। গলায় তখন ঢেলে দেওয়া হয় গলা-গলা খাদ্য, আর গলার ভেতর দিয়ে কণ্ঠনালী অবধি চালিয়ে দেওয়া হয় চাবুকের ডাণ্ডা। গিলতে বাধ্য হয়। আঙুল মোচড়াবার জন্য বিশেষ যন্ত্রই ছিল। চাবুকই ছিল নানা রকমের। চিমটেয় ছিঁড়ে চামড়া পাকিয়ে পাকিয়ে তোলা হত।

কাজেই বিদ্রোহ যখন এরা করত মরিয়া হয়ে করত বলেই সেই বিদ্রোহের ভাষা ভীষণ ভয়াবহ রক্তসিক্ত বীভৎস না হয়ে যেত না। ১৭৪০ সালে হ্যারী গ্রুণ্ডী লিখছেন, বিদ্রোহ ঠাণ্ডা হবার পর পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় যে দাসের ক্ষত তার বাজার দাম কমিয়ে দেবে, ব্যস আর কথা নেই, তাকে জলে ছেড়ে দেওয়া হত। 'কে সন্দেহ করেছে একটি দাস অন্যদের উস্কাচ্ছে। তাকে আলাদা করে দেওয়া হল। হাতে-পায়ে বেড়ী, জাহাজের আংটার সঙ্গেও বাঁধা। ওপরের আংটায় হাতকড়িটা ঝুলিয়ে তাকে এমন টান-টান সোজা করে রাখা হল যে, হাড়ডী পসুলী আলাদা আলাদা হয়ে যাবার জো। জাহাজের সারেংরা কতই সজা হবে? উলঙ্গ সেই দেহটার যেখানে সেখানে খোঁচাখুঁচি করে তারা মজা দেখছে। একটা সময় এল যখন তার প্রাণ আর শেষ নেই।.. টেনে ফেলে দিল তাকে জলে'

প্রিভি কাউন্সিলে একদা এই হত্যার বিপক্ষে কথা উঠল। কোন সভা বদান্যতার দৌলতে কথা ওঠে নি। কী করে উঠল পরে জানা যাবে। প্রিভি কাউন্সিলকে উত্যক্ত করেছিল এক উন্মাদের জেদ। আজও ইংরেজ তার কথা ভুলতেই চায়। প্রিভি কাউন্সিল চেপে ধরল।

তখন নানা রকমের পরিসংখ্যান হাজির হল। ফলে হিসেবে দাঁড়াল দাস ব্যবসায়ে প্রতি তিনজন দাসের মধ্যে জাহাজ থেকে জীবিতাবস্থায় বন্দরে নামতে পেরেছে দুজন। (১ ক-খ) ব্যাপারের গুরুত্ব উপলব্ধি করে অনেকেই আতঙ্কে শিউরে উঠল। কিন্তু এ-ও সত্য যে, অনেকেই উঠল না।

(১) ক—ফিলিপস ইউ বি—আমেরিকান নিগ্রো স্লেভারি।

খ — মানিকস অ্যান্ড কাওলে—পূর্বোক্ত—পৃঃ ১২৪।

মজা আছে। বেলেল্লী আর কোন্

একদা নেপলিয়' ইংরেজদের তকমা
লেন 'বেনের জাত।' এই বেনেলীর

যা করে না ? ফরাসীই কি করে
তা নয়। ইংরেজদের বেনেলীর একটি
প্রকৃতি আছে। তাদের ববসায় যদি
আসে তখন তারা পরোয়া করে না
ায়ে সে সমৃদ্ধি এল। জন স্টুয়ার্ট
থেকে নিয়ে আলডুকস হাকসলী
ইংরেজ এই উদ্দেশ্য এবং সাধন
অনেক তর্ক কপচেছে। কিন্তু
ধর্ম, এটাই নীতি। ভাল-মন্দর, সং-
র বিচার ইংরেজের ব্যবসায়ে আসে
ইংরেজ কেবল জানে, জানায়, বাঁচায়,
াইন। আইন স্বপক্ষে থাকলে অর্থা-
উপায় নিয়ে মাথা ঘামায় না কোন
জা স্যাকসন। অন্তত কোটিপতি কেউ
অর্থাগমই অর্থাগমের উপায়েরও
পাদক। টাকা আসছে একথা ভাবলে
জ সহজেই সব ভুলে যায়। রাজা-
ও দস্যুর সঙ্গে বখরা করে। ধর্ম-
ান-বাইবেল-চার্চকেও টেনে আনে এই
নের জন্য। এ সম্পর্কে নেপোলিয়'র
ট কথা আজও আপ্তবাক্য হয়ে রয়েছে।
ালিয়' ছিলেন শাদা-মাটা সিপাহী
ষ্য। শাদা-মাটা কথায় খোলাখুলি সব
ভালবাসতেন। বলাটার কায়দাই
নটের কায়দা, কুছ পরোয়া নেই। তাঁর
কথা :

এই সব ধর্ম-মিশনারীরা এশিয়ায়
আমার ভারী কাজে দেবে। শুধু
এশিয়া কেন, আফ্রিকা এবং আমে-
রিকাতেও। ঐ সব মিশনারীরাই
খোঁদিরা হয়ে তামাম দেশটার নাড়ী-
নক্ষত্র জেনে আমায় পাচার করবে।
ও'দের পোশাক-আশাকের পবিত্রতার
বাহানা যে কেবল ও'দের গতিবিধির
সহায়তাই করবে তা নয়, আরও
বেশী কিছু, সেই পবিত্রতার তলায়
চাপা থাকবে ও'দের কূটনৈতিক এবং
অর্থনৈতিক মতলবগুলোর অন্ধি-
সন্ধি।

রিস্কার কথা।একদা চীন দেশ ছেয়ে
ছল আমেরিকান মিশনারীতে। বড়
াসপাতাল, গীর্জা, বিদ্যালয়, খাদ্য
া কেন্দ্র কতই না তখন চীন দেশের
দের সাহায্যকল্পে উদার আমেরিকা
দিয়েছে। (আজও ভারত আস্কারা
ভারতেও দিতে রাজী। হতভাগা
সরকার হতে দিচছে না)। কিন্তু এর
তীর্থযাত্রী, ধর্মভীরু মানুষ জোগাত
জোগাত ট্যাকস-গুণনেওলা আমে-
জনসাধার, এবং বড় বড় শিল্প-
। চীনে যাতে স্টাণ্ডার্ড অয়েল

কোম্পানী সবটা সহজে হরপ করতে পারে
তারই ব্যবস্থা। গত পঞ্চাশ বছরে খৃস্টান
দেশগুলো যে রকমভাবে পৃথিবীর শান্তি
নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে তা দুনিয়ার
ছেলে-মেয়ে দেখছে। তারা আজ লায়েক।
কাজেই চার্চে তারা যাচ্ছে না। হিপী হয়ে
চরসে চণ্ডূতে বুঁদ হয়ে আছে। গোল্লায়
যখন বাপ-ঠাকুর্দা দুনিয়াকে দিতেই চায়,
চল গোল্লাই যাই। প্রার্থনা করি আজ
মার্ক টোয়েনের ভাষায়—

'হে ঈশ্বর সহাও হও। কামান
গর্জনের শব্দ যেন আমরা মানুষের
আর্তনাদ দিয়ে কোণঠাসা করে দিতে
পারি। সহাও হও, যাতে মানুষের
সুখ-শান্তির নীড়গুলো আগুনের
ঝড়ের মুখে পুড়িয়ে খাক করে
দিতে পারি। (মার্ক টোয়েন নাফাম
বোমার কথা জানতেন না)। তুমি
প্রেমের গোমুখী হে ঈশ্বর। বিশ্ব-
প্রেমের নামেই আমাদের এই প্রার্থনা,
—এমেন্—।'

ইংরেজ জনমত বড় মজার জিনিষ।
ইংরেজ জনতার দাবী-দাওয়া সম্বন্ধে জন-
মত যেমন প্রখর হল্লাবাজ, সেই দাবী-
দাওয়াই যখন অনিংরেজ সমাজে ইংরেজরাই
পায়ে থেঁৎলায়,—জনমত রা কাড়ে না।
কারণ ও বিষয়ে জনমত কিছু খবরই রাখে
না। নিজের কড়ি গোছাতে সে এত ব্যস্ত
যে পরের সমাজে কোথায় কে সিঁদ ফুঁড়ছে
সে জানতেও চায় না। বিশেষ করে এই
অবিচারের ফলে ঘরে যদি টাকা তোলা
যায়, প্রতিবাদ করা তো দূরে থাক, জন-
মতের প্রচার যাতে না হয় সে জন্যে সরা
চাপা দেবার হুড়োহুড়ি পড়ে যায়।

পরিচছেদের শেষে একটি পরি-
সংখ্যান দেওয়া হল। উদ্দেশ্য এই ক্ষতির
পরিমাণ খানিকটা দেখান। কিন্তু একাধিক
রোগে মানুষ মরত, না খেয়েও মরত, নানা
রকমভাবে আত্মহত্যা করত, বিদ্রোহে মরত
অনেকে, ঝড়-জল-দুর্যোগের মৃত্যু
মৃত্যু ছাড়াও মৃত্যু ছিল হঠাৎ যদি জল বা
খাদ্যের অভাব হত। অভাবটা প্রায়ই না
হলেও হত। জল বা খাদ্য হিসেব মতই
জাহাজে ভরা চলত। মোটামুটি মাস
তিনেকের মত ব্যবস্থা থাকতই। গিনী
উপসাগর থেকে ভার্ডি-অন্তরীপ পর্যন্ত
সমুদ্রে খেয়াল-খুশীর পাত্তা লাগান
ছিল দুরূহ। এই জল ভাগকে নাবিকরা
ঝঞ্ঝা-সাগর বলত। ব্যাধি-মড়কও এই

সাগরেই সবাইকে ঝাপটে ধরত। তারও
ওপরে যদি বাতাস পড়ে যেত, বা ঝড়
উঠত, জাহাজ পথ হারাত। সেই তিন মাস
হয়ে যেত ছয় মাস। এবং সেই দুর্যোগ
বয়ে নেমে আসত তখন অত্যাচার।

এ অত্যাচারের প্রথম কোপই পড়ত
ঐ পশুগুলোর ওপর যাদের ওরা নিগ্রো
বলে অমানুষ করে ফেলে রেখেছিল। একটু
আধটুও রোগী যারা তাদের অবিলম্বে
টেনে জলে ফেলে দিত। শুধু শুধু জিইয়ে
রাখা মানে তো কেবল জল ও খাদ্যের
অপচয়। লিউক কলিংউডের জাহাজ জোং-এ
এই জলে ফেলে মারা নিয়ে হয় এক
কেলেংকারী। াক করে জীবন্ত রুগীকে
জলে ফেলে দেওয়ার কথা রাষ্ট্র হয়ে পড়ে।
ঘটনাটা ঘটেছিল ১৭৮১র সেপ্টেম্বর মাসে।
জোং-এ ছিল ৪৪০ দাস, ১৭ জন খালাসী।
জাহাজে টমাটো, আলু, ডিম পচে গেলে
কি করা হয় ? ফেলেই তো দেওয়া হয়।
পচা-ধ্বসা নিগ্রো তা হলে কি হবে ?
ফেলো। এই নীতি! জোংয়ে ধরল মড়ক।
৬০ জন দাস, ৭ জন খালাসী ঝটপট মরে
গেল। রকতামশা তখন ফলাও। মোটেই
কেউ পৌঁছুয় কি-না সন্দেহ। পৌঁছলেই
বা কিনবে কে ? এদিকে জামাইকার স্বীপ-
রেখা দেখা গেছে। নিয়ম মাফিক যদি পথে
যেতে যাত্রার মধ্যে মরে যায় ইন্সোরেন্সই
পুরো টাকা খেসারৎ দিতে বাধ্য। কিন্তু
হার্ডাগলে, মরকুট এক চিলতে মেয়ে বা
এক চিমটি পুরুষ যদি বাজারে ছাড়া হয়,
কিই বা দাম মিলবে ? ইন্সোরেন্স দেবার
বেলায় পুরো দেবে। সুতরাং ?....
সুতরাং খাতায় লেখ মরেছে, আর দাও
ছেড়ে জলে। সে জলে চারধারে হাঙর।
সঙ্গে সঙ্গে সদগতি হয়ে যাবে। জেমস
কেলসল ছিল জাহাজের মেট। তার খুঁৎ-
খুঁতে মেজাজে মোচড় লাগছে। কলিংউড
জোর করে বাছল ১৩৩ জন দাসকে। ৫৪টা
নিগ্রোর প্রথম পার্শ্বেলটা (এই ভাষাই
প্রযুক্ত হয়েছে আদালতের জবানবন্দীতে)
ফেলা হল ২৯ নভেম্বর, ৪২ জনার দ্বিতীয়
পার্শ্বেল ফেলা হল পয়লা ডিসেম্বর।
তখনও ৩৬ জন বাকী। মনে হয় একজন
সত্যি সত্যি মরে গিয়েছিল-বা। ভীষণ
বৃষ্টি এল। বৃষ্টির জলে গোটাকতক পিপে
ভরে গেল। জলের অভাব আর রইল না।
এরা বাঁচতে পারত। কিন্তু কলিংউড তার
ইন্সোরেন্স নিয়েই ছাড়বে, ২৬ জনকে জলে
ছাড়তে হল হাতকড়া বেঁধেই, কেননা তারা
হৈ-হল্লা করছিল। শেষ দশজন একেবারে

রুখে দাঁড়াল। তারা কারুকে কাছে আসতে দিল না। নিজেরাই বোক্সিং ডিঙিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ২

কলিংউডের মত কত কাপ্তেনই এ কাণ্ড করেছে। কলিংউড ধরা পড়ত না (ইতিহাসের কাছে)। কিন্তু ইনসিওরের টাকা নিয়েই মামলা হল। তখন কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুল। ইংরেজের আদালত বুগী মানুষ আর পচা আদা, ডিম এক করে দেখতে রাজি হল না।

তবু আসে সুখের দিন। নবাবী আমলের বেগমদের সুখের দিন আসত যে-দিন নবাব রাত কাটাবেন বলে খবর পাঠাতেন। দাসেদের সুখের দিন জাহাজের শেষ চার দিন। তখন ধোয়া, মোছা, সাজান, তেল, সাবান, হাতে-পায়ে শেকলের ঘা সারাবার ব্যবস্থা, চুলে রঙ, দাঁত মাজা, খাবার-দাবারে জোরাল তাগৎদার, মাংস-মাখন। তারিবং দেখে কে। ওরই মধ্যে দেখতে-শুনতে ভাল মেয়েরা একটা দিন রাত কাপ্তেনের গদীতেই কাটাত। রাতে কে বুঝত উর্বশীই বা কে আর এই কাল চামড়ায় ঢাকা সুন্দরীই বা কে। ভাবটা তোলা একটি বিখ্যাত কবিতা থেকে।

The winged fish, in purple trace
The chariot drew with easy
grace

Their azure rein she guides;
And now they fly and now
they swim,

Now o'er the wave they lightly
skim,
Or dart beneath the tides

In 'Florence', where she's seen'
Both just alike except the
white,
No difference, no—not at night
The beauteous dames between..

ব্যাপারটা এই যে, একজন রয়্যাল একাডেমীর শিল্পী টমাস স্টথার্ড এক নিগ্রো সুন্দরীকে সমুদ্রের বুকে ঝিনুকের আশ্রয়ে এমন আঁকলেন যে দেখলেই প্রখ্যাত শিল্পী বত্তিচেল্লীর অতিখ্যাত বার্থ অব ভিনাস' চিত্রটি মনে পড়ে যাবেই। আঙ্গিকে, বিন্যাসে একেবারে এক, হুবহু। কেবল বত্তিচেল্লীর ভিনাস শাদা, এ ভিনাস সেবল ভিনাস কালো ভিনাস। (সেবল কাল পশমী কাপড়। সাধারণত শবাধার ঢাকা হয়। মৃতের জন্য শোক পরিচ্ছদে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এ ভিনাসেরে জীবনের জীবন্মৃত রূপটি নামেই প্রকাশিত)। উত্তর কালে যখন আমেরিকার নিগ্রো আন্দোলন ঘনীভূত হয়ে ওঠে তখন এই সেবল-ভিনাসের ছবি বহু যুবককে উন্মাদনা, উত্তেজনা, উৎসাহ, উদ্দীপনা জুগিয়েছে। কিসে কম আমরা? আমরাও মানুষ। তোমাদের মত সুন্দর, শ্রীমণ্ডিত, স্বাস্থ্যবতী এবং তোমাদের চেয়েও সৎ।

এবার বলা যাক এই দাস ব্যবসায়ের তোড়ের মুখে স্বয়ং ইয়াংকীরা কি খেল দেখাচ্ছিলেন। তাঁদের কীলাখেলা সবই এক বিচিত্র মাদুলী-তাবিজ ঢাকা। সে মাদুলী-তাবিজের নাম দেমক্র্যাসী। সেটি সেঁটে নিলে আর কোন পাপের সাধ্য নেই যে মুখ কালো করে দেয়।

খানিক আগে আমরা বলে এসেছি যে, নতুন উপনিবেশ আমেরিকা ধীরে ধীরে ফেঁপে-ফুলে বাড়ছিল। তারাই কিনছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হাট থেকে দাসদের। কিন্তু কেউ কেউ ভাবতে লাগল দাস ব্যবসায়ে যখন এত টাকা তখন ঐ ওয়েস্ট ইণ্ডিজে গিয়ে দাস কেনার হাঙ্গামা না পুষিয়ে সোজাসুজি নিজেরাই তো দাস চালান ব্যবসা শুরু করা যায়।

যায় কিন্তু অন্তরায় ছিল। নতুন উপনিবেশ আমেরিকা। তার মাতৃভূমি ইংলণ্ড। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ওলোন্দাজ জাহাজই অতলান্তিক পারাপার করত। তাদেরই ঢাউস ঢাউস জাহাজ, জাহাজে লস্করের দলকে-দল, বন্দুকরে, কামানরে, কারণ বোম্বেটেও যেত, পাইরেটও তত। (তফাৎটা পরে বলা যাবে)। এর মধ্যে আবার সেরা সেরা বোম্বেটে ফরাসী। তারা থাকে মার্তিনীক এবং গুয়েদালুপের খাঁড়ি-খোঁজের মধ্যে। কার সাধ্য ধরে। এ সব ছাড়া ক্যারাবিয়ানের ঝড় আছে, দক্ষিণ-পূর্ব সমুদ্রের গুমোট-স্থির আকাশের স্তব্ধতা আছে, আফ্রিকার উপকূলের কুখ্যাত জ্বর এবং আমাশা আছে। হাঙ্গামা কম নয়।

কিন্তু লোভের কামড়ানী তাড়ুলে কামড়ানী। লোভই কাম। লোভ থেকেই সব পাপের খোড়া। কম দুঃখে শান্ত যোগী বুদ্ধ ত্রয়হাঃন্তে সবার রক্ত রিপু বলেছিল।

স্বর্গ-মোক্ষ থাক-না-থাক মানুষ যখন, তখন শান্তি বলে কথা আছেই, থাকবেই। মনকে গীতা বলেছে চঞ্চল। মন মন হলেই চঞ্চল হবে। সেটার শান্ততাই শান্তি। এই আমাশায় ভোগা আউরেনও যেমন চেয়েছে, আবার আফিমে বুঁদ দীনজনরাও যেমন চেয়েছে, তেমনি বোম্বেটে ক্লাইভও চেয়েছে। লোভ যাবৎ আছে, শান্তি তাবৎ নেই। দেমাক এবং ডাঁককে শান্তি ভাবা মুখামী।

ঐ লোভের তাড়ায় হলো হোলো আমেরিকা। আমেরিকান জাতটার জন্মো ঐ লোভে। আজ যারা নিজেদের আমেরিকান বলে তাদের ইতিবৃত্ত কী? তারা আসল আমেরিকার বাসিন্দাদের খুন করে, তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে, ভিটে মাটি উচ্ছন্নে দিয়ে রক্তের কাদায় পা দিয়ে নিজেরা জবর করে বসেছে। এ ইতিহাস রক্ত লেপ পৈশাচী ইতিহাস। এ কেউ আর না করতে পারেন না। লোভে। শুধু লোভ।। লোভেরই তাড়ায় ছুটেছে ষাঁড়ের ল্যেজে টিন বেঁধে দিলে যেমন ছোটে। ভস্ম-লোচনের তাড়ায় শিব যেমন ছুটেছিলেন। ঐ যে ধার দেয় ও তো লগ্নী, ঐ যে খয়রাত করে ওতো বাজার কেনা, ঐ যে একলপাট বিশেষজ্ঞ পাঠায়, ওতো দালাল পাঠায়, ঐ যে উচ্চশিক্ষা দেবার জন্যে কলারশিপ দেয় ওতো দেশের সেরা সেরা ছাত্রদের মস্তিষ্কের জৌলুষ, দীপ্তি শানে ঘষে পালিশ করে দেবার চাকা।

এ তো কোনো জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, কৃষ্টির এক চৌটিয়া লেকড় থেকে বেরুনো সমাজ নয়। নানা সংঘাতে, অভিঘাতে, আবর্তে পড়ে নানা দুনিয়া থেকে নানা মানুষ এই মহাদেশটায় জড়ো হয়ে প্রথমেই আইন, নীতি, বিচার, ধর্মের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বে-ধড়ক ঠেঙিয়ে, খুন করে, ওপর চড়াও হয়ে পরের পর জমি দখল করে আর 'কেমন'-এর খুঁটো পুঁতে রাখে। লোভের তাড়ায় সব ভাসিয়ে দেয়। এদের একমাত্র ভগবান— টাকা। বিপুল টাকা। যেন তেন প্রকারেণ। য়োরোপে তবু জনমত, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, ধর্ম বলে যা হোক একটা আবডাল ছিলো। এদের তাও রইলো না, প্রথম থেকেই।

এরা কেন হাত লাগাবে না দাস ব্যবসায়ে। কিন্তু যখন লাগালো সেই প্রসিদ্ধ আমেরিকান ছাপটি রেখে গেলো। জলদস্যু সব দস্যুর মতোই মানুষ সমাজের একটা দিক। ছিলো, আছে, থাকবে। আজও যারা চোরাকারবারী তারাও তাই। কিন্তু 'বোম্বেটে' বলে একদল জাহাজী কাপ্তেন ছিলো। তারাও এক জাতের দস্যু। মোকা পেলেই অন্য জাতকে আক্রমণ করতো। যেমন ইংরেজ ডেক বা হকিন্স ফরাসী জাহাজ বা স্পেনের জাহাজ পেলেই লুটতো। স্পেনের উপনিবেশ, কুঠী জ্বালিয়ে দিতো। আর স্পেনের বোম্বেটেরাও তাই করতো। তফাৎ এই যে, বোম্বেটে ধরা পড়লেই তার সাজা ফাঁসী। তার বলা ম্যাজুয়াল্ড। প্রাইভেটিয়ার্স: আলাদা নয়।

২ আদালতে জবান বন্দী—ম্যানিকস অ্যাণ্ড কাটলে—পৃঃ ১২০

তারা আপ-রুচি, মন-মৌজী কাপ্তেন। কোনো পতাকার ধার ধারে না। ধরা পড়লেও (যদি শত্রু পক্ষ না ধরে) তার জাতের চোখে কোনও অপকর্ম করছে না। বরং সৎকর্মই বলতে পারা যায়। শোন যখন, পায়রা সে খাবেই। ঈগল যখন, শোন খাবেই। কেবল লাভের বখরা দেশের রাজাও পেতেন। ধরা না পড়া পর্যন্ত তারা যা করছে তা বে-আইনী নয়। ধরা পড়লেও রাজা তাকে ছাড়াবেন। নইলে সে ইতিহাসে বন্দনীয় হয়ে থাকবে। শিবাজীর সময়ে বম্বের উত্তরে থানায় এমনি সব কীর্তিমান বোম্বেটে ছিলো। অওরংজেব জোর চালিয়ে আরব বোম্বেটেদের শান্ত করেছিলেন, কিন্তু মারাঠাদের হাত থেকে সুরাট রক্ষা করতে পারেননি।

আমেরিকান জাহাজ বড়ো নয়। অতলান্তির পার হবার তার দরকারও হয় না। পার তারা হয়ও না। কোনোটা স্লুপ, কোনোটা ইয়াট, আমেরিকার তীরে তীরে ঘুরে বেড়ানো বড়ো জোর ক্যারাবিয়ানের দ্বীপগুলো আর আমেরিকার মধ্যে চলাচলের মতো ব্যবস্থা ছিলো। লস্কর থাকতো নাম-মাত্তোর, কাপ্তেনের জ্ঞানও তথৈবচ, কাপ্তেন নামেই কাপ্তেন, সেও লস্করদেরই একজন। আমেরিকায় তো সবাই ভুঁই-ফোঁড়!

একবার এক আমেরিকান ককটেলে আড্ডার মুখে ক'জন প্রোফেসরের মধ্যে মাসরুম (ব্যাঙের ছাতা) আর চিংড়ি খেতে খেতে বলেছিলাম, আমেরিকার জাতীয় ফল-ফুল-সব্জীর মিলিত প্রতীক এই মাশরুম। তাঁরা ভাষ্য দাবী করেন। সবিনয়ে পেশ করলুম সেই 'মে-ফ্ল্যাওয়ার' থেকে অদ্যাবধি বাইরে থেকে করছো কী? উড়ে এসে জুড়ে বসে যে-গাছে বসেছো, সেই গাছ থেকেই রস চুষে অতিথিবৎসল, আশ্রিত প্রতিপালকদের শেষ করে ফেলে তবেই রসে রূপে সুশ্রী হয়েছো। যদিও পুষ্টিকর, তবুও পরভৃতিক তো বটেই! সেই 'মে-ফ্ল্যাওয়ারের' সময় ছিলে মাশরুম। আজও তাই। আমেরিকান মাশরুমে দুনিয়ার বাজার ভর্তি।

সেই 'মে-ফ্ল্যাওয়ারে' এসে জুড়ে বসা থেকে নাগাসাকি-হিরোসিমায় এ্যাটম বম্ পর্যন্ত যা করছো মাশরুম আর মাশরুম। ...বস্তুই তোমাদের মানসিকতার প্রচ্ছন্ন প্রতীক।

হেসেছিলেন তাঁরা। না হেসে করেন কী। কিন্তু বুঝলাম যে বক্তব্য নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করেননি। এই উড়ে এসে জুড়ে বসার দায় পোয়াচ্ছে য়োরোপ, যেখানে আমেরিকার বাড়তি টাকা পরেপর বড়ো বড়ো শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলো খরিদ করে তো নিচ্ছেই ব্যাংক এবং অর্থ-... ...টাই কিনে নিচ্ছে। উড়ে এসে জুড়ে ...। ইংরেজ ডেকেছিলো হিটলার থেকে বাঁচাতে। এখন হিটলারও হাসছে, ...লনও হাসছে। উড়ে এসে জুড়ে বসার ...নি চাই—তো-দৃষ্টি পড়ুক গরীবে, সাইপ্রাসে, লমুম্বা—আয়েন্ডী নিধনে, কঙ্গো-এঙ্গোলায়, ইন্দু-চীনে, প্যালেস্টাইনে—কোথায় নয়? ভারতবর্ষেও তো। এই সেদিন পথে পথে হঠাৎ সরকারকে মেরে পিটে যেন তেন প্রকারেণ শুদ্ধমতি করে তোলার প্রকোপে নম্বরী অরাজকতা এসেছিলো (১৯৭৫)। সে থাক্‌তায় তো সব ওলোট-পালোট হয়েই গিয়েছিলো আর কি! হঠাৎ 'এমার্জেন্সী' ঘোষণা করে কোনওক্রমে আবার চক্রান্ত থেকে বার হওয়া গেলো।

এটা ওদের ইতিহাসে। দেমক্র্যাসী বলতে ওয়েস্টমিনস্টার যা বোঝে, ইয়াংকীরা তা বোঝে না। ইয়াংকীর দেমক্র্যাসী যেন দর্জির রেডিমেড মাপসই কাট। আগে কেটে সেলাই, পরে গায়ে চাপানো। কিন্তু ওয়েস্টমিনস্টারের দেমক্র্যাসী তা নয়। সে যেন গায়ের চামড়া, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া। ওয়াশিংটনে যারা কংগ্রেসে বসে ইয়াংকী দেমক্র্যাসী শিল্প রচনা করলো, তাদের বেশির ভাগই গায়ের জোরে আর পকেটের জোরে সম্ভ্রান্ত হয়েছিলেন। ওখানে মানো তো মানো, না মানো তো গুলি। যতো 'প্রেসিডেন্ট' ঐ আমেরিকানমণ্ডলে নিহত হয়েছেন, ততো আর কোথায় হয়েছে? তবু একে গান-বোট ডিপ্লম্যাসী বলা আজ যাবে না। কারণ একটা আমেরিকা ইউএনও-তে, একটা আমেরিকা হোয়াইট হাউসে, একটা আমেরিকা সিআইএ-র জটিল গহ্বরের বন্দী।

কাজেই সেই বোটের ওপরে নামকে ওয়াস্তে যে ক্যাপ্টেন, সেও ক্যাপ্টেন নয়। কেউ তাকে মানে না। কাজের সময় ছাড়া তারা আড্ডাও দিচ্ছে, জুয়াও খেলছে, এক মেয়ে নিয়েই আপোষে রেষারেষিও করছে। ডিসিপ্লিন ছিলো না। আর অতলান্তিকের সেই অথৈ সমুদ্রে বিনা ডিসিপ্লিনে পার হওয়ার চেষ্টাও আত্মহত্যার সামিল।

তবু, এতো সব অন্তরায় সত্ত্বেও, লোভের ঠেলায় সেই স্লুপ আর ইয়াট-মার্কা নাও নিয়েই মার্কিন ছাওয়ালেরা পাড়ি দিতো, এমনই সোয়াদ ছিলো দাস-ব্যবসায়ের মুনাফায়।

জলে আমেরিকান কাপ্তেনরা (অন্ততঃ তখনকার দিনে- বেশিকড়াকড়ি করলেই স্থলে কি করে খবর এসে যেতো। তখন আবার দেমক্র্যাসি-নবীদের কাছে খেতে হোতো ধমকানি। এ-দেমক্র্যাসি তো চামড়ার দেমক্র্যাসি নয়, দর্জির কাটা দেমক্র্যাসি। বেশি তোড়্‌মোড় করে কাপ্তেনী দেখালেই মানুষ বলবে 'এসো আমার পাড়ায়, দেখে নেবো!' চার্চের পাত্রী শাসাবে—আমার যজমানদের ক্ষেপিয়েছো কেন, পাড়ার মেয়েরা ছড়া বেঁধে গান গাইবে—

টমাসের পো হ্যাংলা
কালো মেয়ের ক্যাংলা
চড়তে গিয়ে কোলে তার
ফিরে এসেছে ন্যাংলা।

এটা অবশ্য আমেরিকায় কেউ গায়নি। কিন্তু গেয়েছিলো—

Old Floyd Ireson, for his
hard heart
Tarr'd and feathere'd and
crried in a cart
By the women of Marble head'

আয়ারসন অবশ্য আয়ারল্যাণ্ডের সুপুত্র কেউ। এবং গায়িকারাও নিশ্চয় আইরিশ, অন্ততঃ কবিটি তো বটেই। ঐ যে ট্যারেড অ্যাণ্ড ফিদার্ড মানে সারা গায়ে আঠা (আলকাতরা) ঢেলে আস্তাকুঁড়ের মুর্গির পালক সারা গায়ে আটকে দিয়ে সাজা দেবার রীতি, সে ঐ আয়ারল্যাণ্ডেই আছে। মার্বেলহেডের কাপ্তেনের অযত্নে নাকি তার জাহাজের এক খালাসী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। ফলে গাঁয়ে তাকে আর ঢুকতে হয়নি। এ অবস্থায় কোন্ কাপ্তেন কী ডিসিপ্লিনই বা জবরদস্তি চাপাবেন? ক্যাপ্টেন উলফ ছিলেন আমেরিকান সেনেটের সদস্য। অথচ তাঁর নামে আদালতের হুকুম ছিলো যে, তিনি মার্ডারার, খুনে। খুনে বলে দোষী সাব্যস্ত হয়েও সেনেটার হওয়া যে-সে দেশের দেমক্র্যাসিতে সম্ভব নয়। বেচারী নিক্‌সন-ই ফেঁসে গেলো নিজের ফিতেয় নিজে। ক্যাপ্টেন উলফের নামে নালিশও বড়ো কম ছিলো না।

"The bill of indictment charges that the same James de Wolfe not haping the fear of God before his eyes, but being moved and seduced by the instigation of the Devil ......did feloniously, willfully and of his malice afore thought, with his hands clinch and seize on upon the body of said Hegro wooman...... and did push cast and throw her from out of the said vessel into the Sea and water of the Ocean, whereby and whereupon she then and there instantly sank, drowned and died". 3

পাছে সবার বসন্ত হয়—এই ভয়ে বসন্তে আক্রান্ত এক নিগ্রো-নারীকে জীবন্তই জলে ফেলে দিয়েছিলেন। তিনি হলেন সিনেটর। খুনের দা-উলফ মামলায় অপরাধী হয়েও সাজা পাননি।

---

3. Howe—George:—Mount Hope. A New England Chronicle Ch. VII (New York—1958).

(চলবে)

ডেণ্টিস্ট আখ্‌তার মিঞা

পরিতোষ সেন লিখিত ও চিত্রিত

"দন্তচিকিৎসক"—এ নামটি শোনা মাত্রই আমাদের বুকের ভেতরটা কাটা কইমাছের মত লাফিয়ে ওঠে। তার ওপর চিকিৎসক যদি নিজের তালিম নিজেই দিয়ে থাকেন তাহলে ত আর কথাই নেই। প্রাণ-পাখিটি উড়ে যায়। এমনই এক ডেন্টিস্ট্ ছিল আমাদের পাড়ায় আখ্‌তার মিঞা। তার দোকানের মস্ত সাইনবোর্ডটির বাঁদিকে একটি মেম্‌সাহেবের মুখাবয়ব আঁকা। রোদ-বৃষ্টি-আর্দ্রতার দাপটে তাঁর মুখের আসল রঙটির অনেকটাই উঠে গেলেও, কোনো এককালে তাঁর গণ্ড যে খোরাসানী আপেলের মতই মসৃণ এবং গোলাপী ছিল, একটু নজর দিলে, তা এখনো ধরা পড়ে। নিলামের দোকানে পুরোনো ভাঙা পিয়ানোর পর্দাগুলোর মতই ময়লা একপাটি পোকা খাওয়া দাঁত বের কোরে তিনি এমনই মুখভঙ্গী কোরে থাকেন যে, হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন একটি মেয়ে-কঙ্কাল মুখ ভ্যাংচাচ্ছে। এছাড়া তাঁর দুই চোখে ছিল দুই দৃষ্টি। দাঁতের ব্যথায় গভীর বিষাদে

ভরা ডান চোখটি অপলক চেয়ে আছে পূবের আকাশ পানে। পশ্চিমে নিবন্ধ অন্য চোখটি দুষ্টুমি ভরা ইসারায় কি যেন বলে। শুনেছি, এক আনাড়ি সাইনবোর্ড-চিত্রকরের হাতে পড়ে সুন্দরী বিদেশিনীর এই হাল হয়েছিল নাকি। তাঁর যত্নে ধরা লোহার রঙের কবরীটি গাদা গাদা কনকচাঁপায় অলংকৃত। যুক্তির দৃষ্টিতে অপরাধ হলেও, চিত্রকরের স্বাভাবিক কামনাটি এমন দোষের কি! হাজার হোক, অবনঠাকুর থেকে, মায় পরিতোষ সেন পর্যন্ত সবাই খোপা আঁকলেই তো তাতে ফুল গুঁজে দিয়েছেন। মেমসাহেবের ডান পাশে আসমানিরঙের পটভূমিকায় মস্ত বড় ইংরিজি হরফে লেখা — "ডাঃ জেড এম আখতার, ওয়ার্লড-রিনাউন্ড-ডেন্টিস্ট্"। কটকটে লাল রঙে লেখা এই হরফগুলোর একপাশে ঘন কালো ছায়া ফেলে চিত্রকর, তাদের অস্বাভাবিক রকম ফুটিয়ে তুলেছে। তাজমহলের অন্দরের নকসার অনুকরণে, হরফের চারপাশ, অনুরূপ ফুল-লতা-পাতায় ভরা। এক কথায়, সাইন-বোর্ডে তিলধারণের স্থান ছিল না। অবিশ্যি আখতার মিঞার মতে, এই জায়গার অভাবের দরুণই তার দন্তচিকিৎসাবিদ্যার যথাযথ খেতাবটি সাইনবোর্ডে স্থান পায়নি। দোষটি পুরোপুরি নাকি চিত্রকরেরই। কিন্তু যে রোগীর একবার তার চিকিৎসার অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ হয়েছে, তার পক্ষে এ যুক্তিটি অবিশ্যি মেনে নেয়া মোটেই সহজ হত না।

একদিন আমি এবং আমার শৈশবের অতি প্রিয় বন্ধু শম্ভু, এক সঙ্গে স্কুলে যাচ্ছি। হঠাৎ এক বিকট চিৎকারে আমরা থেমে গেলাম। একেই ত ভয়ানক আর্তনাদ, তার ওপর আবার নারীকণ্ঠ। আখতার মিঞার চেম্বারের মস্ত বড় কাচের জানলায় নাকমুখ চেপে উঁকি দিতেই দেখি, তার বিশেষ চেয়ারটিতে উপবিষ্ট প্রৌঢ়া এক মহিলা ছাদের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছেন। একটি যুবক পেছন থেকে চেপে ধরে আছে তাঁর হাত দুটি। গায়ে ময়লা শাড়ি। কাঁকড়ার ঠ্যাংএর মতো সাঁড়াশিটি দিয়ে মিঞা, দাঁত খিঁচিয়ে, তাঁর মাড়ির দাঁত ধরে টানাটানি করছে। মহিলার চিৎকারও সেই অনুপাতে তীব্র নিখাদে চড়ছে। এ-ধরনের ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটলেও দাঁতের ব্যথায় আখতার মিঞাকে স্মরণ করা ছাড়া আমাদের উপায় ছিল না। তৎকালের ঢাকা শহরে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত ডেন্টিস্ট খুব কমই ছিল। তাছাড়া আমাদের ইসলামপুর পাড়ার ত্রিসীমানার মধ্যে সবেধন নীলমণি এই আখতার মিঞাই।

পেশার খাতিরে খানিকটা আসুরিক উপায়ের আশ্রয় নিতে হলেও, তার প্রশস্ত ছাতির তলায় কোমলতার যে একটি পুষ্করিণী ছিল সেকথা কে না জানতো। গরীব দুঃখীজনরা তার দুয়ারে এসে কখনো খালি হাতে ফিরে যেত না। প্রতি বছর

দুটো বুভুক্ষু গরু ঘাস খেতে এসে তার জুব্বার লোম ধরে টানাটানি করল

রমজানের শেষে সে অল্পবিস্তর দান-খয়রাতও করে থাকে। তাছাড়া, বিপদে-আপদে পাড়াপড়শী অনেকরই পাশে তাকে দাঁড়াতে দেখেছি।

দুর্গোৎসবের মাসখানেক আগেকার কথা। মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে সবেমাত্র আমরা ওপরে উঠে এসেছি, এমন সময় একের পর এক, প্রচণ্ড বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজে গোটা বাড়ির দরজা জানালাগুলো ঠক্‌ঠক্ করে উঠল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। হাওয়ায় পোড়া বারুদের উৎকট গন্ধ। দেখি মসজিদের তলায় বাজিকর ঝুন্নুর মিঞার দোকান থেকে ভুষো কালো ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে আশেপাশের সমস্ত বাড়িঘর আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। শুধু সাদা আজান দেবার গম্বুজটি বেরিয়ে আছে। দৌড়ে সেখানে পৌঁছতেই শোনা গেল যে, তুবড়িতে বারুদ ঠাসবার সময় আকস্মিকভাবে আগুন ধরে যায়। পাশেই, আপেলের গুচ্ছের মত, মস্ত মস্ত সদ্য তৈরি বোমা, দড়ি থেকে ঝুলছিল। চোখের নিমেষে বারুদের আগুন সেখানে পৌঁছে গেল। বাজিকর আহত হয়ে দোকানের ভেতরেই আটকা পড়ে যায়। বালতি বালতি জল-বালি ঢালা সত্ত্বেও আগুন যদিওবা কিঞ্চিৎ কমলো, বিস্ফোরণের কোনোই লাঘব নেই। আখতার মিঞা, কোথা থেকে ছুটে এসে, ভালোমন্দ বিচার না করেই এক দুঃসাহসিক কাণ্ড করে বসল। নিজের জীবন বিপন্ন করে, এক লাফে দোকানের ভেতর প্রবেশ কোরে, ঝুন্নুর মিঞাকে দুহাতে তুলে আনল। ঘোড়ার গাড়িতে বসিয়ে তৎক্ষণাৎ তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল।

আখতার মিঞার দোকানে যাবার পথটি ছিল আমাদের বাড়ির সামনে দিয়েই। তার চেহারার জৌলুশ বাড়াবার উদ্দেশ্যেই হোক কিংবা একদা সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত থাকার দরুনই হোক, বছরের তিনশ পঁয়ষট্টি দিন, ইউনিফর্মের মতই, তার পরনে মিলিটারি খাকি হাফসার্ট, মালকোচা মারা ধুতি, আর পায়ে সাদা ক্যাম্বিসের জুতো। পোশাক আশাকে তার এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষণীয় ছিল দুই কারণে। প্রথমতঃ শহরের বেশির-ভাগ মুসলমানই পরত লুঙ্গি আর বোতাম-ওয়ালা রঙীন গেঞ্জি, কিংবা পায়জামা-পাঞ্জাবি। দ্বিতীয়তঃ, কাজেকর্মে, চালে-চলনে, গজগমনে মিঞা যখন দোকানের দিকে এগোয়, আমাদের গোটা বাড়িটা থরথর করে কেঁপে ওঠে। যেন দশটন একটা রোলার যাচ্ছে। ঢাকার সদর জেলের কাছে পিলখানার সংলগ্নই তার বাড়ি। হয়ত এই কারণেই ওখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে তার কিঞ্চিৎ শারীরিক সাদৃশ্য। তাছাড়া, পাতিয়ালার বিখ্যাত কুস্তিগীর জুম্মা খাঁর কাছে কিছুদিন নাকি শাকরেদিও করেছিল।

আখতার মিঞার যাতায়াতের সময় আমাদের সংকীর্ণ জিন্দাবাহার গলিটি সাময়িকভাবে অন্ধকার হয়ে আসে। যেন হঠাৎ আংশিক সূর্যগ্রহণ হচ্ছে। তার দেহের এবং দৈর্ঘ্যের বহর দুইই এত কাছাকাছি ছিল যে, কোনটি বেশি ঘন, তা ঠাহর করা মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। তার পর্বতপ্রমাণ বপুটিতে একদিকে ওজনের, আর অন্যদিকে চর্বি এবং মাংসপেশীর চমৎকার বিভাজন। এ দুইই যেন দোকানের থানকাপড়ের মত, আপাদমস্তক থাকে থাকে সাজানো। অনেকটা মোটরগাড়ির মিচেলিন টায়ারের বিজ্ঞাপনের বহু পরিচিত লোকটির মতো। এবং এই লোকটির মতেই তার মুখেও সর্বদা একটি হাসি। নানারকম প্ররোচনা-উত্তেজনার মুখেও এই হাসিটি তার ঠোঁটে ভোরের পারিজাতের মতই অবশ্যাম্ভাবীরূপে ফুটে থাকে, এবং তার রেণু ছড়ায়।

প্রতি বছর বর্ষার শেষে, নুরুদ্দিন মিঞা আমাদের গলির মুখে একটি আখের দোকান লাগায়। সোনালি রঙের পাকা আখের আঁটিগুলো, বিকেলের আলোয় বেশ রসাল দেখাচ্ছে। আখ কিনে বাড়ি ফিরব, এমন সময় আমার চোখ, গলির বিপরীত দিকের দোকানটির দিকে গেল। দেখি আখতার মিঞা একটি ন্যাকড়া বালতিতে ডুবিয়ে মেঝেটা মোছামুছি করছে। মোছা শেষ করে মিঞা, বালতি ভরতি ময়লা জলটা দোকানের ভেতর থেকেই, ধুলো ভরতি রাস্তার দিকে ছুড়ে দিল। একটি ভদ্রলোক বয়েসে প্রৌঢ়, পরনে দামী চীনা সিল্কের পাঞ্জাবি এবং লুঙ্গি, হাতে রুপোর হাতলওয়ালা ছড়ি, পায়ে হরিণের চামড়ার চটি—ঠিক সেই মুহূর্তে আখতার মিঞার দোকানের সামনে দিয়ে সান্ধ্যভ্রমণে যাচ্ছিলেন। তাঁর এই শৌখিন পোশাক-আশাকের যে কী হাল হল তা সহজেই অনুমেয়। ব্যাপারটি এমনই হঠাৎ এবং অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটল যে, ভদ্রলোক তাঁর পাঞ্জাবিটার দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তারপর দোকানদারের দিকে দৃষ্টি যেতেই তাঁর খয়েরী রঙের ডাগর চোখ দুটি অবিকল পাকা বটফলের রূপ ধারণ করল। একদিকে হতবুদ্ধি, আরেকদিকে প্রচণ্ড ক্রোধ, এ দুয়ের সংমিশ্রণে, তিনি একটি ম্যালেরিয়া রোগীর মত কাঁপতে থাকলেন। সেই অবস্থাতেই তার মুখে চিৎকার চেঁচামেচির একটি ফোয়াড়া ছুটল। ছোট-খাটো একটি ভিড়ও জমে গেল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দোকানের ভেতর, অপরাধী লোকটি, একটি মূর্তির মতো সম্পূর্ণ নিশ্চল এবং নীরব। মুখে ক্ষমাপ্রার্থী,লজ্জ সলজ্জ, সবিনয় হাসি। গালিগালাজের অনুপাত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার হাসিটি আস্তে আস্তে একান থেকে ওকান অব্দি ছড়িয়ে পড়ল। এ কৌতুকপ্রদ দৃশ্যটি দেখে, ভিড়ের মধ্যে কারুর কারুর মুখেও হাসির রেখা ফুটে উঠল। অল্পক্ষণের মধ্যে একটি সংক্রামণের মতোই, এই হাসি সমবেত সকলের মুখে ছড়িয়ে পড়ল। সিল্কের পাঞ্জাবি পরিহিত ভদ্রলোকটি বিহ্বল হয়ে এদিক ওদিক তাকালেন। তারপর তিনি নিজেও হাসতে হাসতে এগিয়ে গেলেন।

আখতার মিঞাকে দেখে মিচেলিন টায়ারের লোকটির কথা মনে আসার আর একটি কারণ হল এই যে, তার শরীরের অনুপাতে মাথাটি অত্যাধিক রকমের ছোট। ঠিক যেন বিরাট জালার মুখে ছোট একটি ঘটি। এরকমটি দেখাবার জন্যে হয়ত তার বিশেষ ধরনের চুলের ছাঁটই দায়ী। চুল ঘন থাকা সত্ত্বেও মাথার পুরো পেছনের দিকটাই কামানো। কানের দুপাশও তাই। শুধু সামনের দিকে তিন-চার ইঞ্চি লম্বা কয়েক গাছা চুল। তার মাঝখান দিয়ে সুতোর মত সরু সিঁথি। অতি যত্নে, গুনে গুনে ডানপাশে ছটি, বাঁ পাশেও ছটি—ঢেউ খেলিয়ে দিত। কিংবদন্তি ছিল যে, তার চুলের এই বাহার দেখে, জয়নাব, জুবেদা, সিতারা—এরকম অনেক পর্দানশিন যুবতীরাই নাকি হিংসায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। সে যাই হোক, মাথায় কেশের স্বল্পতাকে পূরণ করে দিয়েছিল তার শরীরের লোমের অস্বাভাবিক ঘনত্ব এবং বৃদ্ধি। বোতাম খোলা কামিজের ভেতর থেকে তার কপাটবক্ষের ঘন জঙ্গল যেভাবে উঁকিঝুঁকি মারে তাতে করে দর্শকদের মনে বাকি শরীরের লোমের পরিমাণ সম্বন্ধে কৌতূহলের সীমা ছিল না।

বৈশাখ জৈষ্ঠ্যের অসহ্য ভ্যাপসা গরম এরকম দিনে দোকান থেকে বাড়ি ফেরবার সময় আখতার মিঞা আরমানিটোলার মাঠে খে[illegible] যেত। সেখানকার সবুজ নরম ঘাসের ও[illegible] ঠান্ডা, খোলা, দখিন্ হাওয়ায়, [illegible] তার বিরাট বপুটিকে একটু জুড়িয়ে নিত।

একদিন ঐ মাঠে ফুটবল ম্যাচ খে[illegible] আমরা ফিরছি। সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে। মা[illegible] দক্ষিণ প্রান্তে কয়েকটি গরু ঘাস খাচ্ছে। দ[illegible] থেকে আবছা সাদাকালো একটি [illegible] আমার নজরে এল। সেটির কাছে [illegible] দেখি, আখতার মি[illegible] উপুর হয়ে শু[illegible] পরিত্রাণে নাক ডাকাচ্ছে। এলিয়ে দেয়া বিশাল খালি গা ঘাসের সঙ্গে মিশে আছে। ধু[illegible] গুটোনো, কোমরের চারপাশে [illegible]। খ[illegible] হাফশার্টটি পোটলাকারে পাশে রা[illegible] সন্ধ্যার অন্ধকারে দুতিনটে বকনা [illegible] ঘাস খেতে খেতে একপা-দুপা করে এগি[illegible] এসে, মিঞার ঘাড়, কোঁকড়ানো, পিঠের বগলের লোম ধরে টানাটানি আরম্ভ [illegible] গরুগুলোকে দেখে অবশ্য বোঝা গেল যে এই কালো ঘাস তাদের মুখে কী [illegible] লাগল! যাই হোক এ অচিন্তনীয় অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্যটি দেখে আমরা একে হতভম্ব। হঠাৎ দেখি মিঞা ধরফর করে বসল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে র[illegible] তারপর হো-হো-হো-হো করে স[illegible] আকাশ-বাতাস ভরিয়ে দিল। সে কি [illegible] খোলা নির্মল হাসি।

প্রতিদিন সকালে দোকানে পে[illegible] আখতার মিঞা চেয়ার-টেবিল [illegible] জানলার কাঁচ—এ সব কিছুই নিজের [illegible] ঝাড়পোঁছ করে সংলগ্ন পর্তুগীজ [illegible] কম্পাউন্ড থেকে জল আনে। তার [illegible] যত্নের দরুন, দন্তচিকিৎসার যন্ত্রপাতি আরশীর মত ঝকঝক করে। [illegible] রোগীর অভাবের দরুন তার হাতে সময়। তার ওপরে তার মস্ত বপুটি

র্মোগ্যমের একটি বিরাট আকর। তাই র্তের জন্যেও নিষ্ক্রিয় থাকা তার পক্ষে কেবারেই অচিন্তনীয়। একদিকে পশারের কপাতা, অন্যদিকে কুমার-জীবন, এ য়ের টানাপোড়নে একটি চাপা নিঃসঙ্গবোধ, কটি ব্যাধির মত, প্রায়ই চাড়া দিয়ে ওঠে। াকীত্ব তার কাছে নিতান্তই পীড়াদায়ক। ই সময় কাটাবার জন্যে আশেপাশের কানীদের সঙ্গে গপ্পোগুজব করে। গালে কে দালালিও করে। বেপাড়ার কোনো লোক, মাদের পাড়ার ঠিকানার সন্ধানে এলে সে র সঙ্গে গিয়েই বাড়িটি দেখিয়ে আসে।

তাছাড়া পাশের মনোহারি দোকানের মালিক বজ্রবাবুর প্রয়োজনে, তাঁকে নতুন বাড়ির খোঁজ তো সেই এনে দিয়েছিল। নিজের কুমার-জীবনের অবসান নাইবা ঘটল, তাতে কি। ফলবিক্রেতা আশগর মিঞার কন্যা আফসানার সঙ্গে ঘুড়িবিক্রেতা জমির মিঞার ছেলে কাদেরের বিয়ের ঘটকালিও তো সেই করেছিল।

চেহারায় যে আখতার মিঞা অবিকল নবাবজাদার মত নয়, এবং তার কুমার-জীবন দীর্ঘতর হবার এটিই যে প্রধান কারণ, সেকথা তার জানতে বাকি ছিল না। কিন্তু পা থেকে মাথা পর্যন্ত তার ব্যক্তিত্বে যে বিরাট পৌরুষের ছাপ ছিল তা কি আর অস্বীকার করা যায়; তার ওপর প্রথম মহাযুদ্ধে মেসোপটেমিয়ায় জার্মানদের সঙ্গে লড়াইয়ে মিঞার অসাধারণ এবং চাঞ্চল্যকর বীরত্বের কাহিনী এবং নানারকম আজব অভিজ্ঞতার কথা ঢাকা শহরে কে না জানত!

মরুভূমির এক ভয়ংকর লড়াইর কথা। শত্রুপক্ষ পুরো এক হপ্তা ধরে অবিরাম তীব্র আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। তার দলের প্রায় সব সেপাইরাই নাকি একের পর এক গুলি খেয়ে, কিংবা বেওনেটের খোঁচায়

আখতার মিঞা তাড়াতাড়ি নিজেকে বিবস্ত্র করে নিল ঠিক যেন পৌষের একটি পাতাছাড়া বটগাছ

যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেছে। কেউ কেউ নাকি নিখোঁজও হয়ে যায়। নানারকম কৌশল আর ধোকাবাজি কোরে মিঞা জার্মানদের বর্বর আক্রমণ থেকে এক জনশূন্য টেন্‌চের বালির তলায় লুকিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল।

চীনে কালির মত কালো মরুভূমির রাত। চারদিক সুনসান্। মাঝে মাঝে পশ্চিমি হাওয়া উঁচুনিচু বালির ঢিপিতে ধাক্কা খেয়ে শোঁ শোঁ আওয়াজ কোরে উঠে থেমে যায়। একদিকে অসাধারণ ক্লান্তি আর সন্ত্রাস। তারওপর পুরো এক হপ্তার তৃষ্ণায় এবং অনশনে মিঞার এমন অবস্থা হয়েছিল যে, পায়ের তলার বালিকনা-গুলোকে চিনির দানা ভেবে মুখে পুরে দেয় আর কি। যেন সে মরীচিকা দেখছে! ক্ষিদে পেলে তো বেড়ালে লোহা খায়! কিন্তু সে লোহাই বা কোথায়! তাছাড়া বিদেশে-বিভূঁইয়ে, এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, তার লাশ পড়ে থাকবে এবং তাতে শেয়াল শকুনিদের উদরপূর্তি হবে, একথাটি সে কিছুতেই মনে আমল দিতে পারছিল না। কেমন কোরে তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে যাবে এ দুশ্চিন্তা তার মস্তিষ্কে জমাট হয়ে বসেছে এমন সময় শত্রুপক্ষের দু'তিনটি আহত সৈন্য অন্ধকারে পালাতে গিয়ে হঠাৎ টেন্‌চের মধ্যে পড়ে গেঁথে গেল। মিঞা বেশ খানিকক্ষণ মৃতের মত ভান করে রইল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে একটু করে এগোয়, আবার চুপটি মেরে পড়ে থাকে। এইভাবে খানিকটা এগুতেই মিঞা বুঝতে পেল, দৈত্যের মত দেখতে ঐ তিনটি জার্মানই অক্কা পেয়েছে। "ওরে চাচা, আপনা জান্ বাঁচা"—পূর্ববঙ্গের বহু প্রচলিত এই প্রবাদটি, সুদূর মেসো-পটেমিয়ার তারকাখচিত, অবসাদজড়িত, মরুভূমির বিনিদ্র রাতে, একটি অবাধ্য মাছির মত তার মনের চারদিকে ভনভন্ করে লাট্টুর মতো পাক খেতে লাগল। মিঞা যতই সেটাকে তাড়াবার চেষ্টা করে, ততোই মাছিটার জেদ্ বাড়ে। একদিকে দাউ দাউ জলছে জঠরের আগুন, অন্যদিকে দোজখের আগুন। কী সাংঘাতিক দ্বন্দ্ব! এ দু'য়ের সংঘাতে মিঞা এক নিদারুণ বিভ্রান্তির গহ্বরে পড়ল। কী করবে! সে কী করবে! তাহলে কি পাগল হয়ে যাবে! নাকি সে কি পাগল হয়ে গেছে! তার মানবিক বৃত্তিগুলো —বুদ্ধি, বিবেচনা, ঘৃণা এসবই একের পর এক, শুকনো ফুলের মত তার হৃদয় থেকে খসে পড়তে থাকল। সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে যে, তার দুর্বল, শুষ্ক, মুমূর্ষ শরীর ক্রমশঃই একটা পশুর শরীরে রূপান্তরিত হচ্ছে। কী সাংঘাতিক যন্ত্রণা! কী অসহ্য! "হায় আল্লাহ্"! ঘন নীলাম্বরের দিকে চেয়ে সে হাঁটু গেড়ে বসল। "এ বেনেয়াদ্ খোদা, এ কেয়ামতের দিনের মালিক, এ তামাম্ জাঁহার পালনে-ওয়ালা। তুমি রহিম, তুমি করিম! তোমার এই হতভাগা খিদ্‌মদ্‌গারের সব কসুর মাপ কর"। এই বলে প্রথমে শত্রুপক্ষের মৃত সেনাদের একটিকে তার উদরে কবর দিল। এই স্বল্পাহারে তার জঠরাগ্নি এতই ক্ষেপে উঠল যে বাকি দু'টিরও পরপর একই গতি হল। যুদ্ধক্ষেত্রের এই অসাধারণ নৈশ-ভোজনের পর থেকে, দৈর্ঘে এবং প্রস্থে, আখ্‌তার মিঞা, দিন দিন একটি হাতির মত বাড়তে থাকল।

মহাযুদ্ধ শেষে উনিশ শ' আঠেরোর পাঁচই নভেম্বর মিঞা যখন ঢাকায় ফিরল, তাকে চেনা দায়, এমন কি তার মার পক্ষেও। উচ্চতায় প্রায় সাড়ে ছয় ফুট, বুকের ছাতি বাটের কাছাকাছি।

এই অসাধারণ গল্পের কথক ছিল, তিরিশের টেরোরিস্ট আন্দোলন দমনে নিযুক্ত, বালুচ্ রেজিমেন্টের এক সেপাই এবং আখ্‌তার মিঞার, মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধের সাথী, জনৈক বুজ্‌দিল শাহ্।

মহাযুদ্ধ শেষ হলেও, বন্দুকের সঙ্গে মিঞার সম্পর্কটি কিন্তু রয়ে গেল। তার কারণ হয়ত এই যে, একদিকে তার শরীরে এক নতুন আসুরিক শক্তির সঞ্চার, এবং অফুরন্ত সময়, অন্যদিকে প্রেমহীন কুমার-জীবনের একঘেয়েমি। তাছাড়া, মাঝে মাঝে শহরের ইটপাটকেলের জঙ্গল এবং ধুলো-বালি ছেড়ে, মুক্ত আকাশের তলায়, গাছ-পালার মধ্যে ঘুড়ে বেড়াতে তার ভালোই লাগে।

এক নতুন শখ আখ্‌তার মিঞাকে পেয়ে বসল। বুড়িগঙ্গার চরে বেলে হাঁস, ডাহুক, পানকৌড়ি ইত্যাদি যাবতীয় খাবার পাখি শিকার করা ওর নিয়মিত উইক্-এন্ড নেশা হয়ে দাঁড়াল।

বিনা কারণে হিংসাত্মক কার্যকলাপ তার কাছে ছিল নিতান্তই অর্থহীন। এরকম সময়ে, অনর্থক হিংসার কবল থেকে হিন্দুদের আশ্রয় দিয়ে গুরুতর ঝুঁকি নিতেও সে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেনি। কিন্তু অযথা নিরীহ পাখিদের হত্যার কথা জিজ্ঞেস করলে আখ্‌তার মিঞা, খাবার উদ্দেশ্যে প্রাণী হত্যার ন্যায্যতার সমর্থন জানিয়ে তর্ক করে।

সব ব্যাপারে মিঞার মৌলিকত্বের কথা আগেই বলেছি। পাখি শিকারের বেলায়ও এই মৌলিকত্বের কোনো ঘাটতি দেখা দিল না।

একবার এই শিকারে তার সব কার্তুজ ফুরিয়ে গেল অথচ, একটি পাখিও খায়েল হল না। পরাজয় শব্দটি তার অভিধানে কখনো স্থান পায়নি এবং এখনো পাবে না, এই প্রতিজ্ঞা করার সঙ্গে সঙ্গেই মিঞার মাথায় এক উদ্ভট আইডিয়া খেলে গেল। ঝটপট সে নিজেকে বিবস্ত্র করে নিল। দুই কাঁধে দু'টি থলি ঝোলাল। চরের ছোট ছোট গাছ-গুলোর মাঝে গিয়ে, ডালের অনুকরণে হাত দু'টি উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন অবিকল শীতের পাতাছাড়া ছোট্ট বটগাছটি। শিকারীও উধাও, বন্দুকও! এই দেখে পাখিগুলো একে একে আবার ফিরে আসছে। হাল্কা বাতাসে পুকুরের জলের মৃদু আলোড়নের মতই মিঞার মনে আনন্দের ছোট্ট ছোট্ট ঢেউ খেলে যায়। একটি দু'টি করে হাঁস-গুলো এসে গাছের ডালে নিশ্চিন্ত মনে বসতে শুরু করল। আখতার মিঞা এমন নিশ্চল এবং স্থবির যেন তার পায়ে সত্যি বটগাছের শেকড় গজিয়েছে। একটি ধূসর রঙের হাঁস তার বাঁ কাঁধে বসল। মিঞা তার ডান হাত নামাল। একটু থামল। তার পর খুব আস্তে আস্তে পিঠ ঘেঁষে সে হাতটি বা কাঁধের কাছে নিয়ে হাঁসের লা[illegible] ধরে, এক হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে থলে[illegible] পুরে দিল। কয়েক মিনিট পর আরেক[illegible] এসে বসল। এটিকেও একই কৌশলে [illegible] ফেলল। এই অভাবনীয় এবং অত্য[illegible] মৌলিক উপায়ে সারা বিকে[illegible] মিঞার শিকারের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল [illegible] চব্বিশটি পাখি। আখতার মিঞার অদ্ভু[illegible] পূর্ব এবং অবিশ্বাস্য শিকার কাহিনী[illegible] এইখানেই ইতি নয় সে কথায় পরে আস[illegible]

রমজানের মাস। সারাদিন নির[illegible] উপোশের পর আমাদের পাড়ার সব মুস[illegible] মানেরা হাতমুখ ধুয়ে নামাজ পড়ে। [illegible] হয়ে ইফ্‌তার করে। আখ্‌তার মি[illegible] মস্‌জিদের দরজায় ভিখিরীদের, ছোলাভা[illegible] ফুলোরি, পেঁয়াজি, মুড়ি ইত্যাদি [illegible] বিলি করে। পুণ্য করবার উদ্দেশ্যে [illegible] নিছক মানবিকতার খাতিরে। ধর্মীয় আচ[illegible] রীতিনীতির বাহ্যিক প্রকাশ, তার [illegible] আগ্রহ নেই। কিন্তু যাদের আছে, তা[illegible] প্রতি কোনোপ্রকার অবজ্ঞা অথবা অ[illegible] প্রকাশে সে নিতান্তই বিমুখ। মেসোপ[illegible] মিয়ায় যুদ্ধের সময় নানা ধর্মের সেপাই[illegible] সঙ্গে একত্রে লড়াই করা এবং সকল অবস্[illegible] সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার হবার যে এ[illegible] অভিজ্ঞতা তার হয়েছিল, সেকথা সে কো[illegible] দিনই ভোলে নি। সেদিন থেকেই মানবজা[illegible] সহধর্মিতায় সে বিশ্বাসী। ব্যক্তি[illegible] কোনো কারণেই [illegible]ক, কিংবা অন্যদের ধর্ম[illegible] বিশ্বাসের প্র[illegible] শ্রদ্ধার খাতিরেই [illegible] রমজানের এক মাসকাল, আখ্‌তার [illegible] শিকার থেকে ছুটি নেয়। সংযমের কার্ণিতে, জীবন তার কাছে, নিরানন্দ একঘেয়ে মনে হয়। ঈদ-উল্-ফিতর[illegible] পরদিন থেকেই তার হাত পা আবার নিশ[illegible] করে। শিকারের ধান্দায় তার মন চঞ্চল ওঠে।

হপ্তার পর হপ্তা, মাসের পর মাস [illegible] শিকারের একঘেয়েমিতে মিঞার মনে ক্লান্তি এল যে, নতুন কিছু শিক[illegible] ধান্দায় সে মেতে উঠল। ঢাকা থেকে [illegible] য়ালের দিকে যেতে যে জঙ্গল পড়ে সবরকম শিকারই তো পাওয়া যায়। ত[illegible] বনে-বাঁদাড়ে একা ঘুরে বেড়াবার আ[illegible] বা কম কিসের।

আমাদের পাড়ার পর্তুগীজ [illegible] কম্পাউন্ডের ভেতর একটি মস্ত পেয়ারা[illegible] আমি আর শম্ভু পেয়ারা খাবার উ[illegible] সেদিকে এগোচ্ছি, দেখি আখ্‌তার কম্পাউন্ডের কল থেকে এক কুজো জল নিয়ে তর দোকানের দিকে [illegible] কাছাকাছি আসতেই শিকারের শোনাবার জন্যে তাকে, আমরা দুজনে, গাজি করে ধরলাম। মিঞার যুদ্ধ এবং

কাহিনীর মজুতের কোনো শেষ নেই। অতি-রঞ্জনায় ত মিঞার জুড়ি নেই। তা সত্ত্বেও, মৌলিকত্বে গল্পোগুলো নিতান্তই সরস এবং বলার ঢংও তেমনি রসাল। কথার সঙ্গে পাকা অভিনয়ের মিশ্রণে, এগুলো, তার মুখে এতই জ্যান্ত হয়ে ওঠে যে, ঘটনার প্রবাহ শুধু অব্যাহত থাকে না, যেন সে-গুলো শ্রোতার প্রত্যক্ষেই ঘটছে। ডেন্টিস্ট্ না হয়ে যদি পেশাদারী গল্পের কথক হত, তাহলে মিঞার পশার বেশী ছাড়া কম হত না।

পাড়ার বেশীর ভাগ কিশোরদের কাছে সে ছিল, আক্ষরিকভাবে, টার্জানের মতোই এক অসাধারণ হিরো এবং এ-কারণেই মিঞার সঙ্গে তাদের খুব ভাব জমে উঠেছিল। তার খাকি হাফশার্টের বোতামওয়ালা বুকপকেট দুটি, তাদের জন্যে, সর্বদাই লজেন্স আর পেপারমিন্টে ঠাসা থাকে। তার এই কিশোর-প্রীতি অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখে, যাই হোক, রোমাঞ্চে, উত্তেজনায় এবং চাঞ্চল্যে, তার শিকার কাহিনীগুলো, রণক্ষেত্রের কাহিনীর চাইতে কোন অংশে কম ছিল না।

সেবার সারা দিন ধরে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে মিঞা, খরগোশ-হরিণ তো দূরের কথা, একটি ছোটট ঘুঘু কিংবা তিতির পক্ষীরও সন্ধান পেল না। আজ পর্যন্ত সে, কিছু না কিছু হাতে করেই ফিরেছে। তাই আজ খালি হাতে ফিরলে লোকেই বা বলবে কি। একথা ভেবে তার অহমিকায় এমনই প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল যে, মিঞা তক্ষুনি সংকল্প করল, রাতটা জঙ্গলে কাটিয়ে পরদিন নিদেনপক্ষে একটা তিতির পক্ষী কিংবা বন-মোরগ শিকার করে ফিরবে। তাছাড়া, জঙ্গলে রাত কাটাবার বেশ একটা নতুন অভিজ্ঞতাও হবে। সঙ্গে যে খাবার এবং জল এনেছিল তার অনেকটাই অবশিষ্ট আছে। কাজেই চিন্তা কিসের! যাই হোক, এত বড় বপু নিয়ে তো আর গাছে চড়ে রাত কাটানো সম্ভব নয়! এই মনে করে মিঞা নিরাপদে, নিশ্চিন্ত মনে, নিদ্রা দেবার একটি জায়গার সন্ধানে বেরুল। খানিকক্ষণ এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করবার পর, ঝোপের আড়ালে, শরের মত লম্বা ঘাসে ঢাকা, মস্তবড় প্যাকিং বাক্সের মত একটা জিনিস দেখে মিঞা চমকে গেল। বিস্তৃত এই জঙ্গলের আশে-পাশে, জনমানবের তো কোনো বসতি নেই! কোত্থেকে এটা এল। কৌতূহলে খানিকটা এগুতেই সে দেখল যে, ঐ বাক্সটা একটা ইঁদুর মারবার কলের মতই। সরু শেকলি দিয়ে গাছের ডালের সঙ্গে বেঁধে খাঁচার দরজাটা ফাঁক করে রাখা আছে। আরো কাছে গিয়ে ভেতরে উঁকিঝুঁকি মারতেই সন্দেহ হল যে খাঁচার অন্ধকারে কী একটা খস্‌খস্ আওয়াজে নড়ছে-চড়ছে। চমকে গেলেও প্রথম মহাযুদ্ধের বীর যোদ্ধা এত অল্পেতে ঘাবড়াবার পাত্র নয়। এরকম পরিস্থিতিতে তার দুঃসাহসিক বৃত্তিগুলো এক অজানা কারণে, শুড়শুড়ি দিয়ে জেগে ওঠে। মিঞা তার বন্দুকটা নেড়েচেড়ে, সব ঠিকঠাক আছে কিনা, দেখে নিল। তারপর, একটা দেয়া-শলাইর কাঠি ধরিয়ে উঁচু করে ধরতেই দেখতে পেল, দড়িতে বাঁধা একটা কুচকুচে কালো ছাগল খাঁচার অন্ধকারে মিশে গিয়ে ভয়ে জড়সড় হয়ে আছে। মিঞাকে দেখেই দড়ি ছিঁড়ে যেন ছুটে এগিয়ে আসতে চাইছে। এবার মিঞার কাছে খাঁচার রহস্যটা দিনের আলোর মতই পরিস্কার হয়ে গেল। বাঃ; খাসা, খাসা; দরজাটা নামিয়ে দিয়ে এই খাচার মধ্যে শুয়ে নিশ্চিন্ত মনে একটা ঘুম দেয়া যাবে খন"। ছাগলটা মিঞাকে কাছে পেয়ে যেন তার প্রাণ ফিরে পেল। কৃতজ্ঞতা বোধে, উঁহুঁহুঁ, উঁ হুঁহুঁ, উঁহুঁহুঁ করে, অবিকল ওস্তাদ গাইয়ের মত গলা কাঁপাতে থাকল। মিঞার মোলায়েম লোমশ্ শরীরের সঙ্গে নিজের গা ঘষে, কালো চতুষ্পদটি, অনির্বচনীয় এক আনন্দে মেতে উঠল। মিঞাও তাকে নিতান্তই নিকট মনে করে তাকে জড়িয়ে ধরল, গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। এদিকে সারাদিনের ছুটোছুটির পর তার চোখের পাতায় যেন জগদ্দল নেমেছে।

বনের রাত যেমনই নিঝুম তেমনই ভুতুড়ে। সবার একটানা ঝিল্লিরব ডাক সারা বনটার মধ্যে এমন ভাবে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, মনে হয় যেন দু'তিনটে এরোপ্লেন একই সঙ্গে, একই গতিতে উড়ছে। শরতের ঘন নীল আকাশের নক্ষত্রের মতই অসংখ্য জোনাকি জ্বলে উঠেই নিভে যায়। মাঝে মাঝে প্যাঁচা আর তক্ষকের ডাক ঝিল্লিরবের একঘেয়েমিকে ভেঙে দিচ্ছে। বিকল জলের কলের মত, ফোটা ফোটা শিশিরবিন্দু গাছের পাতা থেকে গড়িয়ে খাঁচার ছাদে পড়ে টুপ-টাপ্ আওয়াজ করে। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে নিশাচর প্রাণীরা খাবার সন্ধানে ঘুরঘুর করে। আরো যে কতো অপরিচিত রহস্যময় শব্দ তার হিসেব করা কঠিন। শহরের আওয়াজ থেকে কী স্বতন্ত্র! কখন যে মিঞা ঘুমের গভীরে তলিয়ে গেল টেরও পেল না।

অনেকক্ষণ একটানা ঘুমোবার পর মিঞার মনে হল ছাগলটা অস্বাভাবিক রকম উশখুশ্ করছে। তার কানের কাছে মুখটা এনে, অদ্ভুত একটা চাপা আওয়াজে কিছু বলবার চেষ্টা করছে। টুঁটি টিপে ধরলে যেরকম আওয়াজ বেরোয় অনেকটা সেরকম। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় মিঞা তার গায়ে হাত বুলিয়ে তাকে ঘুম পাড়াতে গেলে, চতুষ্পদটি রীতিমত মাথা দিয়ে ধাক্কা মারতে থাকল। দু-একটা পাখির অস্পষ্ট ডাক শোনা গেল। রাত কাবার হয়ে এল নাকি! কিন্তু খাঁচার বাইরে এখনো যে ঘুটঘুটে অন্ধকার! হঠাৎ খাঁচাটা মস্ত এক ঝাকুনি খেয়ে মট্‌মট্ করে উঠল। মিঞার চোখে অবশিষ্ট তন্দ্রাটুকু এবার উবে গেল। স্বপ্ন দেখছে না তো? একটু কান পেতে থাকতেই মিঞার মনে হল খাঁচার বাইরে একটা কিছু নিঃশব্দে ঘোরাফেরা করছে। একথা ভাবতে ভাবতেই খাঁচার দরজাটাকে নিয়ে কে টানাটানি শুরু করল। পরমুহূর্তেই খাচাটা আগের মতই আবার নড়বড় করে উঠল। চিড়িয়াখানার জন্তুজানোয়ারদের খাঁচার সামনে দাঁড়ালে যে উৎকট গন্ধ পাওয়া যায় সেরকম একটা দুর্গন্ধ মিঞার নাকে ভেসে এল। যাই হোক ব্যাপারটা অবিলম্বে তদারক করা দরকার, একথা ভেবে এগিয়ে গেল। একটা দেয়াশলাইর কাঠি ধরিয়ে খাঁচার দরজার শিকের ফাঁক দিয়ে তাকাতেই মিঞার চক্ষুস্থির।

গলিত পিচের মত চক্‌চকে কালো অন্ধকারে টর্চের মত দুটো কি জ্বলছে!! ঐ আলো কিসের তা ঠাহর করবার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু ঝাপ্‌সা মতো যেটুকু দেখা গেল, তাতেই মিঞার শরীরে উত্তেজনা এবং রোমাঞ্চের বান ডাকল। সত্যি কথা বলতে কি বড় কিছু শিকারের জন্যে সে তো তৈরি হয়ে আসে নি। যাই হোক্ অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে এরকম কত অপ্রত্যাশিত, অচানক, পরিস্থিতিরই তো সে সহজে মোকাবিলা করেছে। শিকার যত বড়ই হোক্ না কেন, যদি ঠিকমত নিশানা করে দুই চোখের মাঝখানের বিন্দুটিতে কয়েকটি ছররাগুলি বসিয়ে দিতে পারে, ঘায়েল হবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। তাছাড়া তার হাত-পাই বা বন্দুকের চাইতে কম কিসের। এই হাত দিয়েই সে গণ্ডায় গণ্ডায় জার্মানদের শূন্যে উঠিয়ে মাটিতে আছড়ে মেরেছে—ভলিবলের মত এখান থেকে ওখানে ছুঁড়ে দিয়েছে। কিন্তু কই! কোথায় গেল টর্চের মত সেই চোখ! নিমেষের মধ্যে জানোয়ারটা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! হঠাৎ খাচাটা এমন অসম্ভবরকম দুলে উঠল যে তার কাঠের পাটাতনগুলো খসে পড়ে আর কি। মিঞা তক্ষুনি ট্রিগারে হাত দিল। চারদিকে জমাট নিস্তব্ধতা। হয়ত একটা শুকনো শালপাতা হবে, ঠাশ্ করে মাটিতে পড়ল। পোকামাকড়দের চলা-ফেরাও থেমে গেছে। দারুণ অনিশ্চয়তাপূর্ণ এক মুহূর্ত! হঠাৎ খাঁচার ছাদে, সাংঘাতিক আওয়াজে, কী একটা ঝাঁপিয়ে পড়ল!! ছাদটা মিঞার মাথায় পড়েছিল আর কি! জন্তুটা নিশ্চয়ই গাছে চড়ে, ছাদ দিয়ে খাঁচায় প্রবেশ করবার চেষ্টা করছে। পর-মুহূর্তেই দরজার সামনে লাফিয়ে পড়ে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। মিঞা দরজার আড়ালে বন্দুক উঁচিয়ে রইল। অন্ধকারের ভেতর থেকে জানোয়ারটা এবার হঠাৎ দৌড়ে এসে দরজায় প্রচণ্ড জোরে একটা থাবড়া মারল। পুরো খাঁচাটা চুরমার হয়ে গেছিল আর কি! মিঞা শিকারের দিকে নিশানা কোরে পরপর বন্দুক চালালো। পাখি মারার ছররা গুলি যতই তার গায়ে লাগছে, জানোয়ারটাও বিরক্তিতে, ততোই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। একেকবার খাঁচাটাকে ধাক্কা মারে, গুলি খেয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিঞার কার্তুজগুলো সব খালি হয়ে গেল। এখন মিঞা করে কি। বন্দুকটা নামিয়ে রাখল। খাঁচার দরজাটাকে খানিকটা ফাঁক করে দিয়ে, আড়ালে ঘাপটি মেরে রইল। দু'এক ফোটা শিশির জলের টুপটাপ আওয়াজ বনের নিস্তব্ধ নিস্তব্ধতাকে আরো সরব করে তুলল।

মনে হল খাঁচার তলায় খুব আস্তে আস্তে একটা কিছু নড়াচড়া করছে। তারপরই মিএ্রা দেখল যে, নিঃশব্দে, তার পেছনের দু'পায়ে ভর করে জানোয়ারটা খাঁচার দরজা ধরে দাঁড়িয়ে উঠেছে। লাফ দিয়ে ভেতরে উঠে আসে আর কি! এই একক মুহূর্তটির জন্যেই মিএ্রা এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। যেইনা দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা গলাল, বিদ্যুৎবেগে দরজাটাকে বিরাট জন্তুটার গর্দানের ওপর নামিয়ে দিল। তার একটা থাবাও চাপা পড়ল। অন্য থাবাটা দিয়ে দরজাটা ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করল। মিএ্রা তার পুরো শক্তি আর ওজন দিয়ে তার ওপর চেপে বসল। সাংঘাতিক এক ধস্তাধস্তিতে খাঁচার মেঝের এবং দেয়ালের কয়েকটা পাটাতন খসে পড়ল। সে এক তুমুল কাণ্ড। মেসোপটেমিয়ার মরুভূমিতে সেই অসাধারণ নিশভোজনের পর তার গায়ে যে আসুরিক শক্তি জন্মেছিল মিএ্রা, আজ তা পরখ করবার প্রথম সুযোগ পেল। সে অবাক হয়ে আবিষ্কার করল যে, পূর্ণবয়স্ক একটা রয়েলবেঙ্গল টাইগারের গর্দান চেপে রাখতে একমাত্র তার বাঁ হাতই যথেষ্ট। এরকম দুটো বাঘ একসঙ্গে এলেও কোনো অসুবিধে হত না। তার শরীরের এই প্রচণ্ড শক্তির খবর পেয়ে যেমন সে চমকে উঠল, তেমনি গর্বে তার শরীরের মাংসপেশীগুলো নেচে উঠল। প্রায় সুদীর্ঘ ত্রিশ মিনিট ধস্তাধস্তির পর বাঘটা ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। মিএ্রা কিন্তু কোনো ঝুঁকি নিতে চাইল না। বুদ্ধি আর ধূর্ততায় পশুজগতে বাঘের যে জুরি নেই, একথা তো মিএ্রা ভালো করেই জানে। তাই বাঘটা যে ধোকাবাজি করছে না, কে বলতে পারে। এইভাবে আরো খানিকক্ষণ কাটল। তারপর ব্যাপারটা যে ধরনের একটা নাটকীয় মোড় নিল, মিএ্রা তার জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না।

একটা বন মোরগ ডেকে উঠল—কুক্কুরু কু, কুক্কুরু কু। সে ডাক শুনে দু-একটা কাকও ডাকল। তারপর আরো কয়েকটা কাক, বসন্ত বাউরি এবং হাঁড়িচাচার ডাক শোনা গেল। এই ঘন শাল বনে ভোরের আলো প্রবেশ করতে স্বভাবতঃই বেশ দেরি হচ্ছিল। অনেক দূর থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ মিএ্রার কানে ভেসে এল। কিছুক্ষণের মধ্যে সেই আওয়াজ একটা গোলমালের আকার ধারণ করল।

মাদল, ঢাক, ঢোল, নাকাড়া, ঢ্যারা, ক্যানেস্তারা ইত্যাদির আওয়াজের সঙ্গে

আথতার মিএ্রার পেছনে কুড়ি-পঁচিশটা জোয়ানের কাঁধে রাখা মোটা বাঁশের সঙ্গে বিরাট রয়েল বেঙ্গল টাইগার ঝুলছে।

মানুষের চিৎকার! এই গোলমালের আওয়াজ ক্রমশঃই স্পষ্টতর হচ্ছে। কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরের আবছা আলোয় শালগুঁড়ির ফাঁক দিয়ে তাকাতেই দেখা গেল যে, এক জনতা —হাতে বর্শা, লাঠি, মাছধরার টাঁটা, কোঁচ—এসব নিয়ে এগুচ্ছে। মেসোপটেমিয়ার যোদ্ধার মনে না এল কোনো আশঙ্কা, না এল কোনো চিন্তা। হঠাৎ ঢাক, ঢোল, টিনের আওয়াজ থেমে গেল। চিৎকার চেঁচামিচিও। লোকগুলো স্থির-দৃষ্টিতে খাঁচার দিকে চেয়ে আছে। ভীষণ তৎপরতার সঙ্গে, নিজেদের মধ্যে কি কানাঘুষো আরম্ভ করল। তারপর, আবার একদম চুপ। হঠাৎ ঢাক-ঢোল-নাকারা-ক্যানাস্তারা, যুদ্ধের দামামার মতো একই সঙ্গে বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে জনতাও ক্ষিপ্ত হয়ে লাঠি, টাঁটা, কোঁচ, বর্শা উঁচিয়ে, 'মার, মার' চিৎকারে এগুতে থাকল। খাঁচার দরজাটি পড়ে বন্ধ আছে। তার পিছনে আথতার মিঞা। হঠাৎ তার বুকের মধ্যে একটা ভয় লাফ দিয়ে উঠল। যুদ্ধোত্তর জীবনে এই তার প্রথম ভয়। হয়তো একটা ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে। হয়তো তার জান্ নিয়ে টানাটানি হবে। আথতার মিঞা দুপা দিয়ে খাঁচার দরজাটাকে চেপে ধরে, তার দুহাত খাঁচার বাইরে উঁচিয়ে ধরল। তারস্বরে চিৎকার করতে থাকল, 'আমি মানুষ, আমি মানুষ'। মিঞার লোমশ্ চিকন্ কালো শরীরটিকে দেখে জনতা ততোধিক হকচকিয়ে গেল। একি! বাঘের খাঁচায় বন মানুষ কী

নিয়ে ঢাকার রয়েল্জ্যাস প্রবেশের [illegible] মতোই আর এক মিছিল [illegible]।

করে এল। ভূত প্রেত নয়তো। খাঁচার দরজার তলায় নেতিয়ে পড়া বাঘের শরীরটা কাশের মত লম্বা লম্বা ঘাসে ঢাকা পড়ে আছে। এদিকে মিঞা তার সর্বশক্তি দিয়ে তেমনি আর্তনাদ করে যাচ্ছে—'আমি মানুষ, আমি মানুষ'। তার বিরাট পেটের খোলের ভেতর থেকে এই নাদ উঠে শালের ডগায় ধাক্কা খেয়ে, উউষ্..... উউষ্.... উউষ্ করে প্রতিধ্বনি করতে থাকল। জনতা লক্ষ্য করল যে, আখতার মিঞা তার ডান-হাতের তর্জনী নিচের দিকে কোরে কী একটা নির্দেশ করছে। তারা একপা-দুপা কোরে এগুচ্ছে, কিন্তু এই তর্জনী নির্দেশের কোনোই হদিশ পাচ্ছে না। আচমকা এক দমকা হাওয়ায় খাঁচার সুমুখের ঘাসগুলো নুয়ে পড়তেই বাঘের মুন্ডুটা মুহূর্তের জন্যে দেখা দিয়ে আবার ঢাকা পড়ে গেল। ব্যাপারটা পুরোপুরি খোলশা না হলেও জনতার বুঝতে দেরী হল না যে খাঁচার ভেতর এই কালো, লোমশ জীবটা, বাঘটাকে কোনো বিপদে ফেলেছে। এই মনে কোরে তারা সন্তর্পণে এগুতে থাকল। তারপর সব খামোশ্। জনতার চোখ ছানাবড়া। হঠাৎ ঢাক-ঢোল-ন্যাকারা-ঢ্যারা-ক্যানেস্তারা ভীষণ জোরে বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল নৃত্য। আখতার মিঞার খাঁচার ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে ধেই ধেই কোরে নাচতে থাকল। সারা শালবনটা একদিকে নৃত্য-সঙ্গীতের উল্লাসে আর অন্যদিকে মিঞার নাচের তালে কেঁপে উঠল।

আমি আর শম্ভু। স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে অসাধারণ কাহিনীটি শুনছি, এমন সময় আখতার মিঞা, 'ব্যাস'। এই বলে নাটকীয়-ভাবে উঠে পড়ল। আমরা দুজনে লাফ দিয়ে তক্ষুনি তার হাত ধরে ফেললাম। নাছোড়-বান্দর মত বলি, না না। এইখানে গপ্পো শেষ করলে চলবে না। এমন জবরদস্ত, দুঃসাহসিক শিকার কাহিনীর কথা কেউ জানলো না, এ কী কোরে সম্ভব হয়। আখতার মিঞা সময় নেই' 'আরেকদিন হবে' এইসব বলে নানা-রকম নখরাবাজি করে আমরাও নাছোড়বান্দা। মিঞা অবিশ্যি আমাদের এ কাকুতি মিনতির জন্যেই অপেক্ষা করছিল। তারপর সংক্ষেপে যা বললে তা অনেকটা এই রকম।

এ অসাধারণ বীরত্বপূর্ণ শিকার কাহিনী ঢাকাবাসীদের কাছে যেমন কোরেই হোক, তাকে পৌছে দিতে হবে। তাছাড়া, বাঘের লাশটা দেখালে জেলার সাহেব ম্যাজিস্টেটের কাছ থেকে নগদ পুরস্কারও পাওয়া যাবে।

পরদিন বেলা তিনটে নাগাদ আমাদের ইসলামপুর বাবুরবাজার পাড়ায় অসাধারণ উত্তেজনা। পাড়াশুদ্ধ লোক—এমনকি পর্দানশিন্ জুবেদা, জয়নাব, সিতারাও—রাস্তার দুপাশে ভিড় কোরে, ভীষণ উৎ-কণ্ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। নবাববাড়ির ফটকে খোদ্ নবাব সাহেবও উপস্থিত। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল বাবুরবাজারের পুলের ওপর দিয়ে আখতার মিঞার জোলুস এগিয়ে আসছে। আরেকটু এগুতেই দৃশ্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠল। সামনে নাকারাবাদকেরা, পেছনে মিঞা, বন্দুক হাতে। গায়ে তার বহু-প্রশংসিত পোশাক—মিলিটারি খাকি হাফ-শার্ট, মালকোঁচামারা ধুতি, ক্যাম্বিসের জুতো। মুখে মৃদু হাসি। স্ফীত, প্রশস্ত বুক। চলার রকমটি দেখে মনে হয় ঠিক যেন ছোটখাটো একটি পাহাড় গজগমনে এগিয়ে আসছে। তার পেছনে কুড়িটি লোকের কাঁধে রাখা লম্বা বাঁশদুটি থেকে বিরাট রয়েল বেঙ্গল টাইগার ঝুলছে। ল্যাজসমেত বারো ফুটের বেশী চাইতে কম নয়। বিকেলের পড়ন্ত আলোতে তার ডোরাকাটা, মর্তমান কলার রঙের লোমশ অবয়বটি, কুচকুচে কালো বাহকদের মাঝখানে পড়ে এমনই জাঁকালো বৈষম্য সৃষ্টি করেছে যে, বাঘটা দূরে থেকে ঠিক যেন পালিশকরা একটি সোনার ভাস্কর্যের মতো ঝলমলিয়ে উঠেছে। কী অসাধারণ সুন্দর প্রাণী। যেমনই তার প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুষমা, তেমনি বহিরেখার ছন্দ। প্রাণহীন অবস্থায়ও যে একটি প্রাণী এত অসাধারণ সুন্দর হতে পারে, এ বাঘটিকে যাঁরা দেখেছেন শুধু তাঁরাই জানেন। এমন প্রাণীকেই তো যথার্থ শার্দুল বলা যায়। এক কথায় সৃষ্টিকর্তা যেন তাঁর সৌন্দর্যের ভান্ডার উজার করে দিয়েছেন তার গায়ে।

এতক্ষণে মিছিল আমাদের পাড়ার মস্-জিদের সামনে এসে পড়েছে। আখতার মিঞার বন্ধুরা, মোল্লারা, মস্‌জিদের দো-তলার আঙ্গিনা থেকে পুষ্প বৃষ্টি করল। জনতার অবিরাম করতালিতে কানে তালা লেগে যায়। সাত্তার মিঞা, ফজলুর মিঞা, মির্জাসাহেব, কাল্লু মিঞা, অক্ষয়বাবু, ব্রজ-বাবু এবং আখতার মিঞার আরো অনেক বন্ধুরা সমস্বরে বলে উঠল, 'জব্বর দেখাইলা মিঞা, জব্বর'। হঠাৎ একটি মস্ত সাদা গোলাপ আখতার মিঞার প্রশস্ত, স্ফীত বুকের ছাতিতে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ল। কত ফুলই তো এতক্ষণ তার সর্বাঙ্গে পড়ে নিচে লুটিয়ে পড়েছে। কই, মিঞা তো সে-গুলোকে কুড়োবার কোনো চেষ্টাই করেনি। কিন্তু এ গোলাপটিকে একটি ছোট্ট টিয়ে-ছানার মতই দুহাতে আলতো কোরে তুলে খানিকক্ষণ নাকের ডগায় ধরে রাখল। তার মুখের মৃদু হাসিটি মুখের এপাশ থেকে ওপাশ অব্দি ছড়িয়ে পড়ল। তারপর, সেটিকে বুক পকেটের বাটন্-হোলে গুঁজে দিল। এই জনসমুদ্রের ভেতর থেকে কে এই ফুল ছুঁড়ে দিল? এই রহস্যময় প্রশ্নটি, মিছিল শেষ হবার পরেও, অনেকের মনেই ঘোরাফেরা করতে থাকলো।

মিছিল আর কয়েক গজ এগুতেই খোদ নবাবসাহেব উঠে এসে আখতার মিঞার গলায় [illegible] একটি মালা পরিয়ে দিলেন। তারপর, পাশেই নোকরের হাতে রাখা রুপোলি রেকাবি থেকে লাল রেশমী ফিতে লাগানো একটি স্বর্ণপদক তুলে মিঞার ছাতিতে পড়িয়ে দিয়ে বললেন 'শাব্বাশ্ মিঞা, শাব্বাশ্। মুকর্‌রর মুকর্‌রর্!'

এই ঘটনার [illegible] শেষ হতে না হতে আরেকটি জা[illegible] ঘটনা ঘটল। বাঘ নি[illegible] ঢাকায় জয়োল্লাস প্রবেশের মিছিলের মতো আরেক মিছিল বেরুলো। মিছিলের সাম[illegible] এবং পেছনে ভ্যাঁপপো, ভ্যাঁপপো আওয়া[illegible] দুই বিরাট ব্যান্ডপার্টি। রঙবেরঙের জামাপ[illegible] খালি পায়ে সারি সারি কুলিদের মাথা ঢেউ খেলানো গ্যাসের বাতি। মাঝখানে সা[illegible] জুড়ি ঘোড়ার ফিটন্ গাড়িতে ঈষৎ বাদশা[illegible] ঢংএ বসা একটি অসাধারণ পুরুষ। গা[illegible] রেশমী আচকান্, হাতে মিছিলে প্রা[illegible] ফুলটির মতই একটি সাদা গোলাপ। মা[illegible] জরিদার কালো মখ্‌মলের জমকালো লক্ষ্ণৌ টুপি। গলায় বেলফুলের মালা। মু[illegible] খুশীর জোয়ারে বাঁধ দেয়া হাসি। দু[illegible] বেশে, ওয়ারল্ড-রিনাউন্ড জেন্টিলম্যান, প্র[illegible] মহাযুদ্ধ প্রত্যাগত বীর যোদ্ধা এবং শিকা[illegible] নিঃ [illegible] এম আখ[illegible]। পাশে [illegible] জমকালো লাল ওড়নায় ঢাকা শরমি দুলহান্।

পরদিন আখতার মিঞার বিশ্বস্ত [illegible] অক্ষয়বাবুর কাছে শোনা গেল যে, মিছি[illegible] দিন ঐ ধপধপে সাদা বড় গোলাপটি না[illegible] জুবেদারই হাত থেকে এসে মিঞার ব[illegible] চোকা মেরেছিল।

বিজ্ঞান

বাঁচো এবং বাঁচাও

সালফার ডাই-অকসাইড সাংঘাতিক বিষাক্ত গ্যাস। গন্ধক কিম্বা গন্ধক দিয়ে তৈরি যেকোন পদার্থ জ্বালানর ফলে এর উৎপত্তি। যে যে জায়গায় এই গ্যাস প্রচুর তৈরি হয় তারা হল, (১) হাড় ও শিরীষের আঠা তৈরির কারখানা, (২) সালফিউরিক এসিড তৈরির কারখানা, (৩) পেট্রো-কেমিক্যাল পদার্থ শোধন করার কারখানা, (৪) জিনিসপত্র রং করার কি ব্লিচ করার কারখানা, (৫) ঠাণ্ডা গুদোমঘরগুলোতে কি রেফ্রিজিরেশনের কাজে যে সব জেনারেটর চলে—তাদের থেকে, (৬) ধাতব পদার্থের জ্বালানী হয় যে সব কারখানায়, (৭) রবার ও রবার জাতীয় পদার্থ তৈরির কারখানা, (৮) কাঁচের জিনিষপত্র, চীনামাটির বাসন ও চামড়া তৈরির কারখানাগুলো, (৯) রাসায়নিক ধোঁওয়া দিয়ে কীটপতঙ্গ নাশ করার জায়গাগুলোতে।

সালফার ডাই-অকসাইড বাতাসের আর্দ্রতার সঙ্গে মিশে তৈরি করে কতকগুলি বিষাক্ত এসিড। এদের ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া দেখা যায় কাপড়-চোপড়ে, ইট-মার্বেল-চুন-সুরকীতে। উদ্ভিদ আর প্রাণিশরীরে এদের ক্রিয়া দারুণ [illegible]রাত্মক।

বাতাসে এই গ্যাসের ঘনত্ব কম থাকলে, অর্থাৎ প্রতি দশ লক্ষ ভাগে পাঁচ ভাগ মাত্র—মানুষের চোখে, নাকে, [illegible]লায়, স্বরযন্ত্রে ও ফুসফুসে অল্প-[illegible]স্তর জ্বলুনীর সৃষ্টি করে। তা থেকে [illegible]সে কাশির বেগ। ঘনত্ব বেশী হলে—[illegible]শ লক্ষ ভাগে দুশো ভাগ থাকলে, [illegible]গ্যাসের বিষক্রিয়া মানুষের শরীরে [illegible]খের পলকে সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায়। [illegible]ল, বিষম চোখ-নাক-গলার জ্বলুনী। [illegible]মকা কাশি, শ্বাসনালিতে নিদারুন [illegible]ষ্ট—হাঁপানী।

কলকাতার বায়ুদূষ্টি নিয়ে যেসব [illegible]জ্ঞানীরা মাথা ঘামাচ্ছেন, বিজ্ঞান [illegible]লেজের ফলিত রসায়ন বিভাগের [illegible]ডার ডকটর ধীরেন চক্রবর্তী তাঁদের [illegible]কজন। তাঁর মতে যেসব গ্যাস [illegible]কাতার বাতাসকে নিত্য বিষিয়ে [illegible]লছে তাদের ভিতর পরিমাণে সবচেয়ে [illegible]শী এই সালফার ডাই-অকসাইড।

একদল বিজ্ঞানী নিয়ে কুন ও [illegible]ার গবেষণা চালান মানব শরীরে এই [illegible]স কতটা সহ্য হয় তাই দেখতে। এই [illegible]ই উদ্দেশ্যে নিরীক্ষণ চালান জাউথার [illegible] বনেল। এঁরা সবাই ১৯৭০এ [illegible]াক্যে বলেন, এক কিউবিক মিটার [illegible]সে চারশ মিনি-সাইক্রোগ্রাম পর্যন্ত [illegible]ফার ডাই-অকসাইড মানুষের শরীর [illegible] করতে পারে। এর ওপর হলেই [illegible]র বিপজ্জনক।

১৯৭২-৭৩-এর এক নিরীক্ষায় দেখা গেছে, কলকাতা শহরের বাতাসে ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে এই গ্যাসের ঘনত্ব উঠেছে এক কিউবিক মিটার বাতাসে আটশো তেত্রিশ মিলি মাইক্রোগ্রাম। বিপজ্জনক সীমারেখার দুগুণের ওপর। এবং এটা পাঁচ বছর আগেকার কথা।

ধোঁয়াশা তৈরিতে সালফার ডাই-অকসাইড এর পরই আসে নাইট্রোজেন ডাই-অকসাইড। এর জন্ম অসংখ্য কয়লার চুল্লী, পেট্রোল মবিলে চলা যান, করকারখানার ভূতের মতো কালো ধোঁয়া-ছাড়া চিমনী থেকে।

খুব সম্প্রতি ক্যালিফোর্ণিয়ার একদল বিজ্ঞানী মানবদেহে এই গ্যাসের বিষক্রিয়া কতদূর তা নিয়ে গবেষণার ফল বার করেছেন। এই বিজ্ঞানী দলের প্রধান ডকটর রোল্যান্ড রাসমুসেন বাতাবরণ-ব্যাধির ওষুধের (এনভিরোনমেন্টাল মেডিসিন একজন বিশেষজ্ঞ।

তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় মানব-শরীরের ভিতর থেকে ফুসফুস কোষগুলি বার করে এনে তাদের ওপর নিরীক্ষা চালান সম্ভব হয়েছে। আগে এটা করা ছিল একরকম অসম্ভব। কারণ ফুসফুস কোষগুলিকে দেহের বাইরে আনার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি বাইরের বাতাসের সংস্পর্শে এসে শুকিয়ে মারা যেত।

রাসমুসেনের বিজ্ঞানীদল মানুষ আর গিনিপিগের ফুসফুস থেকে কোষগুলি বার করে এনে রেখেছেন সছিদ্র প্রাণী-ঝিল্লীর (মেমব্রেন) বিছানার ওপর। তারপর ঐ সছিদ্র ঝিল্লীর ভিতর দিয়ে কোষগুলিতে পুষ্টি সরবরাহের বন্দোবস্ত করেছেন। তাতে করে দেখা গেছে শতকরা নব্বইটি কোষই চব্বিশ ঘন্টা বেঁচে থাকে। অতঃপর এই সব কোষের ওপর দিয়ে নাইট্রোজেন অকসাইড আর মোটরের থেকে বেরিয়ে আসা তামাটে রঙের নাইট্রিক অকসাইড মেশান বাতাসে বইয়ে দিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন কোষগুলি বাঁচে মাত্র ছ' ঘন্টা। শতকরা পঁচানব্বইটি কোষ মারা পরে ছ' ঘন্টার মধ্যেই।

এতেই বোঝা যাচ্ছে, নাইট্রোজেন ডাই-অকসাইড মানবদেহের পক্ষে কি বিষম বিষ। সুস্থ মানুষের ফুস ফুস সাধারণতঃ এই বিষের কিছুটা শোষণ করে নিলেও, ধোঁয়াশার ভিতর এর যে গাঢ়ত্ব তা মানুষের পক্ষে সব সময়েই মারাত্মক।

ডকটর রাসমুসেনের এখন দৃঢ় ধারণা, ফুসফুস কোষের এই ধ্বংস থেকেই শুরু হয় যে ব্যাধি তার শেষ পরিণতি ক্যান্সারে।

কলকাতার বাতাসে নাইট্রোজেন ডাই-অকসাইডের ঘনত্ব ভারতবর্ষের সব শহরকে টেক্কা দিচ্ছে। ৭২-৭৩এ শীতের কটা মাসে এই গ্যাসের ঘনত্ব ছিল প্রতি কিউবিক মিটার বাতাসে দুশো মিলি মাইক্রোগ্রামের মতো। কিন্তু সবচেয়ে বেশী ছিল ডিসেম্বরে—এক হাজার একাশী মিলি মাইক্রোগ্রাম।

ইউনাইটেড স্টেটস-এর এনভিরোনমেন্ট্যাল পলিউশান এজেন্সির (ই-পি-এ) মতে এই গ্যাসের বিপদসীমা প্রতি কিউবিক মিটার বাতাসে একশ মিলি মাইক্রোগ্রাম। এখন বুঝে দেখুন আরও পাঁচ বছরে অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে।

কলকাতার বাতাস ও জল দূষণের সর্বাধুনিক ফলাফলের রিপোর্ট 'হলুজ দূর অস্ত'। এব্যাপারে সরকারী সংস্থা নেরী (ন্যাশানাল এনভিরোনমেন্ট্যাল এঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) সহায়তার দায়িত্ব নিয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানের কলকাতা শাখার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ডকটর অজিত বোস একজন বহু দেশ ঘোরা, অভিজ্ঞ, কৃতী ও উৎসাহী বিজ্ঞানী। তাঁর কাছে আমাদের অনেক আশা।

কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে। যে কলকাতায় দমকল ছুটছে আগুন নেভাতে, এ্যাম্বুলেন্স দৌড়চ্ছে আহত কি রুগ্নকে রক্ষা করতে, সেখানে ষাট লক্ষের ওপর মানুষ সেফ গ্যাস-চেম্বারে পড়ে আস্তে আস্তে অভ্রান্তভাবে এগিয়ে যাচ্ছে অকাল মৃত্যুর দিকে। আর আমরা এসম্বন্ধে কেমন নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ, অসাড়!

আমরা এখনও কলকাতার এ অবস্থাকে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করছি না। **রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য**

বাংলার বাইরে বাঙালী

চিত্রকূট

কাশী থেকে খুব বেশী দূরে নয়। উত্তরপ্রদেশের বান্দা আর মধ্যপ্রদেশের সাতনার মধ্যে একটি জনপদ রয়েছে যাকে ছোটখাট বেনারস বলে মনে হয়। তেমনি ঘাটে ঘাটে পুণ্য লোভাতুর সাধুসন্ত এবং যাত্রীর ভীড়, তেমনি সন্ধ্যায় নদীর ধারে মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘন্টা মনকে আবিষ্ট করে তোলে। কিন্তু সুন্দর এই স্থানটির সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় কম বাঙালীরই আছে, অথচ আশ্চর্যের বিষয় কি জানেন এর নামমাহাত্ম্য আছে। কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, প্রায় সব হিন্দুই এই নামটি জানে। এর নাম চিত্রকূট!

এই নামটির সঙ্গ ছোট বেলা থেকে আমাদের পরিচয়, রামায়ণ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের—চিত্রকূটের পাহাড়ে যাই এমনি বরষাতে....কবিতার মাধ্যমে। নয়নাভিরাম স্থানটি আদিকাল থেকে ভারতবাসীর কানে কানে, মুখে মুখে ফিরেছে। রাম যাকে তীর্থের মাহাত্ম্য দান করেছেন, তুলসীদাস তাকে সাহিত্যের জয়রথে তুলে দিয়েছেন, বারে বারে তার নাম রামচরিত মানসে উল্লেখ করে। নামটিই শুধু কাব্যিক নয়, স্থানটিও। চিত্রকূট নামটি ভেঙ্গে অর্থ করলে দেখি—চিত্র-বিচিত্র বা ছবি এবং কূট অর্থে পর্বত। তাহলে পর্বতের ছবি বা বিচিত্র পাহাড়।

সত্যিই বিচিত্র পাহাড়ের সারি রয়েছে একে ঘিরে। মাঝ দিয়ে কলোচ্ছ্বসিনী মন্দাকিনী বয়ে চলেছে। মন্দাকিনীর ধারে ধারে গড়ে উঠেছে কত সুন্দর মঠ, মন্দির। প্রতি অমাবস্যায় মেলা লাগে এখানে। রামঘাটে স্নান করা যে বড় পুণ্য! এরা বিশ্বাস করে এই ঘাটে বসে তুলসীদাস চন্দন ঘসতেন আর রাম তিলক পরতেন।

এখানেই ভরতমিলন হয়েছিল। রাম সীতার দৈনন্দিন জীবনের কার্যতালিকার সব কিছুই এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে। রামঘাট থেকে নদীর উৎপত্তিস্থলের দিকে যেতে গেলে উৎপলসংকুল খরস্রোতা এই নদীর এক অংশের নাম জানকীকুণ্ড। সেখানে জানকীদেবী স্নান করতেন। এমনি আরও রয়েছে রামসীতার নামের সঙ্গে জড়ান, স্ফটিকশীলা। যার সম্বন্ধে তুলসীদাস বলেছেন, রাম নানা ধরনের ফুল দিয়ে ভূষণ তৈরী করে স্বহস্তে সাজিয়ে দিতেন সীতাকে। সুসজ্জিতা জানকী বসতেন ঐ শীলাখণ্ডে।

আরও রয়েছে সীতারসুই, হনুমানধারা, বিন্ধ্যপর্বত শাখার উপর বেশ উঁচুতে একটি শীতল, স্বচ্ছ পেয় জলের ঝর্ণা। শ্রান্ত পর্বতারোহীরা জলপানে নিজেদের তৃপ্ত করে।

গুপ্ত গোদাবরীর সঙ্গে রাম সীতার নাম জড়ান। এঁরা মনে করেন গোদাবরী নদী গুপ্তভাবে এখানে এসেছিলেন, রাম, সীতা আর লক্ষ্মণের স্পর্শ পাবার জন্যে। সত্যি প্রকৃতির এক অদ্ভুত কারিগরি এটি। দূর থেকে দেখলে বোঝাই যায় না এই পাহাড়ের মধ্যে মানুষ ঢুকতে পারবে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার গুহার মধ্যে মশাল জেলে গেলে দেখা যাবে পাশ দিয়ে ঝিরঝির করে ঠাণ্ডা জলের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে।

এখানকার প্রধান পূজ্য রাম হলেও এরা শিব ভক্ত। কামনানাথ বা রামায়ণের কামাতগিরিকে ওরা স্বয়ং শিব বলে মনে করে। তাই ওই পাহাড়ে কেউ ওঠে না। তার চারদিকে পাহাড়ের গায়ে চারটি মুখ কল্পনা করে মন্দির নির্মাণ করেছে। ওরা এগুলিকে বলে মুখারবিন্দ। চতুরানন শিবরূপী এই পাহাড়কে প্রদক্ষিণ করার জন্যে চারিধারে সুন্দর পাথরে বাঁধান রাস্তা রয়েছে।

জায়গাটি ছোট। পাণ্ডাগিরি এখানকার প্রধান জীবিকা। দোকান বাজার চলে যাত্রীদের আসা যাওয়ার উপরে। তবে এদের কুটির শিল্প রয়েছে সুন্দর সুন্দর। যেমন কাঠের খেলনা, সুপারীর কৌটা, পাথরের বাসন বা পাথরের মূর্তি গড়া।

গত চার বছর এখানে 'রামমেলা' নামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। তিন দিন ধরে রামায়ণ এবং তুলসীদাস সম্বন্ধে স্মরণ, মনন চলে। ভারতের নানা কোণ থেকে রামভক্ত আসেন এই সময়।

দুঃখের বিষয় এই যে, স্থান স্বনামধন্য হলেও আজও বড়ই অনাদৃ[illegible] যাতায়াত এবং যোগাযোগের অসুবিধা খু[illegible] মানিকপুর জংশনে নেমে বাসে চিত্রক[illegible] যেতে হয়। এই স্থান থেকে উপরোক্ত দ্র[illegible] স্থানগুলি যাবার কোন যানবাহন নেই [illegible] চলে। গরুর গাড়ি অথবা ডুলিই সম্ব[illegible] কলের জল নেই, অবশ্য বৈদ্যুতিক আ[illegible] আছে। থাকার জন্যে ধর্মশালা ছাড়া একটি নিম্নমানের যাত্রীনিবাস আছে। [illegible] হোটেল বা পান্থনিবাস নেই।

সত্তরের দশকে যার এই অবস্থা [illegible] দশকে তার আরও কত অসুবিধা ছিল [illegible] করতে পারেন নিশ্চয়। মন্দির, দেব[illegible] ঠিকই ছিল, ছিল না চিকিৎসার [illegible] ব্যবস্থা, জনসংখ্যার তুলনায় এখন[illegible] অপ্রতুল। সেই সময় এক বাঙালী ভদ্র[illegible] ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়, নেহাৎই ভ্রমণের তাগিদে এখানে আসেন। সঙ্গে পরিবারও ছিল। তাঁরা দেখলেন এক[illegible] বিনা চিকিৎসায়, বিনা ওষুধে মারা [illegible] ফণীবাবু ভাবলেন একটা কিছু করা [illegible] প্রয়োজন। তিনি সেখানে প্রথমেই একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খুললেন [illegible] বাড়ি করলেন। যত সহজ লিখলা[illegible] সহজে তিনি এ কাজ করতে পারেন নি [illegible] সাধ, সংকল্প। বাঙালী বর্জিত দেশে একজন এসে বসবে তা ওখানকার মহল সুনজরে দেখেন নি। যাহোক [illegible] ইতিহাস। দাতব্য চিকিৎসালয় চালু শুধু চিকিৎসালয় নয়, বলতে গেলে বাঙালী আড্ডা জমে উঠল। বাঙালী না থাকলে কি হবে, তীর্থ বা কোন [illegible]টনের নেশায় যে সব যেতেন [illegible] জমে যেতেন এই [illegible] সঙ্গে। বাঙালীদের কাছে সে যেন মরু মরূদ্যান।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফণীবাবু সপরিবারে কলকাতায় চলে[illegible] দাতব্য চিকিৎসালয় চালু রইল। যা[illegible] তাঁরা যেতেন চিত্রকূটে, এই পরিবে[illegible] কাটাতে পারেন নি তিনি বা তাঁর [illegible] কাজের চাপে এবং স্ত্রীর মৃত্যু[illegible] চিত্রকূট যাওয়া কমে গিয়েছিল ফল[illegible] ফলে দাতব্য চিকিৎসালয় তি[illegible] রাখলেও যাদের উপর ভার দিয়েছি[illegible] দেখাশোনা করার, তাঁরা তার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখেন নি, ফলে [illegible] মানুষ বিনা পয়সায় ওষুধ পেত ন[illegible] ফণীবাবু তাঁর বাড়ির অর্ধেক সরকারকে দান করে দেন চিকিৎসা[illegible] জন্য। তাঁর স্ত্রী নলিনীদেবী[illegible] উৎসর্গীকৃত হয় এই চিকিৎসালয়[illegible] সঙ্গে বুন্দেলখণ্ডের ছোট্ট ইতিহাসে বাঙালীর নামটি—'নলি[illegible] চিকিৎসালয়' হিসাবে লেখা হয়ে[illegible]

মঞ্জুশ্রী[illegible]

বাঘা ক্রিকেটার পাতৌদি

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

হ্যাঁ, তারপর একদিন সেও বাবার মত ভারতীয় দলের অধিনায়ক হবে। দেশ-বিদেশে তার নেতৃত্বে ভারত খেলবে। জিতবে ভারত। আরো কতো স্বপ্নই না দেখতো মনসুর।

সবে কুড়ি বছরে পা দিয়েছে সে। সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তার। সেই স্বপ্নই সে দেখতো।

কিন্তু অলক্ষ্যে বসে আর একজন, সে তখন হাসছে। তরুণ মনসুর ভাবতেও পারতো না কি সাংঘাতিক বিপদই না পা টিপে-টিপে এগিয়ে আসছে তার দিকে। তার সব স্বপ্ন, তার আকাঙ্ক্ষা চিরদিনের মতো নষ্ট করে দেবার জন্যে। অতো বড় বিপদের আঁচ কেউ কোনদিন করতে পারেনি।

১৯৬১ সালের জুলাই মাসেই অভিশপ্ত দিনটি তখন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। এগিয়ে আসছে দুর্ঘটনার সেই দিনটি। ভবিষ্যতে যা মনসুরের সমস্ত জীবন ওলট-পালট করে দিতে বসেছিল।

আচমকা ঘটে গেল সেই মোটর দুর্ঘটনা।

॥ চার ॥

সেদিন অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সাসেক্সের খেলা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ডিং। সারাটা দিন পাতৌদিদের মাঠে কেটেছে। দারুণ খাটুনী গেছে। ক্লান্তিতে যেন ভেঙ্গে পড়ছে শরীর। প্যাভেলিয়নে পাতৌদি টান টান হয়ে শুয়েছিলেন।

কে একজন বলে উঠলেন, 'চল, চাইনিজ খেয়ে আসি।'

লাফিয়ে উঠলেন পাতৌদি। চীনে খাবার খেতে মনসুর দারুণ ভালোবাসেন। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন পাঁচ বন্ধু। সুপ থেকে আরম্ভ করে পাঁচ-ছ' পদের পেট-ভরা খাওয়া খেয়ে ওঁরা যখন রেস্তোঁরা থেকে বেরুলেন, তখন আর কেউই ক্লান্ত নন।

সমুদ্র থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে আসছে। সেদিনের সেই সন্ধ্যাটা সকলের ভালো লাগার মত। হোটেলও খুব কাছে। টেনে-টুনে শ' তিনেক গজ দূরে হবে। মনসুরের তিন বন্ধু ঠিক করে ফেললেন যে, সমুদ্রের ধারে খানিকক্ষণ বেড়িয়ে তবেই তাঁরা ঘরে ফিরবেন।

'আমাদের সঙ্গে এসো প্যাট।'

একজন ডাকলেন।

রবিন ওয়াটারসের সঙ্গে তার মরিস গাড়িটা ছিল। ঐ গাড়িতে করেই মনসুর আর তার বন্ধুরা চাইনিজ খেতে এসে-ছিলেন। পাতৌদির ইচ্ছে করছিল না তখন সমুদ্রের ধারে বেড়াতে। হোটেলে ফিরে শুয়ে পড়তে চাইছে ক্লান্ত শরীর।

পাতৌদি বললেন, 'আমি রবিনের সঙ্গে যাচ্ছি। তোমরা ঘুরে এসো।'

ওরা চলে গেলো। পাতৌদি গিয়ে সামনের সিটে রবিনের পাশে বসলেন। সবে গাড়িটা চলতে শুরু করেছে, হঠাৎ একটা বড় গাড়ি রাস্তার মধ্যখানে এসে পাতৌদিদের গাড়ির দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। রবিন কিছু করার আগেই তার মরিস গাড়িটা গিয়ে বড় গাড়িটার সামনে সজোরে ধাক্কা মারলো।

ধাক্কা সামলাতে পাতৌদি ডান দিকে সামান্য ঘুরে গেলেন। তাঁর ডান কাঁধটা প্রচণ্ড জোরে উইণ্ডস্ক্রীনের গায় লাগলো। প্রচণ্ড আঘাতে। কাঁচ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে।

মরত্মক দুর্ঘটনা নয়। রবিনের কপাল কেটে গেছে। রক্ত ঝরছে। আর বিশেষ কোথাও লাগেনি। রবিনকে উঠতে দেখে পাতৌদি বললেন,

'আমার ডান হাত ভেঙ্গে গেছে। আমি বোধহয় বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাটায় আর খেলতে পারবো না।'

পাতৌদি তখনো জানেনই না যে, তাঁর চোখে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। কারণ, তাঁর চোখে কোন রকম ব্যথা বা যন্ত্রণা সেই মুহূর্তে ছিল না।

কিন্তু পরদিন সকালে ব্রাইটন হাস-পাতালে পাতৌদি আকাশ থেকে পড়লেন। তাঁকে বলা হল যে, তাঁর ডান চোখে তখনই অপারেশন করতে হবে।

উইণ্ডস্ক্রীনের ভাঙ্গা কাঁচের একটা টুকরো তাঁর চোখের মধ্যে ঢুকে গেছে। সেটাকে এখনি বের করতে হবে।

খবরটা শুনে মনসুর যেন পাথর হয়ে গেলেন। তাঁর ডান চোখে কাঁচের টুকরো! অস্ত্রোপচার করতে হবে? আর দেখতে পাবেন তো ঐ চোখে। দেখতে না

পেলে খেলবেন কি করে? ভীষণ কান্না পেলো পাতৌদির। তিনি যে এখনো খেলা শুরুই করতে পারেননি। কতো আশা তাঁর। টেস্ট ম্যাচ খেলবেন। বাবার মত ভারতীয় দলের অধিনায়ক হবেন—সবই শেষ হয়ে যাবে এখনই। ডান চোখে যদি তিনি দেখতে না পান, তাহলে তো তাঁর খেলাও শেষ। এক চোখে কি আর ক্রিকেট খেলা যায়?

হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন কুড়ি বছরের তরুণ পাতৌদি।

খালি মনে হতে লাগলো, বাবা যদি বেঁচে থাকতেন, যা-হোক একটা ব্যবস্থা তিনি করতেনই। আজ তাঁর কি হবে?

বাবা নেই। মা সেই কতো দূরে—ভারতে। বোনরাও কাছে নেই। আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। একা-একা এই হাসপাতালে পাতৌদির নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। চোখই যদি গেল, তাহলে তাঁর আর কি রইলো। অজান্তেই মনসুরের চোখ দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় নেমে আসে জল।

স্যার বেঞ্জামিন রাইকফট দেখা করতে এলেন পাতৌদির সঙ্গে। চক্ষু-বিশেষজ্ঞ হিসেবে রাইকফটের দারুণ নাম। তিনি এসে বললেন,

'আমার মনে হচ্ছে, তোমাকে এখন থেকে এক চোখেই খেলতে হবে। ডান চোখে 'কনট্যাক্ট লেন্স' লাগালে অবশ্য তুমি নব্বুইভাগ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে। কিন্তু খেলার মত সড়গড় হতে তোমার অনেক সময় লেগে যাবে। কারণ, তুমি ঐ চোখে সবকিছুই দুটো করে দেখবে।'

দারুণ মন খারাপ হয়ে গেল পাতৌদির। এতোক্ষণে সে পরিষ্কার বুঝতে পারলো যে, তার একটা চোখ প্রায় নষ্ট হতে বসেছে। কিন্তু আর কখনো ক্রিকেট খেলতে পারবে না—এ-কথা সে ভাবতেই পারে না। ক্রিকেট ছাড়া সে বাঁচবে কি নিয়ে। ক্রিকেট ছাড়া যে তার কো নঅস্তিত্ব নেই। ক্রিকেটকে বাদ দিলে তার জীবনে আর কিছুই যে অবশিষ্ট থাকে না।

পাতৌদি বিশ্বাসই করতে পারে না যে, সে আর কোনদিন খেলবে না। প্রথমটায় ভেবেছিল, সাসেক্সের সঙ্গে খেলাটায় সে আর মাঠে নামতে পারবে না। তারপর ভেবেছিল, অক্সফোর্ডের বাকি তিনটি ম্যাচে সে খেলতে পারবে না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে, সে হয়তো আর কোনদিনই খেলতে পারবে না।

ডাঃ ডেভিড রবার্টস পাতৌদির চোখ অপারেশন করলেন। চোখের মধ্যে থেকে কাঁচের টুকরো বের করে আনার সময় মণিটা প্রায় নষ্ট হয়ে গেল, পাতৌদির ডান চোখে তখন কোন দৃষ্টিই ছিল না।

কিন্তু পাতৌদি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে, তিনি আর খেলতে পারবেন না। ওদিকে পাতৌদির জায়গায় রুলিন ড্রাইবার্গ অক্সফোর্ডের অধিনায়ক মনোনীত হলেন। দুর্ঘটনার পর রবিন ওয়াটার্সও আর আগের মত খেলতে পারছিলেন না। তাঁর জায়গায় উইকেটরক্ষকতার দায়িত্ব নিলেন সি বি ফ্রাইয়ের নাতি সি এ ফ্রাই।

মনসুর আলি পাতৌদির নেতৃত্বে ১৯৬৭ সালে ইংলন্ড সফরকারী ভারতীয় দল। বাঁ দিক থেকে দাঁড়িয়ে—সুব্রত গুহ, রমেশ শকসেনা, ভেঙ্কটরাঘবন, চন্দ্রশেখর বেদী, হনুমন্ত সিং ও প্রসন্ন। বাঁ দিক থেকে বসে বুধি কুন্দেরণ, চন্দু বোরদে, পাতৌদি, কুন্দরণ ও ফারুক ইঞ্জিনিয়ার।

অপারেশনের পর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পাতৌদির তিন-চার সপ্তাহ লেগে গেল। সবদিক থেকে বড্ড অসুবিধে হচ্ছে। যা করতে যান তাতেই ভুল। সিগারেট ধরাবার জন্যে লাইটার জ্বালালে সেটা রয়ে যায় ইঞ্চিখানেক দূরে। চলতে-ফিরতেও বড্ড অসুবিধে হচ্ছে। গ্লাসে জল ঢালতে গেলে জল পড়ে যায় মাটিতে। এক চোখে দারুণ মুশকিল হচ্ছে সব কিছুতেই।

কিন্তু হার মানার ছেলে পাতৌদি নন। আস্তে আস্তে নিজেকে পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে রপ্ত করতে লাগলেন। দিনের পর দিন চেষ্টা করতে লাগলেন নিজেকে মানিয়ে নেবার জন্যে। না, এখন তো আর জল ঢালতে গেলে মাটিতে পড়ে না। দিব্যি গ্লাস ভরে ওঠে। সিগারেট জ্বালাতে আর অসুবিধে হয় না। খাওয়ার সময় কাঁটা-চামচ ঠিক মুখেই যায়।

খুশী হয়ে উঠলেন পাতৌদি। হ্যাঁ, পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে এবার তিনি নিজেকে মানাতে পারছেন। ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাচ্ছে সব অসুবিধে। এইবার আসল কাজ। ব্যাট-বল নিয়ে মাঠে নামতে হবে। নেটে গিয়ে দেখতে হবে ঠিকমত খেলতে পারেন কিনা।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে 'কনটাক্ট লেন্স' লাগালেই সব কিছুই দুটো করে দেখতে শুরু করেন পাতৌদি। ঐ অসুবিধে দূর করতেই হবে। তা সে যেভাবেই হোক না কেন।

নেট প্র্যাকটিস করতে এলেন পাতৌদি। সঙ্গে বুড়ো সাসেক্সের প্রশিক্ষক জর্জ কক্স। তিনি বল করতে লাগলেন। প্রথমটায় কিছুই বুঝতে পারছিলেন না পাতৌদি। বলের লেংথ, ডিরেকশান কিচ্ছু না। ব্যাট চালাতে বল পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। তাঁর ব্যাট এক জায়গায়, বল আর এক জায়গায়।

ব্যাট নিয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গী বদলে ফেললেন পাতৌদি। এতোদিন যেভাবে দাঁড়াতেন, তার চেয়ে একটু ঘুরে দাঁড়ালেন। যদি তাতে কিছু সুবিধে হয়। কিন্তু কই তাতেও তো বিশেষ কোন লাভ হচ্ছে না। বার বার ফসকাচ্ছেন। কিছুতেই আগের মত সেই স্বচ্ছন্দ বোধ, সেই আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে না।

তাহলে....?

হতাশায় ভেঙে পড়তে চাইছিল পাতৌদির মন। তবে কি সত্যিই তাঁকে খেলা ছেড়ে দিতে হবে? চিরদিনের মত তাঁকে ছেড়ে যেতে হবে মাঠ। তাঁর সমস্ত স্বপ্ন, তাঁর সব আকাংখা অপূর্ণ রয়ে যাবে। আর তিনি কোনদিন ক্রিকেট খেলতে পারবেন না। বাবার মত টেস্ট খেলতে পারবেন না, হতে পারবেন না ভারতের অধিনায়ক? মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তাঁকে ফুরিয়ে যেতে হবে? চুপি চুপি সরে যেতে হবে ক্রিকেট মাঠ থেকে?

না, না, না তা হতে পারে না। তা কিছুতেই হতে দেবেন না। পাতৌদি তাঁর মন প্রাণ বিদ্রোহ করে ওঠে। তাঁকে খেলতেই হবে। তা সে যে ভাবেই হোক।

কিন্তু তা কি করে হবে? সব কিছুই যে দুটো করে দেখছেন। বোলার বল করলে তিনি দেখেন দুটো বল তাঁর দিকে ছুটে আসছে। কি করবেন তাহলে পাতৌদি? হার মেনে নেবেন? কিন্তু হার মানা তো তাঁর স্বভাব নয়। যে চেষ্টা যে তাঁকে করতেই হবে।

আবার ব্যাট হাতে নিয়ে নেটে ফিরে এলেন পাতৌদি....। (চলবে
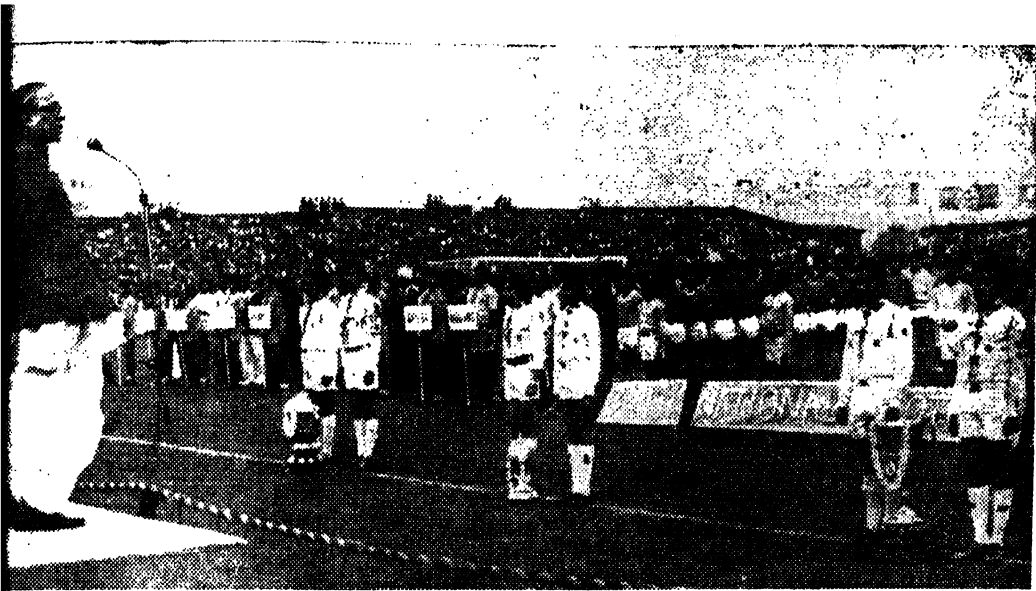
উদ্বোধন করছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু

ন্তাষ ট্রফি

তীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ৩৪তম বসেছে কলকাতায়। ১৯৪১ সালে লকাতা শহরেই জাতীয় ফুটবল গিতা তথা সন্তোষ ট্রফির প্রথম বসেছিল। এবার নিয়ে কলকাতায় বসলো ৬-বার। আগে এইভাবে আসর বসেছিল—১৯৪১, ১৯৪৭, ১৯৫০ এবং ১৯৫৩ সালে।

ই এফ এ-র প্রাক্তন সভাপতি র মহারাজা স্যার মন্মথনাথ রায়- । ভারতীয় ফুটবল খেলায় বিরাট ছিল। তারই স্বীকৃতি হিসাবে এফ এ জাতীয় ফুটবল প্রতি- । বিজয়ী দলের পুরস্কার ট্রফি' উপহার দেয়। ১৯৪১ সাল ১৯৭৬ সাল—এই ৩৬ বছরে ট্রফির আসর বসেছিল মোট ৩৩ সর বসেনি তিনবার (১৯৪২-৪৩ ৯৪৮ সালে)। গত ৩৩ বারের ট্রফির খেলায় বাংলা ২৫ বার খেলে সন্তোষ ট্রফি জয়ী হয়েছে এর মধ্যে উপর্যুপরি জয় চারবার ৫১ : ১৯৪৮ সালে খেলা হয়নি)। ফুটবল প্রতিযোগিতার ৩৩ বছরের সর্বাধিকবার ফাইনালে খেলা ৫ বার), সর্বাধিকবার ট্রফি জয় ১৬ বার) এবং উপর্যুপরি র ট্রফি জয়ের (চারবার) রেকর্ড এপর্যন্ত ১২টি দল সন্তোষ ইনালে খেলেছে এবং তামিল- দ বাকি ১১টি দল এইভাবে ট্রফি জয়ী হয়েছে : বাংলা ১৬ রে ৪ বার (বর্তমানে কর্ণাটক), বার, পাঞ্জাব ২ বার, হায়দরা- এবং একবার করে কেরল, বোম্বাই, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র এবং

১৯৭৮ সালের ৩৪তম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রাথমিক এবং কোয়ার্টার ফাইনাল—এই দুই পর্যায়েরই খেলা লীগ প্রথায় হবে। প্রাথমিক পর্যায়ের লীগের খেলায় যোগদানকারী ২৪টি দল ৮টি গ্রুপে সমান ভাগ হয়ে খেলবে। এবং প্রতি গ্রুপের বিজয়ী দলকে নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের লীগ খেলা হবে দুটি গ্রুপে।

এইভাবে প্রাথমিক, কোয়ার্টার ফাইনাল এবং সেমি-ফাইনাল খেলার তালিকা তৈরি হয়েছে :

প্রাথমিক পর্যায়ের লীগ খেলা

গ্রুপ 'এ' : বাংলা, হিমাচল প্রদেশ এবং গুজরাট।

গ্রুপ 'বি' : পাঞ্জাব, ওড়িষা এবং পণ্ডিচেরী।

গ্রুপ 'সি' : কর্ণাটক, মণিপুর এবং হরিয়ানা।

গ্রুপ 'ডি' : তামিলনাড়ু, জম্মু ও কাশ্মীর এবং সার্ভিসেস।

গ্রুপ 'ই' : মহারাষ্ট্র, বিহার এবং রাজস্থান।

গ্রুপ 'এফ' : রেলওয়ে, মধ্যপ্রদেশ এবং আসাম।

গ্রুপ 'জি' : অন্ধ্রপ্রদেশ, ত্রিপুরা এবং গোয়া।

গ্রুপ 'এইচ' : কেরল, নাগাল্যান্ড এবং উত্তরপ্রদেশ।

কোয়ার্টার ফাইনাল লীগ

১নং গ্রুপ : 'এ' থেকে 'ডি'—এই চারটি গ্রুপের বিজয়ী দল।

২নং গ্রুপ : 'ই' থেকে 'এইচ'—এই চারটি গ্রুপের বিজয়ী দল।

সেমি-ফাইনাল

কোয়ার্টার ফাইনালের ১নং গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান বনাম ২নং গ্রুপের রানার্স-আপ এবং ২নং গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান বনাম ১নং গ্রুপের রানার্স-আপ।

সন্তোষ ট্রফির ফাইনাল

(১৯৪১-১৯৭৬)

	জয়	হার	মোট খেলা
বাংলা	১৬	৯	২৫
কর্ণাটক	৪	৪	৮
রেলওয়ে	৩	৩	৬
পাঞ্জাব	২	০	২
হায়দরাবাদ	২	২	৪
কেরল	১	০	১
দিল্লী	১	১	২
বোম্বাই	১	৪	৭
মহারাষ্ট্র	১	২	৩
অন্ধ্র	১	১	২
সার্ভিসেস	১	৪	৫
তামিলনাড়ু	০	১	১

মেয়েদের বিশ্বকাপ ক্রিকেট

ভারতের মাটিতে মেয়েদের দ্বিতীয় বিশ্ব কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আসর বসেছে। খেলা হবে লীগ প্রথায় এবং বিভিন্ন স্থানে। এবারের প্রতিযোগিতায় এই চারটি দেশ অংশ গ্রহণ করেছে—ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ভারত এবং নিউজিল্যান্ড। এ পর্যন্ত যে তিনটি খেলা হয়েছে তার ফলাফল : ভারত দুটি খেলায় হেরেছে—কলকাতায় ইংল্যান্ডের কাছে ৯ উইকেটে এবং পাটনায় নিউজিল্যান্ডের কাছে ৯ উইকেটে। জামসেদপুরে অস্ট্রেলিয়া ৬৬ রানে নিউজিল্যান্ডকে পরাজিত করেছে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত বনাম ইংল্যান্ড

ভারত : ৬৩ রান (ডায়না এডুলজি ১৮ এবং

নীলিমা ভাবে ১২ রান। হল্দার ২ রানে ২ এবং উইলকস ৬ রানে ২ উইকেট)

ইংল্যান্ড : ৬৪ রান (১ উইকেটে। জীন টমাস নট-আউট ৫৩ রান। জায়না ১৮ রানে ১ উইকেট)

ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড

ভারত : ১৩০ রান (৯ উইকেটে। উজ্জ্বলা নিকাম ৫২, এস কুলকার্নী ২৩ এবং শোভা পণ্ডিত ২১ রান। ক্যারিক ২৬ রানে ২ এবং লিন্ডাসে ২৬ রানে ২ উইকেট)

নিউজিল্যান্ড : ১৩১ রান (১ উইকেটে। বিভেজ নট আউট ৬০ এবং র‍্যাটলে নট আউট ৪১ রান। শুভাঙ্গি শর্মা ৩১ রানে ১ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া বনাম নিউজিল্যান্ড

অস্ট্রেলিয়া : ১৭৭ রান (হিলস ৬৪ রান। বিভেজ ১৭ রানে ৩ এবং ক্যারিক ৪৩ রানে ৩ উইকেট)

নিউজিল্যান্ড : ১১১ (৮ উইকেটে। ৫০ ওভারে। ম্যাক্‌কেলভি ৩৭ রান। ফিট্‌জিবনস ১৬ রানে ৩ উইকেট)

জাতীয় বাস্কেট বল প্রতিযোগিতা

জামসেদপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় বাস্কেট বল প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগের ফাইনালে সার্ভিসেস ৮৪-৬৭ পয়েন্টে পাঞ্জাবকে হারিয়ে উপর্যুপরি ৯ বার চ্যাম্পিয়ান হওয়ার এক দুর্লভ গৌরব লাভ করেছে। এই নিয়ে সার্ভিসেস মোট ২০ বার চ্যাম্পিয়ান হল, যা সর্বাধিক বার চ্যাম্পিয়ান হওয়ার রেকর্ড।

মেয়েদের বিভাগের ফাইনালে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান মহারাষ্ট্র ৮২-২৮ পয়েন্টে দিল্লীকে পরাজিত করে।

চূড়ান্ত দলগত অবস্থান

পুরুষ বিভাগ : ১ম সার্ভিসেস, ২য় পাঞ্জাব ৩য় বিহার।

মহিলা বিভাগ : ১ম মহারাষ্ট্র, ২য় দিল্লী, ৩য় পশ্চিম বাংলা।

জাতীয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

পানজীতে আয়োজিত জাতীয় এবং আন্তঃ রাজ্য ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা একাধিক অঘটন ঘটে গেছে। পুরুষদে দলগত বিভাগের ফাইনালে কর্নাটক ৩— খেলায় ৯ বছরের চ্যাম্পিয়ান রেলওয়েকে হারিয়ে এই প্রথম খেতাব জয়ী হল। মহিল বিভাগের ফাইনালে কেরল ২—১ খেলা গত তিন বছরের চ্যাম্পিয়ান রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে। মহিলা বিভাগে রেল দ ৮ পর্যন্ত ৭ বার চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। অপ দিকে কেরলের পক্ষে খেতাব জয় এই প্রথম

জাতীয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা ব্যক্তিগত বিভাগের পুরুষদের সিঙ্গল ফাইনালে কর্নাটকের প্রকাশ পাড়ুকো ১৫-০ ও ১৫-৬ পয়েন্টে পাঞ্জাবে দীপিন্দর আহুজাকে পরাজিত ক উপর্যুপরি ৭ বার সিঙ্গলস খেতাব জয়ে দুর্লভ গৌরব লাভ করেছেন। এ জয়লাভের ফলে নান্দু নাটেকার প্রতিষ্ঠি সর্বাধিকবার (৬বার) পুরুষদের সিঙ্গল খেতাব জয়ের রেকর্ডও তিনি ভে দিলেন।

দর্শ

ঘটেছিল

১৮৫৪ সালের কথা।

আদিকালের শহর কলকাতার বুকে সেদিন অনুষ্ঠিত হল এক আজব খেলা। কলকাতা কেন ভারতের মানুষ যা কোন-দিন দেখেনি, যে খেলার কথা কোনদিন শোনে নি—সেই এক অদ্ভুত খেলা খেললেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাহেবরা।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ের কোন একদিন। এসপ্লানেডের ময়দানের সাহেবরা এক আজব খেলা খেললেন। হাওয়া ভর্তি একটি চর্ম গোলক নিয়ে লাথালাথি করতে লাগলেন তাঁরা।

সাহেব দেখলে তখনকার মানুষ সাত হাত দূরে সরে যেতেন ভয়ে ভয়ে। কিন্তু ঐ আজব খেলা তাঁদের ভয় কাটিয়ে দিল। তাঁরা পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন মাঠের কাছাকাছি। অবাক চোখে দেখলেন সাহেবরা বল মারছেন, আর একজন পা দিয়ে ধাঁই করে মেরে সেটা ফিরিয়ে দিচ্ছেন। আর হাওয়া ভর্তি চর্ম গোলকটি মাঠের মধ্যে ধপ ধপ করে লাফাচ্ছে। পরে তাঁরা জানালেন, ঐ খেলার নাম নাকি ফুটবল।

১৮৫৪ সালের এপ্রিল মাসের সেই দিনেই ভারতের মাটিতে প্রথম ফুটবল খেলা হয়। খেলাটা সেদিন আসল ছিল না। সাহেব-মেমদের হৈচৈ আর আনন্দ স্ফূর্তি করাই ছিল সেদিন আসল। সেদিন অর্থাৎ ভারতের মাটিতে প্রথম ফুটবল খেলেছিল 'ক্যালকাটা ক্যাব অফ সিভিলিয়ানস' ও ব্যারাকপুরের 'জেন্টেলমেন অফ ব্যারাকপুর'।

কলকাতার ফুটবল শুরু হল সেই দিনই। তারপর কলকাতাকে ঘিরে ভারতীয় ফুটবল একদিন তার শৈশবদশা কাটিয়ে উঠলো। ফুটবল খেলা ছড়িয়ে পড়লো ভারতের প্রতিটি প্রান্তে। শুরু হল কলকাতার লীগের খেলা। আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা। কোচবিহার ট্রফি তো ছিল। দিল্লিতে আরম্ভ হল ডুরাণ্ড কাপের খেলা। আর বোম্বাইয়ে রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা। সব মিলিয়ে ভারতীয় ফুটবলের আসর জমজমাট হয়ে উঠলো। ১৯৪১ সালে শুরু হল জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা। অর্থাৎ ভারতীয় ফুটবল যৌবনে উপনীত হল।

রক্তে রাঙা রাজপথ

বাংলাদেশে সাইক্লিস্টদের অনেক দিনের একটা দাবী হল একটি ট্র্যাকের। রবীন্দ্র-সরোবরে যখন স্টেডিয়াম তৈরী হল তখন সকলে মিলে এখনকার সি আই টির চেয়ার-ম্যান শৈবাল গুপ্তকে ধরে টরে একটি সাইক্লিং ট্র্যাক তৈরী করিয়েছিলেন। সেই ট্র্যাকটি অবহেলিত অবস্থায় আজো পড়ে আছে। কিন্তু সেখানে বাংলার সাইক্লিস্টরা অনুশীলনের সুযোগ পান না। অনেক অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও সকালে তালামারা থাকে স্টেডিয়ামের গেট। তাই বাধ্য হয়েই বাংলার সাইক্লিস্টদের অনুশীলন করতে হয় রাজপথে।

রাজপথে অনুশীলন করতে গিয়ে একে একে বাংলার তিনটি তরুণ প্রাণ দিয়েছেন। দিন কয়েক আগে মারা গেছেন আশিস চ্যাটার্জি। মাত্র ১৮ বছরের তাজা ছেলে। জাতীয় প্রতিযোগিতায় রেকর্ড গড়েছেন। ক'মাস হল রেলে চাকরী পেয়েই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। ভারতের সাইকেল চালকদের মধ্যে আশিসের ভবিষ্যৎ ছিল খুবই সম্ভা-বনাপূর্ণ। কিন্তু সেদিন সকালে অনু-শীলনের সময় রাজপথে প্রাণ দিতে হল আশিসকে। বাবা-মাকে বাবা তারকনাথ সিনেমা দেখাবে বলে টিকিট কেটে রেখেছিল সে। কিন্তু সে টিকিট অক্ষতই রয়ে গেল। সিনেমা দেখা আর ওর হল না।

ডিসেম্বরের সকালে (৭-৪৫) তিন বন্ধু অনুশীলন করছিল। রেড রোড দিয়ে ঘুরে গিয়ে খিদিরপুরের মোড় থেকে আচার্য জে সি বোস রোড ধরে ওরা আবার এসে পড়ে রেড রোডে। সকলেই একই পথে অনুশীলন করে।

সেদিন সকালে খিদিরপুরের মোড়ের কাছে রেসকোর্সের গেটের মুখে একটি রেসের ঘোড়ার চাট খেয়ে আশিস ছিটকে পড়লো রাজপথে। তখন এক দানবের মতো ছুটে এসে এক লরী পিষে দিয়ে গেল তাকে। আশিসের রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো রাজপথ।

ঠিক এমনই হয়ে উঠেছিল এর আগেও দুবার। পাঁচ বছরের মধ্যে আশিসকে নিয়ে তিনজন সাইক্লিস্ট অনুশীলনের সময় রাজ-পথে প্রাণ দিলেন। প্রথমে মারা গিয়েছিলেন জিয়াউর রহমান। তারপর চপল চৌধুরী আর এবার আশিস চ্যাটার্জি।

অথচ রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের ট্র্যাকে এদের অনুশীলনের সুযোগ দিলে অকালে এই তিনজন উদীয়মান ক্রীড়াবিদকে হারাতে হতো না। কিন্তু এখনো হুঁশ হয় নি সি আই টি কর্তৃপক্ষের। তাই এখনো রবীন্দ্র সরোবরের গেটে তালা মারা। আমরা আশা করবো এই ব্যাপারে কিছু করার জন্যে অন্ততঃ রাজ্য সরকার এগিয়ে আসবেন এবং রাজ্যের সাইক্লিস্টদের অনেক দিনের একটি দাবী পূরণ করবেন। রাজ্য ক্রীড়া পরিষদও কি এই ব্যাপারে কিছু করতে পারেন না?

টেস্ট জেতার কারিগর

মেলবোর্ণের তৃতীয় টেস্টে ভারত জিতেছে। পর পর দুটি টেস্টে হারের পর এই জিৎ নিঃসন্দেহে আনন্দের। অবশ্য প্রথম দুটি টেস্টে ভারত হেরে গেলেও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়েছিল। তার আঁচ আমরা এতো দূরে বসেও পেয়েছিলাম। ভারত-অস্ট্রেলিয়ার সেই তীক্ষ্ম লড়াই প্যাকার সাহেবের বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে। সেই সঙ্গে প্রমাণ করেছে যে স্টার ক্রিকেট অচল। কারণ বিশ্বের সামনের সারির খেলোয়াড়রা হাজির থাকলেও সেই খেলা যে প্রদর্শণীরই নামান্তর। তাতে না আছে দু দেশের টেস্ট লড়াইয়ের সেই উত্তেজনা, না আছে সেই উন্মাদনা। কিন্তু ভারত-অস্ট্রেলিয়ার খেলায় উত্তেজনা ও উন্মাদনা তুঙ্গে উঠেছিল। তাই দর্শকরা ভিড় করেছিলেন সরকারী টেস্টের দিকেই। প্যাকার সাহেবের খেলা এক রকম ফাঁকা মাঠেই হলো। ফলে প্যাকার সাহেব এখন রীতিমত চিন্তায় পড়েছেন। এক একজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে বছরে পঞ্চাশ হাজার ডলারের চুক্তি। কারো কারো সঙ্গে আবার এই চুক্তি পাঁচ বছরের অর্থাৎ আড়াই লক্ষ ডলারের। প্যাকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড়ের সংখ্যা পঞ্চাশের ওপর। অর্থাৎ ব্যাপারটা কোটি ডলারের অনেক ওপারেই। এখন এই টাকা আসবে কোথা থেকে? তবে কি শেষ পর্যন্ত প্যাকার সাহেব হার মানবেন? তা অবশ্য এই মুহূর্তে মনে হয় না। তবে ভারত যদি মেলবোর্ণ টেস্টের জয়ের ধারা ধরে রাখতো তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। তখন হয়তো দেশের নামী খেলোয়াড়দের ফিরে পাবার জন্যে অস্ট্রেলিয়া বোর্ডই কেরি প্যাকারের সঙ্গে সমঝোতায় আসবে। তবে তার এখনো অনেক দেরী।

তাই ও প্রসঙ্গ থাক, আমরা বরং এখন ভারতের জয়ের কথায় আসি। মেলবোর্ণে ভারত একমাত্র ফিল্ডিং ছাড়া সব দিক দিয়েই প্রাধান্যের পরিচয় দিয়ে জিতেছে। যদি বলি ভারতকে জিতিয়েছেন দুটি মানুষ—সুনীল গাভাসকার ও ভাগবৎ চন্দ্রশেখর তাহলে তা মোটেই অন্যায় হবে না। কারণ দ্বিতীয় ইনিংসে গাভাসকারের শত রাণ ও চন্দ্রশেখরের দু ইনিংসে সংহার মূর্তি ভারতের জয়ের পথ পরিস্কার করে দেয়। মেলবোর্ণে সেঞ্চুরি করায় গাভাসকার পর পর চারটি টেস্টে সেঞ্চুরি করলেন। গত ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি বোম্বাইয়ে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে শেষ টেস্টে শতরাণ করেছিলেন। তারপর অস্ট্রেলিয়ায় এসে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্টে করলেন। অর্থাৎ পর পর চারটি টেস্টে সেঞ্চুরি। ত্রিশ বছর আগে পর পর পাঁচটি ইনিংসে টেস্টে সেঞ্চুরি করার নজির গড়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের উইকস।

চন্দ্রশেখর

আর চন্দ্রশেখর? ওঁর কথাই আলাদা। চন্দ্রশেখরকে ভারতের ম্যাচ জেতার কারিগর বলা চলে। সাম্প্রতিক কালে ভারত যতোগুলি টেস্ট জেতেছে তার প্রত্যেকটির পেছনেই আছে চন্দ্রশেখরের নিপুন বোলিং। চন্দ্রশেখর সংহার মূর্তি ধরতে পারলে ভারত জিতবে, না পারলে পারবে না। চন্দ্রশেখর একটু জোরের ওপর লেগ ব্রেক বল করেন। সেই সঙ্গে চকিতে গুগলি ছাড়েন। চন্দ্রশেখরের মত বোলার আজকাল খুব একটা হয় না। কারণ এঁরা যেদিন খেলতে পারবেন বা বাগে পাবেন সেদিন বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানে ভরা দলের ইনিংস ধ্বসিয়ে দিতেও এঁদের বেশী সময় লাগে না। কিন্তু যেদিন সুবিধে করতে পারেন না—সেদিন দেদার পিটুনী খান। গাদা গাদা রাণ ওঠে ওঁদের বলে। বেদী, প্রসন্ন—এঁরা খুবই ভালো বোলার গাদা গাদা উইকেট এঁরা দখল করেছেন। কিন্তু ম্যাচ জেতানোর জন্যে চাই চন্দ্রশেখরের মতো বোলারদের।

আমরা যদি সাম্প্রতিক কালে ভারতের টেস্ট জয়ের ইতিহাসের পাতা উল্টোই তাহলে দেখতে পাবো যে এই চন্দ্রশেখরের কাঁধে বন্দুক রেখেই ভারত বাজী মাৎ করে চলেছে। টেস্ট খেলায় ভারতের 'ট্রাম্প কার্ড' এই ভাগবৎ চন্দ্রশেখরই। কিন্তু চন্দ্রশেখর আর কতোদিন এই ভাবে ভারতের জয়ের হাল ধরে থাকবেন। একে তিনি পুরোপুরি সুস্থ নন, তার ওপর বয়সও হচ্ছে। মনে হয় টেস্ট ক্রিকেটের আসর থেকে তাঁর বিদায় নেবার লগ্নটি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। আজ না হয় দু বছর পরে না হয় তো আরো কিছু দিন পরে চন্দ্র অবসর নেবেন, তখন কি হবে? বিষয়টি নিয়ে আজ চিন্তা করার সময় এসেছে। কারণ চন্দ্রশেখরের মতো বোলার আর উঠছে না। বেদী গেলে আর এক বেদী হয়তো পাওয়া যাবে। প্রসন্ন ভেঙ্কটরাঘবনের মত অফ স্পিন বোলার আমরা মনে হয় পাবো—কিন্তু দ্বিতীয় চন্দ্রশেখর কোনদিনই পাওয়া যাবে না। তখন তাহলে ভারতের জয়ের লড়াইয়ের হাল ধরবেন কে? চন্দ্রশেখরের মত কে তখন টেস্ট জয়ের কারিগর হবেন? হবেন ভারতের ট্রাম্প কার্ড?

—শান্তিপ্রিয়

প্রশ্নোত্তর

জ্যোতির্ময় মজুমদার (হনুমান রোড, নয়াদিল্লি-১)

প্রশ্ন : এর আগে কলকাতায় আর কবে কবে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়েছিল? সেবারের ফলাফল কি?

উত্তর : এর আগে ১৯৪১, ১৯৪৬, ১৯৪৯-৫০ ও ১৯৫৩ সালে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা কলকাতায় হয়েছিল। তিনবারই বাংলা জিতেছিল।

অজয় সোম (এস কে দেব রোড, কলকাতা-৪৮)

প্রশ্ন : ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক লয়েডের ব্যাটিংয়ের গড় জানতে চাই।

উত্তর : ৬৩টি টেস্টের ১১১টি ইনিংস খেলে লয়েড ৪৪৬৬ রান করেছেন। ১১টি সেঞ্চুরি করেছেন। ভারতের বিরুদ্ধে অপরাজিত ২৪২ রানই টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর সর্বোচ্চ।

তপন রায় (কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট)

প্রশ্ন : ভারতীয়দের মধ্যে কে কে উইসডেনের স্বীকৃতি লাভ করেছেন?

উত্তর : এ পর্যন্ত মাত্র আটজন এই সম্মান লাভ করেছেন। কে এস রণজিৎ সিংজী—১৮৯৬ সালে, কে এস দলীপ সিংজী ১৯২৯, পাতৌদির নবাব ইফতিকার আলি খাঁ ১৯৩২ সালে, সি কে নাইডু ১৯৩২, ভি এম মার্চেন্ট ১৯৩৬, ভিনু মানকাদ ১৯৪৬, পাতৌদির নবাব মনসুর আলি খাঁ ১৯৬৭ সালে, বি এস চন্দ্রশেখর ১৯৭২ সালে।

গোপা মজুমদার (কেয়াতলা রোড, কলকাতা)

প্রশ্ন : নির্মল চ্যাটার্জি রণজি ট্রফির খেলায় কতো রান করেছেন?

উত্তর : রণজি ট্রফিতে ৬২টি ইনিংসে খেলে ২১২৬ রান করেছেন। ১৯১ রান নির্মল চ্যাটার্জীর সর্বোচ্চ। গড়ে ইনিংস প্রতি তাঁর রান ৩৬.৭৩।

কলকাতা প্রায় অনুপস্থিত

নির্মল ধর

বম্বে থেকে বিনোদ মেহরার মত উঠতি শিল্পী যেমন এসেছে, তেমনি সঞ্জীবকুমারের মত ব্যস্ত অভিনেতাও সময় করে একবার এসেছিলেন মাদ্রাজে। এসেছিলেন রাজকাপুর, বাসু চ্যাটার্জি, এম এস সথ্যু, আরও অনেকে।

উৎসবের উদ্বোধনী সন্ধ্যায় সভামঞ্চে এঁদের সকলকে যখন অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছিল, তখন বারবার মনে পড়ছিল কলকাতার অনুপস্থিতির কথা। মঞ্চে বসেছিলেন সত্যজিৎ রায়, আর দর্শকের আসনে দেখেছি মৃণাল সেনকে। ভিড়ের মধ্যে একবার ই আই এম পি'র জালান সাহেবকে বোধ হয় চোখে পড়েছিল।

বাস!

আর তো কেউ ছিলেন না কলকাতা থেকে। কেন? 'ফিল্ম বাজার' বিভাগেও ই আই এম পি এ কোন স্টল নেন নি। বাংলা যে চারটি ছবি ('অজস্র ধন্যবাদ', 'হারমোনিয়াম', 'সংসার সীমান্তে', 'পদাতিক') ফিল্ম বাজারে রয়েছে তা নিয়েও তেমন প্রচার চোখে পড়ছে না।

প্রথম দিন সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে সভাপতি এম জি রামচন্দ্রণ তাঁর দীর্ঘ (ক্লান্তিকরও বটে) ভাষণে একাধিকবার সত্যজিৎ রায়ের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখলেন, বাংলা ছবির গুণকীর্তন করলেন, কিন্তু মঞ্চে আনতে দেখা গেল না কাউকে! উৎসব কর্তৃপক্ষ কি পূর্বাঞ্চলের শিল্পী কলাকুশলীদের যথোপযুক্ত সম্মানের সঙ্গে নিমন্ত্রণ করেন নি? না, কলকাতারই অনীহা?

একমাত্র এই বুক বাথা করা ঘটনাটি ছাড়া মাদ্রাজের ফিল্মোৎসবের শুরুটা বেশ জমেছে। বিদেশী অতিথিদের সবাই এখনও এসে পৌঁছতে পারেন নি। আটান্নজনের মধ্যে প্রথম দিন উপস্থিত হতে পেরেছেন মাত্র দশজন। আশা করা যায় সবাই-ই আসবেন।

গত সন্ধ্যায় কলাইভানর আরঙ্গমে (শিশু মঞ্চ) পঞ্চদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের উদ্বোধন করলেন তথ্য ও বেতারমন্ত্রী এল কে আদভানি। এবং রাত্রিতে এক রাত্রিভোজের আয়োজন ছিল হোটেল চোলায়।

সাংবাদিকদের জন্য ছবির বিশেষ প্রদর্শনী তিন তারিখ সকাল থেকেই শুরু হয়েছে। অবিরাম ছবিঘরে প্রতিদিন পাঁচখানি ছবি দেখানো হচ্ছে আমাদের। উৎসব কমিটির ছবি নির্বাচন সম্পর্কে অনেকেরই সন্দেহ ছিল, কিন্তু প্রথম দিনের পাঁচখানি ছবি দেখার পর সন্দেহ এখন কিছুটা ফিকে। বোঝা যাচ্ছে ভালো ছবির সংখ্যা খুব কম হবে না।

ফ্যাসবাইন্ডারের 'চাইনীজ ররাউলেট', এলিয়া কাজানের 'দি লাস্ট টাইকুন', ভিত্তোরিও টাভিয়ানির 'পাদরে পাদরোনে' নিশ্চয়ই যে কোন উৎসবের মর্যাদা বাড়ায়। জোলতান ফাবরির 'দি ফিফথ সীল' বা ক্লদ গোরেটার 'দি লেসমেকার' আমাদের আশা মেটাতে পারেনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে চারজন শান্তিপ্রিয় অ-রাজনৈতিক সাধাসিধে সংসারী মানুষের বিদ্রোহী মতাদর্শের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করার কাহিনী নিয়ে ফাবরির ছবি। ছবিতে এত কথা কেন? কয়েকটি প্রতীকের ব্যবহার দুর্বোধ্য। ভিস্যুয়ালসের প্রতি আস্থা কি আজকাল চলে যাচ্ছে? নাকি পরিচালকের ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে?

কই, ফ্যাসবাইন্ডারের ছবিতে ক্যামেরার গতি, প্রাকৃতিক দৃশ্য, শট কম্পোজিশন, কখনও বা নিঃশব্দ অনেক সোচ্চার হল কি করে? আটটি চরিত্রের গতায়াতে, তাঁদের চাউনি, তাঁদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোও যেন কথা বলে উঠেছে। ভূতে পাওয়া বাড়ির মত একটি ভিলায় চারজন মহিলা, তিনজন পুরুষ ও একটি পঙ্গু কিশোরীর গভীর অন্তঃস্থলটিকে পরিচালক কি অপূর্ব কুশলতায় টেনে বার করেছেন।

ভিত্তোরিও টাভিয়ানির 'পাদরে পাদরোনে'তেও নজরে এসেছে শব্দের যাদুকরী ক্ষমতা। ক্যামেরা নয়, শব্দ শুনিয়েই তিনি যেমন সারা পৃথিবীর যৌনকাতরতার প্রতি বিদ্রূপ করেছেন, তেমনি চিরন্তন বাঁশির সুর দিয়ে সংটশীল মনের আর্তিকেও তুলে ধরেছেন। কান উৎসবে সেরা ছবির পুরস্কার পেয়েছে ছবিটি। চোখ ভোলানো সার্ডিনিয়ার লোকেশনে পরিচালক ইতালীর অন্তরাত্মাকেই যেন ধরতে চেয়েছেন। বাবার কড়া শাসন, অশিক্ষা আর প্রকৃতির কোলে মানুষ হওয়া শিশু গিভোনে বড় হলো প্রকৃতির নিয়মেই। শহরে এসে লেখাপড়া শিখল একটু বেশী বয়সেই। বাবার সঙ্গে শুরু হলো দ্বন্দ্ব, থামবার নয় এমন বিবাদ। শেষে গিভোনেকে ছাড়তে হলো দেশ। ছবির প্রকরণে অভিনবত্ব আছে। নাটকের মত প্রধান চরিত্রটি অতীত আর বর্তমানে বারবার ঘুরেছে। এই ছবির বক্তব্যের সার্বজনীনতাটুকুই উপলব্ধি করার মতো।

উদ্বোধন করছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী এল কে আদভানি

এলিয়া কাজানের 'দি লাস্ট টাইকুন'-এ এক বিখ্যাত স্টুডিও মালিকের জীবনের উত্থান-পতন বিধৃত। চিত্রনাট্যকার যেহেতু হ্যারল্ড পিটার, সুতরাং নাটকীয় ঘটনায় জমাটবাঁধা জীবন আরও জমজমাট করে তুলেছেন তিনি। সুসম্পাদিত ছবিটির প্রতিটি বাঁকে ঘটনা-[illegible]ক্স নায়কের পতন কাহিনী দেখতে শুনতে শুনতে সংলাপের আধিক্য থমকে যেতে হয়, একঘেয়েমি আসে না। উপরন্তু রবার্ট ডি নিরো, রবার্ট মিচাম, জ্যাক নিকলসন, টনি কার্টিস, ডোনাল্ড প্লেজেন্সের মত জনপ্রিয় শিল্পীদের অভিনয়ও কম আকর্ষণীয় নয়।

কিন্তু ক্লদ গোরেটার 'দি লেসমেকার' প্রেমের ছবি হয়েও দাগ কাটতে পারলো না। ছবির তিন-চতুর্থাংশ বিরক্তিকর। শেষ পর্যায়ে, যখন নায়ক-নায়িকা আলাদা হলো তখনই যেন উপলব্ধি করা গেল পরিচালকের উপস্থিতি। হাসপাতাল, রুগ্ন নায়িকা, শীতের পার্ক, ঝরাপাতার শব্দ সব মিলিয়ে নায়িকার একাকীত্ব তখনই পরিস্ফুট।

যাই হোক, উৎসব চলছে।

চলবে ১৭ তারিখ পর্যন্ত। দেখার বাকি আছে অনেক, অ-নে-ক ছবি। 'ট্যাক্সি ড্রাইভার', 'ইলাস্ট্রেয়াস করপসেস' 'ব্লাড ওয়েডিং', 'দি বাইবেল', 'মেটামরফোসিস' আরও আরও।

সে সংবাদ পরের সংখ্যায়।

চিত্রধ্বনি

রিচালক বনাম সমালোচক

কয়েকদিন আগে এক সন্ধ্যার এক পরিচালকের সঙ্গে এক চিত্রসমালোচকের কথাবার্তা হয়েছিল, যা আমি টেপ করে রার সুযোগ পাই। এই অবসরে আমি ঐ টা চালিয়ে দিচ্ছি।

পরিচালক : ....ও হ্যাঁ, আগামী হে কোন্ ছবি মুক্তি পাচ্ছে জানেন ?

সমালোচক : হ্যাঁ ঐ তো.......

পরি : ওর প্রোডিউসার ডাইরেকটার র ভীষণ বন্ধু। তা আপনাদের কে ?

সমা : সম্ভবত আমি।

পরি : আপনি না গেলেই কি নয় ? অন্য কাউকে পাঠানো যায় না ?

সমা : কেন বলুন তো ?

পরি : ছবিটা চলা দরকার, বুঝলেন ইণ্ডাষ্ট্রির যা অবস্থা, পরপর মার .....

সমা : আমি গেলে কি ছবি চলবে

পরি : আপনি তো যা তা বলবেন।

সমা : ছবি ভাল হলেও ?

পরি : আহা ছবি যদি ভাল নাই হয়, নারা তো একটু পাশ কাটিয়ে লিখতে ন।

সমা : আমাদের পাশ কাটিয়ে লেখার আপনারাই বরং ভাল ছবি করুন না। আমরা—

পরি : ওসব কথা রাখুন মশাই। ভাল করলেও আপনারা যা তা বলবেন। ৎ, মৃণাল ছাড়া আপনারা কার ছবিটা ালেন বলুন তো ? অথচ ওঁরা ষ্ট্রিটা বাঁচিয়ে রাখেন নি, বাঁচিয়ে ছ আমরা। ওঁরা বছরে দুটো ছবি , আমরা করি ৩২টা।

সমা : কিন্তু কেউ নিশ্চই একজন ছবি করছেন না। সত্যজিৎ রায় যেখানে ১টা ছবি করছেন, সেখানে অন্য লকও ১টা ছবি করছেন। কদাচিৎ জন এর বাইরে। কথা হল আপনারা থেকে আলাদা ভাবছেন কেন ?

পরি : আরে মশাই ঐসব আর্ট ইণ্ডাষ্ট্রির বারটা বাজাল....

সমা : একথা যদি মেনেও নিই, বলতে হয় আপনারা কমার্শিয়াল নামে যা করছেন, তার কাট পয়সা আপনারা যেগুলোকে আর্ট ফিল্ম তা হচ্ছে বছরে ১টা কি দুটো। খুব বেশী ধরলে খরচ ৮।১০ লাখ

নিতু সিং / দোসরা আদমী

টাকা। আর এদিকে বাকী ৩০টা ছবির পেছনে খরচ হচ্ছে দেড় কোটীরও বেশী। তাহলে, ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে। দাঁড়াচ্ছে।

পরি : যা দাঁড়াচ্ছে তারজন্য আপনারাই বেশী দায়ী। উল্টোপাল্টা যা ইচ্ছে লিখে—

সমা : আপনি কি বলতে চান, ছবি যারা দেখে তারা সবাই আমাদের লেখা পড়ে? পড়ে কর্নাভিনসড হয় ? আমরা কি এতই শক্তিমান ?

পরিচালক এরপর কিছুক্ষণ চুপ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর বলেন

পরি : একটা ব্যাপার নিশ্চই অস্বীকার করবেন না যে ছবি চলবার পেছনে আপনাদেরও দায়িত্ব কম নেই। আপনারা যদি কিছু ব্যাক করেন—

সমা : আপনারা কি চান? মোসাহেবী না সমালোচনা? ভাল কিছু করুণ, আমরা সঙ্গে আছি। একই কথা লিখে লিখে আমরাও ক্লান্ত। আমরাও দুর্দান্ত প্রশংসা করতে চাই। আপনারা তার একটু সুযোগ করে দিন না—

পরি : কিন্তু আমরা তো চেষ্টা করছি—জানেন কি সব অসুবিধের মধ্যে আমরা এই ইণ্ডাষ্ট্রিকে বাঁচিয়ে রেখেছি—

সমা : আপনারা বাঁচিয়ে রেখেছেন ?

পরি : নয়তো কি, আমরা ছবি না করলে এই এতগুলো লোক তাদের ঘর-সংসার নিয়ে না খেয়ে মরত।

সমা : হ্যাঁ এই ভেবেই যতদিন ইচ্ছে সুখে থাকুন। আচ্ছা বলুন তো এই ইণ্ডাষ্ট্রিতে একজন নতুন প্রযোজক একবার কি দুবারের পরে কেন হারিয়ে যায়। কেন টেকনিশিয়ানরা ঠিক মতো খেতে পরতে পায় না আর অন্যদিকে পরিবেশক প্রদর্শক কালো টাকা বাড়িয়ে যায় ? কেন কোন ছবি আর্থিক দিক দিয়ে সফল হলেও তার প্রযোজক সময় মতো টাকা ফেরৎ পায় না ?

পরি : এর জন্য কি আমরা দায়ী ?

সমা : নিশ্চই, আপনারা সব জেনেও চুপ করে থাকেন।

পরি : ঠিক আছে আমরা না হয় চুপ করে থাকি, কিন্তু আপনারাও তো বলতে পারেন, স্টুডিওগুলোর প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরতে পারেন। কিন্তু আপনারা কি করছেন? ঝলমলে ছবি ছাপছেন, প্রশংসায় পাতা ভরাচ্ছেন, সুন্দর গল্প তৈরী করছেন, আর স্টারদের পেছনে দৌড়াচ্ছেন—এই আপনাদের সততা? সাহসিকতা?

সমালোচক এই আক্রমণের তোড়ে হঠাৎই খেই হারিয়ে ফেলেন। তাঁর মনে পড়ে যায় একটি অভিজাত হোটেলের একটা পার্টির ঘটনা। পরিচালক সমালোচককে চুপ করে থাকতে দেখে ততক্ষণে আবার আক্রমণ শুরু করেছেন—

পরি : আপনারা এমন অনেকে আছেন যাঁরা ঠিকমতো বর্ণপরিচয় পড়তে পারেন না। ছবি বোঝা তো দূরের কথা—

সমা : অস্বীকার করি না। কিন্তু তার জন্য আমরা কি ছাড়া পাই? পাঠক আর সময় ঠিক বিচার করে নেয় কারা কতটা খাঁটি। গড়বড় দেখলেই ছুঁড়ে ফেলতে তাঁরা দেরি করেন না। আর এখানেই আপনাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ....

পরি : দেখুন, আমাদের কাজ ছবি করা, আমরা....

সমা : বেশ তাই করুন। কিন্তু এগুলো কি ছবি হচ্ছে?....আমি আর্টস নিয়ে পড়েছি। দেখেছি যারা সবচেয়ে ভাল ছাত্র, আর যারা একেবারে খারাপ, মানে সাইন্স, কমার্স কোন বিভাগেই চান্স পায় না, তারাই আর্টস নেয়। এই ফিল্ম ইন্ডাষ্টিতেও হয়েছে তাই। এর মধ্যে ঘুরে ঘুরে করতে করতে যারা ফিল্মের কোন বিভাগেই ঠিকমতো সুবিধে করতে পারে না, তারাই সুবিধে মতো কিছু টাকা জোগাড় করে বা স্টারদের সুপারিশে পরিচালক হয়ে যায়।

পরি : আপনারাই তো তাদের নিয়ে বেশী করে মাতামাতি করেন—আপনারা কি দাবী করতে পারেন যে আপনারা সব বোঝেন? কোন ছবি....

সমা : না সেরকম কোন দাবী অন্ততঃ আমার নেই। তবে বুঝতে চেষ্টা করি—ছবি দেখি, নোট নিই তারপর আলোচনা করি—

পরি : তার পরেও তো ভুল থাকতে পারে। আপনি যে ছবিকে ভাল বলছেন—

সমা : এখানেই ভুল করছেন। কোন ছবিকেই আমরা ভাল বা খারাপ বলতে পারি না। এ দায়িত্ব আমাদের কেউ দেয় নি। আমাদের কাজ ছবিকে বিশ্লেষণ করা, এবং তা আমাদের দৃষ্টি দিয়ে নয়, পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করে।.... বিকাশ রায়

সৌমিত্র / প্রতিমা

অনেকদিন পরে একটি ভাল ছবি

'প্রতিমা' পুরোনো আটচালায় তৈরী। অর্থাৎ সেন্টিমেন্ট দিয়ে গড়া। তবু দেখতে ভাল লাগে। তারাশংকরের ছোট গল্পকে চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক একটা সুন্দর রূপ দিতে পেরেছেন। আর বাংলা ছবির যা দুর্গতি চলছে, সেখানে এই ছবি এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

এই ছবির গল্প এমন এক গৃহবধূকে নিয়ে (সুমিত্রা) যার স্বামী (সৌমিত্র) ঘরের বাইরে থাকতে ভালবাসে। শাশুড়ি (ছায়া দেবী) যাকে কেবলই নির্যাতন করে। চোর বলতেও ছাড়ে না। তবু যমুনা সহ্য করে। স্বামীর পথ চেয়ে রাতের পর রাত জেগে কাটায়। পুজোর সময় সেই বাড়িতে প্রতিমা গড়তে এসে মালিন(সন্তু) এসব দেখে। এমন পরিবেশেই যমুনার মধ্যে সে দেবীরূপ প্রত্যক্ষ করে। তাই প্রতিমার মুখও সে গড়ে যমুনার মতো করে।

সেই সময়কার ঘটনা। আমাদের ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজে যখন ঘটা করে নারী নির্যাতন চলত। খুব কম লোকই যার প্রতিবাদ করত। এমনই একজন মালিন। যে তার শিল্পের মাধ্যমে এ সবের প্রতিবাদ জানায়।

এটি কাহিনীপ্রধান ছবি হলেও কিছু কিছু ট্রিটমেন্ট বেশ সুন্দর। প্রতিমার আবরণ উন্মোচনের সময় খুব দ্রুত কতকগুলো শট, পুজোর আরতির সময় ক্যামেরার বিশেষ এ্যাংগেল, ভাইফোঁটার কল্পনা দৃশ্যে কোনো শব্দ ব্যবহার না করা, আগমনী গানের সময় মাটিতে ছড়ানো শিউলি ফুল—এ সব তার প্রমাণ। ফটোগ্রাফী প্রশংসনীয়। বিশেষ করে জমিদারবাড়ির ভেতরের দৃশ্যগুলোতে। তবে পরিচালক ছবিকে আরও কমপ্যাক্ট করতে পারতেন। প্রথমদিকের সম্পাদনা একটু ঢিলেঢালা। কিছু অপ্রাসঙ্গিক দৃশ্য রয়েই গেছে। বাতাসী (মিঠু) চরিত্র আরও ছোট হতে পারত। আর নাচগানের কি খুব দরকার ছিল? ফ্ল্যাশব্যাকের দৃশ্যগুলো ভাল। তবে এ সময়ের সঙ্গী[illegible] তেমন কাছে টানে না। 'আমি [illegible] তুমি বর' গানের দৃশ্যে বর-বো[illegible] ও বেশ পাকা মনে হয়েছে। আরেকটা ব্যাপা[illegible] প্রতিমার আবরণ উন্মোচনের পর ছবি[illegible] সকলে চমকে গেছেন। সে চমক দর্শকরা[illegible] তো পেতে পারতেন।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ছায়া দেবী এ[illegible] সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়—অভিনয়ে এঁ[illegible] ভেতর যে কে শ্রেষ্ঠ তা বলা শক্ত। [illegible] বলব সুমিত্রার কথা। তিনি ভাল অভি[illegible] করেছেন বললে যেন কিছুই বলা হয় ন[illegible] 'প্রতিমা' যাঁরা দেখবেন তাঁরা এ ব্যাপা[illegible] নিশ্চয়ই একমত হবেন। সারাক্ষণই তি[illegible] সুন্দর। তবু এক জায়গায় বাতাসীকে উদ্দে[illegible] করে 'আমি তোমার কাছে হেরে গে[illegible] কথা কটি তিনি যেভাবে বলেছেন তা সহ[illegible] ভোলা যাবে না। আরেক জনের অভিনয় ম[illegible] রাখার মতো। তিনি সন্তু মুখোপাধ্[illegible] এ ছাড়াও ছবিকে আকর্ষণ করতে [illegible] অনিল চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, অনুপকুম[illegible] কালী ব্যানার্জী, প্রেমাংশু বোস এবং [illegible] মুখোপাধ্যায়।

ছবির গানগুলো শুনতে ভাল [illegible] এক নম্বর গান—শকতি ঠাকুরের [illegible] 'মনে কোরো না বিমুখী'। আবহর [illegible] আহত সুমিত্রার নেপথ্যে এসরাজে জয়জ[illegible] এবং প্রতিমা গড়ার সময় এসরাজে দরব[illegible] প্রয়োগ সুন্দর।

আলোচ্য চিত্র : প্রতিমা। কাহি[illegible] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত : [illegible] মুখোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য ও পরিচাল[illegible] পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এটি ছবিই নয়

চুলো এক যুক্তি তক্তো। [illegible] এক বুদ্ধি বিচার। দরকার সুন্দরী না[illegible] গোটা ছয়-সাত হিট গান। আর মোটা [illegible] জোড়াতালি দেওয়া কিছু হাসির [illegible] এসব ছাড়াও আরও কি কি করলে অন্তত দু' সপ্তাহ চলতে পারে প[illegible] সেদিকেই বেশী মাথা ঘামিয়েছেন।

রঞ্জিত মল্লিকরা এখানে যম[illegible] এক রঞ্জিত মার্ডার করলে অপর প্রক্সি দিতে গিয়ে ধরা পড়ে, ছবিতে ধরনের কোনো ব্যাপার নেই। ধরা প্রেমের ক্ষেত্রে কিন্তু সেখানেও কারণ অপর্ণারাও যমজ। আর সে প্রক্সি। কাজেই এদেরকে নিয়ে যতরক[illegible] জট পাকানো যায় দীনেনবাবু [illegible] ভাবেই তা পাকিয়েছেন। আর ছবি[illegible] একেবারে শেষে। এর আগে পর্যন্ত [illegible] কোনো রঞ্জিত বা কোনো অপর্ণা একে অপরকে তাদের যমজত্বের কথা[illegible] নি। আরো আলোচনা করতে গেলে খারাপ কথা এসে পড়বে। কাজেই [illegible] না তোলাই ভালো।

অন্যদিকে, ছবির প্রাণ বলতে [illegible] সেন। তিনি হেসেছেন, কেঁদেছে[illegible]

ছেন বা পর্দায় আরও অনেক কিছু করে ন। অপর্ণার অভিনয়ে রয়েছে কমেডির র। অন্যদের মধ্যে যে মেজাজকে একমাত্র পেরেছেন নায়িকার বাবা সত্য বন্দ্যো-য়। রবি ঘোষ বা অনুপকুমার কেউই সুবিধে করতে পারেন নি। রঞ্জিত কও তাই। আর করবার সুযোগটাই কাথায় ?

গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার যখন নীকার, নায়ক-নায়িকা তখন গায়ক-কা হবেন এটাই স্বাভাবিক। হয়েছেও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত সেদিক ছবির বিশেষ আকর্ষণ। তাঁর সুরের লো সবই ভালো। তবু কানে লেগে মিশু বাহারে গাওয়া আশা ভোঁসলের তোমার গানের সরগম' গানটি। সব-একটি প্রশ্ন এ ছবি না হলে কি কোন ছিল ?

আলোচ্য চিত্র : প্রক্সি, পরিচালনা : ন গুপ্ত। আসত্তবরণ মিত্র

ানুগতিক গল্প তবুও

হিন্দী ছবির গল্প বানানোর চলতি কে নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে নিয়েছেন এই কাহিনীকার শচীন ভৌমিক। নায়ক শ), সহ-নায়ক (রাকেশ), খল নায়ক ক), ভাঁড় (আসরানী) এবং নায়িকা ভিন) এতগুলো চরিত্রকে ঘটনা এবং নায় গেঁথে গড়ে উঠেছে এর গল্প। শিশুর নায়কের অপরাধ কেন্দ্রে র মধ্যে গুছিয়ে বসেছে।

রমণীপ্রিয় স্মাগলার নায়ক এক সময় ছিল, কিন্তু দারিদ্র্যের নিপীড়নে য় হয়ে স্মাগলার কালে-তিলক তে চোরাচালান চক্রে সামিল হয়ে সে এবং অচিরেই চুরি ডাকাতি লং ইত্যাদিতে বিশেষ জড়িয়ে নায়কদের ত দক্ষতা আবারও প্রমাণ করল। বন্ধু তখন পুলিশ অফিসার আর তারই দায়িত্ব বর্তালো এই দেশদ্রো কে শায়েস্তা করার।

এদিকে অনেক অমানিক নাটকে ন' আর রাজেশের হৃদয়ে ভ্ ছ। তারপর রাকেশ ধরা পড়েছে অফিসার বন্ধুর কাছে এবং এক তার প্রাণ বাঁচানোর সুবাদে সাময়িক নিয়ে উদ্ধার করেছে পালিতা শিশু প্রেয়সী 'পরভিন'কে। মাতৃহন্তার পেয়ে প্রতিশোধ বাসনা চরিতার্থ একই সঙ্গে—ঘটনাক্রমে একই নর ওপর। আর এর জন্যে ঘুঁষি বার ছাড়াও তাকে ইম্পোর্টেড মারা-আশ্রয় নিতে হয়েছে। ক্যারাটে-ইত্যাদির খুলে ব্যবহারকে বিশেষ দেওয়া হয়েছে ঝুলিয়ে াতে।

হিন্দি ছবির তিনটি চাবিকাঠি ভায়োলেন্স, সেক্স আর সেন্টি-এর মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে প্রথমটাই। টো নিয়ে বিশেষ বাড়াবাড়ি নেই।

দীনেন গুপ্ত পরিচালিত প্রক্সি

তপন সিংহের সফেদ হাতী

আর বাড়াবাড়ি নেই গানেও। দু' একটা গান বেশ ভালোই লেগেছে। আবহসঙ্গীতের সংযম সহযোগ চলতা পুরজার চলাকে অনেক ছন্দময় করেছে।

বহু শাখা প্রশাখা সম্বলিত এই স্থলে কাহিনীটিকে কখনো স্থবির হতে দেয় নি সুচিন্তিত গ্রন্থনা। ক্যামেরার কাজ পরিচ্ছন্ন, দু' এক জায়গায় কারুকাজও আছে। অভিনয় হয়তো উচ্চাঙ্গের নয়, কিন্তু বাহুল্যবর্জিত বলেই ভালো লাগে। তাই গল্পের বাস্তবতা বিশ্লেষে না গেলে ছবিটা ভালো লাগার কিছু সুযোগ থেকে যায়।

আলোচ্য চিত্র—চলতা পুরজা
পরিচালনা—বাপ্পি সোনি
সঙ্গীত—আর ডি বর্মণ
বিমান দাস

বি এফ জে এ

২৮শে ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় গ্র্যাণ্ড হোটেলে বি এফ জে এ তাঁদের চল্লিশতম বর্ষের পুরস্কার বিতরণী উৎসবের অয়োজন করলেন। অনুষ্ঠানটি মোটেই বর্ণাঢ্য নয়। শিল্পীদের অনেকে এসেছেন, অনেকে আসেন নি। বোম্বাই থেকে শর্মিলা ঠাকুর, মিঠুন চক্রবর্তী, রবীন্দ্র জৈন এবং কলকাতা থেকে সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, উৎপল দত্ত, উত্তমকুমার ও আরো কয়েকজন উপস্থিত হয়েছিলেন। তবে শিল্পীদের উপস্থিতির চেয়ে অনুপস্থিতির তালিকাই বেশী।

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কাননদেবী, সুকুমলকান্তি ঘোষ, সুবোধ মুখার্জী, কালীশ মুখার্জী। তাঁদের বক্তব্যে অনুষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট এ্যাসোসিয়েশান একটি অতি অভিজাত সংস্থা। জানি না তা কি জন্য তার ঝলমলে রূপটি হারিয়ে ফেলছে। অনুষ্ঠানটি ভাল লাগে বি এফ জে এ-র বর্তমান প্রাণপুরুষ বাগীশ্বর ঝায়ের জন্য। তাঁর ব্যক্তিত্বময় পরিচালনা অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব বৃদ্ধিতে অনেকখানি সাহায্য করে।

কাঞ্চনরঙ্গ

শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র'র লেখা সুখ্যাত 'কাঞ্চনরঙ্গ' নাটকটি সম্প্রতি সুন্দর-ভাবে মঞ্চস্থ করলেন ঢাকুরিয়ার সঞ্জীব ট্রেনিং কোর্সের সদস্যরা। অভিনয় সবারই বেশ আন্তরিক। সোমেন ব্যানার্জি, বরুণ ঘোষ, ভোলানাথ ঘোষ, দীপ্তিকুমার চ্যাটার্জী, প্রসূন ঘোষ, সমীর ঘোষ, মহুয়া রায়চৌধুরী ও মৃন্ময় ভট্টাচার্য'র অভিনয়ে আন্তরিকতা আছে।

অজয় কয়াল (পরিচালক) ও মঞ্জুশ্রী রায়চৌধুরী বেশ স্বাচ্ছন্দ অভিনয় করেছেন। আর দীপালি ঘোষ এ নাটকের শ্রেষ্ঠ চরিত্রচিত্রণ। সলিল মিত্র'র আবহ-সঙ্গীত নাটকটিকে সজীব করে তুলেছে। নাটকের পূর্বের নৃত্যানুষ্ঠানে তাঁর বেহালা বাদনও রীতিমত আকর্ষণীয়। ইলেকট্রিক গীটারে কুনালকান্তি ঘোষের রবীন্দ্র সুর সুন্দর। বিপ্লব মল্লিক ও চন্দ্রা মুখার্জীর কন্ঠসঙ্গীত ও মৌসুমী মিত্র, সোনালী ও রূপালী চক্রবর্তী, সৌমি দাস, শর্মিষ্ঠা মজুমদার ও গার্গী রায়ের নাচ আকর্ষণীয় ছিল।

সঞ্জীব ট্রেনিং কোর্সের এই বার্ষিক উৎসবে পৌরোহিত্য করেন শ্রীসমর বসু এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকেন কবি মণীন্দ্র রায়।

চন্দ্রগুপ্ত

অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তর এবং সাপ্তাহিক অমৃতের কর্মীদের যৌথ উদ্যোগে তাঁদের বার্ষিক অধিবেশনে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জনপ্রিয় নাটক 'চন্দ্রগুপ্ত'-র অভিনয় হয়ে গেল। বলতে দ্বিধা নেই আগাগোড়া নাটকটিতে শিল্পীদের আন্তরিক প্রয়াস সুস্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা গেছে। পেশাদারী নট না হয়েও তাঁরা সামগ্রিকভাবে অভিনয়ের ক্ষেত্রে যে সংহতি দেখিয়েছেন তার অকুণ্ঠ প্রশংসা দ্বিধাহীনভাবেই করতে হয়।

অভিনয়ে মোটামুটি সকলেই সাধ্যমত চরিত্রের প্রতি সুবিচার করার চেষ্টা করেছেন। তবু কয়েকজনের অভিনয় বিশেষভাবে চোখে পড়েছে। এঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় শিশির চক্রবর্তীর। চাণক্যের ভূমিকায় তাঁর অনবদ্য অভিনয় মঞ্চ ঠাসা দর্শককে চোখের আরাম মনের আনন্দ জুগিয়েছে। অন্ধ ভিক্ষুকের গলায় বিশ্বনাথ মিত্র সুরের জাল বুনে বহুবার নাটকের গভীর কথা সুরেলা করে তুলেছেন। চন্দ্রগুপ্ত, নন্দ, বাচাল মেলুকাস, কাত্যায়ন চন্দ্রকেতু, সেকেন্দার আন্টিগোনস—আঁধার ঘোষ, শ্যামল দে, জীবন ভট্টাচার্য, অরবিন্দ ভট্টাচার্য ধীরেন চক্রবর্তী, অনিল দাশ, বরুণ ঘোষাল এবং বীরেনকান্তি ঘোষের অভিনয় নৈপুণ্যে বারবার চোখের সামনে রাখতে বাধ্য হয়েছি। হিরণ্ময় মুন্সী, অরবিন্দ ভট্টাচার্য এবং হারাধন চক্রবর্তী নিপুণ অভিনয় করেছেন। অভিনয় ভালো করেছেন রমেশ গুপ্তও। মহিলা চরিত্রে রাজলক্ষ্মী দেবী, গীতশ্রী দেবী সোমা গাঙ্গুলী তাঁদের অভিনয় দক্ষতার যথাযথ প্রকাশ ঘটিয়েছেন। পরিচালনায় সুধীর মুস্তাফীর কৃতিত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। আলোক সম্পাতে বিভাস মুখার্জীর কৃতিত্বও। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বর্ণভিলা

গত ৩০শে নভেম্বর, ৭৭, থিয়েটার ক্যালকাটার প্রযোজনায় রবীন্দ্রসদনের পাদপ্রদীপের সামনে এলো স্বর্ণভিলা। নাটকের শুরুতে যে আবহসংগীত, তা বিদেশি-চটুল। দর্শককে বুঝিয়ে দেয় যে প্রমোদই এই নাটকের মূল উপকরণ। সেটা কিছু আপত্তির নয়। কিন্তু, প্রমোদ জিনিসটার ধারণা নিয়েই পরিচালক বরুণ দাশগুপ্তের সঙ্গে নাট্যপ্রেমীদের কিছু মতবিরোধ হতে পারে। 'স্বর্ণভিলা' এমনিতেই একটি ড্রইংরুম নাটক। তার মঞ্চভাবনার মধ্যে উল্লেখ্য কিছু নেই। আর্থিক দিক থেকে অভিজাত একটি পরিবারের কাণ্ডকারখানা এই নাটকের বিষয়। যেমন হয়, অর্থলোভী কর্তা তাঁর যোগ্য সহধর্মিনী এবং কন্যা, কন্যাটির পাণিপ্রার্থী একটি মূর্খ ধনী ফ্যাসনেবল যুবক, সর্বদা বুদ্ধিমান হবার চেষ্টা করেন

সাত ভাই চম্পা

এমন এক চাকরিপ্রার্থী বাংলায় এম-এ ও কর্তার আশ্রিতা এক যুবতীকে নিয়ে এই নাটক। ট্রেনে আমাদের কর্তা (ইনডাসট্রিয়ালিস্ট) আসছিলেন, চাকরিপ্রার্থীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। আর একজন বিজনেস টাইকুনের বিবেকী খেয়ালি ছেলের সঙ্গে তিনি চাকরিপ্রার্থী প্রদীপ্তকে গুলিয়ে ফেলেন। শেষাবধি, প্রদীপ্তকে সেই ভূমিকায় অভিনয় করান। প্রথম দিনে তাঁর কন্যার সঙ্গে প্রদীপ্তের যা বচসা হয়, নিতান্ত নির্বোধ না হলে কেউ সেই ঘটনার পর কন্যা তথা পরিবারটির স্বরূপ চিনতে ভুল করেন না। কিন্তু প্রদীপ্ত তা তো করলেনই, আবার কন্যাটির প্রেমেও পড়লেন। আশ্রিতা তরুণীটি প্রেম নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। পাণিপ্রার্থীকে বারবার নিরাশ হতে হচ্ছিলো। অবশেষে, প্রদীপ্তকে আনন্দ-ভ্রমে বিবাহ ঠিক, এমন সময় ঘোষণা ও বাগ্‌দানের দিনে প্রকৃত আনন্দ-জনক সুনন্দ, সেই বিজনেস

আবদাল্লা মর্জিনা

টাইকুন, পদার্পণ করলেন। সত্য প্র... হলো। ধনী কন্যা দ্রুত তাঁর পূর্ব... কণ্ঠলগ্ন হতে হতে ভুললেন না... বোকা বোকা বক্তৃতার পর নাটকে... হলো।

পরিচালক নাটকের অপেক্ষা... বিশ্বাস করেছেন সংলাপকে। নাটকে... —এর জনপ্রিয়তায় তিনি নিঃসংশয়... সংলাপ, বলা বাহুল্য, অবাস্তব। প... সমাজসমস্যাসচেতন, তাই মাঝখানে... সমস্যা সম্পর্কে কিছু ডায়ালগ ও ... জিন্দাবাদ রয়েছে। এ হেন একটি... থাকা যায় একমাত্র স্বর্ণভিলার ... দের জন্যে। ঐরকম ছাঁচে ঢালা ... মঞ্জু দে বিশ্বাস্য করে তুলেছে... অনুপস্থিতিতে স্টেজের দিকে ... যাচ্ছিলো না। সুখের কথা, এই ... সংলাপগুলিও ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছি...

পার্থপ্রতিম ...

বিদেশী ছবি

১৯৭৩-এর বার্লিন চলচ্চি... প্রদর্শিত ও মেলে অলোড়ন সৃষ্টি... একই সময় শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রে... শ্রেষ্ঠ সহঅভিনেতা হিসাবে অস্কার প... ভূষিত 'ক্যাবারে' ছবিটি দেখানো... পাচ্ছে। ১৯৩০ এ বার্লিন এর বাট... নর্তকী স্যালির সঙ্গে পরিচিত হলেন... স্নাতক বিয়ান। কিন্তু স্যালির... আকৃষ্ট হলেন ব্যারন এবং বিয়ান ... তরুণী নাটালিয়ার দিকে আকৃষ্ট... কিন্তু ব্যারন ভীষণ চতুর, ... স্যালি এবং তাঁর প্রেমিকের অর্থাৎ ... মন জয় করে ফেললেন। একদিকে ... বর্বরতা অপর দিকে ত্রিকোণ প্রেম ... জমে উঠতে পরিচালক বব ফস তাঁর ... নিষ্ঠ পরিকল্পনা এবং আঙ্গিকের ... একটি মহৎ ছবি সৃষ্টি করেছেন, আমাদের সেন্সরের কাঁসরত তার অ... জানার বাইরে থেকে গেছে। ভূমিকায় ... ম্যানেলী এবং বিয়ান এর চরিত্রে ম... ইর্তক ও ব্যারণের চরিত্রে হেলমুট ... এবং অপর একটি বিশিষ্ট চরিত্রে জো... চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন, ... শিল্প নির্দেশনা এবং অন্যান্য আঙ্গি... উচুদরের

'ম্যাইড ক্রেজী বয়েজ'... চার ফরাসী কৌতুকাভিনেতা এ... তাঁদের নানাবিধ হাসির দৃশ্য প... মাধ্যমে ছবিগুলি সকলকে হাসাব... করেছেন। কিন্তু 'ক্রেজী বয়' ... ছবিগুলি দেখে মনে হচ্ছে, ওঁদের ... চেষ্টা বড্ড একঘেয়ে হয়ে পড়েছে। ... এই তৃতীয় ছবিতে কেবল কাতুকু... হাসি পাওয়া ছাড়া দর্শকদের পাও... পাওনা থাকবে না।

কড জিদি পরিচালিত এ... সোসাইটি সিনেমায় দেখানো হচ্ছে...

অশোক ...

পর্যটন উৎসবে বিহু পরিবেশন করছেন বিহুর রাণী শুভলক্ষ্মী, বনলক্ষ্মী ও মাধুরী দেবী।

বিচিত্রা

[illegible]সমীয়া লোক সংগীত ও [illegible]লোকনৃত্যোৎসব

অসমীয়া লোকসংগীত ও লোকনৃত্যের [illegible] রবীন্দ্রসদন মঞ্চে হোল গত [illegible] একাডেমির। বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতি [illegible] বর্ষব্যাপী মনোরম আবহাওয়া আসামের [illegible]লোকসংগীত ও লোকনৃত্য সম্পদকে [illegible] করে রেখেছে এক অপরূপ [illegible]। অসমীয়া লোকনৃত্যের সঙ্গে [illegible] নাম 'বিহু'। রঙালী [illegible]হু, কাঙালী বিহু ও ভোগালী বিহু— [illegible]ই তিন [illegible] বিহু নৃত্যোৎসব হয় [illegible] রঙালী বিহু যার অপর নাম [illegible] বিহু বা বৈশাখ বিহু সারা আসামে [illegible] জাতীয় উৎসবের মত। [illegible] বিহু—বসন্তের আগমনী উৎসব, [illegible] যুবক-যুবতীরা দল [illegible], খেলা মাঠে, নদীতীরে কিংবা [illegible] শুকনো ধানক্ষেতে মেতে [illegible] বিহু নৃত্যোৎসবে, ছেলে এবং মেয়েরা [illegible] গীত-এর মধ্য দিয়ে প্রেমনিবেদন [illegible] একে অপরকে। আশ্চর্য সুন্দর এই [illegible] নৃত্য এদিন পরিবেশন করেন, শুভ-[illegible], বনলক্ষ্মী ও মাধবী দেবী। সমবেত [illegible] মেজাজ এবং উন্মুক্ত প্রকৃতির [illegible] না হওয়ায়, অতি দক্ষতার সঙ্গে [illegible] পরিবেশন করেও শিল্পী গোষ্ঠী [illegible]গতভাবে বিহু-র উদ্দাম মেজাজকে [illegible]স্থাপিত করতে পারেননি মঞ্চে।

মন্দিরে এক ধরনের দেবদাসী শ্রেণীর [illegible]নৃত্য—দেওধনী। প্রাচীন ও প্রায় [illegible]স্মৃত এই অসমীয়া লোকনৃত্যটি এদিন [illegible]বেশন করেন দীপালি দাস। পিঠময় [illegible]লা চুল নিয়ে নৃত্যের দ্রুত তালের [illegible]তার সঙ্গে দেওধনী নিজেকে ধীরে [illegible] উৎসর্গ করেন দেবতার পায়ে। বেহুলা [illegible]ন্দর বা মনসার গান শুনিয়ে, সখীরা, [illegible]হীন দেওধনীর প্রাণ ফিরিয়ে [illegible]। সূত্রধর নৃত্য বা সত্র-নৃত্য এক ধরনের ধর্মাশ্রয়ী আখ্যাননির্ভর গীতি-নাট্যবিশেষ, এ-নৃত্যটি এদিন পরিবেশন করেন তুলসী গায়েন। অন্যান্য নৃত্যের মধ্যে নাথভঙ্গী, ছালি, ঝুমুরা, বোরো প্রভৃতি পরিবেশন করেন আরতি বর ঠাকুর, করুণা গায়েন, মাধবী দেবী ও দীপালি দাস।

'[illegible] মাহুত, বৈঠন মাহুত, ও বৈঠন ভাইয়ো...' গোয়ালপাড়া জেলার এই লোকসঙ্গীতটি এদিন পরিবেশন করেন জন-প্রিয় অসমীয়া লোকসংগীত শিল্পী খগেন মাহান্ত ও অর্চনা মাহান্ত। ভুটান ও গারো পাহাড়ের পাদদেশে গোয়ালপাড়া জেলার বিস্তীর্ণ চিরসবুজ বনাঞ্চল হাতী-দের অবাধ বিচরণভূমি। সুদূর অতীত থেকে গোয়ালপাড়া জেলার গ্রাম-গঞ্জ থেকে মাহুত এবং ফান্দিরা ঐ বিপদসংকুল বনে জঙ্গলে হাতী ধরতে যায় দলবেঁধে। শরতের শেষে, ফান্দির দলের সময় চলে আসে অনিশ্চিত অভিযানে বের হবার, বিরহকাতর তাদের প্রিয়জন এবং প্রেয়সীরা আসন্ন বিরহ ব্যথায় এ-সময় গায় 'মাহুতবন্ধুদের গান'। জঙ্গলে হাতী ধরে তার সামনে, কিংবা দলের কেউ জঙ্গলে প্রাণ হারালে, তার স্মরণে ফান্দির দলের নেতা গায় ফান্দিরের গান। এমন বিস্ময়-কর সুন্দর লোকসঙ্গীত-সম্পদকে অসমীয়া শিল্পিগোষ্ঠী শ্রোতাদের উপহার দিতে পারেননি সম্পূর্ণভাবে। কামরূপগীত পর্যায়ে, 'ও সুন্দরী রাধিকা, বৃন্দাবন ছাড়িয়া রাধা মথুরায় যায়....' মুগ্ধ করার মত গেয়েছেন অর্চনা মাহান্ত। 'ঘুম-পাড়ানো গীত', ওমাপালি, মৈসালবন্ধুদের গান প্রভৃতি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অসমীয়া লোকগীতি এদিন একদমই শুনতে পেলেন না শ্রোতারা।

আশিস আচার্য

সুরতীর্থ

সম্প্রতি দুদিন ধরে রবীন্দ্রসদনে সুরতীর্থের ১৯তম বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। উভয় দিনের প্রযোজনায় ছিলেন ডঃ (শ্রীমতী) নীহারকণা মুখার্জি। প্রথম দিন বিভিন্ন কবি রচিত স্বদেশী গান পরিবেশিত হয়। শ্রীমতী মুখার্জি আবেগময়ী ভাষায় গানগুলির রচনাকাল ও পরিবেশের সঙ্গে শ্রোতৃমণ্ডলীকে পরিচয় করিয়ে দেন। পরে সাধন গুহের পরি-কল্পনায় 'শকুন্তলা' নৃত্য নাট্য শুরু হয়। দীনেশচন্দ্রের নির্দেশনায় অভিনব সুরের ইন্দ্রজাল এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। নাট্যরূপে ভাস্কর বসু। নৃত্যে শকুন্তলার ভূমিকায় পলি গুহ কৃতিত্বের দাবী রাখেন। তাঁর সহচরীদ্বয় অনুসূয়া ও প্রিয়ম্বদারূপে শুভ্রা দাস ও শুক্লা দত্ত দর্শকদের মন জয় করেছেন। এই জুটির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। সভা নর্তকী ও মেনকার নৃত্যে সংযুক্তা ঘোষ ও স্বপ্না ব্যানার্জি মনোরম। এছাড়া বিভিন্ন ভূমি-কায় সাধন গুহ, রামগোপাল, বটু পাল, শম্ভু ভট্টাচার্য, ধূর্জটী সেন স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখেছেন। জেলের আংটি চুরির অংশে রামগোপালের অভিনয় অনবদ্য। দ্বিতীয় দিনে নন্দিতা মজুমদার খেয়াল ও ভজন গান করেন। তাঁর গান সকলকে আনন্দ দেয়। তবলায় ছিলেন অর্দ্ধেন্দুশেখর রায়। পরে মঞ্চস্থ হয় 'ডান্সেস অব ইন্ডিয়া।' ভরতনাট্যম, কথা-কলি কথক এবং বহু বিধ লোকনৃত্য অনুষ্ঠিত হয় প্রায় ৮০ জন শিল্পী সমন্বয়ে। আলারিপু, জিপসী এবং সর্প-নৃত্যে অংশ নেন যথাক্রমে রুমেলা ঘোষ, রাজলক্ষ্মী কেলাসম এবং সুনেত্রা সেন। এঁদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়। কথাকলি পদ্ধতিতে তিলোত্তমায় (ব্যালে) পিয়ালী ঘোষ, বটু পাল এবং শম্ভু ভট্টাচার্য উল্লেখযোগ্য পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। কথকের মানভঞ্জনে কৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলীর

ভূমিকায় নূপুর ভট্টাচার্য ও স্নিগ্ধা গোস্বামী সকলের প্রশংসা অর্জন করেছেন। লোকনৃত্যের মধ্যে গুজরাটী, জেলে, তরজা, মহুয়া বিশেষ ভাবে উপভোগ্য হয়েছিল। ছোটদের বেদে নৃত্যে বেহুলারূপে স্নিগ্ধা গোস্বামী পুনর্বার তাঁর অভিনয়ের দ্বারা সকলকে অভিভূত করেন। দ্বিতীয় দিনের আবহ ও নেপথ্য সঙ্গীতে ছিলেন যথাক্রমে দীনেশচন্দ্র ও অমর রায় তাঁদের সম্প্রদায়-সহ। ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন তরুণ সেনগুপ্ত।

জঞ্জাল থেকে বিদ্যুৎ

গত বছরে এদিক ওদিক করে মাস দুই আমেরিকায় কাটিয়ে এসেছিলাম। কতকগুলি বিশেষ প্রকল্পের কাজ দেখাই ছিলো আমার উদ্দেশ্য।

প্রথমের দিকে গেলাম টেকসাস রাজ্যে। ওখানকার আবহাওয়া খানিকটা গরম। নদীতে খালে বিলে কচুরিপানা প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। আশ্চর্য হয়ে গেলাম ওদেশে কি ব্যাপক সব প্রকল্প নেয়া হয়েছে কচুরিপানা আর অন্যান্য আগাছাগুলিকে নিয়ে। ন্যাশনাল এরোনটিকস এ্যান্ড স্পেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা নাসার অধীনে কচুরিপানা নিয়ে গবেষণা হচ্ছে নোংরা জল পরিষ্কার করার কাজে। শিল্পে বা শহরে যেসব নোংরা জল প্রতিনিয়ত একটা সমস্যার সৃষ্টি করছে সেই জলশোধনের ব্যাপারে কচুরিপানা অদ্বিতীয়। কেবল শোধন নয়—ঐসব নোংরা জলের মধ্যে কোনও দামী রাসায়নিক দ্রব্য থাকলে সেগুলোকে আবার বার করেও নেয়া সম্ভব কচুরিপানাগুলিকে শায়েস্তা করে। এইসব কচুরিপানা জন্তু-জানোয়ারের (গৃহপালিত) খাদ্য হিসাবে খুবই পুষ্টিকর। প্রোটিনের ভাগ খুব বেশী থাকে। আর—এই কচুরিপানা থেকে জৈব গ্যাস বা মিথেন তৈরী করা যেতে পারে অনায়াসে। ১ কেজি শুকনো কচুরিপানা থেকে শতকরা ৬০ থেকে ৮০ ভাগ মিথেন গ্যাস-সম্পন্ন জৈব গ্যাস পাওয়া যাবে ০-৩৪ ঘন মিটার। শিল্পপতিরা তাঁদের শিল্পে উৎপন্ন নোংরা জল থেকে সিসা, পারদ, ক্যাডমিয়াম, কোবাল্ট, নিকেল, রূপা প্রভৃতি ইত্যাদি জিনিস বার করে নিতে পারেন। এতে কিছু টাকাও পাওয়া যায়।

টেকসাস রাজ্যের রাজধানী অস্টিনে দেখলাম একটা কচুরিপানার পুকুর। এই পুকুরে শহরের নোংরা জল শোধন করা হচ্ছে। খুব কম খরচে একটা বড়ো প্লানট বসেছে। আমেরিকায় লোকেও এখন খরচ বাঁচাতে অত্যন্ত আগ্রহী। তাই ওদেশে কচুরিপানার কদর বেড়েছে।

শিকাগোতে আমার এক বন্ধুর অফিসে গিয়েছিলাম। বন্ধু ইনসটিটিউট অফ গ্যাস টেকনোলজির 'বায়ো গ্যাস' ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজার। ওখানে দেখলাম সামুদ্রিক উদ্ভিদ থেকে মিথেন গ্যাস তৈরীর রিসার্চ চলছে। রিসার্চের কাজ খানিকটা হচ্ছে ওখান থেকে দেড়শো মাইল দূরে বন্ধুর আরবানী-শ্যামপেনের ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়ে। একদিন বন্ধুর সঙ্গে গেলাম সেইসব রিসার্চের কাজ দেখতে। ওখানে গোবর নিয়ে অনেক কাজ হচ্ছে। আবার এও দেখা হচ্ছে গোবর ও উদ্ভিদের সংমিশ্রণে গ্যাস তৈরী আরও ভালো হয় কিনা। অদ্ভুত কিরিয়াস ওঁরা।

শিকাগো শহরে আর একটা অদ্ভুত সুন্দর জিনিস দেখলাম ওখানকার মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে। নর্থ ওয়েসট ইনসিনারেটরে দেখলাম শিকাগো শহরের একাংশের আবর্জনা কিভাবে পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। ময়লার ভেতর থেকে কেনার খদ্দেরও আছে। প্রতিদিন এই ইনসিনারেটরে ১৬০০ টন ময়লা পোড়ানো হয়। পোড়ানো ময়লাগুলো নিয়ে শহরের আশেপাশের নীচু জমি ভর্তি করে সেসব জায়গা কাজে লাগানো হয়।

ওয়েসট ৩৭তম রাস্তা ও সাউথ হ্যামলিন এভিনিউ-এর মোড়ে ৭½ একর জমিতে একটা নতুন প্লান্ট হচ্ছিল। দৈনিক ২০০০ টন পর্যন্ত ময়লা আবর্জনা এই প্লানটে নেয়া যাবে। এই আবর্জনার মধ্যেকার দাহ্য জিনিসগুলো কুচিয়ে পরে ঝেড়ে বার করে নেয়া হবে। পাশেই আছে ক্রফোর্ড পাওয়ার জেনারেটিং স্টেশন। দাহ্য জিনিসগুলো ওরা নিয়ে নেবে। তা দিয়ে তারা বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে প্রতি সপ্তাহে ১ কোটি কিলোওয়াট ঘন্টা। এই বিদ্যুতের সাহায্যে ১ লক্ষ ২০ হাজার বাড়ীর বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো যাবে। এটা কম কথা নয়। ক্রফোর্ড জেনারেটিং স্টেশনের কাছ থেকে ময়লা দাহ্য পদার্থ বিক্রী বাবদ বছরে ৭ লক্ষ ডলার পাবে পৌর প্রতিষ্ঠান। জাপানেও এই ধরনের প্লানট বেশ কয়েকটা হয়েছে। আমাদের কলকাতায়, বোম্বে বা দিল্লীতেও এগুলো হওয়া সম্ভব নয় কি?

শিশিরকুমার নিয়োগী

গরীবের ঘোড়া রোগ

এই শহরের কয়েকজন তরুণ বাংলা গান নিয়ে চিন্তিত। চেহারায় এবং কন্ঠস্বরে তাঁরা তরুণ, যদিও ঘোষণা করেন নিজেদের মহীনের ঘোড়া বলে। এঁরা কেন তাঁদের পরিচিত নাম নিয়ে পরিচিত না হয়ে ঘোড়া নামে পরিচিত তা বুঝতে হলে এঁদের অনুষ্ঠান দেখা উচিত। ঘোড়া ছুটতে পারে ভালো, এককালে যুদ্ধ জেতা থেকে শুরু করে মালবহন ইত্যাদি সব কাজ তারা করতো, বড়ো দাম্ভিক রূপ তার, কিন্তু তাদের নাম নিয়ে কেউ কেউ যে এমন গানের আসর জমাতে পারে—জানা ছিল না। গান মানে তাই যা কথার বাণীরূপ। এবং কথা ও সুর এই দুয়ের একটিও এখন যথার্থ মান্য হয় না বলেই বাংলা গানের এই দৈন্যরূপ। এঁরা তাই বেছে নিয়েছেন এমন কথা যা কোনো ব্যাপ্তি নিয়ে উঠে আসে না, বেছে নিয়েছেন এমন সুর যা কেবলি বিদেশী। যদিও জানি, সুরের কোনো দেশ-কাল নেই, কিন্তু এও তো সত্যি, সুর জন্ম নেয় সেই দেশ অথবা অঞ্চলের নিজস্ব মাটি এবং জলবায়ু থেকে। এবং এ নিয়ে এতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে যার সংবাদ, বোধ করি, সংগীত-জগতের মূর্খকেরও জানা। আর কথার আধুনিকীকরণ মানে ওজনহীন দ্যুতিহীন শব্দ বা উপমা ব্যবহার তো নয়। সবচেয়ে বিস্ময়ের, যে দেশে সংগীতের চূড়ান্ত প্রতিভাবানরা রীতিমতো খেলা করে গেছেন, সেখানে এঁরা বাঁচবার কোনো মন্ত্র পেলেন না এখানে, যেতে হলো এলভিস অথবা ঐ জাতীয় পপ-গায়কদের কাছে। অথচ ঘোড়ারা শিখেছে বেশ—বিভিন্ন যন্ত্রের ব্যবহার থেকে শুরু করে, অনেকের কন্ঠস্বরও বেশ মার্জিত। কিন্তু পথ যেখানে ভুল সেখানে ভুল পথে ঘুরে মরা ছাড়া উপায় কই? অনুষ্ঠান শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, এ দেশে অপচয় বড়ো বেশি এবং তার চেয়ে বেশি ষড়যন্ত্র। যাঁরা কোনো পথ বাতলান না তাঁরা চিহ্নিত, কিন্তু যাঁরা পথ-নির্দেশের চেয়ে বেশি ছলাকলা করেন তাঁরা ক্ষমার যোগ্য নন। গত ৪ঠা ডিসেম্বর যোগেশ মাইম একাডেমীর যদি একজন দর্শকও গান বলাতে সমাহিতের চেয়ে বেশি ভঙ্গি এবং আলোর কারুকাজ অথবা চটজলদি গায়কীকে মান্য করেন তার দায়িত্ব [illegible] মহীনের ঘোড়ারা [illegible] অথবা দি [illegible] সাংস্কৃতিক অনু[illegible] অনাত্মবিলম্বে ইয়াংকী কালচারে পুষ্ট বার-কাম-হোটেলের প্ল্যাটফর্ম হয়ে যায়—তার কৃতিত্ব?

সমীর চট্টোপাধ্যায়

নীলাম

স্টেইনার ও চৌরঙ্গী সেলস্ ব্যুরোর মতো এই ডালহৌসী একসচেঞ্জেও প্রথম দিকে নীলাম হয় কাচ ও চীনেমাটির জিনিসপত্তরগুলো। অর্থাৎ, গ্লাস, টী-সেট, লেমোনেড-সেট, কাপ-ডিস, এ্যাসট্রে, ডিনার-সেট এইসব। পরপর কয়েকটি টেবিলে রাশিকৃত এসব জিনিসপত্র দেখে যে-কোন মহিলার চোখ চকচক করে ওঠারই কথা [illegible] রবিবারও যে তার অন্যথা কিছু [illegible] সেরকম ভাবার কোনো কারণ নেই।

বেলা সাড়ে এগারোটা। কুইন্স ম্যানসন; ১৩।এফ, রাসেল স্ট্রীট-এর [illegible] বাড়ীটি এখন লোকে [illegible] এইমাত্র ছয়জনের জন্য একটি টী-সেট [illegible] হল মাত্র আটাশ টাকায়। দোকানে তার [illegible]

...য়ই কিছু বেশী। আমার বয়সী একজন ...শ্ন করলেন, 'আচ্ছা, এরা এতো সস্তায় ...কয়ে দায় বলুন তো?' যে-কোনো ...র মর্যাদা বাড়াতে পারে—এরকম একটি ... টী-সেট এক মহিলা পেলেন একশো ...ত্রিশ টাকায়। এছাড়া, একটি চমৎকার ...ানেন্ত-সেট সাতাশ টাকায়, ছটি ডিনার ...ট চল্লিশ টাকায় বিক্রি হল।

...এই নীলামের সময় দুটি পুরুষ ও ...টি মহিলা ঢুকলেন। ঢুকেই তাঁরা পছন্দ ...লেন একটি ডাইনিং সেট, যাতে ছটি ...র আছে। মহিলা ফিসফিস করে বল-..., 'ছশোয় হয়ে গেলে এটাই নেবো।' ...সেটির কোনো ভূমিকাই নেই। তাঁরা ...ছেন, ফিরছেন আর আড়চোখে ডাইনিং ...টই দেখছেন। অনেক পরে, বিকেল ...টায় যখন সেটা নীলামে উঠল, তাঁদেরকে ...ক করে দিয়ে নীলামদার প্রথম ডাক ...ন, ছশো। অর্থাৎ এর বেশী ডাকতে ... ডাকার লোকের অভাব নেই।' পুরো ...শো পঁয়তাল্লিশ টাকায় সেটা বিক্রি ... অবশ্য, জিনিস বড্ড ভালো ছিল। ...ফেরানো যায় না।

...এর আগে উল্লেখযোগ্য বিক্রি হয়েছে ...।ভি-সি ইন্ডি—ত্রেইশে, এ-সি-ডি-...টেন্টার—চৌত্রিশে, ছজনের কিচেন ...রারী—পঁচিশে, একটা কাচের দরজার ...বিও ক্যাবিনেট—দুশো সত্তরে, একটি ... বেডেবখাট, একটি তিন-আয়নার ...ং টেবল ও একটি ওয়াড্রোব ... চমৎকার সেটটি বিক্রি ... হাজার পাঁচশো সতেরো ... একটি আন্ডারউড স্ট্যান্ডার্ড ...রাইটার গেল বারোশো তিরিশ টাকায়। ...একটি পুরোনো টাইপ রাইটার চল্লিশ ... ডাক শুরু হয়ে থামল একেবারে দুশো ... চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এক বাঙালী ...াক এটি নিতে পেরে হেসে উঠে ...য়ে পকেট থেকে টাকা বের করলেন ...াম দেওয়ার জন্যে।

...খুবই জাঁকজমকপূর্ণ একটা সোফাসেট ...ম উঠেছিল। ডাক চলছে, পাঁচশো ...পঞ্চাশ....আশী, ছশো; এবং এরকম ...ছশো ষাটে গিয়ে একেবারে থেমে গেল ... এক দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক, বোধহয় ...শী, দাঁড়িয়ে এতোক্ষণ চুপচাপ। ...ঘিরে দুটি ছেলে ও দুটি মেয়ে। ...সবাই তাঁকে খোঁচা মারছে পিঠে, ... অর্থাৎ এটা নিতেই হবে। শেষমেষ, ...হয়ে ভদ্রলোক চোখকান বুজে হেঁকে ...ন, ছশো সত্তর। এবং ওটা তাঁরই ... ছেলেমেয়েদের চোখে-মুখে ঝলমলে ...খেলে গেল। ছেলেমেয়েদের মুখে যে ... হাসি ফোটানো যায়, তা নয়। তবে, ... নীলামের দোকানে একটু দেখেশুনে ... পারলে—হাসি ফোটানো কঠিন নয়। ...জিনিস, কিছু না কিছু পছন্দ হবেই। ...রও, ছেলেদের মায়েদেরও।

একরাম আলি

কলকাতায় সান্ড্রা জনসন

সম্প্রতিকালের মার্কিন লোকসঙ্গীত সেকালের মতন শুধু সাধারণ মানুষের নানান আবেগ, প্রাণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রণয়-প্রতিবাদের মধ্যেই সীমিত নয়, আরো অনেক ব্যাপ্ত এবং সমসাময়িক জটিল সমস্যাগুলিও সুরে বাঁধতে চায়। সম্প্রতি বিদ্যা-মন্দিরে মঞ্চাভিজ্ঞ গায়িকা সান্ড্রা জনসন এই দুই ধরনের মার্কিন লোকসঙ্গীত পরি-বেশন করেন। গোড়ায় গাইছিলেন ডিমে লয়ে —প্রায় গুনগুনিয়ে। আমার উল্টো ভারতের লোকেরা মনে পড়েছিল। এই সুকণ্ঠী গায়িকার সংকলনে প্রেম, বীরত্ব থেকে আরম্ভ করে যুদ্ধ, পলিউশন সবকিছুই পাওয়া গেল। কৃষ্ণাঙ্গদের একটি ঈশ্বরপ্রার্থ রচনা সান্ড্রার গলায় নিখুঁত শুনিয়েছিল সেদিন। জোয়ান বায়েজ-এর গোল্ডেন হ্যান্ড দে ডান ট্যু দি রেইন'-ও মনে রাখার মতো। গানের সঙ্গে একমাত্র সংগত গিটার, শিল্পী নিজেই বাজিয়েছিলেন। মাঝে কিছুক্ষণের জন্যে অন্য একটি তারের যন্ত্র ব্যবহার করেন। কিন্তু এই কোকিলকণ্ঠী গায়িকার গানে আঁর প্রতিভাসম্পন্ন পূর্বসূরীদের সেই প্রাণের আগুন যুক্ত হলে তাঁকে লোকসঙ্গীতের চূড়ায় নিয়ে যেতে পারে।

শ্রীমতী সান্ড্রা ভারতের নানা অঞ্চলে লোকসঙ্গীত গেয়ে বেড়াচ্ছেন। আয়োজন করেছেন ইউ-এস-আই-এস।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

রেস্তোরাঁ

দেবদূতদের বাসস্থান স্বর্গ থেকে ঘুরে এলাম। চমৎকার কষা আলুর দম আর পেয়াজ মরিচ ছড়ানো ধূমায়িত ঘুগনি খেয়ে এলাম। পঞ্চাশ পয়সায় টোস্ট করা রুটি আর কষা আলুর চার পিস খাওয়ার পর এক গ্লাস জল খেলে আর কিছু খাওয়ার দরকার হয় না অন্ততঃ দুঘণ্টা। খেয়ে খাইয়েও তৃপ্তি।

অসীম, স্বপন কিংবা পাড়ার বন্ধুদের দুলাল বাবু, চ্যাটার্জিবাবু কিংবা রঘুর দু-বেলায় একবার করে আসা চাই-চাই। সকালে অশোক দুয়ারীর এই প্যারাডাইসে ব্রেক-ফাস্ট না করলে যেন সারাদিনটাই মাটি।

বাগনানে আছে দুই সন্তান আর তার স্ত্রী। রাত সাড়ে আটটায় সবাই যখন এসে হাজির হয়—তখন দোকানের ডালডার টিনের জোড়া লাগানো ঝাঁপ ফেলে দেয় অশোক। ভেতরে দাবার চে-কো পিজবোর্ডের ছককাটা ঘরে তখন সে আর তার বন্ধুরা মন সংযোগ করে।

সারাদিনে ৭০।৮০ টাকার উপরে বিক্রী করে উঠতে পারে না। তাছাড়া বাকি তো আছেই। বছরে ছ'টা লাইসেন্সে একশ কুড়ি টাকা। ছোট একটা ছেলে রেখেছে তাকে সব-রকমের সাহায্য করার জন্যে। খদ্দেরের মন রাখার জন্যে বারবার সিগারেটের দোকানেও দৌড়ায়। ছেলেটাকে কুড়ি টাকা মাইনে, দাঁড় লাগানো বছরে দুটো প্যান্ট, গেঞ্জি, গামছা আর মাসে কুড়ি দুবেলা খাওয়া, জলখাবার, মাঝে মাঝে নাইট শোয়ে সিনেমা দেখার আহ্লাদ—সবকিছুই অশোকবাবুকেই মেটাতে হয়।

চায়তে নড়বড়ে তেলচিটে ধরে খাওয়া টেবিল, সাতটা ঠিক একই চেহারার বেঞ্চ। দুটো বেঞ্চ তার মধ্যে দেখলাম পায়া ভাঙা—ইঁট দিয়ে বসিয়ে রেখেছে। সামনে একটা টেবিলের পেছনে একটা টুলে অশোকবাবু বসেন। টেবিলের উপর ধূমায়িত দুটো বড়ো বড়ো তলাটা কালি পড়া ডেকচি; ভেতরে গরমকষা আলুর দম আর ঘুগনি। অশোক-বাবু যেখানে বসে ঠিক তার পেছনে চায়ের সরঞ্জাম। মাসে তিনথেকে চার মণ কয়লা লাগে। দুটো উনুন সারারাত গুঁড়ো কয়লা ছড়িয়ে চাপা দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হয়। বাঁদিকের বোয়ামে লেড়ো বিস্কুট, শোলে বিস্কুট, জয় বাংলা বিস্কুট আর ক্রীম রোল পাশাপাশি সাজানো। টেবিলের নীচে কাঁচের ঢাকনার ভেতরে পাঁউরুটি সাজানো। অশোকবাবুর সঙ্গে কথা বলে জানলাম দিনে দশ থেকে পনেরো টাকা আয় হয়। বাকি না গেলে আরো বেশি আয় হতো। কিন্তু তারতো উপায় নেই।

দোকানের পূর্ব দিকের দেয়ালে লাগানো আছে সরস্বতী পুজোর মন্দিরের পিজবোর্ডের উপরে আঁকা ফ্রেম। বছর বছর কয়েকজন মিলে দোকানের সামনের ফুটপাথ ঘিরে ওরা সরস্বতী পুজো করে।

ভালো ব্যবহার, ভালো খাবার, কম পয়সায় দুপুরে কিংবা রাত্তিরের দম ভর খাবার পাওয়া যায় বলে ধুলো ধোঁয়ায় তেল চটচটে টেবিলে খাবার রেখে খেতে কারোরই তেমন আপত্তি নেই। রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, কারখানার শ্রমিক কিংবা পথ চলতি লোক এই দোকানের খরিদ্দার।

তরুণ চৌধুরী

আমি কংকাবতী বলছি

ক্রিকেট খেলায় যেমন গারফীল্ড সোবার্স, প্রসাধন দ্রব্য হিসেবে তেমন-ই 'অল রাউন্ডার' হ'লো পাতি লেবু। হোক তা চুলের স্বাস্থ্য অথবা ত্বকের সতেজ আভা, পায়ের পাতার মসৃণতা, কি চোখের ঝিলিক, সব কিছু দান করতে পারে সুগোল ও সতেজ পাতি লেবু। লক্ষ্য করুন, কি তন্বী, জীবন্ত সবুজ পাতি লেবুর ভেতরের অংশ, কি সতেজ তার ঘ্রাণ! অতি যথাযথভাবেই তাই প্রসাধন ব্যবসায়ীরা পাতি লেবুকে মনে করেন সজীবতার প্রতীক। প্রতিদিন বাজারে বেরোচ্ছে নতুন নতুন লেমন্ ক্রীম, লেমন্ শ্যাম্পু, লেমন্ সাবান। যে কোনো প্রসাধন দ্রব্যের বিজ্ঞাপন এক ফালি পাতি লেবুর ছবি জুড়ে দিলেই, ব্যস্, দারুণ কাটতি সুনিশ্চিত!

আপনার রূপচর্চায় পাতি লেবুর যে কত রকম ব্যবহার হতে পারে বলিঃ

১। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই চা না খেয়ে পান করুন এক গ্লাস গরম জলে মেশানো একটি পাতি লেবুর রস, ও এক চামচ বিশুদ্ধ মধু। এর ফ
শরীর ঝরঝরে লাগবে, ত্বক থাক
মসৃন ও সতেজ, হজম সংক্রান্ত সমস
ঘটবে না।

২। আপনার কেশরাশি কি মলিন, স্বাস্থ্যের আভাশূন্য? চুলের গোড়া ঘষুন একটি পাতি লেবুর রস এবং তা অর্দ্ধেক পরিমান গরম অলিভ তেলে সংমিশ্রণ। এটি রাত্রে মাখুন, যা সকালবেলায় বেরোবার আগে শ্যাম্প দিয়ে মাথা ঘষে ফেলতে পারেন।

৩। শীতকালে পায়ের পাতা ফে যায় কি গোড়ালী দেখায় রুক্ষ অশোভন এক ফালি পাতি লেবু গ্লিসারিনে চুব পায়ের পাতায় (বিশেষত গোড়ালীতে ভালো ক'রে ঘষুন।

৪। পাতি লেবুর মধ্যে আছে এম একটি অ্যাসিড যা গায়ের চামড়া 'ব্লী করে। করে অর্থাৎ, রোদ্দুরে পুর ত্বকের যে বাদামী চেহারাটি হয়, পা লেবু সেটি তুলে ফেলতে সক্ষম। এ চামচ ময়দায় আন্দাজ পরিমান পা লেবুর রস ও সামান্য দুধ মিশি তৈরি করুন একটি থকথকে সংমিশ্রণ এটি সারা মুখে, গলায়, হাতে মেখে ঘষে ঘষে তুলে ফেলুন।

৫। শীতকালে, গায়ে মাখার তেলে সঙ্গে পাতি লেবুর রস মিশিয়ে নি হোক তা নারকোল তেল, অলিভ অথব বিশুদ্ধ সরিষা, সারা অঙ্গ হবে ঝকঝক মসৃন। একটি ছোটো শিশিতে সামান তেল ও অর্দ্ধেকটি পাতি লেবুর র মিশিয়ে খুব ভা.. করে ঝাঁকিয়ে নিন তেল আর লে... রস একদম মিশে যাওয় চাই।

৬। সর্বশেষ কথা হ'লো এই যে পাতি লেবু-ই হ'লো ভিটামিন 'সি'-এ সবচেয়ে সস্তা অথচ শ্রেষ্ঠ উৎস। নিখুঁ ত্বক ও চুলের জন্য, ঝলমলে স্বাস্থ্যে জন্য এই ভিটামিন অপরিহার্য। তাই একাধিক বার চা না খেয়ে, দিনের মধে যখন তখন পান করুন লেবুর জল।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসত্যপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা।। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

১৭ বর্ষ
৩৮ সংখ্যা
২৭ মাঘ
১৩৮৪
10th Feb. 1978

াগামী সংখ্যায়

চছদকাহিনী
র্গেশনন্দিনীর আগে প্রেম
লখেছেন রমেন মজুমদার
ভীক রায়ের গল্প
সুব্রত রায়চৌধুরীর সঙ্গীত সমালোচনা

আধুনিক জীবন ও বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

বিজ্ঞান হল বিশেষ জ্ঞান। অর্থাৎ সেই বিশিষ্ট পদ্ধতি যার সাহায্যে প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে ভালোভাবে জানা যায়। এবং অবশ্যই, সেগুলিকে ব্যবহার করা যায়।

একথা সকলেই জানেন, ভারত যখন বিদেশীদের দখলে যায় তখন দেশে উচ্চ মানের একটি সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। সাহিত্যে দর্শনে এবং শিল্পকলায় ভারতের কৃতিত্ব ছিল সারা পৃথিবীর শ্রদ্ধার বিষয়। গণিত জ্যামিতি ও বাস্তুবিদ্যাতেও আমাদের দেশ গৌরব অর্জন করেছিল তখন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতকে পরাধীনতা বরণ করতে হয়েছে।

কেন ? সেকি শুধুই রাজনৈতিক বিশৃংখলা ও দেশীয় রাষ্ট্রশক্তির দুর্বলতার জন্যে ? সম্ভবত নয়। এগুলি প্রত্যক্ষ কারণ হলেও মৌল কারণ রয়েছে অন্য জায়গায়। এবং তা হল, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রয়োগবিদ্যার অনাধুনিকতা। ইউরোপ যে এগিয়ে যেতে পেরেছে তা সম্ভব হয়েছে এই দুটি নতুন চাকার সঙ্গে তাদের অগ্রগতির রথকে জুড়ে দিতে পেরেছিল বলেই। এবং আমরা যে পিছিয়ে পড়েছি তারও কারণ, পুরনো দিনের মরচে-পড়া চাকার অনগ্রসরতা।

কিন্তু স্বাধীনতার পরে পরিস্থিতি এখন অন্য রকম। প্রথমত, আমাদের দুর্ভাগ্যের সব দায় বিদেশী শাসকের ওপর চাপিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবার রাস্তা বন্ধ। দ্বিতীয়ত, এবং এইটেই সব থেকে গুরুতর কারণ, স্বাধীন দেশ হিসেবে গোটা পৃথিবীর সমস্ত দেশের সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে টিকে থাকতে হচ্ছে। তৃতীয়ত, উন্নয়নশীল এবং কল্যাণকামী একটি আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যারও সবরকম আশা-আকাংক্ষা পূর্ণ করার দায়িত্ব এখন সরকারেরই। এবং সকলেই জানেন, সরকারের অনেকগুলি প্রয়াসেরই সাফল্য নির্ভর করে সর্বসাধারণের সহযোগিতার ওপর।

কথাগুলি বলা হল এক বিশেষ প্রসঙ্গকে উপলক্ষ করে। শিশুদের জন্য একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এই ধরনের শুভ প্রয়াস গ্রামাঞ্চলেও যাতে বিস্তৃত করা যায়, তার কথা বলেন। বলাই বাহুল্য, আমাদের মতো অনগ্রসর দেশে এ-প্রস্তাবের উপযোগিতা কতো বেশি। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও বোধহয় জেনে নেওয়া ভালো, কলকাতা ও মফঃস্বল শহরগুলিতে এরকম উদ্যোগ বহু বছর আগে থেকে চালু থাকা সত্ত্বেও শহরবাসীদের মনে বিজ্ঞানচেতনা কতোটা বেড়েছে।

অর্থাৎ ভেবে দেখা দরকার, আমাদের বাস্তব জীবনের ছক যদি সেই পুরনো ধাঁচেই বহাল থাকে, শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা বা কয়েকটি মডেল দেখিয়ে চিন্তাজগতে কোনো সত্যিকারের পরিবর্তন আনা সম্ভব কিনা, অথবা ? বিজ্ঞানচিন্তা ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ যদি হাত ধরাধরি করে এগোতে পারে, তবেই সম্ভব হবে আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো ?

সাহিত্য ইত্যাদি...

আধুনিক উপন্যাস

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে তখন।

বুদ্ধদেব বসু এক সাহিত্যসভার আয়োজন করলেন। নিজের বাড়িতে নয়, যতীন মজুমদারের বাড়িতে। অনেকেই এসেছিলেন সে সভায়। বিশেষ করে যাঁরা আধুনিক কবিতা ও কবিদের কাছের মানুষ তাঁরা।

কিছুক্ষণ আলাপসালাপ চলল। তারপর, যা হয়ে থাকে, শুরু হল কবিতা পড়া। চলল প্রায় ঘন্টাদুয়েক।

একসময় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, আমার একটা প্রস্তাব আছে। আমি উপন্যাস পড়ে শোনাতে চাই আপনাদের।

মানিকবাবুকে যাঁরা চিনতেন তাঁরা জানেন ঠাট্টারসিকতার ধার ধারতেন না তিনি। সোজা কথা বেশ স্পষ্ট করে বলতেন। কোনো ব্যাপারে তো-তো করতেন না। তাঁর মুখ থেকে এ-ধরনের কথা শুনে সকলেই বেশ একটু হকচকিয়ে গেলেন।

প্রথমত উপন্যাস পড়ার ব্যাপারটা একেবারেই নতুন। আগে কখনো উপন্যাস পড়া হয়েছে বলে শোনা যায়নি। দ্বিতীয়ত, শ্রোতারা যদি শুনতে রাজিও হন, যিনি পড়বেন তাঁর দম থাকবে কি করে। তৃতীয়ত, ব্ল্যাক আউটের রাতে নটা নাগাদ উপন্যাস পড়া শুরু হলে শেষ হবে যখন, বাড়ি ফেরা যাবে কি করে?

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ব্যাপারটা আঁচ করে অন্য রাস্তা নিলেন। বললেন, বই পাবো কোথায়? আপনি তো নিশ্চয়ই বইটই আনেন নি।?

না।—মানিকবাবু বললেন, কিন্তু যতীনবাবুর বাড়িতে কি আমার একটাও বই নেই?

যতীনবাবু কী বলতেন জানা গেল না, বুদ্ধদেববাবু হাল ধরলেন। বললেন না, না, এখন উপন্যাস পড়ার মানে হয় না। মানিকবাবুর উপন্যাস আমরা বিশেষ সভা ডেকে শুনব। সবাইকে তো খবর দেওয়া হয়নি। এখন পড়া হলে তাঁরাই বা কী বলবেন?

সকলেই একবাক্যে সায় দিলেন। এবং সভার কাজও শেষ হল।

যাবার সময় সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কামাক্ষীবাবু কিছুটা কৈফিয়তের মতো করে বললেন, কবিতা তো কেউ পড়ে না, তাই মিটিং ডেকে জোর করে শোনানো।

কিন্তু তবু তো শোনাতে পারলেন, মানিকবাবু বললেন, উপন্যাস আমি জোর করেও শোনাতে পারলাম না।

না তা কেন! আমরা তো শুনবই ঠিক হয়ে গেল।

মানিকবাবুর ঠোঁটের কোনায় হাসির ঝিলিক খেলে গেল। সেটা খুশির, না অবিশ্বাসের বলা শক্ত।

পরে অনেকবার ভেবেছি, কেন মানিকবাবু সেদিন উপন্যাস পড়ার কথা তুলেছিলেন? ব্যাপারটা যে অদ্ভুত এবং অভূতপূর্ব তা কি তিনি জানতেন না? নাকি কবিতা শুনে শুনে বিরক্ত হয়েছিলেন, ক্লান্ত বোধ করছিলেন? তাঁর সেই হাইওয়া ক্লান্তির অবস্থাই কি টের পাওয়াতে চাইছিলেন তিনি কবিদের ওপর উপন্যাস শোনার ক্লান্তি চাপিয়ে দিয়ে? নাকি সত্যিই তিনি শ্রোতা খুঁজছিলেন? কিন্তু জনপ্রিয় লেখক না হলেও তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা সেকালেও তো খুব কম ছিল না! ......

পাঁচ ছয় বছর পরের কথা। মানিকবাবুর টালিগঞ্জের বাড়িতে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা উঠেছিল একদিন। কবরখানার উত্তরে মানিকবাবুর পৈত্রিক বাড়ি ছিল তখন। জায়গাটাকে দিগম্বরী তখন বলত এখন বোধহয় অন্য কোনো নাম হয়েছে। বাড়িতে ঢুকেই ছোটো একফালি খোলা জায়গার বাঁ পাশে একটা ছোটো গাছের নীচে বেঞ্চ পাতা ছিল একখানা। অনেকটা পার্কের বেঞ্চের মতো দেখতে। আমি যখনি গেছি কথাবার্তা ঐ বেঞ্চে বসেই বলেছি। সেদিনও সেই ব্যবস্থাই বহাল ছিল। মানিকবাবুর গায়ে ছিল একটি হাফহাতা গেঞ্জি, হাতে সিগারেট।

সব কথা মনে নেই এখন। থাকা সম্ভবও নয়। তবু, মানিকবাবু বলেই বোধহয়, দু-একটা বিষয় স্পষ্ট মনে রয়ে গেছে।

মানিকবাবু বলেছিলেন, আমি যখন উপন্যাস লিখি, মাথার মধ্যে থাকে তখন একটা বলার কথা। চরিত্রগুলো আসে তারই বাহন হিসেবে। মানুষ তো কতো রকমই দেখেছি, তাদের ভেতর থেকেই তৈরি হয় চরিত্র। তবে হ্যাঁ, দেখার ধরনটা বোধহয় আমার একটু অন্য রকম। অবিশ্যি এর মধ্যেও একটু কিন্তু আছে। সকলেরই দেখার ধরন অন্য রকম। তবে আমি দেখি, খানিকটা আপনাদের মতো। মানে, আধুনিক কবিদের মতো করে।

তাহলে কবিতা লেখেন না কেন? প্রশ্ন করেছিলাম আমি।

লিখি তো। ছাপি না। একবার আমার ভাই একটা নিয়ে গিয়ে ছেপেছিল। তারপর, ওঃ বুদ্ধদেববাবু খুব ঠকেছিলেন সেটা দেখে। কিন্তু লেখা ছাড়িনি তাই বলে।—

হাই পওয়ারের চশমার আড়ালে মানি[illegible] চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

তখনই আমার মনে বিদ্যুতের [illegible] খেলে গিয়েছিল, এই জন্যই কি মানি[illegible] সেদিনকার সেই সাহিত্য সভায় উ[illegible] পড়ার কথা তুলেছিলেন? কবিদের [illegible] যাতে তাঁর লেখা নিয়ে আলোচনা ও[illegible] উদ্দেশ্যে?

জিজ্ঞাসা করা হয়নি কিছু। অ[illegible] স্বাভাবিক ঝোঁকেই অন্যদিকে মোড় [illegible] ছল কথাবার্তা।

কিন্তু সেইদিন থেকে একটা [illegible] চিন্তা ঠাঁই পেয়েছে মাথায়। এ[illegible] উপন্যাস আসলে দুজাতের। সাবেক [illegible] আধুনিক। দুজাতের উপন্যাসের [illegible] দু ধরনের।

তার মানে এ নয় যে, এই দু [illegible] পাঠক একেবারে বায়ুবোধক কক্ষে [illegible] করেন।

পুরনো ধাঁচে লেখা ভালো উ[illegible] ভালো লাগতে পারে পাঠকের। [illegible] দিয়ে বলা যেতে পারে, 'গোরা' [illegible] একটি ভালো উপন্যাস। কিন্তু 'চতু[illegible] মতো আধুনিক নয় হয়তো। তবু, এ [illegible] পাঠকের কাছে দুটি উপন্যাসই পাঠযোগ্য [illegible] হতে পারে।

অবিশ্যি সময় যে খুবই তাড়া[illegible] বদলে যাচ্ছে [illegible] ঠিক। আধুনিক [illegible] যাত্রার প্রভাব [illegible] দ্রুত ছড়িয়ে পড়[illegible] আধুনিক [illegible]সকতাও দানা বাঁধছে [illegible] করে। নতুন ধরনের সিনেমা দেখার [illegible] কলকাতায় তো বটেই মফঃস্বলে [illegible] আগ্রহ দেখা দিচ্ছে। আধুনিক কবি[illegible] পাঠকও এখন ক্রমবর্ধিষ্ণু। কাজেই [illegible] ধরনের উপন্যাসই বা পাঠক-সমর্থন [illegible] না কেন?

বিশেষ করে, শিক্ষিতের হার [illegible] শতকরা একশজন হবে, তখন তো [illegible] আর লেখাপড়া কিছু কিঞ্চিৎ যাঁরা জা[illegible] তাঁদেরই বা মানসিক প্রস্তুতি কতো[illegible] কাজেই নতুন ধরনের উপন্যাস লেখ[illegible] এটা জেনেশুনেই কলম ধরতে হবে যে [illegible] দিনে তাঁর বইয়ের এডিশন ফুরোবে [illegible] এবং চলতি অর্থে তাঁর খুব জনপ্রিয়ত[illegible] হবে না।

কিন্তু নাম পাবেন তিনি, [illegible] পাবেন। এবং তিনি যখন থাকবেন না, [illegible] তখন তাঁর বইও বিকি হবে।

এটাই এদেশের রীতি। অন্তত [illegible] পর্যন্ত।

মণীন্দ্র রা[illegible]

বড় ?

ক বড়ো, মধুসূদন না রবীন্দ্রনাথ? কের না মাণিক, না বিভূতিভূষণ? নন্দ না সুধীন্দ্রনাথ? সত্যজিৎ না ক? একটা দাঁড়িপাল্লায় দু পাশে দুই া চাপিয়ে তাকিয়ে থাকি কোন্ দিক হয়ে ঝুলে পড়লো, দেখতে। মোটামুটি ত আমরা এতে, একটা সিদ্ধান্তে না তৃপ্তি পাই না। দেখছেন না, কতো সময়ের মধ্যে, উনষাট থেকে পঁয়ষট্টি, বছর ছ'এক তিনি মোটামুটি নির্ঝঞ্ঝাটে তে পেরেছিলেন। আধুনিক মহাকাব্য, ত-কবিতা, সনেট, নাটক, প্রহসন, পত্র- ্য—আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সবকটি ার গোড়াপত্তন করলেন তিনি, বইয়ে লেন বাইরের আলো হাওয়া ধর্মাশ্রিত যুগের সাহিত্যে। যদি সময় আরো তেন, জীবনটা হত সুদীর্ঘ আর হতেন চারি, তবে কি রকম সব অবাস্তব পার ঘটে যেতো, ভাবুন। রবীন্দ্রনাথ প্রায় াব্দী জুড়ে পদচারণা করেছেন। অপেক্ষা- ত আর্থিক সংস্থান ছিলো তাঁর, ছিলেন তাচারি। আর এলেন যখন সাহিত্যে, তখন লা ভাষার বনেদ অনেকটাই তৈরী। তাকে র পরিশ্রম করতে হয়নি। ভাষার দুর্বল- র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়নি। ফলে, নি সমগ্র প্রতিভাকে মেলে ধরতে পেরে- লেন, মধুসূদন তা পারেন নি।

এ ধরনের বিতর্ক প্রতিভার বিচারে উঠে কে। হয়তো কিছু কিছু যুক্তিও আছে বে এ যুক্তি নিয়ে বেশী দূরে যাওয়া য় না। উচিতও নয়। লেখক বা শিল্পীর দেশকালের কতোকগুলি শর্ত আছে, তার ধ্য দিয়ে প্রতিভা বেড়ে ওঠে। সেসব শর্ত রবর্তী সময়ে বদলে যায়। পরের লেখক ন্য কতকগুলি সময়ানুগ শর্তের মধ্যে াস করেন। এটা ভুলে যাই বলেই, একের ভাব অন্যের মধ্যে না দেখে মুগ্ধ হই; কের নৈপুণ্য অন্যের মধ্যে না দেখে ক্ষুব্ধ য়ে উঠি সহজেই। তাছাড়া, একই সময়- ালের মধ্যে থেকেও দুজন শিল্পী ভিন্ন ৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখেন সময় ও সমস্যাকে; মাধানও করেন নিজের ব্যক্তিগত চিন্তার বিশিষ্টতা অনুযায়ী। ঋত্বিক ঘটক কতো ড়ো পরিচালক, তা প্রমাণ করতে দেখেছি, ত্যজিৎ রায়কে ধুলোতে নামিয়ে আনতে চ্ছে। দুজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন- াপন যদি আলাদা হয়, শিক্ষা, রুচির ভিন্নতা দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বতন্ত্র করে দেয়। এটাই ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্বের মেরু তো বিপরীত প্রান্তের হবে ততই, তাদের ৃষ্ট শিল্প নতুন অভিজ্ঞতা ও স্টাইলের য়ে উঠবে অনন্য। আমরা আর একজন সত্যজিৎ চাই না, অনুরূপ ঋত্বিকও নয়। চারুলতা বা কাঞ্চনজংঘা ঋত্বিক বিষয় হিসেবে বেছে নিয়ে ছবি করতেন না। যদি করতেনও, হতো ঋত্বিকের ডাইমেনশান নিয়ে আলাদা কিছু। আমাদের স্মৃতি যতো দিন প্রখর থাকবে, চারুলতার সূক্ষ্ম মানসিক কষ্ট ও বিচ্যুতির অবস্থার অসহায়তার এতটুকুও ম্লান হবে না। এরকম অতি সূক্ষ্ম পরিবেশ রচনা করে একটি কাহিনীকে মনের অতল অন্দরে নিয়ে যাবার দৃষ্টান্ত সত্যজিৎ রায়ের আগে কল্পনাও করতে পারি নি। আবার, দেশ বিভাগ, একটা জাতির জীবনের এক ভয়ংকর দুর্যোগ, ঋত্বিক যেভাবে ব্যবহার করেছেন, সেই অজানিত অভিজ্ঞতা আমাদের বিস্মিত করে দিয়েছে। সুবর্ণরেখা দেখার সময় এমনই আবহ রচিত হয়ে যায়, ইনভল- মেন্ট এমনি স্তরের হয়ে ওঠে, ব্যক্তিত্ব লোপ পেয়ে যায়। আমরা অভিভূত হয়ে পড়ি। সত্যজিৎ ও ঋত্বিক ভিন্ন মানসিকতার মানুষ। দুজনের ছবির জগৎ আলাদা। ভাবনা ভিন্নমুখিন। তুলনা চলে না। তবে, এটুকু বলা যায়, দুই মেরুর এই দুই বাসিন্দা দর্শকদের হাত ধরে যেখানে পৌঁছে দেন তা অতি বড় প্রতিভাবানই পারেন, ফলে এঁদের অসামান্য প্রতিভা, তর্কাতীত প্রতিভা।

বিভূতিভূষণ, মাণিক, তারাশংকর একই সময়-পরিস্থিতির মানুষ। অথচ এঁদের নিজ নিজ দেখা কতো আলাদা। কার কতোটা ভুল ছিলো পরিবেশ ব্যাখ্যায়, তার চেয়ে শিল্প হিসেবে আমাদের চিন্তা ও অনুভূতি- লোক কিভাবে নাড়া খায় এঁদের রচনা পাঠে, এটাই শিল্প উপভোগের শর্ত। এঁরা কেউই সমাজতাত্ত্বিক নয়, ব্যাখ্যাতাও নন। শিল্পী যা দেখেছেন, যেমন ভাবে দেখেছেন তাকে শরীর দিতে চেয়েছেন; পাঠকের কাছে এঁদের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি যদি অনিবার্য প্রকাশ হিসেবে বেজে ওঠে, সেটাই বড়ো কথা। অপুর জগৎ তারাশংকরের নয়, পুতুলনাচের ইতিকথা ইছামতীতে খোঁজা বিড়ম্বনা। শিল্প-উপভোগের পক্ষে অবৈজ্ঞানিক। অমানবিক। জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ ভিন্ন কোটির মানুষ, এঁদের জগৎও আলাদা। একের কাছে যা পাই তা তাঁর কাছে পাবার জনাই বারে বারে হাত পাতবো। তিনি সব প্রার্থনা পুরণ করতে পারেন না, আমাদেরও চাওয়া ঠিক নয়। বিদ্যাসাগর কেনো সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সৈন্যদের সংস্কৃত কলেজে (?) থাকবার ব্যবস্থা করেছিলেন, এজন্য তিনি কতোটা প্রতিক্রিয়াশীল—এসব বিচার করতে গিয়ে ভাবা উচিত, তাঁর সময়ের মানুষ কিভাবে ভাবতো, তিনি সিপাহী বিদ্রোহকে কোন চোখে দেখেছিলেন। সেই সময়ের পক্ষে এরকম দেখা খুবই অস্বাভাবিক ছিলো কিনা। তাঁর সময়ে দাঁড়িয়ে সামাজিক সমস্যাগুলোকে তিনি যেভাবে সমাধান নেমে ছিলেন তার চেয়ে প্রগতিশীলতা আজকের দিনেও কজন দেখাতে পেরেছেন? কার্ল- মার্কস আর বিদ্যাসাগর একই শতাব্দীর মানুষ। অনেকগুলো সমুদ্রের ব্যবধান দুটো দেশের মধ্যে। একের দ্বারা অন্যজন যদি প্রভাবিত না হয়ে থাকেন, যে সময়ে এরো- প্লেন, বেতার আবিষ্কৃত হয়নি, তাকি খুবই গুরুতর অপরাধ? উনি যা পেরেছিলেন, ইনি কেনো তা করেন নি, এসব অবান্তর প্রশ্ন। যদি দেখা যায়, দুজন দুই প্রকৃতির মানুষ, দুই ভিন্ন ভূখণ্ডের বাসিন্দা। আমাদের বিচারবিতর্ক এমন সব যুক্তিহীন পথ ধরে চলে, অসামান্য অবদান তাতে অব- হেলিত হয়, অশ্রদ্ধা পেতে থাকে। একজন টুলো পণ্ডিত হয়েই যাঁর খুশী থাকার কথা, তিনি সদ্য গড়ে ওঠা আলোকপ্রাপ্ত শহরের বাসিন্দা হলেন, গ্রামে গ্রামে ঘুরলেন আধুনিক শিক্ষা ছড়িয়ে দেবার জন্য। যুদ্ধে নামলেন অশিক্ষার বিরুদ্ধে, কু- সংস্কারের বিরুদ্ধে। সারাটা জীবন দিয়ে দিলেন অবিচার অন্যায় থেকে মাতৃজাতিকে বাঁচাতে, মাতৃভাষাকে ঢেলে সাজাতে। এক জীবনে এতো কিছু করলেন আটহাতি ধুতো-চাদর জড়িয়ে। যাঁরা এই মহৎ প্রাণ মানুষটির বিরুদ্ধে লড়াইতে নামে তাদের টেরিলিনের প্যান্ট আর টেরিকটের জামায় এতোটুকু ধুলো বসতে দেখি না। কথার রাজারা যদি কাজের রাজা হতেন তবে, কি বলতে চান ভাববার চেষ্টা করা যেত। ইতিহাস বোধের অভাব, দরদের অভাব কথার মার প্যাঁচে বড়ো বেশী উলঙ্গ হয়ে ওঠে। যদিও—এরকম উদবাস্তু মানসিকতা দেখে ভয় পাবার কিছু নেই।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

ভালোবাসার কবিতা

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

ভালোবাসা শব্দটাকে কাঁটার সাহায্যে
ঈষৎ আলতো চিরে দিই
দেখি তার নুনছাল ছিঁড়ে যায়, শাদা স্তরটুকু
ক্রমশ লালচে লাগে, আর ক্রমে
একবিন্দু রক্ত জমে ওঠে
সেই নুন ও অসুখ জিভ দিয়ে টেনে নিই গোপন আদরে
আমার দু'চোখ জুড়ে, হাতের আঙুলে, রুখু চুলের ভেতর
জড়িয়ে ছড়িয়ে থাকে ভালোবাসাবাসি
যেন সে ইন্দ্রের ফুল, ফুটে আছে মনোবেদনায়

কাঁটা দিয়ে বেদনার মর্মতল খুঁজি
আরো বেশি রক্তপাত হয়, জিভ দিয়ে চুষি ফের

রক্তময় ভালোবাসা চিরদিন রহস্যেই থাকে

মাটির উপমা

এ, এফ, কামরুদ্দীন আহমদ্

সোঁদাগন্ধী মাটি
এতদিন বুঝিনি
তুমি ফলবতী,
শ্যামল অংকুরে
ভরে দিয়েছো ধরিত্রী
এখন বুঝেছি,
শববাহকের খাটিয়ায়
চড়ে কবরের পথিক
আমি. জানি
এখন থেকে চিরকাল
সঙ্গী শুধু মাটি
শহরে থেকেছি তাই
দেখিনি মাটি
বুঝলাম উপমা সার্থক
সোনাই মাটি ।।

ঘাসের মাটির নিচে

নিমাই চট্টোপাধ্যায়

বুকে কী প্রশস্ত রাস্তা ছিলো পিচের।
মাঝেমধ্যে খানাখন্দ, সকলেরই জানা একপ্রকার।
কভু কবুতর মর্দানীটার রাজেশ্বরী ভঙ্গীতে
কাকও ছন্নছাড়া হয়, লাল ঠোঁট বাউণ্ডুলে টিয়া
ট্যাকড় ট্যাকড় করে উস্কোখুস্কো বেনিয়মে,
তখন উঠোনের কলে জল ঝরে অবিরত।
এখান ওখান দিয়ে পালিয়ে যায় ছুঁচো,
আর একবারে প্রজাপতি সাঁতা কথা কয়
কেষ্টকলি গোলাপ কিম্বা জবার মগডালে।
এই তো নিশান হালআমলের, কার্ণিশ বরাবর,
হাওয়ায় পত পত ওড়ে, ভাঁজ খেয়ে লুটোয় বা কখন:
এরপরই সুড়ঙ্গ—সে তো খাল কেটে কুমীর আনা নয়—
সাফসুতরো মানা কলি বাপ,—আমার সংসারই জীবন,—
মুদ্দোফরাসের পথ-ঘাসের মাটির নিচে সে-মাটি নরম।

বিজ্ঞাপনের মানুষ

ব্রত চক্রবর্তী

শহরের প্রধান সড়কের পাশে, কে বা কা'রা তাকে—
ওইভাবে ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে

বাঁ-হাত রাখা আছে একটি টেলিভিশন ... ক্যাবিনেটের ওপর,
আর হাতের ডানদিকে কয়েকটি ছন্দোবন্ধ বাক্য নিয়ে
সে দাঁড়িয়ে আছে, থাকবে যতদিন না মারণ-ঝড়, বৃষ্টি, রোদ্দুর,
বা কর্পোরেশনের নোটিশ এসে ফুঁ দেয় ওর শরীরে;
শরীরের কথা উঠলই যখন, বলতে ইচ্ছা করে ঃ

কেউ যেন ওর জন্মের পরমুহূর্তেই, একটা পাম্পের সাহায্যে—
ওর শরীর থেকে বের করে নিয়েছে যাবতীয় সুখ, সাধ, দুঃখ ও
হতাশা, এমনকি ষড়রিপুর সবচেয়ে প্রবল আলোড়নগুলি;
নিয়েছে তারাই, যারা ওর সৃষ্টিকর্তা, যারা ওর জন্মের কারণ!

ফলে, ওর আর মনে পড়ে না কিছুই; না পেয়ে পেয়ে
ও যে একটা মানুষ, সে কথাও প্রায় ভুলতে বসেছে।

শুধু চোখে খুব আশ্চর্যভাবে সক্রিয় থেকে গেছে, তাই চোখ মেলে
সে চেয়ে চেয়ে দ্যাখে এই জীবন, মানুষের ছুটে যাওয়ার, তার
থেমে পড়ার নানান দৃশ্য ও ঘটনা; আর থেকে থেকে মনে পড়ে
সেই দিনটি, যেদিন এক বিদেশী মন্ত্রী গাড়ি থামিয়ে, ওর দিকে
আঙুল দেখিয়ে বলেছিলেন ঃ ওটা কে? সঙ্গে সঙ্গে হাত
নাড়তে নাড়তে, দেশীয় মন্ত্রী বলে উঠেছিলেন, 'ও কিছু না,
ও কিছু না, ও একটা বিজ্ঞাপনের মানুষ!......'

ঢুরি আর জ্ঞানেশ্বরের ছবি
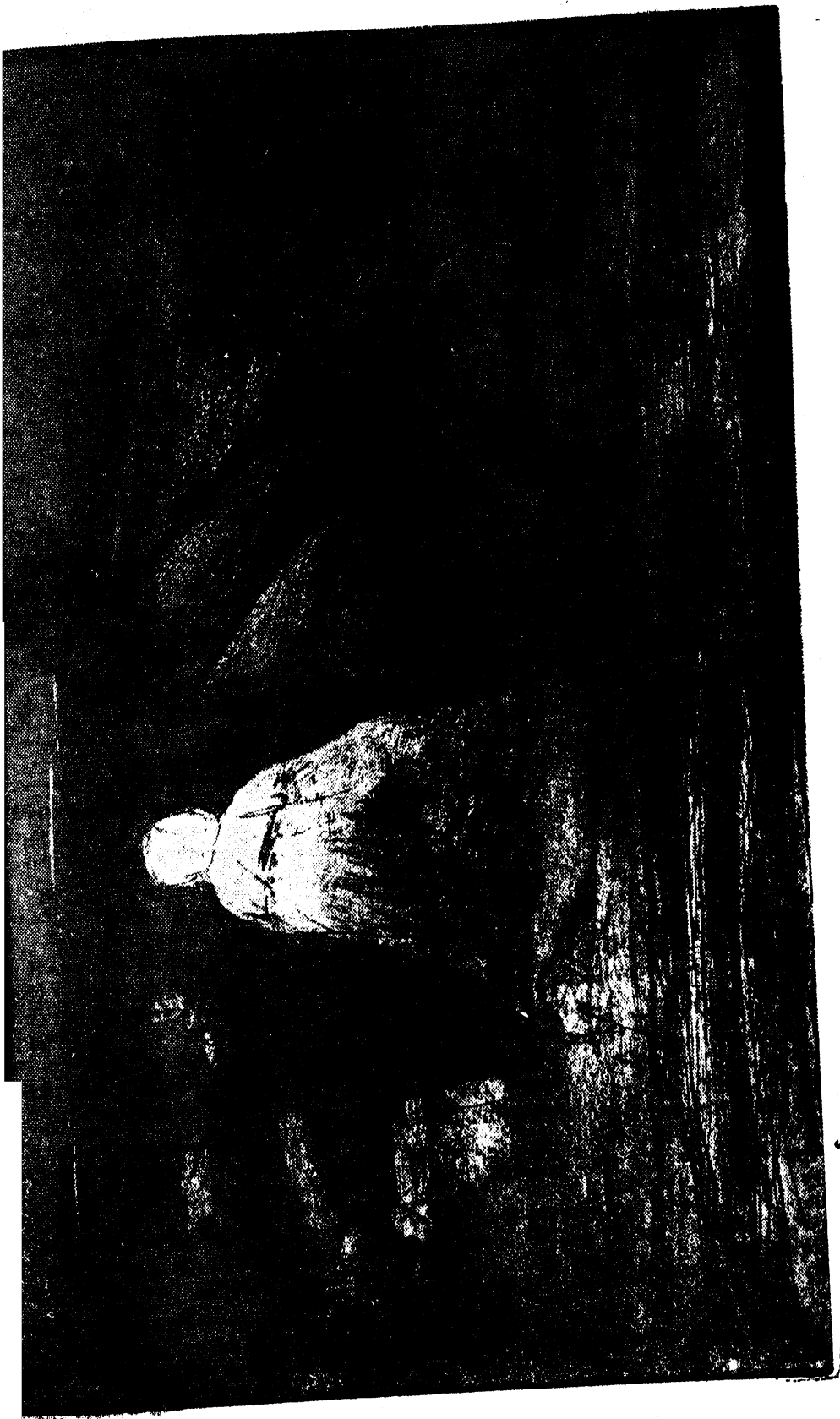
চলো—
বেড়িয়ে আসি
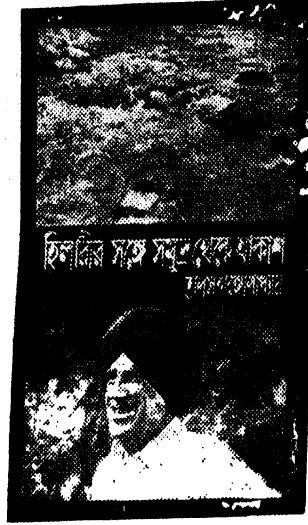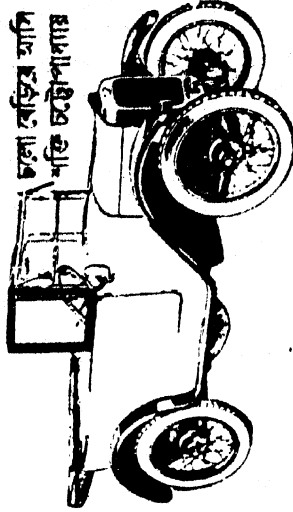
হিলারীর সঙ্গে
সমুদ্র থেকে আকাশ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

চলো বেড়িয়ে আসি—শক্তি চট্টোপাধ্যায়। মনোমোহন প্রকাশনী। ৫৪।৮, কলেজ স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম বারো টাকা।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় কবি। তিনি বেড়াতে ভালবাসেন। আর যেখানেই যান, সে সব জায়গার রমণীয় বিবরণ লিখে রাখেন। সেই সব বিবরণ যখন স্বতন্ত্র বই হয়ে বেরোয়, তার একটা স্বতন্ত্র আকর্ষণ থাকে। অনেক ঘুরেছেন। ফলে সৌন্দর্যের তুলনা বিচার করেছেন কখনো কখনো। সাগর থেকে দীঘা জুনপুট, দার্জিলিং, কালীঝোরা, ঝাড়গ্রাম, বেলপাহাড়ি, রাচী থেকে পালামৌ, জাজপুর, ফিচিং, গুপ্তেশ্বর গুহা, রোগদ, সুন্দরবন, নৃসিংহনাথের মন্দির, তরাই, জলদাপাড়া, আরো অনেক জায়গার কথা বলেছেন। আর সেই বলার মধ্যেই রয়েছে লেখকের স্বাতন্ত্র্য। যেমন—কোনারকের পুরোন ইতিহাসের সঙ্গে এসেছে তার উদ্ধারের কাহিনী, তরাই প্রসঙ্গে এসেছে বনপ্রাণী প্রসঙ্গ ও তাদের সংরক্ষণের বৃত্তান্ত, খাণীপুর ঝরিয়ালের মন্দির প্রসঙ্গ, কিচিং-এর মন্দির ও মিউজিয়াম, জাজপুরের বিরজা দেবীর মন্দির ও বরাহ মন্দির। পুরোন গেঁওখালি বন্দরের কথা—এরকম অনেক কথা আছে। যার অনেক খবর আমরা রাখি না। তমলুকের গরনাবাড়ি মুগ্ধ করেছে লেখককে। আর এর আকর্ষণীয় বিবরণও দিয়েছেন।

বেড়াবার শখ থাকে না সকলের। যারা ছুটিছাটার দিনে ঘুরতে বেরোন, তারা সব কিছু চোখ খুলে দেখেন বা দেখার আনন্দ উপলব্ধি করতে পারেন, এমন নয়। নিছক বেড়াবার শখেই বেরোন। অনেকে যেখানে ঘুরতে যান, সেখানকার ইতিহাস বা পুরাতাত্ত্বিক বিবরণ জানতে আগ্রহী। তাদের জন্য খুব ভাল বই বাঙলায় নেই। লেখার চেষ্টা যে খুব হয়েছে এমন নয়। শক্তির 'চলো বেড়িয়ে আসি' তাদের ভাল লাগবে। যেসব জায়গায় কোন ইতিহাস নেই, তাদের আছে বর্তমান। সেই বর্তমান কবির ভাষায় যেন কখনও কখনও কাব্যময় হয়ে উঠেছে। গোটা বইয়ের অনেক জায়গায় এমন কাব্যময় গদ্যের সন্ধান মেলে সব সময়। তরাইয়ের অরণ্যে শক্তির অনুভূতি :

'ভুতুড়ে অন্ধকার গায়ে মেখে
দাঁড়িয়ে থাকা অতিকায় দৈত্যের মত
শালগাছগুলোর ভেতরে ভেতরে জোনাকি
জ্বলছে।
টেনের সার্চলাইটের আলোক রেখার বাইরে
সমস্ত জঙ্গলটায় যেন
প্রেতপুরীর জমাট অন্ধকার।

বেশ বুঝতে পারা যায়—
রাত্রির তমসায় আদিম হিংসা
সজাগ হয়ে উঠেছে অরণ্যের দিকে দিকে।

হয়তো হাতীর পাল ঘুরছে দূরে
কোন পাহাড়ের পাথর গুঁড়িয়ে, ঝোপের
ভেতরে
হয়তো কোন অজগর
নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করে আছে অসতর্ক
শিকারের আশায় ;

হয়তো কোন গভীর অন্ধকার খাদের ভেতরে
জ্বলজ্বল করছে ক্ষুধার্ত বাঘের চোখ।

এমন আশ্চর্য গদ্য লেখার হাত ইদানিং খুব কমই দেখা যায়। শক্তি যে কত বড় কবি, তার ছাপ ও'র গদ্যে প্রতিফলিত।

যারা ভ্রমণকাহিনী পড়তে ভালবাসে 'চলো বেড়িয়ে আসি' তাদের মুগ্ধ করবে যারা বেড়াতে ভালবাসেন তাঁদেরও উপকা লাগবে। বইয়ের শেষে আছে কোন কিভাবে যেতে হবে, কত খরচ পড়বে, আর প্রাসঙ্গিক বিবরণ।

তাপস গঙ্গোপাধ্যায়

হিলারীর সঙ্গে সমুদ্র থেকে আকাশ—তাপ গঙ্গোপাধ্যায়। মনোমোহন প্রকাশনী কলকাতা বারো। দাম দশ টাকা।

অ্যাডভেঞ্চারের আর এক ন হিলরী—স্যার এডমন্ড হিলারী—কল্প লোকের নায়ক দুঃসাহসী হিলারী। ব মানুষের ভিড়ে সেই দীর্ঘ মানুষটির মা কখনই হারিয়ে যায় না—কেন না সে মা অবিরাম আকাশ ছুঁতে চায়। তাঁর টান ট বুকে জমাট বাঁধে পাথুরে দুঃসাহস লম্বাটে—আট হাত লম্বা মুখের কো লেপ্টে থাকে যে হাসি, সেটিকে নিঃসন্দে বলা যায় হিলারীর বিশ্বস্ত হাসি।

দুনিয়া মাতাল করা নাম স্যার এডম হিলারী। পায়ের বেগে পথ কেটে পৃথিব অনেক অজেয়কে তিনি জয় করেছেন। দী দুর্গম পথ সগৌরবে এই দুঃসাহ মানুষটির পা ছোঁয়া মাটি বুকে ধ রেখেছে। আর ধরে রাখবেই না না কেন অ্যাডভেঞ্চারের অন্য নামই যে হিলার

সাতাত্তরের আগস্টে এক বৃষ্টি ভে দিনে হিমালয়ের চূড়োয় ওঠা কিংবদন্ত হিলারী কলকাতার মাটিতে পা রাখলে মাথার মধ্যে ঠেসে এনেছেন এক নত অভিযানের মতলব—'সমুদ্র থেকে আক অভিযান'। এই অভিযানের বিষয় নিয়ে
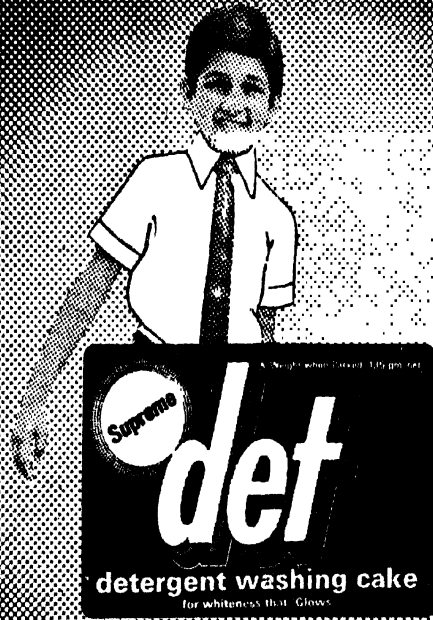
সাম্প্রতিক গ্রন্থ তাপস গঙ্গোপাধ্যায়ের হিলারীর সঙ্গে 'সমুদ্র থেকে আকাশ'।

হিলারীর জীবনের অনেক জ-বড় অভিযানের অ্যাডভেঞ্চারের তুলনায় অনেকটাই পানসে এই সমুদ্র আকাশ অভিযান স্বাভাবিক কারণেই অনেকখানি কেতাদুরস্ত পাটভাঙা পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়ে গরমের সন্ধ্যাতে হাওয়া খেতে বেরোনোর মত। অনেকখানিই রোমাঞ্চহীন আর নাটক-বিহীন। তাপসবাবু একথাটা প্রত্যক্ষে পরোক্ষে আগাগোড়াই তাঁর বইয়ে জানান দিয়েছেন। একবার তো এ সম্পর্কে সংবাদ-পত্রে তাপসবাবুর এক মন্তব্য ঘিরে স্যার হিলারী বেশ কিছুটা অসন্তোষও প্রকাশ করেছিলেন। তবু বলতে দ্বিধা নেই হিলারীর অভিযান অনেকখানিই নিস্তরঙ্গ।

যাই হোক এ অভিযানকে ঘিরেই তাপসবাবু হিলারী, তাঁর ছেলে পিটার এবং হিলারীর অন্যান্য সঙ্গী জন হ্যামিলটন, মাইক হ্যামিলটন, ডঃ মাইকেল গিল, মাইকেল ডিলন, গ্রেহাম ডিঙ্গলের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়েছেন।

হলদিয়া থেকে স্যার হিলারীর যে সমুদ্র আকাশ অভিযান শুরু তার মধ্যে প্রতি মুহূর্তেই তাপসবাবু অসাধারণ দক্ষতায় নাটক সৃষ্টি করেছেন। উপন্যাসের বীজ বুনেছেন অভিযান গ্রন্থের পাতায় পাতায়। পড়তে বসে আগাগোড়া উপন্যাস পাঠের মতই এক অদ্ভুত টান অনুভব করা—পড়া শেষ না করা পর্যন্ত সে টানের হাত থেকে রেহাই মেলে না।

তাপসবাবুর লেখা 'মানুষ গড়ার ইতিহাস' পড়েছি এর আগে। বিষয়বস্তু অনেক ভারী। লেখাটি কিন্তু তার জন্যে এতটুকু রাশভারী হয়নি। তাঁর লেখার যে সহজ সাবলীলতা তা অনিবার্যভাবেই কয়েক পাতা পড়ার পর পাঠককে কব্জা করে ফেলে। সমুদ্র থেকে আকাশেও তা আছে। তাঁর নিখুঁত বর্ণনাভঙ্গীতে সুন্দরবনের জল, মাটি, আকাশ আর বিচিত্র মানুষ জীবন্ত হয়েছে চোখের সামনে। বাঘে মানুষে লুকোচুরি খেলা যেন মনে হয়েছে সুন্দরবনকে পিছনে রেখে চোখের ওপরেই দেখছি।

সমুদ্র থেকে আকাশ যাওয়ার পথে পথে অসংখ্য টুকরো টাকরা ঘটনা। সহজ আর সরল মেজাজে সে-সব বলার মাঝে মাঝে তাপসবাবু কিছু কিছু গভীর কথাও বলে গেছেন অসম্ভব তৎপরতায়. যেমন,

'সমুদ্র থেকে আকাশ' অভিযানের অন্যতম লক্ষ্য ভারতকে জানা, গঙ্গাকে চেনা, গঙ্গার পরবর্তী জীবনধারা ও মানুষকে চেনা।....এ দেশে অর্থাৎ ভারতে এত বড় সামাজিক গবেষণামূলক অভিযানের আর কোন নজির নেই।....

....কিন্তু হিলারীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ঘুরতে ঘুরতে বার বার ককেটা প্রশ্ন আমার মাথায় এসেছে। জানতে চেয়েছি ওই অ্রইডিয়াকে কিভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে? দলের সদস্যদের কার কী বিশেষ যোগ্যতা? কে কী ভাবে এই অভিযানের জানা চেনার পর্বটিকে সার্থক করে তুলছে?....

হিলারীকে নিয়ে মোট সতেরোজন সদস্য। এর মধ্যে পাঁচজন ফিলমের ক্যাপটেন কোহলি ও কম্যানডার যোগীন্দর সিং সমেত সাতজন পর্বতারোহী। জিম উইলসন পর্বতারোহীও বটে আবার জেট বোট ড্রাইভারও।....ভাটিয়া পুরোপুরি ব্যবস্থা-কারী, খাদ্য, পানীয়, বাসস্থানের ব্যবস্থাপক। সারিন প্রাক্তন আই, সি, এস।
তা হলে কে নদীবিশেষজ্ঞ? কে সমাজ-বিজ্ঞানী? কে নৃতত্ত্ববিদ? কে বা ভারত-তত্ত্ববিদ? কে ভৌগোলিক? কে উদ্ভিদবিজ্ঞানী? আর কেউ বা ভূতত্ত্ববিদ?

রাজভবনে স্যার এডমন্ডের স
সম্ভাষ বিবরণ দিতে গিয়েও তাঁ
তেমনই একটা জব্বর প্রশ্ন রেখেছেন
উক্তি থেকেই তা স্পষ্ট—'রাজ
দোতলায় দরবার কক্ষে বিকাল
অনুষ্ঠান। গিয়ে দেখি রাজ্য স
বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ অফিসার,
কাগজের সম্পাদক এবং কলকাতার
মহলের তাবং ভদ্রমহোদয় ও ভদ্র
উপস্থিত। সরকারী অনুষ্ঠান
সরকারী অনুষ্ঠানে হিলারীরা এসেছে
ফরমাল ড্রেসে'। অথচ দিল্লিতে নি
ল্যান্ডের হাই কমিশনারের ডাকা পা
হিলারীদের চেহারা কিন্তু অন্য
লেখকের উক্তিই তুলে ধরছি,
কমিশনারের পার্টিতে অভিযাত্রীরা :
চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সেজে
গেলেন। নিখুঁত টাই-এর নট। অথচ
কলকাতায় রাজভবনের সরকারী সম
অনুষ্ঠানে হাফ প্যান্ট পরে, সার্টের
খুলে বা গেনজি গায়ে চাপিয়ে হা
হয়েছিল।'

থাক এসব কথা। এসব ছাড়ি
অনেক কিছু অমূল্য পাওয়া গেছে স
আকাশ অভিযানে। আর তাই বই শেষ ক
ভোলা যায় না মানুষ হিলারীকে। দু
অভিযাত্রীর দুর্মদ বুকের কাঠামোয় লু
থাকা সেই মানুষ চেহারাটিকে। যিনি
মরা ছেলে পিটারকে অভিযান-সঙ্গী
নিতে ভোলেন নি। তাঁর স্নেহশ
চেহারাটি সেখানে দুর্জয় মানুষটি
মুহূর্তে এক স্নেহশীল পিতার চেহা
ফিরিয়ে দেয়। ভোলা যায় না গোর
ভুইঞাকে। পাহাড় চড়ার ট্রেনিং নি
গিয়ে যে এক শয্যায় স্বয়ং হিলারীরই
ছিল। কুলতলি ফরেস্ট অফিসে গ
শিয়োর সে সাক্ষাৎকার মনে দাগ কা
কখনই ভোলা যায় না সুন্দরবন এলাক
মইপীঠ গ্রামের চুরাশী বছরের
ভিক্ষুক দামোদর মিস্ত্রেকে। আকাশ
ছুঁই চেহারার হিলারীর বুকের কা
দাঁড়িয়ে যিনি হিলারীকেই খুঁজছিলে
দৃষ্টিহীন চোখ মেলে। সব অভিযানই
হয়। হিলারীর সমুদ্র আকাশ অভিযান
শেষ হয়। আর সব শেষ হওয়ার পর
লেখকের মত আমারও চোখে ভেসে থাকে
এক দুর্জয় হিলারীর চেহারা। আর মনে
হয় এই বামনযুগেও কেমন করে একজন
অন্তত অতি মানব হেঁটে চলে বেড়াচ্ছেন
সেই মুহূর্তে এই ভেবেও বিপদ ছায়া ফেলে
যেদিন সেই অতি মানব থাকবেন না সেদিন
পৃথিবীর কি হবে। প্রকৃতি কি সেদিন বড়
নিঃস্ব হয়ে পড়বে না? নতুন আর কোন
হিলারী কি আমাদের সামনে আসবেন
আবার?

বই দুটির সমালোচনা করেছেন
কমল চৌধুরী ও বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠিপত্র

অসার অর্থহীন অবিদ্যা

১৩ জানুয়ারীর অমৃতে সঙ্গীত রচনার ভাবা সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা। শুধু এইটুকু জুড়ে দিতে চাই কেবলমাত্র সঙ্গীত সমালোচনা নয়, নৃত্য া এমন কি চলচ্চিত্র ও নাট্য বিষয়েও কার অসার অর্থহীন অবিদ্যা ল চালু রয়েছে। বেশির ভাগ াই সমালোচনার নামে এই আবর্জনা হয়। সংবেদন আছে, বুদ্ধি আছে, শরি বিষয়ের ওপর অধিকার আছে লোকের হাতে না পড়লে সমালোচনা ্যাকারণকে সওয়ার করে মননের মণি-য় নান্দনিক বিস্ময়' হয়েই থাকবে।

আচ্ছা, বাংলা সংস্কৃতি কি অনাথ ? গার্জেন নেই ? এইসব সমালোচনার ের অত্যাচার থেকে বাঁচাব উপায় কি

ুণ সেন, ৪নং ডোভার রোড, কাতা-১৯।

মন ভরল না

পরিবার পরিকল্পনা আজকের ভারত- একটি অতি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্যা যেমন ভয়াবহ তেমনি সমাধানের পথটিও অত্যন্ত কঠিন। জানুয়ারী অমল আচার্য-এর 'ছোট ার সুখী পরিবার' এরই ওপর একটি। আলোকপাত। লেখাটি পড়ে মন লা না। না আছে বিষয়বস্তুর গভীরতা আছে তথ্যের প্রাচুর্য। হাল্কা চালে ক তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। সুখ যে পক্ষিক—এতো সরল সত্য। এর জন্য কথার প্রয়োজন ছিল কী ? বর্তমান তের মোট জনসংখ্যা কত ? ভারতের তনের তুলনায় এই জনসংখ্যার অনুপাত রকম ? জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারই বা ন ? এই হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লে আগামী দিনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার ক্রিয়া কেমন হবে ইত্যাদি বহু প্রশ্নের অনুচ্চারিত থেকে গেছে। সুখ বলতে ন যা বুঝিয়েছেন, তা সংকীর্ণ অর্থে। াপনে ব্যবহৃত সুখের পৃথক একটি আছে। ভারতের লোকবল যদি রোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে তবে শিক্ষা, কৃতি, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি বহুবিধ ্দার যোগান এক সময়ে আমাদের পক্ষে কর দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে এবং এই ীতিকর অবস্থার যাতে সম্মুখীন না হয় তারই জন্য এই সতর্কবাণী। তের জাতীয় চরিত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ারটা তাই মোটেই সুখের নয়। তাছাড়া ট পরিবার সুখী পরিবার' শ্লোগানের অন্য একটি ইঙ্গিত বলে তিনি যা উল্লেখ েছেন তাও অতি গৌণ। এর জন্যে গ্রামে মে পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র খোলার ার হয় না। বছর বছর সরকারকে একটি বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয় করতে হয় না। প্রত্যেক মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট থেকে জরুরী নির্দেশ দিলেই তা যথেষ্ট ছিল। লেখক নিজেও বোধহয় তাঁর বক্তব্যের প্রতি আস্থাশীল নন। তাই পরেই লেখেন; '..... শহর নগরের মানুষ অনেক সচেতন। তারা প্রচার প্রোপ্যাগান্ডার অপেক্ষা করেন না।' তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী 'ছোট পরিবার'-ই সুখের অন্যতম মাধ্যম নয়। এবং আকারে ইঙ্গিতে তিনি তাই বলতে চেয়েছেন। এই সঙ্গে স্মর্তব্য অমরেন্দু চক্রবর্তীর 'ঘরে ঘরে' লেখাটি। ব্যবহৃত শ্লোগানটিকে বিদ্রূপ করার জন্যই যেন তাঁর কলম ধরা। এরই জন্যে নীলাক্ষকে অকালে আকস্মিকভাবে বিষণ্ণতায় মৃত্যুবরণ করতে হয়। আর তারই জন্য সীমার বারবার ডায়াল করতে ভুল থেকে যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল, একান্নবর্তী পরিবারে কী দুর্ঘটনা ঘটে না ? সেখানকার সমস্ত মৃত্যুই কি সুখের ? গল্প তো এমন ভাবেও বানানো যায় যেখানে একক পরিবারের উৎকর্ষতাই পরিশেষে প্রাধান্য পাবে। আমি যৌথ পরিবারকে কটাক্ষ করি না। সুখ-

সুবিধা, ব্যথা-বেদনা দুটো পরিবারেই সম-পরিমাণে সহাবস্থান করে। আমার শুধু এইটুকুই অনুরোধ, এই ধরনের লেখা ভবিষ্যতে যাতে আরো যুক্তি ও তথ্য নির্ভর হয় সেইদিকে সম্পাদকমশাই যেন দৃষ্টি দেন।

উদয় বড়ুয়া, কলকাতা-৯।

বুদ্ধিহীন স্নবারিও বড় সমস্যা

'স্বাতী' ছবির সমালোচনায় আপনাদের সমালোচক ছবিটি ভাল বলেছেন সেটা সুখের কথা. 'স্বাতী' একটি শুধু ভাল ছবি নয়—গত কয়েক বছরে শিল্প শোভন, লাবণ্যময়, এমন ছবি বাংলা চলচ্চিত্রে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সমালোচকের কয়েকটি মন্তব্য সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। সমালোচক, গ্রামের বর্ষণ-মুখর অন্ধকারে নায়িকার মুখে ইংরাজী গানের প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে বলেছেন এর কৈফিয়ৎস্বরূপ পরিচালকেরা নায়িকার কলকাতার স্বচ্ছল জীবনের ছবি দেখিয়েছেন। সমালোচকের যদি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল গল্পটি পড়া থাকত তাহলে তিনি দেখতেন এটি পরিচালকের নয়, লেখকেরই কৈফিয়ৎ। নায়িকার মার্জিত ব্যবহারে বিস্মিত নায়কের কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছিল নায়িকার সমৃদ্ধ শহর জীবনের কথা—যেটা জানার পর নায়ক নায়িকার বর্তমান অবস্থায় মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। গ্রামের এই পরিবেশে নগর জীবনের স্মৃতির অনুষঙ্গে ইংরেজী গান শুধু নাটকীয় নয়, পরিচালক গোষ্ঠির কল্পনার পরিচায়ক।

সমালোচক আরও লিখেছেন ডি এম'র বাড়ির পার্টিতে গ্রাম্য মাতব্বরদের ধুতি চাদর না পরিয়ে পরিচালকরা ভুল করেছেন। এটাও সমালোচকের ওই ধরনের সমাবেশ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক। ডি এম'র বাড়িতে যাঁদের দেখা যায় তাঁরা সকলেই পরিচিত হয়েছেন উচ্চপদস্থ সরকারী জেলা অফিসাররূপে— যাঁরা স্বাভাবিকভাবেই প্যান্ট সার্ট পরতেই অভ্যস্ত। আজকাল আমাদের দেশে নিছক বিয়ে পৈতের মত সামাজিক অনুষ্ঠানেও ধুতি পাঞ্জাবী কজন পরেন ? আর সার্ট প্যান্ট পরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া যায় না তার জন্যে উড়ুনী চাদর পরতে হবে—এ যুক্তি এখন নেহাৎই হাস্যকর নয় কি ?

সমালোচকের গান ভাল লেগেছে অথচ দুটি ভাটিয়ালী ছাড়া অন্য গানের ব্যবহারের ঔচিত্য সম্বন্ধে প্রশ্নও তুলেছেন। জীবন এবং শিল্পে গণিতের উচিত অনুচিতের হিসেব খাটে না—সেখানে রসের নিয়মই চলে। গান তখনই শিল্প হয় যখন তা মন ভরে দেয়—সেটার সঙ্গে পরিবেশ এবং প্রয়োজন একাকার হলেই তা সার্থক হয়—'স্বাতী' ছবিতে সেটা হয়েছে।

'স্বাতী' ছবিতে যা আছে তা হল ধ্রুপদী সারল্য আর মরমী কবিতার মাধুর্য রস,—যা নেই তা হল, রসহীন বুদ্ধির নির্বোধ কালোয়াতি—যেটা কোন শিল্পেই ধোপে টেঁকে না। রুচির অবক্ষয় আর শিল্প মানের অবনতিই বাংলা ছবির একমাত্র সমস্যা নয়, বুদ্ধিহীন স্নবারিও একটা বড় সমস্যা। সঞ্জয় রায়, কলকাতা-৭০০০০৭।
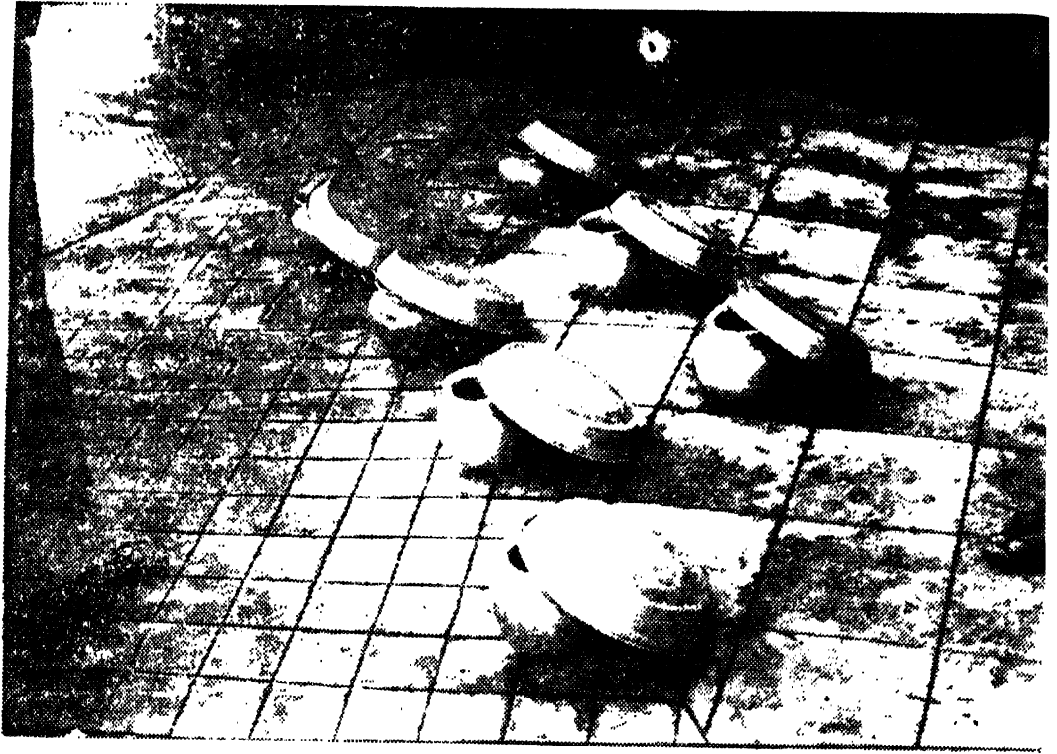
এই মজুরীতে চলে ?

তরুণ চৌধুরী

—কি বললেন ? কাগজ থেকে এসেছেন ? আমাদের নিয়ে লিখবেন ? আপনাদের মতো মানুষ আর দুনিয়ায় দ্বিতীয় নেই। মাসের দশ থেকে পনেরোদিন অনাহারে অনিদ্রায় দিন কাটে। কাপড়-চোপড়ের অবস্থাতো দেখছেন। ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে করে চালাচ্ছি। লজ্জা তো আর অনাহারের সঙ্গে বিসর্জন হয় নি। আর ঘরের অবস্থা তো দেখছেন। এই ঘরেই রান্নাবান্না, খাওয়া-দাওয়া, রাতের শোয়া, এই ঘরে বসেই দুঃখ করা, এই ঘরেই মাসের প্রথম সপ্তাহ সুখেশান্তিতে কাটানো। জুত করে লিখতে পারলে জমে যেতে পারে আপনার লেখা। এরকম অনেকেই আমাদের নাড়ীনক্ষত্র জেনে নিয়ে বেশ ভালোই নাম করেছে, পয়সা জমিয়েছে।

বাজার হাটে আপনারাও তো ঘোরেন। বলুন না জিনিষপত্রের যা দাম তাতে কি করে সংসার চলে। আলু আমাদের প্রধান সবজি। আর কিছু না হোকআলুটা প্রথমেই গিয়ে কিনতে হয়। মাসের শেষের দিকে আলুর জায়গায় কুমড়ো আসে। কিংবা সময়ের শাকসবজির সময়ে সবচেয়ে কম দামের সবজিই আমাদের প্রধান খাদ্য হয়ে ওঠে।

এই কলকাতা শহরে বসেই এই ধরণের কথাবার্তা লেনদেন হচ্ছিল নিম্ন আয়ের বেশ কিছু মানুষের সঙ্গে কলকাতা কি সত্যিই একটা বিশাল কর্মমুখর শহর ? নাকি কলকাতা আসলে একটি আগোছালো বড়ো গ্রাম। আমরা এখনো মনে মনে একদম ভেতর থেকে—গাঁয়ের মানুষ ? এ প্রশ্ন স্বভাবতই এই প্রসঙ্গে উঠে আসে। কেননা আমরা জানি শহরে যারা বাস করে তাদের অনেক পয়সা। দারিদ্র তাদের ছুঁতে পারে না। মাসের প্রথমে খুব ভালো ভালো টাকার মাইনে পায়। তাদের আবার অভাব কিসের ? কিন্তু উপরের অভিযোগ যাবে কোথায় ? এরাও তো জোবচার্নকের শহরেরই মানুষ।

এই কলকাতায় নানারকমের মানুষ ভাড়া বাড়িতে বাস করে। নানা উপায়ে এরা জীবিকা অর্জন করে, বেঁচে আছে। এক বুড়ি হিন্দুস্থানী কথায় কথায় বলে ফেলেছে তার দৈনিক আয় চার টাকা থেকে পাঁচ টাকা;

বিচিত্র মানুষ। বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে একপা করে এক একটা পুরো দিন লোপাট করছে শক্ত হাতে। প্রায় প্রত্যেকের কণ্ঠে হতাশার সুর, ভাঙা রেকর্ডের মতো বেজে যায়। শৈশবের স্বপ্নের সঙ্গে কোনো মিল তখন আর খুঁজে পায় না। ঠিক কতজন বাড়ি কিংবা অফিসের গেটে বন্দুক হাতে ড্রেস পরে দারোয়ানী করে, কতজন ঠিকে ঝি কাক ভোরে বিছনা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে বাবুর বাড়ির দরজায় কড়া নেড়ে ডাঁই করা 'কালকের বাসন' কলতলায় নিয়ে গিয়ে মাজতে বসে, ঠিক কতজন শ্রমিক তাদের যোগ্যতা অনুসারে শারীরিক আর মানসিক শ্রম দিয়ে দুবেলা দুমুঠো অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করে, কতোজন বারবনিতা সন্ধ্যে থেকে সারারাত দেহ দান করে উপার্জন করে, কতজন শিক্ষক আদর্শের জন্যে ছাত্র গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করে আছেন, ঠিক কতোজন নারীপুরুষ বিভিন্ন সময়ে সামান্য মজুরির বিনিময়ে নানান রকম কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে—তার সঠিক হিসেব আমরা কেউ জানি না। জানবার চেষ্টাও করি না। প্রত্যেকেই এক একটা বৃত্ত রচনা করে তার ভেতরেই আব-

ধ্বনিত হচ্ছে: এক ঘেয়েমী, হতাশা, ঈর্ষা, হিংসা, অভাব সব মিলিয়ে একখানা ভাঙা রেকর্ড। সেই একই সুর সব কণ্ঠে ধ্বনিত হয়।
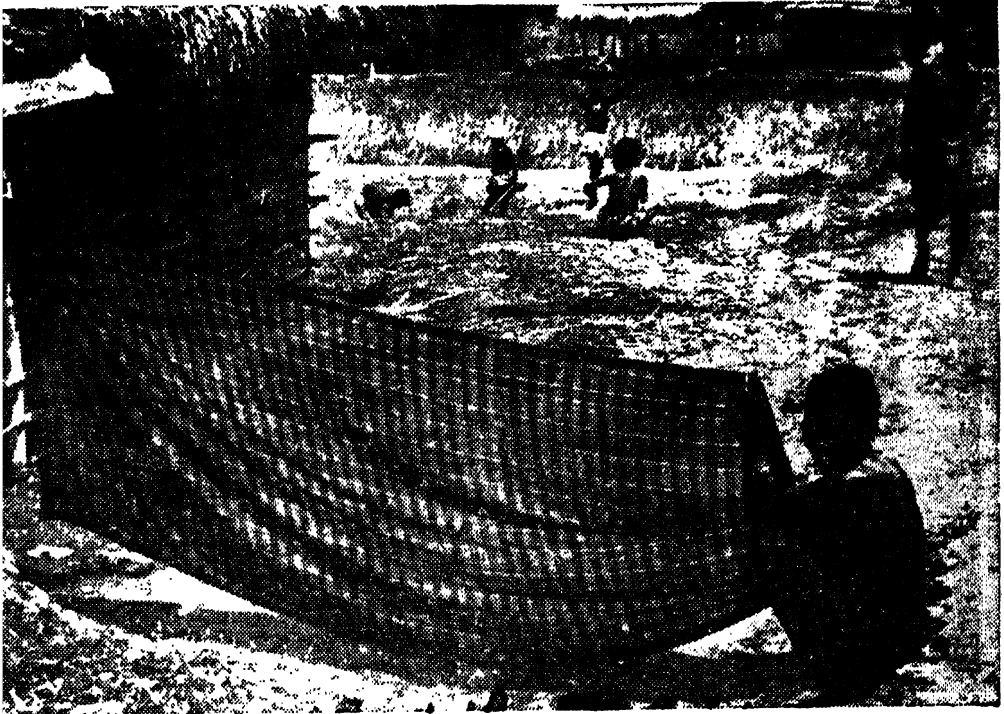
সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে আমার খুব ছোট্ট একটা প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছিলাম, 'এই মজুরিতে চলে?' খুব সোজাসুজি কোনোরকম ভণিতা না করে আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে গিয়েছেন তাঁরা। সঙ্গে চা বিস্কুট আনিয়েছেন, কেউ কেউ দুপুরের খাওয়ার নিমন্ত্রণও করেছেন। এতো অভাব অনটনের মধ্যেও তাঁরা তাঁদের বাঙালী পরিচয়টুকু ভুলতে পারেন নি। বাঙালীর আতিথেয়তা যে বিদেশী না পেয়েছে তার কাছে খুব বড়ো মাপের অভাব থেকে গেল।

ঠিকে ঝি আর চাকরদের সংসার

গোবিন্দ ব্যানার্জী লেনের পুরোনো বাসিন্দারা গীতাকে চেনে। ছোটবেলায় রাস্তার উপরে ছেলেদের সঙ্গে গুলি খেলত। পাড়ার প্রায় প্রত্যেকেরই সারাদিন ফাইফরমাশ খেটে দিত। বাড়ির কর্তা টিউবওয়েলের জল খেয়ে তৃপ্তি পান—কে আবার লাইন দিয়ে বস্তির মধ্যে ঘটর ঘটর করে হ্যাণ্ডেল করতে করতে এক কলসি জল নিয়ে আসে? গীতা আছে। চায়ের দোকানে আঠারো থেকে পঁচিশ বছরের ছেলেরা সিগারেট না থাকায় আড্ডাটা জমাতে পারছিল না। গীতা হয়তো দোকানের সামনে দিয়ে গত রোববার মাসির সঙ্গে দেখা হিন্দী ছবিটার সুর ভাঁজতে ভাঁজতে যাচ্ছিল। ছেলেরা ডাকল। গীতা সিগারেট এনে দিয়ে ওদের আড্ডা পুনরুজ্জীবিত করল। গীতার ছোটবেলার স্বপ্ন ছিল ও বড়ো হয়ে সিনেমায় নামবে। অভিনয় করবে। দু'একটা বাংলা ছবিতে এক্সট্রা হিসেবে ঝি-এর অভিনয় যে না করেছে তা নয়। তবে সেই পর্যন্তই। আর বেশীদূর সেসব এগোয়নি। শেষ-মেষ ওর বাবার মৃত্যুর পর ওর মার হাত ধরে বাড়ি বাড়ি ঠিকে ঝি-এর কাজ করতে লাগল। সকাল-বিকেল ঠিকে ঝি-ওরা কাজ করে। বছর উনিশ বয়স। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই ওর শরীরে যৌবন এসেছে। সারা মাসে মায়েবেটীতে দু'দেড়েক টাকা রোজগার করে। কোনরকমে চলে যায়। ঘর ভাড়া পনেরো টাকা, লাইট পাঁচ টাকা, জমাদারকে দুটাকা, মাসে পঁচিশ টাকা সিনেমা দেখে—হাতে শ'খানেক টাকা থাকে। ওতেই কোনোরকমে চলে যায়।। গীতার আক্ষেপ, 'আমরা তো আর লেখাপড়া শিখিনি, আমাদের জীবনে আর কিই বা আছে। বিয়ের কথা বলতে ওর মার মুখ বন্ধ করে দিল গীতা। গীতা বলল, মুখপোড়া মিনসেদের মুরোদ নেই এক পয়সার আবার বিয়ে করতে চায়। ট্রানজিস্টার রেডিও চায়, হাত ঘড়ি চায়, আবার একটা সাইকেল চায়। আমাদের অতো পয়সা কোথায় —বিয়ে না হয় না হবে। বছরে ছটা বাড়ি থেকে জামাকাপড় যা পায় সারা বৎসর তাতে চলে যায়। ছোট বোনকে দেয়—নিজে পরে, মাকে দেয়। ওর মাও কয়েকটা বাড়ি থেকে পায়। আমি বললাম, আজ কি রান্না করলে? গীতা চকিতে মুখ ঘুরিয়ে নিল। ওর ছোট বোন সুন্দরী বলল আজ কিছু রান্না হয়নি। সকালে যা কয়েকটা বাসি রুটি পেয়েছিল—তাই ওরা সবাই ভাগ করে খেয়েছে। এরকম মাসের শেষ সাতদিন হয়ই। রেশন তোলার টাকা থাকে না। এই-ভাবেই চলছে। অস্বস্তি হয় রাগ হয়, কিন্তু কোনো উপায় থাকে না। গীতা খুব মুখ ফোঁড় মেয়ে, যখন-তখন যাতা বলে দেয়। ওর মা সীতা দাস কিন্তু একেবারে অন্য মানুষ। মনটা খুব চঞ্চল, মেয়েদের মুখে এক মুঠো ভাত তুলে দিতে না পারলে কাঁচে বাঁধানো কালী ঠাকুরের সামনের মাটিতে কপাল ঠোকে। ঠাকুরকে ডাকে।।

এদেরই সমগোত্রীয় বিশ্বাস পাড়ার যমুনা মণ্ডল একেবারে অন্য কথা বলল। বছর দুয়েক হলো সেই শাস্তিটা পেয়েছে। হাফ সেঞ্চুরী পার করে দিয়েও কর্মক্ষমতা একটুও কমেনি। কালো দড়ি পাকানো চেহারা। চোখ দুটো কোটরগত। মাথায় কাঁচাপাকা ছব-ছাঁট চুল। লাল কাপড়, নীলচে রঙের কয়েকটা তাপ্পি মারা ব্লাউজ গায়ে। ভোর পাঁচটায় ওঠে—সাড়ে পাঁচটায় ছেলের বউ চা করে দিলে, দুটো বাসি রুটি খেয়ে বেরিয়ে পড়ে। আগে থাকত সিকারী

পাড়ার বস্তিতে। তাই-তার কাজকর্ম সব এদিকেই। আনওয়ার শাহ রোডে বাড়ির কাছে কোনো বাড়ির কাজ ধরেনি। ছটা বাড়ি আর সাতটা চায়ের দোকানের কাজ সারতে সারতে সূর্য মাথার উপরে উঠলে বাড়ি ফেরে। ছেলের বউ বাড়িতে বসে রান্না করে। ঘর সামলায়। কোলের বাচ্চাটাকে নিয়ে ঝামেলা হলেও শান্তি আছে। ছেলে বিনোদ মায়ের আয়ের পয়সায় স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে রেশন দোকানের স্লিপ লেখে। যমুনা খেটেখুটে বড়ো মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে মেয়েটি বিধবা হলে নিজের কাছেই রেখেছে, আর একটা বছর চোদ্দর আইবুড়ো মেয়ে আছে। একশ টাকা ঘর ভাড়া দেয়। লক্ষ্মীকান্তপুরে চার বিঘে জমিতে চাষ করে বছরের খাওয়া উঠে আসে। মাসে একশ আশি টাকা রোজগার করে। ডালভাতের অভাব হয়না। মুদিখানার দোকানে দেনা করতে হয়না। ছেলের রোজগারে খায় মা। এই যমুনা মন্ডল স্বামী মারা যাবার পর কি কষ্টই না করেছে। একেকদিন পাঁচ মিশেলী আনাজের ঝোল খেয়ে, ছেলে-মেয়েদের খাইয়ে বড়ো করেছে—মানুষ করেছে। ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছে। আগের তুলনায় এখন আর তত খারাপ নেই। আগে লম্ফ জ্বালাত। এখন ঘরে ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলে। ট্রানজিস্টার বাজে। ছেলে বাসনে এমব্রয়ডারী করে বাঁধিয়ে রেখেছে 'পতি পরম গুরু।'

উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলার রাজেন ধন আমাকে দেখতে পেয়েই খইনি খাওয়া দাঁত একগাল হেসে দাঁড়িয়ে পড়ল—রাস্তার মাঝখানে। সেই নীল জাঙ্গিয়া, হাঁটু থেকে কাল্পনিক দুটো শাড়িকারে কোমরে গোঁজা। খালি গা। কোমরে গামছা বাঁধা। মাথার কোঁকড়ানো ঝাঁকড়া চুল। পঁয়তাল্লিশ টাকার মাইনেতে এক বাড়িতে চাকরের কাজ করে। দুবেলা খাওয়া, জলখাবার আর রোজের চারআনা পয়সা বরাদ্দ। চারআনা বিড়িই লেগে যায়। অভাব পুরোদস্তুর তার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে। জিগ্যেস করলাম, পঁয়তাল্লিশ টাকা তোমার ছেলে বউ নিয়ে চলে যায়? প্রত্যুত্তরে রাজেন বাংলা ওড়িয়া মিশিয়ে ভাষায় বলল, তা কি করে চলবে। অভাব তো লেগে আছে। খুব ঠেকায় পড়লে বৌদির কাছে হাত পাতে। বৌদি খুব ভালো মানুষ। দিয়ে দেয়। রাজেন মাসে মাসে সেই টাকা শোধ করে দেয়। বাড়িতে চাষবাসের জমি আছে। বললাম, চাষ করতে পারতো তাহলে আর এই অভাব থাকে না। কিভাবে চালাচ্ছ। ও বলল ছোটবেলায় এখানে এসে পড়েছি। চাষ করতে জানি না। অত খাটতে পারিনা। বিয়াল্লিশ বছরেও যখন অভ্যেস হলো না, এখন আর ওসব চাষবাস হবেও না। আমি জিগ্যেস করলাম, আচ্ছা তোমাকে তোমার অভাবের কথা ভেবে যদি বলা হয়—টাকা দেওয়া হবে তোমাকে তুমি ব্যবসা কর। মাথা নেড়ে খুব লজ্জার সঙ্গে বলল, পয়সা ঠিক মতো গুণতে পারি না।

একই গ্রামের গৌর নায়েক বলল, টিউব ওয়েলের কাজ শিখব বলে কলকাতায় এসেছি। ওর বয়স বছর পঁয়ত্রিশ হবে। রাজেনই সেবার গৌরকে নিয়ে এসেছে কলকাতায়। বাবুদের বাড়ি কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। গাঁয়ের এক কলের কাজ জানা লোককে বলে রেখেছে। সুযোগ হলেই ওকে নিয়ে যাবে কথা দিয়েছে। যেকদিন অন্য কাজ না পায় সেকদিন এখানেই কাটাবে ঠিক করেছে। দুপুরের দিকে ওর ছুটি। ছুটিটাকে নষ্ট করে না তাস খেলে কিংবা আড্ডা মেরে। একেবারে সোজা খেলার মাঠে চলে যায়। একবার মর্দেকা পুরস্কার খেলা দেখার পর ও মোহনবাগানের সাপোর্টার হয়ে গেছে। এবারও ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা দেখতে মাঠে গিয়েছিল। মোহনবাগান হেরে যাওয়ায় ও দুদিন না খেয়ে ছিল দুঃখে। মাস মাইনে কুড়ি টাকা। হাতখরচা কুড়ি পয়সা বিড়ি খাওয়ার জন্য। দুবেলা খাওয়া জল খাবার আর মাঝে মাঝে বকশিস পায় চলে যায় কোনরকমে টেনেটুনে। হাতখরচ মাইনে থেকে খুব বেশী হলে পাঁচটাকার বেশী করে না। পনেরো টাকা মাসের তিন-তারিখে ময়ূরভঞ্জে ওর মা'র নামে পাঠিয়ে দেয়। বাড়ীতে তিনভাই, বিধবা মা, আর দুভায়ের দুবউ। গৌর বিয়ে করেছে। কিন্তু ওর কোনো সন্তানাদি নেই। ওদেশে চাকরের কাজও পাওয়া যায় না, জায়গাজমি নেই যে চাষবাস করবে। খুব অভাব। কোনরকম উপায় বার করতে না পেরে অবশেষে এই কোলকাতায়। এখানে তবু কিছু না কিছু করে খেয়ে পরে বেঁচে থাকা যায়।

রাঁধুনি কাম দারোয়ান কাম ড্রাইভার

কথা হচ্ছিল এক বৃষ্টির দিনে মুদিয়ালীর ধোপার কারখানায় কমল রাইয়ের সঙ্গে নেপালবাসী বলিষ্ঠ চেহারার ফর্সা রঙের কমলের বয়স ত্রিরিশ। বত্রিশ হবে। সঠিক বয়স প্যানথার জেলায় ওর বুড়ী মা বলতে পারে। লন্ড্রী থেকে কাপড় নিতে এসেছিল। ফিরে গিয়ে গ্যারেজ থেকে গাড়ী বার করে সাহেবকে নিয়ে যেতে হবে অফিস। মেমসাহেব তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে বলেছে গাড়ী নিবে। কোথায় যেন আজ বেরোবে। রান্না করে, গাড়ী ড্রাইভ করে বাড়ী পাহারা দেয়, বাইরের কাজ কর্ম সব করে। মাস গেলে একশ পঁচিশ টাকা হাতে পায়। তবে উপরি আছে। নয় তো কি করে চলবে। তবে যতই উপরি পাক মদ খাওয়ার মতো যথেষ্ট পয়সা পায় না। দেশে গেলে প্যানথার জেলায় ওর নেশা করার অভাব হয় না। যেকোনো বাড়ীতেই ভাত কিংবা গম পচিয়ে গরম করে একধরণের মদ তৈরী করে—যার নাম রক্সি, ওদেশে খুব বিখ্যাত। অল্প পয়সায় লোকদের এতো কম দামে আর কেউই এতো ভালো মদ দিতে পারে না। বিয়ে করেছিল উনিশ বছর বয়সে। বউ মারা যাবার পর আর বিয়ে করেনি। দেশে জায়গাজমি সামান্য আছে। বাড়ী থাকতে মন টিকত না। তাই ডাগা হাতে করে বেরিয়ে পড়েছে। দিল্লী, হরিয়ান

াব, উড়িষ্যা, রাজস্থান কোথায় না থেকেছে। যখন যে কাজ য়েছে সেই কাজই করেছে কলকাতায় এলো কেন? আমি ওকে গ্যেস করলুম। ও বললো এতো ভালো জায়গা আর হয় না। ানে অনেক বন্ধুরা থাকে। দেশের খবরা খবর পেতে এখান থেকে ী দেরী হয় না। কমলা তো সোজাসুজি অভিযোগ করেই বলল, লী থেকে প্যানথার জেলায় চিঠি যেতে যেতে মাস ঘুরে যায় ু চিঠি যায় না। খুব মন খারাপ লাগে। এখানে সেই সুবিধেটা র ভালো। সরকারী কাজ পেলে এখনও ও করতে রাজী। তবে বেসর-ী অফিসে ও আর কাজ করতে রাজী নয়। খাটুনী বেশী, মাইনে -মাসের শেষে পেট চলে না। বন্ধুদের কাছে, পরিচিতদের কাছে ত পেতে দাঁড়াতে হয়। খুব লজ্জা করত। কিন্তু উপায় কি। উ তো আর এতোসব বোঝে না দেনার পর দেনা বাড়াতেই লাগল নেকে দিন। এখন সেসব কোনো সমস্যা নেই। দুবেলা খেতে পায়, াশাসে হাতখরচ চলে। আর মাসের মাইনেটা প্রায় মাসেই পুরো-ুরি থেকেই যায়। দেশে খুব অভাব। যখন যেমন পারে পাঠায়। মনা কমল বলল, বিদেশ বিভূঁইয়ে কখন চাকরী চলে যাবে তার ানো ঠিক আছে। তখন খাব কি। কোন কাজ না পেলে বাড়ী রব কি করে। তাই ও প্রত্যেক মাসেই কিছুনা কিছু জমায়।

তপনকে এই শহরের লোকজন কিছুদিন ধরে দেখে অসছে। াধে মই, সাইকেল চালিয়ে চৌরঙ্গীর ল্যাম্পপোস্টের সুইচ টিপছে যুবকটি। ওর বয়স সাতাশ, চুঁচড়া পোস্টাপিসের এলাকায় ওর র ঘরে ভাইবোন আর মাকে নিয়ে ছজন বাস করে। আটষট্টি সালের াটর্স গ্র্যাজুয়েট। এখন ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের দারোয়ান। াসে দুশ চুরাশি টাকা পায়। দিদি টিউশনি করে ষাট টাকা পায়। ই ওদের সারা মাসের আয়। এই বাজারে পঞ্চাশ টাকা ঘর ভাড়া, ঁচিশ টাকা লাইটভাড়া, ভাইদের স্কুলের পড়াশুনো চলে কি করে? লে না। স্পষ্ট জবাব দিল তপন রায়চৌধুরী মাসের প্রথম পনেরো দন দুবেলা ভাতরুটি খায়, পরের দশদিন একবেলা খেয়ে কাটায় আর াষ পাঁচদিন না খেয়ে থাকে। ওর দৈনিক হাত খরচ আশী পয়সা থেকে এক টাকা। এর আগে নানান কাজ করে জীবিকা অর্জন করেছে। া বিক্রী থেকে শুরু করে ধুপ কাঠির প্যাকেট বিক্রী করেছে। জ। প্রেসের কাজ, মাদ্রাজে মার্কেন্টাইল ফার্মে কিছুদিন কাটানোর ার একটা বড় প্রতিষ্ঠানে কন্ট্রাকটরের অধীনে কিছুদিন কাজ করার ার ক্যাজুয়াল হিসাবে ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্টে কাজ করে। ছোট-বেলার স্বপ্ন ছিল বড়ো হয়ে ভালো করে নাটকে অভিনয় করে যেতে াকবেন এখন বলে আমার মা যে কতোবড়ো অভিনেত্রী সেটা না েখলে বিশ্বাস করবে না! এতো অভাবের মধ্যে থেকেও মার মুখে কোনোদিন কোন অভিযোগ শোনেনি। এরপর আমার অভিনয় করার আর কিছু নেই।

ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের ডে-নাইট গার্ড আনন্দ র। একশআশি টাকা মাইনে পায়। চায়ের দোকানে ছিল। গান করত বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে দোকানের মধ্যে। ব্যবসায় মন ছিল। তার-পর যা হবার তাই হলো: দোকানটা গেল। প্রেম করে বিয়ে করল। এখন দুই মেয়ে এক ছেলে নিয়ে সংসার করছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে বাড়ীর দালালী করে। কোনো মাস হয়-কোন মাসে হয় না। চিন্তার আর শেষ নেই। কুঁজো হয়ে পড়েছে এই পাঁয়তিরিশ বছরে। তে মা ধার করে চালিয়ে যাচ্ছে। ব্যবসা করার ইচ্ছে আছে। টাকা পেলে এবার আর ফুর্তি করে উড়িয়ে দেবে না। এখন ও খুবই অনুতপ্ত।

ুপুরে এসেছেন যখন খেয়ে যান

রেডিওতে 'বিবিধ ভারতী' সেন্টারে লাল কাঁটা। দক্ষিণ দিকের ঝুলন্ত দেয়াল ঘড়িতে দুপুর একটা বেজে চল্লিশ মিনিট। ঘরের চারটে দেয়ালে একবিন্দু ফাঁকা জায়গা নেই। চৌকির উপরে

কোণাকুণি পাতের দড়ির উপরে আধ ময়লা জামা কাপড় ঝুলছে। চৌকির নীচে চোলাই মদের স্টক। বাইরের বারান্দায় ছোট্ট এক-ফালি বারান্দা, এক পাশে মাটির পাতা উনুন, মশলাপাতির তেলচিটে ধরা তাক। বারান্দায় অর্ধবৃত্ত হয়ে বারো বছর থেকে চুয়াল্লিশ বছরের ছজন লোক খেতে বসেছে।

সদর পেরিয়ে উঠোনে ঘরের সামনে দাঁড়াতেই অরুণা বাঙালী বাড়ীর অতিথি অভ্যর্থনা করার মতোই অভ্যর্থনা করল। উঠোন থেকে বারান্দায় উঠে ঘরে চলে গেলাম। বসবার জায়গা দিয়ে অরুণা বলল, একটু বসুন, খেতে দিয়ে আমি এক্ষুনি আসছি।

চোলাইয়ের গন্ধ, রান্নার গন্ধ, বন্ধ ঘরের মধ্যে আমার শরীরটা পাক দিয়ে উঠল। মনে পড়ে গেল এক বন্ধুর পরামর্শ। বলেছিল যদি তুই অরুণাদের মতো মেয়েদের ঘরে যাস তাহলে তার আগে গলাটা একটু মদে ভিজিয়ে নিস: গল্প করা তো দূরের কথা, দু দণ্ড বসে থাকতেও পারবি না।

লাস্যময়ী নারীর বিচিত্র ভঙ্গিতে ছবি ছাপা ক্যালেন্ডার, মাটির মহাদেব, মূর্তি, লক্ষ্মীর ঝাঁপি, পাঁচ ফুট লম্বা পুরোনো বেলজিয়াম কাঁচের মোটা আয়না, দুটো বড়ো কোনো বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা ছবি দেখতে দেখতে অরুণা আঁচলে জলহাত মুছতে মুছতে হাসি মুখে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করল, কি খবর বলুন?

—কেমন আছো?

—শরীরটা কয়েকদিন ধরে ভালো যাচ্ছে না।

—ডাক্তার দেখাও?

—কোথেকে দেখাব বলুন! আজ এক মাস হতে চলল

লাইনে দাঁড়াতে পারছি না। হসপিটালের ডাকতারকে দেখাতে গেলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। পারি না। কষ্ট হয় বেশীক্ষণ দাঁড়াতে।

ইতিমধ্যে কালো কুচকুচে গায়ের রঙ, মাথার চুল কোঁচকানো, মোটাসোটা, লাউয়ের মতো ভুঁড়িটাতে হাত বুলোতে বুলোতে মোহন কুমার ঘরে ঢুকল। আমাকে দেখতে পেয়ে নমস্কার করল।

—আচ্ছা মোহন, এখন এখানে কতজন মেয়ে আছে?'

মোহন একটা ছোট্ট আলমারির উপর থেকে নীল মলাটের চার নম্বর বাঁধানো খাতা নামালো। দেখে বলল, শিবরাত্রির পুজোর আগের দিন পর্যন্ত সাতষট্টিজন ছিল। এখন একশোয় দাঁড়িয়েছে। এ বাড়ীতে সাতঘর আছে।

জব চার্ণকের কোলকাতার পূর্বদিক ঠিক করে নিয়ে দক্ষিণ দিকে ঘুরে হাঁটতে শুরু করলে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, টালিগঞ্জ রেল ব্রীজ পেরোলেই দেশপ্রাণ শাসমল রোডের উপরে একটা মোড়। এখান থেকে দেশপ্রাণ শাসমল রোড ভাগ হয়ে পশ্চিমদিকে শুরু হয়ে টালিগঞ্জ রোড, ঠিক এখানেই দক্ষিণ-পশ্চিম গা ঘেঁষে অর্ধবৃত্তাকারে উঠে এসেছে ইউ. কে. মণ্ডল লেন, সেখানে যৌথ পরিবারের মতো একশটা মেয়ে সন্ধে থেকে গভীর রাত পর্যন্ত শরীর বেচে পয়সা উপার্জন করে, যে উপার্জন থেকে অন্ততঃ তাদের সংসারের তিনশ লোক খেয়েপরে কোনোরকমে বেঁচে আছে। অর্থাৎ একটা মেয়ে পিছু কম করেও তিনজন মানুষ যদি নির্ভরশীল থাকে, তাদের খাওয়াপরা, শখ আহ্লাদ, পড়াশুনো সবকিছু যদি মেটাতে হয় তাহলে তিনশ মানুষ এদের উপার্জনে বেঁচে আছে। এদের রোজগার খুবই কম। দরদস্তুর করতে করতে অনেক গভীর রাতে বারো আনা পয়সাতেও নামতে হয়।

কোনোকোনোদিন পনেরো-কুড়ি টাকা রোজগার করে, আবার কো কোনোদিন তাও হয় না। লম্ফের তেল, খরচের খাতায় চলে যা আয় কিছুই হয় না। এরা দশ টাকার উপরে কখোনোই চায় না তার প্রধান কারণ এখানে ভালো খরিদ্দার আসে না। তাছাড়া এ নোংরা বস্তি ভ্যাপসা গরম-অন্ধকার মেশানো দুর্গন্ধের ম কজনই বা বেলফুলের মালা শুঁকতে শুঁকতে আসবে?

চলে আসার সময়ে অরুণা বলল, দুপুরে এসেছেন খে খেয়ে যান না।'

—আমি, আরেকদিন দেখা যাবে এই বলে অরুণার থেকে বেরিয়ে এলাম।

পাশের ঘরের সন্ধ্যার কাছে গেলাম। চোখ আর না অনেকটা জাপানি মেয়ের মতো লাগছিল। উনিশ বছর বয় খেয়েদেয়ে পানের বাটা নিয়ে বসেছে। ২৪ পরগণার গোবরডাঙা ওর বাড়ী। বাড়ীতে এক ছেলেকে নিয়ে বিধবা মা থাকে। মাসে ১০০ থেকে ১২৫ টাকার বেশী পাঠাতে পারে না। সাজসজ্জা, খাওয়া-দাওয়া, ঘর ভাড়া লাইট ভাড়া দিয়ে আর কিছুই থাকে না।

রোজ আয় কত জিজ্ঞেস করাতে বললে সে কি আর ঠিক আছে। যখন যা নিতে পারি—তাই নিই। তবে দশ টাকার বেশী খদ্দের খুব একটা কেউ আসে না। সারা মাসে ৪০০, ৫০০ টাকা রোজগার হয়।

সাড়ে তিন ফুট বাই পাঁচ ফুট পাকা মেঝে, কাঁচা দেয়াল, উপরে টিনের ছাউনি দেয়া একটা ঘরের ভাড়া ২৫ টাকা। লাইট আর ফ্যান নিলে আরো পনেরো টাকা যোগ হয়ে যায়। সাজসজ্জায় ১০ টাকা যায় তার ওপর ডাকতারী চিকিৎসার খরচ—বাদবাকি টাকা চাল, ডাল, তেল, পুঁইশাক কিংবা কচুর শাকের ঘণ্ট সপ্তাহে দু'দিন মাছ, আর মাসে একদিন, জোর দি-দিন মাংস খেতে চলে যায়।

কেরানীর বেতন

'আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে' থেকে 'বেঙ্গল আসাম রেলওয়ে', তারপর শুধুই 'আসাম রেলওয়ে'। পরে তারই বদল ঘটে নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়েতে এবং সবশেষে পরিবর্তন 'নর্থ ফ্রণ্টিয়ার রেলওয়ে'। বয়েসের ভারে ন্যুব্জ মানুষ দিগিন্দ্র রায় হিন্দ মোটরে তাঁর বাড়ির উঁচু দাওয়ায় বসেছিলেন। মনে মনে হেঁটে চলছিলেন স্মৃতির প্রান্তর ছুঁয়ে ছুঁয়ে। চোখের সামনে পাতা-ঝরা গাছ। শীতের জীর্ণ প্রকৃতি। গাছের মাথা শুয়ে শেষ বিকেলের মরা রোদ।

থেমে থেমে কথা বলছিলেন দিগিনবাবু। মাঝে-মধ্যে শ্লেষ্মায় গলা ধরে আসছিল। যৌবনের দুরতম দিন-গুলির কথা বহু কষ্টে টেনে আনছিলেন বার্ধক্যের সীমান্তে বসে। সেটা সম্ভবত ১৯২৯ সাল। বিনা মাইনেতেও তখন লোকে অ্যাপ্রেন্টিস থাকত। আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে কোনমতে দুটো খাওয়াদাওয়া আর প্রাণপণে কাজ শেখা। কাজ খালি হলে মিলবে সেই আশায়।

—আজকাল অবিশ্যি সে-আশা দুরাশা—একটু ম্লান হাসলেন দিগিন-বাবু। তখন তা ছিল না। মিলে যেত চাকরী। তবে ধরা-করার ব্যাপার যে একেবারেই ছিল না—এমন নয়।

যাই হোক ১৫ টাকা বেসিক আর বছরে আট আনা ইনক্রিমেন্টে অনেক-কেই কাজ শুরু করতে দেখছেন দিগিনবাবু। সিগন্যালার পদে নিজেই ১৯২৯-এ কাজে ঢুকেছিলেন ২৭ টাকা মাস-মাইনেতে। যথানিয়মে বছর ঘুরে ইনক্রিমেন্ট মিলেছিল আট আনা—হালফিলের ৫০ পয়সা। ১৯৬১-তে যখন অবসর নিলেন দিগিনবাবু তখন মাইনে সর্বসাকুল্যে একশো সাতাশী। ১৯২৯ থেকে ১৯৬১ এক মাইনেতে রদবদল ঘটেছিল বৈকি। দিগিনবাবু একশো সাতাশীতে যখন অবসর নিলেন, তখন নর্থ ফ্রণ্টিয়ার রেলে তাঁরই পদে চাকরী শুরু করলে মাইনে মিলত সম্ভবত একশো টাকার কাছাকাছি। আর স্বাধীনতার আগে তো দিগিনবাবুদের চাকরীতে ৬৫।৮০-তে স্টেশন-মাস্টাররাই অবসর নিতেন।

তখন এমন মাগ্‌গী-গণ্ডার বাজার ছিল না। জিনিসপত্রের এমন আগুন-ছোঁয়া দামও ছিল না। জোড়াতালি দিয়ে কোনরকমে চলে যেত টেনেটুনে। তবে কষ্ট কি আর ছিল না। নিশ্চয়ই ছিল।

যাঁদের দেখেছি
অনন্ত সিং

'হাম্, তোদের যম-ভাগ'

স্বদেশী ষ্টোর্স'। জিনিষ সব স্বদেশী।' বাবুরা স্বদেশী অর্থাৎ কেউ কেউ অন্তরীণ ছিলেন। তাদের মধ্যে কেবল একজন জেল ফেরতা—গিরিজা শংকর। আমাদের মধ্যে তাঁর পরিচয় শংকরদা। অন্যান্য যুবকরা যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রতাপ রক্ষিত, সতীশ নাগ প্রমুখ সবাই খুবই জনপ্রিয় যুবক। তাঁদের প্রশংসা সবাই করত, আমরাও করতাম। তবে খুব ভালভাবে বুঝতাম—যে তাঁদের দৌড় গান্ধিজীর আন্দোলন পর্যন্ত—একেবারে নিরামিষ সি, অর্থাৎ পুরোপুরি মাছ-মাংসের গন্ধ পর্যন্ত থাকবে না, ভুলেও হিংসাত্মক ভয়ংকর রক্তাক্ত বিপ্লবের চিন্তাও করবে না। তাই সে সব স্বদেশীবাবুর স্বদেশপ্রেম, অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত নিবদ্ধ ছিল। এইরূপ সীমারেখার মধ্যে স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতার যুদ্ধ কখনও ভাবি নি। চরম সংগ্রাম, চরম আত্মত্যাগ ছাড়া যে কখনও পূর্ণস্বাধীনতা অর্জন করা যেতে পারে, তা আমরা মন থেকে বিশ্বাসই করতে পারতাম না। অবাস্তব স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখি নি। মনে হতে পারে, অসহযোগ ও অহিংসার পথে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা এল তো ! ইতিহাসকে অস্বীকার করে বা ঐতিহাসিক তথ্যকে নিছক বাদ দিয়ে, স্বাধীনতা লাভ করেছি বলা যায় বটে কিন্তু তাতে অবাস্তবতার ইতিহাস জোর করে জাতীয় জীবনে লেখা যায়। সেটি কিন্তু সুপরিকল্পিত সাম্রাজ্যবাদী চক্রের মিথ্যা প্রচার।

ভারতের জাতীয় সংগ্রামে কি করে আমরা সিপাহি বিদ্রোহকে বাদ দিতে পারি ? কি করেই বা বাঙ্গলার স্বদেশী আন্দোলনকে হিসেবের বাইরে রাখা যায়—বাঙ্গলার শহীদদের রক্তের দান কি দেশ কখনও ভুলতে পারে ? এত গুলি ও এত ফাঁসীতে মৃত্যুবরণ কি নিস্ফল গেছে। নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনীর শসস্ত্র অভিযান কি হৃদয়ের রক্ত দিয়ে লেখা হয় নি ? ব্যাপক ভারত ছাড় আন্দোলন কি নিছক শান্ত-অহিংসা আন্দোলন ? নিরস্ত্র শান্ত-জনসাধারণ কি বুক পেতে ইংরেজ সরকারের সঙ্গিন ও বুলেটের বিরুদ্ধে সব উপায়ে যুদ্ধ করতে করতে বীরের মৃত্যু বরণ করে নি ? ভারতীয় নাবিকের রণপোত কি বিদ্রোহ ঘোষণা করে নি ? অহিংসারই জয় আর হিংসায় পথে আমাদের পরাজয়——এইকি ভেবে নিতে হবে ? সেই দিন এত সব ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক বিশ্লেষণ মারফৎ স্বদেশী স্টোর্সের বাবুদের মাহাত্ম্য বুঝতে চাইনি। তবে তাঁরা যে অতি সাধুব্যক্তি, অতি অবিশ্বাসী হয়েছেন, তা তাঁদের কথাবার্তায়, হাব, ভাব, ব্যবহার, খুব ভালভাবে প্রকাশ পেত। সবচাইতে খারাপ লাগত যখন তাঁরা তাঁদের বৈপ্লবিক দৈন্যতা ঢাকবার জন্য স্বদেশীগিরির বড়াই করায় বিশেষ চেষ্টা করতেন, এই স্টোর্সের প্রতিষ্ঠার বৈপ্লবীক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে যেমন নাকি তাঁদের স্বদেশী স্টোর্সই হবে ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা যুদ্ধের কেন্দ্রীয় ঘাটি, কার্যালয়। ভাবটা যেন সেই জন্য যেন নেপাল থেকে ভোজালি আমদানি করা হয়েছে। তাঁদের যে যা ভাবুক না কেন, তাঁরাই গান্ধীপন্থি ভোজালি মার্কা শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী।

ইতিমধ্যে কিন্তু স্বদেশী স্টোর্সের ভিতর

যথেষ্ট কড়া নজর রাখত কারণ গান্ধীপন্থী হয়েও ভোজালি মার্কা স্টোর্স! তাঁদের দোকানে এই ধরনের চুরির হদিশ করতে গিয়ে তাদের চোখে পড়ল চোর আর কিছুই নিল না—নিয়েছে মাত্র দুটি ভোজালি। ভোজালি বিক্রি করে কটি টাকা পাবে? আর বিশেষ গবেষণা না করেই সহজে ধরে নিয়েছিল কোন্ চোরের ঐ দুটি ভোজালিরই বিশেষ প্রয়োজন থাকতে পারে? তাঁরা বেশ হিসেব করে বুঝেছিলেন, যে সব যুবক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে তারাই এরূপ হঠকারিতায় লিপ্ত হতে পারে। আর সেরূপ যুবক আছে মাস্টার সূর্যসেনের দলে। যা হউক না কেন? তারা পুলিশের কাছে ডাইরী করলেন—তাদের দোকান থেকে সন্ধ্যের সময় বড় রাস্তার উপরে দুটি বড় বড় তালা ভেঙে লোহার বার দুটি সরিয়ে দোকানে ঢুকে আলমারি খুলে মাত্র ভোজালি দুটি চুরি করেছে—অন্য কোন জিনিষই তাদের প্রয়োজন ছিল না। এরূপ চোর বিশেষ উদ্দেশ্য না নিয়ে এরূপ চুরি করতে পারে না। কাজেই পুলিশ ধরে নিল ঐ চুরির পেছনে কারা থাকতে পারে? অধিকমাত্রা বিপ্লবী দলের সভ্যদেরই যে এই কাজ, তাতে পুলিশের কাছে আর কোন সন্দেহ ছিল না। যদিও চুরি করার পর আমাদের বাজিমাৎ হয়েছে বলে ভেবেছিলাম, কিন্তু পুলিশ সেরূপ ভাবতে পারে নি। তাদের একটানা গবেষণা চলেছিল। পুলিশ যে এই নিয়ে সত্য তথ্য আবিষ্কার করতে গবেষণা করছে বা তাদের সেরূপ গবেষণা না করে নিস্তার ছিল না, তা আমরা ভাবি নি। এই হচ্ছে সরকারী পুলিশ ও পদস্থ কর্মচারীদের সম্ভাব্য দায়িত্ব জ্ঞান যেরূপ দায়িত্ব জ্ঞান বিপ্লবী দলের মধ্যে সাধারণতঃ থাকত না। এরূপ ঔদাসিন্য বিপ্লবীদের সচরাচর ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আমরা যখন এ ব্যাপারে উদাসীন পুলিশ তখন প্রচেষ্টায় ছিল সন্দেহভাজন যুবকদের ফর্দ প্রস্তুত করতে। পরে যখন বেঙ্গল অর্ডিনান্সে ধরা পড়লাম পুলিশের কাছে, অনেক ইতিবৃত্ত জানতে পেরেছিলাম। সব জানা জিনিষের প্রতিশোধক খুঁজেছিলাম বলে চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহের কার্যকলাপ সেরূপ সাবধানতার সঙ্গে তাল রেখে সমাধান করতে চেষ্টা করেছিলাম।

আজকে যখন স্মৃতিচারণ করছি তখন স্বভাবতঃ মনে হচ্ছে এই সব কথা। বিশ্বনায়ক লেনিন বলেন যদি মস্কো অভ্যুত্থানের বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকত, তবে অকটবর বিপ্লবের কথা ভাবাই যেত না। মস্কো ইন্‌সারেকসন্স একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, যে পাদক্ষেপ না থাকলে সফল অকটবর বিপ্লব আজ আর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পেত না। আমাদের চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহও সফল প্রতিপন্ন হোত কি না তা কে বলতে পারে যদি স্বদেশী স্টোর্স থেকে ভোজালি উধাও হওয়ার মত বহু ঘটনার ইতিহাস এর পেছনে না থাকত। সেই হিসেবে ভোজালি অপহরণ না করে, কিনে নিলে কি ভাল হোত? কিনে নিলে যে লাভ হোত তার চাইতে অনেক বেশী লাভ হোয়েছিল যেহেতু আমরা ভোজালী দুটি অপহরণ করাই শ্রেয় মনে করেছিলাম। অপহরণ করার জন্য যে সামান্য অভিজ্ঞতা হয়েছিল এবং অপহরণ করার জন্য আমাদের যে সাহস ও বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হয়েছিল—টাকা দিলাম, আর ভোজালি দুটি ক্রয় করে নিয়ে এলাম—তাতে সাহস ও বুদ্ধিমত্তার অনুশীলন করার সুযোগ পেতাম না। জিনিষটি খুব ছোট। কাজেই বিচার করে না দেখলে বিপ্লবে এই সব ছোটখাট জিনিষ উপেক্ষা ও অবহেলা করে যাওয়া হয়। আমরা সজ্ঞানে সেরূপ চেষ্টা করতাম এবং পরে পরে পরিকল্পনা অনুযায়ী করে যেতাম।

আমরা ভোজালী নিয়ে এসে সিন্দুকে বন্ধ করে রেখে দিইনি। কাজে লাগাবার সুযোগ খুঁজছিলাম। সেই সুযোগটি এলো এক সরস্বতী পূজোর রাতে। চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের বিজ্ঞান গবেষণাগারে একটা ইনডাকটিভ কয়েল ছিল। সেই কয়েলটির উপরে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এই কয়েলটির সংবাদ আমার দাদা শ্রীনন্দলাল সিংহের কাছ থেকে পাওয়া। তিনি বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিলেন এবং তাঁর কাছেই আমি শিখেছিলাম কয়েলের বিশেষ এক ধরণের প্রয়োগ সম্বন্ধে। কয়েল থেকে দুটি তার সংযোগ করে দূরে নিয়ে গিয়ে কিছু তফাৎ করে ধরলেও ব্যাটারী সংযোগ করার পর সুইচ টিপলে দুইটি তারের বিচ্ছিন্ন অবস্থার মধ্যে স্ফুলিঙ্গ বার হয়। এই বিচ্ছিন্ন স্থানটি কিছুটা কম বেশী করা যায় যদি সেই অনুপাতে ব্যাটারী সংযোগ করা হয়। দাদার কাছে যেদিন এই জিনিষটা আমি দেখলাম, সেদিন থেকে আমার মাথায় কেবলই ঘুরতে লাগলো ইলেকট্রিক সুইচ টিপে দূর থেকে আগুন জ্বালাবো এবং সেই আগুনে দূর থেকে বোমা বা ডিনামাইটের বিস্ফোরণ ঘটাবো। গোপনে ব্যাটারী রাখা, দেখতে না পাওয়ার মত করে ইলেকট্রিক তার দূরে নিয়ে যাওয়া, সেগুলি গেরিলা পদ্ধতিতে সম্পন্ন করতে হবে। সে শিক্ষার জ্ঞান বই পড়ে পাওয়া যায়, কিন্তু বই না পড়েই আমার চিন্তা দিয়ে অনেক কিছুই ঠিক করে নিয়েছিলাম। কয়েল ও ব্যাটারী যত বেশী শক্তিশালী হবে, ততই দূর থেকে ডিনামাইট ফাটানো সম্ভব। এইটি চিন্তা করে নিয়েই ভেবেছিলাম সরকারী কলেজে যে 'ইনডাকটিভ কয়েলটি' ছিল, তা পেলেই আমি আমার কাজের বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করতে পারি। আর বেশী দেরী করতে ইচ্ছে করছিল না। তাই সরস্বতী পূজোর রাতে কলেজের গবেষণাগার থেকে সেটিকে আমরা নিয়ে আসবো। এই উদ্দেশ্যে আমি, নির্মলদা ও দাদাকে এই পরিকল্পনার কথা বললাম এবং সঙ্গে সঙ্গে কাজটা করার জন্য যে ছকটা করেছিলাম তাও জানালাম। সংক্ষেপে সেই ছকটা হলো এই—

'আমরা সঙ্গে নেব আত্মরক্ষার জন্য দুটি ভোজালী, একটি ছোট ড্যাগার। ভোজালী দুটি থাকবে আমার ও নির্মলদার সঙ্গে, ছোট ড্যাগারটি দাদা রাখবে তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য। গবেষণাগারের জানলা বেশ উঁচুতে। আমি আগে সেই জানলার তালা ভেঙে খিল্ খুলে দেব। তারপর দাদা ভেতরে ঢুকবেন, যেহেতু দাদাই গবেষণাগারের ভিতরের অবস্থানগুলি জানতেন, বিশেষ করে কয়েলটি কোথায় রাখা আছে। দাদার সঙ্গে থাকবে একটি সাইকেলের লাইট। আর থাকবে বড় ইস্ক্রু-ড্রাইভার, প্লাস এবং লোহার রড—তালা ভাঙ্গার জন্য। আমাদের বাড়ী থেকে বড় স্ক্রু-ড্রাইভার, লোহার রড, প্লাস নেওয়া হয়েছিল। সাইকেলের লাইটটিও—নিজেদের সাইকেলের। আর জানলা খোলার পরে তাঁরা যখন গবেষণাগারে ঢুকবেন, তখন আমি গবেষণাগার ছেড়ে একটি রাস্তা পার হয়ে মেন-বিল্ডিংয়ের বারান্দায় উঠে দাঁড়িয়ে পোজিশন নেব। মেন-বিল্ডিংয়ের বারান্দাটি বেশ উঁচু ছিল। আমি ছদ্মবেশে ছিলাম—ডাকাতের মত গোঁফ-দাড়ি ও পরচুলা পরেছিলাম। নির্মলদা আমারই মত ছদ্মবেশে ছিলেন। আমার দাদা সাধারণ বেশেই ছিলেন, যেহেতু তাঁর কোন লোকের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। আমার উপরে ভার ছিল, যদি কোন লোক কলেজের সরস্বতী পূজোর আসর থেকে বেরিয়ে গবেষণাগারের সামনের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাবার জন্য এদিকে এসে পড়ে এবং কোন কারণে যদি সন্দেহ করে চেঁচমেচি করে আমাদের ধরতে আসে তবে তাদের ঢোকার মুখেই আমি বাধা দেব। আর পেছন দিক দিয়ে যদি কেউ আসে, তবে তার দায়িত্ব নির্মলদার ওপরে। বাস্তবিক পক্ষে সেই সম্ভাবনা ছিল না বললেই চলে কারণ তখন রাত প্রায় ১২টা। তবু এইরকম ছোটখাট একটা মিলিটারী প্ল্যান করে নিজেরা আনন্দ পেয়েছিলাম এবং প্রস্তুত হয়ে অ্যাকশন করতে যাই। আসলে আমরা মনে মনে ধরে নিয়েছিলাম একরম আশঙ্কার কোন কারণই নেই, যে হঠাৎ কোন লোক এসে আমাদের চ্যালেঞ্জ করবে। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হলো।

আমি আমার কাজ করে আমার পাহারা দেবার জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম কলেজের পূজোর মণ্ডপ থেকে একজন দুজন লোক বেরিয়ে সোজা রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমার স্থির বিশ্বাস ছিল অত রাত্রিতে গবেষণাগারের সামনের রাস্তা দিয়ে কেউই যাতায়াত করবে না। আমার সেই ভুল ভেঙে গেল। সাধারণ বেশে দুজন লোক পূজোমণ্ডপ থেকে বেরিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল তারাও অন্যান্যদের মত সোজা বেরিয়ে যাবে। কিন্তু দেখি, তারা হঠাৎ বাঁ দিকে মোড় নিয়ে গবেষণাগারের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। আমি মনে মনে প্রমাদ গুণলাম— তারা নিমেষে গবেষণাগারের দরজার সামনে চলে আসবে। এখন আমি কি করে, কি করি— ভাবছি। কিন্তু সেরকম ভাবার সময় তখন ছিল না। মন বলছে, 'এক্ষুনি বাধা দাও নইলে আত্মসমর্পণ কর।' ঐ দুজন ইতিমধ্যে গবেষণাগারের সামনে এসে থামলো। শোনা গেল

হচেছ : 'ঔমা এত রাত্তিরে ...য়ার খোল কেয়া ? কৌন ? এত রাত্তিরে লেবরেটরীর কেন?....কে?' আমি আমার দঢ় মুষ্টিতে ধরে উপরের ...ক নীচে লাফিয়ে পড়লাম। ...ফলাটি বেঁকিয়ে চওড়া করে ...খন তারা দেখতে পায় কারণ ... খুব অন্ধকার ছিল। লাফিয়ে ... তাদের প্রশ্ন 'কৌন'-এর উত্তরে 'হাম, তোদের যম।'। এই ... কাঁপতে কাঁপতে একপা দু'পা ...গিয়ে দুজনে একত্র হোল। আমি ...াম : 'ভাগ', তৎক্ষণাৎ তারা ঘুরে ...দল। ইতিমধ্যে আমার দাদা ...জা খুলে বেরিয়ে এলো। কারো ...কথা নেই। দাদা ছুটছেন। আমিও ...নির্মলদাও আমাদের পেছনে ...ু করলেন। আমরা বড় রাস্তা ...র সামনের দিকে দেব পাহাড়ে ...ম। পেছনে দু-একবার ফিরে ... কেউই আসছিল না। তবু ...তরের কাঁপুনি থামেনি। নিজেদের ...একটা কথা বললাম, তাও কেঁপে ... তখন দাদার কাছে শুনলাম তিনি ...র লাইট, বড় স্ক্রু-ড্রাইভার আর ...গবেষণাগারে ফেলে এসেছেন। ...এইসব সূত্র থেকে পুলিশ যদি ...ন করে, তবে বেরিয়ে পড়বে যে ...িনিষ আমাদেরই। এই ঘটনায় অনেক ...া হলো বটে, কিন্তু অনেক সমস্যাও ...া। দেব পাহাড় থেকে নেমে আমরা ...তা দিয়ে হাঁটছি, বাড়ীর দিকে যাব ... তখনও গায়ে কাঁপুনি, কথা বলতে ...ম না। সামনের দিকে একটা ভিড় ... আলো জ্বলছে। গান-বাজনা ...চ্ছে। মনে হলো সরস্বতী পুজো ... সেখানে থিয়েটার হচ্ছে। আমরা ... যদি পথে কেউ ধরে জিগেস করে, ...ত্রে কোত্থেকে আসছি, তবে থিয়েটার ...রছি বলবো। সেইজন্য থিয়েটারের ...া উচিত, প্রোগ্রাম জানা উচিত এবং ...ছে তাও জানা উচিত ভেবে ভিড়ের ...গিয়ে দাঁড়ালাম। কি দেখছিলাম ...নে নেই। চেষ্টা করে দুটো প্রোগ্রাম ... করলাম। নির্মলদা একটা রাখলেন ...আমরা নিলাম—যদি কাউকে কৈফি-...ত হয় এদিকে কোথায় এসেছিলাম, ...ই থিয়েটারের প্রোগ্রাম অব্যর্থ প্রমাণ ... জানিয়ে দিত যে আমরা সরস্বতী ... আসগার খাঁ দিঘীর পাড়ে থিয়েটার ...ম। এইসব ঠিক করে আমরা নিজ ...ড়ীতে ফিরব ঠিক করলাম। ভোজালী ...নির্মলদাকে দিয়ে দেওয়ার কথা ছিল, ... একজনের পক্ষে দুটি ভোজালী ...র নিয়ে যাওয়া অসুবিধা বলে, একটি ...লী আমরা সঙ্গে করে বাড়ীতে নিয়ে ...লাম। যখন বাড়ীতে পৌঁছালাম ...াত দুটো।

...পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই আমি ...ন ভেবেছিলাম যে সব জিনিষ পরে ... [illegible] আসছি হবেই, সে রকম জিনিষ কিনে বাড়ীতে রাখবো বলে। কিনেও এনেছিলাম। মনে হয়েছিল যাইহোক, একটা দিক কোনমতে সামাল দেওয়া গেল।

গত রাতের ঘটনা নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ কতখানি বিচলিত তা দেখবার জন্য আমি ভাত খাবার পরে দুপুরে ১১টা নাগাদ সাইকেল নিয়ে বেরোলাম। এ-রাস্তা সে-রাস্তা ঘুরে কলেজের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ইচ্ছে ছিল গবেষণাগার, কলেজ—সব দেখে যাব। কি আশ্চর্য! কলেজের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় বাঁ দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে কলেজের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারলাম না—এত ভয়—যেন আমাকে কেউ চিনে ফেলবে, যে আমিই সেই রাতে সেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত।

কী অদ্ভুত মানসিক প্রতিক্রিয়া। এত দুর্দমনীয় সাহসী অনন্ত সিং তার প্রথম জীবনে এই ছিল! পরের দিন দুপুরবেলা পথ দিয়ে সাইকেল করে যাওয়ার সময় কলেজের দিকে তাকালেই কেউ চিনে ফেলবে—এই সেই দুষ্কৃতকারী—এরূপ ভাবার কি কোন যুক্তি ছিল ?

আমি এই যে বিরটা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম (অবশ্য অন্যরা এই অভিজ্ঞতাকে বিরাট ভাববে না, তুচ্ছ বলেই মনে করবে, যদি তার জীবনে কোন বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য না থাকে) তার জন্য আমি আমাদের বিপ্লবী যুবক বন্ধুদের ট্রেনিং কোর্সে কেবল পিস্তল রিভলবার দিয়ে টার্গেট প্র্যাকটিস করাই এক-মাত্র কাজ বলে মনে করিনি। ডন-কুস্তি মুষ্টিযুদ্ধ, যুযুৎসু প্রভৃতিকেও সর্বোচ্চ স্থান দিইনি। কেবল মাত্র শরীরে খুব জোর আছে, অত্যন্ত সাহসী যুবক হলে চলবে না। নিশীথ রাতে কলেজের গবেষণাগারের নিকটে নির্জন পথে নিরস্ত্র দুজন দারোয়ানকে দেখে আমাদের মত ভয়ে পালটান চলবে না। সেই রকম শিক্ষা পদ্ধতি দিয়ে বিপ্লবী যুবকদের মন তৈরী করতে হবে যেন বাস্তব ক্ষেত্রে তারা সাহস না হারায় এবং ভয়ে না পালায়। যদি মনে করি শারীরিক শক্তির তেমন প্রয়োজন নেই, মুষ্টিযুদ্ধ বা জাপানী-কুস্তী অভ্যাসের কোন প্রয়োজন নেই, তবে কিন্তু মহাভুল হবে।

মাস্টারদা আমাকে বলেছিলেন রাম-মূর্তী হওয়া ও ক্ষুদিরাম হওয়া এক বস্তু নয়। শারীরিক শক্তি থাকলেই সব হয় না। শারীরিক শক্তি, ফাঁসীর দড়ি গলায় পরতে ভীত সন্ত্রস্ত না করার অজেয় সাহস যোগাতে পারে না। তার জন্য চাই মানসিক প্রস্তুতি। সে রকম মানসিক প্রস্তুতি আসতে পারে—যদি আমাদের চিরসাথী হয়—(১) বিপ্লবের বই, (২) বিপ্লবের চিন্তা ও (৩) বিপ্লবী সাথীদের সঙ্গে সঙ্গে সব সময় মেলামেশা।

কলেজের সেই ঘটনা নিয়ে কর্তৃপক্ষ বিশেষ চিন্তিত হলেন। তাঁরা পুলিশকে খবর দিলেন। পুলিশ যথারীতি অনু-সন্ধান আরম্ভ করল, তবে পুলিশ এই হদিশ না করতে পারার কারণ পুলিশ বুঝতেই পারেনি আমরা কী চুরি করতে

সাপ্তাহিক অমৃতের স্বত্বাধিকারি-বৃন্দ এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্যের বিবরণ। প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারির শেষ তারিখের পরবর্তী প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিতব্য।

ফর্ম ৪

(রুল ৮ দ্রষ্টব্য)

১। প্রকাশনের স্থান : ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩।

২। প্রকাশনার সময়ক্রম : সাপ্তাহিক, প্রতি শুক্রবারে প্রকাশিতব্য।

৩। মুদ্রকের নাম : শ্রীসুপ্রিয় সরকার; নাগরিকত্ব—ভারতীয়। ঠিকানা—১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩।

৪। প্রকাশকের নাম—শ্রীসুপ্রিয় সরকার, নাগরিকত্ব—ভারতীয় ঠিকানা ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩।

৫। সম্পাদকের নাম—তুষারকান্তি ঘোষ। নাগরিকত্ব—ভারতীয়। ঠিকানা—১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩।

৬। যেসব ব্যক্তি পত্রিকাটির অংশীদার বা শতকরা এক অংশের বেশী শেয়ারের অধিকারী তাঁদের নাম ও ঠিকানা : সুধীরচন্দ্র সরকার (মৃত), ১০১এ, ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা—২৬, প্রাণতোষ ঘটক (মৃত), ১১১, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা—৯, মুরারীবিলাস রায়চৌধুরী (মৃত), ৭৫, বনমালী নস্কর রোড, বেহালা; মনোজ বসু, পি-৫৬০, লেক রোড, কলিকাতা-২৯; গজেন্দ্রকুমার মিত্র, কেয়ার অব মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২; সুমথনাথ ঘোষ, কেয়ার অব মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, বিশু মুখোপাধ্যায়, ১২বি রাজা কালীকিষণ লেন, কলিকাতা-৫, ভবানী মুখোপাধ্যায়, ৩০১/৪এ বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, কলিকাতা-৩৪, তুলসীকান্তি দে বিশ্বাস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩, অমৃত-বাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩, তুষারকান্তি ঘোষ, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩, শচীবিলাস রায়-চৌধুরী, ৭৫, বনমালী নস্কর রোড, বেহালা এবং প্রফুল্লকান্তি ঘোষ, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩।

আমি সুপ্রিয় সরকার এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্য-গুলি আমার জ্ঞান-বিশ্বাস অনুযায়ী সর্বৈব সত্য।

স্বাঃ—সুপ্রিয় সরকার

তাং—১৭-২-৭৮

গিয়েছিলাম। ছেলেদের মধ্যে কিছু আলোড়ন সৃষ্টি হল। আমাদের বিপক্ষ বিপ্লবী দল যদিও সঠিক বুঝতে পারেনি, যে এই চুরির প্রচেষ্টার পেছনে আমরা ছিলাম, তবুও তারা ভেবেছিল গবেষণাগারের জিনিসপত্র চুরি একমাত্র বিপ্লবীরা—যারা বোমা প্রভৃতি প্রস্তুত করবে, তারাই করবে। সঠিক প্রমাণের অভাবে এইটি যে আমাদেরই কাজ, তা তারা ধরে নিতে পারে নি। আমাদের বিপক্ষ দল, স্বদেশী স্টোর্সে ভোজালী অপহরণ করাটা যে আমাদেরই কাজ—সে বিষয়ে তারা সুনিশ্চিত ছিল। গবেষণাগারে চুরির ঘটনায় যদি ভোজালী সম্বন্ধে কোন তথ্য থাকত, তবে পুলিশও আমাদের বিপক্ষ দল ভেবে নিত যে এটা আমাদেরই কাজ। কিছু দিন আমরা দম নিলাম। তারপর মাষ্টারদাকে আমি আমাদের দুর্বলতার কথা বলেছিলাম। কতখানি স্বাভাবিক দুর্বলতা থাকলে পরে আমাদের ভিতরে সেইরূপ কাঁপুনী ও ২৪ ঘন্টা পরেও কলেজের কলেজের দিকে তাকাতে না পারা। তারপর আমি আমার বক্তব্য রাখি যে, আমাদের সংগঠনের মধ্যে বাস্তবিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত সাহস বাড়াবার জন্য। বললাম বেছে বেছে আমাদের দলের সভ্যদের পরীক্ষা করে দেখা উচিত, কারণ সেই সাথে তাদের অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষাও হবে।

আমাদের মধ্যে 'রাজেন দাস সবাইকে সমালোচনা করত এবং 'আমরা যে কেউ কোন কিছু করব না'—সেই কথা বলে সবাইকে তিরস্কার করত। সে মাষ্টারদা, অম্বিকাদা প্রভৃতিকে বলত : 'তোদের গুজগুজানি, ফুসফুসানী আর ভাল লাগে না। বিপ্লব, বিপ্লব অনেক বলেছিস, কিন্তু কাজের নামে অষ্টরম্ভা। এই সব বলে কেবল ছেলেদের মাথাই খাওয়া হচ্ছে।'

প্রথম প্রথম যারাই তার কথা শুনত তারা ভেবে নিত, সেই চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলে একজন প্রধান বিপ্লবী নেতা। আমরা যারা তাঁর সম্বন্ধে জানতাম, তাঁর কথা শুনে মনে মনে হাসতাম। এই রাজেন দাস কলকাতায় সন্তোষদার (সন্তোষ মিত্র, হিজলী বন্দীশালায় পুলিশের গুলীতে শহীদ হয়েছেন) দলে থেকে কাজ করেছেন। তাঁরা তাঁর আসল পরিচয় পেয়ে খুব খুশী ছিলেন না। একবার তাঁদের সঙ্গে রাজেন দাস কোন একটি ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করতে যান। কিন্তু স্নায়ুবিক দুর্বলতার কারণে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে আসেন। আরও দুবার রাজেন দাস তাঁর দুর্বলতা দেখিয়েছেন। তাই তাঁরা তাঁর মুখের বড়াই শুনে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতেন না। রাজেন দাসের এই বীরত্বপূর্ণ কাহিনী যে আমাদের জানা ছিল, তা তিনি জানতেন না। চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের মাঠে তিনি একলা খেলোয়াড়। সেহেতু বিপ্লবের নামে বড়াই করা এবং অন্যকে অনায়াসে তিরস্কার করে যাওয়া তাঁর পক্ষে খুব যেন সোজা ব্যাপার। বিশেষ করে এই কারণেই সাহস পরীক্ষা করার জন্য রাজেন দাসকেই প্রথম বেছে নিয়েছিলেন। প্ল্যান ছাড়া ত বিশেষ ধরনের সাহসের পরীক্ষা করা যাবে না। সেজন্য ছকটি এইভাবে প্রস্তুত করি। রাজেন দাস আমাকে ডাকতে যাবে মাঠের ওপর দিয়ে একটি পায়ে-চলা সর্টকার্ট রাস্তা ধরে। এই রাস্তার ওপর সন্ধ্যে ৮।৮-৩০টার সময় এক গুণ্ডার বেশে আমি বসে থাকব তাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে ভয় দেখাবার জন্য। আমার পরণে থাকবে লুঙ্গি শার্ট, শার্টের হাতা গোটান, ওপরে একটি কাল ওয়েস্ট কোর্ট। মুখে কৃত্রিম গোঁফ-দাড়ি, মাথায় টুপি। আবছা অন্ধকারের রাতে আমার অতিপরিচিত লোকেরও আমাকে চেনার উপায় ছিল না। অম্বিকাদা রাজেন দাসের সঙ্গে ন্যাশনাল স্কুলের মাঠে এসে রাজেন দাসকে বললেন : 'তুমি গিয়ে অনন্তকে বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে এস। বল খুব দরকারী কথা আছে। সে এলে পরামর্শ করে ঠিক করব সতীদাকে বলব কি-না। এই স্কুলেরই কয়েকটা ঘর নিয়ে সতীদারা থাকতেন, কারণ স্ট্রাইক হওয়ার পর স্কুল বাড়ীটা খালিই পড়ে ছিল। মূল বাড়ীটা দখল করি। মাঠে খেলতাম আর কয়েকটা ঘরে ব্যায়াম করতাম।

আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি মাঠে পথচলা রাস্তার ওপরে বসে রইলাম। অদূরে দেখতে পেলাম রাজেনদা খুব খোস মেজাজে তুড়ী বাজিয়ে বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে আসছেন। আমার সেই বিকট চেহারা দেখে তাঁর গান থেমে গেল, গতিও মন্থর হয়ে এল। তারপর দেখি তিনি আর এগোচ্ছেন না। অগত্যা আমিই একটা ভয়ংকর পো নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। আর যেমনি কয়েক পা এগিয়ে যাবার ভঙ্গিতে তাঁকে স্পর্শ করলাম, তিনি আর দাঁড়াতে পারলেন না, ছিন্নমূল বৃক্ষের মত ধড়াস করে পড়ে গেলেন। সেই নির্জন মাঠে সাড়ে ৮টার সময় এই দৃশ্য উপভোগ করার জন্য আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। বিপ্লবী শ্রেষ্ঠ রাজেন দাসের এই দুরবস্থা দেখে আমি নিঃশব্দে হাসতে হাসতে দৌড় দিলাম। যেতে যেতে বাঁ হাত দিয়ে এক-টানে ওয়েস্ট কোর্ট ও লুঙ্গি খুলে ফেললাম আর ডান হাত দিয়ে দাড়ি, গোঁফ, মাথার টুপী খুলে নিয়ে সব একসঙ্গে সুকুমারদের বাড়ীর কম্পাউণ্ডের ভিতরে ছুঁড়ে ফেললাম। এই স্থান থেকে স্কুলের মাঠটি ২০০ গজের মধ্যে। আমি ভদ্রলোক সেজে অম্বিকাদার কাছে এসে হাজির হলাম। অম্বিকাদা যখন আমার ঘটনার ইতিবৃত্তান্ত শুনলেন, তখন তো তিনি হেসেই খুন। রাজেনদা অম্বিকাদাকে নানাভাবে সমালোচনা করতেন। তাই রাজেন দাসের বীরত্বের এই নজিরটি পেয়ে তিনি খুবই খুশী হয়েছিলেন বলে মনে হয়। কিছুক্ষণ পরে দেখতে পেলাম রাজেন দাস, আমার দাদা, আমাদের বাড়ীর চাকর লাঠি হ্যারিকেন নিয়ে এসে উপস্থিত। অম্বিকাদা ওদের দেখে আগে থেকেই হাসতে শুরু করেছেন। আমি চিমটি কেটে, চোখ টিপে অম্বিকাদাকে হাসতে বারণ করছি পাছে রাজেনদা বুঝতে পারেন যে, আমরাই ফন্দি এঁটেছিলাম তাঁর সাহস প করার জন্য। আমি খুব গম্ভীর হয়ে হবার ভান করে ওদের জিজ্ঞেস 'কি হয়েছে কি ? তোমাদের হাতে হ্যারিকেন দেখছি, সঙ্গে আমার (বাড়ীর চাকর) দেখছি।' দাদাই দিলেন : 'মাঠে গুণ্ডারা রাজেন আক্রমণ করেছিল।' তারপর রা বলতে লাগলেন : 'মাঠের ওপর যাওয়ার সময় গুণ্ডারা আমাকে আক্রমণ করল, টাল সামলাতে না আমি পড়ে গেলাম। আমার পে হাড়ে খুব চোট লেগেছে।' এইটুকু শ অম্বিকাদা আবার হাসলেন। রাজেন বিরক্ত হয়ে বলল : 'হাসছিস কেন না কতখানি ফুলে গেছে, ভীষণ করছে। আমি রাজেনদার বিভ্রান্তি রাখার জন্য খুব গম্ভীরভাবে লাগলাম : 'অম্বিকাদা এই ঘটনাটাকে হাল্কাভাবে নিলে চলবে না। পাড়া কোন গুণ্ডা রাজেনদাকে মারতে আস রাজেনদা কখন তাদের লক্ষ্য হতে পা তারা আমাকে মারতেই এসেছিল। যে এই পথেই রোজ বাড়ীতে ফি অনেকেই জানেন না। কাজেই আমাকে মারবে বলে ঐ জায়গাটা নিয়েছিল। আমাকে মারাটা কোন নয়। কিন্তু পাড়ার মধ্যে যে এই করে গেল, তার একটা বিহিত হবে।' এতক্ষণে অম্বিকাদা বুঝতে ছিলেন, যে আমি এই ব্যাপারটা রাজে কাছে লুকোতে চাইছি। অম্বিকা নিজেকে সংযত করলেন। রাত প্রায় সময় আমরা নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে গেলাম।

পরের এই ব্যাপারটা মাষ্টা শোনালাম এবং বললাম আমাদের স এইরকম আরো অনেক ট্রেনিং হওয়া দ মাষ্টারদা অনুমোদন করলেন। আমারই সহপাঠী নবীনের এইরকম পরীক্ষা হওয়া উচিত। নবীন শা গঠনে প্রায় আমারই মত। বেশ স্মা বলিষ্ঠ। কথা হচ্ছে আমারই সমসা সহপাঠী বলিষ্ঠ যুবকের পরীক্ষা আমি নেব। একটু ভেবে দেখলে বোঝা কাজটি অত সহজ নয়। সবাই জান ধপাস করে চিৎ হয়ে পড়ে যাবে, তা হতে পারে। প্রত্যেকের প্রতিক্রিয়াই যে হবে সেরূপ ভেবে নেওয়ার কোন কারণ না। নবীন হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে প্রতি মণ যে করবে না, তার কোন গ্যারান্টি না। সেইজন্য পরীক্ষকের শারীরিক শক্তি যুযুৎসু প্রভৃতি ভাল জানা দরকার। খুব ভাল জানা ছিল কিনা জানি না আত্মবিশ্বাস ছিল, যে নবীনের এসে কোন আক্রমণ আমি রোধ করতে পারবো। করার অর্থ এই নয়, যে তাকে আমি ফেলবো বা সাংঘাতিকভাবে জখম করব। অক্ষত রেখে, তার হঠাৎ আক্রমণকে দিতেই হবে। সেইরূপ মানসিক প্রস্তু নিয়ে ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে এইরূপ এ

পরীক্ষা নবীনের উপর চালাবার জন্য স্থির করি।

রাজেন দাসের পরীক্ষা অনুযায়ী অম্বিকাদা নবীনকেও আমায় ডেকে আনার জন্য সেই মাঠের পথে পাঠালেন। এখানে একটু বলি, আমরা দাদা এই পরীক্ষার কথা আগে থেকে জানতেন। নির্জন মাঠ, রাত প্রায় ৮-৩০টা। আমি আগের মত সেই ডাকাতের বেশে ওৎ পেতে বসে আছি পায়ে হাঁটা রাস্তার উপরে। নবীন বেপরোয়াভাবে যথাসময়ে এই নির্জন মাঠের ওপর দিয়ে আসছিল। এই নির্জন পথে অস্বাভাবিকভাবে আমাকে বসে থাকতে দেখে সে একটুখানি থমকে গেল। আমাদের মধ্যে দূরত্ব তখন মাত্র কয়েক হাতের। আমার সেই ভীষণ মূর্তি দেখে সে চিনতে পারেনি যে আমি তারই সহপাঠী অনন্ত সিং তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছি। যেমনি দাঁড়ানো, তেমনি আমি দ্রুত পায়ে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার ডান বুকে ছোট একটা ঘুসী মারলাম। সে আমাকে ঘুসী মারতে দেখেই প্রাণের ভয়ে তারস্বরে চট্টগ্রামের ভাষায় চেঁচাতে লাগলো 'উজা, উজা', মানে 'এসো এসো'। সেই রকমভাবে হঠাৎ যে সে চিৎকার করবে, তা আমি ভাবতে পারিনি। এই চিৎকার এক মহা সমস্যার সৃষ্টি করলো। এই মাঠের তিন ধারে লোকের বাড়ী। সব বাড়ীর পেছন দিকটায় এই মাঠটি। ভেবেছিলাম এখনি বাড়ীর লোকেরা ছুটে আসবে। পালাবার রাস্তাটি আমি আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম। অবশ্য রাস্তা বলতে একটিই ছিল, সেখান দিয়ে আমি ছুটলাম। সুকুমারের বাড়ীর কোণা পর্যন্ত আসার পথে আমি আমার কালো ওয়েস্ট কোটটি ও গোঁফ-দাড়ি-টুপী সব খুলে ফেললাম এবং ওদের কম্পাউণ্ডের ভিতরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। এখন আমার নিজ মূর্তিতে দুচার পা এগিয়ে গিয়ে তারপর ঘুরে আবার মাঠের দিকে এগোতে লাগলাম। হঠাৎ যেন আমি 'উজা, উজা' ডাক শুনতে পেয়েছি এমন ভাব করে চেঁচিয়ে বলতে লাগলাম : 'কে কে, কি হয়েছে।' এগিয়ে দেখলাম নবীন। বললাম : 'নবীন, কি হয়েছে?' অকস্মাৎ আমার আবির্ভাব দেখে নবীনের মনে যেন কেমন একটা খটকা হয়েছিল। কিন্তু আমার অভিনয় দেখে তার খটকা কেটে গেল, নিজেকে সামলে নিয়ে বলল : 'গুণ্ডারা আমাকে একা পেয়ে আক্রমণ করে, আর ঘুসী মারে। আমি চেঁচায় উঠলাম বলে তারা পালালো।' 'তোমার টাকা পয়সা কিছু নিয়ে যায় নি তো?' সেই রকম উদ্দেশ্য তাদের ছিল বলে মনে হয় না। আমাকে মারাটাই বোধ হয় তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।' আমি বিজ্ঞের মত একটা বড় রকমের 'হুঁ' বললাম। তারপরে তাকে জিগ্যেস করলাম : 'গুণ্ডারা কয়জন ছিল।' সে অবলীলাক্রমে বলল : 'তিনজন।' 'কোন্ দিকে গেছে?'—জিগ্যেস করাতে সে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল মাঠের দক্ষিণ-পূর্ব কোণটি। ইতিমধ্যে মাঠের তিন দিক থেকে লাঠি ও বাতি হাতে প্রতিবেশীরা দৌড়িয়ে এলো। সবাই আমার পরিচিত। সবাই একসঙ্গে জিগ্যেস করতে লাগলো : 'কি হয়েছে? ব্যাপারখানা কি? কি ঘটেছে?' আমি তাদের সংক্ষিপ্তভাবে ঘটনাটি বললাম। আরও বললাম : 'টাকাপয়সা নেওয়ার কোন চেষ্টাই করল না, কেবল মারার উদ্দেশ্যেই মারলো—এতে আমার মনে হয়, নবীন তাদের লক্ষ্য ছিল না, আমাকেই হয়ত মারতে এসেছিল। ভুল করে নবীনকেই মেরে গেল।' পাড়ার এরকম গুণ্ডামী সহ্য করা যাবে না। আমাদের সজাগ থাকতে হবে। আজকে না হয় নবীন হলো, কে জানে আরেক দিন আর কে এরকমভাবে মার খাবে।' ধীরে ধীরে সবাই চলে গেল। নবীন আমাকে বলল : 'তোকে অম্বিকাদা ডাকছে।'

আমরা দুজন অম্বিকাদার কাছে গেলাম এবং তাঁকে সব খুলে বললাম। নবীনের কাছেও ব্যাপারটা গোপন রাখি। পরদিন মাস্টারদার কাছে সব বলে একটু আলোচনাও করলাম। আমি বললাম : 'দেখুন, কত প্রকৃতির লোক আছে। রাজেনদা 'গুণ্ডাকে' নির্জনস্থানে দেখে ভয়ে তার কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেন, আবার নবীনের সম্পূর্ণ উল্টো প্রতিক্রিয়া। 'গুণ্ডা' তাকে মারতে যাচ্ছে দেখে সে প্রাণপণে চিৎকার করে লোক ডাকতে লাগলো। অন্য প্রকৃতিরও লোক থাকা সম্ভব, যে সে হয়ত উল্টে মারতে আসবে। সেইহেতু এই ধরনের শিক্ষা যে দেবে, তার কিন্তু আরো বেশী শক্তিশালী হওয়া উচিত। এই হলো একটি সমস্যা। যাইহোক না কেন সংগঠনের মধ্যে এইরূপ শিক্ষা প্রণালীর প্রচলন থাকা কর্তব্য। 'তোমরা কর' বলে ছেড়ে দিলে হবে না। যে ট্রেনিং দেবে, তাকেও আমাদেরই শেখাতে হবে এবং এই জাতীয় বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।" মাস্টারদা আমার কথা খুব মন দিয়ে শুনলেন এবং এইরূপ ট্রেনিংই যে প্রয়োজন, তা স্বীকার করলেন এবং বললেন : 'কিন্তু উল্টে মারবে এমন ছেলে কে আছে? আর যদি কেউ আছে ধরে নি তবে যেরূপ বিপ্লবী যুবককে আমাদের মধ্যে শিক্ষা দিতে পারে এমন কে আছে?' মাস্টারদা আলোচনার মাধ্যমে আমাকে অন্তত বোঝালেন যে দলে সংগঠকদের যে উপযুক্ততা থাকা উচিত, তা আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর নিজের এই ধরনের শারীরীক শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা যে নেই, তা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করলেন। কি করে তাঁর পক্ষে মুষ্টিযুদ্ধ, জাপানী কুস্তি প্রভৃতি শেখা যায় সেরূপ একটি পরিকল্পনা যেন আমি তাঁর জন্য ঠিক করি। তাও বললেন। আমি অবশ্য তাঁর উপযুক্ত একটি ট্রেনিং কোর্স তৈরি করেছিলাম এবং কিছুটা কাজ চালাবার মত তাঁকে শিখিয়েছিলাম। আমি ও গণেশ, মাস্টারদাকে সাইকেল চালানো শিখিয়েছিলাম। মজার কথা হলো চট্টগ্রামের পাহাড়ি রাস্তাগুলো নীচে থেকে উপরে ওঠে, আবার উপর থেকে নীচে নামে। প্রায় রাস্তা সেরকম। মাস্টারদা সেরকম রাস্তার মুখে এসে যখন পড়তেন তখন সাইকেল চালিয়ে নিজে উপরে উঠতে পারতেন না। সেই সময় গণেশ বা আমি ঠেলে ঠেলে তাঁর সাইকেলের সঙ্গে দৌড়াতাম। এই করতে করতে তাঁর পায়ের জোরটাও বাড়লো। তারপর নিজেই প্যাডেল করে উপরে উঠতে পারতেন। মাস্টারদা তাঁর শক্তির সীমারেখা যে কী তা বুঝতেন। তাঁর ছোট বন্ধুদের কাছে তিনি সেটা গোপন রাখতেন না। অন্যদের তুলনায় এই ছিল মাস্টারদার বৈশিষ্ট্য। বাস্তব সামরিক শিক্ষা বলতে আমরা কেবল বন্দুক, পিস্তল দিয়ে শিক্ষা দেওয়াটাই মনে করতাম না। আর দলের সভ্যদের সাহসী করে তোলার জন্য সহজ শিক্ষা—যাও অন্ধকার রাস্তা দিয়ে ঘুরে এসো কিংবা অমাবস্যার রাতে শ্মশানে লাঠি পুঁতে এসো প্রভৃতি প্রচলিত শিক্ষা আমাদের সংগঠনের প্রয়োজন মেটাতো না। অমাবস্যার রাতে শ্মশানে যাওয়ার সাহস আর বড় রাস্তার উপরে 'স্বদেশী স্টোর্সের' দরজা ভাঙ্গা, কলেজের গবেষণাগারের সামনে হঠাৎ দপ্তরীর কাছে বাধা পাওয়ার প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে যে সাহস প্রয়োজন, সে সাহস ভূত-প্রেত উপেক্ষা করে চলার সাহস এক নয়। সেই কারণে আমাদের সংগঠনে আমরা অন্য প্রকারে ট্রেনিং দিতাম, যার বর্ণনা আগে দিয়েছি। বুঝেছিলাম যে মানুষকে ভোজালী বা ছুরি বা রিভলবার নিয়ে ভয় দেখিয়ে কিছু অপহরণ করা খুব সহজ নয়। তার জন্য বাস্তব শিক্ষার অনুশীলন প্রয়োজন। সেই জন্য প্ল্যান করেছিলাম যে আমরা আমাদের মধ্যে যুবকদের বেছে নিয়ে দুজনকে এক নির্জন রাস্তায় পাঠাবো কোন একজন পথিককে ভয় দেখিয়ে কিছু ছিনতাই করার সাহস অর্জন করার জন্য। নবীন ও নারায়ণ দাসকে ছোট ছোট দুটি ড্যাগার দিয়ে বললাম, তারা যেন চট্টেশ্বরী কালীবাড়ীর নির্জন পথে সন্ধে ৮টার সময় কোন একজন পথিকের অপেক্ষায় থাকে। যখন কোন এক পথিককে ফিরতে দেখবে তখন দুজনে মিলে ড্যাগার খুলে ভয় দেখিয়ে সেই পথিকের কাছ থেকে মানি-ব্যাগ প্রভৃতি ছিনতাই করবে, অর্থাৎ ছিনতাই করার ভান করবে।

সবার মনে হচ্ছে, দুজন বলিষ্ঠ যুবক নির্জন পথে একজন ব্যক্তির কাছ থেকে ছিনতাই করবে সেটি আবার সাহসের বস্তু কি হতে পারে? অনভিজ্ঞ লোকের কাছে তাই মনে হবে। আমারও তাই মনে হোত যদি না আমার নিজ অভিজ্ঞতা না থাকত—স্বদেশী স্টোর্সে তালা ভাঙ্গার সময় বুকের মধ্যে যে কাঁপুনি অনুভব করেছিলাম, আমার মনে সেরূপ চিন্তাই হোত—এ আবার সাহসের কী পরীক্ষা যে, দুজনে একাকী একটি পথিককে নির্জন রাস্তায় ধরে ছিনতাই করবে? কিন্তু অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। দুজন দপ্তরীর খালি হাতে আকস্মিকভাবে নির্জন রাতে কলেজ গবেষণাগারের সামনে আবির্ভাব আমাকে ও আমাদের তিনজনকে কতখানি বিচলিত করে তুলেছিল, তা আমার সব সময় মনে হোতো বলেই এইভাবে ছিনতাই করার মহড়া যে একটি খুবই বাস্তব শিক্ষার বিষয়—তাতে কোন ভুল নেই। নবীন ও নারায়ণকে সমস্ত বুঝিয়ে এবং তাদের মানসিক প্রস্তুতিতে সাহায্য করে তাদের চট্টেশ্বরী কালীবাড়ীর

পেছনের রাস্তায় পাঠানো হলো।' ওদের পাঠিয়েই আমাদের দায়িত্ব তাতে শেষ হলো না। কলেজে পড়ে ভদ্রলোকের ছেলে জীবনে কখন ভাবেনি যে ছিনতাই করবে। তার যদি ছিনতাই করতে যেতে হয়, তবে তার কারণ যুক্তি দিয়ে বুঝতে হবে। যুক্তি দিয়েই তাদের বুঝিয়ে ছিলাম, তারা বাস্তবে ছিনতাই করতে যাচ্ছে না। এইটি হবে তাদের একটি মহড়া মাত্র। এই মহড়ার সময় যদি কোন কারণে কোন একটি তেমন পথিকের কাছে তারা পড়ে যে ধরা পড়ার আশংকা আছে, তবে তা প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর লোক ও পাড়া প্রতিবেশী ও সহ-পাঠীদের কাছে কী বলে তারা মুখ দেখাবে। এইরূপ ছিনতাইয়ের কী যা অজ্ঞাত হবে। সেই কারণে এই ট্রেনিংয়ের প্ল্যানের গুরুত্ব আমাদের অনুভব করতে বাধ্য করেছিল যে কোন মতেই তারা যেন ধরা না পড়ে এবং তারজন্য আমরা যেন সবরকম ব্যবস্থা রাখি। আমি একটি খাঁকি ফুলপ্যান্ট, খাঁকি শার্ট, মাথায় একটা হ্যাট পরলাম। সঙ্গে নিলাম একটি রিভলবার। নির্মলদাও খাঁকি হাফ-প্যান্ট, সাদা শার্ট ও টুপী মাথায় দিলেন। প্রধান কারণ, খুব দূরে থেকে তাদের ফলো করলেও তারা যেন আমাদের চিনতে না পারে। এইরূপ ব্যবস্থা করে আমরা গিয়ে-ছিলাম। তাদের বলা ছিল, 'আধ ঘন্টা অপেক্ষা করবে, যদি কাউকে না পাও, তবে ফিরে চলে আসবে।' সেইদিন কোন লোকই সেইরূপ নির্জন পথ দিয়ে ৮টা থেকে ৮-৩০টার মধ্যে যায়নি। অগত্যা তারা ফিরে আসছিল। তাই দেখে আমি নির্মলদা আমাদের অস্তিত্ব বুঝতে না দিয়ে চলে আসি। তারা যখন শহরের ভিতরে চলে এলো, তখন নির্মলদা ও আমি নির্মলদার বাড়ীতে সাদা পোষাকে উপস্থিত ছিলাম তাদের মুখ থেকে রিপোর্ট শোনার জন্য। তারা এলো রিপোর্ট দিল, 'কাউকে পাইনি, কাজেই প্ল্যান অনুযায়ী কিছুই করা গেল না।' এই যে রিপোর্ট তারা দেবে, তাতো আমরা আগেই জানি। তবু আমরা ভান করে সবই তাদের মুখ থেকে শুনলাম।

তারপর আমি বললাম : 'অত দূরে শহরের বাইরে নির্জন পথে ৮-৩০টার সময় কোন লোক পাওয়া যাবে না। কাজেই জালে মাছ ধরা পড়বেই। এই ভেবে ঐখানে যাওয়ার আর দরকার নেই। এই জন্য আমাদের বিকল্প স্থান বেছে নিতে হবে। আমি মনে করি, টেলিগ্রাফ অফিসের পাহাড়ের নীচে যে মাঠ আছে, সেই মাঠেই অপেক্ষা করতে হবে এইরূপ একটি মহড়া দেওয়ার জন্য। আমার কথা সবাই মেনে নিল। সেই রাতে আমরা যে যার বাড়ীতে ফিরে গেলাম।

তার পরদিন নির্মলদা আমার সাথে দেখা করলেন। নির্মলদা বললেন, 'নারায়ণ আমার কাছে বলেছে যে সে এ ধরণের কাজে আর যাবে না। সে আরো বলেছে : 'আমি লেখাপড়া করব, আপনাদের প্রতি আমার সমর্থন থাকবে। কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য যদি এই ধরণের ট্রেনিং অপরিহার্য হয়, তবে আমাকে মাপ করবেন, আমি তা করতে পারব না। আপ-নারা আমার উপর রাগ করবেন না. আমাকে ক্ষমা করবেন।' নির্মলদা এইটুকু জানিয়ে আমায় বললেন, 'নারায়ণ আমাদের সঙ্গে সক্রিয় বিপ্লব করবে না. এটা অত্যন্ত ঠিক। আমাদের যে সে আগে বলে দিল, সেটা আমাদের উভয়ের পক্ষে খুবই ভালো হলো।' আমি নির্মলদাকে জানিয়ে ছিলাম. 'আমার মনে হয় নারায়ণের আপনাকে এভাবে খোলা-খুলি না বলে তার নিস্তার ছিল না। যদি না বলত, তবে তার নতুন নতুন এই ধরণের ট্রেনিংস কোর্সে অংশ গ্রহণ করতেই হোত। এই কারণে সে ভয়ে আপনাকে বলতে বাধ্য হয়েছে। নির্মলদা এখন বুঝে দেখুন আমাদের বিপ্লবী সদস্যদের মুখে বিপ্লবের লড়াই কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই। আমাদের ট্রেনিং হবেই। আর যারা এরূপ ট্রেনিংয়ে সামিল হবে না তাদের সংগঠন থেকে বেরিয়ে যাওয়াই ভাল। এইসব সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে ভবিষ্যতে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' নির্মলদা আমার সঙ্গে একমত হলেন, তবে তাঁর সদস্যদের প্রতি তখনও ভুল ধারণা ছিল। তাঁর ধারণা ছিল ধীরে ধীরে ও ক্রমে ক্রমে বিপ্লবী সদস্যরা তাদের

জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারবে। বাস্তবে তা হয় না। সেইজন্য সংগঠনে ঐ ধরণের সামরিক শিক্ষার কর্মসূচী রাখতেই হবে। তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের কাছে খবর এলো পাড়ার একটি বাড়ীতে সন্ধ্যার সময় রোজই ঢিল পড়তে থাকে। যার বাড়ীতে ঢিল পড়ে সেই বেচারী ভয়ে অস্থির। কারণ তাঁর বিবাহযোগ্যা দুটি মেয়ে ছিলেন। খবরটি পেয়ে আমরা বেছে বেছে ৫।৭ জন সেই বাড়ীর উপর এইরূপ ঢিল পড়া বন্ধ করতে গিয়ে-ছিলাম। মনে আছে সেই ৫।৭ জনের মধ্যে নবীনও একজন ছিল। আমরা অন্যের অজান্তে গোপনে বেছে বেছে বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে ছিলাম। নবীন একজনকে ঢিল ছোঁড়ার সময় ধরে ফেলল। তারপর আমরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের গ্রুপের সবারই সং-বাদ পেলাম। বিচার তখনই করলাম। বিচারের রায়ও তখনই দিলাম। ওকে ধমক দিয়ে জানিয়ে দিলাম : 'ঢিল পড়ার সংবাদ আর যেন না পাই। যদি আমাদের কাছে সেইরূপ সংবাদ যায় ও আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে আমরা বাড়ীর কর্তাকে সাহায্য করব এবং আমাদের কঠোর পাহারার মধ্যে যারা ঢিল মারবে, তারা ধরা পড়বে। যারা ধরা পড়বে, তাদের আর রক্ষা থাকবে না। যাও, এখন থেকে বুঝে চলবে।'

পাঠকবর্গ প্রশ্ন করতে পারেন, আপনারা যেমন যুবকদের শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে এই ধরনের কর্মসূচী রেখেছিলেন সেইরূপ নিয়ে আর কোন বিপ্লবী সংগঠন কি চলেছিল? আমি যখন ডিকটেশন দিচ্ছিলাম তখন আমার পরিচিত একজন আমাকে বলল : 'যদি কিছু মনে না করেন, তবে একটা প্রশ্ন করি। আপনি যেরূপ শিক্ষার কথা বলছেন আপনাদের নিজ সংগঠনে এইরূপ শিক্ষা কেউ দিয়েছিল?— প্রশ্নটি খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু উত্তর দেওয়াটা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর ছিল, কারণ বলতে হবে অন্য সংগঠকদের কথা। এই সময় থেকে আরও প্রায় দুবছর পরের সংগঠন ও সংগঠকদের অবস্থা। একদিন সকালে অম্বিকাদা আমাকে ডেকে পাঠালেন পোড়ো ন্যাশনাল স্কুলের একটি ঘরে। তিনি সেদিনই কল-কাতা থেকে এলেন। মাস্টারদাদের সঙ্গে তাঁর তখন দেখাও হয়নি। তিনি বললেন : 'তুই আর কেদারেশ্বর ডবল মুরিং জেটীর রাস্তা যেটি ঢেবার (একটি বড় দিঘীর নাম) পাশ দিয়ে গেছে, তার উপর অপেক্ষা করবি প্রায় ১২টার সময় সেই রাস্তার উপর দিয়ে একটি ঘোড়ার গাড়ী এ বি রেলের টাকা নিয়ে জেটি অফিসে যাবে বেতন দেওয়ার জন্য। ফিটন গাড়ীর ভিতরে পা রাখার জায়গায় টাকার থলিগুলো থাকে। তোরা গাড়ীটাকে আটক করে যে কটা থলি নিতে পারিস তা নিয়ে ঢেবার উত্তর দিকের মাঠ দিয়ে দৌড়ে চলে আসবি। তুই রিভলবারটা সঙ্গে রাখবি, কেদারকে দিবি একটা ড্যাগার। তাকে আমি খবর পাঠিয়েছি, সে এখনি এসে পড়বে। এই হচ্ছে প্ল্যান, মনে এ . বলে দিল। অম্বিকাদাকে আমি ... সমালোচনা করিনি, করবার ইচ্ছাও ছিল না। আমি খুশী হয়ে যাই প্রথম একটি ডাকাতি করার জন্য আমাকে পাঠানো হচ্ছে বলে। কিন্তু, মজার কথা হলো, আমি বা কেদারেশ্বর কেউই অম্বিকাদার নিকটে নই। এই প্ল্যানটা যে কার এবং এই অ্যাকশনের সিদ্ধান্তটা কে নিয়েছে, তা বোঝা গেল না। তবে এই সিদ্ধান্ত যে মাস্টারদার নয়, তা বুঝেছিলাম কারণ এরকম খেলো ও সুপরিকল্পনাবিহীন অ্যাকশনের কথা তিনি ভাবতে পারতেন না। এইভাবে কোন নিয়মা-নুবর্তিতা ছাড়া আমাদের সংগঠনও চলেছিল। আর ভাবলেও অবাক হতে হয় কি করে এক মিনিটে রেলের টাকা ডাকাতি করার প্ল্যান করে ফেলেছিলেন এবং আমাদের দুজনকে সেখানে পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন! অম্বিকাদা তখনও জানতেন না ছ'ঘড়া রিভলবারে কার্তুজ ছিল মাত্র পাঁচটি। একটি কার্তুজ আমি ফায়ার করেছিলাম। আর ঐ বুলেটটার মত, সীসা ঢালাই করে আরেকটা বুলেট ঐ খালি খোলের মুখে লাগিয়ে রাখি। জানা না থাকলে এটা যে একটা ফায়ার করা কার্তুজ তা অম্বিকাদার মত লোকেরও বোঝার ক্ষমতা ছিল না। রিভলবারের পাঁচটি কার্তুজ নিয়ে ও একটি ড্যাগার নিয়ে ডাকাতি করতে দিনের বেলায় সহরের রাস্তার উপরে যেতে

ম্বিকাদা ঠিক করে ফেললেন। তিনি
রাখতেন না যে একটা কাতুর্জ আমি
একটা নকল কাতুর্জ বানিয়ে সেখানে
মাস্টারদা জানতেন এবং বিশেষ
তাঁকে বলা হয়েছিল। কিশোর
আমাদের উদ্ভট উদ্ভট গল্প বিপ্লবী
বলতেন। জলুদা একদিন তার শোনা
আমাদের কাছে বলেন। বোধহয় তিনি
লেন বিপিনদা, যতীনদা—কারো কছ
বা তিনি নিজের মন থেকেই বানিয়ে
লেন। গল্পটা হলো এই—দেখ
জান না, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দও অস্ত্র
শিক্ষা দিতেন। যখন ক্ষুদিরামকে
হেবকে গুলি করার জন্য দার্জিলিংয়ে
া হয় তখন অরবিন্দ বলেছিলেন, খুব
করে সিলেকট করে তবেই পাঠাতে
সেইজন্য কয়েকটি ছেলের সঙ্গে একটি
কক্ষে তাঁরা মিলিত হলেন। অরবিন্দ
ন আর ৫।৬টি ছেলে উপস্থিতও। অর-
টেবিলের উপরে একটা রিভলবার রাখ-
এবং সভাদের বললেন : 'অ্যাকশনে কে
কে রিভলবার নেবে ? সে এই রিভল-
তুলে নাও।' সবারই হাত বেরিয়ে
। অরবিন্দ তাদের সাবধান করে
লেন, 'পরীক্ষায় পাশ না করলে রিভলবার
হবে না, অ্যাকশনেও পাবে না।' এই
সবাই নিজ নিজ স্থানে ফিরে গেল।
অরবিন্দ বলল : 'দয়া নেই মায়া
। তোমারি অন্তর নিষ্ঠুর প্রতীকায়
উঠবে, তবেই তুমি গুলি করে মারতে
। তুমি কি তোমার অতি প্রিয়জনকে
জনবোধে গুলি করে মারতে পার ?
ক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমাকে দেখে নিতে
তোমাদের প্রিয়জনকে গুলি করতে
দের হাত কাঁপে কি না। তাই রিভল-
নিয়ে দেওয়ালের ঐ পাশে গিয়ে দাঁড়াল।
দিলাম তুমি রিভলবারটি নাও। আমি
মার সামনে ঐ পাশের দেওয়ালটিতে গিয়ে
াচ্ছি। আমি আমার মুখের সামনে
ল ধরছি, তুমি আমাকে লক্ষ্য করে
লি ছুঁড়বে। ওয়ান, টু, থ্রি বলার সঙ্গে
ট্রিগার টিপবে।

দুজনে ঘরের দুদিকে রেডি হয়ে
ড়াল। রুদ্ধশ্বাসে অন্যরা প্রমাদ গুনছিল
হবে, কি হবে। ক্ষুদিরাম কোন কিছু
ক্ষেপ না করে রিভলবারটা নিশানা করল।
বিন্দ এক, দুই তিন বলার সঙ্গে সঙ্গে সে
য়ার করল। রুদ্ধ কক্ষে জোর আওয়াজ
লা, বাতিটি নিভে গেল। সবাই যখন
বাত ফিরে পেল, তখন দেখা গেল অরবিন্দ
ডং গাতিতে বসে পড়েছেন। আর রিভল-
রের গুলিটা দেওয়াল ভেদ করেছে। আমি
গল্প শুনে খুব অবাক হয়েছিলাম এবং
বিন্দের প্রতি খুবই আকৃষ্ট হই। তখন
াদের কাছে এরকম বহু আজগুবি গল্প
নেছি। কিন্তু তখন আজগুবি ভাবতে
কে করত না। এই আজগুবি গল্পের
াবে আমি ভেবেছিলাম অম্বিকাদাকে এই-
প একটি টেস্ট করব। আমার কিশোর
নর আতিশয্যে এইরূপ একটি ডামি কাতুর্জ

তৈরী করি এবং প্ল্যান করেছিলাম
অম্বিকাদাকে বলব : যদি কোন সত্য
পুলিশের চর হয়েছি জানেন, তবে আপনি
তাকে গুলি করে কি মারতে পারবেন ? সেই
পরীক্ষাটা আজ দিন এবং সবাই দেখুক আপনি
আমাকে গুলি করুন। এই বলে অম্বিকাদাকে
আমি রিভলবারের খড়াগুলি এমনভাবে
ঘুরিয়ে দেব যাতে তিনি ট্রিগার টিপলে পরে
রিভলবারের ঘোড়াটি নকল কাতুর্জের উপরে
গিয়ে পড়ে। অম্বিকাদাকে টেস্ট করার এই
প্ল্যানটি মাস্টারদাকে জানিয়েছিলাম। মাস্টারদা
হয়ত আমার এই আতিশয্যের কথা শুনে মনে
মনে হেসেছিলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলেন
নি। কিন্তু আজকে যখন কোন আগ্রেম

প্ল্যান ছাড়াই একটি অ্যাকসনে পাঠিয়ে দিচ্ছেন
তখন তাকে বলতেই হলো রিভলবারে পাঁচটি
কাতুর্জ আছে, দুটি নেই। অতিরিক্ত
কাতুর্জ একটিও ছিল না। আজ খুব পরি-
ষ্কার করে বলতে পারি, সেই প্ল্যানবিহীন
অ্যাকসনে আমরা ধরা পড়তামই। ভাগ্যিস
সেই পথে অম্বিকাদার সংবাদ অনুযায়ী কোন
গাড়ী রেলের টাকা নিয়ে জোটিতে বেতন
দেওয়ার জন্য যায় নি। এই ছিল সংগঠনের
আসল চেহারা। বড়াই করে বলা যায়
'আমরা সেরকম সবাইকে ট্রেনিং দিতাম'।
বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। তার একমাত্র কারণ
আমরা দলের নেতারা উপযুক্ত সংগঠক
ছিলাম না।

ইংরেজ ধরে ফেলেছে। এদিকে ন অফিসারদের নিয়ে নৌকো করে গতঃ। সাতখানার মধ্যে ছখানাই মত স্লেভার-জাহাজ হিসেবেই গড়া। টি যেন ঐ ছটিকে রক্ষা করার জন্যই পাইরেট জাহাজ। এমনি ধরা প্রায়ই ত লাগল। কখনও কখনও আমে- ন জাহাজই আমেরিকান জাহাজ ধরত। সঙ্গে তিন-চারখানা স্লেভারও ধরা ১। তবু ব্যবসা চলত। সোনা ধরা পড়ে, ফম, গাঁজা, হিরোঙ্গন, কোকেন ধরা ১। তবু ব্যবসা চলে। কি করে চলে? ণ স্পষ্ট। যা ধরা পড়ে না তা যা ধরা ১ তার ঢের বেশী লাভ এনে দেয়। দা পাল্টালো এবার। আমেরিকান াজ। দাস ভর্তি। ধরা পড়ল। দশখানা হাজের প্রত্যেকখানার কাগজপত্র প্রমাণ াছে তারা স্পানিশ জাহাজ!! আর এক- নাও ইয়াংকী জাহাজের পাত্তা নেই। হঠাৎ পেতেন এবং ধবজা পাল্টে তারা রাতারাতি র স্পানিশ হয়ে গেছে। ইংরেজকে হাত াটাতেই হল। কী করে সে ইংরিজী আইন পনের ওপর (কোন্ অধিকারে) লাগু রবে?

ইংরেজকে আমেরিকা বোঝাল াফ্রিকার উপকূলে খবরদারী জারী রাখার ন্য তার ইয়াংকী জাহাজের অবকাশ নেই। ংরেজও প্রেসিডেন্ট মনরোকে বলল,—দাস ব্যবসাটাকেই বোম্বেটে বলে বেআইনী করে দেওয়া হোক। (বোম্বেটে ধরা পড়লেই াঁসী। এই নিয়ম।) এই সর্তে এক সন্ধিও স্বাক্ষরিত হল। সন্ধিটা গোল আমেরিকান সেনেটে। সন্ধির সর্তগুলোতে সেনেট এমন কতগুলো বাঁধন এঁটে দিল যে সন্ধি একেবারে ঠুঁটো জগন্নাথ। ইংরেজ বললে,— ঘাট হয়েছে ভাই। ও সন্ধিতে কাজ নাই।

এল ১৮৩১। ফ্রান্স আর ইংরেজ করল এক চুক্তি। প্রয়োজনমত একে অন্যের জাহাজে চড়াও হয়েও খানাতল্লাসী নিতে পারবে। বোঝা যাচ্ছে যে ইংরেজ এবার মনে-প্রাণেই এ ব্যবসায় তুলে দিতে চায়। কারণ আমেরিকার পাঁচ আঙুল ঘির ভেতরে ডোবান, অথচ ইংরেজের মাথারও নেই এক ফোঁটা তেল। এ অসহ্য। একশো ইঁদুর বধের পর বেড়ালও নাকি বৈষ্ণবী হয়ে যায়। আমি মাড়োয়ারীকে রিটায়ার করার পর গুরুর বাক্যে তীর্থে গিয়েও ধর্মশালায় ব্যবসা করতে দেখেছি! দুই মাতব্বর ফ্রান্স আর অংরেজ বার বার আমেরিকাকে ডাকে, সাড়া দাও এই শুভ- কর্মে। আমেরিকা — দেমাক্রাসীর সদর কাছারি আমেরিকা, — তখনও পশ্চাদ্দেশ ফিরিয়েই রইলে। হার মেনে অবশেষে ইংরেজ সেই আগা-পাছ কাটা নাকচ সন্ধি- পত্রটাই স্বাক্ষর করতে রাজি। এবার কিন্তু আমেরিকা বলল,—যুক্তরাষ্ট্র সিদ্ধান্ত নিয়েছে দাসপ্রথা নিয়ে এখনও কোন বাঁধা ধরার মধ্যে পড়ার সময় আসে নি।

অতএব এন্তার জাহাজ তারা-ডোরা পতাকা লাগিয়ে অতলান্তিকের এপারের আফ্রিকা ওপারে নিয়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, যাচ্ছেই। জাহাজের আর শেষ নেই। যখন য়োরোপের প্রতি রাষ্ট্র দাস ব্যবসায় নিরোধ করে আইন বেঁধেছে তখন আমেরিকায় সেই দাস ব্যবসায়েরই জমজমাট অবস্থা। বাক্সটন বলেছেন ১৮৩৯—এই দাসের সংখ্যা লক্ষ পার হয়ে গেছে। পরের বছর দেড় লক্ষ আফ্রিকান, ৫০ হাজার আরব। এটা ফলিয়ে বলার কারণ আছে। আমে- রিকার দাসপ্রথা বন্ধ হওয়া নিয়ে আব্রহাম লিংকন বাবদ আমাদের নৈতিক চেতনায় বেশ জোরাল একটা আলো জ্বলে। সেই আলোটা কত সত্য, কত ধাঁধা বোঝার দরকার।

সবটাই কিন্তু সবার জানা হলেও 'গোপনে' চোরা কারবার হিসেবে চালু। কাজেই মৃত্যুর হারও বাড়ছে। 'কন্নীপার' জাহাজের খোলে বড়জোর শখানেক লোক রাখা যায়, অথচ ধরা পড়ার ভয়ে গাদিয়ে যাচ্ছে দুশো। মরবেই। আর যারা সেই আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে মোজাম্বিক থেকে দাস নিয়ে আসত তাদের মধ্যে বসন্তে, বিসূচিকায়, আমাশয় — মরতো আর মরতো।

একটি জাহাজের ঘটনা অমর হয়ে আছে। জাহাজের নাম রোদেঁা। ফরাসী জাহাজ। মোজাম্বিক থেকে দাস লাদাই করে চলেছে। দুশো টনের জাহাজ। দাস নিতে পারে নিয়মমত ৬শো। নিয়েছে ১৬২। ঝড়ে, এলোমেলো বাতাসে গতি হয়েছে অবরুদ্ধ। পথ হয়েছে আবর্তিত। ফলে জলের রেশন গেছে কমে: দিনে এক কাপ,

চোখের রোগ এল। সকলে অন্ধ হতে থাকল। অন্যদের বাঁচাতে প্রথম ৩৯ জনকে কাপ্তেন জলে ফেলে দিয়েছিল, কিন্তু তখন লাদা খালাসীরাও আক্রান্ত। একটি খালাসী ছাড়া নাবিক-কাপ্তনসহ সে জাহাজে সবাই অন্ধ তখন। ইতোমধ্যে দূরে এক জাহাজ। জাহাজের নাম 'লিয়'। লিয় কাছে আসতেই অন্ধের দল রেলিংয়ের ধারে এসে মিনতি করতে থাকে। আমরা অন্ধ হয়ে গেছি, পথ দেখিয়ে আমাদের কোন বন্দরে নিয়ে যাও। চোখ দাও, চিকিৎসা দাও। গতি দাও। লিয়' সরে পড়ল, কে এ ঝক্কী নেয়! কি রোগ কে জানে: শেষে কি নিজেরাও অন্ধ হবে নাকি? পালিয়ে লিয়' কিন্তু বাঁচতে পারে নি। মহাসমুদ্রে লিয়' কোথায় হারিয়ে গেল। অদ্যাবধি তার পাত্তা কেউ জানে না। এদিকে রোদৌ'র সেই একটি চক্ষুষ্মান নাবিকই কোনওক্রমে জাহাজকে এনে ভেড়াল গুয়েদালুপে। কিন্তু কি অভিশাপ! তীরে নামার সঙ্গে সঙ্গে সেই একমাত্র চক্ষুষ্মান কাণ্ডারীও অন্ধ হয়ে গিয়েছিল!

এমনি আর একখানা জাহাজ। নাম বিক্লাস্তে। বিক্লাস্তের ঘটনা আরও ভয়ানক। দাস-জোগান দিত কুবায় আইনের চোখে ধুলো দিয়ে। একবার ইংরেজ পুলিশী জাহাজের সঙ্গে মোকাবিলা হয়। ফলে সে জাহাজখানাকে দু ভাগ করে দিয়েছিল বেক্লাস্তে। আর একবার স্লুপে করে নৌসেনা চড়াও হতে চায় বিক্লাস্তের ডেকে। এমসা বেধড়ক মার দিয়েছিল সেই স্লুপওলাদের যে বেক্লাস্তের নামের কাছেও জাহাজ আসতে ভয় খেত। কিন্তু সেবার বেক্লাস্তে পড়ে যায় এক সঙ্গে চারখানা ক্রুজারের কবলে। বেক্লাস্তের খোলে তখন ছশো দাস! ধরা পড়লে দাস তো যাবেই, বেক্লাস্তেই বাজেয়াপ্ত; ব্যবসা খতম; বেক্লাস্তের 'মামডাকে' কালি পড়বে।

বুদ্ধি করল কাপ্তেন। নোঙরের চেনটাকে রেলিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্যাঁচাল। সেই প্যাঁচান শেকলের সঙ্গে হাত বেঁধে ঝুলিয়ে দিল ছশো দাস একে একে। তারপর নোঙর দিল জলে ছেড়ে। যেন জাহাজ লক্ষ্মীছেলের মত নোঙর করে বলছে, এসো কি দেখবে দেখ। কোথায় দাস, কোথায় কি? চড়াও যারা হল তারা রান্নার জায়গায় দাসেদের রান্নাও দেখতে পেল। জাহাজময় দাসের সেই বিভীষিকা গন্ধও, দাস বাসের চিহ্ন। বিলকুল স্পষ্ট। কেবল দাস নেই। জলে কোথাও কোন চিহ্ন নেই যে কারুকে ডুবিয়েছে। বুদ্ধ বনে গেল কাপ্তেন। বেক্লাস্তের ডেক ছেড়ে চুপটি করে চলে যেতে হল। বুঝল বুদ্ধু করে ছেড়ে দিল বেক্লাস্তে। যখন যাচ্ছে, বেক্লাস্তের রসিক খালাসীদের টিটকারী আর হাসিতে ইংরেজ ইনসপেকটররা পালাতে পারলে বাঁচে।

কাহিনী বন্দরে বন্দরে মুখে মুখে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এই প্রসিদ্ধি ছাড়া এ কাহিনীর খুঁটিনাটি নাড়াচাড়া করে দেখলে অনেক গলদ বেরিয়ে পড়ে। তবু নিগ্রোদের মহলে এ কাহিনী প্রসিদ্ধ। কিন্তু সেদিনের জাহাজের কাহিনী ঐতিহাসিক, এবং বড়ই করুণ। জাহাজে তখন সত্যিই কোন নিগ্রো ছিল না। ছিল কাপ্তেনের প্রেয়সী এক নিগ্রো তরুণী। কাপ্তেনের কাছে সে কেবল তরুণী নয়, নিগ্রো নয়। অনেক বেশী কিছু। কিন্তু যখন জাহাজে খানাতল্লাসী চলবে তখন একটি নিগ্রো পেলেও জাহাজ হাতছাড়া হয়ে যাবে, বাজেয়াপ্ত হবে, আরও সাজাও হতে পারে। তরুণীকে কাপ্তেন ডুবিয়ে দিতে চাইল লোহার নোঙরে বেঁধে। তরুণীটি কাপ্তেনের বিপদ বুঝে একটি শব্দও না করে নোঙরসহ সাহেবকে বিদায় জানাতে জানাতে ডুবে গেল। সেই থেকে আইন বদলালো। যদি জাহাজে নিগ্রো হাতেনাতে নাও পাওয়া যায়, দাস জাহাজ বলে যদি স্পষ্ট চিহ্নে সনাক্ত করা যায় কোন জাহাজকে, সেই চিহ্নের বলেই তাকে সাজা পেতে হবে।

অর্থাৎ ক্রমশই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আইন কড়া হয়ে উঠছে। ইংরেজ নিজে যখন এ ব্যবসায় করতে পেল না, অন্যকেও কিছুতেই করতে দেবে না। এ রকম পুলিশী খবরদারীর ফলে বহু দাস জাহাজ ধরা পড়েছে। কিন্তু এতই লাভ এ ব্যবসায়, হাজার ধরা পড়লেও বন্ধ তার হতে চায় না। বেশীর ভাগ দাস বওয়া জাহাজের ডগায় ওড়ে আমেরিকান পতাকা; বৃটিশ জাহাজ বোঝে ধরলেই ঝামেলা। তা ছাড়া ধরবে কাকে? জাহাজ, কাপ্তেন, আইন, আদালত—এ সব তো জটলা করতেই থাকবে। এবং এই সব ঝামেলা ছাড়াতে যে সময় যাবে তার মধ্যে জাহাজের মানুষগুলোর হবে কী? সেই আফ্রিকার কূলে ছেড়ে দিতে হবে। তারপর? আনবার সময়ে তো মালের হেপাজতের তাড়ায় তাদের তবু যা কিছু পানাহার আশ্রয় যদি বা জুটেছিল, ফেরার সময়ে চারশো মানুষে জাম্মা সামলাবে কে? যাবে তারা কোথায়? পথ কী? কে বাতলে দেবে? তার মধ্যে অন্য সব আফ্রিকান সর্দারেরাই বা আবার ধরে আবার বেচবার জন্যে আটকে রাখবে না কেন? ১৮৩০এ হাউস অব কমন্সে কাপ্তেন রিংগহ্যাম বয়ান দিচ্ছেন যে তিনি একটি জাহাজে এককালীন ৪৮০টি দাস পুরেছিলেন। কিন্তু হায়,— লীওন-এ পৌঁছুতে পৌঁছুতেই ১১০ জন অক্কা! মোট জাহাজী মালের অন্তত ৪৪ শতাংশ বেঘোরে মারা যেত। 'স্নেক'-জাহাজের দাসেদের ব্রাজিলে নামতেই দেয় নি, ফলে তাদের ফিরতে হল। পথেই মলো ১৯০! 'ফেনোর-দা-লাস্পো' জাহাজে ঐ অবস্থায় ২৮৯ জনের মধ্যে মাত্র ৪০ জন বেঁচেছিল।

তবুও লাভের অঙ্ক ব্যবসায়ীদের ঘাটতি হয় নি। কারণ ততদিনে রেড ইণ্ডিয়ানদের খতমই করে দিয়েছে শ্বেতাঙ্গরা, এবং আমেরিকার জমি প্রায় সবই লাঙল-জাত হয়েছে, খনিগুলোও চলছে দুর্দাম বেগে। রেল ইঞ্জিনের পরে বাষ্প-বিদ্যুতের কৃপায় শিল্প জগতে মহাবিপ্লব শুরু হয়ে যাবে নিঃসন্দেহে। নগরের আশে পাশেই লক্ষ লক্ষ 'শ্রমিক'-এর বসতি হবে। আর দাস রাখার ঝামেলা পোয়াতে হবে ন[illegible] দাসের বদলী শ্রমিকরাই মাত্র ভাড়া[illegible] খাটবে। তাদের থাকা-পরা-খাওয়ার ঝামে[illegible] তারা নিজেরাই পোয়াবে। টাকা পাবে [illegible] হাতে, বাঁ হাতে ঢুকতে না ঢুকতে [illegible] হাতেই সে টাকা তুলে দেবে খাদ্য কিন[illegible] ভাড়া মেটাতে, কাপড় জোটাতে, হালে পা[illegible] না পেয়ে গিলবে মদ, খেলবে জুয়া, মেয়ে[illegible] মানুষ ঠেঙ্গাবে, তার ব্যবস্থাতে শুঁড়িখা[illegible] ভাঁটিখানা, জুয়ার আড্ডা, বেশ্যাল[illegible] খুলে দেওয়া যাবে। বাস্তুধনরা স্বাধীন[illegible] খেসারৎ পোয়াতে পোয়াতেই হালাকান [illegible] যাবে। তা ছাড়া সেকালে যে মহাজনের দা[illegible] মরত পুরোপুরিই লোকসান যেত। এখ[illegible] শ্রমিক মলে ফের শ্রমিক পাওয়া যা[illegible] লোকসান নেই এক পয়সা। শ্রমিকের জ[illegible] জন্য মালিকের যা কিছু দায়িত্ব সে কেব[illegible] ঐ ফ্যাকটরীতে, অফিসে, ব্যাংকে কা[illegible] করার সময়টুকুই। তার বাইরে [illegible] বাঁচুক, মরুক, কাঁচকলাটি। যদি কা[illegible] মধ্যেই মরে,—ফাদিশ ফেরার আ[illegible] কুণ্ডলিনী জটাজাল ভেদ করে যে পা[illegible] হাতাতে পারবে সে এখনও বহুৎ দূরে। [illegible] নিয়ে যদি জনু বেশী তেড়িয়া মেড়িয়া [illegible] দূর করে দাও, 'পরু'কে রাখো। বা[illegible] শহরময় নিষ্কর্মা জমিহীন বেকারের [illegible] জমিয়ে রাখো। সেটাই বরং লাভের। দ[illegible] রাখার দরকার কী? এককালে আমেরি[illegible] 'খাটবার' মানুষ ছিলো না। এককো[illegible] অন্ততঃ তিনপুরুষ দাস, দাসদা বাচ্চা, [illegible] বাচ্চা জমা হয়ে গেছে। বাচ্চা-মেয়ে-ব[illegible] সবাই খাটছে। এখনও যদি বা 'আমদা[illegible] করতে হয়ই, বেশ, তাদের কুরণের খা[illegible] দাও, 'কনট্রাক্ট' দাও, 'চাকরি' দা[illegible] ইনডেনচার্ড লেবার (মুচলেকা) করে [illegible] পাঠাও। তারপর তাদের ঘিলু চটকে উল[illegible] বানিয়ে দাও। [illegible] প্রভুর দেশে [illegible] খেয়ে প্রভুভক্ত [illegible] প্রভুর প্রিয় কু[illegible] তোষামোদ করে করে দেশের ডাক, আ[illegible] আলো বিলকুল ভুলে গিয়ে যুগ যুগ [illegible] ভাড়াটে দাস, ভাড়াটে সিপাহী, ভাড়া[illegible] পুলিশ, ভাড়াটে শ্রমিক, ভাড়াটে খালা[illegible] বিডিবে, আর্জাবে, সেয়ানা করবে। কারখানা ভরে দেবে।

এ যুগ যে আসছিলো তা দা[illegible] ব্যবসায়ীরা বুঝতে পেরেই মোটা দা[illegible] মোটা খেসারতে দাসগুলো বেচেছিলো [illegible] ইংরেজ পার্লামেণ্ট প্রচণ্ড টাকায় দাস [illegible] মুক্তি কিনলো। অর্থাৎ দাস ব্যবসা[illegible] তখন এতো টাকা, এতো লাভ, যে [illegible] টাকার কিছু অংশেই মুক্তি ব্যবস্থা হোলো। মাছের তেলে মাছ ভাজা হোলো। তবুও [illegible] কিনলো অংরেজ, বড়ই বদ-আনা [illegible] তো বদনা জাত টাকা ঢেলেছিলো [illegible] সেই টাকাই এক লাফে আমেরিকা [illegible] এংলো স্যাকসন সম্পত্তির সদর [illegible] খুলে দিয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিপ্লব[illegible] ঘাড়ে সেই যে চেপে বস[illegible] আজও নামবার দরকার হয় [illegible] সে টাকার পরিমাণ শুনলে বি[illegible] লাগবে। প্রলেরো মিলিয়ন পাউণ্ডের তথ

কার দিনে গোটা ইংলণ্ডই কেনা যেতো। আজ তো ডলারের চাপে পাউণ্ডের যা অবস্থা, আমেরিকার থলের মধ্যে ইংলণ্ড কেন, য়োরোপেই না চলে যায়।

তার মানে কী আমেরিকা সদাচারী হয়ে দাস বিক্রী বন্ধ করে দিলো? ১৮৩৯ 'ঈগল', ১৮৩৯ 'ক্যারা', 'বোল্লাডোরা', 'পাজ'—জাহাজের পর জাহাজ ধরা পড়ছে। কত বলবো? আমেরিকান ফ্ল্যাগের তলায় স্পানিশ জাহাজ। প্রমাণও হোলো স্পানিশ জাহাজ। আদালত বললো,—'জাহাজেই যদি না চড়লে, তো খানাতালাশীটি নিলে কী করে? খানা-তালাশী না নিলে, তো মালুম হোলো কী করে? মালুম নৈলে প্রমাণ কী?—সুতরাং জাহাজে চড়তে হবেই। আর আইন বলছে আমেরিকান পতাকার তলায় যে জাহাজ তাতে চড়ার জন্য আমেরিকান অনুজ্ঞা চাই। সে অনুজ্ঞা নাও নি। আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করেছো।' ফলে এপার-ওপার উভয় পারের প্রচার বিভাগ, কাগজপত্র, পত্রিকা হৈ হৈ করে উঠলো। লাভ কেবল ক্যা হুয়া—ক্যা হুয়া—হুক্কা হুয়া। 'কী করে কেউ আমাদের পতাকা সত্ত্বেও চড়াও হয়ে জানতে চায় এ পতাকার অপব্যবহার করা হয়েছে কি না' ফ্রান্সে যে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ছিলেন সেই লিউইস্ কাস্-এর উক্তি। 'ইংরেজ জাহাজগুলোর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। ক্ষেমতার গুমোরে লোকের জাহাজ নিয়ে যা-তা করে ব্যবসা বাণিজ্যের বারোটা বাজবার যন্তো ফিকির।'

যুক্তরাষ্ট্র দাস ব্যবসায় জিইয়ে রাখার জন্য যুদ্ধ করতে তখন প্রস্তুত। কিছু মানুষ তা বিশ্বাস করতে চাইছে না। কে আর আজই বা বিশ্বাস করতে চেয়েছে যে, এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর স্বাধীনতা স্বাতে বানচাল না হয়ে যায়, সে চেষ্টা কেবল যুক্তরাষ্ট্রেরই, আফ্রিকায় কে কোথায় কোন্ নদীতে বসবে সে-ভাবনাও যুক্তরাষ্ট্রেরই, কোন দুরাত্মা কবে ভাবতে পেরেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা বাজে খবর উড়িয়ে কোনো স্বাধীন দেশের ক্ষতি করবে, বা খুনে লাগিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রের ভবলীলায় দাঁড়ি টেনে দেবে, বা গাঁটের কড়ি হুড় হুড় করে ঢেলে অন্য দেশে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাবে, ফিকির করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গুলি চালাবার ব্যবস্থা করবে। বিশ্বাস করার যোগ্য কি এ-ব্যাপার? বিশ্বাস তো আমরাও করতে চাই না। কিন্তু হঠাৎ যেন বিশ্বময় 'ভণ্ডা ফোড়' গুম্ খবরের পচা হাঁড়ি ফাটার হিড়িক লেগেছে। কাগজ-গুলো বলছে, হ্যাঁ, এসব হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে এক-জন সেনাপতির হুকুমে হাজার হাজার বন্দীকে মেরে ফেলা হয়েছে। যুদ্ধের বাহানায় দেশকে দেশ মরুভূমি করে দেওয়া হয়েছে। বাঁধ ভাঙা, প্লাবন আনা, মড়ক লাগানো, বিষ ছাড়া—এসব হয়েছে। মানুষ বিশ্বাস করতে চায়নি। আমরাও চাই না। কিন্তু খবরের কাগজগুলো শকুনি। খুঁজে খুঁজে পচা-গলা মড়ার খবর বার করবেই।

আমেরিকান-বিট্রিশের মিলিত বাহিনী এই খানাতল্লাসীর দারোগাগিরি করতে পারতো। কিন্তু করার ইচ্ছে ছিলো না। করবে কী? লাভ যে তুমুল। লোভই যে মানুষকে যক্ষ করে দেয়। সেই ইঙ্গ-মার্কিন সমঝোতার দফা নম্বর আগে এই বাবদে বিধি-ব্যবস্থাও ছিলো। কিন্তু মিলিত নৌবাহিনী রাখা আমেরিকার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মাত্র দুখানা জাহাজ (৩০ কামান) বাহিনীতে যোগ দিলো, তাও কেঁদে-ককিয়ে। ১৮৪৩-১৮৫৭-এর মধ্যে মাত্র কুল্যে ৭ খানা জাহাজ। কিন্তু আইন বাঁচানো যাচ্ছে। যদিও কাজ এগুচ্ছে না। এদিকে চুরি হয়েই চলেছে। ইয়াংকী জাহাজের বহর (?) থাকতো আফ্রিকা থেকে হাজার মাইল দূরে—ভার্ডি অন্তরীপে। আর বিশখানা জাহাজ নিয়েও ইংরেজ এই ডাকাতি সামলাতে পারছে না। জগতে আইন মেনে আন্তর্জাতিক ডাকাতির পত্তন এই হোলো। এটাই এখন উৎকৃষ্ট সরেশ হয়ে উঠেছে সমগ্র সফেদ দুনিয়ায়। জানাই যে, চার হাজার মাইলের তটরেখার তদ্বির করার পক্ষে মাত্র দুখানা জাহাজ শুধুই ছেলেখেলা। কাজেই 'ইলিনয়েস' জাহাজ নিয়ে একবার, 'পনস্' নিয়ে একবার, 'স্পিট্ ফায়ার' নিয়ে একবার—একবার লেগেই রইলো নানাভাবে, নানা প্রকারে। জাহাজ যে-কোনো রাষ্ট্রের হোক, আমে-রিকান ফ্ল্যাগ উড়িয়ে সে নাক উঁচিয়ে চলে যেতো। আমেরিকান জাহাজ যদি বা কখনও তাদের ধরতে বাধ্য হোতো—তারা 'প্রমাণ' করে দিতো, তারা স্পানিশ বা পর্তুগীজ জাহাজ। ব্যবসায় চড়চড় করে উঠছে, বাড়ছে, ফৈলাচ্ছে। ১৮৪০-৫০ যেন আমেরিকাকে দশ বছরে হুড় হুড় করে একশো বছরের দাস ব্যবসায়ের টাকা ঢেলে দিলো।

প্রায়ই নৌযুদ্ধ হতে থাকলো। দাস-জাহাজ ধরার জন্য মোটা অঙ্কের পারি-তোষিক। দাস-জাহাজ সুসজ্জিত হতে থাকলো কামানে। শুধু তাই নয়,—দাস জাহাজে যারা চাকরি নিতো, খালাসীদের সঙ্গেই সর্ত থকতো, ধরা পড়লে 'লড়তে হবেই', নইলে 'মাইনে বাকি পড়লেও পাবে না।'

(চলবে)
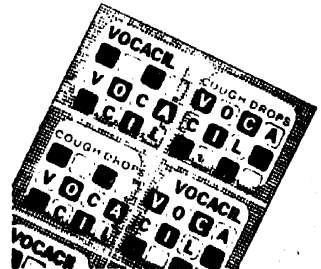
বেহালার রায় বাড়ীতে তিনি এই উপলক্ষে একবার আসছেন....কাল কিংবা পরশু। বেহালার রায় পরিবারের 'অমর রায় থেকে 'মণি রায় পর্যন্ত সবার সঙ্গেই আমার জানাশুনা তাই যথাসময় হাজির হলাম সেখানে তিনদিন পরে। সেদিন রবিবার শুনলাম শরৎচন্দ্র গতকালই এখানে এসে গেছেন। মণিবাবু আমার কথা শুনে তখনই শ্রীশরৎচন্দ্রের সামনে আমায় নিয়ে উপস্থিত করলেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি শ্রীশরৎচন্দ্রের সঙ্গে পূর্বেই আমি পরিচিত যা আমার জাতিস্মরের শিল্পলোকে লিখে গেছি।

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন—'এই যে হীরেন তোমাদের বেতার নাট্যকে দলের খবর কি পানিত্রাসে বসে তোমাদের সব নাটকই শুনি—শুধু কি তাই গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়ে নাটক শুনতে।

আমি পায়ের ধুলো নিয়ে বলি—'আপনার বৈকুন্ঠের উইল' উপন্যাসটির নাট্যাকৃতি দিয়েছি অভিনয় করবো বলে—তাই অনুমতি অপেক্ষায়।

শরৎদা বলেন—কবে করবে ?

আমি বলি—২রা আশ্বিন 'শরৎ-শর্বরী' উৎযাপন করবো। কাজেই আমরা বেতার কেন্দ্রে এটির অভিনয় করতে চাই এবং আপনাকেও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি একবার সময় করে সেখানে উপস্থিত হতে হবে।

শরৎদা গুড়গুড়ি থেকে মুখ তুলে হাসি হাসিমুখে বলেন—ওর চাইবার আগেই ঠিক করে এসেছো কি কি বর নেবে। অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা দুই-ই—চাই ?

আমি হেসে ফেলে বলি—দেবতা যখন তুষ্ট তখন দুটির জায়গায় চারটি বর চাইলেও দেবতা মুখ ফেরাবেন না জানি।

উনি চোখ বুজিয়ে ভেবে নিয়ে বলেন—না বাপু, রাজকনে পাবে কিনা জানি না। কারণ সেদিনটা আমি অপরের হাতে পড়ে থাকবো। তারা যেমন প্রোগ্রাম করবে আমায় মেনে চলতে হবে—তাই তোমার বেতারে উপস্থিত হতে পারবো বলে কথা দিচ্ছি না। তবে বৈকুন্ঠের উইল নাটক নিশ্চয়ই করবে।

আমি নাট্যলিপি হাতে তুলে দিয়ে বলি—আপনাকে অনুমোদন করে দিতে হবে। শরৎদা হাত থেকে পান্ডুলিপি নিয়ে তার ওপর লিখে দিলেন—আমি অনুমতি দিলাম ইতি—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আমি বলি—পড়া হলো না যে—

শরৎদা হেসে উত্তর দেন—সেদিন তোমার মীরাবাঈ নাটকে রাণা কুম্ভের ভূমিকা শুনলাম। কখন কখন তুমি শিশিরকেও অতিক্রম করে যাচ্ছিলে।

আমি কুন্ঠায় মরে যাই—বলি—কি বলছেন শরৎদা কোথায় শিশিরদা আর কোথায় আমি।

উনি পিঠে মৃদু আঘাত করে বলেন—তোমার অভিনয় চাতুর্য আমায় সত্যিই সেদিন মুগ্ধ করেছিল। তুমি যখন বেতার নাট্যকে দলের পরিচালক তখন তোমায় শুধু বৈকুন্ঠের উইল কেন আমার সমস্ত উপন্যাসগুলিকে নাট্যাকারে পরিবর্তন করার অনুমতি দিলাম।

এ অবকাশে তিনি লিখিত অনুমতি আমায় দিতে পারেন নি বটে তবে লিখিত-ভাবে অনুমতিপত্র আমায় ১৯৩৬ সালে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন....তখন আমি বোম্বাইতে। দিয়েছিলেন

কল্যাণীয় শ্রীমান বোস্—

তুমি আমার বই থেকে রেডিওতে নাট্যাকারে পরিবর্তিত করে অভিনয় করতে পারো। কিন্তু এ অনুমতি শুধু তোমাকে ব্যক্তিগতভাবে দিলাম। ইতি শুভার্থী—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বাড়ী ফিরেই উপেনদার চিঠি পেলাম। উপেনদা মানে শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়... (শরৎচন্দ্রের মামা) ও তৎকালীন বিচিত্রা পত্রিকার সম্পাদক।

উপেনদা তখন থাকতেন শ্যামবাজার ফোড়েপুকুরে। সেইদিনই ছুটলাম তাঁর কাছে। তিনি বললেন—শুনলাম শরতের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে। তার ইচ্ছা যে টাউন হলের সংবর্ধনায় তুমি একটি গান করো। তোমার গলা তার বড় ভাল লাগে।

বললাম—কি গান করব ?

উনি বলেন—তোমার নিজের লেখা হলেই ভাল কারণ শরৎ তোমার রচিত গানের খুব সুখ্যাতি করছিল। পঙ্কজের কাছে উদ্বোধনী সঙ্গীতের কথা জানাবার পর শরতের ফোন পেলাম। তুমি না হয় শেষ সংগীত বিতরণ করো।

গান লিখে সুর করে উপেনদাকে শুনিয়ে এলাম। গানখানির স্বরলিপি সমেত উপেনদা বিচিত্রা আশ্বিন ১৩৩৯ সাল পত্রিকায় ছাপাবার ব্যবস্থা করে ফেললেন। সেই সঙ্গে টাউন হলের নিমন্ত্রণ পত্র হাতে তুলে দেন। দেখলাম শ্রীরবীন্দ্রনাথ আসছেন এ সংবর্ধনার সভাপতি হ'য়ে।

রেডিওতে বেতার নাট্যকে দলের শরৎ শর্বরীর আয়োজনে 'বৈকুন্ঠের উইলের' মহড়া চলেছে। রায় মশাই—শ্রীবীরেন ভদ্র, বিনোদ, শ্রীধীরেন দাস, ভুবনেশ্বরী শ্রীমতী নিভাননী, রমা—শ্রীমতি বীণাপাণি, গোকুল—হীরেন বসু ইত্যাদি ইত্যাদি।

এগিয়ে এলো ২রা আশ্বিন ১৩৩৯ (১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ বোধহয়)—টাউন হলে সাহিত্যিকদের সু-সমাবেশ। এছাড়াও কলকাতার নগণ্যমান্য ব্যক্তিদের সবাই উপস্থিত। উপেনদা কানে কানে বললেন—রবীন্দ্রনাথের শরীর খারাপ বলে আসতে পারলেন না—লেখা পাঠিয়েছেন। এদিকে সময় হয়ে এলো পংকজেরও দেখা নেই তুমি প্রস্তুত থেকো হয়তো তোমাকেই না শুরু করতে হয়।

আমি বলি ভালই হবে। রাত আটটায় শরৎ শর্বরী শুরু হবে- তাই প্রথমে হলেই ভাল হয়।

এমন সময় জোড়া শাঁখ বেজে উঠলো—সহস্র জনমন্ডলীর হর্ষধ্বনির মাঝে শ্রীশরৎচন্দ্র টাউন হলে উদয় হলেন। উপেনদা ছুটে এসে বলেন—হীরেন তৈরী হয়ে নাও—ডায়াসে হারমনিয়ম আছে—ওখানে গিয়ে দাঁড়াও—শরৎ ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার গান ধরতে হবে।

রায় পরিবারের কিছু মেয়েরা—শ্রীরাধারাণী দেবী প্রমুখ মহিলাদের অগ্রণী করে শরৎদা হলে পদার্পণ করলেন। আমি আমার গানের জন্য প্রস্তুত। উপেনদা ডায়াসে দাঁড়িয়ে আমার পরিচিতি বলে দিয়ে সবে দাঁড়ালেন।

আমি গাইলাম—শরৎ আলো। প্রাণের আলো। এলো এলো এলোরে। পরাও ভালে তিলক লিখা বিজয় বিষাণ আলোয়ে।

ডায়াসে এসে বসলেন শরৎদা ....গান শেষ হলে উপেনদা শরৎদার হাত দিয়ে আমাকে একখানি বই উপহার দেওয়ালেন বইখানির ওপর লেখা 'শরৎ বন্দনা'.... রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের লেখা। শরৎ বন্দনার শেষ পাতায় আমার গানখানিও দেখলাম ছাপা হয়েছে।

ত ৮টায় শরৎ শর্বরীর উদ্বোধনে বেতার
দল বেতার কেন্দ্রে অভিনয় শুরু
বৈকুন্ঠের উইল শরৎদার সংবর্ধনায়।
টায় হঠাৎ স্টুডিওর ঘরে আমাদের
এসে দাঁড়ালেন শ্রীশরৎচন্দ্র সঙ্গে
ন শ্রীরাধারাণী দেবী—আর যাঁরা
তাঁরা বোধকরি বাইরে অপেক্ষায়।
এখন মাইকের সামনে ছিলাম না—
াই হিসাবে বীরেনবাবুই তখন
য় করছেন। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে
নৃপেনদা নলিনীদা আমি সবাই
কে নিয়ে ধীরে ধীরে স্টুডিওর বাইরে
দাঁড়ালাম। আমার কাঁধটি ধরে
ত অগ্রজের মতো বললেন—শুধু
মনে কষ্ট পাবে বলে পালিয়ে
হ—এক মিনিটও থাকতে পারব না...
ুম...একপা এগিয়ে আবার বলেন—
অভিনয় শোনা হলো না—আর এক-
করো—পানিত্রাসে বসে শুনবো।

চোখ দুটো আমার—কৃতজ্ঞতায়
হয়ে উঠলো। উনি নরেনদা ও বৌদির
নিচে নেমে গেলেন। শ্রীনরেন্দ্র দেব ও
রাণী দেবী।

রৎদাকে আমরা যত না ভালবাসতে
ছিলাম—তার চেয়ে অনেক বেশী তিনি
বেসে ছিলেন আমাদের। এর পরিচয়
র আপনারা পাবেন।

॥ ১৪ ॥

মহুয়ার সুটিং শেষ!....অবসর সময়
াম্বিয়ার ৩৪-এর প্রথমার্ধের রেকর্ডিং
গানের মহলা শুরু করে দেওয়া
ছে। গতবারের সুপ্রতিষ্ঠিতা কুমারী—
মার দুখানি গানের ভার আমার উপর
ত হয়েছে। গান দুখানি—'এই মরমের
র আমার পিচকারি ও বৃন্দাবন চন্দ্র মম
তরতম স্বামী' কুমারী নীলিমাকে আমি
দিয়ে শেখাচ্ছি যাতে বাজারে ছাড়লে
গোকুলচন্দ্রের চেয়ে বেশী বিক্রী হয়।
ড়া গতবারের সমস্ত শিল্পীরাই আমার
ল্পীরাই আমার গানের প্রত্যাশী—কাজেই
প সময়ের মধ্যে শ্রোতাদের হৃদয়গ্রাহী
া ও সুর করতে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ি
রদিকে মহুয়ার শেষ পর্যায়। রেডিওতে
শ্য এখন বিশেষ প্রোগ্রামের ব্যস্ততা
। তার উপর ১৯৩১-এর পয়লা এপ্রিল
কই ইণ্ডিয়ান ব্রডকাষ্টিং কোম্পানীকে
ভাবে সরকারী সাহায্য নিতে হয়ে-
লা—তাই আগের নাম বদলে সে এখন
ছে ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাষ্টিং সার্ভিসেস
ই এস বি এস সরকারী হস্তক্ষেপ মানেই
ষ্টের উৎস খুঁথিয়ে আসা এবং কাগজ-
মের কৈফিয়ৎ জারি বেড়ে ওঠা। তব
৩২ ও ৩৩ সালের সৃষ্টধর্মীয় দুটি বড়
গ্রাম পরিবেশিত করা হয়েছিল। মহালয়ে
মহিষাসুর মর্দিনী ও বেতার নাটকে
লের শরৎ শর্বরী—যা পূর্বের অভ্যাসের শেষ
াস বলা চলে। সরকারী আমলে রেডিও
শনে বইতে শুরু করেছিল—ইন্টারন্যাশ
লিটিকসের এক ফল্গু স্রোত। নতুন
াতনের অন্তর্দ্বন্দ্বে যেন সৃষ্টিধররা যে
যার নিজের দল পাকাতে শুরু করে দিল,
কাজেই সৃষ্টির মাঝে নতুনত্ব দেখাবার—
তাদের সময় কোথায়? সবাই তখন নিজের
দলকে সামাল করতে ব্যস্ত।

এদিকে কলম্বিয়া কোম্পানীর উপরো-
উপরি তিন বছরের নতুন নতুন রেকর্ডের
ধাক্কায় টলমল করে উঠেছে গ্রামোফোন
কোম্পানী তার সঙ্গে ওদের নিজেদের গিল্ডে
বাঁধা মেগাফোন ও হিন্দুস্থান কোম্পানীও
কিছুটা বেগ দেবার প্রয়াস পাচ্ছে। কাজেই
ইংরেজী দুই কোম্পানীর ওপর তলায় গুঞ্জন
কানে এসে পৌঁছতে থাকে। এ আবার
বিলেতী পলিটিক্স। শুনেছিলাম গ্রামো-
ফোন কোং এবং আর সি এ কোম্পানীর
শেয়ার হোল্ডার এক হয়ে গিয়ে দুটি
কোম্পানীই নামে ভিন্ন থাকলে অন্তরে
অভিন্ন হয়েছেন। এবার আবার শুনছি
বিলেতে কলম্বিয়া ও হিজ মাস্টার্স ভয়েস
কোম্পানী যোগ সাজসের চেষ্টা চলেছে।
প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানীকে কিভাবে নিজেদের
কোম্পানীর সঙ্গে একীভূত করা যায় তার
আপ্রাণ চেষ্টা চলেছে বিলেতে ভারতীয়
প্রতিষ্ঠানদের হটাবার জন্যে। কাজেই হয়তো
১৯৩৪-এর রেকর্ড বার হওয়ার পর দুটি
কোম্পানী হাত মিলিয়ে এক হবার এক
সুদূর সম্ভাবনা গড়ে উঠতে পারে।

১৯৩৪-এর রেকর্ডিং তাই আমার শেষ
অবদানগুলি যাতে আরও মনলোভা হৃদয়
স্পর্শী হয় তার চেষ্টায় আমি উঠে পড়ে
লেগে গেলাম। কাননদেবীকে শেখানো
হচ্ছে 'এলো মোর আঙিনায় অবেলায়
আজিকে'—ভাঙ্গা ঠুংরি নিজের গানের নিজ
সুর না করে সুর ও শিক্ষা দিচ্ছেন
'বিনোদ গাঙ্গুলী মহাশয় (যিনি জদ্দান
বাঈ-এর খাস শিষ্য ছিলেন)। আমি শেখাচ্ছি
রাণুদেবীকে 'তার আশে মোর কাটলো সারা
বেলা' ও 'আজ সে কোন অতিথি'—শ্রীমতী
স্নেহলতা লিখছে—'দোলে ভুঁই চাঁপা
আজি' আমি নিজে গাইছি দুখানি স্বদেশী
গান। আমি ও রাণু দেবীর ডুয়েট যথারীতি
হচ্ছে। শ্রীমতী কুন্তলনলিনী গাইছেন—
'আজি ঝুলন দিনে ঝুল লেগেছে দোলনায়
ও রহ গিরিধারী মন মন্দিরে'—শ্রীমতী
প্রফুল্লবালা গাইছেন 'চৈতী হাওয়া হোলরে
আমার কনকলতা' ও 'এতো হাসির ঝরণা-
ধারা' ইত্যাদি ইত্যাদি।

মহুয়ার এডিটিং পুরোদমে চলেছে।
আমার ইচ্ছা ছবিখানির পেছনে আবহসংগীত
রচনা করি কিন্তু টকিতে আবহসঙ্গীত
ব্যবহার করতে হলে চাই রি-রেকর্ডিং নিউ
থিয়েটার্সের সাউণ্ড এঞ্জিনিয়র ছিলেন
শ্রীমুকুল বসু (নীতিন বসুর ভাই)।
আমার ছবিতে এদেরই খুড়তুতো ভাই
শ্রীলোকেন বসু ছিলেন আমার রেকর্ডিস্ট।
তাঁকে গিয়ে মনের বাসনা জানালাম। তিনি
বললেন, মুকুলদাকে জিজ্ঞাসা করুন।
১৯৩৩ সালেই মিঃ সরকার রি-রেকর্ডিংয়ের
যন্ত্রপাতি আনিয়েছেন শুনেছি। আমি
মুকুলদার কাছে গিয়ে সেই কথা জিজ্ঞাসা
করলাম। তিনি বললেন—হ্যাঁ রি-রেকর্ডিং
মেসিন এসে তো পড়েই আছে অথচ কেউই
এর সদ্ব্যবহার আজ পর্যন্ত করছেন না—
অর্থাৎ কোন ডিরেকটরই এর ফায়দা উঠাতে
চাচ্ছেন না। আমি বলি কেন? উনি
বলেন—বোধহয় ভয় পাচ্ছেন শেষবেশ
ছবিটি ভাল হতে গিয়ে যদি মন্দ হয়ে
যায়? আমি বললাম—আমি সে ভয় করি
না মুকুলদা—আমার সারা ছবিই রি-
রেকর্ডিং হওয়া চাই—তুমি প্রস্তুত হও।
মুকুলদা বলে—বেশ খুবই ভাল কথা
আমি মেসিন রেডি করি কিন্তু আমায়
মাসখানেক সময় চাই। আমি বলি—সে সময়
তুমি পাবে।

এইখানে একটা কথা বলে রাখি যে
সে সময় গান ডাইরেক্ট টেক হোতো
প্লেব্যাক হতো না—যদিও এ বিষয়েও আমি
মুকুলদাকে বলেছিলাম ডাইরেক্ট প্লে-
ব্যাকের কথা—আমার জোর বরাতের

ইতিহাস। উনি হেসে বলেছিলেন—এর উত্তর তুমিই দিয়েছো ভাই তোমার জোর বরাত তাই মিলে গিয়েছিল কিন্তু এর যথাযত পদ্ধতি আজও ভারতে শুরু হয়নি।

আবহ সঙ্গীত রচনা কালে বুঝলাম—যে ১৯৩৪ সালে পলিটিকসের স্রোত রেডিও গ্রামোফোনে তো বটেই এমন কি চিত্র-জগতেও শুরু হয়ে গিয়েছে। নিউ থিয়েটার্সের মিউজিক ডিপার্টমেন্ট তাঁদের যন্ত্রসঙ্গীত আমার জন্যে ছেড়ে দিতে পারেন না কারণ তাতে তাঁদের কাজের ব্যাহতি ঘটবে অতএব যত কিছু বাদ্যযন্ত্র দরকার তা আমাকে নিজেই সংগ্রহ করে আনতে হবে। মেসার্স বিভান এণ্ড কোম্পানী ছিলেন কলম্বিয়া রেকর্ডিং কোম্পানী ইংরেজ রেকর্ডের একমাত্র এজেন্ট। তাই আমার কলম্বিয়ার প্রতিষ্ঠা আমাকে তাঁদের কাছ থেকে পিয়ানো অরগান ডবল বেস—জাজ সেট সবই জোগাড় করার সুবিধে করে দিলো। এইভাবে অর্কেস্টাদল সংঘটন করে আমি একই দিনে মহুয়া ছবির দু হাজার ফিট আবহসঙ্গীত রি-রেকর্ড করালাম। বাংলাদেশে মহুয়াই হচ্ছে সর্ব প্রথম ছবি যার রি-রেকর্ডিং হলো এবং যা তুললেন স্বয়ং শ্রীমুকুল বসু মহাশয় নিজ হাতে।

১৯৩৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর মাসে মহুয়া চিত্রা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি লাভ করে। এবং এই ছবিখানিতে শ্রীমতী মলিনা দেবী—নায়িকার ভূমিকায় প্রথম অবতীর্ণ হলেন।

এই সময় সারা কলকাতায় এপি-ডেমিক ডুপসিতে প্রায় শতকরা আশীজন ব্যক্তি আক্রান্ত হন। ঘরে ঘরে রোগি-রোগির উৎপাতে ত্রস্ত এবং আমি একজন এ পীড়ার

কবলে কবলিত রোগী হয়ে পড়লাম। দেখতে দেখতে মাথায় জল হয়ে আমি দৃষ্টি হারালাম।

ডাক্তাররা রায় দিলেন, চোখে গ্লোকুমা হয়েছে, কাজেই চোখ ফিরে পেতে হলে একমাত্র অপারেশন ছাড়া গত্যন্তর নেই। উপায়ন্তর না পেয়ে আমি বেল-গাছিয়া মেডিকেল কলেজের বেডে দাখিল হলাম—অপারেশন করবেন ডাঃ শ্রীসুশীল মুখার্জি মশাই, তৎকালীন চোখের চিকিৎ-সক হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠাবান ডাক্তার।

বেডে অপেক্ষাকালীন সময়ে হঠাৎ অনুপম ঘটক আমায় দেখতে এলেন। আমি তাঁর কাঁধ ধরে দৃষ্টিহীন অবস্থায় নীচে নেমে এসে ওখানকার মাঠে বেড়াতে বেড়াতে আমার রোগের সারা ইতিবৃত্ত বললাম। অনুপম বললো—হীরেনদা, আপনি গীতিকার, লেখক, তার উপর চিত্র-পরিচালক। যদি ধরুন, চোখদুটি অপারেশন করতে গিয়ে কিছু বিপর্যয় ঘটে, আপনি সারাজীবনের মত নিঃশেষিত হয়ে যাবেন—তার চেয়ে আপনি হোমিও-প্যাথি চিকিৎসককে একবার দেখালেন না কেন? আমি বলি, জানো তো আমি ডাঃ জগবন্ধু বসুর (যিনি আর জি কর মেডি-কেলের প্রতিষ্ঠাতা এবং কলকাতা ইউনি-ভার্সিটির প্রথম এম-ডি) ভাইপো। আমার কাকা, তিনিও ডাক্তার, এই কলেজের সেক্রেটারির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন—আমার নিজের দাদাও এলো-প্যাথি ডাক্তার, কাজেই আমার বাড়ি ভাবে, হোমিওপ্যাথি মানে 'জলপড়া'। তাঁদের বললে হেসে উড়িয়ে দেবেন এবং দিয়েও-ছেন।

অনুপম বলে—আপনার নিজের সঙ্গে কোনো হোমিওপ্যাথের আলাপ-পরিচয় নেই?

আমি বলি—একজন আছেন, বন্ধুর সমান, তবে তাঁকে আমি দাদাই বলি। তিনি সিকাগো থেকে হোমিওপ্যাথি পাশ করে এখানে এসে ক্লিনিক খুলেছেন। কি যেন বসটোন ক্লিনিক না কি—গ্লোব থিয়েটারের ওপরের তলায় তাঁর চেম্বার।

অনুপম বলে—বেশ তো, একবার সেখানেই যান না।

আমি বলি, যাবো কি করে—এ-অবস্থায় কেউ তো সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া চাই—বাড়ির দাদাদের বললে তাঁরা একে-বারেই গ্রাহ্য করবেন না।

অনুপম বলে—যাবেন আমার সঙ্গে এখুনি?

আমি বলি—সে কিরকম করে সম্ভব?

ও বলে—আমি আপনাকে সঙ্গে নিয়ে ট্রামে উঠে বসছি—তারপর গ্র্যান্ট স্ট্রীটে নেমে একটা রিকসা করে চলে যাবো—আপনি নেমে নীচে দাঁড়াবেন, আমি ওপর তলায় সন্ধান করে, ডাক্তারকে পেলে আপনাকে লিফটে করে ওঁর কাছে নিয়ে যাবে।

ও আমাকে ভাবতে সময় দিলো না—প্রায় জোর করেই আমায় নিয়ে ট্রামে উঠে বসলো। গ্লোবে পোঁছে বললাম—ডাঃ যতীন হাজরা ওঁর নাম। (এটর্নী হাজরা এণ্ড ব্যানার্জির শ্রীরবীন হাজরার পু ভাই। এবং পরবর্তীকালে আগ্রা স চিফ মেডিকেল অফিসার হয়েছিলেন)।

অপেক্ষায় আমি নীচে দাঁড়া অনুপম এসে বলে, হ্যাঁ উনি আছেন চলুন।

ডাঃ যতীন হাজরার অনুকম্পায় প দিনের মধ্যেই আমি দৃষ্টি ফিরিয়ে পেল আমি একটু সুস্থ হয়ে মেসার্স মানস গিয়ে ভীমজিভাইকে (এখনকার যমুনাজ এর বাবা) বলি—বোম্বাইতে এ এসাইনমেন্ট পেলে আমায় জানা ভীমজিভাই আমার মহুয়া ছবির সুখ্যা করে বলেন—নিশ্চয়ই করে দেবো। ছবির পর বোম্বাই-এর দরজা আপ খুলে গেছে—তবে যাবেন তো? হেসে সম্মতি জানাই।

বাড়ি এসে ভাবছিলাম, বোম্বাই কাজ পেলে নিউ থিয়েটারে একটা রেজি নেশান দিয়ে চলে যাবো—তাহলে আ চালেঞ্জের পরিপূর্তি হবে।

মহুয়া ছবির রিলিজের আগে এ বিশেষ ঘটনা বলতে ভুলে গেছি—সে বলোনি।

শ্রীরাইচাঁদ বড়ালের ভাই শ্রীজ বড়াল একদিন সকালে আমার বাড়িতে এ হাজির হলেন। আমি ভাবলাম নিশ্চ আমার শরীর খারাপের কথা শুনে উনি ছ এসেছেন আমায় দেখতে। এখানে ব রাখি—মহুয়া ছবিতে উনি খুবই খে ছিলেন (কার জন্যে তা আপনাদের জানাই ভালো)। উনি এসে আমার শর সম্বন্ধে প্রশ্ন না করেই বললেন—হীরে আমি এসেছি একটা কথা তোমাকে জানা যে, রাই মিউজিক ডাইরেক্টর হিসাবে থিয়েটার্সের এ্যাবসো ইন দি মিউজিক ক্টর। এই তার সরকারের সঙ্গে কনট্রাকট। কাজেই মহু মিউজিক ডাইরেক্টর হিসাবে তার না পাওয়া উচিত।

আমি অবাক হয়ে ওঁর মুখের দি চেয়ে থেকে বলি—তা মিঃ সরকার বলেন?

জলুদা বলেন—মিঃ সরকার বলে কনট্রাকট তাই বটে, তবু যাঁকে দাঁড়ি এক নিমেষে ছ' হাজার ফিট মিউজি কম্পোজিসন করে রি-রেকর্ড কর স্বচক্ষে দেখেছি, তাঁর নাম কি ক বাতিল করতে পারি আপনারাই বলুন।

আমি হেসে বলি—জলুদা, রাই আম বাল্যবন্ধু, আপনাকে আমি ছেলেবে থেকেই দাদা বলি। আপনি আগাগো মহুয়া ছবিতে ছিলেন, কাজেই স স্বচক্ষে দেখেছেন—তা সত্ত্বেও প্রোপোজালটা আনলেন কি করে?

জলুদা বলেন—ওর যে কনট্রাক ওই।

আমি বলি—সে-কনট্রাকট মিঃ স কারের সঙ্গে, আমার সঙ্গে নয়। আমি এ জনের ব্যক্তিগত স্বার্থে আমার সৃষ্টি অপমানিত করতে পারি না। মিঃ সরক [illegible]-এর সময় আমায় যেমন লিখ

য়, মীরাবাঈ-এর সুরারোপ রাই-এর ম তুলে দিয়েছিলেন, উনি এবারও ই রকম শর্তে আমায় ডাইরেকশান লেই পারতেন, কিন্তু তা তিনি রননি। কাজেই আমি তাঁর বিরুদ্ধেই যাবো কেন বলতে পারেন ?

জলুদা সেদিন ফিরে গেছিলেন কিন্তু রপর দিন সকালেই এসে হাজির হলেন। লেন—বেশ হীরেন, তুমি রাই-এর মে মিউজিক ডিরেকশন না দাও, আমার মে দাও, আমি তো তোমার মহুয়া বিতে সমানে খেটেছি।

কথা শুনে আমার হাসিও পেলো এবং ই নীচ পলিটিক্স শুনে মনে ঘৃণাও লো। বললাম—বেশ, আপনার নাম দিতে ন তো দিন, তবে রাই-এর নাম আমি কছুতেই দিতে দেবো না—যখন মিঃ রকারের তাতে অনুমোদন নেই।

উনি খুশী হয়ে বললেন—বেশ বেশ, াই হবে, তবে মিঃ সরকারকে এক লাইন লেখে দাও।

সামনেই কাগজ ছিল, আমি লিখলাম,
If Mr Sirkar things that Jalu's name should be put as music director then let it be done.

ফলে ছবির টাইটেলে দেখলাম, লেখা আছে—মিউজিক কনডাকটেড বাই জলু বড়াল। নিউ থিয়েটার্সের এই একখানিই ছবি যাতে মিউজিক ডাইরেকটারের নাম নেই....

এখনও কি আপনারা বলেন আমার নিউ থিয়েটার্সে থাকা উচিত ?

ভাবছিলাম রেজিগ্নেশনটা দিয়েই দি. কিন্তু মিঃ সরকার-এর মুখ চেয়ে তা আমি দিতে পারিনি। কারণ, মিঃ সরকারই আমাকে আজ ডিরেকটারের আসনে বসবার যোগ্যতা দিয়েছেন, তাঁকে এভাবে চিঠি দিলে অপমানকর হতে পারে।

ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। বই রিলিজের তিন সপ্তাহ পরে মিঃ সরকার-এর সই-করা একখানি চিঠি পেলাম—
Your services is no longer required.
ভাবলাম যে মিঃ সরকার স্টুডিওর একটি গাছও কাটতে দেন না তিনি তাঁর তালিকা থেকে আমার নামটা এভাবে কাটতে পারলেন ?... বিশ্বাস হলো না। আমি চুপি চুপি তাঁর কাছে গিয়ে একদিন দাঁড়ালাম। তিনি প্রথমেই বললেন—শুনলাম, দৌড়-দৌড়িতে আপনার নাকি দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছিল, আপনি এখন কেমন আছেন ?

আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। আমি বললাম, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে ভাল হয়ে গেছি।

উনি বললেন—যেখানেই যান সাবধানে থাকবেন।

আমি বলি—আপনি আমায় একটা চিঠি দিয়েছিলেন ?

উনি খানিক চুপ করে থেকে বলেছিলেন—জলে বাস করে কুমীরদের সঙ্গে ঝগড়া করে পেরে উঠবেন কি ? তাই তাড়াতাড়িই আপনাকে রিলিজ দিলাম।

আমি নিশ্চুপ বসে উঠে দাঁড়ালাম।

উনি বললেন—নতুন কোনো এসাইনমেন্ট পেয়েছেন নাকি ?

আমি বললাম—পাইনি, তবে চেষ্টায় আছি।

উনি বললেন—আই উইস ইউ অল সাকসেস।

এরই পর পুজো কেটে গেল—নভেম্বর '৩৮ সালে [illegible]-এর ডাক এলো, তখন আমি শিমুলতলায় একটু চেঞ্জে গেছি। টেলিগ্রাম পেয়ে আমি কলকাতায় নেমে এলাম এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি সেই দিনই আমার সঙ্গে মিঃ ভি এম ব্যাসের পরিচয় করিয়ে দেন—উনি হচ্ছেন বোম্বাইতে 'কুমার মুভিটোনে'র অধিকর্তা। উনি ওখানে আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। ডিরেকটর এবং মিউজিক ডিরেকটর হিসাবে। আমার সঙ্গে নিতে দেবেন মিউজিক এ্যাসিসটেন্ট ও ছজন মিউজিসিয়ানকে। পরের দিনই সই-সাবুদ হয়ে গেল—খালি এক সপ্তাহ থেকে আমার এ্যাসিসটেন্ট ও মিউজিক-হ্যাণ্ডসদের সই করে টাকা দিয়ে বোম্বাই ফিরে গেলেন। আমার রওনা হবো ২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৮, মানে মাত্র দশদিন বাকি।

সই-সাবুদের পরই আমি গেলাম অনুপমের বাড়িতে কাঁকুলিয়ায়। ওকে সব বলে বললাম—তোমাকেও আমার সঙ্গে বোম্বাই যেতে হবে। ও শুনে খুশী হয়ে বললো, এত বড় সুযোগ আমাকে হারাতে হচ্ছে, কারণ আমার বাবা পীড়িত, জীবন-মৃত্যু সমস্যা, এ-অবস্থায় আমার কলকাতা ছাড়া উচিত হবে না। তবে আজ বিকেলে আপনি একবার হিন্দুস্থান রেকর্ডে আসুন, ওখানেই একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো, যাকে এ্যাসিস-টেন্ট হিসাবে নিয়ে গেলে আপনার কোন-রকম অসুবিধা হবে না অথচ ছেলেটিরও বিশেষ উপকার হবে। অগত্যা সেইরকম ঠিক করে আমি ভবানীপুরে আমার ভাগ্নে শ্রীগোপাল মিত্রের বাড়িতে এলাম। এই-খানেই অনুপমের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটেছিল। দেখলাম একটি ছেলে নেটিপেটি হয়ে ও-বাড়িতে ঘুরছে—আমার দিদিকে সে মা বলে ডাকছে. পরিচয় পেলাম যে, ছেলেটি বড় দুস্থ, অথচ অদ্ভুত গুণী। গানের গলাও অত্যধিক ভাল। আমি আমার বোম্বাই-এর যাত্রা করার সময় কেমন করে অনুপম না যাওয়ার অক্ষমতায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি, গল্প করতে করতে বলে ফেলি। সঙ্গে সঙ্গে আমার দিদি ও ভাগ্নে বলে ওঠে—কেন এই ছেলেটিকে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যাও—একেই এ্যাসিসটেন্ট করে গড়ে তোল। ছেলেটি বেঁটেখাটো। গান শোনালো। খুবই সুরেলা গলা—নাম বললো অনিল বিশ্বাস। আসার সময় বলে এলাম—অনিল, কাল তুমি একবার সকালে আমার বাড়ি এসো। ঠিকানাও দিয়ে এলাম। ফেরার পথে হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীতে অনুপমের কথামত উপস্থিত হলাম।

অনুপমের ক্যাণ্ডিডেটের কথা সবাই রেকমেণ্ড করলেন। ওখানকার প্রতিনিধি যামিনী মতিলাল আমার ছোড়দার ক্লাস-ফ্রেণ্ড, তিনি তো খুব জোর সমর্থন জানালেন। কথায় কথায় প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়....এমন সময় ছেলেটি এলো—সবাই ওকে ঢুকতে দেখে বলে ওঠেন—এই অনিল, এদিকে শোন্। নামটা শুনে ভাবতে যাবো—দেখি আমার দিদির ও ভাগ্নের বাড়িতে যাকে কাল সকালে দেখা করতে বলে এলাম—এ সেই। কাজেই দুজনেই অবাক হলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠিকই হলো যে, শ্রীঅনিলকেই আমি এ্যাসিসটেন্ট করে বোম্বাই নিয়ে যাবো। ওদের টার্মস এবং কণ্ডিশনস্ সব জানালাম। অনিল সবেতেই রাজি। আমি বললাম—কাল সকালে একবার অতি অবশ্যই আমার বাড়িতে আসবে। মিউজি-সিয়ানরা—যারা আমার মহুয়া ছবিতে বাইরে থেকে এসে বাজিয়েছিল, তাদের মধ্যে ছ'জনাকে নিলাম। গীটার ও ভাইওলিন বাজায় মিঃ পাওয়ার, ট্রামপেট, কর্ণেট-বাজিয়ে মিঃ এবলস্, চেলো বাজায় মিঃ কৈলা, আরও তিনজন বাঁশী ক্যারিওনেট আর একটি ড্রামপ্লেয়ার—ওদেরই রেক-মেনডেশনে....সঙ্গে যাবার ব্যবস্থা হলো।

আমার বোম্বাই যাবার খবর পেয়ে আমার আত্মীয়স্বজন সবাই আমার বাড়ীতে দেখা করতে আসছেন। সকাল ৭টায় আমার আলপনা পত্রিকার কবি বন্ধু শ্রীপরিতোষ বসু এসে হাজির হলো। শ্রীপরিতোষ আমার বন্ধু ডাঃ অমিয়কুমার বসুর (ইণ্ড) ছোট ভাই.... কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমারও বন্ধু। ও এসে বললো—শুনেছি নাকি তুমি বোম্বাই যাচ্ছো ?... আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে যাবো। আভাসে ইঙ্গিতে জানালো যে তার এখানকার চাকরি গেছে... সে বেকার এখানে বসে থাকতে চায় না। ইতিমধ্যে অনিল এসে হাজির। আমি অন্য কাজে একটু ব্যস্ত হবার অবকাশে অনিল ও পরী বেশ বন্ধুত্ব জমিয়ে তুলেছে। অনিল আমায় বললো—ওঁকেও সঙ্গে নিচ্ছেন তো ? আমি বলি...ট্রেন ভাড়ার টাকা যা মিঃ ব্যাস দিয়ে গেছেন তাতে কুলোলে হয়। হাঁ, তোমায় ডেকেছিলাম—এই টাকা নাও—তুমি সেকেণ্ড ক্লাস একখানা—আর তোমার ইন্টারে একখানা দু-খানা টিকিট তো আপাতত কিনে আনো। মিউজিসিয়ানদের টাকা আমি দিয়েছি। টাকাটা হাতে নিয়ে বলে আরও দশ টাকা দিন—দেখি ইন্টারের বদলে দু'খানা থার্ডক্লাস যদি হয়... পরীবাবু আর আমি দুজনেই চলে যেতে পারব। তখনকার দিনে ২০ টাকা থার্ড-ক্লাস ৩০ টাকা ইন্টার আর ৪০ টাকা সেকেণ্ড ক্লাসের ভাড়া ছিল। আমি আরও দশটা টাকা অনিলের হাতে দিয়ে দিলাম। দেখলাম অনিল ও পরী দুজনেই টিকিট বুক করতে উঠে গেলো। ...বিদেশে বন্ধু পেলাম... তাই তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললাম।

(ক্রমশঃ)

হীরকের দিনগুলি

বিজনকুমার ঘোষ

সাতটা নাগাদ হীরক অফিস থেকে বেরোল। হীরক থাকে দক্ষিণে, যাবে উত্তরের একটা গলিতে। যেখানে একজনের সঙ্গে দেখা করবে, খুব দরকারী পরামর্শ আছে। কাজ হয়ে গেলে নয় নম্বর চেপে যাদবপুরে ফিরতে ফিরতে দশটা সাড়ে দশটা তো বাজবেই। সময়টা যাতে একটু কম লাগে সেজন্য হীরকের খুবই ব্যস্ততা।

সরকারী বেসরকারী অনেকগুলি বাস চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল। হীরক শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। ওঠবার কোন চেষ্টাই করল না। অবশ্য চেষ্টা করলে গেটে দাঁড়ান ওই লোকগুলোর খামোখা গালাগালি খেত শুধু। নাঃ, হীরকের ভাগ্যে অল্প পয়সায় কিছু হবার নয়। যন্ত্রত মিনি বাসে চড়তেই হল।

শ্যামবাজার এ ভি স্কুলের কাছাকাছি একটা জায়গায় নেমে পড়ল। সুকুমারের দেওয়া ঠিকানাটা পকেটে আছে। ঠিকানা মিলিয়ে হীরক স্কুলের উল্টো দিকে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। কিছু দূর হেঁটে এসে একটা গলি ছেড়ে বাঁ দিকে বিশু রায় লেনে গোটা তিনেক বাড়ির পরেই গোলাপী রঙের বাড়িটা নজরে এল হীরকের। বড় সাইনবোর্ডে লেখা আছে ডাঃ বি কে সাহা, হোমিওপ্যাথ। এর পর কুটি কুটি অক্ষরে ডিগ্রির বহর। তার মাঝে একটা ব্র্যাকেটে ক্যাল, অন্যটাতে লণ্ডন লেখা। এই সব দেখে-শুনে হীরকের মনে দারুণ ভক্তি এল। সুকুমার ওর খুব কাছের বন্ধু। নিজে উপকার পেয়েছে বলেই তো বন্ধুকে ডিরেকসন দিয়ে ঠিকানা লিখে দিয়েছে। হীরক খুব খুশী হয়ে রাস্তা থেকে কুড়ি বাইশ বছরের টেরিলিন পরা এক ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, এটা কি ডাক্তার বি কে সাহার চেম্বার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—উনি কি আছেন?

—হ্যাঁ। আপনি বসুন।

পঁচাত্তর পাওয়ারের বাল্বের গায়ে [illegible] কালি পড়ায় আলোটা কেমন ম্যাড়মেড়ে দেখাচ্ছে। মাথার উপর ফ্যানটা যত না ঘুরছে তার চাইতে বেশী ক্যাঁচর ক্যাঁচর আওয়াজ হচ্ছে। দুখানা টিনের চেয়ার সামনে. দু পাশে দুটো সরু কাঠের বেঞ্চ। কোণার দিকে একটা বেতের মোড়াও আছে। দুজন মহিলা, তিনজন বৃদ্ধ। একজনের বয়েস হীরকের মতই, বছর চল্লিশ। অন্য-জন হীরকের চাইতে ছোট, খুব রোগা। বোধ হয় পেটের রোগে ভোগে। তাহলে সাতজনের পর হীরকের ডাক পড়বে। গোটা তিনেক ওষুধের আলমারি দিয়ে ঘরটাকে দু ভাগ করা হয়েছে। পেছনে ডাক্তারবাবু বসে আছেন। খুব মৃদু স্বরে কাকে যেন জেরা করছেন।

হীরক একবার তাকিয়েই বুঝল তিনজন বুড়োর মধ্যে একজনের অসুখ কিছুতেই সারবার নয়। হাই ব্লাডপ্রেসার, ডায়াবিটিশ, রাত্রে ঘুম হয় না—আরও অনেক কিছু। তবু বৌ, কিংবা বৌ মরে গেলে ছেলের বৌ জোরজার করে পাঠিয়েছে। নিশ্চয়ই পাড়ার হরিসভার সামনের সারির একটা আসন আজ ফাঁকা। আবার হাফানিও আছে কিনা কে জানে। মুখ বড় বড় করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। তবে মহিলাদের দিকে তাকিয়ে বেশী সময় নষ্ট করতে রাজি নয় হীরক। মহিলাদের দুই রকম রোগ থাকে, কোষ্ঠকাঠিন্য আর স্ত্রীরোগ। প্রথমটা এক্কা দোক্কা খেলার থেকেই, দ্বিতীয়টা বিয়ের পর মাথা চাড়া দেয়। তাছাড় মহিলা

দুটি দেখতেও তেমন সুবিধের নয়। হীরক এবার মুখোমুখি হল ওর বয়সীর দিকে। দুজনেরই পরনে বুশ সার্ট ও খয়েরি রঙের টেরিকটের প্যান্ট। হীরকের হলুদ জামার মধ্যে ছোট ছোট সবুজ গাছ পাতা আঁকা। আর ওর জামার কোন রঙ নেই, সাদা। বিবাহিত কি? হীরকের মনে হল, বিবাহিত। কারণ, গালে আর থুতনিতে মাংস বেশ ভালই জমেছে। মহিলাদের স্পেশাল যত্নআত্তি পেলে পুরুষদের মুখের ওই রকম শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

ডাকতারের জেরা শেষ। একজন মাঝবয়সী বাচ্চা ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে এলেন। ছোকরাটি এবার পর্দা তুলে ডায়াবিটিশ, হাই ব্লাডপ্রেসারকে বলল, আপনি আসুন। হীরক ঘড়ির দিকে তাকাল, প্রায় আটটা। আলমারির ওধার থেকে আবার চাপা স্বরে জেরা ভেসে এল।

হীরক চোখের দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল। লোকটি একটি সিগারেট ধরাল। একটু আগেই সিগারেটের টুকরোটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলেছে হীরক, তবু আর একটি ধরাল। কাজ শেষ হয়ে গেলে দুজনেই কি নয় নম্বর ধরবে? চমকে উঠল হীরক, দুজনে কি একই প্রবলেমে ভুগছে?

ইতিমধ্যে ছোকরাটি আরও তিন-

জনকে পর্দা তুলে ডাক দিয়েছে। তারপর এক সময় পেটরোগা ছোকরাটিও ভিতরে ঢুকল। এবার দুজনে মুখোমুখি। হীরকের পরে আর কেউ আসে নি। ভিতরের একটা হাল্কা উত্তেজনায় ও পায়চারি শুরু করে দিল।

—এই প্রথম চেম্বারে এলাম। কেমন ডাকতার?—হীরক জিজ্ঞাসা করল।

—খুব ভাল ডাকতার। অন্তত আমি তো উপকার পেয়েছি। লোকটি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল।

—হ্যাঁ, আমিও সেইরকম শুনেছি। —হীরক বলল : তাই যাদবপুর থেকে এলাম।

এর উত্তরে লোকটা বলল না যে কোথা থেকে এসেছে। হীরকের জানার ইচ্ছে হল, আপনার কেসটা কি? আপনি কি এই রকম প্রবলেমে প্রায়ই পড়েন?

সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে লোকটা নিজে থেকেই বলল, এম-বি বি-এস ডাকতার, কিন্তু হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করে। বিলেতে ছিল ছ বছর।

ভক্তিতে, বিশ্বাসে হীরকের মুখটা হাঁ হয়ে গেল। সুকুমার উপকার পেয়েছে। নিশ্চয়ই উপকার না পেলে বন্ধুকে কিছুতেই এখানে পাঠাত না। তবে বিলেত ফেরৎ ডাকতার, তাঁর চেম্বারের চেহারাটা একটু সাজান-গোছান হলেই যেন মানাত ভাল। যাক গে, চিকিৎসা নিয়ে কথা। সেখানে উপকার পেলেই হল।

একটু পরে লোকটা ভিতরে ঢুকে গেল। পেটরোগা বেরিয়ে এসেছে। মাথার ওপর ফ্যানের একঘেয়ে শব্দ। হীরকের খিদে লেগে গেল। চেম্বারে অনেক ঠাকুর-দেবতার ছবি। ভিতরে ঢোকার আগে সবাই ছবির পায়ে প্রণাম করে নিচ্ছে। হীরকও কি তাই করবে? একথা ভেবেই কিঞ্চিৎ লজ্জা পেল। ভগবান বলে যদি কোন বস্তু থাকে তাহলে সে কি ভাববে? আমাকে একটুও মানগণ্য করে না, অথচ বিপদে পড়তেই প্রণাম ঠোকা! না, সে হয় না। ভগবানের এখানে কিছু করণীয় নেই। যা কিছু সব হীরককেই করতে হবে।

আজ সকালে হঠাৎ খুড়তুতো শালা, শালার বৌ ছেলে নিয়ে এসে হাজির। খেয়েদেয়ে বিকেলে চলে যাবে ওর শ্বশুর বাড়ি টালিগঞ্জে। সে জন্য রেনা রান্নাঘরে খুবই ব্যস্ত ছিল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে হীরক প্রথমে ভেবেছিল, আজ থাক। হোমিওপ্যাথী ডাকতারের কাছে যাবার আগে রোগীর সবকিছু খুঁটিনাটি জেনে নিতে হয়। ডাকতারবাবুরা সিমটম জেনে ওষুধ দেন। কি ভেবে হীরক বাস স্ট্যাণ্ড থেকে বাড়ি ফিরে এসেছিল। রেনা জিজ্ঞাসা করেছিল, কি ব্যাপার, ফিরে এলে যে?

—দরকার আছে, একটু এদিকে শোন।

শালার বৌ মীরা রসিকতা করেছিল তাই দেখে।

—জামাইবাবুর বুঝি আজ অফিস যেতে ইচ্ছে করছে না?

—কি করে ইচ্ছে করে? তুমি আছ।

—আহা, তাই বুঝি। এসেই কিন্তু দিদিকে ডেকে নিলেন রান্নাঘর থেকে। কি এত কথা?

অন্য সময় রসিকতা করে হীরক এর একটা চমৎকার উত্তর দিতে পারত। কিন্তু এই মুহূর্তে ভিতরে কোন রস সঞ্চার হল না। মুখটা শুধু ফ্যাকাসে হয়ে গেল। শুধু বলল, অফিস থেকে এসে যেন দেখা পাই। দু দিন থেকে যাও না?

হেনা আবার কোডন বাঁচল একবেলা আছি, তাতেই আপনাদের রান্নায় গিয়ে কথা বলতে হচ্ছে।

ডাকতারবাবুর বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। গায়ের রঙ অসম্ভব কালো। সরু একটা পাকা গোঁফের রেখাও আছে। গলার আওয়াজ ভারী, থমথমে। সামনে কাঁচ বসান ছোট্ট টেবিল। পেছনের আলমারিতে মোটা মোটা ডাকতারী বই। হীরকের দিকে একটু আড়াল করে চামচে দিয়ে টিফিন কৌটো থেকে ছানা খেলেন। এক গেলাস জল শেষ করে বিরাট ঢেকুর তুলে চশমার তলা দিয়ে হীরকের দিকে তাকালেন।

হীরক একটু থতমত খেল। বাপের বয়সী ডাকতারের কাছে নিজেদের একান্ত গোপনীয় কথাটা মেলে ধরতে হবে। বলল, ডাকতারবাবু বড় বিপদে পড়েছি।

—হুঁ। সে জন্যই তো আমার কাছে আসা। বলুন।

—আমাদের অফিসের সুকুমার ব্যানার্জিও এমনি বিপদে পড়েছিল। ও উপকার পেয়েছে। সেইজন্যে—

ডাকতারবাবু ভারী গলায় সাফল্যের হাসি হাসলেন, আশা করি আপনিও উপকার পাবেন।

আর ভনিতা করা ঠিক নয়। এবার আসল কথাটা বলে ফেলাই ভাল। হীরক ভাবল।

—দেখুন ডাকতারবাবু, আমার স্ত্রীর ডেট পেরিয়ে গেছে।

ডাকতারবাবু একটু সোজা হয়ে বসলেন।

—লাস্ট ডেট কবে ছিল।

—২২শে ফেব্রুয়ারি।

—তার মানে ষোল দিন হয়ে গেছে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এদিক থেকে আমার স্ত্রী খুব পাংচুয়াল। একটুও হেরফের হয় না। সেজন্য খুব চিন্তায় পড়েছি।

ডাকতারবাবু চোখ বুজে কি যেন ভাবতে লাগলেন।

—আপনার ছেলেমেয়ে কয়টি?

—দুই মেয়ে, এক ছেলে। সামান্য কেরানীর চাকরি করি। ঘর ভাড়া একশো কুড়ি টাকা। বুঝতেই পারেন, মাসের শেষে সংসার চালান খুবই কষ্টকর। — আবেগে হীরকের মুখ দিয়ে আরও অনেক কথা বেরিয়ে আসতে চাইল। কিন্তু ডাকতারবাবুকে যেন চিন্তামগ্ন হতে দেখে চুপ করে গেল।

—ছেলেমেয়েদের বয়স?

—বড় মেয়ে, বয়স ছয়। পরেরটা [illegible] বছরে পড়ল। ছোটটি দেড় বছরের। এ[illegible] হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি ডাকতারবাবু, [illegible] ওপর যদি—

—আঃ, ফালতু কথা বলবেন [illegible] যা জানতে চাইছি শুধু সেটুকুই বলবে[illegible] আপনার স্ত্রীকে একবার আনতে পারবে[illegible]

এই আশংকাটাই হীরক করছি[illegible] বলল, একটু অসুবিধে আছে ডাকতারবা[illegible]

—কি রকম? —ডাকতারবাবু চশ[illegible] তলায় চোখ দুটোকে ছুঁচলো করলেন[illegible]

—আমার স্ত্রী একদম এর এগেন[illegible]

—মানে?

—মানে আমার স্ত্রীর বক্তব্য, [illegible] আসতে চাইছে তাকে আসতে দাও।

—ডাকতারবাবু পুরো পারসোনালি[illegible] বজায় রেখে হাসলেন।

—আপনার আর্থিক অবস্থার [illegible] স্ত্রী নিশ্চয়ই জানেন। তবু—

—কি করব ডাকতারবাবু, আ[illegible] স্ত্রী লজিকের একদম ধার ধারে না।

একটু স্তব্ধতা। ফ্যানের একঘে[illegible] আওয়াজ। দেওয়ালে বসিষ্ঠ টিকটিকির আস্ফালন। কিং কিং করে টেলিফো[illegible] বেজে উঠল। ডাকতারবাবু কাকে [illegible] নির্দেশ দিলেন, দুধ খাওয়া একদম চ[illegible] না। মোসাম্বিও নয়। বার্লি আ[illegible] পাউরুটির মাঝখানের অংশ চিনি [illegible] খেতে পারে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত [illegible] স্পঞ্জ করিয়ে দেবেন। —তারপরে হীর[illegible] দিকে ঘুরে বললেন, জানেন, টুয়ে[illegible] ফুটপাথে, এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জে এ[illegible] ভিড়, তা কিন্তু বেশির ভাগ এ[illegible] মেয়েদের একগুঁয়েমীর ফলে। কোন [illegible] জিনিস মেয়েরা নিতে চায় না। [illegible] চিন্তাধারা এদেশের অস্থিপাঁজরে [illegible] আছে।

মনোমত [illegible] হওয়ায় হীরক সপ্র[illegible] ভাবে তাকিয়ে রইল। ডাকতারবাবুকে [illegible] সুন্দরই দেখাচ্ছে। তিনি বলে চলেছে[illegible] অবশ্য ভাববেন না একমাত্র মেয়েরাই দোষ[illegible] অনেক ছেলেও যুগের সঙ্গে তাল মিলি[illegible] চলতে পারে না। জানেন, অনেক [illegible] মেয়েরা রাজী হলেও ছেলেরাই পিছি[illegible] যায়। এরকম কেসও আমি জানি।

হীরক গলা খাঁকারি দিল।

—আজকাল খবরের কাগজে এই [illegible] অনেক লেখালেখি হচ্ছে।

—তা তো হবেই। জানেন, প্রতি[illegible] ভারতবর্ষে একটা করে অস্ট্রেলিয়া মহা[illegible] তৈরী হচ্ছে?

হীরক বুঝতে পারল না। ফ্যাল ফ্যা[illegible] করে তাকিয়ে রইল।

অপরের অজ্ঞতার বেশি [illegible] ডাকতারবাবু আজকাল সময় নষ্ট করেন [illegible] তবু এক্ষেত্রে মক্কেলের মুখ-চো[illegible] অবস্থা দেখে হাসতেই হল।

—অস্ট্রেলিয়ার লোক সংখ্যা কত[illegible] এক কোটি ছত্রিশ লক্ষের মত। ভারতব[illegible] প্রতিদিন এই পরিমাণ নতুন শিশুর [illegible]

হচ্ছে। আর অস্ট্রেলিয়া ভারতের হয় গরু। তাহলে বুঝতে পারছেন ?

ফ্যাল ফ্যাল অবস্থা কাটিয়ে হীরক মাথা কাত করল।

—আমাদের উন্নতি আমাদের হাতের মুঠোয়। আবার আমাদের অবনতি, সেও হাতের মুঠোয়।

—নিশ্চয়ই।

—অস্ট্রেলিয়ার দিন দিন উন্নতি হবে। গম, পশম, দুধ, মাখন মাংসের স্রোত বয়ে যাবে। প্রচুর ফসল অথচ খাওয়ার লোক নেই। বাইরে চালান দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা আন। তা ভাঙিয়ে কেনো সুখভোগের প্রচুর উপকরণ। আর আমাদের ?

হীরক মাথা নিচু করল। এই সব যুক্তি তথ্য আসলে বকুনি। বিপদের ওপর বিপদ। সুকুমার শেষকালে এই বকা লোকের কাছে পাঠাল। হীরক মুখটাকে হাসি হাসি করল তবু। যাক বকুনি খেয়েও যদি কাজটা হাসিল হয়।

—আপনারা ক ভাই-বোন ?

—আমরা ? আমরা সাত ভাই-বোন। বকুনির বৃহৎ অংশটা বাবার ওপর চালান করে দিতে পেরে হীরক খুশী হল।

—কিন্তু আপনার বাবা নির্দোষ। তাই বলে আপনি দায়িত্ব এড়াতে পারেন না ?

—কেন ? আমার বাবা খুব গরীব

ছিলেম। আমরা কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছি। আমি যদি দোষী হই তাহলে বাবাও দোষী।

—আজ্ঞে না স্যার, অত সহজে আপনি পার পেতে পারেন না। —ডাকতারবাবুর মুখটাকে আরও কালো দেখাল। কালো আর ভয়ংকর।

—ডাকতারবাবু আমি অনেক দূরে থাকি। ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে।—হীরক মরীয়া।

—আপনার বাবাও অনেক দূরে ছিলেন। এত দূরে যে তখন বেশি মানুষ বিত্তীষিকা নয় আশির্বাদ ছিল। কষ্ট হলেও আপনারা সবাই উঠে দাঁড়িয়েছেন মানুস হয়েছেন।

কেউ বিপদে পড়লে মানুষ তাকে লাথি মেরে সুখ পায়। হীরক ডাকতারবাবুর মুখে সেই সুখ দেখতে পেল। ঘরে থাইয়ে এখন এমনি অজস্র লাথি খেতে হবে।

ক্রিং ক্রিং। হ্যালো। ফোনের মধ্যে নির্দেশ গেল, ভাজা মাছের ঝোল আর ভাত। পেঁয়াজ ছাড়া। ওষুধ এখনো চলবে। দুধ নয়, ছানা চলতে পারে।—এই সব বাক্য ডাকাতরবাবু আবার হীরকের দিকে তাকালেন।

—আমারও সময়ের দাম আছে। আমিও কম কথার মানুষ। এখন যা যা জানতে চাই ঠিক ঠিক উত্তর দিন। আপনার স্ত্রীর গায়ের রং?

—কালো।

—মেজাজ? শান্ত না তিরিক্ষে?

—শান্তই। তবে—

—বুঝেছি, মাঝে মাঝে মেজাজ বিগড়ে যায়। তাই না?

—আজ্ঞে হ্যা।

—আপনি যখন স্ত্রীকে আনতে পারবেনই না তখন এসব জানা আমার দরকার বৈকি। কিন্তু কোন এ্যালোপ্যাথিকের তাতে প্রয়োজন নেই। আমরা সিমটম দেখে ওষুধ দিই। আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতি অনেক সায়েন্টিফিক। বুঝলেন?

হীরকের বলতে ইচ্ছে হল, আপনি তো এম বি বি এস ডাকতার। কিন্তু তর্ক করার মত মানসিক অবস্থা এখন নয়। ছেলেমেয়েদের জন্যে মাঝে মধ্যে পাড়ার হোমিওপ্যাথি ডাকতারের কাছে যেতে হয়। সেখানেও একই অবস্থা। একটা পুরিয়া দিতে লাগে দুই মিনিট, কিন্তু তার আগে এ্যালোপ্যাথি ডাকতারের শ্রাদ্ধ করা হয় পাকা পঁয়ত্রিশ মিনিট ধরে।

ডাকতারবাবু কপালে হাত দিয়ে কি যেন ভাবলেন। তারপর ডানদিকে তাকিয়ে ছোকরা কম্পাউণ্ডারের হাতে একটা কাগজে কি যেন লিখে দিলেন। একটু পরে দুটো শিশি এল। শিশির গায়ে আঁঠা মাখানো কাগজের দাগ। উৎকট গন্ধে ঘরটা ভরে গেল।

—ছ দিনের ওষুধ দিলাম। দিনে চারবার করে। সকালে এক নম্বর শিশি, বাকী তিনবার দুই নম্বর শিশির ওষুধ খেতে হবে। একটু তর্কাতি করে খেতে বলবেন।

খুশী হয়ে হীরক জিজ্ঞাসা করল, কত লাগবে?

—ষোল টাকা।

দুখানা দশ টাকার নোট দিল। চার টাকা ফেরৎ দিতে গিয়ে ডাকতারবাবু বললেন আর একটা কথা, স্ত্রীকে আনারস খাওয়াবেন। একটু কড়া ধাতের ওষুধ দিলাম। স্ত্রীকে ভাল করে চানটান করতে বলবেন, জলটল খেতে বলবেন। আচ্ছা নমস্কার।

—ডাকতারবাবু এতে কাজ হবে তো?—ডাকাতরবাবুকে হীরকের আবার ভাল লেগে গেল।

—নিশ্চয়ই। সুকুমারবাবুর কাজ হয়েছে, আপনারও হবে। কাজ হলে একটা ফোনে জানিয়ে দেবেন, ব্যাস। না হলে আবার আসবেন অন্য ওষুধ দেব। নমস্কার।

হীরক বাস স্টপে এসে দাঁড়াল। বেশ ছোটখাট একটা ভিড়। বাসের দেখা না পাওয়ায় কয়েকজন রাগতভাবে গালাগাল দিচ্ছে। সর্বনাশ, এখানেও সেই গন্ধটা। মনে হল সবাই একবার করে হীরকের দিকে তাকিয়ে নিচ্ছে। যেন বুঝতে পেরেছে বিচ্ছিরী গন্ধটা এই লোকটার গা থেকেই বেরোচ্ছে। হীরক গোপনে পকেটের মধ্যে শিশি দুটোর ছিপি বেশ করে টাইট করে দিল তবু গন্ধ বেরোচ্ছে। তাকানোরও বিরাম নেই। মহা মুশকিল। ঠিক সেই সময়ে ট্রলি বাসটা এসে সব আসান করে দিল।

এসপ্লানেডের কাছাকাছি বসার জায়গা পেল। না, বাসের মধ্যে কেউ আর তাকাচ্ছে না। জানালা দিয়ে হু-হু বাতাস এসে খারাপ গন্ধটাকে নিমেষে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ঘাড়টাকে উঁচু করল। আরে ওই যে সেই লোকটা বসে আছে। ওর তো অনেক আগেই হয়ে গিয়েছিল। কি ওষুধ নিল কে জানে। হীরক বাতাসে গন্ধ শুকবার চেষ্টা করল।

বাস চলছে। রাত প্রায় পোণে দশটা। ক্লান্তিতে ঘুম আসছে। লোকটা ইতিমধ্যে কালিঘাটে নেমে গেছে। কাছ দিয়ে যাবার সময় হীরক খুব জোরে গন্ধ শুকবার চেষ্টা করেছিল। অবশ্য কাজ হল কিনা ছ'দিন পরেই টের পাওয়া যাবে। হয়ত ছ'দিন পরে চেম্বারে দুজনের মধ্যে আবার দেখা হয়ে যেতে পারে। না, যে রকম কড়া ওষুধ, হীরককে আর যেতেই হবে না। অফিস থেকে একটা ফোন করে দেবে হ্যালো ডাকতারবাবু, আপনি ধন্বন্তরী। আমার প্রণাম নিন। সুকুমারকে বলবে, মাইরি তুই ভাল ডাকতারের খোঁজ দিয়েছিলি। চল আজ তোকে খাওয়াব।

ট্রলি বাস প্রায় ফাঁকা। মার্চ মাস পড়ে গেছে, শীতের আমেজ এখনো টের পাওয়া যাচ্ছে। লোকের পার দিয়ে যাওয়ার সময় হীরকের বেশ শীত করতে লাগল। সেই সঙ্গে খিদে, ঘুম।

ট্রলি বাসের মেয়াদ গোলপার্ক পর্যন্ত। সেখানে নেমে আর একটা বাসের জন্যে অপেক্ষা। কাছেই তো গড়িয়াহাট মার্কেট। বাসের জন্যে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে হীরক মার্কেটের দিকে এগিয়ে চলল। ফল পট্টিতে দোকানদাররা ঝাঁপ ফেলে তাস খেলছিল। হীরকের কথায় কেউ কানই দেয় না। একজন দিল। অসময়ের ফলের দাম একটু চড়াই হয়ে থাকে। দুটো মরকুটে আনারসের দাম পাঁচ টাকা।

যাদবপুর স্টেশন কোলাহল থামিয়ে চুপচাপ পড়ে আছে। সারা দিন ভিক্ষের পর দক্ষিণের মানুষগুলি জড়াজড়ি করে ঘুমোচ্ছে প্ল্যাটফর্মে। স্টেশন পেরোতেই দেখা হল অধীরের সঙ্গে। দুজনে একদা আশুতোষ কলেজে বি-এ পড়েছিল। অধীর কবিতা লিখত আর হীরক করত ছাত্র ইউনিয়ন। দুজনে এক সঙ্গে এ্যানুয়েল ফাংশনে অভিনয়ও করেছে। সেই অধীর রাত এগারোটার সময় লুঙ্গী পরে লাল সুরকির রাস্তায় সিগারেট খেতে খেতে পায়চারি করছিল। হীরক না দেখার ভান করেও সফল হল না। অধীরই ডাকল, এই যে বাদার, এত রাতে? হাতে ওটা কি, আনারস?

(চলবে)

রূপকথার দুঃখ

অভীক রায়

—সূর্যাস্তের! মা কপালে জোড়হাত ঠেকাল, 'এত সুন্দর ছেলে। এসব ছবি কো আঁকে? মা করতে পারিস না? কিরকম মুখ্যু তুই?'

উড়নপর্ব শেষ হোলে সীমনকে বাড়িতে নিয়ে এলাম। মা খুব যত্ন করে সন্দেশ ধরে দিল, 'বাড়িতে বানানো জিনিস বাবা। খাও তো? সীমন হেসে বলল, 'আমি সব খাই। চিংড়িমাছ বাদে।' পাশ থেকে আমি জানতে চাইলাম, 'চিংড়িমাছ খাও না কেন? বমি হয়?'

—খালি বমি না। সারা গায়ে র‍্যাশ বেরোয়। খুব চুলকোয়।

মা হাসিমুখে তাকিয়ে ছিল। এবার আমাকে দেখিয়ে বলল, 'ওর বাবারও এই ছিল। চিংড়িমাছ খেলেই র‍্যাশ বেরোত গায়ে। বড় কষ্ট পেত।'

বাবার কথা উঠতে আমি অবাক হয়ে মাকে দেখলাম। এভাবে মা কোনোদিন বাবার প্রসঙ্গ টানে না। বললাম, 'বাবা বুঝি চিংড়িমাছ খেতই না।'

—চিংড়িমাছ। তোর বাবা? দেখলেই সাত হাত দূরে পালিয়ে যেত। বলত, গন্ধেই আমার বমি আসে। আচ্ছা ভীতু ছিলো তো!' মার চোখ জলে ভরে উঠল। আমি সীমনকে বললাম, 'উড়ন তুমি নিজে বানাও?'

—সব আমার বাবা করে। আমি খালি ছাড়তে পারি। বাবাও খুব ভাল উড়ন ছাড়তে পারে। আমি তো বাবার কাছেই শিখেছি।

—বাবার কাছে আর কি শিখেছ? আমি কিন্তু কিসসু শিখি নি। সন্দেশ হাতে সীমন হাঁ করে চেয়ে থাকল। মা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আমি খুনীর মতো হাসলাম, 'আমার বাবা খুব চালাপুরিয়া। সোনা বড় হোলেই কিছু কিছু জিনিস শেখাতে হবে, সেই ভয়েই কেটে পড়ল।' সীমন চট করে কথা ঘুরিয়ে দিল, 'চল শ্মশানকালী দেখে আসি। যাবে?'

শোবার সময় দাঁত মাজছি, দেখি বিছানায় বসে মা কাঁদছে। দাঁত মেজে আমি শান্তভাবে মুখ ধুলাম। তারপর মাকে বললাম, 'কাঁদছ কেন? বাবা তো চলেই গেছে।'

—তাই বলে ওভাবে? ওরকম কাপুরুষের মতো?

চুপ করে থাকলাম। কান্না শেষ করে মা চোখ মুছল। বলল, তোকে বলে রাখছি সোনা, তুই বড় হচ্ছিস। যদি কখনো তাকে দেখিস, ক্ষমা করবি না। ওই ডাইনীটার জনাই তোর বাবা পালিয়ে গেছে। ওর জন্যই।' মা আবার কাঁদবে। আমি বড় হচ্ছি। আমার বাবা মরে গেছে। আমি কাকে ক্ষমা করব? তাকে? না, আমার বাবাকে? যে মরে গেছে ভীতু, ফালতুর মতো? কিংবা তাকে? যার কাছে আমার সমস্ত বাবা জমা হয়ে আছে? যার জন্য শুধু এই দোতলার ভাড়াটুকু। কাকে ক্ষমা করব

আমি? কাকে ক্ষমা করব না আমি? আমাকে? না আমার বড় হওয়াকে?

রাতে ঘুমিয়ে আমি কোনো স্বপ্ন দেখলাম না।

এগারো

পরদিন ভাসান। শীত এখনো নামেনি। কিরকম একটা মেঘ জমে আছে। অনেকে বলছে এই মেঘটা কেটে গেলেই জোর ঠান্ডা পড়বে। শরীরটা ভাল নেই। দুপুরে পাখার নীচে শুয়েছি। খিস্রী চাপ ধরে গেছে। সর্দিও জেগে গেছে বেশ। বিকেলবেলা আদা দিয়ে এককোট চা খেলাম। পাড়ায় কালীপুজো হয় না। ভাসানে কোনো মজা নেই। বাড়ী থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি গড়িয়াহাট বাটার সামনে এসে গেলাম। সিগারেট খেতে ইচ্ছে হচ্ছিল। পকেটে হাত দিলাম। পয়সা নেই। এপাশ ওপাশ বেশ ভীড়। সব ভাসান দেখছে। ল্যাম্পপোস্টে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম। অল্প জ্বর জ্বর ভাব। চোখ জ্বালা করছে। হাতের চেটোয় নাক ঢেকে নিঃশ্বাস ছাড়লাম। গরম। বাড়ী ফিরে যাব কিনা বুঝতে পারছি না। একটা বন্ধ দোকান-এর সিঁড়িতে বসলাম। রুমাল বার করে গলায় জড়ালাম। একটু শীত করছে। শার্টের কলার তুলে দিলাম কান অব্দি। তারপর হাঁটুর ওপর কনুই, থুতনীতে হাত রেখে বসে থাকলাম। পূর্ণেন্দুদিন জাইফোঁটা। আমার ওসব পাট নেই। এক খুড়তোতো বোন ছিল। সিঁথিতে থাকত। বছরখানেক আগে বিয়ে হয়ে মীরাট চলে গেছে। বাড়ীতে যদি একটা বোন থাকত, বেশ হতো। আলেয়ার দিক থেকে কাদের ঠাকুর আসছে। জোর গান বাজাচ্ছে ব্যান্ডে। বোমার শব্দ, পটকা উড়ন-তুবড়ি—বেশ বড় মিছিল। অনেকে নাচছে। আমার সামনে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে গেল। মুখ ফিরিয়ে জানতে চাইল, 'এটা কি বারো ভাই?' 'নাঃ'। আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, 'বারো ভাই আরো সুন্দর। ওদের ঠাকুরটা আরো বিরাট।' ছেলেটা একটু অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'বারোভাই কি তোমাদের পাড়া?' ভুরু কুঁচকে তাকালাম, 'আমাকে তুমি করছেন যে?' কথাটা শুনে ছেলেটা একটা সিগারেট ধরাল। হেসে বলল, 'বয়সে ছোট কাউকে তুমি বললে কি কোনো দোষ হয়?' একটু বোকা বনে গেলাম। ছেলেটা সত্যিই আমার চেয়ে বয়সে বড়। তবু পকেটে মুঠো রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। হঠাৎ দেখি, লাট্টু। সিগারেট কিনছে। আমি কি ওকে ডাকব? আমার কি ওকে ডাকা উচিত? ভাবনায় পড়ার আগেই ও আমাকে দেখে চেঁচিয়ে বলল, 'কি রে সোনা, উজবুক স্টুপিড ওখানে কি করছিস?' বলতে বলতে নিজেই এগিয়ে এল। হাওয়া একটু গরম বুঝতে পেরে আমাকে চোখ টিপল, 'কি কেস গুরু! কিছু গরবর?' ছেলেটাকে দেখিয়ে বললাম, 'এটা একে জিগ্যেস কর।' কিছুর মধ্যে কিছু নেই, মাঝখান থেকে রঙ নিয়ে কথা বলছে।' অবাক হয়ে গেল ছেলেটা, 'আমি রঙ নিলাম? মা, তুমি? বেশ আমার নামে চালিয়ে দিলে তো!'

—আবার তুমি! পকেট থেকে মুঠ বার করলাম। ডান হাতের আঙুলে আজকাল সবসময়ই লোহার আংটিটা রাখি। আংটিটা ঘুরে গেছিল। ঠিক করে নিয়ে বললাম, 'আমি আপনাকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি। এরপর কিন্তু কেস বিলা হয়ে যাবে।' আমার থুতনি নেড়ে দিয়ে ছেলেটা বলল, 'খুব পেকেছ তো!' লাট্টু বলল, 'চলে আয় সোনা। ঝামেলা করিস না।'

—দাঁড়া।

আংটিটা যা তা। খালি ঘুরে যাচ্ছে। ঠিক করে নিয়ে সটান একটা ঘুঁষি চালালাম। নাক চেপে বসে পড়ল ছেলেটা। লাট্টু চেঁচিয়ে উঠল, 'কি করছিস সোনা! কেলেংকারী হয়ে যাবে।'

—কেলেংকারী বার করছি! শালা!

বয়সে বড় হলেও ছেলেটা মোটেই জোয়ান না। কলার ধরে টেনে তুললাম। আংটি ঠিক করে নিয়ে আবার একখানা। সঙ্গে সঙ্গে একটা লাথি ঝাড়লাম কোমরে। কোঁক করে উঠল। আমাকে জাপটে ধরল লাট্টু, 'কি করছিস এসব? ছেড়ে দে।' কালো বাঘের মতো আমি গোঁ গোঁ করলাম, 'মেরে একদম লাশ করে দেব!' গোলমাল দেখে টুকটাক ভীড় জমে গেল। সাউথের লোকেরা এমনিতে একটু ভীতু। তবু সাহস করে একজন এগিয়ে এসে জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার দাদা? মারপিট কেন?' লাট্টু হেসে বলল, 'পুরোনো কেস দাদা। নাক গলাবেন না।' সাহসী লোকটা আস্তে কেটে পড়ল। ছেলেটা পড়ে ছিল। উঠে দাঁড়াল। রুমাল দিয়ে রক্ত মুছল। বললাম, 'লক্ষ্মী ছোকরার মতো বাড়ী চলে যাও। গিয়ে বল সোনা লাট্টু মেরেছে। যাও। তোমার গ্যাংফ্যাং ডেকে নিয়ে এসো।' এক ঠেলা দিয়ে এগিয়ে দিলাম। ছেলেটা আর কিছু বলল না। মাথা নীচু করে চলে গেল। লাট্টু বলল, 'হাওয়া সুবিধের না গুরু। চল কেটে পড়ি।'

—কাটবি মানে? কাওয়ার্ড নাকি? সামনেই পানের দোকান। ঘাবড়াচ্ছিস কেন?

—যদি সত্যি ও গ্যাং নিয়ে আসে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাবি?

বললাম, 'তবুও কেটে যাবার প্রশ্ন ওঠে না। বরং একটা কাজ করা যাক। আমি দাঁড়াচ্ছি। তুই চট করে পাড়া থেকে বুলন আর নির্বাণকে ডেকে নিয়ে আয়। বুলনের কাছে আমার চেনটা আছে। ভুলিস না। যাঃ।' লাট্টুর পিঠ চাপড়ে দিলাম। যাবার সময় লাট্টু সাবধান করে দিয়ে গেল, 'তুই স্পটে থাকিস না সোনা। স্টাইলোর পিছনে দাঁড়া। আমি এক্ষুনি আসছি।' দৌড়ে লাট্টু পাড়ায় চলে গেল। আমি গ্যাট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম স্পটে।

একটু বাদে সুন্দর পোষাক পরা এক ভদ্রলোক এসে বলল, 'তোমার নাম সোনা? লাট্টু কোথায়?' পকেট থেকে চিরুনী বার করে চুল আঁচড়ে নিলাম। চোখ পা[illegible] জিগ্যেস করলাম, 'আপনি কে?'

—আমি কেউ না। এখন তুমি আ[illegible] সঙ্গে এসো।

—আপনার সঙ্গে যাব মানে? [illegible] দাঁড়ালাম। চোখ ছোট করে ব[illegible] নাকি? এখানে সুবিধা হবে না। [illegible] পড়ুন।' ভদ্রলোক এবার হাসিমুখে [illegible] কার্ড বার করল, 'আমি তোমাকে [illegible] করলাম।' চমকে দেখি, তিনজন [illegible] লোক আমাকে ঘিরে ধরেছে। তার [illegible] ভীড়ের সেই সাহসীটাও আছে। আমার [illegible] পাশেই সে। পালাবার চেষ্টা করলাম। [illegible] মেরে ফেলে দিল। সোজা চলে এলাম থা[না]... গিয়ে দেখি, বুলন আর নির্বাণও [illegible] এসেছে। সঙ্গে লাট্টু। ও-সির সামনে আ[মা]দের চারজনকে বসানো হোলো। বুলন নি[illegible] বোকা বনে গেছে। ফ্যাল ফ্যাল করে তা[কিয়ে] আছে ও-সির দিকে। ও-সি ফোন করছি[ল]। লাট্টু ফিসফিস করল, 'শালা খোঁচর [illegible] দেখি নি তো।' তারপর গুম মেরে গেল।

ফোন রেখে ও-সি কথা বলল, 'গুন্[ডামি] করা হয়?' নির্বাণ প্রায় কেঁদে ফেল[ল], 'আমরা গুণ্ডা না স্যার। কলেজে প[ড়ি]।' ও-সি সিগারেট ধরাল, 'দেখে তো ম[নে] হচ্ছে না। কোন ইয়ার?'

—ফার্স্ট ইয়ার স্যার। ফার্স্ট ইয়া[র]। চারজনেই ফার্স্ট ইয়ার। আমাদের ছেড়ে দি[ন] স্যার।

—চোপ্। হাতের ছোট লাঠিটা [illegible] করে টেবিলে মারল ও-সি। বলল, 'তোমা[দের] সব পিঠের ছাল তুলে দেব। শুয়োরের বাচ্চা[...]' আমার জিবটা চুলকে উঠল। বলে ফেল[লাম], 'গালাগালি দেবেন না। আমরা ভদ্রলোকে[র] ছেলে।' ও-সি বোধহয় থ হয়ে গেল। [illegible] করে কয়েক সেকেন্ড দেখল আমাকে। উ[ঠে] এল। বুলন [নির্বা]ণ লাট্টু, তিনজনকে [illegible] গুনে তিনটে থাপ্পড় মারল। লাট্টু, [illegible] দুজনেই ভ্যাক করে কেঁদে দিল। [illegible] কাঁদল না। আরো গোঁজ হয়ে গেল। ও-[সি] ধমক দিয়ে বলল, 'তোমরা বাড়ী চলে যাও। আর যদি কোনো দিন শুনি গুণ্ডামি করেছ, যাচ্ছেতাই ব্যাপার করে দেব। যাও।' ওরা চলে গেল। আমি শক্ত হয়ে চেয়ারে ব[সে] থাকলাম। ও-সি আমার একেবারে সাম[নে] এসে দাঁড়াল। টেবিলের ওপর এক পা তু[লে] [illegible] করল, 'বড় তেজ! পুলিশের মার চেনো না?'

—পুলিশে তো মারার নিয়ম নেই। আপনি মারবেন কেন?

—মারব কেন ও-সি যেন আর[ও] অবাক হয়ে গেল। বড্ড রেগে গেছে লোকটা। আমি নার্ভাস হয়ে গেলাম। লোকটা ম[ুঠো] করে আমার চুল ধরল। ঝাঁকুনি দিয়ে মাথাটা ঠুকে দিল টেবিলে। টের পেলাম রগদা। মাথা ঘুরে গেল। আমাকে তুলে দাঁড় করাল লোকটা। শালা তো খুনী! আমি মনে মনে বললাম। এবার কাত হয়ে পড়লা[ম]

চাঁচালে। ও-সি গরগর করল, 'বাবা কি করে ?'

—মরে গেছে।

—চলে কিসে ?

—বাড়ী আছে। ভাড়া পাই।

—আজ তোমার নিস্তার নেই।' গজ-গজ করতে করতে ফোন ধরল ও-সি। শুনলাম, 'ভেরী সারি সার। এক্ষুনি ছেড়ে দিচ্ছি। না না, কি বলছেন সার! গায়ে হাত! না না সার গায়ে হাত দিইনি।' ব্যাপারটা কি ? ও-সির মুখ শুকিয়ে গেছে। পিটপিট করে দেখছে আমাকে। আবার শুনলাম, 'ইয়েস সার, আমি এক্ষুনি ছেড়ে দিচ্ছি। ইয়েস সার। জাস্ট নাউ। আমার লোকই পৌঁছে দিয়ে আসবে। না না সার, গায়ে হাত দিইনি। ওকে।' খট করে ফোন রেখে দিল। গম্ভীরভাবে জিগ্যেস করল, আই-জি তোমার কে হয় ?'

—বলব কেন ?

—ঠিক আছে। থানার জিপে করে বাড়ী চলে যাও। আমি খুব স্যরি। কিছু মনে কোরো না। আর গুণ্ডামিটা কম কোরো। প্রায়ই কমপ্লেন আসে।

—কটা খাতে দেখুন তো।

—নটা। বলে ও-সি আরো গম্ভীর হয়ে গেল। আমি থানার জিপে করে বাড়ী চলে এলাম। দরজার সামনে চৌতিদি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই এগিয়ে এল। গায়ে হাত দিয়ে বলল, 'খুব মেরেছে ? তোকে নিয়ে যে কি করি!'

—আই-জি তোমার কে হয় ?

—কেউ না। বাবার ক্লাসফ্রেণ্ড ছিল। কলেজে। ভালোমত চেনা। নইলে কি হোতো বল্ তো। কি যে করিস ! মাসীমা একা মানুষ। তোকে নিয়ে তো মহা ভাবনায় পড়লাম। বললাম, 'আমাকে কেন ছাড়িয়ে আনলে তুমি ? আমি কি পায়ে ধরতে গেছিলাম ?' চৌতিদি বলল, 'পাগলামি করিস না। তুই কি হচ্ছিস বলতো দিনকে দিন? পড়াশোনার সময় গেল। দেখাই করলি না! কেন রে ?'

—আমার জন্য কে তোমাকে এত ভাবতে বলেছে ? তুমি যাও এখান থেকে।

—তুই আমার ওপর এখনো রেগে আছিস !

—তুমি আর ভেবো না আমার জন্য। আমি পছন্দ করি না।

—তুই বুঝি আমাকেও পছন্দ করিস না ?

—না। করি না। তুমি যাও চৌতিদি। আমার ভালো লাগছে না।

বারো

সকালে একদিন কাগজ খুলে দেখি থ। অংশু আর সীমনের ছবি বেরিয়েছে। চীফ মিনিস্টারের সঙ্গে। ত্রাণ তহবিলে টাকা জমা দিতে গেছিল। ছবি উঠে গেছে। খুব হাসছে দুজনে। মন খারাপ হয়ে গেল। তখন যদি বসে যেতাম ওদের সঙ্গে। আজ আমারো ছবি উঠত। মা কাগজ-টাগজ পড়ে না। একবার চোখ বোলায়। এ ছবি মা দেখুক আমি চাই না। মুখটুখ ধুয়ে কাগজটা নিয়ে বেরোলাম। লোকে চুকে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ভাসিয়ে দিলাম জলে। যাক। ভেসে যাক। অংশু সীমন ভেসে যাক। একটু হাল্কা হলাম। বাড়ী ফিরে এলাম।

চা খাচ্ছি, হঠাৎ ফোন এল। লাট্টু! প্রথমে এটা সেটা কথা, তারপর আসল কথা তুলল, "আজকের কাগজ দেখেছিস ? তোর বন্ধুদের ছবি বেরিয়েছে।'

—দেখেছি। কিন্তু হঠাৎ ফোন করলি যে ?

—একটা দরকার পড়ে গেল।

—বল্।

—দরকারটা আমার না। দিদির।

—যার দরকার সে নিজে ফোন না করে তোকে দিয়ে করাল কেন ?

—জানি না। আমাকে বলল, সোনাকে ডেকে দে। দেব ? এখানেই আছে।

—দে। ফোনটা ভাল করে চেপে ধরলাম কানে। কি মিষ্টি, কি নরম আমার ফোন। শুনলাম, 'এখনো কি অপছন্দ ? আজ দুপুরে নেমন্তন্ন করছি। আসবি তো ?'

—মেনু কি ?

—আগে তুই বল, আসবি। আসবি তো ?

—আসব।

—সত্যি! তার মানে আমার সঙ্গে ভাব, তাহলে বল্, ভাব। ভাব, ভাব।

তেরো

আমরা দুপুরে আড্ডা তোলো। ঠিক আগের মতো। লাট্টু গান গাইতে পারে না। চৌতিদিও না। তাই রেকর্ড শুনলাম। বিকেলের দিকে চৌতিদির এক বন্ধু এল। দীপা। আমারো চেনা। হাতফাত দেখে। চৌতিদি বলল, 'এই সোনা হাত দেখাবি ? দীপা ওর হাতটা একটু দেখে দে তো ?' দীপা আমার হাতটা টেনে নিয়ে বলল, 'কি জানতে চাও বল।'

—আমি কবে ফর্সা হব ? চৌতিদি আমার কান মলে দিল, 'এই পাজী খুব ফর্সা হবার সখ তোর চেয়ে ঢের কালো ছেলে আছে। তুই এমন কি কালো শুনি ?'

—সেজেছে! বলে লাট্টু দৌড়ে বাইরে চলে গেল। দীপা ঠোঁট টিপে হাসছে। বললাম, 'না, এমন কি আর কালো। খালি রঙটা একটু টেলিফোনের মতো।'

দীপাকে বললাম, 'তাহলে দেখুন ভালো ছেলে কবে হব ? কবে সবাই আমাকে ভালোবাসবে ?'

—উফ্! বড্ড পাকা। পাকেশ একটা! আবার কান মলা খেলাম। কানে হাত বুলিয়ে বললাম, 'দেখুন তো চৌতিদির কবে বিয়ে হচ্ছে ?'

—সোনা ভাল হবে না বলছি। এবার কিন্তু থাপ্পড় খাবি।

—তোমার থাপ্পড় খুব মিষ্টি। খুব সুন্দর গন্ধ। দীপা অবাক হয়ে বলল, 'সোনা তুমি একটা বোকার মতো কথা বললে। থাপ্পড়ের কি কোনো গন্ধ আছে ?'

—আছে। আছে। ওর থাপ্পড়ে আছে। ও যেখানে হাত দেবে, সুন্দর গন্ধ হয়ে যাবে। চৌতিদি লজ্জা পেয়ে গেল। বলল,

'ওর কথায় কান দিস না রে দীপা। ভারী জংলী ছেলে।'

দীপা থাকে শ্যামবাজারে। ওঠার সময় বলল, 'চল্ চৈতি, আমায় পেঁছে দিবি। গাড়ীটা বার কর। সোনা তুমিও চল।'

দীপাকে পেঁছে দিয়ে ফিরছি, হাজরার মোড়ে চৈতিদি বলল, 'কফি খাবি?' বসুশ্রীর নীচে গাড়ী রেখে দুজনে ওপরে উঠলাম। জানালার ধারে বসলাম। পকেটে সিগারেট ছিল। বললাম, 'একটা পারমিশন চাইছি। দেবে?'

—সিগারেট খাবি তো? পারমিশন দিলাম। খা। দেশলাই আছে? আমি 'না' বলতে চৈতিদি হাত নেড়ে ওয়েটারকে ডাকল।

কফিতে চুমুক দিলাম। সিগারেট ধরাচ্ছি, চোখে পড়ল, অল্প তফাতে টেবিল থেকে এক মহিলা আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। গালে হাত দিয়ে। চুপচাপ। অস্বস্তি লাগল। চৈতিদির হাতে চাপ দিয়ে আস্তে ইশারা করলাম। চৈতিদি ফিস ফিস করল, 'তুই চিনিস?'

—দূর! লাইফে দেখি নি।

—তাহলে তোর দিকে ওরকম হাঁ করে চেয়ে আছে কেন? মনে হচ্ছে, গিলছে। বাদ দে। তুই তাকাস না।

তাকাতে চাইছি না। তবু বার বার চোখ ঘুরে যাচ্ছে। কিছুটা বয়স হোলেও মহিলার চেহারা সুন্দর। অদ্ভুত মাখামাখা। সবচেয়ে সুন্দর চোখদুটো। বড়। বিশাল। কফি শেষ করে বললাম, 'চল চৈতিদি, উঠি। এখানে ভাল লাগছে না।'

—তাই চল। দাম মিটিয়ে দুজনে উঠে পড়লাম। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছি, পিছনে ডাক পেলাম, 'শোনো!' মুখ ফেরালাম। মহিলা উঠে এসেছে। আমার হাতটা শক্ত করে ধরে রেখে চৈতিদি কথা বলল, 'আমাদের বলছেন?'

—একটু দরকার ছিল। চৈতিদি বলল, 'আপনি আমাদের চেনেন?'

—চিনি। তোমার নাম চৈতি। চৈতি সেন। তুমি তিন বছর আগে বি-এ পাশ করেছো। এখন আছো একটা স্কুলে। আসলে আমার দরকার সোনার সঙ্গে।

বললাম, 'আমি আপনাকে চিনি না। কখনো দেখি নি।'

—তাতে কি? আমি তো চিনি। তুমি কি একটু আসবে? বেশীক্ষণ না। পাঁচ মিনিট।

চৈতিদি বলল, 'সোনা যাবে না। কি দরকার এখানে বলুন।'

মহিলা আমাকে বলল, 'তোমার কি আপত্তি আছে?'

—হ্যাঁ। আছে। আমার হাত ধরে টানতে টানতে চৈতিদি নেমে এল। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম, মহিলা সেই একই-ভাবে দাঁড়িয়ে। চুপচাপ। ছবির মতো। কি দরকার, জানি না। জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল। চৈতিদি গম্ভীর হয়ে গেছে। গাড়ী স্টার্ট দিয়ে বলল, 'কত রকম যেলোক এ শহরে। তুই যদি যেতিস, কি হোতো বলতো?'

—কি আবার হোতো। বেশ মজা হোতো।

—আর মজায় কাজ নেই। যত সব উটকো ঝমেলা।

চুপ করে থাকলাম। গাড়ী চালাতে চালাতে চৈতিদি আমাকে দেখল। বলল, 'কি ভাবছিস? বেশীক্ষণ না, পাঁচ মিনিট?'

—ভদ্রমহিলার বোধ হয় কিছু বলার ছিল।

—মন কেমন করছে? বল তবে গাড়ী ঘোরাই।

—থাক।

সাদার্ন এভিনিউতে পরে স্পীড তুলল চৈতিদি। হঠাৎ বলল, 'সকালে কখন উঠিস্ রে?' বললাম, 'সাতটা, কেন?'

'একদিন সবাই মিলে ব্যাণ্ডেল যাব। খুব হৈ-হৈ করব সারাদিন।

—ব্যাণ্ডেল? দূর! তোমরা যাও। আমি যাচ্ছি না।

—কেন? যাবি না কেন? আগে কখনো গেছিস্?

—আমি যাইনি। অংশু গেছিল। বলছিল খুব নাকি বোরিং।

—কে গেছিল বললি?

—অংশু। এই তো সেদিন ঘুরে এসেছে। চৈতিদি বলল, 'অংশু গেলেই তোর যাওয়া হয়ে গেল? অংশু বুঝি এখন খুব বন্ধু।'

বিড়বিড় করলাম, 'কেউ আমার বন্ধু না। সবাইকে আমি একদিন দেখে নেব.

—ওই কথাই সার। তোর দ্বারা কোনো দিন কিস্যু হবে না। কেকার খবর কি?

উত্তর দিলাম না। কি করে জানাই কেকা আর আমার পিছনে লাগে না। এই তিন মাসে ও অনেক বড় হয়ে গেছে। এই শহরে আর আঁটছে না।

চৈতিদি আবার বলল, 'কিরে? কেকার সঙ্গে দেখা হয় না?'

বললাম, 'আমাক গাড়ী চালানো শিখিয় দেবে? খুব জোরে গাড়ী চালিয়ে এই শহরটা পেরিয়ে যাব।'

—মানে? হঠাৎ একথা বলছি?

—এমনি।

চোদ্দ

কলেজের স্টপে নামলাম না। পরের স্টপ বিজলী। থানার সামনে। হেলেদুলে নামলাম। অথচ দশ মিনিট লেট। সিগারেট ধরালাম। দড়ি থেকে হঠাৎ আগুনের ফুলকি ছিটে এল মুখে। বুকটা ছ্যাং করে উঠল। তবে কি আমি নেই? অনার্স ফুট? কি করেই বা থাকব? পড়াশুনোই করি নি। সেকেন্ড আর থার্ড পেপারের ক্লাসে শুধু ঘুমিয়েছি। বাছাই পরীক্ষায় আমাকে এ্যালাউ করতে বয়ে গেছে কলেজের। আজই রেজাল্ট দেবে। এই ক্লাসে। পঁয়ত্রিশটা ছেলে। কজনকে কাটবে কে জানে। কলেজে এলাম। রেলিংয়ের ওপর হীরক বসে আছে। বললাম 'কিরে ক্লাসে যাসনি?'

—না গুরু। ভি আর রেজাল্ট বলছে। 'কিরে ক্লাসে যাসনি?'

—আমিও না। সিগারেট ফেলে ... রেলিংয়ে উঠে বসলাম। বললাম, 'অনার্স টনার্স বুঝলি আমার জন্য না। ওসব ... ছেলেদের জন্য।'

—তুই পেয়ে যেতে পারিস। ... তো স্ট্যাটিস্টিক্স ভাল হয়েছিল।

—ওতে অনার্স হয় না। অনার্সের জন্য আলাদা খিলু চাই। যেটা তোর আছে।

—যাঃ যাঃ, ইংরাজী করিস না। ... সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে ইয়াকী ভাল লাগে না। তুই কি করে বুঝলি আমার খিলু আছে?

—ও বোঝা যায়। তোর চোখ কতো ব্রাইট জানিস? অনার্স কে পাবে, না পাবে ঐ চোখ দেখলেই বোঝা যায়। একটা ক্যাপস্টান খাওয়া তো। ধরিয়ে আনিস। হীরক চটপট নেমে গিয়ে, ক্যাপস্ট্যান কিনে আনল। বলল, 'তুই বলছিস আমি পেয়ে যাব?'

—না পেলে আমার নামে ... পুষিস। যদি পাস, আমাকে কি দিবি?

—তোকে শালা মাল খাওয়াব। 'কিন্তু তুই যদি পাস আমাকে কি দিবি?'

—তোকে শালা মাল খাওয়াব। কিন্তু তুই ...

—আমি তোকে এই রাস্তাটা দেব।

—এই রাস্তাটা? এই রাস্তাটা মানে?

—হ্যাঁ, ইয়েস, এই রাস্তাটা। ... গোটা রাস্তাটা। এইসব বাড়ীটাড়ী সিনেমা হল থানা ট্রাম বাস, মেয়ে সব তোকে দিয়ে দেব। এসবের সঙ্গে ফাউ পাবি ... এর ওপরের আকাশটা। আপত্তি আছে?

—শালা! হীরক মনমরা হয়ে গেল। বললাম, 'বাদ দে। তার চেয়ে ... লক্ষ্মী দর্শন ... কাজ ... কলেজের পাশে ... । পার্কের পাশ দিয়ে দুজন চাবুক মেয়ে আসছে। আমাদের মতো সব রেলিং রোমিওরা কেউ হাঁ করে, কেউ হাসিমুখ করে, কেউ আঁতেল মুখ করে দেখছে। হীরককে ঠেলা দিলাম, 'কাকে ডাকব? কোনটাকে পছন্দ বল?' হীরক বলল, 'কলেজের সামনে ডাকিস না। কেলো হয়ে যাবে।' বললাম, 'তাহলে আয় ঐ পানের দোকানটার সামনে ডাকব।' মেয়ে দুটো বোধ হয় বুঝতে পেরেছে, আমাদের মতলব। সিগারেট ফেলে আমরা রেলিং থেকে নামতেই, বুকের আঁচল ঠিক করতে করতে চট করে রাস্তাটা পেরিয়ে গেল। আমরা তাড়াতাড়ি শ্রীহরির মিষ্টির দোকানে সমান্তরাল হয়ে রাস্তা পেরোলাম। হীরককে বললাম, 'তুই এ্যাপ্রোচ কর।'

—আমি না। তুই কর।

—অলরাইট। না হেসে আমি ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম। বললাম, 'একটা কথা ছিল।'

—কি কথা? আমাদের কোনো কথা নেই। একজন বলল।

—আমি কি বলেছি আপনাদের কথা আছে? কথা তো আমাদের

—ঐ একই হোলো।

না, ঐ একই হোলো না। কথাটা
।

অন্যজন চুপ করে ছিল। এবার বলল,
কথা আপনাদের ? আলাপ করতে চান ?
?'

—কেন আবার কি ? ভাল লেগেছে
।

—ভাল লাগলেই আলাপ করতে হবে ?

—আমরা এ্যাপ্রোচ করলাম। আমাদের
লাপ লাগলে চলে যেতে পারেন।

—আপনারা তো খুব রাগী। এসব
য় মেয়েরা কিন্তু বিনয় আশা করে।

—আপনিও ?

—আমার কথা হচ্ছে না। আমি ইন-
নারেল বলছি।

—বাঁচালেন। আপনি ইন জেনারেল
।

—আমি বুঝি তাই বললাম ? এই
খবেন, ষাঁড়।

চমকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি বিচ্ছিরী
কটা ষাঁড় আসছে। সরে গেলাম। একটা
য়ে ফাজলামি করল, 'ষাঁড়েরাও খুব রাগী
য়।' বললাম, 'আলাপ তো হোলো।
পনাদের নাম বলবেন না ?'

—নাম শুনে কি হবে ? এই সুতপা,
।

পরের জন এবার জোড়হাত করল,
আমার নাম তো শুনলেন। ওর নাম তন্দ্রা।
বার—আমরা যাই ?' বললাম, 'কোথায়
বেন ? সিনেমায় ?'

—হ্যাঁ, এই সামনে। ইন্দিরায়। আসি,
কেমন ?

হীরক তাড়াতাড়ি বলল, 'আমাদের
নাম জানতে চাইলেন না ?'

—লাভ কি ? হঠাৎ যদি দেখা হয়ে
যায়, কথা নিশ্চয়ই বলব। তখন মুখ ফিরিয়ে
নেবেন না তো ? হীরক বিগলিতভাবে কি
বলতে যাচ্ছিল। চোখ টিপে থামিয়ে দিলাম।
হেসে বললাম, 'তাই কখনো পারি ? অপ-
মানটা ফিরিয়ে দিতে হবে না ? আচ্ছা
আসি। নমস্কার।'

রাস্তা পেরোবার সময় হীরক পিছু
ফিরল, 'দ্যাখ এখনো দাঁড়িয়ে আছে।'

—থাকুক।

কলেজে ফিরতেই অংশুর সঙ্গে দেখা।
বলল, 'তোদের রেজাল্ট বেরিয়েছে।
পাসনি ?' অংশুর পাশ কাটিয়ে আমরা
ধীরে সুস্থে ওপরে এলাম। করিডোরেই
দেখা হয়ে গেল ডি আর-এর সঙ্গে। হেসে
বলল, 'কি ব্যাপার। তোমরা ক্লাস করলে
না ? তোমাদের রোল যেন কত ?'

বললাম। ডি আর পকেট থেকে একটা
ভাঁজ করা কাগজ বার করল। খুলল। তার-
পর পিঠ চাপড়ে দিল, 'বোথ অব ইউ গট
অনার্স। তবে মন দিয়ে পড়। রেজাল্ট ভাল
হয়নি। আমাদের এখন স্বর্গপ্রাপ্তি অবস্থা।
হীরক প্রায় কেঁদে ফেলবে। আর আমি হাঁ
করে ভগবান দেখছি। ভগবান লেফট-রাইট
করে চলে গেল।

সন্ধেবেলা চৌতিদির বাড়ী গেলাম।
মোড়ের মাথায় লাটু ডাকল, 'দিদি কিন্তু
নেই।' জিগ্যেস করলাম, 'কোথায় গেছে ?'

—ক্লাবে। সাঁতার কাটতে। যা না।
পেয়ে যাবি।

ক্লাবে এলাম। সাঁতারের পোশাক পরা,
তোয়ালে জড়িয়ে চৌতিদি পুলের ধারে
আড্ডা দিচ্ছে। সঙ্গে আরো চারজন মেয়ে।
সবাই সাঁতারের পোশাক পরা। তেল মেখে
বসে আছে। আমি আসতেই চার-
জনে ঝুপ ঝুপ করে জলে লাফিয়ে
পড়ল। চৌতিদি হাসল, 'তোকে
দেখে লজ্জা পেয়ে গেছে।' বললাম,
'তুমি পাও নি ?' টিয়াপাখীর মতো
ঘাড় বেঁকিয়ে চৌতিদি আমাকে দেখল।
ভুরু কুঁচকে বলল, 'বড্ড পেকে
গেছিস।' তারপর ঠোঁট উল্টালো, 'তোকে
লজ্জা পেতে বয়ে গেছে আমার।
আমার অত লজ্জাটজ্জা নেই।' আমি
চৌতিদির পাশে বসলাম। বললাম, 'জানো,
আজ সিলেকশন টেস্টের রেজাল্ট
বেরিয়েছে। অনার্স পেয়ে গেছি।
পঁয়ত্রিশ জন ছিলাম। কেটেকুটে এখন মাত্র
ষোলজন।'

—কত পেয়েছিস শুনি ?

—সাতাশি। দুশোর মধ্যে।

মাত্র ! মাত্র সাতাশি ! চৌতিদি পা
ছড়িয়ে বলল, 'কফি খাবি ?'

চট করে আমি চুপ করে গেলাম।
পা ছড়িয়ে বসে আছে চৌতিদি। মাথায়
সাঁতারের লাল টুপি। লাল পোশাক।

ওপরে ছোট্ট একটুখানি তোয়ালে। লাল সিমেন্টের ওপর কালোমতো শরীর ছড়িয়ে বসা চৌতিদিকে আমার ফিল্মস্টার মনে হচ্ছে। তেল মেখে বসে আছে। তেলে মেশানো পাগলা একটা গন্ধ চৌতিদির গা থেকে। ভিতরে ভিতরে আমি ক্ষেপে গেলাম। বোকার মতো বললাম, 'তোমায় আজ টপ লাগছে।' শুনে চৌতিদি সিনেমার মতো হাসল, 'টপ, মানে?'

—মানে দারুণ। বোকামিটা সামলে নিয়ে বললাম 'সত্যি বড্ড পেকে গেছি?'

পনেরো

তুমি কেন রাগ করে আছো? সেদিন মেরেছি বলে? ভেবে দ্যাখো, আমরা ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে মিশছি। একটু-আধটু মারপিট আগেও হয়েছে। তখন তো এ রকম কর নি। সেদিন কেন মাথা ঠিক রাখতে পারলাম না জানো? ক্যাবের সেই ঝলমলে আলোয় আমি তোমার মুখে রঙ দেখলাম। কেমন গোলমাল হয়ে গেল সব। আসলে আমি খুব ছটফট করছিলাম। বিশ্বাস কর। আচ্ছা বেশ ক্ষমা চাইছি। তাহলে হবে তো? তুমি কি ক্ষমা করবে না?—আরো লিখতাম। হঠাৎ মনে হলো, এ সব কি করছি? ছেলেমানুষীর কোনো মানে হয়? কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেললাম পাতাটা। কাকে চিঠি লিখছি—আমি? সে কি পড়বে? যদি নাক সিঁটকায়? যদি বলে নাম পাচ্ছে? কিংবা পড়ে যদি হাসাহাসি করে? তখন কি আর মান সম্মান থাকবে? তার চেয়ে সে থাকুক। সে তার নিজেকে নিয়ে থাকুক। আমার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

খাতা বন্ধ করে ভাবলাম, কি করি। কলেজ নেই। যাই, অংশুদের বাড়ী যাই। ঘুরে আসি। অন্য কাউকে এখন পাওয়া যাবে না। কাছাকাছির মধ্যে একমাত্র অংশুই। চটপট জামা গলিয়ে নিলাম। গিয়ে দেখি, নেই। সকাল সকাল কলেজে বেরিয়ে গেছে। অংশুর মা সন্দেহের চোখে আমাকে দেখল। বলল, 'তোমার আজ কলেজ নেই? ছুটি বুঝি? তোমাদের এ্যানুয়াল কবে? পড়াশুনো করছ?' সেরেছে। একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন! ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। অংশুর মার সন্দেহ আরো বেড়ে গেল। বলল, 'ক্লাস নেই তো রোদে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? বাড়ী বসে পড়াশুনো করলেও তো পারো। অংশুকেও দেখি ক্লাস না থাকলেই রোদের মধ্যে টো টো। তুমি কি ভিতরে আসবে?' যেন, ভিতরে গেলে মহাপাপ হয়ে যাবে। ধুৎ! না এলেই হোতো। সুযোগ পেয়ে মহিলা জ্ঞান দিয়ে দিল জোর। মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললাম, 'পড়তেই তো গেছিলাম। পড়ে ফিরছি। আমার ক্লাস আজ একটায়।' এতক্ষণে মহিলা হাসল, 'তাই বল। আমি ভাবছিলাম কি ব্যাপার, তুমি তো কখনো ক্লাস কামাই কর না। তা এখন বুঝি পড়ে ফিরছ? কোথায় পড়? কোনো কোচিং-এ?'

—না। একজন প্রফেসরের বাড়ীতে।

—অংশুকে কিছু বলতে হবে?

—খালি বলবেন আমি এসেছিলাম।

রাস্তায় নেমে দেখি, অংশু আসছে। আমাকে দেখে দাঁত বার করল, 'আরে তুই। কোত্থেকে?' বললাম, 'তোদের বাড়ী থেকে। গেছিলি কোথায়? বাড়ী গিয়ে পেলাম না।'

—কি করে পাবি?, আমি তো আসছি গরচা থেকে।

—কেন?

—কাজ ছিল। তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, ভালই হোলো। চা খাবি? চল, চা খেয়ে আরেকটা জায়গায় যাবো।

দুজনে একটা ছোট চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়ালাম। চা খেয়ে বললাম, 'কোথায় যাবি এখন?'

—চল না। যেতে যেতে বলব।

বাসে উঠে বালীগঞ্জ স্টেশনে নামলাম।

বললাম, 'এখানে এলি যে? কোথায় যাবি?

—বলছি। বলছি। আগে তুই টাকাগুলো রাখ। আমার পকেটটা ছোট।

একতাড়া নোট অংশু আমার দিকে এগিয়ে দিল। বললাম, 'একি রে! এত টাকা। কাকে দিবি?'

—একজনকে।

—একজনকে মানে? কে হয় তোর?

—কেউ না। বন্ধু।

অংশু বারুইপুরের টিকিট কাটল। ট্রেনে উঠলাম। দরজার কাছে দাঁড়ালাম। বারুইপুরে পৌঁছে গেলাম। নেমেই ওভার ব্রীজ। উঠলাম।

—এবার কোন দিকে?

—ডান। অংশুর অন্যমনস্ক উত্তর পেলাম।

হেসে বললাম, 'কি রে, কি ভাবছিস আবার?' অংশু বলল, 'সোনা, তুই বোধহয় কিছু বুঝতে পারছিস না। আসলে জিনিসটা খুব স্যাড। একদম সিনেমার মতো।'

ওভার ব্রীজ থেকে নামলাম। অনেকটা হেঁটে এলাম একটা আস্তানার কাছে। আস্তানাই। বাড়ী না। অংশু এগিয়ে গেল। গলা তুলে ডাকল, 'হেমাদি আমি এসে গেছি। হেমাদি।'

আমি চারদিক দেখছিলাম। এলোমেলো একটা বাগান আছে। নানা রকম গাছ। আমি গাছ চিনি না। দুপুর হচ্ছে। রোদের ঝাঁঝ প্রচণ্ড। পাশ দিয়ে লম্বা একটা রাস্তা চলে গেছে। গরুর গাড়ী যাচ্ছে একটা। অদ্ভুত অদ্ভুত পাখীর ডাক। কি কম অন্য রকম লাগছে। সব মিলিয়ে কি রকম নতুন নতুন গন্ধ। অংশু আবার ডাকল, 'হেমাদি শুনছ? আমি এসে গেছি?' চোখ ফেরাতেই চমকে উঠলাম। সে। সেই মহিলা। আজ আলাদা। অন্য রকম। বোধহয় কাজ করছিল। আঁচল দিয়ে ঘাম মুছছে। অংশু আবার বলল, 'হেমাদি আমি এসে গেছি। কিচ্ছু ভেবো না।' কথা বলতে বলতে ও দাওয়ায় উঠে পড়ল। আমাকে দেখিয়ে বলল, 'আমার বন্ধু সোনা। আমরা এক কলেজেই পড়ি।' মহিলা কি আমাকে চিনতেই পারছে না? হেসে বলল, 'তুমি বুঝি অংশুর বন্ধু? সামনের বার পার্ট ওয়ান দেবে? অংশু, বন্ধুকে ভিতরে নিয়ে আয়। দাঁড়িয়ে রইলি কেন?'

—আজ থাক হেমাদি। অংশু আমাকে চোখ টিপল, অর্থাৎ টাকাটা বার কর। করলাম। হেমাদির দিকে অংশু টাকাটা বাড়িয়ে ধরল।

বলল, 'রাখো। একদম কিচ্ছু ভাববে না।' হেমাদি হাসল, 'তোকে কি মহৎ বলব?'

—তার আগে বলে দাও, আমার কি পাপ। শুনে চলে যাই।

দুজনে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে হেমাদির চোখে জল আসে না। আমাকে বলল, 'একটু বসবে না? এসেই চলে যাবে?' আমি কিছু বলার আগেই অংশু তাড়া দিল, 'না, না। বসলে দেরি হয়ে যাবে।' হেমাদি তবু কোঁচকালো, 'কোথায় যাবি এখন? এই রোদ মাথায় নিয়ে?' —রোদ মাথায় নিয়েই তো এলাম। চলি আজকে। আবার আসব। আয় সোনা। যেতে আমার পা সরছে না। আজ কি কোনো দরকারই নেই? কোথায় সেই বেশীক্ষণ না পাঁচ মিনিট? তাকালাম। শুনলাম, তোমার সঙ্গে তো কোনো কথাই হোলো না, আরেকদিন এসো। অনেকক্ষণ ধরে গল্প করব। কেমন? বেরিয়ে এসে অংশু বলল, তোর ইমপ্রেশন কি রে?

—ইমপ্রেশন কি এইটুকুতে হয় নাকি?

—তবু, কি রকম লাগল?

—ভাল না।

—ভাল না! কেন? হেমাদিকে তোর ভাল লাগল না?

—ভাল লাগতেই হবে, তার কি মানে আছে?

—কারণটা জানতে পারি?

—কারণ নেই। কোনো কারণ নেই। সবাইকে কি সবার ভাল লাগে?

—হেমাদি মানুষটা কিন্তু খারাপ না। ওর সব কথা তুই জানিস না। জানলে ওকে তুই বুঝবার চেষ্টা করতিস।

—আমি এসব পছন্দ করি না। তুই আমাকে আনলি কেন?

ষোলো

ক্লাসে একদিন তীর্থ একটা বই নিয়ে এল। মলাট দেওয়া। ময়লা। তীর্থ আমার ঠিক সামনে বসে। সেকেণ্ড ইয়ারে ওঠার পর থেকে আমরা সবাই একটা করে খাতা নিয়ে আসি। অফ পিরিয়ডে বনফুলে বসে আড্ডা দিই। ইউনিভারসিটির স্বপ্ন দেখি।

তীর্থ মন দিয়ে বইটা পড়ছে। কেমন অবাক লাগল। নিশ্চয়ই পড়ার বই না।

তেই ঘন্টা পড়ে গেল। তীর্থ বইটা ঢুকিয়ে রাখল ডেস্কে। আমি ঠে খোঁচা দিলাম, 'কি বইরে ?' তীর্থ উত্তর দিল, 'চতুষ্কোণ।'

—চতুষ্কোণ। আমি ভাবনায় পড়ে । কখনো নাম শুনিনি তো।

তীর্থ হাসল, 'লাইফে তো কিছু না। মানিক ব্যানার্জির নাম স? ' মাথা নাড়তে তীর্থ থ হয়ে বলল, 'অদ্ভুত ব্যাপার। তুই মানিকের নাম শুনিস নি ? বেঁচে আছিস কেন ?' তীর্থ আবার বলল, 'সোনা তোর স্টাডি এত লিমিটেড জানতাম না।' বললাম, 'বইটা আমায় দিবি ?'

—পাগল নাকি ? এই বই হাতছাড়া করা যায় ?

—তুই দে, আমি পরশু নিয়ে আসব। কথা দিচ্ছি। অনেক বোঝাবার পর তীর্থ রাজী হোলো। বইটা দিয়ে বলল, সাবধানে রাখিস, ছিঁড়িস না। এ বই কিন্তু পাওয়া যায় না।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর বইটা পড়ে ফেললাম। কিছুক্ষণ ঝিম মেরে পড়ে থাকলাম। দরজা খুলে রাস্তায় এলাম। এলোমেলো ঘুরলাম। সিগারেট খেলাম। ফিরে এলাম। শুয়ে পড়লাম। রাতে আর ঘুম হোলো না।

(চলবে)

হাওয়া গাড়ি

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

।। ছয় ।।

দক্ষিণ দিকে কয়লা ভর্তি দশটা খোলা টাব তারের রশি বাঁধা অবস্থায় ইলেকট্রিক হলেজের জোরে পাতাল থেকে বাইরের পৃথিবীতে উঠে গেল। অবলীলায়। গোকুল দত্ত মাইনারের মেটাল হেলমেট পরা অবস্থায় একদম অ্যাসটোনিশ্ট। প্রায় সেই ভঙ্গিতেই অনন্তকে বলল, গোবিন্দ স্টিল সময়মত কয়লা পেলেই সব মেনে নেবে।

না গোকুলদা। সেভেনটিন পারসেন্টের বেশি অ্যাশকনটেন্ট থাকলে ওরা কন্ট্রাক্ট বাতিল করবে নির্ঘাৎ। চালান খালাসই করবে না।

তা উপায় কি বল।

এখনে তো দেখছি—সেল আর কয়লা একসঙ্গে কাটাই হয়ে মিশে যাচ্ছে। কোন বাছাইয়ের ব্যাপারই নেই।

দু'-এক চালান গোবিন্দ স্টিল মেনে নেবে দেখিস। ওরাও তো এ-দরে ওয়েস্ট কোস্টে কয়লা পাবে না। মাথা খুঁড়লেও পাবে না অনন্ত।

তাই নিয়ে তো গোকুলদা আপত্তি তুলেছে কোল ইন্ডিয়া। ঋষি বলছিল। দিল্লিতে এখন ফাইল চালাচালি হচ্ছে।

তাহলে ?

দিলীপদা বলছিল, ডেলিভারি দিয়ে যাও। তারপর দিল্লি দেখা যাবে। দরকার হলে দিল্লি যাবে দিলীপদা।

দিলীপ গেলে ঠিক সুরাহা হবে দেখিস। দিলীপের জন্যেই তো রেল কোম্পানী লাইন পেতে দিল। এত তাড়াতাড়ি দিত না।

পাতাল মুল্লুকে গাড়িঘোড়া বলতে এই হলেজ। এই সেদিন তারের রশি ছিঁড়ে গিয়ে কাটিং মেশিনের ড্রাইভার প্রায় মরতে বসেছিল। আজকের লুজম্যান লক্ষ্মণ ডোমের কিন্তু ভয় নেই কিছু হলে সেই হয়তো আগে মা[...] রশি ছিঁড়ে গেলে হলেজের গতি ঘণ্[...] দুশো মাইলও হতে পারে।

হলেজ রাবিশ করছে কয়লাবো[...] টাবগুলোকে। ভেতরটায়—কী দিন—[...] রাত—সমান অন্ধকার। রাস্তা দি[...] চলেছে মেশিন কুলি, লেডার, মাই[...] সর্দার, ওভারম্যান, সর্ট ফায়ার[...] পাতালের এ-দুনিয়া একেবারে আলাদা।

গোকুল দত্ত অনন্তর মুখ দেখ[...] পাচ্ছিল না। অন্ধকারেই অনন্ত[...] বললো, দিলীপটা একটা পাগল। নাই[...] এত কাণ্ডের জিনিসপত্তর এই এক বছ[...] ভেতর জোগাড় করা চাট্টিখানি ক[...] নয়রে—

দিলীপদার কথা বলো না। ওর প[...] সবই সম্ভব। একটা ব্যাংক স্টার্ট দিলে[...] দিতে পারে মানুষটা। ওকে তো আ[...] কমদিন জানি না—

ভিজে ভিজে রাস্তা। কোথাও ও[...]

থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে : মনে হবে—ওপরে বৃষ্টি হচ্ছে। ওপরে বৃষ্টি হোক বা না হোক—এখানে এই পাতালে কোন রকমফের নেই। অমনভাবে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল পড়বেই। কয়েকটা জায়গায় জায়গায় জল জমেছে।

গোকুল আর অনন্ত অন্ধকার কুরে কুরে এগোচ্ছিল। এক জায়গায় এসে রাস্তা শেষ। এই শেষটা অবশ্য পিছিয়েই যাচ্ছিল। কয়লা যত কাটাই হচ্ছে—রাস্তাও তত ভেতরে চলে যাচ্ছে। এর ঠিক ওপরেই পৃথিবীতে হয়তো একটা গ্রাম। সেখানে ঘরবাড়ি। হয়তো রান্নাবান্না—নয়তো অন্য কাজকর্ম চলছে। ওরা হয়তো ভাবতেও পারবে না—ঠিক ওদের নিচেই কী ভয়াবহ কান্ডকারখানা চলেছে।

মাইনিং সর্দার এগিয়ে এসে গোকুল-দের সরে দাঁড়াতে বললো। এক একবার বারুদ ঠেসে—জোর দাগানিতে—এক একবারে টন চোদ্দ করে কয়লা উঠছিল।

ওরা দুজনে ওপরে উঠে এসে বললো—কথায় কথায় গল্প করে এ-কাজে যেদিন সবাই মিলে নেমেছিল—তারপর এই এক বছরে—কাজ কি বিরাট করে এগিয়েছে—কাজ কী পরিমাণে বেড়েছে।

ভৌমিক ট্রাস্টের বাংলোর বারান্দায় বসে গোকুল দত্ত বললো, আজ এখানে দিলীপ থাকলে ভালো হোতো রে অনন্ত—

দিলীপদা ? তাকে পাবে কোথায় ! সে এখন দ্যাখো গিয়ে কোন্ কোম্পানীর চেয়ারম্যান নয়তো ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে লাঞ্চ খাচ্ছে। নয়তো ইথেতান কিংবা বাজোরিয়াদের প্রাইভেট পুলে সাঁতরাচ্ছে। ক্যাপিটাল। আরও ক্যাপিটাল চাই।

এক শীত ঘুরে আরেক শীত এসে গেল। কাছেই পান্ডবেশ্বরের পাহাড়। বিকেল মুছে যাবার আগে সূর্যটা এইমাত্র পান্ডবেশ্বরের মাথায় লাল আগুনে রংয়ের বল গড়িয়ে দিয়েছে একটা। বলটা অন্ধকারে হারিয়ে গেলেই অন্ধকার আর শীত এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সেদিকে তাকিয়ে অনন্ত বললো, ঋষি আর দিলীপদা—দুজনে দুদিকে চলছে। কি করা যায় বল তো গোকুলদা?

আমারও ভালো লাগছে না। একজন খাদান বাড়াতে চায়। ক্যাপিটাল আনতে চায় আরো। আরো ক্যাপিটাল। আরো লেবার। অন্যজন আর এগোতেই চায় না। ঋষির কথা হোল—কে এই ঝক্কি পোয়াবে। আমাদের তো বয়স হচ্ছে। দশ বছর আগে হলে অন্য কথা ছিল। সত্যিই তো অনন্ত—

কিন্তু দিলীপদাকে তার জেদ থেকে কে থামাবে। সে কোল ইন্ডিয়াকে একটা লেসন্ দিতে চায়। পাগলামি নয় কি ? কোথায় কোল ইন্ডিয়া ! আর কোথায় আমাদের ভৌমিক ট্রাস্ট !

গোকুল দত্ত পান্ডবেশ্বরের পাহাড়ের মাথার ওপরকার লাল বলটাকে দেখে নিজে এই ডুবে যায়—অথচ ডোবে না। সেদিকে তাকিয়েই গোকুল দত্ত বললো, লোকের

লোকটাকে কোল ইন্ডিয়া কোনদিন কাজে লাগায় নি।

এটা আমার কাছে একটা মিস্টি গোকুলদা।

সে জন্যেই তো দিলীপ এ-ব্যাপারে অত জিদি। গোকুল দত্ত আর কিছু বললো না। তার মনের ভেতর কোন গাছ উপড়ে পড়ার মত থমথমে ভাব। অথচ কোন গাছটা উপড়ে পড়বে—সে তা জানে না। গোকুলের চোখের সামনেই বাংলোর সামনের মাঠটা অন্ধকার হয়ে গেল। একদিকে দুমকা-সিউড়ির রাস্তা। ঠিক উল্টো দিকে পান্ডবেশ্বর এরিয়ার ভেতর দিয়ে বড় বড় কোলিয়ারির গা ছুঁয়ে আরেকটা অজগরের ফিতে। দুটো পথই এখন অন্ধকারে তলিয়ে গেল। পথ যে ওখানে আছে—তা বোঝা যায় চলন্ত গাড়ির হেড-লাইট দেখে।

দিলীপদার এ খাটুনী যদি কোল ইন্ডিয়া পেতো।

উরে শ্বাস ! তাহলে তো রাজা হয়ে যেতো।

অথচ দ্যাখো গোকুলদা—লোকটাকে কাজে লাগাবে না। টোয়েন্টি সেভেন হর্স পাওয়ার—সব সময় থর থর করে কাঁপছে।

এমন লোকের তো জেদ হবেই। অথচ এ-খনি আরও বড় করার ঝাপা পোষানো কার সইবে বল ? আমার খাটাল কি আরও বড় হতে পারতো না ? পারতো। কিন্তু ঝক্কি। সামলাবে কে ?

দিলীপদা চায় টক্কর দেওয়ার মত কোল এমপায়ার। নিজেই জানে—টনেজ বেড়ে গেলে ন্যাশনালাইজেশনের আওতায় পড়তে হবে। তবু—তবু বড় করা চাই। এটা অন্ধ জেদ গোকুলদা। এখানেই মেলে মিলছে না—। কয়লার সাম্রাজ্য দিয়ে আমাদের মত মানুষের কি হবে ?

ওটা একটা কষ্টের জায়গা দিলীপের। সবই বুঝি অনন্ত—অথচ কিছু করতেও পারবো না। এই মেশামেশি—দেখাশুনো—দিলীপ থাকলে হাসিতে—গল্পে—নাচে ভরাট হয়ে যায়। দেখিস—এই কয়লাই না একদিন আমাদের ভেঙে দ্যায়—টুকরো টুকরো করে দ্যায়।

অনন্তও ধরতে পারছিল না—এত বড় একটা কাজের ভেতর—খাদান নিয়ে এতটা এগিয়ে যাওয়ার পর কোথায় যেন থেমে পড়ার ঘন্টা বাজতে শুরু করে দিয়েছে। স্রোতের ভেতর উল্টো স্রোতের জল ভাঙার শব্দ।

তিরিশ মাইল দূরে থেকে পাকা রুই আনিয়েছে অনন্ত। তার কয়েকখানা বড় পিস ভাজা, বরফের কিউব, ওপেনার—সব সাজিয়ে দিয়ে গেল বাংলোর বেয়ারা।

অনন্ত বলছিল, জানো গোকুলদা—আমার পূর্বপুরুষরা শুধু বাড়ি বানিয়ে গেছে। বাড়ির পর বাড়ি। হরিদ্বারে বাড়ি। বৃন্দাবনে বাড়ি। সব জায়গায় একখানা দুখানা করে বাড়ি। অনেক বাড়ি আমি চোখেও দেখিনি।

আমি অনন্ত শুরু করেছিলাম একটা দিশী গাই নিয়ে। দুধের ক্যানভাসারি করতাম সাইকেলে সাইকেলে—

ক্যানভাসারি ?

ওই হোল গিয়ে দুধের জোগান যাকে বলে। মীরাকে আনলিনে কেন এবারে। ভালো লাগতো ওর।

আসতে চাইলো না। কে বল কলকাতা ফেলে কয়লার ধুলো মাখতে আসবে। হাজার হোক মেয়েমানুষ তো। এখানে এলে মেকআপ বিগড়ে যাবে।

গোকুল দত্ত হেসে ফেললো। মেয়ে-ছেলের মন ভালো রাখতে একটা কাজ করবি। মাঝে মাঝে দুজনায় মার্কেটে যাবি। শপিং করবি।

অনন্ত ভৌমিক এই সফল খাটাল-মালিকের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছিল।

হাসির কথা নয়রে। ওরা কেনাকাটা খুব ভালবাসে। একটা হার কিনে দিবি মাঝেমধ্যে।

উরে বাব্বা! তুমি হাসালে গোকুল-দা। এই করে তুমি রেখা বৌদির মন পাও।

রেখা আমায় খুব ভালবাসেরে—

তোমার ছেলেরা কিছু বলে না ?

বড়ছেলে তো দেখাশুনো করে ওদের এই মাকে।

তুমি একটা ছেলে দিলে পারতে এ বউকে।

আর হয় নারে। বয়স হয়েছে রেখার। তারপর মাথার গরম আছে। চক্কির যোগেশে পাগল হয় মাঝে মাঝে। জানিস তো সব। এ অবস্থায় আবার যদি বাপ হই—ছেলেটা হয়তো পাগল হবে। লোকে আমাকেই দুষবে শেষে।

তার চেয়ে বল—আমাদের বড় বউদির

জয়ে তুমি আর বাপ হতে রাজি নয়।

মারে পাগল। ছেলেদের বড়মা রেখাকে খুব ভালবাসে। এইতো পুজোয় কাপড় পাঠালে ছেলের হাত দিয়ে। যা তোদের ছোট মাকে দিয়ে আয়—

বড় বউদি কোথায় গো এখন? সেদিন তো তোমাদের বাড়িতে খেতে বসে দেখতে পেলাম না।

বড় বউ? সে এখন কাশী বৃন্দাবন করছে মেজো ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। বেড়ালে মন ভালো হয়। মন বড় হয়। ওগো আমার কত কি মেনে নিয়েছে—ভাবলে অবাক লাগে। বলতে বলতে গোকুল দত্ত আবার পান্ডবেশ্বর পাহাড়ের মাথার দিকে তাকালো। খুঁজে পেল না। এখন সবটাই অন্ধকার। আলো শুধু এই বাংলোর হাতায়।

জানিস অনন্ত। আরও একজন আমার বউ হতে পারতো।

অনন্ত ভৌমিকের হাত থেকে হুইস্কির গ্লাস পড়ে যাচ্ছিল। আবার কোথায় কি করেছিলে? কবে? কিছুই তো জানিনে আমরা।

আমার এ জীবনটা একটা জীবন নয় রে।

তোমার নেশা হয়ে যাবে গোকুলদা। এমন একবারে খেয়ো না।

দিলীপের জন্যে মনটা বড় খারাপ লাগছে রে—

দিলীপদা ডাকাবুকো লোক। ওকে তুমি ফেরাতে পারবে না। বড়—আরও বড়—বিরাট বড় করতে হবে সব কিছু—এই যার রোগ—তাকে তুমি কি দিয়ে আটকাবে গোকুলদা? ওর নিয়তি ওর নিজের হাতে। ওকে ফেরানো যাবে না গোকুলদা। যা বলছিলে বল।

যদি ফিরতো।

তারপর কি হোল?

ও শুধু ঋষির কথাই শুনবে। আর কারও নয়।

ঋষিকে তো ভালোবাসে পাগলের মত। তারপর কি হোল গোকুলদা?

তখন আমার বয়স কম ছিল। কুস্তি করতাম। আদ্দির সেরওয়ানি পরতাম। বছর বিশ বাইশ বয়স হবে। লক্ষ্ণৌতে পড়ে আছি বাঈজি বাড়ি। গান শুনছি তিন মাস। বাবা লোক পাঠিয়েও ফেরৎ আনতে পারেননি।

কেন?

ফিরবো কি। তখন আমি মীনা বাঈয়ের মেজো মেয়ের পেটের ছেলের বাপ।

মীনা বাঈকে কোত্থেকে পেলে গোকুলদা। তোমার নেশা হয়ে গেছে।

কেন বাজে বকছিস। আমার পূর্ব-পুরুষদের—কর্তাদের কথা তুই জানিস কিছু যে কথা বলছিস। মেজো কর্তার বাবা মেয়ে-মানুষ ন্যাংটো করে বাটনা বাটাতে বসাতো।

সত্যি?

বাজে কথা রাখ তো। কেন বে-লাইন করে দিচ্ছিস? মীনার মেয়েমেয়েকে বিয়ে করবো। সব ঠিকঠাক। বাবা পুলিশ দিয়ে অ্যারেস্ট করে কলকাতায় নিয়ে এলেন। একটি বছর পরে পালিয়ে আবার লখনৌ। কিন্তু দেখা হোল না।

তার সঙ্গে?

তাঁর সঙ্গে। আমার প্রথমা স্ত্রী। বিয়ে হলে প্রথমা স্ত্রীই হতেন তিনি। তিনিই আমার প্রথমা স্ত্রী। বাচ্চা হতে গিয়ে মারা গেল। ছেলেটা আছে।

তোমায় চেনে?

ফি বছর পুজোয় কাপড় পাঠায়। মেয়ের বে দিলাম। বেনারসী পাঠালো বোনের জন্যে।

কি নাম ছেলের?

ওর দিদিমা নাম রেখেছিল প্রিন্স। প্রিন্স আমায় ইংরেজিতে চিঠি লেখে। বাংলা তো শেখেনি। আমিও উর্দু জানিনে। তাই ইংরেজিতে লেখে।

ওই বড় মাছখানা খাও গোকুলদা। তোমাকে দেখা মানে বিশ্বরূপ দর্শন গোকুলদা। তুমি হলে গিয়ে তিনখন্ডের উপন্যাস। যত জানছি তোমায়—তত অবাক হচ্ছি।

অবাকের কি আছে রে অনন্ত। পুরুষমানুষের জীবনে তিন চারটে গল্প থাকবে না? তাহলে পুরুষ মানুষ কিসের।

তোমার ঘি, তোমার দুধ, তোমার দুটি পরিবার, আশিটি অ্যানিমাল, তোমার খাটাল, তোমার প্রিন্স—তুমি অনাদি, অপার আমার কাছে।

এসব কথায় গেল না গোকুল দত্ত। শুধু বললো, এখানে বড্ড মশা। চল ঘরের ভেতর ফায়ার প্লেসের কাছে গিয়ে বসি। ঠিক এই সময়টায়—লাস্ট ইয়ারে সবাই যেমন বসেছিলাম।

তখন তো দিলীপদা ছিল। মীরা ছিল। ঋষি। অনাথ চককোত্তি। সাধন গুপ্ত। দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেল গোকুলদা। সেদিনটা কিন্তু বড় সুন্দর ছিল।

দিলীপের কেমন বুকের পাটা ছিল—পরিষ্কার বলেছিল—আমি প্রাইভেটলি শেয়ার কেনাবো। ক্যাপিটাল জোগাবো। কতখানি কনফিডেন্স থাকলে একথা বলা যায় অনন্ত?

তা কথাও রেখেছে দিলীপদা।

আজ জানুয়ারির পাঁচ তারিখ। সুন্দর রোদ্দুর। সেই সঙ্গে শীত। দিলীপ বসু চান করে উঠে সুপ খেলো। ব্যালকনিতে পেতে রাখা ইজিচেয়ারে বসে বসে। রানী এসে বললো, শক্ত খাবার খাওয়া ছেড়েই দিলে।

ইচ্ছে করে না। কিছু ভালো লাগে না খেতে।

রোজ রাতে অতখানি করে মদ গিললে খেতে রুচি থাকে কারও?

খুব তো খাইনে। আমার চেয়ে ঋষি তো অনেক বেশি খায়। অজ্ঞান হয়ে যায়।

ঋষি অফিস করে। সময়মত লাবণ্যকে নিয়ে থিয়েটারও দেখে। তোমার ছেলেটা একটা গেছে। মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে—সেদিকেও একবার দেখবে না।

ঘুরতে দাও। নিজের ফিউচার নিজের হাতে। ফাইনালে অ্যাপিয়ার হোল না।

ন'তলার ব্যালকনি থেকে চেতলা বেকারির চিমনি ঘিরে দাঁড়ানো একতলা দোতলা বাড়িগুলো দেখিয়ে রানী বললে, ওখানে থাকে মেয়েটা। আমি দেখিনি। কুটু বলছিল, রোজ সকালে দৌড় প্র্যাকটিস করতে বেরোয়।

অ্যাথেলেট। ভালোই তো। বাঙালীর মেয়ে ভোররাতে দৌড়োয়—এ তো গৌরবের কথা। রাখো তোমার বাজে কথা।

এখন যাচ্ছো কোথায়?

বরেন দত্তর ওখানে একটা গাড়ি এসেছে। থার্টি থ্রির ফিয়াট বালিলা। স্পোর্টস কার। জাস্টিস চন্দ্রমাধব রোডের মল্লিক বাড়ির গাড়ি। এককালের সিনেমার হিরো দুর্গাদাসের বন্ধু ছিলেন ভদ্রলোক। তারই নাতি গাড়িটা বেচে দিচ্ছে।

এখন সেটা দেখতে যাবে?

হ্যাঁ। সকালবেলাতেই তো শুভকাজ করতে হয়।

অফিস যাবে না?

ডালহৌসিটা হয়ে তবে যাবো।

সেই তোমার ক্যাপিটাল জোগাড়! কমিশন!! এসব কবে শেষ হবে বলতে পারো? আমাদের তো এত টাকার দরকার নেই। লোভ ভয়ংকর খারাপ জিনিস।

টাকায় আমার লোভ নেই রানী।

কিসে তবে লোভ তোমার?

যদি বলি বন্ধুত্বে।

বাজে কথা। তুমি সবাইকে ভালো-বাসো। আর কেউ তোমায় চায় না। এটা কখনো হতে পারে? নিশ্চয় তোমার কোন দোষ আছে।

হয়তো আছে। কিন্তু কি দোষ?—কোথায় সে দোষ? তা আমি আজও জানি না।

ওই যে তোমার বেশি [illegible] করে আগ বাড়িয়ে এগিয়ে যাওয়া—আ[illegible] সব করবো—এইটেই তোমার দোষ।

হতে পারে।

লোভও তোমার আছে! টাকায়!! গাড়িতে!!! বলতে পারো—একসঙ্গে একটা লোক ক'টা গাড়িতে চড়তে পারে? রোজ তুমি গাড়ি দেখে বেড়াও কেন? রোজ তুমি কমিশনের পেছনে ছুটে বেড়াও কেন? রোজ তুমি অফিসে যাও না কেন? গেলেও দেরি করে যাও কেন?

থেমেছো? তবে শোন এবারে? কমিশন আমার একটা অজুহাত মাত্র।

তাহলে? কিসের অজুহাত?

আমি একটা লোক—যে কিনা আজ অ্যাতো বছর এক চেয়ারে বসে কোল ইন্ডিয়ার কমপেনসেশন, অ্যাস কনটেন্ট, ওয়াগন মুভমেন্ট হ্যান্ডেল করে এসেছি—যার কোন জব স্যাটিসফ্যাকশন নেই, রেকগনিশন নেই—সেই লোক আস্ত একটা বসলাখানি চালু করে দিল—ক্যাপিটাল জোগালো—ডালহৌসি জুড়ে যায় মুখের কথায় তা বড় তা বড় হাউস শেয়ার নিল—এটা কি সে লোকটার কনফিডেন্স ফিরিয়ে দেয় না? আজকাল তো আমার মনে হয়—আমিই সেই লোক—যে কি-না নতুন একটা

খুলেতে পারে। আমিই সেই লোক—
না নতুন একটা কোম্পানী খুলে
ভাসাতে পারে জলে। যারা এসব
তাদের আমি দেখেছি—তারা আমারই
লাক। একথা মনে পড়লে আমার আর
থেতে ইচ্ছে করে না।

শোন। তুমি নিজেকে বেশি বড় করে
—আসলে তুমি কিন্তু তা নও।

সকালের রোদে চোখ তুলে তাকালো
প। রানীর মুখোমুখি। ন'তলার এ
নিতে জীবন ছিমছাম। রোদে ধুলো
না এখানে। বাতাসে পৃথিবীর কোন
নই। রানী দেখলো, দিলীপের বাঁ
বাইরের দিককার কোণে দুটো খুব
শিরা বাধা পেয়ে লাল হয়েছে—তাতে
কে নীল মেশানো ফ্যানের রং। রানী
বললো, তুমি আসলে একজন ছা'
মানুষ। তোমার সংসারের দিকে
এবার। রবিকে পরীক্ষায় অ্যাপিয়ার
হলো। চলো না—আমরা হোল
ল কোথাও গিয়ে বেড়িয়ে আসি।
টিক্কা। ঘাশিড়—

আমার সময় নেই রানী। অন্য একটা
থাকি। সেটা হয়ে গেলেই ফিট হবে
আর নয়। তখন শুধু রেস্ট। তখন
তুমি, রবি, কটু—আমরা সবাই
তিন মাস ধরে বেড়াবো। লক্ষ্মীটি।
এখন বেরোবো।

রানী সরে দাঁড়ালো। চোখে জল এসে
সে একটুও সাবধান হোল না।
টীজ দিলীপের মুখে তাকিয়ে বললো,
আর কোনদিন আসবে না।

ন্যাশনাল লাইব্রেরির পাশ দিয়ে
সময় দিলীপ বসু নাইন্টিন
রো ফিয়াট বালিলার ছবিটা ভাবছিল
ন। দুজনের বসবার জায়গা।
বাদ দিয়ে একজনের বসবার সিট।
টী গাড়ি রংসাইড দিয়ে এসে পড়ায়
নকে বললো। ঝুঁকে টাল সামলাতে
একটা জিনিস দেখতে পেল দিলীপ।
চিড়িয়াখানার দেওয়াল ঘেঁষে একটা
বাচ্চা দাঁড়ানো। হরিণশিশু, বড়
দাবা মুখে সকালবেলার রোদ।
য় হরিণদের জন্যে নকল পাহাড়
আছে। তার মাথায় উঠে বাচ্চাটা
মোটরগাড়ি, টায়ারের রঙীন হোর্ডিং,
ল লাইব্রেরির গেট—সবই দেখছে।
বোধহয় ভাবছিল—একটা লাফ
তো মুক্তি। দেওয়ালের বাইরের
কী আশ্চর্য।

জিরাটপুল পেরোতেই দিলীপের মনে
ফিয়াট বেলিলা গাড়িটা চালানোর
ক পাশে বসিয়ে নেবে। ডান হাতে
দেবে দমকলের সেই ঘন্টা।
র দাম নিশ্চয় তিন চার হাজারের
বে না। তেল বোধহয় বেশি খায় না।
একদিন রানী জানতে চেয়েছিল—
টা গাড়ি দিয়ে কি হবে তোমার ?
ছিয়ে জবাব দিতে পারেনি দিলীপ।
চেয়েছিল—খেলো কম দামি একটা

গাড়ি। অথচ রাস্তা দিয়ে গড়ায় ভালো।
হোক না পুরনো। তেল খায় কম। তখন
কেমন একটা ঘুরে ফিরে বেড়ানোর
স্বাধীনতা। সেটা কম নয় কি ?

রানী বুঝতে পারেনি। বুঝতে চায়নি
আসলে।

যেমন রানী বুঝতে চায়নি—ঋষিকে
আমার কেন ভালো লাগে। অথচ ঋষি আস্তে
আস্তে কোল ইণ্ডিয়ায় নিজের লোক হয়ে
উঠছে। সে-কি আমি যতখানি খাদান নিয়ে
জড়িয়েছি—ঠিক ততটাই কোল ইণ্ডিয়া ওকে
টেনে ধরেছে ? এই কারণে ? এ জন্যেই ?
আজও এব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার
নয়।

রানী হরিণশিশুর স্বাধীনতা কী
জিনিস তা জানে না। দমকলের ঘন্টা ধ্বনির
কী স্বাধীনতা—তা জানে না, রানী। এই
দুই স্বাধীনতা যেদিন আমার হাওয়াগাড়ির
সঙ্গে যোগ হবে—যে-হাওয়াগাড়ির দাম কম,
ফুয়েল কস্ট কম—অথচ গড়ায় ভালো—
সেদিনই তো আসল মুক্তি। পৃথিবীর ওপর
দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ঘোরাফেরার ইচ্ছেমত
ফ্রিডম। সেই স্বাধীনতায় কোল ইণ্ডিয়া
কখনো হাত দিতে পারবে না। আমি একটা
জিনিস বুঝি না। ঋষি কেন খাদান বাড়াতে
চায় না ? যে ব্যবসায় ক্রোধ নেই তার
মৃত্যু অবধারিত ও আমাদের খাদানের
মৃত্যু ঘটছে কি ? আমি বুঝতে পারি না।

তাহলে কি ঋষি চায়—এই খাদান
খেলা চলুক। আর বাড়িয়ে লাভ নেই। যা
আসছে—যা পাওয়া যাচ্ছে—তাই-ই
যথেষ্ট। আর কোল ইণ্ডিয়ার পাণ্ডবেশ্বর
এরিয়ায় ভৌমিক ট্রাস্টের কোল প্রোডাকশন
যেন কোল ইণ্ডিয়াকে ছাড়িয়ে না যায়।

এসব ভাবছিল, আর দিলীপ বসুর মনে
হচ্ছিল—আমি আর ঋষি আলাদা হয়ে
গেলাম। এই সামান্য এক বছরের ভেতর।
কি দরকার ছিল এখন খাদানে ?

তার চেয়েও কি এ-খাদানকে নিজের
করে নিতে পারবে না? এ-খাদান বড়
করায়—আরও বড় করে তোলায় ওর কি
আনন্দ হোত না? এই সকালবেলার রোদেও
আমার কাছে অন্ধকার। আমি কোন পথ
পাচ্ছি না।

অথচ ডালহৌসি আমার কাছে খোলা
খাতা। এখানে ইনভেস্টমেন্ট। এখানেই
শেয়ার। খাটলে—স্কাই ইজ দি লিমিট।
রাণীগঞ্জ, আসাম, মধ্যপ্রদেশের মত—
পাণ্ডবেশ্বর পাহাড়ের কোলে ভৌমিক খাদান
একদিন হয়তো এম্পায়ার হয়ে উঠতে
পারতো।

তবে কি ঋষি একই সঙ্গে কোল
ইণ্ডিয়ার দৃষ্টিতে—অ্যাডভেঞ্চারের নায়ক—
আবার এসট্যাবলিশমেন্টের— প্রতিষ্ঠানের
নয়নের দুলাল হয়ে থাকতে চায় ? আঁখিতে
রাখো গো নন্দদুলাল ! অ্যাডভেঞ্চারের নকল
হিরো হলেই কি আরেক জায়গায় নয়নের
নন্দন হতে সুবিধে হয় ?

আমি বোধহয় ভুল ভাবছি। তাই যেন
হয়। তাই যেন হয়। ঋষি কখনোই তেমন

হতে পারে না। আমারই ভুল। আমারই
নিচু মনের ভাবনা এসব। আমি ঋষির প্রতি
ইনজাস্টিস করছিলাম।

বরেন দত্তর বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে
নেমেই মনে পড়লো, ফিয়াট বেলিলা।
নাইন্টিন থার্টিথ্রি। টু সিটার স্পোর্টস
কার।

বরেনের ছেলে রুনু বেরিয়ে এলো
হাঁসফাঁস করতে করতে। বয়স আন্দাজে
বেদম মোটা। চলতে ফিরতে হাঁফায়। গাড়ির
মেকানিজম নখদর্পণে। বরেন দত্তর
ওয়ার্কশপ চালায়। দিলীপকে পাশে বসিয়ে
একদিন কলকাতার রাস্তায় নাইনটি কিলো-
মিটারে গাড়ি চালিয়েছিল। স্টিয়ারিং ঘোরায়
জলের মত। একদম ঘড়ির লাটাই ঘোড়ায়
যেন। নিভুল। দিলীপকে দেখে হাসলো।
ভালো আছেন?

তোমার বাবা কোথায় ?

বেরিয়েছেন। বসবেন?

না। ফিয়াট বেলিলা এসেছে একটা
শুনলাম। তাই এসেছিলাম।

বাবা না এলে তো বলতে পারবো না।
বসুন না আপনি। আমি একটু ওয়ার্কশপ
যাবো। রুনু চলে গেল। দিলীপ চলে
আসছিল। এক ছোকরা তাকে থামালো।
ঠিক ছোকরা নয়। ছাব্বিশ সাতাশের মেকা-
নিক মার্কা চেহারা। গাড়ি নেবেন?

দিলীপ থেমে দাঁড়ালো। গায়ে লাল
গেঞ্জি। ভালো করে কামানো গাল। আমার
নাম গোপাল ঘোষ। আমি গাড়ি কেনা বেচা
করি স্যার। আপনি যে-গাড়ি চান আমি
দেখাবো। ইংলিশ কার। আমেরিকান কার।
জেঞ্চ জার্মান, জাপানি—

কিন্তু পুরনো গাড়ি কি আছে?

সবরকম স্যার। আমিই তো বরেন
দত্তকে গাড়ির খবর এনে দি স্যার।

বেশ তো। আমার এই কার্ড রাখো।

আপনাকে ফিটিশ দিতে পারি। পিজো,
ফোর্ড গাড়ি, চার সিলিণ্ডারের। ছবির মত
গাড়ি।

কত দাম?

আপনার জন্য পঁচিশে করে দেব।

তার চেয়ে অনেক কমে অ্যাম্বাসাডর
পাবো। কি দরকার আমার পিজো নিয়ে।

সে বললে একটা কথা। কোথায় অ্যাম-
বাসাডার। আর কোথায় পিজো।

আমায় একটা কম দামের গাড়ি জোগাড়
করে দাও।

কত ভেতর? মানে আপনার বাজেট
কত।

একদিন সকাল সকাল আমার বাড়ি
এসো। তখন কথা হবে। এখন তো অফিস
যাচ্ছি।

পার্ক স্ট্রীটে এইচ এম টি-র বাড়ি
ছাড়িয়ে ডান হাতে পার্কিং লট। সেখানে
দাঁড়ালে উল্টো দিকে পার্ক হোটেল। বেলা
তিনটে। রোড সাইড ইন্ এর-দরজায় মাতা-

সাকি কোঠারি দাঁড়িয়ে। তার একটু পরেই হার-কি-কিউ। মলো বন্ধ। মাতাসাকি নীল আকাশ ছুঁয়ে পাখিদের মিলিয়ে দেখছিল। জানুয়ারি যাই যাই। চারদিকে রঙীন পোশাকে মানুষের মেলা— সাজানো সব দোকান পশারের আশে পাশে। এই মাত্র মাতাসাকি কোঠারি রোড সাইডের দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে। লাঞ্চআওয়ার শেষ। এখন সব রেস্তোরাঁতেই ভাঙ্গা হাট। হৃষ্টপুষ্ট, সুখী সুখী চেহারার আত্মবিশ্বাসী অথচ টেনশনে ভুগে ভুগে কান মোচড়ানো টান টান সেতারের তার—ছুঁলেই টং করে বেজে উঠবে—এমন সব কোম্পানী এক্‌জিকিউটিভ, অ্যাডাটাইজিং এজেন্সির মিডিয়া ম্যানেজার, সাঁওতালডিহির সাবকন্ট্রাক্টর—রেস্তোরাগুলো খালি করে দিয়ে এইমাত্র যে-যার কাজে চলে গেছে, দু-একজন অবশ্য টুথপিক দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছিল তখনো।

বাইরে একটা অ্যামবাসাডারের রেডিও থেকে বিবিধভারতীর হিন্দী গান। গাড়ির মালিক বন্ধ দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়ানো গুজরাটি কি পার্সি বোঝা যায় না। হিন্দি ছবির অল ইন্ডিয়া হিরোর হেয়ার কাট, টাই, কোট—সব কিছু। দাঁতের মাজনের চিন্তামণি হাসি দিয়ে স্বাতীকে ওয়েলকাম করলো।

স্বাতী আর দিলীপ রাস্তার জেবরা ক্রস দিয়ে এদিকেই হেঁটে আসছিল। স্বাতী চাপা গলায় দিলীপ কে বললো, আমার পার্টি।

বলা মাত্র দিলীপের মাথায় খচ করে লাগলো। পার্টি?

হু। তুমিও তো এতক্ষণ তাই বোঝাচ্ছিলে। দিলীপদা। তোমার পার্টি। ইনভেস্টমেন্ট শেয়ার। সাদান না কি সব বললে। ভুলে গেলে এর ভেতর?

না। ভুলিনি। একথাটা দিলীপ নিজেই নিজের মনের ভেতরে বললো। স্বাতী ততক্ষণে লোকটার সঙ্গে কথা শুরু করেছে। কাঁচ লাগানো গাড়ির ভেতর থেকে মুকেশ গাইছিল। কথাগুলো পরিষ্কার। বাংলা ঘেঁষা। যে কেউ বুঝতে পারবে।

সব কুছ শিখে হামনে

না শিখে হুঁশিয়ারী

...হাম হ্যায় আনাড়ি—

গাড়ির গায়ে হেলে দাঁড়ানো লোকটা পারলে তখনই স্বাতীকে পাশে বসিয়ে স্টার্ট দেয়। শুধু দিলীপের কেটে পড়ার অপেক্ষা।

স্বাতী পরিষ্কার বললো। নেহি। নেহি। আভি নেহি। তো থার্টি সিক্স টিপ্রস্ ক্যম কে জি ডক টু হলদিয়া।

পেপার্স নিয়ে অফিসে চলে আসুন। সেখানেই পাক্কা বাত হয়ে যাবে। তো ঘুরে আসি চলুন। দিলীপকে দেখিয়ে লোকটা বললো, ও কে কোথায় ছেড়ে দেবো বলুন।

নেহি। আভি নেহি। আভি তো ম্যায় ডগদর সাহেব কো পাশ যাউঙ্গি—

কিউ? ক্যেয়া বেমারি?

কোঈ খাস বেমারি নেহি। ইউঁহি—

লোকটা গান শুনতে শুনতে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। হাত নাড়তে নাড়তে।

দেখলে তো। তোমার জন্যে কেমন কাটিয়ে দিলাম লোকটাকে।

আমি ভাগ্যবান।

ওভাবে কথা বোলো না লক্ষ্মীটি। কেমন পর পর শোনাচ্ছে।

এসো গাড়িতে বসি।

তুমি অফিসে যাবে না দিলীপদা?

আজ আর যাবো না।

শেষে বউদি শুনলে আমায় দুষবে। আমার জন্যেই তোমার অফিস যাওয়া হল না।

মোটেই নয়। আমি এরকম প্রায়ই যাই না।

যাওয়া কেন?

যেয়ে কি হবে। তার চেয়ে এই যে ঘুরছি—তাতে কি কম হচ্ছে?

সে তো তোমাদের সেই খাদানের কাজ। এ কথা স্বাতী বলতে না বলতে গাড়ি ময়দানের দিকে। শীতের পড়ন্ত-বেলায় মেঘলা হয়ে গেল সারা আকাশ।

দিলীপ বসু একদম অন্য জায়গা থেকে শুরু করলো। আমি আজ ভাগ্যবান। এই লোকটাকে চলে যেতে হোল। আবার আরেকদিন আমি অভাগা হয়ে যাবো। সেদিন তুমি অন্য কারও সঙ্গে গিয়ে গাড়িতে বসে জানলা থেকে আমায় হাত নাড়বে।

তার কি দরকার। এসো না আমরা একসঙ্গে থাকি। এখন আর আমাকে পাওয়ার ইচ্ছে নেই তোমার?

দিলীপ কোন কথা বললো না। সরাসরি স্বাতীর শরীরটা ধরে বুকে নিল। তারপর প্রায় বিশ বাইশ বছর লেটে সেদিনকার একটা পুরনো চুমো খেলো। তখনকার ভেবে রাখা। পরে বেমালুম ভুলে যাওয়া। আবার এই কিছুদিনে ফিরে মেখে ওঠা একটা ভারি চুমু।

স্বাতী চোখ বুজে ফেললো। দিলীপের ঠোঁট স্বাতীর ঠোঁটে পড়ে পিছলে গেল। কি মেখেছো? কিছুতেই ঠোঁট রাখতে পারছি না।

স্বাতী চোখ সোজা অবস্থাতেই বললো, ও কিছু নয়। ট্রাই এগেইন। ঠিক পারবে।

পিছলে যাচ্ছে যে—। কি মেখেছো বলো তো? খুব সুন্দর গন্ধ।

স্বাতী ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলীপকে। তারপর সোজা হয়ে বোকা কোথাকার! মেয়েরা কত জিনিস তাছাড়া আমাকে বাইরে বেরোতে হয় আমি তো কিছু মাখবোই।

জিনিসটার নাম কি?

নামটা খুব জরুরী তোমার প্রায় রেগে উঠেছে স্বাতী। ভুলে যেও আমি একজন প্র্যাকটিশিং কোয়ালি বিউটিশিয়ান।

একথায় হো হো করে হেসে দিলীপ। এতক্ষণ চাপা, তেজী নি কথা বলছিল দুজনে। গঙ্গা এসে দিলীপ ড্রাইভারকে এমন একটা আনতে পাঠালো—যা কিনা আকাশ বাড়িটা পেরোলে তবে পাওয়া যাবে।

বৃষ্টির কোন চান্স নেই। কিন্তু বুক জুড়ে—সারাটা এলাকা আকাশের সঙ্গে মেঘলা হয়ে পড়েছে। এখন আই বা ভেলপুরির কোন ভিড় নেই।

সেই হাসির তোড়েই দিলীপ বললো, তুমি একজন প্র্যাকটিসিং, কোয় ফায়েড বিউটি। সুন্দরী রমণী। কমিশনে কাজ করো। আমিও করি। আ দুজনে কোন ফারাক নেই।

আমাকে টাকা জমিয়ে চেম্বার খু হবে। ভালো রাস্তার বাড়ি না নিলে বাড়ির মেয়েরা, বউয়েরা আসবে কেন?

অত খুঁটিনাটিতে না গিয়ে দি হাসতে হাসতে বলল, আমরা দুটি বে শাদা বাংলায়—আমরা দুটি দাল কমিশনের দালাল!!

স্বাতী কি বলতে গিয়ে থমকে একদম চুপ করে দিলীপ বসুর তাকালো।

দিলীপ তখনো [illegible]লা ফাটিয়ে হাসি এক সময় গলা [illegible] গেল তার। সেই হাসির ভেতরেই বললো, আমি শে দালাল! তুমি লরির টিপ্রেস দালাল।

দিলীপের সেই চিরে যাওয়া গলোর ভেতরেই স্বাতী শান্ত গলায় চাইলো, আমার জন্যে তোমার আর ইচ্ছে নেই দিলীপদা?

ইচ্ছে? অনেক ইচ্ছে আছে। অ কত ইচ্ছে তা কি বলবো তোমায়।

থামো। অত হাসির কি হোল?

ধমক দিচ্ছো কেন? আমি সব গেলাম।

তখনই রোড সাইডে খেতে বসে ছিলাম—দুপুরে অতটা জিন খেয়ে পরেপর খেয়ে গেলে। জিনের নেশা সাংঘাতিক। যখন ধরবে—তখন আর না। তোমার নেশা হয়ে গেছে দিলীপদা

না। আমার নেশা হয়নি। তুমিই নেশা স্বাতী। কতদিনকার নেশা!

কি দেখছো অমন করে?

দেখছি আর ভাবছি। এমন বউকে ধরে রাখতে পারলো সুধীরবাবু।

৬,৭৩০ স্কুল ফাইনাল ও ৯,৩৮৬ সেকেণ্ডারী পাশ করতে পেরেছে। চার লক্ষ? তারা যখন শিক্ষাজগৎ পিছলে যাচ্ছে, ষাটের সর্বজ্যেষ্ঠ টি তখনও স্কুলে। বিশৃঙ্খলার এই র মধ্য দিয়ে এরা এসেছেন, স্বভাবতই রে, এদের প্রতিক্রিয়া হবে শৃঙ্খলা করার দিকে। বহিঃস্তর এবং অন্তরের বিশৃঙ্খলাকে চিনে নিয়ে, ই-এর মধ্যেকার সংঘাত থেকে উৎপন্ন দ্বন্দ্বকে ভাষায় সঞ্চার করতে যারা পারে, তারাই হয়ে ওঠে। শৃঙ্খলা এবং বিশৃঙ্খলা, কৃতি এবং পাগলামি, টেকনিক এবং কল্পনা—এই পরস্পর বিরোধী ব্যাপারগুলিকে আলাদা করে দুই মেরুতে রাখতে না পারলে লেখকের পক্ষে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠা কঠিন। ষাটের দশকের লেখকরা বিশৃঙ্খলার স্বরূপকে চেনার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু শৃঙ্খলার জন্য ব্যস্ত নন। বিদ্রূপকে তাদের বাস্তবভূমি উদ্ভাসিত হতে পারেনি।

আধুনিকতাবাদের অন্যতম অর্থ আঙ্গিক নিয়ে নতুন কিছু করা। আর এক অর্থ, আধুনিক জগতের প্রতি বিশেষ ধরনের মনোভঙ্গি। 'নতুন কিছু'-ও অবশেষে কর হতে হতে এক সময় সাবেকি ব্যাপারে দাঁড়িয়ে যায়। সাহিত্যের আধুনিকতাবাদীরা, প্রুস্ত, জয়েস বা হান্স আমলের টমাস পিঞ্চন—যখন নতুন করে তৈরীর কাজে হাত দেন, তখন তাদের আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল, সাহিত্যে বাসি হয়ে যাওয়া প্রথাগুলিকে ভেঙে নতুন চেতনায় বাস্তবতায় বেরিয়ে আসা, আধুনিক জীবনের বিশেষ ধরনের বিশৃঙ্খলাজাত ব্যতিব্যস্ততা উদ্ভ্রান্তির মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার নতুন উপায় অনুসন্ধান।

কিন্তু আধুনিক হবার চেষ্টায় নানা দেশে যেসব আন্দোলন হয়েছে, দেখা গেছে, নতুন করে শৃঙ্খলাবদ্ধ জগৎকে উপলব্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় আধুনিকতাবাদীদের আন্দোলন নিজেই, কারণ ততদিনে সেটা সাহিত্যের চলতি রীতিতে পর্যবসিত হয়ে গেছে। আন্দোলন, একদা যার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল সেই সাবেকী রীতির মত এটাও তত্ত্ব সর্বস্ব, একঘেঁয়ে, ছাঁচে বাঁধা হয়ে যায়; বাগভঙ্গি, পর্যবেক্ষণ, চিন্তা ও অনুভূতি, বোদা-স্থূল হয়ে পাণ্ডুরতা পায়, সক্রিয়তা হারায়। আধুনিকপন্থীদের হামলার প্রধান লক্ষ্য বুর্জোয়া সমাজ ও মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ। সবেগে ঝাঁপিয়ে পড়তে হলে একটু পিছিয়ে সরে আসতে হয়; তাই করতে গিয়ে সমাজ-বাস্তবতা থেকে আন্দোলনকারীদের কখন যেন বিযুক্তি ঘটে যায়। এরপরই এদের অনুভূতিতে যখন পর হয়ে যাওয়া মনোভাবটি পলি জমাতে থাকে তখনই বাস্তবতার সঙ্গে যোগসূত্রহীন এমন এক আপাত সম্পর্ক তারা তৈরী করার চেষ্টা করে যেটা তাকে আরো দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। আরো বেশি আত্মকেন্দ্রিক, নৈর্ব্যক্তিক, অভিমানী করে তোলে।

অতঃপর দশকের পর দশক গড়ায়, তার যে মারমুখো বিদ্রোহী মনোভাব আধুনিক হবার সঙ্গে যুক্ত ছিল, তা ক্রমশ সাহিত্যের বারোয়ারি মণ্ডপে পুজো পেতে শুরু করে, কালক্রমে সম্ভ্রান্তি অর্জন করে, সাহিত্যের সাবেকী রীতিতে রূপান্তরিত হয়ে তার মধ্য দিয়ে এই বুর্জোয়া বিরোধিতার অবিরাম পুনরাবৃত্তি ঘটাতে থাকে। এটাই ছাঁচ ভেঙে আর এক ছাঁচে ঢুকে যাওয়া। বাংলা সাহিত্যেও এসব ঘটে গেছে। ষাটের দশকের লেখকদের কাছে তাদের পারিপার্শ্বিককে অগভীর, ভোঁতা, ক্রূর, আগ্রহনাশক ও সরল অনুভূত হয়েছে। তাই তারা কৌতুক করেছেন, রেগে গেছেন বা বিষণ্ণ হয়েছেন। এর কোনটাই এ দেশীয় সাহিত্যে নতুন নয়, না ভাবে না ভঙ্গিতে। 'প্রগতি সাহিত্য' আন্দোলনে বা 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' গোষ্ঠিতে যারা সামিল হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে এখনো যারা লেখায় আছেন, তারা আজ কি লিখছেন? এখন তাদের লেখা কতটা আধুনিকতার জন্য আর কতটা জনপ্রিয়তা ভিক্ষা! যারা হুমকি দিয়েছিল, গল্পের মধ্যে গল্প খুঁজলে গুলি করে মারা হবে, এই সংকলনে তাদের গল্পের মধ্যে ভাল গল্প পেয়ে আশ্বস্ত বোধ করেছি।

নিঃসঙ্গতা নাকি এদের অনেকের কাছে কৌতুকের বিষয়, একা বোধ করার মন্ত্রণাটাই
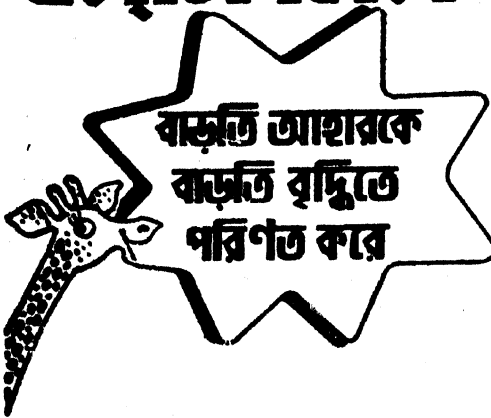
নিঃসঙ্গতা এবং এটা এমনই ব্যাপার যা নিয়ে ঢাক পেটানো যায় না। মানুষমাত্রেই একা। সব থেকে মারাত্মক জিনিস, এই তথ্যটা সে জানে এবং আরো জানে, শেষ দিন পর্যন্ত তাকে একাই থাকতে হবে। নিঃসঙ্গবোধ নতুন কিছু নয়, এটা ষাটের দশকে গজিয়ে ওঠেনি, তবে এত তীব্রতা মানুষ ও সময় ভেদে এক এক রকম হয়। একাকীত্ব থেকে রেহাই পেতে সাধারণ মানুষ চেষ্টা করে সঙ্গ লাভের, চায় কোন কিছুতে ব্যস্ত থাকতে। তথ্য ও প্রমোদ সরবরাহের মাধ্যম এদেশে প্রভূত নয়, তাতে বৈচিত্র্যও নেই। বহির্জীবনের বাস্তবতাকে সংগঠিতভাবে খুন করার পক্ষ টেকনোলজি এখনো ব্যাপক হয় নি। সংকলনে যে-কটি চরিত্রকে নিঃসঙ্গ রূপে চিত্রিত করার চেষ্টা হয়েছে, তাদের চিন্তা ও কাজ থেকে মনে হয়েছে তারা অপ্রাপ্তির কারণে অসুখী, ক্ষুব্ধ (এর সঙ্গে নিঃসঙ্গতার গুণগত পার্থক্য আছে)। যেন তাদের নিঃসঙ্গতা ঘোচান যাবে যদি চাকরিতে কয়েকটা ইনক্রিমেণ্ট পায়, যদি মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের একটি সদস্যকার্ড পায়, যদি প্রেম ও সঙ্গম দেবার মত রমণী পায়। দু-তিনজন আমাদের চেনা অভ্যস্ত পরিবেশের বাইরে গিয়ে একাকীত্বের খোঁজ করেছে বটে কিন্তু এমনই কৃত্রিম ও অপ্রত্যয়ের স্তর থেকে যে, বুনোটের ঔজ্জ্বল্য সত্ত্বেও, খুব দূরের ব্যাপার মনে হয়।

মগজবান মধ্যবিত্ত বাঙালী তরুণের ক্ষোভই ক্রমশ তার মধ্যে একঘেঁয়েমি আনে। নানান বাস্তব কারণে সেটা আসে—সুবিধা-বাদী রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা, পারি-বারিক চাপে বাধ্যতামূলক কৃচ্ছ্রতা, কাঙ্খিত নারীসঙ্গের অলভ্যতা, প্রেমহীন দাম্পত্য জীবন, বেশ্যার কাছে সঙ্গম ক্রয়ের মধ্য দিয়ে যৌবনের গৌরবহীন নতি স্বীকার সব মিলিয়ে তিক্ততায়, উদ্বেগে, সংকোচে, অনিশ্চিতবোধে ভরে থাকা। এই কিছুদ্বারা ভরে থাকাটাই এক ধরনের সঙ্গলাভ, যদিও তা খুবই বাজে সঙ্গ। সামাজিক গঠন বা সরকারের বদল ঘটিয়ে হয়তো কোনদিন এইসব ক্ষোভ দূর করা সম্ভব হতে পারে কিন্তু তখন আবার এক ধরনের একঘেঁয়েমি দেখা দেবে। বাস্তবভেদে আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া চেহারা নেয়, বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে আমাদের একঘেঁয়েমিতে কোন বদল ঘটেনি।

নিঃসঙ্গলতা যে সবসময়েই মঙ্গলক, তা নিয়ে হা-হুতাশ করতেই হবে এমন কোন কথা নেই। যাবতীয় অসঙ্গতি বিচ্যুতি গোলমালের মধ্যে সব থেকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল নিজের মধ্যে সেঁধিয়ে যাওয়া। নিঃসঙ্গতা থেকে গভীরতর নিঃসঙ্গতার অভিমুখী হওয়া। নিজের সঙ্গে নিজের সাক্ষাৎকার, নৈঃশব্দ্য বিনিময় এবং প্রশান্তি। মানুষের অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত যে-কোন সত্যকে উদঘাটিত করতে হলে শেষ-পর্যন্ত এই প্রশান্তি বা শৃঙ্খলার দিকে ঝুঁকতেই হবে। সমস্যাটা নিঃসঙ্গতার নয়, যথেষ্ট ভাবে নিঃসঙ্গ হতে না পারার। জ্যোৎস্না রাতে সবাই বনে গিয়ে হুটোপাটি করলেও কেউ কেউ সেখানে না গিয়ে তখন নিজের ঘরে নিরালায় মগ্ন হয় নিজের মুখোমুখি হবার আয়োজনে, কেউ বা মৌন অবলম্বন করে রাজনৈতিক হট্টগোলের মাঝে। নিঃসঙ্গতা বহু সময়ই প্রার্থিত; উপলব্ধির উপায়গুলির অন্যতম।

আধুনিক সাহিত্য, বাস্তবের অন্তর্লীন প্রবণতাগুলি ধরার জন্য, সামাজিক উন্মত্ততা ও কানাগলির দিকে নজর টেনে ধরতে, যুক্তির থেকেও অনুভূতির, শব্দের থেকেও চিত্রকল্পের উপর বেশি নির্ভর করে। এই অনুভূতির প্রাখর্য গড়ে ওঠায় সর্বাধিক অবদান নিঃসঙ্গতারই। আবার নিঃসঙ্গতা ঘোচাতেই মানুষ তার চারপাশের বিরোধী শক্তিগুলির সঙ্গে সংঘর্ষে নামার জন্য বেরিয়ে আসে তার কোটর থেকে। এজন্য সে সক্রিয় হবেই। অনুসন্ধানে ব্যস্ত হবে নানা ভাবে ও ভঙ্গিতে, অধিকার প্রয়োগ করবে তার বাস্তবতার উপর, দায়িত্ব নেবে জীবনের খণ্ড খণ্ড অংশগুলিকে জুড়ে সম্পূর্ণ করার, যা সাহিত্যের বাইরে ক্রমান্বয়ে চলছে এবং যা সাহিত্যের বাস্তবতা তৈরী করে দিচ্ছে। বিভিন্ন সময়ের লেখকদের স্টাইল ও ফর্ম সাহিত্যের মধ্যে থেকে তৈরী হয়ে ওঠে না, সেটা নেহাতই তার সময়ের দ্বারা হয়ে ওঠা, ষাটের দশকের লেখকেরা জোর করে এমন একটা 'সময়' তৈরী করে নিতে চাইছেন যা তাদের ভাবনার সঙ্গে খাপখেয়ে যাবে, যা তাদের পূর্ববর্তী আধুনিকতাবাদীরা পঞ্চাশের দশকের শেষে করেছিল। এখন তাদের অনেকেই পরিণত হয়ে নিজেদের বাস্তবতাকে চিনতে পেরেছে। ষাটের দশক তাড়াতাড়ি এটা চিনুক।

'বিষয় ব্যক্তিগত হলে তার প্রকাশের জন্যও ব্যক্তিগত রচনা পদ্ধতির প্রয়োজন।' এটা খুবই পুরনো কথা। বিষয় চিরকালই ব্যক্তিগত, রচনা পদ্ধতি তো বটেই। আমরা মোটামুটি সকলেই ট্রাউজার্স-বুশশার্ট পরি কিন্তু আমরা কেউই এক লোক নই বা একই মানসিকতা বহন করি না, প্রত্যেকের আচরণে প্রকাশ ব্যক্তিগত ভঙ্গিতেই হয়। কিন্তু এটা ভাবার কোন কারণ নেই যে, বাস্তব সম্পর্কে ব্যক্তিবিশেষের আভ্যন্তরীণ ধারণাই একমাত্র ব্যাপার যা অর্থবহ, কিংবা শুধু আত্মমগ্ন অবস্থাটাই জীবনের বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। বহির্বাস্তবতা বলেও একটা ব্যাপার আছে যা মগজের মধ্যে দিয়ে ছাঁকা হয়ে চেতনায় আসে। এবং হুবহু একই রকমের দুটি মগজ কখনো হয় না। একই রকমের দুটি চেতনাও হয় না। বুদ্ধিমান লেখক বাইরের এবং ভিতরের বাস্তবের মধ্যে সাযুজ্য ঘটাবারই চেষ্টা করেন।

আত্মমগ্ন হয়ে রচিত ব্যক্তিগত পদ্ধতিকেও তো কম্যুনিকেট করতে হবে পাঠকের সঙ্গে (মনে রাখবেন স্কুলের চার লক্ষের কথা)। নিজের অভ্যন্তরীণ অবস্থাটা লেখক জানাতে চাইছে কিন্তু পাঠক অনেক-খানি এগিয়ে এসেও সেটায় দাঁড়াবার মত জমি যদি না পায় তাহলে খুঁজতে হবে কোথায় দুজনের সাক্ষাৎ সম্ভব। এটা সম্ভব বহি-র্বাস্তবে দাঁড়িয়ে, যেখানে যাবতীয় বস্তু উভয়ের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতায় স্তরে রয়েছে। ষাটের দশকের লেখকেরা যে একথাটা বোঝেন সেটা তাদের অনেকের গল্পেই ফুটে উঠেছে। ন্যারেটিভ ফর্মে উপন্যাসের দিন শেষ হয়েছে, ৫০ বছর আগে এলিয়টের রচনা এই কথাটা এখন আবিষ্কার ক'রে, এদেশের ঢাকীরা বাজাতে শুরু করেছে। এলিয়টের কথাটা ছিল, বিশেষ এক আমলের উদ্দেশ্য পূরণে ও প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে বিকশিত হওয়া ন্যারে-টিভ শিল্পের বিশেষ এক ফর্ম আর পরে কাজে লাগে না। বাংলা সাহিত্যে গল্প-উপন্যাস ন্যারেটিভ অঙ্গিকেই গড়ে উঠেছে, এখনও তাই আছে এবং থাকবেও যেহেতু পাঠকদের বোধ ও বুদ্ধির সঙ্গে কম্যুনিকেট করার জন্য এটাই সর্বাধিক কার্যকরী উপায়। আমাদের আমলে (সেই করতে পারা শতকরা ৩৩ জন)প্রয়োজনেই ন্যারেশন দরকার। মানিক তা জানতেন, সতীনাথও। আসল কথা, কি নতুন চিন্তা, কি নতুন চেতনার বাস্তব ভূমি সাহিত্যে সংযোজিত হল, সেটাই মুখ্য ব্যাপার।

ষাটের দশকের লেখকরা আলোড়ন তোলার মত কিছু করেনি। কিন্তু অনিবার্য-ভাবে যা করেছে তার দরকার আছে। 'পূর্ব-সূরীদের' প্রতি ওদের বিরাগ ও অবজ্ঞা অযথা নয়। বাংলা সাহিত্য আর একবার লোভীদের কুক্ষিগত হয়ে অন্ধের ও কুদর্শনরূপ নিয়েছে এবং একদল তরুণ তা জেনে গেছে। এই খবরটা ওরা আরো জোর-ভাবে জানিয়ে দিতে পারবে যদি এখনকার বাংলা সাহিত্যকে লিট্‌ল ম্যাগাজিন দিয়ে ঘেরাও করে ফেলতে পারে। আমাদের সাহিত্যের আবার পাণ্ডুর রঙ ধরেছে সুতরাং রক্তের দরকার। এখন বন্যাও ব্যাংক লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলি।

সুবোধদা ওখানে ঢোকার সময় অবশ্য াদেশ দেন যে আমি যেন অবসরমত মিঃ ল্লকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষে করে চলি .তারপর উনি তো আছেনই। তাই ১৯৩২ লটি থেকেই আমি আমার নিশ্চুপ চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকি... যখন সবাক ত্রের গতি অতি দ্রুত তালে এগিয়ে লছে। মিঃ প্রমথেশ বড়ুয়ার নতুন টী ফিল্মের 'বেঙ্গল ১৯৫৬' নানমশাইদের । প্রতিষ্ঠিত রূপবাণী—প্রেক্ষাগৃহের শ্বার কত করলো। নিউ থিয়েটার্সের দেবকী-বু পরিচালিত ও রাইবাবুর সঙ্গীত পরি-লনায় বাংলা চণ্ডীদাস রিলিজ হয়ে তীমার্কা ছবির কৃষ্টি ও কলার সৌরভ ংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে থাকলো। এই ছবি প্রসঙ্গে এইটুকু জানানো উচিত ন হয় বলে লিখছি—নিউ থিয়েটার্সের াড়শী ছবিতে গাজনের দৃশ্যে যে উমাশশী ড় পাঁচে পড়েছে এবার ভোলা দিগম্বর—নে গাজনের সন্ন্যাসিনী সেজে নেচে-লেন— গেয়েছিলেন— তিনি চন্ডীদাস বিতে উজ্জ্বল তারকার আসনে অধিরূঢ়া লেন। অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর গান ও ভিনয় চাতুর্যে চিত্রজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত ন এই ছবিতেই।

এই বছরেই হিন্দী ফিল্মী জগতে তীমার্কা ছবি সবার মধ্যে নিজেদের াসন পেতে নিলেন—দেবকী বসু ও রাই-াবুর পরিচালিত—পুরাণ ভকত ছবিতে। পিছিয়ে রইলাম শুধু আমি....

অনেক ভেবে চিন্তে একদিন রাত্রে ল্লিকদাকে চিত্রায় আড্ডায় বসে বললাম-- ল্লিকদা আমি একটা চিত্রনাট্য লিখেছি ীরাবাঈ-এর জীবনীর ওপর। মিঃ হাফেজির ম্মানে নিউ থিয়েটার্স আমার না হয় নাই নলেন—কিন্তু আমার লেখা গল্পতো নতে পারেন যদি অবশ্য মিঃ সরকারের পছন্দ না হয়। তুমি এভাবে একটা চেষ্টা রতে পারো?

উত্তরে উনি বল্লেন—কথাটায় যুক্তি াছে....দেখি কি হয়।

কলোম্বিয়ায় ১৯৩২ সালের রেকর্ড জারে বার হলো। আমার স্বরচিত ও রারোপিত বহু গানই শ্রোতা সমাজে সমাদৃত হলো। রাণীর নাম রেকর্ডে—রাণুদেবী দেওয়া হয়েছিল। তার গাওয়া আঁখিতে রহগো নন্দদুলাল ও তোমার পূজার প্রদীপ করো মোরে (সর্বপ্রথম গীটার সম্বলিত রেকর্ড—যা শ্রীতারক দে বাজিয়েছিলেন)....সে বছরের শেষে প্রথম-স্থান অধিকার করল। স্নেহলতার গাওয়া মলয়া শোনরে তোরে বলি ও আবার ফাগুণ এসেছে ফিরে—গান দুখানি হিট করলো। ফুল্ল নলিনীর গাওয়া আমার প্রথম লেখা বাংলা গজল গান—কে আমারই বাতায়নে এলে আজ নবীন অতিথি—ও ঐ উতল হওয়া যে আজিকে সমাদৃত হলো। কাননদেবীর গাওয়া—রিনিকি ঝিনিক ঝিনী গানও বাজারে সমাদর পেলো এমনি কি আমার গাওয়া—'জাগোহে বিশ্বনাথ ও আবার বেজেছে ভেরী—আমার পূর্বের নাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এ্যামেচার ভদ্র পরিবারের মধ্যে শ্রীমতী উত্তরা দেবীর কীর্তন অত্যন্ত জনপ্রিয় হলো—এর জন্য অভিনন্দিত করা উচিত শ্রীনলিনীকান্ত সরকারকে....কারণ উত্তরা দেবীকে উনিই এনেছিলেন।

রেকর্ডে সর্বপ্রথম গীটার সংযোগে গান শুনে সব রেকর্ড কোম্পানীর এমন কি এইচ এম ভির-ও দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।....

এমনি দাপটে কলোম্বিয়ায় ১৯৩৩এর প্রথমের রেকর্ডিং শেষ হলে সেবারের যত গান হলো—সে সঙ্গীত সপ্তাহের প্রথম স্থান আমিই অধিকার করলাম। বিশেষ করে আমারই গাওয়া 'আমি এ শারদ প্রভাতে' ও শরৎ এলে শ্যামল বনে সবুজ আঁকাশ দেখে গান দুখানি সর্বজনপ্রিয় হলো—রাণু দেবীর সঙ্গে আমার কজন ডুয়েট—এস শংখচক্রগদাপদ্মধারী ও হে কৃষ্ণ মুরারী—গোপী মন চারী, এইচ এম ভির হরিমতী হীরেন বসুর মতই জোড়া মিলে গেল। রাণীর নিজের গাওয়া গান—তার আশু ঘোর কাটলো সারা বেলা'—ফুল্লনলিনীর আমি গিরিধারী আগে নাচিব ও গিরিধারী তোমার বেণুর কোলে প্রভৃতি গানগুলির বিক্রয় তালিকায় লাভাংশে প্রচুর পরিমাণ অংক পরিলক্ষিত হলো।

সবই চলেছে ঠিক....কিন্তু অন্তরের কোথা থেকে যেন হাহাকার শুনতে পাই। ....কেন জানি খুবই ক্ষুণ্ণ মনে সে দিন রাত্রে—চিত্রার আড্ডায় উপস্থিত হলাম। দেখলাম মল্লিকদা হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠ্‌লেন....আমায় দেখে বলেন ——'ঘরে গিয়ে বোস—আমি আসছি এখুনি।'

মল্লিকার ঘরে গিয়ে বসলাম....প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকাদা এসে ঢুকে বলেন দাঁড়া —আগে একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক্‌.... উঃ কী খাটনীটাই না আজ সারাদিন গ্যাছে।। তাছাড়া....এইতো সবে 'সাহেব কে ছেড়ে দিয়ে ওপরে উঠ্‌ছি এমন সময় তুই এলি।

আমি বলি মিঃ সরকার আজ এতক্ষণ এখানে ছিলেন....ব্যাপার কি?

মল্লিকা দা বলেন—উনি কি আর ছিলেন—আমিই বরং নানা কথায় ধরে রেখেছিলাম।

ইতিমধ্যে চা এসে গ্যাছে....চায়ে চুমুক দিয়ে মল্লিক দা বলে ওঠেন—কাল তুই তোর বই নিয়ে ষ্টুডিওতে চলে আয়—সাহেবকে শুনতে রাজী করিয়েছি....অবশ্য আজই দুপুরে সুবোধও নাকি সাহেবকে তোর সম্বন্ধে কিছু বলেছিল....সেই রকমই তো সাহেবের মুখে শুনলাম....এনি ওয়ে কাল বেলা ৩টা নাগাদ চলে আস্‌বি—আজই আমি তোকে একটা 'এডমিট স্লিপ' লিখে দিচ্ছি—তুই সেটা গেটে দেখিয়ে ঢুকে গিয়ে, আমি ঘরে থাকি না থাকি, ওখানে বসে থাকবি—বুঝলি?

আমি চুপ করে থাকি। মল্লিক দা বলে যান—তোর গান সাহেবের খুবই ভাল লাগে....বিশেষ করে তোর সাইলেণ্ট ছবিতে আবাহ-সঙ্গীত শুনে খুশী হয়ে আমায় জিজ্ঞেস করেছিল এ সবই কি তাঁর রচনা.... আমি বলেছিলাম—নিশ্চয়ই। তাই বল্‌..ছিলেন ভদ্রলোক সত্যিই গুণী—তবে একটু রগচেটা। শুনে আমি কিন্তু আজ বলেই ফেললাম—হাফেজিও সেদিন খুব অন্যায় করেছে....চারখানা পাশ ইস্যু করতে পারলে না কেন—যখন এঁরা বলে গেছেন।

রাত এগারটা বেজে গেছে লাস্ট ট্রামটাও বুঝি চলে যায়। দুজনে উঠে পড়-

লাম। মল্লিক দা যাবে কলুটোলার মোড়ে আমি নামবো ঠনঠনে কালীবাড়ীর স্টপেজে। নামবার সময় মল্লিক দা স্মরণ করিয়ে দিলেন—নিশ্চাই কাল যাবি নইলে আবার সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

বাড়ীতে এসে খেয়েদেয়ে রাত দুটো পর্যন্ত মীরাবাঈ-এর স্ক্রীপ্ট পড়তে থাকি ..কোথাও যদি কিছু খাঁকতি থাকে তাই দেখে নি। তারপর শুয়ে পড়েও সে চিন্তার শেষ নেই...কখন অবসন্ন দেহে ঘুমিয়ে পড়ি।

পরের দিন সকালে আর কলোম্বিয়ার রিহার্সাল ঘরে গেলাম না। নৃপেন দাকে একটা ফোন করে জানিয়ে দিলাম।

বেলা দুটোর মধ্যেই বাড়ী থেকে টালিগঞ্জে প্রাই পৌণে তিনটে নাগাদ পৌঁছিলাম। দরজায় পাঠান দরোয়ান আমায় সেলাম জানিয়ে স্টুডিওর ভেতরে অন্তর্ভুক্ত করে নিলো।

স্টুডিও ফেন্নারের পূর্ব গায়ে লম্বা দোতলা বাড়ী। ওপর তলায় নিউ থিয়েটারের হাত লেবোরেটারি—যার সুবোধদাই এখন কর্ণধার। আর নীচের তলার ঘরগুলিতে (উত্তর হতে দক্ষিণে) পর পর সাজঘর, রংঘর, ইলেকটিক ডিপার্টমেণ্ট— তারপর মল্লিক মশাই-এর প্রোডাকশন অফিস এবং সর্বশেষে অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব কোণায় রিহার্সাল ঘর।

মল্লিকদা আমায় দেখেই বল্লেন—এসে গেছিস—পাশের ঘরে গিয়ে বোস আমি আসছি। পাশের ঘরটি অপেক্ষাকৃত বড়—মেঝেতে সতরঞ্চী চাদর বিছানো বুঝলাম এইটাই রিহাসাল ঘর। এই ঘরেই বসবে আমার পরীক্ষার আসর। দেখলাম একটি তাকিয়া মাথায় দিয়ে—বুড়োদা অর্থাৎ প্রেমাংকুর আতর্থী মশাই—বিশ্রাম নিচ্ছেন। উনি মৃদু হেসে বলেন—আরে এসো—কি খবর?

বুড়োদা আমার বড় চেনা লোক তবু আজ স্টুডিওর আবহাওয়ায় তাঁকেও আমার মনে হচ্ছে যেন সুদূর পরাহত এক দুর্লভ ব্যক্তির দর্শন পেলাম। অত্যন্ত সংকোচে বললাম—এমনি।

বুড়োদা বরং সানন্দে জানালেন—অময়া বলছিল যে তুমি নাকি ভাল একটা বই লিখেছো।

আমি কুণ্ঠার সঙ্গে বলি—হ্যাঁ সেইটা শোনাতেই তো আজ এঁরা আমায় ডেকেছেন।

বুড়োদা আমায় উৎসাহিত করতে ওঁর নিজের ধরনের কথাই বললেন— আরে! তা এতো জড়ভরত হচ্ছো কেন। ..এ তো আর মেয়ে দেখা নয়...মানে, তোমার ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে যেন তুমি নিজেই বিয়ের কনে! জড়তায় আড়ষ্ট হয়ে উঠেছো—আরে অত লজ্জা কর্লে কি আর ফিল্মলাইনে বই শোনানো হয়? ...এখানে চটপট চোখে মুখে কথা বলবে—যা নয় তা বা যা নও তা ফলাও করে রং চড়িয়ে অনর্গল বলে যাবে তবেই তো মন পাবে গো।

আমি হাসতে থাকি....

এমন সময় ঘরে ঢোকেন একটি ভদ্রলোক—যাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার অদম্য ইচ্ছা ছিল। তাঁর সঙ্গে বুড়োদা পরিচয় করিয়ে বলেন—'এ আমাদের হীরেন বসু আর ইনিই হচ্ছেন বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান শ্রীনীতিন বসু। আগেই বলেছি—ও'র দাদা দাদা হিতেনদার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল—ছিল না নীতিন বসুর সঙ্গে। পরিচিত হয়ে বললাম—আমি কিন্তু বরাবরই আপনার গুণগ্রাহী ভক্ত।

সত্যই আজকের অভিজ্ঞতাতেও আমি অকপটে বলবো যে নীতিনবাবু তার অদম্য চেষ্টায় ফিল্ম-চিত্র-গ্রহণে প্রথম স্তবের কর্মী। আজ বহু সুযোগ-সুবিধার আধুনিক টেকনিসিয়ানদের হাতে কাছে এসে গেছে—কিন্তু নীতিন বসু নিজে হাতে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে সেখানে জল বার করেছিলেন—বললে অত্যুক্তি হয় না।

এরপর ঘরে ঢুকলেন স্বয়ং সরকার সাহেব—সঙ্গে মল্লিকদা।

মল্লিকদা বললেন ..দেরি করো না হীরেন শুরু করে দাও!

পরীক্ষক চারজনের মুখের দিকে চেয়ে গল্প শোনাতে শুরু করি....গলার স্বরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে....ভয়ে নয়....উদ্বেগে। নীতিন দা দুই ভুরুর মাঝখানের কপালটুকু আঙুলের টিপনীতে চেপে ধরে মাথা নীচু করে শুনে যাচ্ছেন। বুড়োদা আর মল্লিক দা—'হ্যাঁ-না-বা-বেশ' বলে আমায় উৎসাহিত করছেন আর মিঃ সরকার ওরফে সাহেব....নির্বিকার মুখে চেয়ে আছেন। ভাল মন্দ....সুখদুঃখের অভিব্যক্তি তাঁর প্রশান্ত মুখে এতটুকু দাগ কাটছে না। পরে বহু বহু সংঘাতের মাঝেও দেখেছি এই শান্ত মানুষটির—ঠিক এই অনুরূপ অভিব্যক্তি। নিউ থিয়েটার্স যখন পুড়ে যায় তার মুখে এমনি প্রশান্তি ছিল—সে কথা আমি পরে বলবো।

আমার নিজের পড়ায় আমি নিজেই উত্তেজিত হচ্ছি আবার সম্বিতে ফিরে নিজেকে সংযত করছি। গল্প শেষ হলো। বুড়োদা বিনা বাক্যব্যয়ে—ঘর ত্যাগ করলেন।

মিঃ সরকার উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানিয়ে চলে গেলেন মল্লিক দাও তাঁকে অনুগমন করলেন শুধু ফরাসে বসে রইলেন নীতিন দা—তিনি মুক্তকণ্ঠে সবার সামনেই ব্যক্ত করেছিলেন—বাঃ সুন্দর লেখা!

নীতিনদাকে নমস্কার জানিয়ে বাইরে এসে মল্লিকদাকে তার ঘরে পেলাম না। একটু ইতস্তত করে বাইরে যাবো বলে পা বাড়ালাম—ভাবলাম অপেক্ষায় বসে থাকলে মান যাবে। বরং রাত্রে নিরালায় মল্লিকদার কাছেই জেনে নেবো।

গেটের দিকে তাই আমার গতি.... পেছন থেকে একটি 'বয়' ছুটে এলো—বাবুজি—আপকো সাহাব বোলাতে হ্যায়! পিছু ফিরে দেখলাম অদূরে গোলঘর.... গোলপাতার ছাউনীর নীচে সিমেণ্ট করা বেদীমণ্ডপ....তার মাঝে একটি গোল টেবিল—টেবিলের চারপাশে চারখানি চেয়ার ও হাতলযুক্ত বেঞ্চি পাতা....সেইখানে সবাই আমার অপেক্ষায় বসে রয়েছেন। আমি গিয়ে দাঁড়াতেই সবাই উঠে গেলেন রইলেন মিঃ সরকার। মল্লিকদা আর আমি। সাহেব অল্পভাষী—আমার দিকে চেয়ে বলেন—আপনার গল্পটি আমার ভাল লেগেছে... এর জন্য আপনার চাহিদা কি জানতে পারি কি?

মুহূর্তে আমার জয়ের নেশায় আমি অভিভূত হয়ে পড়ি একটু সময় নিয়ে নিজেকে স্থির করে বলি....গল্পের দামের কথা বলছেন আর....

শান্ত স্বরে মিঃ সরকার বলেন—আর ডিরেকশন? হয়তো তাও দিতে পারবেন কিন্তু আপনি সবে মাত্র একখানি নির্বাক ছবির পরিচালনা করেছেন অথচ যা শোনালেন তা এক বিরাট ক্যানভাসের গল্প—তার ওপর আমি হয়ত গল্পটিকে ডবলভারশন ছবিতে রূপায়িত করাব তাই সাহস হচ্ছে না....এবং আপনাকেও সাহস দিতে পারছি না। আমার এখানে দুজন পরিচালক আছেন—শ্রীপ্রেমাংকুর আতর্থী আর শ্রীদেবকীকুমার বসু—যাঁকে আপনার পছন্দ তাঁকেই আমি এর পরিচালনার ভার দেবো—বলুন কাকে আপনার পছন্দ।

বিরাট সমস্যা....বুড়োদা আমার বহু পরিচিত....অথচ বুড়োদা এ ধরনের সাবজেকট-এ অভ্যস্থ নন। মীরাবাঈ ধর্মপ্রধান ঐতিহাসিক গল্প। ভাবলাম হালফিল ঐতিহাসিক ধর্মকেন্দ্রিক বই—চণ্ডীদাস শ্রীদেবকীকুমারই করেছেন....শুধু করেন নি ....তার সাফল্য এনেছেন—লোকের মন হরণ করতে পেরেছেন....তাই ধীর চিন্তা করে বললাম 'বেশ—তবে দেবকীবাবুকেই এই বইএর পরিচালনা দিন তবে গল্প ও সিনারিওতে আমার [illegible] থাকা চাই।

মিঃ সরকার রাজী হয়ে গেলেন—

এবার দক্ষিণার কথা....আমার দিকে চেয়ে থাকেন মিঃ সরকার।

আমি বলি—কি দেবেন—কি পাবো—তা আমি জানি না—জানতে চেয়েছিলাম যা তা জেনেছি....আর মূল্য একটা যা হোক দেবেন....এইটুকুই শুনলাম।

মাত্র চারশ টাকায় দশ বছরের কড়ারে আমার বই-এর সর্বভাষার চিরস্বত্ব কিনে নিলেন মিঃ সরকার....এবং এর সঙ্গে লিখে নিলেন যে চিত্রনাট্য—ডায়লগ ছাড়াও গীতিকার—দরকার হলে সুরকার হিসাবেও আমার ওদের দুই পরিচালককে সহায়তা করতে হবে।

তবু মন সায় দিল—জয়ী হয়েছিস তো?....একটু চুপ থেকে বলি—এসেছিলাম পরিচালক হতে....কিন্তু

কথা শেষ করতে দিলেন না সাহেব—শুধু স্মিত হেসে বললেন—'এ ছবিখানার সঙ্গে যুক্ত থেকে একটু দেখে শুনে নিন না—তারপর ওবিষয় আপনার সুযোগ করে দেবার ব্যবস্থা করা হবে।

যেদিন এই কথানুযায়ী মিঃ সরকারের পাকাপাকি চিঠি পেলাম সেদিনের তারিখটা

ার মনে আছে....১৮ই এপ্রিল

ন এই কথানুযায়ী মিঃ সরকারের চিঠি পেলাম সেদিনের তারিখটা মার মনে আছে....১৮ই এপ্রিল

সময় মিঃ সরকার আনোয়ার শা একটি বাড়ি ভাড়া করে নিউ বি-ইউনিট খোলেন—পরে প্রতিনিধি হয়েছিলেন—শ্রীযতীন মশাই....নিউ থিয়েটার্সের বিখ্যাত দা।

বেঙ্গল ১৯৫৬ ছবির পর মিঃ বড়ুয়া টকী স্টুডিও বন্ধ করে দেন এবং স্টুডিওকে নিউ থিয়েটার্সের হেফাজতে হিসাবে দিয়ে নিজে এসে নিউ টারে ঢুকে পড়েন।

এবং মিঃ বড়ুয়াও নিউ থিয়েটার্সে যোগ দিয়ে বই শুরু করেন ডবল নে—মহব্বৎ কি কসৌটি ও রূপ-। মিঃ কে এল সাইগল নিউ থিয়েটার্সে ভকতের সময় যোগ দেন—ছবিখানি শেষ পর্যায়—তাই একটি ভজন ছিলেন মাত্র ঐ ছবিতে, কিন্তু মিঃ য়ার ডবল ভারসন মহব্বৎ কি কসৌটিতে কীর প্রথম হিরোর অভিনয় করেন। বাংলা রূপরেখার হিরো ছিলেন মিঃ য়া আর হিরোইন—শ্রীমতী উমাশশী।

মীরাবাঈ-এর স্ক্রিপ্ট হাতে পেয়ে কী বসু আমাকে প্রথমেই অনুরোধ ন যে, আঁখিতে রহগো নন্দ দুলাল খানি আমার চাই-ই চাই। কলোম্বিয়ার এ বিষয় একটা নিষ্পত্তি হয়ে আঁখিতে গো নন্দদুলাল মীরাবাঈ ছবিতে গাওয়া গেয়েছিলেন—মিঃ পাহাড়ী সান্যাল চছিলেন তাঁর সঙ্গে সুনন্দার ভূমিকায় মলিনা দেবি।

যাই হোক—ডবল ভারসন মীরাবাঈ-কাস্টিং হলো—হিন্দী রাণাকুম্ভে। মকায়—পৃথ্বিরাজ (সে সময় তিনি র্পিরিয়েন ড্রামা করে ভারতে নাম লাভ করেছিলেন)। মীরাবাঈ—সস দুর্গা খোটে (উনি তখন মিঃ তারাম পরিচালিত হরিশ্চন্দ্র-শৈব্যার ভনয়ে নাম করেছিলেন)। লালবাঈ-এর মিকায় (রাণার বোন) ছিলেন—মিস সর—পরে বদল হয়ে করেছিলেন খুব ভব রতনবাঈ—সেই সময় বড়োদার দা লেড়কী হিরোইন (ঠিক মনে নেই স হলে অপরাধ নেবেন না—কারণ মীরা-এর শেষ শুটিংগুলি আমার ভাগ্যে া হয়ে জোটে নি—কেন জোটেনি পরে ছি)। অভিরাম সিংহ—শ্রীঅমর মল্লিক। রার ভক্ত পরিবার চাঁদভট্ট ও তার স্ত্রী নন্দা—শ্রীপাহাড়ী সান্যাল (নবাগত) ও লনা দেবী। এবং চারণীর ভূমিকায় লেন—শ্রীমতী ইন্দুবালা।

(চলবে)

আন্তর্জাতিক চারুকলা প্রদর্শনী

নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডি ভারতের চতুর্থ আন্তর্জাতিক ত্রৈবাৎসরিক চারুকলা প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন ৯ই ফেব্রুয়ারী। পৃথিবীর ৪০টি দেশ এই চতুর্থ ত্রৈবাৎসরিক প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করছে। এই সব দ্বিবাৎসরিক ও ত্রৈবাৎসরিক আন্তর্জাতিক চারুকলা প্রদর্শনীর রীতি অনুযায়ী প্রতিটি দেশই দেশের সেই সব চিত্রকর, ভাস্কর ও ছাপের ছবি নির্মাতাদের কাজের নিদর্শন আনবেন যাঁরা গত দশ-পনেরো বছরের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছেন ও তাঁদের কাজের মাধ্যমে তাঁদের দেশের চারুকলা ক্ষেত্রে নতুন নতুন দিক খুলে দিয়েছেন। ভারত এই বহুজাতিক শিল্পমেলায় তার চারুকলা কর্মকাণ্ডের কি পরিচয় তুলে ধরছে? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে এই ত্রৈবাৎসরিক শিল্পমেলার সাংগঠনিক দিকটা সম্বন্ধে একটু জানা দরকার।

ভারত সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রকের সংস্কৃতি বিভাগ এই চতুর্থ ত্রৈবাৎসরিক আন্তর্জাতিক চারুকলা প্রদর্শনীর দশ লক্ষ টাকার ব্যয়ভার বহন করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করলেও এর পরিচালনার দায়িত্ব ললিতকলা আকাদেমির। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ত্রৈবাৎসরিক প্রদর্শনীর সময়ে ললিতকলা আকাদেমির জেনারেল কাউন্সিল আকাদেমির এক্সিকিউটিভ বোর্ডকে কিছু অতিরিক্ত ক্ষমতা দিয়েছিল এই বিশেষ প্রদর্শনী সমাধা করার জন্য এবং এক্সিকিউটিভ বোর্ড আকাদেমির চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারীকে প্রদর্শনী পরিচালনার দায়িত্বভার দিয়েছিল। চতুর্থ ত্রৈবাৎসরিক আন্তর্জাতিক চারুকলা প্রদর্শনীর সাংগঠনিক প্রস্তুতি ধাঁধা হল বিরাটভাবে। আগে যেখানে চেয়ারম্যান এবং/অথবা সেক্রেটারী প্রদর্শনীর ভারপ্রাপ্ত অফিসার হতেন, সেখানে প্রদর্শনী শুরু হবার প্রায় সোয়া বছর আগে এক্সিকিউটিভ বোর্ড তার তিনজন সদস্যকে নিয়ে একটি ত্রৈবার্ষিক প্রদর্শনী সেল গঠন করলেন। সেল গঠন কাল থেকে প্রদর্শনী শেষে তার হিসেব-নিকেশ করা পর্যন্ত এই সেলের সদস্যরা প্রতি মাসে প্রতিজন এক হাজার টাকা করে সম্মানীমূল্য ও রাহা খরচ বাবদ আরও কিছু পাবেন। সেল গঠন করা হল '৭৭-এর জানুয়ারীতে। '৭ মার্চ মাসে একটি ত্রৈবার্ষিক প্রদর্শনী কমিটি গঠন করা হল। সমালোচকদের মতে এটি হল একটি লোক দেখান কমিটি। কারণ তিন সদস্য বিশিষ্ট সেলই আসল ক্ষমতাবিশিষ্ট সংস্থা।

নবগঠিত ত্রৈবাৎসরিক প্রদর্শনী কমিটি আগেকার তিনটি ত্রৈবাৎসরিক প্রদর্শনীতে সৃষ্ট প্রথা অনুসারে প্রদর্শনীর ভারতীয় শাখার জন্য শিল্পী এবং নিদর্শন নির্বাচনের ভার দিলেন তিনজন কমিশনারের উপর। এই তিনজন কমিশনার হলে দিল্লীর চিত্রকর এ রামচন্দ্রন, বরোদার ভাস্কর জাগজী প্যাটেল ও কলকাতার কলা সমালোচক প্রণবরঞ্জন রায়।

এর আগেই, এমন কি ত্রৈবার্ষিক প্রদর্শনী কমিটি গঠিত হবার আগেই, ত্রৈবার্ষিক প্রদর্শনী সেলের ত্রিমূর্তি (চিত্রকর কৃষ্ণ খান্না, চিত্রকর জে স্বামীনাথন ও কলা-সমালোচক রিচার্ড বার্থোলমিউ) ঠিক করেছিলেন বিদেশের সাম্প্রতিক রীতি অনুযায়ী ভারতের ত্রৈবার্ষিক প্রদর্শনীরও একটি সূচক বা কনসেপ্ট থাকা উচিত এবং প্রদর্শনীর শিল্পী ও নিদর্শন চয়নে সেই সূচক বা কনসেপ্ট অনুসৃত হওয়া উচিত। সুতরাং ওঁরা একটা কনসেপ্ট তৈরী করলেন। এই সূচক বা কনসেপ্টটা এমনই এক সাধু-ভাষায় লিখিত যে তার যদৃচ্ছা অর্থ করা সম্ভব। ভারতীয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কমিশনরা তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধি মত সিদ্ধান্ত করলেন যে, এই কনসেপ্ট চারুকলা ক্ষেত্রে ইমেজ বা রূপকল্পের উপরে গুরুত্ব আরোপ করে। কমিশনাররা ভাবলেন এই সূচককে অগ্রাধিকার দিতে হলে সব রকমের অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট বা বিমূর্ত শিল্পকে বাদ দিতে হয়। গত দশ-পনেরো বছরে ভারতে উল্লেখযোগ্য যে শিল্পকর্ম হয়েছে অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট বাদ দিলে তার পরিচয় কোনক্রমেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, অতএব কমিশনাররা এই কনসেপ্ট মেনে নিলেন। ত্রৈবার্ষিক প্রদর্শনী কমিটি ভারতীয় বিভাগের কমিশনারদের কাছে তাঁদের নির্দেশনামায় বললেন, যেহেতু মুখ্য উদ্দেশ্য হলে ভারতীয় বিভাগটিকে একটি গুণসমৃদ্ধ বিভাগ হিসাবে উপস্থিত করা, সেহেতু কমিশনাররা যেন নতুন নতুন প্রতিভাবান শিল্পী আবিষ্কারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ভারতীয় বিভাগটিকে একটি অনিশ্চিত গুণসম্পন্ন বিভাগে পরিণত না করেন। কমিশনারদের বলা হল যে ত্রৈবাৎসরিক প্রদর্শনীর মূলমন্ত্র হিসাবে গৃহীত কনসেপ্ট ও উপরোক্ত নির্দেশ মেনে কমিশনাররা তাঁদের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার-মত যে শিল্পী এবং শিল্প-নিদর্শন নির্বাচন করবেন তাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

চতুর্থ ত্রৈবাৎসরিক আন্তর্জাতিক চারুকলা প্রদর্শনীর ভারতীয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কমিশনাররা বহু বিচার-বিবেচনার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে আধুনিক ভারতীয় চারুশিল্প তাৎপর্যময়ভাবে দিক বদল করেছে। সে-সময় থেকে যে-স চিত্রকর, ভাস্কর ও ছাপের ছবি নির্মাতা ভারতীয় শিল্পকলা ক্ষেত্রে তাঁদে স্বকীয়তা গুণে খ্যাতি অর্জন করেছে তাঁরা কেউই তাঁদের পূর্বসূরীদের মত শিল্পী হিসাবে প্রথমেই হয় কোন সনাত ভারতীয় শিল্পশৈলী, না হয় কো আধুনিক পশ্চিমী শিল্পরীতির স আত্মীয়তা স্থাপনে ব্যাগ্র নন। এঁদে প্রত্যেকেরই অন্বিষ্ট নিজ নিজ জগৎ-জীব কালসম্পৃক্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রকাশ। যে-সব শিল্পীরা গত দশ পনেরো বছর ধরে নিষ্ঠাভাবে ক্রমান্বয়ে কাজ করে, তাঁদের কাজের মধ্যে তাঁদের ব্যক্তি-পরিচয়কে তুলে ধরেছেন এবং তা করে দেশে-বিদেশে কথঞ্চিৎ স্বীকৃতি পেয়েছেন ও সাম্প্রতিক ভারতীয় শিল্পের এই নতুন রূপকে মূর্ত করেছেন তেমনই বাইশজন শিল্পীকে কমিশনাররা এই ত্রৈবাৎসরিক প্রদর্শনীতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত করেন। কমিশনাররা মনে করেন যে গ্রামীণ-লোকশিল্পের ও উপজাতীয় শিল্পীদের শিল্পকর্মেও যে পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে, সে-সব ক্ষেত্রেও গুণী ব্যক্তি-শিল্পীরা তাঁদের কর্মের মাধ্যমে ঐতিহ্যে যে পরিবর্তন ঘটাচ্ছেন ললিতকলা আকাদেমি এ-তাবৎ কাল পর্যন্ত সে সম্বন্ধে অনবহিত থেকে অন্যায় করেছেন সে দোষ স্খালনের উদ্দেশ্যে কমিশনাররা এই ত্রৈবাৎসরিক প্রদর্শনীতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একজন লোকশিল্পী ও একজন আদিবাসী শিল্পীর নাম করেন। কমিশনাররা মনে করেন যে, একটি প্রদর্শনী থেকে একজন শিল্পীর শিল্পকর্ম সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পেতে হলে বিভিন্ন সময়ে রচিত তাঁর অন্তত পাঁচ থেকে আটটি শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে থাকা দরকার। অপরাপর ত্রৈবাৎসরিক প্রদর্শনীতে যেভাবে প্রতিটি শিল্পীর একটি বা দুটি নিদর্শন উপস্থাপিত করা হত তা থেকে একজন শিল্পীর কাজের সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যেত না। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে কমিশনাররা ঠিক করেন স্বল্প সংখ্যক সুনির্বাচিত শিল্পীর অধিক সংখ্যক কাজ নিয়ে প্রদর্শনী করাটা অনেক যুক্তিযুক্ত।

গত ৩১শে ডিসেম্বর দিল্লীতে ৪র্থ ত্রৈবাৎসরিক প্রদর্শনী কমিটির জরুরী সভায় ভারতীয় বিভাগের কমিশনারদের প্রস্তাব নিয়ে ঝড় বয়ে গেল। ভারতের চারুকলা কর্মকাণ্ডের জগতে মৌরসীপাট্টা নিয়ে বসে আছেন যে-সব শিল্পীরা তাঁরা কমিশনারদের নির্বাচিত শিল্পী তালিকায় নিজেদের নাম না দেখতে পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। কৃষ্ণ খান্না,

ামীনাথন, গুলাম রসুল, সন্তোষ, পি রেড্ডি, স্বামীনাথন বললেন—কমিশনারদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাঁরা ন ভারতীয় বিভাগটিকে একটি শক্তিশালী প্রদর্শনী করে তোলেন, তার লে তাঁরা এটিকে একটি দুর্বলতম বিভাগ র উপস্থাপিত করার প্রস্তাব পেশ করেন। ভাবখানা এই যে তাঁদের বাদ দিয়ে ন ভারতবর্ষে শক্তিশালী শিল্প-প্রদর্শনীর কথা ভাবাই যায় না। এতেই এঁরা ান্ত হলেন না। ওঁরা বললেন কমিশনাররা কটি জেনারেশনের শিল্পীদের উপরে জোর য়ে তাঁদের কাছে যে নির্দেশনামা দেওয়া য়েছিল সেটা লংঘন করেছেন। কমিটির নাতম সদস্য কবি-চিত্রকর গুলাম মহম্মদ শেখ যখন জানতে চান ঐ নির্দেশাবলী কি ় এবং কোথায় কোথায় কি ভাবে কমিশনাররা াঁদের প্রস্তাবে সেগুলি লংঘন করেছেন, খন কিন্তু এইসব মহারথীরা নীরব থাকেন। তঃপর মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে কমিটি মিশনারদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এই ভোটযুদ্ধ হয় অন্যতম কমিশনার প্রণবরঞ্জন য়, প্রখ্যাত ভাস্কর শঙ্খ চৌধুরী ও চিত্রকর াকবর পদমসীর প্রতিবাদ সত্ত্বেও। ওঁরা লেন, ত্রৈবার্ষিক-প্রদর্শনীর নিয়মাবলী ও থাসিদ্ধ আইন অনুযায়ী কমিশনারদের স্তাব বিতর্ক-সাপেক্ষ নয় ও অবশ্য হণীয়। প্রণবরঞ্জন আরও বলেন নিয়মাবলী নুসারে যেহেতু কমিশনারদের প্রস্তাবই ূড়ান্ত, সেহেতু কমিশনাররা যতক্ষণ কমিশনার আছেন ততক্ষণ প্রদর্শনী সম্বন্ধে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ আইন-সম্মত হতে পারে না। আর নিয়মাবলী অনুসারে কমিশনাররা অপসারিত হতে পারেন না। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

ত্রৈবার্ষিক প্রদর্শনী কমিটি অতঃপর সমস্ত বিষয়টা পেশ করলেন আকাদেমির জেনারেল কাউন্সিল-এর হাতে এবং সেখানেও কমিশনারদের পরিকল্পনার বিরোধিতা করলেন সেই ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী। জেনারেল কাউন্সিল তখন কমিশনারদের মনোনীত শিল্পী-তালিকা খতিয়ে দেখার জন্য এবং ভারতীয় বিভাগে প্রদর্শনের জন্য নতুন একটি শিল্পী-তালিকা একটি সাব-কমিটি গঠন করেন। এই সাব-কমিটিতে স্থান পান গুলাম রসুল সন্তোষ এবং পি টি রেড্ডির মতন লোকেরা যাঁরা আকাদেমিকে সোপার্জিত সম্পত্তি বলে গণ্য করেন, আর আছেন দুজন সদস্য যাঁরা ভারতবর্ষের শিল্প এবং শিল্পীদের সম্বন্ধে কিছুই প্রায় জানেন না। এই চার সদস্য বিশিষ্ট সাব-কমিটি নতুন যে তালিকা তৈরী করলেন তার থেকে কমিশনারদের মনোনীত একজন লোকশিল্পী ও একজন আদিবাসী শিল্পীকে বাদ দিয়ে অপর বাইশজনকেই তালিকাভুক্ত করলেন। কমিশনারদের তালিকাভুক্ত শিল্পীদের নিয়ে প্রদর্শনী করলে তা দুর্বল প্রদর্শনী হবে, এমন যে সমালোচনা করা হয়েছিল—এখন দেখা যাচ্ছে যেটা তাঁরা নিজেরাই বিশ্বাস করেন না। এছাড়াও নতুন তালিকায় তাঁরা আরও পঁয়তাল্লিশ জন শিল্পীর নাম অন্তর্ভুক্ত করলেন। তার মধ্যে পি টি রেড্ডির মতন অবসরপ্রাপ্ত কখনও খ্যাতিমান ছিলেন না এমন শিল্পী যেমন আছেন তেমনই আছেন হুসেন-এর মতন বহুখ্যাত বহু-পরিচিত শিল্পী। কিন্তু এঁরা ঠিক করলেন প্রত্যেকের কাছ থেকেই একটি বা দুটি মাত্র করে কাজের নিদর্শন সংগ্রহ করা হবে, তার বেশী নয়। এ প্রসঙ্গে এ কথা স্মর্তব্য যে পি টি রেড্ডি এবং সন্তোষ শিল্পী নির্বাচনী কমিটির সদস্য হয়েও তালিকা থেকে নিজেদের নাম বাদ দেবার সৌজন্য দেখান নি। সেখানে রামচন্দ্রন এবং নাগজী প্যাটেল স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না যে কমিশনার থেকেও তাঁদের নাম তাঁরা তালিকাভুক্ত করতে পারেন।

ত্রৈবাৎসরিক-প্রদর্শনী কমিটির ও জেনারেল কাউন্সিলের বে-আইনী, অর্থনৈতিক ও নজিরবিহীন কার্যকলাপের প্রতিবাদে তিনজন কমিশনার নাগজী প্যাটেল, এ রামচন্দ্রন ও প্রণবরঞ্জন রায় একযোগে পদত্যাগ করেন। রামচন্দ্রন ললিত কলা আকাদেমির অন্যান্য অনেক কমিটির সদস্য ছিলেন। সেসব থেকেও পদত্যাগ করেন। বরোদার শিল্পী গুলাম মহম্মদ শেখ ও জ্যোতি ভট্টও ললিতকলা আকাদেমির সঙ্গে সব সংশ্রব ছিন্ন করেন। কমিশনাররা যেসব শিল্পীদের নির্বাচন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কলকাতার গণেশ পাইন, বিকাশ ভট্টাচার্য ও মীরা মুখোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতনের সনৎ কর, দিল্লীর পরমজিৎ সিং, বরোদার ভূপেন খক্কর, গুলাম মহম্মদ শেখ ও জ্যোতি ভট্ট, বম্বাই-এর গীভ প্যাটেল ও প্রভাকর বার্ভে এবং হায়দরাবাদের লক্ষ্মা গৌড় আকাদেমির কার্যকলাপের প্রতিবাদে ত্রৈবাৎসরিক প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করছেন না। একই কারণে প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করছেন না কলকাতার সুনীল দাস, শান্তিনিকেতনের সোমনাথ হোড় ও কে জি সুব্রহ্মণ্যম, দিল্লীর রাজকুমার, ভাইয়ের মেহতা, গাইতোণ্ডে ও রামচন্দ্রন, বম্বাইয়ের আকবর পদমসী প্রমুখ প্রখ্যাত শিল্পীরা যাঁরা বে-আইনী ও অনৈতিকভাবে গঠিত সাব-কমিটি কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এঁদের মতন শিল্পীদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার পর ত্রৈবাৎসরিক প্রদর্শনীর ভারতীয় বিভাগ কতটা শক্তিশালী হয় তাই এখন দেখার ও জানার বিষয়।

শোনা যাচ্ছে দিল্লীর কুমার গ্যালারী প্রতিবাদী শিল্পীদের কাজের নিদর্শন নিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করছেন ঐ ত্রৈবাৎসরিক প্রদর্শনীর সময়েই। এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা কলকাতা ও শান্তিনিকেতনের প্রতিবাদী শিল্পীদেরও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রদর্শনীতে অংশ নেবার জন্য। কিন্তু তার উত্তরে এখানকার শিল্পীরা ঐ প্রদর্শনীতেও তাঁদের অংশ গ্রহণ করার অপারগমতার কথা জানিয়েছেন।

অনিমেশ মিত্র
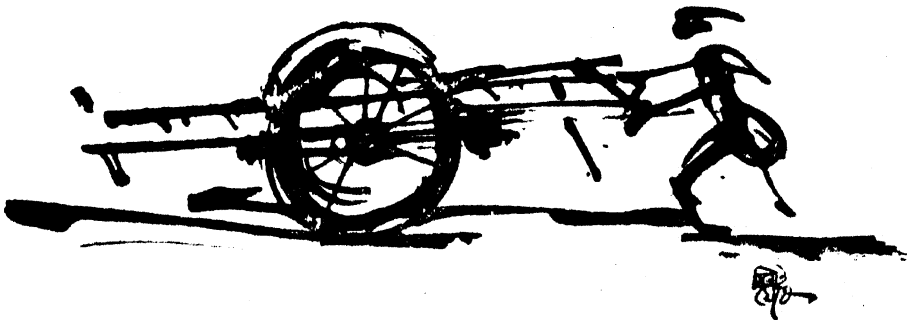
ইংলণ্ডে খেলতে গিয়ে মাছ ধরার নেশায় মেতেছেন দেশাই, বাপ্পু নাদকার্নী পাতৌদি এবং অজিত ওয়াদেকার।

বাঘা ক্রিকেটার পাতৌদি

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ সাত ॥

ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের ওপর দিয়ে কদিন ধরে একটা ঝড় বয়ে গেল। বোম্বাই থেকে উড়ে এসেছেন শ্রীমতী ডলি কনট্রাকটর। ততদিনে নরীর জীবনের আশংকা আর নেই। ভাল আছেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক। বেশ ভাল আছেন।

বার্বাডোজে তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ শুরু হবার আগে গোলাম আমেদ মনসুরকে ডাকলেন। বললেন, নরী আর খেলতে পারবে না। এই সফরের বাকী খেলাগুলোতে তোমাকেই তার জায়গা নিতে হবে।

পাতৌদিই ছিলেন ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক। সকলেই জানতেন নরী কনট্রাকটর আরও পাঁচ-ছয় বছর খেলবেন। ততদিনে তাঁর সহকারী হিসেবে থেকে পাতৌদি পরিণত হয়ে উঠবেন, অভিজ্ঞতায় ভরপুর হয়ে উঠবেন। কিন্তু সে সুযোগ আর পেলেন না পাতৌদি। ভারতীয় দলের সব দায়িত্ব যখন তাঁর কাঁধে তুলে দেওয়া হল তখন তাঁর বয়স মাত্র একুশ বছর দু মাস কয়েক দিন।

দিল্লি ও অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় দলের নেতৃত্ব করার অভিজ্ঞতা থাকলেও টেষ্ট খেলা যে অন্য জিনিষ। আর কটাই বা টেষ্ট খেলেছেন পাতৌদি। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে গিয়ে প্রথম দুটি টেষ্টের একটিতেও খেলেন নি। প্রথম টেষ্টের আগে জামাইকার সঙ্গে খেলার সময় তাঁর পায়ের মাংস পেশীতে টান ধরেছিল। তাই বার্বাডোজের আগে আর খেলতেই পারেন নি। বার্বাডোজের বিরুদ্ধে ঐ খেলাটিতে আবার দু ইনিংসেই গোল্লা করেছেন। এর আগে আর কখনও তিনি তা করেন নি। গ্রিফিথের বলে দু-দুবার আউট হয়েছেন।

অথচ তাঁকেই এখন ভারতীয় দলে হাল ধরতে হবে। ভাঙ্গা সেই হাল শক্ত হাতে ধরার মত শক্তি কি তাঁর আছে! পর পর দুটি টেষ্টে পরাজয়, তার ওপ দলের অধিনায়কের অমন মারাত্মক আঘা —ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের মানসি শক্তিকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক দিয়েছে। সেই ভাঙ্গা দলকে কি করে জোড় লাগাবেন পাতৌদি।

গোলাম আমেদের কাছ থেকে ছাড় পেয়ে পাতৌদি দলের বর্ষীয়ান খেলোয়া পলি উমরিগড়কে ধরে পড়লেন। পলি উমরিগড়ের মতো চৌকস খেলোয়াড় ভারে খুব কমই জন্মেছে। যেমন ব্যাটিং তেমনি ফিল্ডিং, তেমনি বোলিং। দলের অধিনায় হবার মতো মেজাজ আর চেহারা। কিন্ত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে মতভে

য় তিনি স্বেচ্ছায় অধিনায়কের পদ নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন।

তরুণ পাতৌদি গিয়ে দাঁড়ালেন সেই র সামনে।

পাতৌদির মনের কথা বুঝতে উমরি-র একটুও বেশী হল না। তাঁর পিঠ ড় দিয়ে বললেন, তুমি কিচ্ছু ভেবো আমি সব সময় তোমার পাশে আছি।

পলির আশ্বাসবাণী একুশ বছরের টাঁদির মনের জোর অনেক বাড়িয়ে দিল। হল বার্বাডোজের তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ। ম ব্যাট করে ভারত করল ২৫৮ রান। তাঁদি দুরানীর সঙ্গে জুড়ি বেঁধে ৪৮ করলেন।

ভারতীয় বোলাররা বিশেষ করে বাপু কার্নী নিখুঁত বল করলেন। চুম্বকের তিনি টেনে রাখলেন রানের কাঁটাকে। ওভার বল করে ২৮টি মেডেন পেলেন। রনের বিনিময়ে পেলেন ২টি উইকেট। ন্তু তাতে কি হবে—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের টসম্যানরা তাঁদের রানকে টেনে নিয়ে লেন ৪৭৬য়ে।

খেলার মীমাংসা হবার কোন সম্ভা-াই তখন ছিল না। শেষ দিন মধ্যাহ্ন াজের সময় ভারতের রান দু উইকেটে ৩৯। বাকী সময়ে ৮টি উইকেট ফেলে ওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। ফাষ্ট বোলার-র ভয়ে ভীত ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের ক্ষণব্যূহ হঠাৎই ভেঙ্গে পড়ল স্পিন লিংয়ের চাপে। মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির র খেলার চেহারা পুরোপুরি পাল্টে ল। খেলার চতুর্থ দিন থেকে শুরু করে ষ দিনের লাঞ্চ পর্যন্ত ৩৮ ওভার বল রে যে গিবস একটিও উইকেট পান নি—ঠাৎ সেই গিবসের বল সাপের ছোবলের ত মারাত্মক আকার ধারণ করে ভারতীয় ্যাটসম্যানদের ঠেলে দিল পরাজয়ের মুখে।

লাঞ্চের পরেই সরদেশাই (৬০) ও ঞ্জরেকারকে (৫১) পর পর আউট করে লেন গিবস। ৫ মিনিট যেতে না যেতেই তৌদি ফিরে এলেন প্যাভেলিয়নে। াবসের বলে স্লিপে ধরা পড়লেন াবার্সের হাতে। ভীষণ মন খারাপ হয়ে াল পাতৌদির। বলটা তাঁর ব্যাটে লাগেই । লেগেছিল প্যাডে। ঐভাবে আউট হতে ারই বা ভাল লাগে।

মধ্যাহ্ন ভোজের পর খেলা শুরু হতে া হতেই ভারতের রান ২ উইকেটে ১৪৯ থকে গিয়ে দাঁড়াল ৫ উইকেটে ১৫৯। মরিগড় ও বোরদে শকত হাতে ব্যাট ধরে ারতের হার রুখতে চেষ্টা করেছিলেন। ন্তু মিনিট তিরিশেক খেলার পর াবসের বলে আউট হয়ে উমরিগড় আউট য়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে আসার পর খেলার ার কিছুই বাকী রইল না। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে গেল মাত্র ১৮৭ রানে। গিবস পেলেন ৮টি উইকেট। লাঞ্চের পর তাঁর বোলিংয়ের গড় দাঁড়াল—১৫'৩-১৪-৬-৮।

তৃতীয় টেষ্টে এক ইনিংস ও ৩০ রানে হেরে গিয়ে ভারত রাবার হারাল। পাতৌদির মনে বড় দুঃখ। তাঁর নেতৃত্বে প্রথম টেষ্টেই ভারত হেরে গেল। অথচ হারার কোন কারণই ছিল না। ড্রই হতে চলেছিল। কিন্তু কি যে হল—লাঞ্চের পর গিবসের বল আর কেউ খেলতেই পারলেন না। ভারতীয় ব্যাটসম্যানরাই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জয়ের পথ পরিষ্কার করে দিলেন।

পোর্ট অফ স্পেনের চতুর্থ টেষ্টেরও একই হাল হল। আগে ব্যাট করে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ প্রথম দিনে ৭ উইকেটে ২৬৮ রান করল। এর মধ্যে রোহান কানহাই একাই ১৩৯ রান করলেন। পরের দিন ৯ উইকেটে ৪৪৪ রান করে ফ্র্যাংক ওরেল ভারতকে ব্যাট করতে পাঠালেন। শেষ উইকেটে ওরেল ও হল ৯৮ রান যোগ করে নতুন নজির গড়েছিলেন। সেই দিন হল ভারতীয় ইনিংস তছনছ করে দিলেন। মাত্র ৬১ রান তুলতেই ভারত হারাল সেরা ৫ জন ব্যাটস-ম্যানকে। ১৯৭ রানে শেষ হয়ে গেল ভারতের প্রথম ইনিংস। মাত্র ৯ ওভার বল করে ২০ রানের বিনিময়ে হল পেলেন ৫টি উইকেট।

দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত মরশুমের সর্বোচ্চ ৪২২ রান করল। তার অর্ধেকের কাছাকাছি এল পলি উমরিগড়ের ব্যাট থেকে। পলি ১৭২ রান করে অপরাজিত রয়ে গেলেন। দুরানীও সেঞ্চুরী হাঁকালেন—১০৪ রান আর বিজয় মেহেরা করলেন ৬২। ভারতের বাকী ৭ জন ব্যাটসম্যান মিলে যোগ করলেন মাত্র ৪৮ রান। জেতার জন্যে প্রয়োজনীয় ১৭৬ রান তুলতে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিন্দুমাত্রও অসুবিধে হল না। ৩টি উইকেট হারিয়ে তাঁরা সংগ্রহ করলেন ঐ রান। ঐ ৩টি উইকেটই দখল করেছিলেন সেলিম দুরানী।

চতুর্থ টেষ্ট শেষ হতে না হতেই পাতৌদির বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় উঠল। লেগ স্পিনার বোরদেকে নাকি তিনি পুরো-পুরি কাজে লাগাননি। এই অযাচিত সমালোচনায় পাতৌদি একটু অবাকই হয়েছিলেন। তিনি ভাবতেই পারেন নি যে তাঁর প্রতিটি আচরণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখা হবে। হয়ত শেষ উইকেটে ওরেল ও হল যখন ব্যাট করছিলেন তখন বোরদেকে বল করতে পাঠালে কিছু কাজ হত। কিন্তু টেষ্ট ক্রিকেট অনভিজ্ঞ তরুণ পাতৌদির মাথায় সে কথা আসে নি। যদিও তাতে ফলাফলের কিছুই এসে যেত না।

কিংসটনের ৫ম টেষ্টেও ভারত হেরে গেল। হারল ১২৩ রানে। ফলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ জিতল পর পর ৫টি টেষ্টে। সেই খেলায় প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ২৫৩ রানে তাদের প্রথম ইনিংস শেষ করল। এর মধ্যে গ্যারী সোবর্সের একটি দুরন্ত সেঞ্চুরী ছিল। মাত্র ৭৬ ওভারের মধ্যে মুড়িয়ে গেল ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ইনিংস। রঞ্জনে ৭২ রানে ৪টি উইকেটে পেয়েছিলেন।

রঞ্জনের বাকী কাজ সারলেন টেষ্ট ক্রিকেটে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের নতুন তারকা লেস্টার কিং। জীবনের প্রথম টেষ্টে কিং মাত্র ৩৩ রানের মধ্যে ভারতের ৫ জন ব্যাটসম্যানকে প্যাভেলিয়নে ফিরিয়ে দিলেন। ঐ ৫টি উইকেট তিনি পেয়েছিলেন মাত্র ৪৬ রানের বিনিময়ে। মাত্র ১৭৮ রানে শেষ হয়ে গেল ভারতের প্রথম ইনিংস। দ্বিতীয় ইনিংসেও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বিশেষ সুবিধে করতে পারল না। ফ্র্যাংক ওরেল অপরাজিত থেকে ৯৮ রান করায় তাদের রান দাঁড়াল ২৮৩।

ভারতের সামনে তখন জয়ের সুযোগ। ৩৫৮ রান করলে জিতবে। হয়ত তার কাছাকাছি ভারত পোঁছুতে পারত। কিন্তু বৃষ্টি মস্ত বড় বাধা হয়ে দাঁড়াল। বৃষ্টি আর মেঘলা আকাশে খেলতে অনভ্যস্ত ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা ২৩৫য়ের বেশী করতে পারলেন না।

পর পর ৫টি টেষ্টে হেরে দেশে ফিরে এল ভারতীয় দল। পাতৌদি নেতৃত্ব নেবার পর দলে শুধু একটাই উন্নতি দেখা গিয়েছিল। তা হল ফিল্ডিংয়ের।

[চলবে]

বাংলাই সেরা

কলকাতায় ৩৪তম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় ফাইনাল খেলায় দ্বিতীয় দিনে বাংলা ৩—১ গোলে পাঞ্জাবকে হারিয়ে এই নিয়ে ২৬ বার ফাইনালে উঠে ১৭ বার সন্তোষ ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করলো। তাছাড়া এই নিয়ে বাংলা উপর্যুপরি তিনবার জয় করে সন্তোষ ট্রফি হাতে পেল দুবার। বাংলা ছাড়া অপর কোন দলের পক্ষে উপর্যুপরি তিনবার সন্তোষ ট্রফি জয় সম্ভব

ফাইনালের প্রথমদিনেই যেখানে বাংলার একাধিক গোলে জেতার কথা সেখানে তারা খেলাটি গোল শূন্য ড্র করে। দ্বিতীয় দিনেও বাংলা প্রথম দিনের মত গোল করার একাধিক সহজ সুযোগ নষ্ট করে। বাংলা যদি এগুলির যথাযথ কাজে লাগাতে পারতো তাহলে জলন্ধরে ১৯৭৪ সালের ফাইনালে এই পাঞ্জাবের কাছে যে ০—৬ গোলে হেরেছিল তা উসুল হয়ে গোল উপচে পড়ত। পাঞ্জাব এই নিয়ে তিনবার ফাইনালে খেলে প্রথম রানার্স আপ হল। তারা যে দুবার সন্তোষ ট্রফি পেয়েছে তা স্বদেশের আসরে (জলন্ধরে) ১৯৭০ এবং ১৯৭৫ সালে।

ফাইনালে বাংলা

জয় ১৭ বার: ফাইনালে বোম্বাইকে ৪ বার, মহীশূরকে ৩ বার, হায়দরাবাদকে ২ বার, সার্ভিসেসকে ২ বার এবং একবার করে দিল্লী, রেলওয়ে, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র এবং পাঞ্জাবকে হারিয়ে বাংলা মোট ১৭ বার সন্তোষ ট্রফি জয়ী হয়েছে।

রানার্স আপ ৯ বার: ফাইনালে মহীশূরের কাছে ৪ বার, এবং একবার করে দিল্লি, রেল, অন্ধ্র, পাঞ্জাব এবং সার্ভিসেস দলের কাছে বাংলা হেরে গিয়ে মোট ৯ বার রানার্স আপ হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৭৭ সালের সর্ব ভারতীয় ফুটবল মরশুমে কলকাতা তথা বাংলারই মোহনবাগান জয়ী হয়েছে আই এফ এ শীল্ড, রোভার্স ও ডুরান্ড কাপ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল আসর থেকে এনেছে স্যার আশুতোষ মুখার্জি শীল্ড এবং বাংলা ফুটবল দল জয়ী হয়েছে সিনিয়র জাতীয় ফুটবলের সন্তোষ ট্রফি, জুনিয়র জাতীয় ফুটবলের ডাঃ বি সি রায় ট্রফি এবং সাব জুনিয়র ফুটবল ট্রফি।

কোয়ার্টার ফাইনাল

কোয়ার্টার ফাইনালের ১নং গ্রুপ থেকে বাংলা ও পাঞ্জাব এবং ২নং গ্রুপ থেকে কেরল ও রেলওয়ে সেমি-ফাইনালে উঠেছিল।
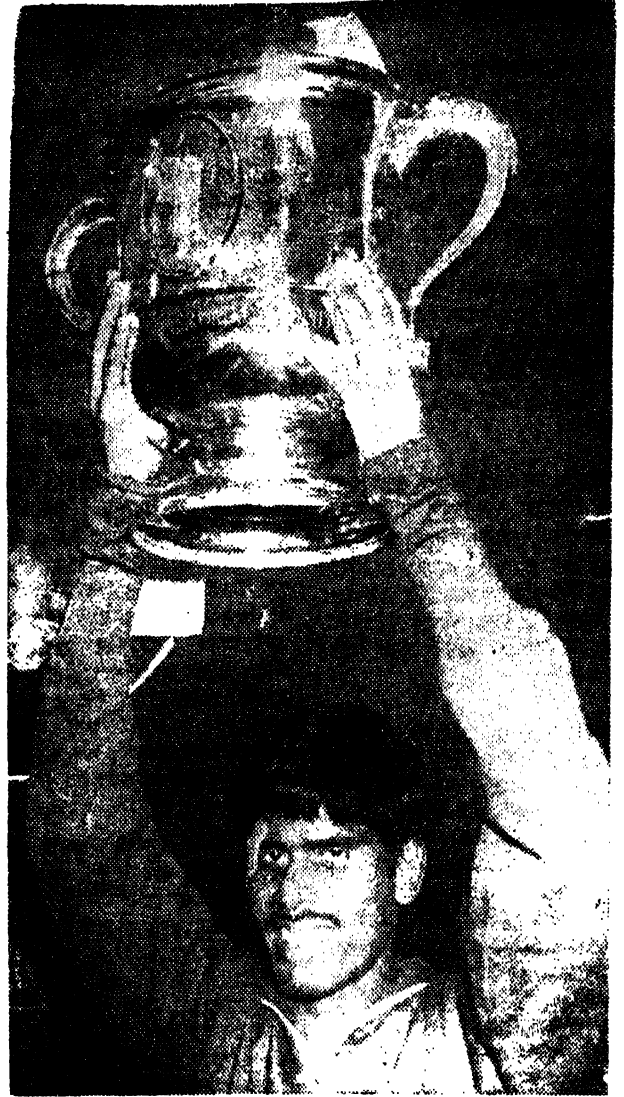
কোয়ার্টার ফাইনালের ১নং গ্রুপে [illegible] ৩—০ গোলে কর্ণাটককে হারিয়ে পাঞ্জাবের সঙ্গে ১—১ গোলে খেলা ড্র করে। অপরদিকে পাঞ্জাব মাত্র ১—০ গোলে সার্ভিসেস দলকে হারায় এবং ১—১ গোলে খেলা ড্র করে লীগের শেষ চতুর্থ স্থানাধিকারী কর্ণাটক এবং কোয়ার্টার ফাইনাল চ্যাম্পিয়ান বাংলার সঙ্গে। এখানে উল্লেখ্য, পাঞ্জাবের সঙ্গে ১—১ গোলে খেলা ড্র করায় লীগের খেলায় বাংলা প্রথম গোল খায় এবং প্রথম পয়েন্ট নষ্ট করে। কোয়ার্টার ফাইনালের ২নং গ্রুপে কেরল ৩—১ গোলে বিহার এবং ২—০ গোলে অন্ধ্রকে হারিয়ে রেল দলের সঙ্গে গোল-শূন্যভাবে খেলা ড্র করে। অপরদিকে রেলওয়ে গোলশূন্যভাবে বিহার ও কেরলের সঙ্গে খেলা ড্র করে ৩—০ [illegible]

ট্রফি হাতে আকবর

গ্রুপ ১

	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পা:
বাংলা	২	১	০	৭	১	৫
পাঞ্জাব	১	২	০	৩	২	৪
সার্ভিসেস	১	০	২	৩	৬	২
কর্ণাটক	০	১	২	৩	৭	১

গ্রুপ ২

	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পা:
কেরল	২	১	০	৫	১	৫
রেলওয়ে	১	২	০	৫	০	৪
অন্ধ্র	১	০	২	৩	৯	২
বিহার	০	১	২	৩	৬	১

সেমি-ফাইনাল

সেমি-ফাইনালে বাংলা ১—০ [illegible] ১—০ গোলে রেল দলকে এবং পাঞ্জাব ৪—৩ ও ২—১ গোলে [illegible] হারিয়ে [illegible]

[illegible]

চলচ্চিত্রোৎসবের শেষ ক'টি দিন

র্মল ধর

উৎসবের পালে হাওয়া লেগেছিল
য় সপ্তাহের শুরু থেকেই। হাওয়া
প্রথম কারণ প্রথম সপ্তাহে ব্রাজিল,
আর ইউ এস এস আর-এর তিনটি উত্তেজক
দেখার পর উৎসাহ বৃদ্ধি, দ্বিতীয়
একের পর এক সাংবাদিক সম্মেলন
ত তীব্র বাদানুবাদ, এবং তিন নম্বর
ট হলো স্থানীয় বিভিন্ন চলচ্চিত্র
গুলি কর্তৃক বিদেশী অতিথিদের
ণ পর্ব। হোটেল সুদর্শন, হোটেল
রা, হোটেল চোলা ও কলাক্ষেত্রে চার-
বিচিত্রানুষ্ঠান হয়ে গেছে: এখনও
।

মূলে উৎসবের বহিরঙ্গ এগুলি বটে,
ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে এ ধরনের অনুষ্ঠান
হার্য। উৎসব অধিকর্তা মিঃ কাটারা
র সকলের সঙ্গে মিলিত হলেন হোটেল
রায়, আর একদিন শুধু সাংবাদিক-
ঙ্গে ঘরোয়া আলোচনায় বসলেন তিনি
স সুদর্শনে।

এতসব ব্যস্ততার ফাঁকেও ছবি দেখায়
নেই।

র্জির মেনজেল নিরাশ করলেন আমা-
তাঁর পূর্বেকার ছবিগুলিতে যে তীব্র
ব্যঙ্গরূপের ছোঁয়া পেতাম, এই নতুন
(এ কটেজ নিয়ার দি উড) সে
া অনুপস্থিত। খুবই হাল্কা চালে
ভঙ্গিতে তিনি করেছেন ছবিটি। এক
গাড়িওয়ালার কাছ থেকে তার গ্রামের
কেনবার জন্য এক শহুরে দম্পতির
চেষ্টা নিয়ে গল্পের বিস্তার। লোকে-
সাধারণ, ফটোগ্রাফী দেখবার মত,
সরস তীব্রতা নেই কেন? মেন-
তো তাঁর সূক্ষ্ম ব্যঙ্গচিন্তার জনাই
ত।

আগ্নেস ভার্দার 'ওয়ান সিঙ্গস দি আদার
নট' কালানুক্রমিক ভঙ্গিতে দুই
র জীবনের প্রেম-বিবাহ-পেশা-
কে বর্ণনা করেছেন। সঙ্গীত প্রেমী
স্বামী ছেড়ে গানের দলে চলে গেল,
ন নিস্তরঙ্গ সংসারী শান্ত জীবনকেই
নিল। কিন্তু দুজনেই গান শিখত
স: ভার্দার বর্ণনাভঙ্গী সাবলীল।'
ত দুই বন্ধুর যোগাযোগ পর্বের
গুলি ছবি-পোস্টকার্ডের মাধ্যমে সুন্দর
ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। এই গল্পের
থেকে পশ্চিম দেশের নারী স্বাধীনতা
র্ক নতুন ধারণা করা যায়।

ইতালীর 'ক্যানিবালস' বিখ্যাত গ্রীক
'আন্তিগোনে'র ছায়া অবলম্বনে
। আজকের ইতালীর কোন এক শহরে
ফেলেছেন ঘটনাটিকে পরিচালক
য়ানা কাভানি। অর্থাৎ এখনও সমান
আন্তিগোনের ঘটনা। কলকাতার একদা
নির্মিত অভিনীত নাটকের তুলনায় এই ছবি
অনেক বেশী বলিষ্ঠ, শিল্পসুষমান্বিত। সারা
শহরে জুড়ে পড়ে আছে বিদ্রোহীদের মৃত-
দেহ। সরকারী আদেশ মৃতদেহ ছোঁয়া যাবে
না। একটি মেয়ে সেই সহস্র মৃতদেহের
মধ্যে খুঁজে বেড়ায় তার ভাইকে। সাহায্যের
হাত নিয়ে এগিয়ে আসে এক অপরিচিত
তরুণ যার ভাষা পৃথিবীর কেউ বোঝে না।
আইন অগ্রাহ্য করেই ভাইকে খুঁজে নিয়ে
সৎকার করে দুজনে, এবং এরপরই শুরু হয়
পুলিশী অত্যাচার। প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রীর
ছেলে বাবার মুখের ওপর বলে দেয় 'আমি
জন্তু হয়ে যেতে চাই'। বন্দীশালায় তার
আচরণ হয়ে ওঠে সরীসৃপের মত। খুব
সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ ভঙ্গিতে বামপন্থী রাজ-
নৈতিক বক্তব্যকে তিনি দৃঢ় ভিত্তিতে
প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং বলেছেন 'ধনতান্ত্রিক
সমাজের বুকের মধ্যে বিপ্লবী আগুন
থাকবেই।' বক্তব্যের দৃঢ়তাই ছবির প্রধান
প্লাস পয়েন্ট।

ফ্রান্সেস্কো রোসির 'ইলাস্ট্রিয়াস
করপসেস' এর মূল বিষয় ইতালীর কমু-
নিস্ট পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্ব হলেও প্রথম স্তরে
ছবিটি ভয়ানক-রহস্য-রোমাঞ্চধর্মী। একের
পর এক বিচারক খুনের কিনারা করতে গিয়ে
ডিটেকটিভ শেষ পর্যন্ত নিজেই খুন হল।
অবশ্য তাঁর কাছে খুনের রহস্য পরিষ্কার
হলেও সাধারণ্যে প্রকাশ করতে পারলেন না
তিনি সত্যটি, তার আগেই পুলিশ কর্তৃপক্ষ
রটিয়ে দিল গোয়েন্দা আত্মহত্যা করেছেন।
পুলিশী ব্যবস্থার প্রতি কি হাস্যকর পরি-
হাস! খুনীর প্রশ্নে তাই দর্শকের সামনে
কয়েকটি জিজ্ঞাসা চিহ্ন আসতে পারে। রোসি
সম্ভবতঃ ছবিটিকে ওপেনএণ্ডেড করেই
রাখতে চেয়েছেন। তবে তাঁর পরিচালনায়
গোয়েন্দা ছবির মত উত্তেজনা বেশী,
বক্তব্যও সুগভীর নয়। এ ধরনের ছবি
তৈরীতে কোস্তা গাভাস অনেক নিপুণ,
কৌশলী ও পরিচ্ছন্ন।

বহু কাঙ্ক্ষিত ইস্তভান সজাবোর
'...অ্যাপেস্ট টেলস' নিরাশ না করলেও আশা
পূরণ করতে পারে নি। একটি পুরোন
পরিত্যক্ত ট্রাম ছবিটির নায়ক। তাকে
ঘিরেই অনেকগুলি চরিত্র। সবাই-ই চায়
ট্রামটিকে শহরে নিয়ে যেতে: যাত্রাপথেই
চরিত্রগুলি নিজেদের মুখোসগুলি খুলতে
শুরু করে। কেউ থাকে প্রেম নিয়ে ব্যস্ত,
কেউ ব্যায়াম চর্চায়, কেউ বা ট্রামটিকে রং
করতে। ট্রামটি এক সময় পৃথিবীর আকার
নেয়, প্রতীকি হয়ে দাঁড়ায় নায়ক। খুবই
সাধারণ শ্রেণীর ছবি এটি। পরিচালনার
কোন বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে না।

দ্বিতীয় সপ্তাহে দেখা তিনটি ফ্রান্সের
ছবির মধ্যে উপভোগ্য ছিল ফিলিপ
সাধারণতন্ত্রী জার্মানীর ছবি কাম
প্রিভেনস ওভার দি কান্ট্রি

গ্যালিমের-এর 'মঁসিয়ে পাপা': কিশোরপুত্র ও
পিতার স্নেহ আর ভালবাসার গল্প এটি।
দুজনের দৈনন্দিন জীবনের ছোট্ট ছোট্ট
ঘটনা আর কৌতুক ও সারল্যের ছোঁয়া
লাগানো দৃশ্যগুলি দেখার মত বটে। পরিচ্ছন্ন
চিত্রনাট্য ও সম্পাদনা ছবিটির প্রধান সম্পদ।'
মনকে আবেগে ভিজিয়ে দেবার মত অভিনয়
করেছেন দুই প্রধান ভূমিকায় ক্লদ ব্রাসিউ
ও নিকোলাস রেবু।

জাঁ লুই বার্তোসেলির 'জাস্ট এ
ওম্যান'এর আবেদন হৃদয়ের গভীরে।
নায়িকার আর্তিকে উপলব্ধির মধ্যেই এই
ছবির উপভোগ্যতা। ক্যান্সারের প্রাথমিক
লক্ষণ প্রমাণিত হবার পর ফ্রাঁসোয়া
ছেলে-মেয়ে-স্বামীর সুখের সংসারটিকে
আবার গড়ে তুলতে চায়। তাঁর ক্ষীণ
বিশ্বাস ইচ্ছাশক্তির জোরে হয়ত বা সে
রোগাক্রান্ত নাও হতে পারে: বেপরোয়া
মেয়ে, বাস্তববাদী ছেলে আর স্বামীকে সে
সুখী করতে চায়। পারেও শেষ পর্যন্ত।
পরিচালক বার্তোসেলি পারিবারিক জীবনের
খুঁটিনাটি বাস্তব চিত্রটি সুন্দর ফুটিয়ে
তুলেছেন। এবং ধীরে ধীরে ফ্রাঁসোয়ার
গভীর বেদনা রূপ পেয়েছে পর্দায়। বহিরঙ্গের
এই নাটকীয় গঠন অবশ্যই প্রশংসনীয় আর
প্রশংসা দাবী করতে পারেন অভিনেত্রী অ্যানি
জিরারদো।

তিন নম্বর ছবি পিয়ের গ্রানিয়েরদেফের
'জ্যাক ইন দি বক্স' হল ক্যাথলিক এক
কিশোরের অতিরিক্ত দুষ্টুমি এবং এক
তরুণ সাংবাদিকদের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের
গল্প। কোন কারণেই ছবিটি মনে রাখার মত
নয়।

চীনের একটি ছবি দেখানো হয়েছে
উৎসবে। নাম 'ভিকটরি টু ভিকটরি।' ১৯৪৭-
এর পটভূমিতে মাও-সে-তুং-এর লালফৌজ
ও আমেরিকার অর্থপুষ্ট চিয়াং-কাই-শেক
বাহিনীর আগ্রাসনকারী দলের ছবি এটি।

সিনেমার দিক থেকে একমাত্র ফটোগ্রাফী
ছাড়া দেখার মত কিছু নেই: আশা ছিল
আজকের চীনের কোন ছবি দেখতে পাব।
কিন্তু নিরাশ হতে হল।

থিয়েটার ১৯৭৭ ঃ সালতামামি

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

১৯৭৭ শেষ হল। চলে এল ১৯৭৮। চলে-যাওয়া বছরটায় থিয়েটার জগতে কি ঘটলো, সেদিকে একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

শম্ভু মিত্র এ বছরও কোনো প্রযোজনায় হাত দেন নি। এ বছরটা পুরোই তিনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন। মধ্যে কলকাতায় অল্প কয়েকটি অভিনয় করেছেন—সবই পুরনো নাটকে—রাজা অয়দিপাউস, রাজা, পুতুল খেলা এবং দশচক্র। বেশ কয়েক বছর বাদে আবার তিনি দশচক্র করলেন। বয়স হলেও অভিনয়ে ও শারীরিক সক্ষমতায় এক বিন্দু শৈথিল্যও তাঁর নেই। এটা যেমন আশার কথা, তেমনি দুঃখের কথা এই যে তিনি দীর্ঘকাল নতুন কোন প্রযোজনা করছেন না। তবে এই সময়ে তিনি তাঁর নাটক চাঁদ বণিকের পালা শেষ করেছেন। নাটকটি অনেক দিন ধরে বহুরূপী নাট্য-পত্রিকায় ধারাবাহিক-ভাবে বেরোচছে শেষ দৃশ্যটি এখনও বেরোয় নি। গোটা নাটকটি মাজাঘষাও এই বছরে তিনি শেষ করেছেন এবং বেশ কয়েকটি আসরে পড়ে শুনিয়েছেন। এই নাটকটি বাংলা নাট্যসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। এমন নাটক বাংলায় খুব কমই রচিত হয়েছে। এই নাটক-পাঠ শম্ভু মিত্রের কণ্ঠে যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতার স্বাদ পেয়েছেন। নাটকটির এই শ্রুতিভাষ্য আমাদের আলোড়িত করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিষণ্ণ করেও রেখে যায়—দৃশ্য-ভাষ্য অগোচর রয়ে গেল বলে। যাই হোক, চাঁদ বণিকের পালাট ছাপা চলছে। শীগগিরই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে। শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত শম্ভু মিত্রের নাট্য-বিষয়ক কয়েকটি বকতৃতা টেপ-করা হয়েছে—পরে হয়ত এর অংশ বিশেষ ছাপা হতে পারে।

বহুরূপী এ বছর করেছে কয়েকটি একাংক—পাখি (নির্দেশক — তৃপ্তি মিত্র), আততায়ী (নির্দেশক—রমাপ্রসাদ বণিক) ও বলি (নির্দেশক—অরিজিৎ গুহ)। এখানে আমরা দুজন নতুন নির্দেশক পেলাম। রমাপ্রসাদ খুবই অল্পবয়স্ক এখনও ছাত্র। অরিজিৎ গুহ এর আগে দু বছর ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির হয়ে ওয়াটার-ব্যালে পরিচালনা করলেও বহুরূপীর হয়ে এই তাঁর প্রথম কাজ।

পি এল টি এবার রাজার পালার পরে আর নতুন কিছু করেন নি। মীর। এটির প্রথম অভিনয়—১৯৭৮-তাঁদের পরবর্তী প্রযোজনা—তিতু-এর জানুয়ারিতে। ১৯৭৭ সালে পি এল টি কলকাতায় নিয়মিত সাপ্তাহিক অভিনয় করেছেন। অ্যাকাডেমি হলে সপ্তাহে দুটি দিন তাঁরা নিয়মিত নানা নাটক করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু সময়ই উৎপল দত্ত নাটকগুলিতে অংশ নিতে পারেন নি।

নান্দীকারের এ বছরের একমাত্র প্রযোজনা — ফুটবল। আন্তিগোনেতে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত পরিচালক হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, ফুটবল তাঁকে বাংলার প্রথম সারির নির্দেশক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল।

কেয়া চক্রবর্তীর অকালমৃত্যু নান্দীকারের তথা বাংলার থিয়েটার জগতের বড় দুর্ঘটনা। এই ধাকবা কাটিয়ে উঠে নতুন প্রযোজনা নান্দী-কারের পক্ষে অসম্ভব ছিল। তবে তাদের কৃতিত্বের কথা এই যে তারা খুব তাড়াতাড়ি ফুটবল-এর পুনরা-ভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিল।

নান্দীকারের একাংশ বর্তমানে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নান্দমুখ নামে পৃথক সংগঠন করেছেন। এঁরা করছেন পুরনো নাটক শের আফগান এবং সদাগরের নৌকা। এঁদের পরবর্তী প্রযোজনা পাপপুণ্য — টলস্টয়ের দ্য পাওয়ার অফ ডার্কনেসের ভাবানুবাদ। এই রূপান্তর করেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নান্দীকারের পরবর্তী প্রযোজনা ব্রেশ্‌টের ককেশিয়ান চক্ সার্কল। বাংলা রূপান্তর রুদ্রপ্রসাদ সেন-গুপ্তের।

'ফুটবল', চেতনার 'জগন্নাথ' ও থিয়েটার কম্যুনের 'দানসাগর' সবচেয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এ-বছরে। অরুণ মুখোপাধ্যায়ের শক্তির পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছিলাম, 'জগন্নাথে' তিনি 'মারীচ-সংবাদ'কে অতিক্রম করে অনেক দূর এগিয়েছেন। অরুণবাবু সম্প্রতি কানাডায় একক নাট্য-সফর করে এসেছেন। 'দানসাগর' নীলকণ্ঠ সেন-গুপ্তকে নির্দেশক হিসেব খুব ভালো-ভাবেই প্রতিষ্ঠিত করলো।

'ফুটবল', 'জগন্নাথ' এবং 'দান-সাগর'—তিনটে নাটকই অ-বাংলা সূত্র থেকে আহৃত। ইংরেজী নাটক থেকে 'ফুটবল'—যদিও রুদ্রপ্রসাদ রূপান্ত-রের যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েছেন। লু সুনের 'আ কিউ' এবং প্রেম চন্দের 'কফন' দুটোই গল্প—নাটক নয়। এই গল্প থেকে দুটি নাটককে বার করে আনা খুবই শক্ত কাজ ছিল। এই কাজ দক্ষতার সঙ্গে করেছেন অরুণ মু পাধ্যায় এবং নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত।

নাটকের জন্য অ-বাংলা উৎ মুখাপেক্ষী আমরা এ-বছরেও।

কয়েকটি গ্রুপ অর্থানুকূ জন্যও বিদেশের মুখাপেক্ষী। পশ্চি ইয়োরোপীয় একটি রাষ্ট্রের দূতাবা আনুকূল্য গ্রহণ করছেন কো কোনো দল।

বোম্বাইর ইণ্ডিয়ান ন্যাশ থিয়েটারে সহযোগিতায় থিয় ওয়ার্কশপ করেছেন মনোজ মি মৌলিক নাটক 'নরক গুলজার'। আতিশয্য থাকলেও এ-নাটক জমে নির্দেশনা, অশোক মুখোপাধ্যায় মানিক রায়চৌধুরীর অভিনয় ভালো।

মনোজ মিত্রের অন্য নাটক 'সাজ বাগান' (সুন্দরম প্রযোজিত) নাট কয়েকটি জায়গা খুবই ভালো। খানিকটা অংশ একটু আলগা হ মনোজ মিত্রের অভিনয়ের জন্য কয়েকটি মজাদার পরিস্থিতির নাটকটি ভালো লাগে। এ-নাট নির্দেশক ও মুখ্য অভিনেতা ম মিত্র।

মনোজ মিত্রই এবার সবচেয়ে অভিনীত নাট্যকার। বহুরূপী (পা থিয়েটার ওয়ার্কশপ এবং সুন্দরম্ নাটক অভিনয় ক ...।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থি এবার বেশ কম।

নাট্য-সম্পর্কিত পাঁচখানি প মোটামুটি নিয়মিত বেরিয়েছে—ব রূপী, এপিক থিয়েটার, গণন থিয়েটার বুলেটিন অভিনয়। গ নাট্যদল তাদের ২০ বছর পূর্তি উ লক্ষে একটি স্মারক-পুস্তিকা করেছিল, এবং তার পরেই পু গৌরবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'গন্ধর্ব বিজন ভট্টাচার্য সংখ্যা বেরিয়েছে পু সময়। একটি বড় কাজ করলেন গন্ধ সম্পাদক নৃপেন সাহা।

নাটকের সরগরম কেন্দ্র দূরে, প্রায় নিভৃতে, নিরলস কাজ যাচ্ছেন একজন লোক—বাদল সরক সাধারণ দর্শক তো দূরের থিয়েটারের লোকেরাও অনেকে খবর রাখে না। অথচ বাদলবাবু ক স্কোয়ারের থিয়োসোফিক্যাল সোসাই হলএ প্রায় নিয়মিত অভিনয় যাচ্ছেন—মিছিল, ভোমা, ভাঙা মা

ঠ্য ভারতের ইতিহাস, ত্রিংশ
দী, ক্যাপ্টেন হুররা প্রভৃতি।
কাগজে বিজ্ঞাপন দেন না, ফলে
ক জানতেই পারে না এই নিয়মিত
নয়ের কথা। বড় হলঘরের মধ্যে-
অভিনয় করেন তিনি। চারদিকে
রা বসেন। দৃশ্যসজ্জার বিশেষ
া বালাই নেই। দলবদ্ধ শারীরিক
নয়ের উপর তাঁর জোর। এই
ত্তে করা 'মিছিল' হিন্দীতে
দিত হয়ে (জুলুস) বোম্বাই ও
পতে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত
ছ। বাদলবাবুর খুব গুরুত্বপূর্ণ
ক্ষা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে
ছ—বড় দুঃখের কথা।

বছরের বিয়োগপঞ্জীতে রয়েছে
জনপ্রিয় বটুকদার (জ্যোতিরিন্দ
) নাম। গণনাট্য সংঘের গোড়ার
র লোক তিনি। গানের সঙ্গেই তাঁর
ছিল বেশি কিন্তু 'গণনাট্যে'র
উৎস থেকে বর্তমানের নাট্যপ্রবাহ,
নে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্ব-
। জীবিকার দায়ে দীর্ঘকাল দিল্লি
ার দরুন তিনি খানিকটা বিস্মৃত
গিয়েছিলেন। কয়েক বছর আগে
কাতায় ফিরে নতুন উদ্যমে তিনি
শুরু করেছিলেন। এই সময়ে তাঁর
চয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ বিষ্ণু দে-র

'স্মৃতি-সত্তা ভবিষ্যৎ'-এর সঙ্গীত, আবৃত্তি মাধ্যমে প্রযোজনা। একাধিক গ্রুপ তাদের পরবর্তী প্রযোজনায় তাঁকে সঙ্গীত-নির্দেশকের কাজ করতে অনুরোধ করেছিল।

যাত্রায় পুরো কাজ করছেন শ্যামল ঘোষ, অসিত বসু, পাহাড়ী ভট্টাচার্য, ভদ্রা বসু প্রভৃতি।

কলকাতার হিন্দী থিয়েটার এবছরে বেশ সক্রিয়। তাঁদের উদ্যোগে একাধিক সেমিনার হয়ে গেছে। এ-বছরে কলকাতার হিন্দী প্রযোজনার মধ্যে বোধহয় শ্রেষ্ঠ অনামিকার গোদান। প্রেম চন্দের বিখ্যাত উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন ডঃ প্রতিভা আগরওয়াল। নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়ও করেছেন তিনি। অনামিকা শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা'র নাট্যরূপ দিয়েও অভিনয় করেছেন।

শ্যামানন্দ জালান শুতুরমুর্গ এবং 'এবম্ ইন্দ্রজিৎ' (হিন্দী) পরিচালনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু এবার 'ভালা আওরৎ' (ব্রেশটের নাটক গুড উওম্যান অফ সেটজুয়ান অবলম্বনে) দাঁড়ায়নি। জালান মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশীর মা'র হিন্দী ভাষ্য এর পরে করবেন।

হিন্দী ও বাংলার যোগাযোগ কম—যে যার ধারায় বইছে। কিন্তু এ-বছর দু'জন বাঙালী নির্দেশক—শেখর চট্টোপাধ্যায় ও রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত—দুটি হিন্দী নাটকের নির্দেশক। শেখরবাবুর নাটক অভিনীত হয়েছে ১৯৭৭ এ। রুদ্রপ্রসাদের নাটক ('যখন একা' অর্থাৎ ওয়েস্কারের 'রুটস' অবলম্বনে) ১৯৭৮-এর জানুয়ারিতে হোলো।

১৯৭৮ শুরু হোলো খুবই জোরালোভাবে — সরকার আয়োজিত দুর্গত প্রাণ নাট্যোৎসবের মধ্য দিয়ে। কিন্তু সেই সঙ্গে শুরুতেই দুঃসংবাদ—বিজন ভট্টাচার্যের মৃত্যু।

কিন্তু ১৯৭৭-এর সবথেকে বড় খবর আগের সরকারের বদলে নতুন সরকারের আবির্ভাব। নতুন সরকার একটি থিয়েটার উপদেষ্টা কমিটি করেছেন। এতে বিভিন্ন নাট্যদলের প্রতিনিধি রয়েছেন। এঁদের ওপর প্রচুর আশা করে নাট্যদলগুলি বসে আছে। তাদের আশা ১৯৭৮-এ সফল হোক।

সরকার ও চলচ্চিত্র

বামফ্রন্ট সরকারের বর্তমান বয়েস আট মাস। কোনো মানুষের পক্ষে এই বয়সটা যদিও কিছুই নয়, কিন্তু পাঁচ বছর পরমায়ু বিশিষ্ট একটি মন্ত্রিসভার কাছে এই সময়ের দাম প্রচুর। এই আট মাসের মধ্যে চলচ্চিত্র বিষয়ে সরকারের কিছু ঘোষণা ও কাজ আমাদের চোখে পড়েছে।

১। চলচ্চিত্র নাটক ইত্যাদির জন্য এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি

২ রঙীন ছবির ওপর ছারচার্জ

৩। 'বাংলা ছবি' বিষয়ে একটি সারকুলার অনুমোদনের জন্য দিল্লীতে পাঠানো

৪। 'সতরঞ্জ কী খিলাড়ীর রিলীজ সংক্রান্ত ব্যাপার

৫।চলচ্চিত্র প্রযোজনায় উদ্যোগ

৬। ডকুমেন্টারী ছবি করার জন্য পরিচালকদের পাঠান ইত্যাদি

নাটক বিষয়ে তাঁদের একটা যে উদ্যোগে লক্ষ্য এসেছে, তা হল সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতি নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে আলোচনার সুযোগ করে দেওয়া। এবং বেশ কিছু ভাল নাটক-নৃত্য সঙ্গীত ইত্যাদি পরিবেশনের ব্যবস্থা।

সরকার এই যে সব কাজ করেছেন আমরা তার একটু পর্যালোচনা করতে চাই। মন্ত্রিসভা গঠনের সময় বামফ্রন্ট বলেছিলেন তাঁরা সমালোচনা চান, তবে তা যেন গঠনমূলক হয়। এই সুযোগে আমরা তাই কিছু প্রস্তাব তাঁদের কাছে রাখছি।

১। কয়েক সংখ্যা আগে অমৃতের এই বিভাগে আমরা এ জাতীয় কমিটি সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রেখেছিলাম। এখন দেখা যাচ্ছে, আমরা যা বলেছিলাম, তাই ক্রমশঃ সত্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ মুহূর্তে ঐ কমিটির যে কোন অস্তিত্ব আছে বা থাকলেও তাঁরা যে সক্রিয় কাজ করছেন, এ বিষয়ে তেমন কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। ঘোষিত কমিটির এক সদস্যের সঙ্গে কিছুদিন আগে আমার দেখা হয়েছিল। তাঁকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি বলেছিলেন, আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না মশাই, আমি ওসব জানি-টানি না। কাগজে দেখেছিলাম, ঐ কমিটি থেকে ইতিমধ্যেই কয়েকজন পদত্যাগ

তরুণ মজুমদার পরিচালিত গণদেবতা

করেছেন, কয়েকজন পদত্যাগ করতে চাইছেন। প্রশ্ন, এ জাতীয় কমিটি প্রকৃতই কি কিছু করতে পারে। এ প্রশ্ন দুটো কারণে, এক কমিটির সদস্যরা তাঁদের নানা ব্যস্ততার মধ্যে এরজন্য আলাদা কতটা সময় ব্যয় করতে পারেন এবং দুই, এই কমিটির হাতে কতটা ক্ষমতা আছে ?

২। সরকার রঙীন ছবির ওপর সারচার্জ বসিয়েছেন এই যুক্তিতে যে এখানে একটা কালার্ড ল্যাবোরেটারী করবেন। আমরা এই যুক্তির সঙ্গে একমত না হলেও সারচার্জ বসানোর জন্য আপত্তি করি নি, যেহেতু তা বাংলা ছবির ততখানি ক্ষতি করবে না। রঙীন ছবি সাধারণতঃ আসে বোম্বে বা মাদ্রাজ থেকে। অনেকে মনে করলেন ঐসব ছবির টিকিটের দাম বেশী হলে লোকে নিশ্চয়ই বেশী করে বাংলা ছবি দেখতে যাবে। কিন্তু এভাবে দর্শক বাড়ানো যায় না। সারচার্জ বাড়ানোর পরেও দেখা গেল, ছবির দর্শক যেদিকে যেমন ছিল, ঠিক তেমনি আছে। অবশ্য এই সারচার্জের ব্যাপারে কোন কথাই বলতাম না, যদি না একটা ঘটনা ঘটত। আগে যে টিকেট দু টাকা পাঁচ ছিল, এখন তা হয়েছে দু টাকা পঞ্চান্ন পয়সা। এবং এই যে বাড়তি পয়সা, এ সমস্তই বহন করছেন দর্শক। বুঝলাম না, দর্শক কি এমন দোষ করেছেন যে সম্পূর্ণটাই তাঁদের দিতে হবে। কেন প্রদর্শক, পরিবেশক, প্রযোজক দেবেন না! নাকি রঙীন ছবি দেখা দর্শকের অপরাধ!

৩। শুনেছি দিল্লীতে একটা সারকুলার অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। তাতে পশ্চিমবাংলায় তৈরী ছবিগুলোর জন্য কিছু সুযোগ চাওয়া হয়েছে। এর আগের সরকারও দুটো প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ভাষাভাষির প্রশ্নে দুটোকেই বাতিল করা হয়। এবার মনে হয় সে সম্ভাবনা খুবই কম। কেননা সরকার বহু চিন্তা করে আইনের অনেক গলিঘুঁজি পেরিয়ে এটি রচনা করেছেন। এবং এ যত তাড়াতাড়ি পাশ হয় ততই মঙ্গল।

৪।সতরঞ্জকি খিলাড়ীর রিলিজের ব্যাপারে যে সমস্যা, তা সমাধানের জন্য কিছুদিন আগে সরকার আন্তরিক চেষ্টা করেছিলেন। এই মুহূর্তে ঐ প্রচেষ্টার কোন ফলাফলের সংবাদ আমাদের কাছে নেই। সরকার এক্ষেত্রে সফল, না ব্যর্থ সে প্রশ্ন এখানে নয়, আমাদের শুধু একা সত্যজিৎ রায় কেন ? আরো যেসব ছবি বছরের পর বছর মুক্তি পাচ্ছে না, শুধু সুদের টাকা গুনছে, তাদের বিষয়ে সরকার কি ভাবছেন ?

৫। কয়েকদিন আগে কাগজে দেখলাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার তিনটি চলচ্চিত্র প্রযোজনা করবেন; পরিচালনা করবেন সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন ও উৎপল দত্ত। এ এক আশ্চর্য ঘোষণা। পরিচালক হিসেবে সত্যজিৎ রায়ের কুশলতা কোন প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে না। তিনি আমাদের প্রত্যেকের শ্রদ্ধেয়। অনেক প্রযোজক তাঁদের দিয়ে ছবি করানোর জন্য উন্মুখ। 'পথের পাঁচালী'র পরবর্তীকাল থেকে এই পর্যন্ত এমন কোন সংবাদ নেই যে তিনি প্রযোজকের অভাবে বা টাকার অভাবে ছবি করতে পারছেন না। তাঁর ছবি 'সতরঞ্জ কি খিলাড়ী'তে খরচ হয়েছে চল্লিশ লাখেরও বেশি টাকা। কিছুদিন আগে কাগজে তাঁর একটি ছবি শুরুর কথা শুনলাম। তাহলে তিনি তো প্রযোজক পাচ্ছেন, তিনি তো বসে নেই। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হয়ে তিনি এর আগেও পরিচালনা করেছেন। তাঁর ছবির জন্য যে টাকা সরকার দেবেন, তা কি সেই সব পরিচালকদের দেওয়া যেত না, যাঁরা টাকার জন্য ছবি করতে পারছেন না। বাংলা ভাষায় গঙ্গা, পালংক, একই অঙ্গে এত রূপ, বিলেত ফেরত, দিবারাত্রির কাব্য প্রভৃতি ছবি হয়েছে। এবং এই সব ছবির স্রষ্টারা এখনো এই শহরে বর্তমান। এঁরা কেউ টাকার জন্য ছবি করতে পারছেন না। অথচ সরকার এঁদের ডাকলেন না কেন অন্য পরিচালক মৃণাল সেন সম্পর্কে আমাদের কোন বক্তব্য নেই। তিনি ১৯৭২ থেকে বাইরের কোন প্রযোজক পাননি, নিজে ধার-দেনা করে ছবি করছেন এবং অনেকদিন হল প্রযোজকের অভাবে বাংলা ছবি করতে পারছেন না। তাঁকে সরকারের আমন্ত্রণ আমরাও সমর্থন করি।

আরেকজন পরিচালক উৎপল দত্ত। উৎপল দত্ত মূলতঃ নাট্যকার ও নাট্য পরিচালক। অবশ্য অনেক আগে তিনি ঘুম ভাঙার গান ও মেঘ নামে দুটো ছবি পরিচালনা

লেন। এবং বর্তমানে বোম্বাই ও চিত্রের এক ব্যস্ততম শিল্পী। শিল্পী চালক হিসেবে উৎপল দত্ত কি, আমরা বতর্কে নিজেদের জড়াতে চাই না। ধরেই নিলাম তিনি ভাল ছবি করকিন্তু প্রশ্ন হল এতদিন তাহলে তিনি রেন নি কেন? তিনি টাকা পাননি, বি করতে গেলেই টাকা পেতেন না, টো কথাই তাঁর ক্ষেত্রে আসে না। ই বাংলা ও মাদ্রাজের ছবি থেকে তিনি য় করেন, তাতে ইচ্ছে থাকলে বছরে ক ছবি প্রযোজনা ও পরিচালনা করতে ন। তিনি ছবি করতে চাইলে অনেক কই টাকা নিয়ে হাজির হত। বুঝতে ম না, এতদিন যিনি নিজে ছবি করার চেষ্টাই করেন নি, তাঁ র ক্ষেত্রে সর- এই দাক্ষিণ্য কেন! সরকার যদি নতুন চলচ্চিত্রকারকে সুযোগ দেওয়ার কথা থাকেন, তাহলে এদেশে কি সেরকম শালী পরিচালকের অভাব? অনেক শালী তরুণ ছবি করার জন্য হন্যে হয়ে ন, অনেকে ছবি শুরু করে শেষ করতে ন না, অনেকের প্রথম ছবি হয়েছে, ে দ্বিতীয় ছবি হচ্ছে না—এর সব মূলে টাকা। বড় আশ্চর্য লাগল, র এদের দিকে তাকালেন না, অথচ চিত্রকে যদি কেউ পুনরুজ্জীবিত পারেন, তাহলে তা ঐ তরুণেরাই, টাকার জন্য ছবি করতে চান না, চান র জন্য।

। দায়িত্ব নেওয়ার পরে ডকুমেন্টারী ও রীলের ব্যাপারে সরকার একটা প্যানেল ত করেছেন এবং ঐ প্যানেল সম্পর্কে হূর্তেই নানা প্রশ্ন তোলা যায়, আমরা সেদিকে যাচ্ছি না, বছর কয়েক পরে করে এই প্যানেলও বা কম কি। আমরা রাখি, এবার নিশ্চয় বেশ কিছু ভাল চত্র দেখতে পাব।

নাটক বিষয়ে একটা কথা না বললেই অনেক দিন চলার পরে একটা নাটক বন্ধ হতে যাচ্ছিল। দর্শক বা জন- গণের মধ্যে সেই নাটক সম্পর্কে আর ব কোন আগ্রহই ছিল না। কিন্তু রের হঠাৎ কিছু বক্তব্যে শুরু হল র্ক, ফলে নাটকটি আবার প্রচারের সুযোগ , এই বিতর্কই তাকে নতুন করে বাঁচার াগ করে দিল।

দ্বিতীয় দফায় নাটকটি বন্ধ করার আইনতঃ চেষ্টা হয়, এবং ঐ আইনেরই দিয়ে নাটকটি বেরিয়ে আসে। এই তাকে দেয় আরো বেশি প্রচার, যা তাকে ন করে বেশ কিছু দিন বেঁচে থাকার াগ করে দিল। আমার মতে সরকারের পদক্ষেপই এজন্য দায়ী।

নাটক নিয়ে সরকারের এই মুহূর্তে ক কিছু করার আছে। পূর্বতন সরকার কর ওপর থেকে প্রমোদকর তুলে নিয়ে- । কিন্তু তাতে নাট্যদল বা দর্শক কোন [illegible]

বুদ্ধদেবের দূরত্বে মমতাশংকর ও প্রদীপ মুখোপাধ্যায়

দাম যা ছিল তাই আছে, অন্যদিকে গ্রুপ-গুলোর ক্ষতির পরিমাণও একই। নাটকের জন্য যে দুটো বিভাগে সবচেয়ে বেশি ব্যয় হয় তার একটি হল, অন্যটি প্রচার। আমার মতে ৩।৪ শ' আসনযুক্ত হল যদি বেশ কিছু থাকত, তাহলে এর কিছুটা সুরাহা হতে পারত। ৩।৪ শ' দর্শকের জন্য প্রচারও যেমন বেশি লাগত না, হলের ভাড়াও তেমনি কম হত ও সেই সঙ্গে অন্যান্য হল মালিকরাও ভাড়া কমাতে বাধ্য হতেন। এখন হলের সংখ্যা এত কম যে যে-কোন ভাড়াতেই গ্রুপগুলো সেখানে যেতে বাধ্য হয়।

চলচ্চিত্রের ব্যাপারে আমাদের চারটি প্রস্তাব আছে।

১। সরকারী কর্তৃত্বে কিছু হলের ব্যবস্থা করা। কেননা আজকের চলচ্চিত্রের নিয়ামক সত্যজিৎ রায় বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মতো ব্যক্তিরা নন, নিয়ন্ত্রণ করছেন কিছু পরিবেশক ও প্রদর্শক। সরকার যতদিন না পরিবেশনার মধ্যে আসতে পারবেন অথবা পরিবেশনার ওপরে কড়া নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবেন ততদিন চলচ্চিত্র কালো টাকা ও বাস্তুঘুঘুদের আড্ডা হয়ে থাকবে। নতুন পরিচালক আসবে না, ভাল ছবি হবে না।

২। প্রযোজক হিসেবে এই শিল্পে সরকারের আরো বেশি পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা উচিত। এ পর্যন্ত এই শিল্পমাধ্যম বিনা নিয়োগেই সরকারকে অনেক মুনাফা দিয়েছে ও দিচ্ছে। তাই এর জন্য কিছু করাও কর্তব্য। এবং প্রযোজক হিসেবে দায়িত্ব নতুনদের অগ্রাধিকার দেওয়া ও পুরোনো-দের মধ্যে যাঁরা ক্ষমতাশালী অথচ টাকার জন্য ছবি করতে পারছেন না, তাঁদের সুযোগ করে দেওয়া।

৩। সেন্সার ডেট অনুযায়ী ছবি [illegible] কোন ছবি '৭৬-এর জানুয়ারিতে সেন্সার সার্টিফিকেট পেয়েছে, অথচ এখনো মুক্তি পায়নি, আবার কোন ছবি এই '৭৮-এর জানুয়ারিতে সার্টিফিকেট পেয়ে মার্চে মুক্তি পাচ্ছে। এর মূলে আছে অর্থ ও ব্যক্তিগত প্রভাব। এই অনিয়মে বিশৃংখলা বাড়ে, অবিশ্বাস হতাশা আসে। সরকারের এ বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

৪। চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত কর্মী ও কলাকুশলীরা যাতে ভালভাবে বাঁচতে পারে, তার ব্যবস্থা করা।

বিকাশ জানা

বুদ্ধদেবের তথ্যচিত্র

কিছুদিন আগে ঋত্বিক ঘটক মারা গেছেন। সত্যজিৎ এবং মৃণাল সেনও যেন ইদানীং বাংলা ছবির চেয়ে সর্বভারতীয় ছবির কথাই একটু বেশী করে ভাবতে শুরু করেছেন। অন্যদিকে দায়িত্ববান তরুণ চিত্র পরিচালকরাই বা কোথায়? এরকম অবস্থায় বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ারই কথা। কিন্তু আশার কথা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি এক্ষেত্রেও একটি পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। যাঁরা বাংলা কবিতা সম্পর্কে কিছুমাত্র খোঁজ রাখেন বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের নাম তাঁদের ভালো-ভাবেই চেনা। এককালে সিটি কলেজে অর্থ-নীতির অধ্যাপক এই শক্তিমান তরুণ কবি চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও অপরিচিত নন। তাঁর খ্যাতনামা 'ক্ষীরোদ নট্ট' এই ডকুমেন্টারি ১৯৭৬ সালের শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র হিসেবে পুরস্কার পায়। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি একটু নতুন পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনী-চিত্র 'দূরত্ব' শুরু করেছেন। এখন দূরত্ব ছবির কাজ প্রায় শেষ। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বন করে এই ছবি। তরুণ বুদ্ধিজীবীর বিশ্বাস ও তার সংকটের গল্প বলা হয়েছে এখানে। [illegible]

মমতা শংকর, প্রদীপ মুখোপাধ্যায়। এছাড়া বিজন ভট্টাচার্য এবং নিরঞ্জন রায়কেও দুটি বিশিষ্ট চরিত্রে দেখা যাবে। চিত্র গ্রহণ করেছেন রণজিৎ রায়। সম্পাদনা : মৃন্ময় চক্রবর্তী।

ছদ্মবেশী

ব্রেখটীয় পদ্ধতির নামে ঢাকঢোল পিটিয়ে আসর জমানো নাটক কিংবা অবহেলিত যুবসমাজের জন্য সমবেদনা আদায় কিংবা ক্ষেতমজুরদের স্বার্থে হাস্যকর সংলাপ-সম্বলিত নাটক করার প্রচণ্ড প্রবণতা, দাদাদের দেখে দেখে, ইদানীং কিছু অফিস ক্লাবের মধ্যেও লক্ষ্য করা গিয়েছে। ধন্যবাদ ইনক্যাব রিক্রিয়েশন ক্লাবকে, যারা ২ জানুয়ারি সন্ধ্যায় কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে ঐ পথ পরিহার করে বেছে নিয়েছেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ছদ্মবেশী'। যার নায়ক সদ্য-বিবাহিত বটানির অধ্যাপক অবনীশ, এলাহাবাদে বড় শ্যালিকার নিমন্ত্রণ পেয়ে মোটর ড্রাইভারের ছদ্মবেশে সেখানে যায় এবং চাকরি নেয়। এরপর থেকে ক্রমে ওঠে নাটক এবং ঘটতে থাকে নানান কাণ্ড। কোনো বক্তব্য নেই। অথচ আছে প্রাণখুলে হাসবার অসংখ্য উপাদান। এটা কি কিছু কম হল? নির্ভেজাল এই হাসির নাটক নির্ভুল রাখার জন্য প্রতিটি অভিনেতা-অভিনেত্রীই জাগ্রত ছিলেন। যদিও কেউ কেউ নিজের অজান্তে একই সংলাপ একই সময়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বারবার বলেছেন। যেহেতু ঐ সংলাপে প্রথমবার দর্শক হেসেছেন। অভিনয়ের দিক থেকে প্রশংসার দাবি রাখেন সকলেই, বিশেষ করে ফিজিক্সের অধ্যাপকরূপী শ্রীজগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছোট্ট একফোঁটা চরিত্র। অভিনয়ের গুণে অপূর্ব। **নির্মলকুমার দাস**

ব্রতচারী শিবির

বাংলার ব্রতচারী সমিতির পরিচালনায় ঊনবিংশতিতম নিখিল বঙ্গ পূর্ণাঙ্গ ব্রতচারী শিবির সম্প্রতি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ক্যানিং অঞ্চলে তালদি মোহনচাঁদ হাই স্কুল ও সুরবালা শিক্ষায়তনে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্ম-শিক্ষা, শারীরশিক্ষা ও সমাজসেবার সম্পূর্ণ শিক্ষাসূচীসহ মূল ব্রতচারী প্রশিক্ষণ এই শিবিরে তিনশতাধিক শিক্ষকশিক্ষিকা ও সংগঠন প্রতিনিধিদের দেওয়া হয়। সমগ্র পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শিক্ষার্থী এই শিবিরে সম্পূর্ণ শিক্ষা গ্রহণের পর এক মনোজ্ঞ অভিপ্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রমন্ত্রী (শিক্ষা) শ্রীআব্দুল বারি পৌরোহিত্য করেন। শিবির উপলক্ষে আয়োজিত লোকশিল্পকলা ও হস্তশিল্প এবং গ্রামীণ বিজ্ঞানের প্রদর্শনীতে প্রচুর দর্শক সমাগম হয়।
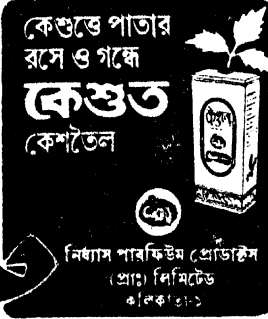
স্বজন বিয়োগ / কালিদাস মুখার্জি

আমাদের সতের বছরের সঙ্গী শ্রীকালিদাস মুখার্জি অকস্মাৎ চলে গেলেন। এই দীর্ঘ সময় তিনি আন্তরিক স্নেহ ও সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের প্রকাশনব্যবস্থাকে সজীব রেখেছিলেন। অতুলনীয় কর্মীমানুষ হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল সুবিদিত। অনেক অসুবিধার মধ্য দিয়ে চলতে গিয়ে প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর প্রাণবন্ত প্রেরণা আমাদের উৎসাহ দিয়েছে। নবীন কর্মীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল মধুর। সকলকে প্রিয় করে নেওয়ার যে দুর্লভ গুণ তাঁর মধ্যে আমরা দেখেছি, সাধারণত তা বিরল।

গত শনিবার ৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা নাগাদ তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

শোক সংবাদ

যুগান্তর পত্রিকার প্রেস বিভাগের প্রবীণ কর্মী শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ রায় গত ২৩ জানুয়ারী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মেদিনীপুর জেলার নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৮ বছর। তিনি স্ত্রী ও একমাত্র ছেলে রেখে গেছেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

১৭ বর্ষ
৪২ সংখ্যা
২৬ ফাল্গুন
১৩৮৪
10 March. 1978

প্রচ্ছদকাহিনী

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী
পরমাণুশক্তি : ভারত ও চীন

অসীম রায়ের গল্প

সংস্কৃতির নতুন পথ

কলকাতা শহরে বিদ্যুতের আলো বন্ধ হয়, কিন্তু সংস্কৃতির আলো এখনো দেখা যাচ্ছে অনির্বাণ। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য এবং এশিয়া ও ইউরোপের কয়েকটি দেশ থেকে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিরা কলকাতায় এসে অনুষ্ঠান করেছেন। সেইসব আয়োজনে কলকাতাবাসীরা যে উৎসাহ নিয়ে সাড়া দিয়েছেন তাতেই প্রমাণ হয়, সাংস্কৃতিক ব্যাপারে শিক্ষিত বাঙালিরা এখনো কতো জীবন্ত।

প্রথমে কাশ্মীরের শিল্প প্রদর্শনী ও নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান। তারপর এল ওড়িষ্যা থেকে বিভিন্নমুখী সংস্কৃতি-চর্চার নিদর্শন। মার্গ সঙ্গীত, ওড়িষী নৃত্য এবং লোকসঙ্গীত ও লৌকিক নৃত্যকলার সেই প্রযোজনাগুলি অপূর্ব বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। পরবর্তী পর্যায়ে পাওয়া গেল ভিয়েতনামের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলকে। তাঁদের নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান থেকে আবিষ্কার করা গেল ভারতের সঙ্গে সেই দেশের আত্মিক যোগ কতো নিবিড়। আর চেক সঙ্গীতশিল্পীদের আগমনে বোঝা গেল, যে দেশ সংস্কৃতির বিষয়ে সচেতন তার আত্মার আত্মীয় রয়েছে পৃথিবীর সমস্ত দেশেই।

এই পটভূমিতে বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয়, বিশেষ করে লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের অবদান, দেশবিদেশে কতোটা এবং কীভাবে প্রচারিত হয়, সে বিষয়েও ভেবে দেখা দরকার। পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্য যে ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে দেখানো হয়েছে, এবং বর্তমানেও প্রদর্শিত হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ায়, তা হয়তো অনেকেই জানেন। কিন্তু যা জানা যায় নি তা হল, বঙ্গ সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের বিশেষ করে তার লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের, কোনো সুপরিকল্পিত অনুষ্ঠান ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এবং বহির্ভারতের নানা দেশে দেখানো হয়েছে কিনা।

যদি তা না হয়ে থাকে, অবিলম্বে তার ব্যবস্থা করা দরকার। না হলে আদান এবং প্রদানের ভেতর দিয়ে সহযোগিতার ভিত্তি তৈরি না হয়ে আমরা হয়ে থাকব শুধুই মাত্র খাতক অথচ ভালোবাসার হাত প্রসারিত রয়েছে আমাদের দরজা পর্যন্ত।

প্রচ্ছদের নেপথ্যে : গোপাল সান্যাল : ইন্ডিয়ান কলেজ অফ আর্ট এ্যান্ড ড্রাফট-ম্যানশীপ-এর শিক্ষক গোপাল সান্যাল কলকাতার একজন স্বীকৃত শিল্পী। রং তুলির চেয়ে ছবি আঁকার চেয়ে রেখাঙ্কনের দিকেই আগ্রহ বেশী। ছবি আঁকার কাজেও যে গোপাল বাবুর দক্ষতা কম নয় তা তাঁর পরিটিক রেক 'পেইনটিং'-এর কাজ দেখলেই বোঝা যায়। অনুভূতি প্রকাশের প্রয়োজনে ফর্ম ভাঙায় গোপাল সান্যাল যথেষ্ট দুঃসাহসী। লোক শিল্পের সারল্য এবং সেজানিয়ান ছবির সফিস্টিকেশন দুই মিলে তাঁর শিল্পকর্মে শুধু প্রাচ্য-পাশ্চাত্যেরই মিলন ঘটায় নি—প্রাচীন এবং বর্তমানেরও যোগাযোগ ঘটিয়েছে।

সাহিত্য ইত্যাদি...

নাটক এবং বাংলা সাহিত্য

জর্জ বার্নার্ড শ' ছিলেন খ্যাতনামা নাট্যকার। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঔপন্যাসিক। কিন্তু শ' তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু করেন উপন্যাস দিয়ে। আর তারাশঙ্করবাবুর স্বপ্ন ছিল, নাটক লিখবেন।

পাঁচ ছ'টি উপন্যাস লেখার পর শ' তাঁর চল্লিশ বছর বয়সে আবিষ্কার করেন, লেখক হিসাবে দাগ কাটা তো ভাল আঁচড়-টুকুও কাটতে পারেননি। পথ পাল্টে তিনি নাটকের দিকে যান। এবং যাকে বলে, ইনস্ট্যান্ট সাকসেস, তাই। নাট্যলক্ষ্মী তাঁকে রাজপাটে বসালেন। আর তারাশঙ্করবাবু? হ্যাঁ তিনিও নাটক লিখতে শুরু করেন বই কি। এবং সে নাটক শ'য়ের উপন্যাসের মতো বাক্সবন্দী থাকে নি, মঞ্চস্থ হয়ে খ্যাতিও পেয়েছে। কিন্তু আমাদের বরাতগুণে তারাশঙ্কর তাতে মনপ্রাণ সঁপে দেন নি। ফিরে এসেছেন গল্প-উপন্যাসের দিকে। আর তাই আমরা পেয়েছি অত বড় লেখক। নয়তো নাটক লিখতেন তিনি, পয়সা পেতেন, নামও পেতেন। কিন্তু সাহিত্যের দরবারে থাকতেন বেশ খানিকটা বাইরের মানুষ হয়ে। যেমন ধরা যাক রয়ে গেছেন আমাদের শচীন সেনগুপ্ত।

অথচ তথ্য এই যে, নাটুকে রাম-নারায়ণ ছিলেন বাঙালি। আর বাঙালি মাত্রেই বোধহয় অল্পবিস্তর নাটুকে। শুধু জীবনযাপনে মেলোড্রামা তৈরি করার ব্যাপারে নয়। নাটক লেখা আর নাটক করার দিকেও ঝোঁক তাঁদের মজ্জাগত। অন্তত একশ বছরের সাহিত্যিক ইতিহাস ঘাঁটলে সেই কথাটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

খুঁটিনাটি আলোচনার মধ্যে না গিয়ে আমাদের জানা খবরগুলোকেই ঝালিয়ে নেওয়া যাক আগে।

তারাশঙ্করবাবু নাটক লিখেছেন, সকলেই তা জানেন। কিন্তু অভিনয় করেছেন সেটা জানেন? করেছেন। নারায়ণ গাঙ্গুলির 'ভাড়াটে চাই' নাটকে বোধহয় রাহুভত্ত্যের পার্ট করেছিলেন একবার। এবং ভালোই করেছিলেন। অভিনয় করেছেন বুদ্ধদেববাবুও। রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' নাটকের অভিনয় করেছিলেন সাহিত্যিকরা। 'ওভারটুন' হলের সেই অভিনয়ে ভূমিকা ছিল বুদ্ধদেববাবুরও।

আর শুধু তাই নয়। মানুষ হিসেবে বুদ্ধদেববাবু বেশ একটু মুখচোরা ছিলেন বটে। জীবনের যে কোনো ব্যাপারে হুড়িঘড়ি মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ফুটলাইটের মুখোমুখী হওয়াও ছিল তাঁর স্বভাবের বাইরে। কিন্তু নাটকের দিকে ঝোঁক ছিল তাঁরও চোখে পড়ার মতো।

সকলেই জানেন, একাডেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি কাব্যনাটকের জন্যে। আর তার পর থেকে নাটক লিখেছেন তিনি অনেকগুলো। কিন্তু এসবেরও আগে দ্বিতীয় যুদ্ধ যখন শেষ হবার দিকে, তখনই লিখেছিলেন তিনি তাঁর প্রথম নাটক। অবিশ্যি আসল নাটক নয়, তাঁর 'কালো হাওয়া' উপন্যাস থেকে নেওয়া। কিন্তু এতেই খুশি হয়েছিলেন তিনি সেই নাট্যরূপে যে 'কবিতা ভবনে'র ব্যানারে তার অভিনয়েরও ব্যবস্থা করেছিলেন।

সত্যি সে এক কাণ্ডই হয়েছিল বটে। বুদ্ধদেববাবু নিজে নামেন নি তাতে, কিন্তু নেমেছিলেন তাঁর স্ত্রী প্রতিভা বসু। (তখনও অবিশ্যি তিনি নামকরা সাহিত্যিকা হন নি।) ছিলেন কবি অজিত দত্তের স্ত্রী, সুধীরঞ্জন মুখুজ্যে, বুদ্ধদেব-বাবুর শ্যালক বাহাদুরবাবু, এখনকার খ্যাতনামা ফিল্ম ডিরেক্টার প্রভাত মুখুজ্যে, এবং এইরকমই সব তরুণতরুণী। দিনের পর দিন এই এমেচার শিল্পীদের নিয়ে কী অধ্যাবসায় নিয়েই না রিহার্সেল দেওয়াতেন বুদ্ধদেববাবু। মনেই হত না যে তিনিও ছিলেন একজন এমেচার ডিরেক্টার।

তারপর যথাকালে একদিন অভিনয় হল সে নাটকের। কাগজে কাগজে ভালো-মন্দ লিখল। দ্বিতীয় দফাতেও অভিনয় হল তার। কিন্তু তারপর কী হল? ফলশ্রুতির ঘরে ঢেরা। বুদ্ধদেববাবুর লেখা সুবৃহৎ সাহিত্য সংসারে 'মায়ামালঞ্চ' নামে সেই নাটকের ঠাঁই যদি হয় তো নেহাতই সে এক গরিব আত্মীয় হিসেবে।

বুদ্ধদেববাবুর কাব্যনাটকগুলোর বিষয়ে অবিশ্যি এ মন্তব্য খাটে না। 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' ইত্যাদি সাহিত্যের তালিকায় অবাঞ্ছিত নয়, খ্যাতিরের সঙ্গেই ঠাঁই পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু এসব রচনা সংলাপকবিতা হিসেবে যতোই পাঠযোগ্য হোক, নাটকের দিক থেকে ততোটা উৎরেছে কিনা বলা শক্ত।

অন্যদিকে আবার দেখা যাচ্ছে, বাঙালি কবিসাহিত্যিকেরা মঞ্চসফল নাটক যতোবারই লিখেছেন, ততোবারই তা হয়েছে সাহিত্যের বিচারে নিরেস। যেমন ধরুন মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' বা 'শর্মিষ্ঠা'। এমন কি তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতা' বা 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' নামে প্রহসন দুটিও। আলাদাভাবে দেখলে এসব লেখার বিষয়ে কৃতজ্ঞ বোধ করাই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু যখ[ন] আমরা ভাবি, এই লেখকই রচনা করে[ছে]ন 'মেঘনাদ বধ' কাব্য এবং সনেটগুলোর ম[তো] পরমাশ্চর্য কবিতা, তখন স্বীকার কর[তে] হয়, কবিতার তুলনায় নাট্যকার মধুসূ[দন] একজন তৃতীয় শ্রেণীর লেখক।

উনিশ শতকের একমাত্র নাট্যকা[র] এবংশ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন দীনবন্ধু মি[ত্র।] তাঁর 'সধবার একাদশী' অসামান্য নাটক স্বনামধন্য 'নীলদর্পণ'ও খুবই উল্লে[খ] করার মতো। কিন্তু দীনবন্ধুর আগে এ[বং] পরে ডজন-ডজন যেসব নাট্য-যশঃপ্রার্থ[ী] ভিড় করেছিলেন বাংলার সাহিত্য জগতে মনে তাঁদের সমাজসেবার আগ্রহ ছি[ল] যে পরিমাণে, কলমে তাঁদের সে পরিম[াণ] ক্ষমতা ছিল না।

মহাকবি গিরীশচন্দ্র এবং ডি, এ[ল] রায়ের (সেই নামেই তিনি তো বে[শি] পরিচিত, তাই না।) কথা মনে রেখে বলা হচ্ছে একথা। ভালো কিছু তাঁ[রা] লেখেন নি, তা নয়। থিয়েটারের দিক দি[য়ে] সত্যিই হয়তো ভালো নাটক তৈরি ক[রে] গেছেন তাঁরা। কিন্তু কবি মধুসূদ[ন] ঔপন্যাসিক বঙ্কিম এবং নাট্যকার দীনবন্ধু[র] কথা মনে রাখলে কবুল করতেই হ[বে] সাহিত্যিক গুণে তাঁদের রচনাগুলো ছি[ল] দ্বিতীয় শ্রেণীর জিনিস। এবং কেবল ত[াই] নয়, বেশির ভাগই 'ভেরিভোটিড' লেখ[া] অর্থাৎ দত্তক নেওয়া ছেলে, নিজের নয়।

যাই হোক, ক্রমশঃ অনেক হ[ল।] মোট কথা, উনিশ শতকে সত্যিকারে ভালো নাটক লিখেছেন একজনই। এ[ই] বিশ শতকেও একজন।

তিনি রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী' বিশ শতকের সব থেকে শ্রেষ্ঠ নাটক এ যুগের এক নির্মম বাস্তবতাকে এম[ন] সার্থক প্রতীকের মারফৎ হাজির ক[রা] সত্যিকারের একজন বড় নাট্যকারের পক্ষে সম্ভব। এবং রবীন্দ্রনাথ সে ব্যাপা[রে] লক্ষ্যভেদ করেছেন। যন্ত্র ও যান্ত্রি[ক] পীড়নের বিরুদ্ধে মানবিক হৃদয়ে[র] প্রতিবাদ 'রক্তকরবী'কে মহৎ নাট[কে] উত্তীর্ণ করে দিয়েছে। শুধু পড়ার ম[তো] নাটক হিসেবে নয়, মঞ্চে নামানোর ম[তো] মতো নাটক হিসেবেও। সেটা বোঝা গে[ল] 'বহুরূপী'র প্রযোজনা থেকে। ক[বি] রবীন্দ্রনাথই দেখা গেল শ্রেষ্ঠ বাঙা[লি] নাট্যকার।

কিন্তু মুশকিল এই যে, আম[রা] বাঙালিরা তাঁকে কবি হিসেবে খ্যাতি করতে এত বেশি অভ্যস্ত যে, তাঁ[র] নাটকগুলোর দিকে ভালো করে নজর

ম না। দিলে, কবিকে সারাজীবন
ার দল তৈরি করে মিউ এম্পায়ারে শো
হত না। কিম্বা নাট্যাচার্য শিশির-
ারের আগ্রহও 'চিরকুমার সভা'য়
ক থাকত না। কিম্বা 'বিসর্জন'
দি পুরনো ধরনের নাটকের মধ্যেও
হত না শিক্ষিত মানুষদের আগ্রহ।
ক্তকরবী' 'মুক্তধারা' ইত্যাদির দিকেও
পড়ত।
'হয়তো তাহলে আমাদের পেশাদারী
মঞ্চ এমন হতাশজনিতভাবে সেকেলে যুগে
আটকে থাকত না। হয়তো তাহলে একেলে
সাহিত্যিকদের বাজার-চালু উপন্যাসের
নাট্যরূপ দিয়েও খুশি রাখতে হত না
দর্শকদের। বাঙালি লেখকরা কবিতা আর
উপন্যাস লেখার সঙ্গে সঙ্গে নাটকও
লিখতেন। আর সে নাটক জায়গা পেত
সাহিত্যের তালিকাতেও।

কিন্তু 'হয়তো' দিয়ে তো আর
জীবন চলে না। সত্যি কথাটা মেনে নেওয়াই
ভালো, বাঙালি নাট্যকর্মিরা নতুন ধরনের
নাটক করার জনে উন্মুখ হয়ে থাকলেও
বাংলা সাহিত্য এখনো পর্যন্ত বিমুখ।

যে অর্থে জীবনানন্দ দাশ বড় কবি,
কিম্বা বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় বড়
সাহিত্যিক, সে অর্থে রবীন্দ্রনাথের পরে
একজনও বড় নাট্যকার পাইনি আমরা।
এমন কি ভালো নাট্যকারও পাই নি।

মণীন্দ্র রায়

াবৃত্তিও শিল্প

বেদের অপর নাম শ্রুতি, তার অর্থ
াদের কথা ঋষিরা শুনতে পেয়েছিলেন;
র আবৃত্তিকে সর্বশাস্ত্র বুঝে নেবার
প্রধান উপায় মনে করা হত; বার বার
করলে, তা না বুঝে করলেও শব্দের
রের নানা ইঙ্গিত, স্তর ক্রমশ কানের
ধরা পড়ে। 'বোধাদপি গরিয়সী'র
া কি বোঝা শক্ত, বোধে উন্মোচিত
ই বিষয়ের সার্থকতা। তবে একথা ঠিক,
বার একই বিষয় পাঠ করলে বা অপরের
শুনলে শব্দের রহস্য ক্রমশ স্পষ্ট হতে
; কবির সঙ্গে শ্রোতার ঘটে হৃদয়ের
র্, বুদ্ধির আত্মীয়তা।

পথের পাশে দাঁড়িয়ে কবির উদাত্ত
তিন দিন হলে শেষ হয়ে গেছে। আর
কবির দল গান গেয়ে ঘুমিয়ে থাকা
াসীকে জাগাবার দায়িত্ব ভুলে গেছেন
এমন কথকের দিনও নেই। কবিরা রাজ-
বসে রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্য রচনা
না। সুতরাং শ্রোতা নেই তার চোখের
া কে খুশী হলেন, কোন রাজকন্যা
থেকে মালা কবির গলায় পরিয়ে দিলেন,
আর চোখে দেখা যায় না। এখন শ্রোতা
ছন 'পাঠক'। ছাপাখানা এসে কবির সঙ্গে
তার চোখাচোখি দেখার কোমল সম্পর্কটি
করে নিয়েছে। এখন কবিও একা।
ন না তার পাঠককে। পাঠকও জানেন না
প্রিয় কবি কেমন দেখতে, আচরণ কি
তাঁর কল্পনার সঙ্গে মেলে কিনা।

এই একাকীত্ব ঘোচাতে পারে, পাঠক
বির সঙ্গে সম্বন্ধ পাতানোয় সাহায্য করতে
আবৃত্তিকার, কিংবা কবি নিজেই। যে
ট কবি ব্যবহার করেছেন বিশেষ একটি
ত দেবার জন্যে, তা হয়তো পাঠকের
ধরা পড়লো না। শব্দের দাবি চোখের
কানের কাছে বেশী। শব্দের সঙ্গে যে
ত থাকে তা পাঠ ছাড়া ধরা যায় না।
ার সকল গান তবুও তোমাকে লক্ষ্য
.–জীবনানন্দর গলায় এ আবৃত্তি
ছেন যাঁরা তাঁরাই বুঝতে পারেন 'লক্ষ্য
আর লক্ষ্য করে'র পার্থক্য কি। গানকে
রী করে তোলা, সে-ই লক্ষ্য করে—
া বুঝলে কবিতার মহত্তম ইঙ্গিত ধরা
না। কবির কণ্ঠে আবৃত্তি শোনার মূল্য
ন। তিনি কোন্ শব্দে কি ইঙ্গিত করতে
শ্রোতা তা জেনে নেয় সহজে। আবৃত্তি-
দের গলাতেও আমি কবির স্বর শুনতে
পাই। শুধু তাঁদেরই কাছে পাচ্ছি যাঁরা
কবিতাটি বোঝেন, শব্দের অনুষঙ্গ, স্তর যার
সংবেদনশীল মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলত,
আবৃত্তিকার হয়ে ওঠেন কবি, কেননা তিনি
কবিতাটির জন্ম মুহূর্তের যন্ত্রণা ও
নৈঃশব্দকে উপলব্ধি করে তা শ্রোতার কানে
পেঁছে দিচ্ছেন।

কলকাতায় এখন আবৃত্তির আসর বসে,
রবীন্দ্র সদনের হাজার টাকার সিট ভরে যায়
শ্রোতার ভিড়ে। আড়াই তিন ঘণ্টার আসর
গভীর মনোযোগে স্তব্ধ। দেবদুলাল বন্দ্যো-
পাধ্যায়ের, অমিয় চট্টোপাধ্যায় প্রদীপ ঘোষ,
নীলাদ্রিশেখর বসু পার্থ ঘোষের নাম শুনেই
টিকিট বিক্রি হয়ে যেতে দেখি। এই কিছু-
দিন আগেও রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তীতে পাড়ায়
পাড়ায় আবৃত্তির প্রতিযোগিতা হত। এখনো
হয়। অনেক শ্রোতাকেই বিরক্তি প্রকাশ করে
উঠে যেতে দেখেছি। শুধু নামী আবৃত্তি-
কারদের ঐশ্বরিক কণ্ঠের ডাকেই শ্রোতারা
সাড়া দেন না, আমি দেখেছি, অপেক্ষাকৃত
তরুণ দীপংকর মজুমদার, বিজয়লক্ষ্মী বর্মণ,
সৌমিত্র মিত্র—এঁদের শ্রোতাও কম নেই।
কয়েক দিন আগে রবীন্দ্রসদনে মহিম ঘোষের
পরিচালনায় সভা হলো। হল কানায় কানায়
ভর্তি। সাড়ে ছটা থেকে সাড়ে নটা। একটানা
আবৃত্তি। অনামী তরুণ-তরুণীর কণ্ঠ।
শ্রোতাদের কোনো চাঞ্চল্য দেখলাম না।
আবার যাদুঘরের একশো বছর পূর্তি উৎসব।
আশুতোষ শতবার্ষিকী হলে সভা হলো ১৭ই
নভেম্বর। ছিমছাম হল পরিপূর্ণ শ্রোতায়।
স্ক্রিপ্ট পড়ছিলেন কিউরেটর শ্যামল
চক্রবর্তী। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়
চট্টোপাধ্যায়, দীপংকর মজুমদার, কাজল
চৌধুরী পাঠ করছিলেন নির্বাচিত কবিতার
অংশ। বাংলা কবিতায় যাদুঘর, প্রত্নপৃথিবী
কিভাবে ছায়া ফেলেছে, এই হলো বিষয়।
অবাক হলাম সমস্ত প্রোগ্রাম খুব সরল
কিছু না হলেও শ্রোতাদের ঔৎসুক্য, স্থৈর্য
দেখে। বোঝা যাচ্ছে, আবৃত্তি আবার কবি
ও শ্রোতার মধ্যে সেতু তৈরী করছে। ধীরে
ধীরে অন্যতম সেরা শিল্প হবে না, কে বলতে
পারে! সব্যসাচী দেবদুলালের, শম্ভু মিত্রের
রেকর্ড কি কম বিক্রী হয়?

তবে, মাঝে মাঝে ভীষণ বিরক্তি ধরে
যায়, যখন যে কবিতাটা খুব সহজভাবে
বোধের গভীর তল থেকে উচ্চারণ করলে
ভালো লাগতো তা হাত-পা ছুঁড়ে ন্যাকা-
ন্যাকা গলায় কেউ পড়তে থাকেন। রবীন্দ্র-
সদনে শাওলি মিত্রের আবৃত্তি শুনে হাসবো
না কাঁদবো, বুঝতে পারিনি একদিন। কারো
কারো গলায় যাত্রার ঢং; কেউ কেউ বড্ড
বেশী হাত নাড়েন, কেউ বা চোখ বুঝে এক
নাগাড়ে কি সব বলে গেল। এসব শ্রোতার
পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। এটা শ্রোতার
সহিষ্ণুতার উপরে চাপ। এটা বন্ধ করতে
হবে। আর মাঝে মাঝে কবিরা যদি অংশ নেন
একই কবিতা আবৃত্তি করা আর— কবি
পাশাপাশি পাঠ করেন কেমন হয়? মনে হয়,
এতে শ্রোতার কাছে ব্যাপারটা আরো সুখের
হতে পারে। আবৃত্তি আর্ট বলে স্বীকৃতি
আছে এদেশে। ইউরোপে এটা অনেকদিনের
অভ্যাস। আমাদেরও অভ্যস্ত করে তুলুন
আবৃত্তি শিল্পীরা, এটা উপরি পাওনা হোক।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

একটি
গল্প সংগ্রহ
সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক
এবং একটি
কিশোর উপন্যাস

.......স্বরূপ মণ্ডল নিভন্ত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার শেষ প্রতিনিধি। স্বরূপ মণ্ডল গ্রাম বাঙলার বিশ্বাস ও আদর্শের শেষ প্রতিনিধি। ....অসীম রায়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমাদেরও শুভেচ্ছা। থাকলো।.....কিশোর কাহিনীটি যে সুপাঠ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই আর তাই জোর দিয়ে বলা যায় যে এই বইটি কিশোরদের মন ভরাতে পারবে।

অমল মুখোপাধ্যায়, তরুণ চৌধুরী এবং সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতামত

বিভূতিভূষণ

একজন গল্পকার বা ঔপন্যাসিক সম্ভবত তাঁর রচিত চরিত্রের মধ্যে যতখানি বেঁচে থাকেন ততখানি অন্য কিছুতে নন। বিশেষত সেই চরিত্র যদি হাসির ফোয়ারায় সূক্ষ্ম কণা আকাশে বাতাসে ছড়াতে ছড়াতে চলে। স্বরূপ মণ্ডল বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের তেমনই এক সৃষ্টি। শুধু তাই নয় স্বরূপ মণ্ডল নিভন্ত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার শেষ সাক্ষী। স্বরূপ মণ্ডল গ্রামবাংলার বিশ্বাস ও আদর্শের শেষ প্রতিনিধি।

স্বরূপ মণ্ডলকে নিয়ে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় দশটি গল্প লিখেছেন। তার মধ্যে আটটি ছোট গল্প এবং দুটি উপন্যাস। এই পর্যায়ের প্রথম গল্পটির নাম 'বিশ্বাস'। প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪২ সালের দোল সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকায়। সবশেষ গল্প 'বিচার' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৪ সালের শারদীয়া যুগান্তরে। স্বরূপ মণ্ডলের সব কথা-র সবগুলিই সংকলিত হয়েছে।

তখন জাপানীদের বোমার ভয়ে দলে দলে লোক কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে। তারই পটভূমিতে রচিত 'বিশ্বাস'। স্বরূপের গল্পের যিনি শ্রোতা (লেখক স্বয়ং-ই বলা চলে) সেই ভদ্রলোক এই সময় কলকাতা ছেড়ে মসনে গ্রামে পালিয়ে এলেন। এখানেই স্বরূপের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটলো। স্বরূপ তাকে শোনালেন সেকালের লোকেদের হিমালয় সদৃশ 'বিশ্বাসের' এই অত্যাশ্চর্য কাহিনীটি।

কাহিনী যেখানে, যে প্রকাশভঙ্গী দিয়ে শুরু হয়েছে রসিকতার জগতে সেই এক্স-প্রেসানটি অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত—স্বরূপ মণ্ডল বলিল, 'নিন্ দাঠাকুর, হুঁকো ধরেছেন।'

এই হুঁকোর ধোঁয়ার সঙ্গে যে গল্প মিশিয়ে চলেছে তা যেমন কৌতুককর তেমনি উপভোগ্য। চরিত্র সৃষ্টি পরিবেশ

বিভূতিভূষণ

রচনা ঘটনার নিখুঁত বুনট এবং সংলাপের আশ্চর্য উজ্জ্বলতা মনে করিয়ে দেয় এই লেখা এক সম্পূর্ণ অন্য ঘরাণার লেখা—যা আজ স্মৃতি মাত্র। অতি আধুনিক সাহিত্যের খাঁ খাঁ ভাবটা আরো বেশী করে কানে লাগিয়ে দেয়।

বিভূতিভূষণকে রাজশেখরের অনুগত অনুগামী বলা হলেও, হাসির গল্পের জগতে তার প্রভাব কোন দিনই ভুলবার নয়। জীবনে যে অসংগতির দিকগুলো তিনি স্বরূপের কাহিনীতে তুলে ধরেছেন তা বুদ্ধি ও বোধের জগতে মৃদু চাপ সৃষ্টি করেই হাসির ফোয়ারা ছুটিয়েছে—কোথাও বিকট হয়ে ওঠেনি। বিভূতিভূষণের প্রত্যেক হাসির গল্পেরই পরিস্থিতি ইউনিক। কিন্তু চরিত্র কখনো কখনো পুনরাবৃত্ত হয়েছে। স্বরূপ মণ্ডল এই ধরনেরই একটি চরিত্র। হুগলী জেলার প্রত্যন্ত মসনে গ্রামের মানুষ সে। ভাষাও তার ঐ অঞ্চলের আকাশা গ্রাম্য ভাষা। মাঝে মাঝে অবশ্য সে শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে—প্রচেষ্টায় ও হাস্যরস সৃষ্টিতে এসব যায়গায় সে মিসেস মেলাপ্রপকেও ছাড়িয়ে গেছে।

স্বরূপ মণ্ডলের মুখ দিয়েই সবগুলো গল্প শুনতে হবে বলেই সম্ভবত বিভূতিভূষণ স্বরূপ মণ্ডলকে প্রথমেই অনবদ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন। আধুনিক শহর কেন্দ্রিক জীবন থেকে বেশ কতকটা দূরে বিশ্বাস অবিশ্বাসের ছায়া ঝিকমিক পরিবেশের অস্পষ্টতার মধ্যে স্বরূপ বসে আছে। তাই স্বরূপের কথা গোগ্রাসে গিলতে পাঠক প্রায় বাধ্য হয়ে পড়বেন।

স্বরূপের পূর্বপুরুষরা বিগত দিনের দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদারের খানসামার কাজ করতো। স্বরূপ নিজেও সেকাজ করেছে অনেক বছর। সেই দিনও নেই সেই জীবনও অপগত। জমিদাররা এখন [illegible] অতীত নয়তো স্মৃতির বিষয়। স্বরূপ [illegible]ন বৃদ্ধ। তার অনন্ত অবসর। আটচালার দাওয়ায় বসে কখনো সে চরকা কাটে, কখনো বাঁশের বাতা চাঁচে। উপচীয়মান তার স্মৃতির ভাণ্ডার। সে ভাণ্ডার ভরে আছে নিজ চোখে দেখা সাধু অসাধু সৎ-অসৎ কত বিচিত্র হরফের চরিত্র—আছে সেই সব মানুষগুলো যাঁদের কাছে সে কাজ করেছে, যাঁদের কাছে শুনেছে অতীততর জীবনের কাহিনী—জমিদারদের কাহিনী, মসনে গ্রামের কাহিনী, সেখানকার নানান ধরনের মানুষের কাহিনী। উপযুক্ত সমজদার শ্রোতা পেলে স্বরূপ মাঝে মাঝে সে ভাণ্ডারের চাবি খোলে।

এখানে লেখকই সেই সমজদার শ্রোতা যিনি আমাদের পরম বিশ্বস্ততার সঙ্গে স্বরূপের বলা গল্পগুলি উপহার দিয়েছেন। এই শ্রোতা যে শুধুমাত্র স্বরূপের ভক্ত তা নয় প্রচ্ছন্নভাবে স্বরূপের প্রতি স্বরূপের দেখা জগতের প্রতি মমতাপ্রবণ। স্বরূপকে তিনি বোঝেন। তাই কোন জায়গায় কি ধরনের ব্যবহারে স্বরূপের গল্পের উৎসমুখ

যাবে তা ভাল করেই জানেন। তাই য় টিকা-টিপ্পনীর কৌশলে স্বরূপের থেকে গল্প আদায় করে নিয়েছেন সহজ তের মত। আবার গল্প বলার তোড়ে প যাতে বে-লাইনে চলে না যায়, গরম করে না-ফেলে সেদিকেও কলকাঠি ছেন লেখক অতি মজাদার উপায়ে।

মোট কথা স্বরূপ মণ্ডল ধরনের একটি র অনর্গল বলার মধ্য দিয়ে গল্প ার যে প্রচেষ্টা বাংলা সাহিত্যে যুদ্ধো-ালে দেখা গিয়েছে তার উৎসধারায় যে বিশিষ্ট সাহিত্যিক বিরাজ করছেন তার বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর প মণ্ডল নিঅন আলোর তলায় বসার ারী। অবজ্ঞায় সুইচ নিবিয়ে দিয়ে ক অস্বীকার করা চলবে, তবে সত্যের তো এক সময় উঠবেই—তখন আর টিক বাতির দরকার হবেনা। সত্য শ হয়ে পড়বে।,

অমল মুখোপাধ্যায়

পে মণ্ডলের সব কথা।
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
জি, ভরদ্বাজ এণ্ড কোং।
২২এ কলেজ রো, কলকাতা-৯।
দাম কুড়ি টাকা।

ীম রায় আর তাঁর পঞ্চাশ বছর

ী অসীম রায় পঞ্চাশ বছর পার করে ন। পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবেরা শুভেচ্ছা বাণী পাঠান। রণ পঞ্চাশ বছর অনেক সময়। এর মধ্যে যুদ্ধে নানা টানা পোড়েন জয়ী হয়ে িকে যান— তাঁকে তাঁর গুণগান র হয় তাঁর বন্ধু-বান্ধব পরিচিত মুখ থেকে।

এই উপলক্ষে চুরাশি পৃষ্ঠার এক ন প্রকাশিত হয়েছে। কভারে হলদে উপর বিভিন্ন বইয়ের প্রচ্ছদের ব্লক িককের মোড়া এই সংকলনটি দুর্লভ রণে যে এই সংকলনটি বিক্রীর জন্যে ডক্টর অমলেন্দু বসু, বিষ্ণু দে, গোপাল ার, নীহাররঞ্জন রায়, লীলা রায়, সুনীল বং অসীম রায়, অসীম রায়ের ছোট-আর উপন্যাস নিয়ে মূলতঃ আলোচনা ন। কবিতা সম্পর্কে লেখকের নিজের সামান্য কথা দেখা যায়। লীলা রায় কবিতা অনুবাদ করেন। অসীম প্রতিকৃতি দুরকমভাবে পাঠককে নার সুযোগ করে দিয়েছেন। সংকলন রার লেন্সে অসীম রায়কে ধরে রেখে-সাবাতে পূর্ণেন্দু পত্রী আর শিল্পী নীরদ দারের স্কেচেও তাঁকে দেখাতে শুভেচ্ছা সম্পুটে'র জন্যে দশ পৃষ্ঠার দেখতে 'একদা ট্রেনে' উপন্যাস থেকে পূর্ব রেলওয়ের বিজ্ঞাপন।

এই পঞ্চাশ বছরে এক ডজন উপন্যাস দুটো কবিতা সংকলন, একটা গল্পের বই একটা নাটকও জার্নালের রচনা, ইংরেজী বাংলা মেশানো অসংখ্য প্রবন্ধ পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। এছাড়া ১৯৪৩ সালে স্কুল জীবনে নবমল্লিকা' নামে একটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছিল। যে বইয়ের 'বিরহী' নামের কবিতাটি 'জোর গলায় পড়ে সংস্কৃত ক্লাসের ডক্টর গোপীনাথ শাস্ত্রী বলে উঠেছিলেন, 'ওরে, অসীম আমা-দের কবিই হবে দেখছি।'

গোপাল দেব উপন্যাসটির কথা মাঝে-মধ্যে আলোচনার আসরে শোনা যায়। এটা নিঃসন্দেহে অসীম রায়ের একটি উল্লেখ যোগ্য উপন্যাস। 'অসংলগ্ন কাব্য' উপন্যাসটি কয়েক বছর আগে এক শারদীয় লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল। এক সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডই এই উপন্যাসের মূল বিষয়। গোপাল দেব উপন্যাসে দুজন নরনারীর মিলনের পথে যে বাধা সেইসব নিয়ে কথাবার্তা বলেছেন চমৎকারভাবে। প্রথম উপন্যাস 'একালের কথা' জীবনবোধ প্রকাশ করেন প্রদর্শনের পদ্ধতিতে, বিবৃতি বা নাট্যাভাসে। ফলে 'একালের কথায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সংযোগ-বিয়োগে এবং সময়ের পরিণতিতে অনির্দিষ্টতা থাকলেও অনেক চরিত্রই এবং গোটা বইটির আবেগটি প্রাণময় হয়ে থাকে। ...'একালের কথা' বোঝা যায় কেন লেখক পরিণতির এই অনির্দিষ্টতা মেনে নিয়েছেন। উপজীব্য জীবনে কোথায় সেই পারস্পরিক সংলগ্নতা, সেই সম্বন্ধ বিস্তার যার পরিণতি মনে একটি নিটোল বাস্তবতা এনে দেয়?'

অসীম রায় সম্পর্কে আরো অনেক কথা বলার ইচ্ছে থাকল। তাঁর রাজনৈতিক চেতনা—যে চেতনার বিশ্বাস তাঁর রচনা সম্ভারে ছড়িয়ে আছে। এই বিশেষ কোনো দলীয় রাজনীতি সাহিত্যে কতটা স্বাস্থ্যকর কিংবা আদৌ সাহিত্যে পাঠক বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের কথা পড়তে চান কিনা— কিংবা কতখানি পাঠক গ্রহণ করেছে কিংবা গ্রহণ না করে থাকলে কেনই বা করেন নি— সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ আছে। এই স্বল্প পরিসরে সে বিতর্কে আর গেলাম না। অসীম রায়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমাদেরও শুভেচ্ছা রইল।

ফুটবল পাগল কিশোরের দল

বাঙালী পাঠকের কাছে জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম সুপরিচিত। এক সময় উপন্যাস ছোটগল্প লিখে তিনি যথেষ্ট জন-প্রিয়তা লাভ করেছিলেন। তিনি ভাল ছড়াও লিখে থাকেন। কিশোরকাহিনী রচনাতেও তিনি সমান দক্ষ। বাংলা সাহিত্যে শিশুসাহিত্য বেশ কিছু লেখা হলেও সাহিত্যের এই শাখাটিকে উন্নত করার এখনও অনেক অবকাশ আছে। যাঁরা বড়দের জন্যে লেখেন তাঁরাই আবার ছোটদের জন্যে লিখে থাকেন। ফলে তাঁদের লেখার মুন্সীয়ানা থাকলেও তাদের লেখা পুরোপুরি ছোটদের উপযোগী লেখা অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে ওঠে না। অবশ্য আমাদের সৌভাগ্য যে সত্যজিৎ রায়, লীলা মজুমদারের মতন লেখক-লেখিকারা এখনও আমাদের মধ্যে আছেন ও লিখছেন, 'নকল নকুলে আসল নাম' নিঃসন্দেহে কিশোরদের উপযোগী একটি সুলিখিত কাহিনী। এতে যে সব ছড়া রয়েছে সেগুলি কিশোরদের আকৃষ্ট করবে বইটির মধ্যে প্রথম থেকেই একটি রহস্যের পরিবেশ গড়ে ওঠা বইটি না শেষ করে উঠতে ইচ্ছে হয় না। মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটেছে কিনা জানি না, বইটির গদ্যরীতি সাবলীল হলেও দু-একটি জায়গায় পড়তে গিয়ে কিন্তু হোঁচট লাগে। মূলতঃ শিশুসাহিত্য রচনায় এই ব্যাপারটি মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। যেমন ২৬এর পাতার প্রথম বাক্যটি। কেমন যেন অসম্পূর্ণ বাক্য বলে মনে হয়। অবশ্য এ ধরনের ব্যাপার সারা বইয়ে দু-একটি জায়গায় মাত্র ঘটেছে। বইয়ের নামকরণ ও চরিত্রগুলির নামকরণে লেখক যেন জোর করে হাস্যরস সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয়। বিশেষতঃ বইটির নাম কি খুব সুপ্রযুক্ত হয়েছে? চন্দর, নকল নকুল, সেজমামা— এই তিনটি চরিত্রকে নিয়ে গল্পটি তিনটি পর্বে বিন্যস্ত। নকল নকুলের নাটকীয় আত্মসমর্পণ এবং এই বিষয়ে 'দুর্বাসা' পত্রিকায় তার স্বরচিত কাহিনী লেখার ব্যাপারটি যদিও এই কাহিনীতে তার চরিত্রকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছে তবুও সেজমামার নাটকীয়তর আবির্ভাব ও 'দুর্বাসা'য় তার লেখা বিচিত্র পরিভ্রমণ-বৃত্তান্ত কিন্তু নকল নকুলকে অনেকটা ম্লান করে দিয়েছে। তাছাড়া সেজমামার কাহিনী দিয়েই লেখক গল্পের পরিসমাপ্তি টেনেছেন। এক্ষেত্রে 'নকল নকুলে আসল নাম' মজার নাম হওয়া সত্ত্বেও সত্যিই কি উপযুক্ত নাম-করণ বলে বিবেচিত হতে পারে? যাই হোক, এই কিশোরকাহিনীটি যে সুপাঠ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই আর তাই জোর দিয়ে বলা যায় যে এই বইটি কিশোরদের মন ভরাতে পারবে। এমন একটি রচনার জন্যে লেখককে ধন্যবাদ জানাই।

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়।

নকল নকুলে আসল নাম ঃ
জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়।
শ্রীপ্রকাশ ভবন, ৬৬ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯।
দাম—তিন টাকা।

চিঠিপত্র

সংগ্রহশালায় জমা রইল

পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহুদূরে আরব সাগরের তীরে এই শহরে বসে আমি প্রতীক্ষায় প্রহর অতিক্রান্ত করি কখন ডাকপিয়ন বহু আকাংখিত অমৃত পত্রিকাটি আমার হাতে পৌঁছে দেবে। আত্মীয়-স্বজনদের চিঠি ও এই পত্রিকাটি আমার কাছে নিয়মিত পশ্চিমবঙ্গের খবর পৌঁছে দেয়। তাই পত্রিকাটি নিঃসন্দেহে আমার কাছে মূল্যবান।

আপনাদের প্রকাশিত এ বছরের অমৃত বিনোদন সংখ্যা সম্বন্ধে আমার মতামত জানাতে চাই। সমালোচনার কচকচিতে যেতে আমি একান্তই নারাজ। শুধু পত্রিকাটির যে রচনাগুলি আমার ভালো লেগেছে সেগুলি সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করে আপনাদের কাছে আমার ভালো লাগার খবর পৌঁছে দেব।

শচীন দাশের 'স্বয়ং কন্দর্প দুর্গাদাস পড়ে অতীতের খ্যাতনামা অভিনেতা দুর্গাদাসের অভিনয় জীবন ও তাঁর জীবনের নানা ঘটনাবলী সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারলাম। এতদিন তাঁকে আমি অতীতের খ্যাতনামা অভিনেতা বলেই জানতাম----তার বেশি কিছু জানতাম না। শ্রীদাশ অভিনেতার জীবনের ঘটনাবলী সুন্দর ভাষায় পরিবেশন করে রচনাটি উপভোগ্য করে তুলেছেন।

খুব ভালো লেগেছে সোমেন গুপ্তের লেখা 'প্রীতিবন্ধ রবীন্দ্রনাথ-অতুল-প্রসাদ।' বিশ্বকবি ও অতুলপ্রসাদের সম্পর্কটি কত ঘনিষ্ঠ ছিল তা জেনে বড় আনন্দ পেলাম। গীতিকার অতুলপ্রসাদ ছাড়াও মানুষ অতুলপ্রসাদের পরিচয় এই রচনার মধ্যে পেলাম। তাঁর ও রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি রচনাটির মূল্য বাড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদের মধ্যে এত গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল তা জানতে পেরে আমি শ্রীগুপ্তের কাছে কৃতজ্ঞ।

'দিনগুলি মোর পদ্মেরই দল' ঋত্বিকা রায়ের আত্মকাহিনী ভালো লেগেছে। গায়িকা লেখনী ধরার ক্ষমতাও রাখেন।

পরিতোষ সেনের চিত্রিত ও লিখিত রচনা বেশ কিছুদিন ধরে অমৃতের পাতায় দেখে আসছি। তাঁর লেখায় নতুন আস্বাদ পাচ্ছি। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্পটি বহুক্ষণ মনকে ভরিয়ে রেখেছিল। হৃদয়ের সৌরভে ভরা বড় আন্তরিক তাঁর ভাষা।

মঞ্চাভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্র ও কেয়া চক্রবর্তীর নাটক দুটি পড়েছি ও ভালো লেগেছে।

খুব আনন্দ পেয়েছি শ্রীঅমিতাভ চৌধুরীর লেখা 'স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' পড়ে। শান্তিনিকেতনে বিদেশী ছাত্রদের আচার ব্যবহার ও কৌতুকময় কাণ্ডকারখানা তিনি সরস ও আকর্ষণীয় ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের লেখাটি এখনও পড়ে শেষ করে উঠতে পারিনি, তাই তাঁর রচনাটি সম্বন্ধে মন্তব্য করার অধিকার আমার নেই।

পত্রিকাটির ছাপা ও ছবিগুলি ভালো। তবে লেখাগুলি পড়ার নেশায় আমি এমন তন্ময় ছিলাম যে, ছাপার কোন ছোটখাটো ভুলত্রুটি থাকলেও তা আমার চোখ এড়িয়ে গেছে।

সবিশেষ জানাচ্ছি, এবারের অমৃত বিনোদন সংখ্যাটি সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ। বিশেষ কয়েকটি রচনার গুণে এই সংখ্যাটি আমার বইএর ছোট্ট সংগ্রহশালায় জমা হয়ে রইলো।

রেখা ভট্টাচার্য, মিঠাপুর।
গুজরাট।

আমরা কৃতজ্ঞ

দূর প্রবাসে পড়ে থাকা দিনগুলোতে 'অমৃত' যে অমৃতেরই স্বাদ আনে আমাদের কাছে সে কথা বলাই বাহুল্য। এই পত্রিকাটির মাধ্যমেই বাঙলার নাড়ীর স্পন্দনটুকু অনুভব করার চেষ্টা করি আমরা।

এই শীতজর্জরিত পাঞ্জাবের দূরতম প্রান্তে আপনাদের বিনোদন সংখ্যা আমাদের মনে যথেষ্ট ভাল লাগার উষ্ণতা এনে দিয়েছে। এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

দুর্গাদাসের জীবন সম্বন্ধে অনেক কথা জানার ইচ্ছে ছিল বহুদিন থেকে। তার সম্বন্ধে লেখাটি পড়ে আনন্দ পেয়েছি। ভাল লেগেছে অমিতাভ চৌধুরীর 'স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' রচনাটি। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় আমার প্রিয় লেখক কিন্তু তাঁর 'চন্দনের গন্ধ' গল্পে পুরো সুরটুকু বাজল না যেন। সবচাইতে ভাল লেগেছে রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'তমলুক থেকে কোনারক'।

যদিও তাঁর রচনার শেষ পর্যায়ের বক্তব্যটির সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। যেখানে তিনি একটিমাত্র শারীরিক প্রবৃত্তিকে তাবৎ মহান শিল্পের প্রেরণা বলে মত প্রকাশ করেছেন। পরিতোষ সেনের চিত্রিত রচনায় একটু অতিশয়োক্তি থাকলেও বেশ কৌতুক অনুভব করেছি। রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদের স্মৃতিকথা সমস্ত বাঙালীর প্রাণের শ্রদ্ধা টানবেই। বাকীগুলি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার নেই।

একটি কথা বলে চিঠি শেষ করব। আমাদের প্রবাসী পাঠকদের কথা ভেবে পশ্চিমবঙ্গের সাপ্তাহিক বিশেষ খবরগুলি যদি সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন তাহলে বড় আনন্দ পাব, কারণ আমরা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় কোন খবরই জানতে পারি না।

বিনোদন সংখ্যা অমৃতের প্রচ্ছদ সম্পর্কে কিছু অভিযোগ নেই। তবে ছাপা এবং ফটোগ্রাফী আরও উন্নত হওয়া নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়। এই সঙ্গে বিনোদন সংখ্যাটির জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মীরা রায়, এম, এইচ, কলোনী-২, পাঠানকোট, পাঞ্জাব।

রাইচাঁদ বড়াল

প্রথমেই শ্রীমতী সন্ধ্যা সেনকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ এবং বাংলার সঙ্গীত নৃপতি রাইচাঁদ বড়াল মহাশয়কে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম।

শ্রীমতী সেন এবার আমাদের একটি অসাধারণ সুন্দর লেখা উপহার দিয়েছেন। সময়ের অন্ধকারে নিমজ্জিত এক শ্রদ্ধেয় সঙ্গীতশিল্পীর জীবনালেখ্য এবং প্রাচীন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের এক গৌরবময় ইতিহাস তিনি আমাদের সামনে এনেছেন। লেখকের লেখনশৈলী কতো হৃদয়গ্রাহী হতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ শ্রীমতী সেন। এঁর রচনা থেকে আমরা সঙ্গীতের অনেক গূঢ়রহস্য জানতে পারছি। শ্রীমতী সেনকে আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি তার কারণ ---তিনি বিস্মৃতি সমাজ থেকে আবিষ্কার করছেন প্রাচীন জগতের অনেক মহামূল্য সম্পদ।

রাধিকানাথ মল্লিক, সম্পাদক, সোনার তরী, কোলকাতা ৭০০০৭০।

মার্কেটিং নয়

'অমৃত' সমেত বেশ কয়েকটি পত্রিকায় একটি শব্দের ক্রমাগত ভুল ব্যবহার লক্ষ্য করে মর্মাহত হচ্ছি। সম্পাদক এবং লেখক তথা পাঠক কেউই এ বিষয়ে দৃষ্টি দিচ্ছেন না। আমাদের কথাবার্তার মধ্যেও আমরা শব্দটিকে ভুল অর্থে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ঠিক যেমন 'রিস্ক'কে 'রিকস' করেছি।

সম্প্রতি ভুল করেছেন প্রশান্ত চৌধুরী ১০ ফেব্রুয়ারীর অমৃতে। তিনি তাঁর গল্পে কেনা-কাটা বোঝাতে 'মার্কেটিং' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বাণিজ্যের ছাত্র মাত্রই জানেন, মার্কেটিং করতে যাচ্ছি বললে জিনিস বেচতে যাচ্ছি বোঝায়। শব্দটি হওয়া উচিত 'শপিং'। আশা করি এবার এই ভুলের অবসান হবে।

শ্যামলকুমার বিশ্বাস, পল্লীশ্রী, শ্যামনগর।

টে পরিবার সুখী পরিবার ?

গত ২০ জানুয়ারী সংখ্যায় অমল র্যের লেখা 'ছোট পরিবার সুখী বার' নিবন্ধটি পড়ে খুবই ভাল ম। লেখক সুখী হওয়ার বাস্তব া ধরেই নাড়া দিয়েছেন। একথা কেউই ীকার করতে পারবেন না যে, আমাদের গরীব দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ণ প্রয়োজন নয়। কিন্তু শুধুমাত্র বা একটি সন্তানযুক্ত পরিবার হলেই ুখী পরিবার গড়ে উঠবে তাও সত্য আসল সমস্যা হল, আমাদের দুর্বল বৈষম্যমূলক জাতীয় অর্থনীতি। অনেক স্বামী-স্ত্রী আছেন যাঁদের ন সংখ্যা ৫।৬টিরও বেশী। অথচ র কোন অভাব অভিযোগ নেই। কটি ছেলেমেয়ে সযত্নে লালিত-ত। রীতিমত স্বচ্ছল। তেমনি এমন ক স্বামী-স্ত্রী আছেন, যাঁদের সন্তান । সীমিত—দু'তিনটির বেশী নয়। ার পরিকল্পনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলা কিন্তু তাঁদের জীবনটাই অন্ধকার। ত পাপক্ষয়ের মতই দিনগুলো গত যাচ্ছে। অভাব অনটনই তাঁদের -সঙ্গী। সীমিত সন্তান-সংখ্যা নিয়ে অভিশপ্ত জীবনের অশান্তিতে দিন য় চলেছেন। এর একমাত্র কারণ হল দের বৈষম্যমূলক অর্থনীতি। আমার বৈষম্যমূলক অর্থনীতিই আমাদের ার পরিকল্পনা রূপায়ণের সর্বপ্রধান ায়।

বলতে চাই না যে পরিবার পরি-ার প্রয়োজন নেই এবং সীমিত ার হলে সুখী হতে পারে না। আমার বা, প্রথম শিক্ষা এবং আর্থিক লতার দিকে নজর দেওয়া উচিত। , আমাদের পরিবার পরিকল্পনা ন সত্যিকারের মার খাচ্ছে, সেটা হল এবং অশিক্ষিত, অনুন্নত সম্প্রদায়ের —যেটা হলো ভারতের বিরাট অংশ। উপর রক্ত জমা হওয়া যেমনি ্যর লক্ষণ নয়, তেমনি শুধু শহরে পরিবার তৈরী করা দরিদ্র ভারতের র সমাধান নয়। পরিবার পরিকল্পনায় া এবং উপকারিতা গ্রাম্য-জনসাধা-বোঝাতে না পারলে কোনদিনই পরিবার আর সুখী ভারত গড়ে না, তা নিয়তির মতই সত্য।

উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী, জেল রোড, ।

ছিলাম

আমি একজন সঙ্গীতপ্রিয় পাঠিকা অমৃতের গুণমুগ্ধ পাঠিকাও বটে। সম্পর্কিত লেখা আমার চোখ না। তাই গত কয়েক মাসের মধ্যে প্রকাশিত সঙ্গীত সম্পর্কিত কোন আমার নজর এড়ায়নি। তরা ারী 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীমতী সন্ধ্যা সেনের লেখা 'রাইচাঁদ বড়াল' পড়ে মুগ্ধ হলাম। শ্রীমতী সেনের রচনা-ভঙ্গী এত সুন্দর যে, তা আমার মতো সাধারণ পাঠিকার প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না। এমন সুন্দর লেখা প্রকাশিত করার জন্য সম্পাদক মহাশয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং শ্রীমতী সেনকে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা। সন্ধ্যা দেবীর লেখায় অতীতের কয়েকজন বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারলাম। বিশেষ করে 'মুস্তারীবাই' সম্পর্কে আমার মন শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে আসছে। যদিও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই বা কিছু বুঝি না। তবুও মনে হচ্ছে কেন ঐ যুগে জন্মাইনি? শ্রদ্ধেয় রাইচাঁদবাবু সত্যিই ভাগ্যবান। তাই তিনি এমন প্রতিভাময়ী শিল্পীর সংস্পর্শে আসতে পেরেছেন এবং গান শুনতে পেয়েছেন। আমার এই ছোট্ট জীবনের স্মৃতিতে শ্রীমতী সেনের এই সঙ্গীত সম্পর্কিত রচনা একটি মূল্যবান সংগ্রহ হয়ে থাকবে যা এতদিন অজ্ঞাত ছিল। আমি নিজে একজন সঙ্গীত-প্রেমী, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বুঝি না, তবুও শুনতে ভালো লাগে এবং কেন লাগে তা বুঝি না। রবীন্দ্রসঙ্গীতপ্রিয় হয়েও, সঙ্গীত বা সঙ্গীতশিল্পী সম্পর্কিত যে কোন লেখা পড়তে ভালবাসি। আমার আশা ভবিষ্যতে 'অমৃত'তে আরোও এই ধরনের রচনা দেখতে পাবো।

বণা রায়, বাবু লাইন, খড়গপুর।

জানালে বাধিত হব

১০ জুন, ১৯৭৭ 'অমৃত' পত্রিকায় হীরেন্দ্রকুমার বসুর লেখা আফ্রিকা ভ্রমণের সচিত্র কাহিনী 'সাফারি' ধারা-বাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু হয়। লেখকের পরিচিতিতে ছাপা হয়েছে—'একটি পয়সা দাও গো বাবু'—এক সময় হীরেনবাবুর লেখা এই গান মুখে মুখে ফিরত।' এই মন্তব্যটি সঠিক নয়। গানটির রচয়িতা স্বর্গত কবি-গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য। ১৯৭৭ সালে রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকার অজয় ভট্টাচার্যের নির্বাচিত গানের সংকলন অজয়-গীতিসংগ্রহ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে 'সিনেমার গান' পর্যায়ে ১৯৬ পৃষ্ঠায় 'একটি পয়সা দাও গো বাবু' গানটি মুদ্রিত হয়েছে।

প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত 'অধিকার' ছায়াছবিতে এই গানটির ব্যবহার অসম্ভব জনপ্রিয় করে তোলে। এই ছায়াছবির পরিচয়লিপিতে গীতিকার অজয় ভট্টাচার্যের নাম রয়েছে। সুতরাং হীরেন্দ্রকুমার বসুর নাম গানটির রচয়িতা হিসেবে ছাপা হয়েছে দেখে আশ্চর্য হলাম। শ্রীবসুর এই দাবী সঙ্গত না অসঙ্গত জানতে পারলে বাধিত হবো। **প্রকৃতি বিশ্বাস**, ১৯এ।৩২, শীল লেন, কলকাতা-৭০০০১৫।

সঠিক সংবাদ কোনটি?

৪ঠা নভেম্বর '৭৭র অমৃত পত্রিকায় সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় রচিত 'মল্লিকবাড়ীর ভেতরে' একটি সুপ্রাচীন বংশের উপর লেখা একটি সুন্দর রচনা আপনার অমৃতের চিঠিপত্রের মাধ্যমে লেখককে ও সম্পাদক হিসাবে আপনাকে সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাই। আপনার সম্পাদিত অমৃতবাজার পত্রিকায় বহু দিন পূর্বে ধারাবাহিক 'ল্যান্ড মার্কস ইন ক্যালকাটা' প্রবন্ধগুলির অন্যতম 'দ মার্বেল প্যালেস' প্রবন্ধটিও প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ প্রবন্ধে মনে হচ্ছে মর্মর প্রাসাদের আয়তন শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত ২৫ বিঘার চেয়ে বেশী লেখা ছিল—আবার মনে হচ্ছে তা যেন আপনার পত্রিকায় ৩৬ বিঘার মত ছিল। সঠিক সংবাদ পেলে সুখী হব। **নকুলচন্দ্র দত্ত**, ভাতার, বর্ধমান।

আনন্দ পেলাম

আমি 'অমৃতের' নিয়মিত গ্রাহক। ২৭ জানুয়ারী '৭৮ সংখ্যায় প্রকাশিত দাউদ হায়দারের লেখা 'কাজ চাই কলকাতা/ঢাকা' লেখাটি পড়ে খুব আনন্দ পেলাম। অমৃত সম্পাদককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সেই সঙ্গে দাউদ হায়দারকেও। রচনাটি সন্দেহাতীতভাবে একটি ভিন্ন স্বাদের রচনা। লেখক যেভাবে কলকাতা ও ঢাকার বেকারদের বর্তমান অবস্থা সহানুভূতির সঙ্গে ও মননশীল দৃষ্টিভঙ্গীতে সাধারণ পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন, তার জন্য তিনি সকলের নিকট প্রশংসা পাবেন।

শিবাজী ভৌমিক, এ।৪৯, বাঘা যতীন, কলকাতা—৩২।

তথ্যগত ভুল

'অমৃত' পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় গীতিকার ও সঙ্গীত ও অভিনয়শিল্পী শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু যে স্মৃতিকথা লিখছেন তা সবিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক, পরন্তু তার ঐতিহাসিক মূল্যও অপরিসীম। এরজন্য ২৭ জানুয়ারী, ১৯৭৮ সংখ্যায় অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর লেখায় একটি তথ্যগত ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তিনি লিখেছেন 'ঋষির প্রেম' চলচ্চিত্রের কাহিনীকার কবি কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা জানি 'ঋষির প্রেম' চিত্রের কাহিনী-কারের নাম কবিশেখর কৃষ্ণধন দে। তিনি 'রবিবাসর' নামক বিখ্যাত সাহিত্যআড্ডার আজীবন সদস্য ছিলেন এবং সেখানে ঐ কাহিনী আমাদের শুনিয়েছিলেন। 'কবি-শেখর' উপাধিধারী কালিদাস রায়ের মত কবিশেখর কৃষ্ণধন দে-ও নিজে একজন খ্যাতনামা কবি ছিলেন, তাঁর লেখা আজও অনেক চিত্রকাহিনীও আছে।

সন্তোষকুমার দে, সম্পাদক, 'রবিবাসর'।

একটি অসমীয়া ছবির দৃশ্যে শিল্পী হাদি আলম বোরা এবং বিনীতা গোঁহাই

কলকাতা ছবি তৈরির কারখানা

নির্মল ধর

আসাম :

অসম-অহম কিংবা আসাম।

যে নামেই ডাকা তার ব্রহ্মপুত্রের দেশ বললে ঐ একটি প্রদেশকেই বোঝায়। পাহাড় পাহাড় আর সবুজ বনানীতে ঘেরা এই আসাম শুধু অসমিয়াদের দেশ নয়, প্রচুর পার্বত্য উপজাতিরও দেশ। গারো হিলস, খাসিয়া বা জয়ন্তিয়া উপত্যকায় কত নাম না জানা লোক প্রকৃতির শান্ত নীড়ে খোলা নীল চাঁদোয়ার নীচে বংশ পরম্পরায় সময়কে ডিঙিয়ে চলেছে।

আসামের শিল্প-সংস্কৃতিতে তাই পাহাড় সভ্যতা আর উপজাতির ছোঁয়া বড় বেশী। আসামের ট্র্যাডিশন্যাল কালচার তাই নানা রংয়ে রঙীন। নৃত্য-গীত ও চিত্রকলায় আধুনিক ছোঁয়াচ লাগলেও মাটির গন্ধ পাওয়া যায় এখনও।

শুধু শিল্পকলায় নয়, সিনেমা—যে শিল্প মাধ্যমটি বর্তমানে সব শিল্পকে আত্মসাৎ করে নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে তার মধ্যেও আসামের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল, ভাস্বর। ভারতের অন্যান্য আঞ্চলিক ছবির মত আসামের ফিল্ম এখনও চরিত্রহীনতার পথে পা বাড়ায়নি। আর যে কারণেই আসামের ছবি এখনও সকলের কাছে প্রিয় ও আদরণীয় বিষয়।

যদিচ কানাড়া-মালায়ালাম-কিংবা মারাঠি ছবির মত দুর্বার আবেগে সব কিছু ভেঙেচুরে এগিয়ে যাবার স্পর্ধা রাখেন। ব্রহ্মপুত্র দেশের ছবি, কিন্তু গভীর মননশীলতায়, বক্তব্যের দৃঢ়তায় আসাম পিছিয়ে নেই।

কোনদিন পিছিয়ে ছিলও না।

বোম্বেতে যেদিন (১৪ মার্চ, ১৯৩১) ভারতের প্রথম সবাক ছবি 'আলমআরা' পর্দায় ফুটে উঠল, কিংবা কলকাতায় তিন মাস বাদে ক্রাউন সিনেমার দর্শক যেদিন (২৭ জুন, ১৯৩১) 'জামাই ষষ্ঠী'তে অমর চৌধুরীকে কথা বলতে শুনল সেদিনও আ পিছিয়ে ছিল না।

অসমীয়া ফিল্মের প্রাণপুরুষ প্রতিষ্ঠাতা জ্যোতিপ্রসা (আগরওয়াল) মস্তিষ্কে তখন ফিল্মের পোকা নড়ছে চড় জার্মানীর উফা স্টুডিওতে দেখা হয়েছিল হিমাংশু রায়ের স তিনিই ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন পোকাটি। কেম্ব্রিজ এবং ট্রিনিটি কে থেকে পাস করে দেশে যখন ফিরলেন জ্যোতিপ্রসাদ, তখন এ অন্য মূর্তি। জ্বালাময়ী কবিতায়-গানে বৃটিশ শাসকের চোখের ব হয়ে দাঁড়ালেন জ্যোতিপ্রসাদ। কারান্তরাল তাঁর আনন্দ হোল।

কয়েক বছর বাদে ছাড়া পেয়ে হাতিয়ার করলেন ফিল্মকে। নিয়ে ছবি করবেন ভাবছেন। মাথায় এলো লক্ষ্মীনাথ বেজবড় নাটক 'জয়মতী'। দারুণ দেশাত্মবোধ গল্প। নিজের পয়সায় নিজে চা-বাগান ভোলাগুড়িতে শুটিং শুরু করলেন ১৯৩৩য়ে।

সাল-তারিখের জট ছাড়িয়ে যেটুকু জানা গেছে সর্বভারত প্রথম নির্বাক দশটি ছবির মধ্যে এই 'জয়মতী' অবশ্যই এ অর্থকরী বাধা ছাড়াও ফিল্ম সম্পর্কে সামাজিক অনেক পা ডিঙিয়ে জ্যোতিপ্রসাদ ছবিটি শেষ করতে পারলেন ১৯৩৪-এর আগে।

কলকাতার রাওনক থিয়েটারে ১৯৩৫-এর মার্চে যে ছ মুক্তি পেল সেটি বিদেশী কোন ছবি নয়, কিংবা টালিগঞ্জের উৎপাদন। ছবিটির নাম 'জয়মতী'। একই দিনে নাটক গৌহা কুমার ভাস্কর নাট্যমন্দিরেও ছবিটি দেখেছিল স্থানীয় দর্শক ছবিটি চললো না বটে, কিন্তু জ্যোতিপ্রসাদ সবাক চিত্রের সম্ভাব পূর্ণ ভবিষ্যতকে দেখতে পেয়েছেন।

তৈরীর কাজে। আর পাওয়া গেল অভিনেতা ফণী শর্মাকে। পরবর্তী সময়ে তিনি অসমিয়া ছবির হাল ধরেছিলেন এক সময়।

'৩৯ সালে জ্যোতিপ্রসাদ এলেন কলকাতায়। বন্ধু নিরঞ্জন পাল তখন অনাদি বসুর সঙ্গে মিলে অরোরা স্টুডিও তৈরী করেছেন। সঙ্গে ছিল চোদ্দ বছরের এক কিশোর গায়ক ভূপেন হাজারিকা। অরোরা স্টুডিওতে নতুন ছবি 'ইন্দ্রমালতী'র শুটিং আরম্ভ হোল। ভূপেন হাজারিকার ক্যামেরার সামনে প্রথম গান গাইলেন, অভিনয় করলেন। জ্যোতিপ্রসাদ তাঁর সকল আন্তরিকতা আর আদর্শের ছোঁয়া দিয়েও এই 'ইন্দ্রমালতী'কে আর্থিক অসাফল্যের হাত থেকে বাঁচাতে পারলেন না।

পারলে কি হতো বলা যায় না, পারেন নি বলেই ভেঙেপড়া জ্যোতিপ্রসাদ আর ফিরলেন না স্টুডিওয় কিংবা ক্যামেরার কাছে! অসমিয়া ছবির ভিতমাটিটি চাপিয়ে তিনি সরে গেলেন নীরবে। চুপ মেরে গেলেন সবাই।

যুদ্ধের দামামা বাজল চারিদিকে। আতংক আর অনিশ্চয়তার ছাপ সকলের মুখে। কলকাতাতেও ছবির সংখ্যা গেল কমে। দুঃসাহসী রোহিনী বড়ুয়া, পার্বতী বড়ুয়া, কমলনারায়ণ চৌধুরী তিনখানি ছবি করলেন ঐ আকালের বাজারেই, কিন্তু যা হবার তাই-ই হলো। কোনোটাই চললো না।

যুদ্ধ শেষ সেই 'জয়মতী'র নটসূর্য ফণী শর্মা মিলিত হলেন আসামের বামপন্থী কবি বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা'র সঙ্গে। স্কটিশ-চার্চ কলেজের ফুটবল ক্যাপ্টেন—নজরুলের প্রিয় বিষ্ণুপ্রসাদ আসামে তখন আগুন জ্বালাচ্ছেন। গল্প-কবিতায় গানে তিনি সরস্বতীর বরপুত্র। দুজনে মিলে শুরু করলেন নতুন ছবি 'সিরাজ'। বিষয় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, হিন্দু মুসলমান বিদ্বেষ।

কলকাতায় হাঙ্গামা তখন জোর কদমে চলছে, কালী ফিল্মসে (অধুনা টেকনিসিয়ানস স্টুডিও) ছবির শুটিং হলো। সামাজিক বক্তব্য নিয়ে তোলা এই ছবি আসামের মন কেড়ে নিল। গৌহাটিতে ছবিটি একটানা চলল ২৯ সপ্তাহ। (শোনা যায় এই রেকর্ড নাকি এখনও কোন অসমিয়া ছবি ভাঙতে পারেনি।) আরও আশ্চর্যের বিষয় কলকাতার সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ আর ছড়ালো না আসামে। অথচ তখন সেখানে অর্ধেকের বেশী মুসলমানের বাস। মানুষের কাছে ফিল্মের কথা যে কতখানি এফেকটিভ, তার জ্বলন্ত প্রমাণ এই 'সিরাজ'। ফণি শর্মা তাঁর পরবর্তী দুখানি ছবিতেও তাই সমাজের কথা বিস্মৃত হন নি।

৪৮ থেকে '৫৫-এর মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের পারে তেমন কোন ছবি হয়নি যার নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করা যায়। লক্ষ্যধর চৌধুরীর 'নির্মিল অংক' নিশ্চিৎ ব্যতিক্রম বটে, কিন্তু সেই ফণি শর্মাই আবার সরবে হাজির হলেন 'পিয়লি ফুকন' ছবি নিয়ে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভঙ্গিতে প্রতিবাদকারী একজন দেশপ্রেমিকের কাহিনী ছিল বিধৃত। ছবিটি পুরস্কৃত হোল। পরের ছবি 'পুওতি নিশার স্বপ্ন' কালোবাজারীর বিরুদ্ধে নাটক একটি জোরদার দলিল চিত্র।

ইতিমধ্যে কলকাতার প্রভাত মুখার্জি গেছেন গৌহাটিতে। 'পুবেরুণ' নামে একখানি ছবি করলেন তিনি সেখানে। অসমিয়া ছবির ইতিহাসে এই ছবি একটি কারণে অন্ততঃ উল্লেখযোগ্য। বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিখানি ছিল ভারতের প্রতিনিধি। এপর্যন্ত আর কোন অসমিয়া ছবিই বিদেশে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি। 'পুবেরুণ' স্বদেশেও কম সম্মান পায়নি, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার আদায় করে নিয়েছিল ছবিটি।

ইন্দ্রমালতী'র কিশোর গায়ক ভূপেন হজারিকা তখন যুবক। গান গেয়ে আর তুষ্ট নন, সংগীত পরিচালনা করছেন।

সন্ধ্যারাগ ছবিতে অরুণ শর্মা ও রুমু দেবী

বাংলা ছবিও তাঁর কাছ থেকে বিচিত্র সুরের পরশ পেয়েছে, জোনাকির আলো, অসমাপ্ত, জীবন তৃষ্ণা'র সঙ্গীতকার হিসাবে ভূপেনহাজারিকা তখন বেশ জনপ্রিয়।

গৌহাটিতে গুঞ্জন উঠেছে ভূপেন হাজারিকা আসামকে ভুলে গেছেন, সত্যি কি তাই? না।

এবং তা প্রমাণ করার জন্য ক্যামেরায় হাত লাগালেন। গান গেয়ে টাকা রোজকার করে শুরু করলেন একবারে নতুন চিন্তা নিয়ে 'এরা বাটর সুর'। (ছাড়া পথের সুর) শিল্পী ছিলেন বলরাজ সাহনী-ইলা আচাও। সম্পূর্ণ আউটডোরে তোলা ছবিটি আসামের লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিককে তুলে ধরেছিল। গানে গানে অপরূপ করে সাজিয়েছিলেন ছবিটিকে ভূপেনবাবু। কিন্তু যা হয়, লক্ষ্মী-সরস্বতীর একসঙ্গে ঠাঁই হোল না। মুষড়ে পড়লেন তিনি।'

ভেঙে পড়ার আরও একটি কারণ হোল আশাভঙ্গ। রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের আশায় 'এরা বটর সুর' গিয়েছিল দিল্লীতে। কিন্তু না, ৫৬ সালের পুরস্কার তালিকায় এই ছবির নামতো ছিলই না! আদর্শের ঘটনা সত্যজিৎ রায়ের 'অপরাজিত' এবং অসিত সেনের 'চলাচল'-ও কোন পুরস্কার সেবার পায়নি।

রেজাল্ট জানার পর তাই ভূপেন-সত্যজিৎ-অসিত নাকি একদিন নিউ এম্পায়ারের সামনের রেস্তোঁরায় বসে উত্তেজনার মাথায় সিদ্ধান্তই নিয়ে ফেলেছিলেন—আর ছবি পাঠাবো না রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের জন্য।'

বিস্ময়ের ঘটনা ভূপেন হাজারিকার পরবর্তী তিনখানি ছবিই সরকারী পুরস্কারে সম্মানিত এবং সত্যজিৎ রায়ের সাফল্যের কথা বলার কিছু নেই। 'শকুন্তলা', 'লাটিঘাটি', প্রতিধ্বনি' অসমিয়া ছবিকে গুণগত উৎকর্ষে যতদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিল তা নিয়ে মতদ্বৈত থাকতে পারে, কিন্তু ভূপেন হাজারিকার ছবি ছিল সাধারণ দর্শকের কাছে অবশ্য দ্রষ্টব্য। ওঁর 'চিকমিক বিজুলী' শিল্প ও ব্যবসার সংমিশ্রণ। কিন্তু সঙ্গীতাংশে ভূপেন হাজারিকা তুলনাহীন।

এখনও পর্যন্ত আর তিনি ছবি করেননি। মূল কারণ আর্থিক অনিশ্চয়তা। শোনা যাচ্ছে নীরোধ চৌধুরীর গল্প নিয়ে (মন প্রজাপতি) আবার ভূপেন হাজারিকা ছবি পরিচালনা করতে আসছেন।

বাংলা ছবির জগতে যখন 'পথের পাঁচালী' কিংবা 'গঙ্গা'র আবির্ভাব, গৌহাটিতে তখনও 'পিয়লি ফুকন' এর মুক্তি হলেও, ফিল্ম নিয়ে নতুনতর চিন্তা আর পরীক্ষার ঝোঁক লক্ষ্য করা গেছে

প্রথম থেকেই। সর্বেশ্বর চক্রবর্তীর 'মণিরাম দেওয়ান' এবং ব্রজেন বড়ুয়া'র 'ডঃ বেজবড়ুয়া' এই সত্যই প্রমাণ করে।

আর এখনতো সেখানে তরুণ রক্তের বন্যা বইছে।

স্রোতের টানটা অনুভব করা গিয়েছিল বছর ছয়েক আগেই। ১৯৭০ সালে চতুরঙ্গ গোষ্ঠির যে দলে ছিলেন ফনী তালুকদার, অতুল বরদলৈ, গৌরী বর্মণ, মুনিন (বায়েন) পরিচালনায় মুক্তি পেল 'অপরাজয়।' বরপেটা অঞ্চলের নৌবাইচ কে কেন্দ্র করে একটি আবেগ ও নাট্যধর্মী কাহিনীকে সুন্দরভাবে চিত্রায়িত করেছিলেন পরিচালকরা। সলিল চৌধুরীর সংগীত এবং রাখীর (বম্বে) অভিনয় ছিল নাকি প্রধান আকর্ষণ।

১৯৭১য়ে মঙ্গলদৈ এর কয়েকজন উৎসাহী যুবক টাকা জোগাড় করে তৈরী করলেন 'অরন্য।' পরিচালক তরুণ সমরেন্দ্র নারায়ণ দেব। রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেল ছবিটা।

এতদিন পর্যন্ত আসামের গড় উৎপাদন ছিল বছরে দুই কি তিনখানি ছবি। '৭২-৭৩যে সেই সংখ্যা দাঁড়াল ৭ ও ৯। 'মরিচীকা' 'হৃদয়ের প্রয়োজন', 'উত্তরন', ছবিগুলির বুকে প্রাপ্ত বয়স্কের তকমা লাগাতেই বুঝি ধাক্কা খেল আবার অসমীয়া ছবি। মধ্যবিত্ত মূল্যবোধে ঘা লাগল। পরিবারের সকলের সঙ্গে বসে ছবি দেখতে না পারলে সেটা ছবির পর্যায়ে পড়ত না এতদিন। '৭৪ সালে ছবির সংখ্যা কমে দাঁড়াল ৪।

এরই ফাঁকে ফাঁকে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে যে মুষ্টিমেয় বিদগ্ধ দর্শক তৈরী হয়েছে তাঁদের ভরসাতেই স্ট্যাটিসটিকসের ছাত্র পদ্ম বড়ুয়া করলেন 'গঙ্গা চিলনীর পাখী।' সত্যজিতের মন্ত্রশিষ্য পদ্ম বড়ুয়া আসামে আলোড়ন এনেছেন এই ছবি দিয়ে। বিখ্যাত গল্পকার ভবেন সইকিয়া করছেন 'সন্ধ্যারাগ'। ব্যবসায়িক কোন প্যাঁচের আশ্রয় না নিয়ে তিনি একবারে নির্ভেজাল পরীক্ষা চালাচ্ছেন ছবিটিতে।

আসামের সবচাইতে সফল পরিচালক ব্রজেন বড়ুয়া আর নেই। তাঁর ছোট দুই ভাই দাদার গড়া ঐতিহ্যকে বজায় রেখে চলেছেন। নিপ বড়ুয়া এবং দীবন বড়ুয়া এখন গৌহাটির 'বড়' পরিচালক। সাকসেসফুল ছবি যোগবিয়োগ—তরামাই তাঁদেরই তৈরী। ছবি করছেন পুলক গোগই, প্রফুল্ল বড়ুয়া, অতুল বরদলৈ, ফণী তালুকদার, আবদুল মজিদ আরও অনেকে। কলকাতায় প্রবীর মিত্র তারাশঙ্করের গল্প 'নতুন আশা' নিয়ে ছবি করেছেন। এখন বছরে ছবির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫-৬টি।

সে একটা সময় ছিল

বেশী নয় হিন্দি-বাংলা মিলিয়ে মাত্র চোদ্দটি ছবি করেছেন তিনি নিউ-থিয়েটার্সের প্রযোজনায়। সময়ের স্থায়ীত্বেও কানন দেবীর সঙ্গে এন-টির যোগাযোগ চার বছরও নয়। কিন্তু কি গভীর আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল একটি ব্যক্তিত্ব আর একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে!

এখনও সেই অন্তিম তিরিশ দশকের কাছে ফিরে যাবার সময় কাননদেবীর মাথা শ্রদ্ধায় অবণত হয়, বি এন সরকারের কথা এলে তিনি সবিনয়ে স্মৃতি-চারণা করেন। তিনি বলেন, 'ম্যাডানের অবদান বিন্দুমাত্র ছোট না করেও বলব, নিউ থিয়েটার্স বাংলা ছবির রাজ্যে নানা দিক থেকে পাইওনীয়র—পথিকৃৎ। সারা ভারতে কোয়ালিটি ফিল্মসের অন্যতম পীঠস্থান ছিল এই সংস্থা। বাংলা ছবির দিগ্বিজয়ে এন-টিকে অস্বীকার করে কার সাধ্য!

তাই বুঝি প্রমথেশ বড়ুয়া যখন 'দেবদাস' ছবিতে পার্বতী করার জন্য কাননদেবীকে ডেকেছিলেন, তিনি অমন উতলা হয়েছিলেন সুযোগটা হাতছাড়া হল বলে। রাধা ফিল্মসের 'মানময়ী গার্লস স্কুল' কানন দেবীকে শিল্পী-জীবনে প্রথম সম্মান দিলেও বিদ্যাপতি, মুক্তি, সাথী, পরিচয় ছাড়া তাঁর অভিনয় জীবন কি পূর্ণ হতে পারে?

পারে না, সেকথাও বললেন তিনি। তাঁর অভিনয় জীবনে এন-টির অবদান অস্বীকার করবেন কিভাবে! বিস্ময়ের ঘটনা হলো এন-টির মালিক বি এন সরকারের সঙ্গে তাঁর মত শিল্পীদের যোগাযোগও ছিল খুব ক্ষীণ। প্রায় ছিল না বললেই চলে। আত্মজীবনীতে কানন-দেবী লিখেছেন 'তাঁর সঙ্গে সরাসরি কোনো কথা বলার সুযোগ আমাদের ছিল না, কারণ আমাদের অভাব-অভিযোগ ও বক্তব্য অন্যের মাধ্যমে তাঁর কাছে পৌঁছে দেবারই রেওয়াজ ছিল।' এজন্য ক্ষোভ ছিল তাঁর মনে। তিনি প্রশ্ন রেখেছেন, 'কেন মিঃ সরকার তাঁর প্রতিষ্ঠানের শিল্পীদের তাঁরই সঙ্গে সোজাসুজি দেখা করবার, আলোচনা করবার অথবা প্রয়োজনের কথা বলবার প্রথা চালু রেখে তাঁর সঙ্গে সহজ সম্পর্ক স্থাপনের পথ প্রশস্ত করে দেননি?'

সম্পর্কটা সে-কারণে মধুর ছিল না একথা সত্য নয়। বরং উল্টোটাই। শিল্পী কলাকুশলীরা সকলে একই পরিবারের মত—পাশাপাশি কাজ করতেন। পরিবেশ ছিল নির্ভেজাল ঘরোয়া। প্রত্যেকে যোগ্য সম্মান দিতেন সকলকে।

এখনকার মত তারকাদের আধিপত্য তখনও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেনি। পরিচালকই ছিলেন সর্বেসর্বা। তাঁদের মুখের ওপর কথা বলার সাহস ছিল না কারও। ছবি তৈরী ঐ বিরাট কারখানায় সবাই-ই ছিলেন মাইনে করা কর্মচারী। ব্যক্তিত্বের সংঘাত ওপরতলায় ছিল না যে এমন নয়, কিন্তু প্রকট হয়নি তখন সেটা। উপরন্তু মাথার ওপর মিঃ সরকার তখন এন-টির ভগবানের মত বিরাজ করছেন।

আজকের দিনে আবার অমন কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা সম্ভব কিনা জানতে চাইলে কানন দেবীও বললেন 'না তা আর সম্ভব নয়। সময় কি আর ফিরে আসে? মানুষের মনটাই বদলে গেছে এখন। আমিত্বটাই এখন বড়। অযোগ্য পরিচালকের ভিড় আর শিল্পীদের একাধিপত্যে সেই যুগ আর ফিরে আসতে পারে না। উপরন্তু তেমন কোনো প্রতিষ্ঠান তৈরীর চেষ্টা হলেও ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বে তা গড়ে উঠতে পারবে কি?'

সেই বিরাট প্রতিষ্ঠানকে ছেড়ে দিতে কানন দেবীর ব্যথা লাগেনি যে তা নয়, কিন্তু উপায় ছিল না তাঁর। পুরোন কাসুন্দি তিনি আর ঘাটতে চাইলেন না। অতীত রোমন্থনে সুখস্মৃতি নিয়েই তিনি বেঁচে থাকতে চান। নিউ থিয়েটার্স বাংলা ছবিকে শুধুমাত্র কঠিন ভিত্তিভূমিতেই দাঁড় করিয়ে দেয়নি, সম্মানের বরমালা এনে দিয়েছে গলায়।

ম্যাডানের সময় থেকেই এই কলকাতা ছিল ছবির ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র। একমাত্র নির্বাক যুগেই জে-এফ-ম্যাডান ষাটখানি ছবি তৈরী করেছিলেন, ছবি কথা বলতে শুরু করলে ম্যাডান অবশ্য পিছিয়ে পড়েছিল। খান দশ-বারো ছবি করার পর প্রায় নীরব হয়ে গেল ম্যাডান। কিন্তু ছবি তৈরী থেমে যায়নি। এসেছেন অনেকে, চলেও গেছেন। কালী ফিল্মস, রাধা ফিল্মস, নিউ থিয়েটার্স এখনও স্বক্ষমতায় ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে।

কানন দেবী সেই অতীতের সুখ-স্মৃতি চারণ করতে করতে বললেন, 'সে একটা সময় ছিল।' কোন মায়ামন্ত্রবলে সেই সুদূর অতীত তো আর ফিরে আসবে না—এটাই আফশোষ।

জানি ছবির সংখ্যা দিয়ে ছবির গুণাগুণ বিচার করা না, উচিতও নয়। কিন্তু যেখানে বেঁচে থাকার সমস্যাটাই সেখানে পরীক্ষার ঝুঁকি নেওয়া বিলাসিতার পর্যায়ে অবশ্য এটাও জেনে রাখা দরকার অসমিয়া ছবি তৈরিতে টাকা ঢালেন তাঁদের অনেকেরই মুনাফা লোটা প্রধান উদ্দেশ্য না। কিন্তু উৎপাদন খরচ তুলতে চাওয়াটা নিশ্চয়ই বেশী বা অন্যায় নয় ?

নীচে দেওয়া টেবলটি থেকেই বুঝতে পারবেন অসমীয়া আর্থিক চেহারাটা কেমন রুগ্ন-ঢিলেঢালা।

র লোকসংখ্যা —১, ৪৬, ২৫, ১৫২
চিত্রগৃহ —১১৯
চিত্রগৃহ —৭০
চ বছরে ছবি তৈরি হয়েছে :—
— ৭টি
— ৯টি
— ৩টি
— ৬টি
— ৫টি
বির উৎপাদন ব্যায় —৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।
র্তি পায় —গৌহাটি, জোরহাট, শিলং, শিবসাগর

রঙীন হিন্দী ছবির চোখ ধাঁধাঁন সাফল্যের সঙ্গে পাল্লা লার সাধ্য বোঝাই যাচ্ছে অসমিয়া ছবির নেই। তবুও অসমিয়া ছবি। পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখনও বন্ধ হয় নি।

কেন জানেন ?

রাজ্য সরকার বিন্দুমাত্র কার্পণ্য না করে প্রতিটি া ছবির প্রযোজককে এক বছরে আদায়কৃত প্রমোদকরের ই ফেরৎ দেন। তাছাড়া প্রতিটি চিত্রগৃহে আইন করে হয়েছে যে বছরে অন্তত ৮৪টি প্রদর্শনীতে আসামের ছবি ই হবে। যদিও এ ধরনের বাধ্যতামূলক প্রদর্শনী আঞ্চলিক ক্ষেত্রে অবশ্য প্রয়োজন, কিন্তু অর্থগৃধ্নু প্রদর্শকরা ছবির পতার ধুয়ো তুলে নানা অভিযোগ করেন, কিম্বা অসময়ে প্রায় শূন্য প্রেক্ষাগৃহে ছবি চালিয়ে আইনের হাত থেকে ন

ছবির স্বল্পতার অন্যতম কারণ রাজ্যে ভাল র অভাব। জ্যোতি চিত্রবণ নামে যে স্টুডিওটি রাজ্য সর- দাক্ষিণ্যে তৈরি হয়েছে সেখানেও সব ধরনের কাজ শুরু । এখনও। যন্ত্রপাতিও তেমন আধুনিক নয়। উপরন্তু ী সুতোর ফাঁস তো আছেই। অসমিয়া ছবির প্রযোজক- াককে তাই কলকাতা কিম্বা বম্বের আশ্রয় নিতেই হচ্ছে। খরচও কিছু বাড়ে।

অবশ্য সম্প্রতি রাজ্য সরকার স্টুডিওটির সংস্কারসাধনে পুরোদমে কাজে লেগেছেন। ফিল্ম ডেভালপমেন্ট কাউন্সিল যে একটি সংস্থা তৈরি হয়েছে, তাঁরা দায়িত্ব নিয়েছেন জ্যোতি চিত্রবণ স্টুডিওর রক্ষণাবেক্ষণের। উপরন্তু সরকার ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের মাধ্যমে ছবির প্রযোজককে সুদে টাকা ধার দেবার বন্দোবস্ত করেছেন। ইতিমধ্যে পাঁচ টাকা চারখানি ছবিকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হয়ে

অনেকের অভিযোগ—রাজ্য সরকার ফিল্ম ব্যবসা থেকে র হিসাবে বছরে প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা রোজগার করছেন, ধার দিচ্ছেন মাত্র এক কিম্বা দেড় লাখ টাকা। এটা ুক। তাঁদের দাবী আরও বেশী আর্থিক সাহায্য চাই।

কিন্তু একটা প্রশ্ন—বেশী আর্থিক সাহায্য পেলেই ল এবং বেশী ছবি হবে ? এবং হলেও হিন্দী ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সব ছবি দর্শককে টানতে পারবে ? বরং দক থেকে ভাবা যাক। সংখ্যায় অল্প, অথচ শিল্পগুণ- সং রুচিবান ছবি তৈরি করে দর্শকের দৃষ্টিটা আগে করা দরকার। পরিচালক ফণী তালুকদারের মতে—এখনও

ধরিত্রী ছবিতে ভানুমতী, শ্রীরাম এবং সন্ধ্যা

উচ্চবিত্ত অসমিয়ারা ফ্রি পাশ পেলেই অসমিয়া ছবি দেখতে যান, নচেৎ হিন্দী ছবিই তাঁদের বেশী পছন্দ। মধ্যবিত্ত সাধারণ দর্শক এখনও বুক মুচড়ে চোখের জলফেলা ছবিকেই পয়সা দেয়। বুদ্ধি দিয়ে মননকে ধারাল করার কোন চেষ্টা তেমন নেই। নেই বলেই উত্তরণ চলে না। যেমন চলে নি এখানে ঋত্বিকের অযান্ত্রিক।

তাই অসমিয়া ছবি এখন এক সংকটের মুখে। বিশেষ করে তরুণ তাজা রক্তের দল এখন ভাবছে কোন পথে তারা যাবে ? আর্থিক সাফল্যের ছত্রছায়াটি মাথায় নিয়ে নির্বিবাদে দিন কাটাবে, না ব্রহ্মপুত্রের ধারার মত পাহাড়, বন পেরিয়ে ছুটে চলবে অজানা রোমাঞ্চিত পথে ?

এ পর্যন্ত পুরস্কৃত অসমীয়া ছবি

ছবির নাম	পুরস্কার	সাল
পিয়ালি ফুকন	সার্টিফিকেট অফ মেরিট	১৯৫৫
রসা পুলিশ ও পুবেরুন	রাষ্ট্রপতি রৌপ্যপদক	১৯৫৮
শকুন্তলা	,,	১৯৬১
মণিরাম দেওয়ান	,,	১৯৬৩
প্রতিধ্বনি	,,	১৯৬৪
লাটিঘাটি	,,	১৯৬৬
ডঃ বেজবরুয়া	প্রযোধক নগদ ৫০০০ টাকা ও পরিচালক পেয়েছেন পদক	১৯৬৯
অরণ্য	,,	১৯৭১
ওপাজা সোনার মাটি	,,	১৯৭২
মমতা	শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক ছবি	১৯৭৩
চামেলী মেমসাহেব	শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক ছবি ও শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক	১৯৭৫

উড়িষ্যা

উড়িষ্যার লোকসংখ্যা— ২, ১৯, ৪৩, ১৪২
স্থায়ী চিত্রগৃহ— ৭৯
অস্থায়ী চিত্রগৃহ— ২৯
ছবি রিলিজের প্রধান জায়গা— কটক ও ভুবনেশ্বর
ছবির গড় উৎপাদন ব্যয়— তিন লক্ষ টাকা
গত পাঁচ বছরে ছবির সংখ্যা— ১৯৭২ — ১
১৯৭৩ — ২
১৯৭৪ — ২
১৯৭৫ — ৩
১৯৭৬ — ৬

ওপরের তালিকা থেকেই বোঝা যায় আমার প্রতিবেশী রাজ্যটির ফিল্ম শিল্পটি কি নিদারুণ দুরাবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। ছুটিতে কদিন আনন্দে ভাসতে যাই আমরা পুরী কিম্বা গোপালপুর। কিন্তু একটি বারের জন্যও কি পুরীর জনতা-লক্ষ্মী-

শ্রীকৃষ্ণ কিম্বা বহরমপুরের ..(গঞ্জাম) জ্যোতি-সীতারাম-উৎকল-বিজয়ায় ওড়িয়া ছবি দেখার আগ্রহ প্রকাশ করি ?

বরং কোন্ হলে শোলে-ববি-দশনম্বরী চলছে তার খোঁজ করি।

ফল যা হবার তাই হচ্ছে, হয়েছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির অনতম পীঠস্থান মন্দিরময় দেব-দেউলের দেশ উড়িষ্যা সারা রাজ্যের প্রায় আশীটি প্রেক্ষাগৃহে অ-উড়িয়া ছবির ব্যবসা রমরম করে চালাচ্ছে।

উড়িষ্যার ছবি যে এখনও টিঁকে আছে সেটাই আশ্চর্যের বিষয়। আজ থেকে নয়, সেই ১৯৩৪ সাল থেকেই ওড়িয়া ছবি কোনমতে প্রাণটুকু নিয়ে বেঁচেবর্তে আছে।

ধর্মপ্রাণ উৎকলবাসী, প্রথম থেকেই পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে যাত্রার পৃষ্ঠপোষক তাঁরা। যাত্রা পার্টিই তাঁদের আদি মৌলিক প্রমোদ মাধ্যম। কবিচন্দ্র কালীচরণ পট্টনায়ক, মোহন সুন্দর দেব গোস্বামী, অশ্বিনীকুমার ঘোষ, কার্তিককুমার ঘোষ উড়িষ্যার যাত্রা জগতের পিলার বলা যায়।

সালটা বোধ হয় ১৯৩৩। কলকাতায় তখন ফিল্ম নিয়ে প্রচণ্ড হৈ-চৈ: দু বছর আগে ছবির মুখে কথা ফুটেছে। কালী ফিল্মস স্টুডিও, নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে নামী-দামী শিল্পীর ভিড়। আর উড়িষ্যায় তখন হাতে গোনা চার-পাঁচটি বায়োস্কোপ ও গেরটি বা চামরিয়া টকিজের মত দু-তিনটি ভ্রাম্যমান সিনেমাঘর ছাড়া আর কিছু নেই। প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী মশাই এই কালী ফিল্মসের কর্ণধার। আর পুরীর মোহন সুন্দর দেব গোস্বামী তাঁর গুরু। শিষ্যের বাসনাকে রূপ দেবার জন্য গুরু রচনা করলেন একটি নাটক সীতা বিবাহ।

শিষ্য ভক্তিসহকারে শুরু করলেন নাটকটির চিত্রায়ণ। অভিনয় করার জন্য ডেকে আনা হল মাখনলাল বানার্জি ও এ সি মহান্তিকে। পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন গু[রু] শ্রীগোস্বামী।

একবারে খাঁটি ধর্মপ্রাণ একজন লোক, যাঁর ফি[ল্ম] সম্পর্কে বিদ্যে নেই এক কণাও তাঁর হাত থেকে যেমন অপ[রি]পক্ক ছবি পাওয়ার কথা উড়িষ্যার প্রথম ছবি সীতা বিবা[হ] তাই হোল। নির্ভেজাল যাত্রাকে পর্দায় নিয়ে এলেন তিনি। উপরন্তু ক্যামেরার অতিকাঁচা কাজ ছবিটাকে অদর্শনীয় ক[রে] তুলল। ধার্মিক দর্শকরাও এই ছবি দেখতে তেমন উৎসাহ পে[ল] না। সীতা বিবাহ শুধু আর্থিক অসফলই হল না, ওড়িয়া ভা[ষায়] ছবি করার চেষ্টাগুলোকেও অংকুরে বিনষ্ট করে দিল। টাকা জো[গান] দেবার ভরসায় আর কেউই এগিয়ে এলেন না স্টুডিওর দিকে।

দীর্ঘ পনেরটা বছর গেল এমনি করে।

হিন্দী আর বাংলা ছবি উড়িষ্যার প্রেক্ষাগৃহগুলো আলোকিত করতে থাকল। কলকাতার পরিবেশকরা সারা উড়িষ্যা ছবি চালিয়ে মুনাফা লুটতে লাগলেন।

স্বাধীনতার দু বছর পর ঢেনকানলের টিকি সাহেব ওড়ি[য়া] ছবি করতে এগিয়ে এলেন। এবার আর পৌরাণিক বিষয় নিয়ে [নয়] সামাজিক কাহিনী নিয়ে 'ললিতা' ছবিটি পরিচালনা করেছিলে[ন] কল্যাণ দত্ত। অভিনয় করেছিলেন উমা গোয়েংকা ও লোকনাথ মি[শ্র] (পরবর্তী সময়ে ইনি এম-পি হন)। যদিও ছবিটি না কাহি[নী] না প্রোডাকসন ভ্যালু কোন দিক থেকেই তেমন উল্লেখযোগ্য ছি[ল] না, কিন্তু দীর্ঘ পনের বছর বাদে মাতৃভাষায় ছবি দেখতে পে[ল] উৎকলবাসী দর্শক আটখানা। আবালবৃদ্ধবণিতা দেখল 'ললিতা'কে। প্রথম সাকসেসফুল ছবি এই 'ললিতা' কিন্তু ছবির প্রযোজককে অ[ন্য] দ্বিতীয় ছবি করার প্রেরণা দিল না—কেন, অজ্ঞাত।

সত্যি কথা তো বলা যাবে না

ফিল্ম তৈরীর এই কারখানায় গৌহাটির নবীন, তরুণ পরিচালকরা এখন কাজ করে যাচ্ছেন। কখনও কি তাঁদের ঐ গোলঘরটির দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে বি এন সরকারের কথা ? কিংবা এক নম্বর ফ্লোরটায় দাঁড়িয়ে বড়ুয়া সাহেবের কোন স্মৃতি জাগে কি কারও মনে ?

না জাগারই কথা। সময় বড় বিশ্বাস-ঘাতক যে !

ছবি শুরুর আগে মৃদু সঙ্গীতের সঙ্গে একটি হাতীর মাথা এবং তার শুঁড়ে জড়ান একটি ফুলের মালা—এই দৃশ্যটুকু থাকলেই আসনে বসে দর্শকের উপলব্ধি হত পরিচ্ছন্ন রুচিশীল একটি ছবি দেখার।

'দেনা-পাওনা' (১৯৩১) ছবি থেকে এই হাতীমার্কা ব্যানারের প্রকৃত যাত্রা শুরু। আগের দুটো নির্বাক ছবি 'চার কাঁটা' বা 'চাষার মেয়ে' একই প্রযোজকের টাকায় তৈরী হলেও নিউ থিয়েটার্স নামটির তখন জন্ম হয় নি। বাড়ীর লোকদের কাছে ফিল্ম লাইনের সঙ্গে তার যোগাযোগের কথা গোপন রাখার জন্যই ইঞ্জিনীয়র বি এন সরকারকে এই চাতুরীর আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তখন কোম্পানীর নাম দিয়েছিলেন ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্র্যাফট।

'দেনা পাওনা' করার সময় ব্যাপারটা আর গোপন রইল না। সুতরাং জন্ম নিল নিউ থিয়েটার্স। হাতী যার প্রতীক চিহ্ন। সেই ১৯৩১ সাল থেকে এক নাগাড়ে বাংলা ছবির রাজ্যে দুর্বার গতিতে জয়ের পর জয়ের মালা গলায় পরে এগিয়ে গেছে নিউ থিয়েটার্স। শুধু বাংলা কেন, হিন্দীতেও ছবি হয়েছে প্রচুর। হাতীর শুঁড়ের মালাটি রঙিন হয়েছে সম্মানে, প্রশংসায়।

নিউ থিয়েটার্স নামটি তিরিশ-চল্লিশের দশকে সবার মুখে মুখে। বাংলা ফিল্মের গর্ব তখন এন-টি। ম্যাডানের আধিপত্যকে ভেঙ্গে দিয়েছিল এই এন-টিই। পাশাপাশি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, কালী ফিল্মস, রাধা ফিল্মস পাল্লা দিয়ে কম দৌড়য় নি, কিন্তু নিউ থিয়েটার্স নিউ থিয়েটার্সই। দু-দুটো স্টুডিওর কর্তৃত্ব তখন বি এন সরকারের হাতে। পে-রোলে রয়েছে বাংলা বোম্বের প্রায় সব নামকরা শিল্পী, কলাকুশলীরা। একদিকে প্রমথেশ বড়ুয়া, কানন দেবী, যমুনা বড়ুয়া, দুর্গাদাস, উমাশশী, চন্দ্রাবতী, অমর মল্লিক, শিশির ভাদুড়ী, অহী[ন্দ্র] চৌধুরি, পাহাড়ী সান্যাল, মলিনা দেবী, জহর গাঙ্গুলী, সায়গল। অন্যদি[কে] দেবকী বসু, নীতিন বসু, রাইচা[দ] বড়াল, প্রেমাংকুর আতর্থী, পংক[জ] মল্লিক, হেমচন্দ্র চন্দ্র, মধু বসুর ম[ত] শিল্পী কলাকুশলীরা [নি]উ থিয়েটার্সে[র] কর্মচারী। এঁদের [সম্মিলিত] চেষ্টায় [...] কোন প্রতিষ্ঠানের সাফল্য না হয়ে যা[য়] না।

হয়েছিলও তাই। সেদিনকার সে[ই] ডাকসাইটে ব্যক্তিত্ব বি এন সরকারে[র] সঙ্গে কথা হচ্ছিল কদিন আগে অতীতের স্মৃতিচারণা তাঁর কাছে যে[ন] গল্প বলার মত। বললেন—নি[উ] থিয়েটার্সের সুনাম আমার তো একা[র] নয়, আর্টিস্ট, টেকনিসিয়ানস সবা[ই] মিলেই করেছিলাম। ভাল ছবি ভা[ল] পরিচালক ভাল আর্টিস্ট ভাল মিউজি[ক] ডাইরেকটর ছাড়া সম্ভব নাকি ভা[ল] ছবি ?

শুনেছিলাম নিউ থিয়েটার্সে[র] ভাঙ্গা-গড়ার ইতিহাস, মাত্র ২৫ বছরে[র] আয়ু নিয়ে ৬২ খানি (২ নির্বাক) ছবির জন্ম দিয়েছিল এন-টি। অকিঞ্চিৎ[] কর ছবি যে দু-একটি ছিল না তা নয় তবে চণ্ডীদাস, দেবদাস, মুক্তি

একই বছরে তৈরি হোল পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের লৌকিক কাহিনী নিয়ে 'শ্রীজগন্নাথ।' ধর্ম এবং পৌরাণিক পটভূমি উপরন্তু ছবির কলাকৌশলগত উন্নতমান ও বালকৃষ্ণ-রণজিতের সুমধুর সঙ্গীত 'শ্রীজগন্নাথ'কে বেশীদিন বাঁচাতে পারল না। কেন, সে-কারণও অজ্ঞাত। তবে ওড়িয়া ছবির ব্যবসায় দেখা দিল প্রথম লিমিটেড কোম্পানী। এই ছবিখানি প্রযোজনা করেছিল রূপভারতী নামে একটি সংস্থা।

এভাবে লোকসানের বোঝা নিয়েই এগিয়ে চলছিল ওড়িয়া ছবি। কখনও সামাজিক কখনওবা পৌরাণিক কাহিনীকে আশ্রয় করে চলছিল টিঁকে থাকার সংগ্রাম। 'সপ্ত শয্যা' 'আমরি গান ঝিয়া' 'কেদার-গৌরী' 'ভাই ভাই' এই সংগ্রামের ফসল।

বলরাম দাস, কল্যাণ গুপ্ত বা বিনয় ব্যানার্জি কেন যে ওড়িয়া সাহিত্যের দরজায় ভালো কাহিনীর জন্য হাত বাড়ালেন না বোঝা গেল না। কালুচরণ মহান্তি'র 'শাস্তি' এবং হরেকৃষ্ণ মহাতাবের 'প্রতিভা' গল্প দুটির নাকি চলচ্চিত্রায়ণ শুরুও হয়েছিল। কিন্তু কোনটাই আর শেষ হয়নি।

ভারতের দিকে দিকে তখন নতুন চিন্তার ঢেউ উঠেছে। বাংলায় তো বটেই, অন্যান্য কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষায়ও ছবি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঝোঁক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিস্ময়ের ঘটনা—এই কলকাতার এত কাছে থেকেও বাংলা ছবির শৈল্পিক কোন প্রভাব লক্ষ্য করা গেল না ওড়িয়া ছবিতে। অথচ ওড়িয়া ছবি শুটিং ও আনুষঙ্গিক ইত্যাকার কর্ম এই কলকাতাতেই হত। এখনও হয়। রক্ষণশীল মেজাজে ওড়িয়া ছবি আঁকড়ে রইল নিজের গণ্ডী। বেড়িয়ে আসতে পারল না মুক্ত আকাশে।

ষাটের দশকের শুরুতেই তাই 'শ্রীলোকনাথ' (প্রফুল্ল সেনগুপ্ত) রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক পেল ছবিটি।

কলকাতার প্রভাত মুখার্জি আবার এগিয়ে এলেন কটকে। আসামের ছবিতে 'পুবেরুণ' ছবি দিয়ে তিনি যেমন একটি ইতিহাস সৃষ্টি করে এসেছেন ৬১ সালে ও'র প্রথম ওড়িয়া ছবি 'দস্যু রত্নাকর' তেমনি ব্যবসায়িক জগতে আলোড়ন আনল। পরের বছর প্রভাত মুখার্জি আশ্রয় নিলেন শরৎ কাহিনীর ছত্রতলে। রামের সুমতি গল্পটি নিয়ে তিনি তৈরী করলেন 'নুয়া বৌ'। নাটক আর সেন্টি-মেন্টের খোঁচায় দর্শকের চোখ একবারে ভিজে গেল। পয়সাও যেমন আয় করল ছবিটি, তেমনি সরকারী পুরস্কারও এনে দিল প্রযোজকের (পঞ্চ সখা) হাতে। ১৯৬৭তে মৃণাল সেনের 'মাটির মনিষ' আলোড়ন তুলেছিল নিস্তরঙ্গ ওড়িয়া ছবির জগতে। কিন্তু ক্ষণিক বাদেই সেই তরঙ্গ হোল স্তব্ধ।

পরের বছর (৬২) সারদাপ্রসাদ নায়েক বাংলার হিট ছবি 'শহর থেকে দূরে'র অনুসরণে তৈরী করলেন 'লক্ষ্মী'। প্রভাত মুখার্জি ইতিমধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন 'ভালো' পরিচালক হিসাবে। ও'র পরবর্তী প্রত্যেকটি ছবিই (মানিক জোড়ি, সাধনা, জীবন সাথী, নবজন্ম) প্রযোজককে নিরাশ করেনি, উপরন্তু রাষ্ট্রপতি পুরস্কার ছিল উপরি পাওনা।

সাংসারিক বিষয়কে ঘিরে মেলোড্রামার চড়া সুরে বাঁধা থাকত বেশীর ভাগ ছবির সুর। জীবনের কথাতো নয়ই, টুকরো জীবনও ওড়িয়া ছবিতে অনুপস্থিত। জীবনের নামে সেখানে আছে বুকমোচড়ানো সেন্টিমেন্ট। বাস্তব সমস্যা যেটুকু দেখানো হয়, সেটা নাটক সৃষ্টির প্রয়োজনে, জীবনকে অন্য অর্থে দেখানোর জন্য নয়।

১৯৬৫ সালে নিতাই পালিত নামে এক তরুণ যুবক 'মরাজহ্ন' (মৃত চাঁদ) নামে একটি পরীক্ষামূলক ছবি করে ওড়িয়া ফিল্মের সোজা সরল পথটাকে একটু অন্যমুখী করতে চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেই মৃত চাঁদের কপালে যে জাতীয় আর্থিক পরাজয়

রাষ্ট্রপতি, রজত জয়ন্তী, প্রিয়বান্ধবী, ...নগড়, মহাপ্রস্থানের পথে, নবীন ...র মত মুখ উজ্জ্বল করা সন্তানদের ...। এন-টি গর্ব করতে পারে। ভারতের ...স-ছবির মানচিত্রে এন-টি তাই ...টি উজ্জ্বল নাম।

বাংলা ছবির এই বিরাট কারখানা ...দিন স্তব্ধ হবে কেউ ভাবতে পারে ... ভাবা যায় নি হাতী মার্কা ব্যানারের ...। ৫৪ সালের পর আর কোনদিন ...য় আসবে না। 'বকুলই' ছিল নিউ ...রটার্সে'র শেষ ছবি।

এই অভাবনীয় ঘটনার কারণ ...শ্ন করলে শ্রীসরকার বললেন, কারণ ...টা নয়, অনেক। প্রথমত এন-টি ...। আণ্ডার ক্যাপিটালাইজড কোম্পানী ...র্ড ফাণ্ড বলে কিছু ছিল না. ...তীয়ত রায়টের সময় শিল্পী-...কুশলীরা স্টুডিওয় আসতে পার-... না বলে খুব কম ছবি করা হয়েছে, ... প্রতি মাসে মাইনে বাবদ পুরো ...ই খরচ হত, তৃতীয় কারণ কয়েকটি ...র ব্যবসায়িক ব্যর্থতাও বটে। কারণ ...চ আরও।

আজকের সময়ে আবার কি নিউ ...টার্সে'র পুনর্জন্ম সম্ভব? প্রথম শ্রেণীর শিল্পী, কলাকুশলীদের বেতনভুক করে নিয়মিত ছবি করা কি অসম্ভব? এন-টির স্বর্ণযুগ ইতিহাসে স্থান পেলেও সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কি অচিন্ত্যনীয়?

সব প্রশ্নের স্বল্প কথায় জবাব দিলেন শ্রীসরকার। আকাশছোঁয়া দর সব আর্টিস্টদের। তাঁরা এখন ফ্রিল্যান্স থাকাটাই পছন্দ করছেন। অনেক টেকনিসিয়ানসও তাই। এঁদের সকলকে বেতনভুক করা কোনক্রমেই সম্ভব ওনয়। সুতরাং ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আর হবে কি করে? ইতিহাস ইতিহাসই হয়ে থাকবে। ও'রা নিজেরাও আর তেমন কোন কথা ভাবছেন না। দু নম্বর স্টুডিও নিয়েছেন রাজ্য সরকার, এক নম্বরও তাঁদের কর্তৃত্বে নেই। নিউ সিনেমা ছবিঘরটিও হাতছাড়া।

প্রায় ধ্বংসস্তূপের ওপর বসে এখন দিন গোনা ছাড়া কাজ নেই শ্রীসরকারের। ছেলে দিলীপ সরকার সম্প্রতি শেষরক্ষা ছবি দিয়ে আবার হাতীমার্কা ব্যানারটিকে আকাশে উড্ডীন করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পুরনো জৌলুষের বড় অভাব। শুধু নামটুকুই আছে।

সেটুকুও হয়ত মুছে যাবে!

প্রামান্য কোন ইতিহাসও নেই হাতের কাছে। এন-টির মত প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস কি আর লেখা হবে না? বয়স হলেও প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তা বি এন সরকার এখনও সরব। এখনও সময় আছে। নইলে অজানা থেকে যাবে বড়ুয়া সাহেবের এন-টি ছাড়ার কারণ, নীতিন বসুর প্রতিষ্ঠান ত্যাগ, বিচ্ছিন্ন সার্কাতত্তের দ্বন্দ্ব ও আরও অনেক কিছু।

ইতিহাস লেখার কথা পাড়তেই তিনি হাসতে হাসতে বললেন, এ প্রস্তাব আপনাদের সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ বহুবার করেছেন আমাকে, মাথাটা কোথায় জানেন? সত্যি কথা তো বলা যাবে না! অনেকে আঘাত পাবেন, কেউ রাগবেন। এই বয়সে আর ওসব ঝাক-বিতণ্ডার মধ্যে যাবার ইচ্ছে আমার নেই।

বললাম—'তাহলে ইতিহাস তো সঠিক হবে না! আপনার অনুপস্থিতিতে বিকৃত হতে পারে।'

এই কথাতেও তিনি হাসলেন। জবাব দিলেন না। হয়ত বা নীরবে ইতিহাস লেখা শুরু হয়ে গেছে। ফিল্ম কারখানার ইতিহাস আমরা এখন সেই অপেক্ষায়।

টিকা পড়েছিল তা দেখে কেউই আর এগিয়ে আসতে সাহস পাননি।' নিতাইবাবু তো ননই। তিন বছর বাদে এই নিতাই পালিত 'কে কাহার' নামে একটি ছবি করলেন। সুপার-সুপার হিট্ ছবি।

আসলে তিনিই পথ পরিবর্তন করলেন, ওড়িয়া ছবির গতিপথ বদলাতে না পেরে ওঁকেই বদলাতে হলো মতটা। গড্ডালিকা স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেন তিনি। ফ্যামিলি ড্রামার বাটি-চচ্চড়ি পাতে সুরু করলেন নিতাই পালিত মশাই। বন্ধন, ধরিত্রী, কৃষ্ণ-সুদামা নিশ্চয়ই অন্য কথা বলে না।

এঁর পাশাপাশি আরেকটি নাম অবশ্যই করতে হবে। ১৯৭৩ সালে 'তাঁনি ঘর-সংসার' ছবি দিয়ে শুরু করেছিলেন। ছবিখানি চলতি ওড়িয়া ছবির ফর্মুলার বাইরে ছিল একথা কেউই বলেন না বটে, কিন্তু তাঁর পরের ছবি 'অমর প্রেম' ওড়িয়া ছবির জগতে এনেছে নতুন হাওয়া। কলকাতার খ্যাতনামা কলাকুশলীদের সহযোগিতায় তৈরী ছবিটি অত্যন্ত ঝকঝকে স্মার্ট—এটুকুই বলা যায়।

ব্যবসায়ের স্রোতে ভাসা প্রোডেথ দল এতদিন যে যান্ত্রিক কথা ভাবতে পারেননি, সম্প্রতি পুণার ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করা কিন্তু ওড়িয়া যুবক সেই যান্ত্রিক নিয়ে এগোচ্ছেন। সাধু মেহের তো এখন সর্বভারতীয় নাম। গত বছর তাঁর কাছ থেকে আমরা 'বাতিঘর' (কাহিনী : মুখ্যদেব গুহ) পেয়েছি। সুস্থ সুন্দর প্রচেষ্টা। ত্রুটি আছে বটে কিন্তু চিন্তায় আধুনিক ছাপ রয়েছে। এখন সাধু মেহের 'অভিমান' নামে আর একখানি ছবি করাতে ব্যস্ত। পুণার স্নাতক মনমোহন মিশ্র কদিন আগে শেষ করেছেন 'সীতা-রাতি'। এই ছবি শোনা যাচ্ছে ওড়িয়া ফিল্মের ধারাটাই নাকি পাল্টে দেবে। দেওয়া উচিতও।

এই সঙ্গে গত বছরের দুটি বক্স অফিস ক্যান্টার-করা ছবি 'মন আকাশ' ও 'মমতা'ও দর্শক আশীর্বাদ ধন্য। ব্যোমকেশ ত্রিপাঠির 'স্বাকৃতি' ব্যবসা করছে মন্দ নয়। আশার কথা দর্শকের রুচিও কিন্তু পাল্টাতে শুরু করেছে।

সংগঠিত কোন চলচ্চিত্র আন্দোলন অবশ্য ভুবনেশ্বর বা কটকে এখনও লক্ষ্য করা যায় না, কিন্তু দর্শকের মাথায় একটা পরিবর্তন চলছে এটুকু বোঝা যায়।

ওড়িয়া ছবির শৈল্পিক মান যেমন উন্নত নয়, তেমনি আশা-প্রদ নয় ছবির ব্যবসাও। কলকাতার হিন্দী ছবির পরিবেশকরাই ওড়িশার বেশীর ভাগ প্রেক্ষাগৃহের বেনামা মালিক। ওড়িয়া ছবিকে জায়গা ছাড়তে তাঁরা নারাজ। বরং উল্টে বেশী ভাড়াই দাবী করেন প্রদর্শক-রা ওড়িয়া ছবির জন্য। কটকের প্রধান ছটি প্রেক্ষাগৃহের ভাড়া শোনা যায় ৫০০০ থেকে ১১০০০ টাকা প্রতি সপ্তাহে। এই পর্যন্ত প্রমাণ টাকা দিয়ে ক' সপ্তাহ আর ওড়িয়া ছবি চালাতে পারেন প্রযোজক যেখানে তাঁর ছবির মোট উৎপাদন ব্যয় তিন লক্ষ টাকা।

সরকারী সাহায্য ছাড়া এ অবস্থায় ওড়িয়া ছবিকে বাঁচানোর কোন রাস্তা নেই। অথচ রাজ্য সরকার এই কাজে সম্পূর্ণ নীরব। স্টেট ফিনান্স কর্পোরেশন নামে একটি সরকারী সংস্থা যে শর্তে টাকা ধার দেন তা নিয়েও স্থানীয় চলচ্চিত্র মহলে অভিযোগের পাহাড় জমেছে। অনেকের দাবী—(ক) আসাম সরকারের মত উড়িষ্যাতেও আঞ্চলিক ভাষায় তৈরী ছবির বাধ্যতামূলক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা, (খ) আঞ্চলিক ভাষার ছবি থেকে যে পরিমাণ প্রমোদকর আদায় হবে, তা ছবির প্রযোজককে একটি নির্দিষ্ট সময় বাদে ফেরতের বন্দোবস্ত, (গ) সম্ভব হলে ওড়িয়া ছবিকে সম্পূর্ণ করমুক্ত করা, (ঘ) এবং অল্প সুদে সম্মানজনক শর্তে সরকারী ঋণের ব্যবস্থা ইত্যাদি। সর্বোপরি প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা বাড়ানোর দাবী তো সার্বজনীন।

কিন্তু এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের কাছ থেকে তেমন কোন পরিকল্পনার আভাস পাওয়া যায়নি। ১৯৭৫য়ে যে ফিল্ম ডেভোলাপমেন্ট কর্পোরেশন তৈরী হয়েছিল, তাও এখন বাক্সবন্দী। গত বছর থেকে অবশ্য বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণের একটা ব্যবস্থা অবশ্য করেছেন। কিন্তু মুমূর্ষুকে খেতে না দিয়ে, ওষুধ না দিয়ে তাকে সম্মানপত্র দেওয়া কোন্ জাতের রসিকতা!

গত তিরিশ বছরে উড়িষ্যা গড়ে দুখানি ছবির জন্মও দিতে পারেনি। কেন, তার কারণ ছড়িয়ে আছে উড়িষ্যার সমাজজীবনের প্রতিটি স্তরে। মৃণাল সেন বা প্রভাত মুখার্জি ক্ষণিকের জন্য বিদ্যুৎ এর চমক এনে দিতে পারেন ঠিকই, কিন্তু স্থায়ী রোশনির বন্দোবস্ত করতে হবে উৎকলবাসীদেরই। গৌর ঘোষ, নিতাই পালিত, ধীর বিশ্বাল, সাধু মেহের, মনমোহন মিশ্র একটু তনাভাবে চিন্তা শুরু করলেই কাজটা শুরু হতে পারে। তার আভাসও পাওয়া যাচ্ছে।

ক'বছর বাদে পুরী-গোপালপুর বেড়াতে গিয়ে যেন ভ্রমণার্থীরা খোঁজ করতে শুরু করেন ওড়িয়া ছবির, যেমন কলকাতায় বিদেশীরা এসে খোঁজেন কোন্ হলে সত্যজিৎ রায়ের [illegible] চলছে।

*নিবন্ধ রচনায় সাহায্য করেছেন ডঃ ভুপেন হাজারিকা, ফণী তালুকদার, মনোরঞ্জন সুর, গোপাল ঘোষ এবং ই-আই-এম-পি-এ।

এ পর্যন্ত পুরস্কৃত ওড়িয়া ছবি

ছবির নাম	পুরস্কার	সাল
শ্রীলোকনাথ	রাষ্ট্রপতি রৌপ্যপদক	১৯৬০
নুয়া বৌ	প্রশংসাপত্র	১৯৬১
লক্ষ্মী, সূর্যমুখী	,,	১৯৬২
সাধনা, জীবনসাথী	রৌপ্যপদক	১৯৬৩
নারী	প্রশংসাপত্র	১৯৬৩
মলাজহ্ন	রৌপ্যপদক	১৯৬৫
কা	প্রশংসাপত্র	১৯৬৬
মাটির মনিষা	রৌপ্যপদক	১৯৬৭
অরুন্ধতী	প্রযোজক—নগদ ৫০০০ টাকা পরিচালক—পদক	১৯৬৮
স্ত্রী	,,	১৯৬৯
আদিম মেঘ	,,	১৯৭০

হীরকের দিনগুলি

বিজনকুমার ঘোষ

এসবের উত্তর দিতে হলে একসঙ্গে
কগুলি কথা বলতে হয়। তা না বলে
ক শুধু হাসল। চাঁদের আলোর হাসিটা
মনোরম দেখাল না। তিন মাস আগেই
রের পঞ্চাশটা টাকা শোধ করার কথা
। বার বার হেনার মুখটা ভেসে উঠ-
। সুকুমারের নির্দেশে ধন্বন্তরী
ডাক্তারের ওষুধ তো আনা হল। কিন্তু
রাজী হবে কি? টাকা শোধ হয়নি,
অসময়ের আনারস খাচ্ছেন। অধীর
ভাবল কি না কে জানে!

—আমার ইভিনিং ডিউটি ছিল। অফিস
আবার রিলেটিভের বাড়ি গিয়েছিলাম
বাজারে। —হীরক দাঁড়িয়ে পড়ল।
শ টাকা শোধ না হওয়া পর্যন্ত এইভাবে
নশন হয়ে দাঁড়াতে হবে।
—আমি ভাই একটু পায়চারি করছি।
ডাক্তারের নির্দেশ।

তা ভালমন্দ খাচ্ছ, হজম হচ্ছে না।
চারি তো দরকারই। তুমি হলে গিয়ে
স্ট্রেলিয়া মহাদেশ। দুধ, ঘি, মাছের স্রোত
যাচ্ছে। লোকসংখ্যা কম একটি মাত্র
ন। আর আমি হলাম ভারতবর্ষ। তিন
মেয়ে। আবার আর একটি পেটে।

—চারতলার ঢালাই কবে হচ্ছে?
—না ভাই, টাকা পয়সার বড্ড টান
যাচ্ছে।—সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে
ফেলল।

—তোমার আবার টাকার টান!—হীরক
শব্দ করে হাসল।

—মানুষের স্বভাব কি জান, নিজের
টাকা কম দেখে আর অপরের টাকা বেশি
দেখে।

সর্বনাশ! কোথায় থাপ খাওয়াতে গিয়ে-
ছিল হীরক।

—আচ্ছা ভাই চলি।

—দাঁড়াও, কথাটা শেষ করি—অধীর
একটা সিগারেট এগিয়ে দিল ঃ এই মানুষই
কিন্তু আবার অপরের বুদ্ধি কম, নিজের
বুদ্ধি বেশি দেখে।

—যা বলেছ!—হীরক হেঁ-হেঁ করে
বোকার মত হাসল ঃ এখনও কবিতা-টবিতা
লেখা হয় নাকি?

—আরে না না, কবি হতে যাব কোন্
দুঃখে! আমি হলাম গিয়ে লোহার কারবারি।

হীরক বিড়বিড় করল, তুমি হলে
অস্ট্রেলিয়া। জোরে বলল, কলেজে থাকতে
তো সুন্দর কবিতা লিখতে। চর্চা ছেড়ো না
ভাই।

নির্জন পাড়া কাঁপিয়ে অধীর হো-হো
করে হাসল।

—এর পরেও কি আমি পঞ্চাশ টাকা
ফেরত নিতে পারব? ঠিক আছে, এবার
বাড়ি যাও। বৌ চিন্তা করবে।

হীরক মনে মনে বলল, সেই ভাল।

॥ ২ ॥

পাক্কা তিন মিনিট ধরে কড়া নাড়ল
হীরক। ভিতর থেকে কোন সাড়া নেই। মরে
গেল নাকি সব? বারান্দার এক ধারে লাল
সিমেন্টের বেঞ্চ চাঁদের আলোয় পড়ে আছে।
হেনার ওই একদোষ, ঘুমুলে একেবারে
কাদা। ছেলেমেয়েগুলোও হয়েছে তাই। এক-
বার জোরে কড়া নেড়ে হীরক সিমেন্টের
বেঞ্চিতে শুয়ে পড়ল।

এপারে শহর, ওপারে গ্রাম। মাঝখানে
সরু একটা খাল এঁকে বেঁকে চলে গেছে
দক্ষিণে। বর্ষার পরেও বেশ কিছু দিন ওই
খালে জল থাকে। শোলা, কচু, কচুরিপানার
ফাঁকে ফাঁকে ওই জল নীল আকাশ মেখে
চুপটি করে শুয়ে থাকে। ছুটির দিনে একটা
ছিপ হাতে হীরক অনেক দূরে চলে যায়।
এটা হীরকের ছেলেবেলার শখ। আজকাল

কোথাও মাছ নেই। সারা দিন নীল আকাশ মাখানো জলে বড়শি নাচাতে নাচাতে ঘরে ফিরে আসে হয়ত একটি শোল, তিনটে টাকি, দুটো খলসে নিয়ে। মাছ নেই, তবে মানুষ আছে প্রচুর। বেঁটে, মোটা, কালো, ফরসা, লম্বা, দাতা, কৃপণ, হিংসুটে, ঝগড়াটে, খুনী, মাতাল, চোর, ডাকাত, কত রকমের মানুষ ছোট্ট পৃথিবীটাকে ভরিয়ে রেখেছে। ছুটির দিনে মাছ ধরতে এসে হীরকের সঙ্গে দুবার দেখা হয়।

খালের ওপারে রেললাইন। চব্বিশ ঘন্টার আপ ও ডাউনে বাষট্টিটা ট্রেন চলে। সারা দিনে কেউ আরও গ্রামের দিকে, কেউ বা গভীর শহরের দিকে চলে যায়। দুইয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে হীরক। ওদিকে মাইলের পর মাইল ধানক্ষেত রোদে বৃষ্টিতে জ্যোৎস্নায় বড় হতে থাকে। হীরক রোজ সকালে উঠে বিশাল একটা ধানক্ষেতের বড় হওয়া দেখে। এই মাত্র যে বাতাসটি ফুসফুসের মধ্যে ঢুকে গেল, সেটি হয়ত কয়েক মাইল ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে দৌড়ে এই মাত্র হীরকের কাছে পৌঁছেছিল।

হীরক যেদিকে বাস করে সেদিকে দস্তুর মত শহর। কি নেই সেখানে। লাল সুরকির রাস্তা, একটু এগিয়ে পিচ বাঁধানো। ইলেকট্রিক লাইট, গায়ে গা লাগানো বাড়ি, দোকানপসার, মাইক, ফিল্মের গান। খালের ওপারে বিঘা হিসাবে জমির দর হয়, এদিকে কাঠা হিসাবে। কত রকমের কথা এদিকে, ভালবাসার কথা, ঝগড়ার কথা, হিসাব-নিকাশের কথা। ওদিকে তখন ধানগাছের সঙ্গে বাতাসের শনশন শব্দ ক্রমাগত ইথারে মিলিয়ে যেতে থাকে।

হঠাৎ অনেক দূরে একটা লাল আলো নীল হয়ে গেল। সাপেরা অনেক দূরের কাঁপুনি বুক দিয়ে টের পায়। হীরকও টের পেল লাল সিমেন্টের বেঞ্চিটা কাঁপছে। শেষ ক্যানিং লোকালটা ধানক্ষেতের ওপর চৌকো আলো ফেলে চলে গেল। রাত তাহলে অনেক। হেনা কি কিছুতেই দরজা খুলবে না? ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। রাতপাখির ডাক শোনা গেল। বেঞ্চের তলায় শিশি দুটোকে সন্তর্পণে দাঁড় করিয়ে রেখে হীরক কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকাবার চেষ্টা করল।

দোষ-গুণ যাই হোক, হেনা যখন-তখন যেখানে খুশি ঘুমিয়ে পড়তে পারে। এজন্য কোন চেষ্টাই করতে হয় না। হীরক বলে, শবাসন। তা বাপের বাড়িতে এই শবাসনের চর্চাটা ভালই চলত। মর্নিং কলেজ। চার বোন কলেজ থেকে ফিরে স্নান করে ভাত খেয়ে নিত। হেনার মা মনে করতেন বেশি করে ভাত খেলে শরীর ভাল হয়। সুতরাং পেট ভরার পরেও আরও দু হাতা ভাত খেতে হত প্রত্যেককে। এরপর প্রয়োজন সেদিনের খবরের কাগজ কি একটা উপন্যাস। দু চার পাতা পড়ার পরেই ভাত-ঘুম চার বোনকে সরাসরি অন্য জগতে নিয়ে যেত। চার বোনই থপথপ করে হাঁটে, একটু মোটা ধরনের। কেউ সে কথাটা আভাসে ইঙ্গিতে বললেও ওর মা রেগে যেতেন। চোখ দিচ্ছে!

হেনা ইতিপূর্বে দুবার উঠেছে। ইভিনিং ডিউটিতে হীরক সাধারণত রাত দশটা সোয়া দশটার মধ্যেই বাড়ি ফেরে। আজ কিছু বলেও যায়নি। এদিকটা বড় নির্জন। খিঞ্জি একগাদা বাড়ির পরেই ফাঁকা মাঠ, তারপর এই বাড়িটা একলা দাঁড়িয়ে আছে। লাল সুরকির রাস্তাও বাড়ির কাছে এসে শেষ। একটা সরু কাঁচা পথ শুধু খালের ধার দিয়ে চলে গেছে। ছুটির দিনে ওই খালে ছিপ ফেলে বসে থাকে হীরক।

পাঁচ জনের সংসার। হীরক, হেনা, ঝিলি, মিলি ও ধূমকেতু। শেষ বারে হাসপাতালে থাকার সময় আকাশের উত্তর-পূব কোণে হঠাৎ ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল। কাগজে কাগজে এই নিয়ে কত লেখালেখি। সেই থেকে ছোটটির নাম রাখা হয়েছে ধূমকেতু। হীরক আদর করে ডাকে ধূম। হ্যাঁ, পাঁচ জনের সংসারে আর একজনও আছে, তার নাম দারোগা। হলুদ রং, খাড়া কান, বড় তেজীয়ান চেহারা। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সারা দিন এখানেই খাবে-দাবে, ঘেউ ঘেউ করবে, সন্ধ্যে হলে কোথায় চলে যাবে। মুঠো মুঠো ভাত দিয়েছে হেনা, শোবার জন্য পেতে দিয়েছে বস্তা। কিন্তু যেই ধানক্ষেতের ওপরটা কালো হতে আরম্ভ করল অমনি দারোগা নেই। হীরক একবার দারোগাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল পেয়ারা গাছের সঙ্গে। ঠিক মানুষের মত কান্না! শেষে বিরক্ত হয়ে হেনা বলেছিল, ছেড়ে দাও আপদকে। অকৃতজ্ঞ!

—নিশ্চয়ই লাভার টাভার আছে। কাল থেকে ওর খাওয়া বন্ধ।

শেষবার সিমেন্টের বেঞ্চিতে অনেকক্ষণ বসে ছিল হেনা। কি হল হীরকের? এত দেরী তো করে না? ছেলেমেয়েরা খেয়েদেয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। বসে থাকতে থাকতে কেবলি হাই পাচ্ছিল। এখানে ঘুমিয়ে পড়লে তো বিপদ! দারোগা নেই। হেনা তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে খিল দেয়, তারপর ঝিলি মিলি ধূমকেতুর পাশে শুয়ে পড়ে

হীরকের অফিসের বন্ধুরা বিয়েতে সুন্দর একটা দেওয়াল ঘড়ি উপহার দিয়েছিল। পিয়ানোর সুরে রাত দুটো ঘোষণা করতেই ধড়মড় করে উঠে বসে হেনা। বাইরে জ্যোৎস্নার মধ্যে কে নাক ডাকছে। জানালায় উঁকি দিয়ে দেখে ধূমকেতুর বাবা। আহা!

হেনার ডাকে চমৎকার ঘুমটা ভেঙে গেল হীরকের। কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ধানক্ষেতের দিকে, জ্যোৎস্নার দিকে। তারপর চোখের মণি দুটোকে হেনার মুখে এনে ফেলল।

—তুমি কখন এসেছ? ছি! ছি! আমাকে ডাকতে পারনি? এইভাবে শুয়ে আছ!

—ডেকেছিলাম। তুমি তখন গভীর ঘুমে। তাই ভাবলাম, ডিস্টার্ব করে কাজ নেই।

—আহা, কিনে আমোদ! চল খাবে চল, হাত মুখ ধুয়ে নাও।

—আজ কি বার বল তো?

—বুধবার।

—চমৎকার! কাল আমার অফ-ডে। শোন, আমার আর খেতে ইচ্ছে করছে না। ঘরেও ঢুকতে ইচ্ছে করছে না। ভাবছি বাকী রাতটা এখানেই কাটিয়ে দেব।

—তাহলে আমারও খাওয়া হবে না।

—সে কি, তুমি এখনো খাওনি?

—কোনদিন তোমাকে ফেলে খেয়েছি?

হীরক ব্যস্ত হয়ে উঠল, আমি হাত মুখ ধুয়ে আসছি, দুজনে এই বারান্দায় বসে খাব। লাইট জ্বালাতে হবে না। দেশে থাকতে আমরা এমনি চাঁদের আলোয় ভাত খেতুম।

হেনা বলল, আমি তোমার জল গামছা সাবান এখানেই এনে দিচ্ছি। শখ হয়েছে এখন এখানেই খাও।

শহর আর গ্রামের সীমানায় দিনের মত জ্যোৎস্না নেমেছে। রাত পাখিটা বোধহয় এখনো সঙ্গী খুঁজে পায়নি। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস আসছে ধানক্ষেত থেকে। কি সুন্দর একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে।

—এত দেরী হল কেন, অফিস থেকে কোথায় গিয়েছিলে?

—দেখেছ কি সুন্দর গন্ধ। শিউলি গাছটা কি বারোমাসই ফুল দেবে?

—কথার জবাব দিচ্ছ না যে?—খাওয়া একটু বন্ধ করল হেনা।

—জান, বাড়িওয়ালা সেদিন আমার অফিসে এসেছিল।

—তাই নাকি। আমাকে বলনি তো? তা দিয়ে দিক না আমাদের বাড়িটা।

—তা তো দিতেই চায়। ম... বাড়ি, ছেলেপিলে নেই। নর্থ ক্যালকাটায় বাড়ি। আজকাল শহরে বেশি সম্পত্তি থাকলে বিপদ হতে পারে।—হীরক ঢেকুর তুলল।

—বিপদ হলে তো ভালই। আমাদের কাছে বিক্রী করে দিক। কি সুন্দর বাড়িটা। হ্যাগো, তোমরা অফিস থেকে লোন পাও না?

—চল্লিশ হাজার টাকা দাম।—হীরক মাছের কাঁটা দিয়ে দাঁত খোঁচাতে লাগল। দিতে পারবে? তোমাকে আমাকে বিক্রী করলেও যে হবে না।

—এত দেরী হল কেন বললে না তো?

হীরকের খাওয়া হয়ে গেছে। সিমেন্টের বেঞ্চিতে বসে একটা সিগারেট ধরিয়েছে। এঁটো বাসনগুলি ভিতরে রেখে মুখ হাত ধুয়ে হেনাও পাশে এসে বসেছে। রথের মেলা থেকে চারা কিনে বাড়ির চারপাশে লাগিয়ে দিয়েছিল হীরক। তার মধ্যে তিনটে মারা গেছে। বেঁচে থেকে এখন একটাই ফুল দিচ্ছে। যারা মরে গেছে যেন তাদের দায়িত্ব একাই বহন করছে। জ্যোৎ-

স শিউলি ফুলের সাদা চাদর
াকে।

ামার বাড়িটা ভাল লাগে হেনা ?
ওকে আরও কাছে টেনে নিল।

া, খুব ভাল। এত সুবিধা অন্য
ব না। তুমি দামটা একটু কমাতে
—হেনা হীরকের বুকে হেলান

াইখানা ঘর, টানা লম্বা বারান্দা,
েন্টের বেঞ্চি, আলাদা মিটার,
, দশ কাঠা জমি নিয়ে হীরকদের
াস্তানা। ভাড়া মাত্র একশো কুড়ি
ড়ওয়ালাও মানুষ ভাল, উঠে
ছে নয়। শুধু কিনে নিতে বলছে।
জার টাকা বাজার দর অনুযায়ী
হীরকের আছে প্রাণভরা সাধ,
ধ্য নেই। ইচ্ছে হয়, এই নিরালা
ক্লশ হাজার টাকা দিয়ে কিনে
নে বাড়ির গেটে শ্বেত পাথরে
র সাজিয়ে লিখে রাখে, স্বপ্ত-
াউস। উনিশশো আটচল্লিশ সালে
এসে বহু পাড়ার বহু বাড়িতে
ছে হীরকরা। কোথাও মন
সে সব বাড়িকে বাড়ি না বলে
বলাই ভাল। হীরকরা তখন
দুই বোন। দাদা চাকরী করত,
ব এক বেসরকারী ফার্মে ঢুকেছে,
নে। আর সবাই পড়ত, কেউ
কউ কলেজে। সবচেয়ে বড় দিদি।
লেবেলায় সাতপাথিয়ায় থাকতেই
য় হয়ে যায়, সে সব কথা হীরকের
নে নেই। দমদমে এই দিদির
হীরকের বিয়ে হয়। বিয়ের পর
টে গেল। মানুষ যেন কেমন হয়ে
ন দিন। হঠাৎ একটা ট্যাকসি
বন্দে চলে এল শ্বশুরবাড়িতে।
কটা ভাল বসার জন্যে গরু খোঁজা
হীরক। সন্ধানও পেল গ্রাম আর
ীমারেখার এই নিরালা বাড়িটার।
টা ছিল প্রচন্ড হানাহানির যুগ।
আমার মতের সঙ্গে তোমার মত
টায় মিলছে না, অতএব তুমি জন-
ু। সুতরাং তুমি পৃথিবী থেকে
। বেঁচে থাকবার, ভালবাসবার,
ার কোন অধিকারই নেই তোমার।
াগজে থকত শুধু বিভৎস হত্যা-
খবর। শ্মশানের ডোমরাও এককেটা
শিউরে উঠে চোখ ফিরিয়ে নিত।
ন এই শেষ প্রান্তের বাড়িটা হয়ে
হঠানেওয়ালাদের বোমা বানানো
সের আস্তানা। ভয়ে কোন ভাড়াটে
াইত না। বাড়িওয়ালা তখন দশ
কা পেলেই বাড়িটা দিয়ে দেয়—
বস্থা। সেই সময়ে হীরক একদিন
র গিয়ে এক বাড়ির দরজায় কড়া

বললেন, দেখুন মশাই, আপনি নিজের ইচ্ছেয় ভাড়া নিচ্ছেন। আবার উঠে যেতে হয় নিজের ইচ্ছেয় চলে যাবেন। আমি যেতে বলব না। তবে আপনি ভেবে চিন্তেই বাড়ি ভাড়া নেবেন। বোমার সঙ্গে আলোচনা করেছেন ?

হীরক বলেছিল, আমি আমার নিজের দিদির কাছে গলাধাক্কা খেয়েছি। শ্বশুরবাড়িতে আছি প্রায় আড়াইমাস হল। শেষে কি এখানেও গলাধাক্কা খাব ? আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমাকেই বাড়িটা দিন। ভাড়ার ব্যাপার আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

তবু কতগুলি শর্ত চাপানো হল। যেমন, ভাড়াটা মাসে মসে বাগবাজারে এসে দিয়ে যেতে হবে। অন্য কোন রকম অঘটন ঘটলে বাড়িওয়ালা কোনক্রমেই দায়ী হবেন না।

এই বাড়িতে ঢুকতে প্রথমে যে ভয় ভয় করেনি তা নয়। তবু হেনাকে বুঝিয়েছে, আমরা তো কোন পার্টি করি না। আমরা সাতে পাঁচেও থাকি না। কেউ বলবে না আমরা বড়লোক, অপরকে শোষণ করছি। সুতরাং আমাদের কি ভয় ?

শ্বশুরবাড়ি থেকেও আপত্তি উঠেছিল। বড় শালা বলেছিল, ওইসব জায়গা থেকে লোক উঠে যাচ্ছে আর তুমি যাচ্ছ ভাড়া নিয়ে ? তুমি কি জলে পড়েছ ?

বড় শালা তখনো বিয়ে করেনি। সবাইকে নিয়ে থাকতে চায়।

দিদি জামাইবাবুও সেই কথাই বলত। ট্যাংরা গভর্নমেন্ট হাউসিং স্টেটের ফ্ল্যাটে থাকত তখন হীরক আর ওর দাদা। জমাইবাবু রিটেয়ার করে দুই মেয়ে, এক ছেলে নিয়ে সেখনেই ওঠে। পয়ত্রিশ বছর আগে দমদমের রজনী সেন রোডে জলের দরে পাঁচ কাঠা জমি কেনা ছিল। প্রায় দেড় বছর পরে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটি টাকায় সেখানে বাড়ি উঠলে দিদি বলল, আমরা এক সঙ্গে থাকব।

বড় শালাও সেই কথাই বলেছিল। কিন্তু হীরক আর দ্বিতীয়বার ভুল করতে চায়নি।

লুকিয়ে থাকবার পক্ষে বাড়িটার পজিসনও চমৎকার। কলকাতা শহরে কোন মায়ের দুলালের মাথা নমিয়ে এখানে দিব্যি গা ঢাকা দেওয়া যায়। আবার অসুবিধে টের পেলে খাল পেরিয়ে ধানক্ষেতে বুকে হেঁটে চলে যাওয়া যায় বহু দূর।

একদিন ভোর বেলায় ঘেরানো সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে পায়চারি করছিল হীরক। হেনা, ডাকল তোমাকে কে ডাকছে। নিচে নেমে এল তক্ষুনি। পাঁচ ছটি চোয়াড়ে ছেলে দাঁড়িয়ে আছে কোমরে হাত দিয়ে।

—এই বাড়ি আমাদের। আপনাকে তিন দিনের মধ্যে উঠে যেতে হবে।

হীরক বলল, আমি এই বাড়ির ভাড়াটে। বাড়িওয়ালার রসিদ আছে আমার কাছে।

—আমরা ওসব শুনতে চাই না। এই বাড়ির মালিক আমরা।

—এই বাড়ির মালিক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। থাকেন বাগবাজার স্ট্রীটে।

একটা ছেলে এগিয়ে এল, মালিক ফালিক বুঝি না। তিন দিনের মধ্যে বাড়ি ছাড়তে হবে।

হীরক ছেলের দিকে তাকাল। বাইশ তেইশের একটি ছেলে, কিন্তু মুখখানাকে এর মধ্যেই কি ভীষণ কঠিন আর হিংস্র করে তুলেছে। হেনা এর মধ্যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মিনিকে কোলে নিয়ে।

—আপনারা কে ? জোর করে তুলে দেবেন নাকি ?

—হ্যাঁ, দরকার হলে জোর করেই দেব।—ছেলেটা ট্রাকের হেড লাইটের মত চোখ জেলে হেনার দিকে তাকাল।

ড়িওয়ালার বয়স বাটের কাছাকাছি।
। দিবানিদ্রা দিবার চেষ্টা করছিলেন।
প্রস্তাবে যেন চাঁদ হাতে পেলেন।

হীরক দেখল মরামুখী ছেলেদের সামনে তর্ক করা বিপদ। কিছু একটু হলে কেউ ছুটে আসবে না। ছুটে আসবে ধান ক্ষেতের হু-হা হাওয়া। পাশের মাঠে যে কবে বাড়ি হবে, কবে লোকজন আসবে।

মিলি কেঁদে উঠতেই হীরক ওকে কোলে নিল। হেনাকে বলল, তুমি ভিতরে যাও, চা কর। আমি আমার ভাইদের সঙ্গে কথা বলি। বারান্দায় বসুন না। আজ আমার ছুটি।

ছেলেগুলি নিজেদের ভিতর কি যেন আলোচনা করল। তারপর বারান্দায় শীতল পাটিতে এসে বসল। ইতিমধ্যে হেনা সবাইকে দুখানা করে পরোটা আর শীতের নতুন ওঠা ফুলকপির তরকারি দিয়ে গেল। ছেলেগুলি যে কি তৃপ্তি সহকারে খেল তা না দেখলে বোঝানো যাবে না। মনে হল, অনেকদিন যেন ওদের খাওয়া হয়নি। ছুটির দিনের হালকা মেঘের ভেলা ভেসে চলেছে। সবুজ ধানক্ষেতের মাঝ-খানটা হলুদ জরির কাজ। ওখানে সরষে ফুল ফুটে আছে। শিউলি গাছের নিচে সাদা চাদর পাতা। মিষ্টি একটা গন্ধ ভোর রাত থেকে এই বাড়ির চৌহদ্দি জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরই মাঝখানে ছেলেগুলিকে আর কুৎসিত মনে হল না হীরকের। প্রত্যেকেরই বাবা আছে, মা আছে, ভাই আছে, বোন আছে, আনন্দ আছে, দুঃখ আছে, ভালবাসা আছে—। আছে আশা আকাঙ্ক্ষা। হীরক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রত্যেকের খাওয়া দেখছিল। দেখতে দেখতে মুগ্ধ হচ্ছিল নিজের মনে, কি সুন্দর চেহারা!

ওদের মধ্যে নাক চোখা একটি ছেলে বলেই ফেলল, বৌদি তরকারিটা খুব রেঁধেছেন, বহুদিন এমন খাইনি।

হেনার একটা অভ্যেস হল, কেউ কেউ কিছু প্রশংসা করলেই বলে, আর দুখানা দি?

আর দুখানাও উড়ে গেল চোখের পলকে। কত কাল খাওয়া হয়নি কে জানে! চোখের কোনে কালি। ঘুমও হয়নি কত রাত। সারা মুখে হতাশা, আতঙ্ক আর ক্লান্তি। দাদা। রাগের মাথায় কি সব বলে ফেলে-ছিলাম। যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে।

একজন বলল, কিছু মনে করবেন না হীরকের ইচ্ছে হচ্ছিল বিছানাটা পেতে দেয়।

আর একজনের ফর্সা চেহারা। বলল, সত্যিই তো, বাড়িওয়ালা বীরেন চক্রবর্তী। আমরা কে?

কালো মত একটি ছেলে নীরব কর্মী। পরোটা, কপির তরকারি, খেজুরে গুড়, চা নীরবে ফিনিশ করে গেছে। এইবার মুখ খুলল, তবে বৌদি, আমরা মাঝে মাঝে এসে খেয়ে যাব। আর কিছুই চাই না।

হীরক মনে মনে হাসছিল। কি চমৎকার ছেলেগুলো! আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে মাথা গুঁজে করে কোন কাজ হয়েছে? এই সামান্য সময়ে মিলির অনেকগুলি কাকা হয়ে গেল। মিলি এখন ফরসা ছেলেটার কোলে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে।

হীরকই প্রথম কথা পাড়ল, তোমরা কি কর? তুমি করে বলছি, কিছু মনে করলে না তো?

—না না। ছোট ভাইকে তুমি বলাই তো ঠিক। আচ্ছা, এবার উঠি।

—কিন্তু আমার জবাব তো পেলাম না।

ছেলেটি হেসে ফেলল।

—জবাব কি যেন এক কথায়!—উঠে দাঁড়িয়েছিল, আবার বসে পড়ল : বুঝলেন কি না, আমাদের প্রাণে প্রচুর স্বপ্ন। আমরা বড়লোকদের নিশ্চিহ্ন করব, গরীবের রাজত্ব আনব। এক কথায় আমরা বিপ্লব চাই।

—খুব ভাল কথা।—হীরক হাসল : এটাই তো বিপ্লব আনার ও স্বপ্ন দেখার বয়স। আমরাও যখন কলেজে পড়তাম সেই সময় প্রচুর স্বপ্ন দেখেছিলাম।

—একটা প্রশ্ন, সেই সব স্বপ্ন সফল হল না কেন বলবেন কি?

হীরক একটু মুশকিলে পড়ে গেল। একটু চিন্তাও করল।

—কেন সফল হল না, সে বলতে পারব না ভাই। হয়ত আমাদের স্বপ্ন দেখাটা ছিল নিছক স্বপ্ন। কিংবা তীব্র ইচ্ছা বা আকুতি তেমন ছিল না।

—ঠিক বলেছেন। স্বপ্ন সফল করতে হলে চাই বৈপ্লবিক দর্শন। এই দর্শন কঠিন বিজ্ঞানের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এর ছোঁয়া পেলে, ওই যে বললেন তীব্র ইচ্ছা বা আকুতি, সেগুলি জ্বলে ওঠে। তখন চুপ করে বসে থাকা যায় না। বিশ্রাম টিশ্রাম অসম্ভব।

হীরক চোখ বড় বড় করে বলল, তোমার কথা শুনতে খুব ভাল লাগছে ভাই। আমি বেশিদূর পড়াশুনা করিনি। অত তলিয়েও কোন কিছু বিচার করে দেখিনি। আমার এখন ইচ্ছে, তোমাদের স্বপ্ন সফল হোক।

ছেলেটি বলল, এত কথা আমরা হুট করে বাইরের লোকের কাছে বলি না। তবে আপনাকে মনে হল আমাদের লোক। তাই বললাম।

—হ্যাঁ ভাই, আমি তোমাদের লোক। তোমরা জীবন উৎসর্গ করে বসে আছ। এটা তো ঠিক, ক্ষুদ্র স্বার্থ তোমাদের স্পর্শ করতে পারেনি। তোমাদের ফেরার পথ বন্ধ, এখন এগিয়ে যেতে হবে।

—ঠিক বলেছেন। ফেরার পথ বন্ধ নয়, আমরা ফিরতেও চাই না। এখন উঠি—

—কিন্তু ভাই একটা প্রশ্ন, তোমাদের লোকে এত ভয় পায় কেন?—হীরক নিজে যেন ভয় পায়নি, সেইভাবেই একটা সিগা-রেট ধরাল।

—ভয় পায় সে অকারণ।—ছেলেটা একটু যেন চিন্তা করল : কিংবা ভয় পায়, সেটা আমরাও চাই। বহু শতাব্দী ধরে আমরা মানুষ না, পশুর জীবন যাপন করছি। সেইজন্যে আমাদের রয়ে সয়ে করলে চলবে না। বহু বছরের কাজ একবারে করতে হবে, তাই কিছু ভুলচুক হচ্ছে বৈ কি, কিন্তু সেটা মাইনর। আসলে আমাদের লক্ষ্য স্থির।

—ভাল কথা। বিপ্লবও হচ্ছে একটা সৃষ্টি। একথা তোমাদের এক ভাল মহান নেতাও বলেছেন। সব সৃষ্টির পিছনেই থাকে আনন্দ। এই আনন্দের সংস্পর্শে সবাই আনন্দিত হয়। কিন্তু এখানে তা হচ্ছে কই?

চোখা নাকের ছেলেটি এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। হঠাৎ বলে উঠল, সমাজের শোষকদের হাড়ে কাঁপুনি ধরে গেছে। ভালই তো!

—কিন্তু ভাই সমাজের শোষক আর কত জন? লক্ষ লক্ষ শোষিত মানুষও কি ভাবতে পেরেছে, এই বিপ্লব তাদের?

শীতকালের লাল বারান্দায় এক আশ্চর্য নীরবতা নেমে এল। খাবারের লোভে কয়েকটা চড়াই পাখি ওড়াওড়ি করছে। হেনা এতক্ষণ কাছেই ছিল। যেই বুঝেছে আর কোন ভয় নেই, তক্ষুনি রান্নাঘরে চলে গেছে। শীতের নরম রোদে এক ঝাঁক টিয়াপাখি কেবলি ঘুরপাক খাচ্ছে। আজ ছুটির দিন। খেয়ে দেয়ে খালে মাছ ধরতে যাবে হীরক। নারকেলের মালায় কেঁচো ছিল, তার থেকে একটা লম্বা শরীর নিয়ে মাটির দিকে হেঁটে যাচ্ছে নিঃশব্দে।

হীরক বলল, তোমরা কি জোর করে ফুল ফোটাতে পার? সেই ফুল কি কখনো স্বাভাবিক গন্ধ দেয়?

—কিন্তু আমরা আর কত কাল অপেক্ষা করব?

—সেটা তোমরা বুঝবে। তাড়াতাড়ি অফিস যাওয়া যায়। কেননা আমরা সেখানে সৃষ্টি করতে যাই না। কিন্তু সৃষ্টির মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য যে ধৈর্য ধরতেই হবে ভাই।

ছেলেরা এর পর আর সময় নষ্ট করল না। হেনাকে আন্তরিকভাবে বলল, চললাম বৌদি। মিলির গাল টিপে আদর করল। হীরকের দিকে ফিরে, ভাল আস্তানা ছিল এটা। ঠিক আছে, আপনিই বাস করুন। আমরা অন্য একটা জায়গা খুঁজে নেব।

সারা সকালটা কেমন যেন এলোমেলো করে দিয়ে গেল ছেলেগুলো। খাল পেরিয়ে ধানক্ষেতের আল দিয়ে বিন্দু হতে হতে এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেল। হীরকের খুব মায়া হল। কি সুন্দর মেঘ-ভাসা আকাশ সকালের নরম রোদ আর মখমলের মত ঘাস—এরই মধ্যে দাঁড়িয়ে ছেলেগুলি

চোরের মত নিঃশ্বাস নিচ্ছে। কথা বলার সময় একটি ছেলের পকেট অস্বাভাবিক ফুলে ছিল। সে দেখে হীরক বুঝতে পেরেছিল, ওখানে একটি রিভলবার আছে। হায়রে, ওরা বুঝতে পারছে না কাকে গুলি করতে হবে, আর কি রক্ষা করতে হবে।

॥৩॥

একটু বেলায় ঘুম ভাঙল। মন ভার হলে শরীরও ভারী হয়ে যায়। এই ভারী শরীরটাকে বিছানা থেকে তুলতে হীরকের কষ্ট হল। আজ বৃহস্পতিবার, আজ অফ-ডে। এই কথা ভেবে শরীরটা হালকা লাগলেও তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

হেনাকে কাল রাতে খুলে বলা হয়নি। জ্যোৎস্না বড় মাতাল হয়ে উঠেছিল। সেই সময় আজেবাজে কথা বলে পরিবেশটাকে নষ্ট করতে মন চায়নি। কিন্তু সময় নষ্ট করা চলে না। একটা সরষে দানার মত অস্তিত্ব প্রতি মুহূর্তে বেড়ে উঠছে। এই বেড়ে ওঠার মূলে কুঠারাঘাত করতে হবে।

কি ভাবে শুরু করবে? হীরক ঠিকমত বুঝে উঠতে পারছে না। মনে আছে ঝাড়গ্রামে মাসখানেকের জন্যে বেড়াতে গিয়ে ধূমকেতুর অস্তিত্ব প্রথম টের পেয়েছিল। কি মন খারাপ তখন। হীরকের এক বন্ধুর আত্মীয়া গীতাদি। ঝাড়গ্রাম শহরের পাশে পুকুরিয়ায় গীতাদিদের মস্তবড় বাগান-বাড়ি আছে। বন্ধুর সূত্রেই আলাপ এবং ঘনিষ্ঠতা। গীতাদি বলেছিল, ঝাড়গ্রাম থেকে বেরিয়ে আসবেন চলুন। যাই যাই করেও যাওয়া হয় না। তো সেবার গিয়েছিল। গীতাদির বাগানে হেন ফুলের গাছ নেই যা নেই॥ পেয়ারার গাছই আছে দেড়শোটা। গাছের পরিচর্যার জন্যে আছে মালী। যাই হোক, সেই বিশাল পেয়ারা খেতে গিয়েছিল হীরক। তখনই দুঃসংবাদটা শুনল। আর এও জানল ছোটখাট মাপের হেনা কি ভীষণ জেদী আর তেজী। মেয়েরা যে কেন এত অবুঝ হয়?

সেই সময় হীরকদের অফিসে দুই মাস ধরে স্ট্রাইক চলেছিল। স্ট্রাইক মিটে গেলেও আগের সেই মেলা-খোলা পরিবেশ ছিল না। যদিও কারও চাকরী যায়নি, তবু একটা থমথমে ভাব, কি হয় কি হয়! আর তখনই কি না দুঃসংবাদটা শুনতে হল। মুখ সমান হাইটের একটা পেয়ারা গাছ থেকেই কামড়ে খাচ্ছিল হীরক। খবরটা শোনার পর ফিনিশ করার আর রুচি হল না। তখনি একটা রিকশা করে চলে এল ঝাড়গ্রাম বাজারে। রিকশা-ওয়ালাকে বলল, একটা ডাকতারখানায় নিয়ে যেতে। বেলা তখন প্রায় বারোটা। রিকশাওয়ালা নিয়ে গেল এক হোমিও-প্যাথি ডাকতারের কাছে। বুড়ো মানুষ। রোগীপত্তর ছিল না। উনি বসে বসে হাই তুলছিলেন। হীরকের কথাবার্তা শুনে ডাকতার প্রামাণিক যেন আকাশ থেকে পড়লেন, আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

খুব রেগে গিয়েছিল হীরক।

—আপনার একথা বলার মানে! আমি ওষুধ চাইছি, ইচ্ছে হয় দেবেন, না হয় না দেবেন। নীতিকথা শুনতে আসিনি।

—আপনি পাপ কাজ আমাকে দিয়ে করাতে চাইছেন বলেই আমি নীতি কথা বলছি। আপনি ভেবে দেখুন কাজটা কিন্তু ঠিক হবে না।

—আমি এটাকে পাপ কাজ বলে মনে করি না। আমি বহন করতে পারব না বলেই আপনার কাছে এসেছি।

—খুব বহন করতে পারবেন। প্রথম দিকে একটু কষ্ট হবে, পরে ঠিক হয়ে যাবে। আমার কয় ছেলেমেয়ে জানেন, সাতটি? —ডাকতার প্রামাণিক এক হাতের পাঁচটি, অপর হাতের দুটি আঙুল তুলে ধরলেন।

হীরক দুটি আঙুল শূন্যে তুলল, আমার দুটি। আপনি যদি রাজী না হন তাহলে অন্য ডাকতারের কাছে যাব।

—পাগলামো করবেন না। পাঁচটা মিনিট চুপ করে বসুন তো।

—গভর্নমেণ্টও এটা লিগাল করে নিয়েছে।

—দেখুন যুক্তির কথা তুলবেন না। যুক্তিই সব নয়। আপনি যেমন আপনার পক্ষে পঞ্চাশটা যুক্তি খাড়া করতে পারেন, তেমনি আমিও পারি পাল্টা পঞ্চাশটা যুক্তি খাড়া করতে। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? এই-খানেই আসে সত্য। মনে রাখবেন, সত্যের বিকল্প যুক্তি নয়।

ভগবান পথেঘাটে আজকাল এত দার্শনিক ঘুরে বেড়ায়। উঠে দাঁড়াল হীরক। ডাকতার প্রামানিক জোর করে একটা হাত টেনে ধরলেন, আর পাঁচ মিনিট। আমার ওপর রাগ করবেন না। ধীরভাবে মেনে নিন। মাথার ওপর ভগবান আছেন। তিনি সব দেখবেন।

—তাই দেখবেন। বেকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হবে মাত্র।

—যে আসছে সে আপনার চেয়ে ভাল চাকরী করবে বলে রাখলাম।

—হুঁ পাকা ওয়াগান বেকার হবে।

—স্যার জগদীশচন্দ্র বসু হবে।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর বারান্দায় রোজ আড্ডা চলে। সভাপতি গীতাদি। প্রধান বক্তাও তিনি। সাধারণত অপরকে অপরকে কিছু বলার চান্স দেন না। হীরক বৌ মেয়ে নিয়ে এক মাসের ছুটিতে চেপে এসেছে। এখানে শুধু নুন লঙ্কা আর সরষের তেলটা কিনতে হয়। তার মানে সব খরচা গীতাদির। তাই বক্তা হতে চেয়ে ফেঁসে কিছু বলে হীরক বিপদে পড়তে চায় না। স্থায়ী শ্রোতা হওয়াটা ভাল। মাঝে মাঝে শুধু হুঁ হাঁ করতে হয়। এইভাবে এক সময় ঘুম এসে যায়।

আজ কিন্তু আড্ডার অন্য রকম চেহারা। বক্তার পোস্ট ছাড়তে হীরক মোটেই রাজী নয়। ওর ভরসা গীতাদি হয়ত হেনাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজী করাতে পারবে। কিন্তু গীতাদির মুখেও ডাকতার প্রামানিকের অবিকল কথা। বোঝানো দূরে থাক, উল্টে গীতাদি হেনাকে ওসকাতে লাগল খবরদার ওই সব কাজ করতে যাবে না। ফলে হেনা আরও জোর পেয়ে গেল।

হীরক বলল, আমি কালই কলকাতায় ফিরব।

গীতাদি বলল, তা যান। আপনাকে বেঁধে রাখিনি। কিন্তু নার্সিংহোমে যাওয়ার মতলব যেন মাথায় না ঢোকে।

—আপনারা সবাই দেখছি ব্যাক ডেটেড। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে জানেন না।

—শুনুন—গীতাদির তর্জনী নাচিয়ে কথা বলা অভ্যেস: প্রত্যেক যুগেই একটা করে হুজুগ ওঠে। সেই হুজুগে গা ভাসিয়ে দেয় বোকারাই। আপনি এত বোকা জানতাম না তো?

—এই বোকামি তবু ভাল। একটা শিশুকে পৃথিবীতে এনে কষ্ট দেয় আকাট বোকারাই।

—তিন ছেলেমেয়ে এমন কিছু বেশি না। আমারও তিন ছেলেমেয়ে। কি হয়েছে তাতে?

—আপনার সাথে আমার তুলনা? কলকাতার সম্পত্তি ছেড়ে দিন, এই বাগান-বাড়িটার দামই তো অন্ততপক্ষে লাখ টাকা; আপনি তো উপদেশ দেবেনই।

রেডিয়াম দেওয়া ঘড়িটা হীরক আবছা আলোয় দেখে বুঝল রাত সোয়া দশটা। এই সময় কলকাতা জমজমাট। অথচ এখানে মনে হচ্ছে যেন মধ্য রাত। ইতিমধ্যে হেনা উঠে চলে গেছে শুতে। সামনের লেবু-বাগানে নিঃশেষ করে জোনাকি জ্বলছে। গীতাদি বলল, আমি ওর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি একদম রাজী নয়। আপনি জোর করে কিছু করাতে যাবেন না, পাগল হয়ে যেতে পারে। এক বিপদ মেটাতে গিয়ে আর এক বিপদ এসে হাজির হতে পারে। খুব সাবধান।

(চলবে)

রূপকথার দুঃখ

অভীক রায়

সকালে উঠে আবার পড়লাম। শুরু থেকে শেষ চিবিয়ে খেলাম আবার। কলেজের জন্য বেরিয়ে ঘুরে বেড়ালাম রাস্তায় রাস্তায়। এ রাস্তা থেকে সে রাস্তা—আমার ভীষণ ছটফট লাগছিল। আমি ছটফট হয়ে যাচ্ছিলাম। আমি কি ছটফট ? কি রকম পাগলামি পেয়ে বসল আমায়। রাস্তায় যত মেয়ে দেখি, মনে হয় সত্যি না। সত্যি না এর কোনো কিছু। কাটা ছেঁড়া করে দেখা দরকার কি আছে ভিতরে। একটা চায়ের দোকানে ঢুকলাম। ঠিক পাশেই দেয়ালে ক্যালেন্ডার। সাংঘাতিক শরীর মেয়ের ছবি। প্রায় ন্যাংটো হয়ে শুয়ে আছে। দোকানের মালিক মুখ নীচু করে কাগজ পড়ছে। আমি সাবধানে নখ দিয়ে খামচে ধরলাম মেয়েটাকে। ছিঁড়ে গেল। রক্ত নেই। মাংসও না। শুধু সাদা দেয়াল। চায়ের পেয়ালা সামনে, আমি অস্থির হয়ে উঠলাম, রাজকুমারের জায়গায় বসালাম নিজেকে। মানাচ্ছে না। তাহলে সরসীর জায়গায় চৈতিদি। দিব্যি মানিয়ে গেল ছবিটা। হায় হায়, চৈতিদিকে কখনো সেভাবে প্রণাম করি নি। ভিতরটা ঝমঝম বেজে উঠল। বাইরে এখন বিকেল। মনের মতো সাজছে।

পরদিন কলেজে গিয়ে বইটা ফেরত দিতেই তীর্থ বলল, 'কিরে ? কেমন ? কি এফেক্ট ?' হঠাৎ কি হয়ে গেল আমার। টেনে একটা চড় কষালাম ওর গালে। ও অবাক হবার আগেই জাপটে ধরে গুনে-গুনে ঠিক চারটে চুমু খেলাম, 'তীর্থ এই, এই, এই এফেক্ট।'

সতেরো

কলেজ থেকে ফিরেই বিছানায় চিৎপাত হলাম। মনে হোলো ঘরের [illegible]। রাজকুমার মিটিমিটি হাসছে। আমি বিরক্ত হলাম, 'হাসছেন যে ? বিকেলবেলায় হাসার মানে কি ?' রাজকুমার বলল, 'তুমি বিকেলবেলায় শুয়ে আছো যে ? মাথা ধরেছে ?'

—মাথা তো আপনার ধরে। আমার ওসব বাতিক নেই।

—পাকামি কোরো না। মাথা ধরা কি বাতিক ? এটা একটা অসুখ। বুঝলে ?

—অসুখ ! ! ....আমি ধড়মড় করে উঠে পড়লাম। যাহ্ শালা। একদম ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দুই চোখ ভাল করে কচলে নিলাম। কোথায় কি ? কোনো রাজকুমার নেই। বিকেল মরে বাইরেটা কালো হয়ে আছে। শরীরটা ভার লাগছে। উঠে চোখেমুখে জল দিলাম। ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে ছটা। চুল আঁচড়াচ্ছি, মা বলল, 'একটু চা কিনে আন-তো। ফুরিয়ে গেছে।'

পাড়ার ভিতর চা পাওয়া যায় না। গড়িয়াহাট যেতে হবে। যাচ্ছি, সিলেক্ট স্টোর্সের সামনে দেখি, কেকা। বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আছে। একলা। আমি এগিয়ে

গেলাম, 'কি ব্যাপার? কেমন আছো?' কেকা ভুরু কুঁচকে তাকাল। বলল, 'ভাল।'

—এদিকে কোথায়? বাসে উঠবে?

—ভাবছি।

—কোথায় যাবে? গানের স্কুলে?

—না।

—আজকাল কবে যাও?

—যাই।

—একটা পাঁচ আসছে। এটা কি তোমার?

—তোমার কত নম্বর?

—দুই।

—তুমি কি এখনো রেগে আছো?

—না।

—সেই কবেকার ব্যাপার। প্রায় এক বছর হতে চলল। এখনো রাগ পড়ল না? আমি কি ক্ষমা চাইব?

—তোমার খুশি?

—তুমি অনেক বড় হয়ে গেছ।

—জানি।

এভাবে কথা এগোয় না। চুপ করে গেলাম। হঠাৎ মনে পড়ল, ব্রণ। নাঃ, কোনো ব্রণ নেই কেকার মুখে। পরিষ্কার সুন্দর মুখ। কেকা হাসলে কি গালে টোল পড়ে? মনে নেই। ভুলে গেছি। বললাম, 'একটা কথা জিগ্যেস করব?'

—কি কথা?

—হাসলে কি তোমার গাল টোল খায়?

—তুমি জানো না?

—জানতাম। ভুলে গেছি। একটু হাসবে?

—এই ডায়লগটা কোন্ সিনেমার?

—তুমি কি আমাকে এখনো ভুল বুঝবে?

দুই নম্বর এসে গেল। ওঠার সময় কেকা বলল, 'রাস্তাটা কিন্তু সিনেমা না।'

রাস্তা সিনেমা না। দেখেশুনে পার হলাম। চা কিনে, নিয়ে এলাম বাড়ীতে। মা কি একটা সেলাই করছে। বিছানায় বসে। বললাম, চা এনেছি।

—বারুইপুরে কে থাকে?

থাবড়ে গেলাম। মা অসহ্য কড়া চোখে তাকিয়ে আছে। এই ঘরটার আলো কম। আমাদের সব ঘরেই আলো কম। কম আলোর মধ্যে মা কড়া চোখে তাকিয়ে আছে। বললাম, কেন?

—আবার কেন? সেলাই রেখে মা উঠে এল। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লক্ষ করল, 'বল, বারুইপুরে কে থাকে?'

—কেউ না। সঙ্গে সঙ্গে ঠাস করে একটা চড় খেলাম, 'হৈমন্তীকে তুই চিনিস না? আমার কাছে মিথ্যেকথা বলছিস?'

—কে হৈমন্তী?

—হেমদি হেমদি তোর হেমদি। তোর আর অংশুর হেমদি। আমি তো এত ব্যাপার কিছুই জানতে পারতাম না। ভাগ্যিস অংশু এসেছিল। ওকে জেরা করেই তো সব জেনে নিলাম। বল্, হেমদিকে চিনি না?

—চিনব না কেন? কিন্তু হেমদি কে হয় তোমার?

শত্রু, শত্রু, আমার শত্রু। তোর হেমদি আমার শত্রু হয়। বুঝলি। মা এবার কেঁদে ফেলল, তোরা সব এক। তুই, তোর বাবা, তোরা সব এক। জীবনে কোনোদিন সুখের মুখ দেখলাম না। ভেবেছিলাম তোকে নিয়ে একটু শান্তি পাব।'....... শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। মা সুখের মুখ দেখে নি। শান্তি চাইছে। সে কি আমি পারি? আমি কি চিনি শান্তি? শান্তি দেবার দায় কি আমার? বললাম, 'কাঁদছ কেন? হেমদি তো আমাকে কেড়ে নেয়নি।'

—তোকে নিয়ে যে বড় ভয় করে আমার। আমাকে কথা দে তুই আর ওখানে যাবি না।

—কথা চাইছ কেন? আমার ওপর কি তোমার বিশ্বাস নেই? মা উত্তর দিল না। ভয়ের চোখে তাকিয়ে থাকল।

আঠেরো

দোলনা সাঁকোর দিকে যাচ্ছি। বড় লেকটা পেরোতেই দেখি অংশু আর সীমন। দাঁড়াতে হোলো। শুনলাম, 'কিরে? কোত্থেকে?'

—তোরা কোত্থেকে?

—সিনেমা থেকে। মেনকায় গেছিলাম। তুই হঠাৎ এদিকে?

—এই একটু হ্যাংগিং ব্রীজে যাচ্ছিলাম।

—হ্যাংগিং ব্রীজে? কেন? সীমন প্রশ্ন করল, 'কেউ আসবে?'

—নাঃ। এমনি। বাড়ী থেকে বেরিয়ে কিছু করার নেই। ভাবলাম, যাই একটু ঘুরে আসি। অংশু বলল, 'আগে ওখানে ছোটবেলায় খুব যেতাম।' সীমন বলল, 'তাহলে চল আমরাও যাই।'

ঢোকার সময় অংশু একঠোঙা বাদাম কিনে নিল। সীমন বলল, 'এতগুলো কিনলি যে? কে খাবে? আমাদের কিন্তু চলে না।'

—আমি একাই খাব। অংশু বলল, 'আর পরোটা না খেতে পারি ওরা আছে কি করতে?' আঙুল তুলে ও জল দেখাল। কালো কালো সব মাছ। বিরাট। বিশাল। সব সময় আনমনা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছোটবেলাতেও দেখতাম এদের। আমি বড় হয়েছি। আমি ছোট নেই। আকাশে মেঘ করলে একেকদিন আমার মন কেমন করে। মাসে চারদিন দাড়ি কামাই। ইচ্ছে করে গলা মোটা করে কথা বলতে পারি। তাকাতে পারি চোখ সরু করে। চায়ের পেয়ালা সামনে নিয়ে তর্ক করতে পারি। এরকম আরো কিছু কিছু জিনিস আজকাল পারি আমি। অথচ এরা, এই মাছেরা ঠিক একইরকম আছে। একটুও পাল্টায় নি। কি করে না পাল্টে থাকে? ভাবনা হোলো। অংশু জলে বাদাম ছিটিয়ে দিচ্ছে। আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে। 'জায়গাটা কিন্তু বাজে। বদনাম আছে।'

জল দেখছি। আমাদের পাশ দিয়ে একজোড়া ছেলেমেয়ে নেমে গেল। সুন্দর পোশাক। সুন্দর দেখতে। একজোড়া সুন্দর মুখ নেমে গেল সাঁকো ধরে। আমরা তিনজন পাশাপাশি। শেষ বিকেলের জলে আমাদের ছায়া পড়েনি। সীমন বলল, 'মাঝে মাঝে এরকম জায়গা বেশ লাগে।'

বললাম, 'মাঝে মাঝে কেন? এত কাছের জায়গা। ইচ্ছে করলে রোজই আসা যায়। কিন্তু আমরা আসব না।'

—সেটাই তো আশ্চর্য। আসলে বোধহয় এরকমই হয়। কেন বল তো?। অংশু চুপ করে আমাদের কথা শুনছিল। এবার হেসে উঠল। বলল, 'ভেরী গুড। এবার সীমন চট করে একটা কবিতা লিখে ফেল্। এই আশ্চর্য ব্যাপারটাকে নিয়ে।' সীমন ছবি আঁকে জানি। কবিতাও লেখে? বললাম, 'তুমি কি কবিতা লেখ?' সীমন লজ্জিত হয়ে বলল, 'আমার মতো অনেক ছেলে আছে। যারা কবিতা লেখে।'

—কি কবিতা লেখ তুমি? মানে, কি নিয়ে?

—যা খুশি। আমার কোনো বাঁধাধরা সাবজেক্ট নেই। আসলে, তুমি খোঁজ নিলে দ্যাখো, এই বয়সে প্রায় সব ছেলেই একটা না একটা কিছু করে। কেউ গান গায়। কেউ ছবি আঁকে। আবার কেউ কবিতা লেখে।

—অংশু কি করে?

—ও তো স্পোর্টসম্যান। প্লাস এন সি সি করে। কিন্তু তুমি কি কর?

—কিচ্ছু না।

—সে কি। তোমার কোনো হবি গ্রো করেনি? তোমার অন্য কিছু করতে ইচ্ছে হয় না? এই কলেজ টলেজ ছাড়াও অন্য কিছু?

—না। আমি তো বেঁচে আছি।

—তোমার এ্যামবিশন কি?

—জানি না।

অংশু তাড়াতাড়ি বলল, 'আমার মনে হয় সোনার কোনো ফিলজফি আছে।'

—বাজে বকিস না। আমার কোনো ফিলজফি নেই। ওসব আমি বুঝি না।

—সীমনের কবিতা পড়বি? সুন্দর লেখে কিন্তু।

—না না আমার কবিতা পড়ার কি আছে? আমার কবিতা পড়তে হবে না।

—তাহলে পড়ব না। আপত্তি থাকলে পড়ব না।

—তুমি কি রাগ করলে?

অংশু বলে উঠল, 'সোনার অত সেন্টিমেন্ট নেই।'

বাদাম ফুরিয়ে গেছে। বিকেলও ফুরিয়ে গেছে। তবু এসময় অন্ধকার— চটপট নামে না। উঁচুতে তাকালাম। সুন্দর আকাশ। তারা ওঠে নি। তারা নিয়েও আমার কোনো সেন্টিমেন্ট নেই। সাঁকোর ওপাশটায় নেমে গেলে দ্বীপ। ছোটমতন। ময়লা একটা মসজিদ আছে। বললাম, 'চল দ্বীপটায় নাবি।' অংশু সাবধান করল,

—থাকুক। আয়। তিনজনে নেমে পড়লাম। ঢিল কুড়িয়ে ছুঁড়ে দিলাম। 'টুপ' একটা শব্দ হোলো জলে। এখান থেকে ওপারটা বেশ লাগে। অন্যরকম মনে হয়। শব্দ আলো সব মনে হয়, অচেনা। অংশু বলল, 'সোনা তুই ব্রীজটায় লাস্ট করে এসেছিস রে?'

—তা ধর প্রায় বছর খানেক হবে। তুই?

—আমি আরো আগে। সেই ছোটবেলায়। সীমন তুই?' সীমন হেসে ফেলল. 'তোর মতই। আসলে মজা কি জানিস; বাড়ীর এত কাছে তো! তাই হয়তো আসা হয় না। খুব আশ্চর্য কিন্তু।' কয়েক সেকেণ্ডের জন্য তিনজনেই অন্যমন হয়ে গেলাম। এত কাছের জায়গায়, এত সুন্দর। আর আমরা আসিই না। আমরা নিজেরাই কি কম আশ্চর্য? সীমন বলল, তারপর ভেবে দ্যাখ এর প্রায় গাঘেঁষা লিলিপুলটা। আমরা সেখানেও আসি না। অথচ কি চমৎকার জায়গা। কি অদ্ভুত একটা গোলকধাঁধা আছে। আমাদের ছোটবেলার হট্ ফেভারেট। আমরা ভুলেই গেছি।

ভুলে গেছি। ভুলে যাচ্ছি। ছোটবেলার হট্ ফেভারিট কিছু কিছু জিনিষ তো ভুলেই যেতে হয়। যেমন আমি ভুলে যাচ্ছি একটা জিনিষ। একটু একটু করে। একটা জিনিষ—অংশুর ওপর রাগ। অংশুর দিকে তাকালাম। মনে কি হচ্ছে আমি ওকে সহ্য করতে পারি না? ছোটবেলায় এই ব্যাপারটাও তো আমার হট্ ফেভারেট ছিল। কিন্তু আমি কি পারছি তা ধরে রাখতে? পারছি কি। অংশু গুনগুন করে একটা সুর ভাঁজছে। বুঝলাম, রবীন্দ্রসংগীত। বললাম, 'পুরোটা জানিস?' অংশু শুধু মুখটা গাইল। বললাম, 'থামলি কেন? গা-না।'

—দূর। আর জানিই না তো গাইব কি? তোরা জানিস? কথাগুলো বলে দে। গেয়ে দিচ্ছি। কি রে সীমন জানিস?

—জানতাম রে। মনে পড়ছে না। তোমার পড়ছে? সীমন আমার দিকে তাকাল। ঘাড় নাড়লাম। আমারো মনে পড়ছে না। জানা গান না মনে পড়লে খুব বাজে লাগে। অংশুকে বললাম, 'কটা বাজে রে?'

—সোয়া সাত। চল্ ফেরা যাক। সিনেমা দেখে বাড়ী যাই নি। মা ভাবছে।

ব্রীজে উঠতে যাচ্ছি, অংশু চেঁচিয়ে উঠল, 'সোনা সাপ।' চমকে, কাঠ হয়ে গেলাম। আড়াআড়ি ঠিক কয়েক ফুটের মধ্যে, মাটির ওপর শরীর টান, দাঁড়িয়ে আছে। মস্ত ফণা। কোত্থেকে আলো পাচ্ছে কে জানে। জ্যোৎস্না, না অন্য-কিছু? ফণাটা চকচক করছে। অল্প অল্প দুলছে। শাপ নাকি হিসহিস শব্দ করে। শুনছি না তো। সাত্যই শুনছি না? তাহলে হয়তো শুনছি। কিংবা শুনছি না। অথচ কাঁপছে। দুলছে। চোখের সামনে। মাটির ওপর টানটান, অল্প অল্প দুলছে। ঠিক এই মুহূর্তে কি আমার সব উল্টেপাল্টে যাবে? ঠিক এখন আমি কি কাঠ? ফিসফিস শুনলাম, 'আস্তে আস্তে সরে আয়। কিছু হবে না।' পা মেপে মেপে পাশে সরলাম। সাপটা সেই রকম দাঁড়িয়ে আছে। শুনলাম, 'ছোট্।' সংগে সংগে ছুট। ছুট ছুট একছুটে তিনজনে ব্রীজ পেরিয়ে ঘাস পেরিয়ে রাস্তায় পড়লাম।

গলাটা শুকিয়ে গেছে। ঢোক গিলতে লাগছে। বুকে ফিক্ ব্যথা। কিসের? ছোটবেলার?

অংশু বলল, 'এক্ষুনি একটা বিচ্ছিরী ব্যাপার হয়ে যেত।'

হাঁটতে হাঁটতে বললাম, 'হেমদি কেমন আছে রে?' অবাক হয়ে অংশু আমার দিকে তাকাল, 'হঠাৎ এই প্রশ্ন?' বললাম, 'এমনি'।

—হেমদি কিন্তু তোর কথা খু-ব বলে। যাবি আরেকদিন?

—হেমদি কে? সীমন জানতে চাইল।

—আছে একজন। সীমন চিনবি না। সোনা চেনে। কিরে সোনা যাবি আরেক-দিন? যাবি?

সাদার্ন এভিনিউতে এসে পড়েছি। বিড়লা এ্যাকাডেমির কাছে এসে সীমন দাঁড়িয়ে পড়ল, 'আমি কাটি মাইরী। একটা নয় আসছে।' সীমন চলে গেল। আমার মাথায় একটা প্রশ্ন ঘুরছিল। বললাম, 'আচ্ছা হেমদি কি তোর আগের চেনা?' অংশু উত্তর দিল, 'আগে তো আমরা নথে থাকতাম। হেমদিব সংগে সেখানেই আলাপ। হেমদি আমাকে জন্মাতে দেখেছে।' কথাটা বলেই অংশু হেসে ফেলল, তুই বোধহয় টাকার পয়েন্টটা ভাবছিস। ওটা আসলে কি জানিস? হেমদি দুটো বালা বিক্রী করতে দিয়েছিল আমাকে। ওটা সেই বালা বিক্রীর টাকা। হেমদির লাইফটা খুব স্যাড্রে। তোকে আরেকদিন বলব।'

চুপ করে থাকলাম। অংশু বলল, 'কি ভাবছিস?'

—তুই তো নিজেই বললি হেমদির লাইফটা খুব স্যাড্। আমার আর কি ভাবার আছে?

ঊনিশ

হঠাৎ ঠিক হোলো, নাটক। কলেজের সোস্যাল। তিনদিন ধরে মজা। একদিন রবীন্দ্রসংগীত। একদিন আধুনিক, আর মধ্যের দিনটায় নাটক। কলেজের জি এস মনোজ আমার বন্ধু। মনোজ বলল, 'একটা সাজেশন দে তো। কি নাটক নামানো যায়?'

—নামা না। যা খুশী একটা। সাংকায়ন কি বলছে?

ও তো কালচারাল সেক্রেটারী।

—সাংকায়ন কি বলবে? ওর কথা বাদ দে। তুই কিছু বল।

—রাজা অদিপাউস চলবে?

—ওটা তো বহুরূপী করে।

—তা বলে কি আমরা করতে পারি না? ওটাই কর। দেখবি ওরা খুশীই হবে।

মনোজ চিন্তিত মুখে বলল, 'জিনিষটা শালা হেভী টাফ। আমরা কি পারব?'

—রিহার্সাল দিলেই পারব। এখনো হাতে অনেক সময় আছে। এখন চল, একটু চা খাওয়াবি। সাজেশন তো পেলি।

কুড়ি

নাটকে আমার খুব একটা উৎসাহ নেই। এদিকে জোর হৈ হৈ কলেজে। রাজা অয়দিপাউস হচ্ছে। সীগগির রিহার্সাল শুরু হবে। লক্ষ করলাম বাংলা অনার্সের মিলন আগ বাড়িয়ে লীড্ নিতে চাইছে। ক্যান্টিনে একদিন মিলন জানিয়ে দিল, সে অয়াদি-পাউস হচ্ছে। আমি শান্তভাবে বললাম, 'তোকে কে সিলেকট করেছে?'

—সাংকায়ন। সাংকায়ন আমাকে সিলেকট করেছে। মনোজেরও সাপোর্ট আছে।

—মনোজের সাপোর্ট আছে কিনা সেটা আমি বুঝব। কিন্তু সাংকায়ন কে? ওসব সাংকায়ন ফাংকায়ন আমি মানি না। বরং তুই ক্রেয়ন কর। আমি অয়াদিপাউস হচ্ছি।

—তুই করবি? তোকে ঐ পার্ট মানাবে?

—তোর চেয়ে ভাল মানাবে। তাহলে এই ঠিক হোলো। আমি অদিপাউস হচ্ছি। তুই অন্য যে কোনো রোল বেছে নিতে পারিস। মিলন চেঁচিয়ে উঠল, 'তুই তো কালো। অদিপাউস কি কালো ছিল নাকি?' শান্তভাবে বললাম, 'মুখ সামলে কথা বলবি মিলন।' মিলন হতাশ হয়ে বলল, তুই গায়ের জোরে বেরিয়ে যেতে চাস অথচ তোর কোনো লজিক নেই।' বললাম, 'আমি যদি অদিপাউস হই, নাটক হবে। যদি না হই, নাটক হবে না। এবার তুই যা করতে পারিস কর।' মিলন ভয় পেয়ে গেল। চোখ পিটপিট করে দেখল আমাকে। বলল, 'নাটক বিলা হলে তুই দায়ী তো?'

—এলেন আমার মদন। নাটক বিলা হলে তোর জন্য হবে। জন্মে তো এ্যাকটিং করিস নি। নাটক সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া আছে?

—তোর আছে?

—যা আছে তোর চেয়ে বেশী।

শেষ অব্দি যা হবার তাই হোলো। তবে নাটকের দিন, বেশ বুঝতে পারছিলাম অয়াদিপাউস হিসাবে আমাকে মানাচ্ছে না। মেকাপ নেবার পর যা তা লাগছে। 'আডাকে অনেকে হাসল। সামনে বলল, 'টপ।'

মা আসে নি। চৌত্রিদিকে কার্ড দিয়ে এসেছিলাম। স্টেজ থেকে লক্ষ্য করেছি, প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে আছে। নাটক ফুরোতেই নেমে এলাম। বললাম, 'পালিও না যেন। একসঙ্গে বাড়ী যাবো।' মেকাপ তুলে পোষাক পাল্টালাম। বাইরে এসে বললাম, 'চল। জোর খিদে পেয়েছে।'

গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে চৌতিদি বলল, 'স্টেজে নার্ভাস হলি না কেন ?'

—তুমি হাসবে বলে।

—দূরদর্শী। খিদে পেয়েছে বলছিলি না ? আমাদের বাড়ী চল, মাংসভাত খাওয়াবো।

—এত রাতে তোমাদের বাড়ী ? তাহলে বাড়ী ফিরব কখন ?

—ফিরবি না। তোদের পাশের বাড়ীতে ফোন করে দেব। সকালে ফিরবি।

—কিন্তু তোমাদের বাড়ীতে কেউ যদি কিছু মনে করে ?

—ধেৎ ? কেউ কি আছে নাকি ? সব উত্তরপাড়া গেছে। বিয়ে খেতে। কাল ফিরবে।

—তুমি গেলে না কেন ? চৌতিদি উত্তর দিল, 'আমার ভাল লাগে না। কি মাংস খাবি বল ?' বললাম, —'যা তোমার ইচ্ছে। আমার সব মাংসই ফেভারিট।'

একুশ

খেয়েদেয়ে বারান্দায় বসে আছি। চৌতিদি এল। বলল, 'কোথায় শুবি ? আলাদা ? না, আমার ঘরে ?' বললাম, 'তোমার ঘরে জায়গা আছে ?'

—না থাকলে বলতাম ? খাট কিন্তু একটা।

—এক খাটে দুজনে। আঁটব তো? চৌতিদি হেসে বল্লো, 'ফাজলামি করিস না। আমার ঘুম পাচ্ছে। চটপট সিগারেটটা খেয়ে চল।'

ঝির ঝির বাতাস পাচ্ছি। জুনের শেষ। উঠোনে টগর গাছের পাতা কাঁপছে। সামনের আকাশ অল্প অল্প লাল। ঠাণ্ডা বাতাস আরেকটু ঘন হোতেই ফোঁটা পেলাম। পা লম্বা করে বসে ছিলাম। টপ করে ফোঁটা পড়ল। লাফিয়ে উঠলাম, বৃষ্টি। বারান্দার কোণে গিয়ে বাইরে হাত ছড়িয়ে দিলাম। মুখ ফিরিয়ে ডাকলাম, 'বৃষ্টি চৌতিদি বৃষ্টি। শীগ্‌গীর এসো।—বৃষ্টি। চৌতিদি উঠে এল। বাইরে হাত মেলে দিল। আমি ওর কাঁধ চেপে বললাম, 'চল ভিজি। দুজনে নেমে পড়লাম উঠোনে। আচ্ছা করে ভিজলাম। চৌতিদি বলল, 'জানিশ সোনা এটা না সীজনের প্রথম বৃষ্টি।' বৃষ্টি বেশীক্ষণ হোলো না। হঠাৎ চৌতিদি বলল, 'এই, এই সোনা পাচ্ছিস ?'

কি?

—আরে সেই গন্ধটা। সেই যে রে বৃষ্টির পরে মাটি থেকে ওঠে না। সেই গন্ধটা। পাচ্ছিস ? বলতে বলতে চৌতিদি নীচু হোলো। মাটিতে নাক চেপে গন্ধ শুকল। আমিও নীচু হলাম। মাটি ফাটিয়ে গন্ধ উঠছে। পাগল করা গন্ধ। বাচ্চা মেয়ের মতো চৌতিদি মাটি চাটল, 'উফ। দারুণ দারুণ দারুণ রে।' আমি ওকে টেনে তুললাম, 'অনেক গন্ধ শুঁকেছো এবার শোবে চল।'

দরজা ভেজানো ছিল। ঢুকে পড়লাম। আলো জ্বালালাম।

চৌতিদি একটা তোয়ালে এগিয়ে দিল। বলল, 'মাথাটা মুছে ফ্যাল। অসুখ করবে।' তারপর হেসে ফেলল, 'ধুতিতে ভিজে তোকে কেমন বোকা বোকা লাগছে।'

—আমি তো বোকাই। তোয়ালে নিয়ে মাথা না মুছে ফেললাম। গেঞ্জী খুলে ফেলে দিলাম খাটের রডে। বললাম, 'লাট্টুর একটা পাজামা দাও তো। পরে রাতটা কাটিয়ে দিই।' পাজামা আনতে পাশের ঘরে চলে গেল চৌতিদি। পাশের ঘর থেকে গলা পেলাম সোনা পাজামাটাজামা নেই। ধুতি পরতে হবে। চৌতিদি ধুতি নিয়ে এল। বলল, পর। আমি শাড়ী পাল্টে আসছি ফিরে এসে দ্যাখে, আমি ধুতি হাতে দাঁড়িয়ে আছি। বলল, কি হোলো। ক্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে আছিস যে ? পরিয়ে দিতে হবে ? কি চমৎকার এতবড় ছেলে নিজে ধুতি পরতে পারে না।

বাইশ

খাবার নিয়ে গোলমাল বাঁধল খুব। রেশনে চালের কোটা কমে গেল। খোলা বাজারে চালের দর লাফ দিয়ে উঠল তিনে কেরোসিন হাওয়া হয়ে গেল। জিনিসপত্রের দাম আগুন। একজনের পকেটে প্রচুর পয়সা। অন্যজন আঙুল চুষছে। সরকার বলে দিল, কাঁচকলা খাও। ফেটে পড়ল মানুষ। ঘরে ঘরে বারুদ জমে ছিল। দপ করে জ্বলে উঠল। দিনে দুপুরে পুলিশ গুলি চালাল রাস্তায়। সরকারের বাপ সবাই খেতে চাইছে কেন ? খিদে মেটাতে গুলি চলল। টপাটপ লাশ পড়ল। লাশ পড়ল বাসাসতে। লাশ পড়ল বসিরহাটে। লাশ পড়ল পুরোনো কলকাতার অলিতে-গলিতে। বারুদের গন্ধ। মেয়েদের কান্না। তবু ফেটে পড়ছে মানুষ। ফেটে পড়ছে চোখ।

তেইশ

কলেজ নেই। বাড়ি বসে ক্যারম খেলছি। হঠাৎ হীরক এসে হাজির।

—সোনা শীগগির চল। কোলোকাবরী হয়ে গেছে।

—কি হয়েছে ? প্রশ্নটা করেই দেখলাম হীরকের মুখ শুকনো। ঠোঁট কাঁপছে। খেলা ভেঙে দিলাম। বললাম, চুপ করে আছিস—কেন বল কি হয়েছে ?

—অংশু গুলি খেয়েছে।

এমারজেন্সীতে ঠাসা ভিড়। আঙুল তুলে হীরক অংশুর মাকে দেখাল। একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে চোখ মুছছে। বললাম, ওভাবে দেখাস না। আমি চিনি। দুজনে ভিতরে ঢুকলাম। বিছানার পাশে বেশ ভিড়। অংশুর পেটে একটা বিরাট ব্যাণ্ডেজ। চাপ চাপ রক্ত জমে আছে। অংশু ঘুমোচ্ছে। না জেগে আছে ? অংশুর বাবাকেও আমি চিনি। এককোণে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে অংশুর দিকে। ফ্যালফ্যাল ফ্যালফ্যাল চোখ জ্বালা করে উঠল। হীরক কানে কানে বলল, বাইরে চল মাইরী।

বাইরে এলাম। ঘাসের জমিতে অনেকে বসে আছে। ফাঁকা দেখে বসলাম। বললাম, কি করে হোলো রে ? অংশু তো পার্টি করে না।

হীরক বলল কাল সন্ধেবেলা নাকি অংশু আর সীমন মৌলালি দিয়ে যাচ্ছিল। ওদের চোখের সামনে পুলিশ তখন একটা বুড়ো লোককে পিটছে। অংশু ছুটে গেল বুড়োটাকে বাঁচাতে। ছুটে গিয়ে পুলিশটার কলার ধরে টেনে একটা ঘুঁষি ঝাড়ল। সীমন আর এগোতে পারেনি। তার আগেই অন্যদিক থেকে আরেকটা পুলিশ বন্দুক তাক করেছে। শালা অংশু বলে সীমন দৌড়ে গেল একটা বাড়ির আড়ালে। অংশু ততক্ষণে রাস্তায় গড়িয়ে গেছে। বুড়োটাও শেষ। সব শুনে আমি বললাম সীমন কোথায় ?

—ঐ যে। হীরক আবার আঙুল তুলল।

রোদের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। পিঠে হাত রাখলাম, কেঁদো না। ওঠো। সীমন উঠে বসল। চোখ মুছল। বলল, কিছু শুনলে ? ডাক্তার কি বলছে ?
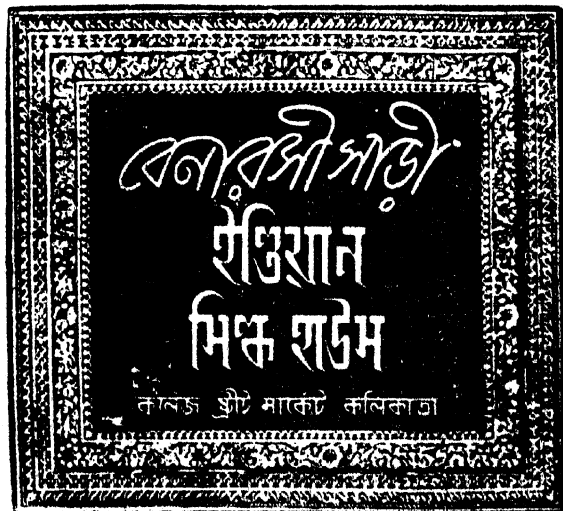
আমি আর হীরক আমরা দুজনে চুপ করে থাকলাম।

অনেক রাতে বাড়ি ফিরলাম সেদিন। বিছানায় শুয়ে ঘুম এল না। অন্ধকার। অন্ধকারের ভিতর কড়া করে চোখ চালিয়েও অন্য কিছু দেখা যায় না। যা দেখা যায় তা অন্ধকার। অন্ধকারের ভিতর অন্ধকার। সামনে পিছনে দুই পাশে শুধু অন্ধকার। কেন জ্যোৎস্না নেই, কতদিন তো দেখেছি জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে মশারীর গায়ে। তৈরী হয়েছে জালিকাটা স্বপ্ন। আজ কোনো স্বপ্ন নেই। কিছু নেই। আমি গরীব হয়ে গেছি।

পরদিন শ্মশানে বসে আমি পৃথিবীর সব সরকারকে বাতিল করে দিলাম।

চব্বিশ

সাদার্ণ এভিনিউ ধরে হাঁটছি। দুপুরবেলা। কলেজে আজকাল ভাল লাগে না। একটা দুটো ক্লাশ করে বেরিয়ে পড়ি। একলা ঘুরে বেড়াই রাস্তায় রাস্তায়। আয়নায় দেখেছি, চেহারা আরো খারাপ হয়ে গেছে। অন্যমনস্কভাবে গালে হাত বোলালাম। অনেকদিন কামানো হয় না। স্টেডিয়ামের গা ঘেঁষে হাঁটছি। গেট ঠেলে পার্কে ঢুকলাম। বাচ্চা বাচ্চা দুটো ছেলে পায়ে বল নাচাচ্ছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম। বেরিয়ে এলাম। সামনে পানের পানের দোকান। সিগারেট কিনলাম না। একটা ভিখিরী এসে হাত পাতল। আমার কি মাথায় গোলমাল। ভিক্ষে চাইছে বলে মারতে উঠছি? হাত তুলতে লোকটা ভাবল বোধহয় আশীর্বাদ। হেসে সরে গেল।

হাঁটতে হাঁটতে মুক্ত অংগনে এলাম। আমি নাটক দেখি না। অনেকে দেখে। এখানে নাটক হয়। আমি কবি না। সীমন কবি। সঙ্গে থকলে হয়তো বলতো 'জানো সোনা জীবনটাই নাটক।' কবিরা এরকম বলে। যেন জীবনটা নাটক। সব কিছু যেন সাজানো। মিথ্যে মিথ্যে। শালা সোয়াইন উল্লুক নাটক। জীবনটা নাটক। তাহলে সেই জীবনের মুখে আমি লাথি মারি। মানুষের জীবনকে মিথ্যে বানাতে কোন শয়তানের বাচ্চা সব কিছু সাজানো যদি হবে তো অংশু বাঁচল না কেন? নাটকের নায়ক না বেঁচে যায় কোথায়? কোথায় যায়? নায়ক কোথায় চলে যায়? অংশু তুই কোথায় গেছিস? বয়স কম বলেই কি আমার মাথা উঁচু হোলো? তন্ন তন্ন চোখ? ওই অসহ্য নীল ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে অংশু কোথায় চলে গেল? এ চোখে আর অংশুকে দেখি না। রামধনুও দেখি না। রামধনুর সাত রং। স্বপ্নের রং সাত। আকাশে আজ স্বপ্ন নেই। কেন নেই? অংশু তুই এখন একলা নায়ক। তুই হিরো। তুই রাজা। অংশু তুই রাজা। তোর কপালে ওঁ, চোখে তুলসীপাতা, পেটের ভিতর গরম বুলেট। [illegible] দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে [illegible]

ওরকম তাকিয়ে থাকে। সাড়াশব্দ নেই। আকাশে চোখ, আমি জোড়হাত করলাম।

এমন সময় পিঠে হাত পেলাম। ফিরে তাকালাম। লাটটু। চুপ করে তাকিয়ে আছে। ওর মুখে হাসি নেই। দুঃখও না। দূর ছাই। আমি কি দুঃখ বুঝি? শুনলাম, 'এখানে কি করছিস?'

বললাম, 'তুই হঠাৎ এদিকে?'

—শনিবারের টিকিট কাটতে এসেছিলাম। দিদিরা যাবে। তোর কি হয়েছে রে সোনা? এখনো বুঝি ঐসব ভাবিস? ও কি আর ফিরে আসবে? তোর কি তাই বিশ্বাস?

—আমার কোনো বিশ্বাস নেই। রাজে বিকিশ না।

—সোনা তুই কি জানিস তোর চেহারা কত খারাপ হয়ে গেছে?

—জানি। একটা সিগারেট খাওয়া।

সিগারেট দিয়ে লাটটু বলল, তুই আমাদের বাড়ী যাস না কেন?

—কি দরকার? তোরা তো ভালই আছিস।

—দিদি আর বেশী দিন এখানে নেই। ভাইজাগ চলে যাবে।

—চলে যাবে। যাবে?

—হুঁ। ভাইজাগ চলে যাচ্ছে দিদি। পরীক্ষার পর আমরাও। বাবার শরীরটা ভাল না। অসুখ বিসুখ লেগেই আছে।

—চৌতিদি চলে যাচ্ছে? ঠিক বলছিস? এবার লাটটু কোনো উত্তর দিল না। কিরকম অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

পঁচিশ

—তুমি এখান থেকে চলে যাবে? আর ফিরবে না?

—কে বলল ফিরব না? বাবা একটু ভাল হলেই আবার ফিরে আসব আমি। কিন্তু তুই রাগ করছিস না তো?

—রাগ করব কেন? আমি যে জানি তুমি আর ফিরবে না।

—কেন তুই এত অবুঝ বলতো?

—আমাকে ছেড়ে যেতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না তোমার?

—তুই কি আমাকে কেবল দুঃখই দিবি? আমার দিকটা একটুও ভাববি না?

চুপ করে বেরিয়ে এলাম। রাস্তায় নেমে খেয়াল হোলো, লুঙ্গীতে কাপড় দিয়েছি। কিন্তু পয়সা আনি নি। উল্টোদিকে হাঁটা ধরলাম। আলো ছাড়া একটা ছেলে সাইকেল চালাচ্ছিল। পুলিশ তুলে নিয়ে গেল। মনে পড়ল, আমাকেও কয়েকবার তুলে নিয়ে গেছে। গতবার তুলে ছিল মারপিটের জন্য। তারপর থেকে মারপিট ছেড়ে দিয়েছি। আঙুলে আজকাল আংটি রাখি না। সাইকেলের বাড়তি চেনটার বোধহয় জং ধরে গেছে, জং ধরে যাচ্ছে— হাঁটতে হাঁটতে, অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। জং ধরে গেছে, জং ধরে যাচ্ছে। কার? আমার? আমার পৃথিবীতে জং ধরে গেছে। তবে তো পাল্টাতে হয়। উল্টেপাল্টে সাফ করে নিতে হয় পৃথিবীটাকে। কিন্তু আমি? আমি কি পাল্টে গেছি? কেউ কি পাল্টায়? শরীর পাল্টায়। চেহারা পাল্টায়। [illegible] পাল্টায়। হাসির ধরন পাল্টায়। কিন্তু ভিতর কি পাল্টায়? একটা ট্রাম যাচ্ছিল। উঠে পড়লাম। কনডাক্টার—বলল, 'ভিতরে আসুন না। জায়গা আছে।' আমি হাসলাম। ভিতরে যাব না। এক স্টপ গিয়েই নেমে পড়লাম। একটা ব্যাংককের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, কে যেন ডাকল। দেখি, চেনা একটা ছেলে। শুনলাম—কেমন আছো? ভাল? হেসে বললাম, তুমি কেমন? ভাল। তারপর আর কথা বললাম না। দেশপ্রিয় পার্কে ঢুকলাম। চিৎপাত হলাম। বাঁদিকে রাস্তা পেরিয়ে সিনেমা হল। সবসময় হিন্দি বই। মালিক বোধহয় ওপরে থাকে। জোর পয়সা করেছে ভদ্রলোক। অনেকে পয়সা করে ফেলেছে। আবার অনক ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা দুটো পয়সার জন্য। অনকে বিছানায় শুয়ে পা দোলায়। অনেকে ছেঁড়া ন্যাকড়া পরে ঘুরে বেড়ায়। বেশ মজা তো! বেশ মজার একটা টনিক পাওয়া গেল এদিনে। হঠাৎ একটা বাচ্চা ছেলে এসে বলল, চা। চা খেলাম। এবার সিগারেট চায়ের পর সিগারেট না হোলে আমার আজকাল চলে না। কিন্তু এখন পকেটে সিগারেট নেই। ফাঁকা। অসম্ভব বিচ্ছিরীরকম ফাঁকা সংযমী পুরুষেরা এসময় কি করে জানি না জানি না বলে দাঁতে দাঁত চেপে অন্যকথা ভাবতে লাগলাম। ছোটবেলায় হাম হয়েছিল শুধু গা চুলকাত। নিমপাতা দিয়ে সুক্তো খেতাম। ক্যারম খেলার সময় যতবারই বোর্ড সাজাও, একটা না একটা গুটি ঠিক [illegible] পড়বে। পড়বেই। আমাদের বাড়ীতে জানলা রং সবুজ। পর্দা লাল রংয়ের। লাল আর সবুজ কি মানায়? লাল রং কিসের সিম্বল রাগের? না, অংশুর? কিরে অংশু তুই লাল? তোকে কি লাল বলা যায়? কিংবা তুই রাগ? লাল কি রাগ? তোর রক্তের রং লাল। আমার রক্তের লাল। আমাদের রক্তের রং লাল। রক্তের রং লাল। রক্তের রং রাগ। আর সবুজ? সবুজ হচ্ছে চোখের সিম্বল। সবুজ রং চোখের সিম্বল? চোখ কি সবুজ? কেউ বিশ্বাস করবে? না করুক চোখ সবুজ। সবুজ। সবুজ। সবুজ। এর আর নড়চড় হবে না।

—মিথ্যুক খালি মিথ্যে কথা। আর কেও গুল দিচ্ছিস?

—গুল দিচ্ছি? ইউ সোয়াইন....

—বাঃ বাঃ কি জিনিষ তৈরী হচ্ছে শালা। যাকে তাকে সোয়াইন বলছিস।

যাকে তাকে বলি নি। তোকে বলেছি। জানিস আমার মন খারাপ।

—তোর মন খারাপ? ছিঃ ছিঃ [illegible] মন খারাপ। ছিঃ ছিঃ হোঃ হোঃ হাঃ কি অদ্ভুত মাইরী তোর মন খারাপ কেনরে? প্রেমে পড়েছিস? পেরেম! [illegible] চুক চুক বিছানায় শুয়ে আসক্তি [illegible] প্রেম। লাফিয়ে উঠলাম। পার্ক [illegible] বেরিয়ে হন হন করে হাঁটতে শুরু করলাম।

বিছানায় বসে চৌতিদি বই পড়ছি। আমাকে দেখেই উঠে এল, কি রে সোনা বাড়ী [illegible] ফিরে এলি যে?

আগামী সংখ্যায় শেষ

কলোম্বিয়ার রেকর্ডিং রুমের চার্জ দিলাম—শ্রীশৈলেশ দত্তগুপ্তের হাতে। রেডিওর সবার কাছে বিদায় নিয়ে আমি বাসায় ফিরলাম। পরদিনই আমাদের যাত্রা—সবাইকে সি-অফ্ করতে আসতে বলেছি। স্টেশনে এসে দেখলাম—ভীমজি মানসাটার ছেলে যমুনাভাই আমাকে ট্রেনে রওনা করে দিতে এসেছেন। রেডিও থেকে স্বয়ং নৃপেনদা উপস্থিত সঙ্গে বন্ধু-বান্ধবের দল। আমার ভগ্নিপতি শ্রীযুক্ত মন্মথ ঘোষ (হেমচন্দ্র—কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনী লেখক) তিনি তাঁর সাথে করে আমার ভাগ্নী রুবিকে নিয়ে এসে হাজির হয়েছেন। যাত্রার পূর্বেই শ্রীমিন্টু এসে পৌঁছালো—হাতে মালা ও একটি তোড়া। সবাই প্রাণ ঢেলে সে মালা আমায় পরালেন—হাতে তোড়া ধরিয়ে দিলেন। ট্রেন ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় আমার চোখে জল ঝরে পড়লো॥

১৫

অনিল ও শরীকে নিয়ে আমি বোম্বাইয়েতে প্রথম উঠি হর্নবি রোডে—শ্রী পি এন মিত্র মশাই-এর প্রশস্ত কোয়ার্টারে। শ্রীফণীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ছিলেন আমার মেজদার শ্বশুর ও স্যার পি এম মিত্র মহাশয়ের আপন ন'ভাই। শ্রী পি এন মিত্র তখন বোম্বাই-এর পোস্ট-মাস্টার জেনারেল। ও'র বাড়ীতে আমরা প্রায় সারা পৌষ মাসটাই ছিলাম—জানুয়ারী ১৫ তারিখের পর আমি দাদরে হিন্দু কলোনীতে মিঃ ব্যাসের পরিচর্যায় বাড়ী পেয়ে উঠে যাই। শ্রী পি এন মিত্র মহাশয়ের সংস্পর্শে এসে একটি মাসের মধ্যেই আমার সঙ্গে তিনি বেশ কয়েকজন বোম্বাই-এর বিশিষ্টের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন—তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্যার রিচার্ড টেম্পল, রেডিও তৎকালীন স্টেশান ডিরেক-টর মিঃ স্টেট্না, স্যার চিমনলাল চিনয়, শ্রীযুক্ত কানাইলাল মুন্সী প্রভৃতিদের। পরবর্তীকালে এঁদের সবাইকে আমার চিত্র-জগতে প্রয়োজন হয়েছিল যখন তাঁরা আমায় অন্তর দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।

কুমার মুভিটোনের স্টুডিও ছিল 'আন্ধারিতে' (এখন যেটি মোহন স্টুডিও)। এই স্টুডিওতে আমার স্থিতি মাত্র দেড় দু মাসের....মিঃ ব্যাসের অত্যধিক অভদ্রতায় আমায় এ কোম্পানী পরিত্যাগ করতে হয়ে-ছিল। কাজেই বোম্বাই এ পৌঁছে আমায় দু-আড়াই মাসেই অসম্ভব দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়।

আমার বোম্বাই আসার অনতি পূর্বে বুড়োদা অর্থাৎ শ্রীপ্রেমাংকুর 'আতর্থী, মিঃ হাফেজি ও শ্রীমতী রতন বাঈ (ইহুদী কা লেড়কীর হিরোইন) নিউ থিয়েটার্স ছেড়ে বোম্বাইতে তখন মিঃ দারিয়ানীর ইস্টার্ন আর্ট স্টুডিওতে যোগ দিয়েছিলেন। ঘটনাটা ঘটেছিল আমার দৃষ্টিহীন হওয়ার সময়—কাজেই এ বিষয় আমি ওয়াকিবহাল ছিলাম না। বোম্বাই এসে এদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল কুমার মুভিটোনে যোগ দেওয়ার পরই। এরা তখন ছবি করছেন 'ভারত কী বেটি'।

মিঃ ব্যাসের সংসর্গ ছেড়ে আমি বাড়ীতে বসে যাই....মাথায় পর্বতপ্রমাণ দুশ্চিন্তা—বিদেশ বিভুঁয়ে খাবো কি—এদের খাওয়াব কি করে। এমনি সময় মিঃ হাফেজি এসে আমার বাড়ী উপস্থিত। বললেন— কাগজে দেখলাম---কুমার মুভিটোনের সঙ্গে তোর কেস পর্যন্ত হয়ে গেছে— মিঃ ব্যাস হেরে গেছে.... এখন কি করছিস্। আমি বলি— বসে বসে হাওয়া খাচ্ছি। হাফিজদা—আমায় টেনে নিয়ে তাঁদের স্টুডিও গেলেন—- ওখানে মিঃ দরীয়ানীর সঙ্গেও আলাপ করিয়ে বলেন—এতো ভালো মিউজিক দেন যে কী বলবো। মিঃ আতর্থীর বইএতে ২ খানি ভজন গান আছে—উনি বলছেন— হীরেনবাবুকে দিয়েই সুর করিয়ে নিতে চান। মিঃ দরিয়ানী বলেন, তাহলে ও'র সঙ্গে একটা কনট্রাকট করে নিন—দুখানা ভজন আর ছবির ব্যাক-গ্রাউন্ড মিউজিক তাহলেই তো চুকে গেল। সেই দিনই কন্ট্রাক্ট তৈরী করে এক হাজার একটাকা হাতে দিয়ে বিদায় দিলেন।

কুমার মুভিটোন ছেড়ে বাড়িতে বসাকালীন সময় আমি বোম্বাই-এর স্টেশন ডিরেক্টর মিঃ স্টেট্নার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি কলকাতার বেতারে আমার বেতার নাট্যকে দলের সুবাদে ৬খানি রেডিও ড্রামা প্রোডিওস করার ভার দিয়েছিলেন। এই সুযোগটুকুই ভগবান আমায় অযাচিতভাবে পাইয়ে দেন। আমার প্রথম রেডিও প্রোডাকসন ছিল মীরাবাঈ। মীরাবাঈ-এর সুর শুনেই মিঃ দারিয়ানী হাফেজি সাহেবকে পাঠিয়েছিলেন সে কথা পরে বুড়োদা আমায় বলেছিলেন। ইস্টার্ন আর্ট থেকে বাড়ি ফিরে দেখি শ্রীযুক্ত শ্রীঅশোক ঘোষ আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। অশোক কলকাতা রেডিও স্টেশনে স্বরোদ বাজাতেন (ইনি শ্রীহরেন শীল মশাই-এর সাগরেদ)। ইনি এখন সাগর মুভিটোনের মিউজিক ডিরেক্টর হয়ে মিঃ মেহ্বুবের 'মন-মোহন' ছবিতে কাজ করছেন। উনি আমায় নিরালা ডেকে বললেন, মনমোহনের গান শেষ হয়ে গ্যাছে....খালি প্রথম গানখানা মেহ্বুবের পছন্দ হচ্ছে না—তাই তোমার একটু সাহায্য নিতে এলাম। আমি বললাম, বেশ করেছো। আমার ফ্ল্যাটটা তিনতলায়—ঘরের সামনেই একটা খোলা টেরাস আছে সেইখানে দাঁড়িয়ে গুন গুন করে আমায় সুরটা শোনালো—আমার বেশ ভাল লাগলো। ও বললে, হয়েছে কি হিরো অর্থাৎ সুরেন্দ্র হিরোইনের একখানা পোর্ট্রেট আঁকতে আঁকতে গানটি গাইছে, তাই মেহ্বুব বলছেন যে ঠিক আঁকার মুডের সঙ্গে সুরটা ট্যালি করছে না। আমি একটু ভেবে বলি ...তা এক কাজ করো না... তুলির টানের সঙ্গে সুরের তালটা ভেঙে একটু টেনে টেনেই গাক না, তারপর তুমি যেমন করেছো সুর তেমনি ধরবে। ও বলে—কাল তোমায় গাড়ি পাঠিয়ে দেবো তুমি যদি একবার আমাদের স্টুডিওতে আসো। তাই ঠিক হলো। পরের দিন সকাল ন'টায় গাড়ি এসে উপস্থিত হলো, আমি যথাসময়ে লেমিংটন সি রোডে সাগর স্টুডিওতে পৌঁছলাম। অশোক আমার সঙ্গে মিঃ মেহবুবের আলাপ করিয়ে দিল। মিঃ মেহবুব আমাকে বেশ করে সিচুয়েশন বুঝিয়ে দিলেন। আমি যা বলেছিলাম—সেইরকম করে অশোকের সুরেই গানখানিকে ডিমন্স্ট্রেট করলাম—মেহবুব - সুরেন্দ্র

হিরোইন 'বিন্দো' সবারই পছন্দ হলো। গানখানি সেইদিনই তুলতে হবে কেননা রিলিজ ডেট অ্যানাউন্স হয়ে গেছে। আমি ভাবলাম যদি এটা অপরের মুখের গানে হিরোর ঠোট নাড়া হোতে পারতো তবে ডাইরেক্ট প্লেব্যাক করে দেখতে পারতাম কিন্তু এখানে হিরার গলায় হিরোই গাইছে কাজেই ভাবনায় পড়লাম। অথচ ডাইরেক্ট গান গেয়ে অ্যাকশন দিতে গেলে সুরেন্দ্র কেমন আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

তাই আমি মিঃ মেহবুবকে বললাম—আপনাদের সাউন্ড রেকর্ডিস্টকে একটু ডেকে দেবেন, মেহবুব বললো নিশ্চয়ই। মিঃ চন্দ্রকান্ত সাউন্ড রেকর্ডিস্ট পাশেই ছিলেন—তাঁকে দেখিয়ে মেহবুব বললেন—ইনিও একজন রেকর্ডিস্ট।

আমি চন্দ্রকান্ত ভাইকে বললাম—আপনাদের তো প্রোজেকশন মেসিন রয়েছে তাই স্ক্রীনের পেছনের লাউডস্পিকারটাতে তার যোগ করে ওটাকে স্টুডিওতে লাগাতে পারেন?

উনি বললেন—কেন কি হবে।

আমি ওকে আমার আইডিয়াটা বুঝিয়ে বললাম যে, এখনি আপনারা প্রোজেকশনের আপনাদের ঐ সিনটা আমায় দেখালেন আমি শুধু সাউন্ডটা এই স্টুডিওতে দাঁড়িয়ে শুনতে চাই—যদি শোনাবার ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে এ সিনে আপনাদের ফুল ফুটিয়ে দেবো। চন্দ্রকান্তের ইতস্তত ভাব দেখে মেহবুব বলেন—আরে লাগাও না চন্দ্রকান্ত—বোসবাবু, ক্যা করণে চাহতা হায় থোরা দেখনে দেও না।

চন্দ্রকান্ত প্রায় আধ ঘন্টা পরে লাউডস্পিকারকে স্টুডিওয় ফিট করে—রীল প্রোজেকশন মেশিনে চড়ালো। আমি সুরেন্দ্রকে বললাম—ভাই সুরেন্দ্র তুমি আমার গাওয়া গানটার সঙ্গে শুনে শুনে এখানে বসে গাইতে পারবে। ও বললো—জরুর। চন্দ্রকান্ত শুরু করাতে বললাম প্রোজেকশনকে। গান শুরু হতেই সুরেন্দ্র আর গাওয়া গানের সঙ্গে গলা দিয়ে গাইতে লাগলো। আমি বললাম—বাস হয়ে গেছে। এইবার ওর গানখানি আমি যেভাবে শেখালাম সেইভাবে রেকর্ড করে নাও। আজই রাতে ডেভালাপ করে কাল সেটে ছবি আঁকাতে ওর গানের সঙ্গেই আবার গাইবে। ফারদুন ইরানী ক্যামেরাম্যান বলেন—আপ সমঝা—সাবাস।

সারাদিন রিহার্সাল করে নিয়ে বেলা তিনটা নাগাদ নতুন করে গান টেক করা হোলো—এবং সেই গানই প্রোজেক্টারে ফেলে স্টুডিও লাউডস্পিকারে রিপ্রোডিউসড হয়ে ছবি তোলা গান সমাপ্ত হলো, এইভাবে মেশিন মারফত ১৯৩৫-এর ফেব্রুয়ারীতে প্লেব্যাক প্রথম গান হলো—'তুমনে মুঝকো প্রেম শিখায়া'। এর আগেই সুরেন্দ্রার উক্তি জানিয়ে এসেছি সঙ্গে পেয়েছেন মেহবুবের প্রশংসাপত্র।

ভারত কী বেটির দুখানি ভজনের মধ্যে আমীরবাঈ গীত 'তেরে পূজনকো লিয়ে ভগবান' সুপার হিট করেছিল।

ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক সাঙ্গ হতেই মিঃ দারিয়ানী আমার সঙ্গে পাকাপাকি কন্ট্রাক্ট করলেন, ওঁর একখানি গল্প 'ধরম কী দেবী'-র চিত্র ও সঙ্গীত পরিচালক রূপে। এই ছবিতে আমি শ্রীগোবরধন ভাইকে ক্যামেরায় এনেছিলাম—এনেছিলাম তাঁর এ্যাসিস্টেন্ট হিসাবে দয়া ভাইকে। আজ যাঁরা অপটিক্যাল প্রিন্টিং ও টেক্লার কবার একমাত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন।

ধরম কী দেবীতে ছিল একটি 'শিপ-রেক'—জাহাজ ডুবির দৃশ্য, এ দৃশ্য এতই সুন্দর হয়েছিল যে মিঃ শান্তারাম পর্যন্ত আমায় ডেকে নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছিলেন। তখনকার দিনে ছবি প্রশংসনীয় হলে বড় বড় পত্রিকায় Honour Page দিবেন। এ ছবি সেই অনার পেজ অর্জন করেছিল।

ছবিখানিতে নায়ক ছিলেন—কুমার (যিনি নিউ থিয়েটার্সের পূরণভ কত ছবির নায়ক ছিলেন)। নায়িকা ছিলেন সর্দার আখতার (পরবর্তী কালে মিসেস মেহবুব হয়েছিলেন) আর ছিলেন যাঁরা তাদের মধ্যে 'গোপ' ও ফিরোজ দস্তুর (গায়ক) বিশিষ্ট ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন। তৎকালীন বিখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী শান্তাকুমারীও এই ছবিতে জাহাজ ডুবির দৃশ্যে তাঁর কলাচাতুর্যে দর্শকমন্ডলীকে অভিভূত করেছিলেন। সঙ্গীতাংশে এই ছবিতেও বাংলা ছবি জোর বরাতের মত ডাইরেক্ট প্লে-ব্যাক ছিল। শ্রীঅনিল বিশ্বাস গান করেছিলেন। সে গানে ছবিতে কুমার লিপমুভমেণ্ট দেন। ছবিখানি ১৯৩৪-এর মার্চেই রিলিজ হয়।

ইস্টার্ন আর্টে প্রজেকশন থিয়েটার ছিল না বলেই আমাকে আবার এই পদ্ধতিতে প্লে-ব্যাক করাতে হয়েছিল। তখনকার দিনে পথচারী ফকীরের গানের সময় ডাইরেক্ট মাইক গায়কের মুখের সামনে ধরে ক্যামেরার field এর বাইরে রেখে যেমন পথচারীর মত পিছু হেঁটে চলতে হয়েছিল তেমনি ক্যামেরার ট্র্যাকের মত Music truck এ অর্কেস্ট্রা বাদকদের বসিয়ে গাইয়ের পিছু পিছু ঠেলে নিয়ে যেতে হয়েছিল।

উত্তাল তরঙ্গ মালা পরের পর এসে দোদুল্যমান ভগ্ন জাহাজখানির ওপর দিয়ে প্লাবন সৃষ্টি করে চলেছিল—সেগুলিও স্টুডিওর সেটে বসেই নিতে হয়েছিল। তার কিছুটা বর্ণনা করে আপনাদের সামনে রাখছি। তরঙ্গমালায় যখন জাহাজ দোলে, তার দোলন স্থির জায়গাতে দাঁড়িয়েই যেমন প্রতীয়মান হয়.... তেমনি সেট যদি দাঁড়িয়ে থাকে তাইলে ক্যামেরাকে দোলালেই ওই ছবিই আপনারা দেখতে পাবেন। আমাদের ক্যামেরা তাই Rocking chair- এর ওপরই রক্ষিত হয়েছিল। তৈরী ডেকের সামনে অর্থাৎ ক্যামেরার দিকেই বড় বড় বেশ ফিট করে তার ডেকের দিকের ওপর অংশে কাত করে প্ল্যাঙ্ক ফিটেড ছিল। ২৪টি জলভরা বালতির ব্যবস্থা ছিল.... যার ১২টি করে বালতি জলা জলের এই রেসের কাঠের ওপর দিয়ে সজোরে ছুঁড়ে মারা হচ্ছিল—এবং কাত করা প্ল্যাঙ্কে ধাক্কা খেয়ে খরস্রোতে ডেকে ছিটকে পড়েছিল—সঙ্গে সঙ্গে অপর ১২ বালতির জলপ্লাবন এসে পড়ছিল—সেটা থামলে আবার ১২ বালতি জলস্রোত এসে পড়ছিল—এমান করেই ক্রমান্বয়ে এইভাবে ডেকের জলপ্লাবনের সৃষ্টি করা হয়েছিল। সামান্য একটু দৃষ্টান্ত তুলে বোঝাতে চাইলাম যে কি করে রোলিং সমুদ্রের তরঙ্গক্ষেপ জাহাজের পাটাতনকে জলপ্লাবনে বার বার বিচলিত করে তুলতে পেরেছিল। অবশ্য বন্দরে দাঁড়ানো একটি ইতালিয়ান Ship S.S. Victoria-র উপর থেকে জাহাজের Boating, unboating ও অন্যান্য দৃশ্য গ্রহণ করেছিলাম।

এই ছবি দেখে এবং মেহবুবের মনমোহন ছবির গানের সুরাহা দেখে সাগর মুভিটোনের মালিক শ্রীচিমনলাল দেশাই আমায় তাঁর স্টুডিওতে যোগদানের নিমন্ত্রণ জানান সঙ্গীত ও পরিচালনার দুটির ভারই তিনি অর্পণ করতে রাজী আছেন। আমি সেখানে যোগদান করবার প্রতিশ্রুতি দি। কিন্তু ইতিমধ্যে মিঃ দরিয়ানী তার বন্ধুর গোল্ডেন ঈগল প্রতিষ্ঠানের একটি ছবির জন্য আমাকে চুক্তিবদ্ধ করেন। তাই চিমনভাইকে কথা দিই যে এ ছবিধ শেষেই আমি সাগর মুভিটোনে যোগদান করব। এ ছবিখানির নাম ছিল 'পিয়া কী যোগন'।

এর মাঝে আবার রেডিওতে নাটক প্রযোজনা করা হলো 'কুঞ্জসুদামা'—কাজেই কলকাতার মত বোম্বাইতে এসেও রেডিও—চিত্রজগত দুই প্রতিষ্ঠানেই কাজ করে চলছিল।

এই সময় এক মজার ঘটনা ঘটে গেল।........

বোম্বাইতে একটি নতুন চিত্র প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হলো—যার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হলেন—শেঠ গোবিন্দ দাস এম-পি এবং শ্রী ডি পি মিশ্র (পূর্বতন এম-পির মুখ্যমন্ত্রী)। প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল—আদর্শ চিত্র লিমিটেড। এরা চিত্রজগতের কোন ব্যক্তি বা শিল্পীদের না নিয়ে শিল্পী সংকলন করলেন এলাহাবাদ থেকে। মীরা এলেকজেণ্ডার (যিনি বোম্বে টকীজের ভাবীর নায়িকা হয়েছিলেন), শ্রীএস এন ব্যানার্জি ওরফে পিটুবাবু (ইনি এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের লেকচারার ছিলেন)—শ্রীমতী লীলা চিটনীস (যিনি মহারাষ্ট্র স্টেজের অভিনেত্রী ছিলেন)। এঁদের ছবির নাম 'ধোয়াধার' মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী ও রাজাদের নিয়ে উপখ্যান। পরিচালক হয়েছিলেন—শ্রীসুকুমার চ্যাটার্জি (যিনি হলিউডে কুড়ি বছর কাটিয়ে এসেছিলেন)। মিউজিক করছিলেন—এলাহাবাদের একজন বিখ্যাত বেহালাবাদক (এখন নাম মনে নেই)। ক্যামেরাম্যান স্বয়ং আম্বালাল প্যাটেল (যিনি পরে প্যাটেল ইন্ডিয়ার মালিক হয়েছিলেন—

ার প্রতিষ্ঠিত ফিল্ম সেন্টার)। এইসব
ী মহারথী সম্মিলনে গড়ে
ুলেছিলেন—আদর্শ চিত্রকে।

বোম্বের গিরগাঁও অঞ্চলে প্রকাণ্ড
কটি বাড়িভাড়া করে এরা এঁদের শিল্পী
টেকনিশিয়নদের রেখে রিহার্সাল
লাতেন—এবং আর দেশী ইম্পিরিয়াল কোম্পানীর স্টুডিওতে শুটিং
রতেন। ইম্পিরিয়াল কোম্পানীই সর্বপ্রথম
ারতে টকী ছবি 'আলমারা' দর্শকদের
পহার দেন।

আমার বন্ধু শ্রীবিমল মিত্র (ক্যামেরা-
ান ভবনানী স্টুডিও) এসে আমার
লেন, প্রোফেসর ব্যানার্জি আমার সঙ্গে
থা করতে চান—আপনার ছবির তিনি
ান। কাল তাঁকে নিয়ে আসবো। তাঁর
ুখেই শুনবেন আদর্শ চিত্র প্রতিষ্ঠানের
াদর্শের কথা—সত্যই এ প্রতিষ্ঠানটি
রা বোম্বাইতে চমক জাগিয়েছে। শুনলাম
িলউড স্পেশালিস্ট চাটুজ্যে মশাই জঙ্গলের
ঘের আক্রমণ কারটুনে তুলে প্রাণবন্ত
রবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। জগতে অবিশ্বাস্য
ছুই নেই তাই অকপটে বিমলবাবুর
থাগুলি বিশ্বাস করলাম।

পরদিন বিমলবাবু প্রোফেসর এস-এন-
নার্জিকে নিয়ে আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত
লেন। আমি অনিল পরিতোষ তিনজনেই
াকে আপ্যায়িত অভ্যর্থনা জানালাম। তিনি
শ সুন্দর জমিয়ে কথা বলতে পারেন, তবে
লেন নবাগত বলে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে
ামার কাছে আলোচনা করতে এসেছেন।
ুবের বর্ণিত সমস্ত ব্যাপারটি বর্ণনা করে
জ্ঞেস করলেন—এখন বলুন দেখি মি:
াস আমার ফিল্ম লাইনে যোগ দেওয়াটা
ল না ঠিক্।

উত্তরে আমি হাসতে হাসতে বলেছিলাম
-কি জানেন, কথায় বলে সাতটা গাধা মরে
কটা টিচার হয়। সাতটা টিচার মরে তবে
কটি প্রোফেসর হয়—আর সাতটি প্রোফেসর
রলে তবে একটি ফিল্ম ডিরেক্টর হয়—এই
ামার অভিজ্ঞতা; এখন আপনি নিজেই ভেবে
দখুন—কাজটা আপনি ভাল করেছেন কি
ন্দ করেছেন।'

এমনি হাসি-ঠাট্টার মাঝে তিনি বিদায়
লেন—আমাকে তাঁদের গিরগাঁও চিত্র-
াসাদে নিমন্ত্রণ জানালেন। এর ক'দিন পরে
বিমল মিত্র মশাই আমায় ও'দের চিত্র-
তিষ্ঠান ভবনে নিয়ে গেলেন, সবার সঙ্গে
ালাপ করালেন। মিঃ চ্যাটার্জির কাছে
লিউডের রীতিনীতি সম্বন্ধে সাতীদীর্ঘ
ক্তৃতা শুনলাম। তাঁর বাঘ লাফাবার প্রচেষ্টা
খাতে নীচে নিয়ে গেলেন। একটি ঘরে
াশিকৃত টেনস্প্যারেন্ট সেলুলয়েড সিটে
াঘের লাফ দেওয়ার ক্রমবিকাশ চিত্রিত
চ্ছে, তাও দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এই
বির প্রকল্পে হয়ত বাঘের ঝাঁপিয়ে পড়া
তে পারে, কিন্তু সেটা প্রাণবন্ত করে
ভাবে ছবির পর্দায় আনবেন? উনি একটু
বজ্ঞার হাসি হেসে বলেন, ওটা স্ট্রিকটলি
াইভেট। ওটাই তো এসব শটের সিক্রেট।

ভূপালোক হলিউডের প্রায় সব ডিরেক-
টারেরই লেখা সার্টিফিকেট ঘরের চার দেয়ালে
ফ্রেমবন্ধ করে টাঙিয়ে রেখেছেন। তার মধ্যে
একটি প্রশংসাপত্র দেখলাম যে ডিরেক্টার
সিসিল বি ডি মিল লিখছেন যে তাঁর সঙ্গে
মিঃ চ্যাটার্জির পরিচয় বিশ বছরেরও অধিক।
এসব দেখে থ' মেরে বিমলবাবুকে নিয়ে ঘরে
ফিরে এলাম। দেখলাম ও'দের ইউনিটের
আর্ট ডিরেক্টর হয়ে স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছেন
মিঃ শীল, যিনি নিরহংকারী পণ্ডিত, মুখে
সদাই হাসি। উনি জব্বলপুরের অধিবাসী
হয়ে গেছেন। মিঃ ডি পি মিশ্রের অনু-
রোধেই এ প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন, শখ
করে।

গোল্ডেন ঈগলসের মিঃ লালা আমায়
গল্পাংশ শোনালেন এবং সিনারিও তৈরীর
আহ্বান জানালেন। 'পিয়াকী যোগন' অর্থাৎ
প্রিয়ার জন্যে যোগিনী সাজিব। কাজেই এই
যোগিনীর খোঁজে সবাই চারিদিকে দৃষ্টি
নিক্ষেপ করে বসলাম। এলেন এক সুন্দরী,
নাম কৃষ্ণকুমারী! যার জন্যে যোগিনী হবেন
কৃষ্ণকুমারী তার খোঁজ বোম্বাইতে পাওয়া
যাচ্ছে না। আমি তার খোঁজ করতে বলে
সিনারিও লিখতে ভারসোভা বিচের কটেজে
চলে যাই, নিরালায় বসে কাজ করবার জন্যে।

পরি, অনিল ও আমি একদিন খোলা
সমুদ্রের বালিরাশির ওপর বেতের চেয়ার-
টেবিলে বসে এই ছবিখানির একটি দৃশ্যের
সম্বন্ধে আলোচনা করছি, এমন সময় শ্রীবিমল
মিত্র মশাই প্রোফেসর এস, এন, ব্যানার্জিকে
নিয়ে ভারসোভায় এসে হাজির। সকলকেই
অভ্যর্থনা জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার
কি; আপনাদের ছবির কতদূর এগুলো?

প্রোফেসর ব্যানার্জি বললেন সেইজন্যেই
তো আপনার শরণাপন্ন হ'তে এসেছি।

মুখের দিকে চেয়ে থাকি—উনি ধীরে
ধীরে বলেন, আমাদের ডিরেক্টর পালিয়ে
গেছেন।

আমি বলি, সে কি রকম? ছবি এতটুকু
এগোয় নি? বললেন—প্রায় ৭০।৭৫ হাজার
ফিট্ একস্পোজ করিয়ে তিনি সরে পড়েছেন
অথচ এই একস্পোজড্ ফিল্মের কিছুই
আমাদের কর্তৃপক্ষের মনোমত হয়নি। সে
যাক, এতদূর এগিয়ে তো ফেলে দেওয়া যায়
না তাই ওরই মধ্যে রেখে ঢেকে এখনও কম
করে ৭।৮ দিন শুটিং করলে তবে একটা রূপ-

দাঁড়াতে পারে। মিঃ ডি, পি, মিশ্র তাই একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান ও-বিষয়ে একটু আধটু পরামর্শের জন্যে।

আমি বললাম—এটা সুখের কথা, তাকে নিয়ে কবে আসবেন বলুন? সামনের রবিবার আমার দাদারের বাড়ীতে এলেই ভাল হয়, কারণ আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি শনিবার।

রবিবার বেলা ৩টা নাগাদ প্রোঃ ব্যানার্জি—মিস্টার ডি পি মিশ্রকে নিয়ে আমার বোম্বাই-এর বাড়িতে পৌঁছলেন। মিঃ মিত্র ওঁদের চিত্র-দুর্যোগের কথা সংক্ষেপে সেরে নিয়ে স্টোরির খামতি দৃশ্যগুলি পড়ে শোনাতে থাকেন এবং আমার অনুরোধ জানান যে আমি যদি এ দৃশ্যগুলির সুটিং করে ছবিখানাকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারি।

আমি বলি—আমি যে অপর কনসার্নের কাছে কাজ করছি—তবে আপনাদের যদি একান্ত আমায় পেলেই উপকৃত হন মনে করেন তবে রাতে শুটিং ফেলুন আমি করে দিয়ে আসবো।

কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে গেল....যে আজ আমি সারা স্ক্রিপটা পড়ে কিছু অ্যাডজেস্ট করবার থাকলে কাল এসে সব ঠিক করবো।

ওঠার সময় মিশ্রজী বলেন—আপনার কত দক্ষিণা জানালে বাধিত হব।

আমি বলি—আপনি বিপদে পড়ে এসেছেন—আমি আপনার বিপদটুকু থেকে আপনাকে উদ্ধার করতে পারলেই ধন্য হব দক্ষিণা লাগবে না। দক্ষিণা নেবই বা কেন? আমি তো অপর জায়গায় চাকর—ডবল চাকরি করা কি উচিত?

উনি হেসে কাল আবার আসার কথা জানিয়ে নীচে নেমে যান। নামতে নামতে আবার উঠে এসে জানান—যে দৃশ্যে হিরোইন উদাস চোখে বাতায়নে বসে আছে তার পেছনে একটি সুরদাসের ভজন দেবো ভাবছি। আপনাকে ভজনের কথাগুলি দিয়েই যাই, সুর করে রাখবেন। কাল ডিসকাস করে ওটার সংগতি করা যাবে।

আমি ওর লেখা কাগজখানি হাতে নিয়ে নি, উনি নেমে গেলেন। দেখলাম কাগজে লেখা সুরদাসের বিখ্যাত ভজন 'নিশিদিন বরষত নয়ন হামারি'—এইরকমই হবে।

একটু পরে আবার মিঃ ব্যানার্জি ফিরে এলেন—বললেন, উনি আমায় নামিয়ে দিয়ে গেলেন—বললেন, আপনার দক্ষিণাটা আপনাকে নিতেই হবে।

আমি বললাম—কেন ক্রিমিন্যাল-এ এ ফেলতে চান? যান-যান বসকে বলুন ছবি শেষ করতে চান তো আমার কাছে আসবেন আর টাকা যদি দিতে চান তবে ফিল্ম লাইনে অপর সুকুমারবাবু অনেক জুটবে।

শেষবেশ বিনা দক্ষিণাতে শুটিং চালু করবার দিন ধার্য হলো—এবং শ্রীমতী লীলা চিটনিসকে নিয়ে প্রোফেসর ব্যানার্জি আমার কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন—সিনগুলো একটু রিহার্সাল করিয়ে দিন। লীলা দাদরেই থাকে ও এসে আপনাকে কয়েকদিন বিরক্ত করবে।

শ্রীমতী লীলা চিটনিস বি-এ মহারাষ্ট্র স্টেজের একজন সুদক্ষ অভিনেত্রী। ওঁর স্বামী ডাঃ চিটনিস একজন জার্মানীর ডকটোরেট। দুজনের সঙ্গেই আমার পরিচয় হলো। লীলাও তারপর থেকে নিতান্ত অনুগতার মতই আমার কাছে আসা-যাওয়া করতেন।

পিয়াকি যোগনের হিরোর জন্য প্রোফেসর ব্যানার্জি—এলাহাবাদ থেকে তাঁর এক জানিত যুবককে আনিয়ে দিলেন—ইনিই হোলেন এখন চিত্র, বেতার ও মঞ্চ-জগতের শ্রীপ্রমোদ গাঙ্গুলি। কাজেই পিয়াকি যোগনের কাস্টিং ঠিক হোলো—প্রমোদ, কৃষ্ণকুমারী সরদার আখতার, আশালতা, আশা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ছবিই আমার প্রথম ছবি। ক্যামেরায় গোবর্ধনভাই। দলাভাই সুধীর বাসু ইত্যাদি তাঁর অ্যাসিসটেন্টের দল। পবিকে আমি সাউন্ড এ্যাসিসটেন্ট করে সাউন্ড এঞ্জিনিয়ার মিঃ দেশাই এর সাথে জুড়ে দিয়েছি। সুধীর বসু—আমার দোড়ীদির দেওর—ওকে বোম্বাইতে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন ক্যামেরার কাজ শেখার জন্য—তাই গোবর্ধনভাই-এর হাতেই তুলে দি। মিউজিকে আমি—অনিল বিশ্বাস সঙ্গীত সহকারী পরিচালক।

শ্রীমতী আশালতা ও শ্রীমতী লীলা চিটনীসকে পেয়ে আমার খুবই সুবিধা হলো—রেডিওতে নাটকে। আমার বোম্বাই রেডিওতে তৃতীয় নাটক অভিনীত হলো—তুফান কী রাত (কক্ষের রাতের 'হিন্দী')। প্রমোদ গাঙ্গুলী-প্রোফেসর ব্যানার্জি অনিল বিশ্বাস আমি এবং দুজন অভিনেত্রীদের নিয়ে।

এদিকে 'ধোয়াধার' শুটিং ইম্পিরিয়েল স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত লাগলো। শ্রীঅনিল বিশ্বাস সুর ভজনখানি একটি ভিখারীর রূপসজ্জায় উদাসীন রাজকুমারীর বাতায়নতলের দিয়ে গেয়ে চলে গেলেন....ইত্যাদির চলছে। দুবার শুটিং-এর পর ক্যামেরা মিঃ আম্বালাল প্যাটেল আমায় নি নিয়ে বললেন—মিঃ বোস আমি ভেবেছি ছবিখানি আমিই ডাইরেক্ট করে শেষ নেবো—আপনি এসে গিয়ে আমি সুযোগ হারাচ্ছি।

আমি বলি—অতএব কাল আমি সিক, আপনিই এগিয়ে চলুন।

সেই কথা মতই কাজ হলো

সেই কথামতই কাজ হলো। আম্বালাল প্যাটেলই ধোয়াধার করলেন। আমি অসুস্থতার ভান করে মারলাম।

আমি পিয়াকি যোগনের শুটিং করলাম। আদর্শ চিত্রের শেষ পরি দেখার আগেই প্রোফেসর ব্যানার্জি এল বাদের টিকিট কিনে আমার কাছে নিতে একদিন দুপুরে এসে উপস্থিত হ এবং জানালেন যে আমি প্রথম দিনে যে উক্তি করেছিলাম—সিনেমাজগত তা সেইজন্য ফিরে যাওয়াই সমীচীন।

আমি বলি—সত্যিই আপনি এল বাদে ফিরে চললেন না টিকিট কেটেছি আমাকে....

উনি বলেন—ব্লাফ দিচ্ছি ভাবছে এই দেখুন টিকিট আজ সকালেই বুক তবে আপনার সঙ্গে শেষ দেখা ক এসেছি।

টিকিটখানা হাতে নিয়ে আমি অ আর পরিকে বলি তোম দুজনে চলে ভি টিতে (ভিকটোরিয়া টারমিনাস) টি রিফান্ড করে গিরগাঁও থেকে মিঃ ব্যানা পোটলাপুটলি তুলে নিয়ে আর।

মিঃ ব্যানার্জি ওরকে পিটু বলেন—সে কি মশাই, বাড়িতে তাব দিয়েছি আমি যাচ্ছি....

আমি বলি—আবার তার করুন আমি যাচ্ছি না। কদিন বন্ধুর থেকে যাচ্ছি।

উনি বলেন—মানে ?

আমি বলি—দুদিন আমার থেকে যান। আমার এ্যাসিসটেন্ট হয়ে পি যোগনে কাজ করুন। অভিনয় করতে তবে পিয়াকি যোগনে যে স্টেটের রোল রয়েছে সেই অংশটি অভিনয় কর বোম্বাই তেতো খাইয়ে অতিথি বিদায় এ ঘটতে দেবো না। পোলাও বিরিয়া না খাওয়াতে পারি বাঙালীর ছেলেকে ভাত খাইয়ে মিষ্টি হাতে দিয়ে দেবো। সেই অবধি পিটুবাবু অ এ্যাসিসটেন্ট হয়ে রয়ে গেলেন। ছ পার্টও করেছিলেন।

(চলবে)

বিজ্ঞান

বাঁচো এবং বাঁচাও—৬

নদ-নদী, হ্রদ, প্রাকৃতিক পুষ্করিণী, তড়াগ, বিল, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলাভূমি, হাওড়,—এসবই প্রকৃতির জল ধরে রাখার স্থায়ী জায়গা।

যে অঞ্চলে এগুলি থাকে সে অঞ্চলের বেশ খানিকটা অংশ জুড়ে তার পাশের মাটি থাকে নরম, উর্বর। আবহাওয়া থাকে ভিজে।

মানুষের চাহিদা বেশী হওয়ার ফলে, জমিতে স্বাভাবিক উপায়ে দুটো ফসল হয় ভাল ভাবে সেখানে সে অস্বাভাবিকভাবে উৎপাদন বাড়িয়েছে চতুর্গুণ। তার জন্যে তার জল খরচ গেছে বেড়ে। সেই জলের যোগান দিতে তাকে খাল দিয়ে জল টানতে হচ্ছে দূর-দূরান্তর অঞ্চলে অস্থায়ী জলাধারগুলি থেকে।

ফলে বারিবাহ (ড্রেনেজ) পদ্ধতিতে এক-একটি জলাধার থেকে জল-নির্গম হচ্ছে অস্বাভাবিকভাবে অতিরিক্ত। হ্রদে নদ-নদীতে, প্রাকৃতিক পুষ্করিণী, বিল তড়াগে জল আসছে শুকিয়ে।

ব্যাপারটা খুব বেশী করে নজরে পড়ে উত্তর আমেরিকায় আর ইউরোপে। উত্তর আমেরিকায় দুশ বছর আগেও ছিল। এক হাজার একশ ত্রিশ লক্ষ একর জোলো জমি। এর থেকে এক হাজার লক্ষ একরই হয়ে গেছে একেবারে জলশূন্য।

উত্তর ভারতে আশী লক্ষ একর নরম, উর্বর জমি ক্রমাগত জল-নির্গমের ফলে এখন ঊষর মরুভূমি। সেখানে প্রতি বছর মরুভূমি শ্যামল অঞ্চলগুলির ওপর এগিয়ে আসছে তার করাল থাবা ক্রমাগত বাড়িয়ে বাড়িয়ে।

পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু উপত্যকায়, মধ্য এশিয়াতে, ইরাক, ইরানে, তুর্কীস্তানে লক্ষ লক্ষ একর জমি নোনা-খরায় ঊষর হয়ে এখন চাষের অযোগ্য। এসব হচ্ছে শুধুমাত্র পরিবাহের জন্য।

কৃত্রিম উপায়ে সেচ-পদ্ধতির উন্নতি খুব ভেবেচিন্তে না করলেই, জমির অবনতি ঘটতে বাধ্য। অবনতিটা সেই অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশী হবে, যেখানে প্রাকৃতিক পরিবাহ এবং বৃষ্টিপাত কম। সেই সঙ্গে বাষ্পীভবনের হার খুব বেশী।

স্থায়ী জলধারগুলির চারপাশের জমি ভিজে, নরম ও উর্বর প্রকৃতির নিজস্ব ব্যবস্থায়। ঐসব বড় বড় জলাধার থেকে জল মাটির তলা দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে (ক্ষরণ) পাশের জমিতে অনুপ্রবেশ করে। একে ইংরেজিতে বলে ইনফিলট্রেশন। সরু সরু চুলের মতো জলধারা—ক্যাপিলারী বা কৈশিক দিয়েও জল মাটির তলায় ছড়ায় ব্যাপকভাবে। জলাধার থেকে জলীয় বাষ্প উঠে চারপাশের বাতাসকে সিক্ত রাখে। বাষ্প ওঠে বাষ্পীভবন (ইভাপোরেশন) প্রক্রিয়ায়।

এসব ব্যাপার প্রকৃতি নিজেই সৃষ্টি করে অঞ্চলগুলিতে এক একটা ছোটখাট বসতি-পদ্ধতি বজায় রেখে চলে যুগ যুগ ধরে। হঠাৎ মানুষ যদি সেই সব জলাধার থেকে অতিরিক্ত জল বার করে নিতে শুরু করে উন্নততর সেচপদ্ধতির দোহাই দিয়ে, তাহলেই প্রকৃতির বসতি-পদ্ধতিতে বাধে বিপর্যয়।

এই রকম একটা দারুণ বিপর্যয় ঘটেছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অন্তর্দেশীয় জলাধার—কাস্পিয়ান সাগরে। ক্রমাগত জল-নির্গমের ফলে ১৮৯৬ থেকে ১৯২৯-এর মধ্যে জলস্তর নামে দেড় ফিট নীচে। ১৯২৯ থেকে ১৯৪৬-এর মধ্যে নামে ছ ফিটের নীচে। ১৯৪৬-এর পর থেকে এই নামার হার উত্তরোত্তর বাড়ছে। ২৫ বছরে কাস্পিয়ান-এর জল নেমেছে নয় ফিট।

কাস্পিয়ান সাগরের ছিয়াত্তর শতাংশ জল আসে ভলগা থেকে। ওপরের অঞ্চলে সেচ ও অন্যান্য কারণে অতিরিক্ত জলের দরকার হওয়াতে ভলগার দু তীরে অসংখ্য খাল কেটে জল বার করে নেওয়া হয়েছে। কাস্পিয়ান সাগরে এখন পড়ে মাত্র পঞ্চাশ শতাংশ। ভলগার স্রোতবেগ এখন অনেক কম।

ফলে কাস্পিয়ানের পরিবেশে এসেছে সাংঘাতিক পরিবর্তন। পরিবর্তন এসেছে নিম্ন ভলগা অঞ্চলে, ভলগার ব-দ্বীপে। এসব অঞ্চলে চাষের যে উৎপাদন ক্ষমতা ছিল এখন আর তা নেই। ভীষণভাবে গেছে কমে। কাস্পিয়ানের জলে যে পরিমাণ মাছ পাওয়া যেত তা কমে হয়ে গেছে অর্ধেকের মতো। কাস্পিয়ান অঞ্চল এক কথায় শুকিয়ে আসছে।

পরিবাহ পরিকল্পনার মতো সেচ পরিকল্পনাও বেশ কয়েকটা অঞ্চলে পৃথিবীর ওপরকার জলস্তর ঘাটতি ঘটিয়েছে প্রচণ্ডভাবে। তাতে নিদারুণ বিপর্যয় ঘটেছে পরিবেশে। উত্তর ক্যালিফোর্ণিয়ায় লম্বায় তিনশ মাইল চওড়ায় একশ মাইল একটা অঞ্চলে মাটির ওপরকার সমস্ত জলের স্তর নেমে গেছে দুশ ফিটের মতো। বড়মাটা ঘটেছে সমস্ত জল টেনে বার করে নেবার ফলে। এই অঞ্চলে ওপরের জমি বসছে বলে অধিবাসীদের নিত্যকার কাজকর্ম চালানই অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তাদের অবস্থা শোচনীয়।

ভারতবর্ষের মতো বহু উন্নয়নশীল দেশে আন্তর্জাতিক পরিকল্পনায় কিংবা বিদেশী কোন সংস্থার সাহায্যে সেচ উন্নয়নের কাজ ব্যাপকভাবে চলেছে গত কয়েক দশক ধরে। এসবগুলিরই আপাত উদ্দেশ্য নগদ লাভ। এবং এক একটা নদীতে ড্যাম বেঁধে, ব্যারাজ তৈরি করে, অসংখ্য খাল কেটে জলকে বিভিন্ন দিকে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছে। তাতে কয়েক বছরের মধ্যেই ফসলের উৎপাদন গেছে বেড়ে বেশ কয়েক গুণ।

কিন্তু কিছুদিন পরেই বিপদ বেঁধেছে অন্যদিকে। নদীর অন্য দিকে প্রবাহ গেছে আটকে। তাতে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এসেছে প্রবল বন্যা। তাতে প্রাণনাশ, অর্থ-সম্পত্তির নাশ হয়েছে প্রচুর। ক্ষতি হয়েছে চাষের জমির উঠতি ফসলের। এই জাতীয় বন্যা তো আমরা গত কয়েক বছরে বেশ কয়ারই হতে দেখলাম।

জলাধারের চার পাশের উঁচু অঞ্চলগুলিতে অতিরিক্ত সেচের ফল অতিরিক্ত চাষ। তার ফল ভূমি ক্ষয়। উঁচু জমির মাটি ধুয়ে ছোট ছোট হ্রদ পুষ্করিণী কি বিলে এসে জমা হয়। পলি জমতে থাকে খুব বেশী। জলাধারের শৈবালজাতীয় ছোট ছোট উদ্ভিদের জন্মও বৃদ্ধিতে ঘটে ব্যাঘাত। মাছের খাদ্যে পড়ে টান। গেঁড়ি গুগলি জাতের প্রাণীরা মারা পড়ে তাদের ঝিল্লীতে কাদা আটকে। মরা জীবদেহ জমে উঠতে থাকে তলায়। জল হয়ে ওঠে দূষিত। শেষে একদিন জলাধারগুলি যায় মজে।

এগুলি ছাড়াও সভ্যজগতে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের তাগিদ জলাধারগুলিতে এনেছে নতুন ধরনের বিপর্যয়। বর্তমানে একমাত্র দক্ষিণ মেরু ছাড়া দুনিয়ার সর্বত্র তৈরি হচ্ছে জল-বিদ্যুৎ। তাতে সারা দুনিয়ায় যে পট-পরিবর্তন ঘটেছে এই গত পঞ্চাশ বছরে, তার একমাত্র তুলনা চলে হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে যে পরিবর্তন এসেছিল তুষার যুগের হিমক্রিয়ার ফলে, তার সঙ্গে।

আধুনিক দুনিয়ায় বাস করতে জল-বিদ্যুতের প্রয়োজন তর্কের অতীত। কিন্তু তার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবার আগে ভবিষ্যতের অনেকখানি চিন্তার প্রয়োজন। যদি আপাত অল্প লাভের তুলনায় ভবিষ্যতের ক্ষতির পরিমাণ হয় বিরাট, তবে সে পরিকল্পনা যতই চমকপ্রদ হোক তাকে বর্জন করতেই হবে।

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

বেশ মজার স্বপ্ন দেখছিল বাপী তরফদার। শহরটা যেন পাঁচ মাসের দেখা কলকাতার শহর নয়। জঙ্গলটাও বানারজুলির চেনা জঙ্গল নয়। কলকাতার মতোই আর একটা শহর। বানারজুলির মতোই আর একটা জঙ্গল। সেই শহর আর জঙ্গল পাশাপাশি নয়। একটার মধ্যে আর একটা।

াশুতোষ মুখোপাধ্যায়

লের মধ্যে শহর, আবার শহরের মধ্যেই
ল। হাতি বাঘ ভালুক হায়না চিতা
ণ মানুষ মেয়েমানুষ সব যে-যার মতো
র বেড়াচ্ছে। কেউ কারো দিকে
কাচ্ছেও না। কারো প্রতি কারো
ক্ষেপ নেই।

বিস্ময়ের ঘোরের মধ্যেই ঘুমটা
ঙেছে। বাপী তরফদার হঠাৎ ঠাওর করে
তে পারছিল না কোথায় শুয়ে সে।
ভট স্বপ্নের রেশ মগজে লেগে আছে
নো। সামান্য নড়াচড়ার ফলে দড়ির
টিয়া ক্যাচ-ক্যাচ করে উঠতে সজাগ
। সবে সকাল। মাথাটা ভার-ভার।

দেড় মাস হল খুপরি ঘরের এই দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে রাত কাটছে। তার আগে যেখানে ছিল সেটা ভদ্রলোকের আশ্রয়। সেখানে সুখ ছিল। ভোগ ছিল। মণিদার বউ গৌরী বউদির চোখের তারায় আগুন ছিল। সে-আগুনে ব্যভিচারের প্রশ্রয় ছিল। রমণীর অকরুণ ইশারায় মণিদার পুরুষকার বাপী তরফদারের পিঠে চাবুক হয়ে নেমে আসে নি। ভালো মানুষ মণিদা সাদা-মাটা দু' চার কথায় তাকে বিদায় দিয়েছিল।

তারপর থেকে এই দেড় মাস এখানে।

ভদ্রলোকের সেই সুখের ঘরের আশ্রয় থেকে ঢের ভালো। অবু সকালে ঘুম ভাঙলে মাথাটা রোজই ওই রকম ভার-ভার লাগে। সেটা দড়ির খাটিয়ার দোষ নয়। নিজের দোষ। মাথার দোষ। অমন পাগলের স্বপ্ন কটা লোক দেখে? স্বপ্ন দেখুক বা না দেখুক, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যে খাপছাড়া ভাবনাগুলো আর ইচ্ছেগুলো মাথার মধ্যে ঠিকি দিয়ে ভ্রমতে থাকে, সেগুলো তরল হবার মতো গাঢ় ঘুমের প্রলেপই বা কতটুকু পড়ে? নইলে এই রকম দড়ির খাটিয়ায় চেপেই তাদের মতো লোকেরা নিমতলা-কেওড়াতলায় চলে যায়। আবার ওতেই শুয়ে ঘুমোয়ও দিব্যি।

টালি-ছাওয়া পঁচিশ ঘর বাসিন্দার মধ্যে ক'টা ঘরেই বা খাট-চৌকি আছে। ভালো ঘুম না হওয়াটা নিজের স্বভাবের দোষ বাপী তরফদারের। তার বুকের তলায় অসহিষ্ণুতার বাষ্প ছড়ানোর একটা মেসিন বসানো আছে। মুখ দেখলে কিছু বোঝা যায় না, সেটা তার নিজের কৃতিত্ব। কিন্তু ওই মেসিনটার ওপর তার কোনো হাত নেই। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ওটা কাজ করে চলেছে। বাষ্পগুলো ঠেলে-ঠেলে মাথায় নিয়ে গিয়ে ঠাসছে। ওই নিয়ে ঘুম, ওই নিয়ে জাগা।

গোল চাপ-বাঁধা এই পঁচিশটা টালি-ঘরের শতেক বাসিন্দাদের একজন ভাবতে চেষ্টা করে বাপী তরফদার নিজেকে। কিন্তু এখানকার বাসিন্দাদের প্রায় কেউই তা ভাবে না। এমন কি, যার আশ্রয়ে এই আধখানা ঘরে সে আছে, সেই রতন বণিকও ভাবে না। তার বউটার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। কিন্তু বাকি সকলে তাকে ভদ্রলোক ভাবে। ভদ্রলোকের ছেলে ভাবে। ভদ্র-লোকের মস্ত পাশ-টাশ করা ছেলে ভাবে। তাদের চোখে এখানে সে রতন বণিকের সমাদরের অতিথি। নেহাৎ বিপাকে পড়ে দিন কতকের জন্য এসে ঠাঁই নিয়েছে।

দিন ফিরলেই চলে যাবে। নইলে বিপুল-বাবুও ওদের মতো ওই আধখানা টালি-ঘরে পাকা বসবাসের ভাঙা কপাল নিয়ে এসেছে নাকি! রতন বণিক কপাল চেনে। বিপুলবাবুর কপাল এরই মধ্যে সকলকে সে ঢাক পিটিয়ে চিনিয়ে দিয়েছে।

....বিপুল তারই নাম। শুধু বিপুল নয়, বিপুলনারায়ণ তরফদার। গরিব বাবা-মা কেন বিপুল আশায় খুঁটি ধরে এরকম একটা নাম রেখেছিল জানে না। গোটা নামটা মনে হলে নিজেরই হাসি পায়। তবে এই পোশাকি নাম ভালো পোশাকের মতো তোলাই থাকে বেশির ভাগ সময়। বাবা মা আত্মীয় পরিজন বন্ধু-বান্ধব সকলের কাছেই সে বাপী—বাপী তরফদার। জ্ঞান বয়সের আগে থেকে ওই নাম শুনে তার কান পেকেছে। কিন্তু খিদিরপুর বুককলিন গোডাউনের বাবুদের পিয়ারের পিওন 'আট-কেলাস' পড়া রতন বনিকের সঙ্গে কার্য-কারণ সুবাদে এখানে তার ওই পোশাকি নামটাই চালু।

অন্য-সব দিনের সঙ্গে এই দিনটার সকাল দুপুর বা বিকেলের রঙে তফাৎ ছিল না একটুও। টালি এলাকার সককলের আগে রোজ যেমন ঘুম ভাঙে আজও তাই ভেঙে-ছিল। তফাৎ শুধু এই উদ্ভট স্বপ্নটা। তার রেশ ছিঁড়তে রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে একবার চোখ তাকিয়ে খুপরি জানলার ফাঁক দিয়ে ভোরের আলোর আভাস দেখেছিল। নড়বড়ে জানলা দুটো বন্ধ করলেও খানিকটা ফাঁক থেকেই যায়। সেই ফাঁক দিয়ে আলো ঢোকে। মাথার ওপরের টালির ছাদের ফাঁক দিয়েও আলোর রেখা এসে পড়ে। আলোর এরকম বেয়াড়া স্বভাব বরদাস্ত করতে ইচ্ছে করে না বাপী তরফদারের। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো শতেক ফুটোর কম্বলটা মাথার ওপর টেনে দিয়ে অন্য দিনের মতোই আবার অন্ধকারে সেঁধিয়ে গেছল সে।

উনিশ-শ' আটচল্লিশের ফেব্রুয়ারির একেবারে গোড়ার দিক এটা। চার কি পাঁচ তারিখ হবে। সকালের শীতের কামড়ের হাত থেকে বাঁচার তাগিদেও আপাদমস্তক কম্বলে ঢাকা দিতে হয়। কিন্তু শেষ রাতে হোক বা প্রথম সকালে হোক, চোখ একবার দু' ফাঁক হলে ঘুমের দফা শেষ। কম্বল মুড়ি দিয়ে শুলেও, সবার আগে কলতলার কলরব কানে কটকট করে লাগবে। এই শীতের সকালেও জল নিয়ে কাড়াকাড়ি। কম্বলের তলায় ঢুকে বাপী তরফদারের ইচ্ছে করে ওদের সককলের মাথায় ঘড়া ঘড়া জল ঢেলে দিয়ে আসতে।

সকালের আলো গরম হতে না হতে একটু, আগে পরে গাঁ-গাঁ করে রেডিও বেজে উঠবে দু' ঘর থেকে। পঁচিশ ঘর বাসিন্দার মধ্যে মাত্র দু' ঘরেই এই সম্পদ আছে। অতএব তারা সককলকে জানান দিয়ে বাজায়। প্রথমেই শোকের প্রসঙ্গ শুরু হবে। সমস্ত দেশ জুড়ে শোকের কাল, শোক-পক্ষ চলেছে এখন। আজ ফেব্রু-য়ারির চার তারিখ কি পাঁচ তারিখ বাপী তরফদার ঠিক করে উঠতে পারছিল না। যাই হোক, পাঁচ-ছ'দিন আগে নীল আকাশ থেকে আচমকা একটা বাজ পড়ার মতোই সেই শোক-সংবাদ সমস্ত পৃথিবীর বুকের ওপর ফেটে পড়েছিল। গান্ধীজী দিল্লীর প্রার্থনা সভায় গুলিবিদ্ধ হয়ে 'হা-রাম' বলে চিরকালের মতো মাটিতে লুটিয়েছেন।

খবরটা শুনে পৃথিবীর শত-সহস্র-কোটি মানুষের মতোই বাপী তরফদারও প্রথমে সচকিত আর পরে স্তব্ধ হয়েছিল। কলকাতায় এসেছে মাত্র পাঁচ মাস আগে; অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হওয়ার এক মাসের মধ্যে। দূরে বসে দাসত্বের শেকল ভাঙার ঝনঝনানি কানে যত মিষ্টি লেগেছিল, এই পাঁচ মাস যাবৎ আবেগশূন্য বাস্তব-ভূমির ওপর বিচরণের ফলে তার রেশ প্রায় মিলিয়েই গেছে। তার চোখে মহাত্মার হত্যা সেই আবেগ-শূন্যতার শেষ নজির যেন। এই নজির দেখে সেদিন সে স্তব্ধ বোবা হয়ে বসেছিল। সকলেরই তাই হবার কথা। কিন্তু তারপর থেকে দেখছে শোকের আনুষ্ঠানিক দিকটাও কম ব্যাপার নয়। যত বড় শোক, ততো বড় অনুষ্ঠান। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত রেডিওয় শোকের গান আর শোকের বক্তৃতা, পথে ঘাটে শোকের মিছিল আর শোকের মিটিং। বাপী তরফ-দারের এক-একসময় মনে হয়েছে দেশটা সত্যি শোকে ডুবে গেল নাকি শোকের উচ্ছ্বাসে! বাইশ বছর বয়সের মধ্যে সে নিজে তো কখনো সরবে শোক করেনি।

....যে মহারানীর ঘুম ভাঙলে বাপী তরফদারের শরীর খানিক চাঙা হতে পারে আর মাথার ভার একটু কমতে পারে, তার সকাল হতে কম করে এখনো ঘণ্টা দুই দেরি। রতন বণিকের বউ কমলা বণিক। আজ দেড় মাস হয়ে গেল ওরাই তার আশ্রয়দাতা এবং আশ্রয়দাত্রী। রতন বণিকের কড়া হাতের ধাক্কা না খেলে রেডিও বাজুক বা কলতলা সরগরম হোক বেলা আটটার আগে সেই দেমাকীর ঘুম ভাঙতে চায় না। ঠেলা মেরে ঘুম ভাঙানোর পরে রতনকে আবার মিষ্টি সোহাগের সুরে দু'-চার কথা বলতে হয়। তা না হলে সাত-সকালে বউয়ের বচনের তোড়ে অনেক সময় তাকে ছিটকে এই খুপরি ঘরে চলে আসতে হয়। সপ্তাহে একদিন করে নাইট ডিউটি পড়ে রতন বণিকের। ফেরে পরদিন সকাল দশটায়। সেদিন বেলা আটটা সাড়ে-আটটার আগে কেউ আর বাপী তরফদারের এই খুপরি ঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢোকে না।

গত রাতে রতনের নাইট ডিউটি ছিল না অবশ্য। অতএব সোয়া সাতটার থেকে সাড়ে-সাতটার মধ্যে চায়ের আশা আছে। খুপরি ঘরের দরজা আছে কিন্তু দরজার হুড়কো নেই....অন্য দিনের মতোই কমলা দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেছিল। কম্বলের তলা থেকে বাপী তরফদার সেটা টের পেয়েছে। কারণ, ভেজানো দরজা দুটো শব্দ করেই খোলা হয় আর কমলার পদক্ষেপও লঘু নয়। ঘরে ঢুকে আপাদমস্তক কম্বলে মোড়া একই দৃশ্য রোজ দেখতে হয়, বাপী তরফদারকেও একই সম্ভাষণ শু[…] হয়।

—কই গো, বড়বাবুর ঘুম ভেঙেছে নাকি ফিরে যাব?

এক ডাকে সাড়া না দিলে সত্যি [ফিরে] যাবে সে। দ্বিতীয়বার আর ডাকবে [না]। সাড়া না পেয়ে এরকম ফিরে গেছে দ[…] একদিন। কমলার নিজের ঘুমের [ওপর] মমতা আছে বলেই হয়তো বেশি হাঁক[…] করে কারো পাকা ঘুম ভাঙাতে চায় [না]। অতএব ডাক শোনা মাত্র কম্বল […] তড়াক করে দড়ির খাটিয়ার শয্যায় […] বসতে হয় তাকে।

সকালের এই একটা সময় […] বণিকের বউটাকে ভালোই লাগে ব[…] তরফদারের। ঘুমের দাগ লাগা ফো[…] ফোলা মুখ। কালো চোখের তারায় […] পর্যন্ত ঘুম-ছোঁয়া ঢুলু ঢুলু […] একটু। তার এক হাতে শাড়ির আঁ[চলে] জড়ানো গরম চায়ের গেলাস, অন্য হ[াতে] শস্তা দামের খানচারেক বিস্কুট, নয় হাতে-গড়া দু'খানা রুটি আর গ[…] বিস্কুট বা রুটি পছন্দ নয়, ওই চা[য়ের] গেলাসটাই লোভনীয়। কিন্তু কম[লার] শাসনে পড়ে বিস্কুট বা রুটি-গুড়ও নি[তে] হয়। না নিলে কমলা ধমকেই উঠবে, খ[ালি] পেটে চা গিললে কারো 'নিভার' এ[…] থাকে!

'আট-কেলাস' পড়া রতন বণি[কের] 'ছ'-কেলাস' পড়া বউয়ের ভুলটা ব[াপী] তরফদার একদিন শোধরাতে চেষ্টা করেছি[ল]। বলেছিল, কথাটা নিভার নয়, লিভার।

পলকা ঝাঁঝে মুখ ঝামটা […] উঠেছিল কমলা বণিক। —থাক্, নি[জের] বিদ্যে নিজের মাথায় ঠেসে রাখো, আম[ায়] আর বিদ্যে দান করতে [হবে]-না!

এরপর আর ভুল সংশোধনের […] করেনি। কিন্তু রোজ সকালে ওই শা[সনের] মুখের ধমক একটু খেতেই হয়। কা[…] কম্বল ফেলে ধড়মড় করে উঠে বসেই চা[য়ের] গেলাসের জন্য হাত বাড়ায় সে। ফল […] হবে জেনেও। শাড়ির আঁচল তে[…] গেলাসে ধরে রেখেই কমলা চোখ পাকা[য়]—মুখ ধোয়া হয়েছে?

এটুকু ভালো লাগে বলেই বা[পী] তরফদার মিথ্যে বলে না। বিব্রত ম[ুখে] মাথা নেড়ে জানান দেয়, ধোয়া হয়নি।

—ঘেন্নাও করে না বাসি মুখে বি[স্কুট] গিলতে—যাও মুখ হাত ধুয়ে এসো!

এই নিয়মিত অধ্যায় চটপট সারা হ[লে] তবে চায়ের গেলাস আর বিস্কুট বা রু[টি] তার হাতে আসে।

আজও এর ব্যতিক্রম হল না। […] ব্যতিক্রম একটু হল চায়ের গেলাস […] বিস্কুট হাতে নিয়ে বসার পর। গজেন্দ্র-গমনে কমলা বণিক দরজার কাছাকা[ছি] এগিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল। এটা অপ্রত্যাশিত। চা দিয়ে চলে যাবার […] বিপুল তরফদারের দু' চোখ নি[…] [illegible]

রেই। আজ হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ানোর ফলে উনিটা তার মুখের ওপর হোঁচট খেল কটু। আর এটুকুও যেন কমলার চোখে রা পড়ল। হাসির ঝিলিক ঢাকা দেবার নোই সে ফোঁট করে হাই তুলল একটা। —বুড়ো বলছিল বিপুলবাবুর দুই-কদিনের মধ্যেই চলে যাবে। ... ঠিক? া-হা, যাট যাট, জিভে গরম চায়ের ছেঁকা াগল বুঝি?

চায়ের গেলাস কোলের কাছে নামিয়ে াপী তরফদার গম্ভীর মুখেই জবাব দিল, দেড় মাস হয়ে গেল আর কত অসুবিধে করব তোমাদের....

কমলাও গম্ভীর মুখেই সায় দিল, আমাদেরই বা সকালে এক গেলাস চা আর দু'খানা বিস্কুট দিয়ে কতকাল ফেল্টু ঠাকুরকে ধরে রাখার ক্যামোতা বলো।.... তা এবার কোন্ মহলে ঘর ঠিক হল?

—কোথাও না। দেশেই চলে যাব ভাবছি। এখানে আর কিছু হবে-টবে না—

কমলার কালো চোখের তারায় চাপা হাসির ঢেউ খেলে গেল একটু। বলল, কোথায় যে তোমার হবে ভগবানই জানে। বুড়ো অবশ্য বলে, হবে যখন দেখে নিস, বিপুলবাবুর ভাগ্যখানা কালবোশেখীর ঝড়ের মতোই সর্বদিক তোলপাড় করে নেমে আসবে একদিন—তা দেখো, যেখানে গেলে হবে সেখানেই যাবে, তার আর কথা কি।

হেলেদুলে চলে গেল।

....আর এই সকালেই-ইদানীং কালের সেই অস্বাচ্ছন্দ্য বোধটা তার মধ্যে ছড়িয়ে রেখে গেল। বাপী তরফদারের ওই কমলার

ওপরেই রাগ হতে থাকল। ভদ্রলোকের সংশ্রব এড়িয়ে রাতের এই মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু তার নিশ্চিন্ত আশ্রয় হয়ে উঠতে পারত। রতনের সঙ্গে কথা বলে সামান্য কিছু ভাড়াও ঠিক করে নেওয়া যেত। কিন্তু এখান থেকে যাওয়ার কথা ইদানীং রতনকে বলতে হচ্ছে নিজের ভিতরের অস্বস্তি দিনে দিনে বাড়ছে বলে। যাবার কথা রতনকে কাল রাতেও বলেছে।

অস্বস্তি শুরু হয়েছিল এখানে আসার দিনকতকের মধ্যেই। বয়স্ক রতন বণিকের ওই তরতাজা বউটা ঠারেঠোরে তাকাতে জানে। চোখের কোণে আর ঠোঁটের ফাঁকে হাসির ঝিলিক ফোটাতে জানে। প্রথম ক'টা দিনই শুধু ধারেকাছে ঘেঁসেনি, আড়াল থেকে লক্ষ্য করেছে। সমস্ত দিন ঘোরাঘুরি করে বাপী তরফদার তখন বিকেলের দিকে ঘরে ফিরত। ঘণ্টা দুই-তিন দড়ির খাটিয়ায় চিৎপাত শুয়ে থেকে আবার বেরুতো। বাইরে রাতের খাওয়া সেরে ঘরে ফিরত।

একদিন সন্ধ্যার ঠিক পরে ব্যস্তসমস্ত মুখে ঘরে ঢুকে রতন বণিক বলেছিল, আজ নাকি সমস্ত দিন খাওয়াই হয়নি আপনার ?

বাপী তরফদার সচকিত।—কে বলল ?

বউ বলেছিল, আজ সমস্ত দিন উপোস গেছে কেষ্ট ঠাকুরের—

বলে ফেলেই লজ্জা পেয়ে জিভ কামড়েছে সে, তারপর হেসে বলেছে কিছু মনে করবেন না বাবু, বউটার লঘু-গুরু জ্ঞান নেই—ওই রকমই কথা। বলে, কেষ্ট ঠাকুরপানা মুখখানা—। আজ ঘরে ফিরতেই বলল, কেষ্ট ঠাকুর সমস্ত দিন উপোস দিয়েছে। এরই মধ্যে ভাত তরকারি রেঁধে ফেলেছে, সকালের একটু মাছও আছে—আপনাকে এক্ষুনি ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঠেলে পাঠালো আমাকে। চলুন—

বাপী তরফদার বাধা দিয়েছিল, না না, তোমাদের ব্যস্ত হতে হবে না, আমি একটু বাদেই বেরিয়ে গিয়ে খেয়ে আসছি—

মাথা নেড়ে রতন বণিক বলেছিল, আজ আর সেটি হচ্ছে না বিপুলবাবু, রাঁধা ভাত-তরকারি সব তাহলে ডেকে ঢেলে দেবে, আমাকেও খেতে দেবে না। চলুন শিগগীর—

অগত্যা উঠে আসতে হয়েছে। সকালের চা-রুটির পর সেদিন সত্যিই চার পয়সার মুড়ি আর চার পয়সার চিনেবাদাম ছাড়া আর কিছু পেটে পড়েনি। সেটা যে নিছক অভাবের দরুণ তা নয়। তিন মাসের চাকরির আর কিছু পুঁজি হাতে আছে এখনো। অবশ্য হিসেবের বাইরে একটিও বাড়তি পয়সা খরচ করে না সে। কিন্তু একেবারে না খাওয়াটা পয়সা বাঁচানোর তাগিদে নয়। মেজাজ না থাকলে এক-আধ বেলা ওরকম উপোস দিয়ে অভ্যস্ত।

...খেতে খেতে একটু সহজ হবার জন্যেই রতন বণিকের বউয়ের দিকে একবার মুখ তুলে তাকিয়েছিল। আর তার পরেই কি-রকম যেন ধাক্কা খেয়েছিল একটু। এ-ক'দিনে দুই-একবার আভাসে দেখলেও মুখখানা চোখে পড়েনি। আধবয়সী রতন বণিকের ঘরে এরকম বউ থাকা সম্ভব সে ভাবেনি। গায়ের রং তারই মতো কালো ঘেঁষা, কিন্তু অল্প বয়েস, সুঠাম স্বাস্থ্য। কালো চোখে সরমের বালাই নেই। উল্টে সে নিজেই যেন রমণীটির চোখে একটি দর্শনীয় বস্তু।

চোখাচোখি হতে বাপী তরফদার হেসেই বলেছিল, সমস্ত দিন সত্যিই আজ ভালো করে খাওয়ার ফুরসত হয়নি, কিন্তু তুমি বুঝলে কি করে ?

তক্ষুনি জবাব এলো, খাটির কেষ্ট হলে বোঝা যেতনি, ওই বুড়োর চোখ থাকলে সে-ও বুঝত।

বউয়ের কথা শুনে রতন বণিক হেসে উঠেছিল, তোর মতো চোখ আর কার আছে বল্। পরে বলেছিল, তোর স্বভাব জানি, বিপুলবাবুর সামনে কক্ষনো ঠাট্টা-ঠিসারা করে বসিস্নি যেন—আমাদের কত ভাগ্যির জোরে উনি এখানে এয়েছেন—একদিন ও'র দিন কেমন ফেরে দেখে নিস—

নিরীহ বিস্ময়ে কমলা বলেছিল, দিন ফিরলে আমি দেখে নেব কি করে গো!

তুষ্ট মুখে হার মেনে রতন বলেছিল, সবেতে কেবল ফষ্টি-নষ্টি কথা তোর—দিন ফিরলেই বিপুলবাবু কি আমাদের ভুলে যাবেন!

সেই দিন থেকেই ভিতরে ভিতরে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করেছিল বিপুল তরফদার। দীর্ঘকাল জঙ্গলে বাসের ফলে বুনো জন্তু-জানোয়ার ছেড়ে মানুষেরও প্রবৃত্তির দিকটা অনেকখানি চেনা তার। সেই সঙ্গে নিজের খোলস-ঢাকা চরিত্রও ভালোই জানা। মনের তলায় সেই রাতেই একটা বিপদের আভাস উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে গেছে।

পরদিন থেকেই সকালে চা-বিস্কুট বা চা-রুটি-গুড় নিয়ে রতন বণিকের বদলে কমলা নিজেই দরজা ঠেলে অনায়াসে ঘরে ঢুকেছে। আর তখন অতিথির অস্বস্তিটুকুও তার কাছেই যেন উপভোগ্য কৌতুকের মতো। তারপরে আবারও এক-আধদিন দুপুরের খাওয়া বাদ পড়লে এই বউটার চোখে ধরা পড়বেই। আর তখন জুলুম করেই ধরে নিয়ে গিয়ে খেতে বসাবে তাকে। ঠিসারার সুরে রতনকে বলবে, অসময়ে তোমার ভাগ্যিমন্ত অতিথির একটু সেবা-যত্ন করে রাখলে আখেরে কাজ দেবে—কি বলো ?

রতন বণিকেরও তুষ্ট মুখ—এখন ঠাট্টা করছিস কর, পরে দেখেনিস।

বাপী তরফদার এরপর বিকেলে ঘরে ফেরাই ছেড়ে দিল। একেবারে রাতের খাওয়া সেরে ঘরে ঢুকত।

কমলা সেই সময় থেকে তাকে বড়বাবু বলে ডাকতে শুরু করেছে। শুনে কান গরম করেছে বাপী তরফদারের। কিন্তু এ নিয়ে তাকে কিছু বলেনি। বলতে গেলেই কমলা দুটো রসের কথা বলে বসবে। সেটা নিজেকে প্রশ্রয় দেওয়ার সামিল হবে বাপী তরফদারের। সব থেকে বেশি ভয় তার নিজেকে। বনে-জঙ্গলে বাসের কালে বিষাক্ত সাপের আচমকা ছোবলে এক-একটা বড় বড় জীবকে ধরাশায়ী হতে দেখেছে সে। সেই ছেলে-বেলা থেকে ওই রকম একটা হিংস্র প্রবৃত্তি তার মধ্যেও লুকনো আছে। এই কারণেই নিজেকে সব থেকে বেশি ভয় তার।

....দেড় মাস আগে প্রবৃত্তির এই দিকটা আচমকা অনাবৃত হয়ে গেছল। গৌরী বউদি দেখেছিল। চিনেছিল। গৌরী বউদি কম করে ছ' বছরের বড় তার থেকে। কিন্তু জানোয়ার বয়েস দেখে না। গৌরী বউদিও চোখের সামনে সেদিন তাজা জ্যান্ত পুরুষ দেখেছিল একটা। তার চোখের আগুনে পতঙ্গ পোড়ে না। পতঙ্গ করুণার পাত্র। মণিদা করুণার পাত্র। গৌরী বউদির চোখের আগুনে ব্যভিচারের প্রশ্রয়।

....কিন্তু জানোয়ারটা তত্ক্ষণে খোলসে সেঁধিয়েছিল আবার। গৌরী বউদি তাকে ক্ষমা করেনি। তাকে আশ্রয়-ছাড়া করেছে।

....এই কমলার মতোই গায়ের মাজা রং গৌরী বউদির। সুপটু প্রসাধনে আর একটু উজ্জ্বল হয়তো। মাথায়ও কমলার থেকে কিছু লম্বা। কিন্তু গৌরী বউদির মতো নয় কমলা। তার মতো তীক্ষ্ন নয়। নির্লিপ্ত নয়। অকরুণ নয়। মায়া-মমতা আছে। বুড়ো স্বামীর যত্ন-আত্তি করে। মেজাজ ভালো থাকলে সহজ কৌতুকে আর উচ্ছ্বাসে টইটম্বুর। সে ঠারেঠোরে তাকাতে জানলেও তাকে দেখে গৌরী বউদির মুখ মনে পড়ত না বাপী তরফ-দারের।

কিন্তু ইদানীং মনে পড়ে। পড়ছে। হঠাৎ-হঠাৎ মনে হয়, সে-রকম পরিস্থিতি-বিপর্যয়ে এই কমলাও গৌরী বউদির মতো হয়ে উঠতে পারে। মণিদার মতো রতন বণিকও হয়তো তখন নিরীহ মুখে ওকে এখান থেকে চলে যেতে বলবে। সেই ভয়েই মাঝে মাঝে এই আশ্রয় ছেড়ে পালানোর কথা ভাবছে সে। যাবার কথা রতন বণিককে বলেছেও।

কমলা নিজের স্বামীকেই বলো বুড়ো। রতনের সামনেই বলে। কিন্তু রতন তাতে রাগ করে না। এই বউয়ের পাশে একগাল কাঁচা-পাকা দাড়ির জন্য একটু বেখাপ্পাই দেখায় তাকে। দ্বিতীয় পক্ষের এই বউকে খুশি করার জন্যও রতন বণিক কেন দাড়ির মায়া ছাড়তে পারে না বাপী তরফদার সেটা ভালোই অনুমান করতে পারে।

বনকলিনের বাবু এমনকি বড়বাবুদের কাছেও কোনো কারণে রতনের একটু বিশেষ সমাদর আছে। এই দাড়ির বোঝা সাফ করে ফেললে সেই বিশেষ কদরে ঘাটতি পড়ার সম্ভাবনা। কিন্তু দাড়ির

এই স্বামী-সম্ভাষণ কি অন্য কোনো
কাণ্ডের ফলে, সেটা একমাত্র কমলাই
রতনের বয়েস এখন উনচল্লিশ
মলা খুব বেশি হলে কুড়ি
ছে। বাপী তরফদারের এখন বাইশ
কমলা তার থেকে দেড়-দু' বছরের
তে পারে।

ধার পর মাত্রা রেখে একটু-আধটু
রার অভ্যাস আছে রতন বণিকের।
রিটা তার নেশার ঘর। বোতল
সাদা জলের মতো খানিকটা দিশি
য় আর সেই সঙ্গে নুন মেশানো
আদার কুঁচি। আগে হয়তো ওই
পর এই দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে
দেখত। এখন মেঝেতে দেয়ালে ঠেস
সে অল্প অল্প দোলে। কেউ
থাকলে মন খুলে গল্প করে তার
সামনে গোড়ার দিকে বাপী তরফ-
থাকত। রতনের সংকোচ সে-ই
দিয়েছে। বলেছে, আমি তোমার
, কিন্তু তোমার কোনরকম
ধে হচ্ছে দেখলেই আমি সরে

তনের অসুবিধের ব্যাপারটা প্রথম
ই টের পেয়ে গেছল। অনা কারো
য়ে নেশা সেরে এসে রতন এই
ড এসে বসেছিল। মেঝেতে বসে
ঠেস দিয়ে তাকে একটু একটু
দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। তারপর
ড আলগা হতে সমস্যা বুঝেছে।
বিবেচনার অভাবের কথাই বলছিল
মাতাল তো আর হয় না, সমস্ত
টা-খাটনির পর সামান্য মৌজের
যা একটু থায়। শরীর মন ভালো
রাতে ভালো ঘুম হয়। এই খুপরি
র্তিথি আছেন জেনেও বোতল সুদ্ধু
কে নিজের ঘর থেকে বার করে
বোতল হাতে দেখলে রতনকে
ডেকে নেবার মতো ঘর এখানে
দু' পাঁচটা আছে। কিন্তু যে ডেকে
তাকে ভাগ তো দিতেই হয়। সেদিনই
া একটা ছোট বোতল একেবারে
হয়ে গেল। রোজ রোজ লোককে
ম ভাগ দিতে হলে সে-যে ফতুর
যাবে বউয়ের এই সামান্য বিবেচনা-
নেই।

বাপী তরফদার তারপর ওই কথা বলে
নিশ্চিন্ত করেছিল। ঢুলু ঢুলু দু'
টান করে রতন বলেছিল, বিপুলে
মতো এমন দরাজ মনের মানুষ
বন্ধুকালেও আর দুটি নেই, অথচ
এমন যে তারই চাকরিটা সকলের
খোয়া গেল। কিন্তু সে নিশ্চিন্ত,
বাবু ঢের ঢের বড় হবেন বলেই এই
খেতে হল।

ওর বড় হওয়ার ভবিতব্যের কথা
হয়তো কমলা তাকে ঠাট্টা করে বড়
বলা শুরু করেছে।

অতিথির কাছ থেকে রতন বনিক স্বর
নেবেই না যখন, অন্যভাবে বাপী
রকে তার দরাজ মনের পরিচয় দিতে
হ। বার দুই নিজেই ছোট বোতল
কিনে ওর হাতে গুঁজে দিয়েছে। রতন
বনিক খুশিতে আটখানা। এ-সময় একটু
আধটু চেখে দেখলে বাবুরও মন ভালো
হত এ-কথা অনেকবার বলেছে। কিন্তু
কিন্তু জঙ্গলের মানুষদের এ জিনিস
হামেশাই খেতে দেখেছে বাপী। অনেক
বেলেল্লাপনাও দেখেছে। ফলে এই লোভ
সে বাতিল করেছে। রতনের কথায়ও
বিন্দুমাত্র আগ্রহ হয়নি। উল্টে বউয়ের
ওকে ঘরে বসে এ জিনিস খেতে না
দেওয়ার তেজটুকু ভালোই লেগেছে।

এ-সময় ওই দ্বিতীয় পক্ষটির গল্প রতন বনিকের মুখেই শুনেছিল সে।.... দ্বিতীয় পক্ষটি হল গিয়ে রতনের নিজের শালী। প্রথম পক্ষ দুর্গার থেকে ঢের ছোট অবশ্য। শ্বশুর শাশুড়ীর বুড়ো বয়সের মেয়ে। ....দুর্গার সর্বাঙ্গ মায়ের দয়ায় ছেয়ে গেছল। সেটা জানাজানি হতে সরকারী গাড়ি এসে তাকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে রেখে এসেছিল। আর ঘরের মুখ দেখতে পায়নি, সেখানেই সব শেষ। সে পাঁচ বছর আগের কথা। দুর্গাকে হারিয়ে রতন চোখে মুখে অন্ধকার দেখেছিল। কমলার তখন বছর পনের কি ষোল বয়েস, মফঃস্বলে বিধবা মায়ের কাছে থাকে। শাশুড়ী তাকে চিঠি লিখত, একটা তো গেছেই, যেটা আছে তার ভয়ে বুকের ভিতরটা সর্বদা হিম হয়ে থাকে। মেয়েটা দিনকে দিন দজ্জাল হয়ে উঠছে।

রনের তখন শোকের সময়, অতশত কান দেয়নি। বছর ঘুরতে শাশুড়ীর জোর তাগিদ এলো, জামাইয়ের শিগগীর একবার আসা দরকার—এখানকার ঘর বাড়ি বেচে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার ইচ্ছে তার। ততদিনে রতন বনিকের শোক হালকা হয়েছে একটু। বোতলের অভ্যাসটাও তখন থেকেই।

ছুটি নিয়ে শাশুড়ীর কাছে গিয়ে তার সমস্যাটা স্পষ্ট করে বুঝল সে। সমস্যা তার ছোট মেয়ে। কমলার তখন বছর সতের বয়েস। বাড়ন্ত গড়ন। তাকে দেখে চোখে পলক পড়ে না রতনের। অনেক ছোট শালী, কাছে ডেকে আগের মতোই গায়ে পিঠে হাত বোলাবার লোভ ছাড়তে পারেনি। কিন্তু সতের বছরের ওই কমলা পাকা ঝানু মেয়ে তখন। তার হাত একটু বেসামাল হতেই ফোঁস করে উঠেছে। আর তাই দেখে ভিতরে ভিতরে রতন বনিকও পাগল হয়েছে। কিন্তু কাউকে বুঝতে দেয়নি।

গম্ভীর মুখে সামনে বসে শাশুড়ীর নালিশ শুনেছে সে। সমস্যা আর দুর্ভাবনার কথা শুনেছে। এই মেয়েকে আর সামলাতে পারছে না শাশুড়ী। তার ফষ্টি-নষ্টি বেড়েই চলেছে। আগে আশপাশের সমান পর্যায়ের ছেলে ছোকরা-গুলো উৎপাত করত। ওই পাজী মেয়েও তাদের আসকারা দিত। যার সঙ্গে খুশি বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতো, কোথাও যাত্রা হচ্ছে শুনলে মায়ের শাপমন্যিতে ভ্রূক্ষেপ না করে চলে যেত। এখন ভদ্দর ঘরের ছেলেদের উৎপাত শুরু হয়েছে। দিনে দুপুরে জানলা দিয়ে ঢেলার মতো চিঠির মোড়ক ঘরে এসে পড়ে। শাশুড়ী লেখা-পড়া জানে না, আর কমলাও চোখ-কান বুজে মায়ের কাছে মিথ্যে কথা বলে। কিন্তু ফাঁক পেলেই চুপিচুপি বেরিয়ে যায়। একা শহরে গিয়ে সিনেমা দেখে আসে। ওই সব পাজী ছেলেগুলোই নিশ্চয় পয়সার যোগান দেয়। চৌদ্দ পনের বছর বয়েস পর্যন্ত বাখারি-পেটা করে মেয়েকে মাটিতে শুইয়ে ফেলা গেছে, কিন্তু এখন মেয়েটা মায়ের সমস্ত শাসনের বাইরে।

....হ্যাঁ, বুদ্ধির চালে সেই একবার শাশুড়ী আর তার মেয়ে দুজনকেই ঘায়েল করতে পেরেছিল রতন বনিক। ভেবে-চিন্তে শাশুড়ীকে বলেছে, কমলাকে এখান থেকে সরানো দরকার। কলকাতা দেখাবার নাম করে শাশুড়ী আর শালী দুজনকেই তার ওখানে নিয়ে যাবে সে। আর তারপর কমলার মতো মেয়ের ভালো বিয়ে হতে কতক্ষণ। কমলার যে ভালো বিয়ে হবে নিঃসংশয়ে সেই ভবিষ্যতবাণীও করেছে। জামাইয়ের এই ঘোষণায় ওপর শাশুড়ীর অটুট আস্থা। তার ওপর শুনেছে খরচা-পত্রের জন্যেও ভাবনা নেই—যা করার জামাই-ই করবে। কলকাতার এই চাকুরে জামাই শাশুড়ীর মস্ত গর্ব।

কমলাও সানন্দে এসেছে। কলকাতা দেখার লোভ তার ওপর দিনে একটা করে সিনেমা দেখার লোভ। এত লোভের টোপ না গিলে থাকতে পারবে এমন মেয়ে কমলা নয়। সমস্ত বাবস্থা পাকা করে বিয়ের আগের দিন মতলবটা শাশুড়ীকে জানিয়েছে রতন বনিক। প্রথম শোনার পর শাশুড়ী ঘণ্টা-কতক গুম হয়ে ছিল অবশ্য। কিন্তু আবার দেশে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে মেয়ের হাল কি হতে পারে সেই ভবিষ্যতবাণী শোনার পর শাশুড়ী আর আপত্তি করেনি। উল্টে ভেবেছে এ বরং ভালোই হল, মেয়েটা তোয়াজ থাকবে।

কমলা জেনেছে একেবারে বিয়ের দিন সকালে। কিন্তু সেদিন আর রতন বনিক এই টালি এলাকা থেকে তার পালাবার মতো কোনো ফাঁক রাখেনি। শেষে মুখ বুজেই বিয়েটি করতে হয়েছে তাকে। তবে ওই দজ্জাল বউকে বাগে আনতে বেশ সময় লেগেছিল রতন বনিকের। কখন কোন্ ফাঁক দিয়ে পালায় সেই ভয়ে আস্ত একটা মাস আপিস ছুটি নিতে হয়েছিল। আর রোজ একটা করে সিনেমা দেখাতে হয়েছিল।

কথায় কথায় একদিন বউয়ের আর একটা খেদের কথা জেনেছিল রতন বনিক। এখানে কারো ঘরে কোনো শুভ কাজ হলে বউ নাকি অপমান বোধ করে। কুড়ি পার হতেও ছেলেপুলে হল না বলে এখানকার এয়োরা কোনো শুভ কাজে প্রথমে তার মুখ দেখতে চায় না। রতন বনিক অবশ্য ভবিষ্যদ্বাণী করেছে কমলা ছেলের মা হবে, ব্যস্ত হবার কি আছে, সবে তো কুড়ি গড়ালো বয়েস। কিন্তু বউ তক্কুনি

গলা উঁচিয়ে তর্ক করবে, তাহলে দিদির কেন তিরিশ বছরেও ছেলেপুলে হল না। এ-সব কথা শুনলে রতন বিরক্ত হয়। দিদির বরাতে ছিল না তাই হয়নি—তা নিয়ে তোর এত ভাবনা কেন, তোর হলেই তো হল।

কপালের ব্যাপারে এত লোকের এত বিশ্বাস রতন বনিকের ওপর, এতটুকু বিশ্বাস নেই শুধু ঘরের বউয়ের। আরে বিশ্বাস না থাকলে কারো কোনদিন কিছু হয়।

....আপিসের সহকর্মীদের কাছে তো বটেই, বাবুদের আর বড় দরের বাবুদের কাছেও পিওন রতন বনিকের ওই কপাল গোনার গুণেই একটু বাড়তি খাতির। মাস দুই আগে পর্যন্ত বাপী তরফদার নিজেও ওই বুককিপিং-এরই সাধারণ কেরানি-বাবুদের একজন ছিল। রতন বনিক সেই বিভাগেরই পিওন। কিন্তু পিওনের কাজ খুব একটা করতে হয় না তাকে। কারণ, দশটা-পাঁচটা অফিসের মধ্যে নিজের বিভাগের বা অন্য বিভাগের কোনো না কোনো বাবু ডিউটির অর্ধেক সময় তাকে ডেকে নিয়ে পাশে টুল পেতে বসিয়ে ভবিষ্যতের জট ছাড়াতে চায়।

নিজস্ব পদ্ধতিতে ভবিষ্যত গণনার সুনাম দিনে দিনে বাড়ছিল রতনের: হাত দেখা বা ঠিকুজি দেখার সঙ্গে এই গণনার কোনো সম্পর্ক নেই। তার কোন্ এক গুরুর আশীর্বাদে সকলের অগোচরের এক ভিন্ন পদ্ধতিতে সে ভবিষ্যত বক্তা আর ভবিষ্যত দ্রষ্টা হয়ে বসেছে। এক মাথা চুল, এক মুখ কাঁচা পাকা দাড়ি, আর চওড়া কপালে তেমনি মোটা করে মেটে সিঁদুর ঘষা। অনেকেরই বিশ্বাস লোকটার তন্ত্রমন্ত্র জানা আছে কিছু। ছোট বড় বাবুদের কাছ থেকেও বাড়তি কিছু রোজগার হয় রতন বনিকের।

সে তার খদ্দেরের মাথার ক্ষেপ দেখে, ভুরু কান নাক চোখ দেখে, ঠোঁটের বক্রভাগ দেখে দেখে—আর সব থেকে বেশি দেখে মুখ আর কপালের রং। শুধু তার চোখেই যে কোনো লোকের সুসময়ে অথবা দুঃসময়ে কপাল আর মুখের রং-বদল ধরা পড়ে। খুব নিবিষ্ট মনে এইসব দেখে নিয়ে চোখ বুজে সে ভবিষ্যত বলা শুরু করে দেয়। যা বলে তার কিছু সত্য হতে পারে, বেশির ভাগই হয়তো সত্য হয় না। বাপী তরফদারের তাই ধারণা। একশটা ঢিল ছুঁড়লে দু' দশটা লেগে যাওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু মানুষের মন এমনি দুর্বল, যে-টা লাগল সেটারই দাগ থেকে গেল। অনেককে বলতে শুনেছে, ব্যাটা ভাওতাবাজ, কিস্যু জানে না। কিন্তু বিপাকে পড়লে অথবা কোনো আশার সম্ভাবনা দেখলে তাদেরও ওকে খাতির করে কাছে ডেকে বসাতে দেখেছে।

দেশভূঁইয়ে কাছে চিঠি লিখতে হলে বা টাকা পাঠাতে হলে নতুন বাবু অর্থাৎ বাপী তরফদার তার সেই চিঠি অথবা মানিঅর্ডার ফর্ম লিখে দিত। আর রোজ ওকে দিয়ে চা আনানোর সময় ওকেও চা খাওয়ার পয়সা দিত। সেই কারণে হোক, বা সমস্ত বিভাগের মধ্যে এমন কি আপিসের মধ্যেও একমাত্র বিপুল তরফদারই ভাগ্য যাচাইয়ের ব্যাপারে কখনো শরণাপন্ন হয়নি বলে হোক—রতন বনিকের তার ওপর একটু বেশি টান ছিল। তার আগ্রহ না থাকলেও নিঃসংশয়ে সে তার সম্পর্কে এমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যা শুনে সহকর্মীদের চোখ ট্যারা আর বাপী তরফদারের মেজাজ গরম। তার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সে গোটা বুককিপিং ডিপোর খোদ মালিক হয়ে বসলেও অবাক হবার কিছু নেই।

....ভবিতব্যের কথা শুনে অপরের হাসি দেখে সাধারণ কেরানিবাবু বিপুল-নারায়ণ তরফদারের মেজাজ গরম হবার আরো কারণ আছে। খুব ছেলেবেলা থেকে সে আকাশ-ছোঁয়া রকমের বড় হওয়ার স্বপ্নই দেখে এসেছে। সেই স্বপ্ন এত প্রত্যক্ষ যে এর প্রতিকূল কোনো বাস্তব সম্ভাবনার সঙ্গে তার এতটুকু আপোস ছিল না। একটু একটু করে মনের তলায় সাফল্যের এক বিশাল সাম্রাজ্যই গড়ে বসে ছিল। বড় হওয়ার এই তাড়নাটা তার মনের তলায় বাসা বেঁধে আছে অনেক দিনের এক অসহ্য তাচ্ছিল্যের আঘাত থেকে। আর নিজের সেদিনের ক্ষুদ্রকায় শরীরটার তাজা রক্তের নোনতা স্বাদ থেকে।

....মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে তাচ্ছিল্যের দুঃসহ অপমানের সেই এক আদিম বিকৃত প্রতিশোধের প্ররোচনায় কোনরকম জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেচনার অবকাশ ছিল না। তার ওপর শাসনের

আঘাতে আঘাতে অপরিণত বয়সের সেই দেহ ঝাঁঝরা হয়েছে। দুই কশ-ঝরা নিজের সেই তাজা রক্তের স্বাদ বাপী তরফ-দার এ জীবনে ভুলবে না।

সেই থেকেই বড় হওয়ার একটা অফুরন্ত তাগিদ ধমনীর রক্তে টগবগ করে ফুটত সর্বদা। এখনো ফোটে। কত বড় হলে মন ভরে সে-সম্বন্ধে তারও নির্দিষ্ট কোনো ধারণা নেই। মোট কথা, কোনো গন্ডী বা কোনো সীমানার মধ্যে কুলোয় না সেটা।

বাপী তরফদারের সমূহ সমস্যা রতন বনিকের বউ কমলাকে নিয়ে। তার হাব-ভাব রকম-সকম দ্রুত বদলাচ্ছে। ওকে দেখলেই মনের তলায় অঘটনের ছায়া পড়ে। বাপী তরফদার সরোষে ওটা ছিঁড়ে খুঁড়ে মন থেকে সরায়।

... মাত্র দিন পাঁচ ছয় আগের কথা। বিকেলের আগেই রেডিও মারফৎ খবরটা আগুনের গোলার মতো ছড়িয়ে পড়তে শুনে বাপী তরফদার আর বাইরে টহল না দিয়ে এই খুপরি ঘরে এসে বসেছিল। ও-পাশ থেকে কমলা দেখতে পেয়ে ছুটে এসেছে। এক পিঠ খোলা চুল, ঢিলে-ঢালা বেশ-বাস, উত্তেজনায় দু'চোখ কপালে।—তুমিও খবর শুনেছ তাহলে? তোমাদের ভদ্রলোকদের হলো কি গো বড়বাবু, কেন দুখু মানুষ [illegible] উনি মানুষ নন—দেবতা—তাঁকেই করে মেরে দিলে?

এর কি জবাব দেবে বাপী তর[illegible] তার নিজের মাথার মধ্যেই সব যেন [illegible] গোল পাকিয়ে যাচ্ছিল।

আগ্রহে আর উত্তেজনায় [illegible] খাটিয়ার সামনেই মেঝের ওপর বসে [illegible] ছিল। তার শোনার ইচ্ছে জানার ইচ্[illegible] বোঝার ইচ্ছে। এ-রকমও কেন হয়, দেব[illegible] আবার শত্রু থাকে কি করে।

বাপী তরফদার টুকটাক দুই [illegible] কথার জবাব দিচ্ছিল। জানতে বুঝতে [illegible] কমলা নিজেই বেশি কথা বলছিল। [illegible] বছর বেলেঘাটায় গিয়ে কমলা নিজের চো[illegible] গান্ধিজীকে দেখে এসেছিল। এখান[illegible] আরো অনেকে গেছিল। নিজের কানে ত[illegible] কথা শুনেছে, নিজের চোখে তাঁর হা[illegible] দেখেছে—জন্ম সার্থক। আর আজ [illegible] এই।

বলতে বলতে থমকে মুখের দি[illegible] তাকিয়েছে। নিজের অগোচরে বাপী তর[illegible] দারের দু'চোখে তার মুখে বুকে ওঠা-না[illegible] করেছে হয়তো দুই একবার। কিন্তু আস[illegible] সে নিজের প্রতি বা কারো প্রতি সচেতন [illegible] না একটুও।

গা ঝাড়া দিয়ে কমলা বসা থেকে সো[illegible] উঠে দাঁড়িয়েছিল আর সঙ্গে সঙ্গে [illegible] আঁচলটা সজোরে বুকের ওপর দিয়ে পি[illegible] দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিল। তারপর ছদ্ম ঝাঁ[illegible] বলে উঠেছিল, খুব যে পরের বউকে সাম[illegible] বসিয়ে চোখের সাধ মেটানো হচ্ছে—আ[illegible]

বলতে বলতে ঘর ছেড়ে চলে গেছে সে। বাপী তরফদার বিমূঢ়।

পরের চার পাঁচ দিনের মধ্যে কমল[illegible] হাবভাব আরো অন্যরকম দেখছে। বাই[illegible] গম্ভীর, কিন্তু চোখে চোখ পড়লে অঘটনে[illegible] অস্বস্তিকর ছায়াটা বেশ আরো ঘন হ[illegible] উঠছে। বাপী তরফদার [illegible] সাড়ে এগারো নাগাত স্নান-টান সেরে বেরিয়ে পড়ে[illegible] বাইরে দুপুরের খাওয়া সেরে একেবা[illegible] রাতে ফেরে। গতকাল বেরুনোর আগে কমল[illegible] এই খুপরিতে এসে হাজির। কালো মু[illegible] থমথমে-গম্ভীর, চোখের কোণে কৌতু[illegible] চিকচিক করছে।

—আজকাল তোমার কোন্ পাথে[illegible] ডিউটি চলছে গো?

....তার মানে? না বুঝেও বিরক্ত।

—মানে আবার কি, রোজ সাড়ে[illegible] এগারোটা বারোটায় বেরিয়ে রাত দশটা পর্যন্ত হন্যে হয়ে জমি চাকরি খুঁজে বেড়াও সেটা ওই হাঁদা বুড়ো বিশ্বাস করলেও আমি করিনা। চাপা হাসি উছলে উঠতে চাইল কিন্তু উঠতে দিল না।—মরুকগে, এদিকে একটা ভালো ছবি হচ্ছে, এখানকার অনেকে দেখেছে দুপুরের শোয়ের দুখানা টিকিট কাটতে পারবে? আমি পয়সা দিচ্ছি—

কমলার চোখ এড়িয়ে মাথা নেড়ে বাপী তরফদার বিড়বিড় করে জবাব দিল, আমার সময় হবে না।

এ জবাবের জন্য প্রস্তুতই ছিল যে[illegible]
[illegible]

য মা হয়....তোমায় দেখার সময় হবে?

এবারে ওর চোখের দিকে তাকালো ী তরফদার। কমলা ফিক করে হেসে লল। —তোমার অত ভয় কিসের, কেউ র পাবে না। ছবি দেখার পর বেরিয়ে এসে মি তোমাকে চিনতেও পারব না—সোজা র চলে আসব—

কমলার দু'চোখের কৌতুক সমস্ত খে ছড়িয়ে পড়েছিল যেন। জবাব না দিয়ে পী তরফদার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে।

তারপর কাল রাতেই রতন বনিকের ান থেকে চলে যাওয়ার কথা বলেছে। আর ই শুনেই কমলার সকালের এই ঠেস।

কিন্তু সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত আজকের নটায় আর কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। ভ্যাসবশতই ঘন্টা কয়েক আপিস পাড়ায় রাঘুরি করেছে। সেখানেও লাল দীঘির ড় দেখে ঘন্টা দুই কেটেছে। বিকেলে য়দানের মাঝখান দিয়ে অন্যদিনের মতোই ক্ষণে হাঁটা দিয়েছে। ট্রামের সেকেন্ড াসের পয়সা কটাও বাঁচে আবার লম্বা াটাও হয়। এই হাঁটারও কোনো নির্দিষ্ট ক্ষা নেই। পা যখন আর চলতে চায় না, রে কাছের কোনোএকটা পার্ক-টার্কএ বেঞ্চি ল বেঞ্চিতে নয়তো ঘাসের ওপরেই বসে ড়ে। ততক্ষণে শীতের ছোট বেলার শেষ ালোটুকুও অন্ধকারের জঠরে চলে যায়।

আজ ক্লান্ত লাগছিল না। বেলা তনটে নাগাত ছেলে-বেলার বন্ধু নিশীথ নএর আপিসে গেছল। সে ভর-পেট খাবার খাইয়ে দিয়েছে। লোকালয়ের ুটপাথ ধরে চলতে চলতে নিজের বাসের লাকা ছাড়িয়ে আরো দক্ষিণে চলেছে সে। জবা পার্কের সামনে দাঁড়িয়ে গেল একটু। াইট জ্বালিয়ে প্যান্ডেল খাটিয়ে এখানেও ন্ধীজীর শোকসভা চলেছে।

এর পাশেই আর এক দৃশ্য দেখে হাসি ায়ে গেল বাপী তরফদারের। রেলিং-ঘেঁষা ুটপাথে গজ দশকে দূরে দূরে কুপী ালিয়ে দু'জন শীর্ণকায় গণৎকার বসে। ামনে ফুটপাথের ওপরেই খড়ির ছক-কাটা। াদের সামনে এক'জন করে খদ্দের হাত াড়িয়ে বসে আছে। এখানেও ভাগ্য গনণা লছে। এক আধজন আবার পাশে দাঁড়িয়ে েখছে। বসে পড়বে কি পড়বে না—দোনা- নাভাব।

বাপী তরফদার আর না দাঁড়িয়ে গিয়ে চলল। মানুষ কত দূরের ভবিষ্যত েখতে পেলে নিশ্চিন্ত হতে পারে সে ভেবে ায় না। আসলে এ একটা রোগ। রোগের তো কিছু। এ-রোগ যে তার মধ্যেও কত োর সে শুধু সে-ই জানে। কিন্তু কোনো লাককে সে হাত দেখায় না, ঠিকুজি দেখায় া। সে জানে, দেখালে একটা রূঢ় বাস্তব াকে হাঁ করে গিলতে আসবে। কারণ, এখনো কল্পনার যে সাম্রাজ্যের সে অধীশ্বর য়ে বসে আছে সেটা কোনদিন সত্যের ধারে াছে [illegible] জগৎ- [illegible]-ই

[illegible], রতন বনিকের ভবিষ্যৎ-বচন বরং শুনতে ঢের ভালো লাগে তার।

কিন্তু ঠিক এই এক ব্যাপার থেকেই যে এই দিনটা অন্য সবগুলো গতানুগতিক দিন থেকে এত তফাৎ হয়ে যাবে, তখন পর্যন্ত এ-রকম সম্ভবনা তার কল্পনার মধ্যেও নেই।

.... বড় রাস্তা ছেড়ে ভিতরের একটা মাঝারি রাস্তা ধরে আরো আধ মাইলটাক দক্ষিণে হেঁটে এসেছিল। সামনের মোড়ের মাথায় একটা তিন-তলা বাড়ির রাস্তা-ঘেঁষা একতলার ঘরটার দিকে চোখ গেল তার। আবারও হেসে উঠল। ওই ঘরেই একজন জ্যোতিষী বসেন সে জানে। এই রাস্তায় আরো এসেছে-গেছে। এই একজন বড় লোকের জ্যোতিষী। বড় লোকের ভাগ্য দেখেন, ভাগ্য ফেরান। ঘরের সামনে দুটো তিনটে গাড়ি দাঁড় করানো দেখে। বাইরে অভিজাত মেয়ে-পুরুষেরা অপেক্ষা করে। ভিতরের খদ্দের বেরিয়ে এলে তবে আর একজনের পালা।

আজও দূর থেকে সেই একই দৃশ্য দেখল। দু'খানা গাড়ি দরজার দাঁড়িয়ে। বাইরে প্রতীক্ষারত দু'জন ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা। বাপী তরফদার হাসছে মৃদু মৃদু, এগিয়ে আসছে। সামনের দরজা দিয়ে ফরাস-ঢাকা চৌকিতে বসা জ্যোতিষীকে দেখা গেল। তাঁর সামনে দুটি অভিজাত মহিলা বসে। পিছন থেকে তাদের পিঠ দেখা যাচ্ছে, মুখ দেখা যাচ্ছেনা। জ্যোতিষীর মুখে হুকো-গড়গড়ার নল। নলের তামাক টানছেন আর নিবিষ্ট মনে দেখছেন কিছু।

দরজা ছাড়িয়ে এসে পাশের জানলা দিয়ে ভিতরে তাকাতেই বাপী তরফদার স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে হৃৎ-পিন্ডটা যেন লাফালাফি করে বুকের খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল। এ কাকে দেখছে বাপী তরফদার? কাদের দেখছে? সত্যি দেখছে না স্বপ্ন কিছু?

সত্যি না হলে বিগত আটটা বছরের এতগুলো দিন থেকে এই দিনটা—এই রাতটা মুহূর্তের মধ্যে এত তফাৎ হয়ে গেল কি করে! সত্যিই এখানে এতবড় একটা চমক তার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে!

জানালার গরাদ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত দুই চক্ষু মেলে দেখছে। ওই দুজনেই এত বেশি চেনা তার যে দেখামাত্র সর্বাঙ্গের স্নায়ুগুলো এক সঙ্গে টান-টান হয়ে গেছে। বয়স্কা মহিলার জমকালো বেশবাস, গলায় কানে হাতে ঝকমকে একরাশ গয়না। .... মনোরমা নন্দী। জ্যোতিষীর সামনে কচি পদ্মের মতো দু'হাত মেলে বসে আছে তার মেয়ে মিষ্টি....মালবিকা। ছেড়ে আসা এক জায়গায় সে যেমন বিপুল নয়—বাপী, সেখানে এই মেয়েও তেমনি মালবিকা নয়—মিষ্টি। মিষ্টি মিষ্টি! অপলক চেয়ে আছে। দশ আর আটে আঠেরো হবে এখন বয়েস। দশ বছরের সেই গরবিনী মেয়েটাই আঠেরো এই হয়েছে।

বাপী তরফদার তাকেই দেখছে আর তার মা-কে দেখছে এ কি বিশ্বাস করবে?

ভিতরে জোরালো আলো। বাইরেটা সে তুলনায় অন্ধকার। ভিতর থেকে তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না।

কতক্ষণ কেটেছে জানে না। এক সময় উঠতে দেখল তাদের। মনোরমা নন্দী হাসছেন। মিষ্টি নন্দীও হাসছে। মনোরমা নন্দী সুন্দর হাত ব্যাগ খুলে দুটো দশ টাকার নোট জ্যোতিষীর সামনে রাখলেন। ভিতরের কথাবার্তা কানে আসছে না।

নিজের ওপর আর যেন এতটুকু দখল নেই বাপী তরফদারের। তারা বেরিয়ে আসতে সে দু'হাতের মধ্যে এসে দাঁড়াল।

মনোরমা বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে দেখলেন পা-জামা পরা ঘরের রঙের গরম আলোয়ান জড়ানো একটা ছেলে হাঁ করে তাঁর মেয়েকে দেখছে। দেখছে না, দুই চোখ দিয়ে গিলছে যেন।

—স্টুপিড! খুব অস্পষ্ট ঝাঁঝে কথাটা বলে মেয়ের হাত ধরে তিনি গাড়িতে উঠলেন। মেয়েটারও বিরক্তি-মাখা লালচে মুখ। সাদাটে রঙের গাড়িটা চোখের সামনে দিয়ে আরো দক্ষিণে চলল।

পিছন থেকে গাড়িটার নম্বর চোখে পড়ল বাপী তরফদারের। তখনো স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে সে। গাড়ির রক্তবর্ণ টেইল-লাইট দুটোও মিলিয়ে গেল।

হঠাৎ জিভে করে নিজের শুকনো ঠোঁট বার দুই ঘষে নিল বাপী তরফদার। আট বছর আগের সেই অকরুণ আঘাতের চিহ্ন হয়তো আট দিনেই মিলিয়েছে।

....কিন্তু নিজের দেহের সেই তাজা রক্তের নোনতা স্বাদ আজও জিভে লেগে আছে।

ছবি এঁকেছেন শৈবাল ঘোষ

(চলবে)

ছবি এঁকেছেন : শৈবাল ঘোষ

॥ সাত ॥

হয়তো রবি ফিরল।

বেলা আড়াইটে-তিনটে। আমি
গা ঘেঁষে বনস্পতি কারখানার চি
এবারে রঙীন ধোঁয়া ওগরাবে। অস
ভোরবেলার আওয়াজে বাদী ধড়মড়

নায় উঠে বসল। এই সময়টা বাড়ি
। থাকে। এরকম সময়েই রবি হঠাৎ
আসে। কিংবা রবি কাউকে দিয়ে
পাঠায়। টিকটিকির নজর এড়িয়ে।
দ্ মাসে প্লিশ এসে রবির খোঁজে
র এ-বাড়ি সার্চ করেছে।

শেষবার সার্চের সময় প্লিশের সঙ্গে
পের দেখা হয়। সে এক হ্জোং।
গ যত কোশ্চেন করে দিলীপ তত
। জবাব দেয়। কারণ কিছ্ই নয়।
প রোজকার মতই মাতাল হয়ে বাড়ি
দেখে—খাঁকির শার্ট গায়ে কতক-
লোক সারা বাড়ির কাগজপত্র এলো-
হাটকাচছে। দিলীপ তাদের ওপর
হয় তখন। তাতে প্লিশ দিলীপকে
নিতে নিয়ে গিয়ে খানিকক্ষণ দূরে-
করে। তাতে দিলীপ আরও ক্ষেপে

এমন ছেলেকে জন্ম দিয়েছেন কেন?
আপনার সঙ্গে তখন কনসাল্ট করার
পাই নি স্যার। দিলীপের এই
র সময় রানী দেখতে পায়—তার
র বাঁ কানের নীচে রকত। কিন্তু
। গিয়ে কিছ্ করতে পারে নি। কারণ,
বেডর্মে তখন ইনভেস্টিগেটিং অফি-
সঙ্গে তিনজন সি আর পি। এই
সি আর পি রবিরই বয়সী হবে।
য়াল কিংবা পাহাড়ী এলাকার তিনজন
য় য্বক। কোমরে বেল্ট। বেল্টে
ঝ্লছিল তিনজনেরই।
রোজই এমন মাতাল হয়ে ফেরে
র স্বামী?
রানী কোন জবাব দেয় নি। চ্প
থেকেছে।
জবাব দিয়েছে দিলীপ। এটাও
কে কনসাল্ট করে করা হয় নি
কাল সন্ধ্যের ঝোঁকে যদি কিছ্
ণ দেন স্যার — তাহলে হয়ত আর
খতে পারি। ওই সন্ধ্যেবেলাতেই যত
রাপ হয় স্যার।
সাট আপ! এ জন্যেই আপনার ছেলে
হয়েছে। ছোটবেলা থেকে সঙ্গ দেন
এখন গ্ণধর অ্যাকশন স্কোয়াডের
জড়িয়ে পড়েছে। আমরা ওকে খ্ঁজে
করবই।
পেলে স্যার আমায় একট্ দেখিয়ে
। অনেক দিন ছেলেটাকে দেখি নি।

রান্না থেকে নেমে রানী দরজায়
এখন নিশ্চয় প্লিশ আসে নি।
দরজা খ্লতেই চমকে উঠল। এ কি?
? ঠিকানা পেলে কোথায়?
ভেতরে আসব?
হাঁ—না —কিছ্ই বলল না রানী।
পিছিয়ে এল ঘরের ভেতর। তুমি
এলে কেন?

আমি কিছ্ চাইতে আসি নি। এক-
ধ্ তোমাকে দেখে চলে যাব।
এত বছর বাদে। দরজাটা আটকে

আসবার ইচছে অনেক দিনের রানী।
কুলোয় নি।

তুমি যে কাওয়ার্ড—সে তো সবাই
জানে। কি মনে করে?
আমার তো কোন কিছ্ চাওয়ার নেই
রাণ্।
রাণ্ রাণ্ কর না প্রবোধ। এখন
বয়স হয়েছে। ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে।
স্বামীর শরীর খারাপ। আমারও ভাল
নেই। এখন আর প্রনো কাস্ন্দি ঝালাবার
মত মন নেই।

তুমি আর গান কর না? আমি ওই
চেয়ারটায় বসবো?
হ্যাঁ। বোসো। আমি ভ্লি নি—তুমি
আমায় তিনশো গান শিখিয়েছিলে। সে
সব গানের খাতা, হারমোনিয়ামটা — ওই
সাইড কাবার্ডে আছে। খালি শিশি-
বোতলের সঙ্গে।
তোমার মেয়ে গান শেখে না?
আমার মেয়ে আছে জানলে কি করে?
দিলীপবাব্ বললেন। একদিন সন্ধ্যে-
বেলা অলিম্পিয়ায় তোমার স্বামীর সঙ্গে
আলাপ। তখন কথায় কথায় তোমার কথা
বললেন। ছেলের কথা। মেয়ের কথা।
বলতে বলতে আবার ভুলেও যাচ্ছিলেন।
তুমি কিছ্ বল নি? তুমি কে?
না। নিজেই নিজের কার্ড দিলেন।
তোমার নাম বললেন।

তাতেই চিনে ফেললে। আশ্চর্য।
এভাবেই তো দেখা হয় মান্ষের।
অনেক কাল পরে—তাই না রানী।
রানী মনে করার চেষ্টা করল। সারা
শহরে তখন শ্ধ্ আমাদের বাড়িতেই
হেরিকেন জ্বলত। আর সব বাড়িতে ইলেক-
ট্রিক। রাতে রান্না হত না আমাদের এক-
একদিন। জলে ছাত্ ভিজিয়ে গ্ড় দিয়ে
খেয়ে নিতাম জ্যোৎস্নায় বসে।

আমি তখন হারমোনিয়ম বেলো করে
তোমায় গান শেখাতাম। এক কাপ চা
খাওয়াবে রানী?
যে কোন সময় রবির খোঁজে প্লিশ
আসতে পারে। ওর বাবা ফিরে আসতে
পারে। এসব কথা মনে হতেই রানী বলল,
গ্যাস ফ্রিয়ে গেছে।

তোমাদের বাড়ি হিটার নেই?
আছে। কিন্তু প্লাগটা ল্জ—
দাও না আমায়। আমি কাজ জানি।
সারিয়ে দিচ্ছি।
উঁহ্। দরকার নেই। শক খাবে।
তুমি না একটা বিয়ে করেছিলে পরে?

হ্ঁ। বউ নেই।
কি অস্খ করেছিল? বাচ্চা হতে
গিয়ে?
উঁহ্। এমনি চলে গেছে। বাচচা
হবার আগেই—
তাই বল! তুমি তো দেখছি একজন
গ্ণধর! শিয়াখালা লাইনে ছোট রেলের
কি একটা চাকরি করতে না?
সে চাকরি আর নেই।
চাকরি গেল কি করে?
কাগজে পড় নি রানী? সে লাইন
উঠে গেছে। বড় রেল বসবে বলে। সবই
আমার ভাগ্য রানী। বড় রেল আজও বসে
নি। তখন যদি সাহস করে তোমায় বিয়ে
করতাম। বড় পয়া তুমি। দ্যাখ না—
দিলীপবাব্ কিসের থেকে কি হয়েছেন।
তোমার বাড়িও রাজি ছিল।
এসব কথা থাক। এখন বরং এসো।
সকালবেলায় ও বাড়ি থাকে। তখন বরং
একদিন ফোন করে ঘ্রে যেও।
আরেকট্ বসি রানী।
না। আমি এখন একট্ ঘ্মোব।
তোমার একখানা ফটো দাও। কাছে
রাখব।

এখনকার তো কোন ফটো তুলি না।
তখনকার যদি থাকে—দাও না এক-
খানা।
আবার খ্ঁজতে হবে। এখন আমি
পারব না। বরং ঠিকানা রেখে যাও। আমি
খ্ঁজে-পেতে পোস্ট করে দেব।
সেই বাড়িতেই আছি রানী।
ঠিকানাটা রেখে যাও।

ন্যাকামি কর না, ও ঠিকানা তুমি
ভ্লতে পার না রানী। বিয়ের আগের
একটা ঠিকানা প্রথম প্রেমের মতই সবাই
মনে করে রাখে। তোমারও মনে আছে
আমি জানি।
খ্ব যে আত্মবিশ্বাস দেখছি!
হ্যাঁ রানী।
তখন নিজের ওপর এ কনফিডেন্স
ছিল না কেন?
প্রবোধ এবার আর কোন কথা খ্ঁজে
পেল না।

মার্চের বিকেল। ভোর রাতে শীত
শীত ভাব থাকে। সন্ধ্যে রাতে জ্যোৎস্নায়
ফ্লসম্ধ লতাপাতা ছায়া ফেলে হাওয়ায়
দোলে।

এ বাড়িটা স্যার লেজলিউডের ফ্যামিলি ভিলা। কলকাতার ভেতর এত বড় লন বড় একটা দেখা যায় না। ওল্ড সার্কাস রেঞ্জে উঁচু দেওয়াল ঘেরা এ-বাড়ির বয়স একশো বছরের ওপর। স্যার লেজলির ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা বানিয়েছিলেন। সপ্তম এডোয়ার্ড এ মাঠে পা দিয়ে গেছেন। তাঁর স্মরণে স্যার লেজলির ঠাকুর্দা মহামান্য সম্রাটের পদচিহ্নের জায়গাটায় তখনকার নতুন আমদানী একটা জিনিস—যাকে এখন সিমেন্ট বলা হয়—তাই দিয়ে বেদী বানান। পাশেই বসিয়েছিলেন একটা রেইন ট্রি চারা। সেই রেইনট্রি এখন মহীরুহ। খানিক দূরেই একমা ক্যাসিয়া গাছ। তার গা দিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হলুদ ফুল অবিরল ঝরে পড়ছে। পাশাপাশি এই দুটো গাছেরই গুঁড়ি গম্ভীর, কালচে আর ফাটা ফাটা। দু হাত দিয়েও বেড়ে পাওয়া যাবে না।

সারাটি লনে এমনি মানান সব রং মেটে গিয়ে একটা রুকতারকাত ব্যাপার। ঝালগুলো তোলা জল খেয়ে সবুজ। গাছ-পাতার চেহারা কালচে। উঁচু কম্পাউন্ড ওয়ালের গা থেকে ঝুলে-পড়া লতানো সব পাতার মাঝে মাঝে বেগুনি ফুলের কুচি।

এরকম একটা জায়গায় বাসন্তী রঙের বিশাল ছাতার নীচে তিনজন লোক বসে। শাদা বেতের চেয়ারে। সামনেই চিল্ড বিয়ার। কারুকাজ কাঁচের টাবে বরফঠান্ডা আঙুর। দু রকমের। কাল আর সবুজ। স্যার লেজলি সরল ইংরিজিতে জানাল, কালচে আঙুরগুলোর জন্মস্থান—নাসিক। ওখানেই স্যারের কোম্পানির ডিস্টিলারি প্ল্যান্ট বসান হয়েছে। আর সবুজ আঙুরগুলো আজকাল নর্থ ইণ্ডিয়ার অনেক জায়গাতেই হচ্ছে। আসলে এ আঙুরের চাষ আগে ছিল শুধু রত্নগিরির ডিস্ট্রিক্টে।

স্বাতীর পাশেই বসেছে স্যার লেজলি। গায়ে একটা সুইমিং ট্রাংক। তার বাইরে শাদা শরীরটার যেটুকু বেরিয়ে—তার কোথাও কোন মেদ নেই। নতুন শাদা ফিকের রঙের দুখানা ঊরু। লাল ঠোঁট। এই লোকটাই খানিক আগে স্বাতী আর দিলীপকে বাড়ির ভেতর ফ্যামিলি কালেকশন দেখাচ্ছিল। ঠাকুর্দার বাবার ঘোড়ায় চড়ার স্যাডেল। হীরা বসান। বুয়র যুদ্ধের তরোয়াল। কুইন ভিকটোরিয়ার দেওয়া পকেট ওয়াচ। ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার অয়েল পেন্টিং। তামার পাত দিয়ে মোড়া কাঠের সিঁড়ি। বৈঠকখানা থেকে আশী ধাপ উঠে গেছে দোতলায়। সিঁড়ির মাথায় কিশোর লেজলির ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট স্টাডি। একজন বাঙালী আর্টিস্টের পেনসিলের কাজ। লেজলির মা ছবি আঁকতেন। বাবা পর পর এগার বছর চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ভাইসরয়ের কাউন্সিলে একবার হোম মেম্বার হন।

লেজলি কথা বলছিল—আর ঘামছিল। স্বাতী তার চেয়ারে বসেই ওর গা থেকে উঠে আসা দামী বাথসল্টের সুগন্ধ পাচ্ছিল। গভীর নীল চোখ। হাতের মুঠো থেকে গ্লাস নামিয়ে লেজলি অনেকগুলো আঙুর খেয়ে ফেলল এক সঙ্গে। চেঞ্জ করে নাও—

এ কথায় দিলীপ বলল, আমি এখন আর জলে নামব না।

গ্লাস রেখে দেবার সময় লেজলির হাতের রেখাগুলো স্বাতী দেখতে পেয়েছিল। লালচে ফ্যাকাশে চামড়ার ভেতর সামান্য কয়েকটি লাইন। ঊর্ধ্ব রেখা আয়ুরেখা। হাতের তালুতে শকত জমান। নীল চোখে স্বাতীর জন্যে অনেকখানি প্রশংসা স্থির হয়ে আছে অনেকক্ষণ। স্বাতী বলল, আমি সাঁতরাব।

পাশেই স্যার লেজলির প্রাইভেট পুল। তাতে চোখের সামনে পাম্প করে জল ভরে দেওয়া হল। পাঁচ-ছ কাঠার গলা তক্ষিদ জল। টলটল করছিল। চাতাল অব্দি পরিষ্কার দেখা যায়।

লেজলি বলল, তাহলে চেঞ্জ করে নাও। একটা ঘেরা ঘর দেখিয়ে বলল, ওখানে সব গোছান আছে। হাত বাড়ালেই পেয়ে যাবে।

স্বাতী গিয়ে সে-ঘরে ঢুকল। বেরিয়ে এল — কলম্বিয়া পিকচার্সের হিরোইন একদম। সরু কোমর। ভারী ঊরু। বুক আর পেছনটা মানানসই উঁচু। কোন জড়তা নেই। চল। নামবে—

দিলীপ ভেতরে ভেতরে কেঁপে গেল। না। আমি এখন নামছি না। মনে মনে বলল, স্বাতী। তোমাকে আমি আরেকবার হারাতে যাচ্ছি। চোখের সামনে স্বাতী দাঁড়িয়ে। ব্যাকগ্রাউন্ডে হোয়াইট সিমেন্টে বাঁধান প্রাইভেট পুল। জলের ভেতর একটা আকাশী রঙের সিঁড়ি নেমে গেছে। সুইমিং ট্রাংকটা স্বাতীর কোমর, বুক, পেছন—সব কামড়ে ধরেছে। তার বাইরে হলুদ আভা ছড়ান টান-টান স্কিন। একই সঙ্গে দুজন পুরুষকে মনোযোগী হতে দেখে—স্বাতী হেসে ফেলল—তারপর, নিজের আনন্দেই জলে ঝাঁপ দিল।

দিলীপের মনে পড়ল, এসব দৃশ্যের বর্ণনাতেই ইংরেজিতে একটা কথা লেখা হয়। স্প্লাস্। দূরে বসার ঘরে প্লাগ লাগান সবুজ রঙের টেলিফোনটা বেতের চেয়ারের পাশেই ঘাসের ওপর। সাবধানে সেটা টপকে স্যার লেজলিও জলে পড়ল। তখনও স্বাতী মুখ দিয়ে জলের ফোয়ারা তুলে মাথাটা জলের ওপর রাখতে চাইছে। পরিষ্কার জলের ভেতর দুখানা ভারী সমর্থ ঊরু দিয়ে জল কাটছিল আর ব্যালান্স রাখছিল। এমন পা দেখতে কোন পুরুষের না ভাল লাগে।

স্যার লেজলি জল কেটে এগিয়ে গিয়ে স্বাতীর ভার নিল। নীল চোখ। শাদা বুক। লালচে ভিজে চুল মাথায়। দু হাতে ছাল ছাড়ান মুরগি হয়ে স্বাতী হাত-পা ছুঁড়ছে। হাসছে। স্যার লেজলি ওর শরীরটা একদম শূন্যে তুলে ধরল। চারদিকে লতায় ঢাকা উঁচু দেওয়াল। ঘাসের ওপর টেলিফোনটা বেজে উঠতেই [illegible] লেজলি স্বাতীকে জলে ফেলে দিল। [illegible] খানিক জল ছিটকে এসে দিলীপের গা[illegible] লাগল।

একজন বেয়ারা ছুটে এসে টে[illegible] ফোনটা পুলের কিনারায় নিয়ে এল। [illegible] লেজলি বুক জলে দাঁড়িয়ে ভিজে হ[illegible] ফোনটা কানে লাগাল। হ্যালো—

টারজান ইন টাউনের পোজে লে[illegible] দাঁড়ান। কাঁচের চেয়েও স্বচ্ছ জলে [illegible] সরু কোমর। চওড়া বুক। কয়েক [illegible] দূরেই স্বাতী এখন প্রায় জলপরী [illegible] ভাসছে। নিস্তব্ধ বিশাল বাড়ি। আর [illegible] দুয়েকের ভেতর সন্ধ্যের ঘোর [illegible] জোৎস্না বেরিয়ে পড়তে পারে।

দিলীপ স্বাতীর দিকে তাকিয়ে চ[illegible] গলায় বলল, উঠে এস। জলে তো অ[illegible] নেই তোমার—

কে বলল। আমি তো চিরকাল [illegible] ভালবাসি।

উঠে এস।

স্যার লেজলি ফোন হাতে [illegible] দিলীপের দিকে তাকাল। নো। নট না[illegible] তারপর কি মনে হল লেজলির—[illegible] বলল, হোয়াই সো আর্লি ?

দিলীপ বুঝল, পুরো ব্যাপার[illegible] এখন তার হাতের বাইরে। সে অনধিকার[illegible] তবু হাসি হাসি মুখ করে বেতের চে[illegible] বসে থাকল। বেয়ারা অরেক প্রস্থ [illegible] গেল। দিলীপের কোন না নেই। সে [illegible] থাকল। দেখতে থাকল। স্যার লেজ[illegible] প্রাইভেট পুল মানুষের ডানার ঝাপ[illegible] তোলপাড় হচ্ছে। বেয়ারা এক সময় ফ্[illegible] লাইট জেলে দিল। তখনই [illegible] মাঠে আবার দিন। একটা নীলজ[illegible] মূর্তির মত পা-গোটানো আগাগোড়া [illegible] স্বাতীকে লেজলি দু হাতে বুকের [illegible] তুলে ধরেছে। সে [illegible]খাতেই স্বাতী আ[illegible] পিছলে জলে তলিয়ে গেল। ভেসেও উঠ[illegible] তিন হাত দূরে গিয়ে। হাসতে হাস[illegible] তখন লেজলি ওকে ধরে ফেলবে ব[illegible] ছুটলো। কিন্তু জল অত তাড়াতাড়ি [illegible] যায় না। বরং টুপ করে ডুবে যেতে আ[illegible] কম সময় লাগে জলে। দুই চওড়া কাঁধে [illegible] লেজলি উঁচু তখনো জল ভাঙছিল।

ঋষিকে একদা দিলীপ মনে [illegible] বলতো : অরণ্যদেব। প্রিয়ার অরণ্যদে[illegible] তোমার লিভার নিশ্চয় টাংস্টেন দিয়ে তৈ[illegible]

একদিন বলেই ফেলেছিল ঋষি[illegible] তুই নিট রাম সাবাড় করলি আধ বোত[illegible] মাছ ভাজা খেলি এক কেজি। তারপর [illegible] পুকুর এপার ওপার করলি তিনবার। [illegible] এখন মাংস ভাত খেতে বসবি!

কথা হচ্ছিল—কলকাতার বাই[illegible] পিকনিকে গিয়ে। একটা পোড়োবাড়ির [illegible] ঘাটলায় বসে।

তা নয়তো কি? অত সুন্দর [illegible]

সেই থেকে গন্ধ পাচ্ছি। কেমন জ্যোৎস্না এখানে দিলীপ। তুই সঙ্গে চাঁদের আলো আমার খুব ভালো

থন দিলীপ অনায়াসে ঋষির মনের দয়ে শর্টকাট করতে পারতো। ঋষি দিলীপ মানে বুঝতে পারতো সে

লীপ বলেছিল—প্রিয় অরণ্যদেব। ভৈরব।। কি দিয়ে তোর লিভার

ন ? খিদে পেলে খাবো না ? বাঃ। মাদের তো বয়স হচ্ছে ঋষি। হচ্ছে। শীগ্‌গিরি হয়তো একটা পাবো কোন দিন। তখন থেকেই হয়ে গেলে চলবে।

ই সাবধান হয়ে যাবার দিন যে এত ড আসবে—কেউ তা ভাবে নি। অনন্ত, অনাথ চককোত্তি, ঋষি, দত্ত—সবাই নিজের নিজের চিকিৎসা ধটু করে থাকে। যেমন অ্যান্টাসিড সবাই পকেটে রাখে। দিলীপ তো চাপ ব্যথা বুঝলে ব্রংকাইটিসের নিস্টোজিন খেয়ে নেয়। নটে করে। সাইনাসের ব্যথায় শাদা কমোনেট ট্যাবলেট।

কমের কোন এক কারণে নিজের চিকিৎসা করতে গিয়ে ঋষি ক্যাপসুল খাচ্ছিল। পেটের সই সঙ্গে সোডা ছাড়াই খানিকটা পেটে পড়ে। অনাথ ছিল সঙ্গে। সে জিন।

নক বাদে ঋষির দম আটকে আসে। দশা হবার জোগাড়। পরে অবশ্য য় যায় ঋষি। খবর পেয়ে দিলীপ তার। ডিপেন্ডলের মোড়কেই চোখ লে তার। তুই পড়ে দেখেছিলি লেখা রয়েছে। তো। দ্যাখ্। এ ওষুধ খাবার সময় যে-কদ্রব্য নিষিদ্ধ।

ই নাকি ? হুইস্কিটা আবার কবে কদ্রব্য !

তোকে এক ডাক্তার দেখিয়ে মার চেনাশুনো। একদম বসিয়ে ।

ণ্য বললো, তাই করুন তো। কি হচ্ছে আছে কে জানে। একবার না উচিত।

লীপের চেনা ডাক্তার ই সি জি দ্যা, সব ঠিক আছে। এবার রক্তের চাই। এই ঠিকানা লিখে দিলাম। য়ে খালি পেটে রক্ত দেবেন। যাল ভালো ডাক্তার।

দন সকালে দুজনে ডকটর চেম্বারে ওঠার দোতলার সিঁড়ির থেমে গেল। প্রায় একই সঙ্গে। লা, হরিদার চেম্বারে যাবি ?

হ্যাঁ। হরিদা তো ডাক্তার। ঠিকানা মনে নেই।

চেম্বার চিনি। এই সকালবেলাতেই আসে হরি বাড়ুজ্যে। চল তো দেখি।

হরি ডাক্তার চেম্বারেই ছিল। হাতে এক বিকার পেচ্ছাপ। ওদের দেখে বললো, দাঁড়া আসছি। এক কাবলিওয়ালার ডায়েবেটিস হয়েছে। বোস।

পাশের ঘরেই হরি ডাকতারের ল্যাব। কালো ঝালো তিন কিশোর মন দিয়ে কিসব পরীক্ষা করছে।

হরি ডাক্তার চেম্বারে ফিরে এসে বললো, কি মনে করে ? সব খুলে বল। অনেক দিন পরে দেখলাম তোমাদের।

তুমি তো কোন খোঁজ নাও না হরিদা। এদিকে কী বাধিয়ে বসেছি দ্যাখো।

রাগ পাচ্ছিস ?

হুঁ।

পালস দেখি। ঋষির কব্জা চেপে ধরে হাত ছেড়ে দিল হরি ডাক্তার। কিচ্ছু হয়নি তোর। সুস্থ শরীর। কোন ডাকতারকে দেখিয়েছিস ?

বড় ডাক্তার। ব্লাড রিপোর্ট চাইলেন।

রক্ত দিবি দে। সন্ধ্যেবেলা আসিস। রিপোর্ট পেয়ে যাবি। তোর খবর কি দিলীপ? ভুরু মরে গেছে দেখছি তোর।

হ্যাঁ হরিদা। আমার হাইপোথায়রয়েড—

তাই। সন্ধ্যেবেলা আসিস। সব বলে দেব।

ওরা কথা বলছিল আর কালো মত ছেলেটি এসে ঋষির হাত রবারে বেঁধে ভেইন খুঁজছিল। কিছু খান নি তো সকাল থেকে ?

ঋষি বললো, খাইনি।

ধমকে উঠলো হরি ডাক্তার। তোকে অত কথা বলতে বলেছে কে বিজু। রক্ত নিয়ে করে রাখনি।

দিলীপ বললো, কি বলছো হরিদা—ও ব্লাড্ অ্যানালিসিস করে রাখবে ?

কেন ? দোষ কিসের ? বিজু—বিজুর ভাই বীরু—ওদের দুজনকেই ব্লাড, ইউরিন—সব টেস্ট শিখিয়ে দিয়েছি।

ওরা পড়াশুনো করেছে ?

না। নাম সই করতে পারে না। কি দরকার ? বাঁদর দিয়ে যদি আমি ফ্লন্ট লাইনে মাইন তোলাতে পারে—তাহলে পিস এরিয়ায় মানুষ দিয়ে ব্লাড অ্যানালিসিস করানো যাবে না ?

ঋষি হেসে ফেললো, অকাট্য যুক্তি ! তাহলে সন্ধ্যেবেলা আসছি আমরা হরিদা।

ওয়েট করবো আমি। কথার যেন নড়চড় না হয়।

অনেক দিন পরে ঋষি আর দিলীপ। একসঙ্গে, কলকাতার রাস্তায়। সকালবেলা। জীবন কোথাও বদলায়নি। বদলালেও টের পাওয়ার উপায় নেই। সামনের গাছটা তার নিজের নিয়মে মাটির ভেতর শিকড় চালান করে দিয়েও ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। বাঁ হাতের ফুটপাথে অনেকটা খোদল। খানিকটা এগিয়ে ওরা দুজনে ময়দান পেয়ে গেল।

ঋষির মুখ, চোখ সব মিলিয়ে দিলীপের বড় বিবর্ণ লাগলো। চিন্তিত অথচ ছেলেমানুষ মুখখানা। এক জায়গায় গিয়ে দুজনে দাঁড়িয়ে পড়লো। কি করবি দিলীপ ? এখন বাড়ি যাওয়া যায় ?

হো হো করে দুজনেই হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে দিলীপ বুঝলো, দুজন পুরুষ লোক কখনো মিটমাট করে না। বরং আলাদা করে যে-যার মত যন্ত্রণা পাওয়ার রাস্তা খুঁজে নেয়। দিলীপ জানে, সে এখুনি ঋষিকে বলতে পারে—ভাই ঋষি। এমন তো কথা ছিল না।

দিলীপ নিজের কথা অনেকটা এভাবে সাজাতে পারে। খামান করতে খামাজি— অথচ খাদান এক্সপ্যান্ড করতে দিবি না কেন ? এক্সপ্যানসন ছাড়া—গ্রোথ ছাড়া —কোন গ্রোইং জিনিস বেঁচে থাকে ? ইন্ডিভিজুয়াল এক্সপ্রেসনের পথই তো বন্ধ হয়ে যায়। রহস্যটা কি ঋষি ? আমার মাথায় আসছে না। তুই কেন কোন ইন্ডিভিজুয়াল চেলে গুড বয় হতে যাবি ? গুড বয় হওয়ার তো কোন দরকার নেই। আমরা নিজেরাই তো বড় জিনিস গড়ে তুলতে পারি। বড় জিনিস গড়ে তোলায় তোর আপত্তি কিসের ? যদি না-ই গড়াব তবে আমার খাদানে খামাজি কেন ? তুই গুড বয় হয়েই থাকতিস। আমি যেমন ব্যাড বয় ছিলাম—তাই-ই থাকতাম। অনাথ চককোত্তিকে আমি জানি। সে শুধু নিজেকে ভালবাসে। সে জন্যে সে যে কোন কাজ করতে পারে। অনাথদা খানিকদূর গিয়ে তোর আর

বন্ধু হতে পারে না। তুই আমার কথা মিলিয়ে নিস।

কিন্তু এর কোন কথাই দিলীপ ঋষিকে বলতে পারলো না।

চল তোকে বাড়ি দিয়ে আসি ঋষি। সন্ধ্যেবেলা তো দেখা হচ্ছে হরিদার ওখানে।

ঋষি বললো, তুই এখন কোথায় যাবি ?

ডালহৌসি।

অত খাটবার কি আছে দিলীপ। কমিয়ে দে সব কাজকর্ম।

না করে উপায় নেই। গোকুলদা বলছিল—ব্যাংক নাইনটি ডে-জ ও ডি দিতে চাইছে না।

পাদ্রী যেমন কনফেশন শুনবার জন্যে তৈরি হয়ে চুপচাপ বসে থাকে—হরি ডাক্তারও তেমনি তৈরি হয়ে বসেছিল। সন্ধ্যেবেলা। টেবিলের ওপর শাদা খামের ভেতর টাইপ করা ব্লাড রিপোর্ট। তার পাশেই কাকচে লাল রামের বোতল। প্লেন ওয়াটার বোঝাই কাঁচের টাম্বলার।

দুজনে ঢুকতেই ঋষির হাতে রিপোর্ট তুলে দিয়ে হরি ডাকতার বললো, তোর কিচ্ছু হয়নি। বোস তোরা। বিজুকে কাবাব আনতে পাঠিয়েছি।

কোন রোগ নেই হরিদা?

নাথিং। যে-ডাক্তার দেখেছে—সে একটি পাঁঠা।

বড় ডাক্তার হরিদা।

বড় ডাক্তার কিসের আবার! আমি উপসালাতে কাজ করেছি। সারা ইউরোপ ঘুরেছি। পিকিং অব্দি ট্রেনে গেছি। সাঙ্গাইতে হাসপাতালের আউটডোর পেসেন্ট দেখেছি। মাসের পর মাস। তাতে বলতে পারি—ডাক্তারের বড় ছোট বলে কিছু নেই ঋষি। ডাক্তার দু রকমের। একজন রোগ ধরতে পারে। আরেকজন পারে না। পারে না বলেই সে ভোগা দেয়। তখন বলে ব্লাড রিপোর্ট চাই। হ্যানো চাই। ত্যানো চাই। নে খা। বরফ দেবো?

দরকার নেই। আমি একদম নরমাল হরিদা ?

তা না তো কি ? আস্তে আস্তে খা। কোন তাড়াহুড়ো নেই তো।

একদম না।

দিলীপ বললো, আমার কি হবে হরিদা ? আমার ভয় নেই। মোটা হয়ে যাচ্ছি। হাবা হয়ে যাবো না তো।

হো হো করে হেসে উঠলো হরিদা। বছর পঞ্চাশের ছেঁচা শরীর। কোথাও একটু টসকায় নি। রীতিমত বক্সারের চেহারা। হাতের থাবা একটি ছোটখাটো কচ্ছপ। ভারি। বড়—আর দলা পাকানো। হাসতে হাসতেই হরি-ডাক্তার বললো, হর-মোনের গোলমাল—যেকোন কান্ড ঘটাতে পারে। যদি হাবা হয়ে যাস—তাতেই বা অসুবিধে কিসের? পার্মানেন্ট চাকরি তোর। অফিস তাহলে মেডিকেল বোর্ড বসাবে। বাড়িতে চিঠি দিয়ে রিটায়ার করিয়ে দেবে। আমি আজকাল সব ভুলে যাচ্ছি হরিদা। অনেক সময় আধ ঘন্টা আগের ব্যাপারও ভুলে যাই।

ভালো তো। তোর মেমারি ব্যাংকের ওপর কখনোই চাপ পড়বে না দিলীপ।

আমার হরিদা আজকাল ভয়ংকর অভি-মান হয়।

বেশ তো।

অপমান থেকে আমার মনে যে-যন্ত্রণা হয়—তার দরুন গা চুলকোয়। একদিন দেখি বাঁ হাতের কবজিতে লাল আলারজি মত বেরিয়েছে।

হতে পারে কিছু আশ্চর্য নয়.

আমি কি মেয়ে হয়ে যাবো হরিদা?

কেন ? সেরকম কি লক্ষণ দেখলি ?

আমার অভিমানের ধরনটা অন্যরকম।

এই তো মানিক। সবই বুঝতে পারছো—তখন আর তোমার মেয়ে হয়ে যাবার ভয় নেই। খুব তাড়াতাড়ি বেশ কিছুটা খেয়ে ফেলায় দিলীপ বসুর চোখে জল এসে গেল। অভিমান তো আরেকটা মদ। ঋষি এতক্ষণ কিছু বলেনি। এবারে খুব আস্তে বললো, চন্ডীতে আছে।

কলকাতায় যত গরম পড়ে—ততই জলের টান পড়ে। আগে শহরটাকে ভিস্তির জলে দোবেলা ভেজানো হোত। সেসব পাট কবে উঠে গেছে।

এরকম একটা শহরে দুপুরে গাড়ি করে ঘুরতেও খারাপ লাগে।

ঋষিকে দেখতে এসেছিল সবাই। যেমন—মীরা, অনন্ত, রানী, দিলীপ, স্বাতী। লাবণ্য সবাইকে চা দিয়েছে একবার। ঋষি বললো, আমার কিছুই হয়নি। ভালো আছি আমি।

এখন এখানে যারা মেয়েরা—তারা দুপুরে খাবার পর ঘুমোয়। শুধু স্বাতী দুপুরের কাজকর্মের লোক। তার পোশাকও আলাদা। সিঁথির ভাজে সিঁদুর খুঁজতে মাইক্রোসকোপ দরকার।

মীরা ভৌমিক ট্রাস্টের সর্বময়ী। অনন্ত হাসিখুশী। রানী তার স্বামীর বন্ধুর জন্য এক বাটি ক্ষীর এনেছিল। সেটা টেবিলের ওপর রেখে রানী চুপ করে বসে ছিল। ওর ভেতরেই মীরা উ আ করছিল।

স্বাতী এই দলের সঙ্গে অল্পদিন হোল পরিচিত। থাকিরা সবাই যে যার সঙ্গে যেমন পরিচিত—স্বাতী ওদের সঙ্গে ততটা পরি-চিত নয়। তাই সে শুধু একবার ঋষিকে বলেছে—কেমন আছেন ?

ঋষি ঘাড় নেড়েছে।

এরপর আর কথা এগোয় না। এখন কলকাতা তাকে ডাকছে। এই এত বছর সে দুপুরবেলা কাজ করে এসেছে। কোনদিন ভাত খেয়ে ঘুমোয়নি। বাইরের পৃ… সে চলাফেরায় অভ্যস্ত। দিলীপকে … যাবে নাকি ?

দিলীপ বললো, চলো।

ঠিক এই সময় রানীর দিকে … স্বাতী বললো, চলি বৌদি।

ঋষিদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে… আর দিলীপ—দুজনেরই দু রকমের … লাগছিল। কলকাতায় সবে পিচ … গরম বাতাসের সঙ্গে রাস্তায় বালি। কালো রংয়ের রোদ চশমা চোখে দিয়ে … এখন স্বাতীর মুখে তাকালে ওর মন … যাবে না। মন থাকে চোখে।

গাড়ি যাচ্ছিল গুরুসদয় রোড … স্বাতীর পরিস্কার মনে হোল—আমি … বউদির মত নই। আমি ঋষিবাবুর … লাবণ্যর মত নই। আমি মিসেস … ভৌমিকের মত নই। তবে আমি কি … জন ওয়ার্কিং গার্ল ! আমি কি আর … আছি ?

ওই মহিলারা কেমন সুন্দর … জিনিসটার ওপর গা এলিয়ে দিয়ে … একজন করে স্বামী আছে ওদের। … ভাবতে হয় না। আর আমি ? টং টং ক… বেড়াচ্ছি সারাদিন। সুন্দর পাড়ার … মতিলাল নেহরু রোডের বাড়ি ভাড়া। … টাকা। ইলেকট্রিক বিল। জমাদার। … ডাক্তারখানা—সবই চালাতে হয়। … ওদের মত হলাম না কেন ? আমি কে… স্বামীদের চোখে দেখবার জিনিস ? … লোকের আগ্রহের ব্যাপার ? ওদের … দের কমিশনের কর্মচারী। … দিলীপদা !! দিলীপ ইজ আনাদার কি… ও আমার গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে … বাসে। যদি এইভা… ও নিজে… জাগাতে পৌঁছতে পা…। কিন্তু সে… পেছন দিকে অনেক দূরে। ডবল … পরেছি বলে ভেতরে ঘামে ভিজে যাচ্ছি…

দিলীপ চলন্ত গাড়িতে … এই স্বাতীকে দেখতে চাইলো। … চশমাও মুখের ওপর অনেকখানি … ছড়িয়ে দিয়েছে। একবার মনে … স্বাতী কোন রাত জাগা … নয়তো? দি নাইট বার্ড। … গানে যারা সারা রাত পুরুষের … হয়ে দাঁড়ায়—স্বাতী তাদের কেউ না… এমন মেয়েরাই কড়া রোদে গগলস … তাহলে চোখের নিচের ক্লান্তি চশমায় … পড়ে। এমন স্বাতীকে তো আমি … চাইলে পাবোও না। স্বাতী আমার গা… পিছলে গেছে। স্যার লেজলি সেদি… প্রাইভেট পুলে ফল্যাড লাইটে… স্বাতীর পিঠ মুছে দিচ্ছিল।

আমি বলেছিলাম, স্যার লে… হয়ার ইজ লেডি লেজলি।

সি ইজ ইন—সারে। আমার … সারের পাবলিক স্কুলে পড়ে। মা বা… নিয়ে ইণ্ডিয়ায় ফিরবে আরেকটা … পড়লেই। আমরা সবাই তখন উটিতে … ওখানে আমার একটা গেস্ট হাউস …

ফাঁকা বাড়িতে ভিজে গায়ে স্বাতী
...াইট সিমেন্ট বাঁধানো চত্বরে দাঁড়িয়ে
...হি করে হাসছিল। বছরে একশো আশি
...টি টাকার গ্রস রেভিনিউ—এমন এক
...ম্পানীর চেয়ারম্যান তার পিঠ মুছে
...ছিল। এমন দৃশ্যের একমাত্র দর্শক—
...ই নিজের একদা প্রেমিক—ওয়ফে দিলীপ
...। কোন্ মেয়ে না এমন নাটকে হি হি
...বে? আর স্যার লেজলিও তো বুড়ো
...ড়া নয়! সুইমিং ট্রাংকে ঢাকা ভিজে গায়ে
...ন্টার চেহারা ছবিতে একদম পরিণত
...জান।

একদা এই স্বাতীর জন্যে আমি মরীয়া
...ছিলাম। তারপর স্বাতী একদিন আমার
...র বাসি হয়ে গিয়েছিল। সুধীর ওর
...ন নিল। স্বাতীকে দেখতাম—গোল
...দুরের টিপ কপালে দিয়ে অফিস টাইমের
...ম উঠছে। একদিন দেখলাম—কাপড়ের
...কানে মিটার মেপে ভয়েল বিক্রি করছে।
...রকদিন দেখি—রাত নটা হবে—শীতকাল
একটা ফিয়াটে বসে আছে—স্টিয়ারিং
...কা—সামনেই পানের দোকানে একজন
...ঙালী মশাই পান কিনছে—আমিও সে-
...কান থেকে সিগারেট নিলাম—স্বাতী
...ন মুখের ভেতর আঙুল পাঠিয়ে খুব
...ব মাংসের কুচি বের করছিল। মুখে
...ন্ত। কোথাও ভরপেট খাওয়ার পরেই তো
...কে পান কেনে। সুধীর নেই কেন?

এজন্যেই কি সুধীর স্বাতীকে অশুচি
...? অস্পৃশ্য?

স্বাতীই বলেছিল, জানো দিলীপদা—
নিজে আমাকে সবার সঙ্গে জোর করে
...তে পাঠাতো। যখন মিশে গেলাম—
...ন শুরু হোল ওর সন্দেহ। সবার সামনে
...অপমান করতে লাগলো কি বলবো।
...অপমানের ভেতর সব প্রেম ভালবাসা
...দিন পুড়ে খাক্ হয়ে গেল। আমি তখন
...রে মিশতে শিখেছি দিলীপদা। আমি
...। ফিরবো? ভালবাসা নেই যেখানে—
...নে ফিরে কি হবে?

দিলীপ বসু নিজের মনে মনে বললো,
...তী। তুমি কি কলগার্ল? আবার নিজেই
...মনে উচ্চারণ করলো, না। আমারই
...। স্বাতী কি তা হতে পারে? কখনো না।

অবিশ্যি হলেই বা কি করার আছে।
...কার গলায় দিলীপ জানতে চাইলো,
টাকা জমলো? এবার কি নিজের বিউটি
...লার খুলতে পারবে?

না। এখনো সময় হয়নি। গত মাসে
...ম আমায় কমিশন দিয়েছে বোলোগো
...।

স্যার লেজলির দরুন তো। আরও
অনেক টাকা পাওনা হয়েছে তোমার।

দিয়ে দিও দিলীপদা। তোমার সঙ্গে
ব্যবসায় নেমে আমারও খরচ বেড়েছে। টাকা
জমাতে পারছি কোথায়?

লেজলিকে বলো না—

ওঃ! পুওর লেজলি! বলেই আচমকা
দিলীপের মুখে তাকালো স্বাতী। চোখের
রোদ চশমাটা খুলে ফেলে দিল। তারপর
বললো, ভালো! এখনো আমি জেলাসি
জাগাতে পারি দেখছি। এবার অন্য কথায়
চলে গেল স্বাতী। তোমাকে আমার ভীষণ
পেতে ইচ্ছে করে দিলীপদা।

আমি তো তোমার স্টকে আছিই।

উঁহু। সেরকম নয়। কত পুরুষলোক
দেখলাম। তোমাকে তেমন করে দেখা হোল
না দিলীপদা। হাজার হোক—আমি জানি—
আমি তো এখনো পুরুষের লোভের জিনিস।

তাই বুঝি!

তোমাদের চোখ দেখেই বুঝতে পারি
দিলীপদা। তোমাকে সেভাবে পাইনি কোন-
দিন।

আমিও পাইনি তোমাকে কোনদিন।
তবে পেয়েই বা কি হবে। আমি তো এখন
কমিশনের দালাল।

তা কেন? তোমার তো চাকরি রয়েছে
একটা। বউ—ছেলেমেয়ে—বাড়ি রয়েছে।
পরে পেনশন পাবে। গ্র্যাচুইটি আছে
নিশ্চয়ই। ইনসিওরেন্স করেছো নিশ্চয়।

সবই আছে স্বাতী। আবার কোনোটাই
নেই। আমি স্বাতী এ একটা কবন্ধ কাজে
জড়িয়ে পড়েছি।

বেশ তো কমিশন পিটছে।

তুমি বুঝবে না স্বাতী। যে-ইঞ্জিনের
গভরনর বাঁধা—তার স্পীড তুলবো কি
করে। ওরা যে কেউ এক্সপ্যানসন চায় না।
যে কাজের কোন গ্রোথ নেই—তার কমিশন
পেয়ে কি করে খুশী থাকবো। আমি ভেবে-
ছিলাম—এবার কোল ইণ্ডিয়াকে একটা
লেসন্ দেব।

তুমি পাগল! একটা কোম্পানীকে
শিক্ষা দেবে কি করে? তা হয় নাকি কখনো!

মানুষ দিয়েই তো কোম্পানী। সেই
মানুষগুলো যদি অকেজো হয়ে যেত—
তাহলেই আমাদের খাদান বাড়তো। আরও
বড় হোত। আরও—

কত বড় তুমি চাও দিলীপদা?

স্কাই ইজ দি লিমিট। তোমার কি মনে
হয় না স্বাতী—আমি আর তুমি দুজনে
মিলে কলকাতার এই খোলা খাতার ওপর
দিয়ে হেঁটে গেলে ক্যাপিটালের কোন অভাব
হোত?

কোল ইণ্ডিয়ার ওপর এত রাগ কেন
তোমার?

রাগ নয়। একটা অন্ধ কবন্ধ জিনিসকে
আমি নাড়া দিতে চেয়েছিলাম। ওরা আমাকে
পক্ষ গ্র্যান্টেড্ ধরে নিয়েছিল। ভেবেছিল—
দিলীপ বসুকে একটা টেবিল দিয়ে ডাম্প
করে ফেলে রাখলেই চলবে। কিন্তু তা
হয়নি। শুধু পাণ্ডবেশ্বর এরিয়াতেই ওদের
বিজনেস ফল করেছে বিশ লাখ টাকার।
ভালো করে এগোলে ওই অঙ্ক বিশ কোটি
টাকায় দাঁড় করানো যেত। তখন টনক
নড়তো। কিন্তু বাধা যে আমাদের নিজেদের
ভেতরেই।

কে?

আমরা নিজেরাই। অনন্ত বা খনি—
কেউ চায় না—খাদান আরও বাড়ুক। ওরা
আমাকে কমিশন দিয়ে বাকি ক্যাপিটাল
কোথায় যে খাটাচ্ছে—তা বুঝতে পারছি না।

তা বলো ওদেরকে। না বলে পড়ে পড়ে
মার খাবার কোন মানে হয়?

কাকে বলবো? আমি কাউকে বলতে
পারবো না। এদিকে আমি হয়ে গেলাম একটা
দালাল!

কার ওপর তোমার এত অভিমান
দিলীপদা?

আমি জানি না স্বাতী। আমি জানি
না। আমি তোমার চোখে পুওর লেজলিও
নই!

ওঃ! এই কথা! এসো না আমরা এক-
সঙ্গে থাকি। আমার ছেলের এখন কম বয়েস।
ও বড় হয়ে হয়তো তোমাকে বাবা ডাকতে
পারে। এসো না—

আমার বাড়ি? আমার ছেলে-মেয়ে-
বউ? তারা?

ওঃ! তা ঠিক। তা ঠিক দিলীপদা।
আমি সেকথা কখনো ভুলি না। লক্ষ্য করে
দেখেছো।

তোমার বাবার কথা মনে পড়ে স্বাতী?

খুব। বাবা আমায় অন্যভাবে মানুষ
করতে চেয়েছিলেন। ভীষণ সাহসী লোক
ছিলেন। একবার জ্যোৎস্না রাতে ক্লাবে খেলে
ফিরছেন। সাইকেলে। পিচ রাস্তায়।
আসামের চা-বাগানে। বুনো হাতির পাল
তাড়া করেছিল। বাবা পকেটের সিকি-
আধুলি রাস্তায় ফেলতে ফেলতে ছুটলেন।
জোরে প্যাডেল করে। পেছনে টুং টাং
আওয়াজ। জ্যোৎস্নায় আধুলি চিক চিক
করছিল। হাতি থমকে দাঁড়ালো।

আমি স্বাতী সেই পয়সাগুলো এখন
কুড়োচ্ছি।

(চলবে)

'ওয়াসপ' একটি ইংরেজ গোয়েন্দা জাহাজ। ধরে ফেললো দুই দাস-জাহাজ। একটায় দাস বোঝাই, অনাটায় দাস বোঝাই এখনও হতে পারেনি, কিন্তু দাস নেবার সব ব্যবস্থাই মজুদ। ইংরেজ খালাসী জাহাজ দুটিকে নিয়ে চললো। বিচার হবে আদালতে। ওয়াসপ-এর অফিসাররা ভাগা-ভাগি হয়ে গেলো। চড়লো সেই আসামী জাহাজে। একটির নাম 'একো', অন্যটির নাম 'ফেলিসিদাদ'। খুব খুশী। হঠাৎ পথে 'একো' ফাঁকি দিয়ে লম্বা। একেবারে ব্রাজিল। এবং ফেলিসিদাদও যেতো। রাতারাতি ফেলিসিদাদ তামাম ইংরেজ খালাসীদের খুন করে ফেলে দিলো জলে। মতলব লম্বা দেবার। ইতিমধ্যে অন্য এক ইংরেজ জাহাজ 'স্টার'-এর অভ্যুদয়। 'স্টার' বুঝলো কোনো গন্ডগোল আছে। তন্ন তন্ন পরীক্ষা করলো। রক্তের দাগ সারা জাহাজে, বিদ্রোহ, মারামারিও হয়নি। তবে রক্ত কেন? সন্দেহ প্রবল। জবর তদন্ত চললো। এক নিগ্রো খালাসী সেই হত্যা চক্ষুষ করে বিলকুল ঘবড়ে গিয়ে-ছিল। আতংকে অভিভূত হয়ে সে সব ফাঁস করে দিলে। তার বয়ানে নির্ভর করে নাম কে ওয়াস্তে এক বিচারও হোলো। আইনের ফাঁক দিয়ে সব আসামী মুক্তি পেয়ে গেলো। 'ফেলিসিদাদ' ব্রাজিলে চলে গেলো। ইংরেজ জাহাজ মনে গেঁথে রাখলো এই নাজেহাল হওয়ার কথা। বুঝে নিলো তত্ত্ব। এবার থেকে জাহাজ পেলেও আর ধরে না। শুধু ডুবিয়ে দিতে থাকলো।

এর ফলে ইংরেজ পররাষ্ট্র দপ্তর টাকা খরচ করেও আফ্রিকার সর্দারদের কাছ থেকে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করাতো যে, তারা দাস বেচবে না। এই হোলো আবার নতুন বাহানা, নব-গ্যাড়াকল। সন্ধি স্বাক্ষরিত-করা মানেই সন্ধি ভঙ্গের দায় ঘাড়ে চাপবে। সেই দায়ের অজুহাতেই সহজ হয়ে আসবে পর পর আফ্রিকান রাষ্ট্র-গুলোকে হাতানো, এবং অধিকার করা। অবশ্য পৃথিবী থেকে অন্যায় দাসপ্রথা দূর করে দেবার মতো শুভবুদ্ধি প্রণোদিত হয়েই শুদ্ধমতি ইংরেজ যে এ-কাজ করে-ছিলো—এই পবিত্র ভাষণ ইতিহাস লেখে, আমরা পড়ি, এবং বিশ্বাস করি।

করেছি। কিন্তু ফল দেখছি কী?

দাহোমীর রাজা সোজা মহারানীকে বিজ্ঞাপিত করলেন, 'মহারানী ছাতার ভেট পাঠিয়েছেন। বহুমান্য ভেট। ধন্যবাদ। ছাতা মাথা ঢাকে। তা, দাস বেচা বন্ধ আমি বা আমার প্রজারা চাই না। অন্যান্য দেশ যাতে বন্ধ করে সে-ব্যবস্থা করলে একা দাহোমী করলেও কিছু আসবে যাবে না।....আবার যদি রানী কিছু ভেট পাঠান যেন কামান ইত্যাদি পাঠান, যাতে যুদ্ধের সময়ে চুটিয়ে যুদ্ধটা করতে পারি।' (মানে ছাতা আমাদের আছে।) কালক্রমে মহা-বলবান আশান্ডীদের ইংরেজ এবং দাহোমীকে ফরাসীরা দমন করেছিলো। তাদের রাজ্যও করায়ত্ত হয়ে গিয়েছিলো। ফলে, কাগজেপত্রে দাসপ্রথা তো বন্ধ হোলো! কিন্তু ব্রাজিলে? কুবায় ও সব দেশে তখনও দাস পাচার হতেই থাকলো। পাইরেটরা দিব্যি ব্যবসা করতেই থাকলো।

নিকোলাস আউয়েনের কথা বলেছি। আর একজন ছিলেন ডন পেদ্রো। ইসলামিক উপজাতি 'ভাই'রা ডন পেদ্রোকে 'মাল' জোগাতো। আর ছিলো 'চাচা', আসল নাম ফ্রান্সিসকো ফেলিজ দ্য সুজা। এ-ভদ্রলোকের হারেমটি ছিলো জবর। বাগে পেলেই দু-একটি সফেদ জেনানার বদলী নানা রকমের সুবিধা করে নিতেন। রিচার্ড ড্রেক এক ইংরেজ পাইরেট। তাঁকে বলেছিলেন, 'অল্প-কালীন স্ত্রী চাই? বলো না কী চাই? ফ্রেঞ্চ? স্পানিশ? গ্রীক? ইংলিশ? ডাচ? ইতালীয়ান? ককেশিয়ান? এশিয়ান?' রায়ো-ডি-জেনেরোর এই ধুরন্ধর ১৮৪৯-এ যখন সমাহিত হন, একটি সুন্দরী ও একটি তরুণকে কোতল করে তার সঙ্গে পোঁতা হোলো। স্বর্গে গিয়ে হুকুমবরদার চাই না? এই সব চোরাকারবারীর কড়চা পাই দুটি চোরা-কারবারীর রেখে যাওয়া সুবিস্তৃত বিবরণ থেকে। একজন ঐ রিচার্ড ড্রেক, অন্যটি থিয়োডোর ক্যানো। ক্যানোর কাছে ইতিহাস ঋণী, কারণ তার রেখে যাওয়া বিবরণ যেমন বিস্তৃত, তেমনি তথ্য ও সত্যে ভরা।

কিন্তু আরও এক তত্ত্ব বোঝা যা দাস-ব্যবসায় ব্যবসায় হিসেবে ব করার পরেও দাস ও শ্রা চালান চলতে লাগলো। (আ চলে)। কেবল ভোল পালটাে আজকাল বড়ো মহলে বলা হচ্ছে 'বে ড্রেন'। কিন্তু নীচু মহলে? যেখা ড্রেন বয়ে বেন যাচ্ছে না, যাচ্ শ্রমিক, দর্জি, কারিগর, মাস্টার, ছুতো রংরেজ, গাইয়ে, নাচিয়ে, বেশ্যা, কাঠু খালাসী, কেরাণী, চাষীও—এরাও যাচ্ছে। কাতারে কাতারে, শত শ লণ্ডনে মেথর মুদ্দোফরাস থেকে নিয়ে ব ড্রাইভার, টিকিট কালেক্টর, টেলিফো বয়, মাস্টার-পড়িয়ে, অফিসের চাপরাশ ক্যাডীবয়—এদের মধ্যে শতকরা ত্রি বেশি লোকই পাকিস্তান, ভারত, মাল হংকং, সিঙ্গাপুর ছাড়াও ওয়েস্ট ইণ্ডি উগাণ্ডা, কেনিয়া, রোডেশিয়া, ঘান লোক। বলবে কে যে, দাস ব্যবসার ও যবনিকাপাত হয়েছে? মন্দিরে সেবাদাস বলা হোক, উৎসর্গীকৃতা কুমারীই ব হোক, নাইট ক্লাব আর্টিস্টই বলা হোক-বাপারটা যখন ঘুলিয়ে যায়, তখন কে বাকি থাকে আইন বাঁচানো। পৃথিবী দুটো জাত : শোষক ও শোষিত।

মুচলেকা লিখিয়ে 'কুলি' জোগা করে তবেই মার্তিনীক, সুরিনাম, গুয়ান ফীজি, মরিশাস, ত্রিনিদাদ প্রভৃতি জায়গা আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে জমিদারী পত্ত করা সম্ভব হয়েছে। টেট্ এণ্ড লায় কোম্পানী, টেক্শাকো কোম্পানী, ব্রুকা কোম্পানী, শেল কোম্পানী—এদের সা কি এই বিরাট ভূমিভাগকে সামলায়? যা কোম্পানীর অংশীদার নয়, তারাই খে যারা না-খেটে জমিদার, তাদের টা জোগাচ্ছে।

তবু বলা হবে দাস নয়। সত্যিই নয় কারণ, আদালত, কানুন অস্বীকার করবে তবে একটা কথা। কানুন তাদেরই গড়া সুতরাং তাদের মতো করে গড়া। হাকি এবং আদালত এই কানুনের বশম্বদ কায়দাটা এই।

আমেরিকানরা তো দাস সাম্রা পত্তন করে দাস ব্যবসার স্বপ্ন দেখতো যেমন 'কামো দাতা কামঃ প্রতিগৃহি কামৈতত্তে' বলে অথর্ব বেদ কামায়নী গে কন্যাকে কুমারীত্ব সমর্পণের জন্য তৈরি করে দিয়েছে, তেমনি ধনর লোলুপ ক্ষমতারিরংসুর জন্য করল মন্ত্র, দাসো দাতা দাসঃ প্রতি গৃহিতা দাসৈতত্তে। দাস রাজা, দাস প্রজ দাস দেশ, দেস বেচনেওলা, দাস খরিদনেওলা—সব নিগ্রো। এর গুপ্ত ম সর্বনেশে। তার খবর বলেই দাস প্রস ইতি। অতঃপর দেখা যাবে এ-প্রস আজের নিগ্রো সমস্যাকে ইয়াংকী সমা কেমন আড়ষ্ট করে তুলেছে। বর্তমা আমেরিকার প্রধান সমস্যাই হোলো নিগ্রো রেড ইণ্ডিয়ান এবং প্রকারান্তরে এস্কিমো সে-তত্ত্বের জন্য দ্বিতীয় পর্ব লিখতে হবে

(১৭)

-কোনো নির্যাতনের শেষ আছে, যতই মাথা চাড়া দিক, ধর্মের নিজের সামঞ্জস্যে ফিরে আসা। র্মে তা হয় না। কাঁদিয়ে ফাঁকিয়ে না। 'অহিংসা' প্রতিরোধে হয় না। বর্ষই তার প্রধান উদাহরণ, ডঃ ন্দ্রের কিং অন্য উদাহরণ। বলা 'চমকদার বৈফল্য', 'মহৎ পরাজয়'। পরাজয়)। প্রতিরোধ ত করবো, মাটেই প্রতিপক্ষ করবো না, প্রতি- বন্ধু বলে জড়িয়ে ধরবো হিসেবেও এটা আত্মঘাতী , কারণ, ভাবছি, আশা করছি হঠাৎ ধর্মপুত্তুর হয়ে যাবে। র প্রতিপক্ষ যদি হুঁশিয়ার হয়, এই মূর্খতার সুযোগ নিয়ে সর্বনাশের দিকে বেশি তাড়াতাড়িই ঠেলে দায়। রামের প্রতিপক্ষ রাবণ, কৃষ্ণের শিশুপাল, দুর্যোধন, —এসব লায়েম কথায় হবার হোতো,—না লংকাকাণ্ড, না কুরুক্ষেত্র। কৃষ্ণ বুদ্ধ বা গান্ধীর চেয়ে বেশি ক বা বুদ্ধু ছিলেন না।

র্কের কথা নয়। নির্যাতিত যখন কের প্রতিপক্ষ হয়, কেবল ভাবে কবে আঘাত হানবো। যাবৎ তা না ভাবতে পারে, তাবৎ সে মনুষ্যত্ব- ক্লীব। যখন থেকে, যে মুহূর্তে সে ভাবতে শুরু করে আমি পাল্টা হানবো, তখন থেকেই প্রকৃত র শুরু।

রতে সংগ্রামের শুরু শ্রীরঙ্গপট্টমে বিরোধ থেকে, তাঁতিয়া তোপের থেকে। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ থেকে, ম, চাকী, দীনেশ, ভগৎ সিং, পর্যন্ত সংগ্রাম চলেছিলো বলেই মতে পতাকা বদলের নাটক হয়েছিলো। কিন্তু প্রতিপক্ষকে র্ম আঘাত এখনও হানা হয়েছে? কী 'শত্রু' তেমনি চোয়ালেই চিবিয়ে না? ইংরেজ জাতির মধ্যে ভারতের বরোধের কোনো স্বভাবজাত কারণ না। বরং দেখা যায় ভারতে ইংরেজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য ভারতের খবরই ইংরেজ জাতের কাছ থেকে রাখতে হয়েছিলো; অনেক মিথ্যের থেকে ইংরেজ শাসককে দোকানদারী হয়েছিলো। আসল ইংরেজ জন- সব কথা জানাবার সাহস কোনো ব্যবস্থার হয়নি; হতে পারেনি; হতে হয়নি। কাজেই ইংরেজ জাত শত্রু ছিলো না। ছিলো সেই ব্যবস্থা যার ফলে কয়েকটি রের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সাধারণ শ্রীহীন করে রাখার ব্যবস্থাই ষদের মারফৎ কায়েম ছিলো। এই শত্রু এই শত্রুর সঙ্গেই বিরোধ। ছিলো। আজও আছে। শত্রু যায়নি। গেছে মাত্র। লড়াই তো মানুষের ছিলো না, পতাকার সঙ্গে ছিলো না। ছিলো দারিদ্র্যের সঙ্গে। আজও কি দারিদ্র্য চিবিয়ে খাচ্ছে না? ছিলো শোষকদের ব্যবস্থার সঙ্গে। সে-ব্যবস্থার পরিবর্তন কী হয়েছে?

অরণ্য আফ্রিকার মহাদেশে আজ প্রতিপক্ষ য়োরোপের সমাজ থেকে লাফিয়ে পড়া কতকগুলো হালুমবাজ হাম্বড়াই ধনতান্ত্রিক ফ্যাসিস্ট। তাদের ওপর অরণ্য আফ্রিকার আরণ্যক সাহস ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই প্রচণ্ড শক্তির ওপর একটা গাঢ় পর্দা চাপা ছিলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলশ্রুতি, ইংরেজ-ফরাসী ডাচ পর্তুগীজদের সাম্রাজ্যের অলীকতা, তদুপরি ভিয়েৎনামের, ও কুবার রক্তবহা শান্তিকর্তার সন্ধ্যা সেই পর্দাটাকে ছিঁড়ে দিলো। এ্যাঙ্গোলার লাফিয়ে ওঠা দেখে রডেশিয়া, মোজাম্বিক, নামিবিয়া, তাঞ্জানিয়া এমন হুংকার ছেড়েছে যে দক্ষিণ আফ্রিকা রাশি রাশি যুদ্ধোপকরণ কিনছে আর কিনছে। যেন ভিয়েৎনামে যুদ্ধোপকরণেরই অভাব ছিলো।
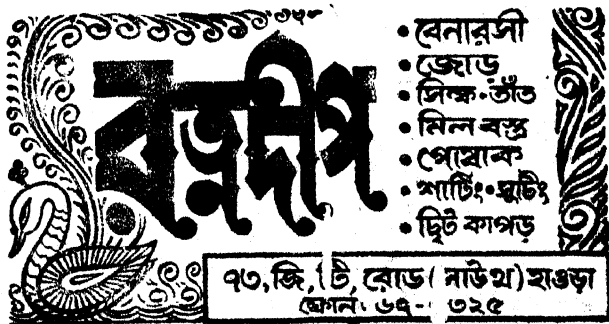
বিপ্লব ও বিদ্রোহে এইখানে প্রভেদ। বিদ্রোহ হোলো বিপ্লবের ইশারা। ফেউয়ের ডাক যেমন বাঘ-সিংহের আক্রমণের ইশারা। ১৬৪২এ ইংলণ্ডে রাজার মাথা খামিয়ে নেওয়া যখন হোলো তখন চাষী শ্রমিকদের সাড়া ছিলো না তাতে। কাজেই সেটা বিপ্লব আনলো না। মধ্যবিত্ত চাঁইরাই রাজ- সিংহাসনকে সমুখে রেখে যাও কে ত্যাও রয়ে তো গেলেনই,—গরীবী আরও বাড়লো বই কমলো না। যখন কমলো, সেটা হোলো পরপর বিপ্লবের ফলে,—তাও কিছুটা। সামগ্রিক বিপ্লব ইংলণ্ডে এখনও আসেনি। ১৭৮৯ ফরাসী সমাজে যা হোলো তাও বিদ্রোহ। সত্যিকার বিপ্লব নয়। নৈলে নেপোলিয়ঁ মাথায় মুকুট চড়ানোর জন্য অভি- ষেকের সময়ে এতো তৎপরতাই বা হবে কেন। বন্দরে বন্দরে একের পর এক রাজধানী বসিয়ে দেবার খেলাতেই বা সেই ফাঁসিকান কর্পোরাল মত্ত হবে কেন? সেও ছিলো মধ্যবিত্ত সওদাগর সামন্তদেরই এক খেল- তামাশা। দারিদ্র্যকে প্রতিপক্ষ করে লড়াই দরিদ্রই করতে পারে। সে দারিদ্র্য ভগবানের পুজো পারেই লাগিয়ে হয় না।

সে রকমের দরিদ্রের সঙ্গে মোকাবেলা হয়েছে ১৯১৭তে রুষে; ১৯৩৫-এ চীনের সেই প্রখ্যাত 'লং-মার্চে'; ১৯৪৯এ জন-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়; সে হয়েছে ১৯৪৬তে ভিয়েৎনামের সংগ্রামে; ১৯৭৬এ এ্যাঙ্গোলায়। ১৯৫৯ কুবার বিপ্লব দুনিয়াকে চমকে দিয়েছিলো। আর দারিদ্র ভিয়েৎনাম দুনিয়াকে শিক্ষা দিয়েছে। প্রতিপক্ষ যখন নিশাচর, প্রতিষেধ তখন অভিচার। কুরুক্ষেত্রে বাসুদেবের এই অনুশাসন। অহিংসার কুরুক্ষেত্রের ময়দানে কু-শাসনের রক্ত পানও হয়নি, দ্রৌপদীর চুল খোলাও হয়নি। শাসন যখন কু, ওষুধ তখন কুরুক্ষেত্র, রক্তপান।

এতোকালের অকথ্য অত্যাচার সহ্য করেও কৃষ্ণ-জগৎ অতলান্তিকের পারে মাটির কাদা হয়ে থাকতে নারাজ। —অত্যাচার যারা করে তারা যখন অত্যাচার করাতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তখনই তলে তলে ক্ষরে যায়। তিলে তিলে তারা মনুষ্যত্বের সব ই প্রতিজ্ঞা থেকে বঞ্চিত হয়। যেমন উইনস্টন চার্চিল। বাংলার মন্বন্তর সম্পর্কে তার সেই কুখ্যাত মন্তব্যই প্রমাণ করে শকুনির মহলে শকুনি রাজা হলেও পাখীর দরবারে সে মড়াখেগো। স্বয়ং এব্রাহাম লিংকলন মনে করতেন যে স্বাধীন আমেরিকার স্বাধীনতা রেড- ইণ্ডিয়ানদের জন্যও নয়, নিগ্রোদের জন্যও নয়। কার জন্য তবে? জবাবটি এব্রাহাম লিংকলনের ভাষাতেই দেওয়া যাক:

> I am not in favour of bringing about in any way the social and political equality of the white and black races ...... (nor) of making any voters and jurors of negroes nor of qualifying them to held office, nor to intermarry with white peoples ...... there must be the position of superior or interior, and I, as much as any other man, am in favour of having the superior position assigned to the white race.

[শাদা আর কালো এ দু জাতের মধ্যে কোনো ভাবেই সামাজিক বা রাজনৈতিক সমতার স্বপক্ষে আমি নই। নিগ্রোরা (কোনো দিন) ভোটের অধিকার পাক, বা আইনজীবী হোক, দেশের কোনো উচ্চপদে আসীন হোক, বা শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে বিবাহে বন্ধ হোক এও আমি চাই না। তারা নীচ, আমরা উচ্চ এটা মেনে চলতেই হবে। এবং আর মানুষের মতো আমিও মানি যে উচ্চ বে লমান পাবার অধিকার একমাত্র শাদা বর্ণেরই আছে।]

ভাগ্যি এব্রাহাম লিংকল্ন্ আজও বেঁচে নেই। নৈলে ভরস্টার, ইয়ান স্মিথ, চার্চিল, থেকে নিয়ে এনক্ পউএল পর্যন্ত অন্য একটা ইউ এন ও-ই গড়তো। আমেরিকায় নিগ্রো ভোটাধিকার পেয়েছে, আইনজ্ঞ, বিজ্ঞানী হয়েছে, বর্ণান্তরে বিবাহও করছে। লিংকল্নের স্বপ্ন সার্থক হয়নি। —লিংকল্নের দৃষ্টিতে তারা 'মানুষই' নয়।

বোঝা যায় যা হয়েছে, যতটুকু হয়েছে ইতিহাসের দাবিতেই হয়েছে, মানবতার জয়ধ্বজার মাহাত্ম্যে নয়। এবং যা হবে, হতে হবে তাও ঐ ইতিহাসের দাবীতেই হতে হবে। (৩)

ভাবতে হবে নিগ্রোর দল এলো কেন এপারে। উপনিবেশ স্থাপন করনেওয়ালাদের মহাসমস্যা হোলো খাটিয়ে-জনমজদুরের। আজ বড়ো বড়ো ফ্যাকটরীতে ইঞ্জিনগুলো চাকা ঘুরিয়ে যে কাজ তাড়িয়ে নিয়ে উগরে দিচ্ছে সে কালে ঐ চাকার শক্তি জোগান দিতো কালো নিগ্রোর তাগড়াই স্বাস্থ্য। য়োরোপের এতো লোক-বল ছিলো না যে সেই চাহিদা মেটায়। ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দের একটি ডায়েরীতে ঔপনিবেশিক এক চাঁই সখেদে লিপিবদ্ধ করেছেন :

> I doe not see how wee can thrive until we gett into a stock of slaves sufficient to doe all our business, for our children's children will hardly see this great Continent filled with people.

আজ আমেরিকায় নিগ্রোরা মাত্র সেই চিলড্রেন্স চিলড্রেনদের সুবিধে করে দেবার জন্যই জীবন ধারণ করতে রাজী নয়। পেন্সিলভেনিয়ার দুই-তৃতীয়াংশই শাদা ছিলো সত্য। কিন্তু প্রায় সবাই য়োরোপ থেকে আনা কুলি। পোটোমাক নদীর দক্ষিণে আর রিভার প্লেট নদীর উত্তরে ইংরেজ, পর্তুগীজ, স্প্যানিশ ঔপনিবেশিকরা জমি সাফ করে চাষ-ক্ষেতী করার জন্য নিগ্রো দাসই রেখেছে। এই নিগ্রোরাই জঙ্গল কেটে ক্ষেত বসিয়েছে, পাহাড় কেটে পথ গড়েছে; আখের ক্ষেতে ফসল ফলিয়েছে; খনির পেট ফুঁড়ে রত্ন আহরণ করেছে। কয়েদী পল্টনের মতো নিয়মানুবর্তিতার তত্ত্বাবধানে থেকে সেদিনের নিগ্রোরাই আমেরিকার চারটি মূল সম্পদ চাল, চিনি, তামাক, তুলোর ক্ষেতী থেকে কোটী কোটী টাকা মনিবদের হাতে তুলে দিয়েছে। এরা কর্মঠ, তেজস্বী, অমিত-পরাক্রমী, সহিষ্ণু। আমেরিকাকে নিগ্রোরা অনেক দিয়েছে। আরও অনেক দেবে। আমেরিকার কৃষ্টিমাত্রে নিগ্রোর দান অপরিমিত ছিলো, আছে এবং ভবিষ্যতে সেই দান বাড়বে বই কমবে না। (২)

হ্যাঁ নিগ্রোদের রাগ আজ ফেটে পড়েছে। আগেই পড়া উচিত ছিলো। দেরী হয়েছে। নিগ্রোদের প্রতি এই অমানুষিক অপব্যবহার এবং নীচ বঞ্চনার জন্য দায়ী কাকে করবো? কে নয়? কেবল কী শাদারা? কেবল কি আফ্রিকার সেই আরণ্যক, আদিম রাজারা? কেবল কী সওদাগরদের লোভ, কেবলই কি ফড়েদের প্রবঞ্চনা, চাতুরী? এ-পাপ এক যুগের নয়। এ পাপ এক যুগে শেষও হবার নয়। জোহানেসবার্গে, ডারবানে 'আশ্রম' খুলে এ পাপ মোচনের সুখ-স্বপ্নে বৌদ্ধ চেতনার তৃপ্তি হওয়া সম্ভব, অন্যের সন্ন্যাস দেখে স্তবপুজো করাও প্রসাদ গুণে অন্তরকে ভরে দিতে পারে। কিন্তু সাবান দিয়ে যদি চিতাবাঘের ছাল থেকে কালো দাগ সরানো যেতো তাহলে সে ছালের এতো কদর কেউ করতো না। এ পাপের গুরুদোষ বহন করতে হবে এ যুগ পেরিয়েও আরও বহু যুগ ধরে; বহন করতে হবে সারা মনুষ্য সমাজকে। মনে রাখতে হবে এই সমাজই অঘটন ঘটিয়ে সর্বনাশ রচনা করেছে 'অস্-উইৎজ্', 'বেলসেন্', 'দাচাউ', 'জালিয়ানওয়ালাবাগ', দেওলী-তে,—যার কালান্তরী পরিণতি হিরোশিমায় এ্যাটম-বম্, ভিয়েৎনামে নাফাম্-বম্, এবং আজও যা অকুতোভয় নির্লজ্জতার সঙ্গে বিষাক্ত করছে নিঃশ্বাসের বাতাস, পানের জল, কুমারীর ভ্রূণ, মানুষ-বোধের শুচিতা;—এবং জুয়া খেলছে মানুষের খাদ্য নিয়ে, ঔষধ নিয়ে। এ সবই তো মানুষ সমাজের অবক্ষয়; সমূহ সর্বনাশের নৃশংস প্রস্তাবনা। এ মানুষকে কখনও কিছুতেই কেউ সমঝোতা করে বাগে আনতে পারবে না। জন-কল্যাণের জন্য সংগ্রাম জন-সংহতিকেই করতে হবে। মহাভারতে কৃষ্ণবাক্য তার সাক্ষ্য।

তাই নিগ্রো সমস্যার ভয়াবহ রূপ শ্বেত আমেরিকার চোখে এতো স্পষ্ট। স্পষ্ট করে দিয়েছে ফীডেল ক্যাস্ট্রো; প্যাট্রিক লুমুম্বা, হো চী মীন্, অশোস্তিনো নেটো। ভয় খেয়েছে শ্বেত বরাহ এদের বিদ্রূপের রূপ দেখে। এটা ব্যক্তির রূপ নয়, মানুষের রূপ। আগুন যখন চল্লী থেকে নগরে ছড়ায় তখন ভয় হয় বটে; কিন্তু নগর ছেড়ে যখন তা অরণ্যকে ঝাপটে ধরে সে সর্বনাশের কোনো চারা থাকে না। ব্যক্তি গান্ধী, ব্যক্তি ডক্টর মার্টিন লুথার কিং-কে কেউ ভয় খায় না। ভয় মাইকেল এক্স, স্টোক্লে কার মাইকেলকেও খায় না। কাঁপন হাড়ে লাগে যখন নিগ্রো বলে আর আমি ভাড়ার বন্দুক তুলে বিরাদর কালাকে মারবো না। জোর আমায় তুমি তোমার লড়াই লড়তে ভাড়া খাটাতে পারবে না। ভয় খায় এই কৃষ্ণ অরণ্যের দাবদাহকে। নিগ্রো আমে আগুন জ্বলে উঠেছে। এই ভয়, এই ...

*   *   *

যে কোনো বিপ্লবের সার্থক স... স্বপক্ষে দুটী প্রস্তুতি এবং উপকরণ চাই-ই। প্রথমটিই হোলো আপামর সাধারণের সমর্থন, এবং সর্বাঙ্গীণ, স্ব... স্বোচ্চার সহযোগ। এ জনসাধারণের কিন্তু পামরই বেশী থাকা চাই, নোক'-এর চেয়ে। দ্বিতীয় : বি... চৈতন্যালোকে একটি এমন বিশেষ ... প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকা উচিত যা ঘোর ... অন্ধকারেও পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে... আজ নিগ্রো জগতের প্রগতি এবং সভ্য... বাদের চেহারা দেখে সফেদ দুনিয়া ফন্দীতে, নানা কৌশলে নানা সন্ধি, স... সভা, মৈফিল, গোল-চৌকো ... আড়ামোড়া ব্যবস্থায় ব্যস্ত হয়ে ... ব্যবস্থাটা যতোই চক্কানিনাদের ক... না কেন, আড়ালে আড়ালে প্রস... অন্ত নেই এই কৃষ্ণ প্রতিপক্ষের সা... মোকাবেলা করা। পারতো তো হাতেই নিতো। পারছে না; কারণ ইতোমধ্যে ... চাষী দুনিয়া জমে বসেছে এইসব ... সমাজের সবল সমর্থনে ... সবলতর সংকল্প নিয়ে। এদিকে এই আমেরি... পিতামহরাই উন্মাদ অস্থিরতার বন্দুক চালিয়েই (রেড ইণ্ডিয়ান) আ... আর্তনাদ স্তব্ধ করে দিয়েছিলো। ... বংশধরেরা আজও বন্দুক ধরার জন্য ... আপত্তি করছে। পারছে না। কৃষ্ণ নিগ্রো জগত আজ একা নয়, অসহা... ছোটো নয়। আমেরিকায় আমেরিকার আদিবাসীদের দুর্গতি দেখার পর নি... সব আস্থা বিশ্বাস ডুবে গেছে। তা... জেনেছে, লড়ো, নয়তো মরো।

একদিন ছিলো সেদিন আ... ভেবেছিলো যেমন সে আজ লোহা-স... পেট্রোল-সাম্রাজ্য, চিনি সাম্রাজ্য, ক... সাম্রাজ্য প্রভৃতি সম্পদের সাম্রাজ্য ফরাসী সাম্রাজ্য, ইংরেজ সাম্রাজ্য, সাম্রাজ্যের দফা শেষ করে দিয়েছে এক বিরাট দাস সাম্রাজ্য কায়েম দুনিয়ার শ্রমিক জোগানদারীর এ... খড় খরিদ করে নেবে।

(চলে...

---

(৩) এব্রাহাম লিংকল্ন্—চার্লস্টনের (১৮৫৮) বক্তৃতা। 'নিউ স্টেটসম্যান —২ মে, ১৯৬৪ দ্রষ্টব্য।

(৪) দানিয়েল ম্যানিক্সের 'মুখবন্ধ' দ্রষ্টব্য। পূর্বোক্ত
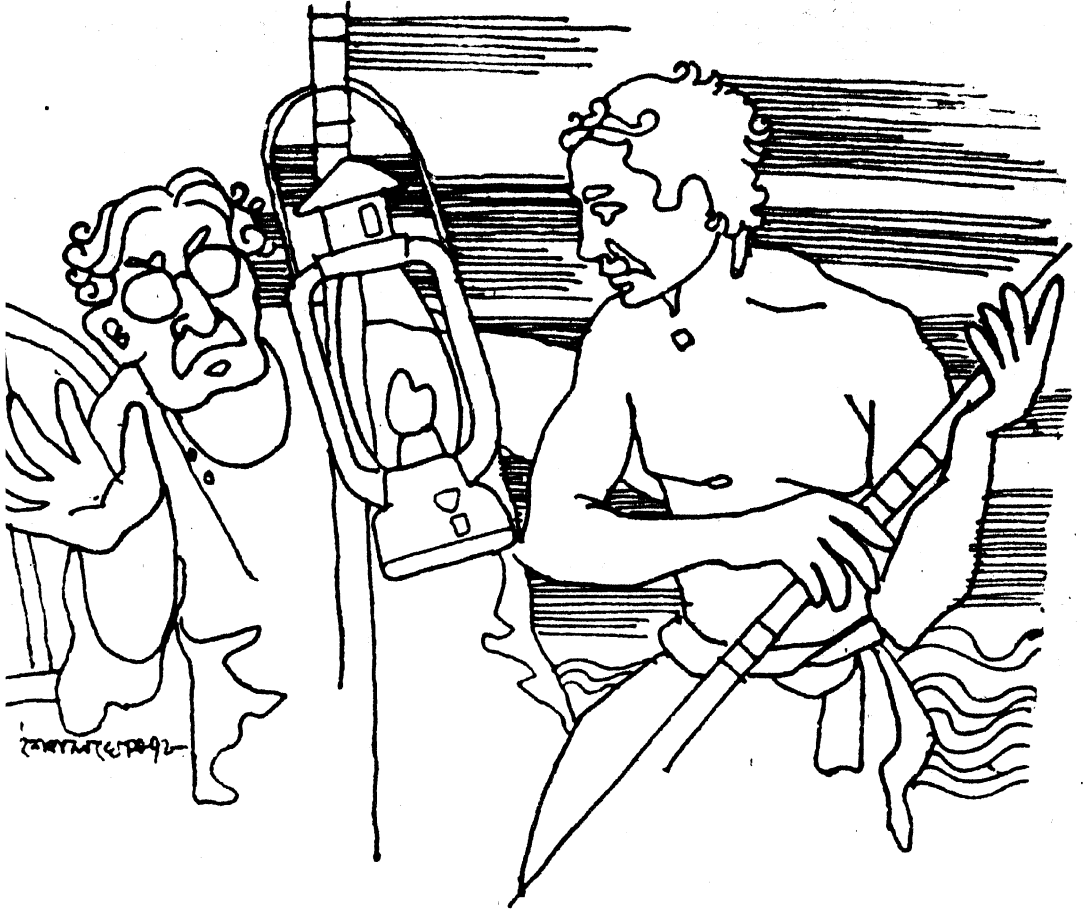
মহাদেব বিকাশ জানা

মহাদেবের হাতে এখন নৌকোর হাল। মানেই যাত্রীদের নিশ্চিন্তে ঘুম। গুলের সবাই জানে যে, হালে মহাদেব ন সে নৌকো পারে ভিড়বে। ঝড়, বৃষ্টি, ও কিছুই তাকে ডুবাতে পারবে না। ব জানে কোন দিকের বাতাসে পাল তে হয়, কোন মেঘ বৃষ্টি আনে কোন বশ নদীকে বিদ্রোহী করে। আর এসব বলেই তার ভয় নেই। আজ তিরিশ তার জলের সঙ্গে সহবাস। সাত বছর থেকেই সে বাবার সঙ্গে নদীতে থাকতে করেছে। বাবা যখন প্রথম তাকে সঙ্গে আসে, তার সে কি স্ফূর্তি। নিঝুম নৌকো ছলাৎ ছলাৎ শব্দে এগিয়ে। তার পায়ে নবাগত বরফী বাতাস। এর ওপর বসে সে আকাশে চোখ রাখত। প্রশস্ত ঝলমলে আকাশ কোনদিন নি। বাবা বলেছিল—একটু পরেই ঝড় ।, তুই চটপট শুয়ে পড়।

বাবার কথায় অবাক লাগত তার। এই ত আকাশের চারদিকে নক্ষত্রের মেলা, র চিহ্নমাত্রও নেই, এখানে বৃষ্টি আসবে কি করে। ওই যে দূরে মেঘটা দেখছিস, একটু পরেই দেখবি ওটা কেমন বড় হয়ে ওঠে।

মহাদেব বিশ্বাস করতে চাইত না। এই এত ছোট মেঘ থেকে বৃষ্টি আসবে, সে কিছুতেই এটা মেনে নিতে পারে না।

নৌকো তখন তরতর করে এগিয়ে চলেছে. দাঁড়িরা কোরাসে গলা মেলায়। ছোট মহাদেব গান শুনতে শুনতে কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। বাবা তাকে কোলে করে ছইয়ের ভেতর শুইয়ে দেয়। নক্ষত্রগুলো ধীরে ধীরে মেঘের আবরণে ঢাকা পড়ে। চাপ চাপ অন্ধকারে সারা আকাশ ছেয়ে যায়, বাতাসও হয় দুর্মুখ। দাঁড়িরা ততক্ষণে গান থামিয়ে বিপদের প্রতীক্ষায় তাকিয়ে থাকে।

হঠাৎ নৌকোর প্রচন্ড দোলায় ঘুমভাঙে মহাদেবের। উঠে বসতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। দড়িতে বাঁধা ছোট্ট লন্ঠনটাও মহাদেবের মতো দোলে। ছইয়ের ভেতর আধো অন্ধকারে একরাশ ভয় তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। বাবা....বাবা গো—ও বাবা ককিয়ে ওঠে সে।

ঝড় শুরু হয়েছে রে, তুই চুপ চাপ থাক।

আমার ভয় করছে বাবা।'

আমি হাল ধরেছি যে, এই ঝড়ে হাল ছেড়ে যেতে পারি না. নৌকো তাহলে ডুববে।

বাবার ওপর খুব রাগ হয় তার। সে কাঁদছে, অথচ বাবা আসছে না, মনে হয় তাকে একেবারেই ভালবাসে না। বাবা যাতে আসে, সেজন্য সে আরো জোরে কেঁদে ওঠে।' বাবা তবু আসে না। এক সময় তার সারা শরীর আইঢাই করে। মুখ থেকে গলগলিয়ে বেরিয়ে আসে তেতো জল। মহাদেবের ছোট্ট শরীরটা ওখানেই এলিয়ে পড়ে।

এবং এভাবেই সে বড় হয়। যখন তার বার বছর বয়েস, বাবা প্রথম তার হাতে দাঁড় ধরায়। কিভাবে দাঁড় ধরতে হবে, জলে ফেলে টান দিতে হবে, সব এক এক করে শেখাতে থাকে। জলে দাঁড় ফেলার সময় মুঠি দুটো আলগা করবি না। শরীর করবি না শক্ত। এ কি পা দুটো এমন টান টান হচ্ছে কেন! দাঁড়টা এভাবে ফেল, বাঁদিকে ঝুলিয়ে।]

গম্ভীর মনোভঙ্গিতে মহাদেব এবার পাঠ নিতে থাকে। আর এমনি করেই একদিন সে বাতাসের গন্ধ থেকে ঝড়ের আনাগোনা বুঝতে পারে, নক্ষত্র দেখে দিক নির্ণয় করতে পারে, নদীর ঢেউ দেখে গম্ভীরতা মাপতে পারে। এখন সে পাকা মাঝি। লোকে বলে সে তার বাবাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

এই নৌকোটাকে সে ভীষণ করে ভালবাসে। বছরে একবার সারা নৌকো রং করায়। তার ছই এর গায়ে আল্পনা। ভেতরটা রঙীন কাগজ ক্যালেন্ডারে সাজানো। মাঝি হিসেবে সে চন্ড মেজাজী। কাউকে কাদা পায়ে চাপতে দেয় না। ওঠার সময় ভাল করে পা ধুয়ে তার পর উঠতে হয়। কোন 'ছোট্ট যাত্রীকে' কখনো নৌকোয় তোলে না। একবার পাশের গাঁয়ের ছোট জমিদারের রক্ষিতার ইচ্ছে হয়েছিল কয়েকদিন বাবুর সঙ্গে নৌকো করে ঘুরে বেড়াবে। ডাক পড়েছিল মহাদেবের। কিন্তু সে যেতে রাজী হয়নি। বলেছিল নৌকোর তলাটা খারাপ আছে বাবু সে কোন সময় ভেঙে পড়তে পারে।

ছোট জমিদার প্রথমে জোর ধমক দিয়েছিল। তাতে কাজ না হওয়াতে ভাল বকশিসের লোভ দেখিয়েছিল। মহাদেবের তবু এক কথা।

যাব কি বাবু, আপনাকে বিপদে ফেলব নাকি, মাঝ নদীতে নৌকা যদি ডুবে যায়।

আবার এই মহাদেব তার গাঁয়ের ছোটে মিঞার নতুন মেয়ে জামাইকে শ্বশুর বাড়ী পৌঁছে দেয় বিনি পয়সায়। জামাইয়ের বাড়ি দুরাত্রির পথ। মহাদেব মজুরি নেয় শুধুমাত্র এক বোতল মদ। সেও ছোটে মিঞা জোর করে তার হাতে গুঁজে দিয়েছিল বলে। মেয়েটা তার মহাদেব চাচাকে ভারি ভালবাসে। বিয়ের আগে প্রায়ই তার নৌকোয় এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াত। মহাদেব হাল ধরে থাকত, আর মেয়েটা ভাত চটকে খাইয়ে দিত তাকে।

আসার সময় ছোটে মিঞার বিবি বারবার মেয়েকে বলে দিয়েছিল—

এ মহাদেবের নৌকা, জানিস তো, ভেতরে কিন্তু কোনো অনাচার করিস না, দুটো তো দিন মাত্র, জামাইকে একটু সামলে সুমলে রাখিস।

মেয়ে নিজেও এটা জানত। কিন্তু গভীর রাতে একথা স্বামী-স্ত্রী কারুরই খেয়াল হয়নি। বাঁশের খুঁটিতে লন্ঠন জ্বলে, মহাদেব সেই আলোয় ছই এর ভেতর হঠাৎ তাকিয়েই ব্যাপারটা আন্দাজ করে নেয়। দরজার ছেঁড়া কাপড়টা সব চাপা দিতে পারেনি। হাল বেঁধে সে দরজার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়।

লন্ঠন নিভিয়ে দরজার কাপড়টা ভাল করে টেনে দেওয়ার সময় তার সারা মুখে এক সলজ্জ হাসি ছড়িয়ে পড়ে।

সেদিন রাতেও প্রচন্ড ঝড়। নতুন জামাই ভয়ে শিউরে ওঠে। মেয়েটি কিন্তু ঘাবড়ায় না। মহাদেব চাচা হাল ধরেছে, সে জানে, এ নৌকো তীরে ভিড়বেই। সেদিন সেই তুফানে চার-পাঁচটা নৌকো ডোবে। কিন্তু মহাদেবের নৌকো নয়।

ফিরে আসার সময় মেয়েকে বলে এবার বাপের বাড়ী যাওয়ার সময় তোর মহাদেব চাচাকে খবর দিবি। অন্য নৌকায় গেলে খুন করে দেব।

মেয়েটি হাসে। বলে—আসার সময় আচার এনো কিন্তু।

এই মহাদেব। ওর হাতেই এখন নৌকোর হাল। তাই ভেতরে বসে জমিদার রামপ্রসাদ পারিষদসহ নিশ্চিন্তে ঝিমুতে পারে। সে জানে মহাদেব আজ ভোরেই তাকে তীরে ভেড়াবে। রামপ্রসাদের ওখানে অনেক কাজ। সবাইকে খবর দেওয়াও হ'য়ে গেছে। পাছে কেউ সন্দেহ করে এজন্য সঙ্গে বেশী লোকও আনেনি। যারা এসেছে তারাও কেউ লাঠিয়াল নয়। একজন চাকর, একজন গোমস্তা, আরেক মোসাহেব—এই নিয়ে রামপ্রসাদের বর্তমান দল। এরা সবাই বয়স্ক। অন্য রকম কিছু ভাবনা কেউ ভাবতেই পারবে না।

ছই এর বাইরে এসে রামপ্রসাদ দাঁড়ায়। খোলা বাতাস তার গায়ে লাগে। চাকর বাইরে একটা আসন পেতে তার হাতে গড়গড়ার নল ধরিয়ে দেয়। রামপ্রসাদ গা থেকে জামা খুলতেই মহাদেব চেঁচিয়ে কাকে যেন ডাকে। কত্তাবাবুর জামাটা ভেতরে নিয়ে রাখ।

রামপ্রসাদ মহাদেবের দিকে তাকায়। মহাদেবের মুখে হাসি। সে হাসি কৃতজ্ঞতার, কৃতার্থ হওয়ার। সে জানে, জমিদার হিসেবে রামপ্রসাদ খুব সুবিধের নয়। তবু তার প্রতি মহাদেবের কোন ক্ষোভ নেই। যেহেতু রামপ্রসাদ তার কোন ক্ষতি করেনি। রামপ্রসাদ টাকা সুদে খাটায়। কিন্তু মহাদেবের কাছ থেকে সুদ নেয় না। মদ ও মেয়ের প্রতি তার এক বিশেষ দুর্বলতা সত্ত্বেও মহাদেবের নৌকোয় এ ব্যাপারে সে সংযত থাকে। মহাদেব রামপ্রসাদের কাছে ঠিক স্বচ্ছন্দ নয়, কিন্তু আর অনেকের চেয়ে সে অনেক বেশী স্বাধীন। ডেকে না পাঠালে সে কখনো যেচে জমিদার বাড়ী যায় না, কিন্তু রাস্তায় মুখোমুখি হলেই মাথা নোয়াতে ভুল হয় না তার।

তাকিয়ায় হেলান দিয়ে রামপ্রসাদ গড়গড়া টানে। মৃদু ঠান্ডা বাতাসে তার চুল ওড়ে। স্রোতের উন্মাদনা একেবারেই নেই। নৌকো এখন স্থিরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। দুলছে না, টলছে না, শুধুই এগুচ্ছে। রামপ্রসাদ দূরের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আজকের হাওয়াটা বেশ ভাল নারে মহাদেব।' মহাদেব কোন জবাব দেয় না। এই বাতাস স্রোত তার একেবারেই পছন্দ নয়, এরকম নিস্তেজ স্রোতে নৌকো বাওয়ার কোনো মজা নেই। ঢেউ উঠবে, নৌকো দুলবে, তবেই তো মাঝি খেলা করার সুযোগ পাবে। মহাদেবের সে পরিবেশ পছন্দ। নৌকো দুললেই হালের ওপর তার হাত টান টান হবে, সারা শরীরে বাজবে দিয়ে দিয়ে মাদলের বা নদীর এই এলিয়ে পড়া ভাব সে কিছু মেনে নিতে পারে না। এখন উজানে অনু হাওয়ায় নৌকো একাই গড়িয়ে চলেছে। কিছুই করার নেই।

একটা কথা মনে পড়তেই মহাদে সারা মুখ খুশীতে ভরে যায়। লাঠো জায়গায় এখন যাচ্ছে, সেটা রামপ্রসাদের জমিদারী। সেই জমিদারীতে ছোটে মি মেয়ে লতিফার বাড়ী। লতিফা তার আদরের। অনেক দিন আগে দে মহাদেব জানে, লতিফা কুলের আচার ভীষণ ভালবাসে। আসার সময় তাই হাঁড়ি আচার সঙ্গে এনেছে। ছোটে বলে দিয়েছে যেন সঙ্গে মেয়েকে বাপের নিয়ে যায়। তার নৌকোয় বেটী ল আসবে এ ভাবতেই মহাদেবের মনে তুফান ছোটে। কিন্তু এ শান মরশুম—শ্বশুর শালা ছাড়বে তো! না মানে! মহাদেবকে তো সে চেনে না আসতে দিলে একটা—

রামপ্রসাদের ডাকে মহাদেবের তন্দ ভেঙে যায়। মহাদেব—

বাবু—

আমরা ঠিক সময়ে পৌঁছোতে তো?

হ্যাঁ বাবু, ঠিক পৌঁছে দেবো

দেখ বাপু কোন গন্ডগোল যেন না

মহাদেব মনে মনে বিরক্ত হয়। অ ঝড়ঝঞ্ঝার রাতে সে নৌকো পারে ভিড়ি আর এখন ঠান্ডা দিনে পারবে না। তার এটুকুও আস্থা নেই। তাড়াতাড়ি পে দিতে না পারলে কিন্তু আমার সর্ব হয়ে যাবে।

আপনার আবার কি সর্বনাশ গো বাবু!

জানিস না তো—

মোসাহেবটি পেছন থেকে বলে —চাষীদের সঙ্গে বাবুর যা গন্ডগ চলছে—

তা বাবু বুঝি ওদের সঙ্গে মি করে নিতে যাচ্ছেন?

মিটমাট? ঐ ব্যাটাদের সঙ্গে? বছর যে কি ধকলটা দিয়েছে, ওরা ভাগচাষের রেকর্ড করবে—

রেকর্ড করা দেখাচ্ছি—

এতক্ষণ চুপ থাকার পরে এবার উঠলেন রামপ্রসাদ স্বয়ং রেকর্ড দেখাচ্ছি—শালা পাড়ার পর পাড়া জ্বা শেষ করে দেব, এক একটাকে ধরে ম কবর দেব, একদিকে আলোচনা চ আরেকদিকে উচ্ছেদ—সাপের পাঁচ দেখেছে না—হ্যাঁ গোবর্ধন, লাঠিয়াল ঠিক মতো—বাবু তো জানেনই, কবে তারা তৈরী হয়ে আছে—শুধু এ হুকুমের অপেক্ষায়—

এক তীব্র জীঘাংসায় রামপ্রসাদের দুটো জ্বলে। মহাদেব কেঁপে ওঠে

ত পারে না। সে জানত না জমিদার-এই উদ্দেশ্যে তার নৌকোয় উঠেছে। না চাষীদের মারার জন্য এত বড় তি নেওয়া হয়েছে। সে ভেবেছিল রবাবু বুঝি কদিনের হাওয়া পাল্টাতে যাচ্ছেন! কিন্তু এখন সে কি ! কি তার করা উচিত! কি করতে পারে মহাদেব। এখান থেকে তাকে ফিরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। পৌঁছে তাকে ই হবে। কিন্তু তারপর। গ্রামের রা যখন মৃত্যু চিৎকারে আকাশ ভরিয়ে ক্ষুধার্ত আগুনে সারা মাঠ দাউ দাউ , তখন মহাদেব তুমি কি খুব সুখে ত পারবে? তোমার জন্যই তো ওদের এবস্থা, তুমিই তো রামপ্রসাদকে নিয়ে কি না। কিন্তু আমার নৌকো না দিলে অন্য নৌকো পেত না! কি পেতো বা পতো সে কথা পরে। এখন তো সে র নৌকোয় যাচ্ছে। মহাদেব হুতে তোমার কি কিছুই করার নেই। করতে পারি আমি! যে আমার নৌকো নেবে তাকে পারে পৌঁছোনো আমার ত্ব—আমি তো অবিশ্বাসী হতে পারি -! দায়িত্বটা কি শুধু রামপ্রসাদের ! ওদের কাছে তোমার কোন দায় নেই! ।। যদি থাকে তাহলে তুমি একটু হতাশ , একটু দুঃখ পেলেই সে দায়িত্ব থেকে তি পাবে—

এক মহাদেব আরেক মহাদেবের সঙ্গে সওয়াল করে চলে। কিন্তু কোন উত্তর মেলে না। মহাদেবের লতিফার কথা ভাবে। হয়তো তার ঘরও জ্বলবে। কিন্তু সে বললে লতিফার ঘরটা বেঁচেও যেতে পারে। বলবে নাকি একবার! বাবু আপনি যাই করুন, অন্ততঃ লতিফার ঘরটা বাঁচিয়ে দিন। দূ-র, একা লতিফা বাঁচলেই বা কি! আরো যারা মরবে, তাদের ঘরেও তো কোন না কোন লতিফা আছে, তার পাড়াপড়শীরা যখন মরবে, মেয়েটা নিজে বেঁচে থেকে কি খুব আনন্দ পাবে! তারপর সে বাঁচবে, সে কাদের নিয়ে! ঐ গ্রামের লোকগুলোর মহাদেবের মনে পড়ে। সেবার যখন লতিফাকে নিয়ে ঐ গ্রামে যায়, তারা কি ভালবেসে না তাকে কাছে টেনে নিয়েছিল, সেই কয়েকটা দিন তাদের সঙ্গে তাশ খেলেছে, জাল ফেলেছে, যাত্রা শুনেছে, আসার সময় বারবার বলেছে আবার আসবে। সেও সেই আবার যাচ্ছে, কিন্তু যাচ্ছে তাদের মৃত্যুর সংবাদ নিয়ে।

মহাদেব নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না। সে ভাবে সবদোষই তার। আচ্ছা জমিদারবাবুকে বললে কেমন হয়। সে কি মহাদেবের কথা রাখবে না!

বাবু একটা কথা বলব—বাবু—শুনছি। বাবু ওদের আপনি এবারটার মত ক্ষমা করে দিন না—ওরা কত গরীব, আপনার তো অনেক আছে।

দেখ মহাদেব যা বুঝিস না, তা নিয়ে একেবারে বাজে কথা বলবি না।

নৌকো চালানোর কথা নৌকো চালাবি, এসব বড়দের কাজে তোর এত মাথা ঘামানো কেন রে?

না বাবু বলছিলাম কি—

ভাগ, তুই বলবি আর বাবু শুনবেন না—দুনিয়ার সব ব্যাটাই দুশমন—মোর কিছু বলেছিস কি—

বাবুর চাকরের কথা শুনে মহাদেবের অবাক লাগে। লোকটা নিজেও তো গরীব! সে কেন ওদের দুঃখ বুঝতে পারছে না। মহাদেব বুঝে নেয়, তার এই অনুরোধ শুধু ঘা খেয়েই ফিরে আসবে, কোন ফল দেবে না। কি করবে ভেবে কূল পায় না। রামপ্রসাদ মহাদেবের কাছে এসে দাঁড়ায়—নদীর চারদিকে চোখ বুলিয়ে মহাদেবের দিকে তাকায়। দ্যাখ মহাদেব, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। তোর নিজের কথা ভাব, ওরা মরলে তো কি! তোর তো কোন দুঃখ নেই, আমাকে ঠিকভাবে তুই পৌঁছে দে, তোকে মোটা বখশিস দেব।

মহাদেব এর কোন জবাব দেয় না। ওপরের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবে। হঠাৎ বেখেয়ালে হালের ওপর তার হাতটা একটু অন্য মনস্ক হতেই নৌকো বেসামাল হয়। দাঁড়িরা হেই হেই করে ওঠে। রামপ্রসাদ চিৎকার করে বলে—এই মহাদেব করছিস কি?

মহাদেব অবজ্ঞাবশে জবাব দেয়, ভয় নেই বাবু, আমি তো আছে।

পরমুহূর্তেই কি এক চিন্তায় তার মুখে এক বিচিত্র হাসি খেলা করে যায়। সে মাস্তুলে একটা উল্টো চাপ দিতেই নৌকোটা হঠাৎ একদিকে এলিয়ে পড়ে—সপারিষদ রামপ্রসাদের শরীরগুলো তখন বিচিত্র নৃত্যের ভঙ্গীমায়।

এই মহাদেব হচ্ছেটা কি—নৌকো টাল খাচ্ছে কেন, মহাদেব না—হেই মহাদেব দা—না এমন করে কেন? মহাদেব দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে—

ভয়ে মরে যাচ্ছিস নাকি। সে নদীকে শাসন করিস, তাকে এত ভয়।

ভয় কে বলছে। এক সঙ্গে অনেক গলা চিৎকার করে ওঠে। বাতাস এখন বেশ শান্ত। শান্ত নদীও। এ সময়ে নৌকো সে কেন এভাবে দুলল তা দাঁড়িরা বুঝতে পারে না। রামপ্রসাদেরাও না। সে বুঝেছে সেই মহাদেব তখন এক আলাদা চিন্তায় মগ্ন। সে বুঝে নিয়েছে মাঝ নদীর এই বিশাল প্রাঙ্গনে এই মুহূর্তে সে সম্রাট। অলৌকিক বিধাতার মতো তার ইচ্ছেটাই এখন এখানে প্রধান। তাকে এক্ষুণি একটা সমাধানে পৌঁছোতেই হবে। দাঁড়িদের দিকে তাকায়। নাঃ তারা তারা কেউই এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে পারবে না। যা করতে হবে তা নিজেকেই। সে কি রামপ্রসাদের নৌকো থেকে ফেলে দেবে! কিন্তু ফিরে গেলে তাহলে কি জবাব দেবে। আমরা বাঁচলাম, নৌকা বাঁচলে বাবুরা মরল কিভাবে। তাছাড়া বাবু আমার নৌকায় এসেছে, আমি নিজে তাকে নদীতে ফেলে দিই কি করে! তাহলে যদি বাবুকে নিয়ে ফিরে যাই? কিন্তু ডাঙায় পা দিলেই যে বাবু তাকে আস্ত রাখবে না। সেই সাম্রাজ্যের অধীশ্বর রামপ্রসাদ, মহাদেব নয়। তার চেয়ে সবাই মিলে ডুবলে কেমন হয়? যার তাগদ আছে, সে বাঁচবে। কিন্তু তার এই প্রিয় পুত্রতুল্য নৌকোটাকে সে কি করে এই মাঝ নদীতে রেখে যাবে। তার তিন-পুরুষের নৌকো, যে নৌকোয় তার ঠাকুর্দা তার বাবাকে, তার বাবা তাকে হাল ধরা শিখিয়েছে, যে নৌকো তাকে, তার স্ত্রীকে, বুড়ো মাকে, ছোট্ট ছেলেমেয়েকে সারা বছরের খাদ্য জোগায়, যে নৌকোয় দাঁড়িয়ে এক দিন সে তার ছেলেকে হাল ধরা শেখাবে, সেই নৌকো কি এভাবে এখানে তলিয়ে যাবে। কিন্তু নৌকো যদি না ডোবে, এ যদি পারে পৌঁছোয়, তাহলে সে আরেক বিপদ। তখন হয়তো মহাদেব বাঁচবে, তার নৌকা বাঁচবে, তার মা বৌ বাঁচবে, কিন্তু সেই সঙ্গে বাঁচবে না আরো অনেক মানুষ। তারা তো মহাদেবের মতোই দুঃখী। তাদের প্রতি কি তার কোন কর্তব্য নেইই।

সেদিন বাতাসে কোন ভয়ংকরতার চিহ্ন নেই। নদী স্বাভাবিকভাবেই শান্ত। আকাশে নেই এক টুকরো মেঘ। শুধু হাজার কয়েক নক্ষত্রের মাঝে চাঁদ সারা আকাশটা আলো করে দিয়েছে। আলো ছড়িয়ে পড়েছে নদীর বুকে। এই পরিবেশে মহাদেবের নৌকো তরতরিয়ে যেতে যেতে সহসা টাল খায়। দাঁড়িরা একসঙ্গে আবার চেঁচিয়ে ওঠে। চিৎকার করে মহাদেব ও তার মোসায়েবরা। মহাদেব কোন জবাব না দিয়ে আকাশের দিকে তাকায়। ঐ নক্ষত্রগুলো যেন এখন তার নানাখেলা দেখতে ব্যস্ত। মহাদেব কঠিন নিপুণ টানে আবার হালটায় মোচড় দেয়। নৌকো এক পাক ঘুরে আসে। রামপ্রসাদেরা এ ওর গায়ে ছিটকে পড়ে। এক বিশাল ভয়ে তাদের বুক ছেয়ে যায়। মহাদেব তোর পায়ে পড়ি তুই নৌকাটা ঠিক কর। আমি আর মাঠে যাব না মহাদেব, তুই আমাকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে চল।

একথায় দাঁড়িরা কিসের যেন আন্দাজ পায়। চমকে ওঠে চাকর গোমস্তারা। হঠাৎ নৌকার এক কোণে একটা তক্তা দেখে সেটা দখল করতে তারা একসঙ্গে দৌড়ে যায়। মাঝ নৌকায় দাঁড়িয়ে রামপ্রসাদের নিজেকে ভীষণ একা লাগে। পারিষদেরা কেউ তার পাশে নেই। তারা তখন তক্তা কাড়াকাড়িতে ব্যস্ত।

রামপ্রসাদ আরেকবার চেঁচিয়ে ওঠে, সেখানে নেই কোন হুমকি, কোন আদেশ, মহাদেব তোকে রাজা করে দেব, তুই আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চল।

মহাদেব ভাবে তাহলে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে কেমন হয়, কিন্তু পায়ের নীচে মাটি খুঁজে পেলেই যে বাবু স্বমূর্তিতে দেখা দেবে। অনেক দূরে এগিয়ে এসেছে মহাদেব। ফিরে যাওয়া এখন অসম্ভব।

মাঝ নদীতে নৌকো তখন এক দুর্দান্ত খেলায় মত্ত। নদীর বুক চিরে যেন নৃত্যরত শিবের আবির্ভাব হয়েছে। এক দাঁড়ি হঠাৎ চিৎকার করে উঠতেই মহাদেব ধমকায়—নদীতে এসেছিস, সাঁতার জানিস না?

দাঁড়িরা সেই মুহূর্তেই যা বোঝার বুঝে নেয়। জল থেকে দাঁড় তুলে তার আগামী ঘটনার অপেক্ষায় থাকে। চেঁচিয়ে ওঠে রামপ্রসাদ। আমি সাঁতার জানি না মহাদেব, তোর পায়ে পড়ি, তুই আমাকে পারে পৌঁছে দে।

মহাদেব কোন জবাব দেয় না। নৌকোটার চারদিকে একবার তাকায়। তার চোখ দুটো জলে ভরে যায়, সারা শরীর শক্ত হয়ে ওঠে, গভীর ভালবাসা নিয়ে হালের হাতলে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দেয়।

ছইয়ের এক পাশ থেকে শোনা যায় রামপ্রসাদের গোঙানির শব্দ, অন্য পাশে চাকর-গোমস্তাদের কাঠ নিয়ে কাড়াকাড়ি চলে। এখন আর দাঁড়িদের কলরব নেই, তারা চুপচাপ মহাদেবের দিকে তাকিয়ে থাকে। এমন খেলা তারা কোনদিন দেখেনি। এতবড় একটা নৌকো শুধু মহাদেবের হাতের কসরতে ডাইনে বাঁয়ে দোলে, জল থেকে লাফিয়ে উঠে জলের আছাড় খায়। তারপর হঠাৎ লাট্টুর মতো বন বন করে ঘুরতে থাকে এক বিশাল চিৎকার কিছুক্ষণের জন্য সারা আকাশ তোলপাড় করে। এই ভয়াবহ কোলাহলের মধ্যে শুধুমাত্র মহাদেবের ঋজু শরীর মাস্তুলের পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

একসময় নৌকোটা ধীরে ধীরে নদীতে ডুবতে থাকে। দাঁড়িরা ঝাঁপিয়ে পড়ে নদী বুকে, ঝাঁপ দেয় সাঁতার না-জানা রামপ্রসাদও। কিন্তু মহাদেব, সে তখনো হাল ধরে দাঁড়িয়ে। এতদিনের এই সঙ্গীকে ছেড়ে যেতে তার ইচ্ছে করে না। সবাই যখন একে একে নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, নৌকো যখন একটু একটু করে তলিয়ে যেতে থাকে মহাদেব এই প্রথম চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। এক সময় নৌকোটা পুরোপুরি জলের তলায় ডুব দেয়। নদী কিছুক্ষণ মাতামাতি করে আবার আগের মতো স্থির হতে থাকে। মহাদেবকে তখন দেখা যায় এক হাতে আচারের হাঁড়ি নিয়ে আরেক হাতে নদী ঢেউ ভাঙতে।

াঁদের দেখেছি
অনন্ত সিং

'কেউ বলে ডাকাত, কেউ বলে বিপ্লবী'

(ক)

শীতের সকাল। আমি ঘুম থেকে আমার টেবিল-চেয়ারে বসেছি তখন সাড়ে পাঁচটা। আমাদের সামনের র গোরার মা আলুথালু বেশে কাঁদতে তে এসে আমাকে জানালেন, 'দাদা, শ আমার গোরাকে ধরে নিয়ে গেল।' মনে মনে জানতাম পুলিশ হয়ত কে খুব শীঘ্র ধরবে। আমার এরকম র কারণ ছিল। পুলিশ মাস দুই-তিন থেকে আমার উপর চব্বিশ ঘন্টা নজর রেখেছিল। আমাকে স্পষ্ট তে দিয়ে তারা তাদের পুলিশের চর-সাদা পোষাকে গাড়ি নিয়ে পাহারা নিযুক্ত করেছিল। আমি বেরোলে তেই বেরোতাম সেইজন্য কলকাতার ডি তাদের এজেন্টদের সাদা পোষাকে কে গাড়ি নিয়ে অনুসরণ করার জন্যই করেছিল। তারা খুব খোলাখুলি-আমাকে বুঝতে দিয়ে সব সময় গাড়ি ই অনুসরণ করত। আমার গাড়ি মাকে নিয়ে যখন তাঁর অফিসে যেত, তখন সেই গাড়িও অনুসরণ করত। তাঁর অফিসে গিয়ে খোঁজ করত তিনি কোন ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন এবং তাঁর অফিস রেকর্ড কী রকম। মাসীমার অফিস রেকর্ড খুব প্রশংসনীয় ছিল। তিনি ও তাঁর স্বামী এ জি বেঙ্গল অফিস থেকে সর্বপ্রথম মনোনীত হয়ে এ জি বেঙ্গলের ইংল্যান্ডের শাখা অফিসে ভারপ্রাপ্ত অফিসার নিযুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে পাঁচ বছরে কাজ সমাপ্ত করে আবার এখানে ফিরে আসেন। পশ্চিমবঙ্গেও তাঁদের কাজে উচ্চ মহল খুবেই সন্তুষ্ট ছিল। মাসীমা কোন দিনই স্ট্রাইক প্রভৃতিতে যোগ দেননি। অফিস টাইম কখনও অপচয় করতেন না। সেই মাসী-মাকে সন্দেহ করার কোন কারণ ছিল না, কিন্তু কলকাতার ডি ডি পুলিশ আমার মোটর গাড়ীর কল্যাণে তাঁকেও রেহাই দেননি।

পুলিশ এইভাবে খুব দেখিয়ে বুঝিয়ে আমাকে অনুসরণ করল কেন? আমার মনে হয় তার একটাই কারণ—আমি পালিয়ে যাই কি-না তা দেখা।

কয়েকদিন বাদে খবরের কাগজে বেরলো শ্রীকল্যাণ বোস ওরফে গোরা হাকিমের কাছে স্বীকারোক্তি করেছে। এই সঙ্গে আরো খবর ছিল তাকে সেই হাকিমের কাছে স্বীকারোক্তি সম্পূর্ণ করার জন্য পুনরায় উপস্থিত করা হবে। এটা আরেকটা পুলিশি চাল বলে আমার মনে হয়েছিল। তারা দেখতে চেয়েছিল এই খবর বের হওয়ার পরে অনন্ত সিং ফেরার হয় কি না। অগত্যা পুলিশ যখন দেখতে পেল ভয় পাওয়ার লোক অনন্ত সিং নয়, তখন পুলিশ আর কোন গত্যন্তর না দেখে আমাকে ধরার জন্য মনস্থির করলো।

বিকেল পাঁচটা। একটা অ্যামবাসাডার গাড়ী এসে বাড়ীর দরজায় থামলো। বেল বাজলো। ছবি (আমার বোন) উপর থেকে দেখলো বাড়ীর দরজার সামনে সাধারণ পোষাকে দু-তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাঁরা ছবিকে বললেন, 'খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে এসেছি। লেক কলোনীর

বাড়ী কেনার জন্য অনন্তবাবুর সাথে কথা বলতে চাই।' ছবিও বলল, 'দরজা খুলে দিতে বলছি, উপরে এসে বসুন।' ছবি ডাকলো, 'আনন্দ, দরজাটা খুলে দিয়ে আয়। বাবুরা উপরে এসে বসুক।'

ছবি আমাকে এসে বলল, 'দাদা, কয়েকজন ভদ্রলোক এসেছেন বাড়ী কেনার জন্য, কিন্তু তাঁদের দেখে আমার একটুও ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে তাঁরা পুলিশ—সাদা পোষাকে এসেছেন আপনাকে ধরার জন্য।'

ছবির পক্ষে এই রকম ভাবার যথেষ্ট কারণ ছিল। মাত্র একমাস আগে সকাল-বেলা গোরাদের বাড়ীতে পুলিশ যে কান্ড করে গেল তারপর থেকে ভদ্রলোক দেখলেও তাদের পুলিশ সন্দেহ করা অস্বাভাবিক নয়। গোরা তখন তাদের বসার ঘরে। তিন-জন ভদ্রলোক সেই ঘরে ঢুকে বেশ ভদ্র-লোকের মতই গোরাকে বলল, 'আপনাকে আমাদের সঙ্গে লালবাজারে যেতে হবে।'

গোরা : 'হেতু।'

'তা গেলেই জানতে পারবেন। সামান্য কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।'

ইত্যবসরে গোরার বাবা এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে সেই বিশিষ্ট তিন ভদ্রলোক বললেন, 'আমরা কল্যাণ-বাবুকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।'

'কেন? কোথায়?'

'আমরা লালবাজারের পুলিশ। স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার রাসেল স্ট্রীট ব্রাঞ্চের ডাকাতি সংক্রান্ত ব্যাপারে কল্যাণবাবুকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'

কল্যাণের বাবা এই কথা শুনে খুব যে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন তাতে আর সন্দেহ নেই। সেই আগন্তুকদের মধ্যে একজন খুব মোলায়েম করে বললেন, 'আপনার এতে কিছু ঘাবড়াবার নেই। স্টেট ব্যাংক ডাকাতি গতকাল হয়ে গেছে। সেই সংক্রান্ত বিষয়ে আপনার ছেলেকে কিছু প্রশ্ন করা হবে। আপনি বেলা এগারোটার সময় যাবেন, ওনাকে সঙ্গে করেই নিয়ে আসবেন।'

মিস্টার বোস একজন টিম্বার মার্চেন্ট। তিনি তাঁদের কথা বিশ্বাস করেছিলেন কি না জানিনা, তবে কিছুটা নিশ্চয় আশ্বস্তঃ হয়েছিলেন। পুলিশ এইভাবে নিঃশব্দে পাড়ার ভেতর থেকে একজনকে তুলে নিয়ে গেল, কেউ আর জানতেও পারলো না।

যে কল্যাণ বোসকে পুলিশ কয়েক ঘন্টা পরেই ছেড়ে দিচ্ছিল, তাকে আট বছর বাদে আমাদের সঙ্গে ১০-১০-৭৭-এ ছাড়লো।

আনন্দ (বাড়ীর একজন চাকর) দরজা খুলে তাঁদের ডেকে এনে বসবার ঘরে বসালো। বসবার ঘরটা দোতলার উপর আমার ঘরের সংলগ্ন একটা ঘর। তাঁরা বসার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাঁদের অভ্যর্থনা করতে যাচ্ছি এমন সময় তাঁদের মধ্যে একজন (মনে হলো তিনি দলের প্রধান) একটু ঢোক গিলে নিজেকে সংবরণ করে নিয়ে মাতব্বরীর চালে বললেন, 'আমি আপনাকে এ্যারেস্ট করলাম স্টেট ব্যাঙ্ক ডাকাতি সংক্রান্ত ব্যাপারে।' আমার চেহারা বদলাতে লাগলো। আমি ক্রমশঃ গম্ভীর হতে লাগলাম। আমি বললাম, 'বেশতো, বলুন এখন আমায় কি করতে হবে?'

আপনাকে আমাদের সঙ্গে লাল-বাজারে যেতে হবে। আমরা এখন আপনার বাড়ী সার্চ করব।'

ডি সি ডি ডি দেবীবাবু বীরদর্পে একপা সামনে এসে তাঁর নিজের প্যান্টের পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে হাতে নিলেন এবং আমাকে খুলে দেখালেন তাতে দু'টি কার্টিজ চেম্বারে পোরা আছে। তার-পর তিনি আমাকে বললেন, 'আমাকে সার্চ করে দেখুন। আমি সার্চ পার্টি নিয়ে বাড়ী তল্লাসী করব।'

দেবীবাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ডি সি এস বি অরুণবাবু খেলা দেখাতে অবতীর্ণ হলেন। তিনিও বেশ একটু ভঙ্গিমা করে এক পা সামনে এগিয়ে এসে তাঁর পিস্তলটা পকেট থেকে বার করে উর্ধে তুলে ধরলেন আর বীরদর্পে ঘোষণা করলেন, 'এই দেখুন, ম্যাগাজীনে ছ'টি কার্টিজ। আমিও সার্চ করতে যাচ্ছি।'

নিয়ম আছে সার্চ করতে যাওয়ার আগে পুলিশ অফিসাররা তাঁদের কাছে অস্ত্রাদি কী আছে তা দেখিয়ে যাবে এবং সঙ্গে যে কিছু নিচ্ছেন না তা বোঝাবার জন্য তাঁদের শরীরও সার্চ করতে বলে থাকেন।

যদি কোন বেআইনী জিনিষ গোপনে বাড়ীর কোন যায়গায় রেখে দিয়ে তারপর বাড়ী থেকেই তা উদ্ধার করেছে বলে প্রতি-পন্ন করতে চান, তবে তা তাঁরা অনায়াসে করতে পারেন। পি সি সরকার যদি হাজার লোককে বিমূঢ় করতে পারতেন, তবে সমস্ত বাড়ীটা পুলিশ দ্বারা বেষ্টিত হওয়ার পর যেখানে সব কিছুই তাদের পক্ষে ঘটানো সম্ভব ছিল, সেখানে এই ধরণের অভিনয়ে আমি অংশ গ্রহণ করতে চাইনি। পুলিশের এই খেলায় আমি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলাম। আমার ঔদাসীন্য তাদের যে যথেষ্ট নিরুৎসাহ করেছিল, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

ডি, সি, এস, বি মহাশয় এই রকম অবস্থাকে তাঁদের অনুকূলে আনবার জন্য এই ধরণের একটি প্রচেষ্টা করলেন। তিনি বেশ জোর গলায় আমাকে উপলক্ষ করে অভিযোগের সুরে বলতে লাগলেন, 'এই কটা বছর আপনি কি করেছেন? ছোট ছোট ছেলেদের বিভ্রান্ত করেছেন তাদের মাথা খেয়েছেন।' এই রকম প্রত্যক্ষ দোষারোপ হজম করে নেওয়ার কোন কারণ ছিল না। তাই বলে অতি বিপ্লবী কমবয়সী যুবক-দের মত তাঁকে আমার মত প্রবীণ লোকের পক্ষে অশোভন ভাষায় গালাগালি দেওয়াটাও প্রশংসনীয় নয় ভেবে আমি খুব গম্ভীর হয়ে গেলাম আর একটু কঠোর ভঙ্গী করে মুখ ঘুরিয়ে বসলাম। জয়েন্ট কমিশনার বুঝলেন কোথায় যেন একটু চালে ভুল হয়ে গেল, তাই তিনি অবস্থাটাকে সহজ করার জন্য প্রসঙ্গ বদলালেন। কমিশনার গলার সুর বদলে মোলায়ে ভদ্র করে আমাকে জিজ্ঞেস 'অনন্তবাবু, সকালে ঘুম থেকে আপনি কি খান?'

একজন ছোট অফিসারকে তুমি কাগজে কলমে নোট কর।

আমি বললাম, 'একটা ডিমের আর দুটো টোস্ট। চা আমি খাই না বোর্নভিটা।'

তারপর তিনি সেই অফিসারটিকে আমাকে শুনিয়ে 'মনে করে এই ব্যবস্থাটুকু করতে।

আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে জিগেস করলেন, 'আপনি বেড-টি না?'

আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে 'বেড-টি আমি খাই না। আমার বে ৭-৩০টায় দিলেই চলবে।'

জয়েন্ট কমিশনার মহাশয় এ জিগেস করে নিলেন দুপুরে, বিকে রাত্রে আমি কী খাই। তিনি তারপ বিনয়ের সাথে বললেন, 'আপনার ফোনটা কি একটু ব্যবহার করতে'

'খুব আনন্দের সঙ্গে।'

টেলিফোন আমার পাশেই তিনি উঠে এসে রিং করলেন কমিশ পুলিশ, লালবাজার। টেলিফোনে যা কথা হল, তা থেকে আমি ছিলাম, তা এই—প্রেসের লোক বাজারে কমিশনারের অফিসে বসে তাঁদের সার্চ করা আর কত বাকী, তাঁরা লালবাজারে পৌঁছাবেন।

উত্তরে জয়েন্ট কমিশনার বলে —এক ঘন্টা ভিতরে তাঁরা ফিরে য

তিনি তাঁর আসনে ফিরে পরমুহূর্তে তিনি [illegible] গেলেন রুম থেকে ফিরে [illegible] পুলিশদের করলেন, 'খাবার ঘরের আলমারীটা করবে। সেই আলমারীতে কাঁচের আচার, কাসুন্দি প্রভৃতি থাকত। কথ আলমারীর ভিতরে যে আ নেই, তা তিনি কি করে জানবেন তাঁর হুকুম, 'ওটাও সার্চ কর। পার্টির এইজন্য কিছু কাজ বেড়ে

সার্চ করতে যাওয়ার সময় উইটনেস পুলিশের নিতে হয়। বাড়ী সার্চ করবে নিয়মানুযায়ী সার্চ উইটনেস দেবেন। কিন্তু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়। তার প্রথমেই আমি তাঁদের বলে দিলাম, ব্যাপার সম্পূর্ণটা আপনাদের। অ সঙ্গে একটুও সহযোগিতা করব কাজেই সার্চ উইটনেস আমি দিলা অগত্যা সার্চ উইটনেস তাঁরাই এলেন। আমার সামনেই তাঁরা কী করলেন এবং সার্চ উইটনেস পাঠালেন। কলকাতার সব জায়গায় পুলিশের লোক থাকে। লোকালিটি কেউ আসতে চায়নি। মনে তাঁদেরই কোন একজন এজেন্টকে এসেছেন। তাকে দেখলাম, তা

র মোটেই মনে হলো না তিনি একজন
ূকৃত সার্চ উইটনেস। তিনিও
শের ভঙ্গিমায় আমার সামনে এসে
ন, 'আমাকে সার্চ করে দেখুন।' আমি
াল হেসে তাঁকে বললাম, 'এই সার্চের
ারে আমি সহযোগীতা করছি না।
শ তাঁদের নিজেদের দায়িত্বে এই
করছে। কাজেই আপনার যদি কিছু
থাকে, তবে তাঁদের কাছেই বলুন।'
ভদ্রলোক তখন পুলিশের কাছে তাঁর
ধাম, গ্রাম ইত্যাদি বললেন এবং
শও তা লিখে নিলেন। বোধহয়
র সময় তিনিও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন।
সার্চ হচ্ছিল, তখন আমি ও ক্রয়েন্ট
শনার বসবার ঘরে বসে ছিলাম।
মধ্যে জয়েন্ট কমিশনার লালবাজার
। আরো দুটি ফোন পান। ফোনের
বিষয় ছিল সাংবাদিকরা বসে আছেন,
ণে আপনারা আসছেন। কাজেই পুরো
সম্পূর্ণ করে আমাকে নিয়ে যাওয়া
ন্ত জয়েন্ট কমিশনার অপেক্ষা করতে
লেন না। জয়েন্ট কমিশনার নিজে
র রাইটিং ব্যুরো থেকে দুটো কলম ও
। সুলেখা কালীর দোয়াত নিতে
লন। দুটো টাইপ-রাইটার তাও যেন
া হয়—তাও বললেন। হলঘরে
র একটা লোহার আলমারীতে আমার
লাইসেন্স করা একটা দোনালা বন্দুক
। এই বন্দুকটাই নেওয়া হবে কি-না
কথাটাই তাঁরা পরামর্শ করে শেষ
ন্ত ঠিক করলো যে বন্দুকটা নেওয়া
না। বন্দুক না নেওয়ার পেছনে কি
ঢ় কারণ ছিল, তা বুঝতে আমার
। অসুবিধা হয়নি। আমাকে নন্
িটিক্যাল বানাতে হবে এবং মামলাটা
নন্ পলিটিক্যাল তা বিশেষ করে প্রমাণ
ত হবে। পুলিশের সব রিপোর্ট
ার অনুকূলে না থাকলে লাইসেন্স
া করা চলে না। এই সর্ববিদিত সত্য
টা সবার জানা, যে একজন অসাধু
িমন্যাল ব্যক্তিকে বন্দুকের লাইসেন্স
া চলে না। লালবাজারে প্রেসের
উদ্গ্রীব হয়ে বসে আছে আমার
রেস্টের সংবাদ জানার জন্য—আমার
তল্লাসী করে ও আমার বাড়ীতে কি
াইনী জিনিষ পাওয়া গেছে। একটা
সেন্স করা বন্দুক পাওয়া গেছে—এই
টা যদি পুলিশ কমিশনারকে সাংবাদিক-
বলতে হয় তবে সেটা পুলিশের পক্ষে
ই অসুবিধাজনক হোক তাই তাঁরা এই
ারটা কৌশলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা
েন।

তখন প্রায় সাড়ে আটটা বেজেছে।
াসী শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাকে
বাড়ীতে বসে থাকা আর চলছে না।
ন্ট কমিশনার অফ পুলিশ যাঁরা সার্চ
ছেন তাঁদের সার্চ করতে বলে, আমাকে
র বড় গাড়ীতে করে লালবাজারে নিয়ে
লেন। রাইফেলধারী পুলিশকে নিয়ে
নে দুটো জিপ, পেছনে একটা পুলিশ
আর মোটর সাইকেলে একজন পুলিশ
র্জেন্ট তাদের গাইড করেছিল।
[illegible] এসে

উপস্থিত হলেন। তিনতলার ডি
সি ডি ডি দেবী রায়ের অফিসে

আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখান থেকে
তাঁরা টেলিফোনে কী কথাবার্তা বললেন,
তারপর তাঁরা চলে গেলেন (মনে হলো
তাঁরা পুলিশ কমিশনারের ঘরে প্রেস
কনফারেন্সে গেলেন)। আমার বাড়ী থেকে
আমার দুজন কেরাণীকেও (অশোক সেন-
গুপ্ত ও শ্রীকানাই হাজরা) লালবাজারে
নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাদের বুঝতে
দেওয়া হয়নি যে, তাদেরও অ্যারেস্ট করে
নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। লালবাজারে আমার
সামনেই তাদের জিনিষপত্রের ফর্দ তৈরী করা
হল এবং তাদের পুলিশ হাজতে রাখার
আদেশ দিল। আমি তাদের বললাম,
'আপনাদের খুবই অন্যায় হয়েছে এইভাবে
না বলে তাদের এখানে এনে অ্যারেস্ট করে
হাজতে রাখা। ওদের বাড়ীর লোক
জানতেও পারবে না, যে ওরা কোথায়।'
পুলিশ আমার কথা ভ্রূক্ষেপও করলো না।
তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে কোন
রিপোর্টও ছিল না। অনন্ত সিং-এর
বাড়ীতে তারা ছিল—তাদের গ্রেপ্তার
করার এটাই ছিল যথেষ্ট কারণ। ইন্দ্রদেও
সিং (আমার ড্রাইভার) আমার জামা-
কাপড়, বিছানা, সুটকেশ প্রভৃতি নিয়ে
দেবী রায়ের অফিসে সেখানে আমি বসে-
ছিলাম সেখানে এলো। একজন যুবক সাব-
ইন্সপেক্টার (দিব্যেন্দুবাবু) যাঁকে মনে
হলো দেবীবাবুর অত্যন্ত প্রিয়জন, তিনিই
সব ফর্দ করে নিলেন। আমি কারো সঙ্গেই
তখন কথা বলছিলাম না। একজন
অফিসারও সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।
তাঁরা সবাই পুলিশ কমিশনার শ্রী পি কে
সেনের ঘরে প্রেস কনফারেন্সে গিয়ে-
ছিলেন। তখন রাত প্রায় সাড়ে দশটা।
আমার দুজন ক্ল্যার্ক কানাই ও অশোককে
নিয়ে চলে গেলে। ইন্দ্রদেও তখনও ছিল।
আমাকে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ হাজতঘরে
রাখার জন্য আদেশ দিল। সেখানে যাওয়ার
পরে যে ইনচার্জ তিনি আমার সঙ্গের মাল-
পত্রের হিসাব নিলেন এবং একজন সাব-
ইনস্পেক্টার তালার চাবি নিয়ে দোতলায়
একটি 'চারজনের সেল' খুললেন এবং
বিছানাপত্র সেখানে রেখে দিয়ে বললেন,
'আজকের মত এখানে আপনাকে রাত
কাটাতে হবে। কালকে কর্তারা ঠিক করবেন
আপনাকে কোথায় ..খা হবে।'

আমাকে যখন দেবীবাবুর ঘর থেকে
হাজত বিল্ডিংয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন
ইন্দ্রদেও খুব সন্তর্পণে পুলিশের চোখ
এড়িয়ে কেবল আমার শুনতে পাওয়ার মত
করে বলল, 'সুকুবাবুকেও এখানে নিয়ে
এসেছে, এখনো ছাড়েনি, কোথায়
রেখেছে জানিনা। আমি ইন্দ্রদেওকে বললাম
তুমি এভাবে ঝুঁকি নিয়ে আমার কিছু
ফিস্‌ফিস্ করে বলতে চেষ্টা করো না,
তোমাকেও আটকে রেখে দেব।' মনে হতে
পারে পুলিশ বেষ্টনীর মধ্যেও ইন্দ্রদেওর
এত সুযোগ ছিল কি করে? প্রথমতঃ আমি
যে কখনও গোপনে কোন চিঠিপত্র বা কোন
গোপন সংবাদ পাঠাই না পুলিশ তাদের
[illegible] থেকে তা [illegible] আর

দ্বিতীয় কথা হলো ইন্দ্রদেওকে পুলিশ
মোটেই সন্দেহ করত না। ইন্দ্রদেও অতীতে
একজন সরকারী পুলিশ ছিল। সে বর্ডার
সিকিউরিটি ফোর্সে নিযুক্ত ছিল। সেখানে
সে চোরাচালানের ব্যাপারে মিথ্যা অভিযুক্ত
হয়। প্রমাণের অভাবে তার সাজাও হলো না,
চাকরিও গেল না। কিন্তু পুলিশের চাকরি
করতে তার বিতৃষ্ণা ধরে গেল। তারপর
থেকে সে আমার কাছেই প্রায় সাত-আট বছর
ধরে চাকরি করছিল।

পুলিশ আমাকে এ্যারেস্ট করতে আমার
আগে সবরকম সংবাদই সংগ্রহ করেছিল।
আমার অন্য ড্রাইভার মদন পালকে তাঁরা
খুবই সন্দেহ করত, কারণ আগে যাদের
ধরে ছিল তাদের অনেকের কাছ
থেকেই মদন সম্পর্কে সন্দেহজনক
তথ্য সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু তারা
কেউই ইন্দ্রদেও সম্বন্ধে কোন প্রতিকূল
সংবাদ পুলিশকে দেয়নি। অতএব এই
অবস্থায় ইন্দ্রদেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাভাবিক
কারণে আমাকে সাহায্য করেছে।

অত বড় ঘরে আমি একা। আমি
দেখলাম মাত্র দুটো বালিশ আমার বিছানার
ওপরে রাখা হয়েছে। আমি প্রায় পনের-বিশ
বছর ধরে সাতটা বালিশ ব্যবহার করতাম
ডাক্তারের পরামর্শে আধশোয়া অবস্থায়
শুতাম বলে। দুটো বালিশ কি সাতটা
বালিশের অভাব মেটাতে পারে? আমি
অফিস ইনচার্জকে ডেকে বললাম, 'আমি
মশায় দুটো বালিশে কোন মতেই ঘুমোতে
পারবো না। আমার সাতটা বালিশ দিতে
বলুন।' তিনি পনের মিনিট বাদে কোথা
থেকে ঘুরে এসে আমাকে জানালেন, 'দেবী-
বাবুর নির্দেশ, তিনটে বালিশের বেশী
দেওয়া যাবে না। দুটো আপনাকে দেওয়া
হয়েছে, আমি আর একটা নিয়ে এলাম।' তখন
রাত সাড়ে বারোটা। ভাবলাম সে রাতে আর
কিছু করা যাবে না।'

আমি অগত্যা ঘুমিয়ে পড়লাম।
পাঠকবর্গের মনে হবে, এতসব দুশ্চিন্তা
নিয়ে কি ঘুম আসে? আমার ঘুম আসে।
আমার তালাবন্ধ সেলের সামনে একজন
সেপাই পাহারায় ছিল আর একজন সাব-
ইন্সপেকটারও নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি
এসে আমাকে নমস্কার দিয়ে বলেছিলেন,
'আমি কিন্তু আপনার দরজার সামনেই আছি
প্রয়োজন হলেই আমায় ডাকবেন কোন
সংকোচ করবেন না।' আমি তাকে ধন্যবাদ
দিয়ে জানিয়েছিলাম, 'যখন আপনার কাছে
আছি তখন প্রয়োজনে আপনাদের সাহায্য
আমায় নিতেই হবে।'

শীতের রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে
যখন উঠলাম তখন সাড়ে আটটা বেজে গেছে।
তখন আর সেই অফিসারকে দেখলাম না,
তাঁর জায়গায় অন্য আর একজন সার্জেন্ট
এসেছেন। আট ঘণ্টা অন্তর তাঁদের শিফ্‌ট
ডিউটি। ঘুম থেকে উঠেই আমি দেখি
ক্যান্টিন থেকে বোর্ণভিটা, ডিমের পোচ,
মাখন দিয়ে দুটো টোস্ট নিয়ে এসেছে।
(আমার বলা ছিল যে আমি গরম [illegible] স্নান
করি। তাই সে প্রটিও তাঁরা রাখেন নি। এর
বালতি [illegible]।

সেখানে কলের জল ছিল। পায়খানায় কোন কমোডের ব্যবস্থা ছিল না। আমার অসুস্থতার কারণবশতঃ আমায় কমোড ব্যবহার করতে হোত। কিন্তু এখন উপায় কি! আমাকে দাঁড়িয়েই পায়খানা সারতে হোল।

ক্যান্টিন থেকে খাবার এলো। সার্জেন্ট আমাকে বললেন, 'আপনি খেয়ে নিন্। আপনাকে কোর্টে যেতে হবে।' আমি খেয়ে নিলাম। পুলিশ ভ্যানে করে রবিবার দিন আমাকে চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের ঘরে হাজির করা হোল। তিনি আমাকে না দেখেই পুলিশ হেফাজতে রাখার জন্য আদেশ দিলেন। সেইদিন কয়েকজন চেনা-অচেনা উকীল উপস্থিত হলেন এবং আমাকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন, কিন্তু তাঁদের আবেদনে কিছুই হোল না। মাননীয় সি পি এম (চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট) আদেশ দিলেন যেন আমাকে পুলিশ হেফাজতে রেখে পুলিশ তাদের অনুসন্ধান চালায়।

সেদিন রবিবার ছিল। রবিবারে সাধারণতঃ কোর্টে লোকের ভিড় হয় না। কিন্তু যেহেতু সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সবাই খবরের কাগজে দেখলো 'অনন্ত সিং ডাকাতির দায়ে গ্রেপ্তার হয়েছে', তখন থেকেই জনসাধারণ উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল কতক্ষণে অনন্ত সিংকে তারা কোর্টে দেখতে পাবে। তাই পুলিশের সতর্কতা সত্ত্বেও ভীড় ঠেকানো গেল না।

আমার পক্ষে দাঁড়াবার জন্য দুজন অ্যাডভোকেট স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে গেলেন। সিনিয়র অ্যাডভোকেটের নাম ছিল মনোরঞ্জন বাবু। আরেকজনের নাম আমার এখন মনে পড়ছে না। মনোরঞ্জনবাবু আমাকে শারীরিক কারণে জামিনে মুক্তি দেওয়ার জন্য হাকিমের কাছে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু মাননীয় হাকিম তা অগ্রাহ্য করলেন। তাই আধ ঘন্টার মধ্যে কোর্টের কাজ শেষ হয়ে গেল, আর আমাকেও লালবাজারে ফিরিয়ে আনলো। হাজত ঘরে না নিয়ে আমাদের দেবীবাবুর অফিসঘরে নিয়ে বসালো। আমাকে চা দিল। তখন দেবীবাবু ও জয়েন্ট কমিশনার আমার সাথে কথা বলতে লাগলেন। তাদের কথা বলার মূল বিষয়বস্তু ছিল দশ। পনের বছর আগের ডাকাতির কথা বলা। কথাটা তুললেন এইভাবে—'আপনি তো আমাদের কোন কথার জবাব দেবেন না, তবে আপনাকেই আমরা বলি শুনুন। এই কলকাতা শহরে একটা ডাকাত দলের অক্ষয় কীর্তির কথা শুনুন। তারা ঠিক করল বিনা রক্তপাতে সোনা-রুপোর দোকান থেকে অন্তত পঞ্চাশ হাজার টাকার অলংকারাদি লোপাট করবে। কিন্তু তাদের সমস্ত প্ল্যানটা হবে যেন ডাকাতিটা। খুবই নিঃশব্দে হয়, একটা গুলিও ছুটবে না, একজনও খুন বা জখম হবে না। এইরকম ডাকাতি হওয়া সম্ভব যদি সেইরকম কোন দোকানের বিশদ খোঁজখবর থাকে। দেখুন মশায় আপনাকে আমরা কিছু বাড়িয়ে বলছি না। শুনলে আপনার সব ভৌতিক মনে হবে। ভৌতিক মনে হলেও বাস্তবে তার সবটাই সত্যি। সেই ডাকাত দলের চার-পাঁচ জনের স্বীকারোক্তি থেকে যাচাই করে নিয়ে এই তথ্য আপনাকে জানাচ্ছি। যে দোকানে ডাকাতি করবে ঠিক করেছিল, সেই দোকানটা ছিল ভবানীপুরে সিঙ্গার মেশিনের দোকানের পাশে। তাদের প্রথমে অনুসন্ধানের পালা চললো—এই দোকানে কটা আলমারী, কি-ভাবে এইসব লোহার আলমারী খোলা হয়, চাবি কোথায় রাখে, দোকানের মালিক ও কর্মচারী কয়জন, তারা ক'টার সময় দোকান বন্ধ করে আর বন্ধ করার পরে মালিক ও কর্মচারীরা কোন্ পথে তাদের বাড়ী যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব বিস্তারিত নিখুঁত সংবাদ তারা পনের-বিশ দিনে জোগাড় করতে পেরেছিল। নানা সময়ে তারা দোকানের সামনে দিয়ে ঘুরেছে। কেউ কেউ বিভিন্ন সময়ে দোকানে গিয়ে জিনিসপত্র কেনার ভান করেছে। সেই সময় দেখেছে অন্য গ্রাহকরা কে কী কিনেছে এবং মালিকরা কোন আলমারী থেকে কী ধরনের জিনিস বার করে দিয়েছে। তথ্য সংগ্রহ করে তারা দেখলো মালিক নিজে ও একজন কর্মচারী রাত্রে আটটা সাড়ে আটটার সময় দোকান বন্ধ করে। দুটো লোহার বার কোনাকুনি-ভাবে দরজার উপরে আঁটা থাকে আর দরজার আংটায় তালা দেওয়া থাকে। সবশুদ্ধ [illegible] সাতটা তালা ঝোলানো থাকে। এইসব তালার চাবিগুলো একটা রিং-এ গাঁথা থাকতো। সেই সাতটা চাবি ও ভিতরের আলমারীর সব চাবিগুলো একসঙ্গে বেঁধে একটা থলিতে পুরে নেয়। এখন মশায় শুনুন তারা এইসব খবর পাওয়ার পর ডাকাতের মত সোজাসুজি পিস্তল নিয়ে সন্ধ্যের সময় দোকানে ঢোকেনি। তারা ঠিক করলো এখানে ডাকাতি হওয়ার সময় কেউ টের পাবে না। সেইরকম একটা প্ল্যান উদ্ভাবন করে পরের ব্যবস্থাগুলো করলো।

দোকান বন্ধ করার পরে মালিক এক রাস্তায় যেত, কর্মচারিটা অন্য পথ ধরে তার গন্তব্য স্থানে যেত। এই ডাকাত দল ঠিক করেছিল এই দুজনকে তারা ধরে বেঁধে একটা গুপ্ত স্থানে নিয়ে আসবে। তারপর প্রায় সারা রাতই ঐ ঘরে তাঁদের বেঁধে রাখবে। আর এরই মধ্যে ওর দোকান রাত্রি-বেলা খুলে লুঠ করে নেবে। প্ল্যানটা শুনতে খুব সুন্দর মনে হচ্ছে। কিন্তু এই প্ল্যানটাকে বাস্তবে ঘটাতে কি দারুণ নিখুঁত প্ল্যান করতে হয়েছিল, তা শুনে একেবারে বিস্মিত হতে হয়।'

পুলিশ অফিসাররা এইভাবে ঘটনা বলতে বলতে আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলেন। আমি সাধারণ-ভাবেই তাঁদের দিকে তাকিয়েছিলাম-আমার কোন রকম প্রতিক্রিয়া তাঁরা দেখতে পান নি। তাঁরা আবার বিবরণ দিতে শুরু করলেন—কলকাতার রাস্তার উপর থেকে দুজনকে কিডন্যাপ করে আনতে অন্তত দুটো গাড়ী তো প্রয়োজনই। কিন্তু তাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্যে মাত্র দুটো পরিচিত গাড়ী ছিল। এই দুরূহ কাজে মাত্র দুটো গাড়ীর উপর নির্ভর করা তো চলে না, কারণ পথে যে কোন সময় গাড়ী বিগড়ে যেতে পারে। সেইজন্য তাদের প্রত্যেকটা গাড়ীর [illegible] আর একটা গাড়ী রাখা দরকার, [illegible] ঠিক করেছিল। ভেবে দেখুন কী [illegible] প্ল্যান তারা করেছিল। কিন্তু প্ল্যান [illegible] তো সব হয় না। গাড়ী কোথায় পাওয়া [illegible] একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড ভক্সল গাড়ী [illegible] বারোশ টাকা দিয়ে কেনে। পার্ক সা[illegible] একজন ডাক্তারের প্রাইভেট গাড়ী সন্ধ্যেবেলা প্রায় তিন-চার ঘন্টা ডিসপেন্সারীর সামনে দাঁড়ানো থা[illegible] সেটি অস্টিন গাড়ী। ঠিক হলো সন্ধ্যার [illegible] তারা এই গাড়ীটা চুরি করে নেবে [illegible] তার পর দিন রাত আটটার সময় [illegible] কিডন্যাপ করার জন্য ব্যবহার [illegible] ততক্ষণ নাম্বার প্লেট চেঞ্জ করে [illegible] রাখতে হবে। তাদের ভেতরে যে [illegible] গাড়ীটাকে নেবে, সে দু'একদিন আগে [illegible] গাড়ীতে উঠে বসেছে, দরজা খুলে দেখে[illegible] এইভাবে প্রাথমিক মহড়া শেষ করার পর [illegible] নির্ধারিত দিনে গাড়ীটা চালিয়ে [illegible] গেল।

তার পরদিন বরানগরে দুপুরে [illegible] গাড়ীটা নিয়ে সে যখন একা বসেছিল [illegible] সেই পাড়ার কয়েকটি ছেলে তার বসার [illegible] ও ধরণ দেখে তাকে প্রশ্ন করতে লাগ[illegible] তখন যদি সে মাথা ঠাণ্ডা রেখে তাদের [illegible] কথা বলত, তবে হয়ত [illegible] কিন্তু সে তাদের সঙ্গে চটাচটি করে, [illegible] পাড়ার ছেলেরা তখন তাকে থানায় [illegible] বাধ্য করে। থানায় তার গাড়ীর [illegible] নাম্বার প্লেট রং করার জন্য সাদা রং [illegible] পায়। এতে ওদের সন্দেহ বাড়ে। [illegible] দিন গাড়ী চুরির খবর সব থানায় জা[illegible] হয়েছিল। সেই কারণে এইটিও অস্টিন [illegible] দেখে পুলিশ নির্ঘাত ধরে নিয়েছিল এ[illegible] সেই চুরি যাওয়া গাড়ী। পুলিশের [illegible] অনুযায়ী কোন চুরি যাওয়া মোটরগাড়ী [illegible] পড়লে তার খবর লালবাজারে পাঠাতে [illegible] সেই ছেলেটাকে অ্যারেস্ট করে গাড়ী [illegible] তাকে লালবাজারে পাঠিয়ে দেয়। লালবাজা[illegible] ডি ডি পুলিশ এই ছেলেটাকে যথেষ্ট পরি[illegible] সন্দেহ করে, আর তাদের কায়দায় [illegible] কথাটা জানার জন্য তার উপর অত্যা[illegible] চালায়। সেই অত্যাচার অবশ্য খুব [illegible] নয়। সামান্য একটু সূঁচ-টুচ ফোটানো [illegible] পোড়া সিগারেট তার গায়ের বিভিন্ন [illegible] চেপেও ধরা হয়েছে, কিন্তু তার মুখ [illegible] একটা শব্দও বার হয়নি।"

আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস কর[illegible] 'সে এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করেনি?'

'প্রতিবাদ তো করেইনি, প্রতিবাদ [illegible] মত তার অবস্থাও ছিল না। সে আমাদের [illegible] প্রশ্নের উত্তরেই কেবল না, না, বলছিল। [illegible] পর্যন্ত তাকে উলঙ্গ অবস্থায় বরফের [illegible] শুইয়ে রাখা হয়। আশ্চর্য তবুও সে এক[illegible] কাঁপলো না, ঠোঁটও নড়লো না, [illegible] লাগলাম ক্রমেই সে সাদা হয়ে যাচ্ছি[illegible] তারপর একজন বৃদ্ধ পুলিশ অফিসারকে [illegible] বলল, 'আমি এই গাড়ীটার পার্টস [illegible] বিক্রি করতাম। এটাই আমার ব্যবসা। [illegible] সঙ্গে কেউ নেই, আমি একা।'

কে শেষ পর্যন্ত আমরা কড়ায়া পাঠিয়ে দিলাম যেন তারা তার রীতিমত মামলা চালায়। এইতো এই ছেলেটার কথা। তাদের দলের রও শুনুন—'ওদের দলে খবর চলে এর বিরুদ্ধে মামলা চালাবার জন্য দিয়ে আমরা তাকে কড়ায়া থানায় । থানা পর্যায়ে তাদের তৎপরতা ন যে কোন উপায়ে তাকে জামিনে করে নিয়ে যেতে পারে। হোলও তাই। ড়বাবু, ছোটবাবু প্রভৃতিকে ঘুষ র জন্য কোর্টে জামিনের দরখাস্ত করা থানার রিপোর্টের পরে তার জামিন রয়ছিল। থানা অফিসাররা ঘুষ নিয়ে ালো রিপোর্ট দিল : 'তার কোন স গাড়ী চুরি করেছে পার্টস বিক্রি না। হাকিম তাকে জামিনে মুক্তি । তাদের লোক কোর্টের ও থানার নচপত্রও বহন করেছিল। সবকিছু ও এই সবল, সুস্থ ছেলের টাই- ল। [illegible] সত্ত্বে চেষ্টা করে ওকে কে এম হাসপাতালে ভর্তি করল। দলে সক্ষম একজনের অভাব মেটানো সম্ভব হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ঐদিকে [illegible] টাকা নেই, [illegible] লোক নেই। এই রকম অবস্থাকে এই অভিনব কৌশলে ডাকাতি সম্পন্ন আর উপায় ছিল না।

[illegible] মশাই ওদের ডাকাতির কাণ্ডটা এই ডাকাতিতে সাহসের কাজে ছিলই, [illegible] থেকে বেশী ছিল কৌশল। [illegible] নয়, কৌশলে [illegible] তুলে নেওয়ার প্রয়োজন

টনার দিন সন্ধ্যা আটটার সময় ডাকাতে [illegible] প্যান্ট, কোট, টাই পরে ডাকাতার । ডাকাতদের হ্যাণ্ডব্যাগ আর স্কোপ নিল। দুজন ডাকাতার ওদের টো গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছিল। সাড়ে আটটার মধ্যে সেই দোকানের মার কর্মচারী দোকান থেকে বেরিয়ে পথে বাড়ী ফিরছিল। প্ল্যান ছিল ই ওদের বাড়ীর কাছের একটি গাড়ীর সা জিগ্যেস করবে। কাছাকাছি বাড়ীর জানাতো সবার পক্ষেই স্বাভাবিক। লিন মালিক তা জিগ্যেস করলো দের কাছ থেকে একই ধরনের উত্তর া নম্বরটা জানি, আমার বাড়ীর ডাক্তারবাবুরা উত্তর দিলেন, বেশ ভালই হোল। আসুন না আমার ঐ দিকেতো যাচ্ছি আপনাকে দেব।' ডাক্তারবাবুরা তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে তাদের তুলে নিল। ড়ী এগিয়ে চলছে এদিকে তখন আর ঠক শুরু হোল। তাদের এখন প্রধান দার দৃষ্টির অগোচরে দুজনকেই বিনা াড়ীর ভেতর সম্পূর্ণ নিজেদের আয়ত্তে ধে ফেলা। এর জন্য এ ব্যাপারের াগেই রিহার্সাল দিয়েছে। কখন কী সাইকোলজিক্যাল কথা বলবে তাও র নিয়েছিল। যেমনি পেছনের সীটে ডানদিকে মালিক উঠে বসলেন তখন ডাকতারবাবু একটি রিভলবার বার করে তার বুকের দিকে তাক করে ধরলেন। ডান হাতে রিভলবার ছিল কিন্তু হাতটা সামনের দিকে না বাড়িয়ে বুকে দিয়ে হাতটা আড়াল করে ছিল আর তার বাঁ হাতটা বাড়িয়ে তাঁকে ঠেলে ধরে রাখছিল যেন হঠাৎ রিভলবারটা ধরতে না পারে। এই সময়ে সামনের সীটে ড্রাইভারের বাঁদিকে যে বসে ছিল সে ঘুরে বসে প্রথমে বাঁ হাত ও পরে ডান হাত পেছনে নিয়ে হাতকড়া পরিয়ে দিল। তুলোর প্যাড দিয়ে আঁটা গগলস রেডি ছিল, সেটাও পরিয়ে দিল যেন সে রাস্তা চিনতে না পারে কোন্‌-দিক দিয়ে তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গাড়ীতে যে এত কাণ্ড হচ্ছে, তা যেন বাইরের লোকে দেখতে না পায়, তার জন্য গাড়ীর কাঁচে পালিশ করার ক্রীম লাগানো ছিল।

দুটো গাড়ী আলাদা আলাদা রাস্তা ধরে একটা নির্ধারিত বাড়ীর দিকে যাচ্ছিল। বুঝবেন মশায় তাদের খুব বাহাদুরী দিতে হয়, তারা বাড়ীটা ঠিক করেছিল খিদিরপুরে একটা বড় রাস্তার উপরে তাও আবার কলকাতার ডি সি পুলিশের বন্দর অফিসের ৩০।৪০ গজের মধ্যে। মস্ত বড় বাড়ী। ভাড়া প্রায় পাঁচ-ছয়শো টাকা হবে। বাড়ীর ডানপাশে দুটো তিনটে গাড়ী রাখার মত লম্বা একটা গ্যারাজ ছিল। গ্যারেজের দরজা বন্ধ করলে ভিতরে আর কিছু দেখা যায় না।

কর্মচারীকেও ঐরকম কৌশলে গাড়ীতে তুলে হাতে হাতকড়ি আর চোখে প্যাড লাগানো গগলস লাগিয়ে সেই বাড়ীতে নিয়ে এলো। সেই বাড়ীর একটা ঘরে দরজা জানলা বন্ধ করে আগে থেকেই তাদের রাখার ব্যবস্থা ছিল। বিভ্রাট হোল মালিককে যে গাড়ীতে করে আনা হচ্ছিল, সেই গাড়ীটা মাঝপথে বিগড়ে গেল। সেটাকে ফার্স্ট গিয়ারে চালানো হচ্ছিল। খুব কষ্টে গাড়ী ভিড় রাস্তা ছেড়ে যখন সার্কুলার রোডে এলো, তখন ঠিক হলো লোয়ার সার্কুলার রোডের উপর গাড়ী পরিবর্তন করে মালিককে পরিচিত একটা গাড়ীতে করে সেই বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা। কখনও পথচারী দু'একজনকে দেখা যাচ্ছে, দু-একটা গাড়ীও পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। ওদের দলপতি স্বয়ং সেখানে গাড়ী নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এক মুহূর্তে সিদ্ধান্ত করলেন এক-মুহূর্ত দেরী না করে সোজা তার গাড়ীতে মালিককে তুলে আনা হোক। সঙ্গে সঙ্গেই সেইমত কাজ হোল। দরজা খুলে তাঁকে সেই গাড়ীতে হাত ধরে নিয়ে আসা হোল। বিনা প্রতিবাদে তিনি চলে এলেন। এক মিনিট দেড় মিনিটে এই কাজটা সারা হয়েছিল। কোন লোক হঠাৎ দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে দেখতে চায়নি। কোন মোটর গাড়ীও দাঁড়িয়ে পড়েনি। কাজ সমাধা করেই তারা পূর্ব নির্ধারিত বাড়ীর দিকে চললো। বাড়ীর কাছে এসে তারা ডি ডি অফিসকে লক্ষ্য করে দেখলো সেখানে লোকজনের ব্যস্ততা আছে কিনা। সব শান্ত, তাদের বাড়ীটাও শান্ত। তারপর তারা হর্ন বাজিয়ে গ্যারাজে ঢুকলো। সাংকেতিক হর্ন আগে থেকে ঠিক করা ছিল।

গ্যারাজের ভিতরে গাড়ীটা ঢোকাবার পর গ্যারাজের দরজা বন্ধ করে দোকানের মালিককে তারা হাত ধরে নামালো। চোখ বন্ধ ছিল বলে তাঁর হাঁটতে খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। তাই তাঁকে হাত ধরে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যাচ্ছিল আর যাওয়ার সময় তার বিভ্রান্তি ঘটাবার জন্য তারা এইরকম বলছিল—'দেখুন পুকুরের ধার দিয়ে যাচ্ছেন। ডানদিক ঘেঁষে যাবেন। আসলে কিন্তু পুকুর ছিল না। একটু এগোবার পরে তার সামনে থেকে একটা কলা গাছের পাতা সরিয়ে দেওয়া হোল। এ সবই মিথ্যা। তারপর তাকে বলা হোল, 'চলুন সিঁড়ি ধরে একটু উপরে উঠতে হবে।' তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মত তাদের সঙ্গে সঙ্গে চললেন। তারপর এই বাড়ীর দুটো ঘর ঘুরিয়ে নিয়ে তাদের যে ঘরে থাকার কথা সেই ঘরে নিয়ে যাওয়া হোল। সেই ঘরে আগে থেকে তার কর্মচারী বন্দী ছিল। তাঁকে বলা হোল, 'এখানে আগে থেকেই আপনার কর্মচারী উপস্থিত আছেন। আপনি তো তাকে দেখতে পাচ্ছেন না তবে কথা শুনতে পারবেন, আপনারা কথা বলুন। তাঁদের চা, সিগারেট দেওয়া হোল। 'যা খেতে চান, তাই দেওয়া হবে'—এও বলা হোল; তবু তাঁরা খেতে চাইলেন না। দোকানের মালিক মনের আপেক্ষ জানাচ্ছিলেন, কারণ তাঁর কাছ থেকে তক্ষুনি দোকানের চাবিগুলো চেয়ে নেওয়া হয়েছিল আর তাঁকে বলা হয়েছিল, চাবিগুলো কাল ফেরত পাবেন।'

তিনি বড়লোক, তবে খুব বড়লোক তো নন। ডাকাতদের তাঁকে সর্বশান্ত করে ফেলার ইচ্ছে ছিল না। তারা তাঁকে বলেছিলেন, 'দেখুন, আপনার টাকা আমরা নিচ্ছি, কিন্তু যদি আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়, তবে আপনার এই টাকা আমরা ফেরত দিয়ে দেব।' উনি বুঝতেই পারছিলেন যে ডাকাতরা তাঁর সব টাকাই নিয়ে যাবে। তাই বুঝেও চুপ করেছিলেন।

যে কজনের সেই বাড়ীতে পাহারা দেবার কথা, তারা রইল, আর যে চাবি নিল সে চলে গেল।

দোকানের দরজা খোলা হবে রাত বারোটার পরে। দোকানের দরজা খোলার সময় কোন বিভ্রাট হোক, তা তারা চায়নি। সেইজন্য তারা কতকগুলো ব্যবস্থা নিয়েছিল। প্রথম ব্যবস্থা ছিল যেন দোকানের সামনের রকটাতে কোন অপরিচিতলোক শুয়ে না থাকে সেইজন্য নিজেদের একজন লোক শুয়ে থাকবে। যে শুয়ে থাকবে সে কিন্তু দরজা খুলবে না, কারণ সে তখনও চাবি পায়নি। রক ছাড়া রকের সামনে ফুটপাতেও মাঝে মাঝে দু'একজন লোক শুয়ে থাকতো। সেই জায়গাও খালি রাখার জন্য তারা গোবর ছড়িয়ে রেখেছিল। চাবি নিয়ে যাকে দেওয়া হবে, সেই দোকান খুলবে। সে ততক্ষণ কোথায় থাকবে। তার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল গাঁজা পার্কে। সে সেখানে শুয়ে থাকবে।

প্রায় রাত এগারোটার সময় গাঁজা পার্কে গিয়ে তাকে দরজা ও আলমারী খোলার চাবি দেওয়া হোল। সে টাইম অনুযায়ী দোকানের সামনে গিয়ে শুয়ে পড়লো, আর আগের

লোকটা উঠে চলে গেল। ক্রমশঃ রাস্তার গাড়ী চলা কমতে লাগলো আর আশপাশের লোকজনের নাক ডাকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। এখন সে দরজার বার আর সাতটা তালা খুলতে শুরু করবে। মাঝে মাঝে পুলিশ ভ্যান পাস করে যাচ্ছে। তবুও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে দরজার তালা খোলার কাজ শুরু হোল। উত্তর ও দক্ষিণ থেকে বড় রাস্তা ধরে যেসব গাড়ী আসছিল তা দূর থেকে দেখে আগে থেকে সাবধান হওয়া যায়, কিন্তু যদি কোন গাড়ী বিশেষত পুলিশের গাড়ী নন্দনরোড থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসে তবে সেটাকে কিভাবে সামাল দেয়া যাবে তাই নিয়ে তাদের একটু চিন্তা ছিল। তারা করলো কী একটা লাল-বাতী সমেত রোড ক্লোজার লাগিয়ে দিল। সেগুলো তাদের নিজেদের জিনিস ছিল। অতি সন্তর্পনে ও নির্বিঘ্নে তারা দরজা খোলার কাজ শেষ করেছিল। আলমারীর চাবিগুলো নিয়ে এবার সে দোকানের ভিতরে ঢুকলো। ঠিক ছিল সে একাই রাত পর্যন্ত ভেতরের সবকিছু অনুসন্ধান করে সোনা-দানা যা পাবে সব নিয়ে আসবে। আরো দুটো সমস্যা তাদের সামনে ছিল। একেকটা এলকার দোকানদাররা মিলে একজন দারোয়ান নিযুক্ত করত। এলগিন রোড শুরু করে পূর্ণ সিনেমার মোড় পর্যন্ত একজন দারোয়ান পাহাড়া দিত। উত্তর থেকে দক্ষিণ হয়ে ঘুরে আসতে তার সচরাচর ঘন্টা লাগতো। মাঝে মাঝে এর ব

দারোয়ানটা পূর্ণ সিনেমার মোড় থেকে ঘুরে আসতো। যেন সে আগে আসতে না পারে তার জন্য কোন রকম ছুতো করে তার বিলম্ব ঘটাবার জন্যে কৌশল নিয়েছিল, যে রাত এগারোটা সময় ক্যাংক রস থেকে একজন কনবে। সেই ওষুধ ও প্রেসক্রিপসন কটে রাখবে। প্রেসক্রিপসনে ঠিকানা হবে হাজরা রোডের কোন বাড়ীর। দারোয়ানটা পূর্ণ সিনেমা থেকে র দিকে হাঁটতে শুরু করে, তখন আশেপাশে তার পকেট থেকে কিছু রা রাস্তার ওপর ফেলে দেবে আর সঙ্গে এমন ভাব দেখাবে যেন কোন দামী আংটিও তার সাথে পড়ে গেছে। দেখবে সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে জিনিস-খুঁজছে। সে দারোয়ানকেও ডেকে ই একটু খুঁজে দাও। সত্যি এই চৌছিল আর দারোয়ানও সেই কৌশলে হয়েছিল।

ডাকাতদের দ্বিতীয় সমস্যা ছিল র মালিক ও কর্মচারী তাঁদের র বাড়ী ফিরছিল না বলে তাঁদের বাড়ী থেকেই দোকানে খোঁজ করতে পারে। এই সমস্যা থেকে উদ্ধার জন্য রাত দশটায় তারা তাদের দলের ক তাঁদের দুজনের বাড়ীতে পাঠিয়ে ল এই কথা বলতে যে, উনি বলে ন, আজ রাতে তাঁর বাড়ী ফিরতে হবে।'

নিশ্চিন্ত মনে দোকানের ভিতরে যে লা সে যে কটা আলমারী ছিল সবই দেখলো আর সোনা-দানা, টাকা-পয়সা ল তাই নিল। কিন্তু একটা আল-একটা ড্রয়ার সে কোন মতেই খুলতে না। তিনটে বাজলো। নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো। সে পোঁটলা নিয়ে এসে গাড়ীতে উঠলো। গাড়ী নিঃশব্দে গেল আরেকটা বাড়ীর উদ্দেশ্যে। জিনিসগুলো নামিয়ে দিয়ে গাড়ী ফিরে খিদিরপুরে এই বাড়ীতে। চোখে আঁটা অবস্থায় ওঁদের দুজনকেই এনে তোলা হোল। পেছনে তাদের বাঁধাই ছিল। একজন গাড়ী ছিল আর তার পাশে আর একজন ল। তাদের কারো সঙ্গেই কোন আগ্নে-ছিল না। রাত চারটের সময় গাড়ী লেকের দিকে। লেকের উত্তর দিকের একটি কোণায় তাঁদের দুজনকে নামিয়ে হোল। দুজনকে একসঙ্গে দাঁড় করিয়ে হাতে হাত কড়ার চাবি দিয়ে দেওয়া যেন নিজেরা খুলে নেয়। আর একটা করে দোকানের চাবি তাঁদের ফেরত হোল। বিদায়কালে তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল এবং আবার বলল, দের কাজ সফল হলে আপনার সব ই ফেরত দেব।' তখনও তাঁরা ভয়ে ছলেন। কথা বলতে পারছিলেন না। অবস্থায় তাঁদের সেখানে রেখে তারা নিয়ে চম্পট দিল। পুলিশ যখন খবর তাঁদের দোকানে ও বাড়ীতে গেল, তখনও তাঁদের পুরো জ্ঞান ফিরে আসেনি। তখনও তারা সব কথা গুছিয়ে বলতে পারছিলেন না।' এতক্ষণ যা বললাম তার কিছুটা অনুমোদন তাদের কাছে পেয়েছি। কোথায়, কোন্ বাড়ীতে তাঁদের বেঁধে রাখা হয়েছিল তার কোন সন্ধানই তাঁরা দিতে পারেন নি।

দেখুন মশাই এতক্ষণ আপনাকে গল্প বললাম। আমাদের যে কী সুস্পষ্ট ধারণা তা এখন আপনাকে জানাচ্ছি। এই ধরনের ডাকাতির খবর আমরা আগে কখন শুনিনি। আমাদের পুলিশের ফাইলে এই রকম রেকর্ড আর একটিও নেই। কে সেই ডাকাত-সর্দার? আমাদের সবারই সুচিন্তিত অভিমত যে এই ডাকাত দলের নায়ক আপনি। তারা সবাই আপনার নামই বলেছিল। আমাদেরও বিশ্বাস আপনি ছাড়া এইরকম বিচক্ষণতার সঙ্গে এই ডাকাতি আর কেউ সম্পন্ন করতে পারতো না। আপনি কি অস্বীকার করবেন?

যেভাবে তাঁরা গল্প শুরু করেছিলেন তাতে আমার মনে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত হয়ত এমনি প্রশ্ন করেই তাঁদের বক্তব্য রাখবেন। তাঁদের মুখে শেষের কথাগুলো শুনে আমি ভিতরে ভিতরে খুবই চটেছিলাম, কিন্তু তা নিয়ে বাকবিতণ্ডা করার কোন অভিপ্রায়ই আমার ছিল না। আমি কেবলমাত্র তাঁদের বললাম, 'নিজের নিজের ধারণা নিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে, তা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।' তাঁরা বললেন, 'প্রায় দশপনের বছর আগের ঘটনার সম্বন্ধে আমাদের অর্থাৎ পুলিশের কোন উৎসাহ নেই। তা তো শেষ হয়েছে। বর্তমানের বড় বড় ডাকাতি ও দুঃসাহসিক-পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমাদের জানা বাকী আছে। সেই সম্বন্ধে আপনি আমাদের কিছু বলুন। আপনার কাছ থেকে জোর-জবরদস্তি করে কিছু জানতে চাই না। স্বেচ্ছায় আপনি যতটুকু জানাবেন, তা নিয়েই আমরা আপাতত সন্তুষ্ট থাকবো।' আমি তাঁদের দুজনের দিকে আড়চোখে তাকালাম। তারপর ধীর কন্ঠে বললাম, 'শুনুন, আপনারা আপনাদের ধারণা নির্ভুল মনে করে বসে থাকতে পারেন, তাতে আমার কিছু করার নেই। আপনাদের সন্তুষ্টির জন্য 'হ্যাঁ' ও বলব না, 'না'-ও বলব না।'

তাদের ভিতরে একজন বললেন, 'আপনি স্বীকার করছেন, তা যদি ধরে নিই, তাহলে কি তা আমাদের পক্ষে ভুল হবে?'

'সে অবশ্য আপনাদের ইচ্ছা। তার ওপর আমার হাত নেই।'

'এই কথা যে অতি সত্যি, তা আপনি বুঝতে পারছেন। আপনি মুখে অস্বীকার করলে তা করতে পারেন। আমরা সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে আপনার কৃতিত্ব সম্বন্ধে একটি সঠিক মূল্যায়ণবোধ আছে বলেই পার্ক স্ট্রীট পোস্ট অফিসের ডাকাতি সকালে অফিসের সময় দু-তিন মিনিটে ঘটে গেল আর পারক্ স্ট্রীট থানা একশ গজের ভিতরে থাকা সত্বেও কিছু করতে পারলো না। তারপর যে রাস্তা ধরে ডাকাত দলের গাড়ী উধাও হয়ে গেল, সে পথে পুলিশ ভ্যান তাদের বাধা দিতে পারলো না। চার লক্ষ টাকা নিয়ে চলে গেল আর সামালও দিয়ে রেখেছে। এইসব ভাবতে গিয়ে আমাদের দৃঢ় ধারণা এই ডাকাতিটা আপনার পরিচালনায় ঘটেছে।'

তারপর তাঁরা স্বগোক্তি করতে লাগলেন, 'অদ্ভুত আপনার পরিকল্পনা, অদ্ভুত আপনার ট্রেনিং। আমরা পুলিশ হতে পারি, তবু আপনাকে আমরা আপনার দক্ষতার জন্যে শত-সহস্র নমস্কার জানাই। ইচ্ছে করে আপনার মাথাটা কেটে পরীক্ষা করে দেখি, ঐ মাথায় কী আছে। দেখুন, আপনি আমাদের কাছে স্বীকার করুন আর না-ই করুন, তাতে মোকদ্দমাতে কিছুই হচ্ছে না। আমরা কেবল আপনার কাছে জানতে চাইছি এই ডাকাতির পরিচালক আপনি ছিলেন কি-না। আমরা এটি কাগজ-পত্রে লিখে নিচ্ছি না, কেবল আপনার মুখের কথায় জেনে নিতে চাই।'

'আমার মুখের কথা না পেলেও আপনাদের কাজের কোন অসুবিধা হবে না। আপনারা নিজেদের বুদ্ধিতে কাজ করে যান। গীতায় বলেছে মা ফলেষু কদাচন।'

তাঁরা হতাশায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

'আপনি যে অনমনীয় ভাব নেবেন, তা আমরা জানতাম। কিন্তু অনন্তবাবু, বোধহয় ভালো করলেন না। যদি তদন্তের সময় আপনি আমাদের সাহায্য করতেন, তবে হয়ত অনেক নির্দোষ ব্যক্তি ও অনেক নিরীহ আত্মীয় স্বজন পুলিশের হাত থেকে রেহাই পেত। সবগুলো প্রমাণ নিয়েই অনুসন্ধান করি, তা নয়; প্রমাণ পাওয়ার জন্যই অনুসন্ধান করি। সেই ক্ষেত্রে আপনার সাহায্য পেলে আমরা অনায়াসে নির্দোষ ব্যক্তি বা আত্মীয়-স্বজনকে বাদ দিতে পারতাম। সেইজন্যই বিশেষ করে আপনাকে অনুরোধ জানিয়েছি 'আপনি আমাদের সাথে সহযোগিতা করুন, তবে বলতে পারি, এই ডাকাতি মামলা-গুলির সমাপ্তি খুব সহজে ঘটবে। অন্যথায় আমাদের কোন কোন বিষয়ে ত্রুটি থাকবে আর আমাদের কর্তব্য পালন করার সময় অনেকে হয়ত কষ্ট পাবে।'

অতঃপর আমার বক্তব্য আমি খুব জোরের সঙ্গেই তাদের শোনালাম, 'শত্রুর সঙ্গে আমি হাত মিলিয়ে চলতে চাই না। আপনারা আপনাদের সৎ-বুদ্ধির ওপরে নির্ভর করে চলবেন। অকারণে উৎপাত করবেন না, আর কোনমতেই কারো উপর শারীরিক অত্যাচার করবেন না। আপনাদের সুবুদ্ধি হবে কি-না জানি না। তবে সর্বশক্তিমান ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন।'

(চলবে)

বাঘা ক্রিকেটার পাতৌদি

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

।। এগারো ।।

একত্রিশ রান এগিয়ে থাকা মোটেই যথেষ্ট নয়।

লরি, সিম্পসন আর কাউপার দারুণ খেললো। লরি-সিম্পসন দলের সূচনা করে ৫৯ রান তোলার পর সুর্তি দ্বিতীয় বার বল করতে এলেন। জোরে না করে এবার শুরু করলেন স্পিন করাতে। ফলও পেলেন হাতে হাতে। সিম্পসন সুর্তির একটা বল ঠিক মত মারতে না পেরে সোজাসুজি তুলে দিলেন হনুমন্ত সিংয়ের হাতে।

কাউপার এসেই পিটোতে শুরু করলেন। সেশনের খেলা যখন শেষ হল তখন স্কোর বোর্ডে অস্ট্রেলিয়ার রান এক উইকেটে ১১২। মাত্র ৪৮ মিনিটে লরি আর কাউপার ৫৩ রান যোগ করেছেন। এর মধ্যে ৪০ রানই উঠলো বাউণ্ডারি থেকে। অর্থাৎ হাতে আটটি (অসুস্থ ওনীলকে বাদ দিয়ে) উইকেট হাতে নিয়ে অস্ট্রেলিয়া তখন ৯১ রানে এগিয়ে। তৃতীয় দিনের সন্ধ্যে বেলায় মনে হচ্ছিল খেলা যেন অস্ট্রেলিয়ার দিকেই ঝুঁকে পড়ছে।

কিন্তু চতুর্থ দিন সকালে খেলা আরম্ভ হবার পর মিনিট পনেরো গড়াতে না গড়াতেই পরিস্থিতি বদলে গেল পুরোপুরি ভাবে। খেলার চেহারা পাল্টে গেল একদম। চন্দ্রশেখরের তখন ভয়ংকর মূর্তি। লরিকে এল-বি-ডবল্যু করে দেবার দু বল পরেই তিনি বার্জকে আউট করে দিলেন। অস্ট্রেলিয়ার তখন তিন উইকেটে ১২১।

বুথ আর কাউপার তখন সব দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে লড়ছেন। বুথ একবার চন্দ্রশেখরের বলে খোঁচা লাগিয়েছিলেন। কিন্তু বলটা বোরদের আঙুলে লেগে থার্ড ম্যানের দিকে চলে যায়। আউট হতে হতে বেঁচে গিয়ে বুথ দারুণ খেলছিল। মধ্যাহ্ন ভোজের পরেও দুজনে খেলে রান তুলতে লাগলেন।

পাতৌদি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন বুথ-কাউপারের জুটি ভাঙতে। কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠছেন না। শেষ কালে বল তুলে দিলেন নাদকার্নীর হাতে। কাউপার নাদকার্নীর একটা বল সিলি মিড-অনের দিকে খেললেন। বলটা সামান্য উঁচু হয়ে গেল। কিন্তু সেখানে কেউ নেই। তাই দেখে উইকেটরক্ষক ইন্দ্রজিৎ সিং পড়িমরি করে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বলটা মাটি ছোঁয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে তুলে নিলেন হাতে। কাউপার আউট।

অন্যদিক থেকে পাতৌদি পাঠিয়েছেন চন্দ্রশেখরকে। নতুন ব্যাটসম্যান জারম্যান আসতে না আসতেই চন্দ্র একটি গুগলী ছাড়লেন। তারপরই টপ স্পিনে ফিরিয়ে দিলেন ভিভার্সকে। রানের মুখ দেখার আগেই দুজনে ফিরে গেলেন। বাকী কাজটুকু সারলেন নাদকার্নী। বুথ ধরা পড়লেন ইন্দ্রজিৎ সিংয়ের হাতে। মার্টিন আর ম্যাকেঞ্জি—দুজনেই ইউকেটের কাছে ধরা পড়লেন সুর্তির হাতে। তিন উইকেটে ২৪৬ থেকে অস্ট্রেলিয়ার রান গিয়ে দাঁড়ালো নয় উইকেটে ২৭৪।

জেতার জন্যে ভারতের তখন দরকার ২৫৪ রান। চতুর্থ ইনিংসে ঐ রান করা খুব সহজ নয়। তার ওপর আছে অস্ট্রেলিয়ার দুরন্ত ফাস্ট-বোলিং। অর্থাৎ জয়ের সম্ভাবনা তখন দু দলের সামনেই।

জয়সীমা ও সরদেশাই ভারতের ইনিংস শুরু করলেন। কিন্তু ফাস্ট বোলার কনোলী তখন দারুণ বল করছেন। যেমন জোর, তেমনি লেংথ। ম্যাকেঞ্জির থেকেও জোরে বল করছিলেন তিনি। যা ভাবা গিয়েছিল ঠিক তাই হল। কনোলীর একটি বলে খোঁচা লাগালেন জয়সীমা। বল চলে গেল সোজা জারম্যান-এর হাতে। দুই ব্যাটসম্যানের কেউই তখন রান করতে পারেননি। মাত্র চার রান বোর্ডে। তাও বাইয়ের উপহার।

দুরানী এলেন। কিন্তু তাঁর মারকুটে মনোভাব আর বেপরোয়া ব্যাট চালানো চল্লিশ হাজার দর্শকের বুকের ধুপ-ধুপুনি বাড়িয়ে দিল আচম্বিতে। মারতে গিয়ে বার বার ফস্কাতে লাগলেন তিনি। কিন্তু অন্য প্রান্তে সরদেশাই ধীর স্থির। অত্যন্ত সংযতভাবে খেলছেন তিনি। ভালোভাবেই জানেন, সেই মুহূর্তে দলের সব দায়িত্ব তাঁর কাঁধে।

রান উঠতে লাগলো ধীরে ধীরে। অবশ্য তাতে ক্ষতি নেই। উইকেট না পড়লেই হল। সামনে আছে পঞ্চম দিনের পুরো সময়। দেখতে দেখতে সত্তরের ওপর উঠে গেল রান। চতুর্থ দিনের খেলা শেষ হয় হয়। দুরানীর তখন ৩১ রান। সিম্পসনের একটি বলে আচমকা ব্যাট চালালেন লাইনে না গিয়ে। বলটি তাঁর ব্যাটে লেগে স্লিপে কাউপারের হাতে চলে গেল।

নৈশ প্রহরী হিসেবে মাঠে নামলেন নাদকার্নী। ঐ কাজে নাদকার্নী সিদ্ধহস্ত। কিন্তু কি যে হল ভিভার্সের একটা বল তাঁর ব্যাটে লেগে স্লিপে ক্যাচ হয়ে গেল। সুর্তি গ্রহণ করলেন দ্বিতীয় নৈশ প্রহরীর ভূমিকা। এবং বাকী সময়টা কাটিয়েও দিলেন। দিনের শেষে ভারতের রান তিন উইকেটে ৭৪ রান। সারদেশাই ৩৬ রানে অপরাজিত। তাঁর সঙ্গে সুর্তি। ভারতের অবস্থা মোটেই ভালো নয়। ...লিয়া রীতিমত কোণঠাসা করে ভারতকে। জেতার জন্যে ভারতকে ক... আরো ১৮০ রান। হাতে অবশ্য এখ... সাতটি উইকেট আছে। কিন্তু ... অস্ট্রেলিয়ার বোলাররাও যে জ... আপ্রাণ চেষ্টা করবেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

সেদিন অকটোবর মাসের ১৫ সকাল থেকেই ব্রাবোর্ন স্টেডিয়া... আশা-নিরাশার দোলায় দুলছে সক... সমস্ত মাঠে কি হবে, কি হবে ভা... কি ভারত জিততে?

সরদেশাই যখন সুর্তিকে ... মাঠে নামলেন চল্লিশ হাজার ... ধ্বনিতে তখন মাঠ মুখর। দলের ... মাথায় সুর্তি ভিভার্সের বলে ... ধরা পড়লেন বুথের হাতে। হনুমন্ত... যোগ দিলেন সরদেশাইয়ের সঙ্গে। এ... সরদেশাই পূর্ণ করলেন তাঁর ... অর্ধশত রান। তারপরই সিম্পসন ... দিলেন ম্যাকেঞ্জির হাতে। সিম... চাইছিলেন তাই হল। ম্যাকে... বিলম্বিত সুইং বলে ... মানলেন ... এল বি ডবল্যু ... গেলেন তি... রান তখন ১১৩। এবং না রান পরেই উড়িয়ে দিলেন হনুমন্ত সিং... স্টাম্প। ভারতের রান তখন ৬ ... ১২২। জয় ১৩২ রান দূরে। হা... মাত্র চারটি উইকেট।

এবং অসম্ভবকে সম্ভব কর... প্রতিজ্ঞ তরুণ অধিনায়ক পাতৌ... তখন উইকেটে অভিজ্ঞ বর্ষীয়া... মঞ্জরেকার।

শুরু হল ব্যাট বলের এ... লড়াই। ভারতের ক্রিকেট ইতিহ... স্মরণীয় মুহূর্ত। এক দিকে পা... দিকে মঞ্জরেকার। দলের পুরো দা... তাঁদের কাঁধে। কারণ বোরদে ... কোন ব্যাটসম্যানই তখন বাকী নেই

পাতৌদি দু দুবার ক্যাচ ত... গেলেন। স্লিপে তাঁকে ... সিম্পসন। সিম্পসন নিজেই ... করতে পারছিলেন না যে তিনি ক...

ছন। আউট হতে হতে বেঁচে গিয়ে
দি দারুণ খেলতে লাগলেন; মঞ্জ-
ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। লাঞ্চের সময় ভারতের
১৬৬।

মাঠে তখন প্রচণ্ড উত্তেজনা। পাতৌদি ও
কার রানের পর রান তুলছেন। ধীরে
জয়ের পথে এগিয়ে চলেছে ভারত।
দের আঙুলে কামড়াচ্ছেন। বার বার
র বদলেও কিছু করতে পারছেন না
ভাবলেন নতুন বলই বোধহয় একমাত্র
নতুন বলেই এই জুটি ভাঙা যাবে,
র ভারতের মুঠোর মধ্যে থেকে জয়
য় নেওয়া যাবে। কিন্তু তার জন্যে
া করতে হবে ২০০ রান পর্যন্ত।
পাতৌদি আর মঞ্জরেকার এক সময়
ভারতের রানকে দুশর গণ্ডী পার করে
দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই সিম্পসন নিলেন নতুন
বল। কনোলী ও ম্যাকেঞ্জির বলে তখন
আগুন। তাঁদের যতো শক্তি, যতো ক্ষমতা
সবই উজাড় করে দিচ্ছেন। কিন্তু পাতৌদি
কিম্বা মঞ্জরেকারকে টলাতে পারলেন না
এতোটুকুও। চা-পানের সময় ভারতের রান
উঠলো ২১৫। জেতার জন্যে চাই আর মাত্র
৩৯ রান। ভারত এসে পৌঁছেছে জয়ের দোর-
গোড়ায়।

চা-পানের পর আচমকাই ঘুরে গেল
খেলার মোড়। এই বিরতিগুলিই এক-এক
সময় বড় মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়। এবারও
হলো ঠিক তাই। কনোলীর একটা বল মঞ্জ-
রেকারের ব্যাট ছুঁয়ে চলে গেল স্লিপে
সিম্পসনের হাতে। বোরদে যোগ দিলেন
পাতৌদির সঙ্গে। তারপরেই পাতৌদি
কনোলীর একটি বল স্কোয়ার কাট করলেন।
বুলেটের মতো বলটা ছুটে গেল ব্যাটে লাগার
পর। সকলের চোখ তখন বাউন্ডারির দিকে।
কিন্তু বার্জ ঝাঁপিয়ে পড়ে এক হাত দিয়ে
বলা তুলে দেবার পর অন্য হাত দিয়ে
সেটা ধরে ফেললেন।

অবাক হয়ে পাতৌদি তাকিয়ে রইলেন
সেইদিকে। তারপর ধরলেন প্যাভেলিয়নের
পথ। ভারতের রান তখন আট উইকেটে
২২৪। ইন্দ্রজিৎ সিং খেলতে এলেন
বোরদের সঙ্গে। প্যাভেলিয়নে তখন বসে
আছেন শুধু চন্দ্রশেখর।

(চলবে)

...তীয় ভলিবল

কলকাতার নেতাজী ইনডোর
য়ামে ২৬তম জাতীয় ভলিবল প্রতি-
ার আসর বসেছিল। খেলা হয়েছিল
এবং নকআউট প্রথায়। প্রতিযোগিতায়
গ্রহণকারী দলগুলি চারটি গ্রুপে ভাগ
প্রথমে লীগ প্রথায় খেলেছিল এবং
গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ
নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার
া তৈরী হয়। এই কোয়ার্টার ফাইনাল
নকআউট প্রথায় খেলা হয়।

পুরুষ বিভাগের লীগের খেলায় এ
থেকে সার্ভিসেস (গতবারের বিজয়ী)
জরাট বি গ্রুপ থেকে রেলওয়ে
রের রানার্স-আপ) ও তামিলনাড়ু,
ুপ থেকে রাজস্থান ও বিহার এবং
পে থেকে পাঞ্জাব ও বাংলা কোয়ার্টার
লে উঠেছিল। কোয়ার্টার ফাইনাল
সার্ভিসেস বাংলাকে, পাঞ্জাব
টকে, রাজস্থান রেলওয়েকে এবং
নাড়ু বিহারকে হারিয়ে সেমি-
লে উঠেছিল। সেমি-ফাইনালে
ন ১৫—২, ১৫—৩, ১১—১৫ ও
১১ পয়েণ্টে গতবারের চ্যাম্পিয়ান
সস দলকে হারিয়ে বিরাট অঘটন
ছিল। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে
৪—১৫, ১৫—৫, ১৫—৫,
১৫ ও ১৫—৪ পয়েণ্টে তামিল-
ক পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

পুরুষ বিভাগের ফাইনালে পাঞ্জাব
১২, ৫—১৫, ১৫—৭ ও ১৫—৭
ট (অর্থাৎ (৩—১ সেটে) রাজ-
ক হারিয়ে মোট সাতবার পুরুষদের
জয়ের গৌরব লাভ করে। অপরদিকে
ানের ফাইনালে খেলা এই প্রথম।
ান কোয়ার্টার ফাইনালে গতবারের
-আপ রেল দল এবং সেমি-
লে গতবারের বিজয়ী সার্ভিসেস
হারিয়ে দারুন চাঞ্চল্য সৃষ্টি
ল। ফাইনালে কিন্তু তারা ঝিমিয়ে

মহিলা বিভাগের লীগের খেলায় এ
থেকে বাংলা (গতবারের বিজয়ী) ও
দিল্লী, বি গ্রুপ থেকে কেরল (গতবারের
রানার্স-আপ) ও পাঞ্জাব, সি গ্রুপ থেকে
তামিলনাড়ু ও হিমাচল প্রদেশ এবং ডি
গ্রুপ থেকে রেলওয়ে ও অন্ধ্রপ্রদেশ
কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল। কোয়ার্টার
ফাইনালের নকআউট খেলায় বাংলা অন্ধ্র
প্রদেশকে, রেলওয়ে দিল্লীকে, কেরল
হিমাচল প্রদেশকে এবং তামিলনাড়ু
পাঞ্জাবকে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে
উঠেছিল। সেমি-ফাইনালে বাংলা ১৫—৩,
১৫—৮ ও ১৫—০ পয়েণ্টে তামিলনাড়ুকে
এবং রেল দল ১৫—৫, ১৫—৩ ও
১৫—৫ পয়েণ্টে গতবারের রানার্স-আপ
কেরলকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

মহিলা বিভাগের ফাইনালে রেল দল
৮—১৫, ৪—১৫, ১৫—১০, ১৫—৯ ও
১৫—৫ পয়েণ্টে (অর্থাৎ ৩—২ সেটে)
গতবারের চ্যাম্পিয়ান বাংলাকে পরাজিত
করে মহিলা বিভাগের খেতাব জয়ী হয়।
এখানে উল্লেখ্য, মহিলা বিভাগের খেলায়
রেল দলের যোগদান এই প্রথম। রেল দলের
প্রায় গোটা দলটাই গতবারের চ্যাম্পিয়ান
বাংলা দলের খেলোয়াড় নিয়ে তৈরী।
এবারের বাংলা দলে গতবারের চ্যাম্পিয়ান
বাংলা দলের মাত্র তিনজন খেলোয়াড় ছিল—
মিতা ঘোষ, বুলা ঘোষ এবং সুমিতা দেব।
বাকি সব নতুন খেলোয়াড়। তবুও বাংলা
একশ মিনিট লড়াই করে। ফাইনালের প্রথম
দুটো সেটে জিতে বাংলা ২—০ সেটে
এগিয়ে থেকেও শেষরক্ষা করতে পারেনি।
রেল দল দুটো সেটে পিছিয়ে থেকে পর
পর তিনটে সেটে জিতে খেতাব জয়ী হয়।
বিজয়ী রেল দলের একজন বাদে সকলেই
ছিলেন বাঙালী।

চূড়ান্ত ফলাফল

পুরুষ বিভাগ : ১ম পাঞ্জাব, ২য় রাজস্থান, ৩য় তামিলনাড়ু ও ৪র্থ সার্ভিসেস।

মহিলা বিভাগে : ১ম রেল, ২য় বাংলা, ৩য় কেরল ও ৪র্থ তামিলনাড়ু।

বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতা

আর্জেণ্টিনার বুয়েনাস এয়ার্সে
আগামী মার্চ ১৮ তারিখে চতুর্থ বিশ্ব
হকি কাপ প্রতিযোগিতার আসর বসছে।
এই আসরে ১৪টি দেশ সমান দুভাগ হয়ে
প্রথমে লীগ প্রথায় খেলবে। লীগের ১নং
গ্রুপে খেলবে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, বেল-
জিয়াম, কানাডা, ইংল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড এবং
পশ্চিম জার্মানী। অপরদিকে ২নং গ্রুপে
খেলবে পাকিস্তান, আর্জেণ্টিনা, হল্যাণ্ড,
আয়ারল্যাণ্ড, ইতালী, মালয়েশিয়া এবং
স্পেন।

১৯৭৬ সালের অলিম্পিক হকির
স্বর্ণ পদক বিজয়ী নিউজিল্যাণ্ড চতুর্থ
বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ
করেনি। তারা ঠিক করেছে প্রতিযোগিতায়
যোগদান করলে যে খরচ হত সেটা দেশের
হকি খেলার উন্নতিকল্পে ব্যয় করবে।
১৯৭৬ সালের অলিম্পিক হকিতে রৌপ্য
পদক পেয়েছিল অস্ট্রেলিয়া এবং ব্রোঞ্জ
পদক পাকিস্তান। রোমের 'ইণ্টার-
কণ্টিনেণ্টাল কাপ' প্রতিযোগিতায় অংশ
গ্রহণ করে রাশিয়া চতুর্থ বিশ্ব হকি কাপে
খেলবার যোগ্যতা লাভ করেও শেষ পর্যন্ত
কোন কারণ না দেখিয়ে যোগদান করবে না
ঠিক করে। নিউজিল্যাণ্ড এবং রাশিয়ার
শূন্যস্থান পূরণ করেছে ইতালী এবং
কানাডা। রোমে এই দুই দেশ যথাক্রমে
৫ম এবং ৬ষ্ঠ স্থান পেয়েছিল।

কুয়ালালামপুরে গত তৃতীয় বিশ্ব
হকি কাপ প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ পদক
পেয়েছিল ভারত এবং রৌপ্য পদক
পাকিস্তান। বর্তমানে পাকিস্তান যে অনেক
শক্তিশালী তা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ভারত
বনাম পাকিস্তানের হকি টেস্ট সিরিজে
প্রমাণিত হয়েছে। পাকিস্তান বোম্বাইয়ের
১ম টেস্টে ২—১, বাঙ্গালোরের ২য় টেস্টে
৩—২ এবং করাচীর ৩য় টেস্টে ৬—০
গোলে জয়ী হয়। সিরিজের শেষ ৪র্থ
টেস্টে ভারত ২—১ গোলে জিতে কোন
রকমে মুখ রক্ষা করে। পাকিস্তানের কাছে
শোচনীয় ১—৩ খেলায় পরাজয়ের পর
ভারতীয় হকির কর্মকর্তাদের কুম্ভকর্ণ
নিদ্রা ভেঙ্গেছে। চতুর্থ বিশ্ব হকি কাপে
নির্বাচিত ভারতীয় হকি দলে বাদ দেওয়া
তিনজন খেলোয়াড়কে (অশোককুমার,
বলদেব সিং এবং বীরেন্দার সিং) দলভুক্ত
করা হয়েছে।

দর্শক

চিত্রধ্বনি

এক্সরসিস্ট

ইয়ুং বা ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে আমরা বুঝতে পারি মানুষের অবচেতনে যে সমস্ত মনোভাব অগোছালো অবস্থায় পড়ে থাকে ভয় এবং যৌনবিকৃতি তাদের মধ্যে অন্যতম। অবচেতনের এই সঞ্চয় থেকেই পিকাসো তার কয়েকটি বিখ্যাত ছবি (মিনোতোরোমাচি, গার্লস প্লেইং উইথ আ টয় বোট, ডেথ অব আ মিনোতোর, গুয়েব নিকা, ওয়ার পীস) এঁকেছিলেন। ইয়োরোপের সমালোচক সমাজ সে সব ছবি দেখে লজ্জায় ঘেন্নায় কুঁকড়ে গিয়েছিলো, পিকাসো নৈতিক অধঃপতনের অপরাধে একজিবিশন চলার সময়ে গ্যালারীর কর্তৃপক্ষ মানুষের ভীড় সামলাতে গলদ-ঘর্ম হয়ে পড়েছিলেন। শিল্পের অন্তর্সত্তা নকল নীতিকে দাবিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলো। ঠিক এই কারণেই হিচককের ছবি সমস্ত দিক থেকেই সাফল্য রাখে। ব্যবসায়িক মূল্য ছাড়াও তাঁর একটা শিল্পগত মূল্য আছে।

দর্শকদের সাবধানী দৃষ্টির সামনে কোনো ছবি তুলে ধরার আগে হিচকক্ তাকে সযত্নে পরীক্ষা করে নিতেন। তাঁর ছবিতে হেমন্তের অরণ্যে ঝরে পড়া লাল পাতার মাঝে আবিষ্কৃত হোতো মৃত শরীর—দুচোখে যার প্রতিহিংসার আগুন। মদের সেলার থেকে খুঁজে পাওয়া যেতো দোমড়ানো, মোচড়ানো এক বৃদ্ধার শরীর (সাইকো)। ভয়ের অনুভূতির প্রচলিত দিকগুলিকে দর্শকের চোখের সামনে আনতেন না হিচকক্। তাঁর কল্পনায় নতুনত্বের বিরাম ছিল না। সমালোচকদের বিরূপ মন্তব্য ধুলোয় মিলিয়ে দিয়ে 'সাইকো' জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিলো, কেননা 'সাইকো'র ভয়ের মুহূর্তগুলি ছিল নতুন এবং অভাবনীয়।

ঐতিহ্যগতভাবে 'একসরসিস্টের' পরিচালক হিচককের উত্তরসূরী। একসর-সিজমের (ভূতে পাওয়া মানুষকে যারা উদ্ধার করে মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়ফুঁকের সাহায্যে, তাদের বলা হয় একসরসিস্ট অর্থাৎ 'ওঝা' —অতীতে পেগান ও ইহুদি সমাজে এদের প্রবল প্রতাপ ছিল।

মিরাকল্ ওয়র্কার স্বয়ং যীশু খৃষ্টকেও একজন একসরসিস্ট বলা হয়েছে। বর্তমানে কেবল রোমান ক্যাথলিক চার্চই এদের স্বীকৃতি, তাও ক্ষীণভাবে) অতি সাধারণ একটি গল্পকে। বারো বছর বয়সের কিশোরী রেগ্যানের শরীরে এখানে অপদেবতা ভর করে। রেগ্যানকে সে নীতিভ্রষ্ট, ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। একসর-সিজমের মহিমায়, অবশ্যই, ছবির শেষে রেগ্যান রাহুমুক্ত) কেবল উপস্থাপনার গুণে ফ্রিডকিন বক্স অফিস সাফল্যে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। রেগ্যান যেন এক অপাপবিদ্ধ কিশোরী আন্তিগোন—তাকে ধ্বস্ত করে দেয় যে অপদেবতা, মিনো-তোরের মত তার রূপ। সিলউয়েতে তাকে আমরা দেখে ফেলি। শব্দের ক্রস ফেডিং সে সময় ভৌতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করে। জননী মেরীর প্রতিমূর্তি'র যোনি থেকে রক্তনিঃসরণ হয়। জনসমক্ষে রেগ্যান প্রস্রাব করে। তার মুখ থেকে ঠিকরে বেরোয় কালচে সবুজ পিত্তরস। তার অতি-মানবিক কণ্ঠস্বর প্রেত আরোপিত। রেগ্যানের খাট অপদেবতার রোষে কাঁপতে থাকে। রেগ্যানের মেটামরফোসিস ঘটতে থাকে। তার মুখ প্রেতের ছায়া। দ্বাদশীর নবীন কৈশোর, যা কিনা শিব ও সুন্দরের বেদী—সেইখানেই আত্মপ্রতিষ্ঠা করে শয়তান তার সর্বশক্তি দিয়ে। আমাদের দুর্বল পাকস্থলী, দূষিত আত্মা ভয়ের এই তীব্রতার কাছে নির্জীব হয়ে পড়ে। স্ক্রীন ও দর্শকের মধ্যে সংঘর্ষ জন্ম নেয়। যুক্তি ও বিচারবিশ্লেষণের শুদ্ধ মন্ত্রে যে অলৌকিককে নিমেষে মন থেকে মুছে ফেলতে পারা উচিত এ ছবি দেখবার সময় ফ্রিডকিন তাকেই বিচক্ষণ প্রকাশভঙ্গির শক্তিতে সত্য বলে মানিয়ে নিতে বাধ্য করেছেন আমাদের। Suspension of disbelief' যদি কবিতার লক্ষণ হয়ে থাকে তবে 'একসরসিস্টে' সে কাব্যগুণ আছে। নচেৎ মৌলভাবনার দিক থেকে 'একসরসিস্ট' মহৎ আখ্যা পাবে না। ভারতবর্ষের গ্রামে, গঞ্জে এর থেকে অনেক বেশি ভয়াবহ ভূতে পাবার কল্পকাহিনী আমরা প্রত্যহ খুঁজে পাই। এবার যদি হিন্দি ছবিতে সেসব গল্প চিত্রিত হতে দেখি অবাক হব না।

শব্দকে ফিল্মে কতখানি গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য, এ ছবিতে সে প্রমাণ আছে। ছবির শুরুতে আবহসঙ্গীত হিসেবে আজানের শান্তমগ্নতা ও পরবর্তী দৃশ্যের মাটি কাটার শব্দের স্বাভাবিক জীবনছন্দকে ভেঙ্গে খান খান করে দেয় হিংস্র কুকুরের ডাক। পার্থিব জীবনের কনট্রাস্টে একটা অপার্থিব, অলৌকিক পরিমণ্ডলকে বজায় রাখার জন্য ফ্রিডকিন অনেকগুলি ছোট ছোট 'কৌশল' নিয়েছেন। যেমন রেগ্যানের ঘরে শয়তানের উন্মত্ততার অনতিবিলম্বেই আমরা সহজ জীবনে ঐশ্বর্যবান কিশোর কিশোরীদের টেনিস খেলা দেখতে পাই। রোমান পোলানস্কির 'রোজমেরিজ বেবি'র প্রেত শিশুটিই যেন ফ্রিডকিনের 'একসরসিস্টে' কিশোরী:

শুনেছি মূল ছবিটিতে ক্রুসিফি… রেগ্যানকে ম্যাস্টারবেট করতে দে… ভারতীয় পরিমার্জিত সংস্করণে… নেই। থাকলে আমাদের নম্র স্নায়… নামেও তাকে সহ্য করতে পার… সন্দেহ।

দীপঙ্কর

ময়না

মাফ করবেন, ছবির প্রথম… মিনিট সম্পর্কে কিছু লিখতে পার… কারণ ওই সময় পর্দার দিকে… থাকতে পারিনি। সবকিছু ঝাপসা। ভাবলাম চোখ খারাপ। কিন্তু না… পাশেও তো সেই অবস্থা। সবাই… ম্যানকে সম্বোধন করছেন। আ… গ্রহণ? স্বর্গত মলিনা দেবীর… কত বিকৃত হতে পারে তা না… বোঝা যাবে না। তবে ওই সময় এ… কানে আসে। ময়না সুমিত্রা মুখার্জি… মলিনা দেবীকে নিয়ে ছোট মেয়ে… তা গাইছিলেন। ক্রমশ পরদা… হয়। তখন রঞ্জিত মল্লিকের বাবা স… পুত্রবধূ হিসেবে পছন্দ করে… আধঘণ্টার মধ্যেই সুমিত্রা কলকাতায়… মল্লিকের ফ্ল্যাটে হাজির। চ… বোঝাবুঝি ও কলহ। প্রথামত গ্রা… বনাম শহুরে স্বামী। আসেন… ভট্টাচার্য। রঞ্জিতকে ভালবাস… অফিসের স্টেনো। অতঃপর… বিচ্ছেদের তোড়জোড়। তবে ছবি… অবশ্যই রঞ্জিত তার ভুল বুঝতে… আরতিকে সঙ্গে নিয়ে সুমিত্রাকে… আনতে ছোটে। তাই শেষের স… দাঁড়ায় এইরকম—সুমিত্রার স্বামী… রঞ্জিতের বোন আরতি।

এমন কাহিনীকে অবলম্বন ক… আগে কত যে ছবি হয়েছে তার সীমা… সেন্টিমেন্টের ঢালাও কারবার আ… আর সেগুলো দেখতে যাঁরা বেশী… করেন, সেই স্নেহপরবশ মায়েদে… ভেবেই হয়ত পরিচালক অসীম ব… এই ছবি করেছেন। ছবি হিসেবে খ… সাধারণ হয়েছে। ময়নার বন্দীদশা… গিয়ে পরিচালক বারবার এখানে… পাখি দেখিয়েছেন। একেবারে… আইডিয়া। স্টীল আর ফ্যা… সুবিধের নয়। কলাকৌশলের ক… আগেই বলা হয়েছে। তবে অভিনয়… ময়না চরিত্রে সুমিত্রা মুখার্জি… দীলিপ রায়, আরতি ভট্টাচার্য এ… মল্লিক—এঁরা সকলেই সুন্দর। সুমিত্রা প্রথমদিকে আর একটু… হলে এবং রঞ্জিত 'কালের যাত্রা' অ… করলে আরো ভালো হত। ভাল লে…

চিঠি, রেডিয়োর গান, কিছু
শা, সংলাপ এবং সঙ্গীত। আর
খোর্জী দারুন গেয়েছেন।

অজিতবরণ মিত্র

প্রত্যাশা না থাকে

নো সখনো সময় বেশী হয়েই
ার বাড়ীর থেকে তিন পা দূরের
যদি আসল দামে টিকিট বিকোয়
দেখতেই হয়—তা 'খেল খিলাড়ী
ক বা খেল কিসমং কা' যাই হোক।
শা না থাকে তবে হিন্দি ছবির
হতাশ করে।

ন এক এ্যাক্সিডেণ্টে একটা
ভেঙে টুকরো হয়ে গেলে অন্যান্য
াক্সিডেণ্টে জানি তা মিলবেই।
জড়ুল উল্কির পরিচিতি মায়ের
া থাকতেই পারে। কল্পলোকের
ায়িকা যদি বিনোদকে বিয়ে করে
ান্ত পরীক্ষিতের মোটর দুর্ঘটনায়
ানো—সে কি অভাবনীয় কোন

বিনোদ মেহেরা

অঘটন! সঙ্গীতের সংজ্ঞা ফিরে দেওয়ার
সম্ভাব্যতায় সন্দেহের সুযোগ কোথায় যদি
সেই ছোট্টবেলার খেলার গান শ্রুতিধর
বিন্দিয়ার সুকণ্ঠে বাজে, করুণ সুরে,
বিলম্বিতে? যদি গান শুনতে গিয়েই
রাজকুমারীর হীরের হার চুরি যায়,
পরীক্ষিতের জ্ঞান যদি গানেই ফেরে তবে
প্রাসঙ্গিকতার থার্মোমিটারে গানের পারাতো
পুরোটাই চড়েছে। কল্যাণজী-আনন্দজীর
সুরে সে গান মার্গ কি উন্মার্গ সে বিচারের
প্রয়োজন কি? জগদীপের যতিহীন গতিময়
আনুনাসিক বর্ণমালা ক্যাবারে নাচুনী।
বেশে সুকেশ বক্ষ ও কক্ষপুটের প্রদর্শনী
যদি অভিনন্দিত হয় হো হো হাসির
হররায় তবে সেই তো সাফল্য। —খুশিতো
যদি পেতে চাই ঠেকায় কে।

আশা না থাকলেই আশাভঙ্গের
অবকাশ নেই। বাড়তি পঞ্চাশ পয়সার জন্য
চোখ মেলে থাকলেই হল। উজ্জ্বল রঙীন
ছবির মিছিল সে পয়সা উসুল করে দেয়।
ক্যামেরার দৃষ্টি তো স্বচ্ছ—না থাকলো
বা দৃষ্টিকোণের বৈচিত্র্য। ডাইমেনশন
মাপতে ভুবরী নাই বা হলাম। বাচাল
চিত্রনাট্য যদি সেলুলয়েডের কণ্ঠরোধ করে
তাতেই বা কি! না পাওয়ার হিসেব থাক না
বাকী।

আলোচ্য চিত্র—খেল কিসমৎ কা
পরিচালক—এস কে লুথরা
সঙ্গীত—কল্যাণজী-আনন্দজী

মনাল দাশ

খোলা মাঠে নাটক

বর্তমানে গ্রুপগুলোর পক্ষে থিয়েটার হলে নাটক করা একটা অবাস্তব ব্যাপার ৩।৪ বছর আগে যে হলগুলোর ভাড়া ৩।৭ শত ছিল, এখন তা হাজার পেরিয়ে গেছে। তারপর আছে করপোরেশন, আলো, শব্দ সজ্জা, মঞ্চ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম। এবং এর পরেও দর্শকদের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপন ও পোস্টার। দু-চারটে বড় গ্রুপ বাদ দিলে কোন গ্রুপের পক্ষেই এই ব্যয়বহুল অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া সম্ভব নয়। এত জনবল অর্থবল তাঁদের কোথায়? দর্শকরাও একটা নাটক অন্ততঃ ৭।৮ বার মঞ্চস্থ হওয়ার পরে দেখার কথা ভাবেন। কিন্তু ততদিন টিকিয়ে রাখাই যে এক সমস্যা।

এ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কয়েকটি গ্রুপ এক অভিনব ব্যবস্থা নিয়েছেন, খোলা মাঠে নাটকের আয়োজন করে। সিলুয়েট থতম, শ্রীবিদাশক, থিয়েটার লাইবয়, শতাব্দী, মেঘমন্দ্র, নটসেনা ক্যালবাটা সাইলেন্ট থিয়েটার, শপথ ইত্যাদি গ্রুপ এই প্রয়াসের অংশীদার। প্রতি শনিবার বিকেলে কার্জন পার্কে ওঁদের নাটক হয়। এক জায়গায় এত গ্রুপের নাট্যাভিনয়ে যাতে কোন সমস্যা না আসে সেজন্য ওঁরা একটা কমিটিও করেছেন। প্রত্যেক শনিবার, সে যে গ্রুপের নাটকই হোক না কেন, প্রতি গ্রুপের প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত থাকেন।

আমরা কলকাতাবাসীরা সাধারণতঃ কোন জটলা দেখলেই সেখানে ভিড় করি। প্রথম দিকে শুধুমাত্র কৌতূহলেই অনেকে ভিড় করতেন। তারপর গ্রুপগুলো তাদের আন্তরিকতা দিয়ে, শ্রম দিয়ে ঐ ভিড়কেই আগ্রহী দর্শকে রূপান্তরিত করেন। এখন আগে জায়গা দখলের জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। প্রতি শোয়ে অন্ততঃ ৫।৬ শ দর্শক থাকেন, নাটকের শেষে কাপড়ের ওপর পাঁচ দশ পয়সা থেকে শুরু করে এক টাকা দু' টাকা অব্দি গ্রুপের জন্য রেখে যান।

প্রখর রোদ আর বৃষ্টি বাদ দিলে এই মুক্ত নাটকের সুবিধে অনেক। হলের ভাড়া নেই, বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন নেই, টিকিট ছাপার ঝামেলা নেই, সেট, মেকাপ, শব্দ ইত্যাদির বালাই নেই। এবং এইসব না থেকেও যা থাকে, তা এক সম্পদ বিশেষ। এদের আঙ্গিক, অভিনয় অনেক সময় ভুলিয়ে দেয় যে আমরা কার্জন পার্কে দাঁড়িয়ে আছি। নাটক তেমন জোরালো নয়, সংলাপেও সেই তেজ থাকে না, কিন্তু সব মিলিয়ে একটা প্রাণবন্ত ব্যাপার থাকে। ওঁদের প্রয়োগপদ্ধতি নতুন, অভিনয়ে শরীরকে দারুণভাবে ব্যবহার করেন, অনেক সময় পেন্টোমাইমেরও সাহায্য নেন।

নিমন্ত্রণ এখানে সবার। কেউ শুরু থেকে এসে শেষ অব্দি থেকে যান, কেউ বা দশ মিনিট পরেও চলে যান। কিন্তু কার্জন পার্ক তো, তাই একজন গেলে দু জন আসে, ভিড়ও বাড়ে, আর ভিড় থাকলেই শিল্পীরা অভিনয়ে উৎসাহী হন।

এই যে অভিনয় গত ৫।৬ বছর, কি তারও বেশী সময় ধরে হয়ে আসছে, এর প্রথম প্রচেষ্টা সম্ভবতঃ বীর সেনের। মাঝখানে তিনি যাত্রা ইত্যাদিতে নিজেকে কিছুদিন ব্যস্ত রেখেছিলেন, আর সেই সময় কার্জন পার্কে নতুন করে উদ্যোগ নিয়েছিলেন বাদল সরকার। এখন যাঁরা ওখানে নাটক করেন তাঁদের একজনের সঙ্গে সেদিন কথা হচ্ছিল। ২৬।২৭ বছরের ঐ যুবক বর্তমানে শ্রীবিদূষকের নাট্যকার ও পরিচালক রামানুজ সেনগুপ্ত। ওঁদের গ্রুপের সদস্য ১৫।১৬ জন। ১৪ থেকে ২৮ অব্দি তাঁদের বয়েস। দু-তিনজন মেয়েও ঐ গ্রুপের সদস্য, তাঁরা অভিনয়ে নিয়মিত অংশ নেন। ওঁদের কেউ চাকরি করেন না, পাননি বলেই। কলকাতার বাইরে থেকে ট্রেনে করে তাঁরা নাটক করতে আসেন, নাটকের শেষে মুড়ি আর ছোলা খেতে খেতে আবার ট্রেনে চাপেন।

নাটক থেকে আয় কি রকম হয়, করতেই বললেন, কোনো শোয়ে ২ কোনো শোয়ে বা ৫০ টাকা। হয়ে যায়। কার্জন পার্ক ছাড়া শ্রী প্রতি রবিবার ৪টায় টালা পার্কে করেন। দর্শকেরা সেখানে বেশ হচ্ছেন। নাটক শুরু হওয়ার সকলে বৃত্তাকারে বসে যান, কেউ গোল করলে ধমকে থামিয়ে দেন

বাংলা নাটককে বাঁচিয়ে আজ এই সব গ্রুপ। ওঁরাই তৈরিতে সাহায্য করছেন বেশী। টাকা নেই, মঞ্চ নেই, পরিচিতি নে যা করছেন তা স্টেজের কাছে এক চ্যালেঞ্জস্বরূপ। শ্রীবিদূষক ছাড়া গ্রুপ এভাবে নাটক করছেন, তাঁর এই একইভাবে চলছেন। তাই আল কিছু বলার নেই। আমাদের আশ্চর্য লাগে ওঁদের আন্তরিকতায়। নিষ্ঠা ও সততার কাছে আমরা শ্রদ্ধা জানাই। মঞ্চের নাটকের মুক্ত নাটক অনেক বেশী কঠিন। শিল্পীকে সাহায্য করতে, পরিবেশ করতে প্রম্পটার থেকে শুরু করে মঞ্চ, শব্দ, অন্ধকার মায় ড্রপসীন আছে। অথচ এখানে কেউ নেই। পরিবেশ সৃষ্টি হয় শিল্পীদের শক্তিতে। মাঝে মাঝে তাঁরা মন্তব্য চান—কেমন লেগেছে, কি ভাল হয় এই সব।

নাটক হিসেবে ওঁদের নাটক এ বিষয়ে মন্তব্য আজ নয়, কেন বিচারের সময় এখনো আসেনি। ওঁরা রোদ বৃষ্টি সহ্য করে নাটক এতখানি করছেন, হল-মালিকদের ধর্না না দিয়ে খোলা আকাশ বেছে ছেন, শিল্পের নামে নাটকের নামে না করে সৎ থাকতে চেষ্টা করছেন জন্য ওঁরা আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। দেবও ওঁদের জন্য কিছু করা উচিত কিছু না পারি, অন্ততঃ উপস্থিত ওঁদের উৎসাহও তো দিতে পারি।

আমরা যারা নাটক ভালবাসি, জন্য কিছু করতে চাই, তাদের আ সব গ্রুপের পাশে দাঁড়াতেই হবে। টার হলগুলো এখন যেভাবে কাছে মাথা নোয়াচ্ছে, অর্থ ও অভাবে সেখানে হতাশার মধ্যে যাচ্ছে গ্রুপ থিয়েটার, সেখানে পদক্ষেপ অনেক বেশী বলিষ্ঠ ও প্রদ।

বিকা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

দেখুন!
গোদরেজ-এর নতুন অবদান:
সঠিক সুষম ফর্মুলায় তৈরী
সুপার ডিটারজেন্ট পাউডার
প্যারেড
আপনার
ধবধবে সাদা, উজ্জ্বল ও টেঁকসই করবে

প্যারেড-এ পাচ্ছেন সঠিক "পি এইচ লেভেল" যে কোনও ডিটারজেন্টে কাপড় ধোয়ার ফলাফল নির্ভর করে তার "পি এইচ্ লেভেল"-এর ওপর:

কিছু ডিটারজেন্ট এতো নরম হয় যে কাপড় ভাল করে পরিষ্কারই হয় না।

অন্যান্য ডিটারজেন্ট এতো খসখসে হয় যে তাতে ধুলে কাপড় নষ্ট হয়ে যায়।

নতুন প্যারেড-এর সব উপাদানই এমন ভারসাম্যপূর্ণ যে এটা খুব নরমও নয় আবার খুব খসখসেও নয়। এই ডিটারজেন্ট সঠিক ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্যারেড-এ এমন একটা বিশেষ "অপ্টিকাল ব্রাইটেনার" আছে যা আপনার কাপড় দারুণ সাদা, দারুণ উজ্জ্বল করে।
আপনি যখন কাপড় ধোবেন তখন প্যারেড-এর যে বিশেষ প্যারেড "অপ্টিকাল ব্রাইটেনার" আছে তা কখনও ধুয়ে বেরিয়ে যাবেনা।

তাজা ফুলের সুরভিতে ভরা প্যারেড-এ এত প্রচুর ঘন ফেনা হয় যা আপনার কাপড় ধোয়া অতি সহজ করে দেবে।
ঠাণ্ডা জল বা গরম জল, ক্ষার জল বা পরিষ্কার জল সব জলেতেই প্যারেড অতি সহজে গুলে মিশে যায়। কাপড় কাচার সময় এর প্রচুর ঘন ফেনা সমানভাবে বজায় থাকে যার ফলে একই সাবান জলে আপনি আরও বেশী কাপড় ধুতে পারেন।

শুভ্রতা ও ঝলক, চোখের পড়েনা পলক
—নতুন প্যারেড-এর চমক
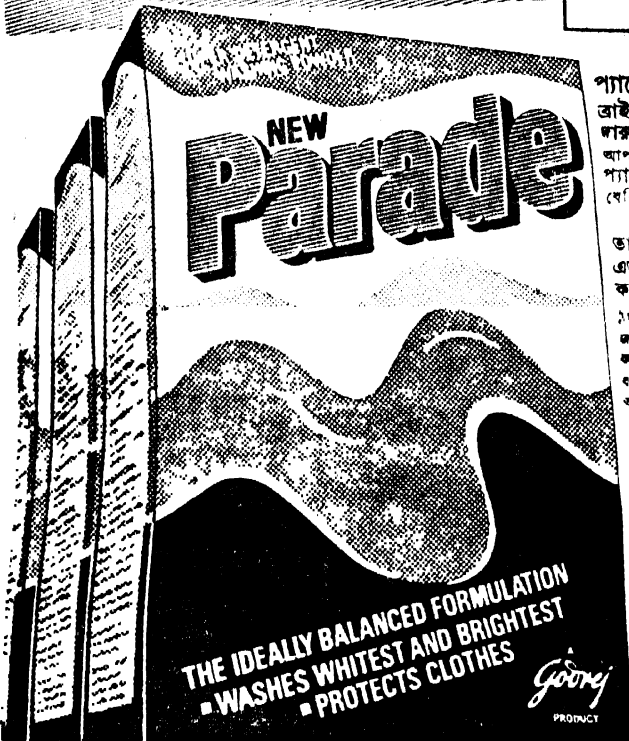
NEW
Parade
THE IDEALLY BALANCED FORMULATION
▪WASHES WHITEST AND BRIGHTEST
▪PROTECTS CLOTHES
Godrej
PRODUCT

CHAITRA-G-17 BENR

১৭ বর্ষ
৪৩ সংখ্যা
৩ চৈত্র
১৩৮৪
17 March 1978

আগামী সংখ্যায়

সাহিত্যিকের দায়

দিন কয়েক আগে দিল্লিতে সাহিত্য নিয়ে একটি আলোচনাসভা বসেছিল। ভারতীয় সাহিত্যের কোন প্রতিনিধি তাতে ছিলেন কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু ইংরেজি ভাষাতে সাহিত্য রচনা করেন এমন কয়েকজন সাহিত্যিক আলোচনায় যোগ দিয়ে মতামত জ্ঞাপন করেছেন। তাছাড়া ছিলেন ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়ার কয়েকজন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধি যাঁরা সাহিত্যিক না হলেও সাহিত্যের ব্যাপারে উৎসাহী সভাটির মূল আলোচ্য বিষয় ছিল—কী করে লেখকরা আরো বেশি ভালো ভাবে লিখতে পারেন, এবং সাহিত্যিকের আসল কর্তব্য কী?

একাদমী পুরস্কারপ্রাপ্ত জনৈক ভারতীয় লেখক জানান, সাহিত্যিক কোন চিন্তাবিদ ব্যক্তি নয়, তিনি শুধুমাত্র কারিগর। তাঁর আসল যত্ন হওয়া উচিত, কী করে তিনি লিখবেন, সেইদিকে। আলোচকের মত—প্রেরণা, আঙ্গিক এবং লেখার শৈলী, এগুলোই হল ভাল লেখার গোড়ার কথা। আর ঐ প্রেরণা ব্যাপারটি যদিও ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে তবু নিজের স্বজাতির সঙ্গে নাড়ির যোগ থাকলেই তবে তা পাওয়া যেতে পারে।

এর প্রতিবাদে মুলুকরাজ আনন্দ বলেন, ভারতে এত বেশি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রয়েছে যে লেখকের পক্ষে বেছে নেওয়া শক্ত কোনটিকে তিনি নিজের জিনিস বলে গ্রহণ করবেন। ফলে লেখকের পক্ষে নিরাপদ পথ হল, নিজের কথাটি নিজের মত করে বলা।

এর পর সাহিত্যিকের সামাজিক দায় প্রসঙ্গেও ভারতীয় সাহিত্যিকেরা নানাজনে নানা মত দিলেন। কিন্তু তুলনায় দেখা গেল, ইন্দোনেশীয় ও মালয়েশীয় প্রতিনিধিরা প্রায় সকলেই এক কণ্ঠে জানালেন, সাহিত্য শুধু চিত্তবিনোদনের উপকরণ নয়, তার সামাজিক দায়ও রয়েছে গুরুতর রকম; এবং তার কর্তব্যটি বেশির ভাগই সদর্থক, অর্থাৎ গড়ে তোলার দিকে। উন্নয়নশীল দেশের সাহিত্যিকদের অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে এই দায়িত্বটির বিষয়ে। সামাজিক রূপান্তরের বৃহৎ কর্মকাণ্ডে সাহিত্যিককেও হতে হবে একজন বিশিষ্ট শরিক।

মালয়েশিয়ার প্রতিনিধি দুজন আরো জানালেন, লেখকরা শুধু টাকার জন্যে লিখবেন তা হতেই পারে না। তাঁদের সব থেকে বড় কর্তব্য হল, সরকারকে তাঁদের অপূর্ণ প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দেওয়া। সেদিক থেকে তাঁরা কাজ করেন প্রায় সামাজিক বিবেকের মত।

এত সব আলোচনার মোট পরিণাম কী দাঁড়াল তা বোঝা গেল না যদিও, কিন্তু নানা দেশের লেখক এবং লেখার অনুরাগীরা এক সঙ্গে বসে মত বিনিময় করেছেন এটাও কম কথা নয়। লেখকরা বেশির ভাগই এখন নিজের নিজের দুর্গে সম্রাট হয়ে থাকতে চান। কিন্তু তাঁরা টের পান ন, তাঁদের নিরাপত্তার সেই দুর্গটিই শেষ পর্যন্ত কচ্ছপের খোলসের মত তাঁদের অনড় করে ফেলে। বাঙালি সাহিত্যিকেরা অবহিত হতে পারেন।

সাহিত্য ইত্যাদি...

সাহিত্যিকরা পছন্দ করেন কী? অবশ্যই সাহিত্য। না হলে তাঁরা সাহিত্য করতেন না। কিন্তু অপছন্দ? স্টাটিস্টিকস নিয়ে দেখেছি, সব থেকে বেশি অপছন্দ করেন তাঁরা অংক।

তার পরই গান।

দুচারজন ওরই মধ্যে শুনতে যদিও বা ভালোবাসেন, গাইতে নয়। অন্তত নজরুলের পর থেকে নয়। চেষ্টা যদিবা করেছেন কেউ কেউ, টেক-অফ করা মাত্রই ক্র্যাশ-ল্যান্ডিং করতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা।

দৃষ্টান্ত হাতের কাছেই আছে। গায়ক ছিলেন সেদিন শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। আর ঘটনাস্থল শান্তিনিকেতন। ঘটেছিল, তিনি যখন ছাত্র ছিলেন সেই সময়।

বিশী মশাই নিজেই বিবরণ দিয়েছেন। সত্য যে কতো মনোরমভাবে উপহার দেওয়া যেতে পারে, লেখাটি নিজে না পড়লে তা আন্দাজ করা শক্ত। ব্যাপারটা ঘটেছিল এইরকম।

সেকালের শান্তিনিকেতনে কী একটা উপলক্ষে গীতাভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। অনুষ্ঠানের একটা বিষয় ছিল, কোরাস গান। স্থির হয়, প্রমথবাবু এবং আরেকটি ছেলেকে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর গান শিখিয়ে তৈরি করে নেবেন। তারপর তাদেরই সঙ্গে গান গাইবেন স্বয়ং দিনেন্দ্রনাথ।

অনুষ্ঠানের দিন প্রমথবাবু আর সেই ছেলেটিকে দুপাশে দাঁড় করিয়ে গান গাইতে শুরু করেন দিনুবাবু। সকলে সাগ্রহে শুনছেন। স্বয়ং দিনুবাবু গাইছেন, রবীন্দ্রনাথ নিজেই যাঁকে বলেছেন—সকল গানের ভাণ্ডারী, সকল সুরের কাণ্ডারী। কিন্তু কি আশ্চর্য, গাইতে গাইতে উশখুশ করতে লাগলেন দিনেন্দ্রনাথ, তারপর হঠাৎ একসময় থামিয়ে দিয়ে স্টেজ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কী ব্যাপার? হল কী? মঞ্চের আড়ালে ওঁরা সবাই হাঁ-হাঁ করে ছুটে গেলেন দিনুবাবুর দিকে। —থেমে গেলেন কেন? ব্যাপার কী!

কী আবার ব্যাপার। প্রমথবাবুর দিকে আঙুল দেখিয়ে ফেটে পড়লেন দিনেন্দ্রনাথ —এমন বেসুরোভাবে চেঁচাচ্ছিল কানের কাছে, আমি অবধি রবিদাদার গানের সুর ভুলে গেলাম!

জানি না আসল ঘটনার ওপর রুপোর রঙ চাপিয়েছেন প্রমথবাবু। কিন্তু গান-বাজনার আসরে তাঁকে খুব একটা দেখেছি বলে মনে হয় না।

দেখেছি আমি সত্যেন বোসকে। (এই-ভাবেই নাম সই করতেন তিনি!) কিন্তু বিজ্ঞানের ওপর বেশ কিছু লেখালেখি করলেও তাঁকে ঠিক সাহিত্যিক বলা ঠিক হবে না। অবিশ্যি কলকাতায় থাকলে পুরনো পরিচয়ের সাহিত্যের আড্ডায় তাঁর যাওয়ার এত বেশি নিয়মিত ছিল যে তাঁকে সাহিত্য জগতের বাইরের লোক বলাও শক্ত।

কিন্তু ধুর্জটি মুখুজ্যের বিষয়ে এসব প্রশ্ন ওঠে না। সাহিত্যিক তিনি নিশ্চয়ই, এবং নিশ্চয়ই তিনি সঙ্গীতজ্ঞ। সেই সুবাদেই একবার বোধহয় তাঁকে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের এক অধিবেশনে সঙ্গীত শাখার সভাপতিও করা হয়েছিল। আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর গানের বিষয়ে পত্রালাপ যা 'সুর ও সঙ্গতি' নামে বই হয়ে বেরিয়েছে, সে তো এখন ইতিহাস।

আমাদের কালে ওস্তাদী গানের আসরে সাহিত্যিকদের মধ্যে কাউকেই দেখা যায় না। রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানেও উপস্থিতির হার খুবই কম। প্রায় নিয়মিত দেখা যায় সন্তোষকুমার ঘোষকে। তিনি একজন বিশেষজ্ঞও নিশ্চয়ই। তাঁর অনেক লেখাতেই তার প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু যদ্দুর মনে হয় তাঁর আসল কৌতূহল লিরিকগুলির দিকে, সুরের দিকে নয়। কাজেই তাঁকে ঠিক সঙ্গীতজ্ঞ বলা যায় কিনা জানি না।

অবিশ্যি ব্যক্তিগত জীবনে কোনো কোনো সাহিত্যিকের মধ্যে গানের দিকে টান আছে তা অস্বীকার করা যাবে না। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী গান জানেন, অন্তত বেশ কিছু টপ্পা গান জানেন, তার প্রমাণ আমি পেয়েছি অনেকবার। খ্যাতনামা লেখক বিমল মিত্র সাহিত্যে আসার আগে গান গাইতেন। তাঁর নিজের মুখে শুনেছি, রেকর্ডও হয়েছিল তখন তাঁর গানের। সমরেশ বসুর অনেক লেখার মধ্যে প্রচলিত পল্লীগীতি ও বাউল গানের লাইন দেখা যায়। তিনি গাইয়ে মানুষ তা শুনিনি, কিন্তু গানের দিকে কান আছে নিশ্চয়ই। নাহলে এসব তাঁর কলমের ডগাতেও আসতে না। (লক্ষ্য করা যেতে পারে, এইদিক দিয়ে আরো দুজন বাঙালি লেখক তাঁর স্মরণীয় পূর্বসুরি। বঙ্কিমচন্দ্র এবং তারাশংকরবাবু।)

এরপর কিন্তু আর কারো মুখ মনে আসছে না। হ্যাঁ, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কথা স্মরণ আছে আমার। কিন্তু তিনি তো লেখার চাইতে গানের মানুষ বলেই বেশি পরিচিত।

একালের বাঙালি সাহিত্যিকেরা গানের বিষয়ে খুবই যেন অসাড়। অথচ এই জগতটিতে কান পাতলে তাঁরা অনেক কিছু পেতেন। অনেক সব স্মরণীয় অভিজ্ঞতা আর বরণীয় উক্তি কুড়িয়ে পেতেন তাঁরা এখানেও।

যেমন এক্ষুনি আমার মনে পড়ল, ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেবের সঙ্গে দুটি সন্ধ্যার অভিজ্ঞতার কথা। প্রথম আসরটি ছিল আমার সদ্যমৃত বন্ধু অমিয় মুখুজ্যের বাড়িতে।

গান এবং সাহি

গানের শেষে বড়ে গোলাম আলি খ সাহেব তাঁর নিজের জীবনের এক ঘট কথা বললেন।

বাবুজি, আমার তখন জোয়ান বয় লাহোরে থাকি। বেশ একটু নাম হয়েছে সকাল থেকে দুপুর তক রেওয়াজ করি সন্ধ্যায় বায়না থাকলে গাই। ওসব শহ চকের দিকে যেমন হয়, নিচের তলায় দোকান পাট, ওপর তলায় লোক বাস করে। একতল থেকে সোজা উঠে যায় সিঁড়ি দোতলায়।

একদিন আমি আমার দোতলার ঘ রেওয়াজ করছি, এক শেঠজি এসে হাজি হলেন। বললেন, গান শুনবেন। তা শুনবে তো শুনুন। আমি রেওয়াজ চালাতে লাগ লাম। ঘন্টাখানেক শোনার পর শেঠজি নীর উঠে আমার সামনে একখানা একশ টাক নোট রেখে চলে গেলেন। আমি ভাবলা যথা লাভ।

বলে একটু থেমে খাঁসাহেব বললে কিন্তু আমি ভুল করেছিলাম বহুকাল পরে, তা বিশ বছর হ আমার তখন খুব নাম, বম্বে এক কনফারেন্সে গান গাইলাম। রা বারোটা থেকে দুটো অবধি। তারপর আ শেষ করে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে গাড়ির জ অপেক্ষা করছি, সাকরেদ এসে জানাল এ বৃদ্ধ শেঠজি দেখা করতে চান। তা চান নিয়ে এস। তারপর বাবুজি, সেই বৃ শেঠজি এসে বললেন, ওস্তাদজি আপন গানে আমার আত্মার মুক্তি হয়ে গেল কিন্তু বিশ বছর আগে লাহোরে গান শুনে ছিলাম আপনার এক সকালে। সেদিন আপ আমাকে অবহেলা করেছিলেন। বলে শেঠ চলে গেলেন। আর আমি? সেইদিনই আ টের পেয়েছি, শ্রোতাকে ছোটো ভাব নিজেকেই ছোটো হয়ে যেতে হয়।

আর দ্বিতীয় আসর বসেছিল, বাল গঞ্জ সার্কুলার রোডের এক বাড়িতে। সে গোলাম আলি খাঁ সাহেব একটা তা কাজ দেখিয়ে আশ্চর্য এক দীনতার হাসি হে বলেছিলেন, দেখুন, সুরটা কেমন আ গলা থেকে বেরিয়ে আপনি আপনি কাঁপে ঠিক যেন কাঁচের চৌবাচ্চার লাল মা অল্প অল্প পুচ্ছ তাড়না করে জলের ম কেমন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ঠিক সাধকের মন। কী বাবুজি, লেখালে সময়েও আপনাদেরও তো এই রকমই হ হয় না?

কী জবাব দেব ভাবতে ভাবতে ব গোলাম আলি সাহেব অন্য তানে চ গিয়েছিলেন। আমিও বেঁচে গিয়েছি লজ্জার হাত থেকে।

অণীন্দ্র ব

মরণের পরে

বুদ্ধদেব বসুর মৃত্যুর পরে নন্দগোপাল সেনগুপ্ত একটি প্রবন্ধে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, দেশবাসী তাঁর মৃত্যুতে গভীর বেদনা অনুভব করে নি বলে। প্রবন্ধটিতে তিনি বলেছেন....কল্লোল, কালি-কলম গোষ্ঠীর কক্ষে সাহিত্যিকদের মধ্যে অধ্যয়ন ও মননের পর্যাপ্ততায় তাঁর সমকক্ষ কেউই ছিলেন না।....এমন তদ্‌গত সাহিত্যনিষ্ঠা বলাই বাহুল্য এ যুগে খুব দুর্লভ জিনিস। এই সব মন্তব্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে এই সমালোচক বলেছেন, যতখানি নিষ্ঠা নিয়ে বুদ্ধদেব সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, ততখানি আগ্রহ নিয়ে জগৎ ও জীবনের সঙ্গে সরাসরি মোকাবিলা করেন নি।....উজ্জ্বল অনবদ্য ও বুদ্ধিদীপ্ত তাঁর নাটক, গল্প ও উপন্যাসের পৃথিবী, কিন্তু তাতে মাটি এবং মানুষের সজীব স্পর্শ কম। দেশবাসী বুদ্ধদেববাবুর মৃত্যুতে গভীর প্রিয়জন বেদনা উপলব্ধি করে নি। তাঁর মৃত্যুর বেশ ক বছর পরেও তিনি কবি হিসেবে অনিবার্য জীবনানন্দ, গদ্যকার হিসেবে মানিক-তারাশংকর-বিভূতিভূষণ সতীনাথের সঙ্গে উচ্চারিত নন। যদি ধরে নেওয়া যায়, জীবৎকালে পছন্দ-অপছন্দ অনেকটাই ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রভাবিত করে, মৃত্যুর পরে সকল বিরোধের অবসান, তবে বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ নির্ভর তর্কাতর্কির অবসান ঘটে গেছে। এখন তার সঙ্গে জীবিত মানুষের কোন বিরোধ নেই। সাহিত্য সম্পর্কে প্রভাবিত মতামতের ইতি ঘটেছে। এখন যা মনে হবে পাঠকের, তা ব্যক্তিনিরপেক্ষ। অতএব বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য-মূল্য এখন নতুন করে বিচার বিশ্লেষণ হতে পারে। নন্দগোপালবাবুর দুঃখের অবসান ঘটাতে দেশবাসী উদ্বুদ্ধ হতে পারে। সত্যিই, বুদ্ধদেব বসুর প্রতি দেশবাসীর উদাসীনতার কারণ কি। তা কি বুদ্ধদেবের সাহিত্যিক আদর্শের জন্য, না কি নেহাৎই একটা প্রতিভাকে বুঝে নেবার ভ্রান্তি।

একজন তরুণ কবি, বয়স পঁচিশ। সুদর্শন, সাহিত্যনিষ্ঠ, শিক্ষিত, মার্জিত। আমাকে বললেন, বুদ্ধদেব বসুর গ্রন্থাবলীর একটি খণ্ড আমি কিনেছি। বেচে দিতে চাই। কম দামে নেবেন? অথচ এই তরুণ মানিক-বিভূতি-তারাশংকরের ভক্ত। সমকালীন ও প্রাচীন দেশ-বিদেশের সাহিত্যের অনুরাগী। বাঙ্গালী, এখনকার লেখকদের অনেককেই পছন্দ করেন, বই কেনেন। তর্ক করেন এঁদের নিয়ে। বুদ্ধদেব বসু তাকে আকর্ষণ করতে পারে নি। কেন? জিজ্ঞেস করলাম, বেচে দিতে চাইছ কেন? সে বলল, আমাদের দেশ-মাটি-মানুষ ওঁর রচনায় নেই। রোমান্টিক নায়ক, প্রেম ছাড়া ভাবতে পারে না কিছু। কবিতায় অতৃপ্তি নেই। অশান্তি নেই। প্রেম, বিরহ, দু-একটি সুন্দর দৃশ্য। দেহভোগ। এই সব আর পড়ার মানে হয় না। তবে প্রবন্ধের খণ্ডটা রাখব। অসম্ভব ভাল। অনুবাদ তো রাখবই।

এই মনোভাব এ সময়ের অনেক তরুণের। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের সংখ্যা কত? সব মিলিয়ে গ্রন্থ সংখ্যা? আড়াইশ? তিনশ? অনেক বই পাওয়া যাচ্ছিল না? কিছু বই ঘুরে-ফিরে ছাপা হয়েছে। অনেক বইয়ের নাম শুনেছি। দোকানে নেই। এসব কারণে তাঁর সমগ্র সাহিত্য পড়ে ওঠা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় নি। হয়ত এ কারণেও তিনি নতুন কালের পাঠকের কাছে স্পষ্ট নন। অস্পষ্টতা কল্পনার জন্ম দেয়। পড়ি নি। হয়ত বড় —এ রকম ধারণা শ্রদ্ধা আনে। পড়া হলে, কোন ভূমি তাকে দেওয়া হবে তা জানতে ইচ্ছে করে। আশা করি সে সুযোগ এসে যাবে। তখন দেশবাসী, ভুল হলে সংশোধন করে নেবার সুযোগ পাবে।

কিন্তু জীবিত কালেই তিনি প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসিক নন, সকলে জানতেন। কবি হিসেবে শ্রদ্ধা ছিল তাঁর প্রতি, কিন্তু অনিবার্য হয়ে ওঠেন নি। তাঁর প্রবন্ধ এবং অনুবাদ আমরা গভীর মনোযোগে পড়েছি। শিখেছি। নতুন করে ভাবিয়েছেন তিনি। অসামান্য ভাষা, স্টাইল। এ ব্যাপারে তাঁর সমকক্ষ প্রাবন্ধিক চোখে পড়ে না। অনুবাদক হিসেবে তাঁর নিষ্ঠা ও অনুবাদ-কর্মের পরিমাণ আমাদের ভাষায় তুলনা-রহিত। তাঁর সম্পাদিত কবিতা একটি আন্দোলন। বাঙ্গালী কবিদের জাতে ওঠার মানদণ্ড। জীবনযাত্রায় বাঙ্গালীয়ানা দেখি নি। যখনই গিয়েছি, সুসজ্জিত, ধোপ-দুরস্ত। শিক্ষা ও মার্জিতরুচির আদর্শ। যে ভাষায়, যে টোনে কথা বলতেন, আমাদের চার পাশের সঙ্গে মেলালে তার আভিজাত্য এমনই, নামই হয়েছিল বুদ্ধদেবীয়ানা। শেষ বার যখন রবীন্দ্রসদনে কবি সম্মেলনে দেখেছিলাম, সম্ভবত মৃত্যুর বছর দু-এক আগে, তখনও বার্ধক্য তাঁকে গ্রস্ত করতে পারে নি। সর্বাধুনিক যুবকটির মতন বড় চুল, লম্বা পাঞ্জাবী আর ফুলপ্যান্ট পরনে দেখেছিলাম। অমন সুন্দর আমার শৈশব, আমার যৌবন সবে পড়ে উঠেছি। পড়েছি কবিতার শত্রু ও মিত্র। শ্রদ্ধা ছিল। ভয় ছিল। কিন্তু, মনে মনে জানতুম, সব সত্ত্বেও বুদ্ধদেব আমার পক্ষে, আমাদের পক্ষে অনিবার্য ঔপন্যাসিক নন, কবি নন: আমরা, এ সময়ের নানা টেনশানের মানুষ, দুর্ভাগ্যে আন্দোলিত মানুষ, স্বপ্ন ও ব্যর্থতায় আক্রান্ত মানুষকে উনি চিনতে পারেন নি। তারাশংকর, মানিক, বিভূতিভূষণ জীবনানন্দর সফিস্টিকেশন তেমন ছিল না। কিন্তু মানুষ আর সময়ের সকল প্রশ্ন বুঝেছিলেন, কখনো শরীর সম্পর্ক স্থাপন করে, কখনও দূরে থেকে, অনুভবে। আমাদের সময়ের রোগে ওঁরা ছিলেন আক্রান্ত। শুধু যৌবন উপাস্য নয়, খণ্ডিত মানুষ নয়। সমগ্র মানুষ ছিল এই সব স্রষ্টাদের প্রিয় জিনিস। তাই কি ওদের রচনায় পাই, যা বুদ্ধদেবে নেই। বুদ্ধির দীপ্তি, মনীষার আলো অসম্ভব সাধনার ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও তিনি ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছেন।

আমার স্মরণে নেই, কোন লেখকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে খবরের কাগজের এমন উন্মাদনা। একটি দৈনিকের শিরোনামের নীচে তরুণ কবিদের কাঁধে চড়ে অন্তিমযাত্রায় বুদ্ধদেব, এ রকম ছবি ছাপা হয়েছিল। এত স্মরণসভাও আগে দেখিনি। এত স্মৃতি-সংখ্যার প্রকাশ। এত হওয়াই উচিত। একটা অমূল্য জীবন মাতৃভাষার জন্য ব্যয় হল, এর দাম দেবে কি দিয়ে। ফরাসী দেশের কারেন্সী নোটে ছাপা ভিকটর উগোর ছবি দেখেছি। এ দেশে ভাবতে পারি? বুদ্ধদেব বসু সম্মানিত হলেন, এত লেখককুলের সম্মান। এ তাঁর প্রাপ্য ছিল। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও, দেশবাসী তাঁকে নেয় নি। কিম্বা নিয়েছে হয়ত। কিভাবে, কতখানি তিনি শুধু সাহিত্যের ঐতিহ্যে বেঁচে রইলেন আর সুখ-দুঃখে প্রিয়জন ভেবে মানুষ তাঁকে কি ভাবে কাছে টেনে নিল, কিম্বা নেবে কিনা, এসব জানার ইচ্ছে হয়।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

বিদেশী উপন্যাস প্রতিবেশী উপন্যাস ও প্রতিবেশী গল্প সংকলন

সমালোচনা

গৌতম ভট্টাচার্য ও পদাতিকের মতামত

ক্নুট হামসুন

হামসুনের যে চারটি উপন্যাস সবচেয়ে বেশি পঠিত, নিঃসন্দেহেই তার মধ্যে একটি হল ভিকটোরিয়া। 'হাঙ্গার' বা 'দি গ্রোথ অব দি সয়েলে'র মতই বিখ্যাত এটি। তাঁর প্রতিটি উপন্যাসেই প্রায় তাঁর দেশ নরওয়ের প্রকৃতি ও জীবন বড় বেশী করে এসে পড়ে। এব্যাপারটা অন্যান্য দেশের পাঠকের পক্ষে হামসুনের লেখার রসগ্রহণে কিছুটা ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। ভিকটোরিয়া কিন্তু ব্যতিক্রম। একটি অনবদ্য প্রেমের কাহিনী এটি। যা দেশ কাল গন্ডিকে অতিক্রম করে গেছে। কিশোর বয়স থেকেই, গরীব যাঁতাকলওলার ছেলে জোহানিস আর অভিজাত জমিদার কন্যা ভিকটোরিয়া পরস্পরের প্রেমে পড়ে যায়। যত বয়স বাড়ে, তত সে প্রেম গভীর থেকে গভীরতর হয়ে ওঠে। কিন্তু সামাজিক ভ্রূকুটি, পড়ন্ত অবস্থার সংসারের প্রতি যান্ত্রিক কর্তব্য ত্যাগের বোধ ভিকটোরিয়াকে মিলতে দেয় না জোহানিসের সঙ্গে। এইভাবে জীবনের বড় সুসময়টাই চলে যায়। বসন্ত চলে যায়। কিন্তু গাছের পাতা ঝরে যায় না। বড় আমূলবিদ্ধকারী যন্ত্রণা দেয় বসন্তের এই যাওয়া। সবশেষে, আর পাঁচটা মহৎ প্রেমের উপন্যাসের মতই ভিক্টোরিয়ার সমাপ্তি। ভিক্টোরিয়া তার মৃত্যুশয্যা থেকে চিঠি লিখে জোহানিসকে তার স্বর্গীয় প্রেম শেষবারের মত নিবেদন করে মারা যায়। সে সঙ্গে পাঠকের বুকে এক-বুক বেদনা উথালে পাথাল করে ওঠে। অনুবাদ স্বচ্ছন্দ।

ভিক্টোরিয়া—ক্নুট হামসন। অনুবাদক চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। চারুবাক, কলকাতা-৩। নয় টাকা।

অমৃতলাল নাগর

গত কয়েকটা দশকে, প্রতিবেশী সাহিত্য, হিন্দী-সাহিত্যের, বিশেষ করে উপন্যাসের ক্ষেত্রে রীতিমতই উন্নতি ঘটেছে। এবিষয়ে বাঙলা সাহিত্যের পাঠকরা সামান্য উল্লেখ্য পরিমাণেও ওয়াকে[illegible] ছিলেন না। তবে হালে হচ্ছেন। প্রেমচন্দ, যশপাল প্রমুখের কিছু কিছু উপন্যাসের মাধ্যমে। এই কিছু কিছুর মধ্যেই পড়ে শ্রী নাগরের লেখা একাধিক উপন্যাসও। যদিও 'অমৃত ও বিষ' এই লেখকের বহু আলোচিত ও পুরস্কার-প্রাপ্ত উপন্যাস তবু বিন্দু ও সিন্ধু—কেও তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে স্বচ্ছন্দেই ধরে নেওয়া যেতে পারে—এটি পড়ার পর।

দু'শো চুয়াত্তর পাতার এই উপন্যাসটির 'ক্যানভাস'-টিও বিরাট। অসংখ্য চরিত্র। এরকম ক্ষেত্রে লেখকের প্রধান সমস্যাটা হয়—কাহিনীর স্বচ্ছন্দ গতিকে অব্যাহত রাখা। এই উপন্যাসে সে সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। এটাই সবচেয়ে বড় কথা। অর্থাৎ বিরাট ক্যানভাস। সফল চিত্রায়ণ। পটভূমি লক্ষ্ণৌ শহর থেকে শুরু করে গোমতী নদীর তীর মথুরা-বৃন্দাবন-গোবর্ধন পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। বিষয়বস্তুর মূলে অংশ জুড়ে আছে—লক্ষ্ণৌ শহরের 'চৌক' জীবনযাত্রা। প্রধান তিনটি চরিত্র—সজ্জন, কর্নেল ও মহিপাল। বুদ্ধিজীবী সমাজের প্রতিনিধি। সজ্জনের চোখ দিয়ে দেখানো হয়েছে শহরের গলি-ঘুঁজির মানুষগুলোকে আর তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে। এবং এই দেখানোর কাজটা নিখুঁতভাবেই সম্পন্ন করতে পেরেছেন লেখক। বেশ কিছু বিভিন্ন স্তরের চরিত্র ও বিচিত্র চরিত্র-প্রবণতা উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও সেগুলিকে নিয়ে স্বচ্ছন্দে লেখক নাড়াচাড়া করতে পেরেছেন। বক্তব্য—সিন্ধু অর্থাৎ সমাজের প্রতিটি বিন্দু অর্থাৎ মানুষ যদি [illegible] তাদের ভেদাভেদ ভুলে [illegible] সততার প্রতি অনুগত হন, [illegible] সমাজও সুন্দর হবে। বক্তব্য আছে, [illegible] উপন্যাসটি কোথাও বক্তব্য প্রধান হ[illegible] ওঠেনি, ফলে কাহিনীর গতি কোথা[illegible] ব্যাহত হয়নি। ফলতঃ কাহিনীটি পাঠকে[illegible] আকৃষ্ট করবে ভালোমতই। অনুবাদ স্বচ্ছন্দ। —দাম একটু বেশী কেন [illegible] এন-বি-টি-র অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য সুলভ মূল্যে প্রতিবেশী সাহিত্যের সঙ্গে এদেশের সাহিত্য পাঠককে পরিচিত করানোর ব্যাপারটি কি ব্যাহত হয়নি?

বিন্দু ও সিন্ধু—অম[illegible] নাগর। অনুবাদক—শ্রীমতী [illegible] কুমার। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া। নয়াদিল্লী। একুশ টাকা [illegible] পয়সা।

উর্দু গল্প সংকলন

ইদানীং ভারতের বিভিন্ন ভাষায় রচি[illegible] সাহিত্যের কিছু কিছু অনুবাদকর্ম আমাদের হাতে আসছে। এই বিষয়ে দিল্লির ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট সার্থক ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় এক একটি ভাষার শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট রচনাবলী অনুবাদে ব্রতী হয়েছেন। আলোচ্য বইটি উপজীব্য উর্দু গল্প। সংকলনে কৃষণ চন্দর, রাজেন্দ্র সিংহ বেদী ও ইস্পত চুগতাই এ[illegible] গল্প নেওয়া হয়েছে।

জীবনের প্রতি গভীর মমতা ও সহানুভূতি কৃষণ চন্দরের রচনাকে নিবিড়ভাবে মানবিক রসাশ্রয়ী করে তুলেছে। বাস্তব জীবন ও ঘটনার বিশ্লেষণে [illegible] সিং বেদী অসামান্য কলানৈপুণ্যের [illegible] দিয়ে থাকেন। একটি বিষয়কে তার যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে সমেত গল্পে উপস্থাপিত করে

সিদ্ধহস্ত। ইস্মত চুগতাই উর্দু তোর একজন প্রথম শ্রেণীর গল্প কা। তিনি জটিল মানব মনের অলি- খবর রাখেন। সাধারণত দেখা যায় লেখিকারা নারী নিজেদের কথা স্পষ্ট করে লিখে উঠতে পারেন না। ক আড়ষ্টতা তাঁদের কলমের রাশ টেনে ইস্মত চুগতাই এর ব্যতিক্রম। খুব কথা খরচ করে তিনি নারী চরিত্রকে ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। তাঁর ভাষাও বেশ পরিশীলিত। তিন রকমের তিনজন লেখক, লেখিকার গল্প সংকলিত হয়ে উর্দু সাহিত্যের বহু বিচিত্রগামী পথের কিছুটা হদিশ আমরা এই সংকলন থেকে জানতে পারি।

লেখাগুলি অনুবাদ করেছেন ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর ভাষা ক্ষেত্রবিশেষে কেতাবী ও আড়ষ্ট হলেও, মোটামুটিভাবে কাজ চলে যায়। সংক্ষেপে সার্থক একটি ভূমিকা লিখেছেন অখতর উরেন্বী। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট এ রকম বই আরও বের করলে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য উপকৃতই হবে।

কথা ভারতী : উর্দু গল্প সংকলন : প্রথম খণ্ড। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়া দিল্লি। দাম ১৩-০০ টাকা।

চিঠিপত্র

সৎ পাঠকের অভিনন্দন পাবে

সুন্দর ছিমছাম প্রচ্ছদসহ অমৃতে দিন ১৩৮৭ সংখ্যাটি নানা পত্রিকার সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সূচী- চোখ ফেললে এর রচনার বিষয়বিন্যাস হই সৎ পাঠকের অভিনন্দন লাভ । ছাপা গতানুগতিক, শেষের দিকে জায়গায় অতিরিক্ত কালি পড়ার অক্ষরগুলি দুর্বোধ্য হয়ে গেছে।

সূচীপত্রে দেখলাম শুধু নাটক, াস ও গল্পগুলিকে ব্র্যাকেটে চিহ্নিত হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য রচনাগুলি পর্যায়ভুক্ত তা লেখা হয় নি। অমৃতে র জন্য ভাল লেখা সংগ্রহের কোন বিধা নেই তা সত্ত্বেও একাধিক কের দুখানা করে রচনা কেন প্রকাশ হয়েছে বুঝলাম না। সংখ্যাটিতে তা স্থান পায় নি। কবিতা কি বিনো- খোরাক জোগাতে অসমর্থ ? সম্পা- য়টি ছোট কিন্তু বাহুল্যবর্জিত হওয়ায় ভাল লাগল।

আলোচ্য সংখ্যাটির সবচেয়ে বড় দি হল জীবনীমূলক রচনাগুলি। এই য়ের সব কটি লেখাই সুন্দর। শচীন র লেখা 'স্বয়ং কন্দর্প দুর্গাদাস' র আলোকচিত্র খুব ভাল লাগল, তবে গুলি মোর পদ্মেরই দল' রচনার কটি ছবিতে ক্যাপশন দেওয়া হয় নি। দ্রনাথ ছিলেন অতুলপ্রসাদের চেয়ে স দশ বছরের বড়। এই দুই অসম ী কবিবন্ধুর মধ্যে অন্তরঙ্গতা কতটা এ সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের উৎসুক্য খুবই স্বাভাবিক। সেদিক থেকে তিবন্ধ রবীন্দ্রনাথ - অতুলপ্রসাদ' টি সফল।

পরিতোষ সেনের লেখার সঙ্গে করা পরিচিত, সে জন্য নতুন করে সা করা বাহুল্যমাত্র। তবে 'প্রসন্ন- র' রচনাটিতে প্রসন্নকুমারকে বর্ণনা হয়েছে বার্কাতত্ত্বসম্পন্ন পুরুষসিংহ বে অথচ স্বয়ং লেখক কর্তৃক চিত্রিত সট্রেশনগুলিতে আঁকা হয়েছে কামিং- ফিগার হিসাবে। এই লেখকের লেখা ন্নকুমার' এবং 'আমি' রচনা দুটিতেই সট্রেশনগুলি অত্যন্ত বাজে হয়েছে। অঙ্গসজ্জা যদি উচ্চমানের না হয়, ওসব বোধহয় না দেওয়াই ভাল। কোনও রচনা পড়ার সময় নায়ক-নায়িকা অথবা ঘটনা- বলীর যে ছবি পাঠক তার কল্পনায় এঁকে নেয় তার সঙ্গে ইলাসট্রেশনের মিল না থাকলে পাঠক রচনাটির উপর, তা যত উৎকৃষ্ট হোক না কেন, বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। পাঠককে চটান কি ঠিক ?

এই লেখকের লেখা আমি রচনাটিতে একটি আট কিংবা নয় বছরের শিশু মেয়ে- দের দেহগত যে সব ব্যাখ্যা দিয়েছে ঐ বয়সী কোন শিশুর পক্ষে তা অবাস্তব। এগুলি পরিণত বয়সে বিকৃত মনের পরি- চয়। শিশুটি কলতলায় বাড়ীর মেয়েদের স্নানের দৃশ্য উপভোগ করে বর্ণনা দেয়, 'সকালবেলার মোলায়েম আলো তাদের ভেজা বক্ষস্থলে নেচে নেচে বেড়ায়।' আবার শিশুটি তার বাবার সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ী করে বেড়াতে বেরিয়ে রাস্তার দু পাশে নানা পশরার মধ্যে যাত্রা-থিয়েটারের পোশাকের নানা রকম জামা-কাপড় এমন কি 'কৃশতনু যুবতীর বক্ষস্থল' নজর করে। একদিন মধ্য রাত্রে শিশুটির বিছানায় এসে আশ্রয় নেয় 'ভরা যৌবনা এক নিকট আত্মীয়া' ও শিশুটির এক দাদা। চোখ বুজে শিশুটি শুনতে পায় 'কাপড়ের খসখসানি, চুড়ি- বালার ঠুনঠুনানী ঝুনঝুনানী এবং আরো অপরিচিত নানা আওয়াজ।'

শিশুটির বিকৃত কল্পনা শক্তিকে একেবারে ক্লাইম্যাক্সে তোলা হয়েছে যেখানে আরেক দিন মধ্য রাত্রে উক্ত আত্মীয়টির প্রায় নিরাবরণ উপবিষ্ট পশ্চাদপ্রদেশ দেখে শিশুটি তার শরীরে অনুভূত বিচিত্র রোমাঞ্চের বর্ণনা দিয়েছে। শুধু তাই নয় সেই নির্জন নিশুতি রাত্রে শিশুটি নারী- দেহের পশ্চাদ ভাগের সঙ্গে তানপুরার একটা উপমা গড়ে তুলতেও সক্ষম হয়েছে। নিছক ইলাসট্রেশনের লোভ সামলাতে না পেরে লেখক সেটিও চিত্রিত করেছেন। এতে এমন সুন্দর পত্রিকাটির পরিচ্ছন্নতা ক্ষুন্ন হয়েছে এবং একজন মহিলা পাঠিকা হিসাবে অমৃতের পাতায় নারীদেহের এ ধরনের ছবি প্রকাশের আমি বিরোধী।

অদ্রীশ বর্ধনের লেখা 'লোহার কোট' একটি ডিটেকটিভ নভেল। নেহাৎ চলনসই, এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলার মত কিছু নয়। ডিটেকটিভ গল্প মাত্রেই শিশু বয়সে সকলের খুব প্রিয় হয়। কিন্তু পরিণত বয়সে, খুব উচ্চমানের না হলে, মন টানে না।

গল্পগুলির মধ্যে বরেন গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত 'কুকুর' গল্পটি নতুনত্বের দাবী রাখলেও শেষটা একটু অতিরঞ্জিত। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'চন্দনের গন্ধ' একটি বয়োত্তীর্ণ সৃষ্টি। মনকে শুধু নাড়াই দেয় না, মনের গোপন অংশকে গভীরভাবে অধিকার করে বসে।

অমিতাভ চৌধুরীর লেখা 'স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' অনবদ্য রচনা, ভারী সুন্দর ছবির মত। এত বেশী জীবন্ত যে পড়তে পড়তে একাত্ম হয়ে যেতে হয়। শান্তি- নিকেতনের সে যুগের পরিবেশ এই রচনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। আগামী দিনের পাঠক- দের কাছে এটির মূল্য অনেক বেশী।

মৃণাল সেনের লেখা 'কেন বাংলা ছবি করছি না' চমৎকার, বক্তব্য ঝরঝরে। তবে তৃপ্তি মিত্র একেবারেই নিরাশ করেছেন। নাটকটির বিষয়বস্তু যেমন বহুচর্চিত তেমনই মামুলী। বর্তমানের নাট্য আন্দো- লনের যুগে লেখিকার কাছ থেকে আমি আরও অনেক বেশী আশা করেছিলাম।—রেখা দত্ত, ১২ সী প্লিম্পস, ওরলি হিলস, বোম্বাই-১৮।

মুগ্ধ হচ্ছি

শ্রীঅনন্ত সিংহের লেখা 'যাদের দেখেছি' পড়ে মুগ্ধ হচ্ছি।

শ্রীঅনন্ত সিংহের অন্যান্য কোন লেখাও কি অমৃতের মাধ্যমে পেতে পারি ? আশা করতে পারি ?—উদয়াদিত্য বসু, ১০ সৈয়দ আমির আলি এভেনিউ, কলি- কাতা-১৭।

সিংভূম জেলার ইউরেনিয়াম খনি

পরমাণু শক্তি \ ভারত ও চীন

১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ মে। ভারতীয় পরমাণু-বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাসে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে এই দিনটি। এই দিন রাজস্থানের মরুভূমির মধ্যে পোখরান নামে একটি জন-বসতিশূন্য অঞ্চলে মাটির তলায় পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল। ভারতীয় পারমাণবিক শক্তি সংস্থার পরমাণু বিজ্ঞানীদের এই অবিস্মরণীয় সাফল্য বিশ্বময় বিশেষ উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। পরীক্ষামূলকভাবে ঘটানো হলেও এই বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন দেশ বলে স্বীকৃতি পেয়েছে ভারত।

পারমাণবিক শক্তি যার আয়ত্তে এসেছে পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণে সে কতখানি সক্ষম এ প্রশ্ন জাগতে পারে। পারমাণবিক শক্তি আয়ত্তকারী ষষ্ঠ দেশ হিসেবে মর্যাদা পাওয়ামাত্র ভারত পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে পারবে কিনা এ প্রশ্ন দেশ-বিদেশের জনগণের মনে উঠেছে।

এ প্রশ্নের কোন উত্তর অবশ্য ভারতীয় পারমাণবিক শক্তি সংস্থার বিজ্ঞানীরা দেননি। তাঁরা বলেছেন যে ভারত পারমাণবিক শক্তিকে গঠনমূলক কাজে লাগাবে, ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপে নয়—কাজেই এদেশে পারমাণবিক বোমা তৈরির কোন প্রশ্ন ওঠে না।

পারমাণবিক বোমা অর্থাৎ এ্যাটম বোমা তৈরির প্রশ্ন না উঠলেও প্রশ্নটাকে মন থেকে মুছে ফেলা যায় না। তাই পোখরান-এর বিস্ফোরণের পরে নানা মহলে এই প্রশ্ন নিয়ে বিস্তর জল্পনা-কল্পনা ও আলোচনা হয়েছে। কিন্তু দেশবিদেশের মানুষদের কৌতূহলের চাপে পড়া সত্ত্বেও ভারতীয় পারমাণবিক শক্তি সংস্থার চেয়ারম্যান ডক্টর এইচ. এন. শেঠনা শুধু বলেন যে পারমাণবিক শক্তিকে ভারত পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করেছে। আমাদের দেশ পারমাণবিক শক্তির দেশ। এর বেশি কোন কথাই তিনি বলতে চান নি।

ভারত অংশ লিখেছেন সংকর্ষণ রায়

চীন অংশ লিখেছেন সুধাংশুকুমার ঘোষ

পারমাণবিক শক্তিকে যে আয়ত্ত করেছে তার পক্ষে পারমাণবিক বোমা বানানো সম্ভব কিনা এ প্রশ্নের উত্তর পরমাণু-বিজ্ঞানীরা না দিলেও সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে প্রশ্নটিকে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে পোখরান-এর পারমাণবিক বিস্ফোরণ কী-ভাবে ঘটেছিল সে সম্পর্কে প্রকাশিত তথ্যের দিকে পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

যে-কোনও বস্তুর পরমাণুর মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে প্রচণ্ড শক্তি। পরমাণুকে বিদীর্ণ করে তার বস্তু-সত্তা ঘুচিয়ে দিলে এই শক্তি মুক্তি পায়। এই মহাশক্তির স্বরূপ আবিষ্কার করেছিলেন আইনস্টাইন—বস্তুর পরমাণু থেকে আহরিত শক্তিকে তিনি বেঁধেছিলেন একটি গাণিতিক সূত্রের মধ্যে। তাঁর এই সূত্রটি অনুসরণ করে বিভিন্ন বস্তুর পরমাণু বিদারণের প্রয়াস করা হতে থাকে। বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছিল তেজস্ক্রিয় ধাতুর পরমাণু নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে। য়ুরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় ধাতু তেজ বিকীরণ করে তাদের বস্তুসত্তা সর্বদাই অতিক্রম করে যাচ্ছে। বাস্তসত্তা অতিক্রমণের প্রবণতার দরুণ তাদের পরমাণু বিদীর্ণ করা সম্ভব হ... সাইক্লোট্রোণ নামক যন্ত্রের আধারের মধ্যে আমেরিকার বিজ্ঞানী ফার্মি প্রথম ঘটালেন এই অঘটন—য়ুরেনিয়ামের পরমাণুর কেন্দ্রে আঘাত হেনে তাকে প্রচণ্ড শক্তিতে রূপান্তরিত করলেন। সেই শক্তিকেই সক্রিয় হয়ে উঠতে দেখেছি আমরা বিভিন্ন পারমাণবিক বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে।

বোম্বাইয়ের ট্রম্বেতে ভারতীয় পারমাণবিক শক্তি সংস্থা পারমাণবিক চুল্লী নির্মাণ করেছেন—তার মধ্যে য়ুরেনিয়ামের পরমাণুকে বিশ্লিষ্ট করে তাকে প্লুটোনিয়ামে রূপান্তরিত করা হয়। এই প্লুটোনিয়ামকে একটি নির্দিষ্ট আধারের মধ্যে বন্দী করে পোখরানে মাটির তলায় একশো মিটার নীচে পুঁতে রাখা হয়েছিল। প্লুটোনিয়ামের পাশাপাশি ছিল প্লুটোনিয়ামের পরমাণু-বিদারক নিউট্রনের উৎস। দূরবর্তী একটি বোতাম টিপতেই নিউট্রনের

পোখরান : বিস্ফোরণের আগে

পোখরান : বিস্ফোরণের পরে

…ংসটি হল উত্তেজিত এবং তার মধ্য থেকে উৎসারিত হল নিউট্রন—তারা আঘাত হানল প্লুটোনিয়াম-পরমাণুর কেন্দ্রে। সঙ্গে সঙ্গে প্লুটোনিয়ামের পরমাণু ভেঙে পরিণত হল প্রচণ্ড তেজঃপুঞ্জে, যার আত্মপ্রকাশ ঘটল প্রবল বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে। মাটির প্রায় একশো মিটার নীচে প্রচ্ছন্ন বিস্ফোরণ মাটির ওপরে বড়ো আকারের গোলাকার ঢিবি এবং ঢিবির মুখে গহ্বর সৃষ্টি করেছিল। এ থেকেই বোঝা যায় কী প্রচণ্ড ছিল এই বিস্ফোরণের পরিমাণ ছিল কুড়ি কিলোটন, হিরোশিমায় ফেলা পরমাণু-বোমার সমান। পোখরান-এর বালির তলায় বদলে তাকে কলকাতা শহরে বিস্ফোরিত করলে প্রায় সমস্ত কলকাতা শহর ধ্বংস হত।

পোখরানের বালির তলায় বিস্ফোরণের সঙ্গে জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকীতে ১৯৪৫ সালের পরমাণু বোমার বিস্ফোরণের যে কোন তফাৎ নেই পরমাণু-বিজ্ঞানীদের এই স্বীকৃতি থেকে আমরা আমাদের সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে অনুমান করতে পারি যে, যে জিনিসটি পোখরানের বালির তলায় বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তাকে অনায়াসে পরমাণু বোমার আকার দেওয়া যেতে পারে।

ভারতের পরমাণু-বোমা নির্মাণের ক্ষমতা

পরমাণু-বিজ্ঞানীরা স্বীকার করুন বা না করুন পোখরানের বিস্ফোরণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে পরমাণু বোমা তৈরি করার ক্ষমতা ভারতের আছে।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান-নীতিতে বিশ্বাসী ভারতের পারমাণবিক অস্ত্র-নির্মাণের কোন ইচ্ছা না থাকলেও আত্মরক্ষার তাগিদে পারমাণবিক অস্ত্র-নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, চীন প্রভৃতি দেশ আত্মরক্ষার তাগিদেই পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ করে যাচ্ছেন। এই সব দেশের অস্ত্রাগারে যত পারমাণবিক অস্ত্র মজুত আছে, তাদের সমবেত বিস্ফোরণে সমস্ত পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য। এ বিষয়ে প্রত্যেক রাষ্ট্রই সচেতন এবং সকলেই জানেন যে পারমাণবিক সমরে কোন পক্ষেরই জয় নেই, পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগে নিশ্চিহ্ন হবে উভয় পক্ষই। সম্ভবত এই আশংকাই ঠেকিয়ে রেখেছে তৃতীয় মহাযুদ্ধকে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জা বিশ্বব্যাপি শান্তিরক্ষায় সাহায্য করছে।

শান্তিরক্ষায় পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার অবদান সোনার পাথরবাটির মত অবিশ্বাস্য শোনালেও সত্য এই অস্বস্তিজনক সত্যকে স্বীকৃতি দিয়ে আমাদের উপমহাদেশ যদি পরমাণু-বোমা তৈরি করতে শুরু করে, পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন কোন দেশই সাহস পাবে না এদেশকে আক্রমণ করতে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিও এদেশের প্রতি আচরণে সংযত হবে—এ দেশের পারমাণবিক শক্তির চাপে সীমান্তের শান্তি কদাপি হবে না বিঘ্নিত।

অর্থাৎ এ দেশের শান্তিকে স্থায়ী ও নির্বিঘ্ন করতে চাই পারমাণবিক শক্তি সজ্জা, আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী পরমাণু-বোমা তৈরি করে গুপ্ত অস্ত্রাগারে সঞ্চয় করা।
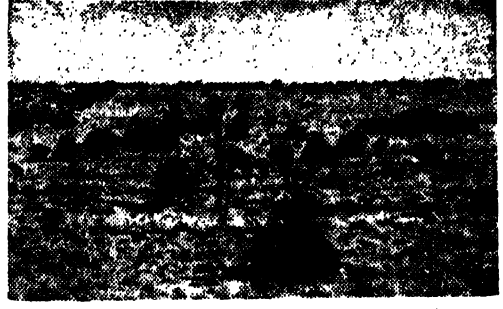
এখন প্রশ্ন উঠতে পারে ভারত মোট কটি পরমাণু-বোমা পারবে তৈরি করতে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণে কোনও রকম বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাবে না, এ বিষয়ে যা করার তা আমাদের নিজস্ব সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ীই করতে হবে।

পোখরান-এর বিস্ফোরণ প্রমাণ করেছে যে পরমাণু-বোমা তৈরির কৌশল ভারতীয় পরমাণু-বিজ্ঞানীরা আয়ত্ত করেছেন। এখন আমাদের জানা দরকার পরমাণু-বোমা তৈরীর আবশ্যকীয় উপকরণ এদেশে আছে কিনা।

পারমাণবিক শক্তির উৎস সন্ধানে

পরমাণু-বোমার প্রধান উপকরণ হল য়ুরেনিয়াম—এই তেজস্ক্রিয় ধাতুটিই হল পারমাণবিক শক্তির মূল উৎস। য়ুরেনিয়াম পাওয়া যায় য়ুরেনিয়ামযুক্ত খনিজে। আসুন আমরা এদেশে য়ুরেনিয়ামযুক্ত খনিজের ভান্ডারের খবর নিই।

ভারতে য়ুরেনিয়ামযুক্ত খনিজের খোঁজ শুরু হয়েছে ১৯৫০ সাল থেকে। গাইগার মুলার কাউন্টার বা তেজস্ক্রিয়তা মাপনী যন্ত্র নিয়ে তখন থেকে ভূতাত্ত্বিকরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যটন শুরু করেছেন, বিভিন্ন পাথরের স্তর, খনি, তামা, সীসা, দস্তা প্রভৃতি ধাতুযুক্ত খনিজের ক্ষেত্রকে য়ুরেনিয়ামযুক্ত খনিজ সর্বদাই একটি অদৃশ্য তেজ বিকীর্ণ করে ফলে যেখানে য়ুরেনিয়াম থাকে সেখানে পাথরের স্তর হয়ে ওঠে তেজস্ক্রিয়। তার ভিতর থেকে বিকীর্ণ তেজস্ক্রিয়তা সোচ্চার হয়ে ওঠে গাইগার মুলার কাউন্টার যন্ত্রের সাহায্যে।

ভূতাত্ত্বিকরা পাথরের স্তরের মধ্যে যেখানেই তেজস্ক্রিয়-

বিস্ফোরণে গড়ে ওঠা টিলার চূড়া

তার সন্ধান পান, সেখানেই শুরু করা হয় পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা ও খনন। তেজস্ক্রিয়তা-সম্পন্ন অঞ্চলে মাটির নীচে তেজস্ক্রিয় খনিজের বিস্তার প্রমাণ করার জন্য ড্রিলিং করা হয়।

এমনি করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যুরেনিয়ামযুক্ত খনিজের অনেকগুলো ভান্ডারের সন্ধান মিলেছে। এ পর্যন্ত যতটা খননযোগ্য যুরেনিয়ামযুক্ত খনিজের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে, তাদের মধ্যে যুরেনিয়ামের মোট পরিমাণ হল প্রায় সত্তর হাজার টন। ভারতীয় পারমাণবিক শক্তি সংস্থার চেয়ারম্যান ডক্টর এইচ. এন. শেঠনার মতে এই যুরেনিয়াম আমাদের দেশের কয়েক দশকের চাহিদা মেটাবে।

কটি পরমানু-বোমা?

কয়েক দশকের চাহিদার মধ্যে ডক্টর শেঠনা পারমাণবিক অস্ত্রের কথা চিন্তা করেছেন কিনা জানা নেই। চিন্তা না করলেও পরমানু বোমা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় যুরেনিয়াম সংস্থান করতে অসুবিধে হবে না বলে আমাদের ধারণা।

কেন অসুবিধে হবে না সে কথা একটু খোলসা করে বলা দরকার। পোখরাণ-এর বিস্ফোরণের অনুরূপ শক্তিসম্পন্ন পরমানু-বোমা তৈরি করতে পনেরো থেকে সতেরো কিলোগ্রামের মত প্লুটোনিয়াম দরকার। 'ব্রিডার' শ্রেণীর নিউক্লিয়ার রিএ্যাকটার-এর মধ্যে যুরেনিয়ামের বিশ্লিষ্ট করে শক্তি আহরণ করতে গিয়ে যুরেনিয়ামের একটা অংশ প্লুটোনিয়ামে রূপান্তরিত হয়। পনেরো থেকে সতেরো কিলোগ্রাম প্লুটোনিয়াম পেতে কতখানি যুরেনিয়াম রিএ্যাকটার-এর মধ্যে বিশ্লিষ্ট করতে হবে তা বুঝতে হলে এই রিএ্যাকটার-এর কার্যপ্রণালী বোঝা দরকার।

শিলাস্তর থেকে খনন করা আকরিক যুরেনিয়াম থেকে যে যুরেনিয়াম-এর নিষ্কাশন করা হয় তাতে বিদারণ যোগ্য যুরেনিয়াম (যুরেনিয়াম-২৩৫) পরিমাণ শতকরা ০, ৭, বাকিটা (অর্থাৎ শতকরা ৯৯.৩ ভাগ) হল সাধারণ যুরেনিয়াম (যুরেনিয়াম-এর ২৩৮) যাকে সরাসরি পারমাণবিক শক্তি আহরণের কাজে লাগানো যায় না। রিএ্যাকটার-এর মধ্যে এই সাধারণ যুরেনিয়ামকে প্লুটোনিয়ামে রূপান্তরিত করা যায় যুরেনিয়াম-২৩৫-এর পারমাণবিক বিক্রিয়ার সাহায্যে। প্রাগ স্মার-ক্রিয় যুরেনিয়াম-২৩৫ যৎসামান্য নিউট্রন বর্ষণের প্রবলভাবে সক্রিয় হয়ে উঠে প্রভূত পরিমাণে শক্তি উৎপাদন করতে থাকে—পরমানু বিজ্ঞানীদের হিসাবে সাড়ে তিন কিলোগ্রাম যুরেনিয়াম ২৩৫ থেকে প্রায় তিন হাজার মেগাওয়াট শক্তি উৎপন্ন হয়। যুরেনিয়াম-২৩৫ নিউট্রন দিয়ে বিশ্লিষ্ট হয়ে পরমাণু প্রতি আড়াইটা নিউট্রন সৃষ্টি করে। যুরেনিয়াম ২৩৫-এর বিদারণের কাজ চালু রাখতে ঐ আড়াইটা নিউট্রনের একটিই যথেষ্ট, বাকি দেড়টির সাহায্যে সাধারণ যুরেনিয়ামকে (যুরেনিয়াম-২৩৮) প্লুটোনিয়ামে রূপান্তরিত করা যায়।'

ধরা যাক ব্রিডার নিউক্লিয়ার রিএ্যাকটার-এর মধ্যে যুরেনিয়ামের আকর থেকে নিষ্কাশিত একশো কিলোগ্রাম যুরেনিয়াম রাখা আছে। এই একশো কিলোগ্রাম যুরেনিয়ামের মধ্যে আছে সাতশো গ্রাম যুরেনিয়াম-২৩৫। সাতশো গ্রাম যুরেনিয়াম-২৩৫ বিশ্লিষ্ট হয়ে যে নিউট্রন সৃষ্টি করবে, তার শতকরা চল্লিশ ভাগ তার বিদারণের কাজ চালু রেখে অবশিষ্ট শতকরা ষাট ভাগ নিউট্রন সাধারণ যুরেনিয়াম-এর (যুরেনিয়াম-২৩৮, যার পরিমাণ ৯৯,৩ কিলোগ্রাম) ওপরে আঘাত হেনে তাকে প্লুটোনিয়ামে পরিণত করবে। অর্থাৎ যুরেনিয়ামে ২৩৮-এর পরমানু নিউট্রনের সংযোগে সৃষ্টি করবে প্লুটোনিয়ামের পরমানু। এমনি করে সাধারণ যুরেনিয়ামের এক কিলোগ্রাম পরিণত হবে প্লুটোনিয়ামে। এই এক কিলোগ্রাম প্লুটোনিয়াম বের করে নিয়ে অবশিষ্ট সাধারণ যুরেনিয়ামের (যুরেনিয়াম-২৩৮) ওপরে প্লুটোনিয়ামের নিউট্রন বর্ষণ করে আরও দেড় কিলোগ্রাম প্লুটোনিয়াম তৈরি করা যাবে। এমনি করে একশো কিলোগ্রাম যুরেনিয়াম থেকে প্রায় দশ বা বারো কিলোগ্রাম প্লুটোনিয়াম আহরণ করা যেতে পারে।

ব্রিডার-রিএ্যাকটার-এর যে কার্যপ্রণালী ওপরে বর্ণনা করা হল, তা থেকে বোঝা যায় যে পোখরাণ-এর সমতুল্য বিস্ফোরণের জন্য প্রয়োজনীয় পনেরো থেকে সতেরো কিলোগ্রাম প্লুটোনিয়াম প্রায় দেড়শো কিলোগ্রাম যুরেনিয়ামের আকর থেকে নিষ্কাশিত যুরেনিয়াম ব্রিডার-রিএ্যাকটার-এর মধ্যে বিশ্লিষ্ট করে আহরণ করা সম্ভব। অর্থাৎ এ দেশের প্রাকৃতিক ভান্ডারে যে যুরেনিয়াম আছে, তার প্রতি দেড়শো কিলোগ্রাম যুরেনিয়াম দিয়ে একটি করে পোখরাণের অনুরূপ বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব।

আগেই বলেছি, এ দেশের প্রাকৃতিক ভান্ডারে মোট প্রায় সত্তর হাজার টন যুরেনিয়াম মজুত আছে। তার সবটাই অবশ্য আহরণ করা সম্ভব নয়। খনন এবং অন্যান্য অসুবিধের দরুণ সত্তর হাজার টন থেকে বেয়াল্লিশ হাজার টনের বেশি যুরেনিয়াম হয়ত আহরণ করা যাবে না। এই বিয়াল্লিশ হাজার টন যুরেনিয়াম দিয়ে চারশো আশিটি পোখরাণের মত বিস্ফোরণ অর্থাৎ চারশো আশিটি পরমানু বোমা তৈরি করা যেতে পারে।

এ দেশের প্রাকৃতিক ভান্ডারে যত যুরেনিয়াম আছে তার সবটা দিয়ে পরমানু-বোমা তৈরি করার কথা কোন যুদ্ধবাজও কল্পনা করবে না। যত যুরেনিয়াম প্রাকৃতিক ভান্ডার থেকে আহরণ করা যাবে তার অর্ধেকের বেশি অবশ্যই গঠনমূলক কাজ, অর্থাৎ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন, জাহাজ চালানো, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, চিকিৎসা প্রভৃতি ব্যাপারে প্রয়োগ করতে হবে। পরমানু বিজ্ঞানীদের মতে প্রায় পঁচিশ হাজার টনের মত যুরেনিয়াম এই সব জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য মজুত রাখলেই চলবে।

পঁচিশ হাজার টন বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সতেরো হাজার টন যুরেনিয়াম দিয়ে পরমানু-বোমা তৈরি করার কথা চিন্তা করা যেতে পারে। সতেরো হাজার টন যুরেনিয়াম দিয়ে একশো থেকে একশো দশটি পরমানু-বোমা তৈরি করা সম্ভব।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে পারমাণবিক শক্তিতে যে সব দেশ শক্তিমান, পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণে তারা যুরেনিয়ামের ওপরে পুরোপুরিনির্ভর করছে না—অন্যান্য মৌল বস্তুর পরমানুকেও তারা পারমাণবিক অস্ত্র-নির্মাণের কাজে লাগাচ্ছে। সে রকম পরিস্থিতির উদ্ভব হলে, এদেশেও পারমাণবিক শক্তির অন্যান্য উৎসকেও দেশরক্ষার কাজে প্রয়োগ করা হবে।'

ভারত ঃ পরমাণু-বোমা

পরমানু-বোমা তৈরির পরিকল্পনা আপাততঃ এ দেশে নেই, ধ্বংসমূলক কাজে পারমাণবিক শক্তি প্রয়োগের কথা এ দেশে কেউই চিন্তা করছেন না। যা কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা চলছে তা সীমাবদ্ধ আছে শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে। কিন্তু আমাদের পরিকল্পনা ও কল্পনা শান্তির পথে যতই এগিয়ে যাক না কেন, দেশের স্বাধীনতা ও সংহতি রক্ষার জন্য পারমাণবিক শক্তি প্রয়োগের চিন্তা না করলে চলে না, কারণ পৃথিবীর শক্তিমান দেশগুলি অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত।

আমাদের দেশ পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হবে কিনা তার সিদ্ধান্ত দেশের কর্ণধাররা নেবেন। আপাততঃ আমরা এইটুকু জেনে খুশি হতে পারি যে পারমাণবিক শক্তিতে আমরা পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন দেশগুলির তুলনায় হীন নই। দরকার হলে পরমাণু বোমা তৈরি করার ক্ষমতাও যে আমাদের আছে দেশের মানুষদের তা জানা দরকার। তার জনাই আমার এই প্রবন্ধের অবতারণা।

চীন

'ভারতের প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তার জন্য পারমাণবিক অস্ত্রের প্রয়োজন নেই। পারমাণবিক অস্ত্র কেবল ধ্বংসের জন্য, যুদ্ধ জয়ের জন্য নয়। অতএব ভারত কখনও পারমাণবিক অস্ত্রের বিকাশ এবং উৎপাদন করবে না'।

প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইর উপরিউক্ত সুনিশ্চিত উক্তি তথা সিদ্ধান্তে ভারতের বিদগ্ধ সমাজে বিশেষ করে রাজনৈতিক এবং সমরবিদ মহলের একাংশে বেশ কিছুটা সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের বক্তব্য যেহেতু চীন পারমাণবিক অস্ত্রবিদ্যা তথা বিকাশ এবং উৎপাদনে অনেকদূর এগিয়ে আছে, সেহেতু চিরকালের জন্য পারমাণবিক অস্ত্রের বিকাশ থেকে বিরত থাকা ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তথা সামগ্রিক নিরাপত্তার পরিপন্থী হবে। এতে করে চীনকে পারমাণবিক ব্ল্যাকমেলের সুযোগ দেয়া হবে।

সত্যিই চীনের ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক শক্তি কেবলমাত্র ভারত নয়, চীনের আশেপাশে অবস্থিত এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশগুলির প্রায় সকলকেই উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। বলাবাহুল্য এই উদ্বেগ থেকে পৃথিবীর প্রধানতম দুই শক্তি, আমেরিকা এবং রাশিয়াও বাদ যায় না। উপরন্তু তাদের আশংকা আরও বেশী এবং সুদূরপ্রসারী। সে যাই হোক, এই প্রসঙ্গে চীনের পারমাণবিক শক্তির বিকাশ এবং পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদনসূচীর পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

গত ১৭ সেপ্টেম্বর চীন তার ২২তম পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। স্মরণ থাকতে পারে যে ১৯৬৪ সালের ১৬ অকটোবর চীন সর্বপ্রথম পৃথিবীর পারমাণবিক গোষ্ঠীতে প্রবেশ করে। এটা সম্ভব হয়েছিল একটি হিরোসিমা-শ্রেণীর ২০ কিলোটন ফিসন বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত চীন আর পিছন ফিরে তাকায় নি। বস্তুত গত ১৩ বছরে চীন পারমাণবিক প্রতিযোগিতায় একের পর এক রেকর্ড সংযোজন করে গেছে। প্রথমত, ফিসন (পরমাণু বিভাজন) প্রথায় প্রথম বোমা বিস্ফোরণের তিন বছরের ভিতরেই চীন তার প্রথম ফিউসন প্রথায় (হাইড্রোজেন বোমা) বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। স্মরণ থাকতে পারে এ-ব্যাপারে আমেরিকার সময় লেগেছিল সাত বছরের ওপর, রাশিয়ায় ৪ বছর, বিটেনের সাড়ে চার বছর এবং ফ্রান্সের সাড়ে আট বছর। এ ব্যাপারে চীন অবশ্য পূর্বসূরীদের অভিজ্ঞতা থেকে লাভবান হয়েছিল, তবুও এখানে পিকিং সরকারের তৎপরতা এবং অনুসন্ধিৎসার অবশ্য স্বীকার্য। দ্বিতীয়ত, চীন তার প্রথম বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল উর্বর ইউরেনিয়াম (ইউ-২৩৫) জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে, যেখানে অন্যান্য সব পারমাণবিক শক্তি (ভারতসহ) তাদের প্রথম বিস্ফোরণের জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করেছিল প্লুটোনিয়াম (পি. ইউ ২৩৯), এবং এটাই প্লুটোনিয়াম ব্যবহারের স্বাভাবিক এবং সহজ পন্থা। তৃতীয়তঃ, পারমাণবিক শক্তিগুলির ভিতর চীনই প্রথম বিস্ফোরণ ঘটাবার জন্য ইমপ্লোসন পদ্ধতির ব্যবহার করেছিল। অন্যান্য পূর্বসূরীরা পুরানো প্রচলিত, সহজ 'গান ব্যারেল' পদ্ধতির ব্যবহার করেছিল। (প্রসঙ্গত ভারতও তার পোখরানের বিস্ফোরণের জন্য ইমপ্লোসন প্রথার ব্যবহার করেছিল)। এছাড়া, চীনই বোধহয় একমাত্র দেশ যেখানে সমগ্র পারমাণবিক শক্তির বিকাশ এবং কর্মসূচী প্রধানত দেশের সামরিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং হচ্ছে। চীনের কোন বড় রকমের শান্তির জন্য পারমাণবিক শক্তির সূচী আছে বলে জানা নেই। প্রসঙ্গত এ বিষয়ে চীনের কার্যধারা ভারতের সম্পূর্ণ বিপরীত।

আজ পর্যন্ত চীন ২২টি পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে (নীচের টেবল দ্রষ্টব্য)। এর ভিতর সাতটি বিস্ফোরণ ছিল হাইড্রোজেন বোমা এবং এর সবগুলি ছিল মেগাটন শক্তির। এছাড়া তিনটি বিস্ফোরণ ঘটান হয়েছিল মাটির তলায়; এবং বাকি ১৯টির ভিতর প্রায় ১০টি বোমা ফেলা হয়েছিল বোমারু বিমান থেকে, তিনটি ফেলা হয়েছে উঁচু বুরুজ থেকে এবং একটি (৪র্থ বিস্ফোরণ) ছোঁড়া হয়েছিল মধ্য দূরত্বের রকেটের সাহায্যে। শেষের কয়েকটি বিস্ফোরণের পরিবহন পদ্ধতি এখনও জানা যায়নি। খোলা আবহাওয়ায় বিস্ফোরিত সবকয়টা বোমাতেই প্রধান জ্বালানি হিসাবে ইউরেনিয়াম-২৩৫ ব্যবহৃত হয়েছে। তবে কোনো কোনো পরীক্ষায় যেমন অষ্টম বিস্ফোরণে, প্লুটোনিয়ামের চিহ্নও পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া, হাইড্রোজেন বোমায় লিথিয়াম এবং ভারী জলের প্রযুক্তি বিদ্যাও চীনের জানা আছে বলে প্রমাণ মিলেছে। ২২টি পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের ভিতর কেবলমাত্র একটি পরীক্ষা (সপ্তম) বিফল হয়েছিল বলে জানা গিয়েছিল। ২৪ ডিসেম্বর ১৯৬৭তে এই বিস্ফোরণ ঘটাবার চেষ্টা হয়েছিল, এবং পরবর্তীকালে (জানুয়ারী ১৯৭২) প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই এই বিফল পারমাণবিক পরীক্ষাটির কথা মেনে নিয়েছিলেন।

সবকটি পারমাণবিক বিস্ফোরণের ঘটনা ছিল সিংকিয়াং প্রদেশের মরুপ্রান্তরে।

১৬ পাতার চার্ট দেখে বোঝা যাবে অপেক্ষাকৃত সামান্য কয়েকটি পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের দ্বারা চীন তার পারমাণবিক শক্তির দ্রুত প্রসারণ করেছে এবং এদিক থেকে চীনের কৃতিত্ব অন্যান্য পারমাণবিক শক্তির তুলনায় বেশী। একথা বলেছিলেন আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মেলভিন লেয়ার্ড ১৯৭০-এর ফেব্রুয়ারী মাসে। তারপর ইয়াংসী নদী দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে এবং এর ভিতর আরও ১১টি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পারমাণবিক পথে চীন আরও অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে।

চীন বর্তমানে পারমাণবিক বোমার ক্ষুদ্রাকৃতি ধরনের প্রচেষ্টায় উঠেপড়ে লেগেছে। আকৃতিতে ছোট এবং ওজনে কম অথচ ধ্বংসশক্তিতে বৃহৎ বোমার সুবিধা হল সেগুলি শুধু দূরপাল্লার বোমারু বিমানে নয়, ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমেও অনেক দূরে দূরে লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। চীন এ বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি করেছে এবং চীনের প্রথম ৩-৪ মেগাটন আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের উপযোগী বোমার ওজন দাঁড়াবে ৪,০০০ পাউণ্ডের কাছাকাছি। এও জানা গেছে যে চীনের সর্বশেষ এবং সর্ববৃহৎ হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের (২১তম বিস্ফোরণ) মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মেগাটন শক্তির বোমার ক্ষুদ্রাকৃতিকরণ।

এছাড়া চীন স্বল্পশক্তির পারমাণবিক বোমার—যেগুলো মুখ্যক্ষেত্রে স্বল্পপাল্লার ফাইটার বিমান বা আরটিলারীর সাহায্যে ব্যবহার করা যায়—বিকাশের জন্য প্রচেষ্টা করছে বলে যানা যায়। মাটির তলায় বিস্ফোরণ করার মুখ্য উদ্দেশ্য হল 'ট্যাকটিক্যাল' পারমাণবিক অস্ত্রের বিকাশ ও উৎপাদন প্রচেষ্টা। মনে রাখতে হবে চীন ১৯৬৩ সনের 'পারসিয়াল টেস্ট ব্যান ট্রিটিতে' স্বাক্ষর দেয়নি, এবং সেহেতু তার খোলা আবহাওয়ায় বিস্ফোরণ ঘটাবার আইনানুগত বাধা নেই (যদিও নীতিগত বাধা রয়েছে)। তবুও চীন মাটির তলায় একাধিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে মুখ্যত 'ট্যাকটিক্যাল' বোমার বিকাশের উদ্দেশ্যে।

পারমাণবিক চুল্লী এবং অন্যান্য কারখানা

১৯৫৮ সালের জুন মাসে চীনের প্রথম ১০,০০০ কিলোওয়াট শক্তির ভারী জল শ্রেণীর পরীক্ষামূলক পারমাণবিক চুল্লীর কাজ সুরু হয়। পিকিংএ অবস্থিত এই গবেষণামূলক রিএক্টরটি রাশিয়ার আর্থিক এবং কারিগরী সাহায্যে নির্মিত হয় (এ ছাড়া,

রাশিয়া অন্যান্যভাবেও ১৯৬০ পর্যন্ত চীনের পারমাণবিক শক্তি বিকাশের প্রভূত সাহায্য করে।) তারপর প্রায় দু দশক পেরিয়ে গেছে, এবং এই সময়ের ভিতর চীনে কম করে অন্তত ৪০টি পারমাণবিক সংক্রান্ত কারখানা বা কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলিতে গবেষণা ব্যতিরেকে নানাবিধ পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের বিকাশ ও উৎপাদন হয়ে থাকে। এগুলির ভিতর অন্ততঃ নিম্নলিখিত ৫টি কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য।

১। ল্যানচাউ গ্যাস প্রসারণ কারখানা : চীনের পারমাণবিক অস্ত্র বিকাশ ও উৎপাদনের দিক থেকে এই কারখানাটির গুরুত্ব সর্বাধিক। কানসু প্রদেশের ল্যানচাউ শহরে অবস্থিত এই কারখানাটি স্বাভাবিক ইউরেনিয়াম থেকে অস্ত্র তৈরীর উপযোগী উর্বর ইউরেনিয়াম-২৩৫ তৈয়ারী করে। (প্রতি ১,০০০ স্বাভাবিক পারমাণবিক আইসোটোপের (ইউ-২৩৮) ভিতর কেবলমাত্র সাতটি রেডিও একটিভ আইসোটোপ (ইউ-২৩৫) পাওয়া যায়। বিভিন্ন উর্বরীকরণ পদ্ধতিতে ইউ-২৩৫ আইসোটোপের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়)। গ্যাস প্রসারণ পদ্ধতিতে ইউরেনিয়াম উর্বরীকরণের জন্য প্রচুর বিদ্যুৎ-শক্তির প্রয়োজন হয়, এবং এই বিদ্যুৎ নিকটবর্তী পীত নদীর উপরে নির্মিত এক মিলিয়ন কিলোয়াট শক্তিসম্পন্ন লিউ-চি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নেয়া হয়। ল্যানচাউর গ্যাস প্রসারণ কারখানাটি রুশীদের সাহায্যে ১৯৫৭ সালের শেষের দিকে কিংবা ১৯৫৮ সালের প্রথমে সুরু হয়। চীন খুব সম্ভব পাঁচ থেকে ১০ শতাংশ পর্যন্ত ইউরেনিয়াম উর্বরীকরণের পদ্ধতি রাশিয়ার নিকট থেকে শিখে নিয়েছিল। (অস্ত্র নির্মাণের উপযোগী হতে হলে ইউরেনিয়ামকে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ উর্বর করতে হবে)। ১৯৬০ সালের আগস্ট মাসে রুশবাসীরা দেশে ফিরে গেলে চীনেরা নিজেদের প্রচেষ্টায় ল্যানচাউ কারখানায় উন্নতি এবং নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করে, এবং শীঘ্রই এখানে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরী করার উপযোগী ইউ-২৩৫-এর উৎপাদন আরম্ভ হয়। ১৯৬৪-এর অক্টোবরে বিস্ফোরিত প্রথম বোমার জন্য এখান থেকেই ইউ-২৩৫ গিয়েছিল। বর্তমানে ল্যানচাউ প্লান্ট প্রতি বছরে প্রায় ৩৭৫ কিলোগ্রাম ইউ-২৩৫ তৈয়ারী হয়।

(২) ল্যানচাউ গ্যাস কেন্দ্রাতিগ কারখানা : চীন মনে হয় গ্যাস সেন্ট্রিফিউজ পদ্ধতিতেও ইয়োরেনিয়াম উর্বর করতে শিখে নিয়েছে। এ পদ্ধতির প্রযুক্তিবিদ্যা অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য হলেও এটা অল্পব্যয়সাপেক্ষ, কেননা এ পদ্ধতিতে সামান্য বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। ল্যানচাউয়ের উত্তরে আলাসান পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই কারখানাটিতে সবেমাত্র উৎপাদন সুরু হয়েছে। বর্তমান উৎপাদনের পরিমাপ অবশ্য জানা যায়নি, তবে ভবিষ্যতে এই কারখানাটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে বলে পশ্চিমা বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

(৩) উমেন পারমাণবিক চুল্লী : কানসু প্রদেশের উমেন শহরে অবস্থিত এই ৬০০ মেগাওয়াটের রিএক্টরটিতে বৎসরে প্রায় ২০০ কিলোগ্রাম অস্ত্র তৈয়ারীর উপযোগী প্লুটোনিয়াম (পি ইউ-২৩৯) উৎপাদন হয়। ২০০ কিলোগ্রাম পি ইউ-২৩৯ থেকে অন্তত পক্ষে ৪০টি হিরোসিমার উপরে ফেলা বোমার আকারের বোমা (২০ কিলোটন) তৈয়ারী করা যায়। উমেন রিএক্টর ১৯৬৭ সাল থেকে কাজ করছে।

(৪) পাওটাও পারমাণবিক চুল্লী : ভিতর মঙ্গোলিয়ার রাজধানী পাওটাওয়ে অবস্থিত ১০০,০০০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন রিএক্টরটি ১০ কিলোগ্রামের অতিরিক্ত পি ইউ-২৩৯ উৎপন্ন করে। ১৯৬৩ সালে নির্মিত এই রিএক্টরটি প্রধানত গবেষণার জন্য ব্যবহৃত হয়।

মনে হয় চীনের প্লুটোনিয়াম উৎপাদনের ক্ষমতা সীমিত, এবং এই জন্যই চীনকে বিশেষ করে ল্যানচাউয়ের ইউরেনিয়াম কারখানার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। অবশ্য চীনের ইউরেনিয়াম ভাণ্ডার যথেষ্ট সমৃদ্ধ। সিংকিয়াং-এর তিনটি বৃহৎ ইউরেনিয়াম খনি ছাড়া, তিব্বত, কিয়াংসি এবং কোয়াংটুং প্রদেশেও ইউরেনিয়ামের খনি আছে।

(৫) হাইয়েন পারমাণবিক কারখানা : চিংহাই প্রদেশের কোকোনর হ্রদের তীরে অবস্থিত এই কারখানাটি প্রধানত হাইড্রোজেন বোমার বিকাশ ও তৈয়ারীর জন্য চিহ্নিত। ১৯৬৭ সালের প্রথম হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের অব্যবহিত পরেই এই কারখানাটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে খবর পাওয়া যায়।

এছাড়া আগেই বলা হয়েছে চীনের নানা ধরনের পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র বিস্ফোরণ দ্বারা পরীক্ষা করার প্রধান কেন্দ্র হল সিংকিয়াং প্রদেশের তাকলামাকান মরুভূমির লপনোর অঞ্চলে। এখন পর্যন্ত যতগুলি পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ (মাটির তলায় সহ) হয়েছে তার সব কয়টিরই অকুস্থল এই লপনোর। লোকবসতি থেকে দূরত্ব এবং দুর্গমতার জন্য এ অঞ্চল পারমাণবিক পরীক্ষার জন্য আদর্শ স্থান। তবে সোভিয়েট সীমানা থেকে এ স্থানের নিকটত্বের জন্য এই কেন্দ্রের নিরাপত্তা সম্বন্ধে চীনের পারমাণবিক এবং সমর-বিশারদদের ভাবিয়ে তুলেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এমনও খবর পাওয়া গেছে যে চীনা সরকার লপনোর থেকে পারমাণবিক পরীক্ষা-কেন্দ্রটিকে সরিয়ে এনে তিব্বত অঞ্চলে পুনঃস্থাপিত করবার কথা বিবেচনা করছেন। তবে পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা কতদূর সম্ভব হবে বলা শক্ত। যতদূর জানা আছে অন্তত ২২তম (বা সর্বশেষ) পারমাণবিক বিস্ফোরণ পর্যন্ত লপনোর কেন্দ্র কার্যকরী ছিল।

পারমাণবিক অস্ত্রের ভাণ্ডার

চীনের পারমাণবিক অস্ত্রের পরিমাণ কত—অর্থাৎ ১৯৬৪ থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত চীন কতটি পারমাণবিক এবং হাইড্রোজেন বোমা বা অন্য প্রকারের অস্ত্র তৈরী করতে সমর্থ হয়েছে, এ সম্বন্ধে বিভিন্ন রকমের হিসাব বা মূল্যায়ন পাওয়া যায়। এর ভিতর আমেরিকার পেন্টাগনের (প্রতিরক্ষা বিভাগ) এবং লন্ডনের আন্তর্জাতিক সমরবিদ্যা সংস্থার হিসাবকেই সাধারণত গ্রহণযোগ্য বলে ধরা হয়। এদের উভয়ের মতে চীনের পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডারে দ্বিশতাধিক (লণ্ডন সংস্থার মতে ২০০ থেকে ৩০০-এর ভিতর) বিভিন্ন শক্তির পারমাণবিক এবং হাইড্রোজেন বোমা বা অস্ত্র আছে। এছাড়া লণ্ডন সংস্থা বলেছে চীনের 'পারমাণবিক অস্ত্রের ভাণ্ডার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা।'

পরিবহণ ব্যবস্থা এবং ক্ষেপণাস্ত্রের বিকাশ

অন্যান্য পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন দেশের ন্যায় চীনও ত্রয়ী পারমাণবিক পরিবহণ পদ্ধতির পক্ষপাতী। অর্থাৎ বোমারু বিমান, স্থল ভিত্তিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং জল-ভিত্তিক ক্ষেপণাস্ত্র (অর্থাৎ যে রকেট জলমগ্ন সাবমেরিন থেকে উৎক্ষিপ্ত করে নির্দিষ্ট লক্ষে পৌঁছান যায়)—এই তিনের সমাবেশ। চীনের বিমান বহরে প্রায় ৬০।৬৫টি দূরপাল্লার (১,৫০০ মাইল পর্যন্ত গিয়ে বোমা ফেলে ফিরে আসতে পারে এমন) বোমারু বিমান আছে। এই বিমানগুলি ২০,০০০ পাউণ্ড ওজনের বোমা বহন করতে সক্ষম। এছাড়া স্বল্প পাল্লার হাল্কা আই এল-২৮ বোমারু বিমান এবং এফ-৯ ফাইটার বিমানও স্বল্প ওজনের এবং ট্যাকটিকাল পারমাণবিক বোমা বহন করতে সক্ষম। চীনের বিমান বহরে প্রায় ৩০০টি আই, এল-২৮ এবং ৫০-৬০টি এফ-৯ বিমান আছে। তবে বোমারু বিমানের চাইতে ক্ষেপণাস্ত্র বা মিসাইলের উপরেই চীন বেশী জোর দিয়েছে।

খাদ্যবস্তুতে ভেজাল মেশানো খুনের সমান অপরাধ

যখন কেউ বিক্রী করার মতো খাদ্যবস্তুতে ভেজাল মেশায় তখন সে যে শুধু অনেক লাভ করতে চলেছে তাই নয় সে ঘোরতর অপরাধও করতে বসেছে।

সে অপরাধ হল আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করা। যখন সরষের তেল বা তিলের তেলে খনিজ তেল মেশানো হয় তখন সে তেল খেয়ে অন্ধত্ব বা হৃদরোগের শিকার হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এতে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা কার? আপনার, আপনাদের।

লঙ্কার গুঁড়োর সঙ্গে কাঠের গুঁড়ো মেশানো হলে তার ফল ভোগে কে? আপনি, আপনারা।

যখন দুধের সঙ্গে নোংরা জল মেশানো হয় তখন তার ফল ভুগতে হয় কাকে? আপনাকে, আপনাদের।

খাদ্যে ভেজাল মেশানো প্রতিরোধ করতেই হবে

এই ধরণের অপরাধীদের ধরার নানা উপায় আছে :

(ক) খাদ্যবস্তু যাচাই করা যেতে পারে (পদ্ধতি সরল, বাড়ীতেও করা যায়)

(খ) ফুড / স্যানিটারী / হেলথ ইন্সপেক্টরগণ আপনাদের সাহায্য করার জন্যই সর্বদাই প্রস্তুত। তাঁদের পরামর্শ নিন।

(গ) খাবার জিনিষ ল্যাবরেটরীতে বিশ্লেষণ করা যায় (এর জন্য যৎসামান্য খরচ হয়)

শাস্তি ও স্বস্তি

খাদ্যে ভেজাল নিরোধ বিধি সংশোধন করা হয়েছে অপরাধীদের কঠোরতর শাস্তি (এমন কি আজীবন কারাবাস) দেবার উদ্দেশ্যে।

কিন্তু এই আইনের সর্বাধিক লাভ নেওয়ার জন্য নাগরিকদের নিজেদের উদ্যোগী হতে হবে। আর তার জন্য সর্বপ্রথম করণীয় হল এই যে এমন এমন ঘটনা নজরে এলে আপনাদের অভিযোগ জানাতে হবে।

দোষী শাস্তি পাবেই

খাদ্যবস্তুর নাম	ব্যবহৃত ভেজাল	ভাপমিশ্রণ বা ভেজাল বার করার সরল পন্থা
ঘি বা মাখন	বনস্পতি	* একটা টেস্ট টিউবে এক চায়ের চামচটাক গলানো ঘি বা মাখন নিয়ে সমপরিমাণ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে মেশান। তাতে এক চিমটি আখের চিনি ফেলে ভালো ভালো করে মিনিট খানেক ঝাঁকিয়ে নিয়ে, তারপর মিনিট পাঁচেক রেখে দিন। টেস্ট টিউবের নীচের দিকে যদি লালচে রঙ দেখতে পাওয়া যায় তো বুঝবেন ভেজাল আছে।
দুধ	জল	* ল্যাকটো মীটারের (দুধের শুদ্ধতা পরীক্ষার যন্ত্র) রীডিং (সংকেত) ১ : ০২৬এর কম হলে বুঝতে হবে জল মেশানো হয়েছে। * চকচকে পালিশ করা কোনও খাড়া জিনিষের ওপর এক ফোঁটা দুধ দিন। যদি ফোঁটা না পড়ে বা ধীরে ধীরে একটা সাদা দাগ ফেলে গড়ায় তো বুঝতে হবে দুধ শুদ্ধ। কিন্তু ফোঁটা কোনও দাগ না রেখে চট করে গড়িয়ে পড়লে বুঝবেন ভেজাল আছে।
	স্টার্চ	* একটু দুধ নিয়ে সামান্য আয়োডিনের টিংকচার ফেলে দিন। যদি নীল রঙ ফুটে ওঠে তো বুঝবেন দুধে স্টার্চ মেশানো হয়েছে।
ভোজ্য তেল	আর্জিমোন তেল	* একটু তেল নিয়ে তাতে কনসেণ্টেটেড নাইট্রিক অ্যাসিড মিশিয়ে ধীরে ধীরে নাড়ান। অ্যাসিডে লাল বা লালচে খয়েরী রঙ ফুটে উঠলে বুঝবেন আর্জিমোন তেল মেশানো হয়েছে।
	খনিজ তেল	* দু মিলিগ্রাম তেল নিয়ে সমপরিমাণ এন/২ অ্যালকোহলিক পোট্যাশ ফেলে দিন। মিশ্রণটা ফুটন্ত জলে মিনিট পনর তাতিয়ে ১০ মিলিগ্রামের মত জল মেশান। এখন তেল যদি ঘোলা মতো দেখায় তো বুঝবেন কোনও খনিজ তেল মেশানো হয়েছে।
	রেড়ীর তেল	* একটা টেস্ট টিউবে একটু তেল নিয়ে পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে মেশান এবং নুন-বরফের সাহায্যে ঠান্ডা করুন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘোলা রঙ দেখা গেলে বুঝবেন রেড়ীর তেল মেশানো হয়েছে।
মিষ্টি, আইসক্রীম সরবৎ	মেটানি ইয়েলো (একটি অননুমোদিত আল-কাতরাজাত রঙ)	* খাদ্যবস্তুতে কয়েক ফোঁটা কনসেণ্টেটেড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ফেলে দিন। মিশ্রণে ঘোর লাল রঙ ফুটে উঠলে বোঝা যাবে যে ঐ আপত্তিকর বস্তুটি মেশানো হয়েছে।
হলুদ	(অননুমোদিত রঙ মেটানিল ইয়েলো	* একটা টেস্ট টিউবে এক চামচ হলুদ নিন। কয়েক ফোঁটা কনসেণ্টেটেড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ফেলুন। ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বেগুনে রঙ হয়ে গেলে তাতে জল মেশালেই হারিয়ে যাবে। কিন্তু জল মেশাবার পরেও বেগুনে রঙ থাকলে আলকাতরা উপজাত মেটানিল ইয়েলো মেশানো হয়েছে বলে বুঝতে হবে।

১৯৫৫ সাল থেকে চীন নানাবিধ ক্ষেপণাস্ত্র এবং মহাকাশযানের উপর গবেষণা সুরু করে। এই গবেষণা পরিচালনার ভার ছিল এবং এখনও আছে বিশ্ববিখ্যাত রকেট বিশেষজ্ঞ ডাঃ সিয়েন সুয়ে সেনের উপর। ডঃ সিয়েন ১৯৫৫ সালে চীনে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে ২০ বছর ধরে আমেরিকায় নানাবিধ রকেট এবং বিমান সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন।

আমেরিকার ১৯৭১ সালের প্রতিরক্ষা রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে চীন ষষ্ঠদশকের মাঝামাঝি সময় থেকে স্বল্প পাল্লার (১০০০-১৫০০ মাইল) ব্যালিস্টিক মিসাইলের বিকাশ এবং উৎপাদন সুরু করেছে। এবং ১৯৭০ সালের পর থেকে এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলি ব্যবহারের উপযোগী করে বিশেষ বিশেষ স্থানে জমির উপরে নির্মিত কোটরে স্থাপন করেছে। সেনসী প্রদেশে অবস্থিত কেন্দ্র থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে এই রকেটগুলি রাশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলবর্তী প্রদেশগুলি (ভ্লাডিভোস্টক প্রভৃতি) ছাড়া জাপান, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়ায়ও আঘাত হানতে পারে। এ পর্যন্ত প্রায় ৩০-৫০টি এই জাতীয় ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত আছে। গত কয়েক বছরে চীন অন্তর্বর্তী পাল্লার (১৫০০-২০০০ মাইল) ব্যালিস্টিক মিসাইলেরও বিকাশ এবং উৎপাদন করেছে। অন্তত ৩০-৪০টি এই ধরনের ক্ষেপণাস্ত্রও চারটি নির্বাচিত স্থানে ব্যবহার উপযোগী করে বসান হয়েছে। এই স্থানগুলি হল মঙ্গোলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম দিক, পিকিং-এর দক্ষিণ, দক্ষিণ-মধ্য চীন এবং কোরিয়ার সীমানা বরাবর। এই রকেটগুলি মেগাটন শক্তির পারমাণবিক হাইড্রোজেন বোমা বহন করতে পারে, এবং এগুলি ইয়োরোপীয় রাশিয়ার কিছু কিছু লক্ষ্যস্থল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ লক্ষ্যে (ভারতবর্ষ সহ) আঘাত হানতে পারে।

আমেরিকার পর্যবেক্ষক মহাকাশযান ইনার মঙ্গোলিয়ায় সিংগসিয়া হুই সীমান্তে নির্মিত সুয়াং চেংগ-সু মিসাইল চালনাক্ষেত্র থেকে এই রকেট এবং অন্যান্য উন্নত ধরনের রকেটের পরীক্ষামূলক চালনা লক্ষ্য করেছে। ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসে যখন চীন এই ক্ষেত্র থেকে প্রথম মহাকাশযান পাঠাবার ব্যবস্থা করছিল তখন আমেরিকান পর্যবেক্ষকরা ভেবেছিল হয়তো আই.সি.বি.এম-এর পরীক্ষামূলক ক্ষেপণের ব্যবস্থা হচ্ছে। (জেনে রাখতে হবে একই ক্ষেত্র থেকে মহাকাশযান এবং দূরপাল্লার মিসাইল ক্ষেপণ করা চলে, আমেরিকার যেমন কেপ ক্যানাভেরাল)।

এছাড়া একাধিক বিভাগের এক উন্নত ধরনের মধ্যপাল্লার (৩,৫০০ মাইল) ক্ষেপণাস্ত্রও চীন উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে বলে জানা গিয়েছে, তবে এই মিসাইলটি এখনও ব্যবহার উপযোগী করে সাইলোতে বসান হয়নি। আমেরিকার প্রতিরক্ষা বিভাগের মতে এই রকেটটি আসলে একটি স্বল্পপাল্লার আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র এবং এই অস্ত্রটি ১৯৭০-৭১ সালে সুয়াং চেং-সু ক্ষেত্র থেকে পরীক্ষামূলকভাবে চালান হয়েছিল। এই রকেটটি চালু হলে মস্কো সমেত সমগ্র ইয়োরোপীয় রাশিয়া, এশিয়া মহাদেশ, অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত গুয়ামদ্বীপ-এর আওতার এসে যাবে।

মূলতঃ চীনের দূরপাল্লার বিশেষ করে আই.সি.বি.এম বিকাশে নানাবিধ বাধা উপস্থিত হয়েছে বলে মনে হয়। এই বাধাগুলি প্রধানত যান্ত্রিক এবং কিছুটা আর্থিক, কারও কারও মতে রাজনৈতিক বাধাও এখানে আংশিকভাবে কাজ করছে। তাছাড়া আমেরিকার সরকারী এবং বেসরকারী মহল থেকে নানাবিধ পরস্পর-বিরোধী খবর রটনার ফলে চীনের আই সি বি এম বিকাশ সম্বন্ধে রীতিমত বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমেরিকার প্রতিরক্ষামন্ত্রী মেলভিল লেয়ার্ড ১৯৭১ এবং ১৯৭২ সালের প্রতিরক্ষা রিপোর্টে বলেছেন যে চীনের দূরপাল্লার আই, সি, বি, এম (৬,০০০ থেকে ৭,০০০ মাইল)-এর প্রথম পরীক্ষা ১৯৭৩ সালে হবে এবং ১৯৭৫ সালের ভিতর এরকম ১০ থেকে ২৫টি আই.সি.বি.এম, ব্যবহারের জন্য তৈরী থাকবে। পরের বছর (১৯৭৩-এর রিপোর্ট) লেয়ার্ড তার পূর্বের বয়ান সংশোধন করে বললেন যে চীনের আই.সি.বি,এম পরীক্ষা ১৯৭৫ সালে শুরু হবে এবং ১৯৭৬-এর মাঝামাঝি সময় ১০ থেকে ২০টি এই জাতীয় ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের জন্য তৈরি থাকবে। ১৯৭৪ সালের রিপোর্টে তদানীন্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইলিয়ট রিচার্ডসন আবার নতুন কথা শোনালেন। তাঁর মতে চীন আই.সি.বি,এম ব্যবহারের আংশিক ক্ষমতা ১৯৭৫ সালের পরে ছাড়া আগে লাভ করবে না। আর পূর্ণক্ষমতা পেতে সপ্তম দশক পেরিয়ে যাবে। এরপর ১৯৭৬ সালের রিপোর্টে তদানীন্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেমস শ্লেসিংগার পরিষ্কারভাবে স্বীকার করলেন যে চীনের দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের বিকাশ ও উৎপাদন সূচী গত কয়েক বছর ধরে বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে এবং এর প্রধান কারণ খুব সম্ভব যান্ত্রিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যার গোলযোগ। যদিও চীন গত কয়েক বছর ধরে দূরপাল্লার (৬,০০০-৮,০০০ মাইল) আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের বিকাশ এবং উৎপাদনের জন্য চেষ্টা করে চলছে, তবুও এই অস্ত্রের পরীক্ষা এখনও হতে বাকি আছে। পরীক্ষার জন্য আই.সি.বি.এমটি হয় প্রশান্ত মহাসাগরে না হয় ভারত মহাসাগরে ছুঁড়তে হবে। এই প্রকারের আই.সি.বি.এম শ্লেসিংগারের মতে, অষ্টম দশকের দ্বিতীয় ভাগের পূর্বে ব্যবহারের উপযোগী হতে পারে না। কাজেই দেখা গেল আমেরিকার প্রতিরক্ষা বিভাগ ধাপে ধাপে চীনের আই.সি.বি.এম সম্বন্ধে তাদের অভিমত পরিবর্তন করেছে। কারও কারও মতে এটা অনেকটা ইচ্ছাকৃত ছিল। ১৯৭০-৭১ সালে আমেরিকার প্রতিরক্ষা বিভাগ এ.বি.এম প্রথা চালু করবার জন্য জোরদার প্রচার চালিয়েছিল এবং তারই ফলস্বরূপ চীনের আণবিক এবং মিসাইল শক্তির ইচ্ছাকৃত অতিরঞ্জন।

সরকারের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার প্রেস এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকাও সোচ্চারে চীনের আসন্ন আই.সি.বি.এম পরীক্ষার কথা ঘোষণা করে গিয়েছে। যেমন 'এভিয়েশন উইক এণ্ড স্পেস টেকনোলজি' ১৯৭০ সালের আগস্ট মাসে খবর দিল যে চীনের আই.সি.বি.এম-এর প্রথম পরীক্ষামূলক উড্ডয়ন খুব সম্ভব এ বছরের শেষের দিকে কিংবা আগামী বছরের (১৯৭১) প্রথম দিকে হবে। বলা হয়েছিল যে রকেটটি ভারতবর্ষের উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে পশ্চিম ভারতমহাসাগরের জানজিবার দ্বীপের নিকটে পড়বে। প্রমাণস্বরূপ বলা হল যে গত কয়েক মাস ধরে প্রচুর সংখ্যক চীনা কারিগর ও ইঞ্জিনীয়ার জানজিবারে উপস্থিত হয়ে সেখানে আই.সি.বি.এম উড্ডয়নের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করবার জন্য টেলিমেট্রি যন্ত্রপাতি বসাচ্ছে। তাছাড়া চীন একটি পর্যবেক্ষণ জাহাজ ভারতমহাসাগরে পাঠিয়েছে বলেও খবর দেয়া হল। এরপর মার্চ ১৯৭৩ সালে নিউইয়র্ক টাইমস খবর দিল চীন একটি নতুন, তিন-মাত্রা তরল জ্বালানীযুক্ত ৫০০০-৭০০০ মাইল পাল্লার আই.সি.বি.এম নির্মাণ করেছে। এই নতুন রকেটটি সোভিয়েট এস.এস—৯ আই.সি.বি.এম থেকেও আয়তনে বড় বলে বর্ণনা করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল আমেরিকার প্রেরিত পর্যবেক্ষক কৃত্রিম উপগ্রহ পিকিং-এর নিকট একটি রকেট উৎক্ষেপণ ক্ষেত্রে এই আই.সি.বি.এমটিকে লক্ষ্য করেছে। তারপর ২ বছর পার হয়ে গেল, টাইমস বর্ণিত আই.সি.বি.এম-এর আর কোন হদিস পাওয়া গেল না। তারপর এইমাত্র সেদিন (জুলাই ১৯৭৭) আমেরিকার আর একটি পত্রিকা বোস্টন গ্লোব আর এক চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশ করল যে দূরপাল্লার আই.সি.বি.এম-এর পরীক্ষামূলক উড্ডয়ন এবার সত্যসত্যই আসন্ন এবং এটা ঘটবে এবার প্রশান্ত মহাসাগরে। পিকিং-এর কাছ থেকে উড়ে এসে রকেটটি পড়বে ফিজি দ্বীপের উত্তরে। এবারে প্রমাণস্বরূপ বলা হয়েছে যে কিছুদিন হল একটি বৈজ্ঞানিক জাহাজকে ফিজি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-দেখা গেছে। এ-খবর

বেরিয়েছে গত জুলাই মাসে, এখনও কিছু ঘটে ওঠার খবর পাওয়া যায়নি। চীনের আই,সি,বি,এম যে তিমিরে ছিল এখনও সেই তিমিরে।

চীনের আই,সি,বি,এম নির্মাণের বিলম্বের তিনটি কারণ দেখান হয়েছে। প্রথম কারণ, চীনের আই,সি,বি,এম-এর আদৌ প্রয়োজন নেই, কেননা চীনের প্রধান শত্রু রাশিয়াকে আক্রমণ থেকে বাধা দেবার জন্য এম,আর,বি,এম এবং ১,৫০০-৩,০০০ মাইল পাল্লার আই,আর,বি,এম'ই যথেষ্ট। কাজেই অযথা আই,সি,বি,এম তৈরী করে অর্থ এবং সামর্থ্য ব্যয় কেন। দ্বিতীয় কারণ হল, চীনের আই,সি,-বি,এম তৈরী করবার মত ক্ষমতা এবং সামর্থ্য আছে, কিন্তু তবুও সে এই দূরপাল্লার অস্ত্রটি তৈরী করছে না আমেরিকার বন্ধুত্বের প্রতিদান হিসাবে। তবে যদি কখনও আমেরিকার সঙ্গে বনিবনা না হয়, চীন তখন এই অস্ত্র তৈরী করতে বিলম্ব করবে না। আর তৃতীয় কারণ, যেটা এই লেখকের সবচাইতে সম্ভাব্য বলে মনে হয়, চীন আজ পর্যন্ত আদৌ আই,সি,বি,এম-এর কলাকৌশল আয়ত্ত করতে পারেনি, বা তাদের প্রয়োজন মত অর্থ ও সামর্থ্য নেই। প্রধান দুটি কারিগরী বাধা হল উচ্চদরের গাইডেন্স সিস্টেম আয়ত্ত করা এবং পৃথিবীর আবহাওয়ায় পুনর্প্রবেশের বিকাশ। চীন যখন পরপর দুবার কৃত্রিম উপগ্রহকে (৪র্থ ও ৭ম সাটেলাইট) আকাশ থেকে পৃথিবীতে নির্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়ে এনেছিল তখন মনে হয়েছিল চীন হয়তো এ দুটো বাধা অতিক্রম করেছে। কিন্তু এখন মনে হয় সে বাধা সম্পূর্ণ রূপে দূর হয়নি বা নতুন কোন বাধা উপস্থিত হয়েছে।

মোট কথা, চীনের পারমাণবিক বা হাইড্রোজেন বোমার ক্ষেত্রে যতটা বিকাশ এবং উন্নতি হয়েছে (এদিক থেকে চীন ফ্রান্স এবং বিটেন থেকে এগিয়ে আছে) ক্ষেপণাস্ত্রের ক্ষেত্রে ততটা হয়নি। তাছাড়া, চীনের ক্ষেপণাস্ত্র এখনও তরল জ্বালানী-নির্ভর। ঘন-জ্বালানীর জন্য গবেষণা হচ্ছে, তবে অষ্টম দশকের আগে তার ব্যবহার হবার আশা নেই। তরল জ্বালানী-নির্ভর ক্ষেপণাস্ত্রের অনেক অসুবিধা। এগুলি ক্ষেপণের জন্য তৈরী করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয় (২৪ ঘন্টার উপর), যেখানে ঘন-জ্বালানী-নির্ভর ক্ষেপণাস্ত্র অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ক্ষেপণের উপযোগী করা যায়। তরল জ্বালানী জল-ভিত্তিক (যা সাবমেরিন থেকে উৎক্ষিপ্ত করা যায়) রকেটেও প্রযোজ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ, চীনের ক্ষেপণাস্ত্রগুলি মূলতঃ মাটির উপরে কাঁচা গাঁথুনির সাইলোর ভিতরে রাখা, এগুলি সহজে স্থানান্তরও করা যায় না। ফলে এগুলি প্রতিপক্ষের প্রথম আক্রমণের শিকার হয়। তৃতীয়তঃ, চীন এখনও সাবমেরিন থেকে উৎক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্রের বিকাশ করতে পারেনি এবং আগামী দশকের আগে তা হবে বলেও মনে হয় না। সর্বশেষে, চীন এখনও রাশিয়া এবং আমেরিকার মত মিসাইল বিধ্বংসী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ করতে পারেনি।

সর্বদিক বিবেচনা করে এটা বলা চলে যে চীন তার পারমাণবিক শক্তি অর্জন করার প্রধান উদ্দেশ্যের কাছাকাছি এসে গেছে। এই উদ্দেশ্য হল প্রধান শত্রু রাশিয়াকে দাবিয়ে রাখা। এটা সম্ভব হবে পারমাণবিক শক্তিতে দ্বিতীয় আঘাত হানার সামর্থ্য অর্জন করা অর্থাৎ রাশিয়া প্রথম আঘাত হানার পরেও যতে করে রাশিয়ার উপর পাল্টা পারমাণবিক আক্রমণের সুযোগ থাকে। জাতীয় প্রতিরক্ষা বাজেটের (এই বাজেটের বর্তমান অনুমিত সংখ্যা প্রায় ২৫ বিলিয়ন ডলার) শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ পারমাণবিক অস্ত্র (ক্ষেপণাস্ত্র সহ) উন্নয়নে ব্যয় করে চীন অবশ্যই এই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। লণ্ডন আন্তর্জাতিক সমরবিদ্যা সংস্থার মতে রাশিয়া হয়তো ১৯৬৪ সালের প্রথম পারমাণবিক পরীক্ষার অব্যবহিত পরে বা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় (১৯৬৬-৬৮) আচমকা একই আঘাতে

চীনের বর্ধমান পারমাণবিক শক্তিকে ধ্বংস করে দিতে পারত, কিন্তু বর্তমানে চীনের পারমাণবিক শক্তি এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে রাশিয়ার পক্ষে একই আঘাতে সবকিছু ধ্বংস করার আর উপায় নেই। প্রথম আঘাতের পরেও যে সব পারমাণবিক অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার উপযোগী থেকে যাবে তাই দিয়েই চীন রাশিয়ার উপর পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে যথেষ্ট উৎপাত সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

এই প্রবন্ধ শেষ করবার আগে চীনের পারমাণবিক মতবাদ সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা সমীচীন মনে করছি। ১৯৬৪ সালের ১৬ই অক্টোবর প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাবার অব্যবহিত পরেই চীন সুদীর্ঘ বিবৃতি দিয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল : (১) চীনের পারমাণবিক শক্তি অর্জন করার প্রধান উদ্দেশ্য হল চীনের নিরাপত্তা সংরক্ষণ এবং চীনের জনগণের আমেরিকার পারমাণবিক ভীতি এবং ব্ল্যাকমেইল থেকে রক্ষা করা; (২) কোন সময়েই বা কোন অবস্থায়ই চীন প্রথম পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে না; এবং (৩) চীনের সরকার পৃথিবীর সমগ্র পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের সম্পূর্ণ ধ্বংসের পক্ষপাতী এবং এটা সম্ভব হতে পারে আন্তর্জাতিক আলোচনার মাধ্যমে।

আজ পর্যন্ত চীন মোটামুটিভাবে উপরে উল্লিখিত মতবাদ মেনে চলছে এবং প্রতি বিস্ফোরণের পরেই এই রকম বিবৃতি দিয়ে চলেছে। অবশ্য সময় এবং নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য বিবৃতির একটু-আধটু পরিবর্তন হয়েছে। যেমন রাশিয়ার সঙ্গে মতভেদ এবং শত্রুতা বেড়ে ওঠার পর উপরিউল্লিখিত প্রথম নীতিটি বদলে এখন বলা হচ্ছে যে চীনের পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণগুলি ঘটান হচ্ছে আমেরিকা এবং রাশিয়ার পারমাণবিক একচেটিয়াত্ব এবং ব্ল্যাকমেইল ভঙ্গ করার জন্য (শুধু আমেরিকা নয়)। এছাড়া, অন্যান্য নীতিগুলি—যেমন কখনও প্রথম পারমাণবিক আঘাত হানব না বা চীন পৃথিবীর সমস্ত পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের নির্মূল করার পক্ষে—১৯৬৪ সালে যেমন ছিল আজও তেমন আছে। আশা করা যায় চীন আগামী দিনেও এই পারমাণবিক নীতিগুলি মেনে চলবে। এতে করে চীনের আশেপাশে অবস্থিত এশিয়া মহাদেশের দেশগুলোকে কিছুটা নিশ্চিন্ত করা চলবে। সাধারণত এই দেশগুলির চীনের বর্ধমান পারমাণবিক এবং অন্যান্য সমরশক্তি কিভাবে এবং কোথায় ব্যবহৃত হবে, এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা নেই।

চীনের পারমাণবিক বিস্ফোরণের খতিয়ান

তারিখ (১)	বিস্ফোরণের শক্তি (২)	প্রধান জ্বালানি (৩)	পরিবহণপদ্ধতি (৪)	বিস্ফোরণের স্থান (৫)
১৬ অক্টোবর ১৯৬৪	২০ কিলোটন	ইউ-২৩৫	স্তম্ভ	লপনোর
১৪ মে ১৯৬৫	২০—৪০ কিলোটন	"	টি, ইউ-৪ বোমারু বিমান	"
৯ মে ১৯৬৬	২০০—৫০০ কিলোটন	"	টি, ইউ-১৬ বোমারু বিমান	"
২৭ অক্টোবর ১৯৬৬	১০—২০ কিলোটন	"	৪০০—৬০০ মাইল দূরত্বের সোভিয়েট শ্রেণীর স্যান্ডাল রকেট	সুয়াং চেংগ-সু থেকে রকেট ছোঁড়া, বিস্ফোরণ লপনোরে।
২৮ ডিসেম্বর ১৯৬৬	২৫০—৫০০ কিলোটন	"	স্তম্ভ	লপনোর
১৭ জুন ১৯৬৭	৩ মেগাটন (হাইড্রোজেন বোমা)	"	টি, ইউ-১৬ বোমারু বিমান	"
২৪ ডিসেম্বর ১৯৬৭	১০—২৫ কিলোটন (বিফল বিস্ফোরণ)	"	"	"
২৭ ডিসেম্বর ১৯৬৮	৩ মেগাটন (হাইড্রোজেন বোমা)	ইউ-২৩৫ এবং প্লুটোনিয়াম-২৩৯	"	"
২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯	২৫ কিলোটন	—	মাটির তলায় বিস্ফোরণ	"
২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯	৩ মেগাটন (হাইড্রোজেন বোমা)	ইউ-২৩৫	টি, ইউ-১৬ বোমারু বিমান	"
১৪ অক্টোবর ১৯৭০	"	"	"	"
১৮ নভেম্বর ১৯৭১	২০ কিলোটন	"	ঠিক জানা নেই (খুব সম্ভব স্তম্ভ)	"
৭ জানুয়ারী ১৯৭২	২০ কিলোটনের নীচে	"	জানা নেই	"
১৮ মার্চ ১৯৭২	২০—২০০ কিলোটন	ইউ-২৩৫	জানা নেই	"
২৭ জুন ১৯৭৩	১—২ মেগাটন (হাইড্রোজেন বোমা)	"	ঠিক জানা নেই (খুব সম্ভব টি, ইউ-১৬)	"
১৭ জুন ১৯৭৪	১—২ মেগাটন (হাইড্রোজেন বোমা)	"	জানা নেই	"
২৭ অক্টোবর ১৯৭৫	১০ কিলোটন	"	মাটির তলায়	"
২৩ জানুয়ারি ১৯৭৬	১০ কিলোটন	ইউ-২৩৫	ঠিক জানা নেই (খুব সম্ভব টি, ইউ-১৬)	"
২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬	১০০ কিলোটন	"	"	"
১৭ অক্টোবর ১৯৭৬	খুব অল্প শক্তির (খুব সম্ভব ২০ কিলোটনের নীচে—	"	মাটির তলায়	"
১৭ নভেম্বর ১৯৭৬	৪ মেগাটন (এখন পর্যন্ত সবচাইতে শক্তিশালী বোমা)	ইউ-২৩৫	ঠিক জানা নেই (খুব সম্ভব টি ইউ-১৬ বোমারু বিমান)	"
১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭	২০ কিলোটন	"	জানা নেই	"

হীরকের দিনগুলি

বিজনকুমার ঘোষ

হঠাৎ হীরকের পিঠে একখানা ঠাণ্ডা আর নরম হাত এসে লাগল।

—ওঠ হাত-মুখ ধোও। চা জুড়িয়ে যাবে।

হীরক তাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে দিল।

—কাল আমরা বাইরে শুয়েছিলাম না?

—হু। তারপর শেষ রাতে ঠাণ্ডা লাগায় চলে এলাম।

—আমার কিছু মনে নেই।

—কাল কোথায় গিয়েছিলে বললে না তো? তুমি আজকাল অনেক কথা গোপন করতে শিখেছ।

—তোমার জন্যে দেরি হল। ডাকতারখানায় গিয়েছিলাম। ছদিনের ওষুধ দিয়েছে। লক্ষ্মীটি—

—আমার আবার কি হল? —এক ঝটকায় হেনা হাত ছাড়িয়ে নিল।

লিলি মিলি ধূমকেতুর বেশি বেলা পর্যন্ত ঘুমোনো অভ্যেস হাত পা ছড়িয়ে বিছানার তিন কোণে তিনজনে পড়ে আছে। ওই দিকে তাকিয়ে গলায় যথাসম্ভব আবেগ নিয়ে আসার চেষ্টা করল হীরক।

—আমি আর ছেলেমেয়ে চাই না হেনা। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

—ক্ষমার কোন প্রশ্নই উঠছে না। হাত মুখ ধোও সুজি পরোটা করেছি।

—তুমি আমার কথা শুনবে না?

—আমি তোমার সব কথাই শুনি।

—এই যে তুমি আমার কথা শুনছ না

এসব কথা শোনা যায় না। কোন মেয়েই শুনতে পারে না আবেগ মুছে ফেলে হীরক গলার স্বরটাকে তীক্ষ্ণ করল।

—সুকুমারের বৌ শুনল কেমন করে? ও মেয়ে না?

—মেয়ে বটে, কিন্তু মা নয়।

—সুকুমারের বৌ দুই ছেলের মা।

—সবাই সব কাজ পারে না।

—সবাই যা পারে তুমি তাই পার ইচ্ছে করলে।

—আমি ইচ্ছে করবই না। যাই আমার কাজ আছে।

হীরক শুয়ে শুয়ে খানিকক্ষণ চিন্তা করল এখন কি করবে। কি করা উচিত। ভয় দেখানো যেতে পারে। ভয় দেখানোর নানা রাস্তা হীরকের জানা আছে। কিন্তু সেটা সব শেষে, উপায়ান্তর না দেখলে তবেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। তার আগে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ভালিয়ে কাজ হাসিল করতে হবে। কোনক্রমেই মাথা গরম করবে না হীরক। তাহলেই বিপদ। এখন যদি চা পরোটা ইত্যাদি না খায় তো অমনি পড়ে থাকবে। ধূমকেতুর বেলায় এসব মেয়েলি দাওয়াই প্রয়োগ করে দেখেছে কোন ফল হয়নি।

লাল বারান্দায় টালমাটাল পায়ে ধূমকেতু ঘুরে বেড়াচ্ছে। মিলি বড় লোভী, কিছুতেই খাওয়া শেষ হতে চায় না। ফুরুলেই আবার বাটি নিয়ে রান্নাঘরে হাজির হচ্ছে। লিলি বড় হয়েছে। সময় দিলে বুঝতে পারে। লাল বারান্দায় পাটি পেতে বই খাতা নিয়ে বসেছে। স্পষ্টই বোঝা যায় বইয়ের দিকে একটুও মন নেই। সিমেন্টের বেঞ্চিতে বসে নিজের শাখা-প্রশাখার দিকে তাকিয়ে হীরকের মনে হল জীবনের আর এক নামই জটিলতা।

লিলি জিজ্ঞাসা করল বাবা আজ মাছ ধরতে যাবে না। আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে যাব।

মিলি বলল, বাবা আমারও যাব।

ধূমকেতুর মুখে এখনো বুলি ফোটেনি। তবু আবেভাবে বুঝিয়ে দিল, সেও মাছ ধরতে যাবে এবং আমারও যাবে।

হীরক হুকুম দিল, নিয়ে এসো বঁটি থালা—।

তিনজন বঁটির চারপাশে গোল হয়ে

বসল। দু আধখানা করে ফেলতেই চমৎকার সুবাস বেরোল। লিলির সবটাতেই কৌতূহল। বলল, বাবা আনারস এনেছ কেন ?

মিলি বলল, আমার জন্যে।

হীরক মনে মনে বলল, তোদের মার জন্যে। ওষুধ হয়ত আজ খাওয়ানো যাবে না। তাই ফল দিয়েই শুরু করা যাক, আহা আনারসেই যদি সব কাজ হত।

সূর্য এক সময় মাথার ওপর চড়ল। রোজ রোজ বাজার করতে ইচ্ছে করে না হীরকের। শিয়ালদা থেকে এক পাল্লা দুই পাল্লা আলু পেঁয়াজ এনে খাটের নিচে বিছিয়ে রাখে। যেদিন বাজারে যায় বড় বড় থলি ভর্তি তরিতরকারি আনে। একটি মুসলমান মেয়ে প্রায়ই ডিম বেচতে আসে। এছাড়া দশ কাঠা জমির এক ইঞ্চিও হীরক পতিত করে রাখেনি। আছে পুঁই মাচা, ঝিঙে লাউ কাচা লংকা, ঢেঁড়শ, বেগুন শশা বড়বটি। সাত দিন বাজারে না গেলেও দিব্যি চলে যায়। কপাল ভাল থাকলে এক এক দিন বঁড়শিতেও মাছ ওঠে। এক বেলা চলে যায়। এই বাড়িতে এসে ডিমের জন্যে দুটো হাঁসও পুষেছিল। দুটোই শিয়ালে নিয়ে গেছে। জায়গাটা কিন্তু কলকাতা কর্পোরেশনের মধ্যে। পৌরসভার হাঁস নিয়ে গেছে চব্বিশ পরগণার শিয়াল—এই খবর জানিয়ে চিঠি দিলে খবরের কাগজগুলো তা ফলাও করে ছাপত। যাই হোক এরপর হাঁস পোষার ঝামেলা মুসলমান মেয়েটির ওপর চাপিয়ে দিয়েছে।

অফিসের উল্টোপাল্টা ডিউটির মধ্যে হীরক এই সব করেছে। আসলে পরিশ্রম করতে ও ভালবাসে। অফিসের ডিউটি ছ ঘন্টা। যেতে আসতে লাগে দু ঘন্টা। বাদ-বাকী ষোল ঘন্টা সময় হীরকের নিজের।
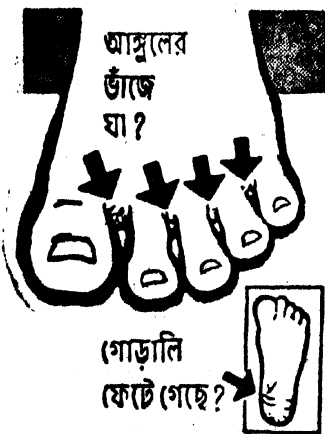
ঘুম বড় পাতলা তবু সে বাবদ ব্যয় হয় মাত্র পাঁচ-ছ ঘন্টার মত। এখন দশ-এগারো ঘন্টা সময়কে যদি ঠিক মত কাজে লাগাতে না পারে তো হীরকের শরীর খারাপ হয়। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে এক এক দিন হীরক হেঁটে চলে যায় কালিঘাট কি ভবানীপুর। হীরক এমনিতে বন্ধু বৎসল। আশুতোষ কলেজে পড়ার সময় চারটি বছর বন্ধুদের নিয়ে কি চমৎকার যে কাটিয়েছিল। হীরকরা চার ভাই দুই বোন মিলে থাকত চেতলা রোডে। কারও বিয়ে হয়নি। দাদা প্রত্যেকের কাজ ভাগ করে দিয়েছিল। দাদা, মেজদার ডিউটি ছিল বাজার করা ও রান্না করা। ছোট দুই বোনের কাধ চা করা ঘর ঝাড় দেওয়া, বিছানা পাতা ইত্যাদি। ছোট ভাইয়ের ডিউটি রেশন আনা ও ফুটফরমাস খাটা। আর হীরকের কাজ ছিল প্রত্যেক দিন সন্ধ্যের আশিখানা রুটি বানানো। কলেজ থেকে ফিরেই একটা বড় গামলায় আটা মাখতে বসত হীরক। রুটি বানানো বড় ঝামেলার কাজ। ডিউটি বদলের কথা বললে দাদা বলত তাহলে দুই মণ কয়লা ভেঙে গুড়ো দিয়ে গুল বানিয়ে ফেল। বেলার সময় রুটিগুলি অস্ট্রেলিয়া, আফগানিস্তানের ম্যাপ হয়ে যেত। দাদাই একদিন পরামর্শ দিয়েছিল রুটিগুলি বেশ করে বেলে, তারপর একটা বাটি ফেলে চারপাশ কেটে নিবি চমৎকার গোল হবে দেখিস। এই প্রক্রিয়ায় আশিখানা রুটি বানিয়ে হীরক চলে যেত।

হাজরা পার্কে। কলেজের গা ঘেঁষে পার্কের সবুজ জমিতে কয়েকজন হাঁ করে বসে থাকত হীরকর জন্যে। এখানে একদিন না এলে যেন পেটের ভাত হজম হত না। সত্যি, কি সুন্দর দিনগুলিই না ছিল।

...... সেই দেবদূতের মত ..বন্ধুদের ..এখন পরিবর্তন দেখলে হীরকের চোখে জল আসে। হাজরা পার্কের এক রাশ স্মৃতি বুকে নিয়ে একদিন বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল হীরক। বন্ধু বলল, কিরে এসেছিস, বোস। —এই বলে বন্ধু ভিতরে চলে গেল। বাইরের ঘরে বসে পুরোনো ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে গেল হীরক ঘন্টা তিনেক ধরে। দিব্যি একটা ঘুম দিয়ে এসে বন্ধুর প্রথম কথা চা না খেয়ে চলে যাসনে। সেদিন রাস্তায় এসে হীরক কেঁদে ফেলেছিল। আর এক বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ। বহু দূরে থেকে এসে হীরক দেখতে পেল দরজায় পাঁচ কিলো ওজনের তালা ঝুলছে। পাশের বাড়ির এক বৌকে জিজ্ঞাসা করে জানল, দেওঘরে ওরা বেড়াতে গেছে। সাতদিন থাকবে। দেখেছে, কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে হলে হীরককেই যেতে হয়। কিন্তু কেউ ভুলেও হীরকের বাড়িতে আসবে না। প্রথম প্রথম হীরক এসব গায়ে মাখত না। পরে ভেবে দেখেছে, বন্ধুত্ব একতরফা চলতে পারে না।

তা এই বাড়ি চৌহদ্দির মধ্যেই সময় কাটাবরা প্রচুর উপকরণ। ছোটট খাল দেখে ছিপ হাতে হীরক ছোটবেলায় পৌঁছে যায়। রথের মেলা থেকে কিনে আনে নিড়ানি,

খুরপি, কোদাল, নানা রকম বীজ। বাগান বিলাসের টকটকে লাল ডাল জোড়া সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে গেছে। বহু দূর থেকে বাড়িটাকে আলাদা করে চিনতে পারে হীরক। মাঠের পাশে লাল ফুলের ... যেন একটি সুখি পরিবার ক্রমশ বড় হচ্ছে।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর এক রকমের অচেনা আতংক হীরককে গ্রাস করতে লাগল। ভাত খাওয়ার আধ ঘন্টা পরে ... খবর। আজ খেতে গিয়ে বুকে ভীষণ ব্যথা লাগল। জলটা যেন অনেকক্ষণ আটকে ছিল। ধীরে ধীরে নেমে গেল। সারা দিন কাজের পর হেনা শুয়েছে। যথারীতি ঘুমও এসে গেছে। বারান্দায় এক কোনে রান্নাবাটি খেলছে লিলি আর মিলি। ধূমকেতু ... কাদা। প্রথম প্রথম মনে হত ধানক্ষেতের পাশে এ আবার কি রকম কলকাতা শহর। ভয় হত, হাঁস দুটো যে ভাবে হারিয়ে গেল ছেলেমেয়েরা না সেভাবে হারিয়ে যায়। না এখন আর ওসব ভয় আসে না। সেদিন পর থেকে একটা চোঁড়া বাড়িতে ঢুকেছিল। দারোগা একলাই তাকে শায়েস্তা করেছে।

হীরক হেনার দিকে তাকাল। দিন একা থাকছে। বোকা বোকা মুখ। এই বাড়িখানার চৌহদ্দি ছেড়ে যেতে রাজী নয়। হীরক, লিলি, মিলি আর ধূমকেতু, ... যেন পৃথিবীতে আর কিছু জানবার নেই। এই যে আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হল জিমি কার্টারের নাম সবাই জানল, কিন্তু হেনা জানে না। অথচ বাড়িতে রোজ সকালে জানালা দিয়ে টুপ করে খবরের কাগজ ছুঁড়ে দিয়ে যায়। কে বলবে এই হেনাই এক বালিগঞ্জ সিটি কলেজে বি এ পড়েছিল। ও নিজেই গল্প করে, এক ... জোর বেলা কলেজে যাবার পথে ... ল্যাংটা পাগল মাথায় চাঁটি মেরেছিল। হায়রে কিছুই খবর রাখে না প্রতিদিন ভারতবর্ষে একটা ... অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ তৈরী হচ্ছে। হীরক জাগিয়ে দিল হেনাকে। কেননা দরকারি ক... সেরে নেবার এটাই প্রকৃষ্ট সময়।

—আমার কথাটা চিন্তা করলে ?

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে হেনা কিসের চিন্তা বুঝতে পারছে না, হীরক ও ... গায়ে একখানা হাত রাখল, নিজেও ... এল।

—লক্ষীটি অবুঝ হয়ো না। আমি ... চালাতে পারছি না।

—তোমার খালি এক কথা। এ... একটু ঘুমোও তো।

—ঘুম আসছে না হেনা। আতংক আমার শরীরে কাঁটা দিচ্ছে।

এই কথা শুনে একটা হাত দিয়ে ... বুলিয়ে দিতে লাগল। ও আবার ঘুমোবার চেষ্টা করল। হেনা। অভিমানে হীরক হা... সরিয়ে দিল। হেনা উঠে বসল।

—তুমি ধূমকেতুকেও চাও নি, ম... আছে ? আমি জোর করে এনেছি। তা... কি তোমার খুব ক্ষতি হয়েছে ? তুমি ধূমকেতুকে ভালবাস না।

—নিশ্চয়ই বাসি। থাক ও, ধূ... কেতুর কথা ... [illegible]

এক ছেলে। চমৎকার কম্বিনেশন।
র আমি তেমন প্রতিবাদও করিনি'
দব কথাই রেখেছিলাম। কিন্তু এই
আমি আর পারছি না। সারাজীবন কি
পুলে টেনেই যাব? আমি তোমাকে
রাখছি হেনা, তুমি যদি জিদ ধর
স আমার মৃত্যু ঘটবে।

—আজ লিলির জন্মবার। ওসব বাজে
মুখেও আনবে না।

—আমি ঠিকই বলছি—হীরক প্রায়
র করল : আলবৎ মৃত্যু ঘটবে। আমিই
যাব, তোমরা থাকবে।

—তুমি এ কথা বলতে পারলে ?

—কেন পারব না ? আমাদের সংখ্যা একই
। আমি চলে যাব, যে আসছে সে
র জায়গায় আসবে।

—তুমি চলে গেলে আমাদের কি
? হেনা হীরকের বুকে হাত বোলাতে
।

—সে আমি জানি না। আমি চলে
দেখতে আসব না সংসারের হাল।

হেনা চুপ করে রইল এর পর।
ও চুপ। মিলি কাঁদতে কাঁদতে
দা থেকে ছুটে এল। ওর খিদে
ছে। লিলির খুব মজা। বাবা বাড়িতে
, অথচ, একবারও পড়তে বলছে না।
কতু ঘুরেপাক খেতে খেতে খাটের এক
চলে গেছে। ধানক্ষেতে কি একটা দেখে
ঘেউ করতে করতে দারোগা ছুটে গেল
কে। খালে জল থাকলে হাওয়াটা ভারী
ট লাগে। পেয়ারা গাছে লেজ ঝোলা
া রঙের পাখি বসে আছে সেই থেকে।

—তোমাকে এক কাপ চা করে দেব
ব ?

—তুমি কি আমার প্রশ্নের উত্তর
তে দেবে না ?

—ভাল প্রশ্ন কর ভাল উত্তর দেব।

—আমি খুব ভাল প্রশ্নই করছি।
া আর সংখ্যা বাড়াতে চাই না। এর চেয়ে
প্রশ্ন আর কি হতে পারে।

—আগে মনটা ভাল কর দেখি। মন
হলে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।—
া উঠে পড়ল।

পিয়ানো ঘড়িতে সুরেলা ছন্দে চারটে
ল। ছুটির দিনে সময় যে কিভাবে বয়ে
। রান্নাঘর থেকে এক পাঁজা বাসন নিয়ে
তলার দিকে চলে গেল হেনা। ঝি
তে দেয়নি। বলেছে, আমাদের কি-ই বা
র ! ও আমি চালিয়ে নিতে পারব।
য়ের টাকাটা আমাকে দিও।

মিলি বার বার রান্নাঘরে যাচ্ছে।
লিও। ওখানে নিশ্চয়ই কিছু একটা
ছে। দারোগাও সব কাজ ফেলে দরজার
নে হত্যে দিয়ে আছে।

একটু পরে হেনা চা নিয়ে এল। সঙ্গে
টে গরম গরম সিঙ্গাড়া।

—তোমার জন্যে ভেজেছি। খেয়ে দেখ
া কেমন হয়েছে।

—তুমি কি আমাকে সিঙ্গাড়া দিয়ে

—তুমি তো বুড়ো খোকা।—হেনাও হাসল আমার সাধ্য কি তোমাকে ভোলাই।

বিকেলে জামা জুতো পরে লিলিমিলি ধূমকেতু বেড়াতে গেল মাঠ পেরিয়ে দত্তদের বাড়িতে। রোজ যায়। ওই বাড়িতে বড় বড় সাতটি মেয়ে আছে। তার মধ্যে পাঁচজনই চাকরী করে। সবাই হীরকের ছেলেমেয়েদের খুব ভালবাসে। ওরা চলে যেতেই বাড়ি একেবারে ফাঁকা। একটা সুবিধে এই বাড়িতে বাস করতে হলে বেশি লোকজনের মুখ দেখতে হয় না। সারা দিনে একটা ফিরিওয়ালাও হাঁক দিয়ে যায় কিনা সন্দেহ। পুরোনো খবরের কাগজ বিক্রী করতে হলে হীরককে মোট বয়ে নিয়ে যেতে হয় স্টেশন রোডের মুদিখানায়। তা এক দিক দিয়ে ভালই।

বিশাল প্রান্তরের ওপর আবছা অন্ধকার খেলা করছে। দারোগা ঘেউ ঘেউ করে দুবার ডাক ছাড়ল। তার মানে ওর খাবার সময় হয়েছে। খেতে টেতে দাও। রান্নাঘর থেকেই দুখানা রুটি ছুঁড়ে দিল হেনা।

নিড়ানি, খুরপি নিয়ে বাগানে চলে গেল হীরক। কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে খোঁচাখুঁচি করল। এক জায়গায় ভাঙা বেড়া ঠিক করল। সেদিন গরু ঢুকে ডাঁটা গাছ-গুলিকে একেবারে মুড়িয়ে খেয়ে গেছে। নিজের হাতে তৈরি জিনিসপত্র খেতে এত ভাল লাগে ! হঠাৎ মনে হল সময় নষ্ট করে কি হবে। নিড়ানি, খুরপি বারান্দার এক কোণে রেখে সটান রান্না ঘরে চলে এল। বসল পিঁড়ি পেতে। ভনিতা না করে শুরু করল, কাল আটটায় অফিস থেকে বেরিয়ে শ্যামবাজারে গিয়েছিলাম। হোমিওপ্যাথি ডাকতার বিলেতে ছিল ছ বছর। সুকুমার উপকার পেয়েছে গো।

লাল উনুন। হেনার এখন কথা বলার সময় নেই। রুটি বেলছে সেঁকছে, সঙ্গে সঙ্গে উনুনে গোল করে ফুলিয়ে নিচ্ছে।

—মেয়েদের শরীরটা বড় কমপ্লিকেটেড। ডাকতার বলেছে, অন্তত একশোটা কারণে মেনস্ট্রুয়েশন সময়মত নাও হতে পারে। যাতে হয়, সেইজন্যই ডাকতার ওষুধ দিয়েছে। লক্ষ্মীটি আমাকে ভুল বুঝো না—।

ফিক করে হেসে ফেলল হেনা।

—নিয়ে এসো ওষুদ, আমি খাব।

এত সহজে হেনা রাজী হবে ভাবা যায় না। হীরক জড়িয়ে ধরে ঘাড়ের ওপর চুমু দিল গোটা কতক। হেনা চেঁচিয়ে উঠল আগুন আগুন।

ডাকতার সাহ। সকাল থেকে খাওয়া শুরু করতে বলেছিলেন। এখন সন্ধ্যে। একগুয়েমীর জন্যে সময়ের হেরফের হয়ে গেল। হীরক নিজেই ছুটে গিয়ে একটা কাপে ওষুদ ঢেলে নিয়ে এসে হেনার কপালে ছুঁইয়ে দিল। ডাকতার সাহ ভক্তিভরে ওষুদ খেতে বলেছেন।

রুটি বেলার তালে তালে হেনার নরম শরীরটা কাঁপছে। একটা প্রচণ্ড ভারী বস্তু হীরকের শরীর থেকে ঝরে গেছে। হীরক এখন একটা পালকের মত মাইল মাইল ধান-ক্ষেতের ওপর দিয়ে উড়ে বেড়াতে পারে।

—আমি তোমাকে ভালবাসি হেনা। লিলি মিলি ধূমকেতুকেও ভালবাসি। আমাদের এই ছোট সংসারটাকে বড় করে তুলতে চাই। লিলি মিলি ধূমকে সুন্দর করে শিক্ষা দেব। লিলি মিলিকে ভাল ঘরে বিয়ে দেব। ধুম যত-দূর পড়তে চায় পড়াব। ডাকতার হোক, ইঞ্জিনীয়ার হোক—সব পথ খোলা।

এ-সব কথা হেনা অনেকবার শুনেছে। তবু শুনতে ভাল লাগছে। রুটির ঝামেলা শেষ। এবার ওবেলার ডাল তরকারি গরম করতে বসল। ঘরে এখন বেশ অন্ধকার। নিজেই উঠে লাইটটা জেলে দিল পাছে হীরক কথা বন্ধ করে।

হীরক বলে চলেছে, জান তো মূল্য-সূচক বাড়া-কমার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ডি-এ ওঠানামা করে। এবার এক ঠ্যালায়

বত্রিশ টাকা মাইনে কমে গেছে। এর ওপর ই-এস-আই স্কীমের টাকা কাটছে ফি মাসে আটাশ টাকা করে। বাড়ি ভাড়া একশো কুড়ি টাকা। দুধের জন্যে লাগে প্রায় শ খানেক টাকা। আমি কত মাইনে পাই? তবু তুমি অল্পের মধ্যে সারতে পার। তোমার কোন চাহিদা নেই। ওঃ, এক একটা বৌকে যা দেখি—

হেনার মনে মনে হাসি পাচ্ছিল। অত হিসেব-টিসেব ওর ছোট্ট মাথায় আসে আসে না। ও জানে, সংসারের ছোট্ট নৌকাটা স্রোতের মাঝখানে ঠিক ভেসে চলবে। মাঝে মাঝে একটু শুধু টাল খাবে, কোথাও ছ্যাদা দিয়ে জল উঠবে হয়ত। তখন প্রয়োজন শকত হাতে হাল ধরার আর জলটুকু ছে'চে ফেলা। ব্যস—।

—লোকসংখ্যা বেড়ে গেলে খরচও বেড়ে যাবে, আমি আর চালাতে পারব না হেনা। সব কিছুর খরচ বেড়ে চলেছে আজকাল। ওদের একটু ভাল ইস্কুলে দিতে হবে। ভাল ইস্কুলের মাইনেও ভাল। কি যে করি। ভাবছি দু-একটা টিউশনি করব। তুমি কোন কথা বলছ না?

—কি আবার বলব। তুমি বল আমি শুনি।

—তার ওপর বীরেন চক্রবর্তী মশাই অফিসে এসে একটা লোভ বুনে দিয়ে গেছে।

এতক্ষণে হেনা মুখ খুলল, একে লোভ বোল না। বীরেন চক্রবর্তী মশাই তোমাকে ভাল কথাই বলেছেন। প্রত্যেক মানুষের এই সব ইচ্ছে থাকা দরকার। ছেলেমেয়েদের ভালবাসা, শিক্ষা দেওয়া, নিজেদের একটু আশ্রয়—সব মানুষই কামনা করে।

—ঠিক বলেছ হেনা। আটচল্লিশে কলকাতায় এসে কত পাড়ার কত বাড়িতে বাস করলাম। কোথাও টিকতে পারলাম না, শেষ পর্যন্ত নিজের দিদির কাছে লাথি খেতে হল। এসব নিজের কোন ঠাঁই না থাকার জন্যেই তো। কিন্তু দামটা বড্ড বেশি। কি যে করব ভেবে পাচ্ছি না। আমাকে ধারই বা কে দেবে?

—বীরেনবাবু নাকি এক সময় দশ হাজার টাকাতেই বিক্রী করতে চেয়েছিলেন?

—তখন ছিল গণ্ডগোলের টাইম। কোন ভাড়াটে আসতে চাইত না। কিন্তু এখন দিনকাল বদলে গেছে। আহা, সেই ছেলেগুলি একদিন এসে তোমার রান্না খেতে চেয়েছিল গো—

অন্ধকার ধানক্ষেতের দিকে হীরক দুঃখিত হয়ে তাকাল। কঠিন ছেলেগুলো কোমল হয়ে একদিন ওই পথেই হারিয়ে গিয়েছিল। ওদের কি দশা হয়েছে কে জানে।

হেনা বলল, আমার গয়নাগুলো ইচ্ছে করলে বিক্রী করে দিতে পার। চুরি, ছিনতাইয়ের ভয়ে পরি না। কি হবে রেখে?

হীরক আত্মজগতের সুরে বলল, না, গয়না বিক্রী করা চলবে না। আমাদের মত লোকদের ওটাই তো শেষ সম্বল।

সমস্ত ঘরে আলো জ্বলে গেছে। রান্নাঘরের কাজ শেষ। লক্ষ্মীর আসন বা শংখের ফু দেওয়ার বালাই নেই হেনার। হীরক ঘোরতর নাস্তিক। ওদের বাপের বাড়িতে কিন্তু বারো মাসে তেরো পার্বন ছিল। হীরক বলে, যে পরিশ্রমের বিনিময়ে কিছু পাওয়া যায় না সেটা ফালতু। কি হবে ঠাকুর দেবতাকে তেল দিয়ে? তার চেয়ে অপরের ক্ষতি না পবিত্রভাবে জীবন-চেয়ে অপরের ক্ষতি না করে পবিত্রভাবে জীবনযাপন করাই তো শ্রেষ্ঠ সাধনা।

দত্তদের বাড়ি থেকে লিলি-মিলির এখনো ফেরেনি। সাধারণত নিজে থেকে ফিরতে চায় না ওরা, গিয়ে নিয়ে আসতে হয়। হেনা বলল, আনতে যাবে না ওদের?

হীরক বিছানার তিনটে বালিশ থাক করে হেলান দিল।

—থাকুক না, খেলছে খেলুক। ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনার চাপ দেওয়া ঠিক নয়। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ?

হেনা মুখের দিকে তাকাল।

—লিলি-মিলি ধুমকে সবাই ভালবাসে। সাতপাখিয়ায় আমাদেরও সবাই অমন ভালবাসত। যাক, আমাদের ধরা পেয়েছে। সাতপাখিয়ায় বাবাকে সবাই বলত, ক্যাশিয়ারবাবুর ছেলেমেয়েরা কুকুরের বাচ্চার মত।

কুকুরের বাচ্চা! সে আবার কি? হেনা তাকাল।

—বুঝলে না? দিশি কুকুরের বাচ্চাগুলি ছোটবেলায় সুন্দর নাদুশ-নুদুশ থাকে, বড় হলে রাস্তার খেঁকি কুকুর হয়ে যায়। গু খায়। আমরাও ছিলাম তাই।

—তুমি কেমন ছিলে?—হেনার চোখে কৌতুক।

—আমি নাকি সবচেয়ে সুন্দর ছিলাম।

—ইস্। নিশ্চয়ই মা বলেছে?

—না গো না। ছেলেবেলায় আমাকে যারা দেখেছে তারা এখনো বলাবলি করে। আমার যখন দু-বছর বয়স, তখনই স্টেটের মুসলমান বরকন্দাজেরা তাদের বহু দূরের গ্রামে নিয়ে যেত। আমি নাকি একটুও কান্নাকাটি করতাম না। ওদের বাড়িতে দুধ খেতাম আর খেলা করতাম। সেই আমিই পরবর্তী জীবনে সবচেয়ে দুঃখ? কষ্ট পেলাম।

—কষ্ট তুমি একা পাওনি, সবাই পেয়েছে।

—আমিই সবচেয়ে বেশি, তোমার ছোট দাদুর বাড়িতে। তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল। মনে আছে সে কথা?

বহু বছর আগে ফেলে আসা চারটি বছরের মধ্যে হীরক সহসা চলে গেল।

শীতকালের সন্ধ্যা। উত্তর কলকাতার এ[illegible] নোংরা গলি, নাম বৃন্দাবন পাল লেন। [illegible] ক্লাইভের আমলের একটি ইট বের-[illegible] স্যাংসেতে বাড়ির দোতলায় দুই [illegible] ঢুকল। বড় ভাইয়ের হাতে একটা [illegible] টিনের বাকস, হীরকের হাতে একটা [illegible] বেডিং। দোতলার ভিতরের দিকে দ[illegible] চাপা এক বারান্দায় চেয়ারে বসে এ[illegible] অত্যন্ত মোটা আর কুৎসিত ধরনের [illegible] উপন্যাস পড়[illegible] দাদা ইশারা করায় হী[illegible] ফোলা ফোলা পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্র[illegible] করল। এই হল দাদু, শ্যামবাজারে [illegible] স্কুলে ভূগোলের শিক্ষক।

১৯৪২ সাল। কলকাতার মাথায় হ[illegible] জাপানী বোমা পড়তে শুরু করলে দলে [illegible] লোক পালাতে শুরু করল। সাতপাখি[illegible] থেকে বাবা চিঠি লিখল, শিগ্‌গীর আ[illegible] এখানে চলে এসো। তাতে গ্রাম সম্প[illegible] পাতানো দাদু খুশি হয়ে জানাল, আ[illegible] তোমার একটি ছেলেকে রাখব। ব্যস, ব[illegible] মহা খুশি। সাতপাখিয়া স্টেটে বা[illegible] মাইনে মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা। সাত ছে[illegible] মেয়ে। ওখানে ক্লাশ সিকস পর্যন্ত এ[illegible] মাইনর স্কুল আছে। ছেলেরা এখান থে[illegible] পাশ করে বেরলেই হারানবাবুর চিন্তা [illegible] কোথায় চালান করা যায়। দাদা এমন এ[illegible] বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করত যে[illegible] পরীক্ষার দিনেও সকালবেলায় গরু চ[illegible] হত। একমাত্র মেজদাই ভাল জায়গায় ছি[illegible] সেখানে বাড়ির ছেলেমেয়েদের মতই মে[illegible] ব্যবহার পেত। হীরকের ছোট দীপক [illegible] গ্রামের এক ভদ্রমহিলা দয়া করে [illegible] মেটেবুরুজের বাড়িতে এনে রেখেছিলে[illegible] স্কুল ফাইনাল পাশ করে ওখান থেকে [illegible] সেই দীপক এখন খাস লণ্ডন শহরে দো[illegible] বাড়ি করেছে। একতলাটা ভাড়া দেয় [illegible] চামড়ার এক সাহেবকে। হীরকের অফি[illegible] এক ভদ্রলোক বিলেতে গিয়ে দীপকের [illegible] দেখা করেছেন। বাড়ির সামনে সবুজ [illegible] ফলে ভর্তি একটি আপেল গাছ দাঁ[illegible] ছিল। অফিসের সেই ভদ্রলোকের [illegible] শিশিরবাবু। তিনি সেই গাছ থেকে [illegible] দিয়ে ছি'ড়ে তিনটে আপেল খেয়েছে[illegible] অফিসে বসে সেই গল্প শুনে হীরকের [illegible] ভাল লেগেছিল।

সেই কাল সন্ধ্যার কথা এখনো [illegible] মনে আছে হীরকের। দাদা চলে গেলে [illegible] ভীষণ বিশ্রী লাগছিল। দিদিমার বহু [illegible] দেখাই পেল না। পরে দোতলার রে[illegible] দাঁড়িয়ে হীরক দেখল, নিচে ফরসা, বে[illegible] মোটা বছর চল্লিশের একটা মেয়ে[illegible] হাতে বেশ করে তেল মাখাচ্ছে। তা [illegible] হল দিদিমা।

সংসারে এমন অনেক লোক অ[illegible] যাদের হঠাৎ হঠাৎ উদারতায় পেয়ে ব[illegible] কখনো সখনো হঠাৎ ইচ্ছে হয় আ[illegible] বিদ্যাসাগর কিম্বা সি আর দাশ হয়ে [illegible] আসলে তাঁদের ধারে কাছে যাবার যো[illegible] নেই ওই সব লোকদের। তবু কেউ [illegible] ভুলেও মনে করে আমার যোগ্যতা কম [illegible]

(চলবে)

দরজা বন্ধ করে দিলাম। চৈতিদির মুখোমুখি দাঁড়ালাম। চোখে চোখ, ভীষণভাবে ওর দুই কাঁধ চেপে ধরে বললাম, 'আমি কি তোমায় ভালোবাসি ?'

ছাব্বিশ

টেস্ট কেটে গেল। পরীক্ষাও। ভাল মন্দ কেমন দিলাম জানি না। মনে হচ্ছে অনার্স পেয়ে যাবো। পরীক্ষার পর লম্বা ছুটি। মা বলল, 'রাঁচী ঘুরে আয়। তোর মাসী থাকে। গেলে খুশী হবে।' বললাম, 'তার চেয়ে আমার কলকাতা ভাল। বেশ দিব্যি খাব দাব আড্ডা দেব। তিনটে মাস ফাইন কেটে যাবে।'

বেড়াতে গেলে কম করে শ দুয়েক টাকার ধাক্কা। মিছি মিছি মার উপর চাপ দেওয়া ঠিক না। আর সাতদিন হোক দশ দিন হোক আমি বাইরে গেলে মা একা হয়ে যাবে। তখন হঠাৎ কোনো দরকার পড়লে কে দেখবে মাকে।

চৈতিদি চলে গেছে। মাসে অন্ততঃ দুটো চিঠি আসে। উত্তর দিই না। কাকে উত্তর দেব? ইচ্ছেই করে না। লাট্টুর পরীক্ষা কেমন হোলো জানি না। সীমনের সঙ্গেও দেখা হয় না। ও আসে না। আমিও যাই না। সারাদিন এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াই। মাঝে মাঝে ট্রামে বা বাসে চেপে ঘুরে আসি উল্টোপাল্টা। এ ট্রাম থেকে সে ট্রাম। এ বাস থেকে সে বাস। ঘুরে ঘুরে দেখি এ পাড়া থেকে সে পাড়া। এগলি সে গলি। বেশ লাগে। মধ্যে মধ্যে রাস্তা হারিয়ে ফেলি। আবার খুঁজে বার করি নিশানা। বেশ লাগে।

সাতাশ

একদিন পড়ার টেবিল ঠিকঠাক করছি। টেবিলের সঙ্গে লাগোয়া ড্রয়ার। শখের জিনিসপত্রে ঠাসা। আর একগাদা চিঠি। এর ওর তার। পরিচিত প্রিয় মানুষদের। হঠাৎ একটা ফটো বেরিয়ে পড়ল। কেকা। কেকা ? কেকার ফটো আমার কাছে ছিল? কই মনে ছিল না তো! সত্যি মনে ছিল না। ফটোটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কেকা হাসছে। কবেকার ফটো। সেই যখন আমি ইলেভেনে পড়ি। কেকা তখন নাইনে। ফটোর কেকা হাসছে। চার বছর আগের হাসি। ভুলে গেছিলাম হাসলে ওর গাল টোল খায় কিনা। এই তো টোল। কেকা এখন কেমন আছে? আমার কথা কি ওর মনেও পড়ে না? মনেই যদি না পড়বে তো এই ফটোটা আছে কেন ? কি দরকার এই মানে-সেই ফটোর পিছনে লেখা তুমি সোনা। সোনা সোনা সোনালী সুখ। আমি কি সুখ? সুখ যদি হব তো রইলে না কেন? সুখ যদি হব তো বাগ করলে কেন? সুখকে কেন ভাসান দিলে অসুখের দেশে? এ দেশ কি আমার?

ফটোটা পকেটে রাখলাম। সারাটা দুপুর ছটফট করলাম। মিটিয়ে ফেলতে হবে সব। দোষ যখন আমার, আমারই উচিত জিনিসটা মিটিয়ে ফেলা। বিকেলে দেব

হোতেই বেরিয়ে পড়লাম। বাসা অব্দি যেতে হোলো না। স্টাইলোর সামনে দেখা হয়ে গেল। বললাম, 'কোথায় যাচ্ছো?'

—একটা কাজে।

—কি কাজ?

—পার্সোনাল।

—আমার কয়েকটা কথা ছিল।

—কি কথা?

ফটোটা বার করলাম। বললাম, 'এটা আমার কাছে ছিল।'

—ওটা থাক। তোমার কি কথা আছে বলছিলে?

—চল হাঁটি। হাঁটতে হাঁটতে বলব।

ফাঁকা রাস্তা ধরে দুজনে হাঁটতে লাগলাম। কিছুক্ষণ বাদে কেকা বলল, 'বললে না কি কথা ছিল!'

—শুনবে?

—শুনব না কেন? বল।

—আমার কোনো কথা নেই।

—এর অর্থ? কথা নেই তো আমাকে এতদূর টেনে আনলে কেন?

আমি আবার ফটোটা বার করলাম। 'এটা রেখে দাও।'

—বললাম তো থাক।

—কেন? থাকবে কেন? আমি অন্য কারো জিনিস রাখি না।

—এটা কি অন্য কারো জিনিস?

—আমার না।

—তাহলে দাও। ফটোটা চেয়ে নিল কেকা। উল্টোপিঠ দেখিয়ে বলল, 'এই নামটা কার? তোমার না?'

চিরকালের সোনা বেরিয়ে পড়ল, 'আমি কি তাই বলেছি?'

—আবার কি বলবে? ফটোটা কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে ফেলল কেকা। বলল, 'তাহলে আমি যাই? তোমার কথা তো শেষ।'

—তোমার পার্সোনাল কাজটা কোন্‌-দিকে।

আঙুল তুলে কেকা লেক দেখাল, 'ওই দিকে।'

—কে আসবে জানতে পারি?

—তুমি এখনো ছেলেমানুষ সোনা। কবে যে তুমি বড় হবে।

—ন্যাকামি কোরো না। আমি জানতে চাই কে আসবে।

—বলব? সইতে পারবে তো? তোমার আবার যা হিংসা।

—তবু বল। আমি শুনতে চাই।

—সীমন। বুঝলে মশাই সীমন। আমি এখন সীমনের কাছে যাব।

জায়গাটা প্রায় অন্ধকার। এপ্রিল মাস। কলকাতায় বৃষ্টি শুরু হয়নি। দুদিক থেকে গরম চলছে। গরম আমার সামনে পিছনে, পায়ের নীচে। কোথাও কোনো স্বপ্ন নেই। বনে মেই। মায়ামবাগের গান বাজছে না কোথাও। লক্ষ্যে তুলে দাঁড়িয়ে, আমি কেকাকে আরেক-বার চড় মারলাম।

শেষ খণ্ড

একমাত্র অংশ

এক

—আসল কথা বেঁচে থাকা। বেঁচে থাকতে জানলে কখনো দুঃখ ফেস্ করতে হয় না। সুজিত আপনি কি এই থিয়োরী মানেন?

আমি অন্যমনস্ক ছিলাম। চমকে উঠলাম, 'আমাকে বলছেন?'

—অফকোর্স আপনাকে। অনিন্দ্য হাসল, 'বেঁচে থাকা নিয়ে আপনার কি কোনো থিয়োরী আছে?' বললাম, 'আমি ওসব থিয়োরীটিয়োরী বুঝি না।'

—বোঝেন না? তাহলে ওসব হিক্‌স সুর্মিপটার পড়েন কেন? ওগুলো তো থিয়োরী।

—ওঁরা বেঁচে থাকা নিয়ে থিয়োরী দেন নি।

—ওঁদের থিয়োরীর বেসিসটা কি মানুষের বেঁচে থাকা না? যাকে বলে বুদ্ধি-মানের মতো বেঁচে থাকা। র‍্যাশনাল শব্দটা ঐ জন্যেই বলা হয়েছে। ডেভরডটাই ওপর নির্ভর করে ওরা নিশ্চয়ই থিয়োরী দেন নি।

দীপিক কিন্তু ঘুরে যাচ্ছে। এরপর আমাদের মানুষের অস্তিত্ব নিয়ে তর্কে নামতে হবে। অনিন্দ্য সিগারেট ধরাল, 'আমার আপত্তি নেই।'

—আমার আছে। এই ঘোর বিকেলে চায়ের পেয়ালা সামনে নিয়ে তর্কে নামার বিরুদ্ধে প্রচুর আরগুমেন্ট আছে আমার।

—যেমন?

—আমরা কিন্তু বয়স্ক লোকের মতো কথা বলছি। আপনি কি মনে করেন? অনিন্দ্য হাসিমুখে বলল, 'এই দোকানটার নাম জানেন তো? ওরিয়েন্ট কাফে। এখানে বসলেই আমার অনেক গভীর গভীর কথা ভাবতে ইচ্ছে করে।' বললাম, 'তার জন্য বিশুদাকে ক্রেডিট দিতে হয়।' কাউন্টারে বসে বিশুদা কাগজ পড়ছিল। হঠাৎ নিজের নাম শুনে চোখ তুলল, 'কি ব্যাপার? ক্রেডিট কেন? কি নিয়ে কথা হচ্ছে আপনাদের?'

অনিন্দ্য তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'এই বেঁচে থাকা নিয়ে। সুজিত বলছেন বেঁচে থাকা নিয়ে ওর কোনো থিয়োরী নেই।' বিশুদা বলল, 'গাদাগাদা বই পড়ে আপনাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বেঁচে থাকার সঙ্গে থিয়োরীর কি সম্পর্ক? অ্যাঁ?' কথাটা বলে বিশুদা আবার কাগজে মন দিল। আমি অনিন্দ্যকে বললাম, 'আপনার রাজনীতি কেমন চলছে? ইউনিভার্সিটির ভোট কেমন হবে?'

—সামনের টেনথ্। আপনাদের ইকো-নমিক্স থেকে কেউ এগিয়ে আসছে না।

—আমার ইন্টারেস্ট নেই। আপনি অন্য ছেলেদের সঙ্গে কথা বলেছেন?

—বলেছি। কিন্তু আপনার ইন্টা... নেই কেন? আপনি একজন ছাত্র। আ... কি ছাত্রদের ওয়েলফেয়ার চান না? আ... তো ধারণা ইকনমিকসের ছেলেদের ব্যাপারে সবচেয়ে আগে এগিয়ে আসা উচি...

—যেহেতু তারা ইকনমিকস পড়... আপনি কি ভাবেন পাশ করে আমরা স... লোকজনের ওয়েলফেয়ার নিয়ে মাথা ঘা...

—তাই তো উচিত। অবশ্য ... যদি আত্মকেন্দ্রিক না হন।

বললাম, 'এই বকতবাটা ... থিয়োরীতে আছে?' অনিন্দ্য চটে গেল।

বলল, 'আপনি কি বিপ্লবের ... ভাবেন না?'

—বিপ্লব! আপনি কি বিপ্লব চে...

—কি বলছেন আপনি? আমি বি... চিনি না? আমাদের পার্টির মূল ... হোলো এদেশে বিপ্লব আনা। এব... রীতিমত গণতান্ত্রিক উপায়ে। আর আ... বলছেন আমি বিপ্লব চিনি না?

এবার বিশুদা বলল, 'লোকে ... পাচ্ছে না। কিসের বিপ্লব ফিপ্লব ম... মশাই? এই তো কদিন আগেও চালের ... পাঁচটাকা ছিল। পেটে ভাত নেই বিপ্লব আকাশ থেকে পড়বে?' অনিন্দ্য রাগ... বলল, 'পেটে ভাত নেই বলেই ... দরকার। এটা খুব সহজ থিয়োরী।' ... থিয়োরী।' বিশুদা মুচকি হেসে ... মন দিল। অনিন্দ্য উঠে পড়ল। ... বাইরে এসে বললাম, 'আপনি ... করলেন?'

—আপনি বলছেন যা ... বিপ্লব ... না!

—চেনেন না বলি নি। চেনেন ... জানতে চাইছি।

—আপনি কি বলতে চান দেশবি... যত বিপ্লব হয়েছে আমি খবর রাখি না...

—বিপ্লবের খবর রাখা আর বি... চেনা কি এক? আপনাকে একটা ... সাজেস্ট করব। শুনবেন?

—বলুন।

—কম্যাস বাদেই তো পরীক্ষা। অ... মনে হয় আপাততঃ রাজনীতি বন্ধ ... মন দিয়ে পড়াশুনো করুন। আগে ... আগে নিজের ওয়েলফেয়ার। তারপর অন্যেরটা। নিজেই যদি ডোবেন তো অ... তুলবেন কি করে? এটা কিন্তু ... থিয়োরী না। খুব সাটামাটা সহজ ... কথাটা বলে আমি একটা ... টামে পড়লাম। অনিন্দ্য তখন স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে আছে। চেঁচিয়ে বললাম, ... আসছি। বিপ্লব নিয়ে অনেক কথা আ...

অনিন্দ্যর সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে ... টিকিট নেবার জন্য আমি পকেটে ... দিলাম।

ট্রাম থেকে নেমে ভাবলাম, পান ... কিন্তু পান চিবুতে চিবুতে শুক্লার ... যাবো। পান মুখে দিয়ে প্রেম?

—আবার শালা ইয়ার্কি। তুই কি মক?

—কেন আমি প্রেমিক না কেন? আমার য় কতো ছেলে প্রেম করছে। আর আমি লেই দোষ?

—তোকে প্রেমিক হিসাবে মানায় না।

—তবে আমাকে কিসে মানায়।

—কোনো কিছুতেই তোকে মানায় না। তুই পান চিবুতে চিবুতে শুক্লার কাছে

—সেই ভাল। দশ পয়সা দিয়ে পান নলাম। সিগারেট ধরালাম। সিগারেটে দিতেই কাশি পেয়ে গেল। মনোযোগ য় আমি একটু কেশে নিলাম। কাশলে, য়নায় দেখেছি, দুটো গভীরভাবে পান নিজের কাছে ধরা পড়ে যায়। মতঃ ভুরু দুটো কুঁচকে ওঠে। এবং টা ওপরের ঠোঁট ছুঁয়ে কাঁপতে থাকে। মিলিয়ে গোটা মুখ বা মুখশ্রী যাই বল কেন অল্প বোকাবোকা হতো লাগেই: াদের আবার বেশী কাশলে মুখ লাল া ওঠে। আমার সে সমস্যা নেই। ব রক্ত আছে। কিন্তু মুশকিল, তা রে থেকে দেখা যায় না।

শুক্লা এসেই বলল, 'বাঃ পাংচুয়াল। মি তো ভেবেছিলাম সাতটার আগে টিকিই বে না।'

—আমার কিন্তু টিকি নেই।

—নেই তো নেই। এখন চল, সেই থেকে হাঁটছি জানো?

গেট ঠেলে ঢুকলাম। বসলাম। হাতের টি ব্যাগটা কোলের ওপর রেখে শুক্লা লল, 'তারপর বল কেমন আছ?'

দুই

ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরেই আমাকে টিশানিতে দৌড়োতে হয়। সপ্তাহে বাঁধা- া চারদিন।

পড়াই একটা বাচ্চা ছেলেকে। এইটে ড়ে। বুদ্ধিশুদ্ধি আছে কিনা কখনো ভেবে খিনি। একদিন ছাত্রের মা বলেছিল, ামার কি মনে হয় সঙ্গীত ও সায়েন্স বে?'

উত্তর দিয়েছিলাম, 'আমার কিছু মনে য় না।' মহিলা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে রিয়ে গিয়েছিল।

আজ পড়াতে গেলাম। একটু পরেই াত্রের মা হাসিমুখে ঘরে ঢুকল। নিশ্চয়ই কা দেবে। আমিও হাসিমুখ করলাম। কা দিয়ে মহিলা বলল, 'তোমার ডাকনাম সোনা?'

—কে বলল? আমি ভুরু কুঁচকালাম।

—বলেছে একজন। যে বলেছে তুমি াকে চেনো।

—আমি চিনি? কে বলুন তো?

—কেকা। আমার মেজ ননদের মেয়ে। সদিন ওদের বাসায় এই পড়ানো টড়ানো নিয়ে কথা হচ্ছিল। আমি তোমার নাম বললাম। কেকা সামনে ছিল। তখনই শুনলাম ওর সঙ্গে নাকি তোমার ছোটবেলার ভাব। খুব জিগ্যেস করছিল তোমার কথা।

আবার ছোটবেলা? বাড়ি ফিরে এলাম। মা বলল, 'কি যে রোজ রোজ দেরি করিস? আয়নায় একবার দেখেছিস নিজের চেহারাটা? ঠিক যেন ভূত।'

আমি খুনীর মতো হাসলাম, 'আমি তো ভূতই।'

তিন

পরদিন পড়াতে গেছি, ছাত্রের মা ঢুকল, 'একে চেনো?'

মুখ ফেরালাম। পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে। হাসছে। শুনলাম, 'কেমন আছো।'

—ভাল। আমি আবার ছাত্রের দিকে মন দিলাম। ঘর ফাঁকা হয়ে গেল। শুধু গন্ধ রইল। সুন্দর অশ্লীল।

বেরোচ্ছি, দরজার মুখে আবার। পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলাম, জামা ধরে টানল, 'কোথায় যাচ্ছো। বোসো।'

বললাম, 'এটা কি তোমার ড্রইংরুম?'

অপ্রস্তুত হয়ে কেকা বলল, 'তাহলে বাইরে চল।'

হাঁটতে হাঁটতে কেকা বলল, 'তুমি একটু লম্বা হয়েছ।'

বললাম, 'তুমি কি এখন বাড়ি যাচ্ছো?'

হেসে ফেলল কেকা, 'এখন তো আমার টিউটোরিয়াল ক্লাশ। তোমাকে দেখব বলে এখানে চলে এলাম।'

—দেখলে?

—ঘরের ভিতর তো চিনতেই পারলে না। বাব্বাঃ কি গম্ভীর তুমি।

আমি ঘড়ি দেখলাম। কেকা বলল, 'ঘড়ি দেখছ যে? আমার ক্লাশ তো সাড়ে নটা অব্দি। তার অর্থ বাড়ি যেতে যেতে দশটা।'

—তাতে আমার কি? আমি কি ঐ জন্য ঘড়ি দেখলাম?

কেকার মুখটা একলা হয়ে গেল, 'তবে? অন্য কোনো কাজ আছে?'

—আছে।

—কি কাজ?

—পার্সোনাল।

—আমাকে বলা যায় না বুঝি?

—না। তুমি কত নম্বরে উঠবে? চল উঠিয়ে দিচ্ছি।

—আমাকে উঠিয়ে দিতে হবে না। আমি একলাই যেতে পারি।

—সেই ভাল।

—সেই ভাল? তাহলে বললে কেন চল উঠিয়ে দিচ্ছি?

—ওটা ভদ্রতা। আমি বললাম।

—তুমি আমার সঙ্গে ভদ্রতা করলে? পারলে?

—দেখলে তো।

বাসস্ট্যান্ডে এসে বললাম, 'এখান থেকে বাসে উঠে যাও।'

কেকা বলল, 'আমার কথা কিছু জানতে চাইবে না?'

—না।

—তুমি কি জানো সীমনের ব্যাপারটা আমি তোমাকে বানিয়ে বলেছিলাম। বিশ্বাস হচ্ছে?

—হচ্ছে।

—কি হয়েছে তোমার? এমন করে কথা বলছ কেন? কতদিন বাদে তোমাকে দেখলাম। কেন এত পাল্টালে?

—ছেলেমানুষী কোরো না। এটা রাস্তা। সিনেমা না।

—রোববার বিকেলে ফ্রি আছো?

—আছি।

—সাড়ে ছটার সময় এখানে আসবে? এই স্টলে?

—কেন?

—একটু গল্প করতাম। আসবে?

—না।

—তুমি কি আমার সঙ্গে আর গল্প করতেও চাও না?

—না।

চার

একদিন বিকেলে বেরোচ্ছি, পাশের বাড়ির রানি এসে বলল, 'সোনাদা, তোমার ফোন।'

সীমন ফোন করেছে। কিছুক্ষণ এটা-সেটা মামুলি কথাবার্তা হোলো। কিছুক্ষণ বাদে জিগ্যেস করলাম, 'তোমার ছবি আঁকা কেমন চলছে?

সীমন উত্তর দিল 'ছবিই তো আঁকছি। সারাদিন সারারাত শুধু ছবিই আঁকছি।'

টেলিফোন রেখে দেবার পর ভাবলাম, ছবি তো আমিও আঁকি। সারাদিন সারা-রাত আমিও ছবি আঁকি। সারাজীবনই এঁকে যাব।

পাঁচ

হঠাৎ পুলিশ ভ্যানের ওপর বোমা পড়ল। কলেজের ছাদ থেকে: আমি কলেজের কাছে টাকা পাই। লাইব্রেরীর ডিপোজিট দশটা টাকা। সেটা নিতেই আজ আমার আসা। অফিসঘরে কথা বলছিলাম হেড কেরানীর সঙ্গে।

হেড কেরানী নবীনবাবু বড়ো মানুষ।

পেনসিলের মতো চেহারা। একটা চোখ নেই। কানেও কম শোনে। কিন্তু বোমাটা ঠিক শুনল। চশমা রেখে কাঁপতে লাগল ঠকঠক করে, দ্যাখো তো কি কাণ্ড। একি অরাজক দেশরে বাবা। দেশে কি সুখ-শান্তি কিছু রইল না?

সুখ-শান্তি রইল না। আমিও রইলাম না। বেরিয়ে পড়লাম অফিসঘর থেকে। দোতলার সিঁড়ির মুখে শ্লোগান চলছে ছাত্র বিপ্লব লাল সেলাম। ছাত্র ঐক্য লাল সেলাম। ছাতে এলাম। ভিড়। লাল ফ্ল্যাগ উড়ছে। শ্লোগান উড়ছে লাল সেলাম।

লাল সেলাম। পাশে তাকালাম। ভিড়। সামনে তাকালাম; ভিড়। পিছনে তাকালাম। ভিড়। কার্নিশ ধরে দাঁড়ালাম। রাস্তায় ভর্তি পুলিশ। বন্দুক তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দোকানপাট বন্ধ। লোকজন নেই। সাবধানে চলে যাচ্ছে বাস ট্রাম অন্যান্য গাড়ি। যে কোনো মুহূর্তে চূড়ান্ত কিছু ঘটে যেতে পারে। কে যেন বলল, সরে আসুন। সরে আসুন। এক্ষুনি গুলি শুরু হবে। দূরে দাঁড়ালাম কেন?

—বাঃ। আবার পেটো পড়বে যে।

—কেন?

—কি তখন থেকে কেন কেন করছেন? সব কেনর কি উত্তর হয়? এরপর হয়তো বলবেন কেন আমাদের লাল সেলাম।

বললাম, ঠিক ধরেছেন। কেন বলুন তো লাল সেলাম।

ছেলেটা রাগ করে চলে গেল। অবাক হয়ে দেখলাম আচ্ছা করে শ্লোগান দিচ্ছে। সব লাল লাল শ্লোগান। আর ভিড়। লাল লাল ভিড়। আর রং। সব লাল রং। তাহলে আমার? এই যে আমি হয়ে যাচ্ছি। রোজ রোজ একলা? কি রং?

—তোর তো কালো। তোর কালো। আবার কি?

—সবটাই কালো? ধাঃ।

আমি ফিক করে হাসলাম।

— শেষ —

মানুষ কেনা বেচার ইতিহাস

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

এই ব্রতে সে আত্মনিয়োগ করলো। অতলান্তিকের এপার ওপার সে 'নিগ্রো সাম্রাজ্য' (৫) প্রতিষ্ঠায় লেগে গেলো। যদি আমেরিকার তদ্বিরীতে আর আমেরিকার পয়সায় আফ্রিকায় একটি আমেরিকান নিগ্রোর উপনিবেশ গড়া যায়, সেটাও তো 'আমেরিকানই' হবে। অতলান্তিকের এপারে রইলো নিগ্রো রাষ্ট্রের জাহাজ খাটিয়ে এই দুই রাজ্যের 'স্বাধীন' ব্যবসায় বজায় রাখতে হবে। তবেই আমেরিকায় নিগ্রো দাস আমদানীর মতো লাভজনক ব্যবসায়টি বজায় রাখা যাবে।

ঐ স্বপ্নে বিভোর হোলো আমেরিকা। পাঠালো নিগ্রোদের,—'ফিরে চলো' আফ্রিকায়। 'ফিরে চলো' আন্দোলন লাগলো জোর। কিন্তু সে আন্দোলনের মূল সূত্র জাগালেন এক ভদ্রলোক (এদেরও ভদ্রলোক বলতে যে কেন হয় জানি না)—নাম এডওয়ার্ড পলার্ড। ভার্জিনিয়ার লোক। ভদ্রলোক স্বপ্ন দেখতেন সারা আমেরিকায় থাকবে সারা য়োরোপ; এবং য়োরোপের অধিবাসীরা এখানে এসে ধনী হবেন। ইয়োরোপের ধন যাদের থাবার মধ্যে আছে, তারা নিরাপদে থাকবে। শুধু দরকার যারা য়োরোপীয় নয় তাদের মুছে ফেলা। ব্যাপারটায় অসুবিধাও নেই অন্যায় তো নেই-ই। [illegible] বর্বর ঐতিহ্য সাফ করে ফেলাটা পুণ্যের কাজই হবে। কে বলে হিটলারের 'মেইন কাম্ফ'এর ভাষা এবং নীতি মানবতার ব্যাভিচার? এডওয়ার্ড পলার্ড-এর 'ব্ল্যাক ডায়মণ্ডস' তিনি পড়েন নি।—পড়লে হিটলারকে খোকা বলে মনে হবে; 'মেইন কাম্ফ' মনে হবে যেন বাপুজীর লেখা গীতার ভাষ্য।

তাঁর বক্তব্য য়োরোপ ভর্তি দীনাতিদীন সব ম্যাদামারা পুয়োর হোয়াইটসরা করছে কী? খেয়ে না-খেয়ে আজ এখানে কাল সেখানে হাঙ্গাম, হুজ্জৎ, বিপ্লব, বিদ্রোহ করে বেড়াচ্ছে, আর করছে এন্তার বংশবৃদ্ধি। চুরি-রাহাজানিরও অন্ত নেই,—পুলিশী দুশ্চিন্তা, আদালতের সময় নষ্টেরও ঝামেলা। তার চেয়ে সবাই ঝেঁটিয়ে এখানে চলে আসুক। জাহাজ ভর্তি হয়ে আসুক। ভোগ করুক এই বিশাল মহাদেশ। ক' মুঠো আদিবাসী এরা যারা এ দেশে আছে, বড়ো জোর দশ থেকে বিশ লাখ,—খতম করে দাও তাদের। তারপর 'একাত্তপত্রং জগত্তং প্রভুত্বং'! সব শাদা; সব এক রং। ভাবনা কী?

ঐ নবাগত য়োরোপীয় দরিদ্র মালিকানা পেয়ে যাবে। দক্ষিণের আমেরিকায় ধনবৃদ্ধির পুণ্য ব্রত থেকে সে ছিলো এতোকাল বঞ্চিত। চেষ্টা এবং অর্থের সুবিস্তৃত এলাকা তার চোখের সামনে জ্বল জ্বল করবে। সে অন্য মানুষ হয়ে উঠবে। শাদাদের চোখে সে আর হেয় থাকবে না। কালা আদমী থেকে পৃথক হয়ে দাঁড়াতে পারবে তারা। খোদাতালাকে সালাম দেবে যে দাসত্বের ফাঁড়া তারা ডিঙিয়ে এসেছে।

পড়লে হঠাৎ মনে হয় হিটলার বা গোয়েবল্সের ভাষণ জীউদের সম্পর্কে। তবে একটা কথা এই ফাঁকে জবর জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে ব্ল্যাক চিকনগুলো খেয়ে দেয়ে বেশ মোটাসোটাই ছিলো। সুতরাং তাগড়াইতে শাদারা তাদের তুলনায় কিছুই নয়।

মোটা ছিল মানে খুব খেতে পেতো তা নয়। খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণের ওপর গড়ন ও পরিপাক নির্ভর করে না। পরিপাক, যাকে বর্তমান বিজ্ঞান বলছে 'মেটাবলিজম' একটা শক্তি। সব শক্তির আধারের মতো এটাও বিজ্ঞানের কাছে দুর্জ্ঞেয়। 'সামান্য খাবার খায় পচার মার সপ্তম মেয়েটা, কী গতর! আর আমার সবে ঐ বনানী, কী না খাওয়াচ্ছি; সানাটোজেন থেকে কাম্প লিভার এক্সট্রাকট্। যে বিশ পাউণ্ড সেই বিশ পাউণ্ড।'

এ আর্তনাদ আকছার! আসল কথা 'মেটাবলিজম'। বেশীর ভাগ নিগ্রো দাসেরা খেতো 'পর্ভিজনস' অর্থাৎ কচু, কাসাভা, যাম, কাঁচকলা ইত্যাদি, ভুট্টার আটা শুকনো নোনা সামুদ্রিক মাছ, শোর, গরু, মোষের নাড়ী-ভুঁড়ি এবং রক্তের পাকে পক্ক পদার্থ—ব্ল্যাক পুডিং এবং যাম। ইদানীং চালও যেতো। কিন্তু দেখতে এক এক জন এক-একটী শুম্ভ, নিশুম্ভ। দৈত্য বলতে যা বোঝায়।

কাজেই সফেদ বাবুরা তাঁদের বিবি-জানদের নিয়ে লবেজান, হলাকান। হাড়ের ভয় আর ছাড়ে না। বেশীর ভাগ জজ-কালেকটর-ম্যাজিস্ট্রেটের দাপট বলতে আমরা যা জানি তা তাদের হাড়ের ভয়ের তাড়শ। ও এক ধরনের অ-নিরাপত্তার বোধের প্রতিক্রিয়া। মানসিক ব্যাধি; ব্যবহারের জন্য।

ঐ ধরনের অ-নিরাপত্তার বোধ থেকে যৌথ এবং সামাজিক ত্রাসের জন্ম। নিগ্রোর অদ্ভুত গঠন, স্বাস্থ্য এবং বপুর বিশালতা দেখে সফেদী বাবুদের মনে এই ত্রাস ছিলো। তখনও ছিলো, এখনও আছে। ভর্স্টারেরও আছে; ইয়ান স্মিথেরও আছে। 'মিশ' থেকে গেলেই 'মিস'দের কেন মিসেস্-দেরই মিস করতে হবে। এটাই অনিরাপত্তা। এবং এই ত্রাস ছিলো যেমন বাবুদের তেমনি বিবি-দেরও। নিগ্রো মেয়ের দেহের গঠন দেখে শাদা বিবিদের কর্সেট, ব্রেসিয়ার-আঁটা যৌবন দোলা বাইরের চেয়ে হাড়ের মধ্যেই কাঁপন লাগাতো বেশী। তারা কখনও নিগ্রো কন্যাদের ধারে কাছেও বাবুদের আসা 'সুনর্' চক্ষে দেখতে পারতো না। চর্ম-চক্ষে ছুঁতো না।

তাগড়াইতে, জৌলুষে, ছন্দে, স্বাস্থ্যে, ক্ষুধায়, পরিপাকে শাদারা নিগ্রোদের তুলনায় কিছু নয়। কাজেই শ্বেত-সমাজ মনে মনে একটি নীরব ভীতি পোষণ করতো। যতোই তা পোষণ করতো, ততোই কঠিন করে আইন বাঁধতো। হয়ে যেতো অগ্রসৃতি-হীন রক্ষণবাদী পুঁজীর গন্ধ। তাদের হাতের মধ্যে অ-নিরাপত্তা। বিশ্বাসই করতে পারতো না যে একদিন এই কৃষ্ণ-ক্রোধানল পাহাড় জঙ্গল ডিঙিয়ে শ্বেত সভ্যতাকে চার পাশ থেকে ঘিরে ধরবে না। অতিকায় নিগ্রোদের ভয় ইয়াংকীর হাড়ের ভয়। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে

হলে একমাত্র মুখোশ—ঐ দেমক্র্যাসী। যে কোনো উপায়ে শাসন ব্যবস্থা, সভ্যতার যন্ত্রটি নিজের অধিকারে রাখা। সেটার জন্য দরকার ভোট। সফেদের জন্য সফেদ ভোট; নতুন মহাদেশ এই আমেরিকায় শাদা ভোটকে তুমুল করে তোলা; কালো ভোটকে চিরদিনের মাইনরিটি করে রাখা।

এই কারণেই বিদেশ থেকে বসত করতে আসা নিয়ে ভিসা এবং ইমিগ্রেশন আইনের আজ এতো কড়াকড়ি। যে বিরাট হারে আমেরিকায় শাদা মানুষ শিয়ে জড়ো হচ্ছে তার তুলনায় অশাদারা যেতেই পারছে না। গোটা কয়েক অশাদা যারা যাচ্ছে তাদের বিদ্যা, মস্তিষ্ক বা অন্য

---

(৫) নিগ্রোদের সাম্রাজ্য নয়; পেট্রোল সাম্রাজ্য পেট্রোল বেচা কেনার একচেটিয়া স্বপ্ন। তেমনি নিগ্রো সাম্রাজ্য অর্থে নিগ্রো বেচা কেনার একচ্ছত্র অধিকার কায়েমী রাখা।

Pollard Edward A — Black Diamond Gathered in the Dark Homes of the South.

কোনো 'কর্তী'র বল আছে বলেই শাদাদের ঐ সব অভাব পূরণের জন্য যাচ্ছে। মধ্য য়োরোপ ও দক্ষিণ য়োরোপের সমাজে দারুন ভাঙ্গন ধরেছে নাৎসী যুগ থেকেই। সেই ভাঙ্গনের তোড় ধারণ করছে আমেরিকা;—উদ্দেশ্য যে সব জায়গায় নিগ্রো সংখ্যাধিক্য, সে সব জায়গায়অনিগ্রো বসতি সৃষ্টি করা।

এই ভয়ের কারণ ঐতিহাসিক। যতই প্রচার করুক শ্বেত বাশিন্দারা যে নিগ্রো ঈশ্বরের সৃষ্ট এক বশংবদ নিরীহ, গো-বেচারী জীবমাত্র, (নিগ্রো বা রেড ইণ্ডিয়ান আপাচে-রা যে 'পারসন' এ কথা আদালতকে রায় জুগিয়ে বোঝাতে হয়েছে; এবং বোঝানো সত্ত্বেও অনেকে বোঝেন নি; বুঝতে অস্বীকৃত হয়েছেন), (৫) আসলে নিগ্রোরা একটি দিনের জন্যও আত্মার বশ্যতা স্বীকার করেনি; দেহ দিয়ে, শুধু দেহ দিয়েই যদিও সে অসাধ্যকেও সাধ্য করেছে। মনে সে পুষে রেখেছে দুর্নিবার পিপাসা। অরণ্যের পিপাসা। স্বাধীন পদক্ষেপে স্বাধীন গৃহাঙ্গনের সীমায় স্বাধীন জীবন।

কাজেই দাস বিদ্রোহের কথা ইতি-উতি প্রায়ই শোনা যেতো। শান্ত নিরীহ 'দাস'-রা সত্যিই শান্ত নিরীহ নয়। শাদাদের স্বার্থবোধ তাতে থরহরি কম্পমান। শহরে গাঁয়ে বিদ্রোহ তো চলতোই, সারা দাস-অধ্যুসিত নিগ্রো-আমেরিকায় বিদ্রোহ লেগেই ছিলো। সে বিদ্রোহ প্রচণ্ড শাসনে দমিত হয়েছে; দমিত হয়নি স্বাধীনতার পিপাসা।

নিগ্রোদের ধরে জুলুম করে করানো হোতোনা এমন কোনো কাজ নেই। অথচ আমেরিকা নাকি জগতের স্বাধীনতার পাণ্ডা চাঁইবাবা, গুরুজী। 'স্বাধীন পৃথিবী'র কর্ণধার। মালিকানা সাব্যস্ত করেও তাঁকে স্বাধীন পৃথিবীর স্বাধীনতা পোখতো রাখতেই হবে। ডালেস থেকে কিসিংজার কেবল ধমকান,—খবরদার পৃথিবীর স্বাধীন লোককে বেসামাল করেছো কী—!

এরা যেন 'মানুষ' ছিলো না! নিজেকে মানুষ বলে প্রমাণ করার একটা গুরুতরো দায় আছে। সে দায় পোয়াতে যার রুচি বা কৃতী-তে বাধে সে-ই বরং মানুষ নয়। মানুষ বলে নিজেকে প্রমাণ করার স্বপক্ষে যে সব 'দায়' নীতি-ন্যায় প্রকরণে মনু থেকে ম্যাকেঞ্জী পর্যন্ত গেয়ে গেছেন কলেজের ছাত্রদের তা মুখস্থ করে ডিগ্রী হাসিল করতে হয়। সে গান গেয়েছেন রামায়ণ, মহাভারত, শাহনামা, ঈলীয়স-অডিসী পর্যন্ত! কিন্তু তার মধ্যে একটা কথা সেদিনের একজন গেয়ে গেছেন : 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে!' একথা শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব একাধিক-বার শাসিয়ে গেছেন। ঋষি-বাক্যের মধ্যে খুঁজলে এ তত্ত্ব পাওয়া কঠিন হবে না। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রুখে দাঁড়াবার স্বাধীনতা পশুও পেয়েছে প্রকৃতির হাত থেকে। কিন্তু যে মহৎ প্রাণ বহুর বিপন্ন স্বাধীনতার স্বপক্ষে যুদ্ধ কোরে নিজের স্বাধীনতা,—এমন কি প্রাণকেও উৎসর্গ করতে অকুণ্ঠিত, অসন্দিগ্ধ, সে-ই পশুত্বের গণ্ডী পার হয়েছে। মানুষ হয়েছে। তার কীর্তিই প্রমাণ করে দেয় মানুষই দেবতার কাছাকাছি উঠতে পারে। এরই নাম আদর্শ। আদর্শের জন্য লড়াই করাই মানুষের সাত্ত্বিক পরিচয়। এবং এই পরিচয়ে নিগ্রো উত্তীর্ণ। পাল্‌মারেসের ইতিহাস তার সাক্ষ্য হয়ে থাকবে। ইতিহাস আরও লেখা হচ্ছে। এ্যাঙ্গোলা শেষ হোলো। জিম্বাবোয়ের (রডেশিয়ার) মোকাবেলা শুরু। আফ্রিকায় আগুন। এপার আফ্রিকায় দাবানল; ওপার আফ্রিকার দিগন্তে রক্তের ঝলক।

আজ এই দারুন বিপ্লবের মূলো মানুষ জানতে শিখেছে রক্ত সবারই লাল। চামড়ার চিহ্ন কোনো অন্তরায় নয়। ছিলোও না মহাভারতে। খণ্ড ভারতের স্মৃতি যা-ই বলুক না কেন। গরুড় যখন ব্রাহ্মণকে গিলে ফেলেছিলেন (মহাঃ ভাঃ আদি) বললেন, হে ব্রাহ্মণ তুমি বেরিয়ে এসো এ বিপদ থেকে। তোমায় সুযোগ করে দিচ্ছি। ব্রাহ্মণ বললেন, সঙ্গে আমার 'নিষাদ' পত্নী। তাকে ছেড়ে যাই কী করে। গরুড় উভয়কেই ব্রাহ্মণ জ্ঞানে নিষ্কৃতি দেন। কোন্ স্মৃতির ন্যায়ে সে ব্রাহ্মণের নিষাদ পত্নী? পরাশরের ছেলে ব্যাসকে কী জাতজ বলতে হবে? অসবর্ণ মিলনও যখন ছিলো তখন আর্য সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করেছে অনার্যকে আত্মীয় করে; তাদের ঠেলে রেখে নয়।

কিন্তু দাস ব্যবসায়ে লিপ্ত আমেরিকা এ পর্যন্ত কী করে এসেছে? তার ঐতিহ্য কী? আমরা দেখেছি যে, স্বয়ং লিংকলনই বলেছেন, নিগ্রো শিক্ষার যোগ্যও নয়, শ্বেতাঙ্গের সমকক্ষ হবার কোনো যোগ্যতা বা দাবী তার নেই। (ক) আদালত বলেছে, নিগ্রোকে 'মানুষ' বলেই মানতে হবে, (খ) কিন্তু তবু মার্কিনী সেনাধ্যক্ষ সে রায় অগ্রাহ্য করেই নিগ্রো নিধন যজ্ঞে পৌরোহিত্য করেছে। ইংরেজ দাসপ্রথা বন্ধ করেছে। আমেরিকা দাস ব্যবসায়ের চোরা কারবার খুলেছে। ইংরেজ যখন দাস ব্যবসায় বন্ধ করার জন্য আন্ত-র্জাতিক জল-পুলিশের ব্যবস্থা করেছে, আমেরিকা তখনও এক দাস কেনা-বেচার 'সাম্রাজ্য' খাড়া করায় ব্যস্ত। উদ্দেশ্য যাতে ইংরেজের শাসন সেই নবরাষ্ট্রে না পৌঁছায়। এবং বর্তমান আফ্রিকী সভ্যতার বহু গণ্য-মান্য পদবীধারী, পদাধিকারী, অর্বুদপতির প্রতিষ্ঠাই হয়েছিলো এই চৌর্য থেকে লুণ্ঠিত ধনের প্রসাদে। আপাচেদের নির্বংশ করে, তাদের জমি-জেরাৎ হড়প করে, এবং নিগ্রো-বেচার চোরা-কারবারের আয়েই এই কালের আমেরিকার মূলধনের মহরৎ।

এই মূলধন সংগ্রহের তপস্যাতেই নিগ্রো-বেচার-সাম্রাজ্য, নিগ্রোর পরিশ্রমে গড়ে তোলা সাম্রাজ্যের কথা বলতে হয়, বলতে হয় চার্লস লামারের কথা, এডুয়ার্ড পলার্ডের কথা, নাইটস অফ দি গোল্ডেন সার্কেলের কথা এবং কয়েকটি কুখ্যাত জাহাজ এবং তাদের ক্যাপ্তেনের কথা।

দক্ষিণ (আমেরিকান রাষ্ট্রগুলি) এবং উত্তর (আমেরিকান রাষ্ট্রগুলির)-এর মধ্যে এই দাস ব্যবস্থা, দাস ব্যবসায়, দাস-নির্ভর-দৌলতের বিপক্ষে সংঘর্ষ বিপুল হয়ে উঠলো। প্রাকৃতিক কারণে দক্ষিণে যতো তুলো, আখ, তামাক ক্ষেতের প্রাচুর্য ছিলো, উত্তরে ততো ছিলো না। দক্ষিণ ছিলো ক্যাথলিক প্রধান। রোম চিরকাল স্পেনের সাক্ষাৎ কারণ পোপের দক্ষিণার মোটা অঙ্ক স্পেনের সাম্রাজ্য থেকেই আসতো, যদিও সে দৌলৎ এক-কাঠ্‌ঠা করা হোতো দাস ব্যবসায় থেকে, আমেরিণ্ডিয়ান নিপাত থেকে, কারীব এবং আরাওয়াকে জাতিদের নিশ্চিহ্ন করা থেকে, রেড ইণ্ডিয়ান আপাচেদের বেড়িয়ে উৎখাৎ করা থেকে। দক্ষিণা দক্ষিণা। কার রক্তের গন্ধ তাতে এ নিয়ে মাথা ঘামায় কে? তবে না কলির পুরুৎ?

দক্ষিণ যেমন ক্যাথলিক, উত্তর তেমনি প্রেসবিটেরিয়ান, এ্যাংলিকান, পিউরিটান, কোয়েকার। এই শেষোক্ত দুই দলই মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করার স্বপক্ষে ছিলো। দক্ষিণ মেনে নিয়েছিলো যে দাস প্রথা কালের অনিবার্য প্রয়োজন। এবং জানতো যে আমেরিকার ভূমি ভাগকে শস্য-শ্যামলা করে তুলতে হলে তার দুর্নীতিকর্মা উপাদান নিগ্রোরাই। এ প্রথার বিপক্ষ-বাদীদের মূর্খ, শয়তান, শ্বেত ভবিষ্যতের অন্তরায় বলতেও দক্ষিণ-শ্বেতীরা কুণ্ঠিত হোতো না। শ্বেতকায়দের বক্তব্যই ছিলো বলদ, মোষ, ঘোড়া, গাধার মতো শ্রমের দ্বারা শ্বেতাঙ্গদের ধনবৃদ্ধির জন্যই ঈশ্বর নিগ্রো সৃষ্টি করেছেন। এই ঐশ্বরিক ইচ্ছাশক্তির বিপক্ষে চিন্তনই পাপকর্ম। দাস প্রথা যদি পাপকর্ম হয় তা হলে ঘোড়ায় চড়া, বলদ চালানো, গাধার ব্যবহারও পাপ কর্ম। অন্তত দক্ষিণ এই মতে বিশ্বাস করতো; এবং এই ছিলো। এবং আজও আছে, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ প্রদেশগুলির আপ্তবাক্য হয়ে। স্বয়ং লিংকলনই তাদের স্বপক্ষে।

মিসিসিপির 'দ্য-বাও'জ রিভ্যুতে ডার্ভের নামক এক তালেবর ব্যক্তি লিখলেন, যে উত্তর আমেরিকার উচিৎ দাস প্রথা য়োরোপেও যাতে চালু হয় সেই ব্যবস্থা এখন থেকেই করা। এককালে যখন কল-কারখানা হবে তখন এই 'মেঠো জন্তু'গুলো দিয়ে তো আর কল-কারখানা চালানো যাবে না; তখন দরকার হবে মানুষ; এবং য়োরোপের মানুষ মানেই শাদা-মানুষ। কিন্তু মধ্য য়োরোপ ভর্তি সেই শাদাদের দলকে দল, সমাজকে সমাজ

(a) US vs. Crook Case. 5. Dillon. 453. (Arguments of Webster and Papleton).
(b) US Congress 46th 3rd Session. Senate Ex Documents 14-p.5.

(ক) পূর্বোক্ত ৩ নম্বর পাদটীকা।
(খ) পূর্বোক্ত ৫ নম্বর পাদটীকা।

...দের ধুঁকছে, না খেয়ে মরছে, প্লেগে-... সাবাড় হয়ে যাচ্ছে। ওদের ধরে ... লাগিয়ে দিলে ওদেরও উব্গার, ...দের এ দেশেরও উব্গার!

এডুয়ার্ড পলার্ডের কথা আগে বলা ...ছ। তাঁর বক্তব্য দক্ষিণে প্রতি ...াঙ্গের একটি দাস থাকা উচিত; প্রতি ...াঙ্গিনীর একটি দাসী। নৈলে নানা ...বিধা। চাকর নৈলে সংসার চলে? চাকর ...ই তো শান। যার যতো শান তার ততো ...মৎগার। 'বামুন-চাকর-ঝি'—এ নৈলে ...নধারণ কী? সুতরাং দাস তো চাই-ই; ...র দামও কমানো চাই।

তবেই মেক্সিকো পার করে, পানামা ...ক পার করে সুদূরে ক্যারাবিয়ান ...রের দ্বীপ-মালাকে গলার হার করে ...ন আমেরিকার ভূভাগে এক-পা রেখে, ...লিফোর্ণিয়ায় অন্য পা রেখে এক সুবর্ণ-...লা-নন্দিতা সভ্যতামণ্ডিতা নাগরী ...ট রচনা করা যাবে যা হয়ে উঠবে ...ক্সিকো উপসাগরের নতুন আফ্রোদিতে।

'সেদিনের কথা যখন ভাবি', বলছেন ...ার্ড, 'দেখতে পাই কবোষ্ণ-শ্যামাঙ্গিনী পয়োধরা আমেরিকা আমাদের ভোগের ...ই বিধাতা সৃষ্টি করেছিলেন। নিয়তির ...ময় প্রেরণায় এ কামিনী দেহ কর্ষণের ...কার আমাদের অর্জন করে নিতে হবে। ...হাস যাকে কখনও স্বপ্ন বলেও মানসে ...ন দিতে পারেনি তেমনি একটি ...ঐশ্বর্যে ভূষিতা সম্রাজ্ঞী আমাদের ...কর্ষিণী হবার জন্য ছট্ফট্ করছে। এ ...ম্রাজ্য স্বপ্ন-সাধনার। এ স্বর্ণচক্র গড়ে ...লা চাই। এ সাম্রাজ্য ক্ষত্রবীর্যে ...অর্জিত হবে; অধিকার করে নেবে ক্ষাত্র ...ল পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপমালার দুটি ...নিশ্চয় সম্পদ, এক, আখ; দুই, তুলো। ...সাম্রাজ্য বিশ্ব বাণিজ্যের পূর্ব তোরণের ...দ্বারী; এ সাম্রাজ্য বিশ্ব ইতিহাসের একক ...স্ময়; অতিকথনকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে ...ধু বলা যায় শৌর্যে, সম্পদে যশোগৌরবে ...কাধারে সুগঠিত এমন সাম্রাজ্য আধুনিক ...তিহাসে কোনো জাতির করতলগত হবার ...না এতো ব্যাকুলতা প্রকাশ করেনি।

'আহা কী ভাস্বর এই স্বপ্ন! কী মহিমায় আচ্ছন্ন এর অনুষঙ্গ। কী উত্তেজক এর চিন্তাপ্রবাহ! অরো কবোষ্ণমণ্ডলের মেখলায় ধৃত এই আমেরিকান রঙ্গমঞ্চ একদা রূপে, লাবণ্যে, শ্রীতে, সমৃদ্ধিতে চিরদিনের চমৎকারিণী নগরীর পর নগরীতে ভূষিতা হয়ে ঝলমল করে উঠবে। বিশ্বজন মোহিত হয়ে জয়ধ্বনি করবে, ওই আমেরিকা, জয়তু আমেরিকা! এই যে বিধ্বস্ত নগরীর কঙ্কালস্তূপে আকীর্ণ অরণ্য, এই যে অর্ধপশু অর্ধমানব অধ্যুষিত জনপদ, এ সব 'দূর' করে দিয়ে যে সাম্রাজ্য গড়ে উঠবে, তা ম্লান করে দেবে প্রাচীনের সব গৌরব; শাসন করবে পৃথিবীর বাণিজ্য সম্পদ, দৃঢ়তায় হবে দুর্ভেদ্য, শাসনে হবে বিশ্ব ইতিহাসের তামাম শাসন ব্যবস্থার মধ্যে সভ্যতম ব্যবস্থা'

ভাষা দিয়েই যদি ইতিহাস লেখা যেতো হিটলার পলার্ডের কাছে সাগ্রিদী করতে পারতো। হিটলারের স্বপ্ন পচ্কে গেছে; ওয়েলেস্লী-ডিজরেলী-চার্চিলের স্বপ্ন জঙ্ঘার ঘা রোদে মেলে ধরে করুণা চাইছে; পলার্ডের স্বপ্ন ধাক্কা খেয়েছে ভিয়েৎনামে, আঙ্গোলায়, গিনি-বিসাও এবং মোজাম্বিকে। নিগ্রোদের চিৎকার কাঁপিয়ে দিয়েছে উত্তর দক্ষিণব্যাপী আমেরিকান মেরুদণ্ড।

এরা এই সাম্রাজ্য পত্তনের ধূয়া ধরে ১৮৯৮ থেকে আরম্ভ করে সেণ্ট টমাস দ্বীপ কিনেছে; দুর্বল স্পেনের সঙ্গে গায়ে পড়ে যুদ্ধ বাধিয়ে ফিলিপিন এবং পোর্তোরীকো হাতিয়েছে; কুবাকেও সেই হিড়িকেই বগলদাবা করেছিলো; মধ্য আমেরিকায় কাপ্তেন হয়ে বসেছে; দ্বিতীয় যুদ্ধের হিড়িকে কারাবিয়ানের শাসক সম্প্রদায়কে দাবার ঘুঁটী করেছে; চিলি, ব্রাজিল, ভেনেজুয়েলা, পেরুর অন্দর মহলে ঢুকে পড়েছে; হেইতী এবং সান্দোমিঙ্গোর সাজানো রঙ্গমঞ্চে ভূতের নেত্যায় দড়ি টানছে। গিয়েছিলো কুবায় ১৮৪৯ থেকে ৫১ এবং তারপরে ১৮৫৪ বার বার তিনবার চড়াও হয়েছে। স্পেনের সঙ্গে লড়ে কুবা হাতিয়ে নিজেদের মতো পুতুলকে বসিয়েছে। অস্টেণ্ড ম্যানিফেস্টোর চাপে স্পেনকে বাধ্য করেছে কুবা বেচতে। নাইকারাগুয়াকে উইলিয়াম ওয়াকার সসৈন্যে চড়াও হয়ে. ওয়াকার চেয়েছিলো নাইকারাগুয়াতে দাস-চালানীর ব্যবস্থা

করতে। পুরো ১৮৫০ ধরে চেষ্টা চলেছে। কী করে ক্যারাবিয়ান দ্বীপগুলো হাতানো যায়। একদা যখন উত্তর ও দক্ষিণে মারণ-মরণ সংগ্রাম লেগেছিল তখন এই গোল্ডেন সার্কেলের 'সর্দার'রা দক্ষিণের দিকে যোগ দিতে ভুল করেন নি।

ভালই করেছিলেন। যুদ্ধ বিরতির একটি কারণ গোল্ডেন সার্কেলের দ্বারা পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যাত 'নিগ্রো-সাম্রাজ্য'-এর স্বপ্ন। পলার্ডের বাঙময় স্বপ্ন। ওরা উত্তরের মানবতা-বিলাসীদের ছোঁয়া এড়িয়ে নিজেদের কাজ গোছাবার জন্য সরে পড়ার মতলবে ভুগছিলো। কিন্তু অন্তরায় অন্যত্র। লাতিন আমেরিকার দিকে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার বিশাল ভূমিভাগ অধিকার করে লাভ কী যদি নতুন 'দাস'-ই আফ্রিকা থেকে আমদানী না করা যায়? দাস আমদানীই বড়ো কথা। সেটা জারী রাখতেই হবে। শাদা দাস হবে ইমিগ্রান্ট. কালক্রমে 'নাগরিক' হবে। কালা দাস থাকবে দাস। কখনও 'মানুষ'-ই হবে না; তার আবার নাগরিকতা কী?

মনে রাখতে হবে এ সবটাই আমেরিকান দক্ষিণের চিন্তাধারা যে দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রকে বার বার প্রেসিডেন্ট জুগিয়েছে। কুবায় বহু দাস তখন। কাজেই কুবা অধিকার করা নিয়ে এতো কাণ্ড-কারখানা। ক্যাস্ট্রো এসে বাতিস্তাকে সরিয়ে দিয়ে সবই ভণ্ডুল করে দিলো। নৈলে কুবা তো গোল্ডেন সার্কেলের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলোই।

কিন্তু আফ্রিকাই আসল খনি। দাস যদি আনতে হয় আফ্রিকার সাথে দাস বাণিজ্যের পথ মুক্ত রাখতে হবেই। প্রথম প্রথম এ জাতীয় কথা আড়ালে আবডালে চুপিসাড়ে বলা হোতো। পরে খুল্লম্ খুল্লা চিৎকার, দাবী,—'দাস ব্যবসায় বিরোধী সব আইন রদ করা হোক'।(৮) ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে (মাত্র শতখানেক বছর আগে) সাউথ ক্যারোলাইনায় 'কমিটি অন্ কালার্ড পপ্যুলেশন' চেঁচাচ্ছে, 'দাসপ্রথা চালু করা হোক! দাস ব্যবসায় পুনশ্চ চলুক!'

এ বাবদে শ্বেত-ধার্মিকরা কিন্তু আদৌ লজ্জিত নন। বরং অল্পবিস্তর অহংকৃতই বলতে পারা যায়। 'আরে আরে তা হলে তো বর্তে যাবে কাফ্রীগুলো।'

কিন্তু দাস আমদানী করার আবদার যখন সোচ্চার হোলো তখন দক্ষিণের জমিদারদের কাছ থেকে যে সমর্থনের আশা করা গেছিলো তেমন সমর্থন এলো না, বরং কাগজেপত্রে বিরুদ্ধ মতই প্রচারিত হতে থাকলো। দমলো না স্বপ্নে বিভোর 'স্বর্ণ-মেখলা' হাতড়াবার দল। তারা চার্চে চার্চে বক্তৃতার ব্যবস্থা করলো। সমর্থন করে শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা যে পাদ্রী দেবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে বলে ঘোষণা করা হোলো। দু দলে কিছু কিঞ্চিৎ মারপিটও হোলো।

পূর্বোক্ত পৃঃ ২৬৮-৭.

অবশেষে সভা ডাকা হোলো; প্রস্তাব রাখা হোলো; প্রস্তাব গৃহীত হোলো। কেন্দ্রীয় সরকার প্রমাদ গনলেন। তাড়াতাড়ি দাসপ্রথা সম্পূর্ণ বেআইনী বলে বিঘোষিত হোলো। (নৈলে এতো তাড়াতাড়ি হয়তো হোতো না) এর পরেই এলো যুদ্ধ। আমেরিকার গৃহ-যুদ্ধ। স্বপ্ন তখনও দেখা চলছে। আফিং-চী আফিম খায় স্বপ্নের রং দেখার মৌতাতেই।

আইন সত্ত্বেও এবার চললো গুম্-ব্যবসা, চোরা-কারবার। সরকার বেশী খবর-দাবী করতে পারে না জাহাজ নেই; ক্যাপ্তেনরা দেখলো চোরাকারবারে বেশ দু পয়সা লাভ; তারা রুপ্পী পেলেই ঝক্কি নেয়। যে দু-একজন পাকড়াও যদি বা হোলো, সফেদ আইনের অলিগলি দিয়ে উধাও হয়ে গেলো। আগেই দেখেছি সফেদ আইনের এই অত্যাশ্চর্য কারামাৎ। সেই আমেরিকান পতাকা উড়িয়ে চোরাকারবার চালানোর তকরার যেন আরও পাকা হোলো। এ নিয়ে গোলমাল এতো ঘন ঘন হতে থাকলো যে ইংরেজ চাইলো একটা বোঝা-পড়া হোক। পতাকার আবডালে এ পাইরেসী বন্ধ হোক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র যুগান্তরে তুচ্ছ কোরে দিলো ও বিষয়ে কোনো সন্ধির প্রস্তাব। জাহাজ ধরা হোতো, ছাড়ান পেতো। সে লীলাখেলার ইতিহাস আমরা জানি। ক্যাপ্তেন লামার, ক্যাপ্তেন কোরী, ক্যাপ্তেন সেমেস্ এদের তত্ত্ব ছাড়াও এডুয়ার্ড ম্যানিং-এর কড়চা six months on a slaver সম্পর্কে উল্লেখও পূর্বে করা হয়েছে। অবশেষে হালাকান হয়েই ১৮৬৭তে ইংরেজ তার খবরদারীর ঝক্কি সরিয়ে নিলো। ততদিনে 'ইণ্ডেণ্টেড লেবার' নামক এক নয়া দাস-সংগ্রহের উপায় বেরিয়েছে। তারপরে এসেছে 'সাময়িক শ্রমিক' সংগ্রহ করা। এদের দুর্দশার কথা যথাকালে বলা যাবে। মোট কথা বহু অর্থ-নৈতিক এবং সমাজনীতির গবেষকের মত আমেরিকার আর্থিক পরিস্থিতি এবং অর্থ-নৈতিক নব-সাম্রাজ্যবাদে দাসপ্রথা বা দাস-গোত্রের প্রথা চালু রাখাই হয়েছে অনিবার্য। এ কথা আমাদের বুঝতে দেরি হলেও দাসেরা বুঝতো। তারা রোখ কখনও ছাড়েনি।

* * *

কারণ কোনো কালেই নিগ্রো চুপ করে মার খায়নি। সুযোগ পাওয়া মাত্র সে আর সব সুযোগ সুবিধা ছেড়েও অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তো। যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরে যখনই দাস প্রথা রদ হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়ে গেলো দক্ষিণের দাসেদের উত্তরে পালানো। সে পালানোর ঝক্কী কিছু কম ছিলো না। ব্লাড হাউণ্ডের তাড়া পর্যন্ত অগ্রাহ্য করেছে সেই স্বাধীনতার পিপাসা। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ৫৫ থেকে ৬০ হাজার নিগ্রো পালিয়ে দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলে গেছে। যাবার সময়ে তারা পিছনে ফেলে গিয়েছে বহু অশ্রু, বহু উৎকোচ, এমন কি বহু প্রণয়ের, প্রাণের পাত্র। কিন্তু দাসত্ব এবং স্বাধীন নাগরিকতা দুটোর স্বাদ আলাদা। অথচ দিনে দিনে উত্তরের 'ঘেটো'র নিগ্রোরা বুঝতে শিখলো তাদের স্বাধীন নাগরিকতা কাগজের ফুল। চোখ ভোলানো ধাঁধা।

যেহেতু দাস হিসাবে তারা নত-মস্তকে তাদের 'কর্তব্য' কাজটুকু নীরবে করে যেতো, শাদা মাতব্বররা বলতো দাসত্ব করার জন্যই নিগ্রোর জন্ম। এমন নিরীহ পোষমানা গতরে মানুষ (জানোয়ার?) আর পাওয়া যায় না। নিগ্রোদের শান্বো নাচের মাধ্যমে এই নীরব পরিচর্যার চিত্র আমরা পাই; সেকালের আমেরিকান আলোকচিত্রেও এবংবিধ মহৎ পরিচর্যাশীল নিগ্রোর পরিচয় পাই। সমগ্র মহাভারতে বাসুদেব বা যুধিষ্ঠিরের দাস বা দাসীর চিত্র আমরা পাই না; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র পর্যন্ত চাকর-চাকরাণীকেও মহৎ মানুষ হিসেবে দেখাবার অভাব নেই। যেন 'চাকর' নামক একধরনের শ্রেণী আছে, যাদের চরিত্রের মহৎ গুণই প্রভুর সেবা। (এ ধরনের সেণ্টিমেণ্ট যে কতো ঠুনকো তা বিরাট পর্বের দাসগুলি ও দাসীটির বয়ান গভীরভাবে পড়লেই অনুধাবন করা যাবে)। চাকর, উত্তম চাকর, সেবা করাই যাদের ধর্ম, সেবা না করলে যাদের পেটের ভাত হজম হয় না এমন একটি শ্রেণীর চিত্র আমরা সৃষ্টি করে থাকি, ও করে নিশ্চিত হই। পালকি এবং পালকি-বেহারা, জমিদার ও লাঠিয়াল এদের গুণগানেও উপন্যাস ভর্তি।

শাদা কড়চায় নিগ্রোকে হাড়কুঁড়ে, নীচ, চোর, রিরংসু, ভীরু, নির্ভরের অযোগ্য বলে দেখানো হয়েছে। বেশ-ভূষার পারিপাট্য নিয়ে ছেলেমী, হাস্য-রসিক, 'মজা'র মানুষ হিসেবেও তাদের খাতির দেখানো হয়েছে। যখন দক্ষিণ এবং উত্তরে লড়াই চলছিলো দাসপ্রথা রদ করা নিয়েই (বলতে গেলে) তখনও এসব চিত্রকারেরা রেখাপাত করে জানাতে ছাড়েন নি যে স্বাধীনতা তো এরা চাইতে জানতোই না, বরং প্রভুরা কি করে 'প্রভু' থাকেন সে জন্যই জান্ কবুল করেও লড়াই করে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি। কোথায় লাগে এ সব চিত্রের কাছে রামচরণ, ধর্মদাস, বিহারী, কৃষ্ণকান্ত (কেষ্টা)? এ সব চিত্রের ব্যঞ্জনাটি স্পষ্ট। যেন একশ্রেণীর মানুষ স্রেফ নফরাগিরি করার জন্যই সৃষ্ট। তাদের পক্ষে নফরাগিরি মানায়ও যেন সুন্দর মুখে নাকছাবি, ঘটের মুখে সশীষ ডাব নারকোল। ওটা ভারত-সমাজের একটা আভূষণ, সংস্কৃতি গৌরব। যে দেশে ডাব নেই সে দেশে যেন কেউ ঘট পাতে না। ভুলে যাই যে 'সাহেব-বিবি-গোলাম'-এর মেজোকর্তার ভালো লাগলো মেজোগিন্নীকে বাদ দিয়েও ঐ বাড়ীরই প্রাক্তন দাসীর কোল। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত দাসীপুত্র, না-কি মৌরীয় আদিবাসীর গর্ভজাত তা নিয়ে চলুক বিবাদ; কিন্তু রাজা দশরথের গুটি-কতক দাস-রাণী ছিলো; এবং বেদব্যাসও ধন্য করে গেছেন দাসীর অঙ্ক।

(আগামী সংখ্যায় শেষ হবে)

আমার বাড়িতে এখন বেশ ভিড়। অনিল, আমি ব্যতীত প্রোফেসর ার্জি (পিটুবাবু), সুধীর বসু ও াদ গাঙ্গুলি : সবাই আমার কাছেই রয়ে ; ফলে বিদেশে সময়টা বেশ সুখেই তো। ছুটির দিন প্রায়ই সঙ্গীত প্রধান ডত দিলীপ বেদি, আর হরিশ্চন্দ্র ন এসে আসর জমাতেন। আমার বাড়ির খানা বাড়ির পাশেই থাকতেন শ্রীমতী শেনারা ইনি আবদুল করিম খাঁর ছোট । নিশ্চয়ই জানেন যে আবদুল করিম র বড় মেয়ে হচ্ছেন শ্রীমতী হীরাবাঈ দকার। এ'দের কথা আমি আমার তম্বরের শিল্পলোকে বিস্তারিতভাবে নয়েছি। শ্রীমতী রোশেনারা এলে ীতের আসর বসতো। ঘন্টার পর ঘন্টা র গান শুনেছি। পিটুবাবুও ছিলেন জন সঙ্গীত সমজদার। অনিলের তো াই নেই। রবিবার বিকালে কখন কখন মার সঙ্গে যাঁরা বাজনদার গিয়েছিলেন রা এসে অর্কেস্ট্রা বাজাতেন--তাদের না করতো অনিল কাজেই আমার ডিটাই হয়ে উঠেছিল সঙ্গীতের আসর। আসরে কখন কখন উপস্থিত থাকতেন মতী আশালতা, শ্রীমতী লীলা চিটনীস াং বহু প্রোডিওসাররা।

পিয়াকি যোগনের সুটিং কালেই মি সাগর মুভিটোনে যাতায়াত করতাম। রা আমার লেখা একখানি বই মনোনীত র ইতিমধ্যেই রেখেছেন নাম তার লেকটিক মিউজিক বা মহাগীত। যার তিপাদ্য বিষয় সামাজিক হলেও হিরো ল এক শব্দ বৈজ্ঞানিক যে প্রমাণ করে রলেছে যে জগতের যত শব্দ সবই ইথারে মা থাকে—যাকে প্রতিধ্বনির মত জগতে রিয়ে আনা যেতে পারে বৈজ্ঞানিক ীতিতে টেলিভিশন মারফৎ। ১৯৩৫ সালেই মি এর জন্য সাগরে প্রোজেকশন মেসিন রফৎ প্লেব্যাক সিসটেমের পূর্ণ ব্যবস্থা স্পন্ন করি এই ছবিতে যা প্রতি মুহূর্তেই রকার পড়বে। মেহবুবের ছবির গানের ময় যা ক্ষণিকের বন্দোবস্ত হয়েছিল তা মাত্র পূর্ণভাবে সাউন্ড ইঞ্জিনীয়ার চন্দ্র-ান্তর দ্বারা সংগঠিত করে তুলি।

পিয়াকি যোগন সাধ্যমতে ছবি তাই তিন মাসের মধ্যেই তার কাজ সুসম্পন্ন হলে আমি সাগর মুভিটোনে পাকাপাকি ভাবে যোগ দিলাম। কিন্তু ইন্টার্ণ আর্টের ছবি সংগীত সমাজ যা মিঃ দরিয়ানীর ভাই শ্রীরাম দরিয়ানী (আমার ধরলক্ষীদেবীর এসিস্টেন্ট) করছিল তার সঙ্গীতাংশের শেষ আবহ সঙ্গীতের জন্যে অনিল বিশ্বাস ওখানেই রয়ে গেলেন। এবং হরি ও সুধীর যথাযথ মিঃ দেশাই ও গোবরধন ভাই-এর সঙ্গে ইন্টার্ণ আর্টসেই রয়ে যান। এই সময় পিটুবাবু ও প্রমোদ এলাহাবাদ ফিরে যান। সাগর মুভিটোন আমি কেবল আমার সঙ্গীতের জন্যে যে যন্ত্রী আমি কলকাতা থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম তাদের ঢুকিয়ে নি। শ্রীনওশাদ (এখনকার বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক) ছিলেন আমার অর্কেস্ট্রার হারমোনিয়ম বাদক।

আমার ছবির সুরুয়াতের পূর্বেই আমার উপর ভার পড়লো ডাইরেকটর বাদামীর পরিচালনায় শ্রীযুত কানাইলাল মুন্সীর লেখা বই কুল বধুর সঙ্গীতাংশ ও ডাইরেকটর লোহার সাহেবের ছবির সঙ্গীত পরিচালনার ভার। শ্রীরামচন্দ্র ঠাকুর (পরে বিখ্যাত ডিরেকটর হয়েছিলেন) হলেন আমার পরিচালনার সহকারী। কিন্তু সঙ্গীত সহকারী অনিলই রইল। কুলবধূর হিরোর রোল করছে শ্রীমতিলাল—আর লোহারের ছবির হিরো তখন সুরেন্দ্র ও বিব্বো (মেহবুবের মনমোহন ছবির জুড়ি)। এছাড়া আমার কাজ চলেছিল মহাগীতের সিনারিও তৈরি বৈজ্ঞানিক ছবির জন্য ইলেকট্রিকাল এ্যারেঞ্জমেন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি: অর্থাৎ সাগরে ঢুকে পর্যন্ত নিঃশ্বাস ফেলতে পারছি না তখন হঠাৎ এলাহাবাদ থেকে ফিরে এলেন পিটুবাবু। এবং আমার কাছে না উঠে উঠলেন আদর্শ চিত্রের অফিসে কারণ ধোঁয়াধার আজও রিলিজ হয়নি....তার ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত হলেন।

আমার এই কর্ম দুর্যোগের মাঝে হঠাৎ উনি মিঃ ডি পি মিশ্রকে আমার আমার বাড়িতে নিয়ে এসে হাজির হলেন: ব্যাপার কি? না ধোঁয়াধার ছবির এডিটিং আমায় বসে করে দিতে হবে.. নইলে ছবি তোলা হয়েছে দেড় লাখ ফিট—কি করে যে তাকে রূপ দেবে—এমন লোক ওরা খুঁজেই পাচ্ছেন না। মিঃ মিশ্রকে আমি বললাম....এ কাজ আমার করতে হলে আমার সময় মাত্র রাত্রে....কাজেই সারারাত জেগে কাজ করতে হলে আমার শরীর ভেঙ্গে যাবে। তিনি বললেন—বেশ ৬টার পর আপনি সটান এডিটিং থেকে চলে আসবেন—এবং রাত বারটায় আপনাকে ছেড়ে দেবো। আমি বুঝলাম....ওরা আমার নিতান্তভাবেই চাচ্ছেন কাজেই আমার মত বিনা দক্ষিণায় করতে দিলে করব বলে কথা দিলাম।

এই এডিটিং-এর কথাটুকু বলার তাৎপর্য হচ্ছে যে আমাদের ছবি শেষে এডিটিং-এ সময় সময় কি রকম বিপদের সম্মুখীন হতে হয় তাই আপনাদের জানাতে। প্রথম রাত্রে ছবির টাইটেলের পিছনে নর্মদা প্রপাতের ওপর টাইটেল আসবে বলে নর্মদা প্রপাত দৃশ্যাবলীর ডাব্বাগুলি (অর্থাৎ টিনের ডাব্বা যার মধ্যে ১০০০ ফিট করে ফিল্ম ধরে) বার করা হ'ল শুধু নর্মদা প্রপাতের ছবি এরা দশ ডাব্বা তুলে রেখেছিলেন। তা থেকে নেগেটিভ বাছাই করতে গিয়ে দেখলাম যে এমন একটি শট নেই যেখানে জলপ্রপাত নীচে ঝরে না পড়ে ওপর দিকে জলধারা উঠে আসছে।.... অবাক কাণ্ড....একি করে সম্ভব হলো.... রিভার্স নেগেটিভ চললেও তো এ কাণ্ড হতে পারে না। কাজেই প্রথম রাতে—রাত দুটো পর্যন্ত এভাবে প্রত্যেক নেগেটিভের একই দৃশ্য দেখে একটুখানি নেগেটিভ কেটে নিয়ে গেলাম। পরের দিন সেই টুকরোটিকে গোবরধন ভাই (ক্যামেরাম্যান এবং যিনি চিত্রক ছবির রাজার বলাচন্দ্র তাঁকে দেখলাম। তিনি সেটি নিজের লেবরেটারিতে নিয়ে গিয়ে তারপর দিন তথ্য জানালেন। জানেন বোধহয় আইমো নামে একটি হ্যাণ্ড ক্যামেরা আছে। তার হ্যাণ্ডেলটা ক্যামেরার নীচে ফিট করা। এবং এই দৃশ্যটি ডাব্বার যত ফিল্ম এই আইমো দিয়েই তোলা— ক্যামেরাম্যান ক্যামেরাটিকে রিভার্স ছবি তুলেছিলেন—অর্থাৎ হ্যাণ্ডেলটিকে ধরে ক্যামেরাকে নীচে দিকে উল্টো করে ঝুলিয়ে—উঁচু পাথরের ওপর শুয়ে পড়ে ফোটো তুলেছিল তাই প্রপাতের সব জলই ওপর মুখে উর্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে। কাজেই সব কটা ডাব্বাই অর্থাৎ দশ হাজার ফিট ফেলে দিয়ে নতুন করে ছবি তুলতে জব্বলপুরে আবার ক্যামেরাম্যানকে পাঠানো হলো। এভাবে নতুন নতুন বিপত্তির মাঝে ধোঁয়া ধারের কত রাত জেগে পার করা হয়।

সাগর মুভিটোনে আমার নিজের ছবি মহাগীত শুরু হলো....৩৫-এর ডিসেম্বরে। এতেই প্রথম টেলিভিশনের গায়ক ও বাদ পর্দার ছবি, একই সঙ্গে গান করছে দেখানো হয় তাই পূর্ব রচিত প্লেব্যাক মেশিনে-

দরকার হয়। এই ছবির হিরোইন ঠিক করতে আমিও চিমনভাইয়ের বড় পুত্র বুলবুলভাই কলকাতায় আসি। সেই সময় ডিরেক্টর কালীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় ত'ার পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী সাগর মুভিটোনে শরৎচন্দ্রের দত্তা করার প্রোপজাল দেন। কাজেই বুলবুলভাই আমার সঙ্গে শ্রীশরৎ-চন্দ্রের পরিচয় আছে জেনে আমাকে নিয়েই ত'ার কাছে আমার জন্য আমায় অনুরোধ করেন। আমি উপেন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে শরৎদাকে ফোনে একথা জানাই। বেশ মনে আছে উনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন—বই-এর দাম কত দেবে? আমি বলি—প'াচ হাজার বলেছি। উনি বলেন—আমি হাজার টাকা নি। অত বেশী বললে পালিয়ে যাবে। উত্তরে আমি বলি—আপনি প'াচ হাজার চাইবেন। ও'রা জোরাজুরি করলে আমার উপর ছেড়ে দেবেন। আমি মধ্যস্থ হয়ে ঠিক করে দেবো।

কথানুরূপ ও'র অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়িতে তারপর দিন সকালেই বুলবুল-ভাইকে নিয়ে উপস্থিত হলাম। এবং শরৎদা প'াচ হাজার চাইতে বুলবুলভাই ও'কে কিছু কমাতে অনুরোধ জানান। উনি আমায় দেখিয়ে বলেন—ও হীরেনই তাহলে ঠিক করে দিক।

আমি মধ্যস্থ হয়ে বলি—বেশ এক হাজার টাকা আমার অনুরোধে উনি ছেড়ে দেবেন।

বুলবুলভাই চার হাজার ক্যাশ দিয়ে দত্তার চিত্র-রাইট কিনে নেন। শরৎদা আমাকে ত'ার চন্দ্রনাথকে নিয়ে ছবি করতে বুলবুলভাই-এর সামনেই প্রস্তাব করেন। বুলবুলভাই রাজী হওয়ায়—চন্দ্রনাথের জন্য

আরও এক হাজার টাকা আগাম দিয়ে দিলেন। কথা হলো মহাগীত ছবির পর আমি ছবির মহরত করলে বাকী টাকা পাঠিয়ে দেবেন। শরৎদার উপন্যাস এই সর্ব-প্রথম হিন্দী ছবিতে রূপায়িত হতে চলেছে।

এখানে এসে আমার মহাগীতের জন্য রমা ব্যানার্জি বলে একটি খ্রীষ্টান বাঙালি মহিলাকে আমরা নিয়ে যাই এবং মহাগীতে মায়ার ভূমিকা অভিনয় করে এতই বিখ্যাত হন যে তিনি রমা ব্যানার্জি'র বদলে লোকমুখে মায়া ব্যানার্জি নামেই প্রখ্যাত হয়ে উঠলেন। সুরেন্দ্র হলেন আমার ছবির হিরো। বাকী সুনলিনী দেবী (মিসেস সরোজিনী নাইডু ও শ্রীহারিন চট্টোপাধ্যায়ের বোন) পিয়ারি যোগনের কৃষ্ণকুমারী, কানহাইয়ালাল, তৎকালীন বিখ্যাত কমিডিয়ন মিঃ য়াড্রোওয়ালি, শ্রীমতী সিতারা প্রভৃতিদের নিয়ে মহাগীত শুরু হলো। বেতার বার্তা প্রেরণ সেণ্টার তখন পুণার কাছে কিরকিতে ছিল। স্যার চিমনলাল চিনয় আমার পরিচিত ছিলেন—ও'র সুবাদে আমার টেলিভিশন ল্যাব এর ট্রান্সমিশন সেণ্টার হলো। কিরকির ট্রান্সমিশন সেণ্টারটি এইভাবে বৈজ্ঞানিক চিত্র সংগঠিত হয়েছিল। আমাদের সাগর মুভিটোনের পাবলিসিটি অফিসার—ফিল্ম ইন্ডিয়া পত্রিকার সম্পাদক মিঃ বাবুরাও প্যাটেল আমার গল্পের পাবলিসিটি করতে গিয়ে—ত'ার এডিটোরিয়ালে আমায় গালাগালি না দিয়ে ঠেস দিয়ে লিখলেন—

A fanatic Bengali gentalman has gven a fanatic story which ne himself is directeng. The narne oi the gunkiman is Hiran Bose. He wants that people should belive that all the sounds of our world are ever kept in the Ether which the Hero of the picture is bringing back through Televistin. Yes Tele-vsion is a new subiect which may be interesting to the public etc etc.

মিঃ কানাইলাল মুন্সী মহাশয়ের কুলবধুর সুর দেওয়ার পর থেকে আমি ওর বাড়িতে খুবই আদৃত হয়েছিলাম। সেইখানে আমায় নিয়ে গানের আসর বসতো। যেখানে গেলাম ফিল্ম ইণ্ডিয়ার এই রিভিউ। শ্রীকানাইলাল মুন্সী বললেন—এখনও পর্যন্ত টেলিভিশনের প্রতিষ্ঠাই ভাল করে জগতে হয়নি তুমি এমন একটা কল্পনা কোথায় পেলে হীরেন?... আমি তখন ও'রই বাড়িতে বসে ইলাসট্রেটেড উইকলির পাতা উল্টাচ্ছিলাম—হঠাৎ নজরে পড়ে গেল—এক পাতায় এসে। তার হেড-লাইন হচ্ছে

Dlistu'bances of Etherial Sound in Radio Wave

আমি নিশ্চুপ বসে দু-চার লাইন পড়ে নিয়ে ম্যাগাজিনটা ও'র হাতে তুলে দিলাম। উনি কিছুটা মনে মনে পড়ে—চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করলেন—

While Her Hiser was sending massage to Musalni a peculiar found was heard which comes frou Ether — the scientists of Germany explains that all the pronounced and produced sound of the World are ever kept in Ether etc. etc.

উচ্ছ্বসিত হয়ে শ্রীমুন্সী ওর পরিবারবর্গ জানালেন—সত্যি এই ছেলে হীরে কল্পনা তো ফ্যানাটিক নয়? বাবু প্যাটেলও এইটি পড়ে ত'ার পরের সং আমার গল্পের ও কল্পনার উচ্ছ্বসিত সু করেছিলেন।

মহাগীতের ইটারন্যাল নিউজিক ম নেগেটিভ ও পজেটিভ অটোমেটিক ল্যা তে সর্বপ্রথম বোম্বাইতে পরিস্ফুট তোলেন শ্রীগঙ্গাধর.... যা ইতিপূর্বে ডিরেকটারই এ'র নেগেটিভ ব্যবহারের পাননি। আমার এবারের ক্যামেরা শ্রীরজনীকান্ত প্যাটেল ও সাউণ্ডে চন্দ্র প্যাটেল, এ'রা দু ভাই আমারই দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই দুভাই প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীসা স্টুডিও। তাই সম্ভব হয়েছিল মেশিন এবং অটোমেটিক ল্যাব চালু ক

ফজলভাই লিমিটেডের স্বত্বাধি শ্রীআকবর আলি আমার বন্ধু ছিলেন চিমনলাল চিনাই-এর দৌলতে। ত'ার কাছে পরি ও সুধীরকে নিয়ে একদিন বলেছিলাম—মিঃ আকবর সেফ ক্যান ইউ গিভ দিস টু চাপস সার্ভিসেস, ইন দেয়ার ইনডিভিড ক্যাপাসিটি। উনি বলেছিলেন চেষ্টা কর

আজ হঠাৎ ত'ার ডাক পড়ে স্পেশ্যাল চিঠি স্ট্রিকটলি কনফিডেনশিয়া সেইদিন বিকেল চারটা নাগাদ আমি অফিসে উপস্থিত হলাম। তিনি ডেকে বললেন। —আপনার ভাই একটা একটা চাকরী হয়—যদি আমার একটা প্রোপজাল গ্রহণ ক আমি বিস্মিত মুখে ও'র পানে থাকি। উনি বলেন—শুনুন ভিজেগা ছত্রিশগড়ের রাজারা মিলে এক স্টুডিও গড়ে তুলেছেন ...র নাম সিনেটোন। মনে করুন ... বিষা ... যার এক পাশে পাহাড় আর এক সমুদ্র এমন স্টুডিও আমাদের সারা ই য়ার কোথাও লোকেটিড নয়। আমি প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার মেশিনারি সা ...কেছি। অথচ ও'দের ভাল ডিরেকটর অবধি পাননি। আমায় ত'ারা ভার দি এ বিষয়। তাই আমি প্রোপজ আপনি এইখানে যোগ দিন; প'াচ হাজার টাকা মাইনে পাবে এবং ওখানে আপনার দুই ভাইকে এবং ক্যামেরাতে সমস্ত সুযোগ করে দি পারবেন। আমি বলি—সাগর মু আমার পরের ছবির জন্য শরৎচন্দ্রের উপন্যাস কিনেছেন....এ অবস্থায়? ত আমি বলেন—আরে সে ছবি আর দিয়ে করিয়ে নেবেন আমি চিমনভ সামলে নেবো—আপনি ওখানে গেলে আমার ৪০ লক্ষ টাকার মেসিনেরও স হবে—কারণ স্টুডিও চালু হলেই ইনস্টুমেন্টগুলো ঠিক ঠিক আ আমি বলি চিন্তা করে দেখি।

বাড়ীতে এসে পরামর্শ করতে সবাই উঠলো। অনিলকে তারপর দিনই এনে চিমনভাই-এর সামনে দাঁড় য় দিয়ে বলি— আমার নিজের ছবি ও গেলে মিউজিকের সময়ের অভাব হ কাজেই অনিলকেই দিন না কেন সারা ত্রকের ভার—ওর যোগ্যতার পরিচয় মধ্যেই আপনি পেয়েছেন। সেদিন থেকেই নিল মিউজিক ডাইরেক্টর হয়ে সাগর টোনে বসলো। তার প্রথম ছবি— বুরের 'ওয়াতন'। সে ছবির প্রথম র সুরও আমাকেই করতে হলো— ন মেহবুবের বিশ্বাস যে আমি ও'র মাত্র পয়মন্ত সঙ্গীত পরিচালক। আমার মনে আছে গানখানি গেয়েছিলেন তী সিতারা—'কি'ও তুমনে দিয়া দিল কো ইশারায়'।....এর মধ্যে শরৎদার খানি চিঠি পাই....তাতে ত'ার কি কি বই লাটি হিন্দীতে অনুবাদিত হয়েছে তে চেয়েছেন এবং পরিশেষে জানিয়ে- ... 'চন্দ্রনাথ' যদি আরম্ভ না করি লে তিন মাস পার হলে টাকা না নিয়ে খানি যাতে ফিরত যায় তার অনুরোধ। ল তেলে সবই ঠিক হয়ে গেল আকবর দার সঙ্গে। আমি বললাম, কিন্তু নিজাইকে সামলাতে হবে আপনাকে। শরৎকেও চুপি চুপি লিখে দিলাম— ম চন্দ্রনাথ ছবি...বন্ধ করছি...আপনার -এর রাইট আপনার কাছেই ফিরত চ্ছি।

শুভক্ষণে কি দুর্যোগে জানি না, মরা ডিজেণ্যাপটামের অন্ধ্র সিনেটোনে ছিলাম গাড়ী-বাড়ী-ও পাঁচ হাজার দর মাসে। কলকাতায় তখন আদর্শ এর দ্বিতীয় ছবি হচ্ছিল 'দলিত সুম'। মিঃ ব্যানার্জি (পিটুবাবু) খানেই কাজ করছেন। তাঁকে ফোনে যোগাযোগ করে সমস্ত বাঙালি টেকনিশয়ান রুক্ত করলাম অন্ধ্র সিনেটোনে। মেরায়— শ্রীজিৎ সিং এবং তাঁর সহকারী ওজীভাই, সাউণ্ডে—ডাঃ শিশির চাটুজ্যে, র সহকারী—পরি বোস, লেবরেটোরীতে —শ্রীকুলদা রায়, সহকারী শৈলেন ঘোষাল, লেন মুখুজ্যে, মিউজিক এ্যাসিস্- স্টেতে নিলাম—শ্রীসুধীর ঘোষ- স্তদারকে। এডিটার আনালাম বোম্বাই কে আমার ধরম কি দেবী ও পিয়াকি গনের সম্পাদক—শ্রীআর জি গোরেকে। র এ্যাসিসটেন্ট হিসাবে — শ্রীবিনয় নার্জিকে।

কিছু কিছু মিউজিশিয়ানও আনিয়ে লাম—যেমন মিঃ কৈলো, মিঃ এথলস— ছাড়া নিলাম বিখ্যাত তবলা ও সরোদ দক শ্রীআজীম খাঁ সাহেবকে। পিটুবাবু- শিবনীকে (এলাহাবাদ) নিলাম আমার এ্যাসিসটেন্ট করে। সারা স্টুডিওর গঠন শষ হলো—মিঃ মীন আর্ট ডিরেক্টর। মিঃ জগন্নাথ রাজু (ওখানকার বিখ্যাত পার্লিক প্রোসিকিউটার) ছিলেন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং জে-পুরের মহারাজা— খানকার অন্ধ্র ইউনিভার্সিটির ভাইস চানসেলার ছিলেন আমাদের চেয়ারম্যান অফ দি বোর্ড।

ছত্রিশগড়ের রাজারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন— এ'দের টাকায় এই বিরাট স্টুডিও—ওয়ালটেয়ার স্টেশন থেকে দু মাইল দূরে।.... এর জন্য নতুন রাস্তা তৈরী পর্যন্ত এ'রা খরচা করেই করেছেন। সব কটি রাজাদের সঙ্গে আমার পরিচয় হোলো ... সবই যেন রাজসিকভাবে চলেছে। ছবি মহাভারতের ... এক অংশ ... জতুগৃহ দহন থেকে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর পর্যন্ত। এর জন্যে দেখলাম মিঃ মীন প্লাই উড দিয়ে ফ্ল্যাট-রথ—সবই তৈরী করে ফেলেছেন। সারা স্টুডিওর মাঝে জায়গায় জায়গায় বাঘের খাঁচায় বাঘ, হরিণের এনক্লোজার-এ হরিণ। ময়ূর ... ইত্যাদি ইত্যাদি করে সারা স্টুডিওর প্রশস্ত উঠোনকে জু গার্ডেন করে সাজিয়ে রেখেছেন। স্টুডিও উদ্বোধনের দিন ধার্য হয়েছে...মাদ্রাজের ইংরেজ গভর্নর এসে উদ্বোধন করবেন—প্রধান অতিথি হচ্ছেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। এ'দের স্টেশন থেকে স্টুডিও আসার নবনির্মিত পথের দু-পাশে চুনকাম করা শ্বেত টবে টবে ব্যাংলোর থেকে ক্রোটন গাছ কিনে সাজানো হচ্ছে। স্টুডিও স্টাফের ডিপার্টমেন্ট অনুযায়ী পরনের এপ্রোণ করা হয়েছে ... অতিথিদের ডিপার্টমেন্টাল অভ্যর্থনা করার জন্য। অর্কেস্ট্রা পার্টির নবতম সুর যোজনা করা হয়েছে ... উদ্বোধনের আবহ-সঙ্গীত উপলক্ষে।

যথাসময় মাদ্রাজের ইংরেজ গভর্নর সাহেব এবং তাঁর সঙ্গে প্রধান অতিথিও এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর আসার সঙ্গে সঙ্গে অর্কেস্ট্রা বেজে উঠলো...চালনা করছে আমি। প্রতিটি ডিপার্টমেন্ট ঘুরিয়ে আমি বুঝিয়ে দিয়ে ডিপার্টমেন্টল হেডদের সঙ্গে ও'দের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি... মিঃ জগন্নাথ রাজু—এ ভার আমার উপরই ন্যস্ত করেছিলেন। গভর্নর সাহেব (নামটা এখন ভুলে গেছি) আমার উপর খুব খুশী। সমস্ত পরিদর্শন করে স্টুডিওর উদ্বোধন হলো—উদ্বোধনী সভায় ছত্রিশ-গড়ের প্রায় ছত্রিশজন রাজাই উপস্থিত ছিলেন তাঁদের প্রমুখ মহারাজ অফ জে-পুর। উদ্বোধন পর্ব শেষ হলে বেলা তিনটায় পুলিশ ক্লাবে চায়ের নিমন্ত্রণ। সেখানে একটি টেবিল ঘিরে বসলাম— গভর্নর সাহেব আমি, মিসেস সরোজিনী নাইডু ও মিঃ জগন্নাথ রাজু। ওখানে বসেও গভর্নর সাহেব ফিল্ম সংক্রান্ত প্রশ্নই আমার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাড়ী ফিরে এসে দেখলাম আমার বাড়ীতে দেওয়ানজী (মানে জে-পুর মহারাজার দেওয়ান) আমার অপেক্ষায় বসে। আসতেই বললেন—কাল সন্ধ্যায় মহারাজ গভর্নর সাহেবকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছেন.... আপনাকেও ডিনারে যোগ দিতে হবে—তারই নিমন্ত্রণে আমি এসেছি। চা খেয়ে, গল্প করে দেওয়ান সাহেব বিদায় নিলেন।

এর পরদিন সকালেই মজা জমে উঠলো। ভোর না হতেই দেওয়ান সাহেব উপস্থিত হয়েছেন। ব্যাপার কি? উনি বলেন—মহারাজ বললেন আপনার বোধহয় ডিনার সুট নেই.... তাই আমায় পাঠালেন আপনার ডিনার সুটের জন্য.. যাতে আপনাকে নিয়ে এখানকার রাজবাড়ীর টেলারের ওখানে পেঁছে যেতে পারি। তাঁকে ফোন করে মহারাজ বলে দিয়েছেন যাতে সন্ধ্যার মধ্যেই আপনার ডিনার সুট আপনার বাড়ী পেঁছে দিয়ে যায়।

আমি বলি ডিনার সুট কি করে? আমি বাঙালী বাংলা পোশাকেই ডিনারে খেতে যাবো—এ তো আর অফিসিয়াল কিছু ফাংশন নয়?

উনি বলেন—না স্যার গভর্নর সাহেব ফোন করে মহারাজকে জানিয়েছেন যে যেন তাঁর সিটের পাশেই আপনার সিট পড়ে— যাতে করে তাঁর ফিল্ম সম্বন্ধে আরও কিছু জানার সুযোগ হয়।

আমি বললাম—ঠিক আছে আপনি মহারাজকে গিয়ে বলুন বাঙালি পোশাকেই যাবো....এতে কোন দোষ হবেনা। ... উনি ফিরে গেলেন কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে এলেন....বললেন—না স্যার তা হবার জো নেই। মিঃ জগন্নাথ রাজু, মহারাজ ববুলি, মহারাজ পারলাম কুড়ি, মহারাজ পারলা কেমডি—মহারাজ নিজে এ'রা সবাই বিচার করে দেখেছেন যে আপনার বাঙালি-বেশে ওখানে যাওয়া উচিত হবেনা...তাই চলুন আর দেরী করবেন না...তাহলে সন্ধ্যার মধ্যে সুট ডেলিভারি দিতে পারবে না টেলার।

আমি হেসে বললাম—যা বাবা... দোষী নিজে জানিল না কি দোষ তাহার—

সোনার হরিণ নেই

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

।। দুই ।।

'...অন্ন দেইখা দিবা ঘি, পাত্র দেইখা দিবা ঝি'।

শুধু কথা নয়, এক বুড়োর ফ্যাসফেসে গলার টানা স্বরসুদ্ধ হুবহু মনে পড়ে গেল বাপী তরফদারের।

ছেলেবেলা থেকে ছাত্র জীবনের শেষ পর্যন্ত একটি মাত্র গুণের ওপর মস্ত নির্ভর ছিল তার। প্রখর স্মরণশক্তি। এই গুণটুকুও না থাকলে হাতের মুঠোয় বিএসসির ডিগ্রী ধরা দূরে থাক, স্কুলের গণ্ডী পার হতে পারত কিনা সন্দেহ। যা একবার দেখে নেয় তার ছাপ মগজ থেকে আর সরে না। যা একবার শোনে কানে সেটা লেগেই থাকে। কিন্তু এই গুণটাকে সে যদি কোনো উপায়ে বিস্মরণের রসাতলে ঠেলে দিতে পারত, দিতই। একটুও দ্বিধা করত না।...অনেক দাহ অনেক যন্ত্রণার অবসান হয়ে যেত তাহলে।

এক ধাক্কায় নটা বছর হুড়হুড় করে পিছনে সরে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে হাফ-প্যান্ট আর মোটা ছিট কাপড়ের ফতুয়া-পরা তেরো বছরের এক ছেলে, নাম যার বাপী—সে সেই বনাঞ্চলের সব থেকে শৌখিন রংচঙা কাঠের বাংলোর বাইরের সাজানো ঘরের দরজার পাশে আড়ি পেতে দাঁড়িয়ে। ভিতরের দামি খাটো ঝকঝকে বেতের সোফায় বসে মুগা রঙের চোগা চাপকান পরা একজন সাদা দাড়িঅলা মুসলমান ফকির। সাদা দাড়ি নেড়ে নেড়ে অন্ন দেখে ঘি আর পাত্র দেখে ঝি দেবার কথা সে-ই বলছিল।

তার হাঁটুর এক হাতের মধ্যে চামড়া-ঢাকা চেকনাই মোড়ার ওপর মেমসাহেব বসে।

অদূরের আর একটা সেটিতে সাহেব—যাঁকে সামনে দেখলে ভয়ে আর সম্ভ্রমে বাপীর বাবা আর বন-এলাকার সমস্ত মানুষের মাথা বুকের নিচে নুয়ে পড়ে। সাদা দাড়ি আর মাথায় সাদা ফেজ টুপী দেখেই অপরিচিত মানুষটাকে মনে মনে ফকির আখ্যা দেয়নি বাপী। সে যখন এসে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়েছে ওই সাদা দাড়ি তখন সবে মেমসাহেবের হাত ছেড়ে তার ন' বছরের মেয়ে মিষ্টিকে কাছে টেনে নিয়েছে। সোফার হাতলের পাশ এক হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। মিষ্টির পরনে জেল্লা-ঠিকরনো বেগুনে রঙের ফ্রক। ওই ফ্রকটাতে এত সুন্দর লাগছে মিষ্টিকে যে এক হাতে ওকে ওইভাবে জড়িয়ে ধরে থাকার জন্য বুড়োর ওপর রাগই হচ্ছিল বাপীর। নিজের অগোচরে আরো একটু গলা বাড়িয়েছে সে। ওদের পিছনে একটু দূরে আর একটা সোফায় আবার ভাবীক্ক মুখে দীপুদা বসে। ওকে দেখতে পেলেই উঠে এসে মাথায় খট-খট করে গাঁট্টা বসিয়ে দেবে কটা। তবু সাবধানে মিষ্টিকে দেখার লোভ সামলে উঠতে পারছিল না সে।

...মিষ্টির ডান-হাতটা বুড়োর সোফায় হাতলে চিৎ করে পাতা। আর বাঁ হাতটা তার সামনে মেলে ধরা। ফুটফুটে হাতের ছোট ছোটো দুটোতে যেন হালকা গোলাপী রং বোলানো। সেই দুটো হাতের ওপর বুড়ো তার এক হাতের পুরু কাঁচের চাকতিটা ফেলে নিবিষ্ট মনে দেখা শুরু করতেই বাপী বুঝে নিল লোকটা গনৎকার। ওই কাচের জিনিসটা সে চেনে। ম্যাগনিফাইং গ্লাস না কি বলে ওটাকে। গনৎকার যদি মুসলমান হয় তাকে ফকির ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে বাপী জানে না।

হাতের রেখার ওপর চোখ রেখে বুড়ো জিজ্ঞাসা করল বেটীর নাম কি?

লজ্জা-লজ্জা মুখ করে মিষ্টি বলল, মালবিকা নন্দী। জবাব দিয়ে সকৌতুকে ও একবার বুড়োর মুখের দিকে তাকাচ্ছে আর একবার নিজের হাতের দিকে।

এরপর ভবিষ্যৎ বলা শুরু হল। খাসা মেয়ে। যত বড় হবে আরো খাসা হবে। উদ-গ্রীব মুখে তার মা আরো সামনে ঝুঁকল। আর বাবা সিগারেট ধরালো।

—খুব বুদ্ধিমতী মাইয়া। অনেক লেখা-পড়া অইব। বি.এ এম.এ পাশ করবো। না, কোন রকম বড় অসুখ-বিসুখ দেখা যায় না, মায়ের কোন ভাবনা নাই, বেটীর শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাইবো।

মেমসাহেবের প্রশ্ন, আর বিয়ে? বিয়ে কেমন হবে দেখুন—

বাইরে থেকে বাপীরও মনে হল মিষ্টির সম্পর্কে এইটেই শুধু জানার মতো কথা, আর সব বাজে।

ওর দুটো হাতের ওপরেই কাচ ফেলে-ফেলে দেখছে বুড়ো। বেশ করে দেখে নিয়ে শেষে শোলোকের মতো করেই কথা কটা বলল।

'অন্ন দেইখ্যা দিবা ঘি, পাত্র দেইখ্যা দিবা ঝি'—

বাইরে থেকে স্পষ্টই শুনল বাপী কিন্তু অর্থ বোঝা গেল না। মেয়ের বিয়ের মধ্যে অন্ন ঘি ঝি আবার কি ব্যাপার! মাথাটা আবার একটু বাড়িয়ে দিতে হল। মিষ্টিও বড় বড় চোখ করে বুড়োর দিকে চেয়ে আছে।

—আর তার মা যেন ওই কথা শুনে উদ্বিগ্ন একটু। —তার মানে গণ্ডগোল দেখছেন নাকি কিছু? প্রশ্নটা করেই কিছু খেয়াল হল যেন। মেয়েকে বলল, এই মিষ্টি তোর হয়েছে, তুই যা এখন।

মিষ্টি তক্ষুনি প্রতিবাদ করে বলল, দাদা থাকলে আমি থাকব না কেন!

ফলে দাদার প্রতিও মায়ের নির্দেশ, দীপু, তুইও বাইরে যা তো একটু—

শোনা মাত্র এদিক থেকে বাপীর ছুট লাগানোর কথা। কিন্তু প্রস্তুত হবার আগেই ছেলের প্রতিবাদ কানে এলো, বা রে, আমারটা তো দেখাই হয়নি এখনো, আমি তাহলে এখন বাড়ি থেকেই চলে যাচ্ছি—

বাপী জানে, মেমসাহেব ছেলের কাছে নরম মেয়ের কাছে গরম। অমনি ছেলেকে অনুমতি দিল, আচ্ছা তুই থাক। সুর পাল্টে মেয়েকে বলল, মিষ্টি! কতদিন বলেছি না দাদা তোমার থেকে ঢের বড়—যাও, ও-ঘরে গিয়ে বই নিয়ে বোসো—

বাপী এদের সমস্ত খবর রাখে। বাইরের শাসন সাহেবের আর ভিতরের শাসন মেমসাহেবের। অতএব বিরস মুখে মিষ্টি এই দরজার দিকে পা বাড়ালো। এবারেও বিপদ হতে পারে বাপী জানে, তবু দরজার আড়াল থেকে সে নড়ল না।

বাইরে পা দিয়ে ওকে দেখেই মিষ্টি থমকালো এক দফা। পরের মুহূর্তে ঘরের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, মা—বাপি—বাপী পাজিটা এখানে দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে শুনছে সব!

'বাপি' আর 'বাপীর' মধ্যে তফাৎ আছে। সাহেবকে তার ছেলে মেয়ে বাবা বলে না, আদর করে বাপি বলে ডাকে। এক লাফে জাহাজ মার্কা কাঠের বাংলো থেকে বাপী মাটিতে এসে পড়ল, তারপর খানিকটা নিরাপদ ব্যবধানে ছুটে এসে ঘুরে দাঁড়াল। না, ওর চিৎকার শুনে সাহেব বা মেমসাহেব কেউ বেরিয়ে আসেনি। এসেছে দীপুদা। চোখোচোখি হতে সে হাত তুলে মার দেখালো, তারপর আবার ভিতরে চলে গেল।

বয়সে দীপুদা তিন বছরের বড় হলেও আর সেবারে সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলেও ওই ননির শরীরে জোর কত বাপীর তাতে সন্দেহ আছে। কিন্তু সাহেবের ছেলের জোর যাচাইয়ের প্রশ্ন ওঠে না বলেই ওর হাতের মুঠোয় পড়লে বাপীকে গুঁতো খেতে হয়। সাহেবের ছেলে না হলে ও উল্টে লড়ে দেখাতে পারত। ছুটে দীপুদা তার নাগাল পায় না কখনো, সে-চেষ্টা করলে জিভ বার-করা কুকুরের হাল হয়।

দীপুদা ঘরে ঢুকে যাওয়ার পরেও ফ্রক পরা মিষ্টি সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে আর ওকেই দেখছে। এ-রকম একটা সুযোগ বাপী ছাড়তে পারে না। যতটা সম্ভব দুপা ফাঁক করে দাঁড়াল। তারপর হাত দুটোও দুপাশে টান করে দিল। শেষে মুখটা বিকৃত-কুৎসিত করে আর ঙ' আঙুল জিভ বার করে ভেংচি কেটে দাঁড়িয়ে রইল।

ফল যেমন আশা করেছিল তেমনি। রাগের মাথায় ও-দিকের কাঠের বারান্দা থেকে মিষ্টিও চোখের পলকে ঠিক ওই রকম পা-ফাঁক করে হাত দুদিকে ছড়িয়ে আর জিভ বার করে ভেংচি কেটে পাল্টা জবাব দিল। তারপরেই তারস্বরে আবার চিৎকার, ও মা! দেখে যাও বাপী-পাজিটা আমাকে কি বিচ্ছিরি করে ভেংচাচ্ছে!

আর এক মুহূর্তও দাঁড়ানো নিরাপদ নয়। মেয়ের ডাকে ওই মেমসাহেব বাইরে এসে আঙুল তুলে ডাকলেই বাপীকে কাচ-পোকার মতো কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। দাঁড়িয়ে কানমলা বা চড় খেয়ে আসতে হবে। চড় অবশ্য এখন পর্যন্ত খেতে হয়নি, কিন্তু কানে দুই একবার হাত পড়েছে। আর চোখ পাকিয়ে গাল লাল করে দেবার শাসানি শুনতে হয়েছে। এ-সব নির্যাতন ওই সোহাগী মেয়ের নালিসের ফল। নইলে দরকার পড়লে মেমসাহেব ওকে ডেকে ফাইফরমাস তো বেশ করে। আর, একটু সুনজরের আশায় বাপীও তার কোনো কাজ করতে পেলে বর্তে যায়।

সোহাগী মেয়ের চিৎকার শেষ হবার আগেই বাপী রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলে সেঁধিয়েছে। তারপর জঙ্গলের ভিতর দিয়েই হাসতে হাসতে ঘরমুখো হয়েছে।

একটু বাদেই মাথায় ফকিরের কথা-গুলো ঘুর-পাক খেতে লাগল। যা বলল তার অর্থ কি হতে পারে, ঘরে গিয়ে পিসীকে জিজ্ঞেস করতে হবে। পিসীর কথা-বার্তার মধ্যেও বাঙালের টান আছে। বিশেষ করে বাবার সঙ্গে যখন কথা বলে। আর ওই ফকিরের মতো অনেক রকমের ছড়া-পাঁচালি কাটে পিসী।

বাপীর যা কিছু আদর আব্দার সব এই পিসীর কাছে। ঘরে মা নেই। মা-কে সে-রকম মনেও পড়ে না। চিন্তা করলে মায়ের একটা কাঠামো শুধু মনে আসে। আরো সাত বছর আগে অর্থাৎ বাপীর ছ'বছর বয়সের সময় এখানকার হাসপাতাল থেকে মা-কে শহরের বড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে মা আর এই বানারজুলিতে ফিরে আসেনি। পিসী তার আগে থেকেই এখানে ছিল। একদিন বিকেলের দিকে তাকে মেঝেতে আছড়ে পড়ে কাঁদতে দেখেছিল। আর বাবাকে মুখ কালি করে ঘরের কোণে বসে থাকতে দেখে-ছিল। তারপর জেনেছে মা বড় হাসপাতাল থেকেই সগ্গে চলে গেছে। এই তেরো বছরের জীবনে তারপর মায়ের জন্য হা-হুতাশ করার সময় খুব একটা মেলেনি।

ঘরে ঢুকে পিসীকে বলল, সাহেব বাংলোয় মস্ত এক ফকির এসেছে কোথা থেকে, সকলের হাত দেখছে—

আপনার চুল কি খসখসে শুকনো, নির্জীব? নতুন হেলো টনিক শ্যাম্পু আপনার চুল করে তুলবে ঝলমলে প্রাণবন্ত!

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথার চামড়ার স্বাভাবিক তেলতেলা ভাবটি কমে যেতে থাকে। এর ফলে চুল খসখসে শুকনো, নির্জীব হয়ে যাওয়ার সমস্যা দেখা দিতে পারে।

নতুন হেলো টনিক শ্যাম্পু চুলের এই সমস্যার সমাধানে দারুণ কার্যকরী। এর যে বিশেষ উপাদান আছে, অ্যালানটোন তা' মাথার এই স্বাভাবিক তেলতেলা ভাব বজায় রাখতে টনিকের মত কাজ করে ও চুলের গোড়ায় পুষ্টি যোগায়।

নতুন হেলো টনিক শ্যাম্পু আপনার চুলের এই নির্জীব শুকনো ভাবটি সম্পূর্ণ দূর করে চুলে আনবে সহজাত সৌন্দর্য, চুলকে করে তুলবে চিকন ঝলমলে, প্রাণবন্ত।

নতুন হেলো টনিক শ্যাম্পুর ঘন ফেনা আপনার চুলের ময়লা সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে চুলে আনবে ঝলমলে দীপ্তি। এর তাজা সুগন্ধ আপনার দারুণ ভালো লাগবে। আপনার চুল চিকন ঝলমলে, প্রাণবন্ত করতে আজই কিনুন—
নতুন হেলো টনিক শ্যাম্পু।

নতুন হেলো টনিক শ্যাম্পু নির্জীব চুলে আনে প্রাণবন্ত ঝলমলে দীপ্তি

TS.G.1.78.BN

হাত দেখা ফকিরের কথা শুনে পিসীর জিভে জল গড়ালো যেন।—বলিস কি রে! কে ফকির? কোথাকার ফকির? তুই নিজের হাতটা একবার দেখিয়ে এলি না কেন?

বিরক্তিভরে শেষের প্রশ্নটারই জবাব দিল, কি যে বলো ঠিক নেই, সাহেব মেম-সাহেব তাদের ঘরে বসে হাত দেখাচ্ছে সেখানে নিজের হাত বাড়াতে গেলে আস্ত থাকত—মুমড়ে ভেঙে দিত না!

এ-রকম কথা শুনলে পিসীর রাগ হয়ে যায়।—কেন, ভেঙে দেবে কেন শুনি, ওদের চারিসতে আছে তোর নেই—তুই কি বানের জলে ভেসে এসেছিস নাকি!

এই পিসী আবার বাবার ঠিক উল্টো। বাবা সাহেব মেমসাহেবের নাম শুনলে কাঁপে। পিসী মরলে। পিসীর রাগের কারণও বাপী নিজেই। তার কাছে ও দুধের ছেলে। সাহেবের ছেলে ভাইপোর গায়ে যখন-তখন হাত তোলে, আর তার মা-ও ভালো ব্যবহার করে না, ধমক-ধামক করে কানে হাত দেয় পর্যন্ত—এ পিসী বরদাস্ত করতে পারে না। দাঁত কড়মড় করে বাপীকেই ঠেঙাতে আসে, তুই সোজা যায় যাস কেন ও-দিকে বেহায়ার মতো—এত হেনস্তার পর লজ্জা করে না ও-মুখো হতে!

বাপীর লজ্জা করে না। দীপুদা তার বাবা মা এমন কি ওই মিষ্টিটার ওপরে পর্যন্ত কি-রকম একটা আক্রোশ তারও বুকের তলায় জমাট বেঁধে আছে। তবু যায়। না গিয়ে পারে না। বিকেলে বা ছুটির দিনে একটা অদৃশ্য কিছু যেন তাকে ওই বাংলোর দিকে টেনে নিয়ে যায়। ওই বাংলোটা তার চোখে রূপকথার নিষেধের এলাকার মতো। নিষেধ বলেই ওদিকে হানা দেবার লোভ।

পিসীর সামনে গ্যাঁট হয়ে বসল বাপী। —বাজে কথা ছাড়ো—অন্ন দেইখ্যা দিবা ঘি, পাত্র দেইখ্যা দিবা ঝি—মানেটা কি চটপট বলে দাও দেখি।

হঠাৎ এই বচন শুনে পিসী হাঁ প্রথম। —কে বলেছে?

—ওই ফকির।

—কাকে বলেছে?

—মিষ্টির হাত দেখে তার মা-কে বলেছে। পিসী মিষ্টিকে চেনে। মেমসাহেবকে লুকিয়ে ও বাপীর সঙ্গেই দুদিন এখানে এসেছে। পিসী ওকে আদর করে নারকেলের নাড়ু আর মুড়ির মোয়া খাইয়েছে।

হাসি মুখেই পিসী ভাইপোকে ছড়ার অর্থ বুঝিয়ে দিল। শুনে বাপী চিন্তিত হওয়া দূরে থাক উল্টে খুশি হল যেন: ঢাক-ঢোল শানাই বাজিয়ে মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলেই হল? হোক গণ্ডগোল—গণ্ডগোলটা যত বেশি হয় বাপী ততো খুশি হবে। ওই হালা মেয়ে কিসসু বোঝে নি। বুঝবে কি করে, তাকে তো ঘর থেকে সরিয়েই দেওয়া হয়েছিল। পিসীর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হলে নিজের মা তাকে ঘর থেকে সরাবে কেন! মিষ্টিটাকে এবারে হাতের নাগালে পেলে হয়—

ডাকলে মিষ্টি যে ওর ধারে কাছে আসতে চায় না সেই দোষটা বাপীর নিজেরই। মেয়েটাকে দেখলেই মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি চাপে। অবস্থার ফারাকটা ওরা যদি এত বড় করে না দেখত তাহলে বোধহয় এতটা হত না। মেয়েটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে একটা অজ্ঞাত লোভ মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দেয়। ঝাঁকড়া আধা-কোঁকড়ানো চুলের সামনে ফর্সা টুলটুলে মুখখানা দেখে মনে হয় ছোট্ট মিশকালো একটা ঝোপের মধ্যে যেন লোভনীয় একখানা রঙিন ফুল বসানো।

একা পেলেই ডেকে বসত, এই মিষ্টি, শোন্—

মিষ্টি কাছে আসত।—কেন?

—তোকে আমি খেয়ে ফেলব। তারপর আরাম করে এক গেলাস জল খাব।

এরপর আর রাগ না করে থাকতে পারে কোন্ মেয়ে। কাছে আসুক না আসুক, দেখা পেলেই বাপীর ওই কথা।—মিষ্টি, তোকে আমি খেয়ে নেব—দূরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কাছে এলে খেয়ে নেব বলে?

মিষ্টি এই নিয়ে তার দাদার কাছে আর মায়ের কাছে নালিশ করেছে। দীপুদা এই অপরাধে ওর মাথায় কম গাঁট্টা মারে নি। আর এই অপরাধেই মেমসাহেবের হাতে কান-মলা খেয়েছে। তার ফলে দেখা হলে দূরে থেকে আরো বেশি করে এই কথা বলে ছুটে পালিয়েছে। এরপর বাবার কাছে সাহেব বা মেমসাহেব কে তড়পেছে বাপী আজও জানে না। বাবা একদিন আপিস থেকে ঘরে ফিরেই ওকে ধরে বেদম ঠেঙালি। কি দোষে মার খাচ্ছে, পিসীর বা ওর তাও বুঝতে সময় লেগেছে। এই মারের ফলেই পিসীর সঙ্গে বাবার ঝগড়া বেঁধে গেছে। দোষটা তখন বোঝা গেছে। বাবা বলেছে, সাহেবের মেয়ে-টাকে দেখলেই মিষ্টি খাবে, মিষ্টি খাবে বলে চেঁচায়—আজ ওকে আমি শেষ মিষ্টি খাওয়াচ্ছি।

বাবার ওপরে রাগ করেই পিসী গুমগুম করে ওর পিঠে আরো কটা কিল বসিয়ে দিয়েছে।—সাহেবের গরিব কেরানির ছেলে হয়ে তোর এত লোভ—পা চাটতে পারিস না?

এরকম বিপাকে পড়ার ফলেই মিষ্টিকে দেখলে বাপী এখন আর গলার আওয়াজে জানান দিয়ে একথা বলে না। কিন্তু মনে মনে ঠিক বলে। আগের থেকে আরো বেশি বলে। আর সেটা ওই মেয়ে ঠিক বুঝতে পারে। কিন্তু কানে না শুনলে নালিশ করতে পারে না বলেই বাপীর ওপর আরো বেশি রাগ তার।

দাদাকে বলেওছে ক'দিন, ও মনে মনে ঠিক আমাকে খাবার কথা বলছে, ঠোঁট নড়ছে দেখছ না—ধরে দাও না দু'ঘা।

কিন্তু দীপুদা যখন দেখে তখন আর বাপীর ঠোঁট নড়ে না। বোনের রাগের কথায় সে অতটা অবুঝ হতে পারে না। শুধু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করে নেয়, মনে মনে বলছিস?

যতটা সম্ভব মুখখানা নিরীহ করে তুলে বাপী মাথা নাড়ে। বলছে না।

দুপুরটা কোনরকমে কাটিয়ে জংলা পথ ধরে আবার সোজা বাংলোর সামনে এসে দাঁড়াল সে। বিকেলে মিষ্টি বাংলো ছেড়ে বেরুবেই জানা কথা। নিজেদের বাগানে ছোটাছুটি করে, আবার সামনের পাকা রাস্তা ধরে বেড়ায়ও। ফাঁক পেলে মেয়েটার জঙ্গলে ঢুকে পড়ারও লোভ খুব। কিন্তু একলা ঢুকতে সাহস পায় না। বাপীর তোয়াজ তোষামোদে মেজাজ ভালো থাকলে মা-কে লুকিয়ে তার সঙ্গেই মাঝে-সাজে ঢুকে পড়ে। ইদানীং বাপীরও তোষামোদের মেজাজ নয় বলে সেটা বন্ধ আছে। এমন কি মিষ্টি ওকে দেখলে বাগান ছেড়ে বাইরেই আসতে চায় না।

চুলবুলে মেয়ে ঘরে কতক্ষণ আর থাকবে, একটু বাদেই কাঠের বাংলোর বারান্দায় দেখা গেল ওকে। তারপর থামকেও দাঁড়াল। অর্থাৎ ওরও চোখ এই দিকে।

একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিল বাপী। কেউ নেই। গেটএর সামনে এসে হাত তুলে ইশারায় কাছে ডাকল ওকে।

মিষ্টি দাঁড়িয়ে রইল। অপলক চোখ। রাগ রাগ মুখ। বাপী বুঝে নিল সকালে সেভাবে ওকে ভেংচি কাটা হয়েছে, সহজে আসতে চাইবে না। খুব মোলায়েম গলায় ডাকল, মালবিকা, একটা কথা শুনে যা, খুব মজার কথা—

মালবিকা বলে ডাকার মানে ওকে বোঝাতে চায় মনে মনেও সে এখন মিষ্টিকে খেয়ে ফেলার কথা ভাবছে না। কিন্তু মেয়েও তাঁাদড় কম নয়।—ফের তুই-তুকারি করে কথা! মা-কে ডাকব?

বাপীর ইচ্ছে হল দুই চড়ে ফোলা-ফোলা লালচে গালে দশ আঙুলের দাগ ফেলে দেয়। তার বদলে দু হাত জোড় করে ফেলে বলল, ঠিক আছে আর তুই-তুকারি করব না, কিন্তু একবার এলে খুব মজার কথা বলতাম, সকালের সেই গণৎকারের কথা—পিসীমার কাছে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েছি—

বাংলো ছেড়ে বাইরে আসার লোভ একটু একটু হচ্ছে বোঝা যায়। তবু মাথা নাড়ল মা তোমাদের সঙ্গে মিশতে বারণ করে দিয়েছে।

এ-কথা মিষ্টি আগেও বহুবার বলেছে। শুনলেই রাগে ভিতরে ভিতরে গজরাতে থাকে বাপী। কিন্তু এত শুনেছে বলেই কানে তোলার মতো নয়। সাদা-মাটা মুখ করে বলল, ঠিক আছে, শুনতে হবে না তাহলে....জঙ্গলের মধ্যে মস্ত একটা মৌচাকও দেখাব ভাবছিলাম। আবু বলছিল, শিগগীরই মওকা বুঝে এক রাত্তিরে ওটা পেড়ে ফেলবে—অনেক মধু হবে। তুই তোর মায়ের আঁচলের তলায় বসে থাকগে যা।

গেট ছেড়ে আবার রাস্তায় এ-ধারে চলে এলো বাপী।

লোভ সামলানো কঠিন হয়ে পড়ছে মিষ্টির। এই পাজীটার সঙ্গে জঙ্গলে বেড়াতে

ওর ভালই লাগে। বাবার সঙ্গে বা বাবার লোকের সঙ্গে ও আর দাদা জঙ্গলে ঘুরেছে। হাতির পিঠে চেপেও ঘুরেছে। কিন্তু সে আর এক রকমের ঘোরা। বাপীর সঙ্গে ঘুরতে অন্য রকমের মজা। বাপী হাত ধরে টানাটানি করলেও মিষ্টি ঘন জঙ্গলে ঢোকে না অবশ্য। এমনিতেই গা ছমছম করে। দাদাও ভীতু, একলা বেশি দূরে যায় না। কিন্তু বাপীর ভয় ডরের লেশ মাত্র নেই। যেখানে বাঘ ভালুক চিতা থাকে আবুর সঙ্গে ও নাকি সে-সব জায়গাও চষে বেড়িয়েছে। আর ঢিল নিয়ে বুনো মোরগ খরগোশ বেঁজী সজারু তাড়া করতে মিষ্টি নিজের চোখেই দেখেছে। ছম-ছমানি ভাব কেটে গিয়ে তখন সত্যিকারের মজা লাগে।

রাস্তার ওদিকে চলে গেল দেখে মিষ্টির আর বাংলোয় দাঁড়িয়ে থাকা হল না। পায়ে পায়ে নেমে গেট-এর দিকে এগলো। কিন্তু তখন পর্যন্ত যেন কোনো কিছুতে উৎসাহ নেই। গেট-এর কাছে এসে চোখ বেঁকিয়ে দেখে নিল সত্যি চলে যাচ্ছে কিনা। তারপর অনেকটা নিজের মনেই যেন কথা ছুঁড়ে দিল, হুঁঃ, মৌচাক দেখতে যাই আর বোলতা এসে কামড়ে দিক্।

বোলতার বদলে বাপীর নিজেরই ওই ফোলা গালে কামড় বসাতে ইচ্ছে করছিল। বলল, বোলতা আর মৌমাছির তফাৎ জানিস না—তোকে দেখতে হবে না। ঢিল না ছুঁড়লে মৌমাছি চাক ছেড়ে নড়ে না—

—আবু চাক ভাঙবে কি করে, তখন কামড়াবে না?

—রাতে ধোঁয়া দিয়ে ভাঙবে। জঙ্গল সাহেবের মেয়ের কত সাহস আবুকে বলে আসিগে যাই।

ওই একজনকে জঙ্গলের দেবতা বা অপদেবতা ভাবে মিষ্টি। আবু রব্বানীকে এ তল্লাটের মানুষ ছেড়ে জঙ্গলের সমস্ত জীব-জন্তুগুলোও চেনে বোধ হয়। জঙ্গলের খবর ওর থেকে বেশি কেউ রাখে কিনা সন্দেহ। এই জন্যে মিষ্টির বাবাও ওকে পছন্দ করে। আবুর বাবা এ জঙ্গলের হেড-বীট-ম্যান। ওর ছেলে আবুকে বাবা শিগ্গীরই বীটম্যান করে দেবে শুনেছে মিষ্টি। ওই আবু এক সময় দাদার দু ক্লাস ওপরে পড়ত শুনেছে। বছর বছর ফেল করার ফলে পাঁচ বছরের ছোট বাপী ওকে ধরেছিল। আর সেই বছরেই আবু ঘেন্নায় ইস্কুল ছেড়েছে। বয়সে দাদার থেকে মাত্র দু'বছরের বড়। বেশি হলে উনিশ। এরই মধ্যে শুধু পাথর ছুঁড়ে আর লাঠি-পেটা করে কত রকমের জীব মেরেছে ঠিক নেই। এই সেদিনও পেল্লায় এক বিষধর সাপ মেরে মিষ্টির বাবাকে দেখাতে এনে খুব বকুনি খেয়েছিল। সাপ ইঁদুর খায়। ইঁদুর বনের ক্ষতি করে। তাই বেশি সাপ মারলে বনের ক্ষতি। বাবা বকুক আর যা-ই করুক ওর বুকের পাটা আছে অস্বীকার করতে পারে নি। কেউ পারে না। জঙ্গলের ব্যাপারে তার আলাদা মর্যাদা।

বাপীকে নিয়ে আবুর সঙ্গেও মিষ্টি চুপি চুপি জঙ্গলে কম বেড়ায় নি। ছুটির দিনের দুপুরে বাবা-মা ঘুমোয়, দাদা শহরে চলে যায়। ফাঁক বুঝে বাপীও এসে মিষ্টিকে ডেকে নিয়ে যায়। বাবা মা ওকে না দেখতে পেলেও ভাবে কাছাকাছি আছে কোথাও। আবু সঙ্গে থাকলে আর হাতে সময় থাকলে মিষ্টি ওদের সঙ্গে একটু বেশি জঙ্গলে ঢুকতেও ডরায় না। এই আবুর কাছে মিষ্টির ভীরু অপবাদ কাম্য নয়।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও গেট খুলে বাইরে এসে দাঁড়াতে হল যেন। মেয়ে ভাঙবে তবু মচকাবে না। ঠোঁট উল্টে জবাব দিল, আবুকে বললে বয়েই গেল। বাবাকে বলে দেব আবু জঙ্গলের ক্ষতি করছে, ওকে যেন বীট-ম্যান না করে।

বাপীর ধৈর্য্য কমছে, তাই রাগ বাড়ছে।—কি, আবুর নামে নালিশ করবি তুই?

—ফের তুই?...তুমিই বা আমার নামে ওকে বলতে যাবে কেন? বোলতার চাক কত দূরে?

একবার শুধরে দেবার পরেও ফের আবার বোলতাই বলল। বাপীর মনে ওকে নিয়ে জঙ্গলে ঢোকার তাড়না।—খুব কাছে। ...আচ্ছা, আবুকে কিছু বলব না।

কিন্তু মিষ্টি অত সহজে ভোলবার পাত্রী নয়।—মজার কথা কি বলবে বলছিলে?

টোপটা আরো একটু রহস্যজনক করে তোলার সুযোগ পেল বাপী। মুখে হাসি টেনে বলল, সকালে গণৎকারের সঙ্গে তোর বিয়ের কথা বলার সময় তোর মা তোকে ঘর থেকে সরিয়ে দিল কেন সে-তো বুঝতেও পারিস নি বোকা মেয়ে! আয়, বলছি—

এবারে আর 'তুই' বলার জন্য ফোঁস-ফোঁস করে সময় নষ্ট করতে চাইল না মিষ্টি। আসলে মা বলেছিল বলেই, নইলে তুই-তুমির তফাৎ খুব একটা কানে লাগে না। ঘুরে দাঁড়িয়ে বাংলোর দিকটা দেখে নিল একবার। কেউ নেই। রাস্তা পেরিয়ে কাছে এলো।...বিয়ের কথা মানেই মজার কথা আর ভালো কথা, কিন্তু মা হুট্ করে ওকে ঘর থেকে চলে যেতে বলেছিল কেন সত্যিই মাথায় ঢোকে নি।

—বলো।

—আগে এদিকে আয়। কাছে পাওয়া-মাত্র ওর একখানা হাতের ওপর দখল নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল। তারপরেও হাত ছেড়ে দিল না। মিষ্টির সুন্দর ছোট হাত নিজের হাতে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করতে বা চাপাচাপি করতে ভালো লাগে।

—সকালের ওই গণৎকার কোত্থেকে এলো রে?

—বাবা শিলিগুড়ি থেকে আনিয়েছে। অনেক জানে—

—কি নাম?

—পীর বক্স্।

—তার মানে এক বাক্স পীর!

না বুঝে মিষ্টি বোকার মতো তাকালো তার দিকে।

বাপী বলল, বি-ও-এক্স বক্স মানে বাক্স না?

—তোমার মুণ্ডু, তুমি এই-সব বজ্জাতি করার জন্য আমাকে ডেকে এনেছ! হাত ছাড়াবার চেষ্টা।

—না রে না—তোর বিয়ের কথায় বুড়ো সেই ছড়াখানা কি বলেছিল মনে আছে?

একটা কি বলেছিল মিষ্টির মনে পড়ছে। চেষ্টা সত্ত্বেও কথাগুলো মনে পড়ল না। মাথা নাড়ল, মনে নেই।

'অন্ন দেইখা দিবা ঘি, পাত্র দেইখা দিবা ঝি'! বাপী হেসে উঠল।

মনে পড়ল। বুড়ো গণৎকার এই কথা-গুলোই বলেছিল বটে। বড় বড় চোখ করে মিষ্টি ওর দিকে মাথা বেঁকিয়ে তাকালো।—তার মানে কি?

—'অ' আর ন'য় -নয়' অন্ন মানে ভাত তো?

মিষ্টি মাথা নাড়ল। তাই।

—পচা গন্ধ-অলা চালের ভাতে ভালো ঘি ঢাললেও খেতে স্বাদ ভালো হয়?

এবারে একটু ভেবে-চিন্তে মাথা নাড়ল মিষ্টি। হয় না বটে।

—আর পাত্র মানে হল ছেলে, যে-ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে। আর ঝি মানে হল মেয়ে—যে-মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে।

মিষ্টি ফোঁস কর উঠল, ঝি মানে কখ্খনো মেয়ে নয়।

বাপী তেমনি জোর দিয়ে বলল, হ্যাঁ মেয়ে। পিসীর কাছে শুনে আমি ডিকশনারি দেখে নিয়েছি, বিশ্বাস না হয় তুইও দেখে নিস। ঝি মানে ঝিও হয় আবার মেয়েও হয়।

এ-কথা শুনে মিষ্টি দমে গেল একটু। বলল, ঝি মানে মেয়ে হলেই বা মা আমাকে ঘর থেকে যেতে বলবে কেন?

—তোর বিয়ে নিয়ে হাঙ্গামা আছে বলে। বাপী গম্ভীর।—পচা চালের মতো একটা বাজে ছেলের হাতে পড়বি তুই।

—কখ্খনো না। পীর সাহেব তো বলেছে, আমার অনেক লেখা-পড়া হবে, চেহারা আরো ঢের সুন্দর হবে, অসুখ করবে না, শরীর ভালো থাকবে—তাহলে খারাপ ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে কেন?

অনেক-জানার মতো মুখ করে বাপী হাসতে লাগল। বলল, ওই জন্যেই তো এই শোলকটারে! তোর পীরসাহেব বলেছে, যত ভালো মেয়েই হোক, সে-রকম ভালো ছেলের সঙ্গে যদি বিয়ে দিতে না পারো তাহলে পচা চালে ভালো ঘি ঢালার মতো হবে সেটা। বুঝলি?

বুঝেও গোঁ-ভরে মিষ্টি বলল, বাবা ঠিক দেখেশুনে ভালো ছেলের সঙ্গেই বিয়ে দেবে আমার—

বাপীর মুখের হাসি আরো প্রশস্ত হল।—তুই আচ্ছা বোকা, তোর বাবাও কি গণৎকার নাকি যে আগে থেকেই ছেলের সব জেনে ফেলবে! ভয় না থাকলে পীরসাহেবের মতো এত বড় গণৎকার এ-কথা বলবে কেন, আর তোর মা-ই বা তোকে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে সরিয়ে দিতে চাইবে কেন! পরিতুষ্ট বাপী ওর হাতে বড়সড় চাপ দিল একটা। অকাট্য যুক্তির মুখে পড়ে মিষ্টি ঘুমকে

দাঁড়িয়ে গেল। বেশ রাগ হচ্ছে তার। একে হানছে তার হাতের ওপর হামলা।

—খোলতার চাক কই?

বাপী থতমত খেল একটু। চারদিকে তাকালো একবার।—কোন্ গাছটায় দেখেছিলাম ঠিক মনে পড়ছে না... একটু খুঁজলেই পেয়ে যাব।

এক ঝটকায় মিষ্টি নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিল।—মিথ্যেবাদী মিথ্যেবাদী! সঙ্গে সঙ্গে যে-দিক থেকে এসেছে সেইদিকে ছুট।

মৌচাক জঙ্গলের কোথাও না কোথাও আছেই। একটা ছেড়ে অনেক আছে। কিন্তু একটাও দেখে রাখা হয়নি বলে বাপী মনে মনে পস্তালো একটু। ছুটে গিয়ে আবার ওকে চেপেচুপে ধরার লোভ হল। কিন্তু ধরতে পারলেও আজ আর ফেরানো যাবে না। ...ওর ফুটফুটে নরম-গরম হাতটা এতক্ষণ নিজের হাতের মধ্যে ছিল, বেশ লাগছিল।

দুষ্ট মুখেই বাপী এবার আর এক-জনের সন্ধানে চলল। বয়সে পাঁচ-ছ বছরের তফাৎ হলেও এখানে প্রাণের দোসর একজনই।

আবু রব্বানী।

ওই রব্বানীর সে একনিষ্ঠ ভক্ত বললেও বেশি বলা হবে না। তার একান্ত সান্নিধ্যে কাটানোর ফলে বাপীর ইদানীং কত দিকে জ্ঞান বাড়ছে আর চেতনা বাড়ছে তা শুধু ও নিজেই অনুভব করতে পারে। বাপীর বিবেচনায় আবুর মতো মরদ তামাম বানারজুলিতে আর দুটি নেই। আবুরও ওর ওপর অকৃত্রিম স্নেহ। তার কারণও হয়তো একটু আছে। বাঁটমান হবার আশায় বানার জঙ্গলের এত বড় রিজার্ভ ফরেস্টের হর্তাকর্তা সর্বেসর্বা রেঞ্জ অফিসারের মেম-সাহেবটিকে আবু নানাভাবে তোয়াজ তোষা-মোদ করে চলেছে বটে। ঝুড়ি ভরতি ফিকে পীত বড়া শাল ফুল অথবা টকটকে লাল পলাশ দিয়ে আসে, আম জাম জামরুল পেয়ারা খেজুর নিয়ে যায়, বুনো মুরগী বা খরগোশ মারতে পারলে মেমসাহেবকে ভেট দিতে ছোটে। কিন্তু চাকরিটা একবার হয়ে গেলে ওর সমস্ত মনিব কেরানিবাবু অর্থাৎ বাপীর বাবা হরিবাবু। অতএব বাপীর সঙ্গে খাতির রাখাটা তার দরকারও বটে। কিন্তু আবুর অকৃত্রিম স্নেহটাই বড় করে দেখে বাপী।

—আরো খো খো—আল্লার খবর রোশনায় রাখে!

বাপীর মুখে গণৎকার পীর বকস-এর সমাচার শুনে বাঙাল টান দিয়ে ওই মন্তব্য করেছিল আবু রব্বানী। বিশেষ করে মিষ্টির বি-এ এম-এ পাশ করে মস্ত বিদুষী হওয়ার সম্ভাবনাটা এক ফুঁয়ে বাতিল করে দিয়েছিল সে। বলেছে বি-এ এম এ দূরে থাক, ওই মেয়েকে ম্যাট্রিকও পাস করতে হচ্ছে না বলে দিলাম।

আবু নিজে অনেক বছরের চেষ্টায় ক্লাশ সিক্স থেকে সেভেনে প্রমোশন না পেয়ে পড়া ছেড়েছে একথা একবারও মনে হল না বাপীর। সত্যিকারের বিস্ময় নিয়ে শুধিয়েছে, কেন বলো তো—মেয়েটা তো ওদের ক্লাসে ফার্স্ট হয়!

—ফার্স্ট হোক আর লাস্ট হোক, ওই পীর যা বলে শুনে রাখ।

শুনে রাখার মতোই কথা বটে। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু বেশি পড়াশুনা কেন হবে না বলো না?

আবুর মুখে সব রাস্তা হাসি।—তোর কোনো বুদ্ধি যদি থাকত। এই বয়েসেই চেহারাখানা দেখছিস না মেয়েটার, ষোল সতের বছরের ডবকা বয়সে এই মেয়ের চেহারাখানা কি রকম হতে পারে চোখ বুজে ভেবে দেখ দিকি? ভেবেছিস? ভাব—

বাপী সঠিক ভেবে উঠতে পারল না, তবে একটা সম্ভাব্য আদল চোখে ভাসল বটে। কিন্তু কি বলতে চায় বোধগম্য নয় তখনো। মাথা নাড়ল। ভেবেছে।

আবু এবার ব্যাখ্যা শোনালো। সেই বয়সে কোনো না কোনো বড় লোকের ছেলের চোখ পড়বেই ওর ওপর। বিয়ে করে ঘরে এনে পুরবে তারপর লুটেপুটে শেষ করবে। বি-এ এম-এ পাশ করার ফুরসৎ মিলবে কোত্থেকে?

হাঁ করে বাপী আবুর মুখখানাই দেখছিল। মগজে এত বুদ্ধিও ধরে ও।

রাস্তার পাশে জ্যোতিষীর জানালা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ওই মা মেয়েকে অপলক চোখেই দেখে নিয়েছিল বাপী তরফদার। তারপর শুধু মেয়েকেই চেয়ে চেয়ে দেখেছে। ওই মা পাশে না থাকলে হঠাৎ দেখে চিনতে পারত কিনা সন্দেহ। জ্যোতিষীর সামনে একটা ছক পড়েছিল। গড়গড়ায় তামাক টানতে টানতে তিনি সেই ছক দেখছিলেন আর টুকটুক করে বলছিলেন কিছু। মনো-রমা নন্দী সাগ্রহে শুনছিলেন। মিষ্টি তাঁর সামনে টান হয়ে বসে। ডান পা-টা পিছনে মোড়া। জ্যোতিষীর দিকেই চেয়ে ছিল সে।

জানলা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে স্থানকাল ভুলে বাপী তরফদার ওকেই পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখছিল। মাথা...কপাল... নাক কান চোখ মুখ...গলা...কাঁধ...বুক ...এক পা পিছনে মুড়ে বসার ভঙ্গী...বুক থেকে কোমরের নীচে পর্যন্ত ঈষৎ স্থির যৌবনরেখা....একটু নড়লে চড়লে সেই রেখা-গুলোও নড়া-চড়া করেছে।

নিজের অগোচরে মনে মনে একটা হিসেব সেরে নিয়েছে বাপী তরফদার। আবু রব্বানীর সেই ভবিষ্যদ্বাণী এখন পর্যন্ত ঠিক হয়নি। ঠিক ন' বছর আগের কথা.. মিষ্টির বয়েস এখন আঠারো। কিন্তু এখন পর্যন্ত কপালে কুমকুমের টিপ, সিঁথিতেও সিঁদুরের আঁচড় নেই।

গাল দুটো আগের মতো ফোলা-ফোলা নয় একটুও। মেদ-ঝরা টানা মুখ। আগের তুলনায় আরো আয়ত চোখ। গায়ের রঙও আগের থেকে ঢের বদলেছে, অনেক কম ফর্সা মনে হয়। কিন্তু এই রঙের মধ্যে আদুরে ভাব থেকে তাজা ভাবটাই যেন বেশি।

নির্নিমেষে দেখছিল বাপী তরফদার। তার এই দেখাটা বাইরের প্রতীক্ষারত অন্য মেয়ে-পুরুষদের চোখে বিসদৃশ লাগছিল সে হুঁশ নেই। একসময় ওই মা মেয়ে উঠল। বাপী তরফদার আত্মস্থ নয় তখনো। অনাবৃত অপলক দু চোখ মিষ্টির সর্বাঙ্গে ওঠা-নামা করেছে। তারা বেরিয়ে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাপী তরফদারও তাদের দু'হাতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। মা-কে ছেড়ে মেয়েকেই দেখেছে সে। দেখেনি, দুই চোখের বাঁধনে তাকে যেন আটকে রাখতে চেয়েছে। চিনতে পারার কথা নয়, দুজনের কেউ চিনতে পারেনি তাকে। অস্ফুট ঝাঁঝে 'স্টুপিড' বলে মেয়ের হাত ধরে মা গাড়িতে উঠেছে। নিজের আচরণ বেপরোয়া অভব্যতার সামিল কিনা সে-চিন্তার অবকাশ মেলেনি বাপী তরফদারের। মেয়েরও বিরক্তিমাখা লালচে মুখ দেখেছে মৃদু শব্দ তুলে সাদাটে গাড়িটা চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। পিছনের লাল আলোর গাড়ির নম্বরের ওপর চোখ আটকেছে বাপী তরফদারের।

সেই দিকে চেয়ে ন বছর নয়, নিজের অগোচরে আটটা বছর পিছনে পাড়ি দিয়েছে বাপী তরফদার।.. ওর বয়েস যখন চৌদ্দ।.. মিষ্টির দশ। হঠাৎ জিভে করে নিজের শুকনো দুই ঠোঁট ঘষে নিয়েছে বাপী তরফদার। আট বছর আগের সেই আঘাতের চিহ্ন নেই, কিন্তু জিভে নিজের দেহের সেই তাজা রক্তের নোনতা স্বাদ।

....এক মেয়েকে কেন্দ্র করে আট বছর আগে অপরিণত বয়সের ছেলের সেই প্রবৃত্তির আগুন বাইশ বছরের এই দেহের শিরায় শিরায় হঠাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আবার।

আবছা অন্ধকার শূন্য পথের দিকে চেয়ে দু চোখে ধক্‌ধক্‌ করছে প্রবৃত্তির সেই রুদ্র আদিম অভিলাষ। **(চলবে)**

হরিদ্বারে সন্ধ্যা

অসীম রায়

রাজা বিড়লার ক্লকটাওয়ারে সন্ধ্যে ছটার সুরেলা আওয়াজ বেজে উঠতেই নন্দ বোস চমকে ওঠে। আজ সন্ধ্যে ছটায় দীপ্তির সঙ্গে তার এপয়েন্টমেন্ট নয়? সঙ্গে সঙ্গে স্তোকবাক্যে সান্ত্বনা দেয় নিজেকে, আজকেই সবে পেঁছেছে শরীরটা খারাপ ইত্যাদি। পায়ের কাছে ছল ছল করে গঙ্গা বয়ে যায়। আর মাঝে মাঝে শালের দোনায় ফুল প্রদীপে গঙ্গা মায়ি কি আর্তি ভেসে আসে। সেদিকে চেয়ে নন্দ বোস ভাবলে এই নৈসর্গ শোভার চেয়ে তার কাছে অনেক বেশী আনন্দদায়ক ঘটনা ঘটবে যদি দীপ্তি তার হাতখানা ধরতে দেয়।

জলের ধারে এসে বসেছিল শান্তিতে মনটাকে শেষবারের মতো নাড়াচাড়া করা যাবে বলে। কিন্তু বাঁধানো গঙ্গার চত্বরে পা দিতে না দিতেই মাইকে ভজন গীত তারস্বরে বাজতে থাকে। চুপ ধারে থেকে বোধহয় আজকাল ভগবানের কাছে যাওয়া

যায় না, হট্টগোলের মধ্যে যেমন বেশীর ভাগ সাংসারিক মানুষের জীবন তেমনি হট্টগোলও বোধহয় এখন ধর্মীয় জীবনের অঙ্গ। এখন চিৎকার করে প্রেস কনফারেন্স ডেকে ধর্মকর্ম করতে হয়, অন্তত হরি-দ্বারে এসে তার অনেকটা এই রকম মনে হচছে।

'কী মশাই, একলা বসে বসে কী করছেন?'

নন্দ বোস সেদিকে তাকাতেই তাদের ধর্মশালার ঘরের ঠিক পাশেই চব্বিশ নম্বর ঘরের বাসিন্দে নদীর দিকে হাত নাড়িয়ে বললেন, 'গঙ্গাটা গ্র্যান্ড না?'

জবাব না পেয়ে বললেন, 'তবে যাই যাই বলুন, সেই রাবড়ি আর নেই। বারো টাকা কে জি, লোকে খাবে কি!'

'তাও গঁুড়ো দুধ, সে স্বাদই নেই', পাশের সঙ্গীটি বললেন।

ভদ্রলোক থেমে ঝঁুকে পড়ে বললেন, 'আপনার গ্র্যান্ড করালেন মশাই। আপনারা আর আমরা। ইন্টেলিজেন্সরাকে [illegible] আমরাই ভাষা দিই।'

ভদ্রলোক আলিপুর কোর্টের উকিল। নন্দ বোস ভাবলে, কি কুক্ষণেই সে তার আত্মপরিচয় দিয়েছিল।

'আপনার কাগজের লোকেরা অবশ্য আগেই ওয়ার্নিং দিয়েছিলেন, হাওয়া ঘুরেছে। আমরাও টের পাচ্ছিলাম। তবে ঠিক এতটা ভাবিনি। আপনি ভেবেছিলেন।'

'না, আমিও এতটা ভাবিনি।' বলেই নন্দ বোস টের পায় তার উত্তর প্রশ্নকর্তার মনঃপূত হয়নি। কারণ অনেক লোকেই সাংবাদিকদের গণৎকার মনে করে। রাজ-নৈতিক ভবিষ্যৎ যদি গুণে না বলতে পারে, অন্তত কাছাকাছি না বলতে পারে তাহলে সে সাংবাদিক কিসে? এবং এক ধরনের চাপা অসহিষ্ণুতা যা থেকে সে নিষ্কৃতি পেতে চায় তাই তাকে পেয়ে বসে। হাওয়ায় কথা উড়ে যাচ্ছিল তাই চেঁচিয়ে বললে, বারো টাকার কেজি রাবড়ি কিন্তু তিন টাকায় নামবে না।'

ভদ্রলোক এক পা এগিয়ে এসে বললেন, 'আপনি তো মশাই সিনিকদের মতো কথা বলছেন। এই চোরেদের রাজত্বে দাম বেড়েছে। এই চোরেরা গেলেই দাম কমবে।'

তারপর চেম্বারবাবুদের প্রসঙ্গে ফিরে এলেন, 'কাল সকালে লছমনঝোলা যাচ্ছি। শেয়ার ট্যাক্সি। মাত্র বারো টাকা যাতায়াত। আমাদের ধর্মশালার ঠিক নীচ থেকে ছাড়বে।'

'কাল সকালে বলব।'

ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা। 'আজ কি করলেন মশাই? মনসা মন্দিরে উঠেছেন? আমরা উঠেছিলাম। ঐতো, ঐ পাহাড়টার ঠিক ওপরে। আলো জ্বলছে, দেখতে পাচ্ছেন? একসেলেন্ট। না দেখলে মিস করবেন।'

'কাল যাব।'

'আচ্ছা, আপনি রেস্ট নিন। চব্বিশ নম্বরের বাসিন্দারা এগিয়ে যান।'

'মছলিকে লিয়ে। বাবু মছলিকে লিয়ে।' আটার গুলির ঠোঙ্গা হাতে কতগুলো ছেলে তাকে ছেঁকে ধরে। নন্দ বোস মাছি তাড়া-বার মতো করে হাত নাড়ায়।

ছেলেগুলো এগোতে এগোতে কাঁকে 'মছলিকে লিয়ে।'

অসহিষ্ণুতা কাটাতে হবে: এই বসন্তে তার পঞ্চাশ বছরের জন্মদিন। আর এই বসন্তে সে প্রতিজ্ঞা করেছে খুব শান্ত স্থিরভাবে জীবনকে গ্রহণ করতে হবে। অনেক আগামীর স্বপ্ন দেখেছে কিন্তু এই বসন্তে এক্ষনের স্বপ্ন দেখতে হবে। এই বর্তমান, এই অধুনা — একে যদি নানা রঙে রূপে অর্থময় করে তোলা যায় তাহলেই বোধহয় গোটা জীবনের চেহারাটার একটা আসে। যরা ভাবছে আগামীতে সব ওলোট-পালট হয়ে যাবে তারা তাই ভাবুক। কিন্তু সেই রকম অনির্দিষ্ট ওলোটপালটের ওপর আর তার জীবন প্ল্যান করতে চায় না। যদি বর্তমান জীবন তার কাছে অর্থহীন হয়, তাহলে ভবিষ্যৎও তার কাছে অর্থহীন। এ কথাগুলো অবশ্য ঠিক বক্তৃতা দিয়ে বোঝাবার নয়, নিজেকেই বারবার বলতে হয়। যাতে জীবনের ওপর আরও মমতা জাগে, এই ষাট-সত্তরটা বছরের নিঃশ্বাস নেওয়াটা আরও সহনীয় লাগে।

আর এই অসহিষ্ণুতার জন্যে দীপ্তি চলে গিয়েছে এ কথাটা মনে করতেই অবশ্য সে প্রতিবাদে উন্মুখ হয়ে ওঠে। দীপ্তি কি তার মনুষ্যত্ব অপমান করে নি? সে যা বলেছে তার বিকৃত মনগড়া অর্থ করেনি? কেবল নিজের অহংবোধ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় তাকে বারবার আঘাত করে নি? এখন এই যে সে হাঁটু গেড়ে দয়া ভিক্ষা চাইবে তা কিসের জন্যে? তা সত্যিই কি প্রেমের জন্যে? অথবা নিজের এক ধরনের বাঁচার অভ্যাসকে চালু রাখার জন্যে?

যদি সত্যি ঘুমন্ত স্মৃতি ধাক্কা দিয়ে জাগান যায় তাহলেই আর এত দূরে ছুটে এসে এক অনিশ্চিত বসন্তের দিকে হাত বাড়ানোর ভবিষ্যৎ আরও অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়ায়। 'মনে নেই, তুমি কি বলেছিলে?' দীপ্তির সেই ক্রুদ্ধ গর্জনের স্মৃতি তাকে আবার জড়ভরত বানিয়ে দেয়। আবার সেই গর্জন শুনবার জন্যেই কি তার প্রাণ আঁক-পাঁক করছে? সেই সব ঝড় যা তাদের দুজনের ঝুঁটি ধরে নাড়িয়ে অর্ধমৃত করে বিনিদ্র রজনীতে বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে সেই ঝড় কি আবার ডেকে আনবে তার এই শান্ত জীবনে?

হাওয়াতে সিগারেট ধরে না। দু-তিনবার চেষ্টা করে আবার প্যাকেট ভরে রাখে পকেটে। অবশ্য এই ধরনের শান্তি বোধহয় ঠিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তি-নিকেতন নয়। বরং ছ মাস আগেও তাদের বিবাহিত জীবনের তরঙ্গক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝরাশির মধ্যে যে ছোট ছোট শান্তির দ্বীপগুলো মাথা তুলে থাকত তা সত্যিই ছিল লোভনীয়। দুজনেই সচেতন চার পাশের প্রবলরাশির অস্তিত্ব সম্পর্কে এবং সেই জন্যেই বোধহয় আরও নিবিড়ভাবে তারা পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ থাকত: আঃ! কি যাচ্ছেতাই ভাল মানুষের জীবনটা। কোন যুক্তি দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে মিলন আসে না, বরং সেই সাজগোজ করা মিলনে পাত্রপাত্রী অত্যন্ত আড়ষ্টভাবে প্রেমের অ্যাকটিং করে যায়। তারপর যখন সমস্ত প্রত্যাশা চুকেবুকে গিয়েছে তখন হঠাৎ অপ্রতিরোধ্য টানে দুজনে কোন সচেতন অ্যাকটিং না করেই এক হয়ে দাঁড়ায়। সিগারেট শেষ পর্যন্ত ধরে।

রাজা বিড়লার ক্লকটাওয়ারে আবার সুরেলা আওয়াজ দেয়। সাতটা বাজল। শেঠজীদের হঠাৎ রাজা বনবার বাসনা হয় কেন? ঠিক নাকের সামনেই এক স্থূলাঙ্গিনী পাঞ্জাবী মহিলা ভেজা গামছাখানা ফেলে মুহূর্তের জন্যে উদোম হয়ে পড়েন। পরমুহূর্তেই ঢাকা পড়ে কালো সায়ায় সেই জ্যোৎস্নামাখা ফর্সা নিতম্ব। কয়েকটি যুবক শিকল ধরে জলে ঝাঁপাঝাঁপি করে। আশ্চর্য! ছেলেবেলা থেকে হরিদ্বার সে ভাবত এক নির্লিপ্ত নিরাশকত কঠিন শীর্ণ তীর্থযাত্রীদের সমাবেশস্থল। তা যে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে ছুটি-কাটান ভিড়ের জায়গা তা আগে ভাবে নি। অবশ্য বুকে হাত দিয়ে বলতে গেলে নন্দ বোসের ভালই লেগেছে। হরিদ্বার মানে সেই আবছা আধ্যাত্মিকতার স্থান নয় যা হয়ত ইউরোপীয়ান বা আমেরিকানদের ভাল লাগে যারা ভারতীয় সত্তা সন্ধানে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচা করতে রাজি। হরিদ্বার মানে এই চমৎকার নীলচে গঙ্গার ক্ষিপ্র জলস্রোত, বারো টাকা কেজি রাবড়ি, আম লংকার আচারের গন্ধ, কম্বল গরম কাপড়ের দোকান, খাবার দোকানে বাংলা হরফে লেখা ভাত রুটি [illegible], গোবি, হিংয়ের কচুড়ির গন্ধ। বাস্তবিক তার জায়গাটা ভাল লেগে যাচ্ছে। একেবারে নিরালম্ব নিপাট আধ্যাত্মিকতা ধোপে টেঁকে না। আধ্যাত্মিকতা যেন শিকড় খুঁজে পায় বৈষয়িক মানুষের সমাবেশে। এখানে এসে শুনেছে সাধু সন্তরা হরিদ্বার ছেড়ে দেবপ্রয়াগ কিংবা আরও নির্জন স্থানে উঠে গেছেন, ভালই করেছেন। এই হিংয়ের গন্ধে জীবনটা ভীষণ মায়াটে লাগে। বড্ড টানে এই ভুলত্রুটিভরা ভঙ্গুর জীবনটা।

দীপ্তি এখন কি ভাবছে? তার মত মেয়ে পারবে আধ্যাত্মিকতার সম্পূর্ণ শাসন মেনে নিতে হাসিমুখে, সজীব আগ্রহে? অসম্ভব। অসম্ভব। কথাটা ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে নিজেকেই চমকে দেয়। আবার প্রেমে-টেমে পড়ে যাবে না তো যাকে বলে আধ্যাত্মিক প্রেম? কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণের কোন অবতারকে আত্মসমর্পণ? পর-মুহূর্তেই নন্দ বোস নিজেকে শাসন করে। এটা বড্ড সহজীকরণ হয়ে যাচ্ছে না? দীপ্তি খুব সচেতন মেয়ে। ঐ রকম নাক চোখ বুজে আত্মসমর্পণ তার পক্ষে সম্ভব নয়। হঠাৎ হেসে ওঠে নন্দ বোস। দীপ্তির

অবিবাহিত জীবনের একটা গল্প মনে পড়ে যায়। দীপ্তিই গল্প করেছিল, তারা দুজনেই চেঁচিয়ে হেসেছিল। তার ভাল লাগত এমন একটি ছেলেকে দীপ্তি অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করে সে ঘন ঘন বিশ্রীভাবে দাঁত বার করে হাই তুলত বলে।

সেই দীপ্তি? হ্যাঁ সেই দীপ্তি। তাতে কি? আসলে তো তারা দুজনেই দুজনকে ভালবাসে না। তাদের পনেরো বছরের বিবাহিত জীবনের কতগুলো অভ্যাস ভালবাসে। তাই অত সহজে দীপ্তিকে সে 'বেরোও আমার ঘর থেকে' বলে বার করে দিয়েছিল, সেই অদ্ভুত বিকট আওয়াজ তার বছরের পর বছর ধরে ঘুমায়িত অবচেতন থেকে বেরিয়ে এসেছিল। থাক, বাইরে এত দিন একটা ভদ্রতার মুখোস পরে থাকতে, সেটা যে খুলে ফেলেছো সে জন্যে ধন্যবাদ।'

'ঠিক বলেছ, তুমি যে তা বুঝতে পেরেছ, এ জন্যে তোমাকেও ধন্যবাদ।'

'তাহলে এ মাসেই ডাইভোর্সের ব্যবস্থা কর। নন্দ লক্ষ্য করেছিল এই সব ক্ষেত্রে যা হয় যেমন ঠোঁট কাঁপা, চোখের পাতা ভারী হওয়া, চোখ ছল ছল করা—এ সবের চিহ্নও নেই দীপ্তির মুখেচোখে। 'একেবারে তো শূন্য হাতে যেতে পারব না।'

তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। তার সমস্ত ব্যবস্থা হবে।

আমি শুধু ভাবছি, এতদিন সমানে আমাকে ব্লাফ দিয়ে গেল একটা লোক। এখন একটু প্রাণশক্তি থাকতে আমাকে ছেড়ে দাও। আমি বলছি, হাত জোড় করে বলছি, আমাকে ছেড়ে দাও।

তোমার হাত জোড় করতে হবে না।

পনেরো বচ্ছর ধরে আমি এই ভণ্ডামি সহ্য করে এসেছি। ভাবতেও অবাক লাগে।

'অত না চেঁচালেও আমি শুনতে পাই।'

'আমি চেঁচাব। আমি চেঁচাব। ভণ্ড জোচ্চোরদের মুখোস খুলে দেব। এতদিন কিছু ভাবিনি। মুখ বুঁজে সব সহ্য করেছি। নইলে আত্মীয়বন্ধুরা মুখে চুণ কালি দিত। এত ঢং করে পেরেম করে বিয়ে করলি....চারদিকে ছি ছি করত। এখন আর ওসব ভাবি না। যা সত্যি তাই সত্যি। যখন পেরেম করতে তখনও এক একবার মনে ঢং করছে লোকটা। বোকা ছিলাম। এখন তার মাশুল দিচ্ছি।

'আর তুমি? তুমি ভণ্ডামি কর নি? দিন-রাত্তির আমাকে দোষী সাব্যস্ত করছ। আমি যা নই তা আমাকে বানাচ্ছ। এগুলো ভণ্ডামি না?

আমি তো বলছি। আমাকে ছেড়ে দাও। হাত জোড় করে বলছি। ছেলেপিলে নেই। তোমার তো সমস্যাও কিছু নেই। মাসে মাসে দুশো টাকা ফেলে দিতে পারবে না? না, বড্ড বেশী হবে?

এবং ঠিক এই মুহূর্তে নন্দর মনে হয়েছিল, কোথাও বোধহয় ভুল হচ্ছে। এগুলো ঠিক দীপ্তির কথা নয়, তার সব মানসিক আশ্রয় দীপ্তি হারিয়ে ফেলেছে। আবার নতুন করে সে আশ্রয় চায়। নন্দকে নতুন করে তাকে আশ্রয় দিতে হবে, মানুষের জীবন সম্পর্কে আরও মমতা জাগাতে হবে তার মনে। সে দীপ্তির কাছে কি পেয়েছে সেই হিসেব তো শুধু নয়, পাল্টা হিসেবও তো আছে। দীপ্তির মন কি সে ভরাতে পেরেছে? আর তা যদি না পেরে থাকে তাহলে তার স্বামীত্বের বড়াই সাজে না। দীপ্তির এই অনাথা চিৎকার তো তারই নিজের ব্যর্থতার ঘোষণা। কিন্তু সঙ্গে মনে হয় বোধহয় ফেরা যাব না। একটা এসপার ওসপার হয়ে গেলেই ভাল। এই ঘ্যানঘেনে চাপা কিংবা প্রকাশ্য কোঁদলে গ্রীষ্ম থেকে বসন্ত যাপন আর সহনীয় নয়। কিন্তু আর একবার চেষ্টা করলে কি হয়?

দ্যাখো দীপ্তি, আমি হয়ত রাগের মাথায়....

আর ন্যাকামো কর না। অনেক ন্যাকামো করেছ। এবার আমাকে নিস্তার দাও।

আলমারীর মাথা থেকে দীপ্তি সুটকেসটা পেড়ে আনে। তাদের বিয়ের সুটকেস। খান তিনেক হাল্কা তাঁতের শাড়ি আর কাল সাটিনের সায়া সুটকেসে ভরে নেয়।

'আমাকে ক্ষমা কর দীপ্তি', অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করে বলল নন্দ। ক্ষমা কথাটা এক্ষেত্রে বড্ড ন্যাকা কথা। কিন্তু অন্য কোন কথা হাতড়িয়ে পায় না।

আর যাই কর কেঁদে ফেল না। চোখের জল দিয়ে ম্যানেজ কর না। আগেও করেছ। আমি যা করছি তা তোমার মঙ্গলের জন্যে। আমাকে বাদ দিলে তোমার কিচ্ছু এসে যাবে না। আমি জানি। আমি না থাকলে তোমার চলবে না এরকম তো নয়। আমাকে ছেড়ে দাও।

আমাদের বোধহয় আর একটু ভেবে দেখা দরকার। নন্দ এবার গুছিয়ে বলার চেষ্টা করে।

কি ভাবব? ছেলেপিলে থাকলে ভাবতাম। এতক্ষণে গলা কাঁপে দীপ্তির।

'আমি তোমার কেউ না?' বলবার সঙ্গে সঙ্গে নন্দর মনে হয়, অ্যাকটিং করছে। সঙ্গে সঙ্গে দীপ্তির মুখ বেঁকে যায় বিদ্রুপে।

সে কি, তুমি আমার কেউ নও বলেছি? তুমি আমার কর্তব্যপরায়ণ স্বামী যে আমাকে পনেরো বছর ধরে বুঝ দিয়ে এসেছে, আমাকে তার বাঁদী বানিয়েছে।

আমিও কি সাফার করিনি তোমার সঙ্গে? আমাদের দুজনের এই সাফারিং-এর কি কোন মূল্য নেই?

'দ্যাখো, তোমার এই কেতাবী কথা দিয়ে আমাকে সান্তনা দেবার চেষ্ট কর না। ওভাবে সান্তনা আসে না। যা ভেঙে গেছে তাকে ভাঙতে দাও। ওভাবে জোড়া লাগিও না। আবার ভাঙবে, আরও বেশী করে ভাঙবে।
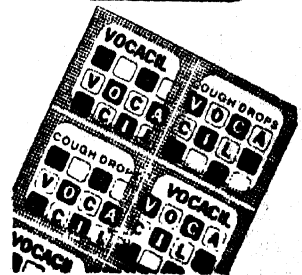
তারপর টেবিলের ড্রয়ার খুলে বিয়ের আগে নন্দকে লেখা তার একতাড়া চিঠি দীপ্তি বার করলে।

ওগুলো এখন আমার। ওগুলোর ওপর তোমার কোন অধিকার নেই।

ঠিক আছে। ঐ আবর্জনাগুলো পুড়িয়ে ফেলো।....আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা কর না। যদি ইচ্ছে হয়, মাস গেলে টাকাটা মণি অর্ডার করে পাঠিও।

স্ত্রী চরিত্রের ক্ষেত্রে না মানে হাঁ এই বহুপ্রচলিত ধারণার বশবর্তী নন্দ পরদিন অফিস ফেরত পার্ক সার্কাসে বড় শ্যালকের বাড়ি হাজির। বড় শ্যালক বাহিরে একটা কাল গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। বললে, 'তোমায় কদ্দিন বললাম নন্দদা, তোমাদের অফিসের একটা গাড়ি আমাকে সুবিধে দরে কিনিয়ে দাও।'

'এখন গাড়ি বেচাকেনা বন্ধ।'

'এই গাড়িটা কিনলাম। স্ট্যাণ্ডার্ড টেন। এক হাতের গাড়ি। ভালই হবে কি বল?'

'দীপ্তি এসেছে?'

'ও হ্যাঁ। কালকে একটা সুটকেস নিয়ে হাজির। তুমি নাকি বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছ। এসব বুড়ো বয়সে ঝগড়া-ঝাঁটি আর কেন? রিটায়রমেন্টের তো সময় হয়ে এল।'

'এখনও ক বছর বাকী আছে।'

'ঐ হোল। পঞ্চাশ আর ষাট। এ-বয়সে আর তোমায় কেউ বিয়ে করছে না।'

'আমি আবার বিয়ে করতে চাই কে বললে?'

আই! আবার চটে যাচ্ছ। মডার্ণ লাইফের এই মুস্কিল! যখন তখন মানুষ যায়। তোমার প্রেশারটা আর একবার চেক কর নন্দদা। আমি দিদিকেও বলেছি। এই যে চটাচটি ঝগড়াঝাঁটি এর পেছনে দেখবে আসলে কোন বেসিক নেই। রক্তের চাপটা হঠাৎ বেড়ে গেলে ভীষণ অসহ্য লাগে। তখন যদি না চেঁচামেচি করে তুমি টপ করে শুয়ে পড়....

আচ্ছা আমি একবার ভেতরে যাচ্ছি।

দীপ্তি বোধহয় বাথরুমে। শ্যালক-স্ত্রী তার দিকে আড় চোখে চেয়ে বললে, আপনাকে বরাবর অন্য রকম ভাবতাম নন্দদা। আপনি যে দিদিকে এরকম অপ-মান করবেন ভাবি নি। ও'র সঙ্গে তো আমারও ঝগড়া হয় কিন্তু কখনও এভাবে....।

শ্যালক গৃহিণী উঠে যায়। তার হাসিখুসি মুখখানা থমথম করে।

তুমি এখানে এসেছো কেন? বাথরুম থেকে সোজা দীপ্তি চলে এসেছে। চুল আঁচড়ায় নি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলে, তুমি ভাবছো, বাবা মা মারা গেছে। আমার এখন কেউ নেই। তুমি তু করে ডাকলেই আমি ফিরে যাব আমি যাব না। আমি আর একবার বাঁচবার চেষ্টা করব। ঐসব স্লিপিং পিলটিলের মধ্যে আমি যাচ্ছি না। তোমার বদনামের ভয় নাই। আমি মরছি না। আর একবার বাঁচার একটা চান্স দাও।'

দীপ্তিকে অনেক সংযত সমাহিত লাগে। নারী-চরিত্রের যে সাধারণ যুক্তি তা এক্ষেত্রে অচল। কোথাও একটা বড়রকম গণ্ডগোল আছে যা বোধহয় আর ধামা-চাপা দেওয়া যায় না।

'আমাকেই তুমি আর একটা চান্স দাও দীপ্তি, নতুনভাবে সংসারটা গড়ি।'

ম্লান হাসে দীপ্তি। তার ভেজা চুল থেকে টপ করে এক ফোঁটা জল গালের ওপর গড়িয়ে পড়ে।

আমি জানি তুমি কি করবে। মিছি-মিছি পয়সা নষ্ট করবে। এটা কিনবে সেটা কিনবে আমার জন্যে। আমাকে এখনও ভাবছো একটা বাচ্চা মেয়ে।

ঠিক বলেছো দীপ্তি। তোমার সঙ্গে সেই যে প্রথম এপয়েন্টমেন্ট, মিউসিয়ামের সামনে, মনে আছে? কি গরম হাওয়া বইছিল....

দীপ্তি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, তুমি আর এসো না। এখনও চলে যাও। উত্তেজনায় তার পাতলা মুখখানা আরও ছুঁচলো লাগে। শ্যালক গিন্নী ঘরে এসে ঢোকে। সঙ্গে তার বড় ছেলে, ইঞ্জি-নিয়ারিং পড়ে।

সেদিকে চেয়ে নন্দ আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে।

এবং সেই আসবার মুহূর্তে টের পায় কোথায় যেমন প্রচণ্ড অমিল আছে তার এবং দীপ্তির মধ্যে তেমনি কোথাও এক প্রচণ্ড মিল আছে।

নন্দ বসুর হঠাৎ খেয়াল হয় মাইকে সেই দীক্ষিত ভজন স্তব্ধ। উল্টোদিকে পাহাড় আর জঙ্গলের মাথায় মস্ত বড় চাঁদ। ঐ পাহাড় আর জঙ্গলের গা দিয়েই বালির পাশে চিকচিকে গঙ্গার মৃদু ধারা বয়ে চলেছে না? এবারে বেশ শীত শীত করে ফাল্গুনের হাওয়া। এই ফাল্গুনেই তাদের দুজনের জন্ম। তারা আপোসে একটা দিনেই দুজনের জন্ম দিন করত। মুর্গীর ড্রাই কারি অপূর্ব রাঁধে দীপ্তি। এই ফাল্গুনের হাওয়ায় সেই ড্রাই কারির গন্ধ পায় নন্দ। কোথাও একটা গণ্ডগোল যখন আছে তেমনি প্রবল মিলও আছে তাদের মধ্যে এই কথাটা যদি তারা দুজনে বুঝতে পারে তাহলে আর সব ভাবনা ছোট হয়ে যায়। সেই বোম্বাই মত প্রায় অলৌকিক ঘটনা কি ঘটবে তাদের জীবনে?

দুই

গঙ্গার হাওয়ায় কি খিদে বাড়ে? সকালের খাওয়া ভালো হয় নি। একটা 'ছমছাম মডার্ণ' দোকান ট্রাই করেছিল। এক হাতা ভাত, এক হাতা ডালের জন্যে আলাদা চার্জ। কাউন্টারে পয়সা গুনছিল সালোয়ার-কামিজ পরিহিতা তরুণী এবং ফিল্মের গান গাইছিল গুন গুন স্বরে। পকুরি আর ফুলকপি গাজর সাজানো দোকানগুলো পার হয়ে সে তাদের ধর্ম-শালার সামনেই একটা দোকানে ঢুকে পড়ে। কাঠের বেঞ্চিতে বসে থাকা অনেক পুরুষ-রমণীর ভিড় দেখে বেরিয়ে আসছিল এমন সময় ঘামে ভেজা তেলচিটে ময়লা গেঞ্জিপরা নাদুসনুদুস পণ্ডিতজী হাঁক দিল, আইয়ে আইয়ে।

পাশেই গনগনে কাঠের জালে ফুলকো রুটি সেঁকা হচ্ছিল। এখানে ডাল সবজির জন্যে আলাদা চার্জ নেই। নন্দ বোস পরমানন্দে সাঁটায়। চাপা হাসি খেলে তার ঠোঁটের পাশ দিয়ে। বিরহে কি খিদে বাড়ে?

কাল ভোরেই নিশ্চয় চব্বিশ নম্বরের লোকেরা টানাটানি লাগাবে। অবশ্য তার নিজেরই আর এক একবার লছমনঝোলা যাবার ইচ্ছে হয়েছিল। লছমনঝোলার পুলের সামনে পনেরো বছর আগে তোলা তাদের হনিমুন ফটোগ্রাফ এখনও তার শোয়ার ঘরে। কয়েকদিনের জন্যে নামিয়ে ফেলেছিল। যখন তার বড় শ্যালক তাকে ফোনে জানায় যে তার দিদি তারই পরিচিত দয়ানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে দীক্ষা নিতে চলেছে তখনই সোজা ফটোগ্রাফটা নিয়ে ছাতের চিলেকোঠায় ফেলে এসেছিল। আবার তিন চারদিন যাবার পর নামিয়ে আনে।

দয়ানন্দ বা টাবু মুখার্জীকে সে বোঝে। টাবুর সঙ্গে পার্ক স্ট্রীটে অলি-ম্পিয়ায় সে অনেকদিন মাল খেয়েছে। খুব দামালে ছেলে ছিল টাবু। ভীষণ হল্লাবাজ আড্ডাবাজ টাবুর টপ করে বউটা মারা গেল। পনেরো ষোলো বছরের চাকরী আর তিনতলা পৈতৃক বাড়ি ফুঁকে দিয়ে সে কয়েক বছর হোল দয়ানন্দ স্বামী হয়েছে, হরিদ্বারে কংখলে এক বাবাজীর কাছে দীক্ষা নিয়েছে। তাদের কাগজের অফিসে প্রায়ই আসত টাবু। ঘোরতর রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করত, কংগ্রেস কমিউনিস্ট, প্রত্যেক পার্টির আভ্যন্তরীণ রাজনীতি, অন্তর্দ্বন্দ্ব—এগুলো নিয়ে তারই সিনিয়ার সহকর্মী রাধুদার সঙ্গে মেতে উঠত। তারপর সব ফক্কা। অফিসেও বেশ সাকসেসফুল ছিল টাবু, দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করার পথও কিছু দুর্গম ছিল না, কিন্তু এখন সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে বৈরাগ্য। মানে আর কোনরকম ঝামেলার মধ্যে না যাওয়া। এই ধরণের আত্মপ্রবঞ্চনা নন্দ বসুর কাছে অসহ্য।

(আগামী সংখ্যায় শেষ হবে)

হাওয়া গাড়ি

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

।। আট ।।

দমদম এয়ারপোর্টে ইণ্টারন্যাশনাল আর ডোমেস্টিক ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জাররা এখন একই ট্রানজিট লাউঞ্জে বসে ফ্লাইট অ্যানাউন্সমেন্ট শুনছিল। ওপথ একদম না মাড়িয়ে স্যার লেজলির জিপ রানওয়ে দিয়ে ছুটলো। স্টিয়ারিংয়ে লেজলি স্বয়ং। হুড গোটানো গাড়ির পেছনের সিটে একা দিলীপ। উইণ্ডস্ক্রীন ভাঁজ করে বনেটে শোয়ানো বলে লেজলির পাশে বসা ম্যাক্সীর মাথার চুল নীলচে স্কার্ফের বাঁধুনির বাইরে বাইরে যতটা পারে উড়ছিল। বেলা আটটাও বাজেনি। প্রথম বর্ষার ভিজে রোদ্দুর।

একটা ছোট মত প্লেন তখন তিন নম্বর হ্যাঙ্গারের বাইরে বেরিয়ে গা গরম করছে। কান ফাটানো আওয়াজ। ককপিটের সাইডস্ক্রিন সরিয়ে হাসিমুখে একটা লোক বুড়ো আঙুল দেখালো।

গ্যাংওয়ে দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে লেজলি জানালো, আমাদের কোম্পানীর আরও চারখানা প্লেন এই ইস্টার্ন সার্কেলে রোজ উড়ছে। চা, সার, ডিস্টিলারি—সব জায়গাতেই আমাদের ইনস্পেকশন থাকে। কম্যুনিকেশন একটা বড় ব্যাপার।

ছোট হলে কি হবে—এয়ার লাইন্সের প্লেন থেকে ভেতরটা অনেক বেশি সাজানো। লেডি লেজলি ইণ্ডিয়ায় থাকলে এটা ইউজ করেন বলে ভেতরের ডেকরেশন তারই পছন্দমত হয়েছে।

দশ মিনিটের ভেতর পাইলট সমেত ওরা চারজন এয়ারবোর্ন হয়ে গেল। নিচে যশোর রোডে গরুরগাড়ির লাইন। [illegible]

দলা পাকানো মেঘের মাথাগুলো বিশাল বিশাল আইসক্রিম। পাইলট কি একটা বোতাম টিপে দিতেই পিয়ানোর সুন্দর সুর।

দিলীপ জানে এবারে লেজলিকে গাঁথতে পারলে—কয়লা সাপ্লাইয়ের কড়ারে বড় করে শেয়ার ধরাতে হবে—তাহলেই তার কাজ শেষ। এ কাজ আর সে করবে না। এই ডিলটা কমপ্লিট হলেই ছুটি। তারপর দিলীপ তার কমিশনটা ফিকসডে রাখবে। কিংবা স্মল সেভিং-এ। সাত বছরে দ্বিগুণ করে নিতে পারলে কে আর এই কবন্ধ গলির ভেতর ঘোরাফেরা করবে। সে তখন স্বাধীন। পুরোদস্তুর স্বাধীন। নয়তো যে, খাদান আর বড় হতে দেওয়া হবে না—তার জন্যে নেশায় নেশায় ঘুরে মরা কেন?

লেজলি বলছিল, টি ইণ্টারেস্ট গড়ে উঠেছিল—তার বাবার ঠাকুর্দার আমলে। ডিস্টিলারি ওদের এক সেঞ্চুরির ওপর। ফার্টিলাইজার এই কয়েকবছর হোল ওদের কাছে নতুন আইটেম। একসপ্যানশন চলছে।

এক একটা মাঠের ভেতর পারফোরেটেড স্টিল পেতে দিয়ে টেম্পোরারি এয়ারস্ট্রিপ গড়ে তোলা হয়েছে। সাতশো আটশো একরের এক একটা চাবাগান থেকে খানিক খানিক জায়গা বের করে নিয়ে ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ড। তারই একটায় লেজলির প্লেন নেমে পড়লো।

নিচে তখন ছিল দমদম। এখন বড় বড় পাহাড়ি গাছের মাথা। দূরে - যাকে বলে দিগন্ত সেখানে রবার দিয়ে মোছা একটা পাহাড়ের অউটলাইন। পেছনের চাকায় মাটি ছুঁয়ে প্লেনটা দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে থামলো।

বাইরে তাকিয়ে দিলীপ অবাক। এ যে রূপকথার জগৎ। প্লেনটার নাকের কাছে একটা তাঁবুর শুরু। তার পর্দা তুলে একজন নেপালী হাসিমুখে একটা ফ্ল্যাগ নাড়ছে। লেজলি বলে উঠলো, আমাদের কোম্পানীর ফ্ল্যাগ। নর্থ ইস্ট ইণ্ডিয়ায় অনেক জায়গায় এ ফ্ল্যাগ দেখতে পাবে।

তারকাঁটা দিয়ে ঘেরা এয়ারস্ট্রিপের বাইরেই ঝকঝকে পিচ রাস্তার শ্লেট। বেলা সাড়ে নটা হবে। বর্ষাকালের রোদ্দুর এখানে কলকাতার চেয়ে নরম। গ্যাংওয়ে দিয়ে নিচে নামতেই ছবির মত অ্যাম-ব্যাসাডর। ড্রাইভারকে সরিয়ে লেজলি স্টিয়ারিংয়ে বসল। নিয়ারেস্ট গার্ডেন আনাদার হাফ অ্যান আওয়ার্স ড্রাইভ। কথা শেষ না হতে হতে লেজলির হাতে গাড়িটা খানিক ব্যাক করে সামনের পিচরাস্তা ধরে ফেললো।

দিলীপ বুঝলো, স্বাতী নামক টোপটি এই পঞ্চাশ-একান্ন বছরের তরুণটি গিলেছে। এখন লেজলি এরোপ্লেনের স্টাইলে গাড়ি চালাবে। এবারও দিলীপ পেছনের সিটে একা। লেজলি এতক্ষণ সরল ইংরিজি, খানিক হিন্দী—দু-একটা বাংলা শব্দ দিয়ে কথা চালাচ্ছিল। বর্ষা শুরুর ভিজে বাতাস। কোথাও রোদ। কোথাও বা ভিজে রাস্তা। আবার খানিকক্ষণ চাবাগান। এসব সিনিক বিউটি কেন যে বাংলা সিনেমায় তোলা হয় না—দিলীপ তার কারণ খুঁজতে গিয়ে কোন হদিশ পেল না।

কোথায় কোল ইণ্ডিয়ার অফিস। কোথায় পাণ্ডবেশ্বর এরিয়ায় ভৌমিক খাদান! আর কোথায় এই গার্ডেন এলাকা—তার ভেতর দিয়ে অ্যামব্যাসাডারটা ছুটছে—একদম জজ সাহেবের নাতনী। কোন চিন্তা ভাবনা নেই। স্বাতীর একখানা হাত স্যার লেজলির কাঁধে। দুধারে গাড়ির জানলায় শুধু ছবির পর ছবি। এই ছায়া, এই রোদ—খানিকটা বৃষ্টি ছাঁট—সব মিলিয়ে—দিলীপের মনে হচ্ছিল—আমাদের নিয়ে কোন সিনেমার স্যুটিং হচ্ছে।

হঠাৎ কখন গাড়িটা পিচরাস্তা ছেড়ে বাগানের ভেতরকার প্রাইভেট রোড ধরেছে—তা দিলীপ বা স্বাতী টেরও পায়নি।

স্বাতী বললো, কোথায় এলাম?

ইউ আর অলরেডি ইন দ্য লেজলি গার্ডেন।

একটা জিনিস দেখে দিলীপ তা এই-মাত্র বুঝতে পেরেছে। উল্টোদিক থেকে যেই সাইকেলে আসছিল—সেই গাড়ি দেখে সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়াচ্ছিল।

স্বাতী বললো, চারদিক তো খুব নিট অ্যাণ্ড ক্লিন।

আই বেট এ রুপি ফর এ উইড। বলেই লেজলি হাসতে হাসতে বললো, একটা চা-গাছের নিচেও একটা ঘাস বা আগাছা লতাপাতা দেখতে পারবে না। ওসব থাকলে চা-গাছের ইল্ড পার একার কমে যায়।

দিলীপ বললো, চা-গাছ? না—চায়ের ঝাড়?

টি ইজ এ ট্রি টেণ্ডেড ইনটু বুশ। গাছের মত বাড়তে না দিয়ে কেটে ছেঁটে ঝাড় বানিয়ে রাখা হয়। ওই যে মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ দেখছো—ওগুলো রাখা হয়েছে—চায়ের ঝাড়কে ছায়া দিতে ওসব গাছ বুড়ো হলে কেটেকুটে জ্বালানী বানানো হয়। আমার কাজ শেখানোর জন্যে প্রথম এরকম একটা গার্ডেনে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার করে পাঠানো হয়েছিল। তিরিশ বছর আগে।

লেজলির মুখে কথাটা শুনে দিলীপ মনে মনে আন্দাজ নিল—লেজলির তাহলে অন্তত পঞ্চাশ। হাড়ে মাসে সাঁতার কাটা কাঠামো। কটা কটা চোখ আর চুল দেখে তো ওদের বয়স ধরা যায় না।

গাড়ি এসে থামলো একটা বিরাট বাংলোর সামনে। জনা তিরিশেক অধস্তন কর্মচারী লাইন দিয়ে দাঁড়ানো। তাতে নেপালী, পাঞ্জাবী, বাঙালীবাবু—সবরকমই আছে। প্রায় এদের গার্ড অব অনার নিয়েই স্বাতী লাফাতে লাফাতে বারান্দায় উঠলো। অন্তত এক বিঘের বারান্দা। বিরাট থামের গেট। ভেতরে বসার ঘর মানে—হলঘর। যা কিছু— সবই বড় বড়।

ওই বারান্দাতেই ব্রেকফাস্টের টেবিল পড়লো। মধুতে ভিজিয়ে শুকনো জ্যাম। আনারসের ঘন রস। কত কি। খেতে খেতে স্বাতী বললো, বাড়িটা ঘিরে ও কিসের খাল?

বুনো হাতি বেরোয় রাতে। তাদের আটকাতে খুঁড়ে রাখা হয়েছে। বারান্দায় উঠতে লোহার পুল পেয়েছো?

লক্ষ্য করিনি তো।

লেজলি বললো, ডিনারের পর দেখো। দিনে ওই লোহার পুলটা গরু ছাগল আটকায়। পার হতে গেলে লোহার জালে পা আটকে যাবে। তাই ও পুলের নাম কাউ ক্যাচার। রাতে কিন্তু পুলটা আমরা তুলে নিই। তখন বুনো হাতিও এদিকে আসতে পারবে না। আমরাও কেউ ওপারে যেতে পারবো না।

অতবড় পুল? তোলা যায়?

ইলেকট্রিক্যালি অপারেটেড। দরকার হলে লোক দিয়েও তোলা যায়। এই বাড়িতে সিকিউরিটির জন্যে অন্তত তিরিশজন গার্ড আছে।

ব্রেকফাস্টের টেবিলেও শেয়ার নিয়ে কথা বলা গেল না। মানে—দিলীপ তুলতে পারলো না। এত এলাহী কাণ্ড। এ গার্ডেনটা বোধহয় বারোশো একর। ব্রেক-ফাস্টের টেবিলে বসে যতদূর দেখা যায়—শুধু ওয়েলট্রিমড চায়ের ঝাড়। তার ভেতরে কোথাও ট্রাক্টর দিয়ে লোহার চেন বেঁধে ষাট বছরের বেশী বয়সী চা-গাছ উপড়ে ফেলা হচ্ছে। সেখানে নতুন চারা বসবে।

লেজলি বললো, চা-গাছের জীবন মানুষেরই মত। কৈশোর, যৌবন, ওল্ড এজ—সবই আছে। একদিকে গাছ বুড়ো হচ্ছে। অন্যদিকে নার্সারিতে চারা বড় হচ্ছে। জায়গা খালি হলেই চারা গাছ তুলে নিয়ে সেখানে বসানো হচ্ছে: যাকে বলে চায়ের সংসার।

ঘুরে ঘুরে এই সংসার দেখতে বেলা এগারোটা বেজে গেল। মেয়েরা চায়ের পাতা তুলে ঝুড়িতে রাখছে। একদল পুরুষ ট্রাকটরে চষা মাটিতে চারা বসাচ্ছিল। নারসারির জায়গাটা ছায়াঘেরা। সেখানে দশ লক্ষ চারার আয়োজন। চাবাগান মানে একটা রাজত্ব। স্যার লেজলির কথা শুনছিল—আর স্বাতীর মনে হচ্ছিল—এ কোথায় এলাম। দূরে ড্রয়ার মেশিনে চা শুকোনো হচ্ছে। একদিকে সারি সারি কোয়ার্টার। জাদরেল এমপ্লয়ারের ভঙ্গীতে স্যার জানালো, ফুয়েল, ইলেকট্রিসিটি, মেডিক্যাল এডুকেশন, থাকবার জায়গা ফ্রি। সেই সঙ্গে সস্তায় রেশন। সাবসিডাইজড প্রাইসে।

দিলীপ বুঝলো, এটা একটা এম্পায়ার। সেই সকাল থেকে স্বাতী একবারও লেজলির কাছ ছাড়া হয়নি। লেজলিও হাঁটছিল, বসছিলো একটা হাত স্বাতীর কোমরে দিয়ে।

আবার পেল্লায় বাড়িটায় ফিরে ওরা যে যার ওয়াশ থেকে যখন বেরুলো—তখন কয়েক মিনিটের জন্যে স্বাতীকে একা পেল দিলীপ। কোথায় আছো ?

স্বাতী বললো, বুঝতে পারছি না—কোন ঘরে রেখেছে। তুমি কোন ঘরে ?

দিলীপ বললো, আমিও বুঝতে পারছি না—কোন ঘরে আছি। এ বাড়ির ঠিক কোন জায়গাটায় আছি। শেষ পর্যন্ত প্রাণ হাতে নিয়ে এবাড়ি থেকে বেরোতে পারলে হয়।

আমাকে শুতে দিয়েছে একদম মহারানীর খাটে। বলতে বলতে স্বাতী হলঘরের আয়নায় গিয়ে নিজের মাথার অগোছালো চুলগুলো ঠিক করে নিল। ওর গা দিয়ে অসম্ভব সুগন্ধী ছড়িয়ে পড়ছিল।

দিলীপ বলে ফেললো, স্বাতী তুমি খুব দামী।

কি বাজে বকছো! বলেও স্বাতী তার মুখে খুশীর ভাবটা ঢেকে রাখতে পারলো না। সেখানে বিউটিসিয়ানের পাকা হাতের প্রলেপ।

তোমার জন্যেই স্যার লেজলি উড এত কাণ্ড করছে। নয়তো একজন কোম্পানী চেয়ারম্যান শহর ছেড়ে গার্ডেনে এতটা সময় দিতে পারে ?

আমাকে দেখলেই তোমাদের মাথা খারাপ হয়ে যায় ? তাই না।

আমি তোমাকে আবার হারাবো স্বাতী। আমি সিওর। তুমি দেখে নিও।

তা যখন জানো—তবে তুমি এলে কেন ? আমাকে আনলে কেন ? এখানকার ভিজে বাতাসে আমার স্কিন খারাপ হয়ে যাবে। আগে জানলে আমিও আসতুম না। হিউমিডিটি বেশি।

স্যার লেজলির প্রাইভেট পুলে তোমাকে দেখে আমার কিন্তু ওসব মনে আসেনি স্বাতী।

সেখানেও তো তুমিই নিয়ে গিয়েছিলে—আমি তো এদের কাউকে কোনদিনই চিনতাম না। তোমার শেয়ার তোমার খাদান। তোমার বন্ধু—ঋষিবাবু।

দিলীপ চুপ করে গেল। সে এখন জানে না—তার জোগাড় করা শেয়ারে সত্যি সত্যিই খাদান বাড়ানো হচ্ছে কিনা। একদিন সে যা ঠাট্টা করে বলেছিল—এই দেড় দু বছরে তা সত্যি হয়ে দাঁড়ালো। এখন দিলীপ জানেও না—ভৌমিক ট্রাস্টের খাদানের ভেতরকার ডিসিশনগুলো কেমন। সেসব ঠিক করে ঋষি, অনন্ত, গোকুল দত্ত মিলে। তার বেলায় থাকে শেয়ার প্রিমিয়ামের কমিশন। সে এখন কমিশনের একজন পাকা দালাল। কোল ইণ্ডিয়ার অফিসে তার একটা চাকরি আছে। সেখানে তার জন্যে টেবিল, চেয়ার, টেলিফোন আছে।

তুমিই তো স্যার লেজলির সামনে আমায় তুলে ধরলে। কো-অপারেট করতে বললে। আর সত্যিই তো লেজলি উড ফেণ্ডলি। বেচারার বউ কি বছর সাত-আট মাস দেশে কাটায়। বেচারা।

লোকালয়ের বাইরে দিলীপ এখন চারিদিকে আরামের আয়োজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছিল তার ফেরার রাস্তা বন্ধ। সে এখন এখানে সম্পূর্ণ লেজলির দয়ায় আছে। কারণ, বেরোতে গেলেও স্যার লেজলির দরকার হবে। কাছাকাছি বিশ মাইলের ভেতর কোন শহর নেই।

দিলীপ একবার শুধু মনে মনে বললো, আমি মিশতে বলেছি বলেই—অতটা মিশবে ? আমি তো বলিনি, সাঁতারে নেমে তুমি ওর পাঁজাকোলে ওঠো। তোমার তো কোথাও বেঁকে দাঁড়িয়ে আপত্তি করা উচিত ছিল। নো লেজলি। নিস ফার অ্যাণ্ড দাস ফার। তুমি ভীষণ নটি—বলেও তো মেয়েরা সরে আসে। কঠিন কথা বলতে হোত না—অথচ মধুরে মধুরে কাজও হোত। —এমন তো করার পথ ছিল। ছিল না কি স্বাতী ?

কিন্তু এর কোন কথাই দিলীপ মুখে আনতে পারলো না।

সিঁড়ি ভেঙে একজন উর্দি আঁটা বেয়ারা ছুটে ওপরে এলো। সাহাব সেলাম দিয়া—

তোমাদের সাহেব কোথায় এখন ?

সাংকোচ নদীতে বসে আছেন। মাছ ধরবেন। আপনাদের জন্যে গাড়ি পাঠিয়েছেন।

দিলীপ স্বাতীকে বললো, তুমি ঘুরে এসো।

তা হয় না।

আমি বলছি—তুমি ঘুরে এসো। খানিকবাদে আমিও যাবো। বেয়ারাকে বললো, জায়গাটা এখান থেকে কতটা দূর হবে ?

তা তিন মাইল। মেমসাহেবকে পৌঁছে দিয়েই ফের আসবো। ওখানেই তো রান্না হবে—নদীর পাড়ে। আপনারা গাছতলায় বসে লাঞ্চ করবেন। ফিরে এসে আপনাকে নিয়ে যাবো।

আবার সেই বনেটে ভাঁজ করে শোয়ানো উইণ্ডস্ক্রীন। হুড গোটানো জিপ। স্কার্ফ জড়ানো স্বাতীর মাথাটা সবুজ চাবাগানের ভেতর মুহূর্তে হারিয়ে গেল।

চোখের সামনের আকাশে সেই পাহাড়টার ফিকে আউটলাইন। মেঘে মিশে আছে। জায়গাটা নাকি ভুটানে। ভুটান পাহাড়। সেখানকার বরফগলা জল নেমে এসে এখানে সব নদী হয়েছে। ভরা বর্ষায় পাহাড় গুঁড়িয়ে—ধসিয়ে নিয়ে নদীগুলো নামে। গাছ ভেসে আসে। খাবারের অভাবে তখন বুনো হাতির পাল বেরিয়ে পড়ে। কখনো দল বেঁধে ওরা হাইওয়ে ক্রস করে। ব্রেকফাস্টে বসে স্যার লেজলিউড এসব বলেছিল—আজই—খানিক আগে।

সেই প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে দিলীপের মনে হচ্ছিল—এই নির্দোষ দৃশ্যে সবুজ চাবাগান—পার্টিকলে রঙের মেঘ মাখানো পাহাড়—নীলচে রঙের নদী—এর ভেতর এত ভাঙচুর—এত ব্যবসা—হাতিদের এত খিদে।

আর আমি শুধু শেয়ারের পেছনে ছুটে চলেছি। কলকাতার একটা অফিসে আমার জন্যে একটা টেবিল আছে। সেখানে আমাকে বাড়তে দেওয়া হবে না। আমি ফাঁকি দিলে দেখার কেউ নেই। সেই অবস্থায়—আমাকে নিয়ে আমার সন্তুষ্ট থাকতে হবে। লয়ালটি! ডিসিপ্লিন!! বাঙ্গোং!!! খাদানে শেয়ার আসবে—আমি দলালি পাবো—কিন্তু খাদান বড় হবে না। চমৎকার! পাণ্ডবেশ্বর এরিয়ায় কোল ইণ্ডিয়াকে জব্দ করার রাস্তা পেয়েও সে সুযোগ ইউটিলাইজ করা যাবে না। কেন ? কেন ? এমন হয় কেন সব ? আমি বুঝি না। ঋষি, তুই মাতাল হলে একটা গান গাইবি। তবু তুই কোল ইণ্ডিয়ায় গুড বয় হয়ে থাকতে চাস ? হোয়াই ? এ আমার কাছে এক রহস্য ঋষি। তুই বেশ ফাইন বলিস। দিলীপ! আমাদের এখন ঝুঁকি নেবার মত বয়স নেই। আমাদের বয়স হচ্ছে। হোত দশ বছর আগে—তাহলে খাদান বড় করা যেত। এখন আর হয় না দিলীপ।

যত বাজে কথা। আসলে ঋষি তুই কোল ইণ্ডিয়াকে বে-ইজ্জৎ করতে চাস না। শুধু পাণ্ডবেশ্বর এরিয়ার স্কেল ইণ্ডিয়ার সেল পড়ে গেলে বাছাধনেরা হাই মধুসূদন ডাক ছাড়তো। সে সুযোগ হাতে পেয়েও ছেড়ে দিচ্ছিস। কারণ ? আমরা নাকি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। ঝুঁকি নেবার আর বয়স নেই। অদ্ভুত যুক্তি। দৌড়ে ছুটে গিয়েও আমরা লং জাম্প দেব না।

দিলীপের চোখের সামনে সবুজ চা-বাগানে একটা বড় শাদা রঙের পাহাড়ি পাখি এসে বসলো।

সাংকোচ নদীর পাড়ে পৌঁছে দিলীপ দেখলো, জনা ছয়েক বেয়ারা মিলে তিনজনের লাঞ্চ সাজাচ্ছে। ডজনখানেক ট্রাউট মাছ বড় তাওয়ায় ভাজা হচ্ছে। মাথার ওপর রুপোলি মেটাল খুঁটিতে টানানো সামিয়ানা। বাতাসে টাটকা মাছ ভাজার সুগন্ধ।

দিলীপকে দেখে স্যার লেজলিউড বাঁ হাত তুলে বললো, হাই—

দিলীপও সেরকম একটা উঁচু আওয়াজ বের করলো নিজের গলা থেকে।

স্যার লেজলির ডান হাতে তখন বেজক্রিয়ান ফাইবার ছিপ। সামনে নীল-গেরুয়া রঙের সাংকোচ নদী। পাশে স্বাতী। বড় একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর স্কার্ফ পেতে বসেছে। দুজনেরই সামনে কয়েকটা আধো-খোলা বিয়ার।

দিলীপ এগিয়ে যেতেই একজন বেয়ারা একটা বিয়ার খুলে দিল। কোন গ্লাস নেই। বোতল—বোতল সই। উপুড় করে তাই মুখে লাগালো দিলীপ। স্যার লেজলি তখন সোনালী রংয়ের ধাতব টোপটা ডান হাতে নিয়ে আবার নদীতে ছুঁড়ে দিল। বড় বড় বোল্ডারের চারদিকে চক্কর দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছিল। স্বাতী একবারের জন্যেও দিলীপের দিকে তাকালো না।

রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের এই ট্রিপের রাইট প্রচণ্ড শক্তি থাবে দাঁড়িয়ে।

দুপুরে ভরপেট খাওয়ার পরেই ওদের নিয়ে স্যার লেজলি আবার এয়ারস্টিপে ছুটলো। মুখে বললো, ডিলিপ—উই উইল হ্যাভ্ অ্যানাদার হপ্। আমরা কয়েকটা গার্ডেন মিলে জায়গা ছেড়ে দিয়ে গলফ্ কোর্স করেছি। সবুজ ঘাসে ঢাকা টোয়েন্টি সেভেন হোল কোর্স। পাশেই প্লান্টার্স ক্লাব। ইচ্ছে হলে টেনিস খেলতে পারো।

আমি খেলতে জানি না স্যার লেজলি।

কি স্পোর্ট। ও আবার জানা লাগে নাকি! আমি তো কোনদিন শিখিনি। অথচ খেলে থাকি।

তোমার ভেতরে কত শক্তি স্যার লেজলি। তুমি ইচ্ছে করলে সব পারো।

মনে হচ্ছে ডিলিপ—তোমাদের কয়লা আমাকে কিনতেই হবে।

না। না। তেমন কোন কথা নেই তো। আমি তোমার ভেতরকার ভাইটালিটির কথা বলছিলাম।

সত্যি! স্বাতী কি তা স্বীকার করে?

দুজন পুরুষ এবার একসঙ্গে একজন মেয়েলোকের দিকে তাকালো। স্বাতী তখনো বেশি বিয়ারের ঝোঁকে খানিকটা আলুথালু। সেই অবস্থাতেই স্যার লেজলির পিঠে একটা চড় দিল।

দিলীপ বুঝলো, কাজ হয়েছে। স্যার লেজলি সারা বছরের কয়লা নেবেই। মুখে বললো, জায়গাটা এখান থেকে কতদূর?

গলফ্ কোর্স? একশো মাইলের কিছু বেশি। লেস দ্যান হাফ অ্যান আওয়ার্স ফ্লাইট।

আবার পাইলট। আবার আকাশে। ল্যান্ডিংয়ের সময় পেছনের টায়ার মাটিতে পাতা লোহার প্যারাপেটে শব্দ তুললো। যাকে বলে হপিং অ্যারাউন্ড। চারদিকে চা বাগান। মাঠের পর মাঠ জুড়ে গলফ্ কোর্স। পাশেই প্ল্যান্টার্স ক্লাবের হার্ড কোর্টে টেনিস চলছিল। যারা খেলছিল—তারা কেউই তিরিশ মাইলের ভেতর থাকে না এক একজন এক একটি গার্ডেনের সর্বময়। তাই এ-ক্লাবে খাবার জলের কাচের গ্লাসও অন্য কায়দার।

তাই এখানে দিলীপ ভিজিটর বিংবা অনলুকার থেকেই গেল। টাটকা চেহারার ম্যানেজাররা ভারি র‍্যাকেট দিয়ে টেনিস খেলছিল। পাশেই ক্লাব ঘরে অঢেল ড্রিংকস। লাগোয়া গলফ কোর্সে সাদা জুই রংয়ের গলফ বল পিটিয়ে স্যার লেজলি মনোযোগ দিয়ে স্বাতীকে খেলাটা শেখাতে লাগলো। বল-কুড়োনি বালকরা মাঠময় ছুটে ছুটে সারা।

আবার ফ্লাইট। আবার হুড়খোলা জিপ। লেজলি-গার্ডেনে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল। তখন বাগানের গাছপালায় মেঘভাঙা জ্যোৎস্না। ভিজে বাতাসে ঠান্ডা ছিল বলে বসবার ঘরে ফায়ার প্লেসে আগুন।

সে-আগুনকে পেছনে রেখে স্যার লেজলি বললো, ডিলিপ—টেক রেস্ট টু-নাইট। কাল দুপুরে আমরা এখান থেকে আড়াইশো মাইল দূরে আমাদেরই আরেকটা গার্ডেনে যাবো। সবটাই অলীক লাগছিল দিলীপের। বাইরে ঠান্ডা বাতাসে মাইলের পর মাইল চা-গাছ অপরূপ দুলছে। ভেতরে ফায়ারপ্লেসের সামনে একজন কোম্পানী চেয়ারম্যান গ্লাস হাতে। স্বাতী অফুরন্ত হাসছিল। কথা বলছিল। বোধহয় নেশা হয়ে গেল এইমাত্র। একদম অজানা বাড়ি। কোথায় কোন ঘর কে জানে। তারই একটায় মহারানীমার্কা খাটে স্বাতী আজ রাতটা ঘুমোবে।

কলকাতার টেলিফোন ধরতে স্যার লেজলি পাশের ঘরে যেতেই দিলীপ নিজের গ্লাসটা কাচের টেবিলে রাখলো শব্দ করে। তারপর আলুথালু স্বাতীর দিকে সোজা তাকিয়ে এগিয়ে গেল। হাতের গ্লাসটা কেড়ে নিয়ে সেটাও দিলীপ শব্দ করে কাঁচের টেবিলে রাখলো।

কি হোল? অমন করছো কেন?

দিলীপ কোন জবাব না দিয়ে সোজা-সুজি স্বাতীকে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিলো।

পরিণাম দাঁড়ালো বিপরীত। স্বাতী হেসে জানতে চাইলো; কেন? টোপ তো দিয়েছো। এখনো গেঁথে তুলতে পারোনি। এ বড় শক্ত মাছ। টোপ গিলেই তলিয়ে যায়। তাই না?

দিলীপ বুঝতে পারছিল না, স্বাতী ভান করছে? না—সত্যিই ওর নেশা হয়েছে?

হাতে সময় বড় কম। টেলিফোন সেরে স্যার লেজলি এখুনি ফিরে আসবে। আর একবার স্বাতীকে ঝাঁকুনি দিলো। এ বাড়ির ঠিক কোন্ ঘরটায় তুমি আছো? ঠিক করে বলো।

আমি কি ছাই জানি। কত ঘর এখানে। আমিও তো তোমারই মত নতুন।

মনে করার চেষ্টা করো স্বাতী।

কেন? এরই ভেতর জেলাস!

ও ঘরে রিসিভার রাখার শব্দ। ফায়ার প্লেসে ফাঁপা কয়লা শব্দ করে ফাটলো। চারদিকে নিশুতি রাতের ফাঁকা ফাঁকা ভাব। স্বাতীকে ছেড়ে দিয়ে দিলীপ নিজের জায়গায় ফিরে এলো।

ডিনারের পর সবারই চোখ জড়িয়ে আসছিল। আজই শেষরাতে কলকাতায় বিছানা ছেড়ে উঠতে হয়েছে।

দিলীপের ঘুম ভাঙলো বেশি রাতে। হাতি বা বুনো শুয়োরের চিৎকারে নয়। কিংবা কোন পাহাড়ি ময়ূরও ডেকে ওঠেনি।

মানুষের হাসিতে—কথায়—ঘুম ভেঙে গেল দিলীপের। উঁচু প্লিন্থের ওপর গেঁথে তোলা বাড়ি। জানলাটা খুলতেই ঝিলিক দিয়ে জ্যোৎস্না ঢুকে গেল দিলীপের চোখে। তখনো যাকে বলে মানুষের কল-হাস ভেসে আসছিল।

জানলাটা আরেকটু খুলতেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল দিলীপের। এখন নিশুতি রাত। লম্বা টানা সিঁড়ির ধাপে দুটি স্বর্গ-খেলনা প্রায়।

স্বাতী লেজলি—দুজনেরই গায়ে কিছু নেই। স্বাতীর সে ঝিকন এ আলোয় বোঝা যায় না। এক একটা ধাপ উঠছে। তার [illegible]

লেজলি। বাইশ হাজার স্টাফের চেয়ারম্যান। গলায় নিশুতি রাতের ঠান্ডা বাতাস।

এক অদৃশ্য সুইমিং পুলেই যেন বুক জলে দাঁড়িয়ে ছিল লেজলি। গার্ডেনের সরু এক চিলতে রাস্তায় জলের বদলে জ্যোৎস্না। তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে লেজলি দুহাতে স্বর্গখেলনা পাঁজাকোলে তুলে নিল। শূন্যে ওঠা অবস্থায় বাঁপায়ের বুড়ো আঙুলের নখে স্বাতী খানিকটা তরল জ্যোৎস্না চারদিকে ছিটিয়ে দিল। তারপরই ওরা দুজন গাছপালার অনেকখানি ছায়ায় ভেতর পড়ে গেল। অন্ধকার কুঁড়ে কুঁড়েও আর কিছু দেখতে পেল না দিলীপ। শুধু একবার চাপা কলহাসি ভেসে এসেছিল বোধ-হয়। অনেকদূরে থেকে। ততক্ষণে জানলা টেনে দিয়ে দিলীপ বসু শুয়ে পড়েছে।

ঘুম ভাঙলো কিন্তু খুব ভোরে। জানলা খুলেই দেখলো, মুগার সুতো বসানো একখানা তাঁতের শাড়ি পরে স্বাতী লনে পড়ে থাকা শিউলি কুড়োচ্ছে। দূরে বাঁবিপাড়ার বাস যাচ্ছিল। স্বাতী ঝুঁকে পড়ে কুড়োচ্ছে। আঁট করে বাঁধা চুল। শাড়ির নিচের দিককার পাড় ভোরের শিশিরে ভিজে উঠেছে।

লেজলি নিশ্চয় এখনো বিছানায়। দিলীপ ঠিক করলো, এখুনি গিয়ে পেছন থেকে স্বাতীকে জড়িয়ে ধরবে। শার্ট ভেতরে গুঁজে ট্রাউজার পরে নিল। পায়ে সু। দরজায় একদম শব্দ না করে পা টিপে টিপে সিঁড়ির ধাপগুলো পার হোল।

আর কয়েক পা এগোলেই স্বাতী। বাগানের লোকজন তখনো আসেনি। নির্জন লন।

দিলীপ থমকে দাঁড়ালো। স্বাতী নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে তুঁই সাফ [illegible] কুড়োচ্ছিল তা গাছতলায় শিউলি [illegible]। আনকোর পাঁচ-ছটা গলফের বল। এতক্ষণ যা দেখতে পায় দিলীপ—তা হোল স্বাতীর হাতের স্টিকখানা। ভোরবেলা বল মারবার কসরৎ করে দেখছে।

আগেকার রবার ভেঁপু বাজিয়ে বীর-পাড়া থেকে বাস আসছিল। যাবে শিলি-গুড়ি। দিলীপ একটু একটু করে পিছোতে লাগলো। স্বাতী যাতে দেখতে না পায় এমনভাবেই কম্পাউন্ডের তারকাঁটা পেরোলো দিলীপ। তারপরেই পিচরাস্তা. এদিকটায় চোখ যাবে না। দিলীপ এখন দৌড়োচ্ছে। বাসটা এসে রেনটি গাছের ওখানে থামবার আগেই সে পৌঁছুতে চায়। তখনো ভালো করে [illegible] ওঠেনি।

শিলিগুড়িতে এখন আর্মির লোকজন যায় আসে। দোকানে দোকানে স্মাগলিং করা সেট চলন। ক্যাসেট। টেপরেকর্ডার। সব স্মাগলড করা জিনিসপত্তর। এখানকার রেল-এয়ার হোটেলে তিন মাসের চুক্তি হয়েছে বিশ্বনাথের। হোটেলে কাম ধায়। বিকেল থেকে সন্ধ্যে আর্মির পাইতে হবে বিশ্বনাথকে। থাকা খাওয়া ছাড়াও মাসে সাতশো টাকা।

[illegible]

কিনেছে বিশ্বনাথ। দুখানা। তাছাড়া বাবার চটি আর একটা হাফশার্ট।

বাবা চটি পায়ে দিয়ে বললো, ফাইন কিনেছিস। অনেকদিন টি'কবে।

বিশ্বনাথ দেখছিল আর তার চোখে জল এসে যাচ্ছিল। সস্তার স্যান্ডেলের বাইরে তার বাবার ফাটা গোড়ালি বেরিয়ে। হাফ-শার্টটা গায়ে দিয়েছে বাবা। একটু ঢোলা হয়েছে। হাতার বাইরে কালো কনুই। মা রান্না করছিল। একসঙ্গে একজোড়া শাড়ি পেয়ে দোতলার বাড়িওয়ালাকে দেখাতে চলে গেল। এই বাড়িওয়ার বউ একদিন বলেছিল বিশু একটা বিশ্ববখাটে। লম্বা চুল রেখে রকে বসে গায়। দেখো ও জীবনে কিছু করতে পারবে না। সেই বিশুর গানের টাকায় কেনা শাড়ি না দেখিয়ে কি পারে মা।

বিশ্বনাথ পুরনো রকে এসে বসলো। বাচ্চু, বাবুলাল, টাপু ওরা কেউ নেই এখন। কোথায় বেরিয়েছে। এই রকের গা দিয়ে সরু গলিটার মাথায় পৌঁছলে শ্যাওলাপড়া দেওয়ালঘেরা ওই অন্ধকার এ'দো বাড়িটায় তার জন্ম হয়েছে। এখানেই সে বড় হয়েছে। আমি আজকাল কনুইতে এ ডি ভিটামিন তেল মাখি। ভাইবোনের মধ্যে আমিই ফরসা। আমি হোটেলে খাই। সঙ্গে অ্যাপে-টাইজার। আমার কনুইতে দাগ নেই কোন। গায়ে আমার ভাল শার্ট। এ ট্রাউজারটা অবশ্য দিলীপদা বানিয়ে দিয়েছিল। সেই গত বর্ষায়। ভালো কাপড়। আজও ছেঁড়েনি। যাই একবার ওদিকে। অনেকদিন দিলীপদার সঙ্গে দেখা নেই। দেখা নেই কুটুর সঙ্গেও। বাচ্চু ওরা বোধহয় এখন দিলীপদাদের ফ্ল্যাটবাড়ির বেসমেন্টে। নিশ্চয় পার্কিং লটে খবরের কাগজ পেতে বসে তাস পেটাচ্ছে।

বিশ্বনাথের পেছনে এখন আদি গঙ্গার ওপর সি এম ডি এ-র নতুন ব্রিজ। শ্মশান। চেতলা বেকারির চিমনি। সামনে সিধে বর্ধমান রোড। সে-রাস্তার গা দিয়ে সুন্দর সুন্দর সব বাড়ির দিকে নানা পথ।

ওদিকটায় পর পর কয়েকটা মাল্টি-স্টোরিড বাড়ি। এদিকটায় হাঁটলে বিশ্ব-নাথের অনেক কথা মনে পড়ে যায়। বাবার চিড়েগুড়ের দোকান একসময় খুব ভালো চলতো। বাজারের ভেতর ওটাই ছিল এ-লাইনের সবচেয়ে চালু দোকান। বাবা আমায় ক্যাশে বসাতো। আমি ক্যাশ ভেঙে বাচ্চু, বাবুলালদের সিনেমা দেখিয়েছি— দিনের পর দিন। তারপর রেস্টুরেন্ট। দীঘা বেড়াতে গেছি সাতজন মিলে। খাওয়া দাওয়া। সবই এই ক্যাশ ভেঙে। আমার জন্যেই দোকানের আজ এই হাল।

হাঁটতে হাঁটতে বিশ্বনাথ দিলীপদের ফ্ল্যাটবাড়ির বেসমেন্টে এসে হাজির। কোথায় বাচ্চু? কোথায় বাবুলাল? সব ভোঁ ভা।

বিশ্বনাথ ফিরে আসছিল। লিফট থেকে কুটু বেরিয়ে এলো। অটোমেটিক লিফটে আর কেউ নেই।

কুটু থমকে দাঁড়ালো। তারপর এগিয়ে এসে বললো, কান টেনে ছিঁড়ে দেব।

এতদিন পরে দেখা। একটা ভালো

তুমি বারণ করার পর আমি তো আর চিঠি লিখিনি তোমাকে।

সুবোধ বালক! আমার সব কথা যেন শুনে চলো কতো।

কোথায় যাচ্ছো কুটু? কলেজে? দিলীপদা কোথায়?

কলেজের খবর দিয়ে কি হবে তোর? স্কুল ফাইনালে তো ঢেঁড়িয়েছিলি! কলেজের মানে জানিস তুই?

না। জানবো কি করে? কোনদিন তো পড়িনি ওখানে। তুমি পড়ছো—তাতেই আমার আনন্দ।

আহা! কত বিনয়। নে একটা কাজ করে দে।

কি কাজ বলো কুটু।

অতি ভক্তি ভালো নয় কিন্তু। চিন্টুর একটা ছবি রিলিজ হয়েছে আজই। রেখা আছে। আমজাদ আছে। একখানা টিকিট কেটে আনতে পারবি? ব্ল্যাকে নয় কিন্তু। আমার বেশি পয়সা নেই।

বেশি পয়সা নেই শুনে একটু অবাক হোল বিশ্বনাথ। মুখে বললো, আমি কি পারবো?

ওমা! তুই তো আগে কেটে এনে দিয়েছিস কতো।

আজকাল তো আমি এখানে থাকি না। কারও সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই। টিকিট কি রিলিজের দিনে পাবো।

কোথায় থাকিস আজকাল। তাই দেখিনে।

তুমি তো একটা খবর নাও নি কুটু। আসানসোলে ছিলাম এক মাস। কালই শিলিগুড়ি চলে যাবো।

নোকরি পেয়েছিস?

তা বলতে পারো। হোটেলে গান গাই।

তোর গলায়! সে-গান কারা শোনে রে।

যত মাতাল। জুয়াড়ি। রেসুড়ে আর দালাল। সত্যি কুটু।

এত খারাপ লোক কোথায় একসঙ্গে জড়ো হয়?

কেন? মদ খেতে। বারে। হোটেলে।

তোর তো খুব কষ্ট বিশু। ওরা তো গান বোঝে না।

খুব সত্যি বলেছো কুটু।

এবার কুটু একটু নরম হোল। যা—তোকে দিয়ে হবে না। এদিকে এসেছিলি. কেন? আমায় দেখতে?

না। বাচ্চু—বাবুলাল ওরা যদি থাকে। তাই এসেছিলাম। আর—

আর?

যদি তোমার বাবা—দিলীপের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। প্রায় বছরখানেক দেখা নেই ও'র সঙ্গে। এই ট্রাউজারটা দিলীপদাই আমায় বানিয়ে দিয়েছিল। তখন আমার খুব খারাপ অবস্থা। পার্ক স্ট্রীটে 'বেড সাইড' ইনে প্রথম গাইবো। তখন কাপড় কিনে দিলীপদা সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বানিয়ে দিয়েছিল। তা এক বছর তো হয়ে গেল। দিলীপদার জন্যে একটা জিনিস এনে রেখেছি আসানসোল থেকে। দিয়ে যাবো। কাল

কি জিনিস?

এক বোতল ব্যানানা রাম। ক্যারি-বিয়ানের আসল জিনিস।

মদ তো? বাবাকে দিসনে।

কুটুর গলায় ছায়া এসে দাঁড়ালো। স্বর তাই খানিকটা নেমে গেল। কুটু বল-ছিলো, বাবা অজাকাল কত রাতে ফেরে আমরা জানি না। জানে মা। বেহুঁশ হয়ে ফিরে জুতো জামা সুদ্ধ বিছানায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে। তখন অজ্ঞান লোকটার পা থেকে জুতো মোজা খোলে মা।

রবিদা?

দাদা। দাদা তো আন্ডারগ্রাউন্ডে। পুলিশ খুঁজে গেছে কবার। মা কাঁদে। বাবা খোঁজও নেয় না। বাবা পাল্টে গিয়েই তো আমাদের আজ এই হাল।

বিশ্বনাথ এবার ভালো করে দেখলো কুটুকে। সাধারণ ছাপা শাড়ি। হাতে দুগাছা চুড়ি। কানে মাকড়ি। গলায় সেই হারটা নেই। আগেকার গরজাস বড়ো শাড়ি ব্লাউজের বদলে ঐ আটপৌরে ভাবটাতেই কুটুকে বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে। কুটু তা জানেও না। আগের চেয়ে ওকে একটু রোগা লাগলো বিশ্বনাথের।

দিলীপদার কি হয়েছে কুটু?

আমি জানি না। তবে অফিসে বিশেষ যায় না। কলকাতার বাইরে ছুটোছুটি। শেয়ার না কি সব—আমি বুঝিও না।

রবিদা কিছু করতে পারে না?

সে নিজেই তো পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তার খোঁজ কে নেয়।

তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি কুটু?

নাঃ! শুনেছি—তোদের পাড়ার দিকে মালা না মালবিকা নামে একটা রোগা মেয়ের সঙ্গে তাকে দেখা যায় মাঝে মাঝে। মেয়েটা আগে খুব ভোরে আমাদের এ রাস্তায় দৌড় প্র্যাকটিশ করতো। আজকাল আর দেখি না।

বিশ্বনাথ মনে মনে বললো, বাচ্চার বোন মালবিকা। আমাদের খুকী। বেঙ্গল টিমের অ্যাথলেট।

(চলবে)

যাঁদের দেখেছি
অনন্ত সিং

'কেউ বলে ডাকাত, কেউ বলে বিপ্লবী'

আমার শেষ কথাগুলো শুনে তাঁদের যে খুবই খারাপ লাগছিল, তা বুঝতে পারছিলাম। তাঁরা বললেন, 'আপনার অহেতুক শেষ উপদেশগুলোর কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে আপনি অভিজ্ঞ ও বয়োজ্যেষ্ঠ, চেষ্টা করবো আপনার কথাগুলো অবজ্ঞা না করার।'

তাঁরা আবার বললেন, 'অনন্তবাবু আমাদের কথা শুনলে ভালো করতেন। আপনার সাজা হবেই।'

এই ধরনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা শোনার পর, আমিও গম্ভীর হয়ে বেশ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলাম, 'আমার বিরুদ্ধে আপনারা যত ইচ্ছা মামলা চালান না কেন আমাকে আপনারা কখনও দোষী প্রমাণ করে সাজা দিতে পারবেন না। আমি বিচারে মুক্তি পাবই।'

লালবাজারের ভি-আই-পি সেলে আমি আছি। আমার ঘরে আমি একা ছাড়া আর অন্য কোন বন্দী থাকত না। দরজার সামনে একজন কনস্টেবল ও একজন ডি-ডি, সাব-ইন্সপেকটর সর্বক্ষণ বসে থাকত। খাওয়া-দাওয়া হওয়ার পর লালবাজারের মধ্যেই অন্য অফিস-বাড়ী যেখানে ডি-সি, ডি-ডি-ও থাকতেন সেখানে আমাকে নিয়ে যাওয়া হোল। কেবল সেদিনই নিয়ে গেল তা নয়, প্রতিদিনই নিয়ে যেত। যদি আমি শারীরিক কারণে না যেতে চাইতাম, তবে বোধহয় জোর করে নিয়ে যাবার কোন অর্ডার ছিল না। কিন্তু ঠাণ্ডা, অন্ধকার ঘরে থাকার চাইতে কয়েক ঘন্টা বাইরে বেরিয়ে আসতে পারলে ভালোই লাগতো; তাই আমার নিজের যাওয়ার গরজটাও ছিল। আমাকে নিয়ে গিয়ে অ্যাসিসটেন্ট কমিশনারের ঘরে বা ইন্সপেকটারের ঘরে বা ডি-সি-এর ঘরে রাখত। তাঁরা আমার সঙ্গে নানা গল্প-গুজব জমাতেন। সব গল্পের উদ্দেশ্য একটাই ছিল আমার কাছ থেকে অধুনা চারটে ডাকাতির খবর জানা। আর বিশেষ করে তাঁদের জানবার প্রয়াস ছিল দুর্গাপুরের ন্যাশনাল স্টেট ব্যাঙ্কের উপর ডাকাতির প্ল্যানটা।

কলকাতা শহরের সব লোকই পার্ক স্ট্রীট পোস্ট অফিসের ডাকাতি, তারপর ন্যাশনাল গ্রীন্ডলেজ ব্যাঙ্কের দুটো ডাকাতি সম্বন্ধে ও সর্বশেষ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া রাসেল স্ট্রীট ব্রাঞ্চের ডাকাতি সম্বন্ধে সবাই জানতো; কারণ এই চারটে ডাকাতি সংঘটিত হওয়ার পর প্রধান প্রধান দৈনিক খবরের কাগজ খুব ফলাও করে পাবলিসিটি দেয়। কিন্তু তখনও কেউ জানতো না যে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার দুর্গাপুর ব্রাঞ্চে এক কোটি টাকা ডাকাতি করার জন্য প্রকাণ্ড আয়োজন চলেছিল। পুলিশ গোপনে এই তথ্য আবিষ্কার করে। দু'তিন মিনিট করে কলকাতা শহরের বুকের ওপরে চারটে বড় ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়ে গেল। একটাও ডাকাতির হিদিস তখনও পর্যন্ত পুলিশ করতে পারেনি। কাজেই গুজবের ছড়াছড়ি। এমতাবস্থায় দুর্গাপুরে এক কোটি টাকা ডাকাতির প্ল্যান পুলিশের কাছে খুব কঠি

হিসাবে দেখা দিল। তাঁরা এইসব
তর তথ্য সংগ্রহ কিভাবে করবেন যা কি
সংশ্লিষ্ট সবার বিরুদ্ধে মামলা সঠিক-
পরিচালিত করে দণ্ড দেবেন তা
ই পুলিশের যত মাথাব্যাথা। ডাকাতির
লোক ধরে ফেলাতো সোজা। কিন্তু
ল লোককে ধরতে পারাটাই ছিল প্রধান
তার জন্য পুলিশ মরিয়া হয়ে যাদের
ছল, তাদের মধ্যে অনেকের প্রতি
নীয়ভাবে অত্যাচার করেছে। যুবক
মীরা পুলিশ অত্যাচারের গল্প কোর্টে
সাহেবের কাছে বলেছে যা পুলিশ
খণ্ডন করতে সাহস করেনি।

এই কারণেই হাজত-বাসের সময় সেই-
বন্দীদের মধ্যে অনেকের গুরুতর
দিয়া দেখা গেছে। কেউ কেউ মানসিক
মা হারিয়েছে, কেউ কেউ প্ল্যান করে
থেকে পালাবার চেষ্টা করেছে আর
গেছেও। পালাবার জন্যই পালানো, কোন
র জন্য নয়। কাজেই সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়
ই ধরা পড়ে গেল। এইরকম
স্থিতিতে আমার সঙ্গে উপর-ওয়ালা
জন পুলিশ অফিসার পরামর্শ করতে
প্রকাশ করলেন। দুজন অফিসার দশ-
বছর আগের ডাকাতির কথা তুললেন।
প্রসঙ্গে তাঁরা বললেন, "দেখুন, ঊষা
পানীর টাকা যে ডাকাত দল ডাকাতি
ছিল তারাই দশ-বারো বছর পরে এইসব
তি আরম্ভ করেছে। ঊষা কোম্পানীর
ডালহৌসীর ব্যাঙ্ক থেকে নির্ধারিত
র পেমেন্টের জন্য নিয়ে যাওয়া হোত।
তে সংবাদ তাদের কাছে না থাকলেও

বেশ মোটা টাকা মোটর গাড়ী
করে দারোয়ানরা নিয়ে যেত। ডাকাতদের
ইচ্ছে ছিল গাড়িটা থামিয়ে পিস্তল দেখিয়ে
টাকা নিয়ে পালিয়ে যাবে। সেই জন্য তাদের
প্রথম প্ল্যান ছিল যখন গাড়ীটা ব্যাঙ্ক থেকে
ছাড়বে, তার বেশ কিছু আগে এসে বিভিন্ন
পোস্টে জানিয়ে দেওয়া হবে। যখন গাড়ীটা
ঊষা কোম্পানীর ভিতরে প্রবেশ করবে, তখন
সেটাকে আক্রমণ করে টাকা ছিনিয়ে নেবে।

দারোয়ানদের সাথে টাকা নিয়ে যাওয়ার
সময় দুটো বন্দুক থাকত আর ওদের সঙ্গে
থাকত একজন কেরানি আর একজন
ড্রাইভার। তারা রোজ একই গাড়ীতে একই
রাস্তায় টাকা নিয়ে যেতেন না। কিন্তু কিছু
রাস্তা কমন যা তাদের অতিক্রম করতেই
হোত। সেই কমন রাস্তাটা তারা ঠিক
করলো ঊষা কোম্পানীর মুখে আনোয়ার শা
রোডের উপরে। গাড়ী কিভাবে তারা থামাবে
তার প্ল্যান ছিল এইরকম—গাড়ী ঘুরে
ঢোকার সময় যখন গতি মন্থর করবে, তখনই
গাড়ীর সামনে ও পেছনের দুটো চাকার ব্রেক
দেবে। সঙ্গে সঙ্গে যারা বন্দুকধারী প্রহরী,
তাদের প্রতি রিভলবার উঁচিয়ে ধরে হুকুম
করবে বন্দুক ফেক। হাত ওঠাও। আর
দুজন তখনই টাকার বাকস টেনে
নামিয়ে নিজেদের গাড়ীতে নিয়ে
উঠবে। সেই সঙ্গে আর দুজন লোক
সামনের চাকা আর পেছনের চাকা পাংচার
করে দেবে। সেই জন্য খুব তীক্ষ্ণ ছুরি
জাতীয় জিনিষ কাঠের ডাঁটে লাগানো ছিল।
মোটরের চাকা খুব ধারালো ছুরি দিয়েও
খুব সহজে পাংচার করা যায় না, তার জন্য

সেই ধরনের উপযুক্ত হাতিয়ার দিয়ে চাকা
পাংচার করা যায় কিনা, তার জন্য তারা
প্র্যাকটিশ করেছিল। কাঠের রোড ব্লক তারা
পোস্ট এণ্ড পার্সেলের মত করে টিকিট
লাগিয়ে নিয়েছিল। সেটা হাতেই ধরা ছিল।
গাড়ীর গতি যখন মন্থর হবে, তখনই তারা
স্ব-স্ব স্থানে থাকবে। আর যখনই অন্যরা
রিভলবার দেখিয়ে ড্রাইভার ও দুই বন্দুক-
ধারী দারোয়ানকে কাবু করবে তখন তারা
তাদের রোড ব্লক সামনের ও পেছনের
চাকায় ঠেসে দেবে। আর দুজনে চাকাও
পাংচার করে দেবে।

গাড়ী যখন ডালহৌসির ব্যাঙ্ক থেকে
টাকা তুলে নিয়ে স্টার্ট করবে সেই সংবাদ
প্রায় দশ মিনিট আগে যে পার্টি আক্রমণ
করবে তাদের কাছে পেঁছে যাওয়া প্রয়োজন।
সেই জন্য তারা রেড রোডের বাঁ-পাশের মাঠ
থেকে উচ্চ-শক্তির হাওয়াই ছেড়ে সংকেত
দেবে যারা গাড়ী নিয়ে ভিকটোরিয়া
মেমোরিয়ালের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। এই
সংকেত পেয়েই এই গাড়ীটা হরিশ মুখার্জি
রোড দিয়ে হাজরা হয়ে রাসবিহারী এভিন্যু
ধরে সাদার্ন এভিন্যু হয়ে লেকের সুইমিং
পুলের দিকে আসবে। যখনই সোজা এই
সুইমিং পুল দেখা যাবে, তখনই মোটরের
হর্ন দিয়ে সংকেত দেবে সংকেত দেখে যে
লোক এদিকে থাকবে সে মোটর গাড়ী
মোছার হলদে কাপড় নিয়ে বাঁদিকের ছোট
প্লটটাতে গিয়ে সেটা খুলে ধরে ইঙ্গিত
দেবে। এইটা দেখা যায় আনোয়ার শা বাসস্ট্যান্ডের
উপর থেকে। সেই সংকেত পেয়েই যারা

প্রস্তুত হয়ে আছে উষা কোম্পানীর গাড়ী আটক করার জন্য, তা তারা অনেক আগেই পেয়ে যাবে। তারা রিহার্সাল দিয়ে দেখেছিল প্রায় দশ থেকে পনের মিনিট আগে এই বার্তা পেঁছানো যায়।

অনেক অভাবনীয় জিনিস ঘটে যার হিসেব আগে করা যায় না। গাড়ি মোছার হলদে কাপড় তাতে কোন দোষণীয় জিনিসের সংস্রব নেই—কেবলমাত্র এক-টুকরো কাপড়। রোদে শুকোচ্ছে মত করে দু-একবার সেটাকে খুলেছে আর বন্ধ করেছে। কিন্তু এতেও মাঠের কয়েকজনের সন্দেহ উদ্রেক করলো। কথা নেই বার্তা নেই, তাকে নিয়ে তারা গণ্ডগোল শুরু করলো, 'কেন এই কাপড়, কেন এটাকে শুকোচ্ছেন, আপনাদের এখানে কি প্রয়োজন?' এই অবান্তর বচসা শুরু হোল আর কথাকাটাকাটি হচ্ছিল। পরিস্থিতি ক্রমেই বেশ ঘোরালো হয়ে গেল। এই মাঠের পথটায় তারা ঠিক করে রেখেছিল টাকার থলি নিয়ে আসবে। এই মাঠের পথে কোন গাড়ি-ঘোড়া, সাইকেল চলে না। লোকও যাতায়াত করে না। তাই ডাকাতি হয়ে যাওয়ার পরে আনোয়ারশার দুদিক থেকে যদি পুলিশ রাস্তা ব্লক করে দেয়, তবে সেই ব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসা দুষ্কর। সেই জন্য এই তৃতীয় পথটা তারা ব্যবহার করবে বলে ঠিক করে রেখেছিল। কিন্তু এত তুচ্ছ কারণ নিয়ে সেখানে একটু গোলমাল হয়ে যাওয়াতে সেদিন সংকেত পাঠানো গেল না আর ডাকাতিও হোল না। এই শিক্ষা নিয়েই তাদের সেই পরিকল্পনা সেদিন বন্ধ করতে হোল। ঠিক হোল, পরবর্তী দিনে আবার পনের দিন পরে উষা কোম্পানির কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার জন্য ব্যাংক থেকে টাকা তুলে গাড়ি যখন কোম্পানিতে যাবে, তখন তারা স্থান পরিবর্তন করে ডাকাতিটা সংঘটিত করবে।

নতুন স্থানটা হোল সিংহী পার্কের বিপরীত দিকে ইলেকট্রিক সাপ্লাই স্টোর্সের সামনের রাস্তা। ট্রাম লাইনটা দুটো রাস্তার মাঝখান দিয়ে একটু উঁচু জায়গা দিয়ে পাস করছে। ট্রাম লাইনের দুদিকে সিমেণ্টের রেলিং দিয়ে ঘেরা। কাজেই দুদিকের দুটো রাস্তা অপেক্ষাকৃত অনেক সরু। দুটো বড় লরি বিপরীত দিক থেকে পাস করতে পারে না। তাই দুটো রাস্তাই একদিকমুখো। একটা রাস্তায় সব গাড়ি উত্তর থেকে দক্ষিণে পাস করে, আবার আরেকটা রাস্তায় গাড়িগুলো দক্ষিণ থেকে উত্তর দিক যায়। তাই আলিহোসী থেকে টাকা নিয়ে যখন গাড়িটা দক্ষিণে আনোয়ার শা রোডের দিকে যায় তখন গাড়িটাকে এই সরু রাস্তার উপরে আটক করবে স্থির করে। আগে যা বলেছি সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী খবরটা বীকেল করে আগে এসে পেঁছাবে। তখন তারা গাড়িটাকে আটক করে টাকার পাহারায় কর্মচারী ও বন্দুকধারী দারোয়ানকে গাড়িতেই আবদ্ধ রেখে টাকার থলি নিয়ে সরে পড়বে।

এই সরু রাস্তা দিয়ে টাকা নিয়ে গাড়িটা আনোয়ার শা রোডে উষাকোম্পানীতে বেতন দেওয়ার জন্য যেন যেতে না পারে, তর জন্য তারা ঠিক করেছিল লম্বা লম্বা বাঁশ বোঝাই করা দুটো গাড়ি এই রাস্তার ধারে বাঁদিক ঘেঁসে রাখবে। সেই অবস্থায় টাকার গাড়িটা এই তৈরি করা ফাঁদে পড়লেই আর সেই মুহূর্তে সামনে থেকে ডাকাতদের 'হিন্দুস্থান ফোরটিন ফোর' গাড়িটা টাকার গাড়িটাকে আটক করবে। তারপর আগে যেভাবে বর্ণনা দিয়েছি, সেইভাবে চাকায় রোড ব্লক দেবে আর চাকা পাংচার করবে। কিন্তু সবরকম প্ল্যানই ভেস্তে গেল। ঠিক আগেরদিন সন্ধ্যার সময় এয়ারপোর্টের রাস্তায় 'হিন্দুস্থান ফোরটিন ফোর' গাড়িটা অ্যাকসিডেণ্ট করে বসলো। তারা চার-পাঁচজন একটা কাজে যাচ্ছিল। এমন সময় এয়ার ইণ্ডিয়ার কোন একটা গাড়ি, এই গাড়িটাকে পেছন থেকে এসে সামনের চাকায় পাশ দিয়ে ধাক্কা মারে। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে ভালো গাড়ি চালায় সেই চলাচ্ছিল। কিন্তু ধাক্কাটা খেয়ে গাড়িটা সামাল দিতে না পেরে রাস্তার উপর থেকে বাঁদিকে নীচে নেমে গেল। এটা হোল একটা মেজর অ্যাকসিডেণ্ট।

একদিন পরেই ডাকাতি হওয়ার কথা আর সেদিন যদি ডাকাতি না হয় তবে তাদের আরো পনেরদিন অপেক্ষা করতে হবে। তাদের দলের যে অবস্থা ছিল, সেই অবস্থায় আরো পনেরদিন অপেক্ষা করা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। গাড়ির ইন্সটলমেণ্ট বাড়ি ভাড়া প্রভৃতি না দিলেই নয়। কাজেই তাদের একদিন পরে ডাকাতি করতেই হোত। কিন্তু এ যেন এক অসম্ভব ব্যাপার। কি করে একদিনের মধ্যে গাড়ি সারিয়ে 'অ্যাকশনে' যাওয়া সম্ভব! তাদের নেতা সবাইকে বললেন, 'অভিধান থেকে 'অসম্ভব' এই শব্দটা মুছে দিতে হবে—যে-কোন উপায়ে হোক, আজকে শনিবারের রাত, রবিবারের সারা দিন-রাত খেটে লেন এই মোটরটা রাস্তার ধারে যেসব মোটর-মিস্ত্রিরা কাজ করে, তাদের দিয়ে সারিয়ে নিতেই হবে। সোমবারে গাড়ি নিয়ে ডাকাতি করা চাই। তাদের মধ্যে যারা সেখানে ছিল, তারা মোটর কি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং চেষ্টা করেও বোধ-হয় সারানো সম্ভব হবে না বলেই মত প্রকাশ করছিল। কিন্তু তাদের নেতা অনেক ঘটনার নজির দিয়ে তাদের বলতে লাগলেন, এরকম পরিস্থিতিতে যখন সব আশা ছেড়ে দেওয়া হয়, তবু ধীর মস্তিষ্কে দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করে গেলে এইরূপ কাজ সারিয়ে ফেলা যায়। কেবল মূল কথা হোল হাল ছেড়ে না দিয়ে মোটর যে সারায় তাদের সঙ্গে লেগে থাকতে হবে, আর মনে উৎসাহ যোগাতে হবে। মোট কথা হচ্ছে যদি প্রথম থেকে হাল না করে কাজ শুরু করি, তবে তার ফল একরকম; আর যদি কাজটা হবেই—এই মনোভাব নিয়ে কাজটা শুরু করা যায় তবে তার ফল ভালো হতে বাধ্য।" তারা নিজেদের মধ্যে এইরকম পরামর্শ করে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে চলে গেল যে রবিবারের রাত্রের মধ্যে এমনকি সারারাত জেগে মেরামতি কাজ শেষ করতেই হবে।

তারা এই মোটরগাড়ী 'অ্যাকশনের' জন্য সোমবার দিন সকাল থেকে পুরো প্রস্তুত রেখেছিল। টাকা নিয়ে গাড়ী এগারোটা সাড়ে এগারোটার সময়ে উষা কোম্পানীতে যায়, আবার অনেক সময় কিছু দেরীও হয়। তারা কিন্তু প্রস্তুত হয়ে নিজ নিজ পোস্টে সাড়ে দশটা থেকে উপস্থিত ছিল। সংবাদ আসবে রীলে করে। তখন সবার মনে এক চিন্তা আজ গাড়ীটা আসবে কি-না। যদি আসে তবে নির্ঘাত ডাকাতিটা হচ্ছেই। একটা মূল কথা বাদ রেখে গেছি, সেটা এখানে বলছি। কোম্পানীর টাকা দুরকম গাড়ী করে যেত। কোনদিন প্রাইভেট গাড়ীতে আর কোনদিন কোম্পানীর ভ্যানে করে টাকা নিত। ওরা কোম্পানীর ভ্যান আটক করে গাড়ী থেকে টাকাটা কিভাবে নেবে তার একটা মহড়া দিয়ে সবাইকে শিখিয়ে নিয়েছিল। মহড়াটা ছিল কোন দারোয়ান বা কোম্পানীর লোকের সামনে থেকে ব্যাগটা সরাবার সময় বিশেষ কৌশল অবলম্বন করবে। পেছনের দরজা খোলা যেত। টাকার ব্যাগ থাকত পেছনের পোর্সানের সামনের দিকে। দারোয়ান ও দুজন কেরানী ভিতরে বসে থাকত। তাদের মাঝখান দিয়ে গিয়ে টাকার ব্যাগ আনাটা সমীচীন বলে ভাবেনি কারণ ভিতরে গিয়ে ক্যাশবাক্স যদি আনতে হয় তবে বিপদের সম্মুখীন হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। অতদূরে যাবে আর আনবে সেই সময় ভিতরে যারা আছে তারা অতর্কিতে আক্রমণ করতে পারে। সেই রকম আক্রমণ এড়িয়ে যাওয়া চাই। সেই জন্য তারা একটা শক্ত বঁড়শির মত লম্বা ছিপ সঙ্গে রাখে আর সেই ছিপের মাথায় লোহার আংটা বেঁধে রাখে। তারা রিভলবার ও পিস্তল দিয়ে তাদের ভয় দেখিয়ে হাত তুলে রাখতে বলবে আর ভিতরে কেউ না ঢুকে ঐ ছিপের আংটা দিয়ে ব্যাগটাকে টেনে সামনে আনবে। এই কাজ শুরু হওয়ার আগেই তাদের বন্দুক ফেলে দিতে আদেশ করবে। যদি সেই আদেশ তারা না মানে তবে আত্মরক্ষার জন্য গুলি করার পারমিশন তাদের দিয়ে-ছিল। তাদের ঘাঁটির একটা বাড়ীতে ভ্যানের উচ্চতা অনুযায়ী খাট কিনে আনা হয়েছিল আর খাটের দুদিকে বেঞ্চ রেখে বসার জায়গা করে। রিভলবার দেখিয়ে প্রথম তাদের বন্দু[ক] ফেলাতে বলবে আর আংটা লাগানো ছি[প] দিয়ে বন্দুক দুটো আগে বাইরে নিয়ে আস[তে] হবে। তারপরে আদেশ হবে তোমরা সামনে[র] দিকে মুখ করে ঘুরে বস। সেই সঙ্গে ছিপে[র] মাথার আংটার সাহায্যে টাকার বাক্স বাই[রে] টেনে আনা হবে। যদি ভ্যান যায়, তবে এ[ই] পদ্ধতি তারা নেবে। আর যদি কোন প্রাইভে[ট] গাড়ী পেট্রোলে বা অ্যামবাসাডর যায়, ত[বে] সেই গাড়ী বাগে আনতে অন্য ব্যবস্থা ছিল সেটা অনেক সোজা।' দুজন দুদিক থে[কে] দারোয়ানকে রিভলবার দেখিয়ে তাদের বন্দু[ক] ছাড়তে বলবে আর তাদের বন্দুক কে[ড়ে] নেবে। তারপর পেছনের সিটের দুজনকে আদেশ দিয়ে অন্যদিকের দরজা দিয়ে বা[র]

দেবে। ইতিমধ্যে কিন্তু রোভ মনুক ও র পাংচার করে দিয়ে গাড়ীটাকে একে- নিশ্চল করে সেখানে রেখে দেবে। তারা র ব্যাগ বা বাক্স নিয়ে নিজেদের গাড়ীতে চলে আসবে।

ঘটনার দিন ঠিক সময়ে সঠিক স্থানে ীটা এসেছিল, ভ্যান নয়।' তাই তাদের ক ডাকাতি করাটা সহজসাধ্য হয়, কিন্তু ান দারোয়ান ঘটনাস্থলে নিহত হয়, আর র দারোয়ানটা গুরুতরভাবে জখম হয়ে- । ডাকাতরা দুটো বন্দুক আর টাকার কেশ নিয়ে তাদের নিজেদের গাড়ীতে সুরেন রায় রোড দিয়ে বেরিয়ে যায়।' য়ার সময় তারা রাস্তার উপরে বন্দুক ফেলে দিয়ে যায়। কিছুদূরে অন্য । গাড়ীতে টাকার ব্যাগটা তুলে দেয়। পরে 'হিন্দুস্থান কোরটিন যোর' ওদের ানকে নিয়ে সুপরিকল্পিত গন্তব্য পথে য়ে যায়, আর পথের পূর্বমনোনীত ে কালো কাগজের উপরে যে নাম্বার টের উপরে লাগানো ছিল তা তুলে ল দেয় আর ড্রাইভার একা গাড়ীটা নিয়ে যায়।"

এই ডাকাতি হওয়ার পরে শহরে খুবই লাড়ন সৃষ্টি হয়। কাদের এই কাজ! লশরা এই সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিল যে এই অনন্ত সিং ছাড়া আর কারো দ্বারা ব নয়। এই ধরনের গল্প শুনতে আমি অভ্যস্ত ছিলাম। পুলিশের কাছে আমি এইসব গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে আমার মত প্রকাশ করিনি, তবুও তারা নাছোড়বান্দা, গল্প তারা করবেই। তারা আমাকে বললেন, 'আপনি হয়ত সবটাই অস্বীকার করবেন। তবে আমাদের কথা আপনাকে জানালাম। আমরা এই ডাকাতির মাস্টার প্ল্যানের জন্য আপনাকেই সর্বতোভাবে দায়ী করি। আপনার বিরুদ্ধে কেস প্রমাণ করতে পারব কি-না, সে অবশ্য অন্য কথা। তবে যে ফৌজদারী ষড়যন্ত্রের মূলে আপনি ছিলেন আর এই ডাকাতির উদ্যোক্তা যে আপনি, তা কিন্তু আপনি কোন মতেই অস্বীকার করতে পারেন না। তবে আপনাকে ডাকাতির ফৌজদারী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গেপ্তার করে চালান দিয়েছি। আমাদের যখন কোন কথা বলতে অস্বীকার করলেন, তখন কোর্টে বিচারের সময় আত্মপক্ষ সমর্থন করে যা জবাব দেবার তা দেবেন। তবে আপনাকে জানাচ্ছি, এই বিচারে আপনার সাজা হবেই আর তা হবে যাবজ্জীবন কারাবাস। সরকারী পক্ষ অন্তত তাই চেষ্টা করবে। যদি আপনি এই ধরনের অনমনীয়ভাব নিয়ে আমাদের এড়িয়ে না যেতেন, তবে হয়ত শেষ পর্যন্ত আপনারই লাভ হোত। আপনি জ্ঞানী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ব্যক্তি। আপনাকে আমরা কী আর বোঝাবো। খুব বন্ধুভাবে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, আমরা পরস্পর আলোচনা করে কি কোন [illegible] পারি না; যে চারটে গুরুতর ডাকাতি আর ষড়যন্ত্রের মামলা রুজু করেছি তার নিষ্পত্তি কি ভালভাবে করা যায় না? আপনি মত দিলে আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করতে পারি।

একেকবার মনে হচ্ছিল হৃদয়বান পুরুষরা আমার কাছে খুব সত্যি কথাই বলছেন। তাদের কথায় মনে সন্দেহ জাগ- ছিল যে সাংঘাতিক ফৌজদারী মামলায় আমাদের আটক করেছে, তার থেকে মুক্তি পাওয়া খুব সহজ নয়। একেবারে মিথ্যা কেস করেও আমাদের ফাঁসিয়ে দিতে পারে। তার থেকে বরং তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে চললে ক্ষতি কি? 'পুলিশের সঙ্গে পরামর্শ করে আমাদের মুক্তির রাস্তা ঠিক করবো? এই রকম নির্বুদ্ধিতা আমার হোক, তা আমি কোন মতেই চাই না। 'প্রিন্সিপল' অনু- যায়ী পুলিশের সঙ্গে মুক্তির ব্যাপারে কোন বোঝাপড়া হোতে পারে না, এ ধরনের [illegible] মনোভাব আমার কোন- কালে ছিল না। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বিচার করে ওজন করে দেখে নীতি ঠিক করবো, মীমাংসা করবো কিনা। মীমাংসা হতেই পারে না, তেমন নীতি আমার মোটেই ছিল না। কল- কাতার এই চারটে ডাকাতি—ভবানীপুরের সোনা-রুপোর দোকান, উষা কোম্পানীর ক্যাশ টাকা লুঠ, কর্নওয়ালীশ স্ট্রীটে সোনার দোকানে ডাকাতি আর সুরেন ব্যানার্জি রোডে সোনার দোকানে ডাকাতির চার্জে যে মামলা আমাদের বিরুদ্ধে দায়ের করেছিল,

তার একটিতেও কোন প্রত্যক্ষদর্শী সনাক্ত করার মত সাক্ষী তাদের ছিল না। একটি স্বীকারোক্তিও হয়নি, কোন রাজসাক্ষীর ব্যাপারটিও ছিল না। তবে তাদের অতসব গল্পের ফাঁদে আমার পা দেওয়ার দরকার কী। আমি নিশ্চিত বুঝেছিলাম সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে তাদের মামলা কোন মতেই টিঁকবে না। তারা ভেবেছিল এক-আধজনকে তারা রাজসাক্ষী হিসাবে পেয়ে যাবে। যখন তারা একজনকেও রাজসাক্ষী হিসাবে পেল না বা কারো কাছ থেকে স্বীকারোক্তিও পেল না, তখন শেষ চেষ্টা করে দেখতে লাগলো যদি আমার সম্মতি নিয়ে মামলাটা নিষ্পত্তি করতে পারে, তবু তাদের মান থাকবে। আমি তাদের তখন বলেছিলাম, আপনারা যা ইচ্ছে তাই করুন তবে আপনারা কাউকে যে সাজা দিতে পারবেন না, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। 'কনস্পিরেসি কেস' করছেন, কিন্তু আপনাদের একজনও রাজসাক্ষী নেই। এগাজিবিটে একটা আর্মস বা ছোট্ট একটা বুলেট, তাও দেখাতে পারেন নি। লুণ্ঠিত টাকা বা সোনাদানা বা অলংকার কিছুই মামলায় উপস্থিত করতে পারেননি। তবে কি করে আশা করেন যে মামলা চালাবেন।

সত্যি তাদের এই মূল দুর্বলতা সম্বন্ধে তাঁরা খুবই সচেতন ছিলেন। এবং সেইজন্য দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বিমান ভাদুরী ও লক্ষ্মীবাবুর সোনা-রুপোর দোকানের একজন মালিক শ্রীপ্রভাত সেনকে নিয়ে তাঁরা খুব চেষ্টা করেছিলেন কোনমতে একটি স্বীকারোক্তি পায় কি-না। প্রভাত সেনকে রাতের পর রাত ঘুমোতে দেয়নি। প্রায় দশ বারো দিন তাকে জাগিয়ে রেখে কেবলই জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, শ্রীপ্রভাত সেন কোন কিছুই জানতেন না। কাজেই কি স্বীকার করবেন? প্রভাত সেনের মতই দীর্ঘকায় ব্যক্তি বিমান ভাদুড়ীকে তদনুরূপ যন্ত্রণা দেয়। অর্থাৎ একমুহূর্তের জন্য দশ-বারো দিন ঘুমোতে দেয়নি। কিন্তু তাদের কাছ থেকে কোন স্বীকারোক্তি না পেয়ে তারা সত্যি খুবই হতাশ হয়েছিল। আমার সঙ্গে আন্দামানের বন্ধু বিরাজমোহন দেব ধরা পড়েছিল। সে আমার সঙ্গে আন্দামান জেলে ছিল। আসাম কোর্টে তার যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড হয়। অনুরূপ দণ্ড তার বাংলাদেশেও হয়েছিল। এই দুটো দণ্ড পর পর খাটার আদেশ ছিল। তাই তাকে পঁয়তাল্লিশ বছর কারাবাসের জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে জেলে থাকতে হয়েছিল।

কিন্তু ইতিমধ্যে মন্টেগু-চেমস ফোর্ডের স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হোল। পলিটিক্যাল প্রিজনারস্‌রা আন্দামান ও সারা ভারতবর্ষের জেলে অনশন সত্যাগ্রহ শুরু করে. সেই কারণে প্রথম প্রাদেশিক সরকার রাজনৈতিক বন্দীদের সবাইকে ধীরে ধীরে মুক্তি দিলেন। বিরাজমোহনও মুক্তি পেল। বিরাজকেও ডাকাতি মামলার অজুহাতে আমার সঙ্গে গ্রেপ্তার করেছিল।

রবি সেন এম-এ পড়তো, তাকেও আমার সঙ্গে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল। তাকে মেয়েদের 'সেলে' রেখেছিল। কিন্তু লালবাজারে মেয়েদের সেল অত্যন্ত জঘন্য। সেখানে যে কোন নীচুস্তরের মেয়েকে বন্দী করে রাখত। বেশীর ভাগ বারবণিতা। সেলটা অত্যন্ত অপরিষ্কার। কাসি, থুথু, বমি ইত্যাদি সেই সেলেই পড়ে থাকত। মেথর থাকা সত্ত্বেও সেলগুলো পরিষ্কার থাকত না। এই অবস্থায় রবির নিশ্চয় খুব কষ্ট হয়েছিল, তবু মনোবল একটুও ভাঙেনি। রবিকে যে বাড়ী থেকে ধরে আনে, সেই বাড়ীর সামাজিক পোজিশন সম্বন্ধে পুলিশ খুব সজাগ ছিল। পুলিশ তার প্রতি একটুও অসৌজন্য ব্যবহার করেনি। সার্চ পার্টিকে পাঠানো হয়েছিল একজন ডি-ডি সাব-ইন্সপেকটারের তত্ত্বাবধানে। তিনি কোন এক কলেজের প্রফেসর ছিলেন। প্রফেসরের চাকরিতে সম্মান বেশী হলেও টাকা কম।' তাই তিনি অধ্যাপকের চাকরি পরিত্যাগ করে বুদ্ধিমানের মত ডি-ডি পুলিশের চাকরিতে যোগ দিলেন। পুলিশের চাকরিতেও তাঁর প্রায় সাত-আট বছর হয়ে গিয়েছিল। তাঁর প্রতি পুলিশরা সম্মানসূচক ব্যবহার করত আর তিনি একজন অধ্যাপক ছিলেন বলে জনসাধারণ তাঁকে বিশেষ সম্মান করত। আমিও শুনেছিলাম রবির বাড়ীতে তিনি খুব ভদ্রতাসূচক ব্যবহার করেছিলেন আর যেন তাদের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা না হয় তার জন্য খুবই সতর্ক ছিলেন। রবিকে লালবাজারে অফিসারের ঘরে বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল বটে, কিন্তু কোন অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করা হয়নি। রবিকে তাদের যে পুলিশ গাড়ী করে ফলো করতেন, সেই ভদ্রলোক একজন বিশেষ দাগী আসামীকে ধরতে গিয়ে রিভলবারের গুলিতে আহত হয়েছিলেন। তিনি খুব সাহসী বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর উপরে ভার ছিল তিনি যেন রবিকে তার অজান্তে দূর থেকে মোটর নিয়ে ফলো করেন। তিনি তা করেছিলেন প্রায় দশদিন। কিন্তু তাঁর রিপোর্টে কোন অস্বাভাবিক চলাফেরা সম্বন্ধে রবির বিরুদ্ধে কোন রিপোর্ট ছিল না। অন্য একজন অফিসার যখন রবিকে প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন তখন তারই মধ্যে তিনি এসে একটু কথা বলে গেলেন, 'তিনি অপূর্ব গাড়ী চালান। তাঁর গাড়ী ফলো করা খুবই কষ্টকর ছিল। একটু অন্যমনস্ক হয়েছি, অমনি তিনি কোনদিক থেকে কোনদিকে চলে গেলেন, বুঝতেই পারা যেত না' তার স্টিয়ারিং কন্ট্রোলকে আমি প্রশংসা না করে পারি না।' এই রকম একটু কথা বলে তিনি চলে গেলেন। যে ভদ্রলোক রবিকে প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন, তিনি একটা ক্লু পেয়ে রবিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'যদি কিছু মনে না করেন তবে আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি—আপনাকে মোটরগাড়ী চালানো শেখালো কে? অনন্তদা কি শিখিয়েছেন?' রবি তাঁকে উত্তর দিয়েছিল, 'হ্যাঁ, আমি অনন্তদার কাছেই গাড়ী চালানো শিখি।'

এই তো গেল রবির কথা। এখন আসা যাক আন্দামান ফেরত অনন্ত সিংহের সাথী বিরাজমোহন দেবের কথায়। একদিন দুপুরে জেল হাজত থেকে বিরাজবাবুকে ডেকে জেল অফিসে নিয়ে গেল। অফিসে গিয়ে বিরাজবাবু দেখেন সেই অধ্যাপক পুলিশটি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন। তিনি খুব বিনয়ী ভদ্র আর নম্র।

তিনি : 'একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এলাম যে ল্যান্ডমাইন ধরা পড়েছিল সুরেন ব্যানার্জি রোডে সে ধরনের ল্যান্ডমাইন চট্টগ্রামে ১৯৩০ সালে ধরা পড়ে। আপনি কি কিছু বলতে পারেন সেই ল্যান্ডমাইনের বৈশিষ্ট্যগুলো কি ছিল?'

বিরাজ : 'দেখুন, [illegible] শোনা ও বই পড়া জ্ঞান। উত্তর অনেক ভুলভাল হবে আপনাকে আমি পরামর্শ দিই, আপনি বরং অনন্তবাবুকে জিজ্ঞেস করুন, তিনি আপনাকে এই সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান দিতে পারবেন।'

তিনি : 'দেখুন ইচ্ছে ছিল, তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস করবো। সত্যি বলতে কি তাঁকে এসব জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয় না, ভয় লাগে। তিনি আমাদের থেকে অনেক বড় তাঁর সঙ্গে আমাদের অফিসাররা কথা বলেন আমার ঔৎসুক্য মেটাতে আমি আপনার সাহায্য চাইছি।'

বিরাজ : (একগাল হেসে) 'আপনি বলছেন বটে, কিন্তু আপনাকে আমি বাস্তবে কিছুই সাহায্য করতে পারবো না, কারণ আমি ল্যান্ডমাইন সম্বন্ধে কিছুই জানি না। সত্যিই যদি এ সম্বন্ধে কিছু জানার থাকে তবে অনন্তদাকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন।'

তিনি : (গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলে) 'তাহলে বোধহয় আমার আর এ-বিষয়ে জানা হোল না।'

(চলবে)

হৃদয় নন্দন বনে

সোমেন্দ্রনাথ রায়

১

ঝড়ের বিক্ষোভ তাণ্ডব নৃত্য করছিল র ভেতরে। টগবগ করে ফুটছিল । নিশপিশ করছিল হাত দুখানা। সে কেমন যেন পিন ফোটানো জ্বালা।

জিভ এবং তালু শুকিয়ে গেছে। ল আর মাথার পেছনটা ঘেমে জবজব । চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি। কণাদকে লেই মনে হতে পারত কোনো সুযোগে মনের রাগ প্রকাশ করে ফেলতে পারে, লে ওই স্টিলের আয়না বসানো দামী মারী, সুদৃশ্য ড্রেসিং টেবল কিম্বা ল সাজানো কাচের শোকেস শুধু মেরে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবে।

প্রজ্বলিত মনের জ্বালা আর ক্ষোভ পনে সংহত করে ছোট স্যুটকেশটা য়ে নিল কণাদ। গোটা দুই করে সার্ট-ন্ট মোজা রুমাল, একটা তোয়ালে একট সিট আর টুথ ব্রাশ এবং পেস্ট ভরে । আর কি কি সঙ্গে নেওয়া উচিত. সা মনে পড়ল না। কষ্ট করে মনে বার ইচ্ছেও হল না। যা দরকার, য়োজন অনুসারে কিনে নেবে। শুধু টাকা নিয়ে নেওয়া উচিত। একটা আধলা শ যাবে না।

চাবি দিয়ে আলমারী খুলে হ্যাঁচকা মারল হ্যাণ্ডেল ধরে। ঝনঝন করে আলমারী। সংসারের টাকা থাকে ভস একটা ভ্যানিটি ব্যাগে। তার তিনটে পে যা ছিল, সব বার করে নিল। চখানা একশ টাকার নোট, তাছাড়া টাকা, পাঁচ টাকা, আর এক টাকার ট অনেকগুলি। তাড়াতাড়ি গুনে দেখল। শা চব্বিশ টাকা। এত সে আশা করেনি। সের আজ চোদ্দ তারিখ। চোদ্দই আগস্ট বার আগামীকাল পনেরই আগস্ট ছুটি। ভ্যাসমত ক্যালেণ্ডারের দিকে নজর গেল। ৬৬ লেখাটার ওপরেই সুন্দরী মেয়েটি সি হাসি মুখে বসে আছে।

মাসের প্রথমে মাইনে পেয়ে মধ্যে রেছিল সে লিলির হাতে। যতদূর মনে মাসকাবারী ধার দেনা মিটে গেছে। কি আছে দু হপ্তার বাজার রেশন, কানের টুকিটাকি। এছাড়া খরচ নেই। তার মানে প্রতি মাসেই উদ্বৃত্ত থাকে বেশ। তা না হলে কি—।

ইলেকট্রিক স্পার্কের শক লাগল মাথায়। নাঃ, আর ভাববে না।

আলমারীর লকারটা খুলে ফেলল। স্টেনলেস স্টিলের সুদৃশ্য বাকসে ঝকঝক করছে কয়েক গাছা চুড়ি আর পেণ্ডেন্ট একটা। বাকি গয়না থাকে ভল্টে। চুড়িগুলো নিয়ে বিক্রি করে দেবে নাকি? না, তা কখনো পারবে না কণাদ। বাপের বাড়ি থেকে বিশ-বাইশ ভরি সোনার গহনা পেয়েছিল লিলি। শ্বশুরবাড়ির তরফ থেকেও ছয়-সাত ভরি পেয়েছিল। না. গয়নার ওপরে লোভ নেই কণাদের। লিলির নিজস্ব সম্পত্তির ওপরে কোন দাবী করতে যাবে না সে। অধিকার আছে যেখানে, সেখানেই থাবা দিতে চায় সে রুদ্ধ আক্রোশে।

অন্যমনস্কভাবে স্টিলের বাকসটা লকারে রাখতে গিয়ে স্প্রিং দেওয়া বোতামটায় হাত লাগল। বাকস সরিয়ে বোতাম টিপে খুলে ফেলল গোপন কক্ষ। মনে পড়ে গেল বছর পাঁচেক আগের সেই দিনটির কথা। আজ থেকে ঠিক পাঁচ বছর আগে। ভেবেই শিউরে উঠল কণাদ। শ্রাবণ মাসের একত্রিশ তারিখ। একষট্টি সালের ষোলই আগস্ট। বিবাহ বার্ষিকীতে আলমারিটা উপহার দিয়েছিল কণাদ তার প্রিয়তমা স্ত্রী লিলিকে। তখন মাইনে ছিল ছশো টাকা। লিফট পায়নি। ইনস্টলমেন্টে কিনেছিল দামী আলমারী। ঘরে এনে লকার খুলে ওই গুপ্তকক্ষ দেখিয়েছিল। গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল লিলি। বাঁহাতে জড়িয়ে ধরেছিল তাকে। মনে হয়েছিল ওর থেকে সুখী স্বামী কোথাও নেই। কনকন করে উঠল বুকের ভেতরটা সেকথা স্মরণ করে। দীর্ঘশ্বাস চেপে গোপন কক্ষ খুঁটিয়ে দেখল। পাথর বসানো সরু একটা আংটি। সাপের মাথায় মুকতো আর দু চোখে চুনী বা ওই জাতীয় কোন লাল পাথর। এ আংটি আগে কখনো দ্যাখেনি কণাদ। আবার জ্বালা করে উঠল বুকের ভেতরে। লিলির গোপন সম্পত্তি। অবৈধভাবে অর্জিত! ইচ্ছে হল ছুঁড়ে ফেলে দেয় ওটাকে। কিম্বা মাটিতে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে গুঁড়ো করে ফ্যালে।

মরা টিকটিকি হাতে লাগলে যেমন ঘেন্নায় শিরশির করে সারা গা তেমনি অনুভূতি নিয়ে ফেলে দিল আংটিটা গুপ্ত-কক্ষে। তারপর আর একবার হাত ঢোকাল সেই গহ্বরে। খসখস করে উঠল কিছু কাগজপত্র। সাপটে সব কিছু দলামুচি করে বাইরে নিয়ে এল।

খান কয়েক চিঠি আর একশ টাকার নোট সাতখানা। নোটগুলো পকেটে পুরে একখানা চিঠি খুলল। মাই সুইট সুইট, সুইটেস্ট. কেউ একজন লাইনটানা প্যাডে ইংরেজিতে চিঠি লিখেছে। তলায় একাক্ষর স্বাক্ষর। পড়তে ইচ্ছে হল না। চিঠিগুলো রেখে দিল গুপ্ত গহ্বরে। তারপর লকার বন্ধ ক র কি এক অসহ্য অস্থিরতায় তছনছ করতে থাকল আলমারীর প্রতিটি সেলফ। কাগজের তলায়, কাপড়ের ভাঁজে, রুপোর বাটির ভেতরে, দশ টাকা, পাঁচ টাকা, এক টাকার নোট। গুনে দেখার প্রবৃত্তি ছিল না। সব টাকা, যা কিছু হাতে উঠল প কেটে চালান করে, আলমারী বন্ধ করে স্যুটকেশ হাতে তুলে নিল। আর কোন আকর্ষণ অনুভব করছে না সে বিগত আট বছর যাবৎ অভ্যেস হয়ে যাওয়া পুরোনো ঘরখানার প্রতি। ব্যর্থ ক্রোধ আর প্রতারণার জ্বালা এ ঘরের প্রতি দেওয়ালে প্রতিটি আসবাবে আঁকা হয়ে আছে।

ফ্ল্যাটের দরজায় চাবি বন্ধ করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে খেয়াল হল, ওই যাঃ, আলোটা নেভা না হয়নি, ফ্যানটা বন্ধ করা হয়নি। না হোক গে। লিলি তো আর সারা রাত বাইরে থাকছে না? ডুপ্লিকেট চাবির সেট আছে তার ব্যাগে। ঘরে এ স যা করবার করবে। ইলেকট্রিকের বিল শোধ করতে আসছে না কণাদ।

২

খালি ট্যাকসিটা দাঁড়িয়েছিল সামনে, ঠিক যেখানে মিনিট পনেরো আগে ট্যাকসি থে ক নেমেছিল কণাদ। পেছনের দরজাটা একটুখানি খোলা। ভেতরে গিয়ে বসার আহ্বান জানাচ্ছে। হঠাৎ মনে হল, সেই ট্যাকসিটাই বুঝি?

অনায়াস ভঙ্গীতে দরজা খুলে ভেতরে গিয়ে বসল কণাদ। স্যুটকেশটা পায়ের কাছে রেখে ঝড়াক করে বন্ধ করে দিল দরজা। পাঞ্জাবী ড্রাইভার স্টিয়ারিং হুইলে ভর

দিয়ে ডান পাশের জানলা দিয়ে তাকিয়ে ছিল বাইরে। সুর ভাঁজছিল গুন গুন করে। কণাদকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে এক লহমায় চাবি ঘুরিয়ে স্টার্ট দিল গাড়িতে আর ট্র্যাফিক সিগন্যাল হলদে থেকে লাল হবার মুখে সাঁ করে চৌরাস্তা ছাড়িয়ে ছুটে দিল সোজা। সেই সময়ে বাঁদিকে একটা হৈ-চৈ শুনে ঘাড় ফিরিয়েছিল কণাদ। মোড়ের পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তারই মত চেহারার কালো টেরিলিন প্যান্ট আর সাদা সার্ট পরা একজন ভদ্রলোক মুখে সিগারেট নিয়ে ট্যাক্সিটার উদ্দেশে দিয়ে আতঙ্কে উঠে চিৎকার করছে। আর পাঁচজন পথচারী বিস্মিত হয়ে দেখছে তাকে। চলন্ত গাড়ি থেকে পিছন দিয়ে লোকটিকে দেখতে চেষ্টা করছিল কণাদ। লোকটি প্রাণপণে দু হাত তুলে ছুটে আসতে চেষ্টা করছে। সেই সময়ে চোখে পড়ল, পেছনের কাচের সামনে একটা প্রায় নতুন এ্যাটাচি কেস রাখা আছে। সমস্ত দৃশ্যটা চোখের সামনে ঘটে গেল সম্ভবত পাঁচ থেকে সাত সেকেন্ডের মধ্যে।

এতক্ষণে ব্যাপারটার গুরুত্ব অনুধাবন করে আশঙ্কায় বুকের ভেতরে দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল তার। ওই লোকটি ট্যাক্সি থেকে নেমে সিগারেট কিনতে গিয়েছিল। সেই ফাঁকে কণাদ এসে উঠেছে ট্যাক্সিতে। তাই মিটার ডাউন করার প্রয়োজন হয়নি ড্রাইভারের। তারপরের ঘটনা ঘটল চোখের সামনে। এখন কি করা উচিত ? এ্যাটাচিতে নিশ্চয়ই ভদ্রলোকের ঠিকানা আছে। ড্রাইভারকে গাড়ি থামিয়ে ফিরে যেতে বলবে ? তাহলে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াবে ? কলকাতার পাবলিক কি চিজ তা জানতে বাকি নেই তার। আগে ধোলাই, পরে কথা। এখন কণাদের প্যান্টের পকেটে প্রায় দেড় হাজার টাকা। কোন কথা বলার আগেই সে টাকা বেহাত হয়ে যাবে। সুতরাং—

ট্যাক্সি ড্রাইভার টুক করে রাসবিহারী মোড় পেরিয়ে সর্টকার্ট ধরেছে হরিশ মুখার্জি রোড ধরে। গন্তব্য নিশ্চয়ই জানা আছে আগে থেকে। না হলে এমন নিশ্চিন্ত মনে গাড়ি চালাবে না পাঞ্জাবী ড্রাইভার। এ্যাটাচি কেসটা কোলের ওপরে টেনে আনল কণাদ। চাবি দেওয়া। অবশ্য এ চাবি খুলতে অসুবিধে নেই। তার পিছনেই আছে। পাশে সরু চেন দেওয়া পকেট। চেন খুলে হাত ঢোকাল। উঠে এল খামে মোড়া একটা টিকেট। হরিশ মুখার্জি রোডে আলো বড় কম। এলগিন রোডের মোড়ে সিগন্যাল পেয়ে গাড়ি দাঁড়াল। পাশের ওষুধের দোকানের উজ্জ্বল আলো ভেতরে এসে পড়ছিল। টিকেটটা থ্রি টায়ার স্লিপার রিজার্ভেশনের। কাগজটা এ রায় নামক এক ব্যক্তির দেরাদুন যাওয়ার ছিল— কনসেশন রিটার্ন টিকেট। আজকের দুন একসপ্রেস চেপে যাওয়ার কথা।

এতক্ষণে ট্যাক্সিটার গন্তব্যের হদিশ পাওয়া গেল। বেচারা ড্রাইভার কালো প্যান্ট আর সাদা সার্ট দেখেই আসল যাত্রী বলে ধরে নিয়েছে। ভদ্রলোকের পোষাক পরা কোন জোচ্চোর এখন অনায়াসে গাড়িতে ঢুকে গদীয়ান হতে সাহস পাবে না। হঠাৎ মাথায় দুর্বুদ্ধি ঝিলিক দিয়ে গেল। কি আশ্চর্য ! সে তো নিরুদ্দিষ্ট হবার চিন্তা নিয়েই বেরিয়েছিল বাড়ি থেকে। শ্রীযুক্ত এ রায় যখন ট্রাভেল এজেন্টের মত টিকেট কেটে, রিজার্ভেশন করে এমন কি ট্যাক্সি ডেকে হাওড়া স্টেশনে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে রেখেছে তখন ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেওয়াই তো ভাল ! দেখাই যাক না, কতদূর যাওয়া যায় !

কিন্তু এ রায় মশাই ঠিক এই মুহূর্তে কি করছেন, সেটা ভেবে নেওয়া উচিত। ট্যাক্সি উধাও হয়ে গেছে দেখে চৌরাস্তার ট্র্যাফিক পুলিশের কাছে যাবে নিশ্চয়ই। তবে কর্তব্যরত ট্র্যাফিক পুলিশ জায়গা ছেড়ে নড়বে বলে মনে হয় না। থানায় যেতে বলবে। বালিগঞ্জ থানার ও-সি সর্বদাই ব্যস্ত। সেখানে গিয়ে পৌঁছুতে লাগবে মিনিট পনেরো। ও-সির মনোযোগ আকর্ষণ করতে আরও পাঁচ মিনিট। অর্থাৎ তার ট্যাক্সি যখন রেসকোর্সের পাশ দিয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে উত্তর মুখে তখনো মুখ তুলে চাননি ও-সি। চেয়ে দেখার পর রাইটার কনস্টেবলকে তিনি ডাক দেবেন ডায়েরী করার জন্যে। তার আগে রায়মশাইকে ধমক খেতে হতেও পারে। ট্যাক্সিতে মালপত্র রেখে ওইভাবে সিগারেট কিনতে গিয়েছিল কেন ? ট্যাক্সির নম্বর নিয়েছে কি ? সচরাচর লোকেরা কষ্টটুকুই নেয় না।

আবার চমক লাগল কণাদের মাথায়: হাওড়া স্টেশনে যাচ্ছিল। সঙ্গে দেরাদুনের টিকেট। তার মানে হোল্ডল ইত্যাদি নিশ্চয়ই বুট-এ রেখেছে। এসব ক্ষেত্রে কিছু বলতে হয় না। ড্রাইভার নিজে এসে বুট খুলে তুলে ধরে। তাহলে আর ঝামেলা থাকে না। না হলে কি করবে ? শুধু এ্যাটাচিটা নিয়ে নেমে যাবে ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে ? কিন্তু সত্যি যদি মাল থাকে বুটে আর সে খোঁজ না নেয়, তাহলে ড্রাইভার কি ভাববে ? ভয়ঙ্কর ভুলো মন, এমন একখানা ভান করতে হবে।

কিন্তু পুলিশ কি করবে ? হাওড়া স্টেশনের পুলিশকে টেলিফোনে এ্যালার্ট করে দিয়ে এ রায় নামক ভদ্রলোকের রিজার্ভ করা বার্থে কোন প্রতারক যাচ্ছে তাকে হাতে-নাতে ধরার ব্যবস্থা করবে কি পুলিশ ? সে ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হল বার্থের নম্বর জানা নেই। অবশ্য পুলিশ যদি প্রাণপণ চেষ্টা করত তখন কণাদের পক্ষে সমূহ বিপদের কারণ থাকত। এখনো যে নেই, তাই বা কি করে বলা যায়। অন্তত এই মুহূর্তে সেই রকম ভরসা পাবার চেষ্টা করেও বুকের ধুকপুকানি থামাতে পারছে না কেন ? কিছুক্ষণ আগে লিলির ওপরে রাগে, ঘৃণায়, ক্ষোভে মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছিল তার। সেই তাড়নায় দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে সংসারের খরচের টাকা এবং লিলির জমানো সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল যেদিকে দু চোখ যায়। সেই ভাবেই পালাতে পারছে বটে, কিন্তু এই মুহূর্তে অন্য আর এক দুশ্চিন্তা, ভয় এবং অনুশোচনা পীড়িত করছে মনকে। ধরা পড়লে প্রকারান্তরে চোরের দায় চাপবে ঘাড়ে। সেই ভয়ে শুকিয়ে যাচ্ছিল গলা। অনুশোচনা জাগছিল এই ভেবে যে অসহায় একজন ভদ্রলোক যার নামটুকু মাত্র জানা গেছে টিকেটের কাগজখানা থেকে, তার সর্বস্ব অপহরণ করে যাত্রা পণ্ড করে, সে বিপাকের মধ্যে ঠেলে দিল, কে জানে! না ফিরে গিয়ে ভদ্রলোকের জিনিসপত্র ফিরিয়ে দিয়ে কিঞ্চিৎ লোকসান পুষিয়ে দেবার কথা এখন আর ভাবা যায় না। হয়তো অফিসের কাজে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। এখন ওঁকে খুঁজে পাওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। কারণ ঠিকানা জানা নেই। হাওড়া স্টেশনে নেমে এ্যাটাচি কেস খুলে যদি ঠিকানা পাওয়া যায়, তবে ফিরিয়ে দিয়ে আসা সম্ভব। কোন একটা গল্প খাড়া করে দিলেই চলতে পারে। কিন্তু যদি ঠিকানা না পাওয়া যায় ? তখন থানায় জমা দিতে হবে জিনিসপত্র। তাতে রায় মশায়ের যে কোন উপকার হবে, তা মনে হয় না। কারণ বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা এবং পুলিশে ছুঁলে একশ আঠারো। পুলিশের জিম্মা থেকে জিনিসপত্র ফিরে পাওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়।

ভাবতে ভাবতেই হাওড়া ব্রিজের ওপরে উঠে এসেছিল ট্যাক্সি। আর মাত্র দু-তিন মিনিট। তারপরেই গাড়ি থামবে স্টেশনের গাড়িবারান্দায়। যদি যোগাযোগ পুলিশ তৎপর হয়ে ওঠে, যদি ট্যাক্সির নম্বর জানতে পেরে টেলিফোন মারফৎ হাওড়ার জি আর পিকে এ্যালার্ট করে দিয়ে থাকে তাহলে এতক্ষণে তার অদৃষ্টে জাল পাতা হয়ে গেছে। শুধু গিয়ে ধরা দেওয়ার অপেক্ষা। দুষ্কৃতকারীকে ধরতে পেরে পুলিশ কর্তাদের গোঁফ শিকারী বেড়ালের মত ফুলে উঠবে।

সন্তর্পণে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখছিল কণাদ। ভীষণ ঢিব ঢিব করছে বুকের ভেতরে। না পুলিশের চিহ্ন নেই। হয়তো গোপনে অপেক্ষা করে আছে। থাকলে আর কি করা যাবে। ভাগ্য যেখানে নিয়ে যাচ্ছে সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার সাধ্য কোথায় তার ?

সর্দারজী গাড়িবারান্দায় ট্যাক্সি ঢুকিয়ে বাইরে বেরুতে না বেরুতেই লাল জামা পরা দুজন কুলি ছুটে এসে দাঁড়াল ট্যাক্সির পিছনে। সর্দারজী বুট খুলে দিতে একটা পেট মোটা হোল্ডল এবং একটা বড় স্যুটকেস বার করে নিল তারা

কটা সময় নিয়ে মিটার দেখে পকেট
ক ভাড়া বাবদ পাঁচ টাকার একটা নোট
ত নিয়ে নামল কণাদ। সাড়ে চার টাকার
ভাড়া উঠেছিল মিটারে। নোটখানা নিয়ে
শই সর্দারজী কোমরের কাশ খুলে
না বার করতে যাচছিল, ঠিক হ্যায়,
তাকে নিরস্ত করল কণাদ। সঙ্গে সঙ্গে
তুলে সেলাম জানালো সর্দারজী।

স্টেশনের কুলিরা খুবই বিবেচক
ত হবে। একজন ব্যক্তি বড় স্যুটকেশ
হোল্ডল মাথায় নিল। কণাদের ছোট
কেশটাও তার হাত থেকে নিয়ে নিল
কুলি। পরের এ্যাটাচি হাতে নিয়ে
দুরু বুকে প্ল্যাটফর্মের ভেতরে
য়ে যেতে থাকল কণাদ। কোন গাড়ি
কুলির এই প্রশ্নের জবাবে অস্ফুটে
এক্সপ্রেস কথাটি উচ্চারণ করে মুখ
করে কুলির পেছনে পেছনে হাঁটতে
ল সে।

৩

কুলির পিছু পিছু প্ল্যাটফর্মে ঢুকে
ক হয়ে গেল কণাদ। ডানদিকে ৬ নম্বর
টফর্মে যে গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল, তার
। কামরাটার গায়ে লেখা ছিল দুন
প্রেস। কোনো ট্রেন যে এতবড় হতে
। সে রকম ধারণা ছিল না তার।
র বিশেষ যেতে হয়নি তাকে এ যাবৎ।
র গিয়েছিল পুরী। সে সেই বিয়ের
প্রায় আট-ন বছর আগে। দ্বিতীয়বার
ছিল দার্জিলিং। বছর চারেক আগে,
সর আপ্যায়নশালায়। সেই দুবারই
া সঙ্গে থাকায় অন্য কোনদিকে ভাল
লক্ষ্য করার ফুরসৎ পায়নি। কণাদের
পার্ড ক্লাশ স্লিপারের রিজার্ভেসন
। সেটা জেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ভিড়
এগিয়ে যাচ্ছিল কুলি। যাচ্ছে তো
ছই। কামরার পরে কামরা জুড়ে এ
সুবৃহৎ ট্রেনের ব্যবস্থা। প্রায় শেষ
ত এসে কুলি বলল, ইয়ে দো
পার কামরা হ্যায়, দেখিয়ে কাঁহাপর
কা রিজার্ভেসন হ্যায়।

কিন্তু লোক ভীড় করে দেখছিল,
যার গায়ে লাগানো রিজার্ভেসন চার্ট।
ল ভাল বলতে হবে। দশ-বারটা
র পরেই একটা নাম পাওয়া গেল এ
টিকেট নম্বরটাও লেখা আছে পাশে।
পলে এ্যাটাচির চেন খুলে টিকেট
করে টিকেট নম্বরটাও দেখে নিল।
ল টিকেটের নম্বার নয়, রিজার্ভেশন
টের নাম্বরটা মিলে গেল। সাহস পেয়ে
হাতে নিয়ে টাই পরা এক ভদ্রলোককে
া, এক্সকুজমি আমার রিজার্ভেসনটা
নম্বরে। চশমাটা বাকসে রয়ে গেছে—

বেশি বলতে হল না। কণাদের
স একবার চোখ বুলিয়ে আশ্বস্ত হয়ে
লোক সেই সতের নম্বর বার্থটাই
য়ে দিয়ে ফেরৎ দিলেন টিকেট।
কে ইসারা করে গাড়িতে গিয়ে উঠল
কণাদ। সরু করিডোরে যাত্রীদের আনা-
গোনার ফলে যাতায়াতের অসুবিধে হচ্ছিল।
তৃতীয় ক্যুপেটার কাছে এসে নম্বর মিলিয়ে
নিতে গিয়ে দেখল কয়েকজন যুবক
ক্যুপেটিকে প্রায় লাগেজ ভ্যানে পরিণত করে
ফেলেছে। সদাগরী আপিসের অফিসার
কণাদ। প্রত্যেক ব্যাপারে টিপটাপ থাকতে
ভালবাসে। ব্যাপার দেখে বিরক্তিতে মন
ভরে গেল। পেছনে পেছনে জিনিষপত্র
মাথায় নিয়ে কুলি এসে দাঁড়িয়েছিল
প্যাসেজে। ফলে যাতায়াতের পথ বন্ধ হয়ে
গিয়েছিল। পেছনের লোকেরা বিরক্ত হয়ে
ঠেলছিল কুলিকে। সরে দাঁড়াতে বলছিল।
বোধহয় সব প্রদেশের যাত্রী এসে জুটেছে
কামরায়। নানা ভাষার কিচিমিচিতে দিশে
হারা হয়ে যাচছিল কণাদ।

কিতনা নাম্বার বার্থ হ্যায় আপকা
সাহাব ? বলিয়ে গা তো সামান রাখ দেই'

ফর্সা লম্বা একটি ছেলে মাল টানা-
টানি করছিল। নির্দেশ দিচ্ছিল সঙ্গীদের
মালপত্র ঠিকমত সাজিয়ে রাখার জন্যে।
তাকে জিগেস করল কণাদ, সতের নম্বর
বার্থটা—

ও, আপনিই সতের নম্বর ? আসুন,
এই যে আপনার বার্থ। সামনের লোয়ার
বার্থটা দেখিয়ে দিল সে। ওই কি আপনার
মাল ? রাখো রাখো ইঁহাপর রাখো।
বার্থের ওপর থেকে দুটো রুকস্যাক ঠেলে
সরিয়ে জায়গা করে দিল ছেলেটি।

কুলিকে পয়সা দিয়ে নিজের চারদিকে
চেয়ে দেখল কণাদ। সতের নম্বরের এই
লোয়ার বার্থটি তার আজকে রাতের মত
আশ্রয়। আর এই পাঁচটি ছেলে, ক্যুপের
বাকি পাঁচটি বার্থের অকুপ্যান্ট। দেরাদুন
যেতে কতক্ষণ লাগে, জানা নেই তার। এই
ছেলেগুলি কতদূর যাবে, সেটাও জানা
নেই। যাই হোক, আপাততঃ কিছু খাওয়া
দরকার। কেমন যেন হাঁফ ছাড়া ভাব মনে
আসা মাত্র খিদেটা চাগিয়ে উঠেছে। সাহস
করে জিজ্ঞাসা করল সেই ছেলেটিকে, গাড়ি
ছাড়তে আর কতক্ষণ আছে ?

সঙ্গীদের মধ্যে কালো রঙের লম্বা
ভারী চেহারার একটি যুবক বলল গাড়ি
ছাড়বে সওয়া নটায়। এখনো পঁয়ত্রিশ
মিনিট বাকি।

জিনিসপত্রগুলো থাকবে ? আমি একটু
খেয়ে আসব ?

খেয়ে আসেন নি ? জিজ্ঞাসা করল
সেই ফর্সা ছেলেটি। তার জিজ্ঞাসার ধরণ
দেখে এবং গলার আওয়াজ শুনে মনে হল
ভয়ানক একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছে
কণাদ। এই বয়সের সাধারণ যুবকদের কাছ
থেকে এ ধরনের ব্যবহার কণাদের কাছে
অপ্রত্যাশিত। তার আন্ডারে পঁচিশ থেকে
ত্রিশ বছরের অনেকগুলি ছেলে কাজ করে।
সকলেই শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান। যথেষ্ট
সমীহ করে তারা সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
কণাদকে।

উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে চাবি বার
করে নিজের স্যুটকেশটা খুলে ফেলল
কণাদ। তার ভেতরে ঢুকিয়ে নিল রায়ের
এ্যাটাচিটা। স্যুটকেশ বন্ধ করে হাতে তুলে
নিল। বলল, আপনারা নিশ্চয়ই খেয়ে
এসেছেন। জিনিসগুলো রইল। দেখবেন।
স্যুটকেশ হাতে নিয়ে প্যাসেজ দিয়ে গিয়ে
প্ল্যাটফর্মে নামল কণাদ। আধ ঘন্টা সময়
পাওয়া গেছে। স্টেশনের ভেতরে রেস্তোরাঁয়
গিয়ে খেয়ে আসতে পারবে না এই সময়ের
মধ্যে ?

বিরাট গাড়িটা লম্বায় বোধহয় দুশো
গজ হবে। এ্যাটাচি ভরে নেওয়ার ফলে
ছোট স্যুটকেশটা ভারী হয়ে গেছে। প্রায়
দৌড়ে পেরিয়ে এল সে দীর্ঘ প্ল্যাটফর্মটি।
নন্-ভেজিটেরিয়ান রেস্তোরাঁয় অল্প কিছু
লোক এ কোণায় সে কোণায় ধীরে সুস্থে
খাচ্ছিল। একজন বয়কে ধরে কণাদ বলল,
আভি হামারা ট্রেন ছুটেগা। বহোৎ জল্দি
কুছ খানেকা লিয়ে লাও।

মাথা ঝুঁকিয়ে দৌড়ে চলে গেল বয়।
ভেতরে খাবার অর্ডার দিয়ে জল ভর্তি
গ্লাস এনে রাখল সামনে। যা কখনো করে
না, তেমনি অপ্রীতিকর একটা কাজ করে
বসল কণাদ। গ্লাসের জল হাতে নিয়ে হাত
এবং ঠোঁট ধুয়ে নিল। একটা কাটলেট,
দু-পিস রুটি আর একটা ফিসরোল বড়
একটা প্লেটে করে সামনে এনে দিল বয়।
অন্য টেবিল থেকে সসের বোতল এনে
রাখল টেবিলে। গোগ্রাসে খাবার খেতে
খেতে হুকুম দিল কণাদ, কফি লাও
জলদি।

(চলবে)

বাঘা ক্রিকেটার পাতৌদি

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সমস্ত মাঠ তখন উত্তেজনায় ছটফট করছে। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা আক্রমণে শান দিচ্ছেন। বোরদের ওপর ভরসা রাখা যায়। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ সিং। তিনি সবে তাঁর জীবনের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ খেলছেন।

কিন্তু বোরদে তখন সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন। ইন্দ্রজিৎকে আগলে রেখে বোরদে খেলতে লাগলেন। বোরদের খেলা দেখে সিম্পসন বাধ্য হলেন ম্যাকেঞ্জি আর কনোলীকে সরিয়ে নিতে। ভিভার্সের হাতে বল তুলে দিলেন তিনি।

দলের রান তখন ২৪৪। আর মাত্র দশ রান দরকার। ভিভার্সের একটা বল ফস্কালেন বোরদে। ধরতে পারলেন না জারম্যানও। বল ছুটে গেল বাউণ্ডারিতে। চার বাই। ২৪৮ রান। বোরদের তখন ২২ রান। পর পর দুটো বল ব্যাট দিয়ে ঠেলে দিলেন। পরের বলটা একটু সর্ট পিচ ধরনের ছিল। বোরদে চকিতে সরে গেলেন। তারপর মারলেন প্রচণ্ড জোরে। সোজা বাউণ্ডারি। ২৫২ রান। আর চাই মাত্র দু রান।

ভিভার্স বল করলেন। লেগ স্টাম্পের ওপর। বোরদে ক্রিজ ছেড়ে এগিয়ে এলেন। চকিতে নেমে এল তাঁর ব্যাট। জোরে....প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলো বলটাকে। মুহূর্তের মধ্যে বলটা পৌঁছে গেল বাউণ্ডারিতে....

এবং জিতে গেল ভারত।

তরুণ দলনায়ক পাতৌদির নেতৃত্বে ভারতের সেই প্রথম জয়।

॥ বারো ॥

তৃতীয় ও শেষ টেস্ট ম্যাচ ছিল কলকাতায়। কলকাতার ইডেন উদ্যানে খেলতে পাতৌদির বরাবরই ভাল লাগে। তিনি জানেন, কলকাতার দর্শকরা তাঁকে পছন্দ করেন, ভালবাসেন। সত্যিকারের ক্রিকেট সমঝদার বলতে যা বোঝায় — কলকাতার দর্শকরা তাই। কিন্তু কলকাতার দর্শকদের মন পাতৌদি ভরিয়ে দিতে পারেন নি।

ইডেনের পিচ থেকে ফাস্ট বোলাররা প্রথম দিকে যথেষ্ট সাহায্য পান। অনেকখানে করে বল সুইং করাতে পারেন। তা ছাড়া আবহাওয়াও তেমন ভাল না। পাতৌদি তাই টসে জিতেও ব্যাট করতে পাঠালেন অস্ট্রেলিয়াকেই।

কিন্তু সিম্পসন আর লরী দারুণ খেলতে লাগলেন। দিব্যি রান তুলতে লাগলেন তাঁরা। ভারতীয় বোলাররা হাজার চেষ্টা করেও দাঁত ফোটাতে পারলেন না। দুজনে মিলে অস্ট্রেলিয়ার রানকে একশর কাছাকাছি পৌঁছে দিলেন।

পাতৌদি তখন কভারে দাঁড়িয়ে আঙুল কামড়াচ্ছেন। বার বার বোলার বদল করছেন। ভাবছেন, অস্ট্রেলিয়াকে আগে ব্যাট করতে পাঠিয়ে তাহলে কি ভুলই হয়েছে? কিন্তু তখনও তিনি তা মেনে নিতে পারছেন না। অথচ রান যে শ ছুঁই ছুঁই।

পাতৌদির বড় আস্থা ছিল সেলিম দুরানীর ওপর। ভারতীয় ক্রিকেটের অবহেলিত এই খেলোয়াড়টি যে কোন সময় ভেল্কি দেখাতে পারেন — তা সে ব্যাটে কিম্বা বলে হোক। সেই দুরানীই তখন পাতৌদির প্রত্যাশা পূর্ণ করতে এগিয়ে এলেন। তাঁর হাত থেকে ছাড়া পাওয়া বলগুলো ইডেনের পিচে লাট্টুর মত ঘুরতে শুরু করল। ভুলের ফাঁদে জড়াতে শুরু করল অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানদের। উইকেট পড়তে শুরু করল। একটির পর একটি।

অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানদের কাছে সেই মুহূর্তে দুরানীর ভয়ংকর মূর্তি। বিনা উইকেটে একশর কাছাকাছি রান থেকে অস্ট্রেলিয়ার রান পৌঁছুল ১৭৪। এই ফাঁকে তারা হারিয়েছে সব কটি উইকেট। দুরানী ছটি উইকেট দখল করলেন ৭৩ রানের বিনিময়ে। হাসি ফুটে উঠল অধিনায়ক পাতৌদির মুখে। অস্ট্রেলিয়াকে আগে ব্যাট করতে পাঠিয়ে তিনি ঠিকই করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হল।

ভারত খুব বেশী রান করতে পারল না। ২৩৫ রানে শেষ হল ভারতের ইনিংস। প্রথম ইনিংসের ফলাফলে ভারত এগিয়ে গেল ৬১ রানে। খেলার তখন যা অবস্থা তাতে ঐ ৬১ রানে এগিয়ে যাওয়াটাই হয়ত ভারতের জয়ের পথে এগিয়ে যাওয়া পাকা করে দিতে পারত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হল না। অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করতে নেমে এক উইকেটে ১৪৩ রান করার পর বৃষ্টি শুরু হল। শেষের দু দিন খেলাই হতে পারল না।

তবে সেই প্রথম ভারত অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সম্মান ভাগাভাগি করে নিল। এর আগে সফরকারী অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারত ১৯৫৬-৫৭ সালে হেরেছিল ২-০ খেলায় আর ১৯৫৯-৬০ সালে ২-১ টেস্টে। আর এবারের মরশুম শেষ হল ১-১ টেস্টে অমীমাংসিতভাবে। মাদ্রাজের প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া জিতেছিল। ভারত জিতল বোম্বাইয়ের দ্বিতীয় টেস্টে। আর কলকাতার তৃতীয় ও শেষ টেস্ট ম্যাচ বৃষ্টির জন্যে ড্র হয়ে গেল।

কটা মাস কাটতে না কাটতেই নিউজিল্যাণ্ড ভারত সফরে। তখন ১৯৬৫ সালের ল্যাণ্ড এল ভারত সফরে। তখন ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। দশ বছর আগে নিউজিল্যাণ্ড প্রথম ভারত সফরে এসেছিল। তারপর এই। জন রিড ছিলেন তাদের অধিনায়ক। ভারতে তারা ৪টি ৪ দিনের টেস্ট খেলবে। তারপর যাবে পাকিস্তানে। সেখান থেকে ইংলণ্ড। পাকিস্তান ও ইংলণ্ডে নিউজিল্যাণ্ড খেলতে ৩টি করে টেস্ট ম্যাচ।

পর পর তিনটি টেস্ট ম্যাচ ড্র হল। আসলে ৪ দিনের খেলা ছিল বলেই হারজিতের মীমাংসা হয় নি। মাদ্রাজ টেস্টে বিজয় মঞ্জরেকার সেঞ্চুরী করেছিলেন। মনে রাখার মত খেলা সেদিন মঞ্জরেকার খেলেছিলেন।

কলকাতায় কিন্তু ইডেনের সবুজ উইকেটের সুযোগ নেবার মত কোন ফাস্ট বোলার ভারতীয় দলে ছিল না। নিউজিল্যাণ্ড ৯ উইকেটে ৪৬২ রান ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করে দিল। বার্ট সাটক্লিফ আর ব্রুস টেলর সেঞ্চুরী করলেন। জন রিড করলেন ৮২ রান। এর মধ্যে তিনি চার-চারটি ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন। ব্যাট হাতে নিয়ে টেলর সেঞ্চুরী করলেন তারপর বোলিং করতে এসে তিনি মাত্র ৮৬ রানের বিনিময়ে ভারতের ৫ জন ব্যাটসম্যানকে ফিরিয়ে দিলেন। ভারতের সেই বিপর্যয়ের মুহূর্তে লড়ে গেলেন অধিনায়ক পাতৌদি আর বোরদে এবং ওঁদের দুজনের জন্যেই ভারত হার এড়াতে পেরেছিল। পাতৌদি করলেন ১৫৩ রান।

ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়ামের ঘাসে ভরা উইকেট খেলার শুরুর দিকে ছিল ফাস্ট বোলারদের স্বর্গ। রমাকান্ত দেশাই নিউজিল্যাণ্ডের ইনিংস তছনছ করে দিচ্ছিলেন। কিন্তু সহ-অধিনায়ক ডাউলিংয়ের ১২৯ ও মরগানের ৭১ রান তাদের ভরা ডুবির হাত থেকে বাঁচাল। ওঁদের দুজনের জন্যেই নিউজিল্যাণ্ড ২৯৭ রানে তাদের প্রথম ইনিংস শেষ করতে পারল। কিন্তু তারপর?

তারপর এই অবিশ্বাস্য বিপর্যয়ের কাহিনী। ব্রাবোর্ণের ঘাসে ভরা উইকেটের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে টেলর, মজ আর কংডন ধ্বস নামিয়ে দিলেন ভারতের ইনিংসে। মাত্র ৮৮ রানে শেষ হয়ে গেল ভারতের প্রথম ইনিংস। ফলো অন করতে হল ভারতকে। কিন্তু এবার রুখে দাঁড়াল দিলীপ সরদেশাই, চাঁদু বোরদে আর হনুমন্ত সিং। সরদেশাই অপরাজিত থেকে ২০০ রান করলেন। বোরদে ১০৯। আর হনুমন্ত ৭৫ রানে অপরাজিত। ৫ উইকেটে ৪৬৩ রানের মাথায় পাতৌদি ভারতের ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে দিলেন। খেলার তখন আর ঘন্টা আড়াই বাকী। ভারত ২৫৪ রানে এগিয়ে। অর্থাৎ বাকী সময়ের আনুষ্ঠানিক খেলা মাত্র।

কিন্তু সেই আনুষ্ঠানিক খেলাই দারুণ এক সমালোচনার খোরাক হয়ে দাঁড়াল। ভারতীয় স্পিনারদের সামনে নিউজিল্যাণ্ডের ব্যাটসম্যানরা অসহায়ের মত

কর পর এক আউট হয়ে যেতে লাগলেন। ৮০ রানের মধ্যে নিউজিল্যান্ড হারাল উইকেট। জয় তখন প্রায় হাতের মুঠোর । দিনের শেষ ওভার শুরু হল। পে ফেলে দিলেন একটি সহজ ক্যাচ। পড়ে যাওয়া ক্যাচটিই নিউজিল্যান্ডকে রয়ে আনল হারের মুখ থেকে। তখনও জিল্যান্ড ১৭৪ রানে পিছিয়ে। একটু য় থাকলেই ভারত সেই টেস্টে জিতে ।

আর তাই নিয়ে সারা ভারত জুড়ে গেল সমালোচনার ঝড়। পাতৌদির ত ছিল আরও আগে ইনিংস সমাপ্তি ঘণা করা। আসলে পাতৌদি যেটুকু য় দেরী করেছিলেন তা ঐ দিলীপ সর-াইকে ডবল সেঞ্চুরী করার সুযোগ ার জন্যেই। সমালোচকদের মতে সেটাই ক দারুণ অন্যায় হয়েছে।

সেই সমালোচনার জবাব দেবার জন্যেই কোমর বেঁধেছিলেন পাতৌদি আর র দলের খেলোয়াড়রা। দিল্লিতে চতুর্থ ট ম্যাচটি তাই তাঁদের কাছে মস্ত এক ীক্ষা।

পিচ থেকে এতটুকুও সাহায্য না ওয়া সত্ত্বেও ভেংকটরাঘবন আর চন্দ্র-খর মুড়িয়ে দিলেন নিউজিল্যান্ডের নংস। ২৫৭ রানেই ইনিংস খতম। ভারত ট করতে নেমেই খুব তাড়াতাড়ি রান লতে লাগল। সেঞ্চুরী করলেন পাতৌদি, ঞ্চুরী করলেন সরদেশাই। ভারত করল ০ রান। অর্থাৎ প্রথম ইনিংসের ফলা-লই ভারত এগিয়ে গেল ২০৩ রানে। ২য় নংসেও নিউজিল্যান্ড বিশেষ সুবিধে তে পারল না। তাদের ইনিংস যখন শেষ জেতার জন্যে তখন ভারতের দরকার ৭০ । কিন্তু সময় আছে মাত্র ৫০।

কিন্তু আকাশের অবস্থা ভীষণ রাপ। বৃষ্টি শুরু হল বলে। ঐ পরি-শে ৫০ মিনিটে ভারতে ৭০ রান করতে ব। সেই লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্যে রতীয় ব্যাটসম্যানরা পিটিয়ে রান তুলতে গলেন। বৃষ্টি শুরু হবার আগেই যাতে য়র মূলধন জোগাড়ে আনা যায়।

না, তা সম্ভব হল না। বৃষ্টি শুরু য় গেল। উৎকণ্ঠিত পাতৌদি তখন শ। দু দুবার এইভাবে জয় হাতছাড়া য় যাবে? প্যাভেলিয়ানে বসে থাকা রতীয় খেলোয়াড়দের মুখ শুকিয়ে গেল। তা আর হল না। তীরে এসে যেন তরী বে গেল।

ফিরোজ শা কোটলার আকাশে তখন ল মেঘ। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। খেলা আর তে পারে না। কোন অধিনায়কই এই বস্থায় খেলা চালিয়ে যেতে চাইবেন না। র ওপর নিউজিল্যান্ড আবার হারতে ছে। আম্পায়ারের কাছে আবেদন করলেই লা বন্ধ হয়ে যাবে।

কিন্তু নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক রীড সেই ধাতের মানুষ নন। তাঁর ট খেলোয়াড়ী মনোভাব খুব কম অধি-য়কেরই আছে।

তিনি খেলা বন্ধ করার জন্যে আবেদন রলেন না আম্পায়ারদের কাছে। তিনি বললেন, এত অল্প সময়ে, এই পরিবেশে ভারত যদি জিততে পারে জিতুক। তাঁরা খেলে যাবেন।

বৃষ্টির মধ্যেই চলল খেলা এবং ৫০ মিনিটের ৭ মিনিট শেষ হবার আগেই ভারত জয়ের মূলধন সংগ্রহ করে নিল। হেরে গেল নিউজিল্যান্ড। কিন্তু তাদের অধিনায়ক জন রীড দিল্লির ফিরোজ-শা-কোটলার মাঠে রেখে গেলেন এক অবিশ্বাস্য খেলোয়াড়ী মনোভাবের নজির। প্রতি-পক্ষকে জেতার সুযোগ দিতে বৃষ্টির মধ্যে খেলা চালিয়ে যাবার নজির আর বোধহয় নেই....।

অস্ট্রেলিয়া

লরি ক ইন্দ্রজিৎ সিং ব দুরানী	১৬	এল, বি, ডব্লিউ ব চন্দ্রশেখর	৬৮
সিম্পসন ব চন্দ্রশেখর	২৭	ক হনুমন্ত সিং ব সুর্তি	২০
বুথ ব চন্দ্রশেখর	১	স্টাঃ ইন্দ্রজিৎ সিং ব নাদকার্নী	৭৪
বার্জ ক চন্দ্রশেখর ব বোরদে	৮০	ব চন্দ্রশেখর	০
কাউপার এল, বি, ডব্লিউ ব নাদকার্নী	২০	ক ইন্দ্রজিৎ সিং ব নাদকার্নী	৮১
জারম্যান ক দুরানী ব সুর্তি	৭৮	ব চন্দ্রশেখর	০
ভিভার্স ক বোরদে ব চন্দ্রশেখর	৬৭	এল, বি, ডব্লিউ ব চন্দ্রশেখর	০
মার্টিন ব নাদকার্নী	১৭	ক সুর্তি ব নাদকার্নী	৪
কনোলী অপরাজিত	০	অপরাজিত	০
ও'নীল অসুস্থ		অসুস্থ	
অতিরিক্ত	১৪		১১
	৩২০		২৭৪

উইকেট পতন : ১।৩৫, ২।৩৬, ৩।৫৩, ৪।১১২, ৫।১৪৬, ৬।২৯৭, ৭।৩০৩, ৮।৩০৪, ৯।৩২০ — ১।৫৯, ২।১২১, ৩।১২১, ৪।২৪৬ ৫।২৪৭, ৬।২৪৭, ৭।২৫৭, ৮।২৬৫, ৯।২৭৪

বোলিং

সুর্তি	১৮— ১—৭০—১	:	২১— ৫—৭৭—১
জয়সীমা	৮— ১—২০—০	:	১১— ৪—১৮—০
দুরানী	২০— ৫—৭৮—১	:	১৫— ৩—৪৮—০
চন্দ্রশেখর	২৬—১০—৫০—৪	:	৩০—১১—৭৩—৪
নাদকার্নী	২৪.৫— ৬—৬৫—২	:	২০.৪—১০—৩৩—৪
বোরদে	৭— ০—২৩—১	:	২— ০—১৪—০

ভারত

জয়সীমা ব ভিভার্স	৬৬	ক জারম্যান ব কনোলী	০
সরদেশাই ক সিম্পসন ব কনোলী	৩	এল, বি, ডব্লিউ ব ম্যাকেঞ্জি	৫৬
দুরানী ক জারম্যান ব সিম্পসন	১২	ক কাউপার ব সিম্পসন	৩১
মঞ্জরেকার ক কাউপার ব ভিভার্স	৫৯	ক সিম্পসন ব কনোলী	৩৯
পাতৌদি ক ম্যাকেঞ্জি ব ভিভার্স	৮৬	ক বার্জ ব কনোলী	৫৩
হনুমন্ত কিং ব ভিভার্স	১৪	ব ম্যাকেঞ্জি	১১
বোরদে ক সিম্পসন ব মার্টিন	৪	অপরাজিত	৩০
সুর্তি ক জারম্যান ব কনোলী	২১	ক বুথ ব ভিভার্স	১০
নাদকার্নী ক জারম্যান ব মার্টিন	৩৪	ক সিম্পসন ব ভিভার্স	০
ইন্দ্রজিৎ সিং ক রেডপাথ ব কনোলী	২৩	অপরাজিত	৩
চন্দ্রশেখর অপরাজিত	১	ব্যাট করেন নি	
অতিরিক্ত	১৮		২৩
	৩৪১	(৮ উইঃ)	২৫৬

উইকেট পতন : ১।৭, ২।৩০, ৩।১৪২, ৪।১৪৯, ৫।১৮১, ৬।১৮৮, ৭।২৫৫, ৮।২[illegible]৩, ৯।৩৩১ — ১।৪, ২।৭০, ৩।৭১, ৪।৯৯, ৫।১১৩ ৬।১২২, ৭।২১৫, ৮।২২৪

বোলিং :

ম্যাকেঞ্জি	২২— ২—৪৯—০	:	২১— ৬—৪৩—২
কনোলী	২২.৩— ৫—৬৬—৩	:	১৮— ৮—২৪—৩
মার্টিন	৩৪—১১—৭২—২	:	১৪— ২—৩৫—০
সিম্পসন	১৩— ১—৪০—১	:	২৪—১২—৩৪—১
ভিভার্স	৪৪—২০—৬৮—৭	:	৪৩.৪—১২—৮২—২
কাউপার	১৩— ৩—২৮—০	:	৪— ০—১৪—০
বুথ	— — — —	:	৪— ৩—১—০

(চলবে)

খেলা

বিশ্ব ফুটবল কাপ

আগামী জুন ১ তারিখে আর্জেন্টিনায় একাদশ বিশ্ব ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতার যে মূল আসর বসবে তাতে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে ১৬টি দেশ — এই প্রতিযোগিতার প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের খেলায় গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হিসাবে ১৪টি দেশ এবং গতবারের বিশ্ব ফুটবল কাপ বিজয়ী পশ্চিম জার্মানী ও উদ্যোক্তা দেশ আর্জেন্টিনা। এবারের মূল আসরে আগের বিশ্ব ফুটবল কাপ বিজয়ী পাঁচটি দেশের মধ্যে তিনটি দেশও খেলবে — ব্রাজিল, ইতালী এবং পশ্চিম জার্মানী। দুটি দেশ উঠতে পারেনি—১৯৩০ ও ১৯৫০ সালের বিজয়ী উরুগুয়ে এবং ১৯৬৬ সালের বিজয়ী ইংল্যান্ড। দক্ষিণ আমেরিকান জোনের ২নং গ্রুপের লীগ খেলায় উরুগুয়ে ৪ পয়েন্টে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে এবারের মত প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেয়। লীগে উরুগুয়ের খেলার ফলাফল দাঁড়ায়—জয় ১, ড্র ২, হার ১ এবং পয়েন্ট ৪। ২নং গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান বলিভিয়ার থেকে উরুগুয়ে তিন পয়েন্ট কম পায়। ১৯৬৬ সালের বিশ্ব ফুটবল কাপ বিজয়ী ইংল্যান্ড পর পর দুবার (১৯৭৪ ও ১৯৭৮) মূল আসরে উঠতে পারলো না। ১৯৭৪ সালে তাদের সাফল্যের পথে অন্তরায় হয়েছিল পোল্যান্ড এবং এবার ইতালী। ইউরোপীয় জোনের প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের ২নং গ্রুপে ইতালী এবং ইংল্যান্ড সমান ১০ পয়েন্ট করে সংগ্রহ করেছিল। শেষ পর্যন্ত গোলের গড়ে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ইতালী মূল আসরে খেলবার অধিকার লাভ করে। এবারের মূল আসরে উঠতে পারেনি আরও নামকরা তিনটি দেশ—রাশিয়া, পূর্ব জার্মানী এবং চেকোশ্লোভাকিয়া। রাশিয়া ১৯৫৬ সালের এবং পূর্ব জার্মানী ১৯৭৬ সালের অলিম্পিক ফুটবল চ্যাম্পিয়ান। অপরদিকে চেকোশ্লোভাকিয়া ১৯৭৬ সালের ইউরোপীয়ান নেশনস কাপ চ্যাম্পিয়ান। এবার ইউরোপীয়ান জোনে ৯নং গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হাঙ্গেরীর থেকে এক পয়েন্ট কম পেয়ে রাশিয়া দ্বিতীয় স্থান পায়। চারটে খেলায় রাশিয়ার জয় ২ এবং হার ২। রাশিয়া ২—০ গোলে গ্রীস এবং ২—০ গোলে হাঙ্গেরীকে হারায়। আবার ১—২ গোলে হাঙ্গেরী এবং ০—১ গোলে গ্রীসের কাছে হেরে যায়। গতবার (১৯৭৪) রাশিয়া ৯নং গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হয়ে মূল আসরে যোগ্যতালাভের জন্যে চিলির সঙ্গে আর খেলেনি রাজনৈতিক কারণে। এবার পূর্ব জার্মানীর প্রাথমিক লীগের খেলা পড়েছিল ইউরোপীয় জোনের ৩নং গ্রুপে। এই ৩নং গ্রুপে অস্ট্রিয়া ১০ পয়েন্টে প্রথম স্থান এবং পূর্ব জার্মানী ৯ পয়েন্টে দ্বিতীয় স্থান পায়। পূর্ব জার্মানী তিনটে খেলা ড্র করে—অস্ট্রিয়ার সঙ্গে দুটো খেলাই ১—১ গোলে এবং তৃতীয় স্থানাধিকারী তুরস্কের সঙ্গেও ১—১ গোলে। তুরস্কের কাছে এই একটা মূল্যবান পয়েন্ট নষ্ট করায় অস্ট্রিয়ার বরাত খুলে যায়। ইউরোপীয় জোনের ৭নং গ্রুপে চেকোশ্লোভাকিয়া লীগ তালিকায় সর্বনিম্ন স্থান পায়—চারটে খেলায় জয় ১ এবং হার ৩। এই ৭নং গ্রুপের লীগ চ্যাম্পিয়ান স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে যে তারা একটা খেলায় ২—০ গোলে জিতেছে সেটাই তাদের একমাত্র সান্ত্বনা।

আর্জেন্টিনায় একাদশ বিশ্ব ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতার মূল আসরে যে ১৬টি দেশ খেলবে তাদের মধ্যে আফ্রিকার টিউনিসিয়া এবং এশিয়ার ইরাণ এই সর্বপ্রথম বিশ্ব ফুটবল কাপের মূল আসরে খেলবে। একটা লক্ষ্য করার বিষয়, এশিয়া অঞ্চল থেকে কোন দেশ প্রতিযোগিতার মূল আসরে দুবার উঠতে পারেনি। এ পর্যন্ত এশিয়া অঞ্চল থেকে মূল আসরে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে এই পাঁচটি দেশ—১৯৫৪ সালে দক্ষিণ কোরিয়া, ১৯৬৬ সালে উত্তর কোরিয়া, ১৯৭০ সালে ইসরাইল, ১৯৭৪ সালে অস্ট্রেলিয়া এবং ১৯৭৮ সালে ইরাণ।

১৯৭৮ সালের একাদশ বিশ্ব ফুটবল কাপের এশিয়া অঞ্চলের প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের খেলায় চারটি গ্রুপ থেকে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল—হংকং (১নং গ্রুপ), দক্ষিণ কোরিয়া (২নং গ্রুপ), ইরাণ (৩নং গ্রুপ) এবং কুয়াইত (৪নং গ্রুপ)। এরপর এশিয়া অঞ্চলের এই চারটি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান দল এবং ওসেনিয়া অঞ্চলের গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে যে লীগ খেলা হয় তাতে ইরাণ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সূত্রে আর্জেন্টিনার মূল আসরে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। ইরাণ এশিয়ান জোনের ৩নং গ্রুপের চারটে খেলায় ৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছিল এবং ৮ গোল দিয়ে একটা গোলও খায়নি। শেষ লীগে ইরাণের খেলার ফলাফল দাঁড়ায়—খেলা ৮, জয় ৬, ড্র ২, হার ০, স্বপক্ষে গোল ১২, বিপক্ষে গোল ৩ এবং পয়েন্ট ১৪।

ডেভিস কাপ

১৯৭৮ সালের আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া ৪—০ খেলায় নিউজিল্যান্ডকে পরাজিত করেছে। পূর্বাঞ্চলের সেমি-ফাইনালে নিউজিল্যান্ড ৪—১ খেলায় ভারতকে এবং অস্ট্রেলিয়া ৫—০ খেলায় জাপানকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

সেমি-ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া খেলবে ইউরোপীয় 'এ' জোন বিজয়ী দেশের সঙ্গে।

আন্তঃরাজ্য অ্যাথলেটিকস

কাইলনে ষোড়শ রাজ্য অ্যাথলেটিকস আসরে প্রথম স্থান লাভ করেছে কেরালা, দ্বিতীয় স্থান মহারাষ্ট্র এবং তৃতীয় স্থান তামিলনাড়ু। দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে পুরুষ বিভাগে মহারাষ্ট্র এবং মহিলা বিভাগে কেরালা। ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান খেতাব পেয়েছে কেরালার ১৩ বছরের মেয়ে পি টি উষা। সে ৫টি ইভেন্টে নেমে পদক পেয়েছে ৫টি—স্বর্ণ ৪ এবং রৌপ্য পদক ১। তার ৪টি স্বর্ণপদক জুনিয়র বালিকা বিভাগে ৩ এবং সিনিয়র বিভাগের ২০০ মিটার দৌড়ে ১। কেরালার সুরেশ বাবু পুরুষ বিভাগে এবং তাঁর ছোট ভাই সত্যানন্দ সিনিয়র বালক বিভাগে নতুন রেকর্ডসহ ৩টি করে স্বর্ণপদক পেয়েছেন।

এবারের আসরে মোট রেকর্ড হয়েছে ১৮টি (এর মধ্যে এশীয় রেকর্ড একটি)। তাছাড়া তিনটি বিষয়ের রেকর্ড পূর্ব রেকর্ড স্পর্শ করেছে। সুরেশ বাবু (কেরালা) ডেকাথলনে ৭,৩৮০ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত এশীয়, জাতীয় এবং মিট রেকর্ড ভেঙ্গে দেন। পূর্বের এশীয় রেকর্ড ছিল বিহারের ডি এস চৌহানের—৭,৩৬৩ পয়েন্ট।

অনেক বছর আগে গড়া কয়েকটি রেকর্ড এবার ভেঙ্গেছে। যেমন বালিকা বিভাগের ৮০ মিটার হার্ডলসে ১৮ বছর আগে (১৯৬০) কেরালার জোসিস স্পিক যে ১২-৬ সেকেন্ডে রেকর্ড গড়েছিলেন তা এতদিন পর ভেঙ্গে দিল তামিলনাড়ুর পান্ড্য টমাস—হিটে ১২-৫ সেকেন্ডে এবং ফাইনালে ১২-৪ সেকেন্ডে দূরত্ব অতিক্রম করে। পুরুষদের হাইজাম্পে সুরেশ বাবু ২-০৭ মিটার উচ্চতা অতিক্রম করে ৯ বছর আগে গড়া ভীম সিংয়ের ২-০৬ মিটার উচ্চতার রেকর্ড ভেঙ্গে দেন। ডিসকাস পরভিন কুমার ৫৫-৯৯ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে ৯ বছর আগে স্বপ্রতিষ্ঠিত রেকর্ড ভাঙ্গেন। বালকদের সিনিয়র বিভাগের ট্রিপল জাম্পে এম বি সত্যানন্দন ১৩ বছর আগে পাঞ্জাবের মহীন্দর সিং গিল প্রতিষ্ঠিত রেকর্ড ভাঙ্গেন।

এবারের আসরে ১৯টি রাজ্য এবং ভারতের দুটি অঙ্গরাজ্য অংশ গ্রহণ করেছিল। খ্যাতনামা অ্যাথলীট শ্রীরাম সিং এবং শিবনাথ সিং যোগদান করেন নি। সুরেশ বাবু (কেরালা), টি সি জোহানন (বিহার) এবং পরভিন কুমার নিজ নিজ ইভেন্টে নতুন রেকর্ডে স্বর্ণপদক জয় করেন।

পদক তালিকায় মহারাষ্ট্র প্রথম কেরালা দ্বিতীয় এবং তামিলনাড়ু তৃতীয় স্থান পেয়েছে। পশ্চিম বাংলার ভাগে ১৪টি পদক—স্বর্ণ ৫, রৌপ্য ৫ এবং ব্রোঞ্জ ৪।

পদক জয়ের তালিকা

(প্রথম তিনটি স্থান)

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
মহারাষ্ট্র	২২	৭	১১
কেরালা	১৮	১৯	১৬
তামিলনাড়ু	১২	১৬	১২

দর্শক

দ্রুত সেইরকম ইমনের তানে অশোক পাঠক-এর মতন বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী হাত প্রয়োজন। এঁদের বাজনার সৌন্দর্যকে পূর্ণ রূপ দেয় বলরাম পাঠকের আর এক পুত্র বিনোদ পাঠক-এর সুন্দর তবলা সঙ্গত।

প্রথম দিনে কুমার মুখোপাধ্যায়ের খেয়ালও শুনলাম। বর্তমান কালের শ্রোতারা ওস্তাদ ফৈয়াজ খানের গান সম্বন্ধে খুব অল্প জানেন। তাঁরা শুধু শুনেছেন কিছু বহু পুরানো রেকর্ড যার থেকে এই বিখ্যাত রঙ্গীলা ওস্তাদ সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণা পাওয়া অসম্ভব। আগ্রা ঘরাণা বহু ভাগে বিভক্ত হয়েছে এবং বহু রূপান্তরও ঘটেছে গায়নভঙ্গীতে। এখনও কিন্তু বহু শিল্পী আছেন যাঁরা এই ঘরাণার রূপটিকে অকৃত্রিম রাখতে চেষ্টা করেন। এমনই একজন গায়ক কুমার মুখোপাধ্যায়।

সুরদাস সঙ্গীত সম্মেলনে এঁর গানে তার এই আগ্রহ পরিস্ফুট হয়। তিনি কেদার রাগের বিস্তৃত আলাপে ফৈয়াজ খানকে অনুসরণ করেছিলেন। বিলম্বিত খেয়ালটিও কেদার রাগেই একতালে ছিল এবং দ্রুত খেয়ালটি তিনতালে। বোলতান ও গমকগুলি খুব চিত্তাকর্ষক হয়েছিল এবং শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতে সার্থক হয়েছিল। এর পর কুমার মুখোপাধ্যায় একটি ভাল বন্দিশ শুনিয়ে ছিলেন বাহারে ও সব শেষে একটি দাদ্‌রা।

ওস্তাদ বিসমিল্লা খান খুব মনোযোগী হয়ে বাজিয়েছিলেন এবং তাঁর বাজানো 'বসন্ত' রাগে আমরা যেন আগেকার বিসমিল্লার বাজনার রেশ পাচ্ছিলাম। স্বরগুলি ছিল যথার্থ এবং সুরেলা।

পণ্ডিত ভীমসেন যোশী গত কয়েকটি অনুষ্ঠান অত্যন্ত সুন্দর গান করেছেন। সেদিনও তিনি তাঁর সুরেলা কণ্ঠে শুদ্ধ কল্যাণ রাগটি পরিবেশন করেন। শ্রোত দৃষ্টি তাঁর মুদ্রা ও ভাবের প্রকাশ ব আকর্ষিত হয়েছিল। কিরানা ঘরাণার শি বলেই বোধহয় ভীমসেন যোশীর গান ও আবদুল করিম-এর কথা মনে করিয়ে ভীমসেন যোশীর সেদিন সন্ধ্যার খেয় স্বর্গতঃ ওস্তাদ আবদুল করিম-এর কল্যাণ-এর পাঁচ মিনিটের একটি রেক মন্দরা বাজে-এর উপর ভিত্তি করেছি বহু বিস্তার অংশে ও স্বর্গতঃ ওস্ত অনুকরণে ছিল। তাঁর গাওয়া কাফি অত্যন্ত সুন্দর হয়েছিল।

বিনোদ পাঠক যিনি সাধারণতঃ সঙ্গীতের সঙ্গেই সঙ্গত করেন এবং যার ক মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সঙ্গত খুব ভাল হ তিনি কিন্তু ভীমসেন যোশীর সঙ্গে অ ভাল বাজান বিশেষ করে তান ও বোলত সময়।

সুব্রত রায়চৌধুরী

ছোটদের চিত্রাঙ্কন

আটাত্তরের প্রথম সকালে স্টেমার লেনের একটি মাঠে এসে হঠাৎই যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম। আকাশে উজ্জ্বল রোদ, তার নীচে বসে ছবি আঁকছিল উচ্ছল কিছু ছেলেমেয়ে, ভবিষ্যৎশিল্পী আর মন্ত্রদ্রষ্টারা। তারা মগ্ন, তারা নিবিষ্ট। সেই মগ্নতা দিয়েই নতুন বছরটিকে বন্দিত করলেন নব-জীবন সংঘ।

তাদের কারো কারো কাজে অসাধারণ নৈপুণ্য। কারো রঙের ব্যবহার চমকে দেয় বড় বড় শিল্পীর কল্পনাকেও। কারো কারো দৃষ্টিতে জাত-শিল্পীর অঞ্জন। যেমন অর্ণব চক্রবর্তী। দশ বছরের এই ছেলেটি এঁকেছে শীতের রাত্রিতে আগুন পোহানোর একটি পরিচিত দৃশ্য। আগুনের শিখা থেকে শুরু করে ফেরী-ওয়ালা, রিকসাওয়ালার বসবার ভঙ্গীটি পর্যন্ত তার তুলিতে নিখুঁত। চোদ্দ বছরের সাধন ঘোষের 'লাইব্রেরী' সম্পর্কেও সেই একই কথা। এগারো বছরের অর্পিতা দত্তের ছবিতেও কল্পনার ছোঁয়া। সে এঁকেছে একটি বটগাছের গুঁড়ি, যা ওপরে অদৃশ্য এবং সেখান থেকে নেমে এসেছে তার ঝুরি। কিন্তু অধিকাংশ শিশু শিল্পীর মধ্যে একটা জিনিষের বড় অভাব তা হল চারদিকে তারা যা দেখে, যা তাদের ভালো লাগে বা মন্দ লাগে তার ছবি তারা আঁকে না। যা কিছু দূরের যা কিছু না দেখা তার প্রতি তাদের আকর্ষণ। এগারো বছরের মৌসুমী ভট্টাচার্য এঁকেছে জাপানী পুতুল। 'তুমি কি কখনও জাপানী পুতুল দেখেছ?' মৌসুমী জানাল 'ছবি দেখেছি।' আট বছরের সুব্রত মুখার্জিও কখনও লাইনচ্যুত মালগাড়ী দেখেনি। তবু তার ছবিই সে এঁকেছে। ছোটরা যা দেখে না, তার প্রতি তাদের স্বাভাবিক আকর্ষণ, হয়তো সেই টানেই তাদের এই ছবি। দশ বছরের প্রবাল মল্লিকের লছমনঝুলা অনেক বেশী শিল্পীসুলভ। পাহাড়ে পাতাঝরা এঁকেছে কুশল মুখার্জি। কিন্তু কুশল কখনও পাহাড় দেখেনি। তবে ছবিটিতে রঙের ব্যবহার নিখুঁত। সবচেয়ে কম বয়সের শিল্পী মৌমিতা নাগ, বয়েস চার। সবাই যখন রঙ নিয়ে মাতামাতি করছে, সে তখন পেন্সিলে কাগজের ওপর এঁকে চলেছে ফুল লতা পাতা ইত্যাদি। এছাড়াও পাপিয়া ব্যানার্জি, সুস্মিতা নাগ, স্নিগ্ধা রায়, রঞ্জন মল্লিক, শেখর চন্দ্র দত্ত, শুভাশিস নাগেরা ভালো ছবি আঁকে। কিন্তু এদের মধ্যে যার ছবি আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে সে হল অলকানন্দা ভট্টাচার্য। সবাই যখন প্রকৃতি আকাশ ইত্যাদি আঁকতে ব্যস্ত, অলকা-নন্দা তখন এঁকেছে তাদের যারা এখানে বসে ছবি আঁকছে। বেথুন স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর এই ছাত্রীটির ডিটেলসের হাতও নিখুঁত। মাঠের ওপরে বেলুন, সামনে লাল শালুতে লেখা সংঘের নাম —দূদিকে দণ্ডায়মান দর্শক, ইঁটের পাঁচিল সবই তার ছবিতে নিখুঁতভাবে এসে গেছে। আরেকজন সন্দীপ রায় এঁকেছে সবুজ বনানীর মধ্যে একটি লালবাড়ী।

উৎসবটি অলংকৃত করবার জন্য এসেছিলেন শিবরাম চক্রবর্তী। তিনিও এদের মাঝে বসে ছবি আঁকা দেখলেন। 'নবজীবন সংঘ' এই চিত্রাঙ্কন প্রতি-যোগিতার উদ্যোগী।

বোলান গঙ্গোপাধ্যায়

আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী

তাঁর ঠিক তেমনি চেহারাই দেখলাম। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে তেমনি ক্লান্তিহীন অন্বেষণ। যে অন্বেষণে তিনি খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন কবিগুরুর গানের প্রাণসম্পদকে আর আধুনিক বাংলা গানের রস সাম্রাজ্যটিকে। তাঁর আত্মসমাহিত চেহারায় তাঁর বহু কালের চেনা রূপটিকেই দেখলাম। যে রূপ নিয়ে তিনি ডুব দিতেন রবীন্দ্রনাথের গানের মর্মলোকে—অনিবার্যই ছুঁয়ে ফেলতেন সুর, তাল লয়েরও অতীত যে যাদু গানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে—গানের সেই প্রাণ-ভোমরাটিকে।

আজ রবীন্দ্রনাথের গান ঘরে ঘরে প্রচারিত। সে প্রচারে আজকের শিল্পী-দের নিষ্ঠা কতখানি আর কতখানিই বা তাঁরা সফল সে আলোচনায় না গিয়েও বলতে পারি পঙ্কজ মল্লিকের গলায় গাওয়া অনেক গানই সময়ের উজান ঠেলে আজও অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে এবং নিশ্চিত করে বলতে পারি আগামীতেও থাকবে।

রবীন্দ্রসংগীতের ভগীরথ বাংলা সঙ্গীত সাম্রাজ্যের মহাসম্রাট পঙ্কজ মল্লিক যেদিন রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারাকে মুক্ত করে দিতে চেয়েছিলেন ব্রাত্য সমাজের মধ্যেও সম্ভবত সেদিন তাঁর সে প্রয়াস ছিল একক। অন্ধকার পথে সেদিন একাই চলেছিলেন সঙ্গীত-পিপাসার আলো হাতে নিয়ে।

গ্রামোফোন কোম্পানীর আয়োজনে পঙ্কজ মল্লিকের স্মরণসভায় কোম্পানীর রিহার্সাল ঘরে বসে এইসব কথাই ভাবছিলাম। পাশে বসেছিলেন রবীন্দ্রসংগীতের জনপ্রিয় গায়ক সাগর সেন। আমার সামনে পঙ্কজ মল্লিকের ছবি—যে ছবিতে তাঁর আত্মসমাহিত চেহারার একটি বিশেষ মুহূর্ত ধরে রাখা হয়েছে। জীবনের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, নানা ছোটখাটো ঘটনার থেকে সে সমাহিত চেহারা যেন অনেক দূরে। ক্ষুদ্রতার মলিন স্পর্শের অতীত। নিজেরাই লজ্জা পেলাম। চরম অবমাননার মধ্যে দিয়ে 'সঙ্গীত শিক্ষার আসর' থেকে তাঁর চলে যাওয়ার কথা মনে পড়ল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই মনে পড়ল রবীন্দ্রসংগীতের এক সুপরিচিত শিল্পী অরবিন্দ বিশ্বাসের উক্তি 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পঙ্কজ মল্লিক একটা বিরাট আলোকস্তম্ভের মত। উনি আমাদের সকলেরই প্রেরণা পুরুষ।

আজ এতখানি অসম্মান ও বেদনার ভেতর দিয়ে তাঁকে বিদায় নিতে হোলো এটা আমাদেরই অযোগ্যতা। সেই অযোগ্যতার জন্য যখন নিজেদেরই ধিক্কার দিচ্ছি সেই মুহূর্তেই দেখলাম বাংলা গানের আর এক দিকপাল শিল্পী সন্তোষ সেনগুপ্তকে। অমনি মনে পড়ে গেল তাঁর সেই অবিস্মরণীয় উক্তি, 'শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচারের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের যতখানি প্রয়োজন ছিল, যীশুখৃষ্টের এবং খৃষ্ট-ধর্ম প্রচারের পক্ষে সেন্টপলসের যতখানি প্রয়োজন ছিল—রবীন্দ্রসংগীতের পক্ষে পঙ্কজ মল্লিকের ঠিক ততখানিই প্রয়োজন ছিল।' সেই মুহূর্তে আরও মনে পড়েছিল দুই অবাঙালী শিল্পীর

কথা—একজন কে এল সায়গল আর একজন মুকেশ। কে এল সায়গল একদা পঙ্কজ মল্লিককে বলেছিলেন, 'দাদা পায়ের ধুলো দাও। তুমি না থাকলে এমন করে রবীন্দ্রনাথকে আর কে বুঝিয়ে দিত'। আর তাঁর সম্পর্কে মুকেশ বলেছিলেন, 'পঙ্কজ মল্লিকের কণ্ঠের পৌরুষ, ওজস, মিস্টিক চার্ম, সঙ্গীতের গভীরে প্রবেশ করার অসামান্য শক্তি, সব মিলিয়ে তাঁর পরিপূর্ণ সঙ্গীত-চেতনা—এ বস্তুর কাছে মাথা নত না করে আমার উপায় ছিল না।.... পঙ্কজ মল্লিক ইজ এ ফ্যানটাস্টিক পার্সোনালিটি টু মি'।

একে একে সবাই এলেন। এলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রসংগীতের আর এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। পঙ্কজ মল্লিককে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'প্রথম স্বরলিপি দেখেই রবীন্দ্রসংগীত গাইতে শুরু করেছিলাম। তারপর নিউ থিয়েটার্সে যোগ দেওয়ার পর এলাম পঙ্কজদার সংস্পর্শে। তখন বুঝলাম রবীন্দ্রসংগীত কি জিনিস। কত অতলস্পর্শী এর ভাব। আমার মন রবীন্দ্রসংগীতের দিকে ঝুঁকেছে পঙ্কজ মল্লিকের গান শুনেই। আর এই হিসাবে তাঁকেই আমার রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গুরু বলা যায়'।

এলেন সবাই। এলেন হীরেন বসু, পরিতোষ শীল, রাজেন সরকার, বেলা মুখোপাধ্যায় অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়, অর্ঘ সেন, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, স্বপন গুপ্ত, মায়া সেন, ভূপেন হাজারিকা, সুমিত্রা সেন, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, আরও অনেকেই।

পঙ্কজ মল্লিককে স্মরণ করতে গিয়ে তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ মানুষ হীরেন বসু বললেন, শুধু বাংলা দেশ বা ভারতেই নয়, ভারতের বাইরেও পঙ্কজ মল্লিক ছিলেন সমান জনপ্রিয়। আমি যখন আফ্রিকায় যাই তখন সেখানে দু-জন বাঙালী শিল্পীর নাম শুনেছিলাম—একজন পঙ্কজ মল্লিক অন্যজন যূথিকা রায়। তিনি আরও বললেন, পঙ্কজ মল্লিকের পরলোকগমনের খবর দিয়ে অমৃতসরের একটি গুরুমুখী ভাষার দৈনিকে প্রথম পাতায় তাঁর ছবি দিয়ে তলায় ক্যাপসান দেওয়া হয়েছিল, 'পিয়া মিলন কো যানা'। পঙ্কজ মল্লিকের জনপ্রিয়তা এসব থেকেই সুস্পষ্ট।

এক সময় গ্রামোফোন কোম্পানীর সেই রেকর্ডটি বাজানো হল। পঙ্কজ মল্লিক স্মরণে যেটি সম্প্রতি প্রকাশিত। ফুলের মালা, ধূপের গন্ধে স্তব্ধ হলঘরে আছড়ে পড়ছিল পঙ্কজ মল্লিকের উদার গম্ভীর গলা, 'বাহিরে ভুল হানবে যখন, অন্তরে ভুল ভাঙবে কি'?

শেষ প্রণাম জানিয়ে এলাম সেই সঙ্গীত সম্রাটকে। বাইরে মেঘের আড়ালে তখন নিস্তেজ রোদ। প্রকৃতিতে বিষাদ। জীবন থেকে মৃত্যু। মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে অবিরাম হেঁটে চলেছেন সঙ্গীতের মহাসম্রাট পঙ্কজকুমার। মনে পড়ল কবিগুরুর গানের একটি লাইন, আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী'। সেই আলোয় পথ চিনে আগামীর অভিযাত্রীদেরও চলতে হবে।

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

নাটকে গ্রাম

ষাট দশকের মধ্যভাগ থেকে আজ অব্দি বাংলাভাষায় যেসব নতুন নাটক এসেছে, নাটকে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে, এক দর্শক হিসেবে তার সঙ্গে আমি মোটামুটি পরিচিত। এই সময়ের মধ্যে আমরা পেয়েছি বেশ কয়েকজন গুণী পরিচালক, কুশলী অভিনেতা-অভিনেত্রী, অসামান্য আঙ্গিক ইত্যাদি। জন্ম নিয়েছে শক্তিশালী বেশ কিছু গ্রুপ। এই সময়ে যে কয়েকজন পরিচালক তাঁদের দক্ষতায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখেন, আমার মতে বিভাস চক্রবর্তী তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। অথচ গভীর দুঃখের সঙ্গে এও স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে তাঁকে আমরা এমন কোন নাটক দিতে পারিনি যা এক সার্থক শিল্প হতে পারে। শুধু তাঁর ক্ষেত্রেই যে একথা প্রযোজ্য তা নয়, প্রত্যেকটি গ্রুপের সম্পর্কেই একথা বললে ভুল হবে না।

নাটক কি, নাটক বলতে আমরা কি মনে করি, কোনটা নাটক বা কোনটা নাটক নয় ইত্যাদি প্রশ্নগুলো এই মুহূর্তে মুলতুবী থাক। পরবর্তী কোন সময়ে এনিয়ে বিতর্কে যোগ দেওয়া যেতে পারে। এই লেখার আগে পর্যন্ত যেসব নাটক আমরা দেখেছি তা থেকে যে সাধারণ প্রশ্নগুলো বেরিয়ে আসে তা হল,

১। নাটক কি সময়ের সঠিক মূল্যায়ন করতে পেরেছে ?

২। নাটক কি সত্যনিষ্ঠ হয়েছে,

৩। নাটকের বক্তব্যের সঙ্গে ঘটনার কি বিরোধ দেখা দেয় নি ?

৪। শ্রেণী চরিত্র বিচারে নাটকে কতটা আবেগ আর কতটা যুক্তি স্থান পেয়েছে ?

অবশ্য এটা ঠিক যে আমাদের নাটক কোন সময়েই সময়কে অনুসরণ করেনি। স্বাধীনতা সংগ্রাম, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, বাংলা বিভাগ, ১৯৪৪-এর বন্যা, খাদ্য আন্দোলন ইত্যাদি কোন কিছুই সঠিকভাবে ঐ সময়ের নাটকে দেখা যায় নি, দু'একটি ব্যতিক্রমের মধ্যে নীলদর্পণ অন্যতম। কেন সেইসব দিনের প্রধান ঘটনা সেদিনের নাটকে নেই, এ আলোচনাও আজকের মতো মুলতুবী থাক। আমাদের বর্তমান আলোচনা একেবারে আজকের নাটক এবং শুধুমাত্র তার একটা দিক নিয়ে—তাহল নাটকের ঘটনা। কলকাতার অভিজাত থিয়েটার হলগুলোতে সেসব নাটক এখন বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে তার প্রধান অংশের ঘটনা গ্রাম কেন্দ্রিক। গ্রামের জোতদার মহাজন সুদখোর দরিদ্র নিপীড়িত চা[ষী] ইত্যাদি ঐ সব নাটকের চরিত্র। শো[ষক] শোষিতের সংগ্রামই তার বিষয় বস্তু। এ[ই] এই বিষয় বস্তুর জন্যেই এসেছে ঐ[সব] চরিত্র। সমাজের এই সমাজ ব্যবস্থা যত[দিন] থাকবে। তদিন এই দুই শ্রেণীও থাক[বে] আর এক সমাজ সচেতন শিল্পীর প্রধ[ান] কর্তব্য এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম। আমা[দের] নাট্যকারেরা সে কর্তব্য পালন করে এক গু[রু] দায়িত্ব বহন করছেন, কিন্তু তাঁরা এ[ই] এই মুহূর্তে ঐ নাটকের জন্য যে সব চরি[ত্র] সৃষ্টি করছেন, সেখানে তাঁদের সংগ[্রাম] একটু ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে না কী? আজকে[র] নাটকে যে জাতের জোতদার, অত্যাচার ইত্যা[দি] থাকে তা যদি ত্রিশ থেকে শুরু করে [...] দশকের নাটকগুলোতে থাকত, তাহ[লে] সেটাই হত সার্থক রূপায়ণ। এখন জোতদারের চেয়েও বড় শত্রু বড় শোষক গ্রা[মে] এসে গেছে। পরিবর্তন হয়েছে অত্যাচারে[র] বর্তমানের স্বরূপ, সংগ্রাম ইত্যাদির রূপা[য়ণ] ঐসব ঘটনাই আনা দরকার। আজকের গ্রা[মের] জোতদার, সুদখোরেরা যতটা শোষক, [...] চেয়ে বড় শোষক শহর, এক গরীবের [...] শত্রু আরেক গরীব। রক্তচোষা প্রাণীর ম[তো] শহর গ্রামের সব কিছু কেড়ে নিয়ে [...] হেসে খেলে আছে।

এবং এর বাইরে আরেকটা যে ব্যাপ[ার] সে বিষয়েও আমাদের নাট্যকারেরা একেব[ারে] দৃষ্টিহীন। এক চাষী পরিবারে ধরা [...] আটজন লোক, তার মধ্যে কাজ করার ম[তো] আছে দু'জন, সারাদিনে তারা দুজন [...] করে ৫ টাকা। এই ৫ টাকায় আটজ[ন] কি ভাবে চলতে পারে, তা সহজেই অনুমে[য়] অথচ এর মধ্যেও তারা হাসতে পারে, আ[নন্দ] করতে পারে, উৎসবে যোগ দিতে পারে। এ [...] কোত্থেকে পায় এই [...] প্রাণের রস কোত্থেকে পায় এই বেঁচে থাকার জোর দুঃখকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেও[য়ার] ক্ষমতাই বা তাদের কোথায় থাকে ? [...] তারা নিজেদের সম্পর্কেও এত উদাসী[ন] কোন অনুভূতি থেকে তারা [...] শত্রুদেরও আপনি আজ্ঞে করে যায় ?

নাট্যকারদের এবিষয়ে আন্ত[রিক] উপলব্ধি আমাদেরই লাভের কারণ। তাঁ[দের] অভিজ্ঞতা থেকে প্রকৃত এই সময় ও সমা[জের] রূপ আমাদের কাছে ধরা দেবে। কি[ন্তু] অভিজ্ঞতা যে নানারকমের। এক বই প[ড়ে] দুই তাদের দেখে, তিন তাদের একজন হ[য়ে]। আমরা এখন কোন জাতীয় অভিজ্ঞ[তার] অংশীদার হতে চাই ?

সিকাশ [...]

অনেক রাত ও কিছু দিন

গল্পটা মূলতঃ ট্র্যাডিশনাল। বস্তি[বাসীদের] দাসীদের সাহায্য ও সহানুভূতি নায়[ক] পাচ্ছেন। নায়িকা বিত্তবতী প্রথমে সংঘা[ত] পরে অনুশোচনা এবং প্রেম। ছোটবে[লায়] নায়কের দিদির কাছ থেকে হারিয়ে যাও[য়া] বড় হয়ে খুঁজে পাওয়া, শেষে শয়তান জায়েস্তা করা ইত্যাদিই গল্পের বিষয়বস্[তু]

টিঁতে পুঁডিংছোঁড়া খেলার মত ়ধময় দৃশ্যের সঙ্গে এমন কিছু আছে ন্য বাইরে থেকে সিগারেট খেয়ে পুরোনো ইচ্ছেটি পেয়ে বসে নি। গানের সিকোয়েন্সগুলো এর ম। গল্প বলার সাবলীলতায় বিশ্বাস হয়ে যায়। চতুর চিত্রনাট্য একটা কাঁটা বিঁধিয়ে রাখে শেষ অব্দি। কাটাছেঁায় বিশ্বাস তাই আহত হয় শয়ের পরিমিতি বেধে মাঝে মাঝে করে—এ জাতীয় ছবিতে যা একান্তই অবাক হতে হয় চিত্রনাট্যের প্রসাদে ছবির নায়ক তার ব্যক্তিত্ব ফিরে দেখে—যা হারিয়ে গিয়েছিল া।

অবশ্য বিনোদ খান্না যেখানে নায়ক মুগ্ধ ইত্যাদি হবে না এটা তাঁর ও র পক্ষে বড্ড বেদনাদায়ক। তাই পর পরিচালক তাঁকে তাঁর ক জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন। একদিকে অন্ধ ও মার্জিত ব্যক্তিত্বের অন্যদিকে প্রচণ্ড এক ফাইটার। কিন্তু ল বাড়ীর এত লোককে ফাঁকি দিয়ে কি করে এত সময় ফাইটার সেজে বেড়াত। কি করেই বা এমন দুর্ধর্ষ চালাত। পরিচালক এখানে দর্শকদের দিয়ে খানিক ঠকিয়েছেন ঠিকই—ফাঁকও রেখে গেছেন প্রচুর।

আশা পারেখকে অনেকদিন পরে দেখে পেলাম। হায়, সেই আসরে আজ এই সময় মানুষের কাছ থেকে কত কিছুই ়ে নেয়। নায়িকা সাবানা বেলবটম্ তে বড়োই বেমানান। অবশ্য তাঁকে ়িতেই ভালো লাগে এ দাবী আমার এ ছবিতে সাবানার পোষাকেই তাঁকে লাগার প্রতিবন্ধক। অভিনয়েও তাঁর কিছু করার ছিল না। হিন্দি ছবি নায়ক প্রধান। বিনোদ সেই সুযোগের ত সদ্ব্যবহার করেছেন।

পরিচালক নাচ গান ও ভোঁতা তার আবশ্যিক কাজগুলো করলেও া গিয়ে ন্যাক্কারজনক্ বাড়াবাড়ি করেন ক্যামেরার কাজ কিছু কিছু এ্যাকশন বাহবা পাওয়ার মত। সুচিন্তিত া এ ছবির একটি সম্পদ।

আলোচ্য ছবি আধাদিন-আধীরাত, লনা—দুলিড।

বিমান দাস

কসরসিস্টের ব্যর্থ অনুকরণ

বুদ্ধি যেখানে ব্যাখ্যার নাগাল হারায় গন্ত নাগাইচের বক্তব্য সেখানেই শুরু। মাত্র প্রেতের অস্তিত্ব 'জাদুটোনা'র ণ বিষয় হলে রেহাই ছিল ভূত তে বিজ্ঞানকে নস্যাৎ করে অন্ধের ত্তা প্রতিষ্ঠাই ছিল উদ্দেশ্য। ছবিটির শেষে প্রশ্ন রাখা হয়েছে—মানুষ বিজ্ঞানে ক উন্নতি করলেও প্রকৃতির সব রহস্যেরই কি [illegible]

সাত ভাই চম্পা ছবিতে বিশ্বজিৎ

ধর্মই আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী। অতৃপ্ত আত্মা আপন বাসনা চরিতার্থ করার জন্য প্রেত হয়ে ঘুরে বেড়ায় সুযোগের খোঁজে।

নাগাইচ মশাইয়ের উদ্দেশ্য মহৎ। তাঁর এ ছবি দেখে কেউ যদি সাইকোলজির মুখে লাথি মেরে ওমালজির পদাশ্রয়ী হয় তো হোক—আমার প্রশ্ন, শ্রীনাগাইচ তাঁর বক্তব্যকে আদৌ বিশ্বাস্য করতে পেরেছেন কি ?

প্রথম থেকেই ছবিটি একটি প্রচারধর্মী লক্ষ্য নিয়ে এগোতে থাকে এবং এক বিরাট আড়ম্বরের মধ্যে দিয়ে অভীষ্টে পৌঁছয়। কিন্তু হরর ফিল্ম হিসেবে জাদু টোনা কি সফল ? শ্বাসরোধকারী দু'একটি মুহূর্তই কি সব ? সত্যি বলতে কি হর্ষাকে ভূতে পাওয়ার প্রাথমিক লক্ষণ চোখ ঘোরানো ও মাথা নাড়া দেখলে ভয়ের বদলে হাসিই পায়। মনে পড়ে যায় 'ওয়ারিশ'এ হেমা মালিনীর নকল ভূতে পাওয়ার কথা। এ ছবির জন্যে মুকরির মূর্খামো দেখিয়ে কাতুকুতু দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল কি ? নাকি প্রয়োজন ছিল অতিথি শিল্পী জগদীপ ও জুনিয়র মামুদের পাগলামি দেখানো। জেসু দাসের একটি গানের সঙ্গে স্ত্রী প্রত্যঙ্গের কিছু স্টিল দেখিয়ে কি চতুর্বর্গ লাভ হয়েছে তাও বুঝলাম না।

এ জাতীয় ছবির মূলধন ট্রিক ফোটো-গ্রাফি। আর যেহেতু এটা হরর ফিল্ম, ফোটোগ্রাফির ঠগবাজীতে ভয় পাওয়ারই কথা। কিন্তু দুখের বিষয় ভয়ের বদলে এসেছে হাসি, সঙ্গে কিছু অনুকম্পাও। ভয়ের ছবি জানি আলো আঁধারিতে জমে ভাল। কিন্তু জাদু টোনার সেখানেও বৈপরীত্য—ছবিটা প্রায় আগাগোড়াই ভুবন ভরা আলোয় তোলা। অথচ বহির্দৃশ্যের ছবিগুলোর জন্য ক্যামেরার পেছনের চোখটিকে তারিফ না করে উপায় থাকে না। ছবির ভূমিকা পর্বে প্রকৃতি দৃশ্যের দু'একটি স্টিলকেও অনবদ্য বললে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু স্টুডিও সেটের দৈন্য বড়ই দুঃখজনক। এত দায়সারা কাজ বেশ কিছুদিন দেখিনি। 'হিন্দি ছবির টেক্‌নিক্যাল দিকে উন্নতি অপার' এমন একটা ধারণা যখন প্রায় বদ্ধমূল হতে বসেছিল জাদু টোনা তার গোড়ায় কুড়ুল হানল তখনি।

তা বলে সারা ছবি জুড়ে মরীচিকার পেছনে ছোটা নয়। কিছু মরুদ্যাম মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন অশোককুমার, তাঁর অনায়াস অভিনয়ে। প্রেমচোপরা, ফিরোজ, রীণাও তাঁদের সুযোগমত অভিনয় করেছেন। শুধু অসুবিধেয় পড়েছিল ভূতটা। পিংকি এমনিতে মোটাসোটা মিষ্টি মেয়ে; হাসি-খুশি, চমৎকার অভিনয়। কিন্তু ভূতটা ওর ভেতর ঢুকলে কিছুতেই বেরোতে পারত না। শুধু চোখ ঘোরাতো, মাথা নাড়াতো, হাসতো হি হি করে। আর হাসাতো।

অতীন্দ্রিয় ব্যাপারগুলো বাদ দিলে ছবির মূল কাহিনীতে সুন্দর এক সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। হেমন্ত-ভোঁসলের সুরে বর্ষা ভোঁসলের গাওয়া গানটি বেশ লাগল। জেসু দাসের গলায় একটি গানও ভালো লাগে। তবে আবহসঙ্গীত পরিবেশ সৃষ্টিতে উল্লেখ-যোগ্য ভূমিকা নিতে পারেনি।

ছবির বিজ্ঞাপনে একটি সাবধান বাণী দেখলাম—'পেট রোগারা যাবেন না' ঠিকতো বদ্‌হজম হবার জিনিষ খুবই যে বেশী।

আলোচ্য ছবি—জাদু টোনা, ছবি ও পরিচালনা—রবিকান্ত নগাইচ।

বিমান দাস

বিদেশী ছবি

'ওয়ানস ইজ নট এনাফ'—প্যারামাউন্ট ফিল্মসের 'ওয়ানস ইজ নট এনাফ' বর্তমানে ১৭ই মার্চ এলিট প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে জ্যাকুলিন সুসান রচিত উপন্যাসের মূল বক্তব্য হলো এক প্রৌঢ় চলচ্চিত্র প্রযোজক এবং তার নিঃসঙ্গ কন্যার প্রেমের বিভিন্ন অভিব্যক্তি। জানুয়ারী প্রথমে ভালবাসলো এক ইতালীয় নায়ককে, কিন্তু বেশীদিন তাঁদের ভালোবাসা টিকলো না। জানুয়ারী ফিরে এলো বাবার কাছে হলিউডে, এখানে এসে সে দেখলো, বাবা নিঃসঙ্গতা দূর করবার জন্যে এক অভিনেত্রীকে বিয়ে করেছেন। বাবা ও তার নব পরিণিতা স্ত্রীর ইচ্ছে জানুয়ারী হলিউডের নবাগত এক চিত্রনায়কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে এবং তার শয্যাসঙ্গী হয় এবং সম্ভব হলে বিবাহ করে সুখী হয়। কিন্তু জানুয়ারী চিত্রনায়কের সঙ্গে কিছু সময় ঘনিষ্ঠভাবে মিশে বুঝতে পারে ও তার মনের মানুষ হতে পারে না। অবশেষে জানুয়ারী বাবার বন্ধু এবং পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত ঔপন্যাসিকের প্রেমে আবদ্ধ হলো। কিন্তু বিয়ে করতে রাজী হলো না। আচমকা বাবা এক প্লেন দুর্ঘটনায় মারা গেলেন, জানুয়ারী যেন আবার নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল। কিছুতেই ভুলতে পারছে না বাবার স্মৃতি। তবে কি সে বাবাকেই ভালবাসতো বলেই অন্য কারোকে বিবাহ করবার কথা চিন্তা করতে পারতো না। পরিচালক গায় গ্রীন আঙ্গিক সমৃদ্ধভাবে জ্যাকলিন সুশানের উপন্যাসের চিত্ররূপ দিয়েছেন। কিন্তু কিছু কিছু দৃশ্য বড় বেশী দীর্ঘায়িত হওয়ায় ছবির গতি শ্লথ হয়ে পড়ে। এ ছবির অন্য সম্পদ অভিনয়—কার্ক ডগলাস (বাবা) জানুয়ারী (ডেবরা রাফিন) এবং ঔপন্যাসিকের চরিত্রে ডেভিড জানসেনের অভিনয় অনবদ্য, কলা-কৌশল, আঙ্গিকের কাজ এক কথায় অপূর্ব।

'সিজার এণ্ড রোজালী'—এফ এফ সি পরিচালিত ফরাসী প্রেমের ছবিটি যমুনায় প্রদর্শিত হচ্ছে। রোজালী বিবাহিত এবং এক কন্যা সন্তানেরর জননী হয়েও, স্বামীর সঙ্গে মতাবিরোধ হওয়ায় তাঁকে পরিত্যাগ করে একাকী বাস করে। ওখানেই আলাপ হয় সিজারের সঙ্গে, প্রথমে ঘনিষ্ঠতা পরে প্রেম, ওদের দেখে মনে হতো, ওরা যেন একে ওপরের জন্যে জন্মেছে, কিন্তু সুখ বেশীদিন স্থায়ী হলো না, রোজালী সিজারকে ত্যাগ করে ডেভিড নামে একজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলো। ডেভিড রোজালীকে বিবাহের পূর্ব থেকেই ভালবাসতো। অন্যদিকে সিজারও উপস্থিত হয় ওখানে রোজালীর খোঁজে, ক্রমে ক্রমে ডেভিডের সঙ্গে সিজারের বন্ধুত্ব হয়, ওঁদের বন্ধুত্ব এমন এক পর্যায়ে পোঁছলো, যে ওরা রোজালীকে ভুলে গেলো। রোজালী ওখান থেকে অন্তর্হিত হলো। কিন্তু খুব বেশীদিন ওদের বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে আবার ফিরে এলো।

পরিচালক ক্লড স্যাডেট ফরাসী নব-তরঙ্গ ধারানুযায়ী এই ত্রিকোণ প্রেম কাহিনীকে পর্যায় রূপায়িত করেছেন। তিনটি ভূমিকায়—ইভস মনট্যানড (সিজারা), স্বামী ফেড (ডেভিড) এবং রোজালীর চরিত্রে রোমী স্নাইডার-এর অভিনয় অনবদ্য। আঙ্গিক উচ্চাসের।

অশোক মজুমদার

মা ছিন্নমস্তা ছবিতে স্বপ্না ও মিহির

ওয়ানস ইজ নট এনাফ ছবির দৃশ্য

এমনও দিন আসতে পারে

রবীন্দ্রশতবার্ষিকী বর্ষে সারা দেশ রবীন্দ্রপূজায় মত্ত। আকাশ ছোঁয়া চাহিদা গাইয়ে, বাজিয়ে, নাচিয়েদের। সেই সুযোগে ফয়দা তোলার জন্য পাকা ব্যবসায়ী চন-চনিরাম চুড়িওয়ালা বাংলাদেশে এসে খুলে বসলেন 'রবীন্দ্র সেন্টিনারী এজেন্সির' অফিস। যার মাধ্যমে বিভিন্ন রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের উদ্যোক্তারা মোটা অর্থের বিনিময়ে পেতে লাগলেন সঙ্গীতশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, আবৃত্তিকার আর সভাপতি সমেত একটা 'কমপ্লিট টীম'। চুকে গেল ল্যাঠা। উদ্যোক্তারা খুশী নির্বিঘ্নে রবীন্দ্রপূজা সারতে পেরে; চনচনিরামও ফুলে-ফেঁপে উঠতে লাগলেন ব্যবসায়িক সাফল্যে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রবীন্দ্র-নাথের সৃষ্টিকে হিন্দী ফিল্মি ছাঁচে বদলে নিতেও তিনি আর পিছপা হন না। তবু বিশিষ্ট রবীন্দ্রানুরাগী হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত তাঁর খ্যাতি আর সম্মান। যার ফলে একদিন এই চনচনিরামকেই দেখা যাবে কোন রবীন্দ্রসভায় সভাপতিরূপে।

এই হলো ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের ২৮ ফেব্রুয়ারি কলামন্দিরে আয়োজিত 'এমনও দিন আসতে পারে' নাটকের কাহিনী। যদিও বক্তব্য আরও জোরালো হওয়া উচিত ছিল তবু লঘু রস ফুটিয়ে তুলতে নাট্যকার (নারায়ণ বন্দোপাধ্যায়) সফল। কিন্তু অতি-অভিনয় সত্ত্বেও শিবপ্রসাদ ঘোষদস্তি-দার (চনচনিরাম) সারাক্ষণ জমিয়ে রাখেন। অমরনাথ দত্ত (জনসংযোগ অফিসার প্রাণেশ) রোমান্টিক দৃশ্যে কিছুটা আড়ষ্ট। বরং এই দৃশ্যে গীতা কর্মকার (চনচনিরামের পি. এ) বেশ সপ্রতিভ। ইনি একমাত্র স্ত্রী চরিত্রে অনেক স্বাভাবিক (রবীন্দ্রকাব্য পাঠটুকু বাদে)। রবীন নন্দীর (গায়ক) গানগুলি সুগীত। অন্যান্য সবাই চরিত্রানুগ। মাঝে-মাঝে সংলাপ ছাপিয়ে প্রম্পটারের কণ্ঠ, একটু ঢিলেঢালাভাব ইত্যাদি সত্ত্বেও মোটামুটি টীম-ওয়ার্ক বজায় রেখে লঘু-রসাত্মক নাটকটি দর্শকদের বেশ আনন্দ দিয়েছে। এজন্য পরিচালক বাদল বর্ধন প্রশংসাই। নাটক নির্বাচনে অফিস ক্লাবগুলি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রুপ থিয়েটারগুলিও সাধারণতঃ যে পথে পা বাড়ান। তার থেকে একটু আলাদা দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করায় এই অফিস ক্লাবটি ধন্যবাদের যোগ্য।

—উৎপল রায়

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

॥ ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৫০ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা॥

শুক্রবার ২ বৈশাখ, ১৩৮৪

Friday, 15th April, 1977

১৬ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা

বিচিত্রা

ছবি এঁকেছেন : সুবোধ দাশগুপ্ত / গৌতম রায়
প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

আগামী সংখ্যায়

প্রেম ভালবাসার গল্প

দীপংকর দাশ

গল্প লিখেছেন
প্রশান্ত চৌধুরী

কবিতা লিখেছেন
শিবশম্ভু পাল

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্তের
সচিত্র আলোচনা
মহাবিহার জগদ্দল এখন কোথায় ?

প্রচ্ছদ কাহিনী

আমাদের জীবনে পাখি

লিখেছেন
বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
কাজল মিত্র
সিদ্ধার্থ রায়
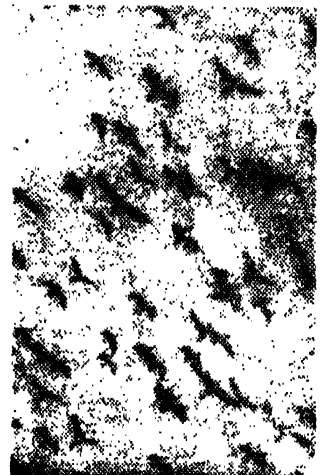
শিক্ষাবিস্তারের

মানবিক দায়িত্ব

আমাদের সংবিধানে সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের জন্যে একটি প্রতিশ্রুতি ছিল। সেই অনুযায়ী একটি সময়-রেখাও সংযোজিত হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পূর্বতন অনেক সুসংকল্পের মতোই সর্বজনীন শিক্ষাও আমাদের দেশে সুদূরের বস্তুই হয়ে আছে।

শিক্ষাবিস্তার একেবারে ঘটেনি তা নয়, কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় তা অকিঞ্চিৎকর বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না।

এই পটভূমিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র যে পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন তার গুরুত্ব অপরিসীম। ডঃ চন্দ্র জানিয়েছেন তিনি দেশের ২০ লক্ষ প্রাথমিক শিক্ষক এবং ইস্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের ওপর দায়িত্ব দেবেন সাক্ষরতা বিস্তারের জন্যে। সেই সঙ্গে প্রস্তাব মতো যাতে কাজ হয় সেজন্যে দশজন নিরক্ষরকে সাক্ষর করতে পারলেই শিক্ষকদের কিছু পারিশ্রমিক এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্যে পড়ার বই ও ইস্কুলের মাইনে দেবারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দেশে সাক্ষরের সংখ্যা এখন শতকরা ৩৩ ভাগের বেশি নয়। অর্থাৎ ভারতের জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ, বা প্রতি ৩ জন মানুষের ২ জনই নিরক্ষর। কাজেই সমস্যাটি যে খুবই ভয়াবহ তাতে সন্দেহ নেই। আমরা মহাকাশে আর্যভট্ট উপগ্রহ পাঠিয়েছি, পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছি, কিন্তু মানবিক দায়িত্ব পালন করতে পারিনি। প্রদীপের নিচের এই অন্ধকার আমাদের সমস্ত কৃতিত্বকেই যে কী পরিমাণে ম্লান করে দিচ্ছে তা বলাই বাহুল্য।

এই পটভূমিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী তাঁর নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করেই শিক্ষাবিস্তারের জন্যে যে প্রস্তাব ঘোষণা করেছেন তা অভিনন্দনযোগ্য।

এটা ঠিকই যে পূর্বতন সরকারের শিক্ষামন্ত্রীও সাক্ষরতার জন্যে একটি প্রস্তাবের কথা ঘোষণা করেছিলেন। কলেজের ছাত্ররা অন্তত পাঁচজন ব্যক্তিকে সাক্ষর করতে না পারলে তাদের ডিগ্রি দেওয়া হবে না বলা হয়েছিল। কিন্তু প্রস্তাবটি কার্যকর করা হয় নি। হলেও খুব যে সুফল পাওয়া যেত তা মনে হয় না। কেননা এভাবে চাপ দিয়ে মানবিক কর্তব্য করিয়ে নেওয়া খুবই কঠিন কাজ।

তার চেয়ে ডঃ চন্দ্রের প্রস্তাব অনেক বাস্তব সম্মত। দেশের চল্লিশ কোটি নিরক্ষর মানুষ হয়তো এই পরিকল্পনায় কাজ শুরু হলে বছর পাঁচেকের আগেই সাক্ষর হতে পারবে।

বলাই বাহুল্য, সেটা হবে ভারতের পক্ষে ঐতিহাসিক ঘটনা।

সম্রাট ও মণীষীর কারিগর

শিল্পে সম্রাট, সম্রাজ্ঞী, সূর্য ও মনীষী ইত্যাদি কিছু কথা শিল্পীর নামের আগে জুড়ে দিয়ে স্বীকৃতি ও ভালবাসা জানানো হয়। এই খেতাবগুলো শেষ পর্যন্ত অবশ্য বক্সঅফিসের দিকে তাকিয়ে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ফলে একই শিল্প-সাম্রাজ্যে বহু সম্রাট, সম্রাজ্ঞী, সূর্য ও মনীষী বিচরণ করতে বাধ্য হন। যদিও তাঁদের দখলের ভূখণ্ড আকবর, অশোকদের জায়গা জমির চেয়ে আয়তনে অনেক ছোট।

আমরা নটদুলাল, নটশেখর, নটসম্রাট, নটসূর্য—বড় বড় কাঠের টাইপে যাত্রা-থিয়েটারের টিকিট বিক্রির পোস্টার, বিজ্ঞাপনে জন্মাবধি দেখে আসছি। এখনো এক-একদিন খবরের কাগজের রঙ্গজগতের বিজ্ঞাপনের পাতায় একাধিক সম্রাট, সম্রাজ্ঞীকে পাশাপাশি, কাছাকাছি দেখা যায়। তাঁদের মধ্যে কোন যুদ্ধবিগ্রহ নেই। বরং নিরন্তর সন্ধি, আদৌ বিচ্ছেদই হয় না।

একদিন একজন প্রাচীন রঙ্গ-সম্পাদক আত্মতৃপ্তির ভঙ্গীতে বললেন, আমিই তো অমুককে নাইনটিন থারটিনাইন থেকে সম্রাজ্ঞী লিখে লিখে নটসম্রাজ্ঞী করে দিলাম। এখন ওঁরও বয়স হয়েছে। চোখে চশমা দিয়ে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে প্রাইজ দেয়।

বৈকুণ্ঠ বিস্ময়ভরা চোখে সম্রাজ্ঞীর স্রষ্টাকে দেখলো। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে এখনকার এই ভগ্নদেহ বৃদ্ধ, রঙ্গ-সম্পাদক নেহাতই যুবক বিনোদ ছিলেন। প্রেস ও কাগজ সস্তা ছিল। পৃথিবীও দয়ালু ছিল। এক সন্ধ্যার অভিনয়ে এখনকার নাট্যসম্রাজ্ঞী তখন মঞ্চে তরুণী বয়সে আয়েসা কিংবা আলেয়া সেজে বিনোদের মনে মায়া সৃষ্টি করেছিলেন।

বিনোদ তখনই তাঁর কাগজে ওঁকে সম্রাজ্ঞী করেছিলেন।

বোধহয় ১৯৫০।৫২ সাল হবে। এক-খানি চালু সাহিত্য পত্রিকায় একটি প্রতিষ্ঠিত মিষ্টির দোকান তাদের সন্দেশের সমর্থনে সজনীকান্ত, তারাশঙ্কর প্রমুখের নামের আগে মনীষী বসিয়ে পূর্ণ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন দিল। ওঁরা কেউ সেদিন সন্দেশের স্বার্থে মনীষী হতে আপত্তি করেননি। এমন প্রায় বারোজনের নামের আগে সেবার মনীষী লেখা হয়েছিল।

বেশ কয়েক বছর আগে একালের প্রসিদ্ধ একজন লেখক নার্সিংহোমে মর মর অবস্থায় ছিলেন। তিনি দিনে ভালো থাকেন। রাত বাড়লে তাঁর অবস্থা খারাপের দিকে যায়। খবরের কাগজকে তাঁর জীবনী লিখে মৃত্যু সময়টা ফাঁক রেখে তৈরি থাকতে হয়েছে। রোজ রাত আড়াইটা অব্দি তাঁর মৃত্যুর খবরের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু তিনি তখন মরেন না। ভুগতে থাকেন।

রাতের ডিউটির সম্পাদককে রোজ রাত দেড়টা দুটো নাগাদ নার্সিংহোমে ফোনে খবর নিতে হয়। কেমন আছেন? ছবির ব্লক ও লাইফস্টোরি রেডি। প্রথম পৃষ্ঠায় জায়গাও রাখা আছে। রোজকার মত সম্পাদক ফোন করে জানতে চাইলেন, কেমন আছেন?

রুগী ওপাশ থেকে নিজেই ফোন ধরে বললেন, এখনো মরিনি। গত তিরিশ বছর আপনাদের কাগজে কোন লেখা বেরোয়নি আমার। অবিচুয়ারির জন্যে কতটা জায়গা রেখেছেন?

সম্পাদক হতভম্ব। অ্যাটেনড্যান্ট সিসটার হয়তো উঠে গিয়েছিলেন কোথাও! ফোন নামিয়ে রাখতে হোল। প্রায় চল্লিশ বছর আগে লেখা ওঁর বইগুলোর কথা সম্পাদকের মনে পড়ছিল। একটা হাসির গল্প নিয়ে তিন যুগে তিনবার ছবি হয়েছে। ১৯৩০।৪০।৫০-এর যুগে নানা বয়সের মানুষ দিনের পর দিন ছবিঘর ফাটিয়ে হেসে এসেছেন।

এককালের প্রসিদ্ধ গল্পকার পরদিন রাতে মারা গেলেন। খবর লেখার সময় সম্পাদক একটি অতিরিক্ত কথা ওঁর নামের আগে বসিয়ে দিলেন। মনীষী। সেই থেকে আজও স্বর্গত ভদ্রলোক বাঙালীর চোখে মনীষী হয়ে আছেন।

সম্রাজ্ঞী ও মনীষীর এই দুই কারি-গরের কথা আজ খুব বেশি করে মনে পড়ছে। এই পৃথিবীতে এখন আমরা যারা নানা আকাঙ্ক্ষায় ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত ও ক্ষয় হচ্ছি—আর একশো বছর পরে এই আমাদের কেউ আর এখানে থাকবে না। তখন আরেক দল মানুষ এসে আমাদের ফেলে যাওয়া আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো তাদের নতুন ধমনীতে তুলে নেবে। একটি প্রাগৈতিহাসিক রেডউড গাছ কিংবা নদীর মরা সোঁতার পাশে আকাঙ্ক্ষা, ক্ষোভ, ক্ষয়-সমেত এইসব বিভিন্ন সময়ের মানুষের আয়ুষ্কাল কতটুকু! তাদের ভেতর কে সম্রাজ্ঞী! কে মনীষী!

এসব মনে পড়ার একটি কারণ ঘটেছে। সম্প্রতি বৈকুণ্ঠের সমসাময়িক সবে চল্লিশোত্তীর্ণ একজন গদ্যশিল্পী কিছু কথা বলে বৈকুণ্ঠের মন ভারি করে দিয়েছেন। বৈকুণ্ঠ এই শিল্পীর রচনার গুণগ্রাহী। ভদ্রলোক কথা প্রসঙ্গে বৈকুণ্ঠকে বলে সম্মানিত ও প্রতিষ্ঠিত লেখক কোথায় আপনাদের?

বৈকুণ্ঠ তখন তাঁর বৈঠকখানায় বসে। অতিথি। উপরন্তু তাঁর লেখা বৈকুণ্ঠের ভাল লাগে। মনে ব্যথা দেওয়ার মত কথা গুণগ্রাহী অতিথি বলতে পারেন না। তবুও তখন বৈকুণ্ঠের মনে যা এসেছিল হুবহু তাই সে এখানে লিখে দিল।

শিল্পে সম্মানিত ও প্রতিষ্ঠিত বলে কিছু থাকতে পারে না। যা থাকে—তা হল : সঠিক ও যথার্থ শিল্প কিনা। সম্মানিত ও প্রতিষ্ঠিত কথা দুটি শিল্পের উপর আরোপিত। অমুকে সম্মানিত শিল্পী, তমুকে প্রতিষ্ঠিত লেখক—ইত্যাদি কথা যখন বলা হয়—তখন, মনে রাখতে হবে—এই বিশেষণগুলো বাণিজ্যিক। কিংবা সঠিক কথা খুঁজে না পেয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রকৃত শিল্পী সর্বদাই প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে। কারণ, তিনি সর্বদাই নিজেকে ভাঙছেন। প্রতিষ্ঠা তাঁর পক্ষে একটি নিগড়। কেউ শিল্পী হলে সর্বদা এই নিগড় ভাঙবেন।

প্রতিষ্ঠিত কথাটি সফল ভূস্বামী, ডাক্তার কিংবা শিল্পপতির আগে বসতে পারে। শিল্পীর আগে বসে না।

প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সম্মানের বিরোধ চির-কালের। একজন প্রতিষ্ঠাবিহীন কবিকে আমরা লেখার গুণে তো শ্রদ্ধা করি। সে শ্রদ্ধাও অবশ্য কচুপাতায় বৃষ্টির জল। লেখা তেমন না হলে গতরাতের বর্ষায় জলটুকু কচুপাতা থেকে নিচের ঘাসের জঙ্গলে গড়িয়ে পড়ে।

প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত কথা দুটি যদি কোন ভালো লেখকের মনে ধরে থাকে—তাহলে তিনি ভ্রান্ত। তাঁরই মনের মরীচিকা। তিনি খেয়ালই করেননি—পপুলার প্রেস নামক কবন্ধ দৈত্যের খাবারের জোগান দিতে গিয়ে তিনি নিজেকে ভালো সূপকার ভেবে বসে আছেন।

বৈকুণ্ঠের এই প্রিয় গদ্যশিল্পী সাহিত্যের যে-কারখানায় জ্বালানী সরবরাহ করেন—তিনি নিজে তার পরিমণ্ডলের জারক রসে জারিত পান্তলেবুটি হয়ে ভাসছেন। তিনি তথাকথিত খ্যাতি, সম্মান ও প্রতিষ্ঠার ঢাকনা আটকানো বয়মের ভেতর ভাসতে ভাসতে গোষ্পদে তাঁর নিজের ক্ষীণ আস্ফালনকে বিপ্লব ও শিল্প ভ্রমে তুষ্ট বোধ করছেন। ফলে বৃহৎ পৃথিবী তার চোখের বাইরেই থেকে যাচ্ছে।

সময় বড় নিষ্ঠুর শাসক। শিল্পী তার চেয়েও নিষ্ঠুর। সময়কে অতিক্রম করাই তাঁর সাধনা।

কয়েক কোটি বাংলাভাষীর ভেতর সামান্য কয়েক হাজার প্রচার সম্বল তথাকথিত পপুলার প্রেস যখন বৈকুণ্ঠের এই প্রিয় গদ্য-শিল্পীকে সম্মান ও প্রতিষ্ঠার জোড়া টোপরের বিজ্ঞাপনে মুড়ে বাজারে চালান—তখন তিনি গদ গদ বোধ করেন। একবারও কি তিনি ভেবে দেখেছেন— এগারোশো কপির বড়জোর দুটি কি তিনটি রিকেটি সংস্করণও তাঁর ওই সাহিত্য কারখানার পণ্য বিকোয় না। তাহলে বাণিজ্যিক অর্থেই বা কিসের সম্মান? কিসের প্রতিষ্ঠা?

তাই আজ সম্রাজ্ঞী ও মনিষীর সেই দুই কারিগরের কথা বৈকুণ্ঠের বারবার মনে পড়ছে।

বৈকুণ্ঠ পাঠক

সুনীলকুমার নন্দীর কবিতা

ফেরা

আমার ফেরার কথা ছিলো নাকি?
হয়তো-বা ছিলো
ভুলে গেছি, ভুল
না-হ'লে কী আর হ'তো। পৃথিবী খানখান
হয়নি, বাগানে ফুল তেমন ফুটছে না?—ফোটে, এই তো ফাল্গুন
এলো, আমি কাছে নেই, আমের মুকুল
কিছু কি উন্মনা করে, আলুথালু
ওড়ে কি বসন....না, না
ধু-ধু পথচেয়ে কেউ চিরদিন থাকে না, এখন
ধুলোবালি অন্ধকার দু'হাতে ছড়িয়ে নিয়ে
দিন ভরি, দিন যায়, আমি বেশ আছি—
তাছাড়া, তোমরা যে-সেই ম্যাজিক খেলায়
নীলিমা গচ্ছিত রাখো, জলে নেমে
ঢেউ দাও, না ভিজিয়ে বেণী
এখনো শিখিনি, যদি শিখি, ফিরে যাবো।

আলোয় আসে না

আলোয় আসে না হয়তো কিছু দৃশ্য
দৃশ্যের শরীর
মেলে দেয় অন্ধকারে, খুলে যায়
পালকের সমস্ত আবডাল
লোকালয়, জনরব, অভ্যস্ত সংশয়
দূরে রেখে, ঝুঁকে আসা
উতল সমুদ্রটানে-মেশা নীল অরণ্যে; ছমছম
সেই
চড়াইয়ে মহুয়া-শাল, ভিজে-ভিজে....
গাঢ় কুয়াশায়
কেমন নিঃশব্দে আনে, দৃশ্যের শরীর
প্রচ্ছন্ন উদ্যোগে-ভরা বিস্ফোরণ, আমাদের ক্রমমুক্তি
অথচ কুহক
আলোয় আসে না, যেন
অন্ধকার কুরে খায় রক্তের ভিতর।

জপমালা

কে কাকে জল দিলো, কে কাকে ছায়া দেয়
আমার জানা নেই
অথবা জানা ছিলো, এখন ভুলে গেছি
এখন পথে নেমে
যেদিকে মুখ তুলি, তুমিই জপমালা।

একটু সরে এসে
পথের ঠা-ঠা বাঁক, পা দিতে মনে হয়
বাহারি অর্কিডে
ছড়ানো বাহু, যেন তোমার ছলাকলা
কে খোলে, লৌকিক
শরীরী তৃষ্ণা কি? রুক্ষ উড়ো চুলে
ছুঁয়েছে বেদীমূলে—
টলছে পদতল, আভূমি তৃষ্ণায়
যদি না আসো, বুক
সজল ছায়া ঢালে, তাহ'লে কে, তুমি কে
কীসের জপমালা।

সমালোচনা

এক সময়ের দুই কবি

কুড়ি বছর বাইশ বছর একটানা কবিতা লেখার পর হঠাৎ একদিন ঘুম ভাঙে। ব্যর্থতার একরাশ ছেঁড়া খাতার ওপর দিয়ে দেখি উই-এর চলাচল। এমনই অনুশোচনার ভরা সময়ে আমার হাতে এসেছে রত্নেশ্বর হাজরার সাম্প্রতিকতম 'রাজি আছি'—আমার অনুতাপকে আরেকটু উস্কে দিতে। এবং ইতিমধ্যেই কখন যে রত্নেশ্বর দক্ষ পদ্যকারের সংজ্ঞা থেকে কবি হয়ে গেছেন!

বইটি আদ্যন্ত পড়ে ফেলে মনে হল, কবিতার আত্মার ভেতর বসে যেতে চাইছেন রত্নেশ্বর। চারপাশের কোলাহলকে আত্মস্থ করে নিজের লেখার টেবিলে একেবারে মগ্নতার কাছে এই চলে আসা।

'রাজি আছি'-র কবিতাবলী সন্দেহ, সংশয়, প্রশ্ন ও সত্যের বহুমাত্রিক অভিঘাত সম্পন্ন। কবিতাগুলো পড়তে পড়তে প্রতিটি 'হ্যাঁ'-র ভেতরে 'না' জেগে ওঠে, শব্দ থেকে শব্দহীনতায় আছড়ে পড়তে চায় বাঞ্ছিত পাখিগুলো। এ ছাড়া পরম যত্নে এই শিক্ষিত, নিরাভরণ তরুণ আঙ্গিকের পর আঙ্গিকের নিরীক্ষা যেমন করেছেন এ গ্রন্থে, তেমনই অতীতকে অসংকোচে শিল্পীর মতই প্রচল ছিমছাম আঙ্গিকের সাজানো সংসার ভেঙে হঠাৎ হঠাৎ তছনছ করে দিয়েছেন।

সাধারণভাবে তথাকথিত '[illegible]' কবিতার চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো ব্যাপারটা ভালো লাগে না। ফলে, এ জাতীয় কবিতা-রচনায় মাঝে মাঝে উৎসাহী রত্নেশ্বরও উত্তেজিত করতে পারেন না সবসময়। কিন্তু এখানে, কখনো কখনো পেরেছেন। এও তাঁর একরকমের জয়। আর—দীর্ঘ কবিতা

তুলসী মুখোপাধ্যায়

রত্নেশ্বর হাজরা

যে লেখেন রত্নেশ্বর, অন্তত একটি সফল দীর্ঘ কবিতা 'পুরুষ' তার পরিচয় পেতে হলেও 'রাজি আছি' না কিনে উপায় নেই। চমক আছে, স্মার্টনেস আছে, আকাশে ছুঁয়ে দেয়ার যাদু জানা, তবু সরলীকরণে বিশ্বস্ত নন রত্নেশ্বর— এই ব্যাপারটাই বেশ নাড়িয়ে দিয়েছে।

একই সময়ের অথচ একেবারে আলাদা মেজাজের কবি তুলসী মুখোপাধ্যায়। জেদি, তেজীয়া, আপোষহীন কবিতায় অহংকার, রাগ দুঃখ সবকিছুর ভেতরেই খানিকটা জোনাকি প্রকাশনীতির জৌলুস থাকে। কবির 'সময় আসবে' গ্রন্থের নামের মধ্যেই রয়েছে অস্ত্র শানানোর শব্দ। সেই অস্ত্র, যে বাঁ লকের মত লক্ষ্যের চাঁদমারিতে বিঁধে যেতে প্রতিশ্রুত।

'সময় আসবে' কবিতাগুলির উচাটন মেজাজের তলে তলে নাকি সময়ের দোষেই অনবরত কাজ করে চলেছে চাপা অভিমান। বলা বাহুল্য সব সময় তেমন চাপাও নয়।

তুলসী কবিতার একটি প্রধান অবলম্বন মধ্যবিত্ত দিশেহারা তারুণ্যের বিপন্নতা। এবং ব্যাপক অর্থে—রাজনীতি। তাঁর কবিতার ত্রুটি বা সাফল্যের চাবিকাঠিও এখানেই।

রাজনীতি বলতে যা দেখতে হবে তা হল বিষয় যা-ই হোক না কেন তা কবিতা হয়ে উঠছে কিনা। হয়ে গেলে, তা হলে 'শুদ্ধ' আর 'কমিটেড'-এর হাজার তর্ক তুললেও নয়। সর্বত্র না হলেও তুলসী 'সময় আসবে'-র অনেক জায়গাতেই তাঁর অনুভূতিগুলিকে সার্থক কবিতা করে তুলতে পেরেছেন। তাঁর কবিতার কণ্ঠ আছে, পুরোনো জমি ছেড়ে নতুন জমির দিকে পা চালানোর ছাপ আছে, এমনকি অন্ধকার তাড়ানোও আছে— এ বড় কম কথা নয়।

রাজি আছি। রত্নেশ্বর হাজরা। রামায়ণী প্রকাশ ভবন, কলকাতা-৯। ৬॰ টাকা।

সময় আসবে। তুলসী মুখোপাধ্যায়। বিশ্ব-জ্ঞান, কলকাতা-৯। ৫ টাকা।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সুনীলকুমার নন্দী

জন্ম : ১৯৩০

জীবিকা : প্রশাসনিক কর্মী।

হৈচৈ নেই, কথায় কথায় চমক নেই, নিজের মত দীর্ঘদিন ধরে কবিতা লিখে যাচ্ছেন সুনীলকুমার নন্দী। কখনো বড় গলায় কথা বলতে দেখিনি তাঁর কবিতাকে। মাথার ওপরে তার মুঠি তোলা হাত-ও দেখিনি।

আসলে সুনীলকুমার কথা বলেন বয়স্ক, চাপা গলায়। সমাজ-পরিবেশ-মানুষ সম্পর্কে আদৌ নির্লিপ্ত নন তিনি। কিন্তু কবিতা তাঁর কাছে একটি শৈল্পিক নির্মিতির ব্যাপার। তাঁর স্বভাবে আছে নিহিত শিল্পবোধ, যা যে কোনো তত্ত্ব বা সংবাদকেও সুষমায় জড়িয়ে ধরে। তাঁর 'ভিন্ন বৃক্ষ ভিন্ন ফুল' থেকে সাম্প্রতিক 'পিটছিল গুহার জল' পড়ে একথাই আমার মনে হয়েছে যে সরলীকরণে বিশ্বাসী নন তিনি। তাঁর কবিতার ঝোঁক হল যে কোনো জিনিসকে গ্রহণ করে আত্মস্থ করা, তারপর তাকে ধীরে ধীরে কাব্যময় করে তোলা। খুব সতর্কভাবে তাঁর পদসঞ্চার সিঁড়ি-ভাঙা ছন্দে, সাঙ্গ রূপকে, প্রকীর্ণ ব্যঞ্জনায়। তাৎক্ষণিকতায় অবিশ্বাসী সুনীলকুমার বরং বেছে নেন, সেই দুরূহ পথ, যা কবিকে রাতারাতি লোকপ্রিয় করে না, কিন্তু ভবিষ্যতের পাঠকের হাত দিয়ে কিছু মূল্য তুলে দেয়।

একটি শিক্ষিত, পরিশীলিত মন আগাগোড়া কাজ করছে তাঁর কবিতায়। এই মার্জিত রুচির ছাপ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তাঁর সম্পাদিত 'অনুক্ত' পত্রিকাটিতেও। জনজীবনই হোক আর নিঃসঙ্গতাই হোক—নিজের ব্যক্তিত্বের স্পষ্টতা দিয়ে নানামাত্রিক অনুভবকে যাঁরা বাংলা কবিতায় প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন, নিঃসংশয়ে সুনীলকুমার নন্দী তাঁদের একটি নাম। হুজুগের ধোঁয়া ধুলো উড়ে গেলে যা থাকে, তাকেই সন্ধান করে তুলতে এখনো অনলস রয়ে গেছেন তিনি।

সত্তরের কবিতা

সম্পর্ক

অনির্বাণ লাহিড়ী

দিন কিছু ব্যস্ত গেলে রাত খুব পবিত্র যায়।
দিন ও রাতের মাঝে এরকম সম্পর্ক আছে।
সেইসব রাত্রির জীবন স্বপ্নহীন কাটে,
গভীরতা বেড়ে যায় আমাদের পানাপুকুরের—
যেইখানে ডুবেছিলো ফুলমাসি, ভেসেও ওঠেনি।
পুরীতে বেড়াতে গেছি আমরা তো বহু বহু বার...
ফুলমাসি আমাদের প্লবতা কি ঈষৎ বেড়েছে?

তবুও

অমিতাভ কাঞ্জিলাল

বিকেলের একটু আগে, সে বেরিয়ে পড়ে পথে
দেখতে পায়, ভিখিরীরা দরজায় দরজায় বাড়িয়ে দিয়েছে
তাদের লম্বা হাত
ফুটপাতে উবু হয়ে বমি করছে এক মাতাল, এবং
সে দ্রুত পাশ কাটিয়ে যায় এদের;
নতুন বিয়ে করা স্বামী-স্ত্রী, ঘুরে আসে পুরী, ঘুরে আসে মুর্শিদাবা
সেসব গল্প তাকে শুনতে হয় কোনো কোনো বাড়িতে গিয়ে
শোনে, দামী দামী উপদেশ
শুনতে শুনতে শুনতে শুনতে হাই ওঠে তার
সে আবার বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়—

এতো যে পাল্টায় দৃশ্য, এতো যে মানুষ
ঘোরাফেরা করে তার চারপাশে
তবু, একটা অচল পেন্ডুলাম সারাক্ষণ ঝুলে থাকে
তার বুকের ওপর

অন্ধ বালিকার প্রতি নিবেদিত কবিতা

অশোক দত্ত

আমাদের এইভাবে নীলিমার ভেতর দিয়ে কতোদূরে যাওয়া যেতে পারে
কতোটা উঁচুতে তুমি কেঁদে-হেসে দেখাবে সংসার-শোক-জীবনযন্ত্রণা
আমাদের জানা নেই, শুধু জানি একটু জমির জন্য যারপরনাই
আমাদের লড়ে যেতে হবে:

তুমি তো জানো   নি দূরনীহারিকা-নক্ষত্র-নীলিমার পথ,
যাদের চক্ষু আছে
তারাও জানে না, তারা শুধু মঙ্গলকাব্য পাঠ করে, মন্দিরে দোলায়
ঘণ্টা—প্রণাম ঠাকুর
হাল ছেড়ে স্বস্তি পাই যেন;

হায় ঐ পথ জানা নেই, আমাদের কারো জানা নেই; ঐ পথ কতোদূরে
ঐ স্থান কতো উঁচু জানে শুধু আমাদের মালিক ঠাকুর আর
ঐ যোগমায়া পূজনীয়া
অধিষ্ঠাত্রী দেবী;

আমরা কেবল জানি সুরু, দুঃখিত কবিতা,
কিছু গান তোমার আমার
আর ঐ যুবকটির কথা:
তুমি শোনো, আমি লিখি : একটু জমির জন্য যারপরনাই আমাদের
লড়ে যেতে হবে।

পদচিহ্ন

অজয় সেন

বারবার ব্যবহৃত হয়েছে, লক্ষ্য করো, কোন বিজন প্রদেশে রয়েছে
পদচিহ্ন তার
অপব্যবহারে যে ক্রমশঃ অহেতু কর্কশ, একদা যার মাহাত্ম্যে
জেগেছিলো প্রতিধ্বনিময় বাচালতা।
অথচ ঐ সে ফিরে যায় অর্ধেক জাগ্রত রেখে আমাদের
সবাই আমরা জানি, সমস্তই জানি, অন্ধকার জঙ্গলে নির্বাসিত
আমাদের গৃহস্থ ও প্রিয় ঢেঁকি
সেই থেকে চলেছি নির্মাণহীন, শৌখিন গন্ধময়, শুধুমাত্র
লজ্জাহীন মর্যাদাবোধ ঘিরে রাখে সমস্ত সকাল সন্ধ্যে
দূরে শ্মশান থেকে এখনও ভেসে আসে শান্ত সাদা চোখের তীব্র আকৃতি
এখনও ভুল উন্মাদ হাওয়ায় ভেসেছো তুমি-যেন—যুদ্ধ কেন? যুদ্ধ
কোথায়?
রঙিন বয়সের কাছে, হাওয়া মোরগের কাছে জানতে চেয়েছি—
কোন্ পথে পদচিহ্ন হারিয়েছে তার? কেন সে এত অভিমানী?

দূর মফঃস্বলের কবি

উনি—

বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। মাথায় টাক। খুদি খুদি চোখ। পোড় খাওয়া মুখ। কালো রঙ। ষণ্ডা-গণ্ডা চেহারা। চিরকুটে পোশাক-আশাক। ওনাকে দেখতে আদৌ সুন্দর নয়। তাই উনি যখন—

—একটি ডাকসাইটে সাপ্তাহিকের অফিস। একদিন উনি এলেন। হাঁটুর ওপর কাপড়, পায়ে সেলাই মারা হাওয়াই চপ্পল। ঈষৎ নার্ভাস মুখ। মুখে বোকা-বোকা হাসি। ওনাকে দেখে কল্পনাতেও আনা যায় না, উনি লেখেনটেখেন।

তাই, উনি যখন—

জমিতে কোদাল, খুরপি চালানো, ইউরিয়া মেশানো হাতে, কয়েকটা পদ্য বার করলেন তাঁর জীর্ণ ঝুলির ভেতর থেকে। এবং কোন ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাপ্রোচ না,—'আমি গাঁয়ের এক কৃষক কবি, কয়েকটা কবিতা এনেছি, আপনাদের কাগজে দিলে বেশী প্রচার হবে, দ্যাখেন যদি এগুলো ছাপতে পারেন—' —জাস্ট এরকম একটা দারুণ সহজ, সরল ডায়লোগ দিলেন। অফিসশুদ্ধ আমরা সবাই বিস্মিত। চমকিত। তার পর একটুও সময় না দিয়েই, 'শুনুন না আমার কয়েকটা কবিতা। প্রথমে দু-একটা ঐশ্বরিক ভাবের কবিতা পাঠ করি।'—বলেই শুরু করে দিয়েছিলেন। —'....দিবার তোমায় কিছু নাহি মোর। এওতো তোমারই দান। তব দেওয়া তব তোমারে দিব হে। কবিও না অভিমান।'....। 'প্রেমরসের কবিতাও লিখি। শুনুন। —'...কতদিনে পাব তোমার বদন হেরিব ধরিব সাদরে ...আর কবে তুমি কবিতা শুনিবে মম পাশে আসি বসিয়া। তোমারও কবিতা শুনাবে আমায় দেখাবে হাসিয়া হাসিয়া।....নোবেল প্রাইজ আনিতে যাইবে পাবে কিনা পাবে না জানি। ওগো শিক্ষিতা ওগো সুন্দরী ওগো মোর মন-বণিতা। ওগো প্রেমহার প্রীতি অর্ঘ্য ওগো রস-প্রিয় রসিকা।'....'....। বলাই বাহুল্য, ওনাকে নিয়ে বিলকুল মজা পাওয়া গেল। তবু উনি আবার একদিন এসেছিলেন। আরেকদিন। বেশ কদিন। মাঝে একদিন ওনার দুটো ছাপানো পদ্যও দিয়ে গেলেন। সবাইকেই। ছোটোটো অপরিচ্ছন্ন ছাপা। ওঁর একমাত্র শর্ত— তাঁর একটাও পদ্য ছাপাতে হবে। তাঁকে প্রশ্ন করে যা যা জেনেছিলাম—

তিনি পদ্য লিখছেন তাঁর বিশ-একুশ বছর বয়স থেকেই। 'সাহিত্য-মুকুলিকা', 'গোলাপ-কুঁড়ি' এ জাতীয় নামধারী কিছু পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন। (গর্বের সঙ্গে জানিয়ে ছিলেন) কোন এক সাহিত্য-সরস্বতী-সমাজ থেকে তাঁকে নাকি 'কাব্য-সাধনার জন্য উপাধিও দেওয়া হয়েছে। (একটু খুঁড়িয়ে জেনেছিলাম, উনি সেই সমাজকে এককালীন 'একশত এক টাকা' দান করেছিলেন।) কবিতা লেখাটা ওনার পরিবারের সকলের কাছে বহুত না-পছন্দের ব্যাপার। অনেকেই পেছন থেকে টিটকিরি দেয়। তবু উনি লেখেন। কেননা কোন সাহিত্য-চূড়ামণি ভবিষ্যত বাণী করেছেন, ওনার মধ্যে নাকি কাব্য-প্রতিভা আছে। উনি সুখ্যাত কবি হবেনই। তাই। উনি থাকেন তারকেশ্বরের ওদিকে কোন এক গাঁয়ে। ঘরবাড়ি আছে। জমিজিরেত আছে। ধানের মরাই আছে। গরু আছে। বৌ আছে। ছেলেমেয়ে আছে।—ভরাভর্তি সংসার আছে। সংসারের যাবতীয় ঝামেলা আছে। উনি সংসারী মানুষ। সংসার চালান। চাষবাস করেন। অর্ধাঙ্গিনীর প্রতি স্বামীর যথাসাধ্য কর্তব্য পালন করেন। যথাসাধ্য ছেলেমেয়েদের প্রতি বাপের কর্তব্যও। এসবের মধ্যেই সময় করে নেন। সে সময়ে পদ্য লেখেন।

ওনারা—

ওনার মত অনেকানেকজনই আছেন। —ওনারা-সাধারণতঃ বাইরে অত্যন্ত সংসারী ভালোমানুষ সংসারী মানুষ। বয়স্কও। সংখ্যাগরিষ্ঠ দূর মফঃস্বলের বাসিন্দা। পেশায়—স্কুল মাস্টার, কেরাণী, দোকানদার, ছোট খাটো ছাপাখানার মালিক....। মাটী,

জল-হাওয়ার দোষ বা বাঙালী জাতের রক্তের দোষ বা অন্য যে কোন কারণেই হোক ওনাদের ঘাড়ে লেখার ভূত ভর করে। গল্প লেখেন, পদ্য লেখেন, তাই তাই সব উপন্যাসও। গল্প নয়, কবিতা নয়....। গল্প পদ্য...। বোঝাতে চাইছি, ওঁদের লেখা কাঁচা, বেশ কাঁচা হয়। গদ্য হলে হাড় সাধুভাষায় লেখা, বাক্য গঠন আইনে কানুনে ভুল ভাল, প্যারায় প্যারায় খেই হারিয়ে যাওয়া, বস্তাপচা বিষয়বস্তু ইত্যাদি। কবিতা—বিয়ের ছড়ার মত কাঁচা। ছন্দ-মেলানো, বিষয়বস্তু—ফুল, পাখি, রূপ-কথার রাজকন্যা-সম প্রেয়সী, মধুর বসন্ত, আদিকালীন প্রেম বিরহ...। 'শোষণের চক্র পড়িবে ভাঙিয়া, হইব তৃপ্ত শোষকের রুধির পান করিয়া।'—এজাতীয় বিষয়বস্তুও থাকে। ওঁরা প্রচুর, সুপ্রচুর লেখেন। লেজার বুকের মত মোটা খাতা, দিস্তে দিস্তে পাতা লিখে শেষ করেন। তাই কবে সযত্নে তা রক্ষা করেন। ওঁদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশই, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাসের নাম শুনেছেন। কিন্তু আদৌ পড়েননি, একটিও লেখা না। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' কি 'খুসর পান্ডু-লিপি'র নামও শোনেননি। হালের বিশিষ্ট তরুণ কবি, সাহিত্যিকদের কারো কারো নামটুকুও পর্যন্ত জানেন না। বিশ্বাস করা কঠিন, তবু, এটা সত্যি যে, ওঁরা লেখেন-টেখেন, অনেকেই কিন্তু তারা-শংকর-প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্যর এপারে আর আসেননি। প্রফুল্ল - শীর্ষেন্দু - অতীন-নরেন কি শক্তি-প্রণবেন্দু-তারাপদ-র নামও পর্যন্ত শোনেননি। শুনেছেও আবছা আবছা।—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। প্রফুল্ল রায়। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়?—হ্যাঁ গল্প-টল্প লেখে দেখেছি। কি,—শক্তি চট্টো-পাধ্যায়?-পদ্য লেখে নাকি? -আমনটা! অথচ ওঁরা নিয়মিত সাহিত্য(!)—চর্চা করেন। পরম উৎসাহে সাহিত্য-তীর্থযাত্রীর আসরে যান-টান। সাহিত্য চর্চা(!) নিয়ে এটা সেটা পাগলামি করে একান্তের আনন্দ পান।

এবং....

উনি। ওনারা। এবং....।—এবং ওঁদের প্রাপ্তি। ওঁরা লেখেন। কিন্তু লিখে কি পান? প্রায় না। স্বাভাবিক-ভাবেই—নাম, সম্মান, অর্থ কিছুই না। ওঁরা লেখেন দূর মফঃস্বলের শীর্ণ জীর্ণ বিবর্ণ ক্ষুদে পত্র পত্রিকায়। কয়েকটা লেখা পত্রিকায় হয়ে থাকে। ওঁদের অনেকেই মাঝে কিছুদিন বড় বড় কাগজের অফিসে অফিসে রচনাগুলো নিয়ে যান। অবশেষে আবার স্বস্থানে ফিরে আসেন। ওঁদের লেখা বড় কাগজে বেরোয় না কোনদিনও। এমন কি নামকরা লিটল ম্যাগাজিনগুলোতেও না। ওঁরা অনামী ও নিজ মানের ক্ষুদে পত্রিকাগুলোতেই শুধু লিখে যান। যে লেখা ওঁদের, কেউ পড়ে না প্রায়। দু-চার-

শ্রম হয়ত না। তাও আবার লেখা ছাপাতে টাকা ঢালেন। পত্রিকাগুলো চাঁদা টাঁদা চায়। দশ-বিশ-ত্রিশ টাকা দিয়ে, ওঁদের লেখা অনামা পত্র-পত্রিকায় ঠাঁই পায়। ঠাঁই পায়, নিম্নমানের সম্পাদনা, রুচি আর প্রোডাকসনের সংকলন গ্রন্থে। মাঝে মাঝে হয়ত কোন সাহিত্য টাহিত্যের ঘরোয়া আসরে দশ-পনেরো লাইনের একটা স্বরচিত পদ্য পড়ার সুযোগ পান। কেউ কেউ বই টই বের করেন। দৈবাৎ-সৈবাৎ কেউ হয়ত বইটার সুখ্যাতি করে। হয়ত বা যে-আন্তরিকভাবে মন-ভোলানো গোছের।—এসবেই ওঁদের আনন্দ, অসীম আনন্দ!

হ্যাঁ—ওঁদের কেউ কেউ বই-টই বের করেন। দরিদ্র কি নিম্নবিত্ত হলে বৌয়ের ক'গাছি সোনার চুড়ি, নিজের বোতাম, আঙটিটা বেচেও।—দু ফর্মা চার ফর্মার শীর্ণকায় গ্রন্থ। কোন বাজে প্রেস থেকে ছাপা, বাজে বাঁধাই...। বড় কাগজে সমালোচনার জন্যে পাঠান, দিয়ে আসেন। কখনো সমালোচনা হয়, কখনও হয় না; বিখ্যাত কোন কোন কবি সাহিত্যিককে উপহার দেন। তাঁরা উপহারদাতার সামনে মলাট বড় জোর উল্টে দেখেন। একটি লাইনও পড়েন না। স্থানীয় ছোটখাটো বইয়ের দোকানে বিক্রির জন্যে দু-দশ কপি করে দেন। বিক্রি হয় না। চেনা-জানাদের মধ্যে বড়জোর বিশ-ত্রিশ কপি পুশ্-সেল করতে পারেন। বেশ কিছু কপিই, 'পড়ে থাকবে কেন, তবু পড়ুক লোকে' এই ভেবে বাধ্য হয়েই উপহার-টুপহার দিয়ে দেন একে ওকে। বাকি সিংহ ভাগ কপিই বাড়িতে পড়ে থাকে, ডাঁই হয়ে। প্রথমে সযত্নে। পরে অবহেলায়। ধুলো পড়ে। ড্যাম্প ধরে। পাতাগুলো বিবর্ণ হলদে হয়। সৃষ্টির ফসল পোকায় কাটে। চোখের সামনে।

তাহলে?—ও'রা কিছুই পান না। বড় কাগজে, ভালো কাগজে আত্মপ্রকাশের সুযোগ না। পাঠক না। নাম না। সামান্য অর্থও না। উল্টে—কাগজ কিনে, কালি কিনে, সাহিত্যের আসর টাসরে যাতায়াত খরচে, পত্র পত্রিকায় চাঁদা দিয়ে—নিয়মিত-ভাবে, ও বই ছাপিয়ে ইত্যাদিতে-অনিয়মিত-ভাবে টাকার শ্রাদ্ধ করে যান। কেউ তাঁদের কবি সাহিত্যিক হিসেবে সামান্য স্বীকৃতিও দেয় না। কেউ, কেউ না। দু-একজন অবশ্য বলে—'কবি', 'সাহিত্যিক'। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই বিদ্রূপাত্মক অর্থে। টিটকিরি!

এতসব সত্ত্বেও ওঁনারা লেখেন। লিখে যান। ভেঙে পড়েন না। সমানে গল্প পদ্য লিখেই যান।

গৌতম ভট্টাচার্য

গোরা । শ্রীকান্ত । অপু

অমৃতের সাহিত্য বিভাগে সম্প্রতি প্রকাশিত বৈকুণ্ঠ পাঠকের 'গোরা। শ্রীকান্ত। অপু' লেখাটি মূল্যবান। সত্যিকারের উপন্যাস সৃষ্টির জন্য যে সুতীব্র জীবন-বোধ এবং গভীর অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, তার অভাবেই বোধহয় আজকের উপন্যাসের এই দুর্দশা। বর্তমান যুগের বেশির ভাগ ঔপন্যাসিকই শুধুমাত্র অবৈধ প্রেমের সাধনায় মত্ত হয়েছেন। কারণ, এই ধরনের মুখরোচক উপন্যাসেরই বাজারে কাটতি বেশি। সেরকম উপন্যাস লিখতে পারলে চলচ্চিত্রে বাজার মাৎ করারও সম্ভাবনা থাকে। অথচ এ-কথাটাও মনে রাখা দরকার যে, তাড়াহুড়ো করে সত্যিকারের সাহিত্য হয় না। কিন্তু এর জন্য দায়ী কেবলমাত্র নতুন লেখকরাই নয়—আমরাও অর্থাৎ পাঠকরাও। অসাধারণ পাঠকের চেয়ে সাধারণ পাঠকের সংখ্যা অনেক বেশি।
—**রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়,** উত্তরপাড়া, **হুগলী!**

দুই

অমৃতের ২১ জানুয়ারীর সংখ্যায় সাহিত্য বিভাগে বৈকুণ্ঠ পাঠক রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণের তিনটি চরিত্র নিয়ে স্মরণীয় চরিত্রের আলোচনা শুরু করেছেন। বৈকুণ্ঠ পাঠক সময়োচিত আলোচনার জন্য আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। তবুও আমার মনে হয় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সমরেশ বসু, নরেন্দ্র-নাথ মিত্র, বিমল কর, শীর্ষেন্দু মুখো-পাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, কমলকুমার মজুমদার, দিব্যেন্দু পালিত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদের সৃষ্ট অনেক চরিত্রই মানুষের মনে দাগ কাটে। **স্যামুয়েল রোজা;** আলিপুরদুয়ার জংশন, জলপাইগুড়ি।

'চিঠি আসে'

অমৃতে সম্প্রতি প্রকাশিত তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'চিঠি আসে' পড়-লাম। এর আগেও পড়েছি 'এখানে অমঙ্গল'। এই সব লেখাতে লেখক বিভূতিভূষণের যথার্থ উত্তরাধিকারী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তারাদাসবাবু যে বিভূতিভূষণের 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'দেবযান' ইত্যাদি লেখার ভাবধারায় আবিষ্ট—তা বোঝা যায়। 'চিঠি আসে' সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা ওঠে মনের মধ্যে। অলৌকিক দর্শন সত্যিই হয়ত ঘটেছিল নায়কের কিন্তু অলৌকিক দর্শন এক্ষেত্রে দার্শনিকতায় পর্য-বসিত নয় কি? আর ঐ 'চিঠি' দুটির লেখক হিসাবে কাকে ধরব—কোনো অলৌকিক সত্তাকে না, নায়কের নিজেরই লেখা অবচেতন মনে, কখনও অন্য মনে? নাকি ঐ চিঠি শুধুমাত্র 'আহ্বান' হিসাবেই ধরা উচিত? তারাদাসবাবু এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করলে বাধিত হই।
—**সন্ধ্যা দাসরায়, নিভা দে, দুর্গাপুর।**

সুকুমার সেন

শ্রীশাণ্ডিল্য অমৃতের ২৮ জানুয়ারী সংখ্যায় সুকুমার সেনের সঙ্গে যে সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ। এর আগের এক সংখ্যায় শাণ্ডিল্য সুনীতিবাবুর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের কথা জানিয়েছেন। সেখানেও সেই একই আক্ষেপ—কেউ পড়ে না, বানান জিজ্ঞাসা করতেও লজ্জা হয় না তথা-কথিত শিক্ষিত ভদ্রলোকদের। আমার মনে হয় এই দুটি সাক্ষাৎকারেই একটা গুরুতর সমস্যার কথা রয়েছে। সে সমস্যা—যথার্থ শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা হ্রাসের সমস্যা, স্থায়ী মূল্যের, মননশীল পুস্তক প্রকাশ ও প্রচারের সমস্যা।
—**দিগ্বিজয় দে সরকার,**
কোচবিহার।

দুঃস্থ শিল্পী সাহিত্যিক

২৮ জানুয়ারীর অমৃতের একটি সংবাদ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তখনকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ মহাশয় বলেছেন দুঃস্থ শিল্পী সাহিত্যিক প্রসঙ্গে যে...এঁদের সম্মানিত করা অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য। তথ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রতবাবুও তা সমর্থন করে দশ লক্ষ টাকার একটি ফাণ্ড গড়ে তোলার আশ্বাস দিয়ে অনেক দরদী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। এ জন্যে উভয়কে আন্তরিক অভিনন্দন না জানিয়ে পারলাম না। আমাদের এই হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে ৮ আড্ডি লেন নিবাসী একজন পংগু সাহিত্যিক শিল্পী ও কবি আছেন যাঁর দুখানা পা নেই। তাকে বার্ধক্য কি নিদারুণ অসহায় করে তুলেছে দেখে চোখের জল রাখতে পারিনি। **স্বর্ণা চৌধুরী,** ভাণ্ডারহাটী, হুগলী।

পদ্মশ্রী

১১ ফেব্রুয়ারীর অমৃত সাপ্তাহিক পত্রিকায় মল্লিনাথ গুপ্ত মহাশয় শ্রীপ্রীতিশ নন্দীর মাত্র ৩০ বৎসর বয়সে 'পদ্মশ্রী' প্রাপ্তির বিষয়ে লিখেছেন 'এর আগে কবিতার ক্ষেত্রে তো নয়ই অন্য কোনো ক্ষেত্রেও এত অল্প বয়সে কেউ পদ্মশ্রী পেয়েছেন কিনা সন্দেহ।'

মল্লিনাথ গুপ্ত এবং আপনাদের অগণিত পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে ৩০ বছরের থেকেই অনেক অল্প বয়সে (মাত্র ১৯ বৎসর ২ মাস বয়সে) এই কলকাতারই এক বাঙালী মেয়ে কুমারী আরতি সাহা ইংলিশ চ্যানেল সাঁতার দিয়ে পার হওয়ার জন্য তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে ভারত সরকার ১৯৬০ সালের ২৬ জানুয়ারী তাঁকে 'পদ্মশ্রী' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। **শুভা ঘোষ, বালিগঞ্জ, কলকাতা।**

সা

অমৃত নববর্ষ ১৩৮৪

উপন্যাস

বুদ্ধদেব গুহ,
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

উপন্যাসোপম বড়গল্প

আঙুরবালার ডায়েরি থেকে

ভুলি কেমনে আজও যে মনে•••

সুদীর্ঘ, সচিত্র, প্রামাণিক স্মৃতিলিপি

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ রায়, বলরাম বসাক, হীরক রায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অমল মুখোপাধ্যায়, শচীন দাসের গল্প

কবিতাগুচ্ছ

অগ্রজের দৃষ্টিতে অনুজ গল্পকার
লিখেছেন প্রফুল্ল রায়/দেবেশ রায়/বরেন গঙ্গোপাধ্যায়/সুধাংশু ঘোষ/কবিতা সিংহ

দ্বারকানাথের দলিল

ল্যাজারাস থেকে কাজল মিত্র একখানি টেবিল কিনেছিলেন। তার একটি চাবিহীন ড্রয়ার খুলে তিনি এই দলিলখানি পেয়েছেন। ১৮৪৫ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুরের এই দলিল থেকে জানা যায় প্রথম ভারতীয় বাঙালীর ব্যবসায়ের ইতিহাস।

অনিল চন্দকে লেখা

রবীন্দ্র পত্রাবলী

পত্র পরিচিতি ঃ গৌরাঙ্গ সাহা

দিনেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে শৈলজারঞ্জন মজুমদার

রবীন্দ্রনাথের চলচ্চিত্র ভাবনা/নিত্যপ্রিয় ঘোষ
বোম্বাইয়ের বাঙালী নায়িকা/নির্মল ধর

আমার অর্ধেক ফ্যানই মেয়ে/সুরজিৎ সেনগুপ্ত
বেলবটস স্ল্যাকসে সাজানো পুতুল চাই না/শ্যামল ঘোষ
মা আমার সব চেয়ে বড় কোচ/সুব্রত ভট্টাচার্য
আমার স্টারই আমাকে ফুটবলার বানিয়েছে/প্রদীপ চৌধুরী

প্রকাশকদের মতে এক বছরের উল্লেখযোগ্য বাঙলা বই

দাম ৬·০০ / সডাক ৮·০০

বোশেখেই বেরোবে

আপনার কপির জন্য এজেন্টকে বলুন বা লিখুন—
সার্কুলেশন ম্যানেজার, অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা-৭০০০০৩

রবীন্দ্রসঙ্গীত

রবীন্দ্রসঙ্গীত কিভাবে গাইতে হয়

পূজনীয় গুরুদেবের গান রচনার কয়েকটি বিশেষ রীতি ছিল। গানের ভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি স্থির করতেন, কোন তালের ছন্দে গানটির সুর যোজনা করতে হবে। যেমন :—শ্রদ্ধা, বন্দনা, ভক্তি, গম্ভীর ও শান্ত প্রকৃতির গানগুলিতে তিনি হিন্দী চৌতালের ধ্রুপদ-গানের রচনা-রীতি অনুযায়ী সরল ও নিরাভরণ সুর যোজনা করতেন। সহজ তালে, একই প্রকার গান রচনার সময়েও দেখা গেছে যে, সুর যোজনা এবং তার গীত-রীতিতে ধ্রুপদের রচনা-রীতির ছাপ। উদ্দীপক ও উল্লাসের কবিতায় যখন সুর বসাতেন, তখন, সুর-গুলি প্রায়ই পরস্পরের সঙ্গে বেশ খানিকটা ব্যবধান রচনা করে ওঠানামা করতো। এসব গান মধ্যলয়ের গতিতে গাইতে হয় বাণীর উপর নির্দিষ্ট ছন্দের ঝোঁক দিয়ে। আনন্দচঞ্চল আবেগের গানে তিনি সুর বসাতেন, দ্রুতলয়ের ঘন-সন্নিবিষ্ট ছন্দের ঝোঁকে। হতাশা, বিষণ্ণতা, বিরহবেদনা, দুঃখ বা কান্নার আবেগের কথায় সুর বসিয়েছেন গড়ানো বা ঢিমালয়ের তালে। কখন, কখন, ঢিমালয়ের তালের বাঁধন থেকে মুক্তি দিয়ে এ ধরনের গানকে ভাঙা বা অনিয়মিত ছন্দে গেয়েছেন। গানের এইরূপ বিচিত্র ভাবাবেগের প্রতি লক্ষ্য রেখে, অনুকূল তালের ছন্দে ও লয়ে শিল্পীরা তাকে যদি কণ্ঠে প্রকাশ করতে পারেন তবেই গানের রূপ ও রসটি ফুটে উঠবে, সহজে: গান গাইবার সময়, এই দিকটির প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রতিটি গায়ক ও গায়িকার অবশ্য কর্তব্য। ভাবের প্রতিকূল তালের ছন্দে পরিবেশিত গানকে বলবো বিকৃত গান।

গুরুদেবের গানকে কণ্ঠে প্রকাশের সময় কণ্ঠস্বর প্রয়োগের কতগুলি ধরণ আছে। যেমন :—বন্দনা, শ্রদ্ধা, শান্ত, উল্লাস, উদ্দীপন, আনন্দচঞ্চল, দুঃখ, ক্রোধ, বিরহ বেদনার ভাবযুক্ত কবিতার আবৃত্তিকালে নানা প্রকার কণ্ঠস্বর প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। তেমনি গানের রসভেদে কণ্ঠস্বরের হ্রাসবৃদ্ধি অর্থাৎ কখনো মৃদু, কখনো মধ্যবল, কখনো প্রবল, কখনো ক্রমশ মৃদু থেকে ক্রমশ বৃদ্ধি বা ক্রমশ বৃদ্ধি থেকে ক্রমশ মৃদুস্বর কণ্ঠে প্রয়োগ করতে হয়। একটানা মৃদু স্বরে বা একটানা প্রবল স্বরে গুরুদেবের গান গাইবার রীতি নয়।

গুরুদেব, তাঁর উদ্দীপক ও গম্ভীর প্রকৃতির গানে তৎসম শব্দকে অধিক স্থান দিতেন। তৎসম শব্দযুক্ত কবিতায় আবৃত্তিকালে শব্দগুলিকে গুরুদেব যে রূপে প্রস্বনের দ্বারা উচ্চারণ করতেন,, তাঁর গানের সুরযুক্ত তৎসম শব্দগুলির ক্ষেত্রেও তাঁকে একই উচ্চারণ রীতি অবলম্বন করতে দেখেছি। তদ্ভব শব্দ যুক্ত উদ্দীপক গানও তিনি রচনা করেছেন, কিন্তু, তার শব্দকে তিনি তালের ঝোঁকের সংগে, কণ্ঠস্বরে বা বাচনভংগীতে এমনভাবে জোর দিয়ে উচ্চারণ করতেন যে, তার দ্বারা সমগ্র গানের ভাবরূপটি সহজে প্রকাশিত হবার সুযোগ পেত।

আহা, অহো, আঃ, আয়, এস, ওগো, কী, কেন, চলো ছি, দে, ডেকোনা, তুই থাক্, ধর, ধিক, না, যাও, যাক্ হা, হাগো হায়রে রে, হাই, হাচ্ছো, হায়, হো, হে, প্রভৃতি বহু রকমের শব্দ গুরুদেবের নানাপ্রকার হৃদয়াবেগের গানে আমরা পাই। কিন্তু, এর যে কোন একটি শব্দকে তিনি যখন ক্রোধ, দুঃখ, বিস্ময়, আনন্দ, বেদনা প্রভৃতি আবেগের গানে বসিয়েছেন, তখন সেটিকে কোন অর্থে ব্যবহার করেছেন তা ভাল করে বুঝে, সুর সহযোগে, ভাবানুকূল স্বরভঙ্গীর সাহায্যে উচ্চারিত হলে, শব্দযুক্ত পংক্তি বা সমগ্র গানের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা সহজ হয়। যে সকল গায়ক-গায়িকা সুরযুক্ত স্বরভঙ্গীতে তা প্রকাশ করতে অক্ষম হবেন, তাঁদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

গুরুদেবের গীতনাট্য ও নৃত্যনাট্যের গান এবং সুরে আবৃত্তিমূলক কিছু গান আছে যা উপরোক্ত এই সকল গীতরীতিতে গাইতে না পারলে, তা যে ভাবানুযায়ী গাওয়া হল, সেকথা বলা চলবে না। গীতনাট্য ও নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রে চরিত্রানুযায়ী কথার ভাবের পরিবর্তনের সংগে সংগে ঘন ঘন তাল ও লয়ের পরিবর্তন করতে হয়। এই কারণে, এইসব নাটকের নানা প্রকৃতির গানগুলি সুরসহযোগে কী ধরনের স্বরভঙ্গীতে এবং ছন্দে ও লয়ে গাইতে হবে তার সুষ্ঠু অনুশীলন আবশ্যক।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের গীতরীতির এ কটিই হল মূল সূত্র এবং এর সঠিক অনুশীলন, গায়ক-গায়িকাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করি। শিক্ষকদের কর্তব্য হবে, গান গেয়ে শিক্ষার্থীকে এই সূত্র কটিকে ভাল করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করা। কেবল, মুখের আলোচনায় বা গ্রন্থের ব্যাখ্যা পাঠের দ্বারা শিক্ষার্থীরা এই গীতিরীতিটিকে কখনই কণ্ঠে ধরতে পারবে না। শিক্ষককে ক্রমান্বয়ে সব রকমের গান গেয়ে বোঝাতে হবে, গানের প্রকৃত রস বা ভাবটিকে কি ভাবে কণ্ঠে প্রকাশ করতে হয়।

গুরুদেবের যে কোন গানের সুষ্ঠু পরিবেশনের প্রয়োজনে গায়কের অবশ্য কর্তব্য হবে, লিরিক কাব্য হিসেবে সমগ্র গানটির মূল ভাবটিকে অন্তরে অনুভব করবার চেষ্টা করা এবং গানের প্রতিটি শব্দ ব্যবহারের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করা। এছাড়া আবশ্যক, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রাগরাগিণী এবং দেশী সুরের মধ্যে নানাপ্রকার লিরিক আবেগ যেভাবে সঞ্চিত আছে তাকে হৃদয়ে গ্রহণ করবার শিক্ষা। আর একটি শিক্ষণীয় বিষয় হল, উচ্চাঙ্গ এবং লোকপ্রচলিত গানের সংগে যুক্ত বিচিত্র তালের ছন্দজ্ঞান। গানের তালও ভাব প্রকাশের একটি আবশ্যকীয় অংগ।

এইরূপ সর্বাঙ্গীণ শিক্ষায় পারদর্শী গায়ক ও গায়িকা হিসেবে যে দিন আমরা রবীন্দ্রসংগীতকে গেয়ে শোনাতে পারব সেদিনই রসিক শ্রোতাগণ জানতে পারবেন, রবীন্দ্রসংগীত কিভাবে গাইতে হয়।

শান্তিদেব ঘোষ

প্রেমের গান

গুরুদেবের গানকে মতঙ্গর মতানুযায়ী দেশী সঙ্গীত (চলতি ভাষায় যার নাম লোকসঙ্গীত) বলা চলে অনায়াসেই। আবার তাকে ইউরোপীয় সঙ্গীতশাস্ত্রে যে-ধরনের গানকে ফোকসং আর্টসং কিম্বা ফোক-লাইক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেই তিন পর্যায়েও ফেলা চলতে পারে। এই নিয়ে বিশদ আলোচনার মধ্যে আপাতত না গিয়ে শুধু এইটুকুই বলার যে অন্তত আমার কাছে গুরুদেবের গান পারফরমেন্সের জিনিস যতটা তার চেয়ে অনেক বেশী হচ্ছে পারটিসিপেশনের বস্তু। অন্য কথায়, এই গানকে আমি দেখি নৈর্ব্যক্তিক বিনোদনের উপকরণ হিসেবে নয়, ব্যক্তি-জীবনের বিভিন্ন প্রকাশের অঙ্গ হিসেবে। এইজন্যেই আমি এই গানকে গুরুদেবের গান বলি: একে রবীন্দ্রসঙ্গীত বলে আখ্যাত করতে আমার আটকে যায়।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে এটা বোধহয় স্পষ্ট হবে যে, দেবের গানকে—এবং অন্য অনেক গীতিকারের রচনাও—র—এবং অন্যদেরও—জীবনের সুখ-দুঃখের অংশ বলে মনে। যে-গান না হলে বর্ষা-নামার উল্লাস, বসন্তদিনের রোমান্স ন বছরের সংকল্প, মৃত্যুর পবিত্রতা কোন কিছুই আমার মনে র্ণতা লাভ করে না, সে গান যে জীবনের অন্যতম ন্তুতা—প্রেমের সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত থাকবে তাতে আর চর্য কী। নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় ঠিক কথা-বলার মতন করে—

'তোমার গোপন কথাটি সখী রেখো না মনে
শুধু আমায় শুধু আমায়, বোলো আমার গোপনে'—

য় উঠে কেউ ঈপ্সিত ফললাভ করছেন ভাবাটা বোধহয় কল্পনা হবে না।

তবে শুধু পূর্বরাগের ক্ষেত্রেই যে গুরুদেবের প্রেমের নর একটা সহায়ক ভূমিকা থাকতে পারে তা নয়। তাঁর এই য়ের গানের একাধিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি এই প্রসঙ্গে শেষ করে স্মর্তব্য। লাবণ্যর কাছে অমিত রায় অভিযোগ করেছেলেন—'তোমার রবি ঠাকুর কেবল চলে যাবার কথাই বলে....।' মধ্যে সত্য এইটুকু যে আমাদের জীবনে অসংখ্য ক্ষেত্রে সৃষ্ট হৃদয়ে হৃদয়ে আধো পরিচয়ের নিমেষ-কাহিনী যাকে পিছে লে স্রোতে ভেসে আবার দূরে চলে যেতে হয় এবং গুরুদেব ই একটুকু ছোঁয়া-লাগা এবং একটুকু কথা-শোনা নিয়ে অজস্র কাহিনী রচনা করেছেন যার উপসংহারে মিড় লাগিয়েছেন দায়বেদনার। উপরোক্ত বিষণ্ণ-মধুর অবস্থায় পড়ে রুদেবের কোন গানকে একটা বাস্তব প্রতিষ্ঠা দেওয়া খুব ন্ত নয়। ছেড়ে চলে যাবার আগে বেহাগের কোমলতায় মোড়া সন্তের গান কাছের মানুষকে উপহার দিয়ে সে গানের বেদনায় র চোখ ছলছল করে ওঠার মধ্যে সান্ত্বনা পাওয়ার সৌভাগ্য রুদেবের দাক্ষিণ্যে অনেকেরই হবার কথা।

তবে গুরুদেবের প্রেমের গান—এবং অন্যান্য বিষয়ক গানও—সব সময়ে খুব বাস্তব করে দেখতে গেলে গণ্ডগোল উঠতে পারে। একদা কোন এক বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তাঁর বিধবা পত্নীকে গান শোনাতে হয়েছিল। ভদ্রমহিলা গাইতে বললেন—তবু মনে রেখো গানটি। আমাকে বলতেই হলো আমি গানটি জানি না। কারণ 'তবু মনে রেখো'র পরের পংক্তি হচ্ছে—'যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নব প্রেম জালে'; আর সদ্য স্বামীহারার পক্ষে তখন নব প্রেমের চিন্তা ঠিক বিধেয় বলে আমার মনে হয় নি।

১৯৫২ সালে শান্তিনিকেতন সঙ্গীত ভবনের ফাইনাল পরীক্ষার আগে আমি বিদায়ী ছাত্র হিসেবে ইংরেজিতে যাকে বলে ফেয়ারওয়েল পেয়েছিলাম। সেই অনুষ্ঠানে কোন গায়িকা গেয়েছিলেন—'যদি হলো যাবার ক্ষণ
দিয়ে যাও শেষের পরশন।'

বলাবাহুল্য ঐ গানকে বাস্তবভাবে গ্রহণ করে শেষের পরশন দিতে এগিয়ে আসাটা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

শোনা যায় জীবনলাল পাত্র নামে এক ভদ্রলোকের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রতি আগ্রহী এক মহিলা নাকি অত্যন্ত দরদ দিয়ে গাইতেন 'আমার জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান।' এতে তাঁর অভিষ্ট সিদ্ধ হয়েছিল কিনা তা অবশ্য আমার জানা নেই।

সর্বজিৎ রায়
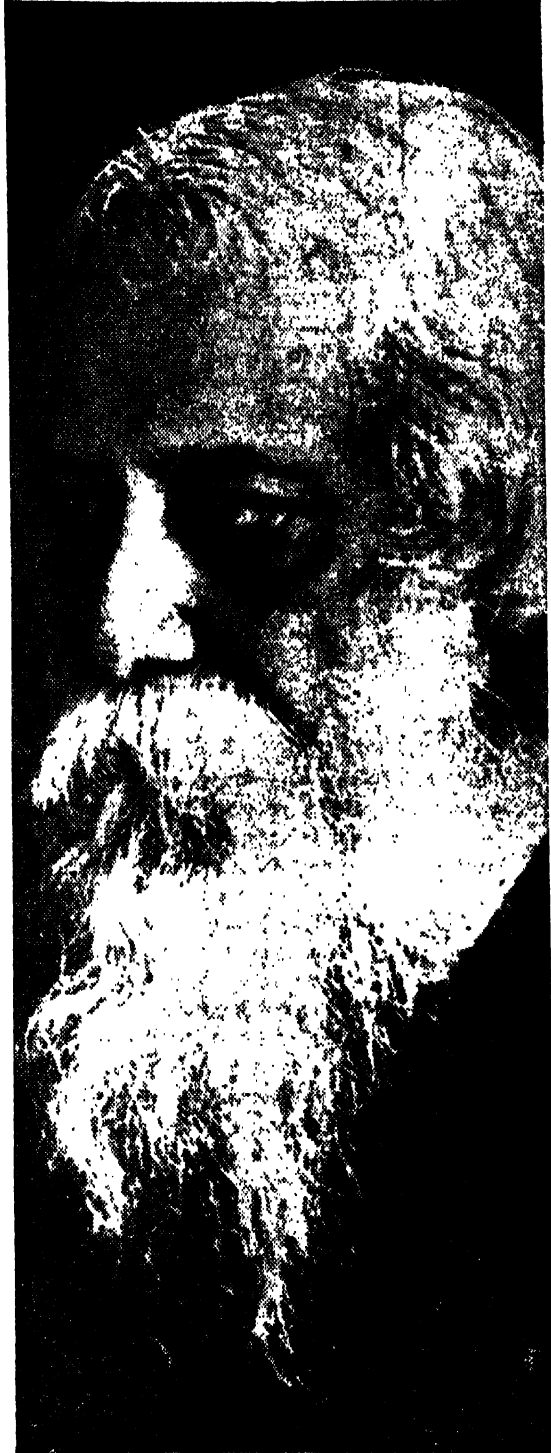
কাননদেবী গান রেকর্ডিং করছেন। বামদিকে রাইচাঁদ বড়াল

কানন

রবীন্দ্রসংগীতকে কানন বীজমন্ত্রের মত করেই গ্রহন করে-ছিলো। শাস্ত্রে আছে 'ন মন্ত্রমক্ষর নাস্তি'—এমন কোনো অক্ষর নেই যা দিয়ে মন্ত্র রচনা করা যায় না। অপেক্ষা কেবল যোগাযোগের। এই অনুকূলে যোগাযোগের দুর্লভ লগ্ন কাননের শিল্পীজীবনে এসেছিলো। সে কখানা রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছে অথবা কি উদ্দেশ্যে গেয়েছে সেটাই তার গান সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা নয়। যে কটি গান সে গেয়েছে, তার ওজন, মর্মগ্রাহিতা এক্সপ্রেশনের অনন্যতা সে গানে এমন একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা সৃষ্টি করেছে যাকে না মেনে উপায় নেই। এ স্বাতন্ত্র্য তার অনন্যসাধারণ প্রতিভাজাত সম্পদ।

কবির কাছে 'দিনের শেষে' গানটি নিজের সুরে গাইবার অনুমতি ভিক্ষা করতে যখন যাই উপরি-পাওনা হিসেবে তিনিই 'আজ সবার রঙে' ও 'তার বিদায়বেলার মালাখানি' গান দুটি ব্যবহার করবার নির্দেশ দিলেন এবং তিনিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এ-ছবির নামকরণ করলেন 'মুক্তি'।

'সবার রঙে রং মেশাতে হবে'—তাঁর গানের জনপ্রিয়তা তো ঐতিহাসিক ঘটনারই সামিল। তারপর একে একে 'তাঁর বিদায় বেলার মালাখানি' (মুক্তি) 'আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে', 'আমার বেলা যে যায়' (পরিচয়) 'সেদিন দুজনে' (পথ বেঁধে দিল) মর্মস্রাবী ভাবগাঢ়তায় মনকে যেন কোথায় নিয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথকে বোঝবার মত বিদ্যাবুদ্ধি কোনটাই আমার নেই। শুধু এইটুকুই বুঝি আলগোছে সবার ছোঁওয়া বাঁচিয়ে চারদিকে স্বতন্ত্র দেওয়াল তুলে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ধ্বজা উড়িয়ে তিনি চলতে চান নি। সব ঠাঁই তাঁর ঘর ছিলো। সেই ঘরই সারা জীবন ধরে তিনি খুঁজেছেন। সেই খোঁজারই রোমাঞ্চ, আবেশ ছড়ানো রয়েছে কবির গানে।'

তবু রবীন্দ্রসংগীত গাইতে আমার কুণ্ঠা। কারণ ভুলুদা (প্রশান্ত মহলানবীশ) একবার আমারই আব্দারে কবির একখানি ছবিতে তাঁর অটোগ্রাফ করে এনে দিয়েছিলেন। তাই নিয়ে উঁর মহলে তুমুল প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল—কেন একজন চিত্রাভিনেত্রীর কাছে কবির নিজের হাতে স্বাক্ষরিত ছবি থাকবে? কলকাতা থেকে অনেকে ট্রাংক কল করেও তাঁকে উত্যক্ত করেছেন। সেই প্রথম নিজের ওপর ধিককার এসেছিলো—আমি অত বড় মানুষটার অশান্তির কারণ হলাম। হোক না সাময়িক। হলাম ত। ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল—রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর গান আমার মত সামান্য মানুষের জন্য নয়। যা আমার নয় তার জন্য লোভ করবার দরকার কি? তার চেয়ে গরীবের ভাগ্যে যেটুকু খুদ কুঁড়ো জোটে তাই নিয়ে খুশী থাকাই ভালো।

তারপর এক একটি ছবির জন্য যখন মাঝে মাঝে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতে হত তখন নিজের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলত। একটা অনামী অভিমানে সারা হৃদয় ছেয়ে আসত। এ অভিমান কেন? কার ওপর? তাও ঠিক বুঝতাম না। অথচ এ গান গাইব না এমন কথাও ত বলা যেত না। কারণ সেটা স্পর্ধার মতই শোনাবে। অতএব গাইতে হত। সে এক মজার অনুভূতি। যেই না গাইতে শুরু করতাম অমনই বিদ্রোহী মনের রুক্ষ ভাব, উদ্ধত অভিমান কোন মন্ত্রবলে যেন গলে যেত অশ্রু আবেগে। কোন এক আশ্চর্য দেশে যেন মুহূর্তের জন্য প্রবেশাধিকার পেতাম। উপলব্ধির সেই পূর্ণিমালগ্নে মনে হোত যেন অন্তবিহীন বেদনাপাথার পেরিয়ে এক জ্যোতির্ময়ের সামনে এসে দাঁড়ালাম। এক জনমে এত পথ পার হওয়া যায় না। তবু যে হলাম এ ত তাঁরই করুণা।...গান শেষ হবার পর সম্বিৎ ফিরে এলেই চমকে উঠতাম। এ কার গান গাইলাম? এ গান ত আমার গাইবার অধিকার নেই? তাহলে এত অভিভূত হলাম কেন।

সে এক স্মরণীয় ঘটনা। হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীতে রবীন্দ্রনাথ রেকর্ড করতে আসছেন শুনে ভুলুদার ভাই বুলাদা আমায় সঙ্গে করে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। তখনই পেয়েছিলাম তাঁর আদর ও আশীর্বাদ। সেই মহাপুরুষের স্নেহঝরা দৃষ্টি ও স্পর্শের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিলো যেন আলোর সমুদ্রে স্নান করছি। এরপর মনের মধ্যে আর কোনো অভিযোগ অভিমান কিছুই ছিলো না। মনে হল তিনি আকাশ, আর সে আকাশ এতই উঁচুতে যে কোনরকম মালিন্যের মেঘ সেখানে পৌঁছতেই পারে না। এ ঘটনার পর তাঁর গান গাইতে গেলেই মনে হোতো যেন তাঁকেই শোনাচ্ছে।

....অবশ্য এসব ধারণার মূলে পংকজবাবুর অবদানও বড় কম ছিল না। রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রথম দীক্ষা ওঁরই কাছে। আর ওঁরই কাছে আমার প্রথম শেখা 'আজ সবার রঙে' গানখানা। শেখাবার সময় সুন্দর করে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গানের দর্শন বুঝিয়ে দিতেন। উনি সব সময় আমায় স্মরণ করিয়ে দিতেন মনে রেখো 'মুক্তি' কথাচিত্রেই তুমি প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাবে অগণিত মানুষকে। আর শোনাবে সেই গান যে গান স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে কবি উপহার দিয়েছেন এ ছবিতে গাইবার জন্য। এতবড় অধিকারের যেন অমর্যাদা না ঘটে।

রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার দায়িত্ব সম্বন্ধে এমন সচেতন হয়ে উঠতে পেরেছিলাম বোধহয় পংকজবাবুর বারংবার উচ্চারিত সাবধান বাণীর দরুনই। নিখুঁত উচ্চারণ, সুরের প্রতিটি শ্রুতির স্পষ্টতা ছাড়াও গলায় স্বরের বিভঙ্গ, কোন পর্দায় কি সেন্টিমেন্ট এসব দিকেও ওঁর সদাসজাগ দৃষ্টি থাকত।

সন্ধ্যা সেন

ছেলেবেলার নিষিদ্ধ গান

'চতুরঙ্গে', লীলানন্দ স্বামী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, 'আধুনিক কবি'র গানটি তাঁর চলে। ১৯১৩-য় লেখা উপন্যাসের এই 'আধুনিক কবি', সন্দেহাতীতভাবে, রবীন্দ্রনাথ নিজেই। অন্ততঃপক্ষে, আমরা এরকম মনে করতে পারি। তাঁর মৃত্যুর এক দশক পরে, শান্তিনিকেতন থেকে মাত্র উনিশ মাইল দূরে, এক গ্রামে আমার জন্ম। এই উনিশ মাইলের দূরত্বটুকু তখন আরও দুর্গম ছিল। বাস চলাচল ছিল না; ও, খাবার-দাবার বেঁধে নিয়ে লোকেরা, একদিন একরাত গোরুর গাড়ী হাঁকালে, ভোরবেলা ভুবনডাঙা পেত। সেরকম এক বৃদ্ধ গাড়োয়ানের মুখে শুনেছিলাম যে, খালি গায়ে চাদর জড়িয়ে কোনো একজন ভোরে ভুবনডাঙায় প্রাতঃভ্রমণে বেরুতেন। পিছনে ছটফটে লাল আকাশ, সামনে মাঠ, হাওয়ায় তাঁর চাদর এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে; তিনি আনমনে আস্তে আস্তে হাঁটছেন। মাঠ পেরিয়ে সারি সারি রাতজাগা গোরুর গাড়ী তিমেতালে কাছাকাছি এলেই গাড়োয়ানেরা সতর্ক হয়ে যেত। 'ঠাকুরের' জন্য সাবধানে পাশ কাটিয়ে তারা গাড়ী নিয়ে যেত বোলপুরের দিকে। সে সময় প্রত্যেক গাড়োয়ান গাড়ী থেকে নেমে পড়তো। গাড়োয়ানের মুখে শোনা এই ঘটনাটি, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে, আমার দূরতম স্মৃতি।

পাঁজিকা ছাড়া কোনো বই ও গ্রামোফোন নেই—এরকম বাড়ীতে জন্মে জীবনে প্রথম যে-গান শুনি, তা হলো ঝুমুর গান। 'ও আমার পিয়া পরদেশী রে, মন বাঁধিব কিসে....'-র কাঁপা কাঁপা টান কোন ছেলেবেলায় শুনেছিলুম খোদ আসরে বসে। গায়ে চাদর জড়ানো ছিল ও হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিলেন আমারই ফুল ঠাকুর্দা। ঘুমন্ত আমাকে, কোনো-এক সময়, আসর থেকে তুলে আনা হয়। পরদিন, ফুল-ঠাকুর্দার কাছে এই অভিযোগ জানানোর জন্য বটগাছতলায় হারমোনিয়াম আনিয়ে তিনি গেয়ে শুনিয়েছিলেন, 'বাবলা বনের ধারে ধারে বাঁশি বাজায় কে....।' গালে একরাশ কোঁকড়ানো পাকা দাড়ি ও মুখে গাঁজায় গন্ধের কোথাও ছিল না স্কুল-শিক্ষার ছাপ। পঞ্চাশের দশকে এসেও 'আধুনিক কবি'-কে তিনি জানতে পারেন নি। কিন্তু 'বাবলা বনের ধারে ধারে..' গানটি কি ঝুমুর? জানি না।

স্বাধীনতা দিবসের সকালবেলা, হাঁটু-কাদা ডিঙিয়ে, প্রাইমারী স্কুলে গিয়ে যে গান নতমস্তকে গাইতে হতো, তা 'জনগণমন-অধিনায়ক..।' ওটা যে রবীন্দ্রসঙ্গীত, তা কি আর জেনেছি তখন! শুধুমাত্র ঐদিনটির কথা ভেবেই স্কুলঘরের সামনে লাগানো হয়েছিল রজনীগন্ধার চারা। উত্তোলনের পর, খুলে-যাওয়া পতাকা থেকে ঝর ঝর করে রজনীগন্ধা কোনো বছরই পড়ত না। বিব্রত মুখে দাড়ি ধরে টানাটানি করতে দেখেছি হেড স্যারকে। ঐ দিনই স্বাধীনভাবে না-জানা সুরে, গানটি সমবেত কণ্ঠে আমরা গাইতে পেতাম। বাড়ী আসার আগে হাতে

পুরনো রেকর্ডে

শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ যখনই কলকাতায় এসেছেন তখনই যাঁর তাঁর কাছে গান শেখার নিমন্ত্রণ বাঁধা ছিল, তাঁর নাম অমিয়া ঠাকুর। স্বয়ং কবির কাছে তিনি শিখেছিলেন কবিরই লেখা অসংখ্য গান। শুনলে আশ্চর্য হতে হয়, এই অমিয়া ঠাকুরেরই গাওয়া চারটি রবীন্দ্রসংগীত অনুমোদন পায়নি। রেকর্ড করেছিলেন হিন্দুস্থান কোম্পানী। যাঁরা অনুমোদন দিতেন তাঁদের মন্তব্য ছিল, 'গানগুলি আরো ভাল হওয়া উচিত ছিল।'

কবি যাঁর গলার গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন, নিজে আগ্রহ নিয়ে যাঁকে গান শেখাতেন, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সেই গুণী শিল্পীর রেকর্ড সংখ্যা মাত্র একটি। তা-ও সে রেকর্ড হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর। একমাত্র রেকর্ডের গান দুটি হল, 'হে নূতন দেখা দিক আরবার,' এবং 'সমুখে শান্তি পারাবার'। এটিও রেকর্ড করেছিলেন হিন্দুস্থান কোম্পানী। ট্রেনার ছিলেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার। এস্রাজ বাজিয়েছিলেন দীনু ঠাকুর, বেহালা দক্ষিণামোহন।

সেকালের নামী গাইয়ে মহম্মদ কাসেম মল্লিক ওরফে কে মল্লিক সে সময় একখানা রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড করেছিলেন। হিজ মাস্টার্স ভয়েসের কুকুর মার্কা লেবেলে। রেকর্ড-নম্বার পি ৪৩০২। গানটি ছিল 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে'। রেকর্ড কোম্পানীকে কবি জানালেন গানটি তাঁর সুরে গাওয়া হয়নি। কবির অভিযোগ পেয়ে ঝরিয়ার রাজসভা থেকে মল্লিক সাহেবকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে ডেকে আনা হল। বেলেঘাটায় স্টুডিওতে বসলেন কে মল্লিক এবং কবি। সঙ্গে ছিলেন কবির গানের ভাণ্ডারী দীনু ঠাকুর। কবি বললেন, রেকর্ডে গানটি ভৈরবীর সুরে গাওয়া হয়েছে কিন্তু ওটি গাওয়া উচিত ইমন কল্যাণে। কেমন ভাবে গাইতে হবে তার একটা নমুনাও গেয়ে দেখালেন দীনু ঠাকুর। শিল্পী শুনলেন মনে ধরল না। সাফ জানালেন কবিকে—ওভাবে তিনি রেকর্ড করতে পারবেন না। ওভাবে গাইতে তাঁর মন সায় দিচ্ছে না।

পরে দীনু ঠাকুরকে দিয়ে 'আমার মাথা নত করে দাও' গানটি রেকর্ড করানো হয়েছিল। ইতিমধ্যেই কে, মল্লিকের রেকর্ডটির কয়েক হাজার কপি বাজারে বিক্রী হয়ে গেছে। দীনুবাবুর রেকর্ড তেমন কাটেনি বাজারে। সম্ভবত শ'তিনেকও 'সেল' হয়নি। আরও দুটি রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড করেছিলেন কে মল্লিক। গান দুটি ছিল, 'আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি '(পি ৪১২৯) এবং 'নিশিথ শয়নে ভেবে রাখি মনে' (পি ১১৬৫)। এগুলি নিয়ে কবির সঙ্গে কোন মতান্তর হয়েছিল কিনা আমার জানা নেই।

রবীন্দ্রনাথ তখনও বেঁচে। তখনও বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড হয়নি। বিশ্বভারতীর একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মী অনুমোদন করলেই রেকর্ড বাজারে বিক্রীর ছাড়পত্র পাওয়া যেত।

হাতে পেতাম বিস্টোনিয়া বিস্কুট, দুটো করে। মাঠে, হয়তো তখন কেউ গলা ছেড়ে গাইছে, 'রসিক কালাচাঁদ....।'

রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়াই, ভয়ংকরভাবে, জীবনের প্রথম আট বছর কাটিয়েছি, গায়ে ধুলোকাদা মেখে। তখন বেশীর ভাগ সময়ই গামছা পরে থাকতুম। মাঝে মাঝে খাকী হাফপ্যান্ট পরতে হতো। সারাদিন ডাংগুলি, ধাপ্সা আর হাডুডু খেলা। ঝড়ের সময়, ঝড়ের বিপরীতে বিপজ্জনকভাবে নিজেকে আলগা করে দেওয়া ছিল একটি প্রিয় খেলা। প্রবল ঝড় হলে, চট করে পড়ে যেতুম না। হাওয়াই দাঁড় করিয়ে রাখত আমাদের। গায়ে এসে ফট্ ফট্ করে লাগত এক-এবটা ঝরে-যাওয়া শুকনো বটপাতা। কে যেন বলেছিল, ঘূর্ণিঝড়ে ঘুরতে-থাকা কোনো পাতা বা খড়কুটো যদি কেউ কুড়িয়ে এনে ঘরের বাক্সে রাখতে পারে, তাহলে সে যা চাইবে, তাই পাবে। সারাদিন আমরা ঘূর্ণি-ঝড়ের সন্ধানে মাঠে মাঠে ঘুরেছি। সন্ধ্যা হয়ে গেল। বাড়ির লোক খুঁজছে। আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে ঘরে ঢুকলাম। চারিদিকে অন্ধকার। এসবের মাঝে কোথায় রবীন্দ্রনাথের গান? তার জন্যে, ক্লাশ ফাইভ অবিদ অপেক্ষা করতে হয়েছে আমাকে।

ক্লাশ ফোরের ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করেই প্রাইমারী স্কুল ছেড়ে দিতে হলো। গ্রাম থেকে দু মাইল দূরের হাইস্কুলে এলাম। যাতায়াতের অসুবিধার জন্য হোস্টেলে থাকতে হতো। ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পরই সরস্বতী পুজো। ইতিমধ্যে হোস্টেলে সকলের ছোটো ছিলাম বলে, কি করে জানি না, আমার নাম হয়ে গেল ভানু সিং। সবাই ডাকত ঐ নামে। হাইস্কুলের উপর দিয়ে বাস যায়। এখানে পাকা বাড়ি ও লাইব্রেরী আছে। সরস্বতী পুজোয় স্কুলে সাজ-সাজ রব। ক্লাশ বন্ধ হয়ে গেল ও ফাঁকা ক্লাশ ঘরে নাটকের রিহার্সাল শুরু হয়ে গেল। এ সময় একজনকে দেখেছিলাম। পাশের গ্রাম থেকে প্রতি পরেরো সাইকেলে চড়ে তিনি প্রায়ই স্কুলে আসতেন। লম্বা চেহারা। হাফহাতা শার্ট ও ধুতি ছিল পরনে। লম্বাটে মুখ ও ভাঙা চোয়াল। দাড়ি-গোঁফ কামানো থাকতে দেখেছি প্রতিদিন। আমাদের স্কুলের শিক্ষক নন, অথচ প্রতিদিনই আসেন, কী ব্যাপার! একজন সহপাঠীকে জিজ্ঞেস করতেই জানতে পেলাম, উনি গায়ক। স্কুলের দু-একজন মেয়েকে, পুজোর উৎসবে গাওয়ার জন্য গান শেখাতে আসেন।

একদিন লক্ষ্য করলাম, তিনি এসে স্কুলের সামনের কৃষ্ণচূড়া গাছে সাইকেলটি হেলান দিয়ে রেখে দিলেন। তারপর একটা ঘরে ঢুকে হারমোনিয়ামে হাত দিয়ে একটিমাত্র মেয়েকে গান শেখাতে বসলেন। এখনো মনে আছে, গানটি ছিল, 'ঐ আসনতলে, মাটির 'পরে লুটিয়ে রব....।'

তাঁকে সব সময় খুব চাপা গলায় গাইতে দেখেছি। অত্যন্ত সংযতভাবে চলাফেরা করতেন, আস্তে আস্তে কথা বলতেন। তাঁকে আমি অবাক হয়ে দেখতুম। আর, মেয়েদের গান-শেখার ব্যাপারটা হজম করতে আমাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। আশ্চর্য, মেয়েরা পড়ে—এটাই যথেষ্ট; আবার গান-ও শেখে! তাহলে তো অনেক কিছুই হতে পারে!

এখন বুঝি, নানা কারণেই ভদ্রলোকটিকে সাবধানী বলে মনে হয়েছিল। যে দু' তিনটি মেয়ে গান শিখতো, তারা গাইতো শুধু 'শুভ কর্মপথে ধরো নির্ভয় গান....' এবং 'ঐ আসনতলে....।' আর কোনো গান তো মনে পড়ে না এখন। স্কুলের স্বাধীনতা দিবসে, রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে, কোনো শিক্ষকের বিদায় সভায়—সবেতেই ছিলো ঐ দুটি গান। বিকেলবেলা পুরন্দরপুরের কোন বাড়ি থেকে ভেসে আসত হারমোনিয়ামের আওয়াজ। একটি পুরুষ কণ্ঠের সঙ্গে কষ্টকরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে মেয়ে কণ্ঠ 'মাটির 'পরে লুটিয়ে রব....।' পাশ দিয়ে গোরুর গাড়ী ক্যাচ ক্যাচ শব্দে পেরিয়ে যাচ্ছে। শুনতে শুনতে কীরকম একটা আকর্ষণ অনুভব করতুম। হয়তো, তার পরেই, ভুল ধরে গানের মাস্টারমশাই শেখাবার চেষ্টা করছেন 'যার হাওয়া যেমন পাতায় পাতায়। মর্মরিয়া বনকে কাঁপায়....।' তারপর ক্লান্ত হয়ে একসময় 'তেমনি করে গাও গো' গেয়ে তিনি থেমে যান। মনে আছে 'গাও গো'-টাতে একেবারে ভেঙে পড়তেন তিনি।

ছোটবেলায়, ঐ ছোট্ট গণ্ডীটিতে কোনো ছেলেকে আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে বা শিখতে দেখিনি। শুধু মেয়েরাই শিখত ঐ গান। বিকেলবেলা দূরের মাঠে সবাই ফুটবল খেলতে গেলে,

---

সেদিন কিছু অতিথি অভ্যাগতের সঙ্গে কবি কথা বলছেন, এমন সময় ভার-প্রাপ্ত সেই ভদ্রলোক এসে কবিকে জানালেন, 'এইচ এম ভির' পাঠানো রেকর্ডগুলি দেখা হয়ে গেছে। দুটি রেকর্ড ছাড়া অন্যগুলির অনুমোদন দিয়েছি। হঠাৎ কবি বললেন, যেগুলি অনুমোদন দেওয়া হয়নি সেগুলি এক-বার শোনাও আমাকে। শোনানো হল। একটি রেকর্ড গানের, অন্যটি আবৃত্তির। গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনলেন কবি, গানটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বললেন, বেশ গেয়েছে। গানে গলার কাজ অবশ্য একটু বেশি, তাতে ক্ষতি নেই—ওটিকে অনুমোদন দিয়ে দাও। আবৃত্তিটিরও অনুমোদন দিতে বললেন। বললেন, নাটকীয়তা একটু বেশি—তা হোক। গানটি ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীতের দিকপাল শিল্পী পঙ্কজকুমার মল্লিকের গাওয়া, 'কি পাইনি তারি হিসাব মিলাতে' গান-খানি। নিউ থিয়েটার্সের 'ডাক্তার' ছবিতে এটি গেয়েছিলেন পঙ্কজবাবু। আবৃত্তিটি ছিল নির্মলেন্দু লাহিড়ীর। সময়টি সম্ভবত ১৯৪০ সাল।

প্রায় সবাই জানেন যে যখন ইলেক-ট্রিক পদ্ধতিতে রেকর্ড করার প্রথা প্রচলিত হয়নি, তখনই হরেন্দ্রনাথ দত্ত নামে এক শিল্পী প্রায় পাঁচিশটি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রেকর্ড করেছিলেন। অথচ শিল্পী মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়েসেই মারা যান। তাঁর গাওয়া গানগুলি ছিল, 'দেশ দেশ নন্দিত করি', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', 'সার্থক জনম আমার', 'বাদল মেঘে মাদল বাজে', 'তুমি যে সুরের আগুন', 'সন্ধ্যা হল গো ও মা' 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার', 'আমার সকল দুখের প্রদীপ', 'কেন চোখের জলে' 'আজি মর্মর ধ্বনি', 'ভেঙেছ মোর ঘরের চাবি',—এমনি আরও কিছু রবীন্দ্র-সঙ্গীত।

প্রাচীন বাংলা গান আর নজরুল গীতির জনপ্রিয় শিল্পী আঙুরবালাও একবার একটা রবীন্দ্রনাথের গান রেকর্ড করেছিলেন। তিনি জানতেনও না এটা রবীন্দ্রনাথের গান। রেকর্ডের লেবেলে গানের পরিচিতি ছিল 'জংলা' গান হিসেবে। গানটি ছিল, 'তোমারই গেহে পালিছ স্নেহে'। শ্রীমতী আঙুরবালার কাছেই শুনেছি সেকালের নামী অভি-নেত্রী আর গাইয়ে কৃষ্ণভামিনীও রেকর্ডে একখানা রবীন্দ্রনাথের গান গেয়েছিলেন। গানটির কথা ছিল, 'ও যে মানে না মানা'।

কুন্দনলাল সায়গল যখনই 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান' রবীন্দ্র-সংগীতটির 'উঠবে যখন তারা সন্ধ্যা-সাগর কূলে' অংশটুকু গাইতেন, তাঁর চোখ জলে ভরে যেত।

জিতেন্দ্রনাথ দাস নামে এক ভদ্রলোক এইচ এম ভি-র ব্ল্যাক লেবেলে রবীন্দ্র-নাথের, 'আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি' গানটি রেকর্ড করেছিলেন। জিতেন্দ্রনাথ দাসের নামের পাশে লেখা ছিল বি, এস, সি। তলায় অ্যামেচার। রেকর্ড নাম্বার পি-৪৭২৮।

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় লুকিয়ে লুকিয়ে, কামিনী গাছের তলায় বসে আমি বেসুরে ভুলে গান গাইতাম, 'আজ যেমন করে গাইছে আকাশ, তেমনি করে গাইবো....।' কামিনী ফুলের গন্ধে সারা বিকেলবেলা ভরে উঠতো। দূর থেকে শোনা গান, নিজে-নিজেই শিখে, প্রাণপণে ফাঁকা হোস্টেলে গাওয়ার ব্যাপারটা ছিল দিগন্ত-প্রসারিত। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে একধরনের নিষেধাজ্ঞা আমি বরাবরই টের পেয়ে এসেছি। কারও সামনে গান-গাওয়া ছিল বেয়াদবী। এমনকি রবীন্দ্রসঙ্গীতও। এক-একটা মেঘলা-বিকেলে, নির্জন ঘরে, দু-একটি জানা গান আমাকে খেলা থেকে দূরে বেঁধে রাখতো। অথচ, কোনোদিন ঐ মানুষটির কাছাকাছি যেতে পারি নি। সাইকেলে আস্তে আস্তে তাঁর আসা ও চলে-যাওয়ার দৃশ্যে কোনো ছেলের উপস্থিতি আমার মনে পড়ে না। মনে পড়ে মঞ্চের উপর ছোট্ট একটা চৌকি-পাতা, তার উপর ফুলদানিতে ফুল। হারমোনিয়াম হাতে একটি ছাত্রী খোলা চুলে গাইছে, 'ওরে, নূতন যুগের ভোরে....।' তবলা বাজাচ্ছেন ঐ মাস্টার-মশাই। ধূপবাতির গন্ধে ছেয়ে গেছে চারিদিক। সন্ধ্যেবেলা; হঠাৎ ঝমঝম করে স্কুলবাড়ি ছাপিয়ে বৃষ্টি এলো। চারিদিকে কী হুটোপুটি। মাইক বন্ধ হয়ে গেছে। বিহ্বল হয়ে কোন সময় থেমে গেছে গায়িকা। অবস্থা দেখে মাস্টারমশাই ইশারা করলেন গেয়ে যেতে। নিভে-যাওয়া হ্যাজাক বাতির পাশ থেকে কাঁপা-গলায় ছাত্রীটি আবার গেয়ে ওঠে, 'কি হবে আর কি হবে না, কি রবে আর কি রবে না, ওরে হিসাবী....।' কোত্থেকে স্কুলের সেক্রেটারী মশাই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'থাক্ থাক্, আর গাইতে হবে না।'

এতোদূর মনে পড়ে। কিন্তু, ঐ উৎসবের উপলক্ষ্যটা কী ছিল? রবীন্দ্র-জয়ন্তী? আজ আর মনে নেই।

একরাম আলি

ছবিতে

বাংলা ছায়াছবিতে প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যবহার দেখা যায় নিউ থিয়েটার্সের 'মুক্তি' ছবিতে। ১৯৩৭ সালেই সর্বপ্রথম প্রখ্যাত অভিনেতা ও চলচ্চিত্র পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া তাঁর 'মুক্তি' ছবিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে কিভাবে সেলুলয়েডের সঙ্গে মেলাতে হয় তার সার্থক উদাহরণ রেখে-ছিলেন। কানন দেবীর কণ্ঠে 'আজি সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে' কিংবা 'তার বিদায় বেলার মালাখানি' এবং পংকজকুমার মল্লিকের গলায় 'আমি কান পেতে রই' 'মুক্তি' ছবিটিকে একটি নির্দিষ্ট মর্যাদার আসন দিয়েছিল। এই ছবিটি উল্লেখযোগ্য আরও একটি কারণে যে, এই ছবিতেই রবীন্দ্রনাথের 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' কবিতাটির উপর পংকজকুমার মল্লিক সুরারোপ করেন। 'মুক্তি' ছবিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যবহারের অসামান্য সাফল্য অন্যান্য চলচ্চিত্র পরিচালকদেরও উদ্বুদ্ধ করে। ফলে পরবর্তী বাংলা ছায়াছবিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যাপক প্রয়োগ শুরু হয়।

নিউ থিয়েটার্সের 'মুক্তি' পরবর্তী বিখ্যাত ছবি 'পরিচয়'-এর সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। তিনি এই ছবিটিতে প্রচুর রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যবহার করান। রাইচাঁদ নিজে রবীন্দ্রসঙ্গীত জানতেন না বলে অনাদিকুমার দস্তিদারকে তিনি শিক্ষক হিসেবে নিয়ে আসেন এবং সেকালের দুজন সফল গায়ক-গায়িকা সায়গল ও কানন দেবী অনাদিকুমার দস্তিদারের কাছেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা শুরু করেন। সায়গল এবং কানন দেবী দুজনেই একের পর এক রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে 'পরিচয়' ছবিটিকে তখনকার ছায়াছবির বাজারে 'সুপার হিট ছবি' রূপে সম্মান আদায় করতে বাধ্য করেছিলেন।

নিউ থিয়েটার্সের 'পরাজয়'-এও ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীতের জোয়ার। কানন দেবীর কণ্ঠে 'তোমারি সুরের ধারায়' নিশ্চয়ই এখনো অনেক প্রবীণের কানেই বাজে।

বাংলা ছবিতে রবীন্দ্রসংগীতের এই জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে এখন অনেক হিন্দি ছবিতেও রবীন্দ্রসংগীতের সুর চুরি করে ব্যবহার করা হয়। সম্প্রতি 'অভিমান' ছবির একটি গানে 'যদি তারে নাই চিনি গো সে কি...' এই গানটির সুর হুবহু হিন্দিতে ব্যবহৃত হয়। এরও অনেক দিন আগে সংগীত পরিচালক নৌশাদ 'দিদার' ছবিতে 'কেন পান্থ এ চঞ্চলতা...' এই গানটির সুরকে বচপন কি দিন ভুলা না যানা'—এই গানে ব্যবহার করেছিলেন। কিংবা ধরা যেতে পারে অনিল বিশ্বাসের 'আব তেরে সিবা কউন মেরা কৃষ্ণ কানহাইয়া...' গানে 'প্রলয় নাচন নাচলে যখন'...গানটির প্রত্যক্ষ সুরের প্রয়োগ।

ছায়াছবিতে যেমন তেমনি থিয়েটারেও রবীন্দ্রসঙ্গীতকে জনপ্রিয় করেন সেকালের প্রখ্যাত অভিনেতা শিশির ভাদুড়ী। মঞ্চেও শিশির ভাদুড়ীকে এই ব্যাপারে সর্বপ্রকার সাহায্য করেন অনাদিকুমার দস্তিদার। 'গোরা', 'শেষরক্ষা', 'চিরকুমার সভা' ইত্যাদি নাটকে অনাদি দস্তিদারই দায়িত্ব নিয়ে গান শেখান। তবে একবার 'চিরকুমার সভা' অভিনয়ে গান শেখানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন দিনেন্দ্রনাথ।

গানের স্কুল

আজকাল রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা প্রায় ঘরে ঘরে। কলকাতা শহরের উপরেই এখন বেশ কয়েকটি নামী ও অনামী সংগীত শিক্ষালয় ছড়িয়ে আছে যেখানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষা দেয়া হয়। শুধু কলকাতা কেন, কলকাতা ছাড়াও দূর মফঃস্বল শহরগুলোতেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তার কথা আজ আর অজানা নয়—একদিকে যেমন বিভিন্ন সংগীত শিক্ষালয়ের মাধ্যমে, অন্যদিকে বেতার ও সংগীত শিক্ষকের একক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েও রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি আগ্রহ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

অথচ এই কলকাতায় এমনও ছিল যখন শুধুমাত্র রবীন্দ্র-সংগীত শিখতে হলে শান্তিনিকেতনে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। অবশ্য তার আগে রবীন্দ্রনাথ যখন জোড়াসাঁকোয় ছিলেন তখনও রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা ছিল—কিন্তু গান শেখানো বলতে যা বোঝায় তা হত শান্তিনিকেতনে। সেকালে সঙ্গীত ভবন বলে আলাদা কিছু ছিল না। থাকলেও গান শেখাতেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এছাড়া অজিতকুমার চক্রবর্তী, জীবনময় রায় ও কিছুদিন পরে পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী এই শিক্ষা দানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

ছাত্র হিসেবে অনাদিকুমার দস্তিদারই সর্বপ্রথম সুসংহত-ভাবে রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯২০ থেকে ১৯২৫ এই পাঁচ বছর এক টানা তিনি রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের কাছে রবীন্দ্রসংগীত শেখেন। এই দস্তিদার মহাশয়ই ভারতবর্ষের প্রথম ব্যক্তি যিনি রবীন্দ্রসংগীতকে প্রথম জীবিকা রূপে গ্রহণ করেন এবং শান্তিনিকেতনের বাইরে কলকাতায় তিনিই প্রথম রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষক। তারও আগে শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্র-নাথ যখন জোড়াসাঁকোয় আসতেন তখন কেউ না কেউ তাঁদের কাছ থেকে সংগীতের শিক্ষা নিতেন [illegible] কলকাতা থেকে শান্তি-

নিকেতনে গিয়েও কেউ কেউ যে রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষা গ্রহণ করতেন এমন নজিরও পাওয়া যায়।

কলকাতায় প্রথম গানের স্কুল 'সংগীত সম্মিলনী'। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন অনাদিকুমার দস্তিদার। 'সংগীত সম্মিলনী' প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরেই স্থাপিত হয় 'বাসন্তী বিদ্যাবীথি'। সেখানেও সংগীত শিক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ও দস্তিদার মহাশয়। তাছাড়া ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী থাকতেন কলকাতায়। তাঁর কাছেও আলাদাভাবে অনেকে সংগীত শিক্ষা নিতেন। পরবর্তীকালে 'গীতালি' নামে আরও একটি গানের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সর্বপ্রথম বৃহৎ আকারে ও এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানের কথা ভাবা হয় এবং সেই ভাবনারই ফলস্বরূপ অনাদিকুমার দস্তিদারকে অধ্যক্ষ ক'রে শুভ গুহঠাকুরতা ও সুজিত রায়ের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয় আজকের 'গীতবিতান'। কিন্তু যে প্রতিষ্ঠানের পেছনে শুভ গুহঠাকুরতার এত পরিশ্রম ও আন্তরিকতা ছিল সেই তিনিই আবার ১৯৪৮-'৪৯ সালে 'গীতবিতান' থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেন 'দক্ষিণী'। বর্তমানে শান্তিনিকেতনের বাইরে 'গীতবিতান' ও 'দক্ষিণী' এই দুটিই সবচেয়ে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

এছাড়াও কলকাতায় শৈলজারঞ্জন মজুমদারের তত্ত্বাবধানে 'সুরঙ্গমা' সুচিত্রা মিত্র, দ্বিজেন চৌধুরীর পরিচালনায় 'রবিতীর্থ', সুবিনয় রায়ের 'গীতবীথি' অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শ্রুতি', সাগর সেনের 'রবি রশ্মি', 'মল্লার', 'রবিচক্র', 'বাণী বিদ্যাবীথি', 'গীতবাণী', 'রবীন্দ্র সংগীত পরিষদ' অরবিন্দ বিশ্বাসের 'ভানুতীর্থ' এবং সুমিত্রা সেনের 'ত্রিবেণী' প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছড়িয়ে আছে।

সুচিত্রা মিত্র প্রথমে 'গীতাঞ্জলি' নামে একটি সংগীত ভবন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরে তিনি রবিতীর্থের সঙ্গে যুক্ত হন। সুবিনয় রায়ও প্রথমে 'গীতবিতান'-এর সংগে যুক্ত ছিলেন, পরে 'গীতবীথি' খোলেন, কিন্তু এখন আলাদাভাবে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষা দেন। শুধু এককভাবে সুবিনয় রায়ই নন, তিনি ছাড়াও দেবব্রত বিশ্বাস, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, মায়া সেন প্রভৃতি প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীরা এককভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখান।

জর্জ

...যাঁর গান একটি অভিজ্ঞতা, যুগপৎ বেদনা এবং দুঃখ স্মরণের ইতিহাস, স্মৃতিকে বিমর্ষ করে এবং অনির্বচনীয় আনন্দধামে প্রবেশাধিকার দেয়, সেই রবীন্দ্রনাথকে যিনি তাঁর কণ্ঠের গভীরতায় এক সফল উত্তরণে পৌঁছে দেন—তিনিই দেবব্রত ওরফে জর্জ বিশ্বাস। তাঁর মা ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন এবং একাগ্রচিত্তে রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছেন, তাই তার ধারাও এসে পড়েছে ছেলের উপর।

১৯২৭ সালে মৈমনসিংহ থেকে কলকাতার কলেজে পড়তে এসে কলকাতায়ই তিনি স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান এবং সেই সময় থেকেই ব্রাহ্মসমাজে ও শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি ব্রহ্মসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছেন। শুধু গাওয়াই নয় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নানা উৎসবের গানের মহড়ায়ও তিনি উপস্থিত থেকেছেন ভাল করে গান শেখার জন্য। এই সূত্রেই তিনি অনেকের কাছে গান শিখেছেন; স্বর্গীয়া ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং নিজে তাঁকে অনেক গান তিনি শুনিয়েছেন ও শিখিয়েছেন।

কিন্তু পরবর্তীকালে দেবব্রতর কণ্ঠে এসেছে এক নিজস্ব গায়কী ঢঙ। এজন্য তাঁর গাওয়া গান নিয়ে ঔচিত্য-অনৌচিত্যের প্রশ্ন উঠেছে। অথচ পাশাপাশি তাঁর জনপ্রিয়তাও বেড়েছে। একদিকে জনপ্রিয়তা যেমন বেড়েছে তেমনি তাঁর বিরুদ্ধ সমালোচনাও তুঙ্গে উঠেছে। এমন কি বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড তাঁর রেকর্ড আটকে দিয়েছেন। তাই ১৯৭১-এর পরে আর কোন রেকর্ডও হয়নি তাঁর। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য একদা যাঁর গান পছন্দ করতেন এবং অনাদিকুমার দস্তিদারের সাহায্য ও প্রেরণায় যিনি রবীন্দ্রনাথকেও গান শুনিয়ে খুশি করেছিলেন সেই তাঁরই বিরুদ্ধে কেন এই আচরণ—প্রশ্ন উঠতে পারে। উত্তর একটাই। দেবব্রতর গান গাওয়ার সময় একসপ্রেসনের স্বাধীনতা এবং রেকর্ড করার সময় দেশী-বিদেশী নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কিন্তু মিউজিক বোর্ডের তাতে আপত্তি। কেননা বাদ্যযন্ত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী না করলে এখন রবীন্দ্রসংগীতকে আর পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাব থেকে রক্ষা করা যাবে না। কিন্তু দেবব্রত এ নিয়ে অনেক ভেবেছেন এবং বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের বিভিন্ন আওয়াজ ও সুর যে রবীন্দ্রসংগীতকে তার অন্তর্গত রহস্যকে তুলে ধরতে আরও সাহায্য করে ত নিয়েও তিনি অনেক চিন্তা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

কিন্তু সেই পরীক্ষা করতে গিয়েই জর্জ-এর গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গান রেকর্ড বোর্ডের অনুমোদন পেল না। ১৯৬৯ সালে প্রথম তার দুটি গান রেকর্ড করাতে গিয়ে বাধা পেলেন। এই গান দুটি হল (এক) পুষ্প দিয়ে মারো যারে ...এবং (দুই) তোমার শেষের গানের...। সুতরাং ১৯৭০ সাল থেকেই তাঁর রেকর্ড করা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হল।

অথচ সেজন্য তিনি গান বন্ধ করেন নি। এখনো তিনি সমানে গেয়ে চলেছেন। গান নিয়ে নতুন চিন্তা-ভাবনাও বাড়িয়েছেন। আর আপনি যদি কখনো হাঁটতে হাঁটতেই এক সময় রাসবিহারী এ্যাভেনিউর সেই বাড়িটায় উঠে আসেন তবেই

দেখবেন একতলার ছোট একটা ঘরে তিনি বসে আছেন। বয়স ৬৬ হলেও ব্যক্তিত্বে এখনো চিরতরুণ। শিল্পের জগতে চির-অনুসন্ধানী। আপনি হয়ত বসতে চাইবেন, বসেই কিছু জিজ্ঞেস করবেন—কিন্তু সংগে সংগেই কানে আসবে, না-না চলে যান। চলে যান আপনারা। আমার কাছে কি শুনবেন। আমি কিসসু জানি না। কিন্তু আপনি তবুও তখন ধৈর্য ধরে বসে আছেন। কেননা জানেন একটু পরেই তাঁর অভিমানটা পড়ে যাবে। তিনি আন্তরিক হয়ে আপনার সংগে কথা বলে উঠবেন। আর কথা বলতে বলতেই কখন যে এক সময় তাঁর হাতে হারমনিমটা উঠে আসবে আপনার খেয়াল থাকবে না। আপনি শুধু শুনবেন সেই উদাত্ত কণ্ঠস্বর, যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসছে। আসবেই। কেননা তিনি তো তখন হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল...

শচীন দাশ

পাত্রী নির্বাচনে

কলকাতার বিভিন্ন রবীন্দ্রসংগীতের স্কুল ছাড়াও রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রম হিসেবে রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষা দেওয়া হয়। তাছাড়া লক্ষণীয় কলকাতার অলিতে গলিতে, মফঃস্বলের প্রত্যেকটি শহরে এমনকি পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও বাঙালী অধ্যুষিত প্রত্যেকটি জায়গায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখবার স্কুল আছে। যেমন দিল্লীতে সুধীর চন্দের পরিচালনায় 'রবি গীতিকা' এবং বোম্বেতে গোবর্ধন পাঞ্চালের পরিচালনায় 'আশ্রমিক সংঘ'।

তাছাড়াও রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা আরও বেড়ে গেছে আকাশ-বাণী কলকাতার বিভিন্ন বেতার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এছাড়াও আছে বেতারে রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষা। আগে দীর্ঘ দিন ধরে পংকজকুমার মল্লিক এই দায়িত্বে ছিলেন, মাঝখানে কিছুদিন শান্তিদেব ঘোষ, এখন সুচিত্রা মিত্র ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বেতারে রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কর্পোরেশনের প্রত্যেকটি স্কুলেই রবীন্দ্রসংগীতের অনুশীলন। এবং এই অনুশীলনের পেছনেও উদ্যোক্তা হিসেবে ছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বয়ং।

সফল গাইয়ে

শুধু রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে মাসে ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা রোজগার করা আজকাল আর কোন বিরল দৃষ্টান্ত নয়। অথচ এমনও একদিন ছিল যখন 'রবীন্দ্রসংগীতের বাজার' বলে কোন কথারই প্রচলন ছিল না, এমন কি রবীন্দ্রসংগীতকেও অন্য গানের লেজুড় হিসেবে গাওয়া হত। কিন্তু আজকাল যেকোন রবীন্দ্রসংগীতের আসরই থাকে জমজমাট। কোন একটি অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার জন্য দেড় থেকে দু' হাজার টাকা দাবী করার মত গাইয়ে ইদানিং কলকাতা ও শান্তিনিকেতনে প্রচুর। এ তো গেল ব্যক্তিগত সুনাম অনুযায়ী গায়কের আর্থিক সাফল্যের কথা। কিন্তু এছাড়াও আছে রেকর্ড বিক্রি।

জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন আজকাল রবীন্দ্র-সংগীতের প্রচলন বেড়েছে তেমনি জনরুচির চাহিদা অনুযায়ী রেকর্ডের বিক্রির বাজারও বেড়েছে। এখন যে কোন প্রিয় শিল্পীর রবীন্দ্রসংগীত শুনতে ইচ্ছে হলেই রেকর্ড কিনে যখন খুশী ইচ্ছে মত আমরা তাঁর গান শুনতে পারি। অথচ বছর ১৫ কি ২০ আগেও এত রেকর্ড বেরোতো না আর চাহিদাটাও ছিল সীমাবদ্ধ।

ইদানিং রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের আর্থিক সাফল্য বরং বেড়েই গেছে বলা যেতে পারে। অন্তত আগের তুলনায় অনেক বেশী। তাছাড়া প্রয়োজন মত যদি বাজারে রেকর্ড সরবরাহ করা যায় তাহলে বিক্রি বেড়ে গিয়ে তাঁদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আরও বাড়বে একথা হলফ করে বলা যায়।

এইচ এম ভি-র হিসেব মত এখনো হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সাগর সেন, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন ও নীলিমা সেনের রেকর্ড বিক্রির বাজার খুবই ভাল। তবু চাহিদার তুলনায় সরবরাহের ঘাটতি পড়ার কারণ কি? কারণ মূলত কোম্পানীগুলোর নানাবিধ অসুবিধে। তার ওপর কাগজে ভাল বিজ্ঞাপন নেই। পরিবেশনার অবস্থাও ক্রমশঃ অবনতির দিকে। সুতরাং এই অবস্থায় যদি ভাল উৎপাদন ব্যবস্থা, চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ এবং অন্যান্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা নেয়া যায় তবে একদিকে গায়কদের আর্থিক অবস্থা যেমন আরও ভাল হবে, তেমনি রেকর্ড কোম্পানীর অর্থনৈতিক অবস্থাও আরও উর্ধমুখী হতে পারবে।

যশোহরে শরৎচন্দ্র

গোপালচন্দ্র রায়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন যশোহর জেলার একজন কৃতী সন্তান। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে যশোহরের অধিবাসীরা যশোহর শহরের বি সরকার মেমোরিয়াল হলে এক সভায় এই মহেন্দ্রবাবুকে অভিনন্দন জানাবার আয়োজন করেন।

সাহিত্যিক মনোজ বসুর বাড়ী যশোহর জেলায় হলেও তিনি যুবক বয়স থেকেই কলকাতাবাসী। তাই সভার উদ্যোক্তারা মনোজবাবুর ওপর ভার দেন, তিনি যেন কলকাতা থেকে কোন একজন বিখ্যাত ব্যক্তিকে সভাপতি হিসাবে নিয়ে যান।

মনোজবাবু অনেক ভেবেচিন্তে শরৎচন্দ্রকে সভাপতি করে নিয়ে যাবেন মনস্থ করেন। শরৎচন্দ্র এই সময় কলকাতায় বাড়ী করে কখনও কলকাতায় কখনও তাঁর সামতাবেড়ের গ্রামের বাড়ীতে বাস করতেন। শরৎচন্দ্র কলকাতায় এসেছেন শুনেই মনোজ বাবু একদিন তাঁর প্রস্তাব নিয়ে শরৎচন্দ্রের কাছে গেলেন এবং সমস্ত বললেন।

মনোজবাবু সাহিত্যিক হিসাবে শরৎচন্দ্রের পরিচিত ত ছিলেনই, অধিকন্তু স্নেহভাজনও ছিলেন। শরৎচন্দ্র সভায় বড় একটা যেতে চাইতেন না। তবু কি ভেবে সেদিন মনোজবাবুর প্রস্তাবে যশোহর যেতে রাজী হয়ে গেলেন। তবে বললেন—আমি যাব। কিন্তু বক্তৃতা দিতে পারব না। এতে যদি রাজী থাক ত বল।

মনোজবাবু বললেন— আপনাকে বক্তৃতা দিতে হবে না। আপনি শুধু গেলেই আমরা মহাখুশী হব। মহেন্দ্রবাবু সম্বন্ধে যা বলার সে আমরাই বলবো।

শরৎচন্দ্র যাবেন, এই সংবাদ মনোজবাবু সভার উদ্যোক্তাদের জানিয়ে দিলে, তাঁরা শুনে যারপরনাই আনন্দিত হলেন। এবং শরৎচন্দ্র আসছেন, এই সংবাদ যশোহরে প্রচারিত হলে ওখানকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান শরৎচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য ও মানপত্র দেবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন।

নির্দিষ্ট দিনে মনোজবাবু শরৎচন্দ্রকে নিয়ে যশোহর শহরে গেলেন। যথাসময়ে সভাও শুরু হল। মনোজবাবু বলেন—সেদিন সভায় লজ্জার ব্যাপার ঘটেছিল এই যে, কেবল দু-একজন বক্তা মহেন্দ্রবাবু সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলা ছাড়া, বাকি বক্তারা সকলেই শরৎচন্দ্রের নিষেধ সত্ত্বেও তাঁরই গুণগানে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন। বহু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ঐ একই সভায় শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানানো হয় ও মানপত্র দেওয়া হয়।

সেদিন শরৎচন্দ্রকে যেসব মানপত্র দেওয়া হয়েছিল, তার একটি যা আজও কোথাও প্রকাশিত হয়নি, সেটি এখানে দিলাম। কলকাতার শরৎ-সমিতি শরৎ শতবার্ষিকী উপলক্ষে শরৎচন্দ্রের কলকাতার বাড়ীতে (২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড) একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। ঐ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীঅজিতনাথ রায়। সেদিন ঐ সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে সেখানেই এই মানপত্রটি দেখি। মানপত্রের বক্তব্য বিষয়টি এক খণ্ড খদ্দরের কাপড়ের ওপর মুদ্রিত। সেই মানপত্রটি এই—

সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথা-সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যশোহরে শুভ পদার্পণ উপলক্ষ্যে

হে দেব! বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সেবক, জাতির কৌস্তুভরতন! এতখানি অপ্রত্যাশিতভাবে আমরা যে পাবো আপনাকে, আমাদের হৃদয়ের এত সন্নিকটে, তা ভেবে উঠতে পারিনি কখনো। আমাদের ভাবধারা উদ্দাম গতিতে নেচে ছুটে যায়—অবকাশ সেখানে নাই মুহূর্তমাত্র ভাববার। শুনলাম, হঠাৎ সেদিন আপনার শুভ পদার্পণ বারতা এ সহরের বুকে।

অবসর পেলাম না চিন্তা করবার, কি বলে আপনাকে আপনার যোগ্য অভিনন্দন দেই। তবে উদ্দাম তরঙ্গায়িত যৌবন ধারার সঙ্গে প্রাণানুভূতিতে যে ভাবধারা প্রবাহিত হয়েছে, তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে, দেশের গর্ব, জাতির গর্ব বঙ্কিম, আশুতোষ, রাসবিহারী ও নীলরতনের মত—সম্পূর্ণ বাঙ্গালীর ভাবধারায় পরিপুষ্ট হয়ে বিদেশে না যেয়েও—বঙ্গজননী তাঁর সন্তানকে মানুষ করে গড়ে তুলতে পারেন। আর, সেইসব মনীষিবৃন্দের এই যে মানুষ হবার অধিকার, ভিন্ন আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে আসার অধিকার থেকে কম গৌরবময় নয়।

তাই হে কথাসাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট! বাঙ্গালীর নিজস্ব যা কিছু, তার সবখানি আপনাতে সমাহিত ও ওতপ্রোতভাবে জীবনধারায় গ্রথিত। আপনি বিদেশে না যেয়েও এক ভাষাবিদ মনীষী রোঁলার মত স্বদেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। তাই বাঙ্গালী আপনার লেখনী-নিঃসৃত চিন্তাধারাকে এত ভালবাসে ও আপনাকে প্রাণে প্রাণে চায়।

হে অসংখ্য পুত্রকন্যার মানস-পিতা! আপনি দীর্ঘায়ু হয়ে বাংলার ঘরে ঘরে শ্রদ্ধার সহিত বিরাজ করুন। এই ভগবানের নিকট আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—

আপনার গুণমুগ্ধ
চিত্তরঞ্জন ক্লাবের যুবকবৃন্দ
যশোহর

যশোহর,
৬ই মাঘ, ১৩৪১
ইং ২০শে জানুয়ারী, ১৯৩৫।

এই ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের পরের বছর ১৯৩৬-এ যশোহরবাসীরা আর একবার শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সে বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে ডি-লিট উপাধি দিলে অনেকের মত যশোহর সাহিত্য সংঘের সদস্যরাও কলকাতায় এসে কলকাতাবাসী যশোহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলে এলবার্ট হলে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তুষারকান্তি ঘোষ

এই সপ্তাহের ভালবাসার গল্প

প্রভাত চৌধুরী

।। ১ ।।

অনুপম ঠিক দুটোর সময় অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী মারা গেছে। কনডোলেন্স হবে। অনুপমের শোক সভা-টভা কোনো কালেই পছন্দ হয় না। অনেকেই ঐ সভায় দারুণ দুঃখ দুঃখ ভাব করে বসে থাকে কিংবা শোক-প্রস্তাব পাঠ করে। তারপর অফিসের বাইরে না এসেই সভার পরে দলবল জোটায় সিনেমা দেখার জন্য কিংবা তাদের আড্ডা বসে কচু টেবিলটা ঘিরে। রামি খেলে। দু-প্যাকে ছ-সাতজন গোল হয়ে বসে। তখন কোথায় দুঃখ কোথায় শোক।

অনুপম অনেক চেষ্টা করেও মৃত সহকর্মীটির মুখ মনে করতে পারেনি। প্রদীপ, বেশ তাজা যুবক, ইউনিয়ন করে, বলেছিল, 'ওই যে রে, সেন্ট্রাল রিসিভিং সেকশন থেকে চিঠির বান্ডিল নিয়ে এসে লিফট-এর সামনে বারান্দায় কিছুটা ঝুঁকে বসে চিঠিগুলো গুছিয়ে নিতো। তারপর সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নেমে যেতো'।

একতলায় একটা ব্রাঞ্চ আছে, ওদের অফিসের। সেখানেই কাজ করত লোকটি।

লিফ্‌ট একতলা এসব ভাবতে ভাবতে অনুপম একতলার সবকটি মুখ মনে আনতে চেয়েছিল। বৃদ্ধ রাধেশ্যামবাবু, একসটেন-শনে আছেন, বাঙাল ভাষায় কথা বলেন সর্বদা, তাঁর মুখ প্রথম মনে পড়েছিল। রাধেশ্যামবাবু সল্ট লেকে জমি কিনেছেন। বাড়ি তৈরিও প্রায় শেষ।

এ বছর নতুন জয়েন করেছে ত্রিদিব, অনর্গল ফুটবল নিয়ে ভাবিত, নিজে খেলে না, অথচ কোন্ প্লেয়ার কোন্ দলে সই করলো তার জন্য রীতিমতো দুশ্চিন্তাগ্রস্থ মনে হয় তাকে। বেশ আছে ত্রিদিব। ত্রিদিব কি প্রেমিকার সঙ্গেও ফুটবল-ফুটবল করে! জানতে ইচ্ছা হয়।

ওর প্রেমিকাটি বেশ। কি যেন নাম। একদিন হেদোর মোড়ে আলাপ করিয়ে দিয়ে-ছিল: হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল তাই। ত্রিদিবরা ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জলের ধারে গিয়ে বসেছিল। জলই বলে দিতে পারে ত্রিদিব সেদিন তার প্রেমিকার সঙ্গে কিভাবে প্রেমপর্ব চালিয়েছিল।

মিসেস্ দেবও একতলাতেই বসেন। কার যেন স্টেনো। অনেক মহিলাকে ঠিক বিবাহিতা মনে করতে কষ্ট হয়। মিসেস্ দেব অনেকটা সেরকম। অনুপমের ওকে দেবীর মতন মনে হয়। ফর্সা মসৃণ শরীর। মাখনের মতো। হাতের ওপরের অংশটা ভরাট নিটোল। অনাবৃত থাকে। হাতবিহীন ব্লাউজ পড়েন দেবী।

মিসেস দেবের নামে নানান কথা তার কানে আসে। দেবী নাকি বড়সাহেবের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে: সাহেব বাইরে গেলে সঙ্গ দেয়। অনুপমের দুঃখ হয়। বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করলেও তা মনে স্থান দিতে রাজি নয়। তার মনের দেবীমূর্তিটির কোনো কলঙ্ক হোক, এটা মনে হলেই বুকটা ভারি হয়ে আসে। দেবীটির সঙ্গে তার আলাপও হয়নি। আলাপ করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়নি কখনো। যদি দেবীর কন্ঠস্বর পছন্দ না হয় অনুপমের। তখন কি হবে।

শুধু দূর থেকে হেঁটে যেতে দেখে। মনে হয় যেন প্রতিমা মন্ডপে চলেছেন। ঢাক বাজছে, বাদ্য বাজছে, আলো ঝলমল্ মন্ডপ। পুজো হবে। আরতি হবে। ওই সুন্দর মুখের সামনে গোল করে পঞ্চপ্রদীপ ঘোরানোর একটা গোপন ইচ্ছা আছে অনুপমের।

কিন্তু তা কখনোই সম্ভব নয়। অনুপম তা জানে।

সে ভয়ানক লাজুক নয় যদিও। পরি-চিতা মহিলাদের সঙ্গে আড্ডা দেয়। ইয়ার্কি করে। মাঝে মাঝে দু-একটা খারাপ খারাপ কথা বলে নিজেকে আধুনিক বা স্মার্ট প্রতিপন্ন করে।

আজই ফার্স্ট আওয়ারে লীলার চেয়ারের পাশে চেয়ার টেনে বসে কিছুক্ষণ কথাবার্তা চালিয়েছিল। আজকের বিষয় ছিল, দেশের কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা এবং তাদের আশু কর্তব্য কি হওয়া উচিত।

অনুপম বলেছিল, এই যে আমাদের কুড়ি-পঁচিশ টাকা করে মাইনে বাড়লো, এতে অনায়াসে পাঁচজন একত্রিত হয়ে একটি কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাকে উদ্ধার করতে পারি। লীলা বিবাহিতা। ধমক লাগিয়েছিল, আপনি ভারি অসভ্য। অনুপম বলেছিল, অসভ্য কেন? পঞ্চপান্ডব একত্রে দ্রৌপদীকে বিয়ে করেনি। এটা শাস্ত্র সম্মত। আর বিদ্যাসাগর মশায় যখন বিধবা বিবাহ চালু করতে চেয়েছিলেন, ঠিক এভাবেই আপনার মায়ের ঠাকুমা তাঁকে অসভ্য বলেছিলেন। আপনার ঠিক মনে পড়ছে না। কাল ভেবে আসবেন। বলেই অনুপম লীলার কাছ থেকে উঠে পড়েছিল।

উত্তরটা শোনা হয়নি।

না, মৃত সহকর্মীর মুখ অনুপমের কিছুতেই মনে পড়ে না। অপর একটা মুখ মনে আসে। রোগা, কালো, বৃদ্ধ। বারো মাসই খাঁকি জামা পড়ে আর ধুতি। একটা ওড়িয়া দৈনিক পত্রিকা হাতে করে ঝিমোয়, মুখটা একদিকে বেঁকে কাঁধের কোনে এসে লাগে। মুখ দিয়ে নাল গড়ায়। লোকটা কাগজ পড়ে না ঘুমোয়, ঠিক বোঝা যায় না। একটা চোখ টেরা। সেই চোখের মণিটা বাঁদিকের কোণে এসে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। অপর চোখ এমনিতেই বন্ধ। ছোট বয়সে বসন্ত হয়েছিল পঞ্চাননের। হ্যাঁ, ওর নাম পঞ্চানন সাউ। ওড়িশার লোক। বারুইপুরের কাছে কোথায় যেন থাকে।

সে তো একাউন্টসে কাজ করে। মোটা মোটা খাতাপত্তর নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে হেঁটে যায়। না, সে মরার লোক নয়। মরবে না। এতক্ষণে হয়তো শিয়ালদা স্টেশনের সাউথ সেকশানের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে পরবর্তী ট্রেনের জন্য। ডায়মন্ডহারবার কিংবা লক্ষ্মীকান্ত-পুর লোকাল। প্লাটফর্মটা নিশ্চয়ই এখন বেশ ফাঁকা। বাড়ি ফেরার নিত্যযাত্রীদের ভিড় নেই। বেচারা পঞ্চানন আজ একটু আরামে বাড়ি ফিরতে পারবে।

অনুপম এসব ভাবতে ভাবতে ফুট-পাত ধরে হাঁটছিল। একা। প্রথমে ভেবে-ছিল এসপ্লানেড থেকে বাসে চেপে বাড়ি ফিরে যাবে। বাসন্তীর পাশে গিয়ে চুপ করে শুয়ে পড়বে। বাসন্তী দুপুরে বাবাইকে নিয়ে ঘুমোয়। বাবাই কিছুতেই ঘুমোতে চায় না। অথচ মা ঘুমিয়ে পড়লে তখন আর উপায় থাকে না। ঘুমোতেই হয়।

বাসন্তীর একটা ঘুমরোগ আছে। বড় বেশী ঘুম। প্রতিবাদ করলে বলে, তোমাকে তো আর ভোর পাঁচটায় উঠে আঁচ দিতে হয় না। তুমি তো আটটা অবধি বিছানাতে।

বাসন্তী অনুপমের স্ত্রী। ধর্মসাক্ষী করা বিয়ে। ও কি জানে না, অনুপমের রাত্রে সহজে ঘুম আসে না। ঘুমের জন্য নিয়মিত ট্যাবলেট খেতে হয়।

আসলে তা নয়। বাসন্তী ঘুমোতে ভালোবাসে।

অনুপম বাস বা ট্রাম না ধরে, নেতাজীর ডান হাত আর ডান পা বাড়িয়ে থাকা মূর্তিটাকে পেছনে ফেলে দক্ষিণের দিকে সোজা হাঁটতে থাকে।

বিগ্রেড প্যারেড মাঠে একদল লোক ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল। বিরাট বিরাট ঘুড়ি। চকচকে বড় লাটাই। লাটাই ভর্তি মাঞ্জা দেয়া সুতো। পাশে সতরঞ্চির ওপর ফ্লাকস, ঘুড়ির বাকস, সিগারেটের প্যাকেট। রীতিমতো আয়োজন করে ঘুড়ি ওড়ানো। অনুপমের এই আয়োজন খুব ভালো লাগে। যে কোনো কাজই যদি যত্নের সঙ্গে করা যায় তাহলে তার সার্থকতা আছে। শুধু প্রয়োজন আয়োজনের।

অনুপম একটু দূরে গিয়ে বসে পড়ে ঘাসের ওপর। সিগারেট ধরায়। আয়োজনের কথা ভাবে। তার কত কাজই শুধুমাত্র আয়োজনের অভাবে করা হয়নি। বকেয়া অবস্থাতেই এক সময় বাতিল হয়ে গেছে। পরে কাজটার কথা মনেও থাকেনি। পুরনো ডায়ারি খুললে এরকম বহু আরজেন্ট ভেরি আরজেন্ট দাগ মারা কাজের কথাই দেখা যাবে। অবশ্য সে-সব করা হয়নি বলে খুব যে একটা ক্ষতি হয়ে গেছে তা নয়। তা হলে তো সেই মুহূর্তেই পৃথিবীর স্তব্ধ হয়ে যাবার কথা ছিল।

পৃথিবী স্তব্ধ হয়নি। এমনকি অনুপমও তো দাঁড়িয়ে পড়েনি। চলেছে। এগিয়েছে কি পেছিয়েছে এসব নিয়ে মাথা ঘামানো অনুপমের স্বভাব নয়। কোনটা সামনের দিক আর কোনটা পেছনের দিক, তা জানে না। তবে চোখ, চোখ যেদিকে আছে সেটা সামনের দিক ধরে নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে সে। কাজেই যখন মদের দোকানে বসে বা অন্যের বাড়িতে খাটের ওপর টান-টান শুয়ে থেকেছে, এসব ভাবেনি। আরামে চোখ বন্ধ করে সুখকে দীর্ঘস্থায়ী করতে চেয়েছে। অর্জিত সুখ। সুখের সন্ধানেই বেঁচে থাকা, জীবনযাপন।

এই সহজতম পন্থাটিকে জীবনের গাইড লাইন হিসেবে গ্রহণ করে অনুপম সুখী হতে চেয়েছে। কোনো ব্যাপারে খুব একটা জড়িয়ে থাকেনি। কাউকে প্রত্যাখ্যানও করেনি। নিজেকে যখন নিয়ামকের মতো বা নির্দেশক মনে হয়েছে, বা সিদ্ধান্ত নেবার কথা ভেবেছে, তখনই নিজেকে থামিয়ে দিয়েছে। সেই সময় অনুপমের মনে হয়েছে, কোনো এক অলৌকিক পুরুষ যেন তার কানে কানে অভিভাবকের মতো প্রশ্ন করেছে, তুমি কে হে মাতব্বর?

আমি কে, আমার ক্ষমতা কতটুকু, এই প্রশ্নের মুখোমুখি হলেই অনুপম দুর্বল হয়ে পড়ে। নিজেকে নিতান্ত ছোট মনে হয়। তার আশেপাশে এত মহান মহান ব্যক্তিরা দাঁড়িয়ে আছেন, দাঁড়িয়ে থাকেন, অর্থাৎ বেঁচে আছেন, সেইসব জীবিতদের সঙ্গে তুলনায় সে কত অযোগ্য এটুকুই শুধু মনে পড়ে যায়।

প্যারেড গ্রাউন্ডে কালো একটা পুলিশ ভ্যান ঢোকে। একদল পুলিশ এবং সঙ্গে নায়ক সার্জেন্ট নেমে আসে। অনুপম ভয় পায়। ছুটে পালাবার কথা ভাবে। পালায় না। জানে পালালেও নিস্তার নেই। পুলিশ ঠিক ধরে ফেলবে। যদি ওকে ধরার কথা থাকে।

পুলিশ সার্জেন্ট এসে ঘুড়িওয়ালাদের ঘুড়ি নামিয়ে নিতে বলে। কিছুক্ষণ পর হেলিক্যাপটার থেকে রাজ্যপাল এখানে নামবেন, এই জন্য। রাজ্যপাল বোলপুর গেছেন।

অনুপম চাকরি পাবার বছরেই পৌষ-মেলা দেখতে গিয়েছিল বোলপুরে। সমাবর্তন উৎসব চলছিল। অনুপম চেষ্টা করছিল সামনের দিকে এগিয়ে যেতে। ইন্দিরা গান্ধী কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সার্টিফিকেট দিচ্ছিলেন। অনুপমের ইচ্ছা করেছিল আরো সামনে থেকে ইন্দিরা গান্ধীকে দেখার। হঠাৎ একটা বোমা ফেটেছিল মঞ্চের পাশেই। সবাই ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিল। অনুপমও।

সোজা স্টেশন। ট্রেনে কলকাতায় ফিরে এসেও বেশ কয়েকদিন বেশ ভয়ে ভয়ে ছিল। একটা দুশ্চিন্তা ছিল। যদি পুলিশ ধরে নিয়ে যায় তাকে। বোমা মারার আসামী হিসেবে দাঁড় করায়। তা হলে কি হবে। সে কিভাবে প্রমাণ করবে যে সে বোমা মারেনি। বোমাকে সে ভীষণ ভয় পায়। কালী পুজোর রাত্রে রাস্তায় বের হয় না। দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে বসে থাকে। অনুপম বোমা মারার লোক নয়। অথচ কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণপত্র তার কাছে নেই। যাতে করে সে পুলিশকে বোঝাতে পারবে যে সে নির্দোষ।

রাস্তার মোড়ে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে দেখলেই সে ঘুরে অন্য রাস্তা দিয়ে চলে যেত। অনুপম ভাবতো, পুলিশ তার অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে আছে। তাকেই তুলে নিয়ে যেতে এসেছে। পুলিশের তাকে তোলা ছাড়াও যে বহু মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয় কাজকর্ম থাকতে পারে সে কথা অনুপমের তখন একবারও মনে হয়নি।

সেই ঘটনার পর থেকে পৌষমেলার সময় বিশ্বভারতীর সমাবর্তন হয় না, অনুপম জানে।

এবং সে একথাও জানে, তরুণ পুলিশ সার্জেন্ট মোটর বাইক থেকে নেমে কোনো রাস্তার মোড়ে প্রেমিকার জন্যও অপেক্ষা করতে পারে। অপেক্ষা করা সম্ভব। পুলিশের প্রেমাধিকার নেই এরকম কোনো বিজ্ঞপ্তি তার চোখে পড়েনি। প্রেম করা ছাড়াও পাউরুটি, খবর কাগজ এবং বেলুন কিনতে দেখেছে সে পুলিশকে।

এইমাত্র পুলিশ সার্জেন্টটি বাদাম কিনলেন। একটা অ্যাম্বুলেন্স ঢুকলো মাঠের ভেতর। অ্যাম্বুলেন্স আসার কি প্রয়োজন? রাজ্যপাল কি অসুস্থ?

অনুপম বাদাম কেনবার সময় বাদাম-ওলাকে জিজ্ঞেস করলো।

বাদামওলা জানালো, উড়োজাহাজ নামার টাইম অ্যাম্বুলেন্স ভি আসে, দমকল ভি আসে।

ঘন্টা বাজাতে বাজাতে দমকল এল।

অনুপম চিন্তাহীন ভাবে একটা বাদাম ছাড়িয়ে মুখে চালিয়ে দিয়ে স্থির করলো, রাজ্যপাল দেখার এ সুযোগ সে ছেড়ে দেবে না।

চার-পাঁচটা লোক চুন দিয়ে লাইন টানছিল। হয়ত এই লাইনেই ল্যান্ডিং হবে।

সামনের অনেকটাই বেশ ফাঁকা। পুলিশ বৃত্তাকারে ঘিরে আছে জায়গাটা।

দুজন যুবতী এবং একজন যুবক এগিয়ে আসছিল সেদিকে। মাঝপথ থেকে একটি যুবতী হঠাৎ পেছন দিকে চলে যেতে লাগলো। যুবকটি তাকে কি যেন বললো। তবু যুবতী থামল না। বেশ হন-হন করেই ফিরে যাচ্ছে। যে দিক থেকে এসেছিল, সেইদিকে। বাকী দুজন দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পরামর্শ করলো।

তারপর যুবকটি ফিরে যাওয়া যুবতীর দিক লক্ষ্য করে হাঁটতে লাগলো। অনুপমের সামনে দিয়ে অপর যুবতী বিনীত হেঁটে গেল। অনুপমের ইচ্ছা হল তার দিকে হেঁটে যায়। কিন্তু গেলো না। জানতে চাইলো, পলাতক যুবতীটির মান-ভঞ্জন হয় কিনা।

শেষের দিকে প্রায় দৌড়ে ছুটে গিয়ে যুবকটি যুবতীর মুখোমুখি হল। কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। সম্ভবত বাক্য বিনিময়। অবশেষে যুবতীটি যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকেই চলতে শুরু করলো। হাঁটা এখন আর খুব দ্রুত নয়। আস্তে আস্তে ধীর পায়ে ক্লান্ত হাঁটা। অবসন্ন।

অনুপম ব্যথা পেল। সে চেয়েছিল ওরা দুজন ফিরে আসুক। গাছের ছায়ায় বসে কথা বলুক। মিটিয়ে নিক ছোটখাট মান-অভিমান।

আজ তা হল না। পরে হয়ত কোনো-দিন হবে। অনুপম কি করে জানবে এই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি।

তাকে তো ওরা জানিয়ে দিয়ে যাবে না শুভ পরিণামের কথা। অনুপমের এই ইচ্ছার কথা তো ওরা জানে না। অথচ সে মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলো হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তুমি যুবতীটির মন থেকে কিছু ক্ষুদ্র অভিযোগ মুছে দাও। ওকে ওর প্রেমিকের কাছে ফিরিয়ে দাও। প্রেমিকের বড় দুঃখ।

প্রার্থনা করার পর অনুপম অনেকখানি নিশ্চিন্ত হতে পারলো।

বাসন্তীর এক মামার ভায়রাভাই নাকি এই রাজ্যপাল সাহেব। সেই মামাবাবু তাদের বিয়ের দিন উপস্থিতও ছিলেন। আহা, তখন যদি জানতো অনুপম, তাহলে বন্ধুদের বলে চমকে দেওয়া যেতো।

স্বয়ং রাজ্যপালের আত্মীয়ার সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে, তোরা দেখে যা, শুনে যা, শা—।

পরবর্তীকালে একথা অনুপম তার বন্ধুদের জানাতে লজ্জা পেয়েছে। কিন্তু আজ এই মনোরম অপরাহ্ন বেলায় তার এই পরম আত্মীয়টিকে সে দেখবেই।

অনুপম ঘড়ি দেখলো। বিকেল শেষ হতে চলেছে। পেছনের রাস্তা দিয়ে কয়েকটা ঘোড়া হেঁটে গেল। ঘোড়ার পেশীগুলো কি ভয়ানক গতিশীল। নিখিল বিশ্বাসের ঘোড়ার কথা মনে এল তার। স্পীড।

অনুপম উঠে পড়লো।

প্যারেড গ্রাউন্ডের এদিকটাকে সে একটা ত্রিভুজের মতো ভাগ করে নিয়ে অতি ভুজ বরাবর হাঁটতে শুরু করলো। সম-কোণের কৌণিক বিন্দুতে তখন একটা আইসক্রীমওলাকে ঘিরে একঝাঁক কিশোরী দাঁড়িয়ে আছে। অনুপম আইসক্রীম-ওলাকে হিংসে করলো।

অতিভুজ থেকে সমকোণের কৌণিক বিন্দুর অবস্থান বেশ কিছুটা দূরেই হয়। এটাই স্বাভাবিক। এতে দুঃখ পাবার কিছু নেই। আর সকলেই তো কৌণিক বিন্দুতে দাঁড়াবার সুযোগ পায় না। সকলেই সমান ভাগ্যবান নয়।

গাছতলায় একটা লোক শুয়ে ঘুমো-চ্ছিল। অনুপম ঐ ঘুমন্ত লোকটার থেকে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে দ্রুত হেঁটে বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে এসে গেল।

ঠিক তখনই আকাশে শব্দ শোনা গেল। রাজ্যপাল এসে পড়েছেন। এখন আর ছুটে যাবার কোনো বাসনা হল না অনুপমের। অতিভুজের দূরত্ব যখন অনেকটা। এত ছুটে কাজ নেই ভেবে সে একটা সিগারেট ধরালো। খুব নিবিষ্টভাবে যা মৌজ করে সিগারেট টানতে টানতে এমন ভাব করার চেষ্টা করলো, যেন সে কারো জন্য অপেক্ষা করছে। এখানেই এবং এই সময়েই কারো আসার কথা আছে।

মৈত্রেয়ী একবার তাকে অপেক্ষা করতে বলেছিল। হাজরা পার্কের পেছনের দিকের একটা গেটের সামনে।

অনুপম তখন লেক মার্কেটের কাছে একটা বাড়িতে টুইশানি করে। সন্ধে সাতটাতে যেতে বলেছিল মৈত্রেয়ী। অনুপম সেদিন টুইশানি করতে যায়নি। সাড়ে ছটা থেকে ঘোরাঘুরি করেছিল। ঠিক সাড়েসাতটায়

নাকি আরো কিছুক্ষণ পরে মৈত্রেয়ী এসেছিল। অনুপম পরম আগ্রহে এগিয়ে গিয়েছিল তার কাছে।

আপনি কেন আমাকে ভালোবাসতে চান। আমি কিন্তু আদৌ আগ্রহী নয় এ ব্যাপারে। আপনি আমাকে ভুলে যাবার চেষ্টা করুন।

কথা কটি বলে মৈত্রেয়ী একমুহূর্ত দাঁড়ায়নি।

অনুপম অনেকক্ষণ কথাগুলোর ঠিক অর্থ বুঝতে পারেনি। শুধু স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। মৈত্রেয়ী কিভাবে জানতে পারলো যে সে গোপনে সঞ্চয় করে রেখেছে ভালোবাসা এবং তা তারই জন্য। মেয়েরা কি অন্তর্যামী! যদি জানতেই পেরেছিল, তবে এই প্রত্যাখান পর্বের প্রয়োজন কি খুব জরুরী ছিল। অনুপম তো কখনো বলেনি, মৈত্রেয়ী, তুমি এসো, তোমার জন্য সাজিয়ে রেখেছি ভালোবাসা। আমার অন্তরে পেতে রেখেছি আসন। তুমি গ্রহণ কর। তুমি তুলে নাও। তুমি কুড়িয়ে নাও সেই প্রেমপুষ্প।

এখন আর শিউলি ঝরা কোনো বৃক্ষতল অনুপম দেখে না। যেখানে ইচ্ছা মতো কুড়িয়ে নেওয়া যাবে শিউলি ফুল। ফুলগুলো শুকিয়ে গেলে বোঁটাগুলো দিয়ে বাসন্তী রং হয়। বেশ উজ্জ্বল বাসন্তী।

বাসন্তী এখন কি করছে। চায়ের জল চাপিয়েছে নিশ্চয়। বাড়ি ফিরে চা খেতে হবে। অনুপম স্থির করে। চা খেয়ে সুবোধ স্বামীদের মতো বাসন্তীর সঙ্গে ঘুরে আসবে খানিকটা রাস্তা। তার হাতের আঙুল ছুঁয়ে থেকে বাবাই নিজস্ব পদ্ধতিতে দুষ্টুমি চালিয়ে যাবে। তাদের ওই গ্রুপ ফটোগ্রাফ পরিবার পরিকল্পনার বিজ্ঞাপন হতে পারে বেশ ভালো। কেননা বাবাই-এর বয়স এখন চার। তাদের ছ বছরের বিবাহিত জীবনে আর দ্বিতীয় কোনো সন্তান হয়নি।

ঠিক সেই মুহূর্তেই গীর্জার ঘড়িতে বিষণ্ণ সুরে ঘণ্টা বাজলো। অনুপম সেই ঘণ্টার শব্দে নিজেকে হারিয়ে ফেললো।

॥ ২ ॥

ঘণ্টাটা বেজেই চলেছে। একটানা। বেশ অনেকক্ষণ ধরে। সন্ধ্যার শুরুতেই প্রাকৃতিক আলোর পরিবর্তে জ্বলে উঠেছে বৈদ্যুতিক আলো। এখন শীতের শেষ। ঠান্ডার ভাব একেবারেই নেই। শুধু কুয়াশা নেমে এসেছে মাঠময়। যেন এখনি শুরু হবে বসন্তকাল।

অনুপম শুনতে পেল অন্য একটি ঘড়ির শব্দ। অনেক দূর থেকে [illegible] আসছে। মাঝ দরিয়া থেকে একটা ডিঙি নৌকো তীরের দিকে ভাসমান। বিরাট বিরাট ঢেউ, জলোচ্ছ্বাস প্রতিকূলতা সৃষ্টি করছে। বিপদসীমার কাছাকাছি চলেছে এই খেলা। অক্লান্ত পরিশ্রমে চালিয়ে যাচ্ছে একটি কিশোর মাঝি। ডিঙিতে আর কেউ নেই। সমুদ্রের শব্দময় নির্জনতা কিশোরটিকে সহযোগিতা করে চলেছে। কিশোরের বয়স কত হবে! বারো কি তেরো।

হ্যাঁ, ক্লাশ সিকস কিংবা সেভেনে পড়ে তখন অনুপম। রতন ছিল তার একমাত্র বন্ধু। রতনদের বাড়িতে অদ্ভুত একটা ঘড়ি ছিল। একটা মোরগ ক্রমাগত নেচে যেতো ঘড়ির ভেতর। আর ঘণ্টার শব্দটা আরো অদ্ভুত। জল-তরঙ্গের শব্দের মতো। নাকি অন্য রকম। অথচ নিদারুণ এক আকর্ষণের ক্ষমতা ছিল ওই ক্ষুদ্র যন্ত্রটার। রতনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার কারণও ওই ঘড়ি।

অনুপমের কিশোরবেলাকে একারণেই জয় করে নিয়ে ছিল রতন। যাদুদণ্ড ছাড়াই ছিল বশীভূত।

অনুপম প্রায় প্রতিদিনই কাজে বা অকাজে, প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে রতনদের বাড়িতে গিয়ে ঘড়িটার সামনে চুপচাপ বসে থাকতো। অপেক্ষা করতো, কখন শোনা যাবে সেই শব্দ। বেজে উঠবে বিটোফেন।

রতনদের বাড়ির সবাই ব্যাপারটাতে বেশ মজা পেত। মুখে কিছু বলত না।

তখন গ্রীষ্মাবকাশ। স্কুল ছুটি। দুপুরবেলা রতনের সঙ্গে ঘড়ির পাশে বসে ছুটির কাজ করতে যেত অনুপম।

এরকমই এক দুপুরে অনুপম দরজার কড়া নাড়তে মালাদি, রতনের দিদি, দরজা খুলে দিয়েছিল।

অনুপম সোজা ঘড়ি ঘরে চলে এসেছিল। ঘন্টা বাজতে তখনো মিনিট পাঁচেক বাকি। সে অপেক্ষা করছিল।

মালাদি নিঃশব্দে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

মালাদির শরীরে বেশ মিষ্টি একটা গন্ধ আছে। ঘুম ঘুম গন্ধ। অনুপমের ওই গন্ধটা বেশ প্রিয়। মালাদি নিশ্চয় খুব ভালো সেন্ট মাখে।

রতন কোথায়?

মার সঙ্গে মামাবাড়ি গেছে। তাতে কি হয়েছে। ঘড়ির বাজনা শুনবি? বলেই ঘড়ির কাঁটাটিকে ঘণ্টার ঘরে এনে ফেলেছিল মালাদি।

ঘণ্টা বেজেছিল। শুরু হয়েছে যাদুক্রিয়া। অনুপম মোহগ্রস্থের মতো কান পেতে বসেছিল টেবিলের পাশেই একটা চেয়ারে। একসময় বাজনা বন্ধ হয়েছিল।

আবার শুনবি।

মালাদি তার উত্তরের অপেক্ষা না করে কাঁটা ঘুরিয়ে বাজিয়ে দিয়েছিল সেই বাজনা।

বাজনা বেজে চলেছে। মালাদি তার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। তার আঙুল চুলের ভিতর খেলা করে চলেছে। অনুপমের এসব ভালো লাগলেও ঘড়ির বাজনায় সে মন্ত্রমুগ্ধ।

আবার শুনবি। আবার। আবার শোন।

মালাদি ক্রমাগত বাজিয়ে চলেছিল বাজনা। আর অনুপমের সারা শরীরে তার হাত খেলে বেড়াচ্ছিল অদ্ভুত মমতায় স্নেহে নাকি আকাঙ্ক্ষায়।

অনুপমের হাত, কপাল, জামার ভেতরে বুক, ঘাড়ের নিচে পিঠ সর্বত্রই মালাদির উষ্ণ হাত। একটা গরম নিঃশ্বাস অনুপমের শরীরে এসে পড়ছিল। বেশ গরম। তার সঙ্গে অদ্ভুত এক গন্ধ। মালাদির শরীরের গন্ধ এবং তাপ তার শরীরের ওপর। বেশ আবেশ আবেশ অনুভব করেছিল সে। চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল সে।

মালাদির কি জ্বর হয়েছিল!

একসময় ঘড়ির বাজনা বন্ধ হয়েছিল! অনুপমের তখন কোনো নিজস্ব অনুভূতি নেই। কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব। বুকের ভেতর খুব দুলে কাঁপছিল। চোখের ভেতর মায়ালোক।

অনু, আয়, খাটে এসে বোস।

মালাদি বিচিত্র এক গলায় তাকে খাটে নিয়ে গিয়েছিল।

মালাদির গলা তো এরকম ছিল না।

তারপর মালাদি তার পাশে এসে বসেছিল।

অনু এক-এ কি বল তো?

কেন, এক-এ চন্দ্র, দুই-এ পক্ষ, তিন-এ নেত্র।

অনুপম একটানা বলে গিয়েছিল।

দূর বোকা, তুই কিসসু জানিস না। চন্দ্র কখনো একটা হয়। চোখ বন্ধ কর। আমি কটা চাঁদ আছে তোকে দেখাচ্ছি।

অনুপম চোখ বন্ধ করেছিল। বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। কেননা তখন তার নিজস্ব কোনো ভূমিকাই নেই। নিজের উদ্যোগে কিছু করতে সে অক্ষম। সে পুতুল মাত্র। মালাদির অসংখ্য পুতুলের মধ্যে একটির মতো মনে হয়েছিল নিজেকে।

মালাদি তাকে নিয়ে খেলুক। ইচ্ছা মতো। এই নির্জন দুপুরে মালাদির পুতুল হ'তে পেরে সে গর্বিত। কেননা মালাদি তাকে একটানা অনেক সময় ধরে তার প্রিয়তম ঘড়ির বাজনা শুনিয়েছে।

আর তাছাড়া মালাদির তো জ্বর হয়েছে। বাড়িতে একা আছে। এই জ্বরের মধ্যে রতন বা মাসিমার মালাদিকে একা বাড়িতে রেখে যাওয়া ঠিক হয়নি। মালাদির জ্বর যদি খুব বাড়ে। তখন কি হবে। অনুপম ভাবে, কেন আমি তো আছি। মাথায় জলের পটি দেব। বাতাস ক'রে দেব হাতপাখা দিয়ে।

মালাদির কোনো ভয় নেই। আমি ঠিক বাঁচিয়ে রাখবো। মালাদি আমাকে আবার ঘড়ির বাজনা শোনাবে, প্রাণ ভ'রে। অনেকক্ষণ ধরে। অনুপমের চোখ বন্ধ।

অনু, চোখ খোল।

অনুপম চোখ খুলেছিল। তার চোখের সামনে মালাদির উন্মুক্ত শরীর।

এক সময় মালাদির পুতুল খেলা শেষ হয়েছিল।

বলেছিল, বাড়ি যা অনু।

আর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে কানে কানে বলেছিল, এসব কাউকে বলিস না যেন বলতে নেই। আমি তোকে আবার ঘড়ির বাজনা শোনাবো। অনেকবার অনেক সময় ধরে।

অনুপম কাউকে বলেনি সেদিনের দুপুরের কথা। মালাদির কথা সে রেখেছিল। মালাদির জ্বরের সময় তার এই সেবাকার্যের কথা সে বলবে কেন অপরজনকে। মালাদিকে সে ভালোবাসে। মা ছাড়া মালাদির মতো ভালোবাসবার আর কেউ নেই তার।

মালাদিকে তার মায়ের মতো মনে হয়েছিল। মা তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে কতকিছু খাওয়ায়। মায়ের ভাগের মিষ্টি চিরকাল তো সেই পেয়েছে। অন্য কেউ নয়।

একথাও অনুপম কাউকে বলেনি।

অনুপম জানে সব কথা-ই বলার জন্য নয়। বলতে নেই। বললে পাপ হয়।

আপনি কি একা আছেন?

অনুপমের তন্দ্রা ছুটে যায়। চার্চের গেটের পাশে সে এতক্ষণ বসেছিল। একটা কাঁকিটের রেলিং-এর ওপর।

অনুপম তাকায়। তার সামনে এক যুবতী। বেশ নাদুশ-নুদুশ ভরাট শরীর। বেশ মাংস আছে সর্বত্রই। গায়ের রঙ খুব একটা ফরসা নয়। কালোও বলা চলে না। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলে একটা কথা চালু আছে। তার প্রকৃত অর্থ কি অনুপম আজও জানে না। অর্থাৎ কোনটা প্রকৃত উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। এ ব্যাপারে সে কখনো খুব একটা আগ্রহী হয়নি, রঙটা চিনে নিতে।

অনুপমের বাবা তার জন্য পাত্রী নির্বাচনে গিয়ে, ফিরে এসে বলেছিলেন, রঙটা কালো নয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ।

বাসন্তীর গায়ের রঙই সেই রঙ। হ্যাঁ, বাবার নির্বাচিতা বাসন্তীর সঙ্গেই তার বিয়ে হয়েছিল।

অনুপমের বাবা এ-বাজার সে-বাজার ঘুরে, বেগুন বা মাছ কেনার মতো ক'রে মেয়ে দেখার বিরোধী।

সোজা কথা। দুটো কথা বলেন না কখনো। বংশ উঁচু, বি এ পাশ, রান্নাবান্না জানে। আবার কি চাই।

মেয়ে দেখতে গিয়েই আশীর্বাদ ক'রে চলে এসেছিলেন। অনুপম খুব একটা দুঃখ পায়নি। তবে তার মায়ের বেশ অভিমান হয়েছিল। বড় ছেলের বৌ নির্বাচনে তিনি অংশ গ্রহণ করতে না পারায়।

কথা ছিল বাবার দেখে পছন্দ হ'লে মা এবং অনুপম যাবে। তারপরই পাকা কথা-বার্তা হবে।

মা সমস্ত দিন কথা বলেননি বাবার সঙ্গে।

অনুপম মাকে বুঝিয়েছিল, তাতে কি হয়েছে, বাবার পছন্দে তুমি বিশ্বাস রাখতে পরাছ না। তুমি দেখ বাবা কখনো ভুল করে না।

তারপর সমস্ত মেঘ কেটেছিল। বাড়ি জুড়ে বিয়ের আবহাওয়া। বেশ উৎসব উৎসব। বাড়ি রঙ করা, ঘর পরিষ্কার, জিনিসপত্র কেনা।

আপনি কি খুব কষ্টে আছেন এত ভাবছেন কি? আসুন না, মাঠে বসবেন। আনন্দ পাবেন। আমি কি দেখতে খারাপ।

চোখ টেনে এবং বেশ দীর্ঘ করে কথাগুলি বলেছিল যুবতীটি।

মাত্র পাঁচ টাকা দেবেন। সারা সন্ধ্যা আটটা অবধি থাকবো। খুশী করে দেবো।

চোখ টিপে অদ্ভুতভাবে হেসেছিল। খুশী করে দেবার ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি অনুপমের।

কটা বাজে?

যুবতী ঘড়ি দেখে বলেছিল, সাতটা বাজতে পাঁচ।

আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, খুব জরুরি, তুমি যাও। অন্যদিন তোমার সঙ্গে বসবো। তোমাকে ভালো লেগেছে, বলে যুবতীটির হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে প্রায় দৌড় লাগায় অনুপম।

সামনেই একটা খালি মিনি বাস। হাত দেখাতেই দাঁড়িয়ে প্রায় ছোঁ মেরে তাকে তুলে নিয়ে স্পীড বাড়িয়ে দেয়। পাতাল রেলের কাজকর্ম, বিড়লা তারামণ্ডলের নেকলেস ঘড়ির সঙ্গে যুবতীটিও থেকে যায় নির্দিষ্ট স্থানে।
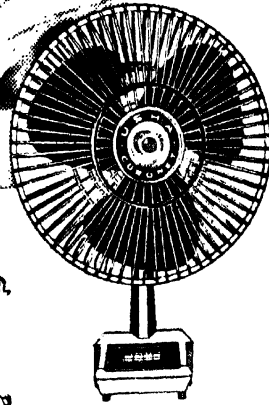
সিটে বসে কিছুটা শান্তি পায় অনুপম। মেয়েটার পাঁচ টাকাতে চলে যাবে নিশ্চয়। আজকের জন্য তাকে আর বিক্রী করবে না। পণ্য হবে না।

নিজেকে বিদ্যাসাগরের মতো মনে হয় অনুপমের। মনে মনে হেসে ওঠে সে। শা, আমিও মহাপুরুষ বনে গেলাম।

আমি অনুপম রায়। পিতার নাম গৌরীশঙ্কর রায়। গোত্র শাণ্ডিল্য। বয়স পঁয়ত্রিশ। বিবাহিত। স্ত্রী বাসন্তী। গ্রাজুয়েট। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। উঁচু বংশের মেয়ে। ভালো রান্না করে। একটাই পুত্র, বাবাই। পোশাকী নাম কুণাল। বয়স চার। এখনো স্কুলে ভর্তি হয়নি। বাংলা এবং ইংরাজি সবকটা অক্ষর লিখতে পারে। এক থেকে একশ মুখস্থ বলতে পারে। অসংখ্য ছড়াও। বঙ তুলি নিয়ে খেলা করে। আমি সরকারি অফিসের উচ্চ বর্গীয় সহায়ক।

আমি মালাদিকে জ্বরের সময় সেবা-কার্য করে আমার সামাজিক দায়িত্ব শুরু করেছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল বারো। আর আজ এইমাত্র বিনা বিনিময়ে পাঁচ টাকা দিয়ে সেই দায়িত্বজ্ঞানেরই পরিচয় দিয়েছি। বারো থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যেকার জীবনযাপনে এরকম অসংখ্য সমাজ সংস্কারকের কাজ আমি করেছি। আমি কেন বিদ্যাসাগর হতে পারবো না? কারো আপত্তি আছে?

কনডাকটর ব্যাগ কাঁধে সামনে এসে দাঁড়ায়। অনুপম পকেটে হাত দিয়ে খুচরো পঁয়ষট্টি পয়সা দিয়ে বিনিময়ে টিকিট নেয়। ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা থেকে অনুপম নিজের মধ্যে ফিরে আসে। পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে সিগন্যালে মিনিবাস থামে।

মালাদির জ্বর সেরে যাবার কয়েক মাসের মধ্যেই রতন একদিন জানিয়েছিল, দিদি একবার তোকে যেতে বলেছে, দিদির বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

অনুপমের খুব কান্না পেয়েছিল। মালাদি চলে যাবে। বিয়ের পর সবাই চলে যায়। চলে যেতে দেখেছে। অনুপমের মনে হয়েছিল মালাদি চলে গেলে সেও চলে যাবে এখান থেকে। দূরে কোথাও হারিয়ে যাবে। মালাদি না থাকলে এখানে থাকার কোনো মানে হয় না। কি লাভ এখানে থেকে। মালাদির মতো তাকে কেউ এত আদর করে না।

ঠিক আছে, যাব, আজই।

বলে অনুপম রতনের কাছ থেকে সরে এসেছিল। রতনটা কি নিষ্ঠুর। তার একবারও কি মনে হয়নি, একথা শুনলে অনু কত দুঃখ পাবে। রতনটা তাকে একদম ভালোবাসে না।

সন্ধ্যের সময় অনুপম রতনদের বাড়ি গিয়েছিল। মালাদি তখন ছাদে। অন্ধকারে একা একা গান গাইছিল। কোনো দুঃখের গান কি? বেদনার, বিষাদের গান।

অনুপম কোনো কথা বলতে পারেনি। মালাদির বুকে মুখ রেখে অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছিল। শুধুই কেঁদেছিল। মালাদিও কি কেঁদেছিল!

অনুপম তা দেখেনি। দেখতে পারে নি। একবারও মালাদির মুখের দিকে তাকায়নি। অনুপম ধরেই নিয়েছিল মালাদিও কাঁদছে। নিশ্চয় কাঁদছে। তাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে, তার আদরের অনুকে ছেড়ে চলে যাবে, আর কাঁদবে না। তা হতে পারে না।

অনুপমের বারো, মালাদির কুড়ি, এই দুই দুঃখীজনের কান্না প্রত্যক্ষ করেছিল সেদিনের জ্যোৎস্না। আর ছাদের কার্নিশ। রতনদের হুলো বেড়ালটা হঠাৎ ডেকে উঠেছিল। বাতাস কিছুক্ষণ বন্ধ ছিল। চরাচর ব্যাপী ঘন অন্ধকার। নক্ষত্রহীন কালো আকাশে হঠাৎই ঝড় উঠেছিল। তারপর বৃষ্টি। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি। অনুপম ভেবেছিল আকাশও তাদের দুঃখেই কাঁদছে। কিন্তু তখন যে বর্ষাকাল, একথা একবারও মনে হয়নি তার।

কাঁদিস না অনু, আমি তো মাঝে মাঝেই এ বাড়িতে চলে আসবো। কতটা আর রাস্তা। বাসে গেলে আধ ঘন্টাও লাগবে না। তুইও চলে যাস মাঝে মাঝে।

মালাদি সান্ত্বনা দিয়েছিল।

মালাদি কি জানে না, অনু তার কখনো একা বাসে চাপেনি। যখনই বাসে চেপেছে মা কিংবা বাবা সঙ্গে থেকেছে। একবার মামার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর বেলুড়মঠ গিয়েছিল। একা কিভাবে বাসে চেপে মালাদির বাড়ি যাবে। দেখা করতে।

মালাদি যেন জেনে গেছে অনু খুব বড় হয়ে গেছে।

অনুপম বলতে চেয়েছিল, মালাদি, আমি একেবারে বড় হয়নি। আমি একা একা বাসে চাপতে শিখিনি। আমি যেতে চেষ্টা করলে হারিয়ে যাব। কোথায় হারিয়ে যাব তোমরা কেউ খুঁজে পাবে না। হয়ত ছেলে-ধরারা আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। ওরা ছেলে বিক্রী করে দেয়। যদি আমাকে তোমার কাছেই বিক্রী করতে যায় ওরা। তাহলে কি মজা হবে। তুমি চিরদিনের জন্য কিনে নেবে আমাকে। আমি তোমার কাছেই চির-দিন থাকতে চাই মালাদি। তুমি আমাকে কিনে নাও।

অনুপম কোনো কথাই বলতে পারেনি। ঘরে আলো না জালিয়ে শুয়ে পড়েছিল, বাড়ি ফিরেই।

কিছুক্ষণ পর মা এসে আলো জ্বালিয়েছিলেন।

কি রে শুয়ে আছিস কেন? গায়ে হাত দিয়ে চমকে গিয়েছিল, গা যে গরম। জ্বর আসলো কখন?

সেই জ্বর ভালো হতে সময় লেগে-ছিল অনেকদিন। টাইফয়েড।

একটানা বিছানায় শুয়ে থাকা।

মালাদির বিয়ে দেখা হয়নি তার।

বিয়ের পরদিন লাল বেনারসী. এক গা গয়না পরে মালাদি এসেছি তাকে দেখতে। সেদিন পথ্য করেছে সবে। উঠে বসতে কষ্ট হয়। তবু উঠে বসেছিল।

মালাদি অনেকক্ষণ ধরে আদর করে-ছিল। মালাদির বর নির্মলদাও এসেছিল। কালো লম্বা সুন্দর শরীর। ফার্স্ট ডিভিসনে ক্রিকেট খেলে। অল-রাউণ্ডার। ব্যাটে বলে সমান দক্ষতা। রতন এসব তাকে জানিয়ে গেছে।

নির্মলদার পাশে মালাদিকে সুন্দর মানিয়েছিল। অনুপম কোনো কথা বলেনি। নির্মলদা বলেছিল, তুমি আর একটু সুস্থ হলে তোমাকে আমি নিজে এসে নিয়ে যাব। স্কুটারে চাপিয়ে। ভয় পাবে না তো।

না, অনুপম ভয় পাবে না। মালাদির কাছে যেতে তার কোনো ভয় নেই। স্কুটারেই হোক আর ঘোড়ায় চেপেই হোক। যেভাবে বলবে সেভাবেই যেতে পারবো। আমি কি ছোট ছেলে। মালাদি আমাকে কত বড় করে দিয়েছে তুমি জান না।

অনুপম নির্মলদাকে এসব কিছুই বলতে পারেনি। মা নির্মলদাকে খাবার ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

মালাদি তখন তার কানের কাছে মুখ ...র বলেছিল, লোকটা খুব ভালো, ...নিস অনু, খুব ভালো, ওকে একদম ...সে করিস না।

অনুপম কাঁদেনি। বলেছিল, হিংসে ...বো কেন? তুমি খুব বোকা মালাদি। ...র্মলদা কত বড় প্লেয়ার। অল-রাউণ্ডার। ...রকম ব্যাটের দাপট। বলেও দারুণ ...পন। ফিল্ডিং করে ফার্স্ট স্লিপে। ...কটা ক্যাচও কখনো ছেড়ে দেয়নি নির্মলদা। ...ব ধরে ফেলেছে।

কিছুক্ষণ পর মালাদিরা চলে ...গয়েছিল।

মালাদির যদি আবার সেই দুপুরের ...তো জ্বর হয়। কে তাকে সেবা করবে? ...নির্মলদা কি পারবে? ভাবতে চেষ্টা করে। ...নিশ্চয়ই পারবে। না পারার কোনো ...কারণ নেই।

অনুপম নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিল।

সে রাত্রে অনুপম স্বপ্ন দেখেছিল, ...ঢাক বাজিয়ে প্রতিমা বিসর্জন হচ্ছে: ...প্রতিমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে চমকে ...উঠেছিল। লাল বেনারসী, এক গা গয়না, ...কাজলটানা দীর্ঘ চোখ! এ যে মালাদি।

অনুপম চিৎকার করে উঠেছিল ঘুমের ...ভিতর।

মালাদিকে তোমরা বিসর্জন দিও না। আমার কাছে ফিরিয়ে দাও। আমি পুজো করবো।

এসপ্লানেডে মিনিবাস থামে। হেল-...পারের চিৎকারে তার চেতনা ফিরে আসে। ...টুক করে নেমে পড়ে রাস্তায়। ভীড়ের ...মধ্যে মিশে যায় অনুপম।

॥ ৩ ॥

পর্দা সরিয়ে ঢুকে পড়তেই প্রথম টেবিলের থেকে একটা আমন্ত্রণ শুনতে পায় অনুপম।

এই যে বিংশ শতাব্দীর দানসাগর মশায়, এদিকে, আসন গ্রহণ করে আমাদের উদ্ধার করুন।

অনুপম তাকায়। প্রভাত চৌধুরী ...দলবল নিয়ে আজ প্রথম টেবিলটাই দখল করে বসে আছে। এটা রেসুড়েদের টেবিল। বারো মাস তিনশ পঁয়ষট্টি দিন এই টেবিলেই চলে অশ্ব-গবেষণা। রীতিমতো ...জ্ঞানী ঘোড়া বিষয়ে অভিজ্ঞ লোককে ...ল্যাবরেটরী বা লাইব্রেরীও বলা যায় এই টেবিলটাকে।

বসে পড়। প্রভাতের ধমকে দুজনের ফাঁকে বসে পড়ে অনুপম।

সবকটা টেবিলই ভর্তি। টেবিলের দুপাশে বেঞ্চি। একটা বেঞ্চিতে পাঁচজনের ভালোভাবে বসা চলে। তারই এক-একটাতে ছজন বা সাতজনও বসে। এটাই রীতি। কেউ কখনো আপত্তি করে না। অসুবিধা হলেও গায়ে মাখে না। হাসিমুখে উড়িয়ে দেয়। এখানের লোকজন বেশ দয়ালু।

টেবিলে বোতল পাঁইট বা ফাইল ছড়ানো। গ্লাস সকলের একটা করে। জলের বোতল বা সোডা কোকাকোলা লিমকা ইত্যাদিও আছে। ছোলা, বাদাম, লেবু, তেলেভাজা, ফলটল, সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই এসব নিত্যসঙ্গী এই টেবিলগুলোর।

অনুপম একদিন বড় মাটির ভাঁড়ে কাঁকড়া চিবোতে দেখেছিল একজনকে। অনুপম তার লালসাকে বশ মানাতে পারেনি। চেয়ে ফেলেছিল। সেই দয়ালু লোকটি বিনা বাক্যব্যয়ে ভাঁড়টা এগিয়ে দিয়েছিল তার দিকে। লোকটির ব্যবহার দেখে তার মনে হয়েছিল যেন শুধুমাত্র তারই সেবার জন্য বাইরে থেকে সযত্নে বহন করে এনেছে—এই কাঁকড়া, পরম সুস্বাদু এবং লোভনীয় আহার্য দ্রব্য।

কাঁকড়া সহযোগে মদ্যপানের পর অনুপম সেদিন গুটিকয় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

(এক) কাঁকড়াই একমাত্র সহযোগী আহার্য হোক মদ্যপানের।

(দুই) পরবর্তীকালে কাঁকড়া ছাড়া সে আর মদ খাবে না।

(তিন) মৎস্য প্রকল্পের মতো সরকারের উচিত কাঁকড়া প্রকল্প চালু করা।

(চার) কাঁকড়াকে প্রথম শ্রেণীর প্রাণীতে রূপান্তরিত করা হোক। ওরা বড় বেশী অবহেলিত।

(পাঁচ) কাঁকড়াদের সংগঠিত করে ওদের মধ্যে একটা তীব্র আন্দোলন শুরু

হোক। দাবী উঠুক—মদের টেবিল ছাড়া ওদের মৃতদেহ অন্য কোথাও যেন ব্যবহৃত না হয়।

(ছয়)) সন্তানবতী মেয়েদের কাঁকড়া চিবনো নিষিদ্ধ হোক। এবং গ্রামের গরীব-গুরবো লোকজন যদি আকালের দিনে খাদ্যের অভাবে কাঁকড়া খায়, তাহলে তাদের নিশ্চিত মিসা করা হবে।

ইত্যাদি অসংখ্য সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য একটা কমিটি করা উচিত। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, উকিল, মোক্তার, দোকানদার কবি, লেখক, নাট্যকার, শিল্পী গায়ক, সিনেমার অভিনেতা ফড়ে, ছাত্র, যুব, বেশ্যাবাড়ির দালাল, এম-এল-এ, এম-পি, মন্ত্রী সকলকে নিয়ে একটা পপুলার কমিটি। সর্বদলীয়। কোনো রকম দলবাজি সহ্য করা হবে না এখানে।

কাঁকড়াকে মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে।

জল দেবো না সোডা ?

জল। প্লেন এ্যান্ড পিওর ওয়াটার।

প্রভাত অনুপমের গ্লাসে জল ঢালে।

মনোজ মিত্রের বেলা সরকারকে তুমি নিয়ে নিলে গুরু!

অনুপম শোনে কে যেন প্রভাতের দিকে ছুঁড়ে দিল কথাটা। প্রভাত কবিতা লেখে। সম্প্রতি যাত্রাপাড়ায় ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে। যাত্রা বিষয়ে লিখছে। সন্ধ্যেতে নিয়মিত আসতে পারে না এখানে।

অনুপম জানে সুন্দরম-এর নায়িকা বেলা সরকার, পরবাসীতে যার অভিনয় তার ভালো লেগেছিল, তিনি এ বছর যাত্রাদলে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। বিজ্ঞাপনে বড় ছবি ছাপা হয়েছে বেলার। এসবই অনুপম লক্ষ্য করেছে। কিন্তু এজন্য প্রভাতের ওপর এই অহেতুক আক্রমণ কেন। কি উদ্দেশ্য। কিছুই বোঝে না অনুপম।

এক চুমুকে ফাঁকা করে দেয় গ্লাস। মুখে চার-ছটা বাদাম ফেলে স্বাদ ফেরাতে সচেষ্ট হয়।

প্রভাত তাকে একদিন বলেছিল, যাত্রা নিয়ে হাসাহাসির দিন শেষ হয়ে গেছে। যাত্রার মতো পপুলার মিডিয়ামকে ব্যবহার করতে পারলে কি কি হতে পারে ডিটেল বুঝিয়েছিল তাকে। যাত্রার নায়কের মাইনে কত, বিজ্ঞাপনে কত টাকা খরচ করে এক-একটা দল, এসব শুনে অনুপম স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

অনুপম আন্তরিকভাবে বলেছিল, তোর কবিতার ক্ষতি হবে না ?

প্রভাত হেসে উঠেছিল, ধুস, তুইও আমাকে চিনলি না। তাহলে আমি কার কাছে যাব। কার কাছে নতজানু হয়ে বলব, তুমি আমার দুঃখ নাও, আনন্দ নাও, বিনিময়ে দাও আমাকে অহংকার। নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন জগৎ। এ মানুষগুলো ভালো। বেশ সরল। কবি দেখে দেখে চোখের পাওয়ার বেড়ে যাচ্ছিল। এবার গদ্য লিখব। গল্প উপন্যাস।

হঠাৎ সমীর কেঁদে ওঠে। সমীর চট্টোপাধ্যায়। নতুন কবি। একটা পত্রিকা সম্পাদনাও করে।

আমিই খোকনকে মেরে ফেলেছি। আমার হাতে রক্ত। সমীর চিৎকার করে কাঁদে।

অনুপম জানে, সমীরের বন্ধু খোকন ছিল উগ্রপন্থী।

সমীরের সঙ্গেই প্রেসিডেন্সিতে পড়তো।

সমীরের নাকতলার বাড়িতে সেদিন যাচ্ছিল খোকন, বাড়ি অবধি পৌঁছতে হয়নি। রাস্তার ওপরেই ঝাঁঝরা হয়ে গিয়ে-ছিল খোকনের শরীর। সমীর এসব কিছুই জানতো না। পরদিন কলেজে গিয়ে শুনে-ছিল। তারপর থেকেই মদ খেলে সমীরের মনে হয়, খোকনকে ও-ই খুন করেছে। ওর হাতে খোকনের রক্ত।

ব্যাপারটা নিরাপদ নয়। সমীরকে চলে যেতে বলে প্রভাত। সমীর যেতে চায় না। প্রভাতের পা জড়িয়ে ধরে। প্রভাত সজোরে একটা চড় কষালো সমীরের গালে। দুজন ধরাধরি করে সমীরকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল।

এখন অনুপম প্রভাতের মুখোমুখি। অনেকটা ফাঁকা হয়ে এসেছে।

আমি যতটা শুদ্ধ, আমার কবিতা ঠিক ততটাই শুদ্ধ হতে পারে। যা হওয়া সম্ভব। তার বেশী নয়। যতই না আমার স্নানের কাছে শুদ্ধতার মন্ত্র পড়া হোক।

প্রভাত বিড়বিড় করে। কাকে শোনায়।

অনুপমকে ? অনুপম এসব কথা অনেকবার শুনেছে। শুদ্ধতা-টুদ্ধতার কথা খুব একটা বোঝেও না।

আজ অফিসে হঠাৎ ছুটি হয়ে যাওয়া, বিকেলে রাজাপালের জন্য অপেক্ষা, রাস্তার মেয়েকে পাঁচটা টাকা খামকা দিয়ে আসা ইত্যাদি ডিটেল বলে চলে অনুপম।

তুমি বেটা বিদ্যাসাগর না হয়ে থামবে না দেখছি। তা একটা বর্ণ-পরিচয় লিখে ফেল না। প্রভাত বলে।

আজ খুব মালাদিকে মনে পড়ছে রে।

বাড়ি যা। সোজা।

দুজনে রাস্তায় বেরোয়। কোথায় যেন যাত্রা উৎসব চলছে। প্রভাত ট্যাক্সি নিয়ে সেদিকে ছোটে।

অনুপম একা হয়ে যায়।

সুরেন ব্যানার্জি রোড ধরে এগিয়ে যেতে যেতে বিচিত্র সব মানুষজন দেখে। অনুপম জানে এদের সকলেরই কিছু না কিছু একটা নির্দিষ্ট কাজ আছে। তার নির্দিষ্ট কোনো কাজ নেই। পূর্ব নির্ধারিত কোনো কর্মসূচী নেই।

অনুপম এলিট সিনেমার করিডোরে ঢুকে পড়ে। কাঁচের ভেতর রাখা স্টিল ছবি দেখে। ওজন যন্ত্রটা ফাঁকা থাকায় তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে। চাকা ঘোরা বন্ধ হলে পকেট থেকে একটা দশ পয়সা বার করে নির্দিষ্ট ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দেয়। একটা বিচিত্র শব্দ হয়। টিকিটের মতো কার্ড বেরিয়ে আসে।

অনুপম দেখে তার ওজন তিপ্পান্ন কিলো গ্রাম।

তিপ্পান্ন কিলোগ্রাম ওজনটা তার পক্ষে বিপদজনক কিনা বুঝতে চেষ্টা করে। তার উচ্চতা পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি। এই উচ্চতায় ঠিক কত ওজন স্বাভাবিক তাও জানে না।

টিকিটের একদিকে নীতু সিং-এর ছবি। অনুপম হিন্দী সিনেমা দেখে না। কাজেই উল্টোদিকের লেখাটা পড়ার চেষ্টা করে।

Your greatest enemy is going to become your closest friend

বাংলাটা কি এই রকম হতে পারে। মনে মনে অনুবাদ করে নেয় অনুপম।

যাকে পরম শত্রু মনে করছেন দেখবেন সেই আপনার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু।

অনুপম তার পরম শত্রুর নাম মনে আনতে চেষ্টা করে। পরিচিত কোনো মুখই তার শত্রুর মুখ বলে মনে হয় না। তার ওপর আবার greatest enemy পরম শত্রু!

শত্রু ব্যাপারটা বোঝা যায়। পরম শত্রু কেমন দেখতে হয়। তার কি চারটে হাত তনটে পা থাকবে, মাথায় টাক নাকি লম্বা লম্বা চুল। অনুপম নিজের চুলে আঙুল চালায়।

মালাদি ওই চুলেই আঙুল চালাতো।

নির্মলদা কি তার পরম শত্রু। পরম শত্রু না হলেও শত্রু। তাকে স্কুটারে চাপিয়ে মালাদির কাছে নিয়ে যাবে বলেছিল। কোনো স্কুটার তাকে নিয়ে যেতে আসেনি। আর আসবেও না।

সেবার অনুপম স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে। রেজাল্ট বেরুতে তখনও কয়েকদিন বাকী। হঠাৎ শুনেছিল নির্মলদা অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে।

নির্মলদার এই শত্রুতার কথা সে ভুলতে পারে না। মালাদি আর বাপের বাড়িতে আসেনি। শ্বশুরবাড়িতেই থেকে গেছে। কোনো ছেলেপুলে হয়নি মালাদির। নির্মলদার অফিসেই একটা চাকরি পেয়ে গিয়েছিল।

মালাদি সত্যিই অনন্যা। এখন বোঝে অনুপম। মালাদি কত মহান।

নির্মলদাই তার পরম শত্রু। অনুপম দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়।

অথচ বুঝতে পারে না এই পরম শত্রুটি কিভাবে তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হবে। কি করে তা সম্ভব। মৃত নির্মলদার ওপর প্রচণ্ড রাগ হয় অনুপমের। কি ক্ষতি হত বেঁচে থাকলে। অনুপমকে তাহলে শত্রু খোঁজার জন্য বৃথা সময় নষ্ট করতে হত না। চিন্তিত হবার কোনো কারণ থাকত না তাহলে। সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হত।

অনুপম ঠিক করে আজ আর নয়। কাল এই শত্রুকে চিহ্নিত করতেই হবে। কেননা সেই তো আগামী দিনের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। অনুপম তার জীবনে এই প্রথম একটা কাজের পরিকল্পনা নির্দিষ্ট করতে পেরেছে। পরিকল্পনা রূপায়ণে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। শত্রুকে খুঁজে বের করতেই হবে।

পরিচিত সকলের সঙ্গে দেখা করবে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেবে কে তার পরম শত্রু।

ইউ এস আই এসের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। গত সপ্তাহে এদের অডিটোরিয়ামে কয়েকটা পুরোনো দিনের নির্বাক ছবি দেখেছে অনুপম। এখন কেন আর নির্বাক ছবি রিলিজ করে না? তৈরি হয় না কেন? তার মনে হয়, এত কথাবার্তার প্রয়োজন কি। অনেক সময়ই দেখা যায় বড় বেশী বক বক করে ফিল্মের চরিত্ররা। এক এক সময় অসহ্য বোধ হয় তার। এত কথা কেন বাবা? যে কাজটা করতে এসেছ, করে চলে যাও। চুকে যাবে ল্যাঠা।

সুরেন্দ্রনাথ এবং জহরলাল নেহরুর মোড়ে এসে অনুপম ভাবে কোন দিকে যাবে।

ফুটপাতে চলমান এক অন্ধ ভিখারিকে দেখে অনুপম। ভিখারীটার ডান হাতে লাঠি এবং কাপড়ের একটা প্রান্ত। অপর প্রান্ত বাঁ-হাতে। কাপড়টা কাঁধ থেকে নেমে এসেছে।

চিৎকার করে আল্লাকে ডাকতে ডাকতে অন্ধটি এগিয়ে যায়।

অনুপম ঠিক বুঝতে পারে না, আল্লা এই ডাক শুনতে পাচ্ছেন কিনা।

সেও প্রায়ই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। ঈশ্বর তার প্রার্থনা শুনেছেন এরকম প্রমাণ তার আছে।

একারণে অনুপম কিছুটা ধার্মিক। শুধু ধার্মিক নয়, সে যে কোনো পাপ কাজ করার আগেও ঈশ্বরকে জানিয়ে করে। সে বিশ্বাস করে ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করবেন। ক্ষমাই ঈশ্বরের ধর্ম। তা না হলে এ যাবৎ পৃথিবীতে যত পাপকার্য হয়েছে তার জন্য এক কোটি পৃথিবীর ধ্বংস হবার কথা ছিল। কিন্তু পৃথিবী ধ্বংস হয়নি, ঈশ্বরের পরম কৃপায়। কৃপাময় রক্ষা করে চলেছেন অলক্ষ্যে, তাকে এবং তার মতো পাপী-তাপীদের।

'পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোকেরা, তোমরা সকলে আমার নিকট এস, আমি তোমাদের বিশ্রাম দিব।'

অনুপম যীশুর ছবির নিচে লেখা অক্ষরগুলো পড়ে। এবং করজোড়ে প্রণাম করে যীশুকে।

হে যীশু, আমি পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত, আমি আপনার কাছে যাব। আমাকে বিশ্রাম দিন। শুধু আমাকে তার আগে মাত্র কয়েকটা দিন সময় দিন, আমি আমার পরম শত্রুকে চিনে আসি।

অন্ধ ভিখারীটা অনেক দূর চলে গেছে। অনুপম তাকে ভিক্ষা দিতে না পারায় দুঃখবোধ করে।

প্রায় দৌড়ে গিয়ে ভিখারীটার কাপড়ের মধ্যে পকেটের সব খুচরো পয়সাগুলো ফেলে দেয়। অন্ধটি বিড়বিড় করে কিছু বলে। হয়ত তার মঙ্গল কামনাই করে।

লিণ্ডসের মুখে একটা ফাঁকা ভিনের খি পেয়ে যায় অনুপম। তাতে উঠে পড়ে।

॥ ৪ ॥

আরতি তুমি আমার পরম শত্রু হয়ে আমাকে উদ্ধার কর। অনুপম আরতির দু পা জড়িয়ে ধরে বুকের ওপর। তুমি আমাকে মুক্ত কর। তুমি জানো না আরতি, আমার একজনও শত্রু নেই বলে, কেউ আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হতে পারবে না।

আরতি কিছু বুঝতে না পেরে পা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে। অনুপম পা ছাড়ে না।

তোমার পদযুগলই আমাকে মুক্তির পথ দেখাবে। আমাকে লাথি মারো। লাথি মেরে দাঁত ভেঙে দাও। আরতি, তুমি কেন হিংস্র হতে পার না। তুমি বন্দুকের লাইসেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই কর। আমাকে খুন করার জন্য।

পা ছাড়ো। মার খাবে বলছি।

হ্যাঁ আরতি, আমি তো মারই খেতে চাই।

রাণীদি, একটা পাঁইট আর দুটো গ্লাস ধুয়ে দিয়ে যাও। গলা বাড়িয়ে বলে আরতি।

অনুপমের মাথার চুলে বিলি কাটে আরতি।

কেন পাগলামি করছো? একটু মদ খেয়ে সোজা বাড়ি চলে যাবে। তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছো। কি হয়েছে তোমার?

অনুপম ওজনের টিকিটটা বাড়িয়ে দেয়। আরতি দেখে।

ওমা, এতো নীতু সিং-এর ছবি! কি হয়েছে? নীতু সিং তো খুব ফেবারিট আমার।

তুমি বুঝবে না আরতি, এতে লেখা আছে, আমার পরমতম শত্রুই হবে আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু।

আরতি হো-হো করে হেসে ওঠে।

এই জন্য। তুমি আচ্ছা হাঁদারাম তো। এই লেখাগুলো সব মিথ্যে। সব বানানো। আমি সিনেমা দেখতে গেলেই ওজন নিই। কত সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা লেখা থাকে। একটাও মেলে না। আমি প্রথম প্রথম দেখতাম। এখন আর ঐসব ছাই-ভস্ম লেখাগুলো পড়িও না। শুধু ওজনটা দেখি ঠিক আছে কিনা। বাড়লে কষ্ট হয়। কমলেও। জানো, আজ না এক ছোকরা আমাকে বলে গেল আমি নাকি হেমা মালিনীর মতো দেখতে। দেখ না গো। ভালো করে দেখে বল না? ছেলেটা ঠিক বলেছে কিনা?

আমি হেমা মালিনীকে দেখিনি। কি করে বলবো, তুমি তার মতো দেখতে কিনা?

তুমি তো আমাকেও ভালো করে দেখো না। আরতি অভিমানে ঠোঁট ওল্টায়।

দেখি না তো এখানে আসি কেন? দুর্গোপুজো না গাজন দেখতে?

তা তুমিই জানো। একদিনও তো—

তাতে কি হয়েছে। তোমাকে ভালো লাগে, তাই আসি। তোমার এই ছোট্ট সংসার ভালো লাগে তাই আসি। তুমি আমাকে আদর কর, যত্ন কর, ভালোবাসো, শ্রদ্ধা কর, তাই আসি। শুনবে আর কি কি কারণে আসি। বলব?

হ্যাঁ বল, আমার খুব ভালো লাগছে। তুমি আমার শরীরকে গ্রহণ না করে আমাকেই ভালোবাসো, এটা অদ্ভুত।

শরীরের তো ক্ষয় আছে আরতি, বৃদ্ধি আছে। তাই শরীটা গৌণ।

অনুপমের যুক্তিনিষ্ঠ কথাবার্তায় মোহিত হয়ে যায় সে। স্থির ভাবে তাকিয়ে থাকে। আনন্দে। প্রেমে।

ভালোবাসা একটা ইন্টারনাল ব্যাপার। ভেতর থেকে উঠে আসে। শারীরিক প্রশ্নটাকে অবশ্য সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া যায় না। যেমন ধরো, তোমাকে আমার ভালো লাগলো কেন? আমি তো জন্মগ্রহণের পরেই ঠিক করিনি যে আমি আমার উনত্রিশে এসে আরতি নামক এক বারবিলাসিনীর প্রণয়ে আসক্ত হব। এবং আজ পঁয়ত্রিশেও তা অক্ষুণ্ণ থেকে যাবে। মোটেই তা নয়। যেমন সুইচ না টিপলে আলো জ্বলে না কোনো ঘটনাই নিজস্ব নিয়মে ঘটে না। তার জন্য প্রয়োজন স্থান-কাল এবং পাত্র।

আরতি অনুপমের দিকে গ্লাস এগিয়ে দেয়। দুজনে পরস্পর গ্লাস ঠোকাঠুকি করে।

'এস এস বসন্ত ধরাতলে।
আন মুহু মুহু নব তান,
আন নব প্রাণ নব গান।'

অনুপম বসন্তকে আহ্বান করে। রবীন্দ্রনাথের গানের দুটি কলিতে।

সেদিনও বসন্ত ছিল। বাসন্তী আসার দিনকয়েক আগে। অর্থাৎ আমার বিয়ের ঠিক আগেই তোমার সাথে যোগাযোগ। এক সন্ধ্যায়। তুমি বসুশ্রীতে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলে, পরে জেনেছিলাম। হাজরা মোড় থেকে আমি তোমাকে অনুসরণ করেছিলাম। হঠাৎ-ই। কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই। নেহাত আগ্রহবশত। কালিঘাট ব্রীজ ক্রশ করার সময় তুমি নাকি আমার মতলব বুঝতে পেরেছিলে। তাই গোপালনগর ঘুরে প্রায় একটা বৃত্ত রচনা করে আমাকে আসতে বাধ্য করেছিলে। যত তুমি দূরত্ব বাড়াতে চেয়েছিলে ততই আমি একগুঁয়ে হয়ে পড়েছিলাম। শেষে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, জানতেই হবে মেয়েটির ঠিকানা। তুমি গোপালনগর রোড ছেড়ে বাঁ-এ ঘুরতেই আমিও বুঝে ফেলেছিলাম তুমি আমায় ঘোরাচ্ছ। অবশেষে এই গলির মুখে কিছুটা এগিয়ে তুমি নেমে গিয়েছিলে। ভেবেছিলে আমি ফিরে যাব। তাই না? পেছন ফিরে দেখেছিলে, মনে আছে?

অনুপম থামে।

আর একটু দাও। বেশ ভালো লাগছে আজ।

আরতি গ্লাসে মদ এবং পরিমাণ মতো জল ঢালে। এগিয়ে দেয়।

অনুপম সেটুকু শেষ করে বলে, আমার সেদিনের প্রথম প্রশ্ন ছিল, এত ঘোরালে কেন? তুমি বেশ দীপ্ত ভঙ্গিমায় কিছুটা অহংকারে উত্তর দিয়েছিলে, সেটা আমার ইচ্ছা। আপনাকে জানাতে বাধ্য নই। তোমার সেই ভঙ্গি সেই অহংকার আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেললাম। তোমাদেরও যে দীপ্তি বা অহংকার থাকতে পারে তা আমার জানা ছিল না।

তোমার হাতের হলুদ ছাপমারা খামগুলো দেখিয়ে আমি বলেছিলাম, আরতি বলতে শুরু করে, ওগুলো কি? তুমি বলেছিলে, আমার বিয়ের কার্ড। কবে বিয়ে? আগামী শুক্রবার। তুমি এখনি বেরিয়ে যাও এখান থেকে। আমি তোমাকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম।

না, আমি বেরিয়ে যাইনি, অনুপম যোগ করে, এবং বিয়ের ব্যাপারটা মিটে যাওয়ার পরেও যখন আসলাম, তুমি অবাক হওনি। বলেছিলে, বৌ কেমন হল? পছন্দ হয়েছে তো। ফুলশয্যার রাতের ঘটনা শুনতে চেয়েছিলে তুমি। আমি সব বলেছিলাম।

আরতি থামিয়ে দেয় অনুপমকে। এগারোটা বাজে। বাড়ি যাও।

কত টাকা পাওনা হল? অনুপম জানতে চায়।

ছ'শ ছাপান্ন টাকা মোট। আমার চারশ দশ, আর মদের দুশ' ছেচল্লিশ।

লিখে রাখো। হিসেবে কারচুপি করো না। পাপ হবে।

অনুপম বেরিয়ে আসে। রাস্তা প্রায় জনশূন্য।

একটা রিকসা এসে দাঁড়ায়। রিকসাঅলাকে কিছু বলতে হয় না। অনুপম উঠে পড়ে।

আরতি তার কাছে একটা পয়সাও কোন দিন নেয়নি। অনুপম ভাবে। একবার পুজোয় একটা কাপড় দিতে চেয়েছিল। দুটো একই প্রিন্টের শুধু রঙের তফাত শাড়ি এনে বলেছিল, কোনটা তোমার পছন্দ।

আরতি সেদিন একটা কথা বলেনি। গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। শেষে অনেক সাধ্যসাধির পর বলেছিল, এই শাড়ি আমি নিতে পারি এক শর্তে। তুমি আর এখানে আসতে পারবে না। রাজি আছো, এই শর্তে। অনুপম কিছু বলতে পারেনি।

পরে একদিন অনুপম জানতে চেয়েছিল, তুমি যে আমাকে মদ খাওয়াও, খাতির কর তার কারণ কি? আরতি হেসে গড়িয়ে পড়েছিল, তুমি যে আমার নাগর গো, রসের নাগর। সেটুকুও বোঝো না। আচ্ছা হাঁদারাম তো তুমি।

অনুপমের বাড়ির সামনে রিকসা এসে থামে।

অনুপম প্রথম সিঁড়িতে পা দিতেই সিঁড়ির আলো জ্বলে ওঠে।

বাসন্তীর শরীরে ভর দিয়ে ঘরে ঢুকেই চমকে যায় অনুপম। রতন! মালাদির ভাই।

'মালাদি মারা গেল অনু। আমি শ্মশান থেকে তোকে খবর দিতে—'

অনুপম কিছু শোনে না। তার কানের কাছে তীব্র জলোচ্ছ্বাস হয়। সমুদ্র। বিরাট বিরাট ঢেউ। একটা ডিঙি নৌকো। কিশোর মাঝি। প্রাণপণ পরিশ্রম। চারিদিকে শুধু জল। কিশোরটি হঠাৎ স্রোতের তোড়ে নৌকাসহ হারিয়ে যায়। আর দেখা যায় না। অনুপমের অচেতন্য শরীরটাকে বিছানায় ধরাধরি করে শুইয়ে দেয় বাসন্তী। রতন তাকে সাহায্য করে।

এক সময় সেই অদ্ভুত ঘড়ির বাজনা বেজে ওঠে। বেজে চলে অনেকক্ষণ ধরে। অনুপম তাকায়। দেখে, মালাদি বাজিয়ে চলেছে ঘড়ির বাজনা। কাঁটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। অনুপম মালাদিকে ডাকতে চেষ্টা করে। চিৎকার করে ডাকে।

অকস্মাৎ অনুপমের ঘুমের ভেতর পুনরায় নৌকাডুবি হয়।

নিরাময়

অরণ্য সেন

আমি রাস্তা পার হই খুব সাবধানে। দুদিক ভালো করে দেখে-শুনে তারপর। তবু মাঝরাস্তা বরাবর গিয়ে ভয়ে উত্তেজনায় আমার পা ভারী হয়ে আসে, চলতে চায় না। মনে হয় এই বুঝি একটা গাড়ী এসে পড়লো। বাকী রাস্তাটুকু আমি প্রায় চোখ বুজে পার হয়ে যাই। ফুটপাথে পা দিয়ে তবে স্বস্তি।

এক-একদিন প্রভা এ নিয়ে বিরক্ত হয় খুব। বলে—রাস্তা পার হতে গিয়ে তোমার কী হয় বলো তো। অমন কর কেন?

আমি কোনো উত্তর দিতে পারি না। বেশীরভাগ দিনই চুপ করে থাকি। বা বড়-জোর বলি—কী আবার, কিছু না তো! তোমার সব তাতেই যত ইয়ে।

এটা যদিও কোনো উত্তর নয়। তবু প্রভা আর কথা বাড়ায় না, চুপ করে থাকে। আমি আড়চোখে ওর মুখটা দেখে নিয়ে অন্যকথা পাড়ি। নিতান্ত সাংসারিক সব কথা। আটপৌরে। প্রভা কান করে সব শোনেও না বোধহয়। শুনলেও অন্যমনস্কভাবে খালি হ্যাঁ হুঁ করে। ওকে খুব চিন্তিত দেখায় তখন।

আসলে আমি যেভাবে রাস্তা পার হই, সেটা আর পাঁচজন মানুষের মত স্বাভাবিক বা বিশ্বস্ত নয়, এটা টের পায় প্রভা। আর সেই কথাটাই ওর মাথার মধ্যে ঘোরে। বাস্তবিক আমি নিজেও ভেবে পাই না, রাস্তা পার হতে এমন নার্ভাসনেস ফিল করি কেন। ব্যাপারটা সাংঘাতিক কিছু না। প্রাথমিক সতর্কতা আর ট্রাফিক রুল একটু-আধটু মেনে চললে ঝুঁকি প্রায় নেই বললেই চলে। আর তাই বা করে কজন। বেশীর ভাগই তো উদাসীনের দলে। অথচ আমারই যত ভয়।

একদিন এ ব্যাপারটা আমি শ্যামসুন্দরকে বলেছিলাম। যদিও আমার বলতে খুব একটা আগ্রহ ছিল, এমন নয়। তবু বলতে হলো তার কারণ—আগের দিন সন্ধেবেলা আমি যখন রাসবিহারী মোড়টা পার হচ্ছিলাম, তখন সে নাকি আমায় দেখেছে। কাছেই কোন একটা দোকানে সে আড্ডা দেয়, সেখান থেকে। সেদিন রাস্তা পার হতে গিয়ে ঠিক কী হয়েছিল, প্রথমে আমার মনে পড়েনি। শ্যামসুন্দর মনে করিয়ে দিল, বলল—আমি দেখলাম, আপনি এ-পারে আসার জন্য একবার মাঝরাস্তা অব্দি এলেন। তারপর কী মনে করে আবার ফিরতে যাবেন, সেই সময় ওদিক থেকে একটা গাড়ি এসে পড়লো। আপনি তখন না এদিক না ওদিক করে, শেষে প্রায় দৌড়ে এপারে এলেন।

হয়ত এরকমই হয়েছিল। শ্যামসুন্দর ঠিকই বলেছে। এতক্ষণে আমার মনে পড়লো। একটা ড্রাইভার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমাকে গালিগালাজ করেছিল।

কথা শেষ করে শ্যামসুন্দর চোখ সরু করে হাসল। ভারী ইঙ্গিতময় হাসি সেটা,

তারপর বলল—কী দাদা শরীর খারাপ নাকি। অবশ্য ভালো ঘুম না হলেও অনেক সময় হয় এরকম।

শ্যামসুন্দর সব ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি মারে। মহা ফাজিল। আমি ওর চেয়ে শুধু চাকরীতেই নয়, বয়সেও সিনিয়ার। তা আমার সঙ্গেও সুযোগ পেলে ছ্যাবলামো করে। তবু আমি বললাম—না শ্যাম, ইয়ার্কি নয়। আসলে জান আজকাল প্রায়ই আমার এরকম হচ্ছে। আমি ব্যাপারটা খুব গুরুত্ব দিয়ে ওকে বোঝাতে চেষ্টা করি, রাস্তা পার হতে গিয়ে আমার খালি মনে হয়, এই বুঝি একটা গাড়ি এসে পড়লো। মানে একটা ডবল-ডেকার বা একটা লরী, অথবা ঐ জাতীয় একটা কিছু। যা আমি দেখতে পাচ্ছি না। পুরো ব্যাপারটাই কিন্তু সম্পূর্ণ কাল্পনিক। অথচ দ্যাখ আমি কিছুতেই নিরাপদ বোধ করি না।

সব শুনে মজার মুখ করে শ্যামসুন্দর বলল—ও কিছু না, বেশী বয়সে বিয়ে করলে কারো কারো হয় এরকম।

ইয়ার্কির ছলে বলা। তবু আমার মনে হয় কথাটা একেবারে ফেলনা নয়। প্রাক-চল্লিশে মানুষে থিতু হয়। বৌ-ছেলেমেয়ের সংসারে আঠালির মত লেপে থাকে। যেমন পালিত আছে। এ অফিসে আমি আর ও একই সঙ্গে ঢুকেছি। দু-একদিন আগু-পিছু। অথচ ও এখন পুরোপুরি সংসারী। এ প্রাউড ফাদার। আর আমি সংসারধর্ম শুরুই করলাম এখন।

পালিত আমাকে একটা সদুপদেশ দিয়েছে। বলেছে, দেখ বেশী বয়সের বিয়ে। ছেলেপুলের মুখ দেখতে দেরী করিস না।

কথাটা আমি প্রভাকে বলেছিলাম। শুনে তার ধারণা হয়েছে আমি বুঝি বাচ্চাকাচ্চা ভালোবাসি খুব। প্রভার এই সমস্ত ধারণা-গুলো এখনও বেশ সাদামাটা গোছের। যে ব্যাপারগুলো আমি স্বাভাবিক দায়িত্ববোধ থেকে করি বা করব বলে ভাবি, ও সেগুলোকে ভাবে ভালোবাসা। আমাদের বিয়ের ব্যাপারটাও সেরকম। ওর ধারণা আমরা ভালোবাসা করে বিয়ে করেছি। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। যদিও বিয়ের আগে প্রভাকে দিনদুয়েক দিদির বাড়িতে দেখেছি। দিদির শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে ওদের কি রকম একটা আত্মীয়তা আছে, সেই সূত্রে মাঝে মাঝে আসত। এবং তার মধ্যে দিন-দুয়েক আমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। এত অল্প সময়ে প্রেম-ট্রেম করার মত এলেম আমার কোনো কালেই ছিল না। সে কথা প্রভাও জানে কিন্তু মানতে চায় না। বলে—তোমাকে বাইরে থেকে যতই নিপাট ভালো-মানুষের মত দেখাক, আমি ঠিকই জানতাম দিদির বাড়িতে তোমার আসল টানটা কীসের।

অর্থাৎ আমার আসল টানটা হচ্ছে ও এবং ওর জন্যেই আমি যেতাম। অথচ আমি নির্ঘাত জানি, ওর সঙ্গে আমার বিয়েই হত না, যদি না ও স্কুল-টিচারীটা পেত। না হলে পাত্রী আরও দু-একজন ছিল। তাদের মধ্যে একজনকে বাড়ির সকলের পছন্দও হয়েছিল খুব। কিন্তু চাকরী করে না বলে, শেষ অবদি খারিজ হয়ে গেল।

কাজেই প্রভার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে ভালোবাসার জোরে এমন বিশ্বাস আমার নেই। জোর যদি কিছুর থাকে, তো সে ঐ চাকরীর। অর্থাৎ এক কথায় লোভ। বিয়ের পর যে সমস্ত দায়-দায়িত্ব অনিবার্যভাবে আমার উপর বর্তাতো, তা থেকে আংশিক অব্যাহতি পাওয়ার লোভ। প্রভা এতসব তলিয়ে বোঝে না। তার পাটোয়ারী বুদ্ধি কম, ভাবে ভালোবাসা। —তা ভাবুক। আমার খারাপ লাগে না। আমার নিজেরও আজকাল এরকম ভাবতে ইচ্ছে করে।

বিয়ের পর প্রথম প্রথম আমরা বেশ ভালোই ছিলাম। এমন কি বন্ধু-বান্ধব কেউ আড়ালে আমাদের সম্বন্ধে 'আদিখ্যেতা' কথাটা ব্যবহার করেছে। অর্থাৎ আমরা পর-স্পরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছি।

সেই সময়ে একদিন সকালে, দাড়ি কামাতে বসে, ব্যাপারটা ঘটল। আমার ডান হাতে সাবান মাখানো ব্রাস। কিন্তু সে আর আমার গালে ওঠে না। আমি নিজের মুখো-মুখি, চুপচাপ বসে থাকি একা। আয়নার খুঁটিয়ে দেখি নিজেকে। বয়স্ক মানুষের মত দেখায় আমার মুখ। অথচ অভিজ্ঞতার ছিটেফোঁটা নেই কোথাও। একদম নিরেট বোকা বোকা।

আমি মুখ ছুঁচলো করে শিষ দিতে চেষ্টা করি। ভেঙ্গেচুড়ে মুখটা আরও বুড়োটে দেখা। আয়নায় চোখ রাখতে চেষ্টা করি। হয় না। দুটো চোখই বুজে আসে। তার মানে আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। বুড়ো হয়ে যাওয়া বড় খারাপ। কেউ ভালোবাসে না। বৌ-ও না।

পাশের ঘর থেকে প্রভা আসে একসময়। এ সময় তার অনেক কাজ। দ্রুত হাতে টুকি-টাকি সব জিনিস নাড়াচাড়া করতে করতে বলে—কী তোমার হল না এখনও।

—নাঃ আজ আর হবে না, শরীরটা ভালো নেই।

কপট শাসনের সুরে প্রভা বলে—শরীর বেশ আছে, অফিসে যাও। আর থেকেও লাভ নেই।—এই অবদি বলে, সে আমার দিকে তাকায়, তারপর জব্দ করার ভঙ্গীতে বলে—আজ আমার স্কুল খুলবে।

—আচ্ছা প্রভা, আমি দুর্বল গলায় জিগ্যেস করি—আমাকে খুব বয়স্ক মানুষের মত দেখায়; না সত্যি বল না বুড়ো বুড়ো লাগে।

আয়নায় আমার চোখে চোখ রেখে প্রভা বলে—কোন সময়কার কথা বলব, দিনে না রাত্তিরে।

বয়সকালে বিয়ে না হলে মেয়েরা এরকম হয় বোধহয়। বড় আলগা রসিকতা করে। আমি চুপ করে থাকি। সেদিন আর অফিসে যাওয়া হয় না। দুপুরে চীৎ হয়ে বিছানায় শুয়ে, নিজের বয়স ভাবতে ভাবতে টের পাই, রক্তে বয়সের সর পড়ছে।

আমার টেবিলে সিগারেটের প্যাকেট বড় অবহেলায় পড়ে থাকে এখন। অভ্যেস মাফিক ধরাই, দু একটা টান দেই কি দেই না, স্ট্যাটুটারী ওয়ার্নিং মনে পড়ে। 'সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর'—কি ধরনের ক্ষতি, ক্যানসার? কিন্তু সে তো মেয়েদেরও হয়। তার মানে না খেলেও হতে পারে। তবে খেলে হয়ত ত্বরান্বিত হয়। এবং সেই মুহূর্তে আমার আঙুল থেকে সিগারেট খসে পড়ে।

আজ অফিস থেকে ফেরার পথে ডাক্তার-এর কাছে যাওয়ার কথা আছে। অন্য কারও নয় আমার নিজের জন্যই। দিন কয়েক হল স্কুলে যাওয়ার সময় প্রভা রোজই আমাকে কথাটা মনে করিয়ে দেয়। আজ সকালেও দিয়েছে। আমার চোখে তখন চটচটে ঘুম আঠার মত। ঐ অবস্থাতেও প্রভা আমাকে টেনে তুলে ডাকতার ফাকতার কী সব বল-ছিল। এখন আমার সব কথা মনে পড়ছে না। বাড়ী হয়েও যাওয়া যায় অবশ্য, সব কিছু ভালো করে শুনে মেলে। কিন্তু অফিস থেকে ফিরে একবার ঢুকলে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। আলসেমি আসে। থেকে থেকে হাই ওঠে কেবল।

যদিও জানি ডাকতারের কাছে গিয়ে লাভ হবে না কিছু। কারণ সত্যি আমার কোনো রোগ নেই। সুখের অভাব, সেই অর্থে অসুখ। রোগ নয়। এ কথাটা আমি প্রভাকে বুঝিয়ে পারি না। ও বলে এটাই রোগ। এই যে সব সময় একটা আতঙ্ক নিয়ে বেঁচে থাকা, প্রতি মুহূর্তে একটা কিছু আশংকা করা, এগুলো হল রোগের লক্ষণ। স্নায়ু দুর্বলতা থেকে হয় এসব। কথাগুলো প্রভা বলে বড় বিচক্ষণের মত। সেই সময় ওর মুখ দেখে আমার হাসি পায় কেমন গম্ভীর গম্ভীর। একটাও বাড়তি কথা বলে না। যেন ও আমার বৌ নয়, সি-জি-এইচ ডিস-পেনসারির লেডী ডাকতার।

আমি প্রসঙ্গটা তরল করতে চাই। বলি—এ সময় তোমার গলায় একটা স্টেথোস্কোপ বড় মানাত। শুনে হয়ত হাসি পায় ওর, কিন্তু হাসে না, আপাত গম্ভীর হয়ে বলে—তোমার অসুবিধে হত খুব। লোকে বলত লেডী ডাক্তারের বর।

—এমনিতেও তো তাই, বিয়ে করলেই লোকে লেডী ডাক্তারের বর হয়ে যায়। বর-কাম-কম্পাউণ্ডার। কথাটা বলে, আমি ভেবে-ছিলাম প্রভা হাসবে। কিন্তু প্রভা হাসে না, মুখ ঝামড়ে বলে—থাক থাক অনেক হয়েছে। তার মানে ও রেগে গেছে: আমি স্পষ্ট টের পাই। এবং কোনো কারণে প্রভা রেগে গেলে, আমার নিজেকে কেমন অপদার্থ মনে হয়। আমি নিরেট অভিজ্ঞতাহীন মুখে একটা বোকাটে হাসি ডাকটিকিটের মত লাগিয়ে রাখি তখন। প্রভা এতে খুশী হতে

পারে। অনেক সময় হয় দেখেছি। আমি সেই রকম হেসে বললাম,—ঠিক আছে কাল অফিস থেকে ফেরার পথে সেনের চেম্বার হয়ে আসব।

—যাওয়া না যাওয়া তোমার ইচ্ছে বলে প্রভা আমার দিকে খর চোখ করে তাকায়। তারপর বলে তোমার ভালর জন্যই বলা।

শুনে আমার দুঃখ হয়। কষ্টও। আমার ভাল আর প্রভার ভাল যেন আলাদা। অথচ আমি দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বার ভাবি আমার একটা কিছু হয়ে গেলে প্রভারই ক্ষতি। দেশতো পার হতে গিয়েও সেকথা মনে হয়। সিগারেটে দু-একটা টান দেই কী দেই না, দড় আলগোছে পড়ে যায় সেটা।

ডাঃ সেন প্রভাদের স্কুলের সেক্রেটারী। সেই সুবাদে তিনি আমাকে থরো চেক-আপ করবেন এবং সম্ভবত বিনি পয়সায়। ব্যবস্থাটা প্রভারই। টাকা পয়সার ব্যাপারে যদিও প্রভা বলেনি কিছু, তবু মনে হয় লাগবে না। আরও কোন কোন দিদিমণিব বরকে ভদ্রলোক বিনি পয়সায় দেখে দিয়েছেন, প্রভা বেশ কয়েকদিন আমাকে বলেছে সেকথা। এই ধরনের উপকারী ডাক্তার আমার খুব সুবিধের বলে মনে হয় না। রুগী-পত্তর কেমন কে জানে।

সান্যালকে জিগ্যেস করলেই জানা যায়। ওদের পাড়াতেই সেনের চেম্বার। কিন্তু সান্যাল সীটে নেই। ধান্দায় বেরিয়েছে। শ্যামসুন্দর একমনে টাইপ করছিল, আমি সেদিকে তাকিয়ে ড্রয়ার বন্ধ করতে করতে বললাম—শ্যাম আমি যাচ্ছি বুঝলে। শ্যাম মুখ না তুলে মাথা নাড়ে শুধু, অর্থাৎ —ঠিক আছে।

আমার ফিরতে দেরী দেখেই প্রভা বুঝেছে, ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। ঘরে পা দিতেই বলল—দেখা হল?

দেয়ালের এই জায়গায় একটা পেরেক ছিল। অথচ জামাটা ঝুলিয়ে রাখতে গিয়ে খুঁজে পাই না। কিন্তু আমার বেশ মনে আছে এখানে একটা পেরেক ছিল, ঘরটা চুনকাম করার সময় সেটার মাথায় পাটের আঁশ পাগড়ির মত জড়িয়ে গিয়েছিল: আমার তা অবধি মনে আছে: অথচ পেরেকটা নেই।

—আচ্ছা প্রভা, এখানে একটা পেরেক ছিল না?

—ওখানে কোথায়, সেটা তো ঐ দেয়ালে —বলে প্রভা আঙুল তুলে দেখায়—তুমি সেদিন ক্যালেন্ডার লাগালে মনে নেই। বন্ধকী গয়না ছাড়িয়ে নেবার সময় লোকে যেভাবে নিরিখ করে দেখে, মিলিয়ে নেয় এটাই সেটা কিনা, আমি পেরেকটা সেভাবে চিনতে চেষ্টা করি। পারি না। অনেক বদলে গেছে পেরেকটা। পাগড়ি ফাগড়ি আর নেই। লালচে রং, শুধু গোড়ার দিকটায় একটু চুনের দাগ, সাদাটে।

—দেখা হল, প্রভা আবার জিগ্যেস করে।

—হ্যাঁ।

—কী বলল?

—কিছু না, চিন্তাভাবনা করতে মানা করল। যেমন বলে আর কী।

—আর ওষুধ?

—সেও মামুলী। কথাটা শুনতে শুনতে বুক পকেট থেকে প্রেসক্রিপশন নিয়ে এল প্রভা। এবং আশ্চর্য ওষুধটার নাম, আপন জনের চিঠি পড়ার মত একবারে পড়ে ফেলল। সেনের প্র্যাকটিস এখনও তেমন জমে নি।

বারান্দার তারে তোয়ালে মেলা থাকে অন্যদিন। খুঁজতে হয় না। আজ নেই। তবু প্রভাকে জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হয় না। হয়ত কাছে পিঠেই কোথাও আছে। আমিই খুঁজে পাচ্ছি না। আজকাল আমার প্রায়ই হয় এ রকম। জায়গার জিনিস জায়গা মতই থাকে, কী একটু এদিক ওদিক। অথচ আমি খুঁজে পাই না। প্রভা এসে একদণ্ডে বের করে দেয়। বলে—এই তো। ম্যাজিশিয়ানের সামনে ব্যক্তিত্বহীন দর্শকের মত আমি চোখ গোল গোল করে তাকিয়ে থাকি তখন।

চা দিতে এসে প্রভা উৎকণ্ঠিত গলায় বলে—তোমার শরীর খারাপ না কী, ঘামছে যে এত।

—ঘামছি, কই না তো, বলে আমি কপাল ছুঁয়ে দেখি। সত্যি কপালটা কেমন ভিজে ভিজে, চুলের গোড়া, কানের লতি, সব কেমন ঠান্ডা ঠান্ডা। তোয়ালেটা খুঁজে পাইনি। কথাটা মনে হতে ভারী স্বস্তি বোধ করি। বড় আশা নিয়ে প্রভাকে বলি—নাঃ, শরীর ঠিক আছে, প্রেসার-ট্রেসার সব নরম্যাল।

রাত্তিরে শুতে এসে প্রভা দেরী করে রোজই। আধঘন্টা ধরে আয়নার সামনে বসে প্রসাধন সারে। ঘাড়ে গলায় পাউডার ছড়ায়। চুল বাঁধে আঁট করে। আমার ঘুম আসে না। মশারীর ভিতর থেকে ওকে দেখি। মেয়েরা নাকি কুড়িতে বুড়ি হয়। আর প্রভার দ্বিতীয় কুড়ি আসতে চলল। সে হিসেবে শরীরের গড়ন পেটন এখনও আলগা হয়নি খুব। দু-একটা ছেলেপুলে হলে এরকম থাকত না নিশ্চয়। সে জন্যই কী প্রভার এমন অনীহা। এরকম একটা সন্দেহ আমার হয় মাঝে মাঝে। অফিসে-টফিসে শুনি। কেউই আজকাল চট করে কিছু বাঁধিয়ে বসতে চায় না। কিন্তু সেসব তাদের পোষায়। যারা বয়সকালে সংসারী হয়। আমি লেট-লতিফ।

আলো নিভিয়ে প্রভা জিভ কাটে, বলে—ঐ যাঃ, তোমার তো ওষুধ খাওয়া হল না। ঘুমের ওষুধ খেতে আমার বড় ভয় হয়। ঐ একটু বেশী মাত্রায় গিলে কত লোক চিরকালের মত ঘুমিয়ে পড়েছে। সকালে উঠে প্রভা হয়ত দেখল আমার শরীর ঠাণ্ডা, পাথরের মত। ডাকলে সাড়া নেই। একটু ধাক্কা দিতেই মাথাটা দম-ফুরোনো লাট্টুর মত গড়িয়ে যায়।

—আজ থাক।

—কেন থাকবে কেন, কোমরের কাষি আলগা করতে করতে প্রভা বলে—দিনক্ষণ দেখে খেতে হবে নাকি?

আমি অক্লেশে টেনে নেই ওকে। ওর শরীর থেকে একটা সুবাস ভেসে আসে তখন। সেই গন্ধে মাথার ভিতরটা ফাঁকা লাগে। ঘোর-লাগা গলায় বলি—দিনক্ষণ জানি বলেই খাবো না।

সেই রাতে সত্যি আমার বড় ভাল ঘুম হয়। স্বপ্নে আমি দেখি ছেলেবেলার মুখ। সে লুকিয়ে সিগারেট খায়। বিপজ্জনক ট্রামে-বাসে বড় অবহেলায় ওঠে। আবার কখনো আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, বলে—ধর শক্ত করে।

এইরকম সমস্ত গোলমাল হয়ে যায়। ভাবনারা উঠে আসে দ্রুত, কিন্তু ঘটনার প্রতিমুখি থাকে।

পাঁচটা বেজে অফিস এইমাত্র ছুটি হল। সারাদিনের ক্লান্তির পর এখন অবসাদে ভরে থাকা। সিগ্রেট ধরানো, পাঁচ-তলার জানালা থেকে রাস্তায় লোকজনদের চলাফেরা, সারাদিন সম্পর্কে ভালোমন্দ একটা ধারণা তৈরী করা। এসব মন্দ না। চেয়ারের ওপর শরীরের সমস্ত ভার রেখে এখন নিশ্চিন্ত, দরকার মতো টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে। এসব চলতে পারে। কিন্তু সে বড়ো দুরন্ত। টেবিলের ওপর কাগজপত্র গুছিয়ে নেয়, ড্রয়ার চাবি বন্ধ করে চাবিটা পকেটে রেখে দিয়ে, দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে চুল ঠিক করে জামার হাতদুটো একটু টেনে দিয়ে, চটির শব্দ করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে রাস্তায়।

সন্ধ্যের রাস্তায় গাড়িগুলো বেশ জোরে যায়। কিবা এমন তাড়া। ধীরে সুস্থে সিগেরেটটা শেষ করা যেতে পারে। এপারের ফুটপাত দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তায় পেঁৗছে সহজে পার হওয়া যাবে। কিন্তু সে হঠাৎ নেমে গেলো রাস্তায়। একটা গাড়ি চলে গেল, আর একটা গাড়ি আসছে। অন্য-দিক থেকেও গাড়ি আসছে। মাঝখানে এই সময়ের মধ্যে ঠিকমত কোন সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না। যা খুশী ঘটে যেতে পারে। তবু সে দ্রুত পা চালিয়ে রাস্তা পার হয়ে গেল।

এসময় বাসে বেশ ভিড়। ভিড়ের এই এতটা পথ শরীরের বাকি শক্তিটুকু শুষে যায়। বাড়ি ফেরার তাড়া নেই। আধঘন্টা একঘন্টা দেরীতে কিছু এসে যাবে না। ভিড় একটু কমুক, আর একটা সিগেরেট ধরানো যাক। একের পর এক বাস আসে, থামে, চলে যায়। কিন্তু তার পা দুটো বাসের গতির কম বেশীর সঙ্গে যথাক্রমে বাড়তে কমতে থাকে। এক সময় হঠাৎ কোন্ এক বাসের হাতল ধরে ঝুলে পড়ে। শিথিল হতে থাকা হাতের বিপজ্জনক মুঠোর ভেতর নেমে পড়ব কিনা এমন ভাবনায় সে আরো দৃঢ় চাপের ভেতর তেমনি ঝুলতে ঝুলতে চলে যায়।

যে বাসে এত লোক উপচে-চুপচে হয়ে যাচ্ছে, গায়ে গা লাগবে, পায়ের ওপর পা। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। প্রতিদিন যাওয়া আসায় এ অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমার পা যেমন কেউ মারিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, আমিও অনেকদিন অন্যের পা মাড়িয়ে দিয়েছি, কোন অস্বস্তি বোধ করি না। মাথার চুল নষ্ট হয়ে গেলে বিরক্তি বড়-জোর ভ্রূ কুঁচকে ন্যাথা পর্যন্ত, মাথায় হাত দিয়ে চুল ঠিক করে নেয়। কিন্তু লোকটা পা মাড়িয়ে দিতে সে বিশ্রী চিৎকার করে উঠল। লোকটা কিছু পাল্টা বলতে সে রীতিমতো ঝগড়া শুরু করে দিল। সেখানে তিক্ততার ভেতর কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রইলো।

মোড় ফেরবার সময় চলন্তিতে নামতে
। দু-একবার সামলাতে পারি নি। এই
ড়ই পেছন থেকে আসা গাড়ির ধাক্কায়
কয়েকটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। একটু
য়ে স্টপেজে নামলে এবং চলন্তিতে
লে বাড়ি পৌঁছনোর সময়ের তফাত মাত্র
আড়াই মিনিট। এর জন্যে এমন ঝুঁকি
য়ার মানে হয় না। তাড়াহুড়োর কিছু
ই, স্টপেজ এলে নামব। কিন্তু মোড়টা
স পড়তে সে ধাক্কাধাক্কি করে গেটের
ছে এগিয়ে হাতল ধরে ঝুলতে ঝুলতে
ং বাসটা মোড় ঘোরবার সময় চলন্তিতে
মে পড়ল। পেছন থেকে জোরে হর্ন দিয়ে
কটা গাড়ি ব্রেক কষে দাঁড়াল। ভ্রূক্ষেপ
করে সে ফুটপাতের ওপর উঠে হাঁটতে
কল।

বাড়ির ভেতর আবহাওয়ায় একটা
গুমোট ভাব থাকে। প্রতিদিন সেখানে ফিরে
কান না কোন কারণে তা তিক্ত হয়।
অথচ এটা সহজে এড়িয়ে যাওয়া যায়।
নিজেকে নির্লিপ্ত রাখলে একসময় গুমোট
ভাব কেটে যেতে পারে। এমন ভূমিকা
আমার থাকা উচিত। বাড়িতে পৌঁছবার
আগে ভাবতে ভাবতে এগোই। আমার কি কি
করার কথা, কার সঙ্গে কি কাজ, কি কি
কথা কাকে কাকে। কিন্তু ঘরে
ঢোকামাত্র সে কিছু একটা কাণ্ড বাধিয়ে
বসে। কেউ কোন কথা বলতে এলো, তাকে
আরো দুচার কথা শুনিয়ে দিলো।
ছেলেটাকে চড়ই কষিয়ে দিলো হয়তো।
অথবা রেগে চটি পায়ে দিয়ে হন হন করে
রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। বাড়ির ভেতর
অস্বস্তিকর পরিবেশ তৈরী হয়।

এমন সমস্ত ঘটে যায়। চিন্তা ভাবনায় নিজেকে সংগঠিত করে তুলি। ঘটনার প্রবাহে ভেঙে চুরমার হয়।

ঘরের ভেতর কিছু কিছু চরিত্র থাকে। যেন এক একটা অঞ্চল। বারান্দায় ইজি-চেয়ার। পিঠ বেঁকে যাওয়া, বই হাতে, মাঝে মাঝে খুক খুক করে কাশি। অর্থাৎ বাবা। বারান্দায় যাওয়া মানে বাবার কাছে। বাবার শরীর দিয়ে সত্তরটা বছর বয়ে গিয়ে। ছেলেবেলা থেকে পড়াশোনার ভেতর বড় হতে হতে। বিয়ে করে স্ত্রী, সংসার, ছেলে। ছেলে বড় হতে হতে। চারপাশ দিয়ে এই বয়েসের চাপে শীর্ণ, ন্যুব্জদেহ বাবা এখন অধিকাংশ সময় বারান্দা হয়ে বসে থাকে। পেছন দিকের পৃথিবী বড় হতে হতে বাবার চোখের দৃষ্টি কমছে ক্রমশ, সামনের পৃথিবী ক্রমে ছোট হয়ে আসে।

ঠাকুরঘর এমনি আর এক অঞ্চল। ফ্রেমে বাঁধানো ছোট ছোট ছবি, আসবাব-পত্র, থালা গ্লাস নিয়ে মা সেখানে কিসব করে। সেখানে মায়ের মুখের আদলটা একটু গোলমতো হয়ে থাকে। ছোটবেলায় সেই ছটফটে শরীরটা হঠাৎ একদিন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চোখের ঠিক ওপরে স্বামী, সংসার। গর্ভধারণ, সন্তান, সারাদিনের ব্যস্ততা। অসুখবিসুখ, রান্নাবান্না, খাওয়ানো, স্কুল। ছেলেকে বড় করতে করতে, শরীরের ওপর দিয়ে বয়েস বয়ে গিয়ে। ছেলের বিয়ে, বৌ, নাতি, নাতির মুখ, গর্ব। বাকীটুকু বছর মার শরীর দিয়ে, মার পিঠের মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে দিয়ে গেছে, পায়ের বাত মাকে প্রায় পঙ্গু করে এনেছে। এতদিন রান্নাঘর বলতে যা এখন ঠাকুরঘর অঞ্চল হয়ে থাকে।

স্ত্রী নামক চরিত্রটি কাছাকাছি ঘোরা-ফেরা করে। বাড়ি ফিরলে মুখে বিরক্তি মেখে, কখনো উচ্ছ্বসিত। কখনো ছেলেকে নিয়ে, কখনো রান্নাঘরে। ব্যস্ত পদক্ষেপে অথবা আলস্যে শুয়ে থেকে। কখনো দুশ্রী লাবণ্যে ভরে থাকে, কখনো শীর্ণ ম্লান চোখ নিয়ে। কোন কোনদিন অনেক কথায় মুখিয়ে থেকে অথবা দৃষ্টিতে পর্যন্ত বিমুখ জাগিয়ে রেখে। এইরকম অনির্দিষ্ট স্ত্রী নামক চরিত্রটি চারপাশে বলয় নির্মাণ করে। যতক্ষণ বাড়িতে, এই বলয়ের ভেতর ঘুরপাক খেতে খেতে। কয়েক বছর আগের সেই আশ্চর্য রাত্রি, লোক সমাগম, দুই কক্ষ এক সম্মিলনে। তারপর পাশাপাশি বিচ্ছিন্ন, ক্রমে ক্রমে বিবর্তনের ভেতর দিয়ে। সন্তানের স্বপ্ন, সন্তান। আশা আকাংক্ষা। সন্তান বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো বিবর্তনের ভেতর এখন চারপাশে বলয় নির্মাণ করে সমগ্র অঞ্চল জুড়ে থাকে।

আর একটি চরিত্র থাকে। চরিত্র হবার মত যদি তার বয়েস। তিন বছরের শিশুটির

অঞ্জল এই সমস্ত বাড়িটা। তখনো বারান্দায় গিয়ে বাবার চশমা নিয়ে দৌড়ে চলে আসে। অথবা ঠাকুরঘরে গিয়ে সব লন্ডভন্ড করতে লেগে যাওয়া। কিংবা রান্নাঘরে কলসী উল্টে খুন্তি হাতে পালিয়ে আসা। সবাই উদ্বিগ্ন, সবাই ত্রস্ত, ওর আধো আধো অলীক অথাবার্তার ভেতর মজা খুঁজে পাওয়া পাওয়া, খাবার সময় বিরক্ত করা, জিনিষপত্র ছুঁড়ে ফেলে দেয়া, ছোটখাট কাজকর্ম করার উৎসাহ। সবার মধ্যে এইরকম কোন না কোন প্রতিক্রিয়ার ভেতর দিয়ে এই তিন বছরের শিশুটি একটি চরিত্র। বাড়ি ফিরলে ঘুর-ঘুর করে চারপাশে, নানারকম আব্দার, মার নামে নালিশ, বিকেলে বেড়িয়ে আসার গল্প। এইসব শুনতে শুনতে ভেতরে যে প্রতিক্রিয়া হয় সেই সমেত এই তিন বছরের শিশুটি সমস্ত বাড়িময় হয়ে থাকে।

এই চরিত্রেরা যেমন যেমন বলা হোল তেমন স্বতন্ত্র মনে হলেও এদের পারস্পরিক থাকে। যখন বাড়িতে ফিরে আসি, মোটা-মুটি অন্তর্গত হতে যাচ্ছি। চরিত্রেরা অনবরত ঘটনার জন্ম দিতে থাকে। বারান্দা থেকে হয়তো চিৎকার ভেসে এলো। আর অমনি

—চিৎকার করছ কেন। ভিমরতি হয়েছে নাকি।

—এছাড়া আর কি বলবে। এককোণে পড়ে আছি, কেউ খবর রাখে? এত রাত হোল এক কাপ চা পেলাম না।

—রাত কোথায়। খোকা তো এইমাত্র ফিরলো।

—হ্যাঁ দিগ্বিজয় করেছে।

—এই নিন বাবা, চা।

—দাও। খোকা ফিরেছে একবার দেখা করার প্রয়োজন বোধ করে না। একটা খবর আনতে বলেছিলুম।

—সময় পাই নি বাবা।

—তা পাবে কেন, ফূর্তি করে সময় কুলোয় না। বাবা তো এখন আপদ বিশেষ।

—এসব কথার কোন মানে হয় না।

—ছেলেটা অফিস থেকে ফিরতে না ফিরতে কী আরম্ভ করলে তোমরা।

—আমাকে আর অফিস দেখিও না।

সবার ছুঁড়ে দেয়া শব্দগুলো ওপরে উঠে ঘরটা থমথমে হয়।

ঠাকুরঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে 'এই খোকা.' শোন শুনে থামকে দাঁড়াতে হয়। এবং তারপরই

—শেষ পর্যন্ত বৌয়ের কাছে হেনস্থা হতে হল।

—আবার কি হল?

—নিজেই জিজ্ঞেস করে দ্যাখ। আর একজন বাড়িতে থাকে যেন ঠুটো জগন্নাথ।

—আমাকে এর মধ্যে কেন। নিজেরা মিলমিশ করে থাকতে পারো না, এ তো বড় আশ্চর্য। সব সময় খিটখিট করলে হয়?

—সারাদিন পর বাড়ি ফিরে এসব আমার ভালো লাগে না।

—তাতো বলবিই। বৌকে শাসন করার মুরোদ নেই।

—যা খুশী বল।

সমস্ত কথাগুলো বিরক্তি ভরে ওপরে ঝুলতে থাকে।

স্ত্রীর সঙ্গে চোখোচোখি হলে মুখে বিরক্তি যেন লেপ্টে থাকে। কিছুটা সময় পার করে

—এ বাড়িতে আমার একদম ভাল্লাগে না।

—তোমার আবার কি হল?

—ছেলেটা কদিন ধরে পায়খানা করছে পেটে কৃমি। তোমার তো দ্যাখার সময় নেই। এদিকে লুকিয়ে লুকিয়ে চিনি, গুড়, চকলেট।

—দশগুণ করে বলো না। একদিন এসে চেয়েছিল, একটু গুড় দিয়েছি। অমন একটু-আধটু খেলে কিছু হয় না।

—যে সামলায় সেই বোঝে।

—ছেলেপুলে আমরাও মানুষ করেছি। তোমার মত অমন করিনি।

—কি ছেলেমানুষের মতো ঝগ করছ।

—আর কি, তোদের কাছে শেখ বাকি আছে।

সবার কথাগুলো মেঝের তলানি হ থিকথিক করে।

ছেলেটা একটা কাঁচের গ্লাস ছুঁ দিতে ভেঙ্গে টুকরোটুকরো হয়ে ছিট পড়ে। স্ত্রী গিয়ে গালে পিঠে চড়চা বসিয়ে দিতে কাঁদতে সুরু করলে

—এটুকু ছেলেকে অমনভাবে ম কেউ।

—আস্কারা দিয়েই তো মা তুলেছেন।

—খোকা, শুনলি তো নিজের কা

—সবই দেখছি। প্লাসটাস নাগা বাইরে রাখতে হয়, অমনভাবে মারলে সামলাতে পারবে না।

—সারাক্ষণ তো বাইরে বাইরে থ কতটুকু সামলাও। আমি আর পারি যা হয় হবে।

—কে আমার দাদুভাইকে মেরে আমি ভয়ানক মারব তাকে।

—মা-আ মেরেছে। মাকে বকে দ

—খুব বকে দেব। তুমি আমার ব এস। আমরা বারান্দায় চলে যাই।

ওরা বারান্দায় চলে যায়। স কথাবার্তা ছাড়াছাড়া হতে থাকে হয়।

সারাদিনের পর বাড়ি ফিরলে এই চরিত্রেরা থাকে। বিচিত্র সম্মিলনে ঘটনা করে। ছোট-ছোট ছোট-বড় বড়-বড় রকম বিভিন্ন ঘটনাসকল। ঘটনা সম্মি নানা আবহ। এইরকম কোন না আবহের ভেতর একটা প্রতিদিন আসি। সেখানে এই চরিত্রসকল ঘটনা যে যার অংশ ভূমিকা নিয়ে। আমি প্র করি। ওরা আমার ওপর গভীর চাপ করে। ভিন্ন ভিন্ন উৎসের শব্দ কথাবার্তা, ভঙ্গিসমূহ এই আবহস ক্রমাগত কোলাহল অন্তর্গত করতে থ কোলাহল ঘনীভূত হয়ে গেল কোন কোন শীতের সন্ধ্যায় ধোঁয়ার মত দুঃসহ থম আমি প্রত্যক্ষ করি। আমার কিছু থাকে না। আমার ভেতরের নির্জন চ হয়ে কোলাহলে ভরে যায় অথবা দ থমথমে হয়ে থাকে।

ঘরের ভেতর এইরকম কোলাহল দুঃসহ থমথমে। আমি অন্তর্গত আ হয়ে পড়লে, সে নির্জনে যায়।

হঠাৎ লোড-শেডিং শুরু না হলে ...তো মনে পড়তো না।

ছাদে বসেছিলাম একা। শীত শেষ ...য় গিয়েছে, কিন্তু এখনও পুরোপুরি ...ম পড়েনি। বেশ লাগে সন্ধ্যেবেলা ছাদে ...স থাকতে। কিন্তু সময় হয় কোথায়? ...কাজে অকাজে—বাস্তব পৃথিবীটা ...ফ ছাড়তে দেয় না একটুও। আজ ...নেকদিন বাদে আমি কিছুটা সময় চুরি ...তে পেরে ব্যবহার করে নিচ্ছিলাম।

চারদিকে বড় আলো। অনেক নতুন ...কানপাট গজিয়ে উঠেছে গত কয়েক ...রে। রাস্তায় এসেছে নিওন আলো। একা ...দে বসে থাকার যে রোমাঞ্চকর অনুভূতি ...এত আলোয় নষ্ট হয়ে যায়। এই কথা ...বছি, এমন সময় সমস্ত শহরে ঝাঁপিয়ে ...ড়লো অন্ধকার। লোড শেডিং।

ধূসর অন্ধকার জড়িয়ে গেলো সারা ...য়ে, প্রথম প্রেমিকার মতো গায়ের কাছে ...সে এলো রাত্রি, আমি হাতের ওপরে ...থা রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম।

শুয়ে দেখলাম এক আকাশ তারা ...টেছে আজ। রোজই ফোটে, কিন্তু রোজ ...া দেয় না। আজ আলো নিভে যেতে ...প্রদীপ প্রহরে আকাশের সব তারা সুযোগ ...য়ে বেরিয়ে এসেছে। ওই তো মধ্য ...কাশ ছাড়িয়ে পশ্চিমের দিকে [illegible] ...ড়েছে কালপুরুষ [illegible] করছে [illegible] ...মানবমন্ডলী। [illegible] ...থ মেলে তাকিয়ে, নিচে ধবক ধবক করে জ্বলছে নিয়োন। একগুচ্ছ আঙুরের মতো ঝুলে রয়েছে লঘুসপ্তর্ষি। সমস্ত আকাশটা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, জিজ্ঞাসা করছে—এতদিনে সময় হলো? এতদিনে?

আমি মনে মনে নক্ষত্রের নিচে হাঁটু গেড়ে বসলাম। দু হাত জোড় করে মার্জনা চাইলাম প্রকৃতির কাছে।

উত্তরে বিরাট আকাশ চুপ করে তাকিয়েই থাকলো, ক্রোধ-অক্রোধ প্রেম অপ্রেম কিছুই ব্যক্ত করলো না।

খুব ছোটবেলায় এর শুরু। পিতৃহীন একমাত্র সন্তান, স্বাস্থ্য ভালো ছিলো না—ঘান ঘন ব্রংকাইটিসে ভুগতাম। জ্বরে পড়তাম প্রায়ই। সুস্থ থাকলেই বা কি? কোনো খেলাই ভালো খেলতে পারিনি কোনোদিন, পাড়ার ছেলেরা আমাকে দলে নিতো না। নানারকম বই পড়ে কাটতো আমার সময়। মা একবার একসেট শিশু-ভারতী আনিয়ে দিয়েছিলেন। প্রত্যেক খণ্ডে আকাশের কথা বলে একটা চ্যাপটার ছিলো। রাত্রের আটটার সময় দাদুর কাছে বাড়ির পড়া শেষ হয়ে গেলে হ্যারিকেনের আলোয় অবাক হয়ে গ্রহ-নক্ষত্রের কথা পড়তাম। কোথায় গভীর মহাকাশে তীব্র গতিতে ভ্রমণ করছে ধূমকেতুর দল সৃষ্টি হচ্ছে নতুন বিশ্ব, বিশাল অ্যান্ড্রোমিডা নীহারিকা ধীরে চলেছে নিজের অক্ষের [illegible] আছে রোজই চন্দ্র গ্রহণ হয় সেখানে।

একটু একটু করে পড়তাম আর দৌড়ে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে একবার আকাশটা দেখে আসতাম। কে জানতো আকাশে এতবড় একটা কর্মকাণ্ড চলেছে! তার চেয়েও বড়ো কথা মহাজাগতিক দূরত্বের হিসেবটা আমাকে বেশি করে আবিষ্ট করতো। মাইল সেখানে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, আলোর গতি দূরত্ব গণনার মাপকাঠি। বসে বসে ভাবতাম—আচ্ছা, যদি আরো দূরে চলে যাই, সেখানে কি দেখতে পাবো? আরো আরো দূরে? মাথা ঝিমঝিম করতো, শরীর অবশ হয়ে আসতো।

এই সময়ে আমার হাতে পড়ে আইভ্যান পেরেলম্যানের ছোটদের জন্য লেখা একখানা জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই। কিভাবে নিজের কৈশোরে পেরেলম্যান টিফিনের পয়সা জমিয়ে একটি দূরবীণ কিনেছিলেন, পোস্টম্যানকে দূরবীণের পার্সেল নিয়ে আসতে দেখে তিনি কেমন করে লাফিয়ে দৌড়ে গিয়েছিলেন—এইসব পড়ে আমিও একটা দূরবীণ কেনার জন্য ক্ষেপে উঠলাম। তখন ক্লাশ এইটে পড়ি—আনাচারেক পয়সা দাদুর কাছ থেকে দৈনিক বরাদ্দ। তাই জমাতে শুরু করলাম এবং শুরু করেই বুঝলাম সামনে দুস্তর সমুদ্র— চার আনার খেয়ায় পাড়ি দেওয়া যাবে না। ফলে অসদুপায়েও কিছু কিছু উপার্জন শুরু করলাম। কিন্তু তহবিল বিশেষ স্ফীত হয়ে উঠলো না। হিসেব করে দেখলাম এই হারে সংগ্রহ হলে আমার সম্পূর্ণ আয়ুষ্কালের ভেতর কুলোবে কিনা সন্দেহ। তাছাড়া দূরবীণের দামই বা কতো? বন্ধু-বান্ধবদের জিজ্ঞাসা করলাম, তারা এ বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করতে পারলো না।

এমন সময়ে কি একটা কাগজে ইনস্ট্রুমেন্ট রিসার্চ ল্যাবোরেটরীর বিজ্ঞাপন দেখলাম। তারা কম দামে দূরবীণ তৈরি করছে বলে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। স্ট্যান্ড ইত্যাদি নিয়ে মাত্র তিনশো টাকা।

মাত্র তিনশো টাকা! ভেবেছিলাম ক'হাজার টাকা না জানি লাগে। ঠিক সময়ে এরা বিজ্ঞাপন দিয়েছে তো!

ঠিকানা বৌবাজারের। জীবনে কখনো একা কলকাতা যাইনি এর আগে। যাই হোক সে পরে দেখা যাবে। গোটা পঞ্চাশ টাকা জমিয়েছিলাম— সে যে কি আত্মবঞ্চনা করে জমানো! ইস্কুল থেকে ফেরার পথে হজমি-গুলির দিকে তাকাইনি নতুন ডিটেকটিভ বইয়ের বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে শুকতারাতে, আমি না দেখার ভান করে পাতা উলটে গিয়েছি। গরমের বিকেলে বাড়ির সামনে রাস্তা দিয়ে কুলপিওয়ালা হেঁকে গিয়েছে আমি মুঠো শক্ত করে কাঠ হয়ে থেকেছি। এভাবে পঞ্চাশ। বাকিটার জন্য এবারে রীতি-মত অফিস সত্যাগ্রহে শুরু করলাম। ভালো করে খাই না মেজাজ খিটখিটে করে রাখি। বইপত্র যেখানে সেখানে ছড়িয়ে

রাখি, সর্বদা খুঁতখুঁত করি। হাফইয়ার্লি পরীক্ষার রেজাল্টও খারাপ হলো। এই শেষের ব্যাপারটার জন্য অবশ্য আমাকে বিশেষ আয়াস করতে হয়নি—কার্যকারণ সম্পর্কের ফলে হয়ে গিয়েছিল।

এই কার্য পরম্পরার শেষ পর্যায় সহজেই অনুমেয়। বাকি টাটা আমার হাতে এলো। প্রাণের বন্ধু দীপ্তাংশুকে নিয়ে একদিন কোলকাতার গাড়িতে চেপে বসলাম। শহরতলীতে তখনো ইলেকট্রিক চালু হয়নি।

অনেক খুঁজে বৌবাজারে কোম্পানির অফিস বের করলাম। টাকমাথা কেরাণীবাবু হেসে বললেন —এটা শুধু শোরুম, কিনতে হলে তোমাদের টালিগঞ্জে কারখানায় যেতে হবে। এখানে বিক্রি হয় না।

ঠিকানা নিয়ে চলে আসছি কেরাণীবাবু পেছন ডাকলেন, শোনো।

দাঁড়িয়ে বললাম, কি?

আমার হাফপ্যান্ট পরা মূর্তির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে উনি বললেন, তুমি কি সত্যিই দূরবীণ কিনবে?

—কিনবো তো।

—পয়সা আছে?

উত্তরে বুকপকেট থেকে তিনটে একশো টাকার নোট বের করে খচমচ শব্দ করে করে গুনিয়ে দিলাম।

আনোয়ার শা রোডে ফ্যাকটরী। ম্যানেজারবাবু খুব ভালো ব্যবহার করলেন। ইস্কুলের ছাত্র এবং টিফিনের পয়সা জমিয়ে এসেছি শুনে উনি আমাকে দশ পার্সেন্ট কমিশন দিয়েছিলেন মনে আছে আজও।

দূরবীন কিনে পথে বেরিয়ে আমার সবৎস মেনীবেড়ালের মতো মনের অবস্থা হলো। সবাই যেন আমার দূরবীনটা কেড়ে নেবার জন্য আজ পথে বেরিয়েছে। বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে ট্যাকসি চড়ে শেয়ালদা, সেখান থেকে জীবনে প্রথম ফার্স্ট ক্লাসে চেপে বাড়ি। পয়সা বেশি লাগে লাগুক, কিন্তু এ অমূল্যধন নিয়ে আমি কিছুতেই ভিড়ের কামরায় উঠবো না।

পরিষ্কার মনে আছে, সেদিন ছিল শুক্লপক্ষের নবমী। বেশ ঝকঝকে চাঁদ উঠেছে আকাশে। ছাদে সন্ধ্যেবেলা স্ট্যাণ্ডে দূরবীন লাগিয়ে আইপিসে চোখ রাখলাম। লক্ষ্য চাঁদ।

প্রথমটা সব ঝাপসা। তারপর এ্যাডজাস্টিং নব ঘোরাতে ঘোরাতে হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠলো চাঁদের শরীর। ওই যে চাঁদে পাহাড়, শুকনো সাগর—সূর্যের আলো উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে সবকিছু। আমার প তখন আনন্দে শিউরে উঠেছে।

আইপিস থেকে চোখ সরিয়ে একবা চারদিকে তাকালাম।

নাঃ, সবই দেখছি একরকম রয়েছে বাস-লরী ছুটে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে, রোজ কার মতো কোলকাতা-ফেরত যাত্রীদে আশায় স্টেশনের চত্বরে ফুচকাওয়ালা গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খাচ্ছে, পাঁচকড়ি দোকানে তেল-নুন কিনছে খদ্দেররা হায়! বড়ো অভাজন এরা। আজকের দি বেচারীরা চাল-ডাল-ম... কিনে সময় ন করছে। জানে না আমি এখানে সত্যিকারে একটা দূরবীণ দিয়ে চাঁদ দেখছি। জানলে দৌড়ে আসত ওরা, পথে থেমে যেতো লরী বাস-রিকসা—সবাই নেমে পড়ে দৌ আসতো ছাদে— খোকা, তোমার দূরবীনে ভেতর দিয়ে আমাদের একটু তাকাতে দেবে একবারটি?

স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কেটে গেলো পবি কৈশোর। রাশি রাশি বই পড়তাম, ঘুরে বেড়াতাম মাঠে ঘাটে, বাঁশের বনে। নানা রকম বন্য গাছপালার পাতা সংগ্রহ করা সখ হয়েছিলো একবার। এ ব্যাপারে আমা সহমর্মী ছিলো মুকুল— একই ক্লাসে পড়তাম। হাতে দূরবীণ, কাঁধে পাতা ও ফল রাখবার ঝোলা ব্যাগ, ধুলিধুসরি পা —আমরা দু-জনে সারাদিন কাঁহা কাঁহা মুল্লুক ঘুরে বেড়াতাম। একবার খবরে কাগজে বেরুল, সূর্যের গায়ে নাকি কয়েকটা কলংক দেখা দিয়েছে, সূর্যাস্তের সময় তে কম থাকে, তখন খালি চোখেও দেখা যাচ্ছে

মুকুল আর আমি ব্যস্ত হয়ে ...ম। সৌরকলঙ্ক বলে কথা! আবার দেখা দেবে কে জানে। এ সুযোগ ... নয়। খালি চোখেই বা দেখতে যাবো ... দুঃখে? আমাদের বুঝি দূরবীণ নেই?

কিন্তু শহরের ভেতরে কোনো দিগন্ত ...। ছোটো শহর বটে, তবু বাড়ি-ঘরে ...ন্তের কাছে আকাশ ঢাকা পড়ে গিয়েছে। ...্যাস্ত যাবার সময় দেখা যায় না। ঠিক ...লাম আমরা মোহনপুরের বিল পেরিয়ে ...পাশে চলে যাবো। সেখান থেকে দেখবার ...বিধে হবে।

একদিন দুপুরে দূরবীণ হাতে গেলাম ...কুলের বাড়ি। তারপর দু-জনে মিলে ... পেরিয়ে হেঁটে এলাম বিলের পাড়ে। ...ংকর জেলের নৌকো চেয়ে নিয়ে বিল পার ...লাম। ওপারে ধু ধু করছে মাঠ, এখানে ...খানে শুকনো কচুরীপানা পড়ে রয়েছে, ...ষ্টি হলে জল এই পর্যন্ত উঠে আসে।

ঠিক সূর্যাস্তের সময় মাঠে উপুড় হয়ে ...য়ে দূরবীনে চোখ দিয়ে দুই বন্ধুতে সৌরকলঙ্ক দেখেছিলাম মনে আছে। আমাদের শরীর ছাড়িয়ে উঠেছে কালকাসুন্দে গাছের ঝোপ, হাওয়ায় দোলায় তার শুকনো বীজাধার ঝুমঝুমির মতো বাজছে। পালা ক'রে মুকুল আর আমি আইপিসে চোখ রাখছি। অপার শান্তি ছড়িয়ে আছে মাঠে মাঠে।

অনেকদিন অবধি আমাদের এই অবস্থা চলেছিলো। রাত্তিরে ঘুমোতে পারতাম না, শুয়ে শুয়ে ভাবতাম যেন মহাকাশযানে করে শূন্যের ভেতর দিয়ে ভেসে চলেছি। আমাকে নিয়ে আমার খাটটা যেন ছাদ ফুঁড়ে উধাও হয়ে বেড়াতো নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে। মাথার মধ্যে ডারুইন, অলিভার লজ, এডিং-টন, আর্থার সি ক্ল্যার্ক, সব ঘুরপাক খেত। তখন সবে রাসেলের এ বি সি অফ রিলে-টিভিটি-তে দাঁত বসাবার চেষ্টা করছি—রাত জেগে আইনস্টাইনের মতবাদ এবং অন্য গ্রহে প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাব্যতা ইত্যাদি নিয়ে তুমুল বিতর্ক হতো মুকুলের সঙ্গে। যত কম বুঝি ততই উৎসাহ বাড়ে।

একবার দীঘা বেড়াতে যাবার পথে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখেছিলাম। হাউর-কেলা এক্সপ্রেসে চেপে চলেছি। রাত প্রায় দেড়টা। গাড়িতে খুব ভিড়। ভেতরে গুঁতোগুঁতি না করে আমি আর মুকুল যেদিকে প্ল্যাটফর্ম পড়ছে তার উলটো-দিকের দরজায় বাইরে পা ঝুলিয়ে বসে আছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই খড়গপুর আসবে। হঠাৎ আমাদের বিস্মিত চোখের সামনে সমস্ত আকাশে দীর্ঘ নীল রেখা টেনে সামনের মাঠে একটি বিশাল উল্কা এসে পড়লো। উল্কা সচরাচর আকাশেই বাতাসের ঘর্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, নিতান্ত বড় না হলে মাটি পর্যন্ত পৌঁছয় না। আমরা সত্যিই এতবড় উল্কা পড়তে দেখিনি এর আগে। মাটিতে পড়ার আঘাতে নীলচে স্ফুলিঙ্গ ছিটকে উঠলো দেখলাম। মুকুলকে ধরে রাখা কঠিন হলো, চলন্ত ট্রেণ থেকেই নেমে যায় আর কি। পরের তিন-চারদিন ও কেবলই হায় হায় করলো—কোথায় মাঠের ভেতর পড়ে রইলো রে ওটা! গেঁয়ো লোক লাঙল দিতে এসে পাথর ভেবে ঠেলে সরিয়ে দেবে একদিকে। যদি কুড়িয়ে আনতে পারতাম।'

কৈশোর ও প্রথম যৌবনের সুগন্ধি বছরগুলো এভাবেই কেটে গেলো। কেটে গেল হেমন্তের মাঠে মাঠে বেড়াবার দিন, মাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের দিন। কর্ম-জীবনের রূঢ় আলো চোখে লেগে চমকে উঠলাম—এ জীবন তো আগে দেখিনি। এখানে কেউ কাউকে ক্ষমা করে না, সামান্য ভুল শুধরে নেবার সময় পাওয়া যায় না। এখানে প্রিয় বন্ধুরা চলে যায় দূরে, যাদের সঙ্গে দু-বেলা দেখা না হলে আহার পরি-পাকের ব্যাঘাত ঘটতো, এখন তাদের সঙ্গে বছরে একবার দেখা হয়।

আর সেই সর্বনেশে চিন্তাটাও আছে বই কি!

বড় হতে হবে—দশজনের একজন হতে হবে। অন্য অনেককে ছাড়িয়ে ওঠার দুরন্ত প্রয়াসে আমার সময় কই মোহনপুরের মাঠে বেড়াতে যাবার? কোথা দিয়ে বসন্ত কাটে, যাযাবর কোকিলের দল গান শেষ করে স্বদেশে উড়ে যায় ফের। আমার কৈশোরের প্রান্তরে ঈষত্তপ্ত বাতাস বয় সারাটা বিকেল ধরে, ঝুমঝুমির মতো বাজে কালকাসুন্দের শুকনো বীজাধার! আমি তখন পড়বার ঘরে দরজা এঁটে বড় হবার সাধনায় মগ্ন থাকি।

হঠাৎই আলো জ্বলে উঠলো। লোড্‌-শেডিং শেষ। একটা নিঃশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে নিচে চলে এলাম।

আচ্ছা, দূরবীণটা কোথায় রেখেছি আমি? হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কাচে দাগ লাগবে এই ভয়ে আইপিস্‌ আর মিররটা খুলে কাগজে মুড়ে সরিয়ে রেখে-ছিলাম। খালি চোঙাটা কেবল পড়ে আছে আলমারীর মাথায়, অনেকদিন হাত দেবার সুযোগ হয়নি।

নিচে এসেই আলমারীর মাথাটা হাত-ড়াতে শুরু করলাম। পুরণো খবরের কাগজ, ছেঁড়া নেকড়া, প্রচুর ধুলো এবং ইঁদুর ও আরশোলার অপকীর্তির ভেতরে তার বিষণ্ণ অস্তিত্ব নিয়ে পড়ে আছে আমার দূরবীণ—যার জন্য এক সময় আমি দিনের পর দিন জলখাবার খাইনি, ঘুমিয়ে যার স্বপ্ন দেখতাম একসময়।

ধুলো পড়ে পড়ে ব্যারেলের কালো চকচকে পালিশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে, দেখে মনটা কেমন করে উঠলো। ধুলো ঝাড়বার জন্য তুলতে গেছি, চোঙের ভেতর থেকে একটা টিকটিকি ধড়ফড় করে বেরিয়ে পালিয়ে গেল। আহারে, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কয়েকটা বছরের সঙ্গে যে এ জড়িত—তার এই দশা! খালি ব্যারেল, দু-দিকেরই কাচ খোলা। ভেতরে আরো টিকটিকি লুকিয়ে আছে কিনা দেখবার জন্য চোঙটা তুলে চোখে লাগালাম।

আশ্চর্য। কাচহীন দূরবীণের ওপাশে আমার ঘরের আসবাব তো চোখে পড়ছে না। এ কি দেখছি আমি। ওদিকে ফুটে উঠেছে একটি ঘাসেভরা মাঠ— সে মাঠে এখন বিকেল। দূর দিগন্তে নিবিড় বাঁশের বন সবুজ হয়ে আছে। সেই মাঠ দিয়ে কে একজন কিশোর হেঁটে চলে যাচ্ছে দূরে, তার বগলে দূরবীণ। ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছে সে। এই কিশোর আমার খুব পরিচিত, আমি ওকে চিনি।

বনবিবি উপাখ্যান

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

চার

সূর্য অস্ত যাওয়ার পরও ডিমের কুসুমের মতো কিছু আলো ছড়িয়ে ছিল চার পাশে। সন্ধ্যা নামছে। পাখিরা সব ফিরে আসছে আশ্রয়ে। জঙ্গলের দিক থেকে ভুতুড়ে এক অন্ধকার হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসছে কাছারির দিকে।

কাছারির বারান্দায় কাঠের একটা চেয়ার। চেয়ারে অলসভাবে বসেছিলেন দয়াল ঘোষ। ভেড়ির দিকে চার-পাঁচজন লোক কাঠের গুঁড়ি জড় করে আগুন জ্বালাতে ব্যস্ত। কাছারির পেছন দিকে বনের কাছাকাছিও আগুন জ্বালান হয়, ওদিকেও হয়তো কেউ-না-কেউ আগুন জ্বালাতে চলে গেছে। আগুন জ্বালিয়ে আসার কথা কাউকে মনে করিয়ে দিতে হয় না। আত্মরক্ষার এত বড় অস্ত্র আর বোধ হয় দুটি নেই।

কাঠুরেদের ঝুপড়ি ঘরগুলো পাশে গোঁয়াও গোঁয়াও করে কে যেন সারেঙ্গি নিয়ে বসেছে। শব্দটা শুনতে পাচ্ছিলেন দয়াল ঘোষ। আর একটু পরে একটা ঢোলের শব্দও শোনা যাবে। তারপর গভীর রাত অবধি বেতালে বেসুরো গান গাইবার চেষ্টা চলবে। কয়েকজন তো পাড় মাতাল, ওদের গান ফানের নেশা নেই, মদাপ হয়ে অনেক রাত অবধি নাটক রচনা করবে এপাশে ওপাশে। রাতে ঘরে শুয়ে শুয়ে ওদের হুল্লোড় শুনতে পান দয়াল ঘোষ।

সারাদিনে আজ নাম মাত্র কাজ হয়েছে। কাজের চেয়ে উত্তেজনা আর কথাই বেশি। প্রশ্নের আর শেষ নেই। একা একা ডিঙি করে যে এল, সে কি কোন উদ্দেশ্য না নিয়েই এসেছে! সে কি কেবলমাত্র তার মুখখানা দেখিয়েই চলে যাবে! অসম্ভব, এ রকম যদি ভেবে থাকো, ভুল ভাববে।

—কি উদ্দেশ্য নিয়ে আসতে পারে?

—কি উদ্দেশ্য! রজনী এমনভাবে বুঝিয়েছে, যেন বিপদ-আপদ যা হওয়ার তা হয়েই গেছে। এখন আর কারো বাঁচার উপায় নেই।

এ সব কথা শুনতে কারই বা ভালো লাগে! মুখগুলো কেমন ফ্যাকাসে হয়ে যায়। এ অবস্থায় জঙ্গল কাটার কথা আর মাথায় থাকে না। একটু খুলেই বল না রজনীভাই? উৎকণ্ঠায় সবাই ছেঁকে ধরেছিল রজনীকে।

রজনী আমতা আমতা করে বলেছিল, বলি কি করে! নুন খাই যার তার গুণ না গেয়ে কি উপায় থাকে। শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে কোন শুভ কাজই করি না কেন, তার কতগুলি রীতি আছে। রীতি যে না মানে তার ওরকমই হয়।

—কি রকম?

—একটু খোলাখুলি বলছ না কেন, রজনীভাই? আমরা সব মুখ্যসুখ্য মানুষ। প্রাণ খোয়াব শেষটায়।

রজনী বলল, তার আগে তোদের সবাইকে একটা প্রশ্ন করি, আচ্ছা, এই যে তোরা কুড়ুল নিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বন পরিষ্কার করছিস, বলতো এই বন-জঙ্গল কার?

—কার মানে! প্রশ্নটা কেমন রহস্যময়। তবু একজন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করল, কেন, চৌধুরীদের।

—ঐ রকম জানলেই হয়েছে আর কি! ঐ জন্যই তোরা আজ এখানে এসে এত কষ্ট সহ্য করছিস।

সবাই কেমন হকচকিয়ে গেল।

রজনী বলল, আমি জানতু[illegible] আসলে এ বন-জঙ্গল যার তার কথা [illegible] বেমালুম ভুলে যাবি। এই [illegible] আকাশ, এ সবই হচ্ছে বনবিবির। বন[illegible] বিবিকে খুশী না করে বনের গায়ে [illegible] চালালে এ রকমই হয়।

বিশু মিঞা বলল, ডিঙিতে [illegible] সত্যি সত্যি বনবিবি এসেছেন, আ[illegible] বুঝছি কি করে?

—মেয়েটার যদি মুখ দেখা[illegible] তা হলেই বুঝতে পারতিস। আসলে [illegible] ছদ্মবেশী।

—তবে ঈশান ওখানে থাকছে [illegible] করে?

রজনী জ্ঞানবৃদ্ধের মতো তা[illegible] বশ করেছে ওকে। বশ করা বুঝিস[illegible]

বশ করা না বোঝার কোন কা[illegible] নেই। মকবুল মুখ খুলল, আর তো[illegible] ধারণা যদি মিথ্যে হয় রজনীভাই?

তা হলে দাদা ছেড়ে নাকে [illegible] দিতে দিতে চলে যাবো।

এরপর আর অবিশ্বাস করার কিছু থাকে না। তবু ঈশানই যেন কিছু উলটো খাতে বয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি [illegible] করে রেখেছে ওদের মধ্যে। সন্দেহ [illegible] যদি কিছু হয় ঈশানেরই হবে স[illegible] আগে। আর যদি না হয়, ঈশানই প্র[illegible] করে দেবে রজনী ভুল।

সারেঙ্গী বাজোচ্ছিল জগন্না[illegible] জগন্নাথকে ঘিরে ছোট্ট একটু [illegible] দয়াল ঘোষ দেখছিলেন, ওপাশে ঝা[illegible] ঝুপড়িগুলোর পাশে কাঠে উনোনে [illegible] নিয়ে ব্যস্ত নিশিকান্ত। উঠোনের [illegible] মাঝখানে একটা খুঁটি পোঁতা। মকব[illegible] একটা পেট্রোম্যাকস জ্বালিয়ে সেই খুঁটি ঝুলিয়ে দিয়ে গেল। সকালবেলা [illegible] আলোর নিচে ঝিন ঝিন করবে পো[illegible] মতো।

রজনী আজ সারাটা দিন এ[illegible] আড়ালে আড়ালে কাটাতে চাইল দয়[illegible] ঘোষের। গোপনে গোপনে সারাদিন [illegible] কি ষড়যন্ত্র করছে কে জানে!

দয়াল ঘোষ ডাকলেন, মকবুল!

মকবুল আলো ঝুলিয়ে দি[illegible] সারেঙ্গীর দিকে এগোচ্ছিল, থম[illegible] দাঁড়াল, আজ্ঞে!

—এদিকে আয়! রজনী কোথা[illegible] রে?

মকবুল এগিয়ে এল, এদিকই[illegible] কোথাও আছে দয়ালবাবু।

—সারাটি দিন তো আজ মু[illegible] গোমড়া করে কাটালি। কেবল গুজগু[illegible] আর ফুসফুস। কি যে আমি অন্যা[illegible] করেছি কে জানে।

মকবুল মাথা নিচু করে দাঁড়িয়[illegible] থাকল।

—তা, এই সন্ধেবেলাটাও কি ...র মতো কাটাতে চাইছিস? এই—

মকবুল চোখ তুলে তাকাল। দয়াল- যেন কিছু একটা নতুন প্রস্তাব ...ত চান।

—আমি বলছিলাম, জগন্নাথকে না। এই দাওয়ায় বসেই জমিয়ে গান- না হোক!

মকবুল গান-বাজনার ব্যাপারে বরা- ... উৎসাহী। সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমি ...র এক্ষুনি ডেকে আনছি আজ্ঞে!

—তাই আন। একা একা আর ...ক্ষণ ভালো লাগে বল তো!

মকবুল সরল সিধে মানুষ। জগ- ...থকে টানতে টানতে নিয়ে এসে হাজির ...। কান টানলে যেমন মাথা আসে, ...মনি এসে হাজির হল অনেকেই। লেংটে ...তনা আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা গাঁজা টেনে ...গড়ি যাচ্ছিল একটা ঘরে, মকবুল গিয়ে এসে হুমকি ছাড়ল, এই শালারা, ... গান-বাজনা হবে। আয়।

—কে গাইবে? হি হি করে হাসল ...টে চৈতন্য।

মকবুল বলল, উঠে আয়, দেখতে ...বি।

যতীনরা সূর্য ডোবার আগ থেকেই ...াই গিলতে শুরু করেছিল, টলতে টলতে এগিয়ে এল, গান ফান করে কি লাভ! তার চে এসে আমাদের সঙ্গে বসে ...ড় দেখি! এসো।

মকবুল হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে এল।

দয়াল ঘোষ এক পাশে একটু জায়গা দিয়ে সরে বসলেন।

গোল পাতা বিছিয়ে তার উপর বসে পড়েছে জগন্নাথ। সারেঙ্গীটার দুর্দশার আর অন্ত নেই। তবু ঐ যন্ত্রটা থেকেই আশ্চর্য সুন্দর একটা শব্দ বেরুচ্ছে। একটা চ্যাপটেপে ঢোল নিয়ে বসেছে প্রাণকেষ্ট। মকবুল এগিয়ে এল।

দয়াল ঘোষ বললেন, রজনীকে দেখছি না? রজনী কোথায়?

রজনীর দেখা পাওয়া গেল আরো কিছুক্ষণ পরে। ভেড়ির কাছে আপনমনে ধারে ঘুরে ঘুরে করছিল রজনী। দাঁতো চালে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে এল।

দয়াল ঘোষ বললেন, একা একা এই সন্ধেবেলা ঘুরে বেড়ানটা কি ভালো হচ্ছে রজনী?

রজনী হয়তো চোখে মুখে বিরক্তি প্রকাশ করল, তবু দয়াল ঘোষ পরিস্থিতিটা সহজ করার জন্য হেসে বললেন, অত ব্যাজার মুখে থাকার কি হয়েছে! যদি কিছু অন্যায় করে থাকি সরাসরি বল না! তা ছাড়া নৌকাটাকে আমি আটকে রাখি নি। তোরাই আটকেছিস।

রজনী এবার উত্তর না দিয়ে পারল না, আমরা নই, ঈশান।

—হোক ঈশান। আমি বলি নি ঈশানকে। ঈশানের বিবেক আছে, ও জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে।

নৌকার প্রসঙ্গ আসায় সারেঙ্গীটা থেমে গেল। সবাই নতুন কিছু শোনার জন্য যেন থমকে গেছে। খানিকক্ষণ শব্দহীন স্তব্ধ অবস্থা।

মকবুলেই কথা বলে আবার যেন সচল করল সবাইকে, একটা কথা বলব দয়ালবাবু?

—আলবাত বলবি! মনের মধ্যে গুমরে না মরে, যা বলতে চাস খোলাখুলি বল!

—আজ্ঞে, আমাদের সবার ইচ্ছে বনবিবির একটা পুজো হোক!

—হাঁ দয়ালবাবু, বনদেবীকে পুজো না করলে আমাদের কারো মঙ্গল হবে না।

দয়াল ঘোষ মুখগুলির দিকে তাকালেন। অন্ধকারে রহস্যময় সব দৃষ্টি। পোড়খাওয়া। হেসে বললেন, বেশ তো, সবাই চাইলে হবে বই কি!

রজনী বলল, সবাই চাক না চাক, সেটা বড় কথা নয়। বনদেবীর পুজো না করে বনের ভিতর ঢোকাই আমাদের অন্যায় হয়েছে।

—বললাম তো, হবে পুজো। আমি কালকেই কলকাতায় খবর পাঠাচ্ছি। জবাব এলেই ঘটা করে পুজো হবে।

লোকগুলোর মধ্যে গুনগুন করে রব উঠল। দয়াল ঘোষও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এতক্ষণ যেন হাতের বাইরে চলে গিয়েছিল লোকগুলি, আবার উনি মুঠোর মধ্যে তুলে নিতে পেরেছেন।

সারেঙ্গীতে আবার ছড় বোলাতে শুরু করল জগন্নাথ। কে যেন বেসুরো গলায় গানের একটা কলি টেনে বসল, ও চামেলী, যুঁই শেফালি—

কিন্তু গায়ক নয় বলেই হঠাৎ থেমে গিয়ে হেসে উঠল।

লেংটে চৈতন্য টলতে টলতে উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। কোমর দোলা দিয়ে এক পাক নেচে উঠল, চালাও পানসী—

মকবুলের বেশ মজা লাগছিল। সন্ধ্যাটা একটু একটু করে এবার থেকে জমতে শুরু করবে। বনদেবীর পুজো করলেই যদি মঙ্গল হয়, আর তাতেও যখন আপত্তি নেই দয়াল ঘোষের, তখন আর ভাবনা কি। রজনীর দিকে তাকাল। রজনী একটা খুঁটির গায় হেলান দিয়ে বসে পড়েছে।

—তা হলে একটা কাজ কর না। দয়াল ঘোষ রজনীর দিকে তাকালেন।

রজনী জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল, বলুন।

—বনদেবী সম্পর্কে গানটান জানা থাকে তো তাই হোক না।

জগন্নাথ আবার একবার সারেঙ্গী থামাল, কেউ গাইতে জানলে তো গাইবে। সব শালা লবণ চোর।

মকবুল উঠে দাঁড়াল. ঠিক আছে, আমিই গাইব।

ঢোল নিয়ে বসেছিল যে, সে ডুম ডুম করে বার দুয়েক ঢোলে শব্দ করে প্রশ্ন করল, কি গাইবে?

—দেহতত্ত্ব গাইব।

—দেহতত্ত্ব। লোকটা আবার ডুম ডুম করে দুবার শব্দ তুলল ঢোলে, দেহতত্ত্ব।

মকবুল ওকে আমল দিল না। চোখ বুজল, তারপর বাঁ হাত কানে চেপে, ডান হাত ঈষৎ সামনে ছড়িয়ে গান ধরল,

প্রভু, তোমার আজব কারখানা
জলের ভিতর আগুন জ্বলে
জাদুই আটখানা।

হয়তো যথাযথ গানটি ওর মনে পড়ছিল না। এমনিভাবে দশজন লোকের সামনে একদিন ওকে গাইতে হবে জানলে পুরো গানটা ও শিখে রাখত। গানটি হঠাৎই যেন ওর মনে পড়ে গিয়েছিল, শুনেছিল এক বাউলের মুখে। একতারা বাজিয়ে লোকটা মনের আনন্দে গেয়ে গেয়ে হাঁটছিল। শুনতে শুনতে উদাস হয়ে গিয়েছিল মকবুল। তেমন করে গাইতে জানলে এই একখানা গানেই ও দয়াল ঘোষকে মাত করে দিতে পারত।

গানটাকে ও হাতড়াতে শুরু করল।

প্রভু, তোমার আজব কারখানা
জলের ভিতর আগুন জ্বলে
জাদুই আটখানা

—কি রকম জাদু, সেটা শোনাও! প্রাণকেষ্ট ঢোলে আবার কাঠির ছড়রা টানল।

কিছুতেই গানের পরের কথাগুলো মনে আনতে পারছিল না মকবুল। চর্চা না থাকলে যা হয়। হেসে মাঝখানে গান থামিয়ে দয়ালবাবুর দিকে তাকাল।

জগন্নাথ ঘাড় গুঁজে তখনো ছড় টেনে চলেছে সারেঙ্গীতে। অনেকটা ঘাড়-বিহীন শুয়োরের মতো মনে হচ্ছে ওকে। সমঝদার কেউ থাক আর নাই থাক, ওর নিজেরই খুব ভালো লাগছিল। খুব একটা খেমটা গোছের তালের বাজনায় ও মেতে উঠল।

ঢোলটা বড় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ দীননাথ উঠে দাঁড়িয়ে ঢোলআলাকে ধমকে উঠল, এটা হচ্ছে কি প্রাণকেষ্ট, ঢোল যে তোর চিংড়িমাছের মতো লাফাচ্ছে।

প্রাণকেষ্ট দমবার পাত্র নয়, হেসে ডুম ডুম করে দুবার ঢোলে শব্দ তুলে দীননাথের দিকে তাকাল, এখন বুঝি তোমার গান হবে?

দীননাথ মূল গায়েনের মতো ভঙ্গি করল, তা তোর চেয়ে আমি খারাপ গাইব না।

—বটে বটে! প্রাণকেষ্ট উঠে দাঁড়াল ঢোল হাতে। তারপর ঢোলের গায়ে একবার

কপাল ছোঁয়াল, দয়াল ঘোষের দিকে মাথা নীচু করে একবার প্রণাম জানাল। তারপর তিরিক্ষি কবিয়ালের ঢোলকের মতো সে শুরু করল, বলি ওহে দীনু ওস্তাদ। ভারী তো গাইতে নেমেছ আসরে। এই অধম একটা পরস্তাব রাখতে চায়। অনুমতি দাও তো বলি। ডুম ডুম।

দীননাথ কেন, সবাই বুঝল, সভার মাঝে একটা প্রশ্ন রাখতে চায় প্রাণকেষ্ট। মকবুল বসে পড়ল। দেহতত্ত্বটার মাথামুণ্ডু ছাই আর কিছুই ওর মনে এল না।

দীননাথ কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। সভার রীতি-নীতি মূল গায়েনরা যেভাবে মানে, সেইভাবেই ও পাকা ওস্তাদের মতো মুখ দিয়ে কেবল একটা শব্দ উচ্চারণ করল, হুঁ। কি তোমার প্রস্তাব?

—বিচার করে দেখাও দেখি দীনু ওস্তাদ। ডুমডুম

—হুঁ।

—বিচার করে দেখান দেখি সভাসদ ভক্তবৃন্দ। ডুম ডুম।

—হুঁ।

—গণ্যমান্য সভাপতি।

—হুঁ।

—বিচার করো সামান্য একটা প্রশ্ন, আকাশ মাটি চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র স্বর্গ মর্ত—প্রাণকেষ্ট আবার ডুম ডুম করে শব্দ তুলে দীননাথের দিকে তাকাল।

—হুঁ।

সারেঙ্গীটা থেমে নেই। আবহ-সঙ্গীতের কাজ করছে। চোখে চোখে ফেটে পড়ছে কৌতুক। প্রাণকেষ্ট কি প্রস্তাব রাখতে চাইছে কে জানে। দয়াল ঘোষেরও কৌতুকের শেষ নেই। জায়গা বিশেষে দীননাথ, প্রাণকেষ্টর মতো লোকও যে মুখর হতে পারে চোখে না দেখলে যেন বিশ্বাসই করা যেত না।

প্রাণকেষ্ট আবার শুরু করল, তা চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র স্বর্গ মর্ত মিলে যে এই বিশ্ব সংসার এর কি কোন তুলনা আছে? ডুমডুম।

—নেই।

—এই যে বনের লতাপাতা ফুল ফল এর কি কোন তুলনা আছে?

—নেই।

—মানুষ, পশু, পাখি, পোকামাকড় জীবজন্তু এর কি কোন তুলনা আছে?

—নেই।

—এত সুন্দর সব সামগ্রী যিনি তৈরী করেছেন তিনি তবে কত সুন্দর? তার রূপ বর্ণনা কর দেখি দীনু ওস্তাদ। বুঝব তোমার ক্ষমতা।

ডুডুম ডুডুম, ডুডুম ডুডুম—বসে পড়ল প্রাণকেষ্ট। হাঁপাতে শুরু করল।

সারেঙ্গীর শব্দটা আবার গাঁক গাঁক করে উঠল। এখন সভার রীতি অনুযায়ী কিছুক্ষণ বাজনা হবে। বাজনার গমকটা থামলে দীননাথকে এবার মহান সৃষ্টি-কর্তার রূপের বর্ণনা শুরু করতে হবে। যুগ যুগ ধরে মুনি-ঋষিরা যাঁর স্তুতি গান গেয়ে শেষ করতে পারেনি, দীননাথের মতো অতি সামান্য একজন লোককে এখন সেই কাজটিই করতে হবে। কিছুটা যেন সমস্যাতেই পড়ে গেল দীননাথ। কিভাবে শুরু করতে হয় জানা নেই, কিন্তু আসরে যখন দাঁড়িয়েছে তখন পালিয়েও যাওয়া যায় না। অতি প্রাচীন কিছু পাঁচালি কথা ও আওড়াতে শুরু করল মনে মনে, কি দিয়া পুজিব রাঙা চরণ তোমার।

দয়াল ঘোষ সামনের ভেড়ির দিকে তাকিয়ে বসে ছিলেন। ভেড়ির গায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলি গড়িয়ে গড়িয়ে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। আগুনের ফুলকিগুলো উড়তে উড়তে কাছারি বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। আগুনটা যেন সম্মোহন করছিল দয়াল ঘোষকে। এমন সময় ক্ষীণ গানের কলি কানে আসতেই দীননাথের দিকে তাকালেন উনি। আগুন থেকে চোখ তুলে আনায় চোখে যেন ধাঁধা লেগে গেল। বিচিত্র একটা হলুদ রঙের মানুষের মতো দীননাথকে নেচে কুঁদে গান গাইতে দেখলেন উনি।

কি দিয়ে পুজিব রাঙা চরণ তোমার
গগনেতে জ্বলিতেছে দীপ উপাচার।
তুলসী দিয়া পুজিব যে
আছে কি উপায়
কাঠি পোকায় দিবারাত্রি
কুড়ে কুড়ে খায়।
পুষ্প দিয়া পুজিব যে
আছে কি উপায়
ভোমরা হেন অবোধ যত
দংশি দিয়া যায়।

দয়াল ঘোষ আবার চোখ তুলে আনলেন আগুনের দিকে। লকলকে জিহ্বা ছড়িয়ে আগুনের আস্ফালন কত।

দূর্বা দিয়া পুজিব যে
মানুষ হেঁটে যায়
দুগ্ধ দিয়া পুজিব যে
বাছুর আগে খায়।

সারেঙ্গীর শব্দটা সমস্ত স্নায়ুর মধ্যে গলে গলে পড়ছে। মাঝে মাঝে সচকিত হয়ে উঠছিলেন দয়াল ঘোষ। প্রাণকেষ্ট ঢোলের কাঠিতে যেন তাল রাখতে পারছে না। কিন্তু দমবার পাত্র নয়, তাল সামলে নিচ্ছে। রজনী তখনো কাঠের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে, যেন ঝিমুচ্ছে। মকবুল তাল ঠিক রাখবার জন্য মাঝে মাঝে যেন তালি কষে হুঁ হুঁ শব্দ কষছে। গানের কথাগুলো জব্বর মনে লাগছে ওর।

দয়াল ঘোষ আবার চোখ ফেরালেন। প্রথমে দীননাথের দিকে, ঝাপসা। হলুদ ছোপ ছোপ কিছু চোখের ভ্রম যেন।

ভ্রমই কি। নিঃসন্দেহ হবার জন্য জঙ্গলের দিকে তাকালেন। আর আশ্চর্য জঙ্গলের ভিতরে খানিকটা জায়গা জুড়ে বেশ ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। অথচ জ্যোৎস্না থাকার কথা নয়। জ্যোৎস্না কেবল-মাত্র ঐটুকু জায়গাতেই গড়িয়ে পড়ার কথা নয়। সারা দেহে কেমন এক শিহরণ খেলে গেল। দৃষ্টি ফেরাতে ভয় হল। ভয় হল একটু নড়াচড়া করলেই যেন এই জ্যোতিটুকু চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যাবে। চোখ ফেরাতে পারলেন না।

সমস্ত ইন্দ্রিয়কে এখন তীক্ষ্ণ করে ঐ জ্যোতির দিকে নিবন্ধ রাখলেন। আর আশ্চর্য মনে হতে লাগল, যেন বহুদূর থেকে ঢাকের শব্দ ভেসে আসছে। আরতির কাসর ঘণ্টা। মনে হতে লাগল, ধূপ ধুনোয় ষোড়শ উপাচারের পবিত্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে ওকে ঘিরে। আরাধ্য কোন দেবীর পুজোর আয়োজন চলেছে যেন কোথাও।

কোন সে দেবী। শিহরিত হচ্ছিলেন দয়াল ঘোষ। চোখের পলক ফেলতেও ভয়, মুহূর্তেই যেন হারিয়ে যাবেন উনি।

ঢাকের কাঠিতে ধুম উঠছে। ধূপের গন্ধে অনাবিল এক বিশুদ্ধতা।

সহসা মানুষের সমস্ত বিশ্বাস অবিশ্বাসের ঊর্ধ্বে এক অনির্বচনীয় ঘটনার সূত্রপাত।

দয়াল ঘোষ দেখলেন, এক শুভ্রবসনা দেবীমূর্তি। জ্যোতির্ময়ী। মাথায় হীরক-খচিত টোপর। গলায় গোলাপের এক মালা। ধীরে ধীরে হেঁটে আবার চন্দ্র-লোকের ভিতর দিয়ে মিলিয়ে গেলেন।

স্থির থাকতে পারলেন না দয়াল ঘোষ। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠে দাঁড়ালেন। কঁকিয়ে উঠলেন মা মা করে। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করলেন জঙ্গলের দিকে।

সারেঙ্গী থেমে গেল। ঢোল সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল প্রাণকেষ্ট। দীননাথ অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে চমকে ফাঁফিয়ে উঠল, কি, কি হয়েছে?

রজনী আরো ক্ষিপ্রগতিতে লাফিয়ে দৌড়ে এসে দয়াল ঘোষকে জড়িয়ে ধরল, কি, কি হয়েছে? কি ওদিকে?

ধীরে ধীরে হাত-পা কেমন অবশ হয়ে এল। দয়াল ঘোষ হকচকিয়ে আবার স্বাভাবিক হতে হতে রজনীর দিকে তাকালেন।

—কি হয়েছে দয়ালবাবু? মা মা করে কাকে ডাকছিলেন।

দয়াল ঘোষ অনেকক্ষণ ধরে কথা বলতে পারলেন না। সত্যি সত্যি কি এক অপরূপ দৃশ্য দেখলেন উনি কয়েক মুহূর্ত আগে! এখন জঙ্গলের দিকে আবার নিঃসীম অন্ধকার। অথচ ঐ অন্ধকারের মাঝেই কি মনোহর জ্যোৎস্না। কেমন আবার গুটিয়ে গেলেন উনি।

—না, কিছু না। হঠাৎ কেমন যেন মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল।

রজনী তবু সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে।

দয়াল ঘোষ বললেন, চল। আর কিছু না।

চলবে

ব্লু ফিল্ম

অদ্রীশ বর্ধন

'তাই বলুন। ঐজন্যে ক্যামেরাটা অত পুরোনো দেখেছিলাম। তাতে অবশ্য কিছু এসে যায় না। চোখ থাকলে ভালো ছবি ওঠে বাজে ক্যামেরাতেও। কত দেখেছি।'

'ব্যাপারটা এতক্ষণে পরিষ্কার হল। মিস্ লাল, এক কোটি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সনাতনের এই সাঙাতটি আপনার ফটোর নেগেটিভ সনাতনের স্টুডিওতেই পেয়েছিল। জাল নেগেটিভ বানিয়েছে বিনা ঝঞ্ঝাটে। সনাতনের সঙ্গে গঙ্গার পাড়ে এসেছিল কেন ঈশ্বর জানেন। সনাতনই বা রাজি হল কেন, জানি না। মোট কথা, দুজনেই গিয়েছিল সেখানে। সাক্ষী আছে, গত শুক্রবার সনাতনের বাড়িতে অন্য এক পুরুষ হাজির ছিল। কপাল মন্দ আমার, তাই সাক্ষী শুধু তার গলার আওয়াজ শুনেছে—সুরতটা চোখে দেখেনি। চুলোয় যাক, এখন যা জানলাম—লোকটাকে জাল ফেলে তুলতে বেশি দেরি আর হবে না।'

মিষ্টি হাসল বন্যা।

'জীবনে এই প্রথম আমার জরুল একজনের উপকারে এল। আই হোপ, মার্ডারারকে যেন ক্যাচ করতে পারেন।'

'নিশ্চিন্ত থাকুন....করবই।'

'কোর্টে গিয়ে জরুল দেখাতে হবে নাকি?'

'না দেখালেও চলবে। ফটো তো রয়েছে।'

'ভাগ্যিস জরুলটা পিঠে ছিল।'

আমি আর দাঁড়ালাম না।

।। ১১ ।।

খুশিতে প্রায় নাচতে নাচতে হেড কোয়ার্টারে ফিরলাম। অমূল্য বরাটের সঙ্গে এখন দেখা করা যায়। রিপোর্টে একটা ব্যাপার বেমালুম চেপে যাব। গঙ্গার পাড়ে ফোয়ারাকে নিয়ে গিয়ে ফটো তোলার ব্যাপারটা এখন না বললেও চলবে। মনটা ভীষণ হাল্কা হয়ে গেল কথাটা ভাবতেই। কিন্তু অমূল্যবাবুকে পেলাম না। বেরিয়েছেন। সন্ধ্যের আগে ফিরবেন না। অগত্যা পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতে বসলাম ঠ্যাংয়ের ওপর ঠ্যাং তুলে দিয়ে।

ফলে, ঠ্যাং নামিয়ে নিতে হল একটু পরেই। ঝিমিয়ে এল উল্লাস। এত ফুর্তি কিসের? আসল কাজই তো এখনো বাকি। হেরম্ব ঘোষ যার কণ্ঠস্বর শুনেছিলেন সনাতনের ভাড়া বাড়িতে, সেই যে খুন করেছে সনাতনকে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে-লোকটার ঠিকানা বার করবার একটা রাস্তাই খোলা আছে সামনে—তার সবুজ গাড়িখানা। যে তিনজন ফটোগ্রাফারকে ইণ্টারভিউ করে এসেছি, সবুজ গাড়ির মালিক সেই তিনজনের একজন হলেও, হতে পারে, নাও হতে পারে। হলেও, শুধু সবুজ গাড়ি দিয়ে তাকে খুনের দায়ে ঝোলানো যাবে না। আরো অকাট্য প্রমাণ চাই।

কিন্তু সে-প্রমাণ কি আর আছে? অপরাধী কি এত কাঁচা লোক? সনাতনের সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে যেসব জিনিসের মধ্য দিয়ে, তার সবই নষ্ট করে ফেলেছে আগিদমে—প্রিণ্ট, নেগেটিভ, কাগজপত্র—কিস্সু আর নেই। তাই পা নামিয়ে কপাল কুঁচকে চেয়ে রইলাম টেবিলের দিকে। সহজে কিনারা করতে হবে না এ-কেসের। লোক তিনটেকে আবার জেরা করতে পারি—অ্যালিবির ব্যাপারে আরো টাইট মারতে পারি। কিন্তু মেরে লাভ? অ্যালিবি যদি নাও থাকে, শুধু তার ভিত্তিতে একটা লোককে খুনী বলা যায় না।

কিন্তু অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন থাকলে সবুজ গাড়ির মালিককে আবিষ্কার করা কঠিন হবে না—বিশেষ করে গাড়িটা যখন আমেরিকান এবং বেশ বড় সাইজের। গাড়িটা বেচেও দিতে পারে ধুরন্ধর হত্যাকারী। দিক। মোটর ভেহিকলস্ থেকে তা সত্ত্বেও নাম-ধাম পাব। সহজেই পাব। শুধু তিন সন্দেহভাজনের নাম তিনটে দিতে হবে। ফোন তুললাম। ট্র্যাফিক ডিপার্টমেণ্টে নাম তিনটে দিলাম। রিকোয়েস্ট করলাম জবাবটা আধঘণ্টার মধ্যে চাই। পুলিশের দক্ষতা সম্বন্ধে যাঁরা বেঁকা বেঁকা কথা বলেন, তাঁরা শুনে সুখী হবেন—জবাবটা এল বিশ মিনিটের মাথায়। আবদুল সামাদের একটা ১৯৬৬ মডেলের ডজ গাড়ি আছে। রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটি টুকে নিলাম নোট বইয়ে।

খুনী তাহলে আবদুল সামাদ। বিশ্বাস করা কঠিন। লোকটা এত কাঠ-খোট্টা, শুষ্ক টাইপের যে, বিকৃত রুচির কদর্য ছবির ব্যবসায়ে লিপ্ত বলে মনেই হয় না। ভাবাও যায় না। কিন্তু সে ছাড়া আর কে হবে? সব মিলে যাচ্ছে। শিরীষ দত্তর আছে মরিস মাইনর, ম্যালকম সুকিয়াসের স্ট্যাণ্ডার্ড হেরাল্ড—ডজ গাড়ির সঙ্গে কোনো মিল নেই—দেখে ভুল হতে পারে না কোনমতেই। সুতরাং খুনী আবদুল সামাদ। কিন্তু তারপর? সামাদের কাছে গিয়ে এখন কিছু লাভ হবে কি? না-হওয়াই ভালো। এখন দূরে থাকা যাক। এখন গেলে ভড়কে যেতে পারে এবং হাওয়া হয়ে যেতে পারে।

সামাদ জানে, তার প্লট নিশ্ছিদ্র। সেই জেনেই এত নিশ্চিন্ত সে। দৈনিক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে স্বাভাবিকভাবে। প্লট সাকসেসফুল হয়েছে বলেই আত্ম-বিশ্বাস তুঙ্গে উঠেছে। ওঠাটাও যুক্তি-সঙ্গত। এই যে আমি তাকে খুনী বলে জেনেছি, জেনেও তাকে খুনী বলতে ভরসা পাচ্ছি না। আদালত শুনবে কেন? প্রমাণ কোথায়? সামাদ যে গঙ্গার ঘাটে গিয়েছিল, তা কি প্রমাণ করতে পারব? শুক্রবার সে সনাতনের বাড়িতে ছিল—তাও পারব না প্রমাণ করতে। সনাতনের সঙ্গে তার কারবারের সম্পর্ক ছিল—সনাতনের হাঁড়ির খবর সে রাখত—কিন্তু প্রমাণ করতে পারব না কোনটাই। এরকম কোণঠাসা জীবনে হইনি। অমূল্য বরাটের সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভাল

হত। এ অবস্থায় তার কনসালটেশনের দাম আছে।

তবে একটা কাজ এখুনি করা যায়। সামাদের ঠিকানা বার করলাম। জনাকয়েক ডিটেকটিভ কনস্টেবলকে সেই ঠিকানা দিলাম। বলে দিলাম যেন চৌপর দিন নজর রাখা হয়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্টুডিওতে যাক কি যে চুলোয় যাক—নজরবন্দী থাকুক আজ থেকে। পাখী না উড়তে পারে। সে-ব্যবস্থা সেরে রওনা হলুম গঙ্গার ঘাটে—অকুস্থল অভিমুখে—পুলিশ জীপে।

কেন যে গেলাম, সে-কারণটা অস্পষ্ট রইল আমার কাছেও। ঠুঁটো জগন্নাথের মত অফিসঘরে চুপচাপ বসে থাকতে পারছিলাম না। মনের কোণে উঁকি মারছিল একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা। সনাতনের ভাঙা বাড়িতে কিছুক্ষণ একা একা কাটালে। সেখান থেকে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত ড্রাইভ করে গেলে হয়ত আবিষ্কার করতে পারব কি কৌশলে খুনটি সেরেছে সামাদ। ধাঁধায় পড়েছিলাম সনাতনের গঙ্গার ঘাটে যাওয়া নিয়ে। সামাদ তাকে নিয়ে গেল কিভাবে? কোন্ অছিলায়? বন্যালালকে গায়ের জোরে বলেছিলাম—নিয়ে গেছে যেভাবেই হোক। কিন্তু এখন যত তা নিয়ে ভাবতে লাগলাম, মাথা গুলিয়ে যেতে লাগল ততই। নিয়ে গেছে কিভাবে? বিশেষ করে ক্যামেরা-ট্যামেরা সমেত? সনাতন রাজি হল কেন? সনাতন ফিল্ডের লোক—সামাদ পর্দার আড়ালের লোক। সনাতন মেয়ে জোটাতো, পোজ দিতে বাধ্য করত ছলে বলে কৌশলে। কিন্তু বন্যালালের যে-ছবি তুলেছে সনাতন, তা নির্দোষ। নোংরামির কাছ দিয়েও যায় না। তবে কেন সামাদ নাক গলালো তার মধ্যে? সামাদের মোটিভটাই বা কি? হেরম্ব ঘোষ নিজের কানে শুনেছেন, টাকা নিয়ে কচলাকচলি চলছে দুজন পুরুষের মধ্যে। সে-কথা দিয়ে প্রমাণ করা যায় না যে, সামাদ খুন করেছে সনাতনকে। লাভ ছিল বলেই দুজনে চালিয়ে গেছে কারবার—সনাতন-নিধন মানে নিজের পায়ে কুড়ুল মারা, লাভের পথ বন্ধ করা।

ভাঙা বাড়ির সামনে পোঁছোলম। জীপ রেখে ঢুকলাম ভেতরে। জিনিসপত্র বেশ আগোছালো। ঝাড়ন দিয়ে ধুলো পর্যন্ত ঝাড়া হয়নি অনেক জায়গায়। গেলাম বসবার ঘরে। এই ঘরেই দুটি পুরুষমানুষকে টাকা নিয়ে তর্ক করতে শোনা গেছে। তারপর কি হয়েছে? নিশ্চয় গাড়ি হাঁকিয়ে গিয়েছে গঙ্গার ঘাটে। ওয়েস্ট, ওয়েস্ট, ঝটিতি বললাম নিজের মনকে। আদৌ গিয়েছিল তো? ফোয়ারা স্বচক্ষে দেখেছে সবুজ গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে রাস্তার দিকে—গাড়িতে সামাদ ছাড়া আর কেউ ছিল না। অথচ ফোয়ারা বাড়িতে ঢুকে কাউকে দেখতে পেলো না। সনাতন তখন ছিল কোথায়? সামাদ রেগেমেগে চলে যাওয়ার পর সনাতন গিয়েছিল কোথায়? না কি আবার ভুল পথে চলেছি?

সনাতন নিশ্চয় একাই গাড়ি নিয়ে গিয়েছিল গঙ্গার পাড়ে। কিন্তু 'একা' যাবে কেন? বিশেষ করে ক্যামেরা কাঁধে? ড্যাম ইট, নিশ্চয় যাওয়ার পথে কোথা থেকে ও তুলে নিয়ে গেছে কোনো একটা মডেল গার্লকে। তার মানে, আমার এই থিওরীও ইতি হতে চলল এইখানে। সামাদ মার্ডার করতে পারে না সনাতনকে। করত, যদি জানত সনাতন গঙ্গার পাড়ে যাবে। সেটা জানলে হয়ত আগেভাগে গিয়ে লুকিয়ে বসে থাকত ঝোপেঝাড়ে। হয়ত তাই হয়েছে। সামাদ জানত সনাতন এখুনি যাবে গঙ্গার ঘাটে ন্যুড মডেলের আর এক সেট ফটো তুলতে। তাই আগে সেখানে গিয়েছে, ঝোপের মাঝে ওৎ পেতে থেকেছে, সময় হতেই তীরবেগে বেরিয়ে এসে পাথর দিয়ে খুন করেছে সনাতনকে। কিন্তু মডেল মেয়েটা? সে কেন এগিয়ে এল না? নাকি, সে-ও সামাদের স্যাঙাৎ? সনাতন-নিধন চক্রের অন্যতম চক্রী?

গোল লাগল সময়-রহস্য নিয়ে। সামাদ বেরিয়ে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চয় রওনা হতে হয়েছে সনাতনকে। নইলে ঠিক সময়ে গিয়ে খুন হতে পারত না গঙ্গার ঘাটে। সেক্ষেত্রে, ফোয়ারা গিয়ে তাকে দেখতে পেত। কিন্তু পায়নি। কেন? ওয়েট ম্যান, ওয়েট। আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি? ফোয়ারা গিয়ে দেখেছে বাড়ি খালি। সনাতন তখন কোথায়? সামাদের আগে নিশ্চয় বেরোয়নি। শেবোলে, স্টেশন ওয়াগনটা চোখে পড়ত ফোয়ারার। স্টেশন ওয়াগন বাড়ির মধ্যেই ছিল—তারা দেওয়া ছিল গ্যারেজের মধ্যে।

এই পর্যন্ত ভাববার পরেই একটা দারুণ আইডিয়ার ফ্ল্যাশবাল্ব জ্বলে উঠল মাথার মধ্যে। কিছুক্ষণ বসে রইলাম স্থাণুর মত। তারপর তুললাম ফোন, ডায়াল করলাম ডাক্তার ভদ্রকে, জিজ্ঞেস করলাম কয়েকটা প্রশ্ন, জবাব পেলাম সঙ্গে সঙ্গে। রিসিভার রেখে দিয়ে ভীষণ খুশী হয়ে ধরালাম একটা সিগারেট। কাজ এগোচ্ছে। গেলাম গ্যারেজে।

নামেই গ্যারেজ, আসলে একটা কাঠের শেড। দু-পাল্লার কাঠের দরজা। ঘাসে-ছাওয়া মাটির মেঝে। দরজায় খিল জাতীয় কিছু নেই। শুধু দুটো কড়া আর একটা প্যাডলক। এখন ঝুলছে একটা কড়া থেকে। মনে পড়ল, আমি এবং অমূল্য বরাট ভেতরে এক ঝলক তাকিয়েই দরজা টেনে দিয়ে চলে গিয়েছিলাম। সনাতনের চাবির গোছা বার করলাম পকেট থেকে, একটা চাবি লাগল প্যাডলকে। খুশী মনে চাবি রাখলাম পকেটে। গ্যারেজ এখন শূন্য। গাড়ি নেই। বেশ কিছু পুরোনো টিন আর আজেবাজে জিনিস পড়ে। দেখার ইণ্টারেস্ট ছিল না বলে দেখলাম না। গ্যারেজ দেখবারও খুব একটা ইণ্টারেস্ট ছিল না। একবার শুধু চোখ বুলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে, বন্ধ করলাম পাল্লা দুটো।

গ্যারেজের ঠিক বাইরে খানিকটা ধুলো জড়ো হয়েছিল। সাইকেলের টায়ারের দাগ দেখলাম সেখানে। অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম দাগগুলোর দিকে—মন ছুটল হরিণের গতিতে। সদর দরজার সামনে দাগটা থাকলে ধরে নিতাম টেলিগ্রাফ পিয়ন বা খবরের কাগজওলার সাইকেলের চাকার দাগ। কিন্তু গ্যারেজের সামনে তারা আসে না। হেঁট হয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। গত শুক্রবার থেকে বৃষ্টি নেই। মাটি শুকনো। বাতাসও [illegible] নেই। ধুলো উড়ে যায়নি। শুক্রবার থেকেই দাগগুলো রয়েছে মাটিতে। দাগ-রহস্য ভাবতে ভাবতে বাড়িটাকে এক চক্কর দিয়ে বসলাম জীপে।

গেলাম গঙ্গার ঘাটে। সারাটা পথ মাথার মধ্যে ঘুরপাক দিতে লাগল সাইকেলের চাকার দাগ-রহস্য। আগে যেখানে পুলিশ-কার রেখেছিলাম, জীপ রাখলাম সেইখানে। রাস্তা থেকে হেঁটে গেলাম অকুস্থলের দিকে—চোখ রইল জমির দিকে। শক্ত জমি — মাটি শুকিয়ে খটখটে। তা সত্ত্বেও হাল ছাড়লাম না। পুরস্কার পেলাম হাতে হাতে। দেখলাম সাইকেলের চাকার দাগ। একই ব্র্যাণ্ডের টায়ার। মুহূর্তের মধ্যে বায়োস্কোপের ছবির মত মনের পর্দায় ভেসে উঠল শুক্রবারের অদেখা কাহিনী। সব বুঝলাম। স-ব।

তা সত্ত্বেও রুটিন মাফিক হেঁটে গেলাম জলের ধার পর্যন্ত। ঘুরে ঘুরে চার দিক দেখলাম। মনের চোখে ভেসে উঠল ফোয়ারার নিরাবরণ সুঠাম তনু। তার বেশী কিছু নয়। নতুন তত্ত্ব আর কিছুই জানলাম না। সূত্র পেলাম না।

আশাও করিনি। যা জানবার তা জানা হয়ে গিয়েছে। আমি জানি, সামাদ কিভাবে মার্ডার করেছে সনাতনকে। কিন্তু শুধু জানলে তো হবে না। প্রমাণ কই? প্রমাণ করব কি করে?

জীপ হাঁকিয়ে ঝড়ের বেগে ফিরলাম হেড কোয়ার্টারে। অমূল্য বরাটের সঙ্গে এবার দেখা হল। আমাকে দেখেই দারুণ একখানা হাসি হেসে বললেন কৃত্রিম উচ্ছ্বাসে—'হ্যালো বিলিয়ান্ট ইয়ং ডিটেক-টিভ! খবর কি? কাকে অ্যারেস্ট করলে?

আস্তে আস্তে বললাম — কাউকে করিনি। কিন্তু আমি জানি, কে খুন করেছে, কিভাবে খুন করেছে। শুধু প্রমাণ করতে পারছি না।'

হাসি উড়ে গেল অমূল্যবাবুর মুখ থেকে।

'জানো কে খুন করেছে?'

'জানি।'

'হেরম্ব ঘোষ?'

'না। একজন ফটোগ্রাফার। নাম, আবদুল সামাদ।'

পাইপটা টেবিল থেকে তুলে নিলেন অমূল্যবাবু।

'বলো কিভাবে জেনেছো।'

বললাম। সবই বললাম, শুধু খোয়ারাকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যাওয়ার জায়গাটুকু বাদ দিলাম। অমূল্যবাবু ভাল শ্রোতা। দু-একটা খটমট জায়গা বুঝে নেওয়ার জন্যে বাধা দেওয়া ছাড়া একদম কথা বললেন না। কাহিনী শেষ হবার পর কড়িকাঠের দিকে দু হাত তুলে বললেন: রোববারের কাগজে খবরগুলো বেরিয়ে গেলে মুখ দেখানোর যো থাকবে না! যাকগে। সুমন্ত, তুমি খেলেছো ভাল। ফার্স্ট ক্লাশ কাজ হয়েছে। এখন বলো দিকি বাবা এর পর কি করতে চাও? সামাদের কাছে যাওনি তো?

'না। যাওয়ার পথ নেই। যা প্রমাণ করতে পারব না, তা বলতে গেলে পার্টি হুঁশিয়ার হয়ে যাবে।'

ফুক-ফুক-ফুক-ফুক করে পাইপ টেনে চললেন অমূল্য বরাট।

'সুমন্ত এরকম গেরোয় এর আগেও পড়েছি। বহু কেস এইভাবে আটকে যায়—কূলে আর পোঁছোয় না। তা সত্ত্বেও বলব, সামাদের কাছে তোমার যাওয়া দরকার। না। 'আমাদের' যাওয়া দরকার। দুজনে থাকলে সিধে করতে বেশী বেগ পেতে হবে না। লোক কি রকম সামাদ?'

'বছর চল্লিশ বয়স, স্বভাব শান্ত, নির্টপিটে, একটুতেই ঘাবড়ে যায়।'

'খুব শক্ত কি?'

'শক্ত না বলে বলব একগুঁয়ে। ভীষণ চালাক

'তার মানে কঞ্চি, বাঁশ নয়। সহজে নোয়ানো যাবে।'

'একগুঁয়েদের গোঁ অনেক ক্ষেত্রে আগে ভাঙ্গে।'

'আমি কিন্তু স্যার পেছনে লোক লাগিয়েছি।'

'লাগিয়েছো? সাবাস! গুড বয়! ও লোককে শায়েস্তা করতে হলে বাড়িতে গিয়েই করতে হবে। বাড়ি কোথায়?

'লিনটন স্ট্রীটে। ঠিকানা জানি।'

'আজ রাতে যাবে?'

'মন্দ কি। শুভস্য শীঘ্রং।'

'রাইট। বিকেলটুকু বাদ দিলাম রিপোর্ট লেখবার জন্যে। বাট ফর হেভেনস্ সেক, নেকেড মেয়েদের কেচ্ছা লেখবার সময়ে কলমটা বেশী ছুটিও না।'

'খটকা লাগছে শুধু মোটিভ নিয়ে। মোটিভটাই জানি না। কেন খুন করল? কারণ নিশ্চয় আছে—আমরা জানি না।'

'আছে তো বটেই। সামাদ ছাড়া আর কারো কাছে জানবার সম্ভাবনা আছে?'

'সে রকম কাউকেই দেখছি না স্যার।'

'তাহলেই ভয় দেখিয়ে কথা বার করতে হবে। আজ রাতে মুখ না খুললেও একদিন না একদিন খুলিয়ে ছাড়ব। একটা ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আজ রাতেই দুজনে চড়াও হলে ভালভাবেই বোঝা যাবে সামাদই খুনী কিনা। একটার পর একটা প্রশ্ন করে গেলে জবাব না দিয়ে থাকতে পারে, এমন লোক খুব কমই আছে। পেটের কথা বাইরে আসবেই। আস্তে আস্তে ভাঙবে সে কি করেছে। ঠিক যেভাবে খুনটা করেছে, তুমি যেন তা দাঁড়িয়ে দেখেছো—বলবে সেইভাবে, গ্যারান্টি দিচ্ছি, সামাদ সইতে পারবে না। কেননা, ও জানে আমরা কিছু জানি না। জানে, ও যা করেছে, তা ফুলপ্রুফ। সুতরাং তুমি যা বলবে তার জন্যে ও তৈরী নেই। তাই রেজাল্টটা হবে ড্রামাটিক। অতএব, বৎস সুমন্ত, অযথা উদ্বেগ ত্যাগ করো—রিপোর্ট রেডি করো।'

অমূল্যবাবু তো বলে খালাস 'অযথা উদ্বেগ ত্যাগ করো।' ত্যাগ করব বললেই কি ত্যাগ করা যায়? কেসটার শুরু থেকে প্রত্যেকটা ঘটনা আলাদা আলাদা করে ভাবলাম। কিন্তু নিরেট চক্রান্তে ছেঁদা কোথাও বার করতে পারলাম না। ফলে নার্ভাস হলাম, উদ্বিগ্ন হলাম। প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই, আছে শুধু পরোক্ষ প্রমাণ—পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য—পারিপার্শ্বিক পরি-স্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে খুনী বলা যায় আবদুল সামাদকে—তার বেশী নয়। সুতরাং সামাদ যদি কাঠগোঁয়ার হয়, লোহার মত শক্ত মনোবল থাকে, তাহলে আমরা লক্ষ প্রশ্ন করলেও ও শুধু এড়িয়ে যাবে—মানবে না কোন চার্জ—মুখ চুন করে ফিরতে হবে আমাদের। প্রমাণ করতে পারব না সে খুনী।

সারা বিকেলটা এই দুশ্চিন্তাতেই কাটল। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ দরজায় উঁকি মারল অমূল্য বরাটের মুখখানা।

'উঠে এস সুমন্ত। কফি-টফি খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নাও। এই হল গিয়ে তোমার লাইফে ফার্স্ট মার্ডার কেস। হিল্লে করতে পারলে ইন্সপেক্টর হওয়া আটকায় কে।'

কফির সঙ্গে টফি মানে যে একখানা ডিনার, সেটা পরে বুঝলাম। অমূল্যবাবু প্র্যাকটিক্যাল মানুষ। ভুঁড়ি ঠাণ্ডা রেখে মুড়ি ঠাণ্ডা রাখেন। অধস্তন কর্মচারীর বেলা যে হট, তা আঁচ করেই পেট ভরে আগে খাওয়ালেন। খাওয়ার পর সত্যিই মনে অনেক জোর পেলাম। তদন্তে আমি ফাঁকি দিইনি—ফাঁক কোথাও রাখিনি; তবে কেন পারব না সামাদকে শোয়াতে?

গেলাম লিন্টন স্ট্রীটে। কবরখানার পাশের রাস্তা দিয়ে নোনাপুকুর ট্রাম ডিপোকে বাঁয়ে রেখে ঢুকলাম ভেতরে। বাড়িটা নির্জন। সামনে তাল-পেয়ারা-আমের বাগান। দোতলা সাদা চুনকাম করা সেকেলে বসতবাড়ি। বাইরে চাকচিক্য নেই।

জীপ থেকে নামতে নামতে অমূল্যবাবু বললেন—"কথা যা বলবার তুমিই বলবে। তুমি আমার চাইতে বেশী জানো। যেখানে দরকার হবে, সেখানে আমি মুখ খুলব।"

ফটক থেকে হেঁটে গেলাম সদর দরজায়। কলিংবেল ছিল; বোতাম টিপতেই আবদুল সামাদ নিজে এসে দরজা খুলে দিলে। আমাকে চিনতে পারল। কিন্তু চমকাল না। তাতে বৃদ্ধি পেল আমার প্রত্যয়। সদর দরজায় এই রকম সময়ে পুলিশের লোক কলিংবেল টিপলে নির্দোষ মানুষ মাত্রই আশ্চর্য হয়। সামাদ হল না। কারণ, সে দোষী। সে আমার পথ চেয়েই রয়েছে। তাই চমকাল না। আমি পরিচয় করিয়ে দিলাম অমূল্য বরাটের সঙ্গে। সামাদ আমাদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে চেয়ে দেখল রাস্তায় দাঁড়িয়ে পুলিশ জীপ। একটু দ্বিধা করল বটে, তারপর দুজনকে নিয়ে গেল ভেতর বাড়িতে। বাইরে চাকচিক্য না থাকলেও দেখলাম ভেতরে আছে। ঘরদোর রুচিসুন্দরভাবে সাজানো। এক কণা ধুলোও কোথাও নেই।

দরজার দিকে তাকিয়ে অমূল্যবাবু বললেন—"কথাটা প্রাইভেটলি বলতে চাই।"

"আমার ওয়াইফ মারা গিয়েছে। কেউ আসবে না কথা শুনতে। কিন্তু প্রাইভেটলি কথা বলার কোনো দরকার—"

বাধা দিলাম।

"আপনি জানেন আমরা কেন এসেছি।"

"না জানি না।"

"সনাতন গুঁইয়ের মৃত্যু সম্পর্কিত তদন্তে আপনার ইন্টারভিউ-এর আগে নিয়েছি। সেই সম্পর্কেই আরো কিছু প্রশ্ন আছে।"

(চলবে)

অপ্রকাশিত বিবেকানন্দ ও উপেক্ষিতা ক্রিস্টিন

প্রণতা দে

(পরবর্তী চিঠির কিছু অংশ পোকায় কাটবার দরুন তারিখ পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রে চিঠি ক'খানি যদি পর পর সাজাতে না-পেরে থাকি সেজন্য মার্জনা চাইছি।)

(৩৬)

...........১৯০০

....তোমার চিঠি এইমাত্র পেলাম। ....স্ট্রীট। নিউইয়র্ক

আমাকে আরও কদিন নিউইয়র্কে থাকতে হবে আমার বইয়ের ব্যাপারে। কর্মযোগের আর একটি সংস্করণ এবং সেই সঙ্গে লণ্ডনের বক্তৃতার একটি সংকলন মিসেস ওয়াল্ডোর সম্পাদনায় মিঃ লেগেট প্রকাশ করছেন। আমার মনে হয় আমি যদি এদেশে আরও কিছুদিন থাকি তাহলে তুমি একটু বিশ্রাম নিতে ও পরিবর্তনের জন্য এসে যাও। নিউ পোর্টস সমুদ্রের কাছে একটি বিখ্যাত জায়গা। নিউইয়র্ক থেকে মাত্র চার ঘণ্টার রাস্তা। আমি সেখানে নিমন্ত্রণ পেয়েছি। এই সপ্তাহেই সেখানে যাবো। ওঁরা কথা দিয়েছেন যে আমি সেখানে চুপচাপ, অবসরপূর্ণ দিন কাটাতে পারব—আর স্বাধীনতা। সেখানে তোমার থাকবার উপযোগী একটা জায়গার ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করব এবং পাওয়া মাত্র তোমাকে 'তার' করব।

আমি ঠিক জানি যে তুমি ডেট্রয়েটে কখনই বিশ্রাম পাও না। মাঝে মাঝে স্থান পরিবর্তন এবং নির্জন জায়গায় বাস মানুষকে নতুন শক্তি ও উদ্যম এনে দেয়। তবে যদি মনে কর ডেট্রয়েটেই তুমি বেশী বিশ্রাম ও নির্জনবাসের সুবিধে পাও তাহলে জানিও, আমিই যাবো। নিউইয়র্ক থেকে ডেট্রয়েট মাত্র ১৭ ঘণ্টার পথ। এটুকু পথ যাবার মত আমি যথেষ্ট সবল। আমি

একটা বক্তৃতা দিলাম। এখানকার স্বনামধন্য ধর্মযাজক পেরী হায়াসিন্থ আমাকে খুব পছন্দ করেছেন মনে হল! হুঃ। তাতে কী হল? কিচ্ছু না!! কেবল,—তুমি এত ভালো, আর আমি একটি নির্বোধ বুড়ো মানুষ। বাস্ এইটুকুই! কিন্তু 'মা' ভাল জানেন সব! আমি সুখে দুঃখে সর্বদা তাঁর সেবা করেছি—তাঁর ইচ্ছে পূর্ণ হোক্।

ভাল কথা আমি আমার হারানো ভাইয়ের খবর পেয়েছি! ও একজন মস্ত পর্যটক! সেটা ভালই। তাহলে দেখ মেঘটা ধীরে ধীরে অপসারিত হচ্ছে। তোমার মা, বোন ও মিসেস ফ্যাঙ্ককে আমার ভালবাসা জানাবে।

ভালবাসাসহ
বিবেকানন্দ।

শ্রীমতী অ্যাকশার পরবর্তী চিঠি—

Chatean Burn, April 18, 1930.

বিলাভেড বশী,

তোমার সুন্দর চিঠিটি পেয়ে আমি ও হারউড খুব নিশ্চিন্ত হলাম। তুমি যে কেবলগ্রাম পাঠিয়েছিলে শ্রীমতী এলমহার্স্টকে, তাইতেই আমরা তোমার কীর্তন সম্বন্ধে সব কিছু বিশদভাবে জেনেছি। ......আমি গভীরভাবে অভিভূত হয়েছি জেনে যে আমার নগণ্য এবং সামান্য স্মৃতিচারণ সে সময় পড়া হয়েছিল। আমার মনে হচ্ছে আমরা সবাই যেন সে সময় একসঙ্গে ছিলাম। ......তুমি শিগগির আমাদের কাছে আসছ আমরা সেই প্রতীক্ষায় আছি। তোমাকে না বললেও তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ আমাদের স্নেহের বশীকে আমরা কীভাবে অভ্যর্থনা করব।

আমি জানি তোমার কাজকর্ম সুনিয়মে চলবে এবং তোমার মতই তোমার কাজও সার্থক ও সমৃদ্ধ হয়ে সকলের হিতের জন্য হবে। ভাবতেই কী আনন্দ হচ্ছে যে তুমি আমাদের মধ্যেই আসছ।

সমস্ত মহান ব্যক্তিদের সমস্ত আশীর্বাদ তুমি লাভ কর এবং আমার অনেক ভালবাসা জানবে। —অ্যাকশা

Chatean Burn
St. Cyr-Sur-Mer Var. France
April 3 1930.

হারউডের চিঠি:
মাই ডিয়ারেস্ট বশী,

আমি ক্রমাগত তোমার কথাই ভাবছি। মনে হচ্ছে এই সময় যদি তোমার কোন সাহায্যের কাজে আমি লাগতে পারতুম! কিন্তু আমি জানি স্বামীজী এবং তোমার সুন্দর সরল প্রকৃতি তোমাকে সাহায্য করছেন। আমরা সবাই তাঁর জ্যোতির্ময়ী উপস্থিতি যে কী ভীষণভাবে অভাব বোধ করব। তাঁর কথা ভাবতেই আমার মনে শান্তি ও আনন্দের অনুভূতি হয়। তাঁর মত একজন মহীয়সীকে দেখেছিলাম বলে নিজেকে ধন্য মনে করছি। সেই আলমোড়ার দিনগুলি আমার সব সময় মনে পড়বে। ঐ দিনগুলি আমার সবচেয়ে গৌরবের দিন ছিল। সত্যি কথা বলতে কী আমার আসল জীবনের শুরু ঐ দিনগুলির মধ্য থেকে। তোমার এখন কী পরিকল্পনা জানবার জন্য আমি খুবই চিন্তিত হয়েছি। তোমার সঙ্গে শিগগির দেখা হবে বলে আশা করে আছি বশী! কতদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি। কত কথা জমে আছে বলবার জন্য। আজই সকালে আমি

বশী সেন

ডারলিংটন থেকে এখানে এসে পৌঁছেছি। খুব বিশ্রী লাগছে এখানে বাবা নেই বলে......

আমি আজকাল কর্মযোগ পড়ছি এবং এতে আমার বেশ সুবিধে হচ্ছে। এটা পড়ে বুঝতে পারছি ভাগবত গীতাকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কেন যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তোমার ভক্তের কাছ থেকে আরও বেশী ভালবাসা।

লাম্বুজী।

Chatean Burn, St. Cyr-Sur-Mer-Vars
France April 18, 1930.

মাই ডার্লিং বশী,

মাকে ও আমাকে লেখা তোমার চিঠির মধ্যে তোমার উপস্থিতিকে আমরা এত স্পষ্ট ও নিকটে অনুভব করেছি! কী বিশ্বাস আর সৌন্দর্যের ভেতর দিয়ে তুমি জীবনকে গ্রহণ করেছ। তুমি আমাকেও এইভাবে চলতে শিখিয়েছ। এর চেয়ে বড় উপকার আর কী আছে? সত্যি কথা পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছাড়া শান্তি কোথায় পাওয়া যায়?

আমি আজকাল মায়ের কাছে এসেছি। অতএব বিশ্রাম ও কুঁড়েমির মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছি। আজ থেকে ঠিক দু সপ্তাহ বাদে আমার স্কুল খুলছে। অর্থাৎ মাত্র ২।৩ দিনের জন্য বাবার সঙ্গে দেখা হবে না, যদি না আরও কদিন থেকে যাই। ...গত দুদিন ধরে স্কেচ করছি, যেটা বরাবরই আমার কাছে আনন্দদায়ক। আমার খুব ইচ্ছে করে যদি তোমাকে আমি এখানকার সুন্দর পাহাড়ের মাথায় নিয়ে যেতে পারতাম যেখানে অবিরাম রংয়ের পটপরিবর্তন হয়। সেখানে পৌঁছলে মানুষ সংসারের সব অশান্তি কোলাহল থেকে দূরে সরে যেতে পারে। তবে তুমি যে আশ্রমে আছ সেটাও নিশ্চয় খুব সুন্দর এবং আমি খুশী হয়েছি যে সেখানে তোমার ভাল যত্ন হচ্ছে। ইচ্ছে করে তোমার 'নো-হোয়ার' জাহাজটি তোমাকে আমাদের কাছে নিয়ে আসুক। তবে আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করব। জানি সময় হলে তুমি নিজেই আসবে। আর বাবা না থাকায় বাড়ীটা কী রকম বুঝতেই পারছ। যখন বাবা আসবেন তখন তুমিও এসো। এখানে এসে পর্যন্ত অল্পসল্প ধ্যান করছি। আমি চাই তোমার মত ভক্তি ও মনের জোর যাতে, এইসব চর্চা ঠিকমত চালাতে পারি। যেমন আমি বুঝতে পারি আমার আরও শক্তি চাই যাতে এমন কী আমি শয্যাত্যাগ করে বেড়াতে যেতে পারি। আসলে আমার মনটা শরীরের চেয়ে আগে আগে কাজ করে।

তোমার ভক্তের কাছ থেকে আরও বেশী ভালবাসা।

লাম্বুজী

কলকাতা নামে গ্রাম

রাণুমাসী চোখ মটকে বললেন, মানে?

আমি বললাম, এটাই ওদের আসল নাম। ওরা তো বেশ অথরিটি নিয়ে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে আমরা এই করেছি সেই করেছি। আর তুমি সেগুলোকে বললে বাঁচার প্রাথমিক সর্ত—ওরা তো দেখছি শুধু সেগুলোতেই হাত দিয়েছে।

রাণুমাসী পানের বটুয়া খুলে তিন খিলি পান একসঙ্গে মুখে দিয়ে চিবুতে চিবুতে বললেন, ব্যাখ্যা কর।

আমি বললাম, সবার দ্বারা সব কাজ হয় না। ব্যাখ্যাটা আমি ঠিক পারি না। তার চেয়ে তুমি তো আছই। আমার সঙ্গে ঘুরবে ফিরবে। মনে হয় তাতেই কিছু কিছু বুঝতে পারবে।

রাণুমাসীর ছোট বোন থাকে হাওড়ায়। বয়স হলে সব লোকের যা হয় সেই হার্ট হঠাৎ জঘন্যভাবে আক্রমণ করে বসল তার ভগ্নিপতিকে। সবাই ছুটলাম। বাড়ি গিয়ে শুনলাম হাওড়া হাসপাতালে নিয়ে গেছে। শুনেই রাণুমাসী কপালে হাত দিয়ে বসে পড়ল। আমি বললাম, কি হল!!

রাণুমাসী বলল, ওরে, তুই জানিস না, আমি বছর দশেক আগে আর একবার এসেছিলাম, সেবারো একবার যেতে হয়েছিল। আদ্দিকালের বাড়ি এই হাসপাতালটা...

কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি ছুটলাম। রাণুমাসীর কথা আগে না তার ভগ্নিপতির কথা আগে। এমারজেন্সিতে গিয়ে রাণুমাসীর মুখে রা সরে না। ঝকঝক করছে সব। নতুন বাড়ি। মাটির নিচেও ঘর। মোজাইক বহুদূর পর্যন্ত। বিছানাপত্তর পরিষ্কার। ডাক্তাররা সুবেশ। নার্সরা সপ্রতিভ। আধুনিক বন্দোবস্ত।

রাণুমাসী বলল, এটা কবে হল?

আমিও জানতাম না। একজন হাউস-স্টাফকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কবে হল?

তিনি বললেন, এই কয়েক মাস। সি-এম-ডি-এ এটা বানিয়ে রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দিয়েছে। —হাউসস্টাফের হাতে স্টেথিসকোপ থাকলে তাঁদের পায়ে বড় ব্যস্ততা আসে বোধহয়। আরও দুএকটা প্রশ্ন শুধোতাম। তা লোকটি চলে গেল বলে আর জিজ্ঞাসা করা গেল না।

এবং সুখের কথা রাণুমাসীর ভগ্নিপতি সেই হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ফিরেছেন।

ভারতবর্ষ আমার দেশ হলেও কলকাতার ওপর আমার দুর্বলতা সবচেয়ে বেশী। বেশীক্ষণ কলকাতার নিন্দা সহ্য করতে পারি না। ব্রেবোর্ন রোডের উড়ালপুলে উঠে রাণুমাসীর হাসি আর থামে না। —আরে, আরে, তোরা কি আহাম্মক রে! তোরা এর ওপর দিয়ে তাড়ি চালাচ্ছিস। সারা সহরে তো একটা। এটা ব্যবহার না করে তুলে রাখ। তুলে রাখ। লোকজনকে দেখাবি।

আমি বললাম, একটা মানে, ব্র্যাবোর্ন রোডের কাজ প্রায় শেষ। হাওড়ার দিকেও একটা বেশ বড়-সড় উড়ালপুলের কাজ পুরো দমে চলেছে। এগুলো শেষ হলে আরও নতুন নতুন ফ্লাইওভারের কাজ নেওয়া হবে। —একটু থেমে বললাম, একবার ভেবে দেখ রাণুমাসী। সম্পূর্ণ ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদের ওপর নির্ভর করে, হাওড়া ব্রিজের ট্র্যাফিককে এতটুকুও বিরক্ত না করে কেমন [illegible] করা গেল এতবড় ব্যাপারটা। ফাঁকা [illegible]র ওপর ফ্লাইওভার আর হাওড়া ব্রিজের ট্র্যাফিকের

কি হচ্ছে?

এক কথায়। অনেক কিছু।

বালীগঞ্জ থেকে কসবা যেতে আর রেলওয়ে লেভেল ক্রসিংএ আটকাতে হবে না। কেননা, রেললাইনের ওপর তৈরী হচ্ছে ওভারব্রীজ...

শিয়ালদার আর প্রাণ হাতে করে চলতে হবে না, অথবা অসহ্য ট্রাফিক জ্যামের মধ্যে পড়তে হবে না, কারণ তৈরী হচ্ছে ছোট উড়াল-পুল আর নতুন বাজার। ...

হাওড়ায় নতুন বাকল্যাণ্ড (বঙ্কিম সেতু) তৈরী হলে হাওড়ার লোকের প্রচুর সুবিধা হবে...

হাওড়াতেই বিরাট পানীয় জলের প্রকল্প চলছে,—আর মল শোধনের আধুনিক ব্যবস্থা ...

গার্ডেনরীচের জলপ্রকল্প শেষ হলে কলকাতা, বেহালা, গার্ডেনরীচ, ইত্যাদি জায়গায় জলের সমস্যার সত্যিকারের সুরাহা হবে...

মানিকতলা আর উল্টাডাঙ্গার রেলব্রীজে তিনটি করে ফোকর হবে—একটি দিয়ে দোতালা বাস যাবে...

আরও তিনটি বড় এবং নতুন রাস্তা হচ্ছে—যেমন কোণা একসপ্রেসওয়ে, বারাকপুর-কল্যাণী আর ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস... তিনটি নতুন শহর, পূর্ব কলকাতায় কসবার পেছনে, হাওড়ায় কোণাতে আর গড়িয়ার কাছে বৈষ্ণবঘাটা-পাটুলীতে। (আরও অনেক কিছু হচ্ছে; আরও অনেক অনেক কিছু করছেন। ওপরের কাজগুলিতে হাত দিয়েছেন সি এম ডি এ)

এত কাজের পরেও অনেক কাজ বাকী থাকছে। সবচেয়ে বড় যে কাজ সেটা হোল সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে না তোলা। জঞ্জাল যাতে যত্রতত্র না জমে, জলের অপচয় যাতে না হয় (সি এম ডি এ মাথা খুঁড়ছে, রাস্তার কলের পাইপগুলির মুখ কি সত্যিই বন্ধ করা যায় না?), ফুটপাথ যাতে অবরুদ্ধ না হয়...

ভাল কথা সবাই বলতে পারে (খারাপ কথাও)। কিন্তু ভাল কাজ কি সবাই করতে পারে? (অবশ্য খারাপ কাজ সবাই পারে... তাই না?) বাংলায় 'সুতানটি গেজেট' আর ইংরেজীতে 'ক্যালকাটা পাস্ট, প্রেসেন্ট, ফিউচার' সি এম ডি এ থেকে সংগ্রহ করুন! দাম এক টাকা।

...টের পাশে একটা ফ্লাইওভার বানানো—দুটোর মধ্যে কত তফাত।

বালিগঞ্জ স্টেশনের গায়ে যেখানে প্রায় আড়াই কোটি টাকার উড়ালপুলের কাজ চলছে সেটা পার হয়ে কসবার আরও অনেক ভেতরে গিয়ে রাণুমাসীকে বলেছিলাম, তাকিয়ে দেখ। কি দেখছো।
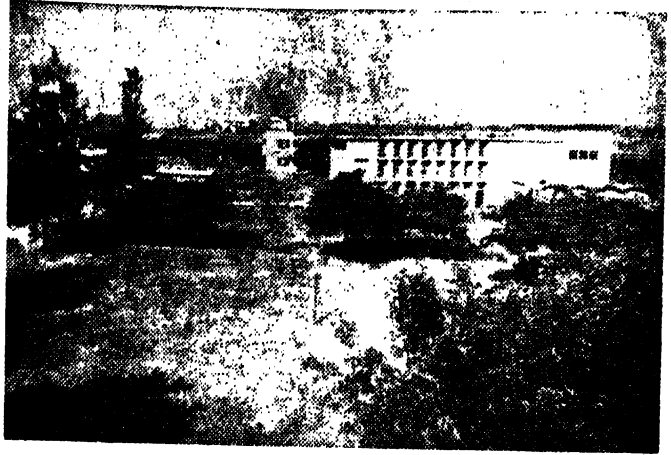
রাণুমাসী হাই তুলে বললেন, কি দেখাতে এসেছিস! জমি? এই ট্যারচেরে গোবিন্দপুরে এসব ব্যাপারে আমার ইন্টারেস্ট নেই।

আমি হাসলাম। বললাম, তুমি ঠিক এই জায়গাটাতেই এসো বছর চারেক পরে। দেখবে এখানে একটা নতুন উপনগরী দাঁড়িয়ে আছে। এটা হবে এক অভিনব উপনগরী। এখানে থাকবে বাজার কমপ্লেকস্। বাজারের সব কিছু এখানে পাওয়া যাবে। আর থাকবে বাস করবার ফ্ল্যাট। নানা আয়ের মানুষের জন্য নানা দামের। এইসব ফ্ল্যাটের মানুষদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য তৈরী হবে স্কুল, হাসপাতাল, দোকানঘর। এখান থেকে অল্প দূরে গড়ে তোলা হবে আরো একটা এলাকা। এখানে সরে আসবে সহরের অনেক খাটাল। প্রায় হাজার দুয়েক খাটালওয়ালা এখানে পুনর্বাসন পাবে। এলোমেলোভাবে কোন কিছু হবে না। আমি ব্লু-প্রিন্ট দেখেছি। বিজ্ঞানসম্মতভাবে তৈরী করা হবে গোয়ালা। দুর্গন্ধ ছড়াবে না। গরুর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। সহরবাসী টাটকা দুধ পাবে। গরুর চিকিৎসার জন্য হাতের কাছেই থাকবে পশু চিকিৎসালয়, ঠাণ্ডাঘর।

ধোপাদের জন্য আলাদা কোন কলোনী হবে—এটা কোন ধোপাই বোধহয় আগে কল্পনা করেনি। কসবায় সেরকম একটা কলোনীও হচ্ছে। বেশ কিছু ধোপা এখানে থাকতে পারবেন। তাদের জন্য সুন্দর চৌবাচ্চা বানানো হবে। সেই চৌবাচ্চার জলে কাপড় কাচা হবে। নোংরা জল জমে থাকবে না। জল নিষ্কাশনের বন্দোবস্ত রাখা হবে।

রাণুমাসী এতক্ষণ চুপ করে সব শুনে বললেন, সত্যি!

আমি বললাম, বললাম তো আর বছর চারেক পরে এসো। শুধু এখানে নয়। গড়িয়ার কাছে বৈষ্ণবঘাটায় কিংবা হাওড়ার কোণায় গেলেও চমকে উঠবে। সেখানেও দেখবে নতুন উপনগরী দাঁড়িয়ে আছে। কোণায় তো শিল্প উপনগরী গড়ে তোলা হচ্ছে। মিনি দুর্গাপুর বলতে পারো। কারখানায় খেটে খাওয়া মানুষেরা স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে কাজ করতে পারবেন। আর কাজ শেষ হলে বাড়িতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকতে পারবেন। হাওড়ার ছোট কারখানায় কেউ নিয়ম মানে না। কোণার শিল্পনগরীতে সবাইকে নিয়ম মেনে চলতে হবে। কোণা এক আদর্শ উপনগরী হয়ে উঠতে পারে।

বাঙ্গালী মেয়েরা বোধহয় চারটে জিনিস সবচেয়ে বেশী চায়। অর্থ, অনুগত স্বামী, সোনার গয়না এবং বাথরুমে অনেক জল।

কলকাতায় জলের বড় অভাব ছিল। এখনও সর্বত্র প্রয়োজন মত জল পৌঁছয়নি। তবে আর দেরী নেই। জল সর্বত্র প্রচুর পরি-

কোণায় উপনগরী তৈরী হচ্ছে
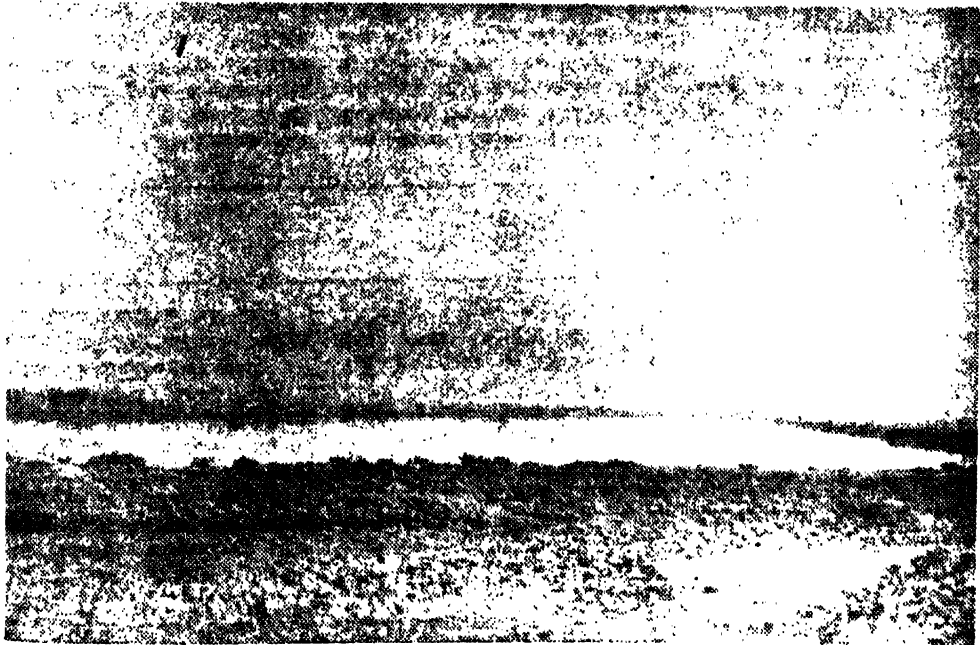
কসবায় যে পতিত জমিতে উপনগরী হবে

অকল্যান্ড প্লেসের ভূগর্ভ জলাধার

মাণে পেঁাছে দেবার কাজ পুরোদমে চলেছে। প্রায় সোয়া দু কোটি টাকা দিয়ে সি-এম-ডি-এ অকল্যান্ডে যে বিশাল ভূগর্ভস্থ জলাধার তৈরী করছেন সেটি দিনে জোগাবে যাট লক্ষ গ্যালন জল।

গরমের দেশের মানুষ আমরা। শীত এখানে থাকে আর কদিন, যেন রিটার্ন টিকিট নিয়েই আসে। গ্রীষ্ম আবার নড়তে চায় না। এলো তো এলোই। মাস ছয়েক পর গা ঝাড়া দেয়। এমন দেশে জল ছাড়া বাঁচা অসম্ভব। শুধু অকল্যান্ডের জল কলকাতার শুকনো ছাতি ভেজাতে পারবে না। তাই তৈরী হচ্ছে মধ্য কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে আরও একটি ভূগর্ভস্থ জলাধার। এখানেও ব্যয় হবে সোয়া দু' কোটির মত টাকা। জোগান পাওয়া যাবে দৈনিক যাট লক্ষ গ্যালন জল।

অকল্যান্ড আর সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার দু জায়গাতেই জল এসে জমা হবে টালা-পলতা থেকে। তারপর এইসব সেন্টার থেকে আবার জল সরবরাহ করা হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে টালা-পলতার জলের ক্যাপাসিটি আরও প্রচুর পরিমাণে বাড়ানো দরকার। পুরোদমে সেই কাজও চলছে। নতুন ইনটেক জেটির কাজ চলছে। এই বছরের মধ্যে শেষ হবে। ভূগর্ভস্থ জলাধার দুটিরও ইঞ্জিনিয়ারিং কাজকর্ম শেষ। এখন অপেক্ষা মোটরের। কিলোস্কারে তৈরী হচ্ছে। মোটরের ভট ভট শব্দ উঠলেই বুঝে নিতে হবে মাটির নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে যাট লক্ষ গ্যালন তরল জীবন।

হাওড়াতেও কাজ চলছে। আন্দুল রোডের পিছনে তৈরী হচ্ছে স্বয়ংসম্পূর্ণ জলাধার। এখানে টালা-পলতা থেকে জল আসবে না। জল সরাসরি আসবে গঙ্গা থেকে। গঙ্গায় যতদিন জল থাকবে ততদিন এসব দিকেও জল পেতে আর বিভ্রাট হবে না। গঙ্গার জল মাটির নিচে টেনে আনা হবে। সেখানে নানারকমভাবে পরিশুদ্ধ হয়ে পানীয় জল কল দিয়ে পেঁাছে যাবে শহরতলীর মানুষদের কাছে। আর টিউবওয়েলের পাশে হাওড়ার মানুষদের লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হবে না। উনিশশো আশী সালের মধ্যে দৈনিক চার কোটি গ্যালন জল পাওয়া যাবে। হাওড়ার প্রয়োজন মিটবে। ভবিষ্যতে যদি আরও জল লাগে তাহলে যাতে এইসব বন্দোবস্ত আরও বিরাটভাবে করা যায় তার জন্যও বন্দোবস্ত রাখা হচ্ছে। প্রায় দশ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে এ ব্যাপারে।

গঙ্গার ওপাশে গার্ডেনরীচ, এপাশে শিবপুরের বোটানিকেল গার্ডেন। গার্ডেনরিচেও প্রায় বারো কোটি টাকা খরচ করে আর একটি জলাধার গড়ে তোলা হচ্ছে। এখানেও জল যোগান দেবেন গঙ্গা। মাটির নিচে ফিলটার হয়ে জল বেরিয়ে আসবে নল দিয়ে। পাওয়া যাবে দিনে ছয় কোটি গ্যালন।

কলকাতায় পানীয় জল বাড়ছে এটা ভাল খবর। কিন্তু এখনও আকছার দেখা যায় কলের মুখ খোলা—ধারেকাছে কেউ নেই। জল পরে যাচ্ছে অকারণে। কারও কাজে লাগছে না। এরকমভাবে চললে প্রয়োজনের পাত্র তো কোন দিনই পূর্ণ থাকতে পারবে না। আমাদেরও যত্নশীল হতে হবে। এখন যখন বাঁচবার ন্যূনতম প্রয়োজনগুলো পাচ্ছি তখন আরও ভালভাবে সেগুলো উপভোগ করার একটা চেষ্টা করেই দেখা যাক না।

রাণুমাসীকে সব দেখাতে পারিনি। বাকি থেকে গেল ব্যারাকপুর কল্যাণী কিংবা কোণা এসপ্রেসওয়ে অথবা হাতের সামনের সাবওয়ে। বেহালার ডায়মণ্ডহারবার রোড দেখলে রাণুমাসী দিল্লিতে গিয়েও হয়তো কিছু বলতে পারতেন। আর সবই কি দেখানো যায়! বিশেষ করে দিল্লির লোকদের —যারা রিটার্ন টিকিট কেটে আসে! মোট চার হাজার জায়গার মাত্র দু-একটি রাণুমাসীকে দেখিয়েছি। এতেই তিনি খুশী বলে গেছেন, আবার আসছি। তোদের কলকাতাকে বাপু এবার যেন ভালই লেগে গেল। পুজোর আগেই আবার আসবো। ট্রেন না ছাড়লে হয়তো আরও কিছু কথা আমি শুনতে পেতাম।

কি ছিল কি হয়েছে...

আমি একজন বেহালার বাসিন্দা। চাকুরিজীবী। রোজ বাসে-ট্রামে অফিস-বাজার করি। রোজ গণ্ডগোল হত কারণ ট্রাফিক জ্যাম, না হলে ট্রাম 'আউট লাইন', না হলে অ্যাকসিডেন্ট। বছরখানেক হোল অবস্থা পাল্টেছে। কারণ রাস্তাটা এখন অনেকাংশে এত চওড়া যে জ্যাম-অ্যাকসিডেন্ট আর হয় না। অবশ্য ট্রাম-বাসের সংখ্যা বাড়লে ভাল হত কিন্তু এখন বেহালাটা যেন কেমন চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী দেখায়। পাশেই বিদ্যাসাগর হাসপাতালও ভাল.......

চেতলা ছিল যেন বৈতরণীর অন্য পাড়ে......অর্থাৎ আদিগঙ্গার ওপারে একটা অনুন্নত অঞ্চল। সম্প্রতি চেতলায় যতীন দাস সেতুটা হওয়ায় বালীগঞ্জ ভবানীপুর চৌরঙ্গী আর দূর নয়; চেতলা আর ফ্যালনা নয়। এমন কি বস্তীগুলিও আর নারকীয় নয়......

হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ধরতে গিয়ে ব্রীজ পেরোতে না পেরে ফিরে এসেছেন বহু ভুক্তভোগী। কারণ বিরাট ট্রাফিক জ্যাম-জট। গত দু'বছর সাবওয়ের কল্যাণে (আর সম্প্রতি উড়াল পুলের একাংশ খোলায়) সে দুর্ভাবনা এখন কম।

উল্টাডাঙ্গার অরবিন্দ সেতু। বেশ কয়েক বছর তপস্যার ফল কিন্তু এই একটি কাজের ফলেই এই এলাকার লোকেরা সত্যি খুশী।

চোখে দেখা না গেলেও পানীয় জলের সরবরাহ অনেক বেড়েছে (প্রায় দ্বিগুণ);

অনেক নালা-নর্দমা বসানো হয়েছে;

হাজার তিনেক হাসপাতালের শয্যা-সংখ্যা বেড়েছে;

অনেক রাস্তা চওড়া, আলোময় আর অনেক পার্ক এখন সবুজ......

(অন্যান্য অনেক সংস্থা কলকাতা উন্নয়নের কাজে নেমেছে; ওপরের ফিরিস্তি শুধু সি-এম-ডি-এর কাজের। বাংলায় "সুতানুটি গেজেট" এবং ইংরেজীতে 'ক্যালকাটা, পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার', সি-এম-ডি-এ থেকে সংগ্রহ করুন। দাম এক টাকা।)

কলকাতার প্রথম সম্পাদক

দেবেশ মুখোপাধ্যায়

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় প্রথম খবরের কাগজ প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন উইলিয়াম বোল্টস্ সাহেব। তিনি কাউন্সিল হাউসের দরজা ও অন্যান্য প্রকাশ্য জায়গায় নোটিশ ঝুলিয়ে 'বৃটিশ প্রজা ও ব্যবসায়ী-দের স্বার্থে খবরের কাগজ বের করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এ খবরে কোম্পানী কর্তৃপক্ষ প্রমাদ গুনলেন। বোল্টস সাহেব ছিলেন ওলন্দাজবংশীয় এবং কোম্পানীর চাকুরে। কোম্পানীর বেনামীতে নিজের ব্যক্তিগত কারবার করার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ায় তিনি কোম্পানির চাকরিতে ইস্তফা দেন। এরকম লোক কাগজ বের করবার অনুমতি পাবেন, আশা করা যায় না। কাজেই কোম্পানি ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ এপ্রিল এই হুকুমনামা জারি করল—'মিস্টার বোল্টস্ বর্তমানে এবং অতীতে সরকার কোম্পানির মধ্যে বিভেদ ও অশান্তি সৃষ্টি করিবার সুস্পষ্ট ইচ্ছায় কোম্পানির পরিচালননীতির প্রতি প্রকাশ্য ঘৃণা প্রদর্শন করায় কোম্পানি এতদিন পর্যন্ত তাঁহাকে যে সুযোগ সুবিধা দিয়াছেন ও তাঁহার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব লইয়াছেন তিনি তাহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন। অতএব তাঁহাকে বাংলা প্রেসিডেন্সি ছাড়িবার নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে। প্রকাশ থাকে যে আগামী জুলাই কলিকাতা হইতে মাদ্রাজগামী প্রথম জাহাজে তাঁহাকে অবশ্যই কলিকাতা ছাড়িতে হইবে যাহাতে তিনি মাদ্রাজ হইতে সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপগামী জাহাজে আরোহণ করিতে পারেন। কোম্পানির এই দমদম দাওয়াইয়ের ফলে সাহেবদের আর খবরের কাগজ বের করবার উৎসাহ হইল না। একটানা বার বছর কোম্পানির শান্তি বজায় রইল।

১৭৮০ সালে আসরে এলেন জেমস অগাস্টাস হিকি সাহেব। অন্যান্য বেসরকারী ইংরেজের মত তিনিও এই সোনার দেশে ভাগ্য ফেরাতেই এসেছিলেন। কারবারীর পাটোয়ারী বুদ্ধি তো দূরের কথা দুর্দান্ত মেজাজী হিকি সাহেবের নিজের ভালমন্দ বোঝবার মত সাধারণ বুদ্ধিরও অভাব ছিল। সদাগর ব্যাপারী হওয়ার যোগ্যতা না থাকলেও তিনি জাহাজের কারবারে হাত দিলেন। ১৭৭৫ ও ১৭৭৬ সালের মধ্যে কারবার ডুবে যাওয়ায় তিনি সর্বস্বান্ত তো হলেনই উপরন্তু তাঁকে 'অনমনীয় কাল ব্যবসায়ী'দের কাছে দেনার দায়ে জেলে যেতে হল। এই হিকি সাহেবের সমসাময়িক ছিলেন কলকাতার এ্যাটর্নী উইলিয়াম হিকি সাহেব, যিনি তাঁর বিখ্যাত ডায়েরীতে সে সময়কার কলকাতার কথা লিখে গিয়েছেন। হিকি সাহেব লোকটি কেমন ছিলেন তা বলতে গিয়ে এ্যাটর্নী হিকি সাহেব তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন যে জেলে গিয়ে দেনার দায়ে জর্জরিত তাঁর সমপদবীর যে লোকটিকে তিনি দেখেছিলেন তাঁকে দেখে একজন অর্ধশিক্ষিত ও ভয়ানক রাগী লোক বলে মনে হয়েছিল। তিনি বহু চেষ্টা করে দু দুবার তাঁকে জেল থেকে খালাস করেন।

জাহাজের কারবারী হিকি সাহেব কি করে খবরের কাগজের জগতে এলেন সে সম্বন্ধে এ্যাটর্নী হিকি তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন যে, হিকি সাহেব জেলে থাকতে ছাপাখানা সম্বন্ধে পড়াশুনা করে এবিষয়ে ওয়াকিফহাল হয়ে ওঠেন। জেল থেকে বেরিয়ে ১৭৭৮ সালে শেষ সম্বল দু হাজার টাকা আর কঠিন পরিশ্রম ও অধ্যবসায় নিয়ে ছাপাখানার ব্যবসায় নেমে পড়লেন। স্থানীয় ছুতোরদের দিয়ে মোটা মোটা টাইপও তৈরী করে ফেললেন। সে সময় কলকাতায় আর কেউ ছাপাখানা চালাত না আর হিকি সাহেব সমস্ত কাজ নিজেই দেখতেন বলে তাঁর ছাপাখানাটি বেশ ভালই চলতে লাগল। হ্যান্ডবিল ও বিজ্ঞাপনের কাজ দিয়ে সাহেবরা তাঁকে সাহায্য করলেন। ভাগ্য ভাল হওয়াতে এর মধ্যে আবার তিনি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাও পেলেন। কোম্পানির সেনাপতি জেনারেল স্যার আয়ার কুট ১৭৭৯ সালে হিকি সাহেবকে সৈন্যবাহিনীর নিয়মকানুন ছাপার মোটা টাকার কাজ দিলেন। কয়েকশ' টাকা জমতেই হিকি সাহেব ভাল টাইপের জন্য বিলিতে অর্ডার দিলেন। ভাগ্য ফেরাবার জন্য হিকি সাহেবের মাথায় সবসময় নানারকম কারবারের চিন্তা ঘুরত। বিলেতে টাইপের সঙ্গে তিনি কিছু ওষুধপত্রের অর্ডারও পাঠিয়ে দিলেন। ছাপাখানার সঙ্গে 'সাইড বিজনেস' হিসেবে ডাক্তারি সার্জেন ও ডিসপেনসারির ব্যবসাও করবেন ঠিক করলেন। তাঁর এ সাইড বিজনেস কিরকম চলেছিল বা আদৌ চলেছিল কিনা, সে সম্বন্ধে এ্যাটর্নী হিকি সাহেব কিছু লেখেন নি।

ছাপাখানার কাজ ভাল চলার ফলে হিকি সাহেবের মনে শান্তি ফিরে এল। উৎসাহিত হিকি অন্তরঙ্গদের বললেন, আমি আশা করছি আমার সমস্ত দেনা শোধ করে ছ হাজার পাউণ্ড (তখনকার দিনের হিসেবে ৬০,০০০ টাকা) জমাতে পারব। এই দিয়ে ইংলণ্ডে একটি বাড়ী কিনে বাকি টাকায় সংসার চালাব।

বেঙ্গল গেজেট

শনিবার ২৯ জানুয়ারী, ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে হিকি সাহেবের সম্পাদনায় কলকাতার প্রথম সাপ্তাহিক খবরের কাগজ, 'দি বেঙ্গল গেজেট' বা 'ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভার্টাইজার' প্রকাশিত হল। বার ইঞ্চি লম্বা ও আট ইঞ্চি চওড়া দুটি পৃষ্ঠা। প্রতি পাতায় তিনটি করে কলাম, যার বেশীর ভাগই ছিল বিজ্ঞাপন, কবিতা, স্থানীয় সংবাদ ও সর্বশেষ পাওয়া বিলিতি খবরের কাগজ থেকে নেওয়া খবরের টুকিটাকি। তাঁর কাগজের নীতির কথা বলতে গিয়ে হিকি সাহেব বললেন—কাগজটি মূলতঃ বাণিজ্যিক, তবে সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে এর দরজা খোলা থাকলেও কোন দলের মতামতই তাকে প্রভাবান্বিত করতে পারবে না। সমসাময়িক ইংরেজরা অবশ্য লিখেছেন যে হিকি সাহেব উচ্চশিক্ষিত না হওয়ায় তাঁর কাগজের মান ছিল নীচু এবং কলকাতার সাহেবদের কেচ্ছা কেলেংকারীর কথা তাতে বেশী থাকত। কাগজটি ছিল কলকাতার সাহেবদের আর সেই কারণেই নেটিভদের সম্বন্ধে কোম্পানির নীতি এতে সমর্থন পেত। কাগজ বেরুনোর কয়েক মাস যেতে না যেতেই হিকি সাহেব শুনলেন আর একজন সাহেব 'ইন্ডিয়া গেজেট' বলে একটা কাগজ বার করে তাঁর গ্রাহকদের ভাঙাবার মতলব করছে। হিকি সাহেব রেগে গিয়ে তাঁর গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে ১৭৮০ সালের ১৭ জুনের সংখ্যায় লিখলেন যে তাঁরা নিশ্চয় এরকম 'নীচ কাজ করবেন না'। ১৭৮০ সালের নভেম্বর মাসে ইন্ডিয়া গেজেট তো বেরুলোই এর ওপর আবার হিকি সাহেব শুনলেন ঐ কাগজকে ডাক মাশুলের ব্যাপারে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। রেগে ফেটে পড়ে হিকি সাহেব লিখলেন যে ঐ বিশেষ সুবিধাটি গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেবের স্ত্রীর ওপর প্রভাব বিস্তার করে আদায় করা হয়েছে।

একাজের ফল হিকি সাহেবকে সঙ্গে সঙ্গেই পেতে হল। ১৪ নভেম্বর ১৭৮০ সালের এক হুকুমনামায় কোম্পানি হিকি সাহেবের কাগজ ডাকঘরে ফেলা যাবে না বলে নির্দেশ দিলেন।

হেস্টিংস সাহেবের চিরশত্রু বিখ্যাত স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস হিকি সাহেবের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলে মনে করা হয়। হিকি সাহেবের কাগজে সব সাহেবদের কেলেংকারীর কথা বেরুলেও ফ্রান্সিস সাহেবের মত এত উচু মর্যাদার লোকও যখন স্ত্রী-ঘটিত বিরাট কেলেংকারীতে জড়িয়ে পড়লেন হিকি সাহেব তখন চুপচাপ ছিলেন।

অবশ্য একথাও ঠিক এতদিনে প্রবল শত্রু ফিলিপ ফ্রান্সিসকে হতমান করিয়ে কলকাতা থেকে সরাতে পেরে নিষ্কণ্টক হেস্টিংস সাহেবের আত্মম্ভরিতা তখন সীমাহীন। হিকি সাহেবের অপরাধ ক্ষমা করবেন এরকম মনের অবস্থাও তাঁর ছিল না। ১০ নভেম্বর ১৭৮০ সাল, হিকি সাহেবের ওপর হুকুমনামা জারি করার মাত্র চার দিন আগে হেস্টিংস ইংলণ্ডে তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, 'ফ্রান্সিসের প্রত্যাবর্তনের অর্থ আমার রাজনৈতিক জীবনের এক অধ্যায়ের শেষ ও নতুন এক

অধ্যায়ের আরম্ভ। এখন থেকে আমার কোন পরিকল্পনার প্রতিবাদ বা আমার ক্ষমতা অস্বীকার করার বা জনসাধারণের সামনে আমাকে হেয় করে এমন আর কেউ থাকবে না। এবার থেকে আমি আমার ক্ষমতায় পূর্ণ অধিকারী হলাম এবং আমি তা সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করব।'

রাজরোষের ফলে হিকি সাহেবের কাগজ মফঃস্বলে যেতে না পাওয়ায় তাঁর আর্থিক ক্ষতি হল চারশ টাকা। তিনি এতে না দমে গিয়ে যথারীতি ব্যক্তিগত কাদা ছোঁড়া-ছুঁড়ির কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। আর্থিক দুরবস্থা যে অপ্রকৃতিস্থ সম্পাদককে আরও বেসামাল করে তুলেছিল তা তাঁর উক্তি থেকেই বোঝা যায়। 'অত্যাচারীদের সামনে নীচু হওয়া বা তাদের খোসামোদ না করায় যদি কাগজ বন্ধ হয়ে যায় তবে গান লিখে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় তা বিক্রি করব। আমি আমার সম্মান, ব্যক্তিস্বাধীনতা হারাতে পারি। হয়ত আমার কাগজও বন্ধ হয়ে যাবে। তবুও আমি দাসত্ব স্বীকার করব না। আমার ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার করা হল তার প্রতিবাদ করে যাব। শেষপর্যন্ত আমি সুবিচারের জন্য আমার কথা ইংলণ্ডেশ্বরের পায়ে নিবেদন করব।' এই গরম গরম কথা লেখার পর মনের জ্বালা জুড়লে তিনি যদি কোম্পানির সঙ্গে বিবাদের পথ ছেড়ে দিয়ে একটু বুঝে শুনে চলতেন তাহলে হয়ত ক্রমাক্রমে তাঁর ওপর বিধিনিষেধগুলো উঠে যেত। কিন্তু তিনি সে পথ দিয়ে ত গেলেনই না উপরন্তু সেই গালিগালাজের পথটাই বেছে নিলেন।

প্রথম আঘাত এল সুইডিশ মিশনারী রেভারেন্ড জন জাকারিয়া কিরেন্ডারের কাছ থেকে যাঁকে তিনি সরাসরি আক্রমণ করেছিলেন। মানহানির দায়ে হিকি সাহেবের চার মাস জেল ও পাঁচশ টাকা জরিমানা হল।

প্রথম সম্পাদকের কারাদণ্ড :

হিকি সাহেব 'সৎ সাংবাদিকতার' নেশায় এতদূর মত্ত হলেন যে, তাঁর আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান রইল না। নিজের ভবিষ্যতের কথা ভুলে তিনি এক নম্বরের ভি আই পি গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস সাহেবের কার্যকলাপ ও প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইম্পের অবৈধভাবে টাকা রোজগারের চেষ্টার কথাও ফলাও করে প্রচার করতে লাগলেন। এর ফলে খোদ গভর্ণর জেনারেল হেস্টিংস সাহেবের মানহানির দুটি অভিযোগে সুপ্রীম কোর্টের আদেশে ১৭৮১ সালের জুন মাসে তিনি গ্রেপ্তার হলেন। প্রতিটি অভিযোগের জন্য চল্লিশ হাজার মোট আশি হাজার টাকার জামিন দেওয়ার ক্ষমতা না থাকায় তাঁকে মামলার শুনানী না হওয়া পর্যন্ত জেলে রাখা হল। জেলে গিয়েও হিকি সাহেবের তেজ কমল না। জেল থেকেই কাগজ বার করতে লাগলেন। হেস্টিংস সফর থেকে ফিরে আসার পর ১৭৮২ সালের জানুয়ারী মাসে মামলার শুনানী আরম্ভ হল ও প্রথম অভিযোগের জন্য এক বছর জেল ও দু' হাজার টাকা জরিমানা ও দ্বিতীয় অভিযোগের জন্য হেস্টিংস সাহেবকে পাঁচ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ হল। হেস্টিংস সাহেব অবশ্য দয়া করে ক্ষতিপূরণটা মাপ করে দিলেন। এত করেও হিকি সাহেব তাঁর স্বভাব বদলাতে পারলেন না। এদিকে কোম্পানিও তাঁর বেয়াদপি আর সহ্য করতে রাজি হলেন না। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের গোড়ার দিকে হিকি সাহেবের ছাপাখানাটি কোম্পানি বাজেয়াপ্ত করে নিলেন। এইভাবে প্রায় দু' বছর চলার পর রাজরোষের ফলে কলকাতার প্রথম খবরের কাগজটি উঠে গেল এবং হিকি সাহেব সর্বস্বান্ত হলেন।

সেকালের কারাগার

কারাবাস ও চরম দারিদ্র্য অপরিণামদর্শী হতভাগ্য সম্পাদকের শিরদাঁড়া গুঁড়িয়ে দিল। একদিন যাঁর কেচ্ছা-কাহিনীর কথা হিকি তাঁর কাগজে বার করতেন, উপায়ন্তর না দেখে সেই প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইম্পের কাছেই দয়াভিক্ষা করে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারি এক দরখাস্তে লিখলেন : 'আমি উনিশ মাসের ওপর জেলে রয়েছি, এর ভেতর ন' মাস আমার জীবিকা উপার্জনের একমাত্র উপায় ছাপাখানাটি বাজেয়াপ্ত হওয়ায় আমার পরিবার প্রতিপালনের উপায় থেকে বঞ্চিত রয়েছি। পাকা বাড়ি ভাড়া নেওয়ার সামর্থ্যের অভাবে আমার ন'টি সন্তান গত বারোদিন অবধি আমার সঙ্গে জেলের ভেতরেই ছিল। আপনারও ত কয়েকটি সুন্দর সন্তান আছে (ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করুন) কাজেই নিরীহ শিশুরা অর্থাভাবে নরক সদৃশ জেলে থেকে শুকিয়ে যাচ্ছে, আর তাদের স্নেহময় পিতা তাদের কষ্ট লাঘব করতে পারছে না—এই অসহনীয় অবস্থাটা অবশ্যই সঠিক বুঝতে পারবেন। এই জেলে কি অবস্থায় আমি বাস করছি, তার বর্ণনা দেওয়ার ভাষা নেই। আমার চারপাশে যারা থাকে, তারা সকলেই ঘোর মদ্যপ ও গুণ্ডা ধরনের ভীষণ বদমেজাজী লোক। এদের দিবারাত্র ঝগড়া-ঝাঁটির ফলে আমার এক মুহূর্তও শান্তি নেই। আমার প্রতিবেশী একজন লেফটেনাণ্ট গুণ্ডো শুধু যে আমায় চরম বিরক্ত করে তাই নয়, একদিন আমার কানে ঘুঁষিও মেরেছে, যদিও আমি তাকে সর্বদাই সাহায্য করেছি।'

হিকি সাহেবের আমলে কলকাতার জেলের অবস্থা কি রকম ছিল তিনটি সূত্র থেকে তা মোটামুটি পাওয়া যায়। ১৭৮২ সালের হাউস অফ কমন্সের সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট, মিঃ কেসী নামে জনৈক কয়েদীর বিবরণী ও এ্যাটর্ণী হিকি সাহেবের ডায়েরি। জেলটি ছিল কেন 'নেটিভে'র বাস্তুভিটার ধ্বংসস্তূপ। জেলের মাঝখানে ত্রিশ বর্গগজ মাপের একটি পুকুর ছিল যেখানে বন্দীরা কোনরকম নিয়মশৃংখলা না মেনে ভিড় করে স্নান করত, কাপড় কাচত। জেলের নৌটভদের সঙ্গে ইয়োরোপীয়ানদের বাস করা অসম্ভব বলে জেলার তাদের পুকুরের কাছে বাঁশ ও ছিটে বেড়া দিয়ে আলাদা ঘর করে থাকার অনুমতি দিতেন। (ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ডের জন্ম ?)। চারিদিকে ভয়ানক দুর্গন্ধ। অসুস্থ বন্দীদের চিকিৎসার কোন বালাই নেই। যারা সাধারণ দেনার দায়ে এসেছে, তাদের দাগী আসামীদের থেকে আলাদা করে রাখায় ব্যবস্থা ছিল না। একজন বৃদ্ধা কয়েদী এ্যাটর্ণী হিকি সাহেবের কাছ থেকে খাবার জল কেনবার পয়সা ভিক্ষা চেয়েছিল। খাবারের অভাবে অনেক কয়েদীই মারা যেত। সাহেব, হিন্দু ও মুসলমান সবাইকে এক জায়গাতেই রাখা হত। কয়েদীদের খাবারের জন্য মেয়েরা মুটের সাহায্যে বাজার নিয়ে আসত এবং আরও স্বচ্ছলদের জন্য দরকার হলে রান্নাবান্নাও করে দিত। এ্যাটর্ণী হিকি সাহেব এ-জেলকে 'বিরাজি জেল' বলেছেন।

আগস্ট ১৭৮৩ সালে হিকি সাহেব আবার সুপ্রীম কোর্টে দয়াভিক্ষার আবেদন করে বিফল হন। কবে তিনি জেল থেকে ছাড়া পান কিনা জানা যায় না। দুর্ভাগ্যের বিষয় কাগজ বের করার আগে ১৭৭৯ সালে হিকি সাহেব জেনারেল স্যার আয়ার কূটের কাছ থেকে কোম্পানির কাগজপত্র ছাপার যে-কাজ পেয়েছিলেন, বহু চেষ্টা করেও তার টাকা আদায় করতে না পারায়, অভাবের তাড়নায় তাঁর সকল দুর্ভাগ্যের কারণ ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেবকে ১৭৯৩ সালের নভেম্বর মাসে সাহায্য ভিক্ষা করে বিনয়ে এক চিঠি লিখে জানান।

হিকির করুণ পরিণাম

হেস্টিংস হিকি সাহেবকে কোন সাহায্য করতে পারেন নি। পারার কথাও নয়। ১৭৯৩ সালেও পার্লামেন্টে তাঁর বিচার শেষ হয়নি। হিকি সাহেব স্যার আয়ার কূটের দেওয়া অর্ডারের টাকা আদায়ের জন্য গরম গরম চিঠি পাঠাতে লাগলেন। শেষের দিকে অসুস্থতার জন্য তাঁর হাতের লেখাও জড়িয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সুদে আসলে তাঁর মোট দাবী ৪৩,৫১৪ টাকা ১ আনা ৩ পাই ১৬ বছর পর ৭ মার্চ ১৭৯৫ সালে মাত্র ৬,৭১১ টাকায় মিটিয়ে নিতে বাধ্য হলেন। এ টাকায়ও তাঁর বেশী দিন চলেনি। সাহায্য ভিক্ষা করে হেস্টিংসের কাছে তাঁর লেখা শেষ চিঠিটির তারিখ ১৭৯৯ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে। যে বন্ধুর হাত দিয়ে তিনি এই চিঠিটা পাঠিয়েছিলেন তাঁকে হেস্টিংস বলেছিলেন যে তিনি একটু স্থির হয়ে হিকির জন্য যদি কিছু করতে পারেন তো করবেন। দীর্ঘ সাত বছর ধরে মামলা চালিয়ে হেস্টিংসের নিজের অবস্থা বোধহয় এমন ছিল না যে হিকি সাহেবকে সাহায্য পাঠান। শেষ পর্যন্ত হিকি সাহেবের পরিণতি কি হয়েছিল জানা যায় না। কলকাতার মৃত ইংরেজদের যে তালিকা আছে তাতে হিকি সাহেবের নাম নেই।

শুরু। আবার দেখা হলে নিশ্চয় তাঁকে চিনতে পারবো। এ জীবনের উচ্চারণের ভঙ্গীতে সে হয়তো আবার বলবে—চ-থ-খে জল আসে...

পশুপতি ভট্টাচার্য রোডে নিজের বাড়ির দেওয়ালে বাবার ছবিখানি দেখিয়ে যোগব্রত সগর্বে একজন সাহসী, আপসহীন মানুষের বর্ণনা দিয়েছিল। তখন মা আমাদের দুজনকে লাউশাক মেশানো ডাল খেতে দিয়ে বলেছিলেন—যোগো ভালবাসে।

আমরাও ওকে যোগো বলেই ডেকেছি।

মাইশোর গার্ডেনে গিয়ে শুনলাম কাজ শেষ। নিজেরা কথা বলতে গিয়ে দেখলাম—প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতেই যোগো কোন না কোন স্মৃতিচিহ্ন ফেলে গেছে। কারও বাড়িতে স্যান্ডেল, কারও বাড়িতে শার্ট, নয়তো পাজামা কিংবা ট্রাউজার। আমার কাছে অনেকদিন একটি মাফলার আর রোদ চশমা পড়ে ছিল। কেন যে এই সেদিন ফেরত দিয়ে দিলাম। উচিত হয়নি। আগে একটু বুঝতে পারিনি। নয়তো ও জেলেদের জালে অভিজ্ঞান হয়ে ফিরে আসার মানুষ!

বৈকুণ্ঠ পাঠক

বাঙলা নাটকে জোতদার

মাননীয় বৈকুণ্ঠ পাঠক,

বাংলা নাটকে জোতদার (অমৃত : ১৮ই মার্চ) লেখাটির মধ্যে যে পরিণত চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছে তার জন্যে আপনাকে সাধুবাদ জানাই। আমাদের নাটকে শাদা এবং কালো চরিত্র এমন মোটা দাগে আঁকা হয়ে থাকে এবং গভীরতর সমস্যাগুলির এমন সরলীকরণ করা হয় যে বাংলা নাটক কতোটা পরিণত হয়েছে সে সম্বন্ধে প্রায়শঃই সন্দেহ জাগে।

কিছুদিন আগে বাদল সরকার বোম্বাইতে একটি ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণের চাঞ্চল্যকারী অংশগুলি নিয়ে খুব গোরগোল পড়ে যায়, কিন্তু চিন্তনীয় আরো যে সকল তাঁর ভাষণে ছিল সেগুলি কোথাও আলোচিত হতে শুনলুম না। বাংলা নাটকে গ্রামীণ সমস্যাগুলির হাস্যকর অতি সরলীকরণ প্রধান উদাহরণ হিসেবে তিনি জোতদার চরিত্রটির উল্লেখ করেছিলেন। এই চরিত্রটি ধনী হওয়া চাই এবং সেইজন্যেই তার ভিলেন হওয়াটাও প্রায় বাধ্যতামূলক।

এইসব দেখেশুনে মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে যে আমাদের ব্যবসায়িক মঞ্চগুলির সঙ্গে এই আধুনিক মঞ্চগুলির মূলগত তফাতটা কোথায়। প্রথমোক্ত মঞ্চে যেমন আমাদের সামাজিক ভালোমন্দের অস্তিত্ব বা আদর্শকে সহজ ফর্মুলায় বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তেমনি এই বৈপ্লবিক মঞ্চগুলিও কি জীবনের গভীর সমস্যাগুলিকে একটা সরলীকৃত রাজনৈতিক ফর্মুলায় টেনে আনার প্রবণতা দেখান না? আমরা নিজেরা যে মতবাদেই বিশ্বাসী হই না কেন, আত্ম-সমীক্ষার প্রয়োজন আমাদের সকলেরই আছে। এই সমীক্ষার প্রবণতা থাকলে যে কোনো সমস্যাকে নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। যে মঞ্চ নিয়ে বাংলা গৌরবান্বিত, সেখানে আমরা এই মননের পরিণত চিন্তাধারার সঙ্গেই পরিচিত হতে চাই।

শম্ভু মিত্র একটি প্রবন্ধে আধুনিক যুগের বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, "আমি চাইছি গালাগালি ইতরোমি অতিক্রম করে একটা স্থিরবুদ্ধি সমীক্ষা।...এতে লোকে বুঝতে পারবে যে, আমরা কি জটিল অবস্থার মধ্যে আছি। এবং কোনো সস্তা শ্লোগানে এর থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে না। অথচ মুক্তিটা তো পেতে হবে। কোন পথে মুক্তি পাবো আমরা?"

মুস্কিলটা হোল ওই 'স্থিরবুদ্ধি' কথাটা নিয়ে। সেনসেশনালিজম-এর যে সর্বস্তরে কি চটক তা হয়তো আমরা সব সময় বুঝতে পারি না। স্তর হিসেবে তার রূপটা আলাদা বটে, কিন্তু মূলতঃ ব্যাপারটা একই।

আর একটা কথা। উৎপল দত্ত বা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু অসাধারণ শক্তিশালী অভিনেতাই নন, তাঁরা বাংলা রঙ্গমঞ্চের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। জনমত গঠনে তাঁদের প্রভাব সম্বন্ধে তাঁরা পূর্ণমাত্রায় সচেতন। তাঁদের নাটকে যদি এখনো অত্যাচারী ভূস্বামী বা জোতদারের চরিত্র দেখা যায়, তবে তা বিশ্বাসযোগ্য কিনা সে প্রশ্ন সম্বন্ধেও আশা করবো তাঁরা যথেষ্ট সচেতন।

নমস্কারান্তে,
শ্রীলেখা বসু,
বোম্বাই

আমার কবিতার কথা

১ এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত আমার তিনটি কবিতা 'যাও বালানন্দ ও গণতন্ত্র'-এর লে-আউট বেশ পছন্দসই হয়েছে। নাতিদীর্ঘ পরিচিতিটির জন্যে বন্ধুবর অমিতাভ দাশগুপ্তকে ধন্যবাদ।

দু-একটি ভুল সংশোধন করে দিতে চাই।

১। আমার জন্ম ১৫ আগস্ট ১৯৩১ (১৯৩০ নয়)।

২। আমার জীবিকা—বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে অর্থ সচিবের চাকরি। সোজা কথায় 'গোমস্তা'। সি-এ আমার অন্যতম উপাধি।

৩। উদ্ধৃত কবিতাংশের সঠিক পাঠ :

"আমাদের রান্না ভালোবাসো বলে রান্নাঘরে এসো না হঠাৎ। এই সময় এলে তুমি অবোধ ডিমের মতো সিদ্ধ হয়ে যাবে।"

('হাঁসের ডিমের মতো'—না)।

মুগ্ধ নিষ্পাপ পাঠিকার ছবি ফোটাতে ডিমের উপমা। 'অবোধ' বিশেষণ তাকে মানায়। সত্যি, কী নিটোল, সুন্দর, অসহায় ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জিনিস এই ডিম, প্রকৃতির সৃষ্টি, তাই না? অথচ রান্নাঘরের পরিপ্রেক্ষিতে এ শিল্পমাল্য নষ্ট হয়ে যায়। এই সব চিন্তা আছে 'অবোধ' শব্দটির পেছনে।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

পটরচনায় শ্যামাপদ চিত্রকর

এইভাবে কি পট ও পটুয়ার মৃত্যু ঘটে?

সম্প্রতি পার্ক স্ট্রীট রোডে ... ক্রেতা সার্ভিস প্রদর্শনী কক্ষে ... মেদিনীপুর ... মেসেজ্ জড়ানো পটের এক মনোজ্ঞ প্রদর্শনী আয়োজন করেন। ১৯৭৩ সালে ... সাংস্কৃতিক বিনিময়ে পশ্চিমবঙ্গের ... পটের নান্দনিকতায় আকৃষ্ট হয়ে পরের বছরই জড়ানো পটের ... গবেষণা শুরু করেন। গবেষণার ... এখন শেষ হয়েছে। বাংলার বিস্তৃত ... পদে ঘুরে ঘুরে তিনি এ কাজে ... রয়েছেন গভীর অনুসন্ধিৎসায়।

এই প্রদর্শনীতে রয়েছে মেদিনীপুর, বীরভূম ও পুরুলিয়া জেলার ... ১৯টি জড়ানো পট। তার মধ্যে ...

কানাকানি

পাঞ্জাবের এক জাঁদরেল দেওয়ানের নাটক-পাগল পৌত্র গিয়েছিলেন নিউ ইয়র্ক। ব্রডওয়েের
গিয়েছিলেন নউইয়র্ক। বডওয়ের
কয়েকটি মঞ্চে নাট্যাভিনয়ের মাথাটি চটকে ভদ্রলোক পাড়ি দিয়েছিলেন ভাগ্যান্বেষণে লণ্ডনের উদ্দেশ্যে। সময়টা সম্ভবতঃ পঁয়ষট্টি-ছেষট্টি সাল। অতবড় শহরে জানাশোনা প্রায় কেউ নেই। বলতে গেলে ফুটপাথেই তাঁর দিন কাটে। আর টো-টো করে চরকি মারতে হয় শহরটায় কাজ খোঁজার জন্য। নাটক তবুও তিনি ছাড়েননি। খেয়ে না-খেয়ে নাট্যশালার দরজায় ঘুরেছেন, টি-ভি প্রোগ্রাম করেছেন। আর আজ? আজ তিনি জন হাস্টন-রেলফ নেলসনের ছবিতে কাজ করেন, এখন কাজ করছেন সত্যজিৎ রায়ের সতরঞ্চ-কে-খিলাড়িতে: নাটক পাগল সেই ভদ্রলোকের নাম সৈয়দ জাফরে।

*　*　*

পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ছেলেমেয়েদের নিয়ে কলকাতায় খুব কম ছবিই হয়েছে। কলকাতায় নতুন মুখও তেমন দেখা যাচ্ছে না আজকাল। তপন সিংহের 'পুরস্কার' (হিন্দী) বোধ হয় আর সেই বদনামটি রাখবে না। এ-ছবিতে পুনা ইনস্টিটিউটের ছজন ছাত্রছাত্রী কাজ করছেন। মালা জগ্গি রীনা বড়ুয়া বিজয় অরোরা, অমজদ চৌধুরী, শত্রুঘ্ন সিনহা, সাধু মেহের। এ'রা প্রত্যেকেই অভিনয় পাঠক্রম নিয়ে পাশ করেছিলেন ইনস্টিটিউট থেকে, একমাত্র ব্যতিক্রম সাধু মেহের। পরিচালনায় হাত পাকিয়ে এখন তিনি বেশীর ভাগ ছবিতেই ক্যামেরার সামনে হাজির হচ্ছেন।

*　*　*

আউটডোর শ্যুটিং চলছে একটি বাড়িতে। বাগানঘেরা জায়গায় নায়ক নায়িকা একটি মিষ্টি আলাপের দৃশ্যে দু-চারটি হাল্কা রোমান্টিক কথা বলবেন। ক্যামেরা মিড লং সটের দূরত্বে দাঁড়িয়ে। রিহার্সাল আলোর মাপজোক ইত্যাদির পর টেক স্টার্ট হতেই ক্যামেরাম্যান বলে উঠলেন—'কাট কাট-কাট। রান আউট হয়ে গেছে ফিল্ম।' (ফিল্ম শেষ হয়ে গেছে।) নায়ক-নায়িকার মুড গেল নষ্ট হয়ে। পরিচালক লাঞ্চব্রেক দিলেন। ভরপেট খাবার পর দুজনের কেউই আর রোমান্টিক হয়ে উঠতে পারলেন না সেদিন। শুনেছি সেই দৃশ্য নাকি এখনও টেক করা যায়নি।

মেদিনীপুরের। অধিকাংশই ধর্মীয় পট। সতীশ পটীদারের 'দাতা কর্ণ' কিংবা ননীগোপাল চিত্রকরের 'চিতা বাণী' পটের অলংকরণসমৃদ্ধ শিল্প সুষমায় মোহিত হতে হয়। অন্যান্য ধর্মীয় পটের মধ্যে ছিল মনষামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, সাবিত্রী-সত্যবান, সত্যপীর পট ইত্যাদি। ঈশান পটীদারের সাহেব পটটির কাজ মন্দ নয়। শ্যামাপদ চিত্রকরের মনষা মঙ্গলও শিল্প ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ নিঃসন্দেহে।

পটুয়া শিল্পীরা যে কতটা রাজনৈতিক সচেতন তার দৃষ্টান্ত মেলে বাপী চিত্রকর অঙ্কিত বিশ দফা কর্মসূচী ও দুখুশ্যাম চিত্রকরের আঁকা 'জয়বাংলা' নামক ধর্মনিরপেক্ষ পট থেকে। বাপী চিত্রকর জোরালো রৈখিক বিন্যাসে গড়ে তোলেন চিত্রের শরীর। দুখু শ্যামর রেখা ধীর বহতা। রঙের প্রয়োগে পরিলক্ষিত শীতলভাব সমাহার। এই প্রদর্শনীতে সাজানো পটুয়াদের জীবনধারার কিছু অন্তরঙ্গ আলোকচিত্র এবং তাঁদের রঙ তুলি এবং শিল্প উপাদান প্রভৃতি থেকে এ'দের জীবন ও শিল্প সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা গড়ে তুলতে পারবেন সাধারণ রসিকরা।

চিত্রকরদের মধ্যে এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুরের দুখুশ্যাম চিত্রকর। তিনি মনসা ও কৃষ্ণলীলার পট দেখিয়ে পট গান শোনান সমবেত সুধীজনকে। সঙ্গীতের সুর এবং চিত্রের রঙ একাত্ম হয়ে একটি সুসংহত ও সম্পূর্ণ রূপকল্পের ছায়া সঞ্চারিত করে আমাদের মনে।

অধুনা এই সুপ্রাচীন জনপ্রিয় লোকশিল্পটি কিন্তু মৃত্যুর পথে। সামান্য পাঁচ-দশ টাকায় পটও বিক্রি হয় না। ফলে জীবনধারণের জন্যে পটুয়াদের দিন মজুরীর কাজ করতে হয় দু-তিন টাকা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। অভাবের তাড়নায় অনেকেই পট আঁকা ছেড়েছেন। অনেকেই অন্য জীবিকায় নিযুক্ত হয়েছেন। নিদারুণ অর্থকষ্টে চিত্রকরদের তুলির টান স্তব্ধ হতে চলেছে।

এইভাবে কি পট চিত্রের মৃত্যু ঘটবে?

প্রশান্ত দাঁ

আমাদের শহরতলী আমাদের মফস্বল

জল্পেশ্বর মন্দির
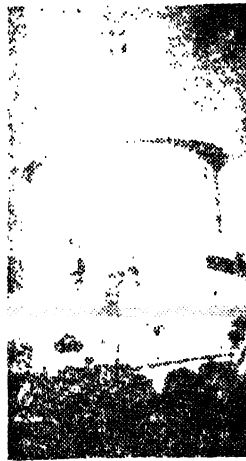
শিব হয়েছেন জল্পেশ্বর

এ এলাকাকে বলা হয় মহাকাল ক্ষেত্র। মহাকালের নামে উত্তরবাংলার এ অঞ্চলের মানুষ শ্রদ্ধায় প্রণাম জানায়। শৈল-শিখর থেকে সমতল ভূমি পর্যন্ত নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে মহাকালের নিদর্শন।

এই অঞ্চলের অন্যতম শৈব পীঠস্থান জলপেশ। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের গড়ভাঙ্গি অঞ্চলকে শ্রীশ্রীজল্পেশ্বরের মন্দির। প্রতি বছর ফাল্গুণী কৃষ্ণা চতুর্দশীতে সারা উত্তরবঙ্গ থেকে কাতারে কাতারে মানুষ আসে দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনায়। সেই সময় মন্দিরের অল্প দূরে বসে এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো মেলা।

শ্রীরামচন্দ্রের সাধনায় তুষ্ট হয়ে দক্ষিণ ভারতে শিব হয়েছেন রামেশ্বর। বিহারের দুমকা জেলার দেওঘরে বৈদ্যুর সাধনায় তুষ্ট হয়ে শিব হয়েছেন বৈদ্যনাথ বা বৈদ্যনাথ। আর উত্তরবঙ্গে জল্প রাজার সাধনায় তুষ্ট হয়ে ভক্তের নাম ভুবনবিশ্রুত করার জন্য শিব হয়েছেন জলপেশ্বর। এর প্রমাণ আছে আমাদের শাস্ত্রে।

জলপেশ্বরের ঈশান কোণে কালিকা পুরাণ বর্ণিত মহাশক্তি মহাদেবী সিদ্ধেশ্বরী রয়েছেন।

মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে জটেশ্বরী (ডাক নাম জরদা) নদী। শিবের বিয়ের সময় মায়েরা শিবকে স্নান করাতে গেলে মহাদেবের জটা থেকে যে জল নেমে আসে তাতেই উৎপন্ন হয়েছে জটোদ্ভবা নদী।

তিস্তা নদীর পূর্ব তীর থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে জটোদ্ভবা নদীর পাশে গড়ভাঙ্গি অঞ্চলে জল্প রাজা কোন মন্দির নির্মাণ করেছিলেন কিনা, তা জানা না গেলেও, এ কথা সকলেই জানেন যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে কোচবিহারের তদানীন্তন মহারাজা প্রাণনারায়ণ দেব জল্পেশ্বর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। গত ১৮৯৭ সালের জুন মাসে প্রবল ভূমিকম্পে সেই মন্দিরের

মন্দির ভেঙ্গে পড়ে। এখনকার মন্দির তৈরীর কাজ শেষ হয় ১৯৩৯ সালে।

জলপাইগুড়ি জেলার নানা স্থানে আছে শিবের মন্দির। শিব চতুর্দশীকে কেন্দ্র করে সেই সব মন্দিরের কাছেও ছোট ছোট মেলা বসে। তার মধ্য দুটি উল্লেখযোগ্য মেলা হল রাজগঞ্জ ব্লকে জল্পেশ্বর শিব মন্দিরের মেলা আর দক্ষিণ বেরুবাড়ীর গৌরচণ্ডী গ্রামে শিবরাত্রির মেলা। দুটি মেলাই চলে দুদিন ধরে। ভিড়ও হয় বেশ।

সন্তোষ ঘোষ।

বাঙলার বাইরে বাঙালী
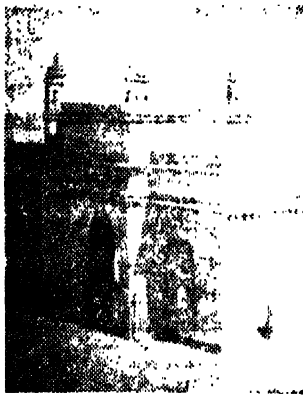
গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়া

বোম্বাই

জাভেরি বাজার

কুবেরের কুপাধন্য বোম্বাই শহরে এলে তার ধন ভাণ্ডার বা রত্নাগার দেখতে বাসনা জাগা বিচিত্র নয়। সেই জন্য অনেকে আসেন গয়নার বাজারে। বিশাল চত্তর জুড়ে রয়েছে অলংকারের দোকান। যার নাম এখানে জাভেরী বাজার। ইংরেজি ইউ আকৃতির ভূখণ্ডে এই বাজার যার তিন দিকে ঘিরে রয়েছে মুম্বা দেবী রোড, শেখ মেনন স্ট্রীট এবং ধনজি স্ট্রীট।

জাভেরী বাজার দিয়ে হাঁটার সময় মাঝে মাঝেই ঘরোয়া বাংলা আপনার কানে আসবে, তখন আপনি যদি ফিরে দেখেন তো চোখে পড়বে উত্তর কলকাতার সাবেকি চালের ধুতি পাঞ্জাবি পরে, মুখে পান দিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করতে করতে চলেছে কতকগুলি সম্পূর্ণ বাঙালী।

এই সব নিতান্ত বাঙালী চেহারার বাঙালীরা এখানকার অলঙ্কার শিল্পী। অলঙ্কার শিল্পে, বোম্বাই কেন মহারাষ্ট্রেই বাঙালী একটি বিশেষ নাম। এই শিল্পীরা এক শতাব্দীর উপর এখানে থেকেও সম্পূর্ণ বাঙালী।

জীবিকান্বেষণে বাঙালী স্বর্ণকাররা প্রায় একশ' কুড়ি বছরেরও ওপর এখানে বসতি শুরু করেছেন। শুনলে আনন্দ হয় যে, বোম্বাই শহরে নিরানব্বই জন হীরা সেটিং-এর কারিগরই বাঙালী। অর্থাৎ গয়নার যাবতীয় সূক্ষ্ম এবং মূল্যবান কাজই বাঙালীরা করেন।

জাভেরী বাজারের দুধারে সুন্দর সুন্দর 'শোরুম' সহ সুসজ্জিত দোকান রয়েছে। দুঃখের বিষয় এই সব দোকানের কোনটির মালিকই বাঙালী নন। যদিও বোম্বাই এ বাঙালীর গহনার দোকান আছে প্রায় তিনশোর মত এবং সেগুলি জাভেরী বাজারেই। এই দোকানগুলি বাড়ির দোতলা, তিনতলা এমন কি চারতলায় পর্যন্ত রয়েছে।

অলঙ্কার শিল্পী যারা বাঙালী দোকানে কাজ করে তারা সবাই বাঙালী। অবশ্য অনেক বাঙালী কারিগর স্থানীয় লোকের দোকানে কাজ নিয়েছে।

বাঙালী শিল্পীরা দোকান সাজিয়ে না বসে ফুরণের অথবা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করে থাকে ফলে গ্রাহকের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ কমই।

বাঙালী অলঙ্কার শিল্পীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মোটামুটিভাবে সাজিয়ে দোকান করে জমিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছেন, যেমন উপেন্দ্রনাথ দাস পরিবার, নীলমণি সিকদার (স্বর্গত), বাবু জহরলাল বেজ ইত্যাদি। উপেন্দ্রনাথ দাসের পিতৃব্য অন্নদাপ্রসাদ কর্মকার প্রায় একশ' বছর আগে জীবিকান্বেষণে এখানে আসেন।

বোম্বাই শহরে এঁরা প্রায় দুশ' ঘর মত রয়েছেন। জনসংখ্যা প্রায় দশ হাজার। বোম্বাই এবং বৃহত্তর বোম্বাইতে এঁরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। কয়েক পুরুষ ধরে পাশ্চাত্য ভাবধারায় সম্পৃক্ত এই শহরে বাস করেও কিন্তু এঁরা মনে প্রাণে বাঙালী এবং বাংলা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। দুর্গা পূজো, সরস্বতী পুজো, ফুটবল খেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—সবেতেই তাঁরা উৎসাহী। কালবাদেবী অঞ্চলে এঁদের প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গলী ক্লাবে যে পরিমাণ বাংলা বই আছে, সম্ভবত অন্য কোন লাইব্রেরীতে নেই। এঁরা একটি প্রাইমারি স্কুলও চালাচ্ছেন যাতে বাংলা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

নানা অর্থনৈতিক চাপে হীরার কাজ আগের তুলনায় কমে যাচ্ছে। এই জন্য বংশ পরম্পরা গত বাঙালী হীরার কারিগররা তাঁদের উত্তর পুরুষদের অন্য কোন জীবিকায় দেবার কথা ভাবছেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি

বিশ্ব টেবল টেনিস

বার্মিংহামে আয়োজিত ৩। বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় । গত বিভাগের খেলায় প্রজাতন্ত্রী সোয়েথলিং কাপ এবং করবিলন জয়ের গৌরব লাভ করেছে। প্রজাত চীন পুরুষ বিভাগের ফাইনালে ৫ খেলায় জাপানকে হারিয়ে সোয়েথ কাপ জয়ী হয়। অপরদিকে মেয়ে বিভাগের ফাইনালে ৩—০ খে ১৯৭৩ সালের চ্যাম্পিয়ান দ কোরিয়াকে পরাজিত করে করবিলন পায়। এই নিয়ে প্রজাতন্ত্রী চীন বছরের আসরে সোয়েথলিং কাপ করবিলন কাপ জয়ের দুর্লভ লাভ করলো মোট তিনবার (১৯ ১৯৭৫ ও ১৯৭৭) এখানে উল্লে প্রজাতন্ত্রী চীন ছাড়া একই আসরে সোয়েথলিং কাপ এবং কর্বি কাপ জয়ী হয়েছে জাপান—৪ (১৯৫৪, ১৯৫৭, ১৯৫৯ ও ১৯৬৭) এ আমেরিকা ১ বার (১৯৩৭)।

বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা আসরে সর্বাধিকবার দলগত খেতা জয়ের রেকর্ড ঃ

সোয়েথলিং কাপ (পুরুষ বিভাগ ১১ বার হাঙ্গেরী। হাঙ্গেরীর শেষ জ ১৯৫২ সালে।

করবিলন কাপ (মহিলা বিভাগ ৮-বার—জাপান। জাপানের শেষ জ ১৯৭১ সালে।

এবারের আসরে পুরুষ বিভাগে সেমিফাইনালে চীন ৫— খেলায় সুইডেনকে এবং জাপান —৩ খেলায় হাঙ্গেরীকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠে ছিল। অপর দিকে মহিলা বিভাগে সেমিফাইনালে চারটি দেশই ছিল এশিয় মহাদেশের—প্রজাতন্ত্রী চীন, জাপান দক্ষিণ কোরিয়া এবং উত্তর কোরিয়া পুরুষ এবং মহিলা বিভাগের ফাইনালে খেলেছিল এশিয়ার তিনটি দেশ—প্রজা তন্ত্রী চীন (পুরুষ ও মহিলা বিভাগ) জাপান (পুরুষ বিভাগ) এবং দক্ষি কোরিয়া (মহিলা বিভাগ)। এশিয়া মহা দেশের জয় জয়কার!

কমনওয়েলথ টেবল টেনিস

গার্ণেসিতে আয়োজিত ১৯৭৭ সালে চতুর্থ কমনওয়েলথ টেবল টেনিস প্রতি যোগিতায় হংকং পুরুষ ও মেয়েদের দল গত এবং ব্যক্তিগত বিভাগে পুরুষ মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের প বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে কমনওয়েলথ টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা আগের তিনটি আসর বসেছিল ১৯ সালে সিঙ্গাপুরে, ১৯৭৩ সালে ওয়েলস এবং ১৯৭৫ সালে অস্ট্রেলিয়াতে

এখানে উল্লেখ্য, আগের তিনটি আসরের প্রতিটিতে দলগত এবং ব্যক্তিগত সমস্ত খেতাবই জয়ী হয়ে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিল ইংল্যান্ড। এবারের প্রতিযোগিতায় ইংল্যান্ড শক্তিশালী খেলোয়াড়দের বাদ দিয়ে যোগদান করেছিল। কারণ বার্মিংহামের আসন্ন বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডের খ্যাতনামা খেলোয়াড়রা প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

এবারের প্রতিযোগিতায় হংকংয়ের দুই অবাঙালি খেলোয়াড় পুরুষ ও মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন। পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে কুয়াং সু লী (হংকং) ২১—৪, ২১—১৫, ১৯—২১, ১২—২১ ও ২১—১৬ পয়েন্টে ইংল্যান্ডের ১৮ বছরের তরুণ খেলোয়াড় এন্ড্রু বার্ডেনকে পরাজিত করেন। মেয়েদের সিঙ্গলস ফাইনালে সীল ইং চ্যাং (হংকং) ২১—১৮, ২১—১৪ এবং ২১—১৯ পয়েন্টে স্বদেশের কিউ মান সিউকে পরাজিত করেন।

সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়

ফাইটিং পিকচারের ম্যাটিনী আইডল

ভিলেনের লালসার হাত থেকে বাঁচবার জন্য হিন্দী সিনেমার নায়িকারা যে বিশাল বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন নিশ্চিন্তে আমি সেই বুকটার দিকেই সেদিন প্রথম তাকিয়েছিলাম। চওড়ায় আট চল্লিশ ইঞ্চি—যা ঢাকা ছিল নকশা কাটা সিল্কের পাঞ্জাবিতে। রাস্তার মোড়গুলোতে প্লাইউডের যে কাঠকেশো দারা সিং কুস্তির পোঁজে এখন কলকাতা পাহারা দিচ্ছেন, তার চেয়ে অনেক বেশী রোমান্টিক লাগছিল আমার সামনে বসা ওই দারা সিংকে। চুলের সামনের দিকটা বেশ বাহারী যদিও জুলপিতে কয়েকটা প্রতারক রুপোলী রেখা—বিশ্বের 'যেমন-ইচ্ছে' (ফ্রি স্টাইল) কুস্তির চ্যাম্পিয়ান দারা সিং রণধাওয়া এ বছরই সাতচল্লিশে পা দিলেন।

একালের হারকিউলিসের গালে কলকাতার এ্যানোফেলিস মশার কয়েকটি আদরের দাগ—যাদের বাগ মানাতে উনি মাঝে মাঝেই অনামনস্ক হয়ে হাত বোলাচ্ছিলেন। আর তখনই পাঞ্জাবির চিলে হাতা ভেদ করেও ওর আঠার ইঞ্চি বাইসেপের অস্তিত্বটা টের পাচ্ছিলাম। কথা বলার সময় ফিল্মী হিরোদের মতো হাসছিলেন দারা। গুণগ্রাহীদের আসা যাওয়ার বিরাম ছিল না, টেলিফোনের

দারা সিং

ঝাঁকিয়ে ওঠার তো নয়ই—তবুও ওর চোখে বিরক্তির চিহ্ন দেখলাম না। ফাইটিং পিকচারের ম্যাটিনী আইডল দারা পেশাদারী কুস্তির জগতে সাড়া জাগাতে পেরেছেন কেবল নাকি ওর শান্ত মেজাজের জন্যই।

প্রথমেই দুম করে বলেছিলাম ক্যারাটে ও পাইপ গানের যুগে বিশাল শক্তিধর হওয়ার কোন সার্থকতা আছে কি না। পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়লেন দারা—'শুধুমাত্র লড়াই করার জন্যই কি শক্তিমান হওয়া দরকার? বাড়তি কাজ করার প্রেরণা, নীরোগ হয়ে জীবন যাপন এবং মানসিক স্বাস্থ্যটা ভাল রাখার জন্যও কি বলিষ্ঠ হাওয়ার প্রয়োজন নেই?'

সাঁইত্রিশ বছর আগে পাঞ্জাবের ধরমচুক্কা গ্রামে লেংটি পড়ে দেশোয়ালী ভাইদের সঙ্গে দারা প্রথম আখড়ায় নেমেছিলেন। এখন নামছেন নেতাজী স্টেডিয়ামে হ্যালোজেন বাতির আলো মেখে কাঠের মঞ্চেতে। নয় বছর আগে বোম্বেতে লুথেসকে (আমেরিকা) হারিয়ে দারা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানের বেল্ট কোমরে লাগান। এখনও পর্যন্ত ১৪৩টি লড়াইয়ের পরও ওই বেল্ট কেউ খুলে নিতে পারে নি। সম্প্রতি দারা স্থির করেছেন কুস্তির রিং থেকে বিদায় নেবেন বিশ্ব-সেরার তকমাটা পেশাদার কুস্তিগীরদের আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে।

এত বছর ধরে দারার অপরাজিত থাকার রহস্যটা কি? দারা-কিং কং লড়াইয়ের ব্যাপারটা এক সময়ে তো লোমহর্ষক ছিল। কিং কংয়ের তিনশো নব্বই পাউন্ডের বিশাল দেহটি দারা মাথার ওপর তুলেও বনবন করে ঘুরিয়েছেন এক সময়, আছড়ে ফেলেছেন কানাডার জর্জ গোডিয়েংকো এবং স্কটল্যান্ড চ্যাম্পিয়ান বিল রবিনসনকেও। এই সেদিনও ব্রাউন বম্বারকে ছুড়ে ফেলেছেন মঞ্চের বাইরে। এরোপ্লেন স্পিন আর ইন্ডিয়ান ডেথ লকই নাকি দারার মারণাস্ত্র। বিদেশীরা স্লো মোশনে ছবি তুলেও যে প্যাঁচগুলোর হদিশ করতে পারে নি।

দারার ভোজ্য তালিকা শুনুন। সকাল ৮টায় এক কিলো দুধ ও বাদামের সরবত। দুপুরে বারোটায় ৫টা চাপাতি, একটি মুরগী, গোটা ছয়েক কলা আর কিছু মরশুমী ফল। বিকেল ৫টায়ও কিলো খানেক দুধ, রাতে দুটো চাপাতি, আধ খানা মুরগী এবং সামান্য তরকারী ও ফল। দিনে দু ঘণ্টা ব্যায়াম, দশ ঘণ্টা স্যুটিং, চার ঘণ্টা গল্পগুজব ও আট ঘণ্টা ঘুম—এই হল দারার নিত্যকার কাজ।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম সিনেমা এবং কুস্তি—দুটোর মধ্যে কোনটা এখন বেশী টানছে। দারার উত্তর—'কুস্তিই ছিল এতদিন ফারস্ট লাভ। বয়স হয়ে যাচ্ছে, এবার তো সরে যেতেই হবে। সিনেমা নিয়ে এখন মাথা ঘামাচ্ছি। একটা পাঞ্জাবী ছবির ডিরেকশন দিচ্ছি—ধ্যানু ভগত—সেটা নিয়ে খুব ব্যস্ত আছি। জানেন নিশ্চয়ই আমার ডিরেকশন দেওয়া পাঁচটা ছবিই হিট করেছে।' দারা এ যাবৎ আশীটা ছবিতে নেমেছেন।

কথা বলছি এমন সময় ফোন এলো এয়ারপোর্টে যাবার জন্য গাড়ি রেডি, বোম্বে ফিরে যাচ্ছেন দারা ওর জুহু বীচের ফ্ল্যাটে। যেখানে বউ সুরজিত ও পাঁচ ছেলেমেয়ে রয়েছে। উঠে আসবার সময় পাঞ্জাবীতে 'সৎ শ্রিকালজী' (ঈশ্বরই সত্য) বলতেই দারা খুশী হয়ে আমার হাতে এমন ঝাঁকুনি দিলেন যে সে ব্যথা আমার দু দিন পর্যন্ত ছিল।

রূপক সাহা

সুমিত্রা গুহ

গত ২রা এপ্রিল সন্ধ্যায় হিন্দ হাইস্কুলের মঞ্চে আয়োজিত শ্রীমতী নমিতা গুহ (রাজু)র একক সঙ্গীতানুষ্ঠান শুনলাম। কলকাতার শ্রোতাদের কাছে তাঁর গান নতুন নয়। একাধিক অনুষ্ঠানে তাঁর গান শোনা গেছে। একক অনুষ্ঠানের তাৎপর্য তাই পরিলক্ষিত হয়েছে শ্রোতৃসমাগমে।

আমন্ত্রণপত্রে প্রকাশিত সময়ের কিছু পর অনুষ্ঠান শুরু হল সরস্বতী বন্দনা দিয়ে। তারপর পুরিয়া-কল্যাণের বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল গান। কণ্ঠস্বরের তীব্রতা আছে কিন্তু দম কম। যাদের অংশ মাইক্রোফোনেও ধরা পড়ছে না। পুরাতন ধারা অনুযায়ী আলাপ

করবার পর গান ধরার বদলে শুরুতেই গান এবং তারই মধ্যে রাগালাপ বিশেষ বেমানান মনে হয়নি। হলফ তানের উপযুক্ত কণ্ঠস্বর, অনুশীলন ও প্রকাশভঙ্গী শিল্পীর আছে। কিন্তু বলয়িত বিন্যাসের তানের ক্ষেত্রে স্বরের প্রাঞ্জলতা নেই, সব যেন জড়িয়ে এক হয়ে যাচ্ছে। কণ্ঠস্বরের ভাঁজ ও উত্থান-পতনের ধারা থেকে বোঝা যায় যে, উন্নতির সম্ভাবনা আছে।

পূরিয়া-কল্যাণের পর কেদারার দ্রুত খেয়াল। রাগ রূপায়ণে চেষ্টা না করেই সরাসরি গান ধরা হলেও পরিমার্জিত বলা চলে।

তৃতীয় গানটি ঠুমরী অঙ্গের। কিন্তু তার মধ্যে পূর্বী ঢং-এর অলংকরণ লক্ষ্য করা যায় নি। এক্ষেত্রেও স্থির মেজাজ ও সুর প্রযুক্তির মধ্যে সংযম রসসৃষ্টির পরিপোষক মনে হয়েছে।

এ-ছাড়া আরও কিছু লঘু চালের গান শিল্পী পরিবেশন করেছেন।

সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়

আদিম অসম্মান

এমন কতগুলি ক্ষেত্র আছে যেখানে পৃথিবীর সব মায়েরাই এক। ভারতের গণ্ডগ্রামের মায়েতে আর নিউ ইয়র্কের মায়েতে কোন ভেদ থাকে না। তার মধ্যে একটা হল মেয়ে বড় হলে, তার জন্য একটা উপরি চিন্তা। প্রথমত মেয়ের ভাবী স্বামীটি কেমন হবে? দ্বিতীয়ত সেই পাত্রটির সন্ধান কোথায় পাওয়া যাবে? এই দ্বিতীয় প্রশ্নটি এত বড় হয়ে দেখা দেয় যে, মায়েদের রাতের ঘুম, দিনের খাওয়াও বন্ধ হবার যোগাড় হয় মাঝে মাঝে। বিশেষত আমাদের সমাজে। ভাল বিয়ে হওয়াটা যেখানে মেয়েদের জীবনের অন্যতম লক্ষ্য।

বিয়ের ব্যাপারে আগে ঘটকই ছিল প্রধান সহায়। ছেলেমেয়ে বড় হলে, বাড়িতে ঘটক-সমাগম ঘটত। এখন ব্যক্তি-ঘটকের জায়গায় বিভিন্ন ঘটক-প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি স্থান নিয়েছে। কিন্তু মেয়ে দেখানোর রীতির তেমন পরিবর্তন হয়নি। আগেকার মতন এখনও মেয়েরা এসে পরীক্ষকের সামনে বসে—হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গায়, তাদের প্রশ্নের বাঞ্ছিত উত্তর দেয়। কখনও কখনও গ্র্যাজুয়েশনের সার্টিফিকেটখানাও দেখাতে হয়।

এখন, কোথাও কোথাও এই রীতির একটু অদল-বদল চোখে পড়ে। যেমন আমার বান্ধবী নন্দাকে বাড়িতে দেখতে এলো না। নন্দা তার দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গে অ্যাকাডেমীতে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল। সেখানে তার ভাবী স্বামী তার দিদি-বৌদি বন্ধুদের নিয়ে হাজির ছিল। থিয়েটারের শেষে ওরা পার্ক স্ট্রীটের মধ্যমমানের এক রেস্তোঁরায় যায়—সেখানেই রাতের খাওয়া আর কনে দেখা পর্বটি সমাধা হয়। বিয়ের আগে পাত্রপাত্রীর বেড়ানো, আলাপ এ সবও এখন চালু হয়েছে। কিন্তু এ সমস্ত খোলসের অন্তরালে কনে দেখার আদিম অসম্মান কিন্তু এখনও বর্তমান।

আমাদের রুণাকে দেখতে এসে এক ভদ্রমহিলা রুণার সামনেই একবার বলেছিলেন, 'আপনাদের বাজেট কি রকম? আমাদের একটাই ভাই—কিছুদিন আগে বোনের বিয়ে দিতে হয়েছে—খরচ-খরচা কিন্তু করতে হবে—তাছাড়া আপনাদের মেয়ের রঙও বড্ড চাপা।' অসম্মানিতবোধ করে রুণা উঠে চলে গিয়েছিল। পরে চিঠি এসেছিল, এই রকম অসভ্য, উদ্ধত মেয়ে তাঁরা জীবনে দেখেন নি ইত্যাদি।

আর একবার এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক রুণাকে ট্রান্সলেশন করতে দিয়েছিলেন আর ট্রান্সলেশন ঠিকমত করতে না পারার জন্যই যে জাতীর এই অধঃপতন তা ঘন্টাখানেক বক্তৃতা দিয়ে বুঝিয়েছিলেন।

কনে দেখতে গেলেও, বিভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতা হয়। আমার বাবা কাকার জন্য মেয়ে দেখতে গিয়েছিলেন। পাত্রী হঠাৎ বাবাকে দাদা বলে ডেকে জিজ্ঞেস করে বসল, 'আপনি কেমন আছেন? চেহারাটা বড্ড শুকনো শুকনো লাগছে।' (মেয়েটির সঙ্গে বাবার চাক্ষুষ পরিচয় কিন্তু সেই প্রথম)।

কনে দেখতে গেলে, নানান অভিজ্ঞতা হয়। কিন্তু একটা অভিজ্ঞতা প্রায়শঃই মিলে যায় — মেয়েদের কত সহজে দর্শনযোগ্য মনে করি আমরা। মেয়ের বাবা তার উজ্জ্বল বর্ণ অথবা এক মাথা চুলের বিনিময়ে কতটা বরপণ থেকে রেহাই পাবেন, তাই চিন্তা করেন। আর বরপক্ষ এসে নিক্তিতে ওজন করে রঙ, গড়ন, মুখশ্রী ইত্যাদি। মেয়ে পছন্দ-অপছন্দের ওপর অবশ্য বিয়ের কতটুকু নির্ভর করে, তা জানি না। মেয়ে খুব পছন্দসই হলেও কি মেয়ের বাবা বরপণ বা যৌতুক থেকে রেহাই পান?

মেয়েদের আমরা বড় বেশী সুলভ করে ফেলেছি। বিদুষী গুণবতী মেয়েদেরও বিয়ের বাজারে একাধিকবার নিজেদের পণ্য করে এসে বসতে হয়। গায়ের রঙ আর চুলের বাহারের পরীক্ষা দিতে হয়। জানি না, যে মেয়ে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, কর্মদক্ষতায় তার স্বামীর সমান, তার রূপটা বিচারের প্রাথমিক মাপকাঠি কেন হয়! কিংবা রূপ দেখে একটি মেয়ে সম্বন্ধে কতটুকু জানা যায়!

তবু, মেয়ে দেখার রীতি পাল্টান যাবে না, কেননা বিয়ে হওয়াটা সামাজিকভাবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আশা হয়, আরও পঞ্চাশ বছর পরে আমাদের সমাজে অনুকূল আবহাওয়ায় পারস্পরিক ভিত্তিতে পাত্রপাত্রী নির্বাচন হবে আর বারবার এক অসম্মানের হাত থেকে রেহাই পাবে মেয়েরা।

বোলান গঙ্গোপাধ্যায়

বনবাসর ছবিতে সন্তু : মহুয়া

অবহেলিত যাত্রা ললনা

সত্যিই এরা অবহেলিত। বিজ্ঞাপনে এদের নাম প্রচারিত হয় না। পোস্টারেও এদের নাম ছাপার স্থান নেই। নায়ক-নায়িকার বড় বড় ছবি, বড় বড় হরফে নাম জ্বল জ্বল করে। তাঁরাই নাকি ডেকে আনেন নায়েক পার্টি দলের বায়না হয়।

তাহলে এই সব অবহেলিত যাত্রা ললনাদের দলে রাখা হয় কেন? শুধু কি মুখ দেখতে! না শুধু মুখ দেখতে নয়। শুধু মাত্র নায়ক নায়িকার পক্ষে তিন ঘণ্টার পালা চালানো কখনোই সম্ভব হত না যদি এই সব শিল্পীরা তাদের দায়িত্ব পালনে তৎপর না হতেন। সামগ্রিক টিম-ওয়ার্কই পালাকে আসরে প্রতিষ্ঠিত করে।

অথচ একটু ভেবে দেখুন, নট্ট কোম্পানির তারা দেবী, সত্যাম্বরের ময়না চক্রবর্তী, রেখা ভট্টাচার্য, মহুয়া ব্যানার্জি, নিউ গণেশের শান্তশান্তি চ্যাটার্জি, সুলতা চৌধুরী, সুতপা সেনগুপ্ত, মালবিকা ব্যানার্জি, গীতা নস্কর, বীণা ভট্ট, লতিকা পাল, নিউ প্রভাসের বেলা ব্যানার্জি, লিলি মণ্ডল, অরুণা গোস্বামী, গণনাট্যের বন্দনা দেবী, অনিমা কর, জনতা অপেরার সোমা রায়, শিল্পীতীর্থের সীমা বোস, মোহন অপেরার দোলা বসু, মীরা অধিকারী,

ময়না চক্রবর্তী

শ্রাবন্তী চ্যাটার্জি

চন্দ্রলোকের রাণু চক্রবর্তী, রীতা সরকার, মঞ্জরী অপেরার লীনা চক্রবর্তী, ঝুমা মুখার্জি, আনন্দলোকের সীমা ঘোষ, অনামিকার মীনা চক্রবর্তী, ভারতীর মীনা দে, ছন্দা মল্লিক, সুশীলের আরতি মান্না, মাধবীর জয়া মুখার্জি, ভোলানাথ অপেরার বেবী অধিকারী, কলিকাতা যাত্রা সমাজের লতা দেশাই এবং আরো অসংখ্য সম-মানের শিল্পীরা যদি না থাকতেন, তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াতো?

সমালোচনাতেও কি যোগ্য মর্যাদা এরা পান? না, সেই সততা টুকুও সমালোচকদের থাকতে নেই। কেননা যাত্রা সমালোচনা তো যাত্রা-মালিককে খুশী করার জন্য লেখা হয়। এই সব যাত্রা ললনাদের একক্ষেত্রে ভাগ্য ভালো। এরা প্যাসের সামনের দিকের সিটগুলো পান।

এদের মাস-মাইনে দুশ থেকে ছশ'। বছরে পাঁচ, ছয় কিংবা সাত মাসের কাজ। বাকি কটা মাস হরি-মটর: কাজ নেই মাইনে নেই। বিহার্সাল কদিন যাতায়াতের ভাড়াটুকু জোটে অসীম দুর্গায়।

পালা হলে জলপানি পান দৈনিক পাঁচ সিকে থেকে দু টাকা। তার বেশী নয়। এতেই একবেলার খাবার সংগ্রহ করতে হয়।

একজন নায়ক নাকি একশ' টাকা জলপানি পান দৈনিক। গাড়ি মুগী ছাড়া। তফাৎটা একবার চিন্তা করুন।

নায়িকারা মেক-আপ তোলার জন্য নারকেল আর সাবান পান সুগন্ধী। এদের ভাগ্যে গন্ধহীন কোনো সাবানও জোটে না। শুধু তেল সম্বল।

এদের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। ছুটিকালীন মাইনে বরবাদ, মাথা ধরলে সারিডনও কিনে দেয় না কেউ, তার আবার চিকিৎসার খরচ!

এসব কথা যাত্রা ইন্ডাস্ট্রির সবাই জানেন, অথচ প্রকাশ করতে নারাজ। তাহলে নাকি বজ্রপাত কিংবা ভূমিকম্প হবে।

প্রভাত চৌধুরী

ফৈয়জ খাঁ মেমোরিয়াল মিউজিক সার্কেলের অনুষ্ঠান

ফৈয়জ খাঁ মেমোরিয়াল মিউজিক সার্কল বিড়লা একাডেমী মঞ্চে একটি মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে আগ্রা ঘরানার শিল্পী শচীন বন্দ্যোপাধ্যায় ঝিঁঝিট রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন। রাগের রূপটি তিনি যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। আগ্রা ঘরানার তিনি সুযোগ্য উত্তরাধিকারী, তার প্রমাণ তিনি রেখেছিলেন সেদিনকার সঙ্গীতানুষ্ঠানে। তিনি যে ভাবগম্ভীর পরিমন্ডল সৃষ্টি করেছিলেন তা শ্রোতাদের মুগ্ধ ও অভিভূত করেছিল। সেদিনকার শ্রোতৃমন্ডলীর মধ্যে অনেকেই রসজ্ঞ ও জ্ঞানী গুণী। সময়ের সংক্ষিপ্ততা শ্রোতাদের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হতে দেয় নি। শিল্পীকে পাখোয়াজ ও তবলায় সুন্দর সহযোগিতা করেছিলেন যথাক্রমে বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায় ও সুরেশ তেওয়ারী (বেনারস)।

অনুষ্ঠানের পরবর্তী আকর্ষণ ছিলেন রাধিকামোহন মৈত্রর সুযোগ্য ও তরুণ শিষ্য শ্রীসঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্পী সেতারে শ্যামকল্যাণ রাগে আলাপ-জোড় বাজিয়ে ত্রিতালে বিলম্বিত এবং একতালে দ্রুত গৎ বাজান। তিনি আলাপের শুরুতেই স্বকীয় বাদনশৈলীর নৈপুণ্যে শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। রাগের ক্রমরূপায়ণে শিল্পীর মীড় তান ও আলঙ্কারিক প্রয়োগে রসসৃষ্টি শ্রোতাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়েছে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি আঙ্গিক দিক থেকেও নিঃসন্দেহে অতি উচ্চমানের হয়। ঘন্টাব্যাপী শ্যামকল্যাণের রূপায়ণ শ্রোতাদের সংক্ষিপ্ত বলে মনে হয়েছে। পরে শ্রোতাদের বিশেষ অনুরোধে তিনি কাফি বাজিয়ে শোনান। তবলায় তাঁকে যথাযথ সহযোগিতা করেছেন দেবেন্দ্রকান্তি চক্রবর্তী।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

মূল্য ৭৫ পয়সা॥ অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা॥ ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য।

১৭ বর্ষ
৪৮ সংখ্যা
৭ বৈশাখ, ১৩৮৪
21 April. 1978

আগামী সংখ্যায়

উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান কোন পথে

দণ্ডকারণ্য থেকে গত কয়েক সপ্তাহে হাজার হাজার উদ্বাস্তু ফিরে এসেছে পশ্চিমবঙ্গে। এমনিতেই এরাজ্যে প্রতিদিন নতুন সমস্যা। তার ওপর ২৪ হাজার পুনরাগত উদ্বাস্তুর চাপে সংকট আরো গভীর হবার দিকে। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে আগন্তুক এই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা কোনো মতেই সম্ভব নয়, এটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট।

আশ্বাসের কথা, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর যে আলোচনা হয়েছে তাতে উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে ফিরে যেতে হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এবং পুনর্বাসনমন্ত্রী নিজেও পরিস্থিতির গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। উদ্বাস্তুরা কেন এমনভাবে দলবেঁধে ফিরে আসছে তা জানার জন্য অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। কাজেই আশা করা অন্যায় হবে না, কেন্দ্রীয় সরকার এমন ব্যবস্থাই গ্রহণ করবেন যাতে অবস্থাটির পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং সমস্যাগুলিরও স্থায়ী সমাধান সম্ভব হয়।

গোড়াতেই মনে রাখা ভালো ১৯৫৮ সালে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা গৃহীত হবার পর গত বিশ বছর ধরে যে পদ্ধতিতে পুনর্বাসনের কাজ চলেছে, তাকে আমূল ঢেলে না সাজালে উদ্বাস্তু-সমস্যার সত্যিকারের সমাধান হবে না। এতগুলো বছর ধরে আগেকার কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের প্রতি যে ধরনের দায়িত্বহীনতা এবং অবহেলা দেখিয়েছেন তার তুলনা পাওয়া কঠিন। নদীমাতৃক দেশের কৃষক ও ধীবরদের দণ্ডকারণ্যের ঐ পাথুরে মাটির জলহীন অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে পুনর্বসতির নামে তাদের প্রায় ভিক্ষাজীবীর পর্যায়ে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। অথচ দেশত্যাগ এদের কোনো ব্যক্তিগত কারণে ঘটেনি, ঘটেছে রাষ্ট্রিক কারণে, এবং সেদিক থেকে তারা ইতিহাসের বলি। তাই তাদের প্রতি দায়িত্বপালনও ছিল ইতিহাস-নির্দিষ্ট। আগেকার কেন্দ্রীয় সরকার সে কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছেন।

এই ব্যর্থতার কারণগুলি আবিষ্কার করে সতর্কতার সঙ্গে না এগোলে উদ্বাস্তুদের পুরো আস্থা ফিরে আসবে কিনা সন্দেহ। তাদের জন্যে বাসযোগ্য বাড়ি, আবাদযোগ্য জমি, যথেষ্ট পরিমাণে সেচের জল, শস্যবীজ, সার এবং দৈনন্দিন দরকারী জিনিসপত্রের জোগান অব্যাহত রাখা হল প্রাথমিক শর্ত। এই শর্তগুলি পালিত হলে উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্য ছেড়ে আসবে কেন ? ফিরে যেতেই বা আপত্তি করবে কেন ? উদ্বাস্তুরা যে উপযুক্ত পরিবেশ ও সাহায্য পেলে সোনা ফলাতে পারে তার সাক্ষী আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের দিগলিপুর ও মায়াবন্দর উপনিবেশদুটি। দণ্ডকারণ্যও নিশ্চয়ই পিছিয়ে থাকবে না!

কেন্দ্রীয় সরকার সহৃদয়তার হাত বাড়িয়ে দিন, উদ্বাস্তুরাও নিশ্চয়ই প্রাণপণ পরিশ্রম করে তার প্রতিদান দেবে।

শিশু সাহিত্যের কথা

বয়স যাঁদের পঞ্চাশের বেশি, ছেলেবেলায় তাঁরা যদি গ্রামে কাটিয়ে থাকেন, কী কী বই পড়তেন তাঁরা? না পড়ার বই নয়, অন্য বইয়ের কথা বলছি। মানে যেসব বই ছেলেমেয়েরা নিজের ইচ্ছেতেই পড়তে চায় পড়ে আনন্দ পায়। আঙুলে গুনে শেষ করা যায়, এতই কম তাদের সংখ্যা।

সবার আগে মনে পড়বে উপেন্দ্রকিশোরের ছোটদের মহাভারতের কথা। তারপরেই নিশ্চয় সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল'। সেইসঙ্গে কুলদারঞ্জনের 'রবিনসন ক্রুশো', 'রবিনহুড' আর 'আশ্চর্য দ্বীপ'। তারপর? ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে অবনীন্দ্রনাথের 'রাজকাহিনী'ও হাতে আসত। আসত হয়তো 'বুড়ো আংলাও'। কিন্তু তারপরেই অন্ধকার। তার মধ্যে জোনাকীর মতো হঠাৎ-হঠাৎ জ্বলে ওঠে আরো দু-একটা নাম—যেমন, গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'লালকালো', কিংবা 'ক্যাটকুটের দপ্তর' (লেখকের নাম মনে পড়ছে না)। অথবা 'ঝিলে জঙ্গলে শিকার'। [illegible] বইটির লেখক সেকালের বিখ্যাত শিকারী কে চৌধুরী (কুমুদ চৌধুরী—স্বনামধন্য লেখক প্রমথ চৌধুরীর দাদা)। ইংরেজিতে লেখা 'স্পোর্টস ইন ঝিলস্ অ্যান্ড জঙ্গলস্' বইয়ের অনুবাদ। কিন্তু 'অনুবাদিকা' ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর ভাষা এতই ভালো ছিল যে অনুবাদ বলে মনে হত না।

তালিকা খুব দীর্ঘ নয়, কিন্তু এই নিয়েই খুশী থাকতে হত তখন। চট করে কেউ ছোটোদের জন্যে লিখতে চাইতেন না। ছোটোদের জন্যে লেখা যে শক্ত তা তাঁরা ভালো করেই জানতেন।

এই জন্যে সুধীন্দ্রচন্দ্র সরকার যখন 'মৌচাক' বার করলেন, ছোটোদের লেখা পাওয়া তাঁর পক্ষে খুব সহজ হয়নি। অবিশ্যি অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন, ছিলেন সুধীনবাবুর 'ভারতী' যুগের বন্ধুরা। অর্থাৎ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, মণীন্দ্রলাল বসু। কিন্তু তাঁরা তো সেকালের নামকরা লেখক। নতুন লেখক তৈরি না হলে তো কাগজ চলে না। সুধীনবাবুকে তাই তখন তৈরি করতে হত লেখক। 'কল্লোল' আমলের তরুণ লেখকদের তিনি ছোটোদের জন্যে লিখতে বলতেন। তাঁদের দিয়ে লিখিয়ে নিতেন। সে সব লেখকরা যে ছোটোদের জন্যেও লিখতে পারেন তাঁদের সেই ক্ষমতাটিকে আস্বাদ করাতেন তিনি তাঁদের দিয়ে—শিশুসাহিত্যের সঙ্গে তাঁদের সত্যিকারের একটা ভালোবাসা তৈরি হয়ে যেত।

এইভাবেই আমরা পেয়েছি প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসুর ছোটদের লেখাগুলো। পেয়েছি শিবরাম চক্রবর্তীকে। এমনকি একটু আগের আমলের লেখক বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়কেও। মনে পড়ছে, সুধীর বাবু, তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় এবং মানিক বন্দোপাধ্যায়কে দিয়েও ছোটদের জন্য লিখিয়েছেন! ছোটদের জন্য মধুচক্র রচনায় কতো লেখককেই যে তিনি ডেকে এনেছেন তখন।

ছেলেদের কাগজ এখনো আছে। সম্পাদকরাও নিশ্চয়ই নতুন লেখা পাওয়ার জন্যে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিন্তু গত দশ-পনের বছরে কটা লেখা উৎরে গেছে বলুন? কজন লেখক সামনে উঠে এসেছেন? সার্থক লেখক বলতে তো মাত্র দুজন। একজন বিশ্ববিশ্রুত পরিচালক সত্যজিৎ রায়। তিনি শুধু সার্থক নন শ্রেষ্ঠ লেখক। তাঁর কিশোর উপন্যাসগুলো এত সুন্দরভাবে রসোত্তীর্ণ হয় যে বড়োদের কাগজেও মানিয়ে যায় চমৎকার। একালের অন্য খ্যাতিমান শিশুসাহিত্যিক মতি নন্দী। তাঁর খেলাভিত্তিক গল্প-উপন্যাসগুলো বাংলা সাহিত্যের নতুন দিক, তা স্বীকার করতেই হবে।

কিন্তু আর কোন লেখক? না এই মুহূর্তে আর কারো নামই তো বলার মতো করে মনে পড়ছে না। মনে পড়ছে না এমন কোনো চরিত্র যারা বন্ধুত্বের পাশপোর্ট পেয়ে আমাদের আপনজন হয়ে গেছে। যেমন আপন হয় ছেলেবেলার কোন চেনা মানুষ। যারা আমাদের সঙ্গে ওঠে-বসে খায় বেড়ায় ঘুমোয়, হয়তো বা স্বপ্নও দেখে! যেমন ধরুন ঈষৎ আগেকার যুগের অবিস্মরণীয় চরিত্র ঘনাদা, কিংবা হর্ষবর্ধন-গোবর্ধন, এমনকি পটলডাঙার টেনিদাও। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ই বোধহয় পুরনো প্যাটার্নের শেষ লেখক। সে প্যাটার্নে ছোটোদের গল্পের প্রধান মশলা হত হাসি। হাসির ফোড়ন দিয়েই লেখাগুলোকে তখন শিশুভোগ্য করা হত। এমনকি লীলা মজুমদারের লেখারও আসল ঝোঁক ছিল উইট আর হিউমারের দিকে। সত্যজিৎ এসে মোড় ঘোরালেন। মতি নন্দী একেবারে অন্য রাস্তা। মনে হয়েছিল, শিশু সাহিত্যে বুঝি নতুন পালা শুরু হল।

ছলনাময়ী আশা। যতোটা উসকে দেয়, উৎরে দেয় না ততোটা।

অথচ ফুটপাতে ভর্তি বই। শ্যামবাজার থেকে বালিগঞ্জ অবধি যে কোনো মোড়েই চোখ ফেরান দেখবেন ফুটপাত ভর্তি বই। কী তাদের গেট-আপ, কী তাদের জেল্লা! তিন বছর থেকে তের বছরের ছেলেমেয়েদের মন কেড়ে নেবার মতো রঙচঙ আর তেমনি তাদের বিষয়বৈচিত্র্য। বাস্তবিক, চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার সেই গ্রাম্য কিশোরের বইয়ের পুঁজির কথা [illegible] আজকের ছেলেমেয়েদের ভাগ্যের সঙ্গে তু[illegible] করে হিংসেই হবার কথা।

কিন্তু হয় না। বরং দুঃখ হয় তা[illegible] জন্যে। সেকালের শিশুদের হাতে বই [illegible] আসত। সত্যিই বড় কম আয়োজন [illegible] তাদের জন্যে। কিন্তু যা পেত সেটা [illegible] তাতে ভেজাল ছিল না। ছিল না [illegible] প্রয়াসের ছদ্মবেশী রাহাজানি। [illegible] তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে মিষ্টির [illegible] তারা। পেতো শুধু খানিকটা [illegible] এক গেলাস জল। কিন্তু [illegible] সে ছিল [illegible]।

না বললেও চলে, আমি [illegible] বাঙালি লেখকের বাংলা ভাষায় [illegible] বইয়ের কথাই বলছি। অনুবাদ [illegible] বইয়ের কথা নয়। আজকের [illegible] বেশির ভাগই বিদেশি [illegible] 'পথেরপাঁচালী' [illegible] বা এই রকম [illegible] লেখকের বই। না হলে [illegible] একেবারে।

এবং তাতে যা হবার তাই [illegible] বিজ্ঞানের সেই রোমাঞ্চ [illegible] ভালো বইয়ের জায়গাটা [illegible] যেত।

আজকের শিশু [illegible] অশালীন [illegible] সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু তাঁরা কি [illegible] দেখেছেন, শিশু ও কিশোরদের এই [illegible] ও [illegible] তার জন্যে [illegible] দায়ী? [illegible] শিক্ষা নেই যা [illegible] বলতেন না। [illegible] কেটে, আর [illegible] একটু [illegible] কেউ! উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের [illegible] বড় অংশের মধ্যে এই যে সব [illegible] ভাব দেখা দিচ্ছে তার জন্যে ভেজাল শিশু সাহিত্য কতোটা দায়ী, একটু [illegible] চালিয়ে দেখবেন না।

হয়তো তাহলে আমরা জানতে [illegible] শিশুসাহিত্য মানে খোকামী নয়। [illegible] পারব, সর্বকালের একজন বড় লেখক [illegible] ছোটোদের জন্যে কলম ধরা যায় না!

মণীন্দ্র [illegible]

আমি কেমন আছি?

এগারো বছর বয়েসের পর থেকেই [illegible] আমার আর কোনো ছবি নেই। তার আগে ছিল। গালে টোল পড়া ভারি নিষ্পাপ এক পাট-পাট করে আঁচড়ানো চুল, [illegible] দিয়ে হাসি [illegible] আছে। ওই ছবির [illegible]

[illegible]

[illegible] হবে তবে একদিন এক জায়গায় পৌঁছে যাবো নিশ্চয়ই। আমার দাঁড়াবার জায়গা, আমার ভিটেমাটি কোথাও না কোথাও আছেই। তাকে খুঁজে বার করতে হবে। সেটাই আমার বাড়ি। আমার স্বগৃহ।

হেরমান হেসের স্টেপেন উলফের নায়ককে মনে পড়ে গেল। শৃংখলা নিয়মের শুদ্ধতার গন্ধ সে নিয়মের গন্ডির বাইরে থেকে শুঁকে নিতো। তার ভালো লাগতো। সে প্রেমিকার সঙ্গে হৈ-চৈ করে বাড়ি ফিরে এসে কি যেন বিষাদ কি যেন অবসাদে ডুবে যেতো। সে কখনো সুখী হোতো না। সে কখনো দুঃখী হোতো। তার ভিতরের নেকড়েটাকে হিংস্র হতে দিতো না তার মানুষ আমিটা। অথচ মানুষ হবার ধার প্রয়াসেও থেকেছে সেদিন রাত। তার ভিতরের নেকড়েটা ডেকে উঠেছে। একটা নেকড়ের মধ্যে অনেক মানুষে অনেক নেকড়ে। একটা মানুষের মধ্যে অনেক নেকড়ে অনেক মানুষ। আমিও যেমন গড়িয়াহাট গোলপার্কের সদর রাস্তায় যখন ঠিকঠাক হঠাৎ বেঠিক হবার ইচ্ছেয় গলি-গলিতে ঢুকি। এক-একটস বাড়ির মধ্য দিয়ে ভেসে আসে হাসি আলতার মতো গড়ায়। রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজে। টেলিভিশনের আশিনা কাঁপিয়ে কেউ হাঁক ডাকে। রাস্তার মোড়ে ভিড় জমে ওঠে। অ্যাকসিডেন্টকে ঘিরে লোক-জন উৎকণ্ঠার সাবধানী হয়ে যায়। কোনো একটা নিমন্ত্রণের ডাককে কে যেন থামতে দেয় না। এ-পথের সঙ্গে আমার বহুদিন [illegible] ছেলেবেলায় ছিল। ছেলে-বেলায় আসল ঠিকানা। ঠাকুর্দা বেহালার দক্ষিণ চৌধুরীদের বারান্দায় আলো জ্বেলে ইজিচেয়ারে বসে থাকতেন অনেকক্ষণ। টেবিলের উপর মোটা একখণ্ড গীতা। মা তাঁর পায়ের কাছে। একটি শ্লোক রোজই আবৃত্তি করতেন। অন্যমনস্ক হয়ে আমিও একদিন বলে ফেলেছিলাম—

শ্রেয়ান স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।

ক্লাস সেভেনের ছেলের মুখে স্বধর্ম, পরধর্মের তত্ত্ব আলোচনা শুনে ঠাকুর্দা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'তুই এসবের মানে জানিস?'

—স্বধর্মে যদি কোনোও গুণ না থাকে বউমা তবু জেনো তা খুব উত্তমভাবে তৈরি হওয়া পরধর্মের চেয়ে অনেক ভালো, অতএব তুমি রুট্টুকে ফিরে আসতে লেখো।' একটানা মুখস্ত বলে গিয়েছিলাম কথাগুলো। আমার কথা শুনে ঠাকুর্দা হা-হাশব্দে হেসে উঠেছিলেন দাদা বিলেত যাবার পর বাড়িতে এক বছর পরে চিঠি লিখেছিলো যে সে আর দেশে ফিরছে না। মাঝে মাঝে মা-বাবাকে দেখে যাবে। সেই-জন্যেই দাদু ওসব কথা মাকে বলতেন। স্বদেশকে ঠাকুর্দা স্বধর্মের থেকে কখনোই আলাদা করতেন না। ঠাকুর্দা খুলনা বার ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বছরে একবার বাবার কাছে বেহালায় আসতেন। দিন পনেরোর মধ্যেই অস্থির হয়ে উঠতেন ফিরে যাবার জন্য। কেননা এই দেশ এই পশ্চিম-বঙ্গের সঙ্গে ঠাকুর্দার কোনো দিন কোনো যোগাযোগ ছিল না। বাগেরহাট টাউনকে তিনি কোলকাতার চেয়ে অনেক বেশি ভালোবাসতেন। সত্তর বছর বয়সে বাগের-হাটের বাড়িতেই ঠাকুর্দা একদিন মারা যান। বাংলাদেশে যুদ্ধের সময়। অনেক পরিবারের আশ্রয়ের ভার নেওয়া আর স্বধর্মে অবস্থান করার জন্য ঠাকুর্দার ভাগ্যে নিধন জুটেলো। সত্তর বছর বয়সে স্বধর্মে থাকতে চেয়ে আঁদ্রে মালরোও শুনেছি বাংলাদেশে ট্যাংক অপারেশন করতে চেয়েছিলেন।

ব্যানার্জিপাড়া আর বিশালাক্ষীতলা যে চৌমাথায় মিশেছে সেইখানেই ছিল নন্দ চৌধুরীর খেলার মাঠ। এখন ওখানে অনেক ছোট-বড়ো বাড়ি। ওখানেই ওই মাঠের এক কোণেই ছিল পরাশর চৌধুরীর ঘর। দরমা, তক্তা, কাঁচ বেত, ছেঁড়া ন্যাকড়া ভাঙা টালি সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে সেই ঘরটা। সেখানে কোনোদিন রোদ্দুর ঢুকতে দেখিনি। দাওয়ার কাছে বসে থাকতে দেখতাম বাড়ির মালিককে। গাল ভর্তি সাদা সাদা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কি গ্রীষ্ম কি বর্ষা সব সময় তার গায়ে একটা কালো মোটা কম্বল জড়ানো থাকতো। হাতে চলটা ওঠা ভাঙা একটা টিনের মগ। ঠিক সুকুমার রায়ের কাঠবুড়োর ঘরের মতো দেখতে। নন্দ চৌধুরীর মাঠে বিকেলবেলায় যখন ফুটবল খেলতে যেতাম তখন দেখতাম মাঠের দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে আছে পরাশর চৌধুরী। তার ঠোঁট দুটো নড়ছে।

ঘরের মধ্যে একটা নেড়ি কুকুর এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করতো—আমার ভীষণ ভয় কোরতো। এক-একদিন ব্যানার্জিপাড়ার জ্যোতির কাছে যেতাম অংক বুঝতে। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে পার হয়ে যেতো। নন্দ চৌধুরীর মাঠের পাশে একটা ট্যারা-বাঁকা পেয়ারাগাছ। মাঠের উপরে বয়ে যাওয়া ফনফনে হাওয়া আর ল্যাম্পপোস্টের টেরচা হলুদ আলোয় গাছটাকে কেমন ডাইনি ডাইনি মনে হোতো। পরাশর চৌধুরীর বাড়ির কাছে এসেই গা হাত পা সব শিটিয়ে যেতো। নন্দ চৌধুরীর মাঠটাকে সে বয়সে ডাকাতমারীর মাঠ বা আফ্রিকার মরুভূমি বলে ভুল করলে ন্যাকামি হোতো না। কাঁটা বাবলার ঝোপঝাড় খেজুর গাছও ছিল ওখানে। ভাগ্যিস পাশেই ছিল রাধাগোবিন্দের মন্দির। দেবালয়। ওখানে সন্ধ্যের পর থেকেই ঘন্টা বাজতো, কাঁসি বাজতো কাই নানা কাই নাকাই নাকাই। আমি বুকে বল পেতাম। বাকি রাস্তাটা কোনদিকে না তাকিয়ে প্রায় দৌড়োনোর মতো প্রায় ছুটে চলে আসতাম। বাড়ির কাছে পৌঁছে সে যে কি আরাম হোতো।

একদিন ওরকম আসছি। পরাশরের বাড়ির কাছে এসে কানে এলো কে যেন ডাকছে, 'খোকা ও খোকা একটু জল এনে দেবে, ও খোকা।' পরাশরের অন্ধকার ঘুটঘুটে বাড়িটার মধ্যেই আওয়াজটা গুমরোচ্ছে, সেদিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারলাম। তাকাইনি কেননা তাকানোর ক্ষমতা আমার তখন আর ছিল না। গলা দিয়ে স্বর উবে গেছে, ঘাড় বাঁকাতে পারছি না এমন ভয়। 'খোকা ও খোকা... নিশির ডাকের কথা মনে খেলো, মার মুখ মনে পড়লো। চোখে তখন প্রায় জল এসে এসে গেছে। সেদিন আর কিছু ভাবিনি। রোগা পটকা ছেলের বুকে যতটা দম ছিল তাই নিয়ে ছুট। বাড়িতে পোঁছে একেবারে গরমকালের কুকুরের মতো হ্যা-হ, হ্যা হ করে মুখ দিয়ে নিশ্বাস নিয়েছিলাম এক-টানা অনেকক্ষণ। পরদিন বিকলবেলায় খেলতে গিয়ে দেখি পরাশর চৌধুরীর বাড়ির সামনে ভিড়। ভিড় ঠেলে সাহস করে (হাজার হোক দিনের বেলাতো) ঘরের ভিতর উঁকি দিলাম। পরাশর সেখানে মরে কাঠ হয়ে আছে। তার ঠোঁটের কোণে থোক থোক লাল পিঁপড়ে। তার চুল এলো-মেলো। গা থেকে কম্বল খসে গেছে। পরাশরের নিত্যসঙ্গী।

পরাশরের ছেলের নাকি অনেক পয়সা। সে ডাক্তার, দিল্লিতে তার বাড়ি। ছেলের সঙ্গে মন কষাকষি হওয়া ইস্তক পরাশর তার পোড়ো ভিটেটা একা একাই আগলাতো। ছেলে বাপে মুখ দেখাদেখি ছিল না বহুকাল। এসব সেদিন রাত্রিবেলায় খেতে বসে বাবা মাকে বলছিলেন। আমি জানলার বাইরে থেকে ভেসে আসা নিশির ডাক শুনছিলাম। 'ও খোকা, খোকা একটু জল দাওনা বাবা।' চৈত্র মাসের এক দুপুরে, নিজের বাড়িতে তার পিতৃ-পিতামহের ভিটেতে মারা গিয়েছিল পরাশর। আগের-দিন সন্ধ্যেবেলায় যার খুব তেষ্টা পেয়ে-ছিল। এক ফোঁটা দু ফোঁটা জলের জন্য পরাশরের স্বর্গে যাওয়া হোলো না। তাকে বহুদিন ছেলের দেওয়া তর্পণের আশায় বসে থাকতে হবে। সেই ছেলের, যার মুখ সে বহুকাল ধরে দেখেনি।

ইচ্ছে করলেই এক-একদিন ছেলে-বেলার এক-একটা গলিতে ঢুকে পড়তে পারি। তাহলে স্বপ্নে স্বপ্নে কিছুক্ষণ বেঁচে থাকা যায়। পোর্টিকোর এক কোণে পার্ট টু পরীক্ষার কয়েক দিন আগে শ্রীলাকে একথাটা আমি বলেছিলাম। একসঙ্গে প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হয়েছিলাম আমি, সুমন্ত্র, শ্রীলা। বাবার বন্ধু রথীনকাকুর মেয়ে শ্রীলা সুমন্ত্রের আট বছরের বন্ধু। দুজনেই ক্লাস থ্রি থেকে সাউথ পয়েন্টে পড়াশোনা করেছে। সুমন্ত্রকে আমি ঘৃণা করতাম। এখনো করি। কিন্তু তখন আমরা একসঙ্গে ঘুরতাম। শ্রীলা গুনগুন করে সুর তুলে বলেছিলো আই ডু নট রিমেম্বার সী হোয়াই উই ক্যান নট বি ফ্রী। তখন প্রেসিডেন্সির বেকার ল্যাবের সিঁড়িতে, আর্টস লাইব্রেরীর পাশে অফর্টের ধারে সেসব সম্ভব ছিল। সুত্রা আমাকে প্রথম জোনিস জ্যাপলিন, জিম হেনড্রিক্সের গান শোনায় ওদের বাড়িতে। নিউআলিপুরের জি-ব্লক থেকে বেহালার দূরত্ব সামান্য। তবুও আমি শ্রীলাকে কখনো আমাদের বাড়ি নিয়ে আসিনি। সুত্রা আমায় সিলভিয়া প্লাথের কবিতার রেকর্ড উপহার দিয়েছিলো এক জন্মদিনে। তাতে ছিল লেডি ল্যাজারাস। ড্যাডি। সিলভিয়া প্লাথ সুত্রার মতে খুব ডিস্টার্বিং। সিলভিয়া প্লাথ আত্মহত্যা করেছিলো। জ্যানিস জ্যাপলিন, জিম হেনড্রিক্সও। শিকাগোতে বার অ্যাক্সিডেন্টে শ্রীলা মারা যায়। আত্মহত্যা নয় খুব ইচ্ছে ছিল সুত্রার। ... উঠতে পারেনি। সুমন্ত্র এখন ... সার্ভিসে। ... ইকোনোমিকস পড়াতো। কলেজে ম্যাগাজিনে ... হোয়াইট ম্যানস ... উপর বিস্তৃত আর্টিকল লিখেছিলো। কালো চামড়ার ফরাসী ... জেএমজিনলজেনিয়ানদের নিয়ে লেখা এই বইটা সুমন্ত্রের খুব প্রিয় ছিল। সুমন্ত্র কাফুর কন্টেম্পোরারি-দের অনুকম্পা কোরতো। সার্ত্র ছাড়া ... ইয়োরোপীয়ান ইনটেলেকচুয়ালদের।

আমি একদিন শ্রীলার খাতায় লুকিয়ে লুকিয়ে লিখে দিয়েছিলাম আমার ... জীবনানন্দের লাইন 'সফল হতে গিয়েও তবু বিষণ্ণতার মতো'। উত্তরে শ্রীলা আমার খাতায় লিখেছিলো 'আমি রোদ কি ধুলো পাখী না সেই নারী'। শ্রীলাও জীবনানন্দের ভক্ত ছিল। আমি জানতাম না। জানতাম না এটাও যে সুমন্ত্রের বাড়িতে সবাই আটটার মধ্যে ডিনার খায়। এমন কি সুমন্ত্রও। জানতাম না যে ও বাড়িতে কাজকর্মা সাদা পাঞ্জাবী আর পাজামা পরে। নীচু স্বরে বাবার সঙ্গে কথা বলে। সেদিন জানলাম, সেদিন ওদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খাবার পরে সুমন্ত্র গাড়িতে আমাকে ওদের এলগিন রোডের বাড়ি থেকে টালিগঞ্জ ফাঁড়ি অবধি পোঁছে দিয়েছিলো। তার বেশি এগিয়ে দেওয়াতে ওর বাবার বারণ ছিল। সেদিন পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ছিল টুকরো টুকরো। আমাকে মাঝপথে নামিয়ে দিয়ে সুমন্ত্রের গাড়ি যখন আবার উল্টো দিকে ঘুরল আমি সুমন্ত্রের মুখ দেখতে পেলাম চাঁদের আলোয়। ও কেমন গলে গলে গেলো, ও কেমন ফাঁকা হয়ে গেলো।

দীপঙ্কর চক্রবর্তী

সমালোচনা

নতুন ধারায় বাইবেল

[বা]ইবেল

ক. সে কালে য়িহোদা দেশের উজাড়ে যোহান ডুবা আইল চেঁচি দিতে ২ এবং বলিতে ২ খেদ কর এ কারণ স্বর্গের রাজ্য সান্নিধ্য। এই সে জন যাহার বিষয় বিভাবিত ছিল যিশাঁয়াহ ভবিষ্যত বক্তা হইতে বলিয়া এক জনের রব চেঁচাইতে ২ উজাড়ে প্রস্তুত করহ ঈশ্বরের পথ সোজা কর তাহার পথকে। এবং সে যোহনের ছিল উটের লোমের পরিচ্ছদ ও চর্মের পটুকা কমরে তাহার ভক্ষ ও পঙ্গপাল ফড়িঙ্গ ও বন মধু। [১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত বাঙলা বই]।

খ. যোহন নামে বাপ্তাইজক সেই সময়ে যিহুদা দেশের প্রান্তরেতে উপস্থিত হইয়া প্রচার করিয়া কহিল, মন ফিরাও, কেননা স্বর্গের রাজত্ব সন্নিকট হইল। পরমেশ্বরের পথ প্রস্তুত কর, ও তাহার রাজপথ সমান কর, প্রান্তরে এই বাক্যবাদী এক-জনের রব, এমন কথা, যিশাইয় ভবিষ্যদ্বক্তা দ্বারা অই যোহনের বিষয় কথিত ছিল। যোহনের বস্ত্র উটের লোমজাত, ও সে কটিতে চর্ম্ম পটুকাবন্ধ, এবং পঙ্গপাল ও বনমধু তাহার খাদ্য ছিল। [১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পাদ্রী উইলিয়ম ইয়েটস লিখিত ও লণ্ডন থেকে প্রকাশিত]

গ. তদনুসারে যোহন উপস্থিত হইলেন, ও প্রান্তরে বাপ্তাইজ করিতে লাগিলেন, এবং পাপমোচনের জন্য মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাহাতে সমস্ত যিহূদিয়া দেশ ও যিরূশালেম নিবাসী সকলকে বাহির হইয়া তাঁহার নিকটে যাইতে লাগিল। আর আপন আপন পাপ স্বীকার করিয়া যর্দন নদীতে তাহা দ্বারা বাপ্তাইজিত হইতে লাগিল। সেই যোহন উটের লোমের কাপড় পরিতেন, তাঁহার কটিদেশে চর্ম্মপটুকা ছিল এবং তিনি পঙ্গপাল ও বনমধু ভোজন করিতেন। [১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারত পাকিস্তান ও সিংহলের বাইবেল সোসাইটি প্রকাশিত]

ঘ. যিনি বাপ্তিস্ম দিতেন, সেই জনই এই দূত। তিনি মরু প্রান্তরে বাস করতেন। তিনি শিক্ষা দিতেন যে পাপের পথ ছাড়ার সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে ঘোষণা করে তাদের প্রত্যেককেরই বাপ্তিস্ম নেওয়া দরকার, যেন ঈশ্বর তাদের পাপ ক্ষমা করতে পারেন। জেরুশালেম ও জুড়িয়ার সমস্ত অঞ্চল থেকে লোকেরা জনকে দেখতে ও তাঁর প্রচার শুনতে জুড়িয়ার প্রান্তরে গিয়ে জড় হত। আর যখন তারা তাঁর প্রচার শুনে নিজের নিজের পাপ শিকার করতো, তখন তিনি তাদের জর্দন নদীতে বাপ্তিসম দিতেন। তিনি উটের লোমের তৈরী কাপড় পরতেন, কোমরে চামড়ার বেল্ট বাঁধতেন। পঙ্গপাল বনের মধু ছিল তাঁর খাবার। [১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে লিভিং বাইবেলস্ ইণ্ডিয়া থেকে প্রকাশিত]

ওপরে বাইবেল থেকে চারটি উদ্ধৃতিতে একই অংশের অনুবাদ রয়েছে। এ অংশটুকুর মধ্য দিয়ে আমরা গত একশ আটাত্তর বছরের বাঙলা গদ্যের বিবর্তনের রূপরেখাটি চিনে নিতে পারি। বিবর্তনের এ ইতিহাসটি যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক।

বাইবেলের বাঙলা যেমন গদ্যের সৃষ্টিকালে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল, তেমনি আবার এক সময়ে পণ্ডিতি বাঙলার অদ্ভুত নিদর্শন হিসেবে হাসির খোরাকও যোগাত। আসলে গদ্য ভাষা যে মুখের ভাষারই সমুন্নতিকরণ, এমন বোধ আদি যুগের অনেক গদ্য লেখকের ছিল না। ইংরেজী ভাষারীতির যান্ত্রিক ও কৃত্রিম অনুকরণ, অচলিত শব্দ ব্যবহার এবং জটিল অন্বয়ের আবর্তে পড়ে বাঙলা গদ্য আড়ষ্ট হয়ে ছিল। অর্থাৎ গদ্য ভাষা সৃষ্টি হচ্ছিল শুষ্ক মস্তিষ্ক থেকে, আবেগের উৎস থেকে নয়, জীবন বোধের গভীরতা থেকে নয়। ভাষার সৃষ্টি লগ্নে বোধ করি এতটা আশা করাও যায় না। তারপর অবশ্য বাঙলা গদ্য সাম্রাজ্যের অভূতপূর্ব বিস্তার ও উন্নতি ঘটেছে, কিন্তু বাইবেলের বাঙলা তার সঙ্গে তেমন তাল মিলিয়ে চলতে পারে নি। নইলে বাইবেলের বাঙলা গদ্যকে চলিতরূপে আসতে একশ আটাত্তর বছর লাগত না।

বাইবেল পৃথিবীতে সর্বাধিক বিক্রীত ও প্রচারিত বই। শুধু ধর্মপুস্তক এটি নয়, যীশু নামক সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ মানবের বিস্ময়কর জীবনকাহিনী বলা হয়েছে এ বইতে অপূর্ব কাব্যময় ভাষায়। অথচ এর পূর্ণ স্বাদ বাঙালী বাঙলাভাষার মাধ্যমে এযাবৎ নিতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। তাই 'তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।' লিভিং বাইবেলস্ ইণ্ডিয়া প্রকাশন সংস্থার অনুবাদকমণ্ডলীকে ধন্যবাদ। তাঁরা বাঙলা ভাষার এ দুর্মর অভাবকে ঘোচাতে চেষ্টা করেছেন এবং অনেকটাই সাফল্যলাভ করেছেন। এ কালের বাঙলা গদ্য ভাষা যীশুর পুণ্যজীবন ও ভাষণকে আমাদের মর্মে পৌঁছে দিয়েছে।

বাইবেলের ইংরেজী ভাষাকে রচনা-রীতির দিক থেকে বলা হয় দি গ্র্যাণ্ড স্টাইল। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের গদ্যে হয়ত স্টাইলের সে সহনীয়তা ধরা পড়ে নি। সেটা বোধহয় সম্ভবও ছিল না। শত শত বছরের বিবর্তনে গড়ে উঠেছে বাইবেলী ইংরেজী। সে হিসেবে বাঙলায় বাইবেল ত সেদিনকার ঘটনা। এ মাপকাঠিতে লিভিং বাইবেলস্ ইণ্ডিয়ার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রচ্ছদ ও ভেতরকার ছবিগুলো সুন্দর ও অর্থোদ্যোতক। প্রকাশন সংস্থাকে পরিশেষে একটি প্রশ্ন, তাঁরা ডবল কলামে বইটি ছাপলেন কেন ? এখনকার অভ্যস্ত চেহারায় বইটি দেখা দিলে আরও ভাল লাগত।

বিষ্ণু বসু

বাইবেল : নতুন ধারা। লিভিং বাইবেলস ইণ্ডিয়া। ১৫ ক্যামাক স্ট্রীট। কলিকাতা ৭০০০১৭।

প্রফুল্ল রায়

এ বই নিশ্চয় প্রফুল্ল রায়ের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির মধ্যে একটি নয়, কিন্তু এই বইয়ে তিনি পাঠককে দেখিয়েছেন একজন জাত গল্পকার কিভাবে গল্প বলেন। গল্প শোনবার স্পৃহা মানুষের বহুকালের। বোধহয় গুহাবাসী মানুষও শিকারশেষে সংবাদিনের পরে অগ্নিকুণ্ডের ওপরে মাংস ঝলসাতে ঝলসাতে পরস্পরকে গল্প বলে শোনাতো। কাজেই পাঠক যখন কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করে বই কেনেন, তখন ধরে নেওয়া যায় তিনি একটি নিটোল গল্প আশা করছেন। প্রফুল্ল রায়ের সাম্প্রতিক-তম উপন্যাস 'একজন যোদ্ধা' তাঁদের সেই আশা পূর্ণ করবে।

কাহিনীর পটভূমি স্থাপিত হয়েছে মহারাষ্ট্রে। এবং পাত্র-পাত্রীরাও কেউই বাঙালী নয়। ফলে শুরু থেকেই একটি ভিন্নতর মেজাজের স্বাদ পাওয়া যায়। বোম্বাই থেকে দেওলালী বাবার বাসে আমরা প্রথম দেখতে পাই নায়ক যোদ্ধা অশোক দয়ালকে। সেই বাসেই চলেছে নায়িকা নীতা আনন্দ। দুজনেই সদ্য চাকরি পেয়েছে দেওলালীর আদবানী এন্টারপ্রাইজে। অশোকের চিন্তার মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় সে একটা ভয়ানক প্রতিজ্ঞা নিয়ে চলেছে সেখানে। উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠার আগে রহস্য ভাঙেননি লেখক। একই উদ্দেশ্য নিয়ে চলেছে নীতা আনন্দও। একটা ঘনীভূত রহস্যের পরিবেশ একটু একটু করে পাঠককে উন্মুখ করে তোলে। শেষ পরিচ্ছেদে স্বস্তি। টেনশনকে আগাগোড়া এভাবে বজায় রাখা কম ক্ষমতার কথা নয়।

চরিত্রসৃষ্টির কুশলতা লেখকের মানবমনের গভীরে প্রবেশ করবার শক্তির

পরিচয় দেয়। কত কম কথায় তিনি জীবন্ত করে তুলেছেন ম্যানেজিং ডিরেকটর মনোহরলাল শিবদাসানির চরিত্র। বিরাট ব্যক্তিত্ব নিয়ে মনোহরলালকে আমরা যেন বাস্তবে দেখতে পাই। অপ্রধান চরিত্রগুলির প্রতিও লেখকের মনোযোগ লক্ষণীয়।

প্রফুল্ল রায়ের ভাষা প্রসাদগুণে মধুর ও ঝরঝরে। সমস্ত উপন্যাসটি বিরতিহীনভাবে পড়ে গেলেও কোনো ক্লান্তি বোধ হয় না। গৌতম রায়ের প্রচ্ছদ অতি মনোজ্ঞ। ছাপার ভুল নেই বললেই চলে। কাগজ ও বাঁধাই ভাল।

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

একজন যোদ্ধা : প্রফুল্ল রায়। সমকাল প্রকাশনী। ৮।২এ, গোয়ালটুলি লেন, কলকাতা—১৩। দাম : ১০-০০ টাকা।

প্রমথনাথ বিশী

বাংলা সাহিত্যে প্রমথনাথ বিশী একটি সুপরিচিত নাম। গল্প উপন্যাস ছোটগল্প কবিতা নাটক প্রবন্ধ প্রভৃতি নানাবিধ রচনায় তিনি বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর মত ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা' এ-কথা প্র-না-বি ছদ্মনামে লেখা লেখকের ব্যঙ্গ গল্পগুলি পড়লে বোঝা যায়। বাংলাদেশ থেকে রঙ্গ-ব্যঙ্গ এখনও লুপ্ত হয়ে যায়নি। আনন্দের বিষয় অশোককুমার কুণ্ডু লেখকের বিভিন্ন সময় রচিত অজস্র সরস ছোটগল্পসমূহের মধ্যে বেছে বেছে আলোচ্য ছোটগল্প সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। এটি প্রথম খণ্ড। সম্পাদক জানিয়েছেন যে, প্র-না-বির সমস্ত গল্প প্রকাশ করতে আরো দুটি খণ্ডের প্রয়োজন হবে। বাংলাদেশে ছোটগল্পের মধ্যে যে অমূল্য সম্পদ রয়েছে, তা পাঠকদের কাছে সহজলভ্য করার জন্য সম্পাদক অশোকবাবু, অন্যান্য লেখকদের ছোটগল্পগুলি একাধিক খণ্ডে যা এখন দুষ্প্রাপ্য, সেগুলি ক্রমশঃ প্রকাশ করবেন বলে জানিয়েছেন। এটা সাহিত্যরসিকদের কাছে একটি আনন্দ সংবাদ।

এই সংগ্রহের কয়েকটি রচনা যেমন শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব ন-ন-বৌ-ব-লি, চিত্রগুপ্তের রিপোর্ট, ফটোগ্রাফ, বাগদত্তা ১৩৩৬ সালে প্রকাশিত শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব নামক পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেগুলিও এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। এছাড়া নির্বাণ, নগেন হাতির ঢোল, গণক, ভূতের গল্প, কাঙালী ভোজন, দ্বিতীয় পক্ষ, মাগ্গী মাল্লী প্রভৃতি হাস্যরসাত্মক গল্পগুলি পাঠ করলে পাঠকের রসবোধ জাগ্রত হবে। গ্রন্থের শেষে লেখকের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর রচিত ছোটগল্পের ২১টি বই-এর প্রকাশকাল, প্রকাশকের নাম, লেখকের আলোচনা বইখানির গৌরব বৃদ্ধি করেছে। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল। পুস্তকের প্রচ্ছদপটটিও আকর্ষণীয়। বাংলা ছোটগল্পপ্রেমী পাঠক এই গল্পসংগ্রহ পড়ে নিশ্চয়ই আনন্দ পাবেন।

পল্লব মিত্র

ছোট গল্প সংগ্রহ : প্রমথনাথ বিশী। পুস্তক বিপণি। ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯। মূল্য কুড়ি টাকা।

লীলা মজুমদার

হাতি নিয়ে একবই গল্প। খুব মজার, খুব বেদনার—শুধু ভালো লাগাতেই শেষ হয়ে যায় না, ভাবায়, এমন সব গল্প।

লীলা মজুমদারের লেখা তো, ভঙ্গি এত সহজ, এমন ঘরোয়া গল্প লিখেছেন, মনে হয় যেন গল্প বলছেন—গল্প শুনছে সামনে বসে রাজ্যের যত কৌতূহলী কিশোর।

হাতির সুখ-দুঃখ, আনন্দ, ভয়, ভাবনা, বুদ্ধি-বিবেচনা, আবেগ অনুভূতির নানান কথা আর কাহিনীর মধ্যে দিয়ে এক আশ্চর্য হাতিকে জানা যাবে—থামের মতো চারটে পা, ক্ষুদে ক্ষুদে দুটো চোখ, কুলোর মতো দুটো কান, অদ্ভুত একটা শুঁড়, বিশাল থেপ শরীর ছাড়িয়ে যে হাতি। ভাবলে অবাক হতে হয় কেমন করে একদল হাতি তাদের এক সঙ্গীকে নদীর ধারের চোরাবালিতে ডুবে যাওয়ার থেকে, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনল। সেই হাতিটি যখন নিরাপদ জায়গায় উঠে এল, তখন দলের বাচ্চা হাতিগুলোর কী আনন্দ—মহা ফুর্তিতে শুঁড় তুলে কী লাফালাফি তাদের। যেন সব মানব-শিশু। আসলে সুখ-দুঃখের, আনন্দের, বেদনার, অনুভূতিতে প্রাণের স্পন্দনে আর সন্তানের মানুষে তেমন প্রভেদ নেই। এই সত্যটি খুব সুন্দর করে বলেছেন লীলা মজুমদার।

হাতি আর দরজির গল্প, হাতির মা আর একটি বাচ্চা হাতি—শোকাবহ গল্প কোন কিশোর মনই শুধু নয়, যে কোন বয়সের মন গভীরভাবে স্পর্শ করবে।

গল্পগুলো তো বটেই, সুন্দর বইটির মলাটের আর ভেতরের পাতার ছবি আর লেখাগুলোও খুব ভালো লাগবে তাদের, যারা হাতিকে ভালোবাসে। যারা এখনো হাতির কথা বেশি জানে না, তারা বইটি পড়ে হাতির কথা অনেক জানতে তো পারবেই সেই সঙ্গে মজাও করে ভালোবাসতে শুরু করবে পৃথিবীর এক মহান সুন্দর প্রাণীকে।

চণ্ডী মণ্ডল

হাতি! হাতি! : লীলা মজুমদার। বিমলারঞ্জন প্রকাশন। ৮।১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। মূল্য : ছয় টাকা।

রাণী চন্দ

রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা রাণী চন্দ সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিতা। ছোটবেলায় গ্রামের স্মৃতিগুলি তিনি যখন অবসর সময়ে কবির কাছে বলতেন, কবি তখন মন্ত্রমুগ্ধের মত সেগুলি সব শুনেছেন। অর্ধশতক আগে বাংলার গ্রাম কেমন ছিল, আজ তা জানবার কোন উপায় নেই। তাই কবি লেখিকাকে গ্রামের খারাপ দিকটা বাদ দিয়ে, যা সুন্দর সেটুকু লিখে ছবির মত ফুটিয়ে তুলতে বলেছিলেন। লেখিকা কবির কথা রেখেছেন বলে সেকালের গ্রাম-বাংলা কেমন ছিল তা জানার আমাদের সৌভাগ্য হলো। এ বই কেবল গঙ্গাধরপুর গ্রামের ইতিবৃত্ত নয় এ বই বঙ্গসমাজ সেকালে কেমন ছিল তার লোকজন পুজো-পার্বণ মেলা ব্রতকথা এক কথায় বলা যায় বঙ্গ সংস্কৃতির একটি সুন্দর সুষম আলেখ্য সহজ সরল শব্দবিন্যাসেও নিখুঁত রেখা চিত্রে লেখিকা যে রচনা কৌশল এই বইয়ে দেখিয়েছেন তা অনুকরণ যোগ্য।

বাংলার আপামর জনসাধারণ যখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয় নি তখন চরম দুর্গতির মধ্যে ঈশ্বর বিশ্বাসই সেদিন তাদের শক্তি দিয়েছিল বেঁচে থাকবার। যেমন লেখিকা রোজ সকালে শুনতেন তাঁর বড়-মাসিমার কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের শতনাম 'কৃষ্ণনাম হরিনাম বড়ই মধুর—যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।' মানুষ কিসে বাঁচে আর কিসে বিনাশ পায়, আমার মার বাপের বাড়ি পড়লে তা বেশ বোঝা যায়। সেকালে দুঃখ ছিল অভাব ছিল যেমন, মানুষের প্রাণও ছিল তেমন। তাই চরম দুর্যোগের মধ্যেও সেদিন জীবনের অবলম্বন খুঁজে পেতে কাউকে কোন কষ্ট পেতে হতো না। শ্রীমতী রাণী চন্দকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই জন্য যে তিনি এই পুস্তক রচনা করে হারিয়ে যাওয়া বাংলার সমাজ জীবনের ও লোক সংস্কৃতির একটা দিক আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। এটি একটি নতুন দিগদর্শন।

আমার মার বাপের বাড়ি—রাণী চন্দ। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ ১০, প্রিটোরিয়া স্ট্রীট, কলিঃ—৭১, মূল্য দশ টাকা।

অসমীয়া কবিতা

গৌতমপ্রসাদ বড়ুয়া অসমীয়া সাহিত্যের সুপরিচিত তরুণ কবি। 'ধৃতরাষ্ট্র' একটি কাব্যগ্রন্থ—দীর্ঘ কবিতা, মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রই এর নায়ক, মূল চরিত্র অনুসারে গ্রন্থের নামকরণ। প্রখ্যাত সমালোচক মুনীন বরকটকী ভূমিকা লিখেছেন, একটি মূল্যবান ভূমিকা, যা থেকে প্রতিবেশী সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের
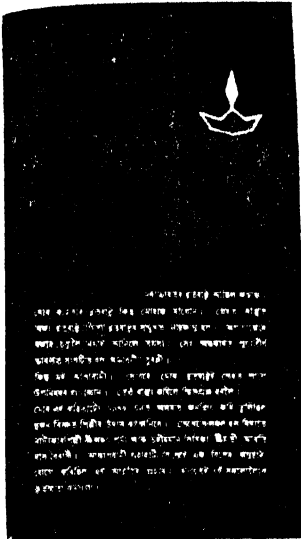
উৎসুক্য জাগবে, যা থাকা উচিত ছিলো, আমাদের নেই। এই ভূমিকাটি থেকে কবি গৌতমপ্রসাদের কবিতার বিশেষ চরিত্রটি সম্বন্ধে একটি ধারণা করে নেওয়াও সম্ভব। যদিও, বইটি অসমীয়া সাহিত্যের একটি সাম্প্রতিক নিদর্শন, এবং বঙ্গানুবাদ নয়, খোদ অসমীয়া ভাষায় রচিত, তবু বলতে হবে—পড়তে সামান্য কষ্ট হয়, সামান্যই. স্ক্রিপ্ট বাংলারই মতন, আর বাক্য গঠন প্রণালীও একই, কিছু শব্দগত পার্থক্য রয়েছে যা আমাদের কাছে অজানা, এটাই কষ্টের—কারণ যা কিছু; তবে মোটামুটি-ভাবে বুঝে নিতে তেমন অসুবিধে হয় না। অতএব, বাঙালী পাঠককে আহ্বান করছি, আমাদের প্রতিবেশীদের সৃষ্টিকর্ম, ভাবনা চিন্তার সঙ্গে, আসুন, সংযোগ স্থাপন করি; সে কাজে সাহিত্য একটি বড়ো সেতুর কাজ করবে; স্ক্রিপ্টের সামান্য পার্থক্য ছাড়া প্রবল অন্তরায় তেমন কিছু নেই।

'ধৃতরাষ্ট্র' একটি দীর্ঘ কবিতা। এবং যথাসাধ্য রূপক ব্যবহারও করা হয়েছে। এমারজেন্সীর আমলে প্রতীকের মাধ্যমে রাজনীতিক চিন্তাকে প্রকাশ করা প্রয়োজন অনুভব করেছেন কবি। মহাভারত বা রামায়ণের নানা চরিত্র ভারতীয় নানা প্রদেশের সাহিত্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নতুন তাৎপর্য নিয়ে উঠে এসেছে; পুরাণ-প্রতিমার আড়ালে কবি চলতি সময়ের সমস্যা-উদ্ভূত অনুভূতি ও উপলব্ধিকে প্রচ্ছন্ন রেখে শরসন্ধান করতে সাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন; এ ক্ষেত্রেও, গৌতমপ্রসাদ তা-ই করেছেন। মুনান বরকটকী বলেছেন, ধৃতরাষ্ট্র-এ সেটা বিশেষত্ব—প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হলো এর মধ্যে গীতিকবিতার স্তবককে সুরে ব্যালাড পরিবেশন করা হয়েছে।

মনে হলো, রূপকের আড়াল থেকে কবি বর্তমান ভারতের রাজনীতিক সমস্যার কথা বলতে চেয়েছেন। তবে, স্টাইলের দিক থেকে অনেকটা মনোজোগ, কিছুটা কাব্য-নাট্যধর্মী। এ গ্রন্থটি সম্পূর্ণ স্বাদ নিতে হলে যে ভাষাজ্ঞান থাকা দরকার তা আমার নেই, তবে মূলে কিছু কিছু স্বাদ পেয়েছি, পাঠকও পাবেন আশা করি। ছাপা সুন্দর। অঙ্গসজ্জা মনে রাখার মতন।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র : গৌতমপ্রসাদ বড়ুয়া। লয়াল বুক স্টল পান বাজার। গৌহাটি।

অরুণ ভট্টাচার্য

অরুণ ভট্টাচার্য দীর্ঘ দিন কবিতা লিখছেন। কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা বেশ কয়েকটি। কিন্তু কাব্যজগতে তেমন আলোচিত নন; তাঁর কবিতায় তেমন হৈ চৈ নেই, নেই কোন শব্দ ছন্দের খেলা। তবে সহজ, সরল শব্দে বক্তব্য তুলে ধরার প্রয়াস আছে, আছে বয়স্ক দার্শনিক ভাবনা।

গ্রন্থটির নামকরণে আমরা সহজেই বুঝতে পারি, কবি কি বলতে চান।

৫৫ পৃষ্ঠার গ্রন্থে ছোটবড় মোট ৬২ কবিতা স্থান পেয়েছে। বেশির ভাগ কবিতাই প্রেমে ভরপুর,—এ প্রেম দুই অর্থেই গ্রহণ করা যেতে পারে। অরুণ ভট্টাচার্যের প্রায় প্রতিটি কবিতার শেষে কাহিনী রচনার চেষ্টা করা হয়েছে—এবং এখানেই কবির সার্থকতা। পাঠকদের ভালো লাগে এই নাটকীয়তা। অরুণ ভট্টাচার্য যদি কবিতা পড়ে আরো বেশী সতর্ক হন, তবে, অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা উপহার দিতে পারবেন। তাঁর হাতে কবিতা আছে, আছে উপমা। [illegible] কবিতাগুচ্ছ, প্রথম রাত্রিতে, [illegible] শব্দ, প্রথম [illegible] কবিতাগুচ্ছ, ভালোবাসার দিনগুলি তোমাকে ছুঁলে [illegible] ইত্যাদি কবিতাগুলো আমাদের কাছে ধরে রাখার চেষ্টা করে। গ্রন্থের কয়েকটি কবিতা বেশ স্মরণীয়।

দাউদ হায়দার

ঈশ্বর প্রতিমা : অরুণ ভট্টাচার্য, উত্তরসূরী গ্রন্থমেলা, এ-১২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭। মূল্য চার টাকা।

স্বচ্ছ অনুভূতির প্রতিবেদন

প্রসন্নতা দিয়ে মোড়া কিছু নরম ভালোবাসার কবিতা তারাপদ রায় এই বইয়ে সন্নিবেশিত করেছেন। কেন যেন মনে হচ্ছে, আজকের যুগে এর খুব দরকার ছিল। আজকাল নিখাদ প্রেমের কবিতা বড় একটা চোখে পড়ে না। জীবনে সমস্যা অবশ্যই আছে, আজও আছে—দু হাজার বছর আগেও ছিলো। জীবনের সেই হতাশায় বাস্তব রূপ যেমন সত্য, তেমনি নির্জন দুপুরে জানালা দিয়ে হেমন্তের আকাশ দেখতে দেখতে অনেকদিন আগের অর্ধস্ফুট কোনো কথা, চটুল হাসিতে উদ্ভাসিত কারো পরিচিত চোখ মনে পড়ে উদাস হয়ে যাওয়াও সত্য। অনেকদিন বাদে তারাপদ রায়ের কবিতায় এসব গাঢ় অনুভূতির স্বাদ পেলাম। কবিতা নিয়ে নতুন পরীক্ষার নামে পাগলামী, শব্দ নিয়ে অহেতুক নাড়াচাড়া, বিষয়কে বাদ দিয়ে কেবল আঙ্গিক নিয়ে বাড়াবাড়ি—এসব তো অনেক হল, এবার এরকম স্বচ্ছ অনুভূতির প্রতিবেদন—যা সাধারণ মানুষ একবার পড়ে বোঝেন—এমনও কিছু কিছু লেখা হোক। এককালে পাঠকের প্রতি কবি ও সমালোচকের অভিযোগ ছিলো—তাঁরা পরিশ্রম করতে চান না। সে অভিযোগ এখন সম্ভবত বাতিল হয়ে গিয়েছে। কারণ গত অন্তত দশ বছর পাঠক নিশ্চুপ বুদ্ধি খরচ করে বিস্তর আধুনিক কবিতা পড়েছেন। কিন্তু মন ভরেছে কি? লিরিকধর্মী কবিতার আবেদন সরাসরি যতটা হৃদয়ে, ততটা মস্তিষ্কে নয়। কাঁহাতক বুদ্ধির হাতুড়ি দিয়ে শব্দের কাঠবাদাম ভেঙে খাওয়া যায়? এই কারণেই তারাপদ রায়ের সহজ বুদ্ধিগ্রাহ্য অথচ কমনীয় সুষমামণ্ডিত এই কবিতাগুচ্ছকে অভিনন্দন জানাতে ইচ্ছে করছে। সংকলনের প্রথম কবিতা 'বনানী'-ই তো একটি অসাধারণ সৃষ্টি। এ ছাড়া 'সাদা কালোয়' 'কতদিন পরে', 'চিঠিপত্র'—এই কবিতাগুলি অনায়াসেই পাঠককে একটি সান্দ্র মধ্যামরতার ভূমিতে উত্তীর্ণ করে।

রঞ্জন ঘোষাল-এর প্রচ্ছদ অতি দৃষ্টিকটু ও অবান্তর। এত ভালো কাব্য-সংকলনের প্রচ্ছদ কি আরো স্থিতধী এবং দায়িত্বশীল কাউকে দিয়ে করানো যেত না? দেখে মনে হয় শিল্পী সবে আঁকতে শিখেছেন। এর চেয়ে কেবলমাত্র টাইপ বসিয়ে নাম লিখে দিলেও ভালো ছিলো। ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। মুদ্রণপ্রমাদ নেই বললেই চলে।

ভালোবাসার কবিতা : তারাপদ রায়। ঈশান, ৭৯।২ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা-৯। দাম পাঁচ টাকা।

'বিনন্দ' ছদ্মনামে রচিত 'কত হেঁটেছিলাম' লেখকের প্রথম বই হলেও লেখকের সরস ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর মুন্সীয়ানার জন্য বইটি পাঠকদের ভাল লাগবে। ভারতের নানাস্থানের ভ্রমণের সুন্দর বিবরণ এই বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে। যাঁরা তারাপীঠ, রাজগীর, চিত্তরঞ্জন, কাশী, গয়া, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানের নানাবিধ সরস কাহিনী শুনতে চান এই বই তাঁদের ভাল লাগবে। ছাপা কাগজ ও মুদ্রণ ভালো। প্রচ্ছদে রবীন মণ্ডলের আঁকা ছবিটি এইটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।

কত হেঁটেছিলাম—বিনন্দ, পরিবেশক : মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ৮ টাকা।

চতুর্থ আন্তর্জাতিক ত্রিবার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনী ১৯৭৮

শৈবাল ঘোষ

(এক)

১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮। নয়াদিল্লীতে ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীনীলম সঞ্জীব রেড্ডি বর্ণাঢ্য পরিবেশের মধ্যে চতুর্থ আন্ত-র্জাতিক ত্রিবার্ষিক চারুকলার প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন। এই প্রদর্শনী একমাস ধরে চলবে।

আন্তর্জাতিক শিল্পজগতের অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে আয়োজিত তিনদিনব্যাপী সেমিনারে সমাজে শিল্পের স্থান, শিল্প এবং সৃষ্টির পরিচয় ইত্যাদি আরও অনেক বহু বিতর্কিত বিষয় আলোচিত হয়েছে নিমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন হ্যারোল্ড রোসেনবার্গ, অক্টাভিও পাজ, রবার্ট মাটা, মরিস গেজ্ভস্ এবং জন ডেভিস।

এই গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শনীর আন্তর্জাতিক বিচারকদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী রিচার্ড হান্ট, ফিলিপ রসন্, ইয়েশায়াকা ইনুই এবং ভারতের দুই বিখ্যাত শিল্পী সতীশ গুজরাল এবং কৃষ্ণা রেড্ডি।

শিল্প ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ দেশ ভারতবর্ষ এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী নিজস্ব তত্ত্বাবধানে প্রতি তিন বছর অন্তর আয়োজন করে থাকে। এইবার নিয়ে চারবার এই প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে।

প্রদর্শনীর প্রত্যক্ষদর্শীরা প্রত্যেকেই একবাক্যে স্বীকার করবেন যে আন্তর্জাতিক শিল্প আজ কোন গতিপথ ধরে চলেছে সে সম্পর্কে একটা ধারণা তাঁরা করতে পেরেছেন। ভারতীয় শিল্পরসিক দর্শকদের কাছে এই প্রদর্শনী আন্তর্জাতিক শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে। এই প্রদর্শনী শিল্পপিপাসু ভারতীয়দের কাছে উপস্থিত করার জন্যে ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের সাংস্কৃতিক বিভাগ এবং ভারতীয় শিল্পের কর্ণধার ললিতকলা আকাদেমী সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য।

আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী শুরু হবার অনেক আগে থেকেই সারা ভারতে তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়, দেশের সব চাইতে ভালো শিল্পকর্ম নির্বাচন করে বিশ্ব চারুকলার দরবারে উপস্থিত করার জন্য। প্রতি দেশের শিল্পকর্ম নির্বাচনের দায়িত্ব এবার দেওয়া হয়েছিল সেই দেশের বিশিষ্ট একজন কি দুজন শিল্পীর ওপর। সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক শিল্প নির্বাচনের জন্য নির্বাচক অর্থাৎ কমিশনার ছিলেন আঠারোজন শিল্পী এবং সমালোচক। কেবলমাত্র ভারতে ছিলেন তিনজন নির্বাচক। রামচন্দ্রন, মাণুজী পটেল এবং পশ্চিম বাংলার প্রখ্যাত কলাসমালোচক ও শিল্প শিক্ষক প্রণবরঞ্জন রায়। এই কমিশনারদের অবশ্য পদে ত্রিবার্ষিক কমিটির থেকে অন্যায় ভোটযুদ্ধে হটিয়ে দেওয়া হয় এবং এই প্রথমবার ভারতীয় আন্ত-র্জাতিক ত্রিবার্ষিকের নির্বাচনের নিয়মাবলী ত্রিবার্ষিক কমিটি (অনেকেরই অনুপস্থিতিতে) দ্বারা লঙ্ঘন করা হয়। ত্রিবার্ষিক কমিটির মধ্যে কয়েকজন প্রবীণ শিল্পী এই কমিশনারদের নির্বাচনকে একতরফা এবং একটি দেওয়া কন্‌সেপ্টের ওপর কন্‌সেপ্ট তৈরী করার দায়ে নাকচ করে দেন। এইটি ত্রিবার্ষিক ইতিহাসে এই প্রথম। যদিও নির্বাচকদের ওপর ত্রিবার্ষিক কমিটি দায়িত্ব দেবার সময় জানিয়ে দিয়েছিলেন যে এই কমিটির নির্বাচনই চরম এবং বাইন্ডিং বলে ধরা হবে, এর থেকে কোনোরকম নড়চড় করা হবে না।

আসল ব্যাপারটা নিশ্চয়ই পাঠকদের বুঝে নিতে সময় লাগবে না, যে ত্রিবার্ষিক কমিটির মধ্যে একটি শিল্পীগোষ্ঠী (সন্তোষ, পি টি রেড্ডি, কৃষন খান্না, স্বামীনাথন, শান্তি দাভে এবং এদের মধ্যে দিল্লীর কলাসমালোচক রিচার্ড বার্থলোমিয়ুও ছিলেন) তাদের নাম নির্বাচকদের নির্বাচিত শিল্পী তালিকায় না দেখতে পেয়ে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন এবং মনে করলেন তাঁরা অর্থাৎ প্রবীণরা যদি ভারতের প্রতিনিধিত্ব না করেন তবে শুধুমাত্র

হেন্ডে বুহলের ভাস্কর্য : থার্ড-২

মারসাদ্ বারবারের উডকাট : ক্যানিকাল অফ সেরাজেভো

নবীনদের দ্বারা এত গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শনী চালু রাখানো শক্ত হবে (যেটা সম্পূর্ণ মিথ্যে একটা কল্পনা মাত্র)। এর ফলে তারা তাদের প্রতাপ এবং ছলচাতুরী খাটিয়ে অন্যায় ভোটিং দেখ ৮-৭ ভোটে অনেকের অনুপস্থিতিতেও) এই নির্বাচকদের জানিয়ে নির্বাচন তালিকা ভুল বলে প্রমাণিত করলেন। পি. টি. রেড্ডি তো তাঁর নাম না দেখতে পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়েই ছিলেন, এই সুযোগে রাগ দেখানোর অছিলায় নির্বাচকদের তালিকাটিকে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেললেন।) ত্রিবার্ষিক কমিটির একমাত্র সদস্য প্রণবরঞ্জন রায় সঙ্গে সঙ্গে কমিশনার হিসাবে তার পদত্যাগ পত্র পেশ করলেন। অন্য দু'জন নির্বাচকও একইভাবে পদত্যাগ করলেন।

এরপর শুরু হলো ওই শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতাপ দেখানোর পালা। তারা নতুন নির্বাচিত তালিকায় নিজেদের নাম আগে বসিয়ে তারপর অন্যান্য প্রবীণ শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানালেন এই ত্রিবার্ষিকে যোগদান করার জন্যে; যেখানে আগের নির্বাচকরা চব্বিশজন শিল্পীকে নির্বাচিত করেছিলেন (এর মধ্যে একজন ফাক্ আর্টিস্ট ও একজন ট্রাইবাল আর্টিস্ট)। এই দু'জনকে একটি অন্যায় অজুহাতে বাদ দিয়ে নতুন নির্বাচকগণ (পি. টি. রেড্ডি, জি আর, সন্তোষ, শাম্পিলাল এবং ডোনিয়র) আগের নির্বাচিত বাইশজনের ওপর আরও ৬৩।৭০ জনকে নির্বাচিত করলেন। এই অবৈধ নির্বাচনের জন্য প্রথম তালিকার দশজন সদস্য এই ত্রিবার্ষিকে যোগদান করবেন না বলে জানালেন। এই দশজন হলেন গণেশ পাইন, বিকাশ ভট্টাচার্য, সনৎ কর, পরমজীৎ সিং, ভূপেন খাক্কর, গুলাম মহম্মদ শেখ, ভীভান সুন্দরম, গিয়েভ্ পটেল, অকৃশমা গৌড় এবং মীরা মুখোপাধ্যায় (যদিও ইনি পরে অংশ গ্রহণ করেছেন)। অবশেষে দেখা গেল সব মিলিয়ে এই ত্রিবার্ষিকে যোগদান করলেন ৬৯ জন শিল্পী।

যেখানে আগের নির্বাচকরা প্রতিশিল্পীর ৬।৭টা করে ছবি প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন সমকালীন ভারতীয় শিল্পের রূপ তুলে ধরার জন্য সেখানে প্রত্যেকের একটা কি দুটো করে ছবি প্রদর্শন করার জায়গা রইল এবং যার থেকে সমকালীন শিল্পের ছাপ তো বোঝাই যায় না উপরন্তু বিভিন্ন রকম একটা দুটো ছবি দেখে কোন ছবিরই গুরুত্ব দেওয়া যায় না এবং শিল্পীর শিল্প-কর্মের পরিমাপ করা অসাধ্য হয়ে পড়ে।

এই হচ্ছে ভারতীয় শিল্প নির্বাচনের কথা এবং নির্বাচক হবার পরিণাম। কথায় আছে 'এক কান কাটা শহরের বাইরে দিয়ে যায় আর দু'কান কাটা শহরের মধ্যে দিয়ে যায়'। এই প্রবীণ নব-নির্বাচন কমিটির সদস্যদের দেখে সেটাই প্রকট হয়ে উঠলো। আগের দু'জন পদত্যাগকারী নির্বাচকের (রামচন্দ্রন ও নাগজী পটেল) মধ্যে শিষ্টতা বোধ ছিল। তাই নির্বাচক হয়ে নিজেদের নাম নির্বাচিত তালিকায় বসানো ঠিকানা ভেবে তার থেকে বিরত ছিলেন। অপর-দিকে নতুন নির্বাচক কমিটি অর্থাৎ গোলাম রসুল সন্তোষ, পি. টি. রেড্ডি এবং ভারতীয় শিল্পজগতের এক অপরিচিত শিল্পী প্রেমজীলাল জুমত্য হাতে পেয়ে নিজেদের নাম নির্বাচিত তালিকায়

বসানোর লোভ থেকে বিরত থাকতে পারলেন না। সব চাইতে লজ্জার কথা অনেকের মতে এবং নিজের চোখে এই তিন নির্বাচকদের শিল্পকর্ম দেখে মনে হলো না যে এই শিল্পকর্ম খুব উঁচুমানের। বরং ছবি বা ভাস্কর্য দেখে মনে হলো, এই শিল্পীদের শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে না থাকলে কোনরকম ক্ষতি তো হতোই না উপরন্তু এইসব কাজ না থাকলেই বোধহয় প্রদর্শনীর মান আরও কিছুটা বৃদ্ধি পেতো।

এই প্রদর্শনীতে আন্তর্জাতিক বিভাগে অংশ গ্রহণকারী ৩৯টি দেশের চিত্র এবং ভাস্কর্য প্রগতি ময়দানের ডিফেন্স প্যাভিলিয়ন, রবীন্দ্রভবনের গ্যালারী এবং টেরেস গার্ডেনে প্রদর্শিত হয়েছে।

ডিফেন্স প্যাভিলিয়নে যে সব দেশের ছবি এবং ভাস্কর্য সাজানো হয়েছে তারা হলো হাঙ্গেরী, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, আয়ারল্যাণ্ড, ইটালী, জাপান, নেদারল্যাণ্ড, নাইজেরিয়া, ফিলিপিন্স, পোল্যাণ্ড, রোমানিয়া, স্পেন, শ্রীলংকা, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, টানজানিয়া, ইউনিয়ন অফ সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক ইউনাইটেড আরব এমিরেটস্, ভিয়েতনাম, যুগোশ্লাভিয়া এবং ইরাক। রবীন্দ্রভবনের ললিতকলা আকাদেমীর গ্যালারীতে যেসব দেশের ছবি আছে সেই সব দেশ হলো আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, বিটেন, বুলগেরিয়া, চিলি, চায়না, কিউবা, ফ্রান্স, চেকোস্লোভাকিয়া, ফিনল্যাণ্ড, জারমান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক, বাংলাদেশ, ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানি এবং ভারত (যার স্থান জুটেছে বেসমেন্টে অর্থাৎ মাটির তলায়)।

এই প্রদর্শনী পুরোপুরি ভালোভাবে ঘুরে দেখতে গেলে অন্তত তিন-চারদিন সময় লাগে এবং এই প্রদর্শনী দেখার পর মনে হয় শিল্পরসপিপাসু দর্শক হতাশ হবেন না। প্রদর্শনী দেখে একটা বৈশিষ্ট্য যা চোখে পড়লো তাহলে প্রত্যেক দেশই নিজে-দের দেশের ঐতিহ্য এবং সমকালীন অবস্থা তুলে ধরতে চান। তাদের শিল্পকলায় নিজের নিজের দেশের অন্তরঙ্গ ছবি পাওয়া যায় এবং এটা দেখে সুখকর লাগে যে প্রত্যেক দেশের থেকে প্রত্যেক দেশের কাজ আলাদা ধরনের। কোথাও মিডিয়াম কোথাও বা টেকনিক এবং স্টাইলের পার্থক্য প্রত্যেক দেশের নিজস্বতা (ইণ্ডিভিজুয়ালিটি) এনে দিয়েছে।

এই প্রদর্শনী শুরু হবার আগে যেন কনসেপ্ট ঠিক করে নেওয়া হয় এই চতুর্থ ত্রিবার্ষিকের জন্য এবং সেই কনসেপ্টের ওপর নির্ভর করে সব দেশকে শিল্পকলা পাঠাবার জন্য অনুরোধ করা হয়। কনসেপ্টের মূল ভাবানুবাদ নীচে দেওয়া হল।

চতুর্থ আন্তর্জাতিক ত্রিবার্ষিক প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য, সেই শিল্পকে তুলে ধরা যে শিল্প সারা বিশ্বের শিল্পকলার ক্ষেত্রে স্থায়ী গতিপ্রবণতা প্রতিপালন করে। সেই শিল্পই প্রকৃত শিল্প বলে ধরে নেওয়া যায় যা আজকের গতানুগতিক, ছড়িয়ে পড়া, অবয়বহীন উদার শিল্পপ্রবণতা নয় এবং শুধুমাত্র যা দেখার আনন্দের জন্য অথবা শুধুই ব্যবহারিক নিয়মানুযায়ী গড়া শিল্পের বিরুদ্ধে যায় এবং সেই বাহ্যিক আকারের শিল্পের দ্বারা চালিত হয় না।

চতুর্থ আন্তর্জাতিক ত্রিবার্ষিক প্রদর্শনী এই বক্তব্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে চায় যে আজকে বিশ্বে যত নতুন আঙ্গিকের শিল্পকলা শুরু হয়েছে, সেটাই যে একমাত্র তাৎপর্যপূর্ণ তা নয় এবং এই মনোভাব অথবা ধারণা সত্য নয় যে অবয়বহীন অথবা তার বিপরীত শিল্প সৃষ্টি মানেই বিমূর্ত শিল্পকলা।

এইসব শিল্পকে প্রবাহিত করে তোলে বাজারের খাম-খেয়ালীপনা এবং অন্যের হয়ে বিজ্ঞাপিত করা যার কাজ এরকম কিছু [illegible]

যে আন্তর্জাতিক গুরুত্ব শিল্পের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়ে থাকে একটা ঝোঁকের বশবর্তী হয়ে তা কখনোই আন্তর্জাতিক শিল্পের সার্বভৌমত্বের তাৎপর্য বোঝায় না।

এই ত্রিবার্ষিক, সেই কারণে নিঃসন্দেহে এই বিশ্বাস রাখে যে শিল্পকে কখনোই কোনও কারণে এই সব অমানবিক প্রবর্তিত ধারায় শিকার হ'তে দেওয়া উচিত নয়। এক এক অনির্দিষ্ট শিল্পকে মানবজাতির ওপর বোঝার মত চাপানোর চেষ্টা থেকে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য। এই সংগঠন আশা করে যে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ-কারী সব দেশ এই ধারণার পৃষ্ঠপোষকতা করে এই বক্তব্যকে সত্য বলে প্রমাণিত করার চেষ্টা করবেন।

ত্রিবার্ষিক প্রদর্শনী যে চিন্তাধারার বশবর্তী তা হ'লো, এমন এক সুচিন্তিত আকৃতিগত রূপের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করা যা অত্যন্ত সহজে কল্পনা বা দর্শনের রূপকলার সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ করায়। যে কল্পনা বা দর্শনের রূপকলা শিল্পীর সেই অভিজ্ঞতা থেকে জন্মায় যা তার সৃজনীমূলক আত্মার আত্মিক সত্তের পারিপার্শ্বিক এবং মনস্তাত্ত্বিক জগতের সাক্ষাৎকারে সৃষ্ট হয়।

এই ধরনের শিল্প যেমন শুধুমাত্র মানসিক, পরিবেশগত প্রেরণা, নিয়ম বা আদেশানুযায়ী সৃষ্ট নয় তেমনই এই শিল্প কখনোই পরীক্ষামূলক নবধারার প্রবর্তনকারী হতে পারে না।

এই শিল্প দর্শন ও উপলব্ধিতে পরিপূর্ণ এবং মানবিক পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত করা যায়। এই শ্রেণীর শিল্পকলা আত্মার বোধের প্রতিরূপ যা আকৃতি, রূপ এবং ভারসাম্যের কল্পনামূলক শিল্পবোধকে বজায় রাখে। নমনীয়, কোমল প্রকাশ ভঙ্গিমাতে মানে এবং বক্তব্য এমনভাবে বক্তৃতা করা যায় যা শিল্পীর অন্তর্নিহিত আত্মাকে প্রত্যক্ষদর্শীর সামনে সুদৃঢ় করে তুলে ধরে।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে তাকেই শিল্প বলে যা মানবিক মূল্যবোধের নিঃসন্দিগ্ধভাবে মূল্য নিরূপণ করে এবং যা অন্তর্দৃষ্টি এবং আত্মার বোধকে প্রকাশ করে।

এই বক্তব্যের উপর গুরুত্ব দিয়ে চতুর্থ আন্তর্জাতিক ত্রিবার্ষিক শিল্পীর ব্যক্তিগত শিল্প প্রকাশের স্বাধীনতাকে কোনও রূপ নিবারণ অথবা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন নিয়ে খর্ব না করে প্রকৃত আন্তরিক এবং বাস্তিক ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় শিল্পের প্রকাশভঙ্গির ধারাবাহিকতার সংস্থাপন করতে শিল্পী, ভাস্কর এবং গ্রাফিক শিল্পীদের কাছে সহযোগিতা প্রার্থনা করে।

এই বক্তব্য অথবা কনসেপ্টই হচ্ছে এবারের চতুর্থ ত্রি-বার্ষিকের মূল চিন্তাধারা বা ধারণা। এই চিন্তার ওপর ভিত্তি করেই এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু এই কনসেপ্ট কতটা প্রতিপালিত হয়েছে প্রদর্শনী দেখার পর সেই সন্দেহটা বেশী করে জাগে।

চতুর্থ ভারতীয় আন্তর্জাতিক ত্রিবার্ষিকে ৩৯টি দেশের যাবতীয় শিল্পকর্মের ভিতর থেকে আন্তর্জাতিক বিচারকরা দুটি গ্রাফিক শিল্প, তিনটি ভাস্কর্য এবং একটি চিত্রশিল্প বেছে নিয়েছেন সমকালীন চারুকলার সব চাইতে সেরা নিদর্শন হিসাবে। এই ছয়-জন পুরস্কার প্রাপক প্রত্যেকে একটি স্বর্ণপদক এবং সঙ্গে ২০,০০০ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন। বিচারকদের দ্বারা নির্বাচিত আরও দুটি গ্রাফিক শিল্প, একটি ড্রইং এবং একটি রিলিফ ভাস্কর্য পেয়েছে সম্মানপত্র (অনারেবল মেনশন)।

পুরস্কার বিজেতাদের মধ্যে আছেন সুইস শিল্পী রলফ লেহম্যান'। তাঁর পুরস্কার প্রাপ্ত ছবি 'রিকনট্রু সিরিজ ১-১০'।

ছবির দশটি সমমাপের ছবির সমষ্টি এবং ইনি কপার প্লেট করে এই দশটি ছবি নির্মাণ করেছেন।

যুগোস্লাভ শিল্পী মারসাদ বারবার কাঠের ব্লক বহুবর্ণে দর্শকদের তাক্ লাগিয়ে দিয়েছেন। এই একম ওল্ড মাস্টার প্রিন্টের মত গ্রাফিক শিল্প সমকালীন শিল্পজগতে দেখা যায় না। বহুবর্ণ ছবি কাঠের ব্লকে খোদাই করে রং দিয়ে ছাপতে প্রচুর পরিমাণ অভিজ্ঞতার দরকার। এই শিল্পীর অসাধারণ দক্ষতা দেখে বোঝা যায় যে ইনি বহুদিন ধরে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছেন ও সফল হয়েছেন। ত্রিবার্ষিক প্রদর্শনী তাঁর এই অনন্য সাধারণ প্রতিভাকে পুরস্কার দিয়ে সম্মান জানিয়েছেন।

আর এক পুরস্কার প্রাপক হলেন ফেডারাল রিপাবলিক অব জার্মানীর হেডে বুহ্লে। ইনি একজন মহিলা ভাস্কর। এনার ভাস্কর্য ... শক্তিতে ভরপুর। ভাবতে অবাক লাগে সেই সঙ্গে ভালো লাগে যে আজকাল মহিলারাও ভাস্কর্য জগতে শিল্প সৃষ্টিতে এগিয়ে এসেছেন। এই শিল্পীর ভাস্কর্য প্রায় লাইফ ... এতটা ছন্দময় আর রহস্যময় যে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে ভালো লাগে। যদিও এঁর ভাস্কর্যে কোনরকম প্রতীক কাজ অথবা ... আভাস মাত্র পাওয়া যায় না। তবুও ভালো লাগে। যে ... তাঁকে এত বড় সম্মান এনে দিয়েছে তা খুবই সহজবোধ্য। ... এবং রহস্যময়। কাঠের ওপর মোমের পালিশ দেওয়াতে ... দেখে ... বলে ভুল হওয়াও আশ্চর্য নয়। তিনি পুরস্কার পেয়েছেন তাঁর রচনা পার্ট-২ সৃষ্টি করার জন্য। তার ... মার্সিত এবং ... কাঠের টুকরো দিয়ে দিয়ে ... এই মূর্তির অভিব্যক্তি ... কৌশলে ... বাহাদুরীর ছাপ ... সব চাইতে ... চোখে পড়ে তা হলো ... মূর্তির চোখ বলে কিছু নেই, তার বদলে চামড়ার একটা ... খোদাই করে তার মধ্যে বসানো।

তাঁর ... কাঠের মধ্যে ... খোদাইয়ের কাজেও যেটা ... তা হলো সেখানেও তিনি তার মূর্তির চোখে, মুখে এক ... চওড়া একটা পট্টির বাঁধন দিয়েছেন। যার ফলে তাঁর ... ভাবে নির্বাক, অন্ধ একটা জড় বস্তুতে পরিণত হয়েছে ... তিনি সেটাই হয়তো দর্শকদের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

তাঁর সব মূর্তিই মানবাভিত্তিক এবং তাঁর মূর্তিতে তিনি ... মধ্যে চামড়া অথবা লোহা জুড়ে তাঁর বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করে ... ধরতে চান। হেডে বুহ্লের ভাস্কর্য আধুনিক ভাস্কর্য ... একটি অতি উন্নতমানের নিদর্শন। এই ভাস্কর্য দেখলে ... মনে হয় নবীন ভাস্করেরা অনেকেই ভাস্কর্যের সম্বন্ধে নতুন দিকে চিন্তা করার অনুপ্রেরণা পাবেন।

পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে একজন ভারতীয় ভাস্কর বিশ্ব-শিল্পের দরবারে ভারতের শিল্প সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনরায় তুলে ধরেছেন তিনি হলেন নন্দগোপাল। ইনি বিখ্যাত ভারতীয় শিল্পী স্বর্গত পানিকরের পুত্র। এঁর সৃষ্টি পানিকরের শিল্প থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নরকমের।

ইনি পুরস্কার পেয়েছেন রিচুয়াল ইমেজ নামক মূর্তি সৃষ্টি করে। তাঁর মূর্তিকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে সিলভার প্লেটেড ... রিলিফ বলা যায়। অনন্যসাধারণ এই কাজের গঠন ভঙ্গিমা ও ... প্রকাশে পুরোমাত্রায় ভারতীয়, তাঁর কাজ একটা বিশেষ ...-এর (গোষ্ঠীগত)। তিনি কপারের ওপর কপারের পাত ... ধর্মীয় প্রতীক চিহ্ন তৈরী করে ওয়েল্ডিংএর মাধ্যমে মূল ... কাঠামোর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। জায়গায় জায়গায় হাই এবং ... রিলিফের জন্য তাঁর কাজ আরও সুষমামণ্ডিত মনে হয়। এঁর ... একটাই দোষ তা হলো এই ভাস্কর্য কোনদিনও খোলা ময়দানে রাখা যাবে না কারণ এঁর মণ্ডন শুধুমাত্র সামনের দিকে এবং সেই দিকটাই দর্শকদের সামনে দেওয়া হয়। প্রথাগত ভাস্কর্যের একটা অলিখিত নিয়ম হলো যে ৩৬০ ডিগ্রী অ্যাংগেল করে মূল মূর্তির চারপাশে ঘুরলে যে মূর্তির পুরোটাই অর্থবহ হয়ে দাঁড়ায় বা দেখতে ভালো লাগে সেটাই ভাস্কর্যের প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু।

নন্দগোপালের কাজ ১৮০° ডিগ্রীর বেশী অ্যাংগেল থেকে দেখা যায় না, তার বেশী অ্যাংগেল থেকে দেখতে গেলে ইনার স্ট্রাকচার অথবা ভিতরের মণ্ডন চোখে এসে যায়। এবং এই শিল্প রিলিফও বলা যায় না এই কারণে যে তার ভাস্কর্যের এমন কতক-গুলি নির্মাণ প্রকৃতি আছে যা দেয়ালের গায়ে লাগিয়ে রাখলেও বেরিয়ে আসে এবং দর্শকের বিভিন্ন অ্যাংগেল থেকে দেখতে গেলে আবার সেই ইনার স্ট্রাকচার চোখে পড়ে।

তবুও বলতে দ্বিধা নেই যে হেডে বুহ্লের ভাস্কর্যের থেকে নন্দগোপালের ভাস্কর্যের মূল্য কোনমতেই কম নয় এবং নিজস্ব স্বকীয়তায় তিনি যে শিল্প সৃষ্টি করেছেন তা সত্যিই প্রত্যক্ষদর্শী শিল্পরসিকদের ভালো লাগবে। তাঁর এই নবধারা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

আর একজন পুরস্কৃত শিল্পী কোরিয়ার হুং সিও কিম্। ইনি ক্যানভাসে আঁকা চিত্রের জন্য পুরস্কার পেয়েছেন। ছবির নাম 'ওপেনিং এণ্ড শাটিং' অর্থাৎ খোলা এবং বন্ধ করা।' এই ছবির বক্তব্য ব্যক্ত করতে গিয়ে শিল্পী যে মিডিয়ামের আশ্রয় নিয়েছেন তা হলো ক্যানভাস এবং সূঁচ-সূতো। এই ছবির বিষয় এবং উপস্থাপনার অভিনবত্বে যেমন কোন সন্দেহই থাকে না সেইরকম মনের দিক থেকে অথবা শিল্পবোধের দিক থেকে এটাও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে মূল কনসেপ্ট-এর বক্তব্যের সঙ্গে এই ছবির মিল খুবই কম।

ছবিটিতে দুটি ক্যানভাস পাশাপাশি জুড়ে একটায় কালো এবং আর একটাতে সাদা রং দিয়ে ভরা হয়েছে। পরে ক্যানভাসের ওপরে ছুঁচ দিয়ে আলগা করে সেলাই করার মতো কালো ক্যানভাসে কালো এবং সাদা ক্যানভাসে সাদা সুতো পরপর রেখা ধরে ঝুলিয়ে যাওয়া হয়েছে।

নিঃসন্দেহে কালো ক্যানভাসের মধ্যে প্রবেশ করা যায় এবং সাদা ক্যানভাসে দৃষ্টি আটকে যায়। ছবিটির গঠনের সার্থকতা এইখানে।
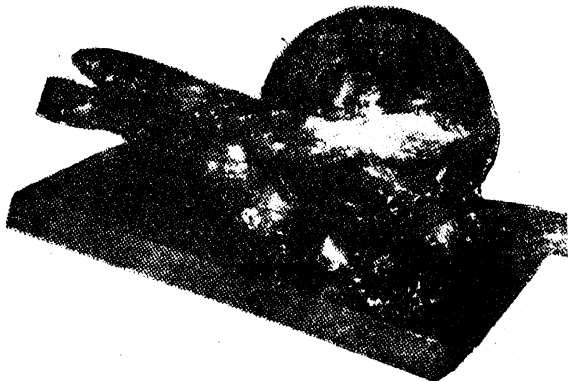
কোশো ইটোর ভাস্কর্য : ক্রোম্যাটিক অবজেক্ট্স্

পুরস্কৃত ছবি সম্বন্ধে যদিও বলার কিছুই থাকে না তবুও এর চাইতে ভালো অথবা এরই সমান ভালো কি আর কোনও শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে ছিল না? এই বক্তব্যটা আমি শিল্পজ্ঞানসম্পন্ন আন্তর্জাতিক বিচারকদের সামনে রাখতে চাই।

এই ধরনের শিল্প আমার মতে খুবই তাৎক্ষণিক সুন্দর এবং আমার মতো সীমিত শিল্পজ্ঞানসম্পন্ন দর্শকও নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে বাধ্য যে এই ধরনের শিল্প প্রথম দর্শনে হয়তো বা ভালো লেগে যায়, কিন্তু এই শিল্পের বক্তব্যের অথবা প্রকাশভঙ্গিমার সঙ্গে বাস করা যায় না। আর এই ধরনের শিল্পের সুদূরপ্রসারতা, বিশালত্ব এবং অন্তর্দৃষ্টি সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়। মাননীয় আন্তর্জাতিক বিচারকমণ্ডলীর নির্বাচন যে ভুল তা আমি কোনমতেই বলতে চাই না, তবে এটাই অত্যন্ত সবিনয়ে বলতে চাই যে এই শিল্পের ভাব মনের গভীরে দাগ না কাটার জন্য আমি, শিল্পী এবং শিল্প বিচারকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

সর্বশেষ পুরস্কৃত ভাস্কর জাপানের কোশো ইটো, ইনি সেরামিক এবং অ্যাকরাইলিক দিয়ে তার শিল্পবস্তুর মণ্ডন করেছেন। শিল্পকর্মের নাম 'ক্রোমাটিক অবজেক্টস্'। সব চাইতে মজার কথা হলো, যে সব দর্শক এই শিল্পবস্তুর সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন, প্রত্যেকেই বিমূঢ় ও হতবাক হয়েছেন। এটাই এই ভাস্কর্যের কারিগরী। এর মানে খুঁজতে যাওয়া বৃথা এবং এই শিল্পদ্রব্যের বর্ণনা দিতে গেলে বলতে হয় একটা গোলাকার স্বচ্ছ [illegible] এর মধ্যস্থলের চারপাশে এক আধা স্বচ্ছ সেলোফোন কাগজের মত কাঁচের কাগজ জড়ানো এবং তার একপাশে লম্বা টিউবের মত কাঁচের পাইপ [illegible] দুটো মুখই বন্ধ, খুবই আশ্চর্য রকমের শিল্পবস্তু। এই ভাস্কর্যের গঠন কৌশলেরও অভিনবত্ব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকে না। সন্দেহ থেকে যায় সেখানেই যে এর ভাবরস কতটা দর্শকরা নিতে পারলো অথবা এই শিল্প তার সঙ্গে দর্শককে কতটা একাত্ম হবার সুযোগ করে দিলো। তখনই এই শিল্পের সার্থকতা সম্পর্কেও সন্দেহ জাগতে আরম্ভ করে।

সেরামিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে শিল্পী হয়তো অনেকটাই উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং এর জন্য তাঁর কারিগরীর প্রশংসা না করে পারা যায় না, কিন্তু এই শিল্পের ব্যাপ্তিই বা কতদূর এবং এই শিল্পের বক্তব্যই বা কত সুস্পষ্ট সে সম্বন্ধে না বোঝার জন্যই [illegible] দর্শক এত বেশী হতচকিত ও স্তম্ভিত। শিল্পের শ্রেষ্ঠত্বের [illegible] হয়।

আন্তর্জাতিক বিচারকমণ্ডলী আরও যে চারটি শিল্পবস্তুকে বিশেষ সম্মান জানিয়েছেন সেই চারটি শিল্পবস্তু এই আন্তর্জাতিক ত্রিবার্ষিকের মত এত বড় প্রদর্শনীতে খুঁজে নিতে হয় না, এরা আপনি এসে ধরা দেয়। এই চারটি শিল্পবস্তুর আকর্ষণ ক্ষমতা এতই বেশী যে ছবির সামনে দাঁড়ানোর পর কাউকে আর বলে দিতে হয় না যে এইসব একজিবিট বিশেষ সম্মান পেয়েছে। এদের নিজেদের রূপ, ভাব, বক্তব্য বা গঠন কৌশলই জানিয়ে দেয় এরা আশেপাশের আর সব ছবির থেকে স্বতন্ত্র এবং জাজ্বল্যমান শিল্প।

এই সম্মানীয় মানপত্র পেয়েছেন আয়ারল্যাণ্ডের লুইস লে ব্রোখুই তাঁর লিথোগ্রাফ 'দ্য টেইন—পোরশন অব এ্যান আরমি' রচনা করে। লিথোগ্রাফ গ্রাফিক শিল্পের একটি অঙ্গ। লিথোগ্রাফ এক শ্রেণীর পাথরের উপর অঙ্কিত তৈলাক্ত এবং অতৈলাক্ত বিভিন্নাংশে তফাৎ রচনা করে কালি দিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে কাগজের উপর ছাপা হয়। এই মুদ্রণ প্রণালীর গুণগত ফললাভে এই রচনার মান নির্ধারণ করা হয়।

লুইস লে ব্রোখুই তাঁর এই রচনায়—মুদ্রণ কৌশ[illegible] পুরোপুরিই সম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁর ছবিতে সাদা কাগ[illegible] ওপর জমাট কালো দিয়ে ছাপা হয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈনিক, [illegible] কোন কিছুই দেখা যায় না একমাত্র তার বহিরঙ্গ ছাড়া। এই ধর[illegible] কালো কালো ঘোড়ার পিঠে চড়া অথবা তরবারী হাতে পদা[illegible] সৈন্যের সমারোহে গঠিত একটা পুরো নকসা। এই বিষয়ের বিশাল[illegible] তাঁর এই রচনায় (যদিও খুবই ছোট ছবি) উপলব্ধি করা যায় [illegible] ভালো লাগে।

ভারতের আর এক সম্মানের অধিকারী—চন্দ্রশেখর। [illegible] টেমপটেশন নামক ড্রইং-এ সম্মান লাভ করছেন। সুন্দর রচনা। [illegible] বড় ছবি কালি ও কলমে আঁকা এক নারী শিল্পাঞ্জলি [illegible] পরমে শিল্পাঞ্জী সেই আদিম কামনার প্রস্তাব উত্থাপন করে[illegible] ছবির পটভূমিকায় দেখা যায় এক শয়নঘরের দৃশ্য, পুরু[illegible] শিল্পাঞ্জীর পেছনে খোলা দরজা, হাওয়ায় পরদা উড়ছে। বেশ ভা[illegible] পরিশ্রম করে রচিত ড্রইং বেশ বাস্তববাদী ছবি। সাধারণ লোকে[illegible] ছবিতে প্রবেশ করা কোন অসুবিধা নেই।

হাঙ্গেরীর এলেনাই তমাসও এই সম্মানের অধিকারী। তা[illegible] রচনা ব্রোঞ্জের 'এ সেট অব ডিসফিগারড শেপস'। মনে হয় এ[illegible] ধরনের শিল্পকলা বৃহত্তর শিল্পের জন্য বহুদূর এগোতে সক্ষম।

এটি একটি রিলিফ ভাস্কর্য বলা যেতে পারে। মখমলকে [illegible] করে তার ওপর তিনটি [illegible] করে মেডালিয়ান লাগানো, প্রত্যেক মেডালিয়নের নিজস্ব বলিষ্ঠ বক্তব্য আছে। তাঁর ইমেজ সৌন্দর্য দেবী ভেনাসকে নিয়ে গঠিত। একটি মেডালিয়নে ভেনাস মুক্তার মতো ঝিনুকের থেকে আবির্ভূতা হচ্ছেন। আরেকটাতে ভেনাস তারকাঁটা এবং চেনের দ্বারা বন্ধন করা হয়েছে। প্রতি কাস্টিং অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সম্পাদন করা এবং তার ভাব ও গঠন দক্ষতা গুণের জন্য প্রত্যেক দর্শকই এই শিল্পকর্মের সামনে দাঁড়ি[illegible] ভালভাবে উপলব্ধি না করে চলে যেতে পারবেন না। এই শিল্প[illegible] নিদর্শনের মধ্যে এমনই কতগুলো কোয়ালিটি বা [illegible] আছে যা মানুষকে টানে ধরে রাখে। এই নিদর্শন দেখবার জন্য অনেকে অনেকবার করে ছুটে আসতে হয়েছে। এই রিলিফ ভাস্কর্যে আরও একটা গুণ হলো এর বক্তব্য, আকৃতি এবং উপস্থাপনায় [illegible] শিল্পিক ক্ষেত্রে বক্তব্যের অনেক গভীরে নিয়ে যেতে পারে। যারা না দেখলে শিল্পরসপিপাসু মানুষ পুরোপুরি এর শিল্প আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হয় এবং এই শিল্পের মধ্যে শিল্পপ্রেমী সহজেই বাস করতে পারেন।

ভিয়েতনামের লে টাট লোইও একজন সম্মানপ্রাপ্ত শিল্পী ওনার উডকাট এর শিল্প দক্ষতার সম্বন্ধে কোন সন্দেহই পা[illegible] না তার একমাত্র কারণ তিনি তাদের ট্র্যাডিশনাল পদ্ধতিতে উডকা[illegible] করেছেন। যথাসম্ভব কম রঙ-এ রচিত তাঁর 'বাটট্যাং পার্টির ভিয়েতনাম সংগ্রামীদের দেশ। তাঁদের অসংখ্য শিল্পে তারই প্রকা[illegible] পাওয়া যায়। এদের সবার কাজ এতই এক ধরণের যে বিশে[illegible] স্বকীয়তা খুঁজে পাওয়া যায় না, সবার কাজ দেখে মনে [illegible] একই লোকের।

ভিয়েতনামী শিল্পীগোষ্ঠীকে ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক [illegible] যায়, কোনো একজনকে নয়, তবুও বলতে বাধ্য হচ্ছি লে ট[illegible] লোই এর কাজ দর্শককে মুগ্ধ করেছে।

এই হলো ত্রিবার্ষিক প্রদর্শনীর সম্মানপ্রাপ্তদের শিল্পকর্মে[illegible] [illegible] বরণ।

এইই হলো ত্রিবার্ষিক প্রদর্শনীর সম্মানপ্রাপ্তদের শিল্পকর্মের বিবরণ।

আন্তর্জাতিক বিচারকমণ্ডলী এই প্রদর্শনী পরিক্রমা করে পুরস্কার নির্বাচনের পর এই গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শনীর উপর যে লিখিত বক্তব্য পেশ করেছেন তার মূল ভাবার্থ দেওয়া হলো।

বিচারকমণ্ডলীর রিপোর্ট :

চতুর্থ আন্তর্জাতিক ভারতীয় ত্রিবার্ষিক প্রদর্শনীর বিচারকমণ্ডলী ললিত কলা আকাদেমীকে এই প্রদর্শনী পরিচালনা এবং সুব্যবস্থাপনার জন্য সাধুবাদ জানায়। এই উদ্যোগ যে দক্ষতা ও মনোযোগদ্বারা সুসম্পাদিত হয়েছে তা প্রশংসার দাবী রাখে।

বিচারকমণ্ডলী খুবই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছেন যে বিচারকদের আয়ত্ত বহির্ভূত অবস্থার জন্য যালয়েশিয়ার শিল্প দ্রব্য শিল্পবিচারের আওতায় রাখা যায়নি।

একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় লক্ষণীয়। বিশ্বের বহুদেশের শিল্পীরাই গ্রাফিক শিল্পের দিকে বেশী ঝুঁকেছেন এবং এই প্রদর্শনীতে বেশ কিছু উচ্চমানের গ্রাফিক নিদর্শনের মধ্য অত্যন্ত উন্নয়নমূলক সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো যে প্রচুর পরিমাণ ভাস্কর্য এই প্রদর্শনীতে দেখা যায় এবং এটা অনুভব করা যায় যে শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমের ক্ষেত্রে ভাস্কর্য আগের চাইতে আজ অনেক এগিয়ে গেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এই মনে হয় যে ভাস্করবা দিনে একটা ভাস্কর্য শিল্পের থ্রি ডাইমেনসাল ক্ষেত্রের ভিতরে একটা আকৃতিক সঠিক মূল্যায়নে সক্ষম হচ্ছেন বা গুরুত্ব দিচ্ছেন।

মুদ্রণশিল্পের ক্ষেত্রে গ্রাফিক একটি পরিষ্কার রূপকার ধারণ করেছে এবং তার অন্তরের বক্তব্যকে বা গঠনপদ্ধতিকে সংক্ষেপে সময়োপযোগী আকারে নিয়ে আসছে।

প্রদর্শিত শিল্পবস্তু প্রত্যেকটাই স্বকীয়তা দ্বারা সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করা হয়েছে।

যদিও সমকালীন শিল্পের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শিল্প গঠনের ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই সার্বভৌমত্ব গ্রহণ করেছে তথাপি ভাবতে ভাল লাগে যে প্রত্যেক দেশ তার চারিত্রিক গঠনের উপর নিজের ভাষায় শিল্পকথা বলেছে এবং সে শিল্পভাষা এক সুন্দর স্বতন্ত্র সমসাময়িক যুগের জাতীয় সাংস্কৃতিক চরিত্র ব্যক্ত করেছে।

এমনি কোন কোন ক্ষেত্রে সারা বিশ্বের প্রতি পরিচ্ছন্ন ইঙ্গিতময় বক্তব্যও পাওয়া যায় এই শিল্পে।

এই বিচারকমণ্ডলী স্বর্ণপদক প্রাপকদের শিল্পমান নির্ধারণ করার জন্য যা খতিয়ে দেখেছেন তা হলো রূপকল্পের যথার্থ স্বাধীনতা যার দৃষ্টরূপ মৌলিক অন্তর্নিহিত ভাবকে অনুপ্রাণিত করে।

বহু উচ্চশ্রেণীর আকর্ষণীয় শিল্পবস্তুর সমারোহের থেকে বিচারকগণ সেই শিল্পকেই বেছে নিয়েছেন পুরস্কার প্রদানের জন্য যার মধ্যে উন্নত আধুনিক কলাকৌশল উত্তীর্ণ হয়েছে। যা শুধুই আকর্ষক নয়, অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে অতিসংবেদক অনুভব পরিষ্কার করে বোঝানো গিয়েছে এবং যা কেনো কৌশলের ভনিতা প্রদর্শন না করে অথবা নকল না করে সৃষ্টি হয়েছে।

এইই হলো বিচারকমণ্ডলীর পুরস্কার প্রদানের পর পুরো প্রদর্শনী সম্বন্ধে বক্তব্য। এই বক্তব্যের উপর গুরুত্ব দিয়ে দর্শকরা প্রদর্শনীর শিল্পদ্রব্য অথবা তার শিল্পগত মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবেন বলে আশা করা যায়।

শিল্পকর্ম বিচারের সম্বন্ধে যদিও নতুন করে বলার কিছু নেই আর পুরস্কৃত শিল্পসামগ্রী সম্পর্কে কোনো অভিযোগই টেঁকে না। কারণ পাঁচজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্প বিশেষজ্ঞ দ্বারা এইসব ছবি শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছে এবং বলা হয়ে থাকে যে সব বিচারকই যখন একটা বিশেষ ছবির সম্পর্কে একমত হতে পারেন তখনই সেই শিল্পকে শ্রেষ্ঠ শিল্প বলে ধরে নেওয়া যায়।

সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি যে বিচারকমণ্ডলী যে সব শিল্প পুরস্কৃত হয়েছে সেগুলি সম্বন্ধে একমত হতে পেরেছেন।

তবুও এই ত্রিবার্ষিকের কমপ্লেন্ট পড়ার পর এবং বিচারকমণ্ডলীর রিপোর্ট পড়ার পর এবং পুরস্কৃত ছবির মূল্যায়ন করার পর মনের গভীরে কোথায় যেন একটা খটকা থেকে যায় এবং মনে একটাই প্রশ্ন জাগে—পুরস্কৃত শিল্পকর্মের সবগুলির ক্ষেত্রে কি সঠিক মূল্যায়ন করা হয়েছে ? এবং প্রদর্শনীতে সম মানের অথবা পুরস্কৃত শিল্পদ্রব্যের চাইতে উচ্চমানের কি আর কোনও নিদর্শন নেই ? বিচার কি একেবারেই সঠিক হয়েছে ? হয়তো এ প্রশ্নটা করা ভুল কারণ এত বিশাল শিল্পদ্রব্যের সমারোহের মাঝখান থেকে সর্বোৎকৃষ্ট শিল্পদ্রব্যটি খুঁজে বার করা হচ্ছে সেই খড়ের বোঝার মধ্যে ছুঁচ খোঁজার মতো এবং মনে হয় স্বয়ং ঈশ্বরও যদি এই বিচারকদের জায়গায় থাকতেন তা হলে তিনিও হয়ত সঠিক শিল্পের মূল্যায়ন করতে পারতেন না। কোথাও না কোথাও একটা ভুল হয়তো হয়ে যেতো। এবং এই ধরনের ভুল শুধুমাত্র ত্রিবার্ষিকে কেন, অন্যান্য বহু প্রদর্শনীতেও হয়ে থাকে।

সুতরাং সঠিক নির্বাচন সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করাই চলে না, হয়ত এই কথা বলা চলে যে, এতই উৎকৃষ্ট শিল্পের সমারোহের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা অসাধারণ শিল্পসৃষ্টি করেও পুরস্কার লাভ থেকে বঞ্চিত হলেন। তার একমাত্র কারণ হতে পারে মাত্র ৬টি স্বর্ণপদক। ত্রিবার্ষিক কমিটির কাছে অনুরোধ যে পুরস্কারের সংখ্যা যদি বাড়িয়ে দেওয়া যেতো তা হলে আরও অনেক ভাল শিল্প পুরস্কৃত হতে পারতো।

তবে আবার এমনও হতে পারে যে পুরস্কারের সংখ্যা দশটি করে দেবার পর হয়তো দশটি সেরা কাজ পাওয়া গেলো না। সেই ক্ষেত্রে যতগুলি সেরা কাজ পাওয়া যাবে ততগুলোই পুরস্কার দেওয়া যুক্তিযুক্ত।

বিচারকদের রিপোর্ট পড়ে এটাই মনে হয় যে সুযোগ থাকলে ওঁরা আরও ছবিকে পুরস্কৃত করতে পারতেন। কিন্তু তাঁদের হাতে সে সুযোগ ছিল না।

পুরস্কারের তালিকা পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে তিনটি ভাস্কর্য পুরস্কৃত হয়েছে। ছটি পুরস্কারের মধ্যে প্রদর্শনী ভালো করে দেখলে বোঝা যায় যে আরও বেশ কিছু ভাস্কর্য ছিল যা পুরস্কার পাবার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু সেই শিল্পীদের দুর্ভাগ্য যে পুরস্কারের সংখ্যা ছটি হবার জন্য ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে তিনটির বেশী পুরস্কার দেওয়া যাচ্ছে না। পুরস্কারের সংখ্যা বাড়িয়ে দশটি করলে হয়তো আরো দু একটি ভাস্কর্য পুরস্কার পেতে পারতো।

এই একই কথা মুদ্রণশিল্প সম্বন্ধে বলা যায়। সত্যি কথা বলতে কি এবারের প্রদর্শনীতে ভাস্কর্য এবং গ্রাফিকসের এতই প্রাধান্য দেখা গেছে যে সব পুরস্কারই যদি ভাস্কর্য এবং গ্রাফিকশিল্পের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হতো তাহলেও বলার কিছু থাকতো না।

সুতরাং ক্ষমতা অনুযায়ী শিল্প বিচারকদের বিচার যথার্থ বলে মেনে নেওয়া যায়, এবং তাদের সম্বন্ধে কোনরকম অভিযোগ করাটাই অন্যায় বলে মনে হয়।

যতদিন মোরারজী ততদিন জনতা

রাজধানীর ইনসাইড স্টোরি

ছোট, বড়, মাঝারি মন্ত্রীদের আলাদা করে ডেকে প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই হুমকি দিয়েছেন—মিলেমিশে কাজ না করতে পারলে আমি গভর্নমেন্ট ভেঙে দেবো। জনতা পার্টির বিবাদমান নেতারা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা অনেকেই ঠাওর পর্যন্ত করতে পারেন নি যে এমন একটি মোক্ষম অস্ত্র মোরারজী ছুঁড়বেন তাঁদের দিকে। জনসাধারণের কাছে আবার যাবো। জনতা নতুন করে রায় দিক। এমন ভয়ও তিনি কয়েকজনকে দেখিয়েছেন। আবার নির্বাচনের মুখোমুখি হবো কথাটায় অনেকটা ভূত দেখার মত প্রতিক্রিয়া হয়েছে জনতা পার্টির মধ্যে। অনেকেরই আশংকা যে নির্বাচনে যাওয়া মানে হবে রাজনৈতিক যূপকাষ্ঠে মাথা পাতা। সাধ করে আর বলি হতে চায় কে? মুখ বুজে তাই হুমকিটা হজম করছেন সকলে।

সংসদে জনা তেত্রিশ ছাপ মারা সংগঠন কংগ্রেস সদস্যদের ঐকান্তিক আনুগত্যের ওপর ভর করে মোরারজী দেশাই এক বছর আগে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হন। সেদিন সংসদে সদস্যদের ভিড়ে রমরমা অবস্থা ছিল জনসংঘ আর বি-এল-ডি দলের। সেই ভিড়ে বালাজোয়ান্ট নেতা মোরারজীকে আপনজন থেকে বিচ্ছিন্ন মনে হয়েছিল। তারপর মাস ছয়েক রীতিমত কসরৎ করতে হয়েছে বিভিন্ন শরিক দলের ভিন্ন ভাবগতিক বুঝতে। বুঝতে হয়েছে পায়ে কোথায় লাগে; কে কার লোক; কে দক্ষ। আর কে কত বেশী [illegible] নিতে ক্ষমতা রাখতে। মন্ত্রিসভায় সদস্যদের [illegible] কেরামতি সম্বন্ধে যে আসলে মোরারজীর কোন ধ্যান ধারণা ছিল না। নেহাৎ শরিক দলের সংসদীয় শক্তির আনুপাতিক হার মনে রেখে নানা নানা চাপের প্রভাবে সেদিন তাঁকে বিভিন্ন নামের তালিকায় কেবল সই বসাতে হয়েছে। মোরারজীর মানসিকতার পক্ষে এই অবস্থা ছিল অসহ্য। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে [illegible] উঠল অনতিদূর থেকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের [illegible] ক্ষমতা শক্ত পোক্ত হল সংসদীয় 'পারফরম্যান্স' দেখে আর [illegible] ভাবে তিনি মন্ত্রীদের বুঝিয়ে দিতে [illegible] সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত এসেসমেন্ট কি। ভুরু নাচিয়ে না বলে মোরারজী তাঁর [illegible] মন্তব্য করলেন 'আমি [illegible] সরকার।' এটা মাস কয়েক আগের কথা। [illegible] অন্ততপক্ষে ভাবমূর্তির দিক থেকে উনি [illegible] শক্তির পরিচয় দিতে শুরু করেছেন জনতা পার্টির অন্দর মহলে। মোরারজী কিন্তু এখনও ক্যাবিনেট পুনর্গঠন করতে পারেন নি। [illegible] এমন কথা যে তিনি বলতে পারেন এটাই যথেষ্ট। কারও কারও ধারণা যে উনি বলবেন ভবিষ্যতে এটা ছিল তারই ইঙ্গিত। সময় অসময়ে জনতা পার্টির এবং মন্ত্রিসভার বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের [illegible] অনেক কথা। আর এমন সব বলা-কওয়ার মধ্যে [illegible] 'আর্থার বাড' হল মধ্যবর্তী নির্বাচন। উনি বলছেন 'আমার কিছু এসে যায় না' 'আই হ্যাভ নাথিং টু লুজ।' প্রকারান্তরে উনি বলতে চাইছেন জনতা পার্টির আর সকলে সর্বহারা হয়ে পড়বে। সর্বহারা হয়ে পড়বে কখন, মোরারজী যেখানে সরে দাঁড়াবে।

প্রধানমন্ত্রীর গদির জন্য যিনি এক বছর আগে 'কম্প্রোমাইজ ক্যান্ডিডেট' ছিলেন তিনি এখন একমাত্র ব্যক্তি যাঁকে বাদ দিয়ে রাজনৈতিক বিচারে কেন্দ্রীয় জনতা সরকার অচল। জনতা পার্টির শরিক দলের অন্দর মহলের টানাপোড়েনের পরোক্ষ ফল তাঁকে ক্রমশঃ শক্তিশালী করেছে। আর অবস্থাটা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে যতদিন মোরারজী আছেন ততদিন জনতা সরকার থাকছে। প্রধানমন্ত্রীর কুর্সির জন্য শরিক দলগুলির মধ্যে এককালে বিকল্প প্রস্তাব ছিল। ছিলেন চরণ সিং। ছিলেন জগজীবন রাম। কিন্তু এঁদের দুজনের পায়ের তলা থেকে অনেক জমি সরে গিয়েছে গত এক বছরে। এঁদের কণ্ঠে এখন 'একলা চলো রে' গান। একলা চলার পথে সাধু, সন্ন্যাসী হওয়া যায় কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হওয়া যায় না।

রাজনৈতিক দাবার চালে বি-এল-ডি, জনসংঘ ও সি-এফ-ডি তাড়াহুড়ো করে একের পর এক ভুল করায় মোরারজী অবশেষে শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন। জনা সতেরো বি-এল-ডি সদস্য বিজু পট্টনায়কের নেতৃত্বে এখন সরাসরি মোরারজীকে মদৎ দিচ্ছেন। সোস্যালিস্ট এবং বিদ্রোহী কংগ্রেসীরাও মোরারজীর পাশে। এছাড়া তেমন কিছু উপসর্গ দেখা দিলে যদি জাতীয় সরকার গঠন করতে হয় তাহলেও বাম-দক্ষিণ এবং অন্যান্য দলগুলি মোরারজীর দিকেই হাত বাড়াবে। মোরারজীর এই অবস্থা সর্বাগ্রে রাজনৈতিক চশমা দিয়ে লক্ষ্য করে জনসংঘ—আর এস এস গোষ্ঠী। নাগপুর থেকে ছুটে আসেন বালা সাহেব দেওরস। আর এস এস প্রধান, দেওরস দিল্লিতে জনসংঘ নেতাদের সঙ্গে গোপন বৈঠকে বসেন। আর সেই বৈঠকের পর মোরারজীকে পুরো সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেয় জনসংঘ। [illegible] মোরারজী যাতে প্রধানমন্ত্রী থাকেন সেই উদ্দেশ্যে জনতা পার্টির শরিকদের মধ্যে একমাত্র সংগঠিত দল জনসংঘ তার [illegible] সংসদ সদস্য নিয়ে সর্বদা সজাগ থাকবে।

মোরারজীর দুর্গ নানা কারণে এইভাবে শক্তিশালী হচ্ছে। দলীয় কোন্দলের ঊর্ধ্বে থাকাই হল প্রধানমন্ত্রীর আপ্রাণ চেষ্টা। রাজ্যসভার নির্বাচনে কোন শরিকের কতোজন মনোনীত হল, রাজ্য নির্বাচনে কে দাঁড়িয়েছে—এসব ব্যাপারে অন্যদের মত উনি মাথা ঘামান না। প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারকে কেন্দ্র করে পার্টির মধ্যে পারস্পরিক ঝগড়া লেগেই আছে। তাঁরা লড়াই করছেন দলীয় প্রতিপত্তি ও প্রভাব বাড়াতে। প্রধানমন্ত্রীর সে বালাই নেই। উনি সার কথাটা বুঝেছেন যে ভারতের দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক বাতাবরণে তাঁর সংগঠন কংগ্রেস ফুলেফেঁপে বড় পার্টি হিসাবে দানা বাঁধতে পারবে না। সুতরাং দলীয় রাজনীতির বাইরে তিনি থাকতে পেরেছেন। এর ফলে তিনি ছোট-বড় নানা 'কন্টোভার্সি'র' ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছেন। চরণ সিংয়ের দল এটা এতোদিনে বুঝতে পেরে মোরারজীকে দলীয় 'কন্টোভার্সি'র' মধ্যে আনবার চেষ্টা করছেন। তারা বলছেন মোরারজীকে 'আপনি পার্টি সংগঠনের কাজে নামুন' এদিকে নজর দিন। এই কাজে হাত দিলে মোরারজী দেশাই নির্ঘাৎ বিপাকে পড়বেন। তিনি এই প্রস্তাব এড়াবেন কি করে সেটাই লক্ষ্য করবার ব্যাপার। এক বছরের জনতা সরকারের প্রশাসনিক বাজারে মন্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র মোরারজী দেশাইয়ের রাজনৈতিক 'শেয়ার ভ্যালু' যাকে বলে তুঙ্গে। এই সুবিধা নিয়ে উনি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবার মানুষ নন। এই সুবিধা মোরারজী দেশাই কোথায় কীভাবে কখন কাজে লাগাবেন সেটা দেশাই আগামীদিনের রাজনৈতিক পোলারাইজেশনের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। জনতা পার্টির ভিতরে ও বাইরে পুরোন কংগ্রেসীরা এবং সমভাবাপন্ন লোকেরা মোরারজীর রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধিতে এখন উৎসাহ পাচ্ছেন।

পার্থ [illegible]

মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল। নন্দা চোখ নামিয়ে নিতেই শুভ্রাংশু নিজেকে তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক করে বলল, 'আরে তপন তুমি ?' একটু থেমে অবার বলল, 'এই স্টীমারেই ছিলে নাকি! কোত্থেকে আসছ?'

'মাকে নিয়ে ফিরছি কালিয়াগঞ্জ থেকে। তপন উত্তর দিল, 'এতক্ষণ আপনাকেও দেখতে পাই নি।' হাসিমুখে মার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'ইনি আমার মা', মাকেও জানাল সে, 'উনি হচ্ছেন আমাদের ইংরেজীর প্রফেসর 'এস—বি।'

দুজনেই হাত তুলে নমস্কার জানাল। নন্দা বলে উঠল, 'দেখুন তো ছেলের কান্ড! এই কি আলাপের সময়!'

'তাতে কি হয়েছে।' শুভ্রাংশু তখনো অপরাহ্ন আকাশে আঁকা প্রতিমা মূর্তি দেখছে। তার মুখে মুগ্ধতার মৃদু হাসি। 'আলাপের কি আবার সময় অসময় আছে নাকি ?'

'তা নয়', নন্দাও হেসে ফেলল, 'আমাদের তো এখন নামবার সময় হল। খুব অবেলায় আলাপ হল, তাই বলছিলাম।'

'ঠিক বলেছেন।' শুভ্রাংশুও নামবার জন্যে প্রস্তুত হল।

'চলুন—ঘাটে স্টীমার ভিড়েছে এবার তোড়জোড় করি।'

তিনজনে এগিয়ে চলল। দুটো একটা সামান্য কথা দিয়ে প্রথম এই আলাপ। ছাড়াছাড়ির সময় তপন বলল, 'স্যার কলকাতা ফিরে কিন্তু আমাদের বাড়িতে যাবেন—' সে তাকাল শুভ্রাংশুর দিকে।

'নিশ্চয়ই যাব—' শুভ্রাংশু আড়চোখে নন্দাকেই দেখল। তারপর পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে বলল, 'তপন তোমাদের ঠিকানাটা ?'

তপন ঠিকানা বলল। এবার নন্দা বলে উঠল, 'অবশ্যই আসবেন, আজ কিন্তু কথা হল না।'

'সেদিন হবে।' শুভ্রাংশু হাসি দিয়ে উত্তর দিল। 'তখন আর অবেলার প্রশ্ন থাকবে না।'

খিল খিল করে হেসে উঠল নন্দা। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। শুভ্রাংশুর মনে হল একরাশ যুঁইফুল ছায়াভরা অন্ধকারে মনের ভেতর ফুটে উঠল। নন্দার কথাগুলো যেন [illegible] মিষ্টি মাখা। 'ঠিক আছে।'

দুজনে দু' দিকের পথ ধরল। অথচ সেই জোৎস্নায় প্রথম ওদের এক তৃতীয় সুরে [illegible] বাজা শুরু হল।

কলেজ খোলার পর তপনের সঙ্গে একদিন সোজাসুজি ওদের বাড়িতে চলে এল শুভ্রাংশু মনের খেয়ালে। তাকে দেখে নন্দা সত্যিই চমকে গিয়েছিল। কারণ সে এতটা আশা করে নি। তার ঝকঝকে চোখ দুটো দিয়ে অপ্রত্যাশিত আনন্দ উপচে উঠল। স্টীমার ঘাটের স্মৃতি মনে পড়ল। নন্দা ভুলে গিয়েছিল সেই শীতের বিকেল। এখন শুভ্রাংশুর চেহারায় সেই বিকেলটা যেন ফিরে এল।

[illegible] আপনি এলেন।'

বাইরের ঘরে বসবার পর নন্দা কথা বলল। 'কতদিন সেই বিকেলের কথা ভেবেছি…'

'ধরে নিয়েছিলেন আমি আসব না, এই তো।' শুভ্রাংশু হাসল।

'এখন নিশ্চয়ই অবেলা নয় কি বলেন।'

'কথাটা এখনো আপনার মনে আছে।' নন্দা হাসল। শুভ্রাংশুর মনে হল এই মুখের ভেতর কোথাও কিছু একটা লুকোনো আছে।

'আমাদের আর বেলা কোথায়! সংসার করতে করতে বেলা তো ফুরিয়ে এল। যখন কাজ ফুরবে তখন তো সবই অন্ধকার হয়ে যাবে।'

'তা কেন—' শুভ্রাংশু ঝুঁকে পড়ল। 'বিকেলের কি সৌন্দর্য নেই, রাতের অন্ধকারের কি আলাদা রূপ নেই। সবেরই সব কিছু আছে। এখনো হতাশ হবার কিছু হয় নি।'

'তাই বুঝি!'

'বিশ্বাস না হয় দেখে নেবেন।' শুভ্রাংশু কথা শেষ করল। নন্দা চা জল-খাবারের জন্যে ভেতরে চলে গেল। একটু বাদেই প্লেটে খাবার সাজিয়ে সে ফিরে এল। একরাশ খাবার দেখে শুভ্রাংশু বলল, 'আমি কিন্তু খাবার নেমতন্নে আসি নি, এই কথা ছিল না।' 'না বলা অনেক কিছুই থাকে—' নন্দা বলে উঠল, 'নিন, এখন খান তো—না খেলে আমি শুনব না। তপন তোমার স্যারকে দেখ, আমি চা নিয়ে আসছি।' নন্দা বেরিয়ে গেল।

মুগ্ধ চোখে সেই পথের দিকে তাকিয়ে রইল শুভ্রাংশু। তপনের ডাকে তার মনে হল সে এতক্ষণ কিছু একটা ভুলে গিয়েছিল। 'স্যার খেয়ে নিন।'

'ও—হ্যাঁ—একটু বিব্রতই হল শুভ্রাংশু। ভাবটাকে সহজ করবার জন্যেই প্লেটটা টেনে নিল। কই, তুমি নাও তপন।'

'আপনি খান—তপন বলে উঠল, 'আমার খাবার আলাদা আসছে।'

'তা হবে না।' শুভ্রাংশু জোর দিল, 'কথা শোন যা বলছি, তুমি এখান থেকে নাও। এত খাবার আমি কখনই খাই না।'

নন্দা চা নিয়ে ফিরে এল। এমন সময় কলিং বেল বাজতে নন্দা আবার বেরিয়ে গেল। একটু বাদে এবার সে ফিরল প্রায় শুভ্রাংশুর বয়সী এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। ধারাল মুখ, মাথায় সামনের দিকে টাক পড়েছে। গেরস্ত, পোষ মানা চেহারা। সদা সুখী একটা মানুষ বলেই তাঁকে মনে হয়। নন্দা শুভ্রাংশুকে দেখিয়ে বলল, 'ইনি তপনের বাবা—' স্বামীর দিকে ফিরে সে জানাল, 'আর উনি হলেন শ্রীশুভ্রাংশু বন্দোপাধ্যায়, তপনদের কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক।'

দুজনে নমস্কার বিনিময় করল। রাজীববাবু বলল, 'খুব ভাল লাগল পরিচিত হয়ে—কি সৌভাগ্য আপনি নিজে এলেন।'

'এতটা বিনয়ের প্রয়োজন নেই রাজীববাবু—'শুভ্রাংশু চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'আমরাও একই সমাজের জীব—পেশা আলাদা শুধু। আমিও আপনার সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ পেলাম। কই, বসুন।'

'আপনারা কথা বলুন—' রাজীববাবু বলল, 'আমি অফিসের সাজটা পালটে আসি।' তপনের বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চা খেতে খেতে শুভ্রাংশু বলল, 'আপনার বাড়িটা কিন্তু খুব গোছানো: বেশ ভাল লাগল।'

'বাইরের ঘরে বসে বুঝলেন কি করে?' নন্দা রহস্য করে বলল, 'আপনি কি হাত গুনতে জানেন।'

'আপনাকে দেখে যদি বলি।'

'তাহলে বাড়াবাড়ি হবে কথাটা।'

'হোক না—একটু বাড়িয়ে বললে দোষ কোথায়!' শুভ্রাংশু সম্ভুত এক ভাল লাগা গলায় উত্তর দিল। চোখ বুজে সে যেন সেই স্টীমার ঘাটের ছবিটা দেখছিল। আর ভাবছিল সত্যিই কি খুব অবেলায় এই দেখা হল।

রাজীববাবু ফিরে আসতে ঘোরটা কেটে গেল। দুজনে আলাপে মেতে উঠল। নন্দা মুগ্ধ শ্রোতার মতো সেই কথাগুলো শুনে গেল। কি চমৎকার শান্ত নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠ, কি সুন্দর কথা। এমন যেন সে আর কোনোদিন শোনে নি।

বাইরে রাত হয়ে আসছিল। এক সময় শুভ্রাংশু উঠল। বলল, 'চলি।' নন্দার দিকে ফিরে বলল, 'একদিন কর্তাকে নিয়ে আসুন না আমার গরীবখানায়।'

'যাব।' নন্দা ঘাড় নাড়ল।

'মুখের ভদ্রতা নয়, মন থেকে বলুন কবে আসছেন ?'

'ওঁর ছুটির কোনো—' নন্দা উত্তর দিল। 'তপনকে দিয়ে খবর পাঠাব। দেখবেন কি ভীষণ বিরক্ত করব আপনাকে।'

'মানুষ মাঝে মাঝে বিরক্ত হতেই চায়। বিরক্ত করলে খুশি হব।'

'বেশ দেখা যাবে তখন।' নন্দা বড় বড় চোখ মেলে কথাটা ছুঁড়ে দিল। শুভ্রাংশু এ কথার আর উত্তর দিল না। শুধু মৌন হেসে চলে গেল। কিন্তু নন্দার মনের মধ্যে রয়ে গেল নতুন ছোঁয়া। সে যেন স্বাভাবিকের বাইরে অন্য এক মানুষ দেখল। নন্দা সেই রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল। অদ্ভুত স্বপ্ন। যার মানে সে খুঁজে পেল না। অনেক কিছুর মানেই মানুষ খুঁজে পায় না। অনেক ব্যাপারের ব্যাখ্যাও সে ঠিক মতো করতে পারে না। কিন্তু ঘটনা ঘটে যায় আর তাতে সে জড়িয়ে পড়ে।

নন্দারা সত্যিই একদিন শুভ্রাংশুর বাড়িতে গেল। দুটি পরিবারের পরিচয়ের হাসি-খুশি নিয়ে একটা নিবিড় হৃদ্যতা কিছুটা সময় মাতিয়ে রাখল। শুভ্রাংশুর স্ত্রী মাধবীও শান্ত, মিষ্টি। তার

আতিথেয়তা. আলাপ যে কোন মানুষকেই আপন করে নেয় মুহূর্তে।

নন্দা সামান্য সময়েই তার মনের কাছে পৌঁছে গেল। প্রায় সমবয়সী দুটি মহিলা নিজেদের সংসারের ঝাঁপি খুলে অনর্গল কথা বলে গেল। কর্তারাও কম যায় না, চায়ের ফাঁকে ফাঁকে তাদের রাজনীতি ইংরেজী সাহিত্য, সম্প্রতি শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ধুন্ধুমার আলোচনা রাত পর্যন্ত গড়াল।

এক সময় ওরা বিদায় নিল। ঠিক যাবার আগে শুভ্রাংশু নন্দার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল, 'আজ কিন্তু আপনার সঙ্গে কথাই হল না।'

'ওমা সে কি।' নন্দা অবাক হয়ে গেল, 'আমি তো সারক্ষণ বকবক করে গেলাম।'

'তা করেছেন। তবে সবই প্রায় বাজে কথা।' শুভ্রাংশু হাসল, 'দুজন মহিলা এক হলে যা আর কি করে থাকেন।'

'আমাদের নিন্দে করছেন!' নন্দা মুখিয়ে উঠল।

'না না, এটা আপনাদের প্রশংসা।' শুভ্রাংশু ওকে থামিয়ে দিল।

মাধবী ও রাজীববাবু ওদের ঝগড়ায় হেসে উঠল।

'অনেক রাত হয়েছে আসি।' নন্দা বলল।

'আসুন, আবার দেখা হবে। আজ লড়াইটা মুলতুবী রইল।' শুভ্রাংশু বলল।

নন্দা আর কোনো উত্তর দিল না। দরজা দিয়ে আলো অন্ধকারে বেরিয়ে গেল।

এইভাবেই শুরু। কথা দিয়ে। অনেক কথার মারপ্যাঁচে। কিন্তু এখন আর কথার দরকার নেই। কথার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। শুধু বুকে হাত দিয়ে বুঝে নেওয়া। চোখের দেখায় যা কিছু বলা। অথচ কেউ কাউকে কিছু জানায় না, বলে না। ক্রমাগত এমন চলে আসছে। আর অস্বস্তি বাড়ছে। প্রথম দিকে তবু কেমন একটা নতুনত্ব ছিল—এখন তাও ফুরিয়েছে। দুজনেই তাই একলা হয়তো ভাবে এর তাহলে মানে কি।

দু দিন না যেতে যেতেই শুভ্রাংশু এসেছিল। সেদিন নন্দা একা ছিল। রাজীববাবু বাড়ি ফেরে নি। নন্দা প্রথমে সামান্য অস্বস্তি বোধ করেছে, কিন্তু তারপর মনে হয়েছে এমন আড়ালে তো ওকে পাওয়া যেত না সবাই থাকলে।

বেশিক্ষণ না থাকলেও দুজনে কেমন যেন কাছে আসতে পেরেছিল। ওদের কথার মানে ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল না, অথচ একটা আবহাওয়া গড়ে উঠল। কথায় কথায় বয়েসের কথা উঠলে শুভ্রাংশু বলল, 'আপনাকে দেখলে কিন্তু বয়েসের চেয়ে অনেক কম লাগে।' নন্দা হাসে। 'বাজে কথা। জানেন আমার মাথায় বেশ চুল পেকে গেছে।'

'চুলের পাক দিয়ে কি বয়েস বাড়ে। মন কাঁচাই আছে।'

'তাই নাকি। আপনার মতো!'

'আমি তো বুড়িয়ে গেছি।' শুভ্রাংশু বলে।

'আমাদের বয়সী সবাই তাই ভাবে। উনিও এই কথাই বলেন।'

'বলেন বুঝি!' শুভ্রাংশু হাসে। এই হাসিতে এক ধরনের স্নিগ্ধতা মাখানো যা এর আগে নন্দা দেখে নি। আবার নন্দার মুখে যে শেষ বিকেলের লাবণ্য তা শুভ্রাংশু ভাবে ইতিপূর্বে চোখে পড়ে নি।

পর পর আরো দু'বার শুভ্রাংশু এসে পড়ে। এই আসার মানেও জানে না কিন্তু আসে। বসে, গল্প করে। এই দু'বারই রাজীববাবুর সঙ্গে গল্প। নন্দাকে পাওয়া যায় না ধারে কাছে! তবু শুভ্রাংশুর মনে হয় সে কাছেই রয়েছে। নন্দা পাশে-পাশেই থাকে। আড়ালে। শুভ্রাংশুর গলার স্বরের স্নিগ্ধতায় সে ভাবে, মানুষটা বেশ।

বেশ ক'দিন শুভ্রাংশুর খবর নেই। নন্দা একটু আনমনা হয়ে পড়ে। তপনের

কাছে ভাবে খোঁজ নেবে। কিন্তু ছেলের কাছে এ ব্যাপারে বলতে তার কোথায় বাধে। কেন যে একটা দ্বিধা এসে দাঁড়ায় তা সে বোঝে না। অথচ মানুষটার একটা খবর পাওয়ার মনো ছটফট করে।

নন্দা একদিন কাজ ফেরৎ কি ভেবে চলে যায় সোজা। তার ভাগ্য ভাল সেদিন শুভ্রাংশুকে বাড়িতেই পায়। শুভ্রাংশু ওকে দেখে যেভাবে উৎসাহিত হয় তাতে মনে হয় সে ওর অপেক্ষাতেই ছিল। কথা কিন্তু সামান্য। নন্দার সময় কাটে ওর স্ত্রীর সঙ্গে। এই আলাপ তুচ্ছ হলেও নন্দা তাই বজায় রাখে। কথায় কথায় শুভ্রাংশু একবার বলে, 'আপনার নামটা কিন্তু বেশ ছোট—তাই না?'

'কে বললে?' চোখ বড় বড় করে নন্দা তাকায়। 'যে নামটা আপনি জানেন ওটা ছেঁটে নেওয়া। আমার আসল নাম অলকানন্দা।'

'বাঃ এ ত নদীর নাম।'

'এতে বাঃ করার কি আছে!' শুভ্রাংশুর স্ত্রী বলে ওঠে।

'তা নয়, ওই নদীটা আমার খুব প্রিয়।'

'ওনার কথা বাদ দিন', নন্দা বলে, 'চলুন আমরা ওদিকে গিয়ে গল্প করি।' নন্দা প্রসঙ্গ পাল্টে দেয়। তার ভয় হয় হয়তো ভদ্রমহিলা কিছু ভাবলেন।

কিন্তু উৎকণ্ঠা আঁচলের তলায় চাপা থাকে না। এর পরও নন্দাই আরো দুবার শুভ্রাংশুর বাড়ি যায় এবং তাকে পায় না এমনি উদ্দেশ্যহীনই সে এসে পড়ে। এতে বিড়ম্বনা বাড়ে। শুভ্রাংশুর স্ত্রী চা দেয়, বসায়। কিন্তু আলাপটা যেন সহজভাবে হয়ে চলে না। সে গম্ভীর। তার কথা কাটা কাটা। মনের ভাব কথায় স্পষ্ট হয়। কথা প্রসঙ্গে সে বলে, 'আমি জানেন মেয়েদের, বিশেষ করে ছেলেপুলের মায়েদের খুব একটা বাইরে কাটানো দেখতে পারি না।'

'ঠিকই বলেছেন।' নন্দা কথাটা হজম করে নেয়।

শুভ্রাংশুও একদিন তপনদের বাড়িতে কথায় কথায় বুঝতে পারে রাজীববাবু তার আসবার হেতু খুঁজে না পাওয়ায় কিছুটা নিষ্প্রাণ। তপনও বোধহয় অবাক হয়ে যাচ্ছে তাকে দেখে। সে যতই সহজভাবে ব্যাপারটাকে নেয় ওরা সেভাবে বোঝে না।

দুজনের কাছেই মনে হয় শুধু শুধুই একটা অশান্তিকে তারা টেনে আনছে। এটা স্বাভাবিক। সৌজন্যমূলক আলাপ প্রায়শই হয় না। দু একদিন। বাড়াবাড়ির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে মনের ইচ্ছে চেপে রাখে দুজনেই। যদিও সঠিক ইচ্ছের চেহারাটা খুব অস্পষ্ট, তবু ওরা মেপে মেপে পা ফেলে সরে আসে।

নন্দা বা শুভ্রাংশু যে যার মত্তো কি ভেবেছিল তা একে অন্যকে বলে নি। তবে দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে পড়ে। হয়তো এভাবে আরো কিছুদিন চললে একটা যে দূরের সৌগন্ধ ওদের ঘিরতে চাইছিল তা ফিকে হয়ে উড়ে যেত। কিন্তু তার আগেই ওদের আবার দেখা হয়ে গেল।

কাজ সেরে নন্দা ফিরছিল ধর্মতলা দিয়ে। ঘড়িঅলা বাড়িটার নিচে ওদের দেখা হয়ে গেল হঠাৎ। মুখোমুখি। শুভ্রাংশুই প্রথম বলল, 'আরে আপনি!'

'ওমা তাই তো!' নন্দা দাঁড়িয়ে পড়ল। 'কি ব্যাপার যান না যে!'

'আপনিও তো যান না।'

'আমি মেয়েমানুষ—সব সময় যাওয়া কি ভাল দেখায়!'

'পুরুষদের যাওয়ারও একটা নিয়ম আছে।' শুভ্রাংশু উত্তর দেয়। 'সেটা মেনে চলাই সংসারে ভাল।' দুজনে হাঁটতে থাকে।

'চলুন একটু চা খাওয়া যাক।' শুভ্রাংশু সুরেন ব্যানার্জি রোডের দিকে এগিয়ে যায়। নন্দাও ওর পেছনে।

একটা চা-ঘরে বসে নন্দা বলে, 'সংসারে বহু কিছু মানাই তো ভাল শুভ্রাংশুবাবু—আর এই মানতে গিয়ে ভাল লাগাগুলোকেই যে বরবাদ করতে হয়।'

'উপায় নেই।' শুভ্রাংশু ভেবে উত্তর দেয়। 'এটাই ধর্ম।'

'আমি মানি না আপনার কথা।' নন্দা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, 'আসলে আমরা ভীরু, তাই এসব বলি—আমি ভেবেছিলাম আপনার সাহস আছে।'

'সাহস জিনিসটা অনেক সময় তাৎক্ষণিক—ওটা তৈরি হয়।'

'কথাটা মনে থাকবে।' নন্দা মাথা নিচু করে।

চা শেষ করে ওরা বাইরে বেরিয়ে আসে। 'আমি প্রায়ই এখানে আসি। আসলে লাইব্রেরীতে আসতে হয়। বিকেলগুলো বই নিয়েই কাটে।'

'তাই নাকি!' নন্দা উৎসাহ দেখায়, রোজ সন্ধ্যেয় আমাকে এখান দিয়েই যেতে হয়।'

'তাহলে তো মাঝে মধ্যে দেখা হবে।'

'আপনি ইচ্ছে করলে।'

'একহাতে তালি বাজে না।' শুভ্রাংশু বলে। তার হাসি সন্ধ্যাকে নিবিড় করে। 'দেখা হলে খুশীই হব।'

'ঠিক আছে।' নন্দার কথার সঙ্গে সঙ্গে তার বাস এসে পড়ে। সে বলে, 'আজ চলি—আবার দেখা হবে।'

'সাড়ে পাঁচটা থেকে ছটা আমাকে লাইব্রেরীতে বা ওই চা-ঘরে পাবেন।' শুভ্রাংশুর কথার সঙ্গে সঙ্গে বাস ছেড়ে দেয়।

এরপর লাইব্রেরী আর চা-ঘরে ওদের দেখা হতে থাকে। কোনদিন নন্দা আগে এসে পড়ে—কোন কোনদিন শুভ্রাংশু যখন প্রায় ভাবে ও আর আসবে না ঠিক তখনি নন্দার শাড়ির আঁচল দেখা দেয়। এই দেখা রোজ না, প্রায়ই। প্রায় মানে এমনও হয় কখনো দু-তিন দিন পরপর নন্দার পাত্তা পাওয়া যায় না। শুভ্রাংশু বিরক্ত হয়ে বলে, 'আসবে না বললেই তো পার—এভাবে দাঁড়ানো খুব খারাপ লাগে।'

'আমার সংসার নেই।' নন্দা হাসে।

শুভ্রাংশু উত্তর দেয় না। ভ্রূ কুঁচকে সিগারেট ধরায়। তারপর একটু বাদে বলে, 'চা খাবে।'

'থাক।'

'তাহলে চল।'

এই চলার অর্থ ভিড়ে নয়—নির্জনে চল। যেখানে এত আওয়াজ বা কোলাহল নেই।

দুজনে হাঁটতে থাকে, কার্জন পার্ক পেরিয়ে, রাজ্যপাল ভবন পাশে ফেলে, ইডেন গার্ডেন ছাড়িয়ে গঙ্গার ধারে চলে যায়। গঙ্গার ধার দিয়েও দক্ষিণ দিকে অনেকদূর। যেখানে মানুষ প্রায় নেই। দুজনে নীরবে হাঁটে। কোথাও হয় তো বসে।

কখনো কখনো শুভ্রাংশু আসে না। দু-তিন দিন তার পাত্তা নেই। নন্দা এসে ফিরে যায়। একা ক্লান্ত চরণে। ওদের এই সন্ধে কাটানোটা এখন একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। দেখা না হলে বাড়ি ফিরে বিরক্তি আসে। একটা কেমন ক্লান্তি। কাজে ভুল হয়ে যায় দুজনেরই। নন্দা হয়তো চায়ে চিনি দেয় না—কিংবা চাবি খুঁজে পায় না। শুভ্রাংশু খাতা দেখতে ভুল করে। অকারণ স্ত্রীর ওপর রেগে যায়। দুজনের পরিবারের অন্যান্যরাও বুঝতে পারে কোথাও একটা গোলমাল হয়ে গেছে। কিন্তু সেটা কি তা কেউ জানে না। অথচ দেখা হলেও আজকাল কোনো কথা হয় না। দুটো একটা সামান্য টুকরো ভাঙা ভাঙা কথা। তবু তার ভেতরই অনেক কথাই লুকিয়ে থাকে। কেমন এক প্রশান্তি।

এই শান্তির খোঁজ যে কবে [illegible] ওরা পেয়েছে তা বলতে পারবে না। [illegible] দিকে নন্দা জোর করে শুভ্রাংশুকে ধরে নিয়ে সিনেমায় গেছে। শুভ্রাংশু আড়ষ্ট হয়ে ছবি দেখেছে। নন্দা ছবি দেখেনি, দেখেছে ওকে। মাঝে মাঝে ওর কাঁধের ওপর হাত রেখেছে। কিংবা হাতের ব্যাগটা ইচ্ছে করে ফেলেছে ওর সামনে। তারপর ঝুঁকে সেই ব্যাগ তুলেছে। দেহের উত্তাপ ছুঁইয়ে দিয়েছে ওর হাঁটুতে। শুভ্রাংশু আরো সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। সরে গেছে।

তেমনি কথা নেই, বার্তা নেই, শুভ্রাংশু হয়তো লোকের মাঝে ওর হাতখানা টেনে নিয়েছে। ধপ করে ওর পাশে বসে শাড়ির আঁচল ধরে বলেছে, 'বাঃ এই শাড়িটা তো ভারী মানিয়েছে তোমায়।'

আপনি থেকে তুমিতে শুভ্রাংশুই প্রথম নেমে এসেছে। কি একটা ইংরাজী বই বোঝাতে গিয়ে একদিন সে বলে ফেলে, 'দেখ নন্দা'— তারপরই বলে ওঠে, 'সরি— তুমি বলে ফেললাম, ছাত্র পড়ানো অভ্যাস তো, তাই বেরিয়ে গেল।'

'ভালই হল এবার থেকে তুমিই বলবেন।' নন্দা সম্মতি জানাল।

'না সেটা ঠিক হবে না'—শুভ্রাংশু গম্ভীর, যেন এমন একটা কিছু হয়েছে তার মুখ দেখে তাই মনে হল।

সঙ্গে সঙ্গে না না বলে উঠল। বাইরের হাওয়ার শব্দে আর জলের ঝাপটায় তার মৃদু প্রতিবাদ হারিয়ে গেল। আর আশ্চর্য সে ওর দেহ থেকে শুভ্রাংশুর হাত সরাল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা গাঢ় অনুভূতি দুজনের শরীর বেয়ে তরতর করে নেমে গেল। নন্দা আর বাধা দিল না।

বৃষ্টিটা ধরতে ওরা বাইরে বেরিয়ে এল। বাস রাস্তা পর্যন্ত ফিরল চুপচাপ। নন্দা বাসে ওঠবার আগে শুভ্রাংশু শুধু জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কিছু মনে করো নি তো?'

'তুমি ভীষণ অসভ্য।' নন্দা আর কিছু না বলেই বাসে উঠে গেল। ওর চোখে কিন্তু অদ্ভুত একটা হাসি। শুভ্রাংশু নির্বাক সেই দিকে তাকিয়ে রইল।

এরপর বেশ কয়েকদিন ওরা দেখা করে নি। কেন আর কি জন্যে তা নিজেরাই বুঝতে পারল না। কয়েকটা দিন মাত্র—তারপরই আবার আগের মতো ওদের দেখা হতে লাগল। ওই ঘটনা যেন ওরা ভুলে গেছে, কিংবা সতর্কে এড়িয়ে যেতে চাইছে প্রসঙ্গটাকে। কথায় কথায় একদিন শুভ্রাংশু নন্দাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমাকে কেন ভালবাস নন্দা?'

'তা জানি না।' নন্দা উত্তর দিল মুখ নিচু করে। 'কি করে বলব—এর কোনো উত্তর হয় না।'

'হয়;' শুভ্রাংশু ভাবল একটু—'আর তা তোমাকে বলতে হবে।'

'তাহলে তুমি আগে বল?' নন্দা পাল্টা প্রশ্ন করল।

'আমি আবার কি বলব—' শুভ্রাংশু হেসে কথাটা উড়িয়ে দিতে চাইল, 'আমি ভালবাসি কিনা তাই জানি না।'

'ন্যাকা।' নন্দা ঘাড় বেঁকাল। সে এই কথায় খুশী হতে পারল না।

'ন্যাকা বলার কি আছে।' শুভ্রাংশু ওর হাত ধরল, 'বরং ভালবাসা ব্যাপারটাই তো ন্যাকামি।'

'বেশ তাই—' নন্দা মুখে রাগ দেখাল, 'হাত ছাড়।'

শুভ্রাংশু হাত ছেড়ে দিল। কি সামান্য ভাবল। তারপর বলল, 'দেখ নন্দা, ভালবাসাবাসি বুঝি না, শুধু এটুকু বলতে পারি আরো কিছুদিন আগে দেখা হলে তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতাম।'

'কি আমার বীরপুরুষ।'

'তোমার বিশ্বাস হয় না।' শুভ্রাংশু তাকাল নিবিড় চোখে। 'থাক।' নন্দা হেসে উঠল, 'তোমার চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে এখনি বুঝি পালাতে চাইবে। কেলেঙ্কারী আর বাড়িও না।'

'তুমি আমাকে কেন ভালবাস বললে না নন্দা।'

'কি বলব বলো।' নন্দার গলার স্বর গাঢ়—'এ কথা যে তোমাকে আমি বলে বোঝাতে পারব না। শুধু জেনে রেখো জীবনের কোনো একটা ফাঁক তুমি ভরে দিয়েছ, তাই তোমাকে ছাড়া এখন আর নিজেকে ভাবতে পারি না।'

'আমারও কি এমন কোনো ফাঁক ছিল?'

'তা তুমিই জান।' নন্দা সহজ গলায় উত্তর দিল। 'হয়তো সংসারী সব মানুষের এমন ফাঁক থাকে—সবাই তা টের পায় না—কেউ কেউ পায়।'

'হবে হয়তো।' শুভ্রাংশু আর কিছু বলল না।

যাওয়া আর ফেরা

সে কিছু বলল না কিন্তু একাকী হয়ে ভাবল। নিজেকে একা করে নিয়ে শুভ্রাংশু চিৎ হয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল। তার মনে হল, সে যেন তার নিজের বাড়িতে কোনো এক নিমগ্নতায় ডুবে গেছে। যখন সে নন্দাকে নিয়ে ভাবে তখন মনেই হয় না এখানে তার আত্মীয়তা বাঁধা আছে। এই বোধের কি মানে হয়। ভালবাসা। শুভ্রাংশু বুকের সবটুকু জমি হাতড়ে বেড়ায় চিন্তার মধ্যে। একটু একটু করে সে অনুভব করে মাধবী বা তার সন্তানদের স্থান যেখানে যেমন ছিল ঠিক তেমনি আছে। শুধু সবকিছু জুড়ে আছে একজনের উপস্থিতিটাও বোঝা যায়।

নিজেকে স্থির করতে সুস্থ করতে চেয়েছে শুভ্রাংশু। মাথা ঝাঁকিয়ে নিজেকে বলেছে, নন্দার কথা ভাবব না। এই ভাবনা এক ধরনের অসুস্থতা কিংবা বিচ্যুতি। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে নন্দাকে সরিয়ে রাখে। বই বা খবরের কাগজ খুলে ধরে। একটু পরেই বুঝতে পারে কাগজের লেখাগুলো তার চোখে শুধু ছবির মতন ফুটে আছে, সে একবর্ণও মানে বুঝতে পারছে না যা পড়ছে। হয়তো কোথাও বেরিয়ে পড়ে সময় কাটাতে—পথ চলতে গিয়ে টের পায় সে তার উদ্দেশ্য ভুলে গেছে। কোথায় যাবে আর মনে পড়ে না।

শুভ্রাংশুর এটুকু জ্ঞান আছে সাধারণ মানুষের চেয়ে তার বোধশক্তি কিছু বেশি। সে যুক্তিবাদী তবু নন্দার ব্যাপারে তার যুক্তিরা কোথায় হারিয়ে যায়। তার এই বয়সের সমস্ত প্রতিরোধকে টলিয়ে দেয়।

নন্দাকে একথা বলেছে সে। বলেছে, 'নন্দা সত্যি আমি বুঝতে পারি না এই টান কিসের।'

উত্তরে নন্দা তার চোখ দুটোকে বিস্তৃত করে তাকায়। সেখানে যেন একটা আকাশ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। 'তাহলে বোঝ, তুমিই যেখানে কোনো মানে খুঁজে পাও না সেখানে আমি মেয়েমানুষ হয়ে কি বুঝব।'

নন্দার নিশ্চিন্ত ভঙ্গি। এই কথার ভেতর দিয়ে এই সম্পর্ক যে কত সহজ সে যেন তাই বোঝাতে চায়।

শুভ্রাংশু ওর সেই সরল স্বচ্ছন্দ ভঙ্গির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। চেয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হয় এই মেলামেশায় নন্দা যতটা খাঁটি, সে বুঝি ততটা নয়। একটা সংসারের কর্ত্রী হয়ে নন্দা কেমন সহজে তার সামনে নিজেকে মেলে ধরে!! সে কী তা পারে। হয়তো পারে না।

যাওয়া আর ফেরা।

নিজের সংশয়কে খুলে ধরে শুভ্রাংশুর বলে, 'নন্দা আমি বোধহয় তোমার মতো করে সবকিছু ভাবি না। আমার সন্দেহ—'

'তোমার সন্দেহ তোমার থাক। নন্দা হাসে, আমি জানি তোমাকে পেয়েছি এই

'যদি তোমাকে ঠকাই?'

'ঠকাবার কীআছে। এখানে হারজিতের কোনো ব্যাপার তো নেই—তুমি সরে গেলে ব্যথা পাব, দুঃখ পাব তাই না?'

'ঠিক বুঝতে পারি না, আমার সব গুলিয়ে যায়।' শুভ্রাংশু মাথার চুলে হাত বুলোয়। 'কি চাই? কি চাই আমরা—কেউ কি আমাদের বলে দিতে পারবে।'

'না।' নন্দা ছোট্ট জবাব দেয়।

'মানে!' শুভ্রাংশু জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

'মানে খুব সোজা—' নন্দা বলে, 'কি চাই তা যখন নিজেরাই জানি না, তখন অন্যে কি বলবে।'

'ঠিক আছে নন্দা, নিজেরাই জানি না।'

'জানি কিন্তু বাইরে মানতে চাই না তাই এই বিরোধ।'

'কি বললে?' শুভ্রাংশু শুধোয়।

'ভুল বললাম।' নন্দা প্রশ্ন করে করে একটু অপেক্ষা করে। আমরা পরস্পরকে চাই কিন্তু এই সামান্য সত্যি সভ্য-সমাজে স্বীকার করতে পারি না। পারি না বলেই কিছুতেই বুঝি না চাওয়ার মাপকাঠি।'

শুভ্রাংশু নন্দার কাঁধে হাত রাখে। উত্তেজনায় বলে, 'নন্দা তুমি আজ আমার চোখ খুলে দিলে, সত্যি বলেছ আমরা সত্য গোপনের হতাশায় ভুগছি।' শুভ্রাংশু নন্দার একটা হাত নিজের মুঠোয় নেয়, 'আমার কি মনে হয় জান, যে-কোন বয়সে প্রেমের ব্যাপারে মেয়েরা অনেক বেশি সিনসিয়ার।'

'তাই নাকি!' নন্দার [illegible]ত হাসি সন্ধ্যাকে ঝলমল করে।

'তাই।' শুভ্রাংশু তার হাতের চাপ বাড়ায়। দুজনের নিবেদনের মধ্যে দিয়ে আর একটি সন্ধ্যে কেটে যায়।

নন্দা একটা ব্যস্ততা নিয়ে বিকেলটার দিকে দৌড়য়। ঠিক তেমনি শুভ্রাংশু। তারপর সন্ধ্যে গাঢ় হলেই দুজনে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কেমন অবসন্ন। ধরাবাঁধা জীবনে একদিনই হঠাৎ বৃষ্টি ওদের ভিজিয়ে একাকার করে ছিল। তারপর সেই আগের নিরুত্তাপ জীবন।

মনের বাইরেটো এরকম থাকলেও, মনের ভেতর কোথাও তাপ জমে। দহনের একটা জ্বালায় ছটফট করে। আর তারই আঁচ লাগে নন্দার গায়ে। দুজনেই হয়তো এটা বোঝে কিন্তু মুখে বলে না। মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে গেলেও জোর করে চেপে রাখে।

গুমোট আবহাওয়ায় হঠাৎ এক দমকা হাওয়া সব কেমন এলোমেলো করে দেয়। তখন ঘূর্ণি ওঠে। শুভ্রাংশুর মনে বোধহয় সেদিন তেমনি একটা ধাক্কা মারে। নন্দা তখনো আসছে না। তার দেরি হচ্ছে। অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে শুভ্রাংশু। লাইব্রেরী ছেড়ে [illegible] চায়ের দোকানে বহুক্ষণ একা

বসে কাটায়। দু কাপ চা খায়। বারবার ঘড়ি দেখে।

এমন সময় নন্দা আসে।

হাঁপাতে হাঁপাতে আসে। ক্লান্ত হয়ে। এসেই টেবিলে বসে বলে, 'কিছুতেই একটা বাসে উঠতে পারছি না। ঠায় এক-ঘণ্টা বাস-স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েছিলাম এত-ক্ষণ।'

শুভ্রাংশু কথা বলে না।

তার অসহিষ্ণু ভাবটা মুখে লাগানো। নন্দা সেদিকে তাকায়, তারপর জিজ্ঞেস করে, 'কি হল?'

'কিছু না।'

'কিছু না তো কথা বলছ না কেন—আমার জন্যে এক কাপ চা বলো।' শাড়ির আঁচল দিয়ে নন্দা মুখ মোছে। 'জানি তুমি বিশ্বাস করলে না।'

'তা নয়।'

'তবে!' নন্দা গম্ভীর চোখে ওকে দেখে।

'আমি আর পারছি না নন্দা—এভাবে পারা যায় না' শুভ্রাংশু হঠাৎ মনের তাপটাকে দমকা হাওয়ার মতো টেবিলে ফেলে দেয়। তার মুখ লাল হয়ে ওঠে লজ্জায়।

নন্দা সেই হাওয়া টের পায়, ধাক্কা খায়। তার মুখও লাল হয়ে ওঠে। নন্দা ভাবে এত লোকের মধ্যে এই কথাটা যেন তার দিকেই তাকিয়ে আছে। কথাটা ঝুলছে নন্দার সামনে সাইন বোর্ডের মতো। সে মুখ নিচু করে কোনদিকে তাকাতে পারে না। নত মুখেই বুঝতে পারে শুভ্রাংশু তার দিকে তাকিয়ে আছে।

চায়ের পেয়ালা রাখবার শব্দ হয়। সামান্য মাথা তোলে।

'তোমার কি মনে হয়—' চায়ে চুমুক দিয়ে সে বলে, 'এর জন্যে কি আমি দায়ী?'

'তা জানি না।' শুভ্রাংশু ছোট উত্তর দেয়।

'তাহলে?'

এভাবে চলতে পরে না—এ এক অসহ্য অবস্থা।

'আমাকে কি করতে বলো।'

'তাও জানি না।'

নন্দা আবার চায়ে মন দেয়। তার মুখটাও তখন লাল। কান দুটো গরম হয়ে ওঠে। সে যেন চা-ঘর ছেড়ে বেরতে পারলে বাঁচে। তাড়াতাড়ি চা শেষ করে বলে, 'চল।' নন্দা উঠে দাঁড়ায়।

দুজনে বাইরে হাঁটে। ঠান্ডায় কিছু-ক্ষণ চলতে ওরা স্থির হয়। নন্দাই কথা বলে। 'তুমি বোঝ না, আমিও আর পারছি না, সমস্ত কিছু ঠেলে হিঁচড়ে করে বেরিয়ে আসি।'

'কোথায়?'

'অ তুমিই জান।'

শুভ্রাংশু তখন শান্ত হয়েছে। 'কিন্তু আমাদের যে পারতেই হবে। এই সামান্য সুখকেই ম্যাগনিফাই করে শূন্য ভরে তোলা। নন্দা এছাড়া রাস্তা নেই।

'তবে যে বড় বলছিলে?'

'তোমার দেরি দেখে [illegible] [illegible] গিয়ে-ছিলাম।'

'মাঝে মাঝে আমারও এমন হয়।'

'স্বাভাবিক।'

'ছোট্ট ওই কথাটাই কি সব।'

'সব।' শুভ্রাংশু নন্দার হাত চেপে ধরে। সেখানে তখন জমে রয়েছে ভাল-লাগা। যা এই শেষ বিকেলকে প্রসন্ন করে তুলছে। 'এছাড়া আর কি বলার আছে?'

'কিছু নেই?' নন্দাও হাতের চাপকে বাড়ায়।

'বলতে পারব না নন্দা, এ-কথারও জবাব হয় না।

'তাহলে এর শেষ কি?' নন্দা জানতে চায়। 'এমন করে মেলামেশা এই শেষ!'

'এর অনিঃশেষ।' শুভ্রাংশু বুঝি কবি হয়ে ওঠে। 'সব চাওয়ার কি শেষ আছে। যা বলে চাওয়া শেষ হয়ে যায় না।'

'বড় বড় কথা বুঝি' নন্দা জবাব দেয়।

'না বোঝাই ভাল।' শুভ্রাংশু বলে ওঠে, 'বুঝলে কষ্ট বাড়ে।'

রাত হয়। কথায় কথায় সময় গড়ায়। শুভ্রাংশু ঘড়ি দেখে। তারপর বলে, 'সেকি আটটা বেজে গেছে।'

'এর মধ্যে!' নন্দা সচকিত হয়ে ওঠে, 'আর দেরী করলে বাড়িতে ভাববে।'

'হ্যাঁ চল।' দুজনে বাস স্ট্যান্ডের দিকে এগোয়।

একটা বাস এসে পড়ে। নন্দা ওঠে। হাত নাড়ে। শুভ্রাংশু সেই দিকে তাকিয়ে থাকে। রাস্তাটা এখন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। বরং ওর মনে হয় তার কোথাও বুঝি ফাঁক নেই। তাপটা এখনো তাকে ঘিরে রয়েছে। শুভ্রাংশুও বাড়ি ফেরবার জন্যে ব্যস্ত হয়।

হন্যে হয়ে ছুটে আসা। তারপর একটা নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ি ফেরা। এটা তো জানা হয়ে গেছে ওদের। তবু জানাটাকেই নতুন করে জানে ওরা। যেন জানার ভেতর থেকে হঠাৎ নতুন একটা কিছু বেরিয়ে আসবে। ওদের এই নিয়মিত অভ্যাস অন্যের কাছেও জানা হয়ে যায়, ব্যস্ততায় ব্যাকুলতায়।

তাতে ওদের ভ্রূক্ষেপ নেই। বহুর জীবনে অনেক রহস্য ঢাকা থাকে। ওদেরটা না হয় খুলে গেল।

'সবাই কিন্তু আমাদের নিয়ে ভাবে।' নন্দা একদিন বলে।

'কি।'

'এই আমরা এটা কি করছি!'

'সবাই অর্থে তুমি কি বোঝাচ্ছ!' শুভ্রাংশু শুধোয়।

'বাড়ির সব—এই ধরো চেনাজানা সকলে।'

'ভাবতে দাও।' শুভ্রাংশু আকাশের দিকে তাকায়—'কারো মনের ওপর হাত-চাপা দেওয়া যায় না।'

'কিন্তু ওরা বোঝে কি করে?' নন্দা এবার প্রশ্ন করে। 'এটাও আশ্চর্য।'

'আমরাই বোঝাই—আমাদের যন্ত্রণা সব খুলে ধরে।'

'এটা যন্ত্রণা!'

'সমস্ত সুখই তো যন্ত্রণা থেকেই শুরু।'

'তাহলে আমাকে তুমি আরো—আরো যন্ত্রণা দাও।'

'আমি কি তোমায় বিমুখ করেছি।' শুভ্রাংশু বলে, 'তোমার কি তাই মনে হয়?'

'আমার কিছুই মনে হয় না—শুধু ভাবি সবটাই সুখ।'

'এটা যদি বলি মনের অসুখ?'

'তোমার যা খুশি তাই বল—' নন্দা শান্ত কণ্ঠে বলে, 'তোমার কথায় কিছু এসে যায় না।' নন্দা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। 'আমি যা বুঝেছি, তা জেনেশুনেই। যাই হোক না তার জন্যে তো তুমিই রইলে।' তার মুখে অন্য এক উজ্জ্বলতা তার বয়েসটাকে হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়। সে অদ্ভুত হালকা হয়ে হাঁটে। চারদিকে বাজার চিৎকারগুলো তাদের ঘিরে ধরে।

দুজনে আবার সেই বাসস্ট্যান্ডের দিকেই এগোতে থাকে।

হীরকের দিনগুলি

বিজনকুমার ঘোষ

ভাইঁদের অভিযোগ, বোনেরা মেজদির যে কোন অন্যায়কে সাপোর্ট করে অশান্তি বাড়িয়ে তুলেছে। এতে বৌরা যাচ্ছে বিগড়ে। ফলে স্বামীরাও আর নিরপেক্ষ আচরণ করতে পারছে না।

এতে যুক্তি যে নেই তা নয়। একদিন সুশান্ত উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় যাদবপুরে এসেছিল। নতুন বিয়ের পর এই অচেনা অশান্তিতে বেচারার শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে। হীরক ওকে বুঝিয়েছিল, ধর, যদি রাস্তার একটা লোকের সঙ্গে মেজদির ঝগড়া হয়, তাহলে কাকে তুমি সাপোর্ট করবে? অন্যায় হলেও তুমি নিজের বোনকেই সাপোর্ট করবে। এটাই স্বাভাবিক। এর উল্টো হলে বুঝতে হবে তুমি মহামানব। এখানেও ঠিক তাই। বৌদি হল পরের বাড়ির মেয়ে আর মেজদি হল মায়ের পেটের বোন।

সুশান্ত খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল, মেজদির স্বভাব বরাবর একই রকম। আগে বোনেদের সঙ্গে হিংসে করত এখন বৌদের সঙ্গে করছে। এটা আমি বুঝ ছেনবই।

—পারবে না। অসুস্থ শরীর অসুস্থ মন, লেখাপড়াও বেশি শেখেনি। কোনদিন বিয়ে হবে না, নিজের সংসার হ্র [illegible]

বলাতে কেউ পারবে না—এমন একটা মানুষের কাছে কি তুমি আশা কর? আগে বোনেদের সঙ্গে হিংসা করেছে, এখন বোনেরা নেই তাই বৌদের সঙ্গে লাগছে।

—তাহলে বৌরা কেন সহ্য করবে? তারাও তো পরের বাড়ির মেয়ে।

—খুবই স্বাভাবিক। সহ্য করলে তারাও মহামানবী হয়ে যেত।

—তাহলে উপায়?

—মেজদির কেসটা একটু অন্যভাবে বিচার করতে হবে। মেজদি যা বলবে তা কানে তুলবে না। একটু সহনশীলতা দেখাতে হবে।

তা অসম্ভব। পুরো পাগল হলে দেখানো যেত। কিন্তু এ হল সেয়ানা পাগল!

হীরক চুপ করে গিয়েছিল। কেউ যদি কাউকে সহ্য করতে না পারে তো কি বলার আছে! তবে বলেছিল, আমি নিজে প্রচুর পরিশ্রম করে উঠে দাঁড়িয়েছি। তাই কেউ যদি চব্বিশ ঘন্টা শুয়ে বসে কাটায় তো তাকে আমি দু চোখে দেখতে পারি না। তার ওপর মেজদি আবার সবাইকে সমালোচনা করে বেড়ায়! তোমার বোনেরা কি [illegible] [illegible]? [illegible], [illegible]

গোড়া! ওকে আমরা বড় মুখ করে সাপোর্ট করতে পারি না।

—আমিও তো সেই কথা বলছি। আমার স্ত্রী ডেলিভারীর জন্যে হাসপাতালে যাওয়ার সময় প্রণাম করল, মেজদি একটা কথাও বলল না।

—হ্যাঁ, এসব খারাপই লাগে। সাধারণ বুদ্ধিটুকুও নেই।

—আমি বিবাহিত। আমার প্রথম কর্তব্য তো স্ত্রীর প্রতি।

—একশোবার সত্যি।

—তাহলে?

—আমি কোন রাস্তা দেখতে পাচ্ছি না। তোমার কপাল খারাপ!

হীরকের নিজের কথা মনে পড়ল। বাংলাদেশে বিয়ের পরই ছেলেদের অন্য চোখে দেখা হয়। রজনী সেন রোডে দিদিও বলে বেড়াতে লাগল, হীরু আর আগের মত নেই।

অনেক জল ঘোলার পর রজনী সেন রোডেই হীরকের বিয়ে হয়। বরযাত্রীদের জন্য একটা বাস, হীরকের জন্য মোটর গাড়ি ফুল দিয়ে সাজিয়ে নৃপেনদা বিকেল চারটের আগেই সদলে চলে এল। গণ্ডগোলের [illegible] [illegible]

গুলো আনবেই। আহা, ছেলেমেয়েগুলোর কি কষ্ট, মা কতদিন নিবারণদার বাড়িতে চাল ডাল পাঠিয়ে দিয়েছে।

—বলেছি তোমার মা মহীয়সী মহিলা। আমাদের কিন্তু খুব সাবধানে চলতে হবে।

—নিশ্চয়ই। আর কিন্তু কাছে আসা যায় না।

—খুব যায়। দেখিয়ে দিচ্ছি। —খুব নরম আর স্নিগ্ধ শরীরটাকে নিয়ে হীরক খানিকক্ষণ টানাহেঁচড়া করল।

—উঃ, লাগে! একটা কথা বলব? —হেনা হীরকের চুলে আঙুলগুলো ঢুকিয়ে দিল।

—বলবেই তো। আজকের রাতে আমরা কেউ ঘুমোব না। কথা বলেই কাটিয়ে দেব। রাজী?

—রাজী। বল আমার কথা শুনে রাগ করবে না?

—না গো, একটুও রাগ করব না।

—আমার তবু বলতে ভয় করছে। যদি কিছু মনে কর।

—কিছু মনে করব না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা, তাতে অত সংকোচ কি?

হেনা তবু অনেকক্ষণ চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে, ঠোঁটে আলতো চুমু খেয়ে বলল, আমাদের আলাদা বাসা করলে হয় না? আমি তুমি আর দাদা থাকব সেই বাসায়।

হীরক অন্ধকারে চমকে উঠল।

—কথা বলছ না যে! রাগ করলে?

—না, রাগ করিনি। কেন তোমার মনে এই প্রশ্ন এল বল তো?

হেনার কথা জড়িয়ে গেল, আমি কিন্তু কিছু না ভেবেই বলেছি। হঠাৎ মনে এল তাই বললাম। বল রাগ করনি?

—আমার দিদি জামাইবাবু খুব ভাল-মানুষ। একথা আমি মুখে কি বলব। দুদিন বাস কর, তুমি নিজেই টের পাবে।

—ঠিক আছে, তাই হবে।

—তুমি যখন দিদি জামাইবাবুকে বুঝতে পারবে তখন তুমি নিজেই লজ্জা পাবে একথা বলার জন্যে।

—তুমি আমাকে যেখানে রাখবে আমি সেখানেই থাকব।

—আমরা সামাজিক মানুষ। পরস্পরের সুবিধে অসুবিধেটা একটু বুঝতে হয়। জামাইবাবু রিটায়ার করেছে, দুই মেয়ে কলেজে পড়ছে, এক ছেলে বেকার। এই অবস্থায় নিজেদের স্বার্থের জন্যে জামাইবাবুকে ফেলে সরে পড়ে যাওয়া কি ঠিক?

লজ্জায় হেনা হীরকের বুকে মুখ লুকোবার চেষ্টা করল, আমাকে ক্ষমা কর।

—জামাইবাবুর দুই মেয়েরই কলকাতার বড় বড় বাড়ি। জামাইবাবু কিন্তু রিটায়ার করে শালাদের ফ্ল্যাটেই এসেছিল।

—সেটাই তো ঠিক। মেয়ের শ্বশুর-বাড়ি যতই বড়লোক হোক, সেখানে গিয়ে থাকা অসম্মানের।

—তোমাদের বাড়িটাও তো বেশ বড়। তা আমি যদি সেখানে বাস করতে চাই?

—আমার মা একটুও ভাল বলবে না।

জানালার খড়খড়িতে ফাঁকফোকরে জানুয়ারির বাতাস আর বৃষ্টি সমানে আছড়ে পড়ছে। শীতকালে মুষলধারে বৃষ্টি কে কবে দেখেছে! পুরু লেপের মধ্যেও যেন দুজনের শরীর হিম হয়ে যাচ্ছে।

বিয়ের মাসখানেক পরেই নিখিল ভারত কর্মী সম্মেলনে হীরককে আমেদাবাদ যেতে হল। অফিসের আরও অনেকেই গেল একসঙ্গে। আমেদাবাদ স্টেশন থেকেই হীরক দিদিকে পৌঁছ সংবাদ দিল পোস্টকার্ডে। ছোট চিঠি লিখল হেনাকে।

আমেদাবাদ কাপড়ের জায়গা। ডেলিগেটরা যে-যার পছন্দসই কাপড় কেনায় ব্যস্ত। সন্তোষদা বলল, কিরে নতুন বিয়ে করলি, বৌমার জন্যে একটা শাড়ি কিনে নিয়ে যা—।

বিয়েতে মোট খরচ সাড়ে তিন হাজার টাকা। হীরককে এজন্য অনেক দিন ধরে ধার শোধ করতে হবে। মাঝারি দামের একটা শাড়ি অবশ্য কেনা যায়, কিন্তু হীরক সেটা সকলের চোখের সামনে আলাদা করে হেনাকে কিছুতেই দিতে পারবে না। সন্তোষদা তখন বুদ্ধি বাতলে দিল, তুই শাড়িটা কিনে আমাকে দিয়ে দে। তারপর তোদের একদিন বাড়িতে নেমন্তন্ন করি। তুই দিদিকে গিয়ে বলবি, সন্তোষদা হেনাকে প্রেজেন্ট করেছে।

কথাটা হীরকের মনঃপুত হল না। ব্যাপারটা তো একই দাঁড়াচ্ছে। তার চেয়ে আটচল্লিশ টাকার বারোখানা ব্লাউজ-পিস কিনল। সকলের সঙ্গে হেনারও একখানা হল। দৃশ্যটা হীরকের চোখে ভারি সুন্দর ঠেকেছিল।

রজনী সেন রোডে দিদির বাড়ির সামনেই থাকেন ডাক্তার দেবনাথ। রাত তিনটের সময় হঠাৎ তাঁর বাড়িতে একদিন টেলিফোন বেজে উঠল। খবর পেয়েই ছুটে গেল হীরক। ওপাশ থেকে নৃপেনদার কাঁপা কাঁপা গলা, হীরু, দিনের আলো ফুটলেই হেনাকে নিয়ে ট্যাক্সি করে চলে আসবে।

—কেন, কি হয়েছে?—হীরকের পা কাঁপছে।

—হেনার মা মারা গেছে।

—কি বলছেন আপনি!

ঠিক সেই সময় কানেকশন কেটে গেল।

হেনার পাঁচ মাস চলছে। ওকে শুধু বলল, হঠাৎ শরীরটা খারাপ হয়েছে, ভয়ের কোন কারণ নেই। ফাঁকা ভি আই পি রোড দিয়ে ট্যাক্সিখানা উড়ছে। সকালের প্রথম রোদ এসে পড়েছে জানালার কাঁচে। এক জায়গায় কি একটা গাছের ডাল ভি আই পি রোডের খুব কাছে এসে পড়েছে। সেখানে ঘন পাতার আড়ালে আপন মনে বসে আছে ভোরের দোয়েল পাখি। হীরকের চোখটা বারবার ঝাপসা হয়ে আসছে।

কসবাতেই লিলি হল। ওকে পাঁচ মাসের বানিয়ে হীরক হেনাকে নিয়ে হাজির হল দিদির বাড়িতে। তখন সবে সূর্য অস্ত গেছে। জামাইবাবু একটা ঘরে খকখক করে কাশছে। পাঁচ টাকার সন্দেশ নিয়ে হীরক সেখানে দাঁড়াতেই হঠাৎ সবার মুখ-চোখের চেহারা পাল্টে গেল। অবাক কাণ্ড, একটা কথাও কেউ বলল না। সবাই ভীষণ গম্ভীর। টিউব লাইটের উজ্জ্বল আলো দেখে লিলি হাত-পা ছুঁড়ে খেলতে লেগে গেছে। কেউ ফিরেও দেখছে না ওর খেলা। শুধু জামাইবাবু বলল, মেয়েটা তো বেশ, কান্নাকাটি নেই। দিদি সিরিয়াস হয়ে ঠাকুরের আসন দিতে লেগে গেল। সুস্মিত, রাস্মিত যে বইটা সামনে পেল সেটাই তাড়াতাড়ি মেলে ধরল। যেন রাত পোহালে এম-এ পরীক্ষা ওদের। ব্যাপার দেখে হীরক হতভম্ব। যেন অফিস-টাইমের শিয়ালদা স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কারও দিকে তাকিয়ে দেখার সময় নেই। ভীষণ রকম দমে গেল হীরক। সুস্মিত শুধু বলল, আজ তো আসার কথা ছিল না। হীরক জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, তাতে কি খুবই অপরাধ হয়ে গেছে? কিন্তু কোন রকমে সামলে গেল।

জামাইবাবু বলল, শুনেছিস শিবুর চাকরি হয়েছে?

খুবই আনন্দের খবর। শিবুর একটা যেমন-তেমন চাকরির জন্যে মামারা কত ছোটাছুটি করেছে। ডাক্তার, হাসপাতালের জন্য হীরককে এ-সপ্তাহের চারটে দিনই কসবায় থাকতে হয়েছিল। তাই খবরটা সময়মত পায়নি। কিন্তু কোথায় যেন একটা তাল কেটে গেছে। খুবই চেষ্টা করে মুখে একটা হাসির আভাস এনে হীরক বলল, তাই নাকি?

রাত্রিবেলায় হীরক যখন হেনার পাশে শুয়ে ছটফট করছিল, সেই সময় দেওয়াল ঘড়িটা মধুর সুরে থেমে থেমে দু'বার আওয়াজ দিল। ঘুম আসছে না। কেন এমনটা হল? সুস্মিত, রাস্মিত ছোটমামা বলতে অজ্ঞান হত। আজ এ কি রকম ব্যবহার! দিদি একবারও মেয়েটার দিকে তাকিয়ে দেখল না পর্যন্ত। একটা ছ' মাসের শিশুও অপরাধ করে বসল নাকি?

দিদির মেজ জামাই সুনীল শ্রীরামপুরে এক বড় জুট মিলে চাকরি করে। মানুষটা সরল-সিধে। আগে আগে হীরককে বলত, সেজমামা, তুমি বিয়ের পরও দিদির বাড়ি ছেড়ে যাবে না। অফিস থেকে লোন নিয়ে দোতলাটা তুলে ফেল না? দিদি-ভাইতে বেশ জমিয়ে থাকবে!

মশারি থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে হীরক ঢাকা-দেওয়া জলের গেলাসটা খালি করল। আস্তে আস্তে সবকিছু যেন পরিষ্কার হয়ে আসছে। সুনীল ছেলেটা ঠিক অতটা সরল-সিধে নয়। এখন কিছুতেই বলবে না, সেজমামা তুমি এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যেও না। দিদি-জামাইবাবুও এখন নিশ্চয়ই গার্জেন হতে রাজি নয়। কি দরকার আর ঝামেলা বাড়িয়ে? শিবুর যে চাকরি হয়েছে!

মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ, যারা এইসব বড় বড় কথা বলে, তারা কখনো কি হীরকের অবস্থায় পড়েছে? ঘুমের মধ্যে হেনা এই সময় হাউমাউ করে কি কেঁদে

হলে উঠল। আহা বেচারা! মেয়েরা কি আগে থেকেই খারাপ গন্ধ পায়? বলেছিল, তুমি আমাকে গাছতলায় নিয়ে রাখলেও আমি সেখানে থাকব।

পরদিন থেকে দিদি কথাবার্তা একদম বন্ধ করে দিল। বাড়তি লোক থাকার অসুবিধে হচ্ছে, সুপ্তি, রাপ্তি প্রতি মুহূর্তে সেটা বুঝিয়ে দিতে চাইল। শিবু চাকরি পেয়ে চলে গেছে পাটনায়। দাদার খুব ভোরে ওঠা অভ্যেস। অফিস সাত্রাগাছিতে। বাজার করে খেয়েদেয়ে সাড়ে আটটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ে। ফেরে রাত দশটায়। হীরক রেশন আনে। হেনা রান্নাঘরে দিদিকে সাহায্য করে। দুই ভাই সংসারের যাবতীয় খরচ চালায়। জামাইবাবুর খাম-পোস্টকার্ড, মেয়েদের টেলিফোন করবে তার পয়সা—দাদা অফিস যাবার আগে সব রেখে যায়। জামাইবাবু চিরকালের হাঁপানি রুগী। ওষুধ খরচাই তাঁর মাসে পঞ্চাশ-ষাট টাকা। তবু ওরা এক সময় অসহ্য হয়ে উঠল। ওই যে, শিবু চাকরি পেয়ে গেছে। প্রয়োজনও তাই ফুরিয়েছে।

টালার ফ্ল্যাটের কথা মনে পড়ে গেল। দুখানা ঘর, ব্যালকনি, খাবার ঘর, বাথরুম-পায়খানা, রান্নাঘর। ভাড়া মাত্র আটানব্বই। বাইশ মিনিটের মধ্যে অফিসের চেয়ারে এসে বসা যায়। কলকাতা শহরে এমন সস্তায় আর একটি বাসা পাওয়া যাবে কি? কতজনে তখন সেধে উপদেশ দিতে এসেছিল, হীরক কারও কথা শোনেনি। বিয়ের পরও দিদির সঙ্গে থাকা যায়, এইরকম একটা জেদ এসে গিয়েছিল ভেতরে। সত্যি, পৃথিবীটা কি নোংরা!

হীরক বিয়েতে একটা রেডিও পেয়েছিল। জামাইবাবু রোজ সেটা খুলে খবর শুনত। একদিন রাপ্তি হঠাৎ রেডিওটা বন্ধ করে হীরকের সামনেই ওর বাবাকে ধমকাল, পরের রেডিও শুনবে না—। হীরক স্তম্ভিত। এরপর অনিবার্যভাবে এসে পড়ে কথা কাটাকাটি। দিদি সুপ্তি-রাপ্তিকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল হীরকের ওপর। জামাইবাবুর বিচিত্র পলিসি, নীরব থেকে বৌ-মেয়েদের মদত দিয়ে গেল সারাক্ষণ। তীব্র অপমানে হীরকের ফরসা মুখ হয়ে গেল নীল। কুড়ি-বাইশ বছর আগে হীরক সুপ্তি-রাপ্তিকে হতে দেখেছে।

একটু পরে ট্যাক্সিতে ওরা তিনজন। মাত্র পনের দিন আগে কসবা থেকে রজনী সেন রোডে এসেছিল। আজ ফিরে যাচ্ছে। চোখের জল পাছে হেনা দেখে ফেলে হীরক তাই সারাক্ষণ ঘুরে বসে রইল। মনে মনে বলল, এত অপমানের কোন দরকার ছিল কি? যে-কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে চলে যেতে বললেই পারত। সুপ্তিরা এখন মেজোমামা ডাকে না, স্রেফ, ওদের! কোথায় যেন হীরক পড়েছিল, ভাইফোঁটার মত এত সুন্দর প্রথা বাংলাদেশের বাইরে আর কোথাও নেই। যাঁরা যিনি এটি প্রথম চালু করেন, তাঁর মনে নিশ্চয়ই সেদিন খুব আশা ছিল।

এই পনের দিনে বা তার আগেও হেনার ওপর যথেষ্ট চাপ গেছে। যে নিজের মাকে সহ্য করতে পারেনি, সে করবে ভাই-বৌকে? হেনা সব সহ্য করে গেছে। ট্যাক্সির মধ্যে এই প্রথম মুখ খুলল, হ্যাঁগো, শিবু বাড়ি থাকলে এমন হত না।

তীব্র বাতাসে চোখের জল শুকিয়ে গেছে। হীরক বলল, শিবুকে সবাই ভয় পায়। কারণ, সবাই তো অপরাধী।

—আচ্ছা, শিবু দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গে কথা বলে না কেন? দিদিকে মা বলে কখনো ডাকে না।

—খুব ছেলেবেলায় মা ডাকত।

—কেন বড় হয়ে ডাকে না?

—কি জানি!—হীরক একটু চিন্তা করল: দিদি মা-র সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে। সেইজন্যে হয়ত ছেলের মুখে মা ডাক শুনতে পাচ্ছে না।

হেনা একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, তুমি যে বল ভগবান নেই, এই তো ভগবান। ছেলের কাছে মা ডাক শুনতে না পাওয়াই তো চরম শাস্তি!

গাড়ি কসবার বাড়ির সামনে এসে থামল। ভাগ্যিস হেনার মা মারা গেছে। নাহলে ভাল মানুষটা শুধু শুধু কষ্ট পেত। তেলের দাম তখনো বাড়েনি। মিটারে উঠল পুরোপুরি দশ টাকা। শিখ ড্রাইভারকে হীরক একটা টাকা বকশিস দিল।

যে দিনগুলি হীরক একদা রজনী সেন রোডে ফেলে এসেছিল, সেই দিনগুলিই এখন অন্যরূপে ফিরে এসেছে কসবার বাড়িতে। তার চেহারাও কম ভয়ংকর নয়।

কসবার বাড়ির পাশে করুণাময়ী ইস্কুলের টীচার রিনা। বিয়ের পরও চাকরি ছাড়েনি। রোজ টিফিনের সময় একবার বাপের বাড়িতে পা দেয়। শুধু তাই নয়, মেজদির ওপর আচরণটা ঠিকমত না হলেই প্রতিবাদ করে। সেইজন্য ছোট বোনের ওপরেই ভাইদের প্রচণ্ড রাগ।

কমল সর্বদা মনে রাখে যে, সে গাভার বিখ্যাত সোমদস্তিদার পরিবারের সন্তান। আর তাঁরই সামনে রিনাকে বলে কিনা বাড়িতে ঢুকলে ঘাড় ধরে বের করে দেব! রাগে রিনা কাঁপছিল। আমার বাবার বাড়ি। আজকাল মেয়েদেরও বাবার সম্পত্তিতে অধিকার আছে। ঘাড় ধরে বের করে দেওয়া অত সোজা নয়। সম্পত্তির চুলচেরা ভাগ হবে। কেন ছাড়ব?

বেলাদির বক্তব্য, আমরা সম্পত্তির ভাগ চাই না। আমরা চাই বাবা যে টাকা রেখে গেছে, সেই টাকা থেকেই বোনের সামান্য খরচ, একটু শখটখ মেটানো হোক। তা না হলে আমরা চুপ করে বসে থাকব না।

হেনা বলছে, তোদের এতটুকু সহ্যশক্তি নেই কেন? দমদমে দিদি আমার সঙ্গে সব সময় খিটিমিটি করত। আমি একটা কথা কারও কাছে বলেছি? মেজদি একটা সুস্থ মানুষ যে তার সব কথা ধরতে হবে?

বেলাদির বক্তব্য, বোনেরা যে এত ভালবাসে, ভাইরা তার কোন মর্যাদা দিল না। বৌরা পরের মেয়ে, ওরা যদি আমাদের ভালবাসতে না পারে তো দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু তোরা তো আমাদের চিনিস। তোদের কি এতটুকু ব্যক্তিত্ব নেই?

রিনা বলল, আমরা নাকি প্রশান্তর

বিয়ের সময় উপহার পাওয়া কাপড় চুরি করেছি।

শিউলি গাছের তলায় তিন জামাই পাটি পেতে চা খাচ্ছিল। চুরির কথায় হীরক বিষম খেল।

—কি যা-তা বলছ।

উত্তেজনায় রিনার সর্ব শরীর কাঁপছিল, আমরাও বিয়েতে অনেক শাড়ি পেয়েছি। মা সবাইকে বিলিয়ে দিয়েছে। আর আমরা ভালবাসার অধিকারেই শাড়ি নিয়েছি। মূর্খ, একে চুরি করা বলে না। তুই না বিলেত-ফেরৎ, বড় চাকরি করিস, প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়েছিস। তোর এত ছোট মন?

—কারও যদি ছোট মন হয় তো সে দায়িত্ব তোমার নয়।

—কিন্তু আমাদেরই তো ভাই। আমরা মেয়ে, বিলেত-আমেরিকা যাইনি, তোর মত স্কলারশিপও পাইনি। তবু আমরা যেটা সহজভাবে বুঝতে পারি, তোরা পারিস না? হেনাদিকে তো দস্তুরমত চোরই বলল।

—কি রকম?

—হেনাদি চুরি করা শাড়িটা পুজোয় মেজদিকে দিয়েছে।

—এ হতেই পারে না।

—আমি মিথ্যে বলছি না। প্রশান্তর কথা হল চুরি করে হেনাদি সেটা অপরকে দান করেছে।

রাস্তাঘাটে চলাফেরায় বা কেনাকাটায় হেনা তেমন চালু নয়। তাই একান্ত মেয়েলি কাজগুলো হীরককেই করতে হয়। পুজোর সময় ওদের বোনাস মেলে। অফিসের পর সেই দিনই হীরক চলে যায় বৌবাজারের বনেদী দোকান ভারত বস্ত্রালয়ে। আটখানা শাড়ি, দুটো প্যান্টের কাপড়, বাচ্চাদের জামাকাপড় ও আরও অনেক কিছু টুকিটাকি কিনতে হয়। তারপর প্রত্যেকটি কাপড়ে টুকরো কাগজে নাম লিখে তিন-চার দিনের মধ্যেই যথাস্থানে পাঠিয়ে দেয়। এ-কাজগুলি হীরক নিজের হাতেই করে।

ওর কপালটাই মন্দ। চিরকাল এই চুরির অপবাদ শুনে যেতে হল। বৃন্দাবন পাল লেনে থাকতে প্রায়ই চুরি হত। হীরক ছাড়াও দাদুর বাড়িতে তখন বাস করত দাদুর ভাইপো ও শালা। তারা দুজনেই চাকরি করে, মাস গেলে দাদুর হাতে খাইখরচা হিসেবে ত্রিশ টাকা করে দিত। দাদুর শিশিরদা ছিল খুবই হিসেবী। টাকা চুরি গেলেই বাড়ি তোলপাড় করত। কিন্তু ভাইপো পিন্টুদা ঢিলেঢালা মানুষ। চুরি হলেই দিদিমা অম্লান বদনে বলত, কে জানি ঘরে তো সব সময় হীরকই থাকে। ও ছাড়া আর কে নেবে! হীরক নিজের চোখে দিদিমাকে চুরি করতে দেখেছে। ফি মাসে দাদা হাত-খরচার জন্যে হীরককে পাঁচ টাকা দিয়ে যেত। মাঝে মাঝে সেটাও উধাও হত। তখন দোষ পড়ত বাড়ির চাকর মহেন্দ্রের ওপর। দিদির মত দিদিমারও ছিল ঠাকুর দেবতার ওপর অসাধারণ ভক্তি। সকাল-সন্ধ্যে ঠাকুরের আসন দেওয়া, উপবাস, মিথ্যে কথা, চুরি—সব একসঙ্গেই চলত।

হীরক হঠাৎ চমকে উঠল। পৃথিবীতে লোকসংখ্যা কি খুবই বেড়ে গেছে? নাহলে ভাইবোনের মধ্যে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বিবাদ হয়?

দিনটিকে পুরো নিষ্ফলা করে দিয়ে বৈঠক শেষ হল। সমস্যা যেখানে ছিল, সেখানেই রইল। কেউ কোন আলো দেখাতে পারল না। দিদির বাড়িতে দুঃসহ দিনগুলির অবসান ঘটিয়েছে হীরক তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সি ডেকে। কিন্তু এখানে সমস্যার শিকড় অনেক গভীরে।

খালের পার নিস্তব্ধ। সুমন্ত ধানক্ষেতের পাশে সাতটা পাইশের বাসেইপুরে ভোকাল একরাশ মানুষ নিয়ে থেমে গেল। হয়ত সিগন্যাল পায়নি। নৃপেনদা মোটর-সাইকেলে উঠে বিপুল শব্দে খালের পার কাঁপিয়ে দিল। পেছনে বেলাদি কোমর জড়িয়ে।

রিনার শরীরটা খুবই ভারি। হাঁটতেও অসুবিধা হয়। হীরক ঠাট্টা করল, তুমি গ্যাডাল ঘোষদস্তিদার ফ্যামিলির বৌ। দাঁড়াও, তোমার জন্যে রিক্সা ডাকি—।

॥ ২২ ॥

আজ অফিসের চেয়ারে এসে বসতেই পাশের টেবিলের সুকুমার দুঃসংবাদ দিল।

—কিরে, তোর শরীর ভাল আছে তো?

—কেন?

—তুই পরশুদিন কি লিখে দিয়েছিলি?

—খেয়াল নেই তো।—হীরকের বুকটা ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল।

—হবে রাণীগঞ্জে কারফিউ, তুই লিখেছিস আসানসোলে কারফিউ।

—তাই নাকি?

—অফিসের কাজে এত অন্যমনস্ক হলে চলে? এই নিয়ে কথা হয়েছে। টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে আসানসোলের রিপোর্টার।

এরকম কিছু একটা যে হবে হীরক আগেই টের পেয়েছিল। সব সময় এত দুশ্চিন্তা নিয়ে কাজ করলে ভুলভ্রান্তি হবেই। বস আসবে তিনটায়। তার আগেই অবশ্য হীরক কেটে পড়তে পারে। কিন্তু কাল-পরশুই তো মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। হীরক মনে মনে একটা কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করে শেষে হাল ছেড়ে দিল। বসের সামনে মাথা চুলকোতেই হবে।

সুকুমার খানকয়েক হাল্কা খবরের কপি লিখতে দিল। বলল, জানি তোর মন ভাল নেই। অনেক তো চেষ্টা করলি। হল না যখন মেনে [illegible]।

হীরক নিজেকে শাসিয়ে বলল, এবার শেষ চেষ্টা করতে হবে। মিহিরদা অনেক দূরে থেকে দেখতে [illegible] এল।

—[illegible] খবর [illegible]? মনের অশান্তি [illegible]

অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে হীরক মাথা কাত করল।

সমীর গুপ্ত, চিত্ত মজুমদারের সঙ্গেও দেখা হল। চিত্তকে হীরক আলাদাভাবে বলল, দিন কয়েকের মধ্যেই তোমার সঙ্গে দেখা করব। বিশেষ কথা আছে।

মনের অশান্তি কেটে গেছে শুনে সমীর গুপ্ত খুব জোরে হ্যান্ডসেক করে বলল, এই তো লক্ষ্মীছেলের মত কথা। 'এবার হাসপাতাল থেকেই লাইগেসান করিয়ে নিন, ব্যস।

চারতলার অফিস থেকে আর একটা দুঃসংবাদ এল। গত মাসে পাঁচদিন কামাই-এর ফলে মাইনে কাটা যাবে। হীরকের ছুটিও পাওনা নেই, তাছাড়া, কোন দরখাস্তও দেয়নি। অফিসের কি দোষ?

বিকেলের লোক এখনো আসেনি। মাইনে নেবার পর সুকুমার ছুটি দিয়ে দিল। সন্তোষদা আর আসবে না। রিটায়ার করে গেছে। হীরকের কাছে এটাই আসল দুঃসংবাদ। এত বড় অফিস থেকে [illegible] জনের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে।

এপ্রিলের কড়া রোদে চোখ মেলা যাচ্ছে না। ফাঁকা ট্রাম। হীরক খিদিরপুরের জানালার এক ধারে বসল। সরু [illegible] মাড়িয়ে দুপুর বেলার ট্রাম আপন মনে ছুটছে। এক জায়গায় মেমসাহেব হাফপ্যান্ট পরে গলফ্ খেলছে। উদাস ট্রামে আধশোওয়া অবস্থায় হীরক ভেবে দেখল, হেনার ওপর ওর কোন সিমপ্যাথি নেই। প্রশান্ত চোর বলেছে, এটা ভাইবোনের ব্যাপার। হীরকের রাগ করার কোন কারণ নেই।

খিদিরপুরে আসতেই [illegible] ভীড় হয়ে উপচে পড়ল। হীরকের সামনে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে। বোধহয় সাত মাস চলছে। না, এক্ষেত্রেও হীরকের কিছু করার নেই। ধুমকেতু পর্যন্ত নিজের সীটটি ছেড়ে দিয়ে আদিখ্যেতা দেখিয়েছে। অজন্তা সিনেমার কাছে নেমে পড়ল। ডায়মণ্ডহারবার রোড চওড়া হচ্ছে। একদিকে সি এম ডি এ-র নোটিশ। অন্য দিকে হাউসিং এস্টেটের ফ্ল্যাট বাড়ি। পশ্চিমের আকাশে রুমালের সাইজে একটুকরো মেঘ জমাট বেঁধে আছে। হীরক চারতলার সাত নম্বর ফ্ল্যাটের কড়া নাড়তেই ভিতর থেকে লাভা-স্রোতের মত অনেকগুলি তপ্ত কথা বেরিয়ে এল। যেমন ঃ ওঃ, ডুমুরের ফুল! মস্ত বড় সংসারী হয়ে গেছ। আর যেন কেউ সংসার করে না। আমি বলে বলে হয়রান হয়ে গেছি। টেলিফোন করলে সাড়া পাই না। ভেবেছটা কি? নিজের দর বাড়াচ্ছে। ইত্যাদি। বক্তার নাম ছায়া সেন। দাদার বন্ধুর স্ত্রী। বৌদি ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে কাজ করে। এই মাত্র অফিস থেকে এসেছে। হীরক বলল, বড়বাবুর কাছে ধাতানি খেয়েছেন বুঝি? সেইজন্যে আমার ওপর ঝাল ঝাড়ছেন।

সাতপাখিয়া থেকে মা কলকাতায় এসে তিনটি বছর মাত্র বেঁচে ছিল। হীরকরা

তখন ছিল সাদার্ন এ্যাভেনিউতে। দাদার নামে গভর্নমেণ্ট কোয়ার্টার। অফিসের পর অনিলদা দাদার সঙ্গে প্রায়ই বাড়িতে আসত। সেই সময় অনিলদার মনটা একটু উড়ু উড়ু হয়। কিন্তু বাড়িতে ঘোর অমত। শেষে মা-ই এই কোয়ার্টারে অনিলদার সঙ্গে ছায়া বৌদির বিয়ে দেয়।

হাত-মুখ ধুয়ে বৌদি সামনে এসে বসেছে। বাচ্চা চাকর কেষ্ট পরোটা, আলুভাজা আর চা দিয়ে গেল। বৌদি বলল, তোমাকে এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন? কি হয়েছে?

—কিছু হয়নি।

—হেনা কেমন আছে?

—ভাল।

—ছেলেমেয়েরা?

—খুব ভাল।

—আরও হবেটবে নাকি?

বৌদির কথাবার্তা এইরকমই। হীরকও হেসেই জবাব দিয়ে থাকে। কিন্তু এই মুহূর্তে মুখে কোন কথা জোগাল না। চারতলা, মানে আকাশেরই কাছাকাছি। কেমন দিন ছটার পরেও আলো-বাতাস মাখামাখি হয়ে থাকে। শেষ প্রচণ্ডটা হীরক জানিস করার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের সূর্যটা যেন নিভিয়ে দিল। সেই যমজের মত মেঘটা এখন আকাশ জুড়ে। কাছেপিঠে কোথাও গর্জন করে উঠল। হীরক বলল, বৌদি আজ বৃষ্টি হবে।

—তবে তো ভালই। যা গরম।

—বৃষ্টি হলে কিন্তু আমি বাড়ি যেতে পারব না। আমার আবার সর্দির ধাত।

বলতে বলতে সাদা মুড়ির মত বড় বড় ফোটায় ব্যালকনিতে বৃষ্টি নামল। তারপর বৃষ্টির বর্শায় সারা আকাশ ঝাঁঝরা হতে লাগল।

—বৌদি কি মজা, আমি আর বাড়ি যাচ্ছিনে।

—বারে, হেনা চিন্তা করবে না?

—করুক গে চিন্তা। আমি আজ থাকবই। আমাকে না হয় কেষ্টর সঙ্গে শুতে দেবেন।

—না, তা হয় না হীরক। তুমি হেনাকে বলে এসে দিব্যি এক মাসও থেকে যেতে পার। কিন্তু এটা আমি কিছুতেই অ্যালাউ করব না।

হীরক অতিশয় নিশ্চিন্ত। বৃষ্টির বহর দেখে বোঝা যায় ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে থামবে না। তারপর রাস্তায় কোমর সমান জল দাঁড়িয়ে যাবে। ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি সেই জলে হাবুডুবু খাবে। আর বৌদি তখন চেয়ে থাকলে কিছুতেই বলতে পারবে না, বেরিয়ে যাও—।

ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক সেই রকমই হল। অনিলদা ভিজতে ভিজতে অফিস থেকে এল। তার একটু বাদে এল বৌদির ছেলে সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থ ভোরবেলায় ছোলা-গুড় খায় আর বিকেলে পাড়ার ক্লাবে এক্সারসাইজ করে। সুযোগ পেলেই বড় আয়নার সামনে আয়রনম্যানের স্টাইলে মাসল ফোলানো ওর অভ্যেস। এর ফলে বুকের হাড়গুলি আগের চেয়ে স্পষ্ট ভাবে গোনা যাচ্ছে। ক্লাশ টেনে পড়ে সিদ্ধার্থ।

বৌদি চিন্তিত হয়ে বলল, এই বৃষ্টিতে তোমাকে কি করে যেতে বলি।

খুব খুশি হয়ে হীরক বলল, আরে আমি ঠাট্টা করেছিলাম। হেনা খুব চিন্তা করবে না গেলে।

—কিন্তু যাবে কি করে?—অনিলদার গলা খাঁকারি দিয়ে কথা শুরু করা অভ্যেস। হেনা ঠিক বুঝে নেবে তুমি কোথাও আছ।

বৌদি বলল, তোমার বাসাটা মাঠের দিকে। সেইজন্যে ভয় করে।

হীরক তাড়াতাড়ি বলে উঠল, দাদাবাবু এখন বাড়িতেই শোয়। বাবানদা একটা কথা পেতে দিও, বড় লক্ষ্মী ছেলে। বাড়িতে একটা টিকটিকি ঢুকতে পারে না।

অনিলদা যে কোন কথার ভিতরে ফ্ল্যাটের প্রসঙ্গ আনবেই।

—বুঝলে হীরক, আমরা তিন জন লোক তিনখানা রুম। সুতরাং জায়গার অভাব হবে না। তা ফ্ল্যাটখানা কেমন দেখছ?

—চমৎকার।—মনে মনে বলল, তিন জন লোক, দুজনেরই চাকরী। আপনিও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ। থুড়ি, নিউজিল্যাণ্ড!

—ওঃ, এই ফ্ল্যাট জোগাড় করা কি সোজা কথা। তুমিই বল, গভর্নমেণ্ট ফ্ল্যাটের মত সুবিধা আর কোথাও আছে?

—মোটেই না।

—তোমাদের টাওয়ার ফ্ল্যাটও তো আমিই জোগাড় করে দিয়েছিলাম। তোমরা রাখতে পারলে না। দিদির কথায় নেচে উঠলে।

বৌদি তাড়া দিল, খাবার রেডি। টেবিলে এসো।

(চলবে)

সোনার হরিণ নেই

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

।। সাত ।।

হাতির নাম বনমায়া। বানারজুলি জঙ্গলের পোষা হাতি। কাঠ টানে। আর ...প চলে না এমন জায়গায় যেতে হলে জঙ্গলের বাবুরা ওর পিঠে চাপে। পিঠে ...খন হাওদা লাগানো হয়। বনমায়াকে বাপী ...য় জন্ম থেকে দেখে আসছে। ওর পিঠে ...পেওছে কতো। বনমায়া নামটাও কেন যেন ...ব মিষ্টি লাগে। চা-বাগানের সাহেব ...জোর একটা ... মেয়ে কাজ করত তার ওই নাম ছিল। বছর তিনেক আগে ওই মেয়েটাকে নিয়ে কি একটা হুজ্জত হয়েছিল খুব। এখানকার অনেক লোক সাহেবদের ওপর খুব ক্ষেপে গেছল। আর তারপর থেকে সেই মেয়েটা একেবারে হাওয়া। বাপী তখন আরো কত ছোট। ভালো করে কিছু বুঝতেই পারে নি।

কিন্তু বাপীর মাথা এখন আর অত কাঁচা নয়। বনমায়া নাম থেকে নিজেই বুঝে নিয়েছে এটা মেয়ে হাতি। আবু হেসে হেসে বলে বনমায়ার রূপ খুব। ওকে দেখলে চা-বাগানের আর জঙ্গলের কন্ট্রাকটরদের মর্দা হাতি দুটো নাকি ছোঁক ছোঁক করে কাছে আসতে চায়। কিন্তু বনমায়ার রূপ যেমন দেমাক তেমন। কাউকে পাত্তাও দেয় না। রূপের কথা বনমায়ার মাহুত ভীম বাহাদুরও বলে। ভীম বাহাদুরের সঙ্গেও বাপীর মন্দ খাতির নয়। মাস গেলে মাইনেটা তো বাপীর বাবার হাত থেকেই নিতে হয়। তা বনমায়ার রূপ নিয়ে

ভীম বাহাদুরেরও খুব গর্ব। এদিককার সব নেপালী আর অবাঙালী মেয়ে-পুরুষই মোটামুটি পরিষ্কার বাংলা বলে। ভীম বাহাদুরের জন্ম-কর্ম সব এখানেই। ওর কথা শুনলে কেউ বুঝবে না বাঙালী নয়। বনমায়ার মাথা চাপড়ে ভীম বাহাদুরকে বাপী নিজের কানে বলতে শুনেছে, তোর মরদ খুঁজে বার করতে হলে আমাকে আফ্রিকার জঙ্গল চুঁড়ে আসতে হবে।

আবুও শুনেছিল। সে হেসে সারা। কিন্তু বাপীর মাথায় কিছুই ঢোকে নি। পরে আবু খোলসা করে বলতে কিছু কিছু বুঝেছে।.... বনমায়ার বয়েস নাকি মাত্র কুড়ি। আশী-নব্বুই একশ দেড়শ বছর পর্যন্তও বাঁচে হাতিরা। তা এই বয়সেই বনমায়ার সর্ব অঙ্গে রূপ চুয়ে পড়ছে। আর স্বাস্থ্যখানাও তেমনি হয়েছে। প্রায় দশ ফুট উঁচু, পাঁচ ফুটের মতো শুঁড়। ওর যুগ্যি বর সে-রকম ডাঁদরেল মরদ হাতি এখানে কোথায় জুটবে? বরের খোঁজে তাই আফ্রিকায় যাবার কথা বলছিল ভীম বাহাদুর। এখানকার কোনো পোষা মরদ হাতির হাতে ও নাকি কখনো ওকে ছেড়ে দেবে না।

হাতির বর শুনে বাপীর হাসি পেয়ে গেছল। হাতির রূপ কাকে বলে অতশত বোঝে না। একটা হাতির সঙ্গে আর একটা হাতির তফাতও ভালো করে আঁচ করতে পারে না। তবে অনেক দেখার ফলে ছাড়া অবস্থায় একলা চড়ে বেড়ালেও বনমায়াকে ঠিক চিনতে পারে। আর বনমায়া তো ওকে চেনেই। দেখলেই শুঁড় উঁচিয়ে সেলাম ঠোকে। কেরানিবাবুর ছেলেকে সেলাম করাটা ভীম বাহাদুর শিখিয়েছে।

রূপ না চিনলেও বনমায়ার মতো সভ্যভব্য ঠাণ্ডা জীব বাপী আর দেখে নি। হাজার দৌরাত্ম্যেও ওর মেজাজ গরম হয় না। শুঁড় ধরে ঝুলে পড়লে ও ও মজা পায় আর দোলা দেয়। কলা বেল আখ শুঁড়ের কাছে ধরে বার বার সরিয়ে নিলে পিটপিট করে তাকায়, তারপর ঝাঁ করে ঠিক এক সময় কেড়ে নেয়। বাপী তখন রাগ দেখিয়ে চড় চাপড় ঘুসি বসিয়ে দেয়। কিন্তু বনমায়া তখন সাত চড়ে রা নেই এমন ঠাণ্ডা।

দেড় মাস আগে, আবুর কথায় যাকে বলে এই বনমায়ার নামেও কলঙ্কের ছিটে পড়ে গেছল একেবারে। সেই বিষম ঘটনার আগের রাতে জঙ্গলের এ-ধারের আর আশপাশের অনেকেই একটা বুনো হাতির ডাক শুনেছিল। সে নাকি সাংঘাতিক ডাক। দল ছাড়া ক্ষ্যাপা বুনো হাতি ভয়ংকর জীব। কাছে ঘেঁসবে কে?

দূরের জঙ্গলে বা পাহাড়ী এলাকায় দল বাঁধা বুনো হাতির উপদ্রব নতুন কিছু নয়। ছোট পাহাড়ী নদীগুলোর মাঝে খোল। সেই খোলে ওরা জল খেতে আসে। এক সঙ্গে অনেকগুলো পাহাড়ের দিক থেকে নেমে এসে এক-এক সময় জঙ্গল তছনছ করে, চাষের খেত মুড়িয়ে দেয়। ওদিকের লোকেরা তখন দল বেঁধে মশাল জেলে ঢাক ঢোল ক্যানেস্তারা বাজিয়ে হাতি তাড়ায়। ফরেস্টের ফরেস্ট গার্ডকেও তখন বন্দুক নিয়ে ছুটতে হয়। কিন্তু হাতির দঙ্গল এদিকের জঙ্গলে বা লোকালয়ে আসে না। আবু বলে, বুনো হলেও ওরা নুন্দিধ ধরে। চা-বাগান আর সাহেবদের সব বাংলোগুলোতেই বন্দুক আছে। এদিকে এলে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে সে ওরা বেশ জানে। ক্ষ্যাপা হাতির কথা আলাদা। ক্ষেপে গেলে কারই বা কাণ্ডজ্ঞান থাকে। সেদিন ওটার হাঁক ডাক শুনে জঙ্গলের কুঁড়েতে যারা থাকে তাদের রক্ত জল। ওটা হানা দিয়েছিল চা-বাগানের দিকে। ওটাকে ভয় পাওয়ানোর জন্য বাগানের সাহেবরা তখন এক-ধার থেকে জঙ্গলের দিকে রাইফেল ছুঁড়েছে। হৈ-হৈ কাণ্ড যাকে বলে। দূরে হলেও থমথমে বেশি রাতের সেই গুলির শব্দ আর হাতির ডাক বাপীরও শোনার কথা। কিন্তু বাপী বিছানায় গা দিল কি ঘুমে কাদা।

পর দিন সকালে সকলের চক্ষু ছানা-বড়া। বনমায়ার পায়ের শেকল ছেঁড়া। বনমায়া হাওয়া। ভীম বাহাদুরের মাথা খারাপ হওয়ার দাখিল। পাগলের মতো বনমায়ার খোঁজে তামাম জঙ্গল চষে বেড়াল। সব দোষ এসে চাপল ওরই ঘাড়ে। বুনো হাতির ডাক শুনে ও কেন আগে থাকতে বন্দুক-অলা ফরেস্ট গার্ড এনে বনমায়াকে পাহারা দিল না। ভীম বাহাদুর যত বলে, বুনো হাতি এসে বনমায়ার শেকল ছেঁড়ে নি—তাহলে বনমায়াও চেঁচিয়ে একাকার করত, আসলে বনমায়াই নিজে শেকল ছিঁড়ে পালিয়ে গেছে—আগের বড় সাহেব ততো রেগে যায়। চাকরি তো গেলই, তার ওপর ওর বিচার হবে। একটা হাতি খোয়ানো কম ব্যাপার নয়।

আবু চোখ টিপে হেসে হেসে ব'লছিল, ভীমবাহাদুরের কথাই ঠিক। ওটা ছিল বুনো মস্তির প্রেমের ডাক। বনমায়া সাড়া না দিয়ে পারে নি।

তার আগেই ওর কাছ থেকে বাপীর বুনো জীব-জন্তুর প্রেমের পাঠ নেওয়া শুরু হয়ে গেছল। কিন্তু তখন পর্যন্ত মস্তি কথাটা শোনে নি। মস্তি কি?

আবু বলেছে, মরদ হাতির মাথায় প্রেম জাগলে বিষম ব্যাপার। তখন সঙ্গিনী না পেলে ক্ষেপে যায়। সেই সময় ওদের মাথার আপনা থেকেই এক রকমের রস গড়ায়। ওই দশার সময় ওদের মস্তি বলে। কিন্তু দলছুট মস্তি সঙ্গিনী পাবে কোথায়? তখন আরো ক্ষ্যাপা দশা। পোষা হাতিনী দেখলে শিকল ছিঁড়ে দাঁতের ঘা মেরে মেরে ওটাকে টেনে নিয়ে যাবেই। না গেলে মেরে ফেলবে। আবুর মতে বনমায়ার দুর্জয় সাহস। নিজে থেকে নিঃশব্দে শেকল ছিঁড়ে ওই বুনো মস্তির সঙ্গে পালিয়েছে! পোষমানা মেয়ে হাতিরা তো বুনো মস্তিকে সাংঘাতিক ভয় করে।

সব জানা আর শোনার পর বাপীর বনমায়ার জন্য খুব চিন্তা হয়েছিল। বুনো মস্তি শেষ পর্যন্ত ওটাকে মেরেই ফেলে কিনা কে জানে। আর ভীম বাহাদুরের জন্য বেজায় দুঃখ হয়েছিল। পাগলের মতো ও এখনো বনমায়াকে খুঁজেই চলেছে।

তিন সপ্তাহ বাদে আবার এক দারুণ ব্যাপার। আর সেই ব্যাপারের নায়ক কিনা বাপী নিজেই। বনের পশু পাখির কিছু ভালবাসাবাসি দেখার তাড়নায় ছুটির সেই নির্জন দুপুরে একলাই জঙ্গলে ঢুকেছিল। হঠাৎ দেখে দশ গজের মধ্যেই একটা হাতি!

টা করত না। কিছু টাকা খসালেই গেট গার্ডের মুখ বোজাই। কিন্তু খোদ সাহেবের ছেলের সঙ্গে এসে দেবকীনন্দন অমান্য করে কি করে।

সকলের সঙ্গে এইদিন বাপীও নিতাইয়ের সাহেবের বাংলোয় ঢুকতে পেরেছে। মোরগ নিয়ে দীপুদা যেন দিগ্বিজয় করে ফিরেছে। তিন-তিনটে বন-মোরগ মেমসাহেবও খুশি। তার মধ্যে একটা মেরেছে মিষ্টি সে-খবরও তার মা-কে দিল। বাপী আশা করেছিল, সাহেব একটা মোরগ অন্তত ওকে আর দিয়ে দেবে। কিন্তু সে গুড়ে

বাপীর তা বলে আফসোস নেই একটুও। নিষেধ মুচল ভেবে আনন্দে আটখানা। এক ফাঁকে জানিয়ে দিল, দুপুরে আবার সে আসছে। বরং আগেই বেরিয়ে এসেছিল।

ঘাড় বেঁকিয়ে তাকালো এর গম্ভীর মুখ। কিন্তু ভিতরে যায়। একটা চোখ ছোট করে মজা লুটছে বুঝি —মেয়েটাকে যেমন বোলে সাপটে নিয়ে দেখলাম—

এতো আনন্দ কিনা জানে না। অচেনা অদ্ভুত স্বাদ এ আনন্দের। ভেতর পর্যন্ত নরম-নরম একটা এখনো ছড়িয়ে আছে। আবুর কথা এক ও ছাড়া আর ধুলো দিতে পেরেছিল এই বোকা মেয়েটার চোখেও।

এখানে নিজে থেকেই মন্তব্য চরিত্র আমার থেকে বলতে হবে—

আবুকে কোনো কথাই বাপীর কাছে ফেলার নয়। ঠাট্টা হলেও না। মুখ বোঝার চেষ্টা। —কেন ?

—একটা দুধের মেয়েকে নিয়ে দিব্বি উঠিস। তোর মতো বয়সে আমার ষোল- বছরের মেয়েগুলোকে ভালো

বাপী বিমূঢ় একটু। আবু এখন বছর সতের পেরিয়েছে। বাপীর বয়েসে বারো বছর বয়সে ষোল-আঠারোর ভালো লাগত। অবাক হয়ে করল তাহলে এখন ?

—এখন কি ?

—এখন কোন্ বয়সের মেয়েদের লাগে ?

ফোঁস করে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলল। —আর বলিস না আমার বারোটা গেছে। বয়েস-টয়েসের ধার ধারি না এখন শুধু একটা মেয়েকেই লাগে— জীম বাহাদুর টের পেলে আমার মুখ করে দেবে—

শুনে বাপী হাঁ একেবারে। —কেন ? কোন্ মেয়েকে ভালো লাগে তোমার ?

—বনমায়াকে। মানুষের মেয়ে-টেয়ে অত ভালো লাগে না। অমন ডাকাবুকো প্রেম ওই বজ্জাতের মতো আর কোনো মেয়ে জানে না। জ্বর-জ্বরের মাথা খেয়ে একরাশ দিনের মধ্যে একটা বুনো মস্তিকে কব্জা করে ঘরের মেয়ে আবার ঘরে ফিরে এলো— চাট্টিখানি কথা।

বাপী এরপর হেসে বাঁচে না। পরে ফিরেও আবুর হাতি-মেয়ের প্রেমে পড়ার কথা যতবার মনে এসেছে, কেবল হেসেছে।

কিন্তু আবুর ঠেসের কথায় বাপী একটুও হতাশ হয়নি। মিষ্টিটা ছোটই বটে। কিন্তু যে মিষ্টিকে ওর খুব ভালো বাসতে ইচ্ছে করে সে যেন ঠিক অত ছোট নয়। বাপী নিজেও তো সকলের চোখে কত ছোট কিন্তু ভিতরে ভিতরে ও কি আর তেমন ছোট ? মিষ্টিরও দেখতে দেখতে আর একটু বুদ্ধিশুদ্ধি হবে। আর আবু তো নিজেই বলেছে বড় হলে ওই মেয়ে খাসা দেখতে হবে।

পিসীর চোখে ধুলো দিয়ে সময় হিসেব করে বাপী দুপুরে আবার মিষ্টিদের বাংলোর সামনে হাজির। কিন্তু সামনের বারান্দা ফাঁকা। এই হিসেবে গর্দিনস দেখেই

বাপীর মেজাজ গরম। দুটো বেজে গেছে, চারটের মধ্যেই তো ওর মা মহারানী ভিক্টেরির ঘুম সাঙ্গ করে ছেলে দুলে ওই বারান্দায় এসে দাঁড়াবেন। গেটটা ধরে বাপী শুধু কাঠের বারান্দার দিকে চোখ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কিন্তু ঘরের জানলা দিয়ে মিষ্টি ওকে ঠিকই দেখেছে। বাবা নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। ও-দিকে মায়েরও পাকা ঘুমের ঘন নিঃশ্বাস। মিষ্টির ওপরেও মায়ের আর একটু ঘুমোনোর হুকুম ছিল। বাবা যে ছুটির দিনে আড্ডা দিতে বেরোয় সেটা কিছু নয়। ঘুম-টুম ধারে কাছে নেই মিষ্টির। উপুড় হয়ে শুয়ে মাঝে মাঝেই মুখ তুলে জানলা দিয়ে গেটের দিকে দেখছিল।

পা টিপে বিছানা থেকে নেমে এলো। তারপর বারান্দায় এসেই ফিক করে হাসি। এই লুকোচুরির দেখাশুনার মধ্যে যেন মজা আছে।

মজার ছোঁয়া বাপীর মনেও। হাত তুলে মিষ্টিকে কাছে আসতে ইশারা করল। মিষ্টি দ্বিধায় পড়ল একটু। ওর ইচ্ছে বাপী আসুক। কিন্তু গেল সপ্তাহে ওকে এখানে এনে বসানোর ফলটা ভালো হয় নি

মনে আছে। দেড় দু' ঘন্টা এখন আনন্দে কাটানোর ইচ্ছে ওরও।

গেটের কাছে আসতে এ-ধার থেকে বাপী জিজ্ঞাসা করল, কি কচ্ছিলি ?

—মায়ের কাছে শুয়ে ছিলাম, আর তুমি আস কিনা জানলা দিয়ে দেখছিলাম—

—মা কি কচ্ছে ?

—মা-বাবা দুজনেই ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে—ভারী খাওয়া হয়েছে তো।

—খুব মুরগির মাংস সাঁটলি বুঝি ?

মিষ্টির মুখে এখনো রান্না গড়ানোর দাখিল। —কি সুন্দর খেতে, মা নিজে রান্না করল। দাদা তো নিজে পেট ঠেসে খেয়ে টিফিন বাক্সয় করে তার বন্ধুর জন্যেও নিয়ে গেল—

বাপী এবারে বেশ করে ঠেস দিতে ছাড়ল না। বলে উঠল, আমরা মেরে এনে দিলায় আর নিজেরাই স্বার্থপরের মতো খেলি—আমাদের কথা একবার মনেও পড়ল না ?

মিষ্টি বিপাকে পড়ল। বাপী বলার পরে মনে হল ওদেরও দেওয়া উচিত ছিল। বলল, মা না দিলে আমি কি করব....এখনো আছে বোধহয়, মা ঘুম থেকে উঠলে তোমাকে দিতে বলব ?

—আমার খেতে বয়ে গেছে, আমি কি ভিখিরী ? শব্দ না করে শেকল সরিয়ে আস্তে আস্তে গেটটা খুলল।—নে, বেরিয়ে আয় চট করে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে খেলা করিগে চল্।

কিন্তু মিষ্টির অত সাহস নেই।—মা জানতে পারলে রক্ষে রাখবে না।

—তুই আচ্ছা ভীতু! মা জানছে কি করে, তার ঘুম ভাঙার ঢের আগেই তুই চলে আসবি। তোকে নিয়ে কি আমি দূরে যাব নাকি, কাছেই খেলা করব—জঙ্গলের মতো মজা আর কোথাও আছে নাকি, নিজেই তো দেখলি!

মিষ্টি তবু ভয় পাচ্ছে দেখে এবারে রেগেই গেল।—মায়ের পাশে শুয়ে তুইও তাহলে ঢেপসির মতো ঘুমোগে যা—মুরগির মাংস খুব ভালো হজম হবে'খন—স্বার্থপর মেয়ে কোথাকারের, আর কক্ষনো যদি আসি।

গেট ছেড়ে বাপী রাস্তাটার ওপারে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। ভাবখানা এক্ষুনি ও একলাই জঙ্গলে নেমে যাবে।

বাপীকে অন্তত না দিয়ে নিজেদের মুরগির মাংস খাওয়াটা যে স্বার্থপরের মতো হয়েছে মিষ্টি এখন আর সেটা অস্বীকার করে কি করে। তাছাড়া সকালে ওই ছেলের সঙ্গে জঙ্গলে ঘোরার মজাটাও কম হয়নি। চলে গেলে সত্যি খারাপ লাগবে, রাগ করে সত্যি যদি আর না আসে তাহলে আরো খারাপ লাগবে।

একটা হাত তুলে বাপীকে দাঁড়াতে বলল। তারপর হালকা পায়ে ছুটে বাংলোয় উঠে গেল। বাবা মা কেমন ঘুমোচ্ছে উঁকি দিয়ে দেখে নিল। কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে আবার ছুটে চলে এলো। সন্তর্পণে গেটের শিকলটা তুলে দিয়ে সেও রাস্তার এ-ধারে। উত্তেজনায় বুকের ভিতরটা টিপটিপ করছে একটু।

মিষ্টির একটা হাত বাপীর দখলে। তরতর করে রাস্তার ঢাল বেয়ে নেমে চোখের পলকে দুজনে জঙ্গলের আড়ালে। মিষ্টির পা ছমছম করছে। এখন তো আর বড় কেউ সঙ্গে নেই। ভিতরে পা দিয়েই মনে হল জঙ্গলটা কি ভীষণ নিরিবিলি এখন।

বাপীর বুঝতে দেরি হল না। হাতি পিঠে বসেই ভালুক আর বুনো শুয়োর দেখে ওই মেয়ে ওকে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরছিল। ওর যেন সুবিধেই হল।

—ভয় করছে বুঝি ?

মিষ্টির স্বীকার করতে আপত্তি, আবার একেবারে অস্বীকারও করতে পারে না।

—দূর বোকা মেয়ে, আমি তো সঙ্গে আছি। হাত ছেড়ে বাপী এবারে ওর কাঁধ ধরে নিজের গায়ের সঙ্গে আগলে নিয়ে পা বাড়ালো।

কিন্তু ভয়-ডর কিছু ক্ষণের মধ্যেই মিষ্টিরও উবে গেল। দুটো রঙ-চঙা প্রজাপতির পিছনে ছোটাছুটি শুরু করে দিল। পাথর হাতে করে গাছের ডোরা-কাটা কাঠবিড়ালিও তাড়া করল দুজনে। একটা খরগোস ও-দিক ফিরে গাছের কচি পাতা খাচ্ছিল, একেবারে একটুর জন্যে বাপীর ঢিলে থেঁতো হবার হাত থেকে বেঁচে গেল।

এ এক ভিন্ন রোমাঞ্চ। ছোটাছুটির ফলে মিষ্টি অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে আর বাপীর চোখে তাও মিষ্টি মিষ্টি লাগছে। ফোলা ফোলা গাল দুটোতে এখন বেশ আলগা রং লেগেছে। চুলের গোছা মাঝে মাঝেই মুখে এসে পড়ছে। বাপী লক্ষ্য রাখছে, ফাঁকে পেলে ওর আগেই নিজে হাত বাড়িয়ে সেগুলো পিছনে সরিয়ে দিচ্ছে।

এরপর একটা গাছের বুক-সমান নীচু মোটাসোটা ডাল বেছে নিয়ে বাপী দুহাতে ভর দিয়ে সেটার ওপর লাফিয়ে উঠে বসল। তারপর ঝোলানো পা দুটোকে শক্ত করে একটু ঝুঁকে মিষ্টির হাত দুটো ধরে হুকুম করল, নে, পায়ের ওপর পা দিয়ে উঠে চলে আয়।

মিষ্টির এখন সবেতে আনন্দ। গাছের ডালে কখনো চড়েনি বা বসেনি। বাপীর [illegible]।

খিল হাসি। ওঠা হল, এখন হাত বাপীর পাশে গাছের ডালে বসে কি... ?

কি করে বসবে বাপী সেটা ভালোই জানে। একটা হাত ছেড়ে কোমরের কাছটা জড়িয়ে ধরে নিজের কোলের ওপর টেনে এলো ওকে। মুখে মুখ ঠেকল, মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি। তারপর দু'হাতে একরকম সাপটে ধরেই পাশে ডালের ওপর বসিয়ে দিল।

মিষ্টি আনন্দে আত্মহারা। আর আনন্দের সঙ্গে বাপীর হাড় মাংসের মধ্যে আরো যেন অচেনা কিছুর ঝিলিক। গাছে বসার পরেও এক হাতে নিজের গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে আছে ওকে।

কিন্তু মিষ্টির এখন সাহস খুব।—আঃ, সাপটে ধরে আছ কেন, ছাড়ো না!

জবাবে একটু ধমকের সুরে বাপী বলল, ... পড়ে গেলে তখন? তোর কি অভ্যেস আছে? পড়ে গিয়ে ওই ননির শরীর একটু ... গেলে তোর মা আস্ত রাখবে আমাকে? ... একটা বাঁদর-টাঁদর এসে বসলেই তো ... ভিরমি খেয়ে পড়ে যাবি।

মিষ্টি সভয়ে গাছের ওপরটা দেখে নিল একবার।—বাঁদর এসে বসবে নাকি?

বাপী যথাসম্ভব গম্ভীর।—আমি থাকলে ভয় নেই, এখানকার বাঁদরেরা আমাকে ওদের হেডমাস্টার ভাবে।... বাড়ির চেয়ে এখানে তোর ভালো লাগছে কিনা বল—

সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টির অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস। —খু-উ-ব ভালো লাগছে। সকালেও ভালো লেগেছিল। বাড়িতে কিচ্ছু মজা নেই।

সোৎসাহে বাপী বলল, তাও তো এখন পর্যন্ত কিছুই দেখিসনি তুই। জঙ্গলের জীব-জন্তুরা যে কি-কাণ্ড করে না!

ওদের ভাল-বাসাবাসির ব্যাপারটা বলতে গিয়েও বলল না। হাঁদা মেয়ে বাড়ি গিয়ে যদি আবার কাউকে বলে দেয় তাহলে ...রে। জোরে শ্বাস টানল বার কয়েক। মিষ্টির চুলের গন্ধ আর গায়ের গন্ধ এখন যেন ওরও শরীরের মধ্যে এসে গেছে। সকালে ... ঠাট্টা করে বলছিল, হাওদার ওপর ও ... কি মিষ্টিকে কোলে সাপটে নিয়ে বসে-ছিল। না অতটা পারেনি। ওকে গাছে টেনে তোলার সময় বরং ঢের বেশি চালাকি করা গেছে। সেই চালাকির ঝোঁকটাই মাথায় চেপে বসছে আবার।

—তোর চুলে আর গায়ে সুন্দর গন্ধ...কি করে হল রে? কি মাখিস?

মিষ্টি বলল, চুলে মা গন্ধ তেল মেখে দেয়, চানের সময় গায়ে সাবান ছাড়া আর তো কিছু মাখি না—

বাপী ওর গলার নীচে নাক ঠেকিয়ে জোরে দু'বার শ্বাস নিল। তারপর মন্তব্য করল, তোর গায়েও সুন্দর গন্ধ।

নিজের বুকে চিবুক ঠেকিয়ে মিষ্টি বুঝতে চেষ্টা করল কি-রকম সুন্দর গন্ধ! তারপর বলল, আমি তো পাচ্ছি না।

বাপী বলল, নিজেরটা নিজে পাওয়া যায় না বোধহয়, আমার পাস কিনা দেখ্ তো

মিষ্টি ওর বুকে নাক ঠেকিয়ে জোরে শ্বাস টেনেই মুখটা বিকৃত করে ফেলল।—এঃ, কি বিচ্ছিরি ঘামের গন্ধ!

রাগ না করে বাপী হাসতে লাগল, বলল, আমি তো ছেলে, বুঝলি না—ছেলে-দের গায়ে কি মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ মানায়!

আনন্দে যত বিভোর হোক, আজ সময়-জ্ঞান ভোলেনি বাপী। ধরা পড়লে আজকের আনন্দ তো মাটি মারা যাবেই, পরেও আর কোনো আশাই থাকবে না। লাফিয়ে ডাল থেকে মাটিতে নেমে পড়ল। তারপর দু'হাত বাড়িয়ে মিষ্টিকে ডাকল, আয়।

ওর মতো লাফিয়ে নামতে পারে কিনা মিষ্টি একবার দেখে নিল। ... কিন্তু খুব ভরসা পাচ্ছে না। সেটা বোঝায় সঙ্গে সঙ্গে বাপীর গলায় শাসনের সুর।—হাতে পায়ে লেগে গেলে জঙ্গলে ঘোরার মজা একদিনেই শেষ—চলে আয়।

দু'দিকের পাঁজর ধরে বাপী নিজের বুকের ওপর টেনে নামালো ওকে। তারপর তক্ষুনি মাটিতে না নামিয়ে সেই ভাবেই দশ বারো পা এগিয়ে গেল। বুকে ... মুখে মুখ ঠেকে আছে। এবারে মিষ্টি ...—মাটিতে নামাচ্ছ না কেন?

—দাঁড়া, পিঁপড়ে ... দেখে ... ও-দিকটায় দাঁড়িয়ে গেল। মুখে হাসি।—আমার গায়ে ... তোর ... জানিস, তোকে আমি এমনি করে ওই রাস্তা পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি—যাব?

—না—না। মিষ্টি এবারে হিঁচড়ে নেমে এলো।—আমি কি ছোট, কেউ দেখে ফেললে?

মাটিতে নেমে গেলেও বাপী ওর হাতের ওপর দখল নিতে ছাড়ল না। রাস্তার কাছাকাছি এসে হাতও ছাড়ল।—শোন্, বাড়িতে কাউকে কিচ্ছু বলবি না কিন্তু, খবরদার!

ঠোঁট উল্টে মিষ্টি জবাব দিল, কি বুদ্ধি তোমার, বললে তো মা আমাকেই আগে ঠেসে বকুনি লাগাবে।

ছুটে রাস্তায় উঠে গেল। বাপীও এগিয়ে এসে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে। সন্তর্পণে গেট খুলে আবার শেকল লাগিয়ে দিয়ে চোরের মতোই হালকা পায়ে বাংলোয় উঠে গেল। ঘরের মধ্যে একবার উঁকি দিয়ে এক-মুখ হেসে আবার সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ালো। গাছের আড়াল থেকে বাপীও গলা বাড়িয়েছে। হাত নেড়ে মিষ্টি বুঝিয়ে দিল, বাবা-মা এখনো ঘুমোচ্ছে।

বাপী হাওয়ায় ভেসে বাড়ি ফিরল। ... শুনলে কি বলবে ভাবছে আর হাসছে। সেই সঙ্গে একটা অবুঝ আনন্দ যেন ভিতর থেকে উপচে পড়তে চাইছে। এটা কি একমের আনন্দ বা এ-রকম কেন হয় বাপীর কাছে এখনো সেটা খুব স্পষ্ট নয়।

...তবে আবার একটা কথা ঠিক, মিষ্টিটা এখনো বড্ড ছোট। আজ এত কাণ্ড হয়ে গেল, ও কিছু বুঝতেই পারল না। তাই ওর এই আনন্দের এক ফোঁটাও ভাগ পেল না।

...বাপীর মত সে-রকম মন্তর-টন্তর কিছু জানা থাকত, মিষ্টিটাকে তাহলে রাতারাতি আর একটু বড় করে ফেলত।

(চলবে)

লালবাই-এর দেশে

রেখা বড়ুয়া

এ্যাঁকি তুই ?

—হ্যাঁ, সুটকেসটা রইল, দেখি তোমার টিকিটটা—ব্যস্তভাবে হাত বাড়াল ঝুমুর।

—কি হবে টিকিট দিয়ে ? ব্যাপারটা কি ?

—আঃ ফুলমাসি দাও তো—

কথার জবাব না দিয়ে আমার হাত থেকে টিকিটখানা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে বাস থেকে নেমে গেল ও। জানলা দিয়ে দেখলাম গুমটির ভেতর ঢুকে গেল সোজা। একটু বাদেই ফিরে এল একমুখ হাসি নিয়ে। বলল, উঠে এসো ফুলমাসি এদিকে, দুটো টিকিট এক জায়গায় করিয়ে আনলাম।

আমার বিস্ময়টা কেটে গেছিল কারণ ঝুমুরকে আমি চিনি। ও আমার মাসতুতো দিদির তিন নম্বরের মেয়ে। বর্ণনা দিতে গেলে বলতে হয়, পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, ফরসা রং, মুখের কাটটি ভালো, চোখ পটলচেরা না হলেও ভাসা ভাসা। ডানদিকে একটি গজদন্ত আছে, যার জন্যে সুষমাদির ধারণা চেহারায় একটা খুঁত হয়ে গেছে, কিন্তু আমার মনে হয় ঠিক উল্টো। ঝুমুরের চুলগুলো থোকা থোকা, কোমর ছাড়িয়ে নীচে নামেনি। ওর ঝুমুর নামের আদিতে রয়েছে ওই চুলের গোছা।

এ মেয়েকে নিয়ে সুষমাদির জ্বালার অন্ত নেই। পড়াশোনা একেবারে করতে চায় না, করেও না, তবে কি করে যেন বছর পুরলে পাশটা ঠিকঠাক করে ফেলে। ওর দাদারা বলে টুকে। তবে আমি জানি ঝুমুর টোকে না কারণ অত কৌশল, লুকোচুরি ওর চরিত্রে নেই। যাইহোক এমনি করে টেনেটুনে বি-এ পার্ট ওয়ানটা পাশ করে এখন আবার কলেজে পড়ছে। তবে একটা কথা স্বীকার না করে উপায় নেই, যে, মেয়েটার বুদ্ধিটা ক্ষুরধার। একবার যা কানে যায় তা সহজে ভোলে না। এ তো সব ভালোমন্দয় মিশিয়ে হল, কিন্তু সুষমাদির জ্বালার মূল কারণ হল মেয়ের গান। স্কুলে থাকা কাল থেকে এই এক পাগলামী ঢুকেছে মাথায়। ঝুমুর নাকি প্রতিজ্ঞা করেছে যে ও নামকরা গায়িকা হবেই, যেমন করে হোক। এ নিয়ে ওর মেজদার সঙ্গে বাজি পর্যন্ত ধরা হয়ে গেছে।'

আমার বিষ্ণুপুর যাওয়ার প্ল্যানটা ওকে বলেছিলাম। কলেজ ফেরৎ মাঝে মাঝে আসে এদিকে। সেদিন তখন কিছু বুঝিনি। এখন দেখছি ও দিন সময়টায় সব নিখুঁত মনে রেখে তৈরী হয়ে বেরিয়ে এসেছে।'

বাস ছাড়ার পর ও নিঃশ্বাস ফেলে জমিয়ে বসল। তারপর বলল, ফুলমাসি, আমাকে নিয়ে ভেবো না, ঘর তো তোমাকে নিতেই হবে একখানা। ... ? তার ব্যবস্থাও আছে। বাবা ... —ব্যাগ খুলে দু আঙুলে ধরে তুলল একখানা একশ টাকার নোট, এবার আমি পুজোয় শাড়ি নিইনি। হবে না এতে ?

একটা ধমক দিলাম, বললাম—পাকামি করিস না—ধমক খেয়ে একমুখ হাসল ও, বলল, বাঁচালে ফুলমাসি, আমি ভেবেছিলাম তুমি ভীষণ চটে যাবে।

—হঠাৎ এভাবে বিষ্ণুপুর যাওয়ার ইচ্ছেটা হল কেন বলবি ?

—ক্রমশঃ প্রকাশ্য, ঝুমুর বলল, তার আগে আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও তো এই বিষ্ণুপুরের ব্যাপারটা। গানটানের কথা কিছু কিছু জানি, কিন্তু—তুমি নিশ্চয় এর মধ্যে ইতিহাসটাও পড়ে ফেলেছ ?

—ইতিহাসে হঠাৎ যে বড় ঝোঁক দেখছি, আমি গম্ভীর ভাবটা বজায় রাখার চেষ্টা করলাম। বললাম, বাড়ীতে বলে এসেছিস ?

ঝুমুর বলল, বাবা জানে। এবার বলো।

মেয়েটা যা ধরেছে, সহজে ছাড়বে না। বললাম, কি শুনতে চাস বল।

—ওই বিষ্ণুপুরের কথা—মানে লালবাই-এর গল্প।

আকাশে পেঁজা তুলোর মত সাদা সাদা মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যি ঠাকুরের হাসিভরা মুখখানা দেখা যাচ্ছিল। সকালের এই সোনালী রোদে ঝুমুরকে দেখতে ভারি ভালো লাগছিল।

স্টেট ট্রান্সপোর্টের বাসখানা এতক্ষণ যাত্রী বোঝাই হয়ে সেন্ট্রাল এ্যাভেনিউ-এর ক্ষতবিক্ষত বুকের ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে নানা ভঙ্গিমায় নৃত্য করতে করতে চলেছিল, এবার বি টি রোডে এসে পড়ল।

ঝুমুরকে বললাম, বিষ্ণুপুরে গানের বড় ঘরানা আছে জানিস, আর কি জানিস ?

—কেন লালবাঁধ ? টেরাকোটা ?

হেসে ফেললাম, রাজাদের কথা জানিস কিছু ?

—না বাপু, ঝুমুর বলল।

আমি বললাম, বিষ্ণুপুরের কাহিনী শুনতে গেলে কিন্তু অনেক পুরোনো কথা শুনতে হবে, একবারে লালবাঈকে আনা যাবে না, তার জন্যে আগের পরের সব কথাই জানতে হবে। শোন তবে।

সে আজ বেশ কয়েক শ' বছর আগেকার কথা, সঠিক সাল তারিখ কারও জানা নেই, তবে এটুকু বলা যায় যে তখন দিল্লীর সিংহাসন হিন্দু রাজাদের দখলে। বখতিয়ার খিলজী বাংলাদেশে আসার শ' পাঁচেক বছর আগে থেকে এক স্বাধীন হিন্দু রাজবংশ মল্লভূমি, মানে বিষ্ণুপুর রাজ্যে রাজত্ব করছিলেন। এই বংশের নাম ছিল মল্লবংশ।

—মল্ল ?' ঝুমুর চোখ বড় বড় করে বলল, মল্লযোদ্ধা টোদ্ধা ছিলেন না তো রাজারা ?

বললাম, ইতিহাস এব্যাপারে খুব বেশী তথ্যের হদিশ দিতে পারেনি। প্র... দিকের রাজাদের সম্বন্ধে আবছা যেটু... জানা যায় তাতে মনে হয় এই বংশের প্র... রাজা ছিলেন আদিমল্ল রঘুনাথ। ইনি না... লাউগ্রামের এক বনের মধ্যে জন্মেছিলেন।

কিংবদন্তী আছে যে উত্তর ভারতে জয়নগরের রাজা নাকি আত্মীয়স্বজন লোক লস্কর নিয়ে শ্রীক্ষেত্রে যাচ্ছিলেন তী... করতে। পথে শিশুটি জন্মালে তাঁরা ... বিব্রত হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত তা... বনের মধ্যে রেখে চলে গেলেন। পরে ... বাগদি মেয়ে এসে বাচ্চাটিকে ঘরে নি... গিয়ে মানুষ করে। সেই ছেলে পরে ম... যুদ্ধ শেখে আর রাজা হয়ে রাজ্যের ন... রাখে মল্লভূম। তবে ঐতিহাসিক মত ... মাল জাতি, যাদের বাগদী বলে মনে ক... হয়, সেই জাতের ঘরে মানুষ বলে রাজ... বংশের নাম হয়েছিল মল্লবংশ, রাজ্যের না... মল্লভূম। এই মল্লভূম রাজ্য বেশ বড় ছি... বলে মনে হয় কারণ, মোটামুটি উত্ত... সাঁওতাল পরগণা, দক্ষিণে মেদিনীপুর... কিছুটা অংশ, পূর্বে বর্ধমানের অংশ ... পশ্চিমে পঞ্চকোটের সীমানা বরাবর ... এই রাজ্যের আয়ত্তে। বলতে গেলে রা... বেশ বড়ই, আর সেই দেশ রক্ষা করত—কারা জানিস ?

—কারা ?

—বাগদি, ডোম, এই সব জাতে মানুষ আর আদিবাসীরা। বেশ জবরদস্ত সৈনাবাহিনী ছিল আর বেশ সমারোহ ক... যুদ্ধে যেত তারা।

আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সা... —ছোটোবেলায় শুনেছিস তো, ও ছড়া নাকি বিষ্ণুপুরের ডোম সেনাদের নিয়ে তৈরী হয়েছিল।

তারপর আদিমল্লর ছেলে জয়মল্ল নাকি লাউগ্রাম থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে আসেন আর এই বংশের রাজা জগৎ মল্ল পরে তার নাম দেন বিষ্ণুপুর। শোনা যায় তিনি রাজধানীকে বেশ সুন্দর আর সুরক্ষিত করে তৈরী করেছিলেন। বাড়ীঘর সব সুন্দর পাথর দিয়ে তৈরী ছিল, দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের বেশ সুপ্রসার ঘটেছিল—

এটা কোন সময়ের কথা? ঝুমুর জিজ্ঞেস করল।

বললাম, ১০৩৩ খ্রীস্টাব্দের পর বলে মনে হয়, অর্থাৎ নশো বছরেরও বেশী আগে। একটা লক্ষ্য করার বিষয় হল যে, আজকাল দেশ বিদেশ থেকে পর্যটকরা যে সব মন্দির-টন্দির দেখতে আসেন সেগুলি তৈরী শুরু হয়েছিল এই সময়ে। ষাঁড়েশ্বর, শৈলেশ্বর বা গোকুলচাঁদের মন্দির এই সব সময়েই তৈরী হয়েছিল বলে পণ্ডিতদের ধারণা।

এর পরে রাজ্যের আরও নানাদিকে উন্নতি হল। ১৩৭১ খৃষ্টাব্দে রাজা ... সিংহ মল্লের সময় থেকে এ রাজ্যে গ...

কোথায় গেল তা কেউ খেয়াল করল

...ভগ্ন খাঁর চিঠি নিয়ে দূত অবিলম্বে ...হয়ে গেল মানসিংহের দরবারে। চিঠির ...হল, কুমার জগৎ সিংহ রইলেন ...র হেফাজতে। ইতিমধ্যে রাজা মান- ...হ বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যান তিন- ...মধ্যে, নইলে কুমারের মূল্যবান ...হ মাথাটা অচিরে পৌঁছে যাবে তাঁর ...দূত খবর নিয়ে ফিরে আসার এক ...মধ্যে কাজ সমাধা করার আয়োজন ...হয়ে রইল পাঠান শিবিরে। চিঠির ...স্পষ্ট এবং সরল। বুঝতে কোনও ...হওয়ার কথা নয়।

...দিকে একই সঙ্গে শুরু হল নতুন ...। মোগল সৈন্য নেতাবিহীন অব- ...মনোবল হারিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল, ...মোগল ছাউনীর আগুনের শিখা ...হুয়ে জ্বলতে লাগল প্রহরের পর

...কে জানাই ছিল। জানা ছিল যে ...সং পরামর্শে কান দেবেন না। ...দিকে যার অঞ্চলে পাঠানদের ঠেকিয়ে ...না পারলে বিষ্ণুপুরের সমূহ বিপদ। ...জগৎ সিংহকে বাঁচাতেই হবে, তাতে ...সেরই মঙ্গল।

...স্থির কাজেই কাজে এগিয়েছিলেন। ...জগৎ সিংহের চতুর্থ দেহরক্ষী নকল ...পেশ আড়ালে আসল চেহারা ...নিজেকে সরিয়ে রাখল একটু দূরে। ...ন্দী হওয়ার মুহূর্তে সবার অলক্ষ্যে ...ই হল সে। সেইদিনই গভীর রাতে ...প্রকৃত অবস্থা বোঝার আগেই দুটি ...হাউনীর সঙ্গে পাল্লা দিতেই যেন ...জল উঠল পাঠান শিবিরেও। ছত্রভঙ্গ ...পার হয়ে গেল নায়পুর ...সীমানা। ছদ্মবেশ তখন খুলে ...নিজের মিথ্যা অহংকারের লজ্জা ...হেঁটে করে হাম্বিরের পাশে পাশে ...জগৎ সিংহ। চার দণ্ড পরে বিষ্ণু- ...তোরণ পার হয়ে প্রাসাদে ...হাম্বির অম্বররাজপুত্রকে নিয়ে।

...পর অবশ্য পাঠানরা শোধ নেওয়ার ...চেষ্টা করেছে, কিন্তু বার বার ফিরে ...হাম্বিরের বীরত্ব আর কৌশলের ...পরাজিত হয়ে।

...গল্প থামিয়ে দিয়ে বললাম— ...ঝুমুর, এত গল্প শুনলে তো ...কিছুই দেখতে পাবি না।

...এ রাস্তার আর কি দেখব, ঝুমুর ...বলে দিল, সবই তো ধানক্ষেত।

...শুধুই কি ধানক্ষেত, ভালো করে ...। আম-কাঁঠালের বাগান, সবজি ...। পুকুর কত কিছু দেখবি। ...আগে এলে পাটের ক্ষেত দেখাতে ...এই হুগলী জেলায়।

...এটা বুঝি হুগলী জেলা? ঝুমুর ...।

...ফেললাম। ঝুমুর বোধহয় ...লজ্জা পেল। একটু লজ্জিত

হেসে ও বলল, জিওগ্রাফীটায় আমি বরাবরই কাঁচা, জানো ফুলমাসি, বরং হিস্ট্রি হলে—

—তুই থাম বাবা, কিসে যে তোর ইন্টারেস্ট আর কিসে তুই পাকা তা আমি ভালো জানি। ওই গানেই তোর সর্বনাশ করবে।

—তুমি বলছ একথা? ফুলমাসি?

মেয়েটা আমাকে বিপদে ফেলল দেখছি। আমি জানি ও গান পাগল। ক্লাসিকাল গানে ঝোঁকটা অনেক বেশী। দিনে ও কম করে ছ-সাত ঘণ্টা রেওয়াজ করে রোজ, তাই পড়াশোনার সময় বেশী পায় না। এর জন্যে বাড়ীতে মায়ের মুখঝামটা, দাদারা সমালোচনায় মুখর। শুধু বিনয়বাবু, ঝুমুরের বাবা ওর পক্ষে। উনি সুষমাদিকে বোঝান যে দুটো মেয়ে তিনটে ছেলে তো শুধু পড়াশোনাই করল। এটাকে না হয় একটু ছেড়েই দিলে তোমরা।

তা সেই ছাড়াই আছে ঝুমুর। কলেজের খাতায় নামটা রয়ে গেছে। ও নিশ্চিন্ত। পরীক্ষার আগে দু' মাস না হয় রাতদিন জেগে মেক-আপ করে নেবে। এখন তো তার দেরি আছে। তাই ঝুমুর একমনে গানের রেওয়াজ করে যাচ্ছে। আমি জানি আজ যে ও এসেছে তার পেছনেও গান রয়েছে। বিষ্ণুপুর বলেই ও এসেছে, দীঘা হলে আসত কিনা সন্দেহ।

—জানো ফুলমাসি, ঝুমুর মাথা দুলিয়ে বলল, আমার আসার কথা এক বাবা ছাড়া কেউ জানে না। ওরা তো দেরিতে ওঠে। সকালে উঠে অবাক হয়ে যাবে সবাই।

আমাদের কথার মাঝে ধানক্ষেত-ঢেউ ছাড়িয়ে কখন বাস শহরের এলাকায় ঢুকে পড়েছে। ঘড়িতে দেখলাম দশটা বেজে গেছে।

আরামবাগ এ-পথে বড় শহর। ইলেকশনের সময় নামটা সবার খুব কানে আসত। এখানে বাস থামিয়ে ড্রাইভার কনডাক্টর নেমে গেল। যাবার সময় বলে গেল, আপনারা চা-টা যা খাবার খেয়ে নিন।

ঝুমুর চেঁচিয়ে উঠল, ও ফুলমাসি, দেখ মৌচাক। ওদের মিষ্টি আমি খুব ভালোবাসি।

বললাম, যা কিনে আন।

—ও ফুলমাসি, ডাব খাবে? কি বড় বড় ডাব—ও নেমে গিয়ে নেব, সন্দেশ আর নিমকী নিয়ে এল, বাইরে থেকেই আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে আবার ছুটল ডাব আনতে।

আরামবাগ ছাড়ার পর ঝুমুর আবার হাম্বিরের গল্পের খেই ধরিয়ে দিল আমাকে।

শিব শক্তির উপাসক হাম্বির পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন শ্রীজীব গোস্বামীর শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য-র কাছে। বীরত্ব আর হিংসার পথ ছেড়ে প্রেম ভক্তির ধর্ম গ্রহণ করলেন। অন্য দিকে নদীয়ার চাকন্দী গ্রামের চৈতন্যদাস গোস্বামীর ছেলে শ্রীনিবাস গৃহী হয়ে বিষ্ণুপুরের গোস্বামী বংশের পত্তন করলেন।

খেয়াল করি নি জমির চেহারা এর মধ্যে কখন যেন পালটে গেছে। কলকাতা থেকে যখন রওনা হয়েছিলাম তখন পথের ধারেও শহর শহর ভাবটা বজায় ছিল। বি, টি, রোডের ধারে গাছপালা যত না তার চেয়ে বেশী চোখে পড়েছে দোকান-পাট। মোটর মেকানিকের দোকান, চাখানা, সবজি বাজার ছিট কাপড় মণিহারীর দোকান ছিল রাস্তার দু-পাশে। দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়ে জানকুনির লেভেল ক্রসিং পার হতেই যেন মফঃস্বলের গন্ধটা পুরোপুরি অনুভব করতে পেরেছিলাম। আর একটু এগোলে দেখা মিলল, কুঁড়ে ঘর, পুকুর, ক্ষেত খামার। আরামবাগ পৌঁছনোর আগে অনেক নদী নালা পেরোতে হল। নদীর ওপর পাকা ব্রীজ, নালার ওপর ভারি মোটা কাঠের সাঁকো। দু-পাশে ধানের ক্ষেত এ হলদে রং ধরছে। যতদূর চোখ যায়, চাইলে যেন নেশা লাগে। প্রকৃতির ওপর ঝুমুরের কোনও টান নেই। জন্মেছে ইঁট কাঠের খাঁচায়, মানুষ হয়েছে দাঁড়ে ঝোলান অবস্থায়। কলকাতার মাপা এক ছটাকের বেশী আকাশ দেখলে ওর অস্বস্তি হয়, জল দেখলে ও ভয় পায়।

কিন্তু আমি কোথায় জন্মেছিলাম সে কথাটা মাকে জিজ্ঞাসা করে নিতে ভুলে গেছি। আজ তো মা আয়ত্তের বাইরে, তাই ও কথাটা আমার অজানাই রয়ে গেল। তবু আমি ঝুমুরের মত নই, আমি আমার চারপাশের অবাধ আকাশ অজস্র বাতাস দেখলে আত্মহারা হই, ধানক্ষেতের শোভা এখনও আমাকে উন্মনা করে তোলে। মনে পড়ে যায় ছোটবেলার স্মৃতি। পূর্ববঙ্গের মফঃস্বল শহর রাজবাড়ী। গোয়ালন্দ যাওয়ার পথে পড়ত। নামে শহর কিন্তু গ্রামের ছোঁয়া ছিল তার সর্বাঙ্গে। শনি মঙ্গলবারে হাট বসত আমাদের বুড়ো চাকর ধামা কাঁধে নিয়ে চলে যেত রেল লাইনের ওপারে। তরীতরকারী, ফল ফুলুরীর সঙ্গে আনত টাটকা তিলের খাজা, খাগড়াই মুড়কী। রেল লাইন ধরে হাঁটলে একটু দূরেই পড়ত সাহেবদের বরফ কল। পাশে পুকুর। ওই পুকুরের জল থেকে নাকি বরফ জমাত কলে। বর্ষায় এ পুকুর, আমাদের বাড়ীর সামনের রেলের খাল সব টইটুম্বুর হয়ে মাঠে পর্যন্ত জল উঠে আসত। সেই জলে কিলবিল করত ল্যাঠা আর পুঁটি মাছ। ছেলেরা সব কঞ্চিতে সুতো বেঁধে ছিপ বানাত আর ভাতের টোপ দিয়ে টপটপ ধরত পুঁটিগুলোকে।

আমাদের বাগানে একটা আম একটা কাঁঠাল, একটা জামরুল আর তিনটে পেয়ারা গাছ ছিল। আরও কত গাছ ছিল আজ তাদের নামগুলো আর মনে পড়ে না। গাছ আরও দেখেছি, যেবার কলকাতা সাতাশ্যাপেতের পথে ছিলাম...... শহরো, আশশ্যাওড়া, হলদিমনসা। এত ভালো লাগত আমার। কেমন একটা গন্ধ আছে যেন সবুজ পাতার। হঠাৎ সেই গন্ধটা আমাকে ফিরিয়ে

নিয়ে গিয়েছিল অনেক আগের ফেলে আসা জীবনে।

ঝুমুরকে বললুম, আমরা মল্লভূমিতে এসে পড়েছি রে।

ঝুমুর বলল, বাব্বা, কি জঙ্গল, এর ভেতর যেতে হলে দিনের বেলাই ভয় করবে মানুষের। এ যেন এক অন্য রাজ্য।

তা সত্যি, গল্পের ফাঁকে কখন যেন একটা নতুন রাজ্যে এসে পড়েছি। ক্ষেত খামার, পুকুর, চরে বেড়ান গরু, ছাগল সব মায়া মন্ত্রে হারিয়ে গেছে, যেন এক বনের মধ্যে এসে গেছি আমরা। সরু পথ, একটা গাড়ী যাওয়ার পর আর বেশী জায়গা থাকে না, তার দু পাশে ঘন গাছপালার সারি। জানা, না-জানা কত গাছের মেলা সেখানে। ও-পাশে কি ক্ষেত-খামার ঘরবাড়ী সব আছে? ওই গাছগুলোর ওপারে? কে জানে। গাছ দেখেছি কিন্তু বন-জঙ্গল তো দেখিনি তাই সবটাই রহস্যময় মনে হয়। রূপকথার রাজকন্যাকে কি নির্বাসন দেয় এমনি জঙ্গলে? আর ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী? তারা কোথায় থাকে?

কিন্তু এ তো দিবাস্বপ্ন, কারণ তারা তো থাকত গহন বনে। এ কি তেমনি বন নাকি? না, রূপকথাটথা নয়, তবে ইতিহাসের অনেক রাজা-রাজড়া, সেনাপতির আনাগোনা হয়েছে এ পথে। পাঠান সর্দার কতলু খাঁ এসেছিলেন আরামবাগ পর্যন্ত। আরামবাগের নাম তখন ছিল জাহানাবাদ। তাকে তাড়া করে এসেছিল মোগল ফৌজ। তারপর বর্গী, সব শেষে কোম্পানীর সেপাই। ঘন গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে পাথুরে মাটি। ঘোড়ার ক্ষুরের ঘায়ে বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ত সেই মাটিতে।

সে অবশ্য অনেক পরের কথা। তখন মল্লভূমির রাজবংশের মুমূর্ষু অবস্থা। জঙ্গল মহলের রাজপ্রাসাদ ভেঙে ভেঙে পড়েছে, ভেঙে পড়েছে বিষ্ণুপুরের বিরাট ঐতিহ্য।

গেছে সব কিন্তু সাক্ষী রেখে গেছে কিছু। তারই সন্ধানে চলেছি আজ আমরা। যেটুকু আছে তাও তো অবহেলার নয়। বাস চলেছে তীব্র বেগে। কামারপুকুর জয়রামবাটী আগেই পেরিয়ে এসেছি, এবারে শেষ হতে চলেছে এই যাত্রা।

বিষ্ণুপুর শহরের সরু রাস্তার দু-পাশে বাড়ী-ঘর দোকান পাট সে সব পার হয়ে বাস এসে দাঁড়াল এক মস্ত দিঘীর পাশে। পিচ বাঁধান পথের এপাশে দিঘী ওপাশে স্টেশনারী, ফল মিষ্টি জামা-কাপড়ের দোকান। এদিকে লোকে বাজার হাট করছে আর ওপাশে চলছে স্নান কাপড় কাচা। দিঘির চারপাশের দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে বাড়ী ঘর।

—পোকাবাঁধ? ও ফুলমাসি, এ কি নাম? ঝুমুর অবাক হল। সত্যি নামটা ভালো নয়। কোন কাব্য নেই মহিমা নেই এমন সুন্দর ভরা দিঘীর নামে। তবে সুবিধা আছে। জিভের জড়তার জন্যে উচ্চারণে আটকায় না। রিকসাওয়ালা থেকে জনমজুর পর্যন্ত সবাই উচ্চারণ করে অক্লেশে, বাঁকুড়া জেলার বিশিষ্ট ভঙ্গিতে বলে 'পকা বাঁধ।'

সুটকেস দুটো নিয়ে নেমে পড়লাম দুজনে। সামনেই সাইকেল রিকসা, রিকসাওয়ালা যত্ন করে তুলে নিল জিনিস-পত্র। ভাড়া বলল দেড় টাকা। আমরা রাজী হতে এঁকে বেঁকে উঁচু নীচু রাস্তায় কখনও প্যাডেল করে কখনও বা ঠেলে নিয়ে চলল আমাদের।

উৎরাই-এর মুখে ঝুমুর ভয় পেয়ে বলল, উলটে দেবে না তো, ও ফুলমাসি—

রিকসাওয়ালা হেসে বলল, না দিদিমণি, ভয় পাবেন না ঠিক পৌঁছে দেব আপনাদের। অবশেষে এসে গেল ট্যুরিস্ট লজ যেখানে কদিন থাকব আমরা।

অনেকখানি খোলা জমির মাঝখানে দিব্যি হাত পা ছড়ান একতলা বাড়ী। কম্পাউণ্ডের গেট খুলে রিকসা সোজা চলে এল লজের দরজায়। কাউন্টারে লেখালেখি সারছি, এর মধ্যে ঝুমুর ফিসফিস করে বলল, চেয়ে দেখ ফুলমাসি, এখানেও লাল শার্ট এসে গেছে, বোধহয় আমেরিকান ট্যুরিস্টদের দেখাদেখি।

—আঃ চুপ কর, তাড়া দিলাম। ভয় হল কাউন্টারের ছেলেটি শুনতে না পায়।

লজটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, লম্বা টানা বারান্দার পাশে সারি সারি ঘর। ওর মধ্যে তিন নম্বরটা আমাদের। ছোট কামরা, কিন্তু বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা। ফোমের গদি দেওয়া দুখানা খাট, মাঝখানে এক চিলতে জুটের কার্পেট, এপাশে ওয়ার্ডরোব, টেবিল চেয়ার, এককথায় যা দরকার সবই রয়েছে। বিছানায় ধপধপে চাদর, বালিশে কাচান ওয়াড়, বাথরুমে তোয়ালে, মিনি লাকস সাবান পর্যন্ত সব কিছু মজুত।

নরম বিছানায় বিনা বাক্যব্যয়ে গড়িয়ে পড়ল, ঝুমুর, বলল, বাবা, গায়ে ব্যথা হয়ে গেছে বাসের ঝাঁকুনিতে, আমি বাপু শুয়ে পড়লাম।

দুপুরে আর কপালে ভাত জুটল না। আমার সঙ্গে পাঁউ আলুর দম আর ডিম ভাজা ছিল। তাই খেলাম দুজনে। খাওয়ার পর ঝুমুর বলল, তারপর ফুলমাসি, তোমার বীরবাঁধের কি হল?

মেয়েটার আচ্ছা নেশা তো গল্পের। বললাম, এখন একটু জিরোতে দে বাবা, তারপর বিকেলে আবার বলব।

ঝুমুর হাসল, বলল, জানো ফুলমাসি, গল্পের নেশা আমার ছোটবেলা থেকে। বড় পিসিকে কম জ্বালিয়েছি তখন। মার কাছে শুনেছি বড় পিসির ছিল আমাকে গল্প বলার ডিউটি। তা সেই রাজা আর টুনির গল্পটা ছিল আমার সবচেয়ে পছন্দ, তাই পিসিকে রোজ ওইটেই বলতে হত। শেষে বলতে বলতে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে পিসি বোধহয় ঘুমোত ঘুমোতেও বলতে পারত, গল্পটা এমন অভ্যেস হয়ে গেছিল। কিন্তু, ঝুমুর হেসে ফেলল, বেচারী পিসি যে কখনও বাদটাদ দিয়ে সংক্ষেপে সারবে সে উপায় ছিল না, কারণ আমারও তো মুখস্থ, সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলতাম।

হেসে বললাম, দেখিস বাবা, যেন পিসিকে ছেড়ে মাসিকে ধরিস না। আমার কিন্তু এক কথা দুবার বলতে মাথা ধরে যায়।

বাসের জার্নিটা সত্যিই বেশ কাবু করে ফেলেছিল দুজনকেই। কিন্তু ঘুম দিয়ে উঠে শরীরটা ঝরঝরে এখন। জানলার বাইরে চেয়ে দেখি শীতের বেলা পড়ে এসেছে, ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। ঘণ্টা বাজিয়ে অর্ডার দিয়ে চা আর পেঁয়াজী আনালাম।

—আমার কিন্তু খুব খিদে পেয়েছে, ঝুমুর ঘোষণা করল। রাত্তিরে আমরা কি খাব ফুলমাসি? বললাম, সেটাও কি আমি বলে দেব? মেনুকার্ড দেখে অর্ডার দে না।

মেনুকার্ড নিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল ও।

কিছুক্ষণ বাদে বেয়ারা টেবিল পরিষ্কার করে ডিনারের অর্ডার নিয়ে গেল। এবার আমরা দুজনেই একা। এরকমটা সহজে হয় না। কলকাতায় এমন অবসরের কথা চিন্তাই করা যায় না। সন্ধ্যা ছটায় সেখানে শুরু হয় ঝুল চা, খাবার, অতিথি, বন্ধু, টেলিফোন কল, সব নিয়ে জমজমাট অবস্থা। ফাঁক দিয়ে এতটুকু অবসর চুঁইয়ে পড়ার উপায় থাকে না কোথাও, কর্তব্য, ভদ্রতা আর লৌকিকতা দিয়ে ভরাট থাকে প্রতিটি মুহূর্ত। যখন সংসারের পাট মেটে, তখন দৃষ্টি যায় ক্যালেণ্ডার টেবিলটার দিকে। তা অবসরের ভাবার অবকাশ মেলে না।

ঝুমুর কিন্তু তাই বলে থাকার পাত্রী মোটেই নয়। একটু পরেই তাড়া দিয়ে উঠল, কই ফুলমাসি, হল সময়? ইতিহাস কি মাঝপথে থাকবে নাকি?

হতাশ হয়ে বললাম, তুই ছাড়বি না দিবি তা; বল কোন পর্যন্ত বলেছিলাম।

—বীর বাঁধ প্রতিষ্ঠা করলেন রাজা বীর সিংহ—

বললাম, হ্যাঁ, বীরবাঁধ। শুধু বাঁধ নয়, একে একে আটটা বাঁধ কাটিয়েছিলেন রাজ্যে। নিজে সেই কতকগুলির নামকরণ করেছিলেন, শ্যামবাঁধ, কালিন্দী বাঁধ। এছাড়া আর চারটি বাঁধের নাম হল বীরবাঁধ, গাঁতাতবাঁধ আর চৌখন বাঁধ। বাঁধের কোন চিহ্নই আর এখন নেই।

—কিন্তু, ফুলমাসি, লালবাঁধ তো রঘুনাথ সিংহ কাটিয়েছিলেন না?

—নারে অনেকের ধারণা লালবাঈর জন্যে ওটা করা হয়েছিল, কিন্তু বোধহয় নামের মিল থাকায় এই ভুল হয়েছে।

...বার হাসন রাজার একটি গান

...র কেও ধরিতে না পারে
...রসের মানুষ
একটি থাকে মর ঘরে।
...থকে বাইরে থাকে,
থাকে সে অন্তরে।
...লাগিয়া পাগল হইয়া
হাছন রাজা ফিরে।

...করে ঢং করে আর করে খেলা।
...মানুষে লাগাইছে
ভবার্ণবের মেলা।
...ন রাজায় হইছে পাগল
দেখিতে তার লাগি।
...র যদি ধরতে চাও
রাত্রি থাকিও জাগি ॥(১৩)

...মনের মানুষ' যে আমাদের মনের ...রয়েছেন, ভুল করে তাঁকে আমরা ...দেখি না, অন্তরের ঠাকুর যে ...র অন্তরেই আসন নিয়েছেন, সেদিকে ...র দৃষ্টি পড়ে না, তাই সাধন ...র ব্যর্থ হয়। এই জন্যে দুঃখ করে ...রাজা গেয়েছেন—

...ন সাধন আমার হইল না।
... পূজা মনে কি বুঝিল,

আমার মাঝে কোন জন,
তারে খুঁজল না।
ঠাকুর যে ঘরের মাঝে
তারে চেয়ে দেখল না ॥(১৪)

লালন ফকির ছাড়াও বাংলাদেশের আরও অনেক হিন্দু-মুসলমান বাউলের নাম জানা যায়, যেমন, খেজমৎ সাঁই, মেহের শা, গোঁসাই নলিনচাঁদ, গোঁসাই হীরালাল, মদন শা, পাগলা কানাই পাঞ্জ, শাহ, দুদ্দু শাহ প্রভৃতি। কিন্তু হাসন রাজার সমতুল্য দ্বিতীয় আর একজন বাউল কবির সন্ধান পাওয়া যায়ে কিনা সন্দেহ। সম্পন্ন জমিদারির বৈভবের মধ্যে বাস করলেও বাউলের একতারার সুরে বাধা ছিল তাঁর অন্তরের ধ্যান। বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু কিছু অনষ্ঠানাদির রেওয়াজ আছে। হাসন রাজা আনুষ্ঠানিকভাবে সেরূপ বাউল পর্যায়ভুক্ত না হলেও ধারণায়, সাধনায় তিনিও ছিলেন বাউলদের সমানধর্মী, এতে সন্দেহ নেই।

সাধন ভজন, ধর্মকর্ম ও ঈশ্বরানুসন্ধানের পথে চলতে গিয়ে অনেক সময়েই আমরা বাহ্য উপকরণ, আচারনিষ্ঠা ও অনুষ্ঠানিক অভ্যাসের পুনরাবর্তনের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে ভাবি যে, আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন সার্থক হল। হাসন রাজা গভীর ... ও ...

ভাষায় সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, বাইরের শুদ্ধাচার পালন করা ভগবানকে পাওয়ার পথ নয়, কেবল মাত্র ভগবৎ প্রেমে মাতোয়ারা হলেই তাঁকে পাওয়া যায়।

খদা মিলে প্রেমিক হইলে
পাবে না পাবে না খদা
নমাজ রুজা কইলে ॥
খদা যদি ধরতে চাও
তার সঙ্গে পিরিত বাড়াও।
মিলিবে মিলিবে খদা
প্রেমে তার মজিলে ॥
মিলবে নারে প্রাণের খদা
তছবি টনকাইলে

মিলবে না মিলবে না খদা
নাম তার লইলে ॥
আল্লা আল্লা কইলে
কিনা কল্মাও পড়িলে।
পাইবে নারে প্রাণের খদা
মাথা কুটিয়া মইলে ॥
অন্য পন্থে না যাইয়া
প্রেমপন্থে গেলে।
পাইবায় পাইবার খদা
হাছন রাজায় কলে।।(১৫)

লালন ফকিরও বলেছেন—
অনুরাগ নইলে কি সাধন হয়।
... ॥

অনন্তরূপে উপলব্ধির কথা বলেছেন কবীর—

ইক প্রেমরস চাখা নহী
অমলী হুআ তো ক্যা হুআ।।
কাজী কিতাবে খোজতা
করতা নসীহত ঔরকো
মহরম নহী উস হালসে
কাজী হুআ তো ক্যা হুআ।।

'সেই এক প্রেমরস যদি আস্বাদ না করিয়া থাক, তবে পবিত্র হইয়াছ ত কি হইল? কাজি যে কেবল কোরাণ খুঁজিয়া মরিতেছেন এবং অন্যকে উপদেশ দিতেছেন, যদি তিনি সেই ভাবের ভাবুক না হইয়া থাকেন তবে কাজি হইল ত কি হইল?' (কবীর।। ক্ষিতিমোহন সেন)।

হাসন রাজার পল্লীগীতি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা ইতিমধ্যে পাঠকের জন্যে থাকতে পারে। তাঁর গানের মূল সুর হল ভগবৎপ্রেম ও সেই প্রেমাস্পদ পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। তাঁর জীবন ছিল গৃহীর জীবন, গার্হস্থ্যধর্মকে এড়িয়ে বৈরাগী ব্রহ্মচারী হয়ে মঠে মসজিদে ফকির দরবেশের জীবনকে তিনি বরণ করেন নি। পাঁকের ভিতরে থাকলেও পাঁকাল মাছের গায়ে পাঁক লাগে না, জলে ডুবে ডুবে হাঁসের গায়ে যে ছিটেফোঁটা জল লেগে থাকে, ডানা ঝাপটিয়ে অনায়াসে সেই জলের স্পর্শকে সে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে গা থেকে। হাসন রাজাও তেমনি সংসারের ভোগ-বিলাসের মধ্যে বাস করেও ভোগবিলাসের বাসনা কামনা থেকে নিজের মনকে মুক্ত রাখতে চেয়েছেন। কঠিন দুশ্চর এই সাধনা অতন্দ্র প্রহরীর মত এই নির্লিপ্তি এই নিরাসক্তির সাধনাকে তিনি যে অন্তরে সদাজাগ্রত রাখতে নিরত ছিলেন, তারই নিদর্শন পাই তাঁর গানে—

হাছন রাজায় বলে,
ও আল্লা ঠেকাইলায় ভবের জঞ্জালে।
বেভুলে মজাইলায় মোরে
এ ভবের খেলে।।
বন্ধের সনে প্রেম করিবার
বড় ছিল আশা।
ভবের জঞ্জালে ফেলে করিলে দুর্দশা।।
স্ত্রী হইল পায়ের বেড়ী,
পুত্র হইল খিল।
কেমনে করিবার হাছন
বন্ধের সনে মিল।। (১৬)

সংসারের বন্ধনে জড়িয়ে জীবনের মূল উদ্দেশ্য থেকে তিনি বিচ্যুত হয়ে পড়ছেন, ঈশ্বরোপাসনায় বাধা পড়েছে. এই অন্তর্বেদনা রূপ পেয়েছে তাঁর আরও গানে—

বৃথা কাজে দিন গেল
রিপু সঙ্গে লইয়া।
রিপুর কার্য করি সদা
তোমার কার্য খুইয়া।।
ভালা পথ হইয়া আমি
হইলাম রে বেপথি।
পরকালে কি হইবে আমার গতি।। (১৭)

আমোদ আহ্লাদের মায়াজালে বন্দী হয়ে হাসন রাজার মন কাঁদে মুক্তির জন্যে—

মাটির পিঞ্জিরার মাঝে বন্দি হইয়া রে
কান্দে হাছন রাজার মন মনিয়া রে,
মায়ে বাপে বন্দি কইলা খুসীর মাঝারে
লালে ধলায় বন্দি হইলাম
পিঞ্জিরার মাঝেরে।
উড়িয়া যাত্রের মারনা গুলী
পিঞ্জিরায় হইল বন্দি।
মায়ে রূপে লাগাইলা
মায়াজালের আন্দি। (১৮)

এসব গানে আছে হতাশ্বাসের বোধ, কিন্তু কখনো কখনো আবার তিনি ভগবৎ প্রেমে বিভোর হয়ে পড়েন, তখন তিনি পরমেশ্বরকে ভজনা করেন নানাভাবে—তাঁকে ডাকেন পিয়ারী, প্রাণ, জান, প্রিয়া বা মনমোহিনী বলে কখনো তাঁকে দেখেন বন্ধুরূপে, আবার কখনো তাঁকে ডাকেন মা বলে। যেভাবেই দেখুন, পরমেশ্বরকে তিনি কখনো পর বলে ভাবেন নি, হৃদয়ের উত্তাপ দিয়ে তাঁর সঙ্গে তিনি প্রেমের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন আশেক বা প্রেমিকরূপেই তিনি ভগবানের ভজনা করেছেন প্রধানত এবং পূর্বরাগ, অভিসার, বিরহ, মিলন প্রভৃতির প্রেমের বিভিন্ন ও বিচিত্র অনুভূতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর গানে।

নিশা লাগিল রে বাঁকা দুই নয়নে,
নিশা লাগিল রে,
হাছন রাজা পিয়ারীর প্রেমে মজিল রে।
ছটফট করে হাছন দেখিয়া চান্দ মুখ,
হাছন জানের মুখ দেখি
জনমে গেল দুখ। (১৯)

তার মন-ভোলান রূপ দেখে মোহিত হই, এ কি চোখের ধাঁধা? কিন্তু চোখকে বগড়ে মুছে যত তাকাই ততই যেন তার রূপের আভা আরও ঝলমল করে ওঠে। কবি এতে সন্তুষ্ট নন, এহ বাহ্য, এ ত তার ক্ষণস্থায়ী নশ্বর বাইরের রূপমাত্র। ঈশ্বরের অন্তরের অবিনশ্বর রূপকে যদি দেখতে চাও, যদি তার স্বরূপকে জানতে চাও তবে দিলের চোখ দিয়ে অন্তর খুলে তাকাও তার দিকে—

আখি মুঞ্জিয়া দেখ রূপরে।
আখি মুঞ্জিয়া দেখ রূপরে।।
আর দিলের চক্ষে চাইয়া দেখ
বন্ধুয়ার স্বরূপরে। (২০)

প্রেম-রস যেমন আনন্দের নেশা ধরিয়ে দেয়, তেমনি আবার তার জ্বালা যন্ত্রণাও কম নেই—

কত যন্ত্রণা ... [illegible] ...

তোমার সাথে প্রেম করিয়ে
হইলাম পেরেশান।।

মদনের বাণে জর্জরিত অবস্থা শুনুন, সহজ সরল ভাষার সঙ্গে রিকতার স্পর্শ লেগেছে—

ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি করে তার
কেমনে মিলি মিলি খাইল দুই ন
দেখয়া তা তার চান্দ বদন
মন করে মোর কেমন কেমন
অন্য কিছু চায় না মনে,
কেবল চায় সে
হেরিয়ে গ তার রূপের চটক,
হাছন রাজার মন হইল আটক,
মাইল মাইল, মাইল মাইল
মাইল গ মদনে।।
(মাইল—মারিল)

বিরহরূপে ডাকছেন বন্ধুকে—

ও বন্ধু অন্তর্যামী রে,
আমি তোরে ডাকিরে
দেখা দিয়া প্রাণ বাঁচাওরে।।
না দেখিলে চান্দ মুখ
আমার প্রাণ যায়রে।

হাছন রাজা হৃদয়ের সেই প্রাণনাথের চিন্তাতেই ভরপুর হয় দিন-রাত। বিচ্ছেদের বিষণ্ণ কালে পান তাঁর স্পর্শ, স্বপনে পান তাঁর বাণী—

হাছন রাজায় কান্দে কান্দেরে।
আল্লাজির লা
স্বপনে দেখিলাম তারে,
না দেখি জাগিয়া
স্বপনেতে প্রাণনাথ এই কথা কহি
তোমার আমি আমার তুমি
এ বাক্য কহিল।।

প্রিয়াকে ভালবাসার বন্ধনে জিঞ্জির দিয়ে বেঁধে রাখতে চান তি

ওরে হাছন রাজা ...
...ন্ধের বান্ধন
দিলের জিঞ্জির
(আর) ছুটিতে না পারে যেন
প্রাণবন্ধু প্রিয়া।

মনমোহিনীকে বলছেন সকাতরে

আমি তোর কাঙ্গালিনী
এগো মনমো
তুমি বিনে যত দেখি
সকলই ফাণী।।
(ফাণী—পানি—জল)

মা, বলেও ভজনা করছেন কখ

আইস পরদা খুলিয়া গ মা
আইস পরদা খুলি
হাছন রাজার প্রাণ যায়
তুমার লাগি জ্বলিয়া গ।।

লালন ফকির গেয়েছেন অচি কথা, আর হাসন রাজা গেয়েছে মনের মুনিয়া পাখির কথা—

মনমুনিয়ারে ও মর মনমুনিয়া
কুন দিন পাইবায় মানিয়া
তুমি উড়ি
তুমি ত হাওই সুন্যে বাইবার
আমি ত মাটির মানিয়া
... ...।।

।। তেরো ।।

মাল্টিস্টোরিড্ বাড়ির উঁচুতলায় দিন আসে আগে আগে। ভোর না হতেই দিলীপ ফোন পেলো। এত সকালে কে আবার? হ্যালো।

আমি স্বাতী বলছি।

এতদিন পরে? কি মনে করে?

কাল থেকে নন্দনকে—আমার ছেলেকে পাচ্ছিনে—

দিলীপের চোখের ঘুম মুছে গেল। শেষ কোথায় দেখা গেছে তাকে?

স্কুলে। আমিই দিয়ে আসি। আমিই নিয়ে আসি। কাল আনতে যেতে একটু দেরি হয়েছিল। গিয়ে দেখি স্কুল গেটে নন্দন নেই। দারোয়ান বললো, কার সঙ্গে চলে গেছে।

স্কুলে তো বলা ছিলো তোমার—কে নিয়ে যেতে পারে ওকে। তাই না।

ছিলো। বলে স্বাতী কান্নায় নিজের গলা বুঝিয়ে দিলো। আমি কিছু বুঝতে পারছিনে—

কোত্থেকে কথা বলছো স্বাতী?

আমার ফ্ল্যাট থেকে।

সেটা কোথায় বলবে তো।

ঠিকানা বলবো না দিলীপ। আমি তো নন্দনকে নিয়ে লুকিয়ে আছি এখানে।

তাহলে আমায় ফোন করলে কেন?

ওপাশ থেকে তখনি স্বাতীর গলা ফুটে উঠলো না। খানিক পর। তার' করে ফেলেছি।

দিলীপের একসঙ্গে অনেক কিছু হচ্ছিল। নারী একটি স্বার্থপর জী আহা! ওরা বড় নিরুপায়। একই বোকা, স্বার্থপর ও নিরুপায়।

তোমার ছেলে নিশ্চয় চেনা কারও সঙ্গে গেছে।

সেটাই তো আমার ভয়।

ওঃ। তাহলে চিন্তার কিছু স্বাতী। খোঁজ নিয়ে দ্যাখো—ওর বাবা নিয়ে গেছে ওকে—

সেটাই তো আমার আশংকা।

বাঃ। ছেলের ওপর বাবার অ তো থাকবেই।

আমি স্বীকার করি না। নন্দনকে ও [illegible]বেশে রাখলে ও কিছুতেই মানুষ হবে [illegible] ওকে এবার আমি আসানসোলের [illegible]লে নিয়ে দেব।

[illegible]হলে তো টাঁশ তৈরি হবে। তুমি [illegible] কোন কনভেন্টের কথা বলেছিলে। টাঁশ কেন? ইংরিজি শিখবে।

হ্যাঁ। যৌবনে একটা প্রাইভেট [illegible]ম্পানীতে অফিসার হবে। গলায় টাই। [illegible]য়াতাঁর অনর্গল ইংরেজির চচ্চড়ি [illegible]বে। সে এক ভারি ইন্টারেস্টিং জিনিস [illegible] কিন্তু।

ঠিক এই সময় লাইনটা কড় কড় শব্দ [illegible]লে আপনাআপনি কেটে গেল। পৃথিবীর [illegible]রে একটা মজা আছে। এখানে একই [illegible] নানা জায়গায় অনবরত নানারকম কাণ্ড [illegible] যাচ্ছে। খোলা চোখে মনে হবে একটার [illegible] আরেকটার কোন যোগ নেই। যে [illegible]সব টুকরো মনে মনে জুড়তে পারে— [illegible] এইসব অবিরাম কাণ্ডকারখানার ভেতর [illegible] যোগ দেখতে পায়—সেই শুধু এই [illegible]থিবীর মজা বোঝে—এই পৃথিবীর মানে [illegible] বলা যায়—সে-ই শুধু এই [illegible]থিবীর ভেতর আরেকটা পৃথিবী দেখতে [illegible] দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ড দেখার চোখ [illegible]দ ছিল। তিনি কবি ছিলেন।

সেই তুলনায় দিলীপ বসু একজন [illegible] দালাল মাত্র। সে পরিষ্কার দেখতে [illegible]চ্ছিল—লাইন কেটে যাওয়া ফোনে স্বাতী [illegible] বার ডায়াল করে যাচ্ছে। তার পাশেই [illegible] রাণী পাতলা মত নাক ডেকে [illegible]চ্ছে। গোকুলদার খাটালে, গয়লা মন [illegible]বনা যাচ্ছে। তাদের বাট টেনে পাকা [illegible] দুধ বের করছে। পৃথিবীর কোন [illegible]ভের কার্নিসে—ঠিক এখুনি হয়তো [illegible]টে পাখি এসে বসলো। একই সঙ্গে [illegible]বরাম নানা জায়গায় নানা কাণ্ড ঘটে [illegible]চ্ছে—ছবি হয়ে উঠেই আবার মুছে [illegible]চ্ছে। এইসব ছবি যদি একসঙ্গে সব [illegible] ফেলা যেতো। তাহলে ঠিক একটা [illegible]নে—কিংবা এই পৃথিবী থেকেই আরেকটা [illegible]থিবী বেরিয়ে আসতো। তার নাম দ্বিতীয় [illegible]বেন। কিন্তু আমি কবি নই। দার্শনিক [illegible]। আমি একজন পাকা দালাল।

পৃথিবীতে এই সময় আরেকজন একটা [illegible]ন দেখছিল। জায়গার নাম কলকাতা। [illegible]জের চেম্বারে হরি ডাক্তার কাল রাতে [illegible]কজন সামান্য জানাশোনা পেশেন্টের সঙ্গে [illegible]নারকমের মদ পর পর খেয়েছিল। একজন [illegible]শেন্ট মার্চেন্ট নেভিতে কাজ করে। সে [illegible]হাজ থেকে অনেক ড্রিংকস্ এনেছিলো। [illegible]সব খেয়ে সে যখন নিজের চেয়ারে টলিয়ে [illegible] তখন বোধহয় ঘরে আর কেউ ছিল [illegible]। সবাই চলে গেছে।

এখন এই ভোরবেলায় হরি ডাক্তার [illegible]জের রিভলভিং চেয়ারে এক কাতে ঝুলে [illegible] ডান হাত ঝুলিয়ে দিয়ে স্বপ্ন [illegible]ছিল। টেবিলে কয়েকটা খালি বোতল। [illegible]ভার ছিপি। মাটির বড় খুরিতে সস্তার [illegible] [illegible] কাবাব। ঘটকওপেনার।

একটা শাদা রঙের বড় খাম। [illegible] কাল রাতের [illegible] দাগ।

হরি ডাক্তারের ডায়গনোসিস রুম ঘর [illegible] দুই কিশোর পাশের ল্যাব-এ অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। [illegible] ওদেরও কাল রাতে অনেকবার সোডা কিনতে যেতে হয়েছে।

হরি ডাক্তার কাল অনেকবার ভেবেছিলো, বাড়ি ফিরবো। বাড়ি ফিরবো। আজ নিশ্চই সুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফিরবো। কিন্তু রাত নটায় মার্চেন্ট নেভির ছেলেটা এসে সব বানচাল করে দিলো।

[illegible] হরি সারাদিন নানারকম ভেবেছিলো।

[illegible] সে [illegible] করে দেখছিলো। আমি এখন বাহান্ন। আমার শরীরটা [illegible]। ডাক্তারি পড়াতে বাবার মোট তেত্রিশ হাজার টাকা খরচ হয়। আমি বিয়ে বাবদ যে-বাড়িটা পাই সেটার দাম—কলকাতার বাইরে হলেও এখনকার বাজারে অন্তত দেড় লাখ। সে-বাড়িতেই আমরা আছি। [illegible] দিয়ে যেতে হয়।

সেখানে আমি তিন বছর প্র্যাকটিস করে দারুণ পসার করেছিলাম। তখন বাবা বেঁচে। কিন্তু প্র্যাকটিসে কি লাভ!

কলকাতায় এসে এই [illegible] করলাম। নামমাত্র চিকিৎসা। তার সঙ্গে রিসার্চ চালানো। [illegible] নিয়ে। [illegible] ওপর বাঙালীদের অনেক [illegible] আছে। আমি সে-কাজে আমার কিছু কন্ট্রিবিউশন রেখে যেতে চাই। কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারিনি। এখন দুদিক চালাতে গিয়ে আমার অনেক দেনা। বাইরে গাড়িটা পড়ে আছে। টাইমিং [illegible] আর আনা হয়নি। এ গাড়ি এখন শুধু মল্লিকবাজার স্ক্র্যাপ হিসেবে কিনতে [illegible]। আমার ছেলেরা আমাকে ক্ষমা করবে না। স্ত্রী ক্ষমা করবে না। তারা জানেও না—আমার এখন কোন প্র্যাকটিস নেই। রিসার্চ ভণ্ডুল। সংসার আর রিসার্চ চালাতে গিয়ে প্রচুর দেনা। ফিরে এখন পসার জমানো কঠিন। আমি এখন সাত পেগ খেয়ে তবে অজ্ঞান হই। এই বাহান্ন বছর বয়সে। পেগের মাপ আর ঠিক নেই। ঢক ঢক করে খাই। নিট। বেশ লাগে নেশা হলে। ব্যান্ড, ইউরিন—টুকটাক কালচার করে যা দু'পয়সা পাওয়া যায়—তাই দিয়ে দুদিক কোনমতে খুঁড়িয়ে চালাচ্ছি। আমার শরীর খারাপ হয়ে যদি মরে যেতাম এখন—তার চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারতো না। কিন্তু শরীর যে কেন এত ভালো। কিচ্ছু হয় না। ঘাই করি না কেন—পরদিন আমি দারুণ ফ্রেস।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতেই গতরাতে সে অল্প জানাশুনো লোকজনের সঙ্গে বোতল খুলেছিল।

তখন মার্চেন্ট নেভির ছেলেটা বললো, আপনি নাকি চলে যাচ্ছেন হরিদা।

হ্যাঁরে। আবার ফিরে আসবো দু'বছর পরে।

খুব মিস করবো আপনাকে। কোথায় যাচ্ছেন?

এখনকার মত তেহেরানে। সেখান থেকে অয়েলটাউন বান্দারশানিতে যাবো। সেখানেই হসপিটাল। কোয়ার্টার।

অনেক টাকা পাবেন তো। কবে অ্যাপ্লাই করেছিলেন?

সবাইকে এক মাত্রায় গ্লাসে ঢেলে দিতে দিতে হরি ডাক্তার বললো, যার যার জল বা সোডা নিজে নিজে মিশিয়ে নিন। আমি অ্যাপ্লাই করিনি ভাই। ঋষি কোত্থেকে ফর্ম আনিয়ে আমার সই দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলো।

এখন খোলা দরজা দিয়ে হরি ডাক্তারের পায়ের জুতোয় ভোরের আলো এসে পড়লো। হরি এখন তেহেরানে পৌঁছে গেছে। খোদ ইরাণের শাহের বেডরুমে।

শাহেনসা মুক্তোর কাজ করা খাটে আধশোয়া অবস্থায় বাঁ হাতখানা এগিয়ে দিলো হরি ডাক্তারকে। নাড়ী দেখে হরি বললো, আপনার এখানে তো থানকুনি পাতা পাওয়া যাবে না। লোহা দাগ করে খানিকটা রস সকালে খালি পেটে খেলে ভালো হয়।

পাওয়া যাবে না কেন! আলবৎ পাওয়া যাবে। বলে শাহেনসা উঠে বসলো বিছানায়। কাস্পিয়ান সাগরের তীরে খানিকটা জায়গায় থানকুনির চাষ হচ্ছে আজ তিন বছর। আমাদের দেশের ওষুধ বিষুধ তৈরিতে লাগে।

তাহলে তো ভালো কথা। কোন চিন্তা নেই বাদশা! আপনার পা দেখি।

শাহেনসা পা দেখালেন। পায়ের পাতা ফুলেছে।

হু। কি করা যায়?

পেচ্ছাপ হচ্ছে ঠিকমত?

চাপে। কিন্তু মনে থাকে না। তাই অনেক সময় পা ফুলে যায়—

ফ্যাশ হওয়া দরকার। হরি ডাক্তার কি ভেবে বললো, অ্যালকাসেল তো খেলেন এতদিন। এবার কিছুকাল একটা ইণ্ডিয়ান টোটকা করে দেখুন বাদশা।

বলুন।

আতপ চাল ধোয়া জল খেতে পারেন। বালতি বালতি পেচ্ছাপ হবে।

আতপ চাল? সেটা কি জিনিস?

হরি ডাক্তার বুঝিয়ে বলতে শাহ বললেন, না। ও জিনিস এখানে পাওয়া যাবে না।

তাহলে খেজুর গাছের জিরেন কাটের রস খান। সামান্য তাড়ি হওয়ার পর। পেটছাপ একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে। রুরাল ইণ্ডিয়ায় এ ওষুধ খুব চালু শাহেনসা।

খেজুর গাছ তো আমাদের মরুভূমিতে অনেক। এ জিনিস পাওয়া যাবে ডকটর। এখুনি টেলেকস মেসেজ পাঠিয়ে দেওয়া হবে। শাহেনসা বেল টিপে যোগাযোগ মন্ত্রীকে ডাকলেন। বাইরের ঘরে পুরো ক্যাবিনিটে ওয়েট করছিল।

যোগাযোগ মন্ত্রী ঘরে ঢুকতেই হরি ডাক্তারের ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখের সামনেই টেবিলের ওপর অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার। আজ থেকেই তাকে ইরাণ সরকারের খরচায় গেস্ট ইস্টার্ণে থাকতে হবে। সেখানে ইণ্ডিয়া থেকে সিলেক্ট করা অন্য সব ডাক্তার এসে জড়ো হবে। তারপর এরিয়ান এয়ার লাইন্সের ফ্লাইটে তেহেরাণ। মাত্র কয়েক জনস্ত্রীও আজ ছেলেদের নিয়ে হোটেলে এসে উঠবে। একদিন থেকে যাবে স্বামীর সঙ্গে।

হরির ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে পাশের ল্যাবরেটারিতে দুই কিশোরের ঘুম ভেঙে গেল। তারা তড়াক করে উঠে পড়েই টেবিল সাফ করে ফেললো। খুরিতে চা এনে দিল হরিকে। এরা রান্না জানে। ব্লাড এগজামিন করতে পারে। ব্লাড রিপোর্ট টাইপ করতে পারে। ইউরিনের সুগার বের করতে পারে। ব্লাড স্যাম্পেল টানতে জানে। বয়স ষোল সতেরো হবে। ইংরাজি বাংলা কিছুই জানে না। পড়তেও পারে না। গত ছ'সাত বছরে হরি ডাক্তার এদের তৈরি করেছে।

চা খাওয়ার পর হরিকে ওরা দুজন বললো। স্যার আমাদের কি হবে? আপনি তো চলে যাচ্ছেন।'

আমি তো আর চেম্বার ছাড়ছিনে। মাসে মাসে ভাড়া পাঠাবো। তোরা ইলেকট্রিক বিল দিবি।

টাকা পাবো কোত্থেকে?

কেন? যেমন ব্লাড ইউরিন করছিলি—তেমন করে যাবি। তাতেই তো টাকা পাবি।

আমরা তো ডাক্তার নই স্যার। তাছাড়া—

বলনা—আমরা তো রিপোর্ট সই করতে পারিনে।

কোন অসুবিধে নেই। প্যাড নিয়ে আয়। আমি এক হাজার সই করে দিয়ে যাচ্ছি। চেম্বারের নামে অনেক পেসেন্ট আসবে। তাদের বলবি—ডাক্তারবাবু এই-মাত্র বেরিয়ে গেলেন। যেদিনকার রিপোর্ট—সেদিনকার ডেট বসিয়ে নিবি। চিন্তা কিসের! দেখতে দেখতে দু' বছর কেটে যাবে।

প্যাড ফুরিয়ে গেলে?

চিঠি লিখবি। আমি আবার হাজার সই করে পাঠাবো।

আমরা তো চিঠি লিখতে জানিনে স্যার। আমাদের আপনি শুধু রিপোর্ট টাইপ করতে শিখিয়েছেন—

তাও তো কথা। বেশ। ঋষি কিংবা দিলীপের কাছে চলে যাবি। তারা লিখে দেবে। ব্যাস্! প্রোবলেম মিটে গেল। সব জলের মত হয়ে গেল।

এক হাজার সই করতে হরি ডাক্তারের প্রায় দশটা বেজেগেল। কলকাতায় এবার শীত পড়তে শুরু করেছে। দুর্গাপুজো তো দু' মাস হয়ে গেল। সামনের পুজোয় আমি বাজারঘানিতে। হরি পরিষ্কার টের পেল—বেলা দশটার মিঠে রোদের ভেতর একটু খোসা ছাড়ালেই আসল শীতকে খুঁজে পাওয়া যাবে। এখন কলকাতায় ক্যাথে-ড্রালের ছায়াঘেরা গাছতলায় শীতকে চেনা যাবে। ধরা যাবে। ছোঁয়া যাবে।

ঠিক এই সময়টায় দিলীপ যাচ্ছিল বেকবাগান দিয়ে। গাড়ির পেছনদিককার একখানা পার্টি ভেঙে গেল শব্দ করে। ড্রাইভার বললো, কাছেই মল্লিকবাজার। চলুন নিয়ে নেব।

তাহলে একটা পুরনো ভালো টায়ার নিয়ে নিও সস্তায়।

পেছনের শক-অ্যাবজরবারের দুটো লিংক্ নিয়ে নেবো তাহলে।

সব নেওয়ার পর দিলীপ টায়ারের দোকানে দাম দিচ্ছিল। এক বুড়ো খাতা নিয়ে এসে তার কাছাকাছি বসলো। টায়ার-ওয়ালা বললো, ওই দেখুন, মল্লিকবাবু ভাড়ার জন্য এসে গেছেন। আপনি আর দশটা টাকা বাড়িয়ে দিন। নয়তো আমার খুব নুকসান হয়ে যাবে—

কোন্ মল্লিক? ঘুরে তাকালো দিলীপ। ভাঙা গাল। পাকা চুল। এরই ভেতর ভালো করে শেভ্-করা চিবুক। টুইলের ফুলশার্ট।

টায়ারওয়ালা বললো, যাদের নামে বাজারবাবু। এখানে পাঁচশো ঘরের ভাড়া পান ও'রা।

ভদ্রলোক আপত্তি করলেন। বিনয়ের আপত্তি। না না স্যার। আমরা কিচ্ছু না।

এ-বাজার আপনাদের?

আমার ঠাকুর্দার বাবা এ-বাজার বসিয়েছিলেন।

তখন তো মোটরগাড়ি ছিল না।

হয়তো সবজির বাজার ছিল। হয়তো মাছ বসতো। আপনি কি রিপোর্টার স্যার?

না না। আমি এমনি লোক। টায়ার কিনতে এসেছি।

ওরে। ভালো দেখে টায়ার দে বাবুকে।

নেওয়া হয়ে গেছে।

মল্লিকবাবু জানতে চাইলো, আপনি এখানে মাঝে মাঝে আসেন বুঝি।

তা আসি। ঘুরে ঘুরে দেখি।

দিলীপের একথায় মল্লিকবাবু এক-রকমের হাসি হাসলো। যার মানে বের করা কঠিন। তারপর বললো, চাদ্দিকে স্টিয়ারিং, ইঞ্জিন, পিস্টন দেখছেন। এসব মুছে গিয়ে হয়তো এখানেই একশো বছর পরে অন্য জিনিসের বাজার বসবে।

একথা বলছেন কেন?

কেন বলছি! ধরুন মোটর আবি[illegible] হয়নি। আমরা ঘোড়ার গাড়িতেই চড়[illegible] তাহলে ঘোড়া সে-গাড়ির ইঞ্জিন। [illegible] কি বেল্লিকের মত মরা ঘোড়া আ[illegible] ঘোড়া কেটে—তার ঠ্যাং, দাবনা, শিরদা[illegible] লেজ, কেশর এমন কেটে কেটে আলাদা [illegible] ঝুলিয়ে রাখতে পারতাম। এটা একটা [illegible] হিউম্যান—অশ্লীল—অসভ্য কাণ্ড চল[illegible] এখানে খানিকক্ষণ থাকলে তো অ[illegible] শরীর খারাপ লাগে মশাই। কত অহংক[illegible] গাড়ির এখানে স্কন্ধকাটা ভূতের দ[illegible] দেখলেও কষ্ট হয়।

মল্লিকমশাইকে ভালো লাগ[illegible] দিলীপের। হেসে বললো, সবাই [illegible] আপনার মত করে ভাবে না। এখানে এ[illegible] কালের চালু গাড়ির যা অপমান।

মল্লিকমশাই বললো, চলুন পিস[illegible] পাড়ায়। বালিয়া জেলার মা বসে বসে র[illegible] চরিতমানস পড়ছে। ছেলে কেরোসিন [illegible] পুরনো ইঞ্জিনের হার্ট ধুয়েমুছে সাফ কর[illegible]

এ-জায়গাকে আপনি পুরনো গা[illegible] ভাগাড়ও বলতে পারবেন না। চোরাই ন[illegible] গাড়ির টায়ার, দরজা, ক্র্যাংক্স্যাফট [illegible] আসছে এ-বাজারে। এখান থেকেই [illegible] গাড়ির হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট হচ্ছে। [illegible] গাড়ির ইঞ্জিন এক লক্ষ কিলোমিটা[illegible] করার পর এখানে চলে এসেছে। [illegible] পিস্টনে, ভালভে কত রাস্তার স[illegible] জড়িয়ে আছে। কত বিকেল। কত স[illegible]

এদিনই সন্ধ্যেবেলা গোকুলদার খা[illegible] চারজন মানুষ চারটে চেয়ারে বসে এ[illegible] বিচিত্র পানীয় খাচ্ছিল। গরুর দ[illegible] গরম। এরকম পানীয় ওরা কোন[illegible] খায়নি। অন্তত কয়েক বছরের মধ্যে [illegible] কাছেই চেনে বাঁধা সারি [illegible] স্বাস্থ্যব[illegible] গরু-মোষের নিতম্ব দে[illegible] যাচ্ছিল।

দিলীপ অনেকবারই ঘুরে-ফিরে এ[illegible] জায়গায় পৌঁছতে চাচ্ছিল। আমা[illegible] খাদানের মূলধন এত। ব্যয় এত। [illegible] এত। ট্যাক্স এত। ইণ্টারেস্ট এত। তাহ[illegible] যোগ-বিয়োগ করে লাভ কত? কি[illegible] লোকসান হয়ে থাকলে তা কত?

গোকুল দত্ত এই সরল অংকটার ফ[illegible] ফল কত তা আদৌ বলতে পারলো [illegible] অনন্ত বললো, দিলীপ দা—এ-হিসে[illegible] তো তুমি এখুনি পাবে না। হিসেবপ[illegible] অডিট হবে। চার্টার্ড অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট [illegible] দেখবে। তারপর তো।

শীতের সন্ধ্যেবেলা গোকুল দ[illegible] গরুগুলো অমৃত খাচ্ছিল। ময়রার ময়[illegible] ভাজা অমৃত। গোকুলের বরাদ্দ ক[illegible] সেই সঙ্গে শুকনো দুধের একটা গ[illegible] বাতাসে। গোকুল দত্ত বললো, আর [illegible] গলায় গলায়। লাভ লোকসান এখ[illegible] বোঝার সময় হয়নি।

দিলীপ দেখলো, অনেক কিছুই জান[illegible] চাওয়া যায়। কিন্তু যেটাই চাইবে—সে[illegible] খানিক খানিক করে বিশ্বাসের পালেস্ত[illegible] তুলে দেবে। সে-কথা উচ্চারণের [illegible] কেউ কারও মুখে অকাতে পুরবে না।

আরো কষ্টের। কেন যে খাদান করতে ছিলাম। কোন দরকার ছিলো না দিব্যি আমরা বন্ধুরা ছিলাম। আমাদের এমন শক্তি নেই—যার এসব পার হয়েও আমরা বন্ধু পারি!

আমার খুব সুবিধে হোত—যদি সত্যি গোকুলদা একজন খারাপ লোক। ঋষি খারাপ। অনন্ত খারাপ। এরা যে কেউ খারাপ নয়। কোথাও কোথাও এদের ভেতর থেকে আমি ভাল-র সত্যে পাই।

আমি তো জানি—ঋষি আমায় ভালো-। কিন্তু কিছুতেই ও সাহস করে ইণ্ডিয়ার নিরাপদ, নিশ্চিন্ত ছায়া বেরিয়ে আসবে না। ও জানে—আমি কিছু করেছি, সবই ঝোঁকের মাথায়। ভাষায় আমি আসলে একজন পাগল। ভাষায়—ও কিছুতেই কোন ঝোঁকে চটাতে চায় না। চায় না—সবাই মিলে রোদ্দুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা জঙ্গল, নিজেদের একটা খুঁজে পাই—অনেক কষ্টের পর। আমরা দু'জনে দু'রকম করে ভাবি তো এই কষ্ট পাই। আমি যদি মত করে ভাবতাম—তাহলে তো কথাই দিলো না।

ঋষি বললো, তুই হিসেব দিয়ে কি? লাভ-লোকসানে তোর দরকার

যে-জন্যে খাটছি, তার নাড়ীনক্ষত্র না?

জেনে তোর লাভ? তোর যদি টাকার থাকে—যেমন কাজ দিচ্ছিস—কমিশন নিয়ে নে—

হয়তো তার চেয়ে বেশিই নিয়ে বসে। কিন্তু আমি কি খাদানের পলিসি কেউ নই?

গোকুল দত্ত বললো, নিশ্চয় তুমি পলিসি-মেকার। কিন্তু এত তাড়াহুড়ো তো পলিসি হয় না। সময় ঋষি তোর চেয়ে ঠাণ্ডা মাথা—তাই কথা শুনি।

দিলীপের মনে অনেক কথা আসছিলো। চেপে দিয়ে শুধু একটা কথাই লো, এসব আপনি বুঝবেন না।

তোকে তো বুঝি। তোর রাগ কেন—বুঝি। একটা কথা বলি দিলীপ—নো চাল ডাতে বাড়ে।

তাহলে গোকুলদা আমরা খাদান এসেছিলাম কেন? খাদান খাদান?

অনন্ত বললো, তুমি এত ইন-হোচ্ছো কেন? অনেকে তো অনেক করে। তার ভেতর কোনোটা হয়। কোনোটা হয় না। জীবন তো এরকম দীপদা—

তোর মত অনন্ত—আমার অনেক সেনসিটিভ নেই।

ঋষি বললো, এত সিরিয়াস হচ্ছিস দিলীপ। এমন সুন্দর শীতের সন্ধ্যে-বেলা। পরিতোষের গরুর দল লেজ দিয়ে মশা তাড়াচ্ছে আমাদের হাতে খাঁটি দুধের গ্লাস।

তার চেয়ে বল না—আমরা এখন এক নিরাপদে আছি—একটু পরে গায়ে শ্যাওলা জমতে শুরু করবে।

মানুষ কি সব সময় জেগে থাকতে পারে! সেটা আমাদের স্বভাব নয় দিলীপ। দীপর খবর কি রে? কোথায় আছে? কেমন আছে?

কিচ্ছু জানি না।

ছোট থাকতে আমার কোলে উঠেছে

তখন আমরা কত বয়সে সংসার করতাম।

আমি তো সংসার দেখি না দিলীপ—লাবণ্য যেমন চালায় তেমন চলি।

সুন্দর চালায় লাবণ্য।

চালিয়ে দায় একরকম। সেদিন দর্জিকে বলছিলো মিস্ত্রিমশাই। আরেকদিন মিস্ত্রিকে দর্জি।

দিলীপ এবার হেসে ফেললো। অনেকদিন আগে তোর বাড়িতে লাবণ্য আমায় একদিন তোয়ালে এগিয়ে দিয়ে চান করতে বলেছিলো। আসলে তোকে দেওয়ার কথা।

হাওয়া পাতলা হয়ে এসেছে দেখে অনন্ত বললো, আর নয়। অনেক সাংসারিক কথা হয়েছে। এবার বলো তো কোথায় যাওয়া যায় আজ সন্ধ্যেবেলা।

ঋষি গম্ভীর গলায় বললো, আমার একটা কথা শেষ হয়নি। মানে শুরুই করিনি। খাদান থেকে দেখলাম—বেআইনী ইণ্টারেস্টে টাকা খাটানো হচ্ছে।

অনন্ত বললো দিলীপদা মোটা সুদ আসবে বলে ইনভেস্ট করতে বলেছে।

জিনিসটা বেআইনী। আমরা কোথা ইণ্ডিয়ায় কাজ করিই তুমি আর আমি ন্যাশ-নালাইজড ব্যাংকে। জানাজানি হলে আমরা কোথায় দাঁড়াবো?

গোকুল দত্ত বললো, ইণ্টারেস্ট কতো দিচ্ছে?

দিলীপ বললো, থার্টি সিকস পারসেণ্ট।

জোচ্চোর কোম্পানী। তাহলে ক্যাপিটালই মেরে দেবে। থার্টি সিকস পারসেণ্ট সুদ হয় কখনো? তাহলে তো তিন বছরে দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

না গোকুলদা—ক্যাপিটাল মারতে পারবে না। রিজার্ভ ব্যাংকে রেজিস্টার্ড পার্টি। খোলাখুলি লোন সার্টিফিকেট দিয়েছে—স্ট্যাম্প কাগজে। এ্যাপারেন্টলি টুয়েলভ পারসেণ্ট ইণ্টারেস্ট দেবে ট্যাকস দেবে। বাকিটা—মানে চব্বিশ পারসেণ্ট দেবে লেখাপড়া ছাড়াই।

ঋষি বললো, যদি না দেয়।

সেইটে তো বিশ্বাসের ব্যাপার ঋষি।

এখানে বিশ্বাস অর্থাৎ—বেআইনী।

তা বলতে পারো। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আমরা কোত্থেকে এত রিটার্ন পাবো। ব্যাংক তো ওভি দিলে সেভেনটিন পারসেণ্ট ইণ্টারেস্ট নেবে।

গোকুল দত্ত বললো, ব্যাংকের চেয়ে সাড়ে তিনগুণ চারগুণ সুদ দেবে। এ যে রূপ-কথার মত শুনতে লাগছে। কোন্ ব্যবসায় টাকা খাটায় তারা।

বড় বড় ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীতে। লোন ফ্লোট করার পরেও অনেক টাকা লাগে। আচমকা দরকার হয় তাদের। তখন ওখান থেকে চড়া সুদে টাকা নেয়। তাড়াতাড়ি রিটার্ণ আসবে—এমন ব্যবসায় টাকা খাটায় ওরা।

তাহলে তো সবাই খাটাতো।

খাটছে তো। তিনশো কোটির ওপর। ব্ল্যাক মানি শাদা হয়ে যাচ্ছে—বারো পারসেণ্ট। বাকি চব্বিশ পারসেণ্টের হিসেব প্রতি মাসে বাড়ি পৌঁছে দেয় ওরা।

এটা তাহলে মাড়োয়াড়ীদের ব্ল্যাক মানির প্যারালাল ইকোনমি। ভৌমিক খাদান-এর ভেতর যাবে না।

কিন্তু ঋষি—আমি কতকাল শেয়ারের টোপ গেঁথে গেঁথে ক্যাপিটাল জোগাবো। আমি টায়ার্ড। আমার কিছু ভালো লাগছে না।

তুই রেস্ট নে।

তাহলে ও পথ ছাড়া কোত্থেকে ক্যাপিটাল আসবে?

তেমন হলে আসবে না।

খাদান চলবে কি করে?

দরকার হলে চলবে না। কিংবা যেমন চলছে—তেমন চলবে। একটু একটু করে।

এই জন্যে কি আমরা খাদান করে-ছিলাম?

প্যারালাল ইকোনমির ব্ল্যাক টাকায় খাদান করতে আসিনি আমরা।

ফেয়ার বিজনেস। বেশ। তুই কি ঋষি সর্বত্র সত্যবাদী? সাধু?

হয়তো নয়। কিন্তু যতটা পারা যায়—তাতে আপত্তি কিসের? কে আমাদের ডিজঅনেস্ট হবার মাথার দিব্যি দিয়েছে? খাদান ও টাকায় যাবে না। বারো পারসেণ্ট অব্দি ঠিক আছে। তারপর নয়। দরকার হলে লোন সার্টিফিকেট ভাঙিয়ে টাকা তুলে নিতে হবে।

তুই কিন্তু আমায় ইনভেস্ট করতে বাধা দিসনি।

কবে বললি আমাকে?

গোকুলদের বাড়িতে। সেদিন থিয়েটার ছিলো। সাপ বেরুলো কামিনী ফুলগাছের গোড়ায়।

আশ্চর্য। তখন কি বলতে কি বলেছি—মনে আছে আমার? তুই এমন টেনশনে ছিলিস কেন দিলীপ? এটা করতেই হবে। না হলেই নয়। যদি ফেল করি তাহলে মরে যাবো। এমন কিছু নয় খাদান আমাদের কাছে। সুস্থ শরীর—চাকরি করছিস। জলে তো পড়ে নেই আমরা।

আমি একটা কবন্ধ গলির মধ্যে পড়ে আছি।

ধৈর্য ধর।

সাধন গুপ্তও ওই কথাটা বলেছিলো আমায়। শুনতে খুব সুন্দর ! । অনেকটা বাণী বাণী লাগে।

সাধন গুপ্তকে অপমান করে তোর লাভ ?

সাধনদাকে আমি অপমান করিনি. কিন্তু কিছু বললে তোর লাগে কেন ? তুই কি সাধনদার চেয়ে আমার অনেক কাছাকাছি হতে পারছিস না ? সেটাই তো নরমাল হোত ঋষি।

যার যা ডিউ তাকে তা দিতে হয়।

সাধনদার কোয়ালিটি—কন্ট্রিবিউশন—কোন ইন্ডিয়ার কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু আজ একটা ঘটনা ঘটলো ঋষি।

কিরকম ?

সন্ধ্যে অনেকটা এগিয়ে গেছে। গোকুল দত্তর সিগারেট ধরিয়ে দিল অনন্ত।

তুই কোনদিন কোন কথায় সাধনদার নাম তুলিস না ঋষি। খুব সাবধানে ওনাম তাকে তুলে রাখিস। ভকতি সতর্কতা হুলসেন। কোনটা ঠিক জানি ন তোকে দিয়ে ও নামটা তাক থেকে পেরেছি।

অপমান করার ইচ্ছে থাকে কাউকেই যে কোনভাবে ইনসাল্ট ক

গোকুল দত্ত বাধা দিল। আ কি দিলীপ। তিনি আমাদের ওয়েল

তুমি থামো গোকুলদা।

অপমান করিনি। ওভাবে একটা নাম
আলোচনার বাইরে রাখা কেন ?
হয়তো এখন। অনেক কচকচি
সন্ধ্যেটাই মাটি করে দিচ্ছিলি।

কাছাকাছি সময়ে খাটালের সবুজ
চৌকো লন থেকে তিন মাইলের
ইস্টার্ণ হোটেলে প্রায় ঠাকুরমার
একটা সিন অভিনয় হচ্ছিল।
দু নম্বর সুইটে।

ওখানে ইরান সরকারের পয়সায়
থাকতে হবে হরি ডাকতারকে।
সে থাকতে এসেছে দুপুরবেলা।
জয়শ্রী এসে দেখা করে গেছে।
সঙ্গে নিয়ে। সন্ধ্যেবেলা হরির
জীবনের এক ক্লাসফ্রেণ্ড এসে
সঙ্গে একটি বছর দশের ছেলে।
গিয়ে হরি ডাকতারকে না পেয়ে
এই হোটেলে হানা।

প্রথম অংক।। হরি আছিস ? হরি ?
শৈলজা—
খোলা দরজা দিয়ে কেউ যে এভাবে
থাকতে ঢুকে পড়তে পারে হরি
ভাবতেই পারেনি। কোন শৈলজা ?

এইতো হরির গলা। বেশ লম্বা
হয়েছিস দেখছি। বড় বিপদে পড়ে
তোর সঙ্গে স্কুলে পড়তাম। আমি
বিশ্বাস। তোর শৈল—

হরি ডাকতার অনেক কষ্টে মনে
পারলো। বিশেষ করে শৈল কথাটা
ভেতর বিদ্যুৎ খেলে দিল।
কে মনে করে ?

এই শেষ বয়সের খোকাটি
খেয়ে ফেলেছে।

দ্বিতীয় অংক।। হুঁ। কিন্তু ভালোই
আছে ছোকরা। দেখি খোকা। কোন
তোমার।

বললো, আমি থাকি সাইটে—
নিয়ে। একদিনের জন্যে এসে-
কলকাতায়। এখানে এই বিপর্যয়।
তো ?
বাঁচবে। কিন্তু আমি যে তেহেরাণ
যাবো।

কেওলায় সব জেনেশুনেই এসেছি।
তার পাশের ঘরটা ভাড়া নিলাম।
ভাড়া নিয়েছো ? কখন নিলে ?
লিফটে ওঠার আগে। কদিন তুই
এখানে—জেনে নিলাম। সে
ভাড়া নিলাম।

ঠিক আছে। তোমার খোকাকে এখন
টিভ খাওয়াতে হবে। তারপর বাথ।
নজর রাখতে হবে।
অবাঙ্ক।।
আর একটু মদ খাই হরি।

তোমার খোকার জোহর খেয়েছিনি
।

কেন যে ওর মাকে এক ডজন মোহর
দিতে গেলাম। আমারই ভুল হরি। তার
থেকে একটা সরিয়ে মজা করে মুখে
রেখেছিল। সেটা শিলপ করে একদম সিধে
পেটে। এখন সব কাজ ফেলে কলকাতায়
বসে থাকতে হচ্ছে।

কিসের ঠিকেদারি করো।
ব্রিজ বানাই। খাল কাটি। রিজার-
ভয়ার করছি।
যেমন ?

সেকেণ্ড হাওড়া ব্রিজে করছি। গ্যামন
ইণ্ডিয়া পাইলিং করবে। নতুন কায়দায়
পাইলিং।
বেয়ারা সাজিয়ে দিয়ে গেল।
ওকি শৈল—ওভাবে খাচ্ছো কেন ?
সোডা বা জল মেশাও।
কোনদিন মেশাইনি রে হরি।
নেশা হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি।
নারে হরি। আমি এক বোতলের
বেশি খাইনে। ছোট এক বোতল।

চলো চলো। বাথরুমটা দেখে আসি
একবার।
দুজনেই পানে তাকালো। হরি
বললো, নাঃ। কোন চিহ্ন নেই। হজম
করে ফেলেনি তো।
করলে কোন ভয় আছে ?
নাঃ। কোন খাল কেটেছো ?
কেন ? ডি ভি সি ক্যানাল। সবটা
তো কাটালো না গভর্মেন্ট। তাছাড়া
খড়িয়ার খাল। ওদিকে ময়ূরাক্ষীর ক্যানাল।
একটা পেমেন্ট পাবো এ মাসে। সাতচল্লিশ
লাখ টাকা। সাইটেও অনেক টাকা দিতে
হবে।
সাতচল্লিশ লাখ ? এত টাকা দিয়ে
কি করো শৈল ?
সবটাই প্রফিট নয়।
এতটা কি করো শৈল ?

খরচ আছে না। পুরুলিয়ায়—
বড়লোকপুরে পাহাড়ের মাথায় একটা শাদা
রঙের বাড়ি করেছি। সেখানে তিনশো আম
গাছ। ঝরণার জলে চাষ হয়। আট জোড়া
বলদ। লোকজন। তাছাড়া কলকাতায়
বাড়ির খরচ। বড়ছেলে বি-কম পড়ে।
তাও তো তোমার টাকা ফুরোবে না।
তা ফুরোবে না হরি। চল বাথরুমটা
দেখে আসি। এই মাত্র খোকা ঘুরে এলো।
চলো। চলো।

দুজনেই হতাশ হয়ে ফিরে এলো
টেবিলে।
মনে আছে শৈল—টাকার অভাবে
তুমি ম্যাট্রিকুলেশন দিতে পারলে না।
তোমার মা তখন বাড়ি বাড়ি সেলাই
করতেন। মাসিমা এখন কোথায় ?
দাদার ওখানে। দোবেলা দুজন নার্স।
কেন ? কি হোল ?

ছাদে লেপ গরম করতে গেলেও
গিয়েছিল। লেপ নিয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ে।
লেপ থাকাতেই বেঁচে গেছে অবশ্য।

এখন কোন সাইটে কাজ হচ্ছে
তোমার ?
নরঘাটে ব্রিজ বানাচ্ছি। চল চল।
খোকা বাথরুম থেকে এলো আবার।

দুজনে সেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে
লাগলো। যেমন: হজম করে ফেলেছে ?
কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তো হজম হয় না।
তাহলে কি বেরিয়ে গেছে ? হয়তো আমরা
তখন টেবিলে বসেছিলাম। তাহলে তো
জানার উপায় নেই কোন। আচ্ছা আরেক
ডোজ পারগেটিভ দিলে কেমন হয় ? না
না—আর নয়। থাক না একটা মোহর
পেটের ভেতরে। অবিশ্যি বড় হয়ে কোনদিন
যদি ব্যথা ওঠে পেটে—তাহলে ডাকতার তো
ধরতেই পারবে না। আজ থেকে বিশ
বছর বাদে সবাই যদি ভুলে যাই মোহরের
কথা। তখন অসম্ভব কষ্ট পাবে ছেলেটা।

ঠিক এরকম একটা সময়ে স্বাতী তার
ফ্ল্যাটে বসে নন্দনকে এলোপাথাড়ি চড়
মারছিলো। কতদিন বলেছি—ওই লোকটা
ডাকলে কখনো ওর সঙ্গে যাবে না।
নন্দন কাঁদতে কাঁদতে বললো, ও
তো আমার বাবা হয়। ডাকলে কি করবো ?

তোমার স্কুলের ভেতরে চলে যাওয়া
উচিত ছিল।
তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম মা—
আমাদের এবাড়ির কথা বলোনি তো ?

বলবো কি করে ? আমি কি রাস্তার
নাম জানি ? নম্বর জানি ?
জানতে চেয়েছিলো ?

হ্যাঁ আমি গুছিয়ে বলতে পারিনি।
শুধু বলেছি—দেশপ্রিয় পার্কের পাশে।
তা বলতে গেলে কেন ? বোকা
ছেলে! কতদিন না বারণ করেছি তোমাকে।
চলো খেতে বসবে।

খিদে নেই। বাবা খাইয়েছে অনেক।
কাকে বাবা বলছো ? ও লোকটাকে ?
ও তোমার বাবা নয়।
তাহলে কে আমার বাবা ?

বেশি কথা বোলো না। খেতে
বোসো।
খিদে নেই একদম। মাংস খেয়েছি।
আইসক্রিম। তোমার কথা জানতে চাই-
ছিলো বাবা।
কি জানতে চাইছিলো ?

তুমি চাকরি করো কিনা ? আমাদের
বাজার করে কে ?
তুমি বলেছো ?

না। আমি অত বোকা। কিন্তু
বলিনি। দিদিমার ওখানে আমায় রেখে
যাবার সময় মাথায় চুমু খেলো বাবা।

বাবা বাবা করছো কেন ও লোকটাকে।
তাহলে আমার বাবা কে ?
স্বাতী কোন কথা না বলে ফিরে
একটা চড় কষালো নন্দনকে।

(চলবে)

যারা তাসের জুয়ার রস পায় না, তারা চলে যায় পার্ক স্ট্রীট চৌরঙ্গীর পানশালায়। ফ্রি-স্কুল স্ট্রীটের গণিকা পল্লীতেও যাতায়াত আছে কারও কারও। মোট কথা কলকাতার সুসভ্য উচ্চবিত্ত নাগরিক রাত নটার মধ্যে বাড়ি ফিরে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ার কথা ভাবে শরীর খুব খারাপ হলে। সুস্থ অবস্থায় এ কথা ভাবলে নিজের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কেই সন্দেহ জাগবে তার।

এখুনি শুলে ঘুম হবে? সসংকোচে প্রশ্ন করল অনন্ত।

দীপু বলল, ঘুম না হলেও রেস্ট হবে। রাত চারটের উঠে বাসের টিকেটের জন্যে লাইন দিতে হবে। পৌনে পাঁচটার ফার্স্ট বাসে যাব।

জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করে ঘরে তালা বন্ধ করে রাখা হল। একটা রুকস্যাক খুলে গোটা কয়েক কম্বল শুধু বার করে নিয়েছিল। বারান্দা ঝাঁট দিয়ে সেখানে পেতে ফেলল কম্বলগুলো। তার ওপরে ফোলান বালিশ সারি সারি পাতা। অনন্তর জন্যে একটা কম্বল ভাঁজ করে পেতে দিল দড়ির চারপায়াটায়। দীপু বলল, আপনি তো সকালে চারপায়ায় বসেছিলেন। ছারপোকা কামড়ায় নি তো? তাহলে আপনি এখানে শুয়ে পড়ুন। মাটিতে শোওয়ার অভ্যেস নেই—

গোপু বলল, তারপর রাত্রিরে যদি কামড়ায়, নেমে শুয়ে পড়বেন এক পাশে।

শুয়ে শুয়ে গুন গুন করে কথাবার্তা কইছিল কানু আর দীপু। কোথায় কিভাবে প্রোগ্রাম মত যাওয়া এবং অন্যান্য ব্যবস্থা হবে, তাই নিয়ে লীডার আর ম্যানেজার আলোচনা করছিল। দুজনেই যথেষ্ট জ্ঞানবুদ্ধি ধরে। সুতরাং নাসৌমুণির্যস্য মতং ন ভিন্নং। পানু বিরক্ত হয়ে বলল, কি মাঝ রাত্তিরে ক্যাচ ক্যাচ করছিস বলত? ঘুমটা আসছে আর চলে যাচ্ছে তোদের বকবকানিতে।

কানু বলল, ঠিক বলেছিস। রাত তিনটেয় উঠতে হবে আমাকে। লীডার সায়েবকে বেড-টি খাওয়াতে হবে।

দীপু বলল, ঠিক আছে, বয়েজ, গেট রেডি ফর স্লিপ।

প্রথমটা ঘুম আসতে অসুবিধে হচ্ছিল। দড়ির খাটিয়ায় শোওয়া খুব বিপজ্জনক ব্যাপার। মাঝখানটা নিচু হয়ে যায়। পাশ ফিরতে অসুবিধে। যদিও কম্বল পাতা আছে তলায়, তবু পিঠে শক্ত দড়ির বাঁধন ফুটতে থাকে। তারপর এক সময়ে ঘুমের অতলে তলিয়ে গেল অনন্ত।

ঘুম ভাঙ্গতে বাতির আলোয় মানুষজনকে নড়াচড়া করতে দেখে কেমন যেন ধাঁধা লেগে গেল তার। কোথায় রয়েছে সে ঠাহর করতেই লেগে গেল দু-একটা মিনিট। শরীরটা হাল্কা লাগছে। দড়ির খাটিয়ায় শোওয়ার জন্যে ব্যথা হয়েছে গায়ে। কিন্তু সব মিলিয়ে এ এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। এমন একটা ভাঙ্গাচোরা ধর্মশালার বারান্দায় চতুর্দিকে পুরনো গন্ধময় পরিবেশে দড়ির একটা চারপায়ায় শুয়ে এমন গভীর ঘুমে রাত কাটিন যেতে পারে, এ কি স্বপ্নেও ভেবেছে কখনো? কটা রাত আজ পর্যন্ত কাটল বাড়ির বাইরে? দুটো রাত ট্রেনে, আর এই তৃতীয় রাত কাটল হৃষিকেশের ধর্মশালায়। আগেকার দিনে যারা সংসার ত্যাগ করে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়ত, তারা কি এমনিভাবেই পরম মুক্তি আর ভূমার আস্বাদ পেত?

দীপু ব্যস্ত ছিল কাজে। বলল, রায়দা, আপনি উঠে পড়ুন। ফ্লাস্কে আপনার চা আছে। খেয়ে নিন। প্রাতঃকৃত্য সেরে আসুন। জামাটামা পড়ে নিন। আপনার স্লিপওভারটা বাইরে রাখবেন। বাসে দরকার হবে।

দেখে-শুনে বুঝে নিয়েছে অনন্ত, ফালতু কথা বলে না এরা অপ্রয়োজনে। ওদের নির্দেশ যত দূর সম্ভব অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই যুক্তিযুক্ত। অনেক ঝামেলা পোহাতে হবে ওদের। কাজেই নিজে তৈরী হয়ে নিয়ে ওদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারলেই যথেষ্ট হবে।

ভোর হবার অনেক আগেই চা খেয়ে, জিনিসপত্র বেঁধেছেঁদে বাইরে এনে তৈরী হয়ে নিল সবাই। পানু আর গোপু আগেই চা খেয়ে চলে গেছে টর্চ নিয়ে, বাসের টিকেট কাটার লাইনে দাঁড়াতে। বেশ লাগছে অনন্তর। সব মিলিয়ে কেমন একটা অজানা প্রত্যাশা। কলকাতায় প্রতিদিন সকাল থেকে রাত বাঁধানিয়মে চাকা ঘু[illegible] থাকে, কিসের পরে কি, জানা হয়ে গে[illegible] নিয়মের ব্যতিক্রম নেই বললেই [illegible] অভ্যস্ত দিনযাপন। কিন্তু এখানে [illegible] মুহূর্তে এক রকম আবার পরের ঘন্টা[illegible] আর একটা বিস্ময়। মগজের যে জায়[illegible] স্মৃতি, সেখানে নাকি অনেক খোপ [illegible] মত জায়গা আছে। প্রতি মুহূর্তে [illegible] নতুন সম্ভাবনা, এত বিচিত্র অভি[illegible] তুলে রাখার মত জায়গা আছে কি স্মৃ[illegible] কোষে কোষে!

দ্রুত এসে খবর দিল পানু। [illegible] কাটা হয়ে গেছে। গাড়ির নম্বর [illegible] গ্যারেজের কোণে আরও অনেকগুলি [illegible] মাঝখান থেকে তাকে আবিষ্কার [illegible] গোপুকে বাসের ভেতরে বসিয়ে [illegible] ছুটে এসেছে পানু। এবারে জিনি[illegible] স্ট্যাণ্ডে নিয়ে যেতে হবে।

শুরু হয়ে গেল ব্যস্ততা। নিজের সুটকেস, রায়ের এ্যাটাচি আর একটা যেন ছোট সাইড ব্যাগ হাতে তুলে [illegible] অনন্ত দীপুর নির্দেশে। কানু এ[illegible] মালের জিম্মায় রইল। পানু, আশু, [illegible] আর অনন্ত হাতে পিঠে মালপত্র [illegible] অন্ধকারে ফার্লংটাক দূরে বাস স্ট্যা[illegible] দিকে এগিয়ে চলল।

যদিও সাড়ে চারটে বাজে প্রায়, মনে হয় এখনো গভীর রাতে ঘুমে অ[illegible] হয়ে আছে চতুর্দিক। উঁচু উঁচু [illegible] কাঠের পায়ার ওপরে দেশলাই খোলের [illegible] খুপরি খুপরি দোকান। এখন ঝাঁপ [illegible] রাস্তার একটা কুকুর কুণ্ডলী পা[illegible] ঘুমোচ্ছে তার নিচে। কর্তব্যপরায়ণ বাসের কর্মচারী শুধু রাতচরা পাখির [illegible] কিচমিচ করছে টিকেট কাউন্টারের [illegible] সেখানে ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে। দীপ্তি এসে পড়েছে বাঁধান স্ট্যাণ্ডে। [illegible] সুঝে একটা জায়গায় মালপত্র নামিয়ে [illegible] অনন্তকে পাহারায় রেখে চলে গেল [illegible] ধর্মশালায়। চারদিকে এখানে সেখানে [illegible] দাঁড়িয়ে আছে। এই সব বাসগুলো [illegible] কোথায় যাবে, অনন্তর পক্ষে তা অন[illegible] করা সম্ভব নয়। এরই কোন একটা [illegible] গোপু বলে ছেলেটি বসে আছে একা-এ[illegible] অনন্তর চেয়েও তার অবস্থাটা প্রা[illegible]

অসুবিধাজনক। কিন্তু কর্তব্যবোধ আর দায়িত্ব তাকে এই ভুতুড়ে পরিবেশে বাধ্য করেছে স্বেচ্ছানির্বাসনে। জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, যেন স্যালভেজ ডিপোয় পরিত্যক্ত আবর্জনার মধ্যে আত্মগোপন করে আছে অপরাধীর মত।

সমস্ত মালপত্র আনতে বেশ কয়েকবার যাতায়াত করতে হল তিনটি ছেলেকে। প্রথম দুবার কানু ধর্মশালায় মালের পাহারায় ছিল। তারপর কানুর বদলে পানু রইল ধর্মশালায়। কানু মালপত্র বইতে থাকল। অনন্ত বলল, এবারে আমি একটু রিলিফ দিই আপনাদের কাউকে।

দীপু বলল, কেন, আপনার দাঁড়িয়ে থাকতে অসুবিধে হচ্ছে নাকি? ভয় পাচ্ছেন একা একা?

ভয় পাবার কথা নয়। বিরক্তি চেপে সহজ হতে চাইল অনন্ত। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি আর আপনারা খাটছেন, আমার কাছে তো ভাল দেখায় না।

এই কথা? আশু গম্ভীর হয়ে বলল, আপনি আমাদের থেকে কম ঝামেলা পোয়াচ্ছেন না। একা একা দাঁড়িয়ে এই অন্ধকারের মধ্যে—

কানু যোগ দিল, গোপু তো কোথায় কোন বাসের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে আছে। আমরা তবু এক সঙ্গে রয়েছি এতজন।

দীপু বলল, আর বার দুই টানাটানি করলেই হয়ে যাবে।

কানু বলল, ঠিক আছে, বাকী রয়েছে রুকস্যাকগুলো আর বড় কিট। আর বোধহয় একটা হোলডল। দীপু তুই থাক এখানে। আমরা দুজনেই নিয়ে আসছি।

অনন্ত বলল, তা হবে না। দীপুবাবু এবারে একটু থাকুন এখানে। আমি যাই আপনাদের সঙ্গে। সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন, আমার খারাপ লাগছে।

আশু বলল, তাহলে আপনি আসুন।

দীপু আর আপত্তি না করে সিগারেট ধরাল।

প্রায় আধ ঘন্টা পরে নানা রকম কসরৎ করে একখানা বাস গোঁ গোঁ করতে করতে বাইরে এল। গোপু ভেতর থেকে জানান দিল, আমি তোমাদের জায়গা রেখেছি।

আরও কিছু কিছু লোক টিকেট কাউন্টারে এসে গিয়েছিল। ঘুম জড়ান চোখে একজন কণ্ডাক্টার অথবা হেল্পার ক্লান্ত বাসের পেছনে লাগান লোহার সিঁড়ি বয়ে ওপরে উঠে গেল। পানু আর দীপু তার সঙ্গে সঙ্গে ওপরে উঠে তেরপল নাড়াচাড়া করে নিচে থেকে মালপত্র ওঠাতে নির্দেশ দিল। হাতে হাতে রাশি প্রমাণ মালপত্র ওঠানো হল ছাদে। সাজিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখা হল তেরপলের নিচে। তারপর ভেতরে গিয়ে বসল সকলে।

অদ্ভুত ধরনের বাস, দেখে অবাক হল অনন্ত। ড্রাইভারের পেছনে এক সারি সিট। ছজনের বসার মত ব্যবস্থা। তার সঙ্গে বাসের বাকী অংশের কোন যোগ নেই। পিতলের গরাদ দিয়ে পার্টিশান করা। প্রথম শ্রেণীর সেই খাঁচায় ঢোকার পথও স্বতন্ত্র, সামনে দিয়ে ঢুকতে হয়। বাকী অংশ দ্বিতীয় শ্রেণী। ঢুকতে হয় পেছনের দরজা দিয়ে। লম্বালম্বি পিছন থেকে পার্টিশান পর্যন্ত জানলার ধারে দু পাশে এবং মাঝখানে একটি, এই তিনটি নারকেল ছোবড়া মোড়া চামড়ার সিটে তিন দশে ত্রিশ জনের বসার জায়গা। একটি স্পেয়ার টায়ার টিউব রীম সমেত রাখা আছে দুটো লম্বা সিটের মাঝামাঝি। তাতে যাত্রীদের পা রাখার কাজ চলে। পরে দেখা গেল, গাড়ির কণ্ডাকটার বসে তার ওপরে।

পৌনে পাঁচটায় বাস ছাড়বার কথা। ছাড়ল মিনিট পাঁচেক পরে। যাত্রীর সংখ্যা তখন জনা কুড়ির কাছাকাছি। ফার্স্ট ক্লাসের ভাড়া টাকা পাঁচেক বেশী। তাই নীচের ক্লাসের টিকিট কেটেছে ওরা। খুঁত খুঁত করছিল অনন্তর মন। ওরা ছাড়া বাকী যে কজন যাত্রী উঠেছে সেকেণ্ড ক্লাসে, তাদের চেহারা বা জামা-কাপড় কোনটাই ভদ্রজনোচিত নয়। উঠেই কটু গন্ধ বিড়ি ধরিয়েছে মস্ত পাগড়ি মাথায় দেওয়া এক বুড়ো। কাঁসছে খকখক করে। শব্দ করে শ্লেষ্মা তুলে জানলা দিয়ে ফেলতে গেল। তার কিছুটা অংশ জানলার রেলিংয়ে লেগে ঝুলতে থাকল। ভয়ানক অস্বস্তি হচ্ছিল অনন্তর। ছজনের মধ্যে ত্রিশ টাকা বেশী লাগত ঠিকই। জানা থাকলে অনায়াসে সেই বাড়তি টাকাটা দিতে পারত সে। অবশ্য একটা অসুবিধে ছিল। এই ছেলেগুলি যে টাইপের তাতে বাড়তি টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দিলে অফেন্স নিতে পারত হয়ত।

ফার্স্ট ক্লাস খালিই ছিল এতক্ষণ। বাস ছাড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে একটি পাঞ্জাবী পরিবার এসে উঠল সেখানে। স্বামী-স্ত্রী, একটি তরুণী মেয়ে আর কিশোর বয়সের একটি ছেলে। ফার্স্ট ক্লাসের গা ঘেঁষে সামনা সামনি দুটো বেঞ্চে বসেছিল তিনজন তিনজন করে। দীপু বসেছিল ধারের সিটের প্রথমে। তরুণী মেয়েটির চুলের বেণীর প্রান্ত পিতলের রেলিং গলে তার গায়ে এসে লাগছিল। হাসাহাসি করছিল পানু আর গোপু। নির্বিকার হবার ভান করেও ব্যাপারটা পুরো মজায় উপভোগ করছিল দীপু। ওদের ছেলেমানুষী দেখে সামান্য সংকোচে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েছিল অনন্ত। সে বসেছে মাঝের সিটে। মেয়েটির প্রোফাইল আর দীপুর মুখের সম্পূর্ণ অংশ তার চোখের সামনে।

ঘুমন্ত শহরের মাঝখান দিয়ে চলতে থাকল বাস। বাজার দোকানের দু-একজন লোক সবে উঠে নড়াচড়া শুরু করেছে। পুব আকাশ ক্রমশ ফিকে হচ্ছে। মৃদু ঠাণ্ডা বাতাস আসছিল জানলা দিয়ে। শহর ছাড়িয়ে আধো অন্ধকারের মধ্যে চলতে চলতে হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি। শোনা গেল, জায়গাটার নাম মুনি কি রেতি। এখানে স্বাস্থ্য বিভাগের লোকেরা যাত্রীদের পরীক্ষা করবে কলেরার টিকে নেওয়া হয়েছে কিনা। যাদের সার্টিফিকেট নেই, তাদের ওরা টিকে দিয়ে দেবে।

এ আবার কি ঝামেলায় পড়া গেল ? চুপি চুপি গোপুকে জিজ্ঞাসা করল অনন্ত, আপনাদের সকলের টিকে নেওয়া আছে ?

হেসে গোপু বলল, আমার কানুর আর পান্নালালের নেওয়া আছে। দীপু আর আশু মফঃস্বলে চাকরি করে, ওরা টিকে নিয়ে আসতে পারে নি।

দীপুকে জিজ্ঞাসা করল অনন্ত, আপনারা টিকে নেবেন নাকি ?

উপায় নেই রায়দা। সার্টিফিকেট সঙ্গে না থাকলে অনেক জায়গায় এই রকম অসুবিধেয় পড়তে হয়। ইউ-পি গভর্নমেন্ট এ ব্যাপারে খুব কড়া।

ইঙ্গিত করে অনন্ত বলে, কিছু দিয়ে ম্যানেজ করা যায় না ?

হয়ত যায়। কিন্তু কি দরকার ঝামেলার মধ্যে গিয়ে। শেষকালে চটেমটে বাস থেকে নামিয়ে দিলে গোলমালে পড়তে হব। চলুন নিয়ে নেওয়া যাক।

কয়েকজন দেহাতী যাত্রী ছাড়া প্রায় সকলেরই টিকে দেওয়ার সার্টিফিকেট আছে বলে মনে হল। সেসব পরীক্ষা করে বাকি যাত্রীদের জন্যে মোটা সূচওয়ালা সিরিঞ্জ উঁচিয়ে ছিল টিকাদার। এরকম পরিস্থিতিতে পড়তে হবে ভাবেনি কখনো অনন্ত। ওইসব দেহাতী লোকগুলোকে ইনজেকশন দেবার আগে আগ্‌বাড়িয়ে গেল সে সামনে। অন্ততঃ কিছুটা সান্ত্বনা পাওয়া যাবে, ওদের গায়ে ফোটানো সূচটা তার গায়ে ফোটানো হচ্ছে না।

টিকে নিতে নিতেই সকাল হয়ে গেল। চারিদিকে তাকিয়ে খুব একটা নয়ন সুখকর দৃশ্য চোখে পড়ল না। প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে পিচঢালা সরু বাসের রাস্তা দু'ধারে এখানে সেখানে কাঁটা গাছের ঝোপ মাঝে মাঝে বড় বড় পাথর পড়ে আছে ইতস্ততঃ। দু-একটি ঝোপঝাড় আর চারিপাশে কাঁটার বেড়া দিয়ে ঘেরা ক্ষেতে শসা অথবা ঝিঙের মাচা। চতুর্দিকে নোংরা ধুলোয় সমাকীর্ণ।

প্রায় মিনিট চল্লিশেক পরে বাস ছাড়ল। দূরের পাকুড় গাছটার ডগায় তখন প্রথম রোদের আভা পড়েছে। উঁচু নিচু পথ পেরিয়ে ক্রমশঃ পাহাড়ের কোল ঘেঁষে চলতে থাকল বাস। একদিকে গঙ্গার বিস্তৃতি অন্যদিকে পাহাড় কেটে পথ চলেছে এঁকে-বেঁকে। গোঁ গোঁ করছিল বাস চড়াই ঠেলে উঠতে। হঠাৎ পানু বলে উঠল, দেখুন, দেখুন রায়দা ল-অ-অ অছ্‌মনঝুলো।

মাঝের সিট থেকে বাঁয়ে মুখ বাড়ালো অনন্ত। অনেকখানি উঠে এসেছে বাস। নিচে গঙ্গার স্রোতের ধারা সংকীর্ণ বলে মনে হয়। তার মাঝখানে কখনো গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে, কখনো পাহাড়ের আড়ালে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ঝুলন্ত লছমনঝোলা গঙ্গার দুই তীর সংযুক্ত করে রেখেছে। বড় বড় বাড়ি উঠেছে ওই পারে। বেতো নাগের লক্ষ্মণ দূরে থাক, একশ বছর আগে যাত্রীরা যে প্রাণ হাতে করে গঙ্গা পার হয়ে সেই দীর্ঘ কেদার-বদরী তীর্থের পথে, এখন এই আধুনিক পরিবেশ দেখে সেকথা কল্পনা করা খুব কষ্টকর।

ক্রমশঃ গঙ্গাকে ছাড়িয়ে গোঁ গোঁ করে উঠছিল বাস পাহাড়কে বেষ্টন করে। অনন্তর মনে হল, সত্যিই চলেছে এবার মেঘের রাজ্যে, হিমালয়ে। বাসের গর্জন পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ঝনঝন শব্দে একটানা সুর তুলেছে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে বাসের ভেতরের আবহাওয়া। জল চুঁইয়ে পড়ছে পাহাড়ের গা বেয়ে। ফুল [illegible] আছে পাথরের গায়ে অযত্নে বেড়ে ওঠা গুল্মে। কেমন একটা আশঙ্কা জাগছে বুকে, যখন একটা বাঁক পেরিয়ে আর একটা চুলের কাঁটার মত বাঁকের পথে বাস এগিয়ে যাবার সময়ে সামনেটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে এবারে বুঝি মুখ থুবড়ে পড়বে বাস অনেক নিচে।

একটানা চলতে চলতে হঠাৎ খট্ করে তালা ধরে গেল কানে। কেমন অস্বস্তি হতে থাকল অনন্তর। কানে আঙুল দিয়ে নাড়া-নাড়ি করছে দেখে আশু বলল, কানে তালা ধরে গেছে তো ? হবেই। অনেক ওপরে উঠে এসেছেন। এখানে বোধ হয় পাঁচ হাজার ফুট ওপর দিয়ে পাহাড়কে ক্রশ করছে বাস। ওপরে হঠাৎ উঠে এলে এয়ার প্রেসার কম হওয়ার জন্যেই কানে তালা ধরে যায়।

ব্যাপারটা অনন্তর অজানা নয়। দার্জিলিং যাবার পথেও এরকম হয়েছিল বলে যেন মনে পড়ছে। তবু নতুন করে অভিজ্ঞতা হল। কাঁধে ফেলে রাখা পুলওভারটা গায়ে পরে নিল। একটু টাইট হচ্ছে। রায়ের বুকটা তাহলে কণাদের থেকে সরু। মনে মনে একটুখানি আত্মপ্রসাদ অনুভব করল অনন্ত।

(চলবে)

যাঁদের দেখেছি
অনন্ত সিং

‘কেউ বলে ডাকাত, কেউ বলে বিপ্লবী’

রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকেও তার ভগ্নিপতির বাড়ী থেকে দারুণ পোড়া অবস্থায় আমি গাড়ী করে নিয়ে চলে গেছি। তাদের প্রত্যেকের জ্বলন্ত দেহের বিভৎস চেহারা আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগলো। আর সেই সঙ্গে আমার কল্পনার চোখে আমার এই তরুণ দুই সাথী তপন ও বৃন্দাবনকে বিস্ফোরণে দারুণ দগ্ধ অবস্থায় দেখতে পাচ্ছিলাম। পুড়ে যাওয়ায় যে কি যন্ত্রণা সেটা আমার নিজের চোখে দেখা। কাজেই তাদের পোড়া যে কতখানি যন্ত্রণাদায়ক ছিল, তা কেবল অনুভব করা যায় নিজের অন্তর দিয়ে। আমি দেখেছি বৃন্দাবন এক স্ট্রাইকের দিন গাড়ী নিয়ে বিশেষ কাজে বেরিয়েছিল। কিন্তু তার গাড়ী রাস্তায় দেখে স্বেচ্ছাসেবকরা মনে করলো গাড়ীটা স্ট্রাইকের বিপক্ষ পার্টির। আর যায় কোথায়! রাস্তা থেকে একটা ইঁট তুলে নিয়ে বৃন্দাবনকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লো। ইঁট গিয়ে পড়লো বৃন্দাবনের মাথার ডান দিকে, চোয়ালে, চিবুকে। একটুখানি মাথা ঘুরে পড়েছিল। তবু সামলে নেয়। অসহ্য যন্ত্রণা। কোন ভ্রূক্ষেপ না করে সে কোন মতে হেড-কোয়ার্টারে ফিরে আসে। বৃন্দাবন ব্যথায় কাতর হওয়ার ছেলে নয়। এই বৃন্দাবনকে লালবাজারে বরফের উপরে শুইয়ে রেখেছিল। তাও সে সহ্য করেছে। কিন্তু আজ এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ তাকে অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে বাধ্য করলো।

তপনকে আমি দেখেছি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিস্ফোরক পদার্থ তৈরী করছে। সে জানতোও না, সে নিজেই বিস্ফোরণে একদিন প্রাণ দেবে।

ভাই তপন, ভাই বৃন্দাবন, তোমরা আজ যেখানেই থাক না কেন তোমাদের কথা আর কেউ বলুক, আর নাই বলুক, আমি বলছি তোমরা মৃত্যুকে জয় করেছ। তোমরা তরুণ বিপ্লবীদের মনে চিরজীবি হয়ে থাকবে। তোমাদের মৃত্যু নেই। ধ্বংস নেই। তোমাদের বিপ্লবী দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল হয়ে তরুণদের চিরকাল বিরাজ করবে। আকাশে তোমাদের জয়গান শোনা যাচ্ছে। বৃন্দাবন—আমাদের স্মৃতিতে হারিয়ে যাও নি, হারাবে না—

জীবনে যত পূজা হল না সারা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধ
যে নদী মরু পথে হারালো ধা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা

(৬)

ডিনামাইট ভীষণ বিস্ফোরক এই বিস্ফোরকের রাসায়নিক চরিত্র বিশেষ অবগতি না থাকলেও সাধা মোটামুটি বোধহয় সবাই জানে যে যুদ্ধে ব্যবহৃত হয় প্রধানতঃ সেত লাইন, এয়ারোড্রোম প্রভৃতি বিধ্বংস কাজে। ধ্বংস কাজ চালাবার জন্য শিক্ষিত স্কোয়াড প্রতি সৈন্যের অস

তে থাকে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে দূরে ডিনামাইট বিস্ফোরণ করা যায়: অবস্থা ও বিশেষ প্রয়োজনে রণের প্ল্যান করতে হয়। গেরিলা বিভিন্ন কারণে ও বিভিন্ন কৌশলের বিপক্ষের অজান্তে ডিনামাইট ব্যবহার রীতি আছে। সবলের বিরুদ্ধে শক্তির গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ নৈতিক অধিকার তো আছেই। চট্টগ্রাম প্রান্তে জালালাবাদ পর্বত যুদ্ধে জের সাময়িক পরাজয় হওয়ার পর রদা তাঁর রণনীতি পরিবর্তন লেন।

শত্রু পুনরায় প্রবলতর শক্তি নিয়ে লা শিবিরের উপর আক্রমণ চালাবে।' লা যুদ্ধ-পদ্ধতি—দ্রুত স্থান পরিবর্তন অতি অবশ্য যুদ্ধ কৌশল বলে। তাই মাস্টারদা সবাইকে গেরিলা রণের আদেশ দিলেন। লোকনাথ দার নির্দেশানুসারে বিপ্লবীদের ভাগে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন যেতে বললেন। সেই ভাবে জালালাবাদ পাহাড়টি ছেড়ে চট্টগ্রামের অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। প্রধান দার হাতে ছিল এবং প্রত্যেকটি দল মাস্টারদার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা চলত।

আমি ও আমার সঙ্গের তিনজন গণেশ আনন্দ গুপ্ত ও মাখন ঘোষাল ফেণী খন্ড যুদ্ধটি সমাপ্ত করে উধাও তারপর বিভিন্ন ভাবে আমরা চারজন মিলিত হই। আমি পরে ভাবে পুলিশের কাছে ধরা দিই। ধরা দেওয়ার ফলে পুলিশ বিশেষ বিভ্রান্ত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ আর সেই জনাই আন্দামান নির্বাসনে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে তখন পায়ে ডান্ডা বেড়ী, দুজন -কড়ি ও জোড়ায় জোড়ায় হাত-ভিতর দিয়ে লোহার শিকল গলিয়ে একটি সেপাই ধরেছে যেন কেউ কে সটকে পড়তে না পারি। এত-নিয়ে যখন পুলিশ আমাদের দলটিকে নিয়ে যাচ্ছিল তখনও সেই জিজ্ঞাসা—কেন ধরা দিলেন? আমাদের নিয়ে পুলিশের এই শসস্ত্র যাওয়ার জন্য উদ্যোগ করছে তখন মুহূর্তেও একজন খুব ধৈর্যশীল অফিসার (যিনি দু' বছর থেকে চেষ্টা করে আসছেন আমার ধরা সঠিক কারণটি কী জানার জন্য) বিনীত নিবেদন জানাচ্ছিলেন যেন যাওয়ার আগে তাঁকে আমার ধরা সঠিক কারণটা জানাই। যদিও চিঠিতে মিঃ লোম্যানকে লিখে ভাবে জানাই—ধরা দেওয়াটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তবু পুলিশরা আমার এই কথাটি করেন নি কোন কালে'। তাই আন্দা-[illegible] চেষ্টা

করলেন। পুলিশ অফিসারটি খুব বিনীত ভাবে করজোড়ে প্রার্থনা জানালেন—'আপনি হয়ত আপনার বাকি জীবনের শেষ দিনগুলি আন্দামানেই কাটিয়ে যাবেন। আমাদের মধ্যে বোধহয় আর দেখাও হবে না। আমার প্রথম সাক্ষাতের প্রথম প্রশ্নটির উত্তর আজও পেলাম না—কেন আপনি ধরা দিয়েছিলেন? আজ আপনি অন্ততঃ সেই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে আমাদের মনের সংশয় দূর করুন।'

উত্তরে আমি বলেছিলাম: 'বিভিন্ন সময় আমার বিভিন্ন উত্তর হয় না। বাস্তব কথাটি কখনও বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে না। তখন যে জবাব পেয়েছিলেন আজও সেই একই জবাব পাবেন—নেহাৎ ব্যক্তিগত কারণে আমি ধরা দিয়েছিলাম।' পুলিশ অফিসারটি খুবই মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ কোন গল্প আমদানি করতে পারি নি।

'আমি বার বার বলা সত্ত্বেও তাঁরা কেন সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না? প্রথমতঃ অনন্ত সিং কি ব্যক্তিগত কারণে ধরা দিতে পারে? অতি বুদ্ধিমান যাঁরা, তাঁরা ধরে নিলেন এই ধরা দেওয়ার পেছনে অনন্ত সিংহের কোন বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিল। একটি প্রচলিত কথা—'বৈপ্লবিক কারণ ব্যতিরেকে অনন্ত সিং একটি পদক্ষেপও দেয় না।' তাই ত পুলিশের মাথা ব্যথা অনন্ত সিংহের ধরা দেওয়ার কারণ যে কোন উপায়ে খুঁজে বার করা। কত পুলিশ অফিসার কত স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করে রিপোর্ট দিয়েছেন—'এ মেয়েছেলে ঘটিত ব্যাপার তাতে কোন সন্দেহ নেই।' কোন বিশ্বস্ত-সূত্রের রিপোর্ট: 'দলের ছেলে যারা স্বীকার-উক্তি করেছে তাদের জীবিত থাকার অধিকার নেই। অতএব তাদের মৃত্যুদন্ড অনন্ত সিং দেবে।' কোন রিপোর্টে আছে: 'আন্দামান থেকে অনন্ত সিং সদলবলে উধাও হয়ে দেশে ফিরে আসবেই।' ইত্যাদি ইত্যাদি রিপোর্ট পুলিশ সংগ্রহ করে। তাই অনন্ত সিংহের ধরা দেওয়ার সঠিক কারণ পুলিশের জানা প্রয়োজন। অনুরূপ সারকুলার প্রত্যেকটি উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীকে দেওয়া হয়েছিল।

এইরূপ সারকুলারের অনুবর্তী হয়ে তাঁরা আমার ধরা দেওয়ার কারণ অনুসন্ধান করছিলেন কিনা তা জানি না, তবে আন্দামানে গিয়ে আমাদের খুব বিশ্বাসী ছেলে শান্তির মুখে শুনেছিলাম মাস্টারদা চট্টগ্রামের যুব অভ্যুত্থানের ঘটনা নিয়ে লিখতে শুরু করেছিলেন। ধলঘাটের বাড়ীতে যেখানে নির্মলদা ও অপূর্ব গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় এবং মেজর ক্যামারণ সাহেব যিনি অনুসন্ধান চালাবার উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান পার্টিকে নিয়ে সর্বাগ্রে বাড়ীর ভেতর ঢুকে নির্মলদার গুলিতে প্রাণ হারান, সেই বাড়ী থেকেই পুলিশ এই তিনটে খাতা উদ্ধার করে। সাহেবের বিরাট বপু, তিনি ভাবতেন তাঁর অতুলনীয় শক্তি—তিনি একাই সব কটি ফেরার আসামীকে ধরে ফেলবেন। নির্মলদা ও মাস্টারদাকে অক্ষত দেহে ধরতে পারলে পনের হাজার টাকা পুরস্কার পাবেন। বলশালী মেজর ক্যামারণ সাহেব লোভ সামলাতে পারলেন না, তিনি তথ্য নিয়ে এসেছিলেন যে ঐ বাড়ীতে স্বয়ং সূর্য সেন ও নির্মলদা ফেরার হয়ে আছেন। আর গুটিকতক তাঁদের বিপ্লবী সাথীও সঙ্গে আছেন। এই নির্ভুল সংবাদটি পেয়ে মেজর ক্যামারণ পুরস্কারের আশা ছাড়তে পারলেন না। তিনি পিস্তলের ট্রিগারে আঙুল রেখে বীরদর্পে ঘরে প্রবেশ করতে চেষ্টা করলেন। নির্মলদার রিভলবার ক্যামারণ সাহেবের বুক লক্ষ্য করে গর্জন করে ওঠে। আর্মি রিভলভারের .৪৫০ সাইজের গুলি ক্যামারণের বুক ভেদ করে দিয়ে গেল। সাহেবের প্রাণহীন দেহ তক্ষুনি দোতলার সিঁড়ি থেকে

ঘাঁটে পড়ে গেল। পুলিশ ও মিলিটারীর বেষ্টনী থেকে মেসিনগানের অজস্র গুলি তাদের বাড়ীতে এসে সর্বত্র আঘাত করতে লাগলো। সেই বৃষ্টির ধারার মত গুলি মাস্টারদা, প্রীতিলতা প্রমুখ আর কাউকে স্পর্শ করল না। তারা পুলিশ ও মিলিটারীর বেষ্টনী ভেদ করে তাদের অন্য আশ্রয়স্থলে চলে যেতে সক্ষম হন। সেই কথা এখানে আর পুনরাবৃত্তি করব না।

সেই তিনটি খাতায় এই ঘটনা সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়েছেন আর লিখেছেন আমি কি উদ্দেশ্যে ধরা দিয়েছিলাম। মাস্টারদা নাকি আমার ধরা দেওয়ার কারণ সম্বন্ধে লিখেছিলেন, আমি যেন সে সব বন্দী যারা রাজসাক্ষী হওয়ার উদ্দেশে পুলিশের কাছে খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেছে তাদের খতম করি। যখনই পারি তা যেন নিশ্চয়ই করি। মাস্টারদার এই লেখার সমর্থনে আর কোন বক্তব্য সাক্ষ্য পান কিনা সেই জন্য আমার কাছ থেকে বা আমার প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত ছেলেদের মুখ থেকে তাঁদের শোনবার অভিপ্রায় ছিল—আমি কেন ধরা দিয়েছি।

যারা স্বীকার উক্তি করে, তাদেরকেও একসঙ্গে আন্দামানে পাঠাচ্ছে—কাজেই পুলিশের মত মাথাব্যথা স্বীকারোক্তিকারীদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে। তাই তাঁদের পক্ষে জানা প্রয়োজন ছিল তখনও তেমন কোন গুপ্ত পরিকল্পনা আমার মনে ছিল কিনা। তাঁদের আরো একটি বিষয় জানবার ছিল—আমার আন্দামান থেকে পালাবার কোন গোপন পরিকল্পনা ছিল কিনা? সত্যি বলতে কি সেরূপ চিন্তা আমার মাথায় যে আসেনি তা নয়। হাজারো চিন্তা হতে পারে কিন্তু সমুদ্রঘেরা দ্বীপ থেকে উধাও হওয়া সহজ নয়। আমি পালাতে পারতাম বললেও আজ কারো বিশ্বাস হবে না। মনে হবে বানিয়ে বানিয়ে এখন বলা হচ্ছে—যদি সহজসাধ্য ছিল তবে তুমি পালালে না কেন? যে যা ইচ্ছে মনে করতে পারেন, তবে আমি কেন আন্দামান থেকে পালাই নি বা পালাতে চেষ্টা করিনি, তা হচ্ছে পালাবার পরে কোথায় যেতাম? আমার মানস চোখে সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, যেখানেই যাই না কেন, তাঁদের নির্দিষ্ট কোন প্ল্যান নেই এবং আমাকে ফেরারের মত রাখতে তাঁরা কেউ প্রস্তুত ছিলেন না। প্রত্যেক দল উপদলের মধ্যে পুলিশের চর ছিল—আমি যে কোন আস্তানায় যাই না কেন, দলের মধ্যে পুলিশের গুপ্তচর আমাকে ধরিয়ে দেবে, সে সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলাম। এ আমার গণনাশাস্ত্রের আবিষ্কার নয়। আমার বিচারবুদ্ধি দিয়ে অনুশীলন করে ঐরূপ সিদ্ধান্ত করি। আন্দামানের কম্যুনিস্ট কনসলিডেশন কমরেডদের ঐরূপ চিন্তা করাও পাপ ছিল। তাঁরা ভাবতেই পারতেন না কম্যুনিস্টদের মধ্যেও পুলিশের চর থাকতে পারে। আমার তো প্রথম কাজ হল সত্যনিষ্ঠ কম্যুনিস্ট কর্মীরা অন্ততঃ এইরূপ ধারণা থেকে মুক্ত হউন যে তাঁদের পার্টির মধ্যেও পুলিশ এজেন্ট আছে ও থাকবেই। যদি কম্যুনিস্ট পার্টি তার পুঁজিবাদী বিরোধী ভূমিকা পালনের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুত হয়, তবে বুর্জোয়া সরকার তার বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব পোষণ করবেই। সেই পার্টির ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখবে। কাজেই কম্যুনিস্ট পার্টিতে পুলিশ নেই, সেইরকম মনোভাব আমার অন্তত কখনও হয় নি। সরকার পার্টিতে যাঁদের, আপোষহীন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামী বলে মনে করতেন, তাদের সবদিক দিয়ে আক্রমণ চালিয়ে পঙ্গু করার চেষ্টা করতেন। কম্যুনিস্ট পার্টির ভিতর কম্যুনিস্ট নেতারা 'তাঁদের কমিউনিস্ট সত্তা' বজায় রাখার জন্য সেইরকম সংগ্রামশীল কম্যুনিস্টকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে— সে একজন 'অতিবাম বিপ্লবী কম্যুনিস্ট' না হয় 'ট্রটস্কী মতবালম্বী', আর না হয় একজন 'ব্লানকুই' বা 'ব্রাকুনিন' বলে আখ্যা দিয়ে তাকে বহিষ্কার করার নীতি অনুসরণ করে চলেছিলেন। ভারতের কেন্দ্রীভূত কম্যুনিস্ট পার্টি এইভাবে কঠোর ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালাইজড পার্টির দোহাই দিয়ে তাদের পার্টির সুদৃঢ় কাঠামো বজায় রেখেছে। আমার কিন্তু ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালাইজড পার্টির নীতি নিয়ে কোন বিতর্ক নেই। আমার প্রশ্ন, মানুষকে নিয়ে, কম্যুনিস্ট নেতাদের নিয়ে। আমার ঝগড়া 'কম্যুনিজমের' সঙ্গে নয়—'কম্যুনিজম' একটি বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক মতবাদ। কোন বৈজ্ঞানিক মতবাদকে গান্ধীজির নামে বা আধ্যাত্মবাদ দিয়ে খণ্ডন করার মিথ্যা স্বপ্ন আমি দেখি না। যাঁরা জোর করে তাঁদের মতবাদ চালাতে চান—যেখানে দুর্নীতি থাকে না, শেষে ঈশ্বরের নামে বক্তব্য রাখা ... অন্ধ বিশ্বাসে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা ... তার সঙ্গে আমার মতের লড়াই থাকবেই ... লড়াই কোন মানুষের ব্যক্তিগত ... বিরুদ্ধেও বট, তাছাড়া সেইসব ব্যক্তি বিশেষকেও কঠোর সমালোচনা না করে যায় না। সেই সমালোচনা প্রসঙ্গ বত... আমি স্থগিত রাখলাম। আমার কথা আন্দামান সমুদ্রবক্ষের দ্বীপ, সেখান থেকে পালানোটা আপাতদৃ... সম্পূর্ণ অসম্ভব, তবু আমার কাছে অসম্ভব ছিল না। আন্দামান থেকে ব... উপকূলে প্রায় আটশো-নশো মাইল মাদ্রাজ সমুদ্রতীরও প্রায় হাজার বা... মাইল দূরে, কিন্তু বার্মার উপকূল ... শো, সাড়ে তিন-শো মাইলের ... একটুকু জলপথ পেরিয়ে যাওয়া যায় ... তা একজন বিপ্লবী ভাবতে পারে... যদি কেউ মনে করেন আমি ভাবছি স... পেরিয়ে যাওয়ার কথা, তবে সেটি অ... বলে যুক্তিপূর্ণ ভাবনা হয় না। তখ... দিনেও উনিশ শো বত্রিশ সাঁইত্রিশ ... মোটর চালিত স্পীড বোটের প্রচলন ... স্পীড বোটের দাম তখন মোটর ... চাইতে বেশী নয়, ঘন্টায় প্রায় আশি ... মাইল বা আরো বেশী যেতে প... বিপ্লবীর পক্ষে এইরকম স্পীড বোট ... অসম্ভব ছিল না। বাকিটুকু সহজে ... নিতে পারা যায় যে আন্দামান দ্বীপ... মধ্যে কোন নির্দিষ্ট স্থানে তা লুকিয়ে ... দু-একদিনের জন্য খুবই সম্ভব। নি... দিষ্ট সময়ে সেই স্পীড বোট আ... নির্ধারিত স্থানে এসে অপেক্ষায় থ... আর আমরা সেই সংবাদ পাবো জেলে ... বন্ধু সিপাইদের মারফৎ। বাকিটুকু আর বলব না, বুঝে নেওয়া যায় সে... ঘটানো খুব সম্ভব ছিল। এখন ... আসল কথাটিই বলি। আন্দামান পালিয়ে আসার জন্য সেদিন কোন প... হাত দিই নি, তার একমাত্র কারণ 'পা... যাবো কোথায়'?

পুলিশ যখন ভাবছিল আ... আন্দামান জেল থেকে পালাবার কোন ... ছিল কিনা তখন তা নিয়ে আমাদের ... মাথাব্যথা ছিল না। আমি বলছি ... দের স্বদেশে থাকার সময়কার কথা, ... আমাদের জেল হয়নি নির্বাসন ... আদেশও ঘোষিত হয়নি। আমাদের ... তখন চলছে। মাস্টারদা আমার ... লিখে ও বলে পাঠালেন যেন আমি গ... সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করি ... অবস্থায় সরকারের বিরুদ্ধে কী ... বাস্তব পরিকল্পনা নিয়ে তাদের ... করতে পারি। এইসময় এইরকম প্ল্যান করি যে ডিনামাইট দিয়ে ... ঘাঁটি ও বিজ, সৈন্যবোঝাই লরি ... কিভাবে বিধ্বংস করব্যে। শহরে ... মাইট পুঁতে রাখা ও তার ফেলে ... অনেকগুলো গোপন নিরাপদ জায়গায় ...

না করে এবং এই বিরাট বিস্ফোরণে যেন নিজের বিপদ না ঘটে।

খুব চতুরতার সঙ্গে যদি ল্যাণ্ডমাইন পুঁতে রাখা না যায় এবং সংগোপনে তার টেনে এনে গুপ্ত স্থানে সুইচটি ব্যবহার করার জন্য ব্যবস্থা না থাকে, তবে এই ভয়ানাক বিস্ফোরক দ্রব্য খুব কার্যকরী-ভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। কাজেই তৈরি করাটাই যত ঝামেলা, আর ফিল্ডে প্রয়োগ করাটা ঝামেলা ও আশংকার বস্তু নয়, তা মোটেই ঠিক নয়। প্রস্তুত করা যতখানি ঝামেলা, প্রয়োগ করাটা তার চেয়ে বেশি ঝামেলা ছাড়া কম নয়। তাছাড়া বিস্ফোরক সামগ্রী জোগাড় করা এবং তা মজুত ও প্রস্তুত করার যে বিরাট আয়োজন, তা কোনমতেই উপেক্ষা করা যায় না। আমরা প্রোগ্রাম নিয়েছিলাম, ডিনামাইট যখন পাইনি, তখন নিজেদের তৈরি বারুদ দিয়েই ডিনামাইটের অভাব মেটাবো। ছোট্ট একটি চার বা আট আউন্সের ডিনামাইটে যে কার্যোদ্ধার হওয়া সম্ভব, আমাদের তৈরি করা ল্যাণ্ডমাইন দিয়ে তা করতে হলে বিস্ফোরক পদার্থের প্রয়োজন অনেক বেশি। চার আউন্স ডিনামাইটের সমান কাজ পেতে হলে অন্ততপক্ষে এক মণ-দু' মণ গান-পাউডারের প্রয়োজন হয়। তবু আমরা আমাদের নিজের সামর্থ্যে নিজের প্রয়োজনে ল্যাণ্ডমাইন তৈরি করে নিতে পারি, কিন্তু ডিনামাইটের ভরসায় বসে থাকলে কখন যে তা পাবো তার কোন ঠিক ছিল না। চট্টগ্রামে তখন 'ডিনামাইট কনস্পিরেসি কেস' হয়ে গেল, কিন্তু সেই কেসে একটি ডিনামাইট বা একটি ডিটোনেটারও ছিল না। তবুও পুলিশ প্রচার করল, 'ডিনামাইট কনস্পিরেসি কেস বলে। পুলিশ কিংবা সরকার কেন ভীত হল? কেন সত্যি কথা 'ল্যাণ্ডমাইন কনস্পিরেসি কেস' বলে মামলা চালালো না? তার একমাত্র কারণ এই ভয়ানক জিনিসের প্রচার হোক তা তারা কোনদিনও চায়নি। আমিও বলিনি বা বলতে চেষ্টা করিনি। এটুকু আগে কখনও বলিনি। যদি কেউ মনে করেন এটুকু থেকেই তাঁরা ল্যাণ্ডমাইন তৈরি করার সঠিক ব্যবস্থা করতে পারবেন, তবে সেটি ভুল হবে। এর সঙ্গে আরো হাজারটি জিনিস জানার আছে। আর সেইসব না জেনে এই সাংঘাতিক কাজে হাত দেওয়ার অর্থ হল, অনভিজ্ঞতার জন্য ল্যাণ্ডমাইন প্রস্তুত করার সময় হয় লোক মারা যাবে আর নয়ত বিস্ফোরণে পুড়ে যাবে অথবা চিরকালের মত পঙ্গু হয়ে যাবে। এই সবই আমাদের দলে ঘটেছে। তাছাড়া বিপ্লবী পরিস্থিতি না থাকলে ল্যাণ্ডমাইন প্রস্তুত করার কোন প্রয়োজনই নেই। সেইজন্য আমার স্থির সিদ্ধান্ত সব না জেনেশুনে, না বুঝে, এইরূপ মারাত্মক কাজে কেউ যেন হাত না দেয়।

এখন আর একটি জিনিস বলার আছে। এই সেদিন আমার ঘরে বসে আমার পুরোনো দিনের বিপ্লবী সাথীরা কথা বলছিল। তার মধ্যে ছিল চট্টগ্রামের ডিনামাইট কেসের প্রধান নায়ক অর্ধেন্দু গুহ। তাঁর সাথে আমাদের অন্যতম সাথী ছিলেন কালিকিংকর দে। বর্তমানে কোন ফার্মে কাজ করেন, তিনিও কিছুদিনের মধ্যে অবসর গ্রহণ করবেন। হয়ত দু'-একমাস চাকরিতে আছেন। কালিকিংকর দে আমার পূর্বস্মৃতির অনেক কথা সবাইকে বলছিলেন। আমারও শুনে খুব ভাল লাগছিল। শ্রীকালি দে বিবাহিত, তাঁর দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে। তারা তিনজনেই বড় হয়েছে। দুটি ছেলেই চাকরি করে, মেয়েটিরও হয়ত শীঘ্র বিয়ে হবে। কালি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ডিনামাইট কনস্পিরেসি সম্বন্ধে বলছি। 'ডিনামাইট কনস্পিরেসি কেস' আমাদের এক নম্বর আর্মারী রেড মামলার সঙ্গে অন্য কোর্টে চলেছিল।

তার স্মৃতি উদ্ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে আমারও পূর্বদিনের কথা অনেক কিছুই মনে পড়তে লাগলো। মাস্টারদা আমার সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক কথা কী কী বলতেন তা সে বলছিল। যখন মাস্টারদা ফেরার ছিলেন, তখন কালিকিংকর দে-ও তাঁর সঙ্গে সুদীর্ঘকাল থাকার সুযোগ পেয়েছিল এই কালিকিংকর দে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার নেতৃত্বে পাহাড়তলির ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করতে গিয়েছিলেন। এই ইউরোপীয়ান ক্লাবটি আক্রান্ত হয় চট্টগ্রাম আর্মারী আক্রমণের প্রায় তিন বছর পরে। সেই আক্রমণকালে প্রীতিলতা সেখানে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। সেই প্রসঙ্গে এখন আমি আর কিছু বলছি না। কালিকিংকর দে যদি তাঁর বাড়ির সব লোকের সমর্থন আমাদের দলের জন্য জোগাড় করতে না পারত, তবে হয়ত ডিনামাইটের এই ব্যাপক পরিকল্পনাটি কার্যকরী করা সম্ভব হোত না। ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলা হয়েছিল যেহেতু বাস্তবে তারা ষড়যন্ত্র-মূলক কাজকর্ম অনেকখানি এগি যায়।

অর্ধেন্দু গুহর যেমন বিশেষ আছে ডিনামাইট পরিকল্পনা নিয়ে চালাবার, তেমনি কালিকিংকর দে- দানও কোন অংশে কম নয়। সে আমি নাকি চট্টগ্রামে স্লোগান ছিলাম : 'প্রত্যেকটি বিপ্লবী সদস্যে হবে এক-একটি দুর্গ।' সেখান আক্রমণ ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা
চট্টগ্রামের বিপ্লবী সদস্যদের বাড়িকে আমরা অনায়াসে বিপ্লবী বলতে পারি। শ্রীগণেশ ঘোষের দোকান আমাদের একটি দুর্গবিশে চট্টগ্রাম শহরের উত্তর প্রান্তে ছোট উপরে আনন্দের বাড়ি একটি সু হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। শহরের কর্ণফুলি নদীতীরে রজতের আমরা দুর্গ হিসাবেই ব্যবহার ক 'ডবলমুরিংস' এলাকাতে কালিকিংক বাড়িটি আমাদের কালে দুর্গ ব্যবহৃত হয়েছিল বললে কোন অ না।

চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহে তরুণে ১৮ এপ্রিল, ১৯৩০ সালে ইংরেজ পোর্ট টাউন বন্দরসহ টাউনটিও দখ নেয়। তারপর তিন বছর আগে ছোট ছোট গেরিলা সংঘর্ষ ঘটেছি সমস্ত শহরটি মিলিটারির অধী বললে অত্যুক্তি করা হয় না। খান সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত চিহ্নিত করার জন্য পুলিশ সাদা কার্ড প্রত্যেক শহরবাসীকে দি প্রত্যেক বড় বড় রাস্তার মোড়ে ও স্থানে চেকপোস্ট বসালো যেখানে ও মিলিটারী একযোগে কাজ কর কোন লোককে সন্দে করে ধরে নি সার্চ করত। সৈন্য নিয়ে টহলদার সারা শহরে ও শহরের উপকণ্ঠে ঘণ্টাই টহল দিত। কোন একটি যদি পুলিশ সন্দেহ করত, তাহলে তখন সেখানে গিয়ে হানা দিত। কড়া পাহারার মধ্যে তারা ল্যাণ্ডমাই করে এবং তা বিশেষ বিশেষ স্থানে রাখে ও গোপনে মাটির নীচ দি নিয়ে গিয়ে সুইচ বোর্ডের সাথে করে। তারা জেলখানার দেওয়াল দিয়ে চট্টগ্রাম আর্মারী রেডের যুবকদের মুক্ত করার জন্য প্লা ছিল। জেলখানাটি সতর্ক পাহারার অধীনে ছিল। ইস্টার্ন রাইফেলসের এক কোম্পানি সিপা সময় পাহারা দিত। তারা জেলখানা ছাদের উপরে মেসিনগান ফিট ক সারা দিনরাত সেখান থেকে চারদি রাখত। জেলখানার প্রাচীরের চারদি ছোট ছোট তাঁবু খাটিয়ে সেপাইদে দেওয়ার স্থান ঠিক করেছিল চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া কাঁটাতারের বেড়া সম্বন্ধে একটু ধারণাটা স্পষ্ট হবে না।

দল বদলের পরে তিন প্রধান

কলকাতার ফুটবলের ঢাকে কাঠি পড়েছে। দল বদলের পালা শেষ। এখন মাঠে মাঠে চলেছে অনুশীলন। মোহনবাগান কোজিকোড়ে নাগজি ফুটবলে জিতেছে। তারপর ফেডারেশন কাপের খেলা সেরে ঘরে ফিরতে না ফিরতেই সময় হয়ে যাবে দূর-প্রাচ্য সফরে যাবার। আই. এফ. এ অনুমতি দিয়ে দিয়েছে। মোহনবাগান বলেছে মে মাসের শেষে ফিরে এসে দরকার হলে প্রত্যেক সপ্তাহে তারা বেশী বেশী ম্যাচ খেলবে।

ময়দানের অন্য দুই প্রধান ইস্টবেঙ্গল আর মহামেডান স্পোর্টিং এখন অনুশীলনে মত্ত। রোজ সকালে প্রশিক্ষক অরুণ ঘোষের নেতৃত্বে ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়রা খুব খাটছেন। অরুণ ঘোষ বলেছেন, দরকার হলে তিনি মিহির বসুকে নামিয়ে এনে লিংকম্যান হিসেবে খেলাবেন। অরুণের মতে মিহির লিংকম্যান হিসেবে আদর্শ। কারণ তাঁর অফুরন্ত দম আছে। সারা মাঠ চষে খেলতে পারবে। এগিয়ে গিয়ে সে দলের আক্রমণের ধার বাড়াতে পারবে, আবার নেমে এসে আত্মরক্ষায় সামিল হবে। মোটামুটি-ভাবে মনে হয় ইস্টবেঙ্গল দলটি বেশ শক্তি-শালীই। ইস্টবেঙ্গলের প্রতিটি খেলোয়াড়ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাঁরা চাইছেন যে কোন উপায়ে মোহনবাগানের কাছ থেকে হারানো সম্মান ছিনিয়ে নিতে। সুরজিত সেনগুপ্তের নেতৃত্বে আশা করা যায় ইস্টবেঙ্গল এই মরশুমে সমর্থকদের প্রত্যাশা মিটোনোর মতো খেলা খেলবে।

দল ভাঙ্গা গড়ায় মোহনবাগানের গায়ে এবার বিশেষ আঁচ লাগে নি। গত বছর যাঁরা দলে ছিলেন তাঁদের প্রায় সবাইকে ধরে রাখতে পেরেছে। মোহনবাগান থেকে বেরিয়ে গেছে গোলরক্ষক বিশ্বজিত দাশ আর দিলীপ সরকার। এঁদের দুজনকে ধরে রাখার কোন গরজই মোহনবাগান দেখায় নি। উল্টে তারা ইস্টবেঙ্গল থেকে তরুণ শ্যামল ব্যানার্জীকে দলে আনতে পেরেছে। আর পেরেছে এরিয়ানের গোলরক্ষক লক্ষণ বেলেলকে।

ইস্টবেঙ্গলে গত বছর যাঁরা ছিলেন এবার প্রায় সকলেই আছেন। তবে দলের দারুণ লাভ হয়েছে মোহনবাগান থেকে বিশ্ব-জিত দাশ, খিদিরপুরের তরুণ মুখিয়া, জর্জ টেলিগ্রাফের সুবিমল ঘোষ, এরিয়ানের তপন দাশ, আর বি এন আর থেকে অশোক চন্দ আসায়। ইস্টবেঙ্গলের নতুন প্রশিক্ষক অরুণ ঘোষ নতুনভাবে দল গড়ার জন্যে খেলোয়াড়দের তালিম দিয়ে নিচ্ছেন। এর ওপর যদি মহারাষ্ট্রের সাবির আলি খেলতে পারেন তাহলে তো আর কথাই নেই। দারুণ শক্তিশালী হয়ে উঠবে ইস্টবেঙ্গল।

কলকাতা ময়দানের পুরোন খেলোয়াড় টি এ রহমান এবার মহামেডান স্পোর্টিং দলের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। কল-কাতা ছাড়ার পর তিনি কেরলে ছিলেন। নিজের ভাগ্নে নাজিবের খেলা নিয়েই মেতে ছিলেন। সন্তোষ ট্রফিতে খেলতে এসে নাজিব তো কলকাতার দর্শকদের মন জয় করে গেছেন।

মহামেডান স্পোর্টিং এবার বিশেষভাবে নির্ভর করছে রাজ্যের বাইরের খেলোয়াড়-দের ওপর। গত বছর যাঁরা দলে ছিলেন তাঁদের বেশীর ভাগই আছেন। গোলরক্ষক তরুণ বসু অবশ্য চলে গেছেন। তবে মহা-মেডানের মস্ত লাভ হয়েছে মোহনবাগানের দিলীপ সরকার আর রেলের অশোক চক্র-বর্তীকে দলে পেয়ে। এর ওপর যদি বাইরের খেলোয়াড়রা সকলে আসেন তাহলে মহা-মেডান এবারের ফুটবল মরশুমে দারুণ শক্তিশালী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

আসছে মে মাস থেকে তিন প্রধানের পক্ষে যাঁদের খেলতে দেখা যাবে তাঁরা হলেন :

মোহনবাগান : গোলে : শিবাজী ব্যানার্জী, লক্ষণ বেলেল (এরিয়ান) ও সন্তোষ বসু (ইস্টবেঙ্গল)।

ব্যাকে : শ্যামল ব্যানার্জী প্রদীপ চৌধুরী, সুব্রত ভট্ট পালিত, কম্পটন দত্ত ও সুধী

লিংকম্যান : প্রসূন ব্যানা সরকার।

ফরোয়ার্ডে : মানস ভট্টা আকবর, শ্যাম থাপা, বিদেশ ভৌমিক।

অধিনায়ক : প্রসূন ব্যা অধিনায়ক : দিলীপ পালিত প্রদীপ ব্যানার্জী।

ইস্টবেঙ্গল :

গোলে : ভাস্কর গাঙ্গু দাশ (মোহনবাগান) ও তপ মেডান))।

ব্যাকে : চিন্ময় চ্যাটার্জী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সত্যজিৎ দাশ (টি বোর্ড), সমীর মুখো ও তরুণ মুখিয়া (খিদিরপু

লিংকম্যান : সমরেশ চৌ ব্যানার্জী ও সুবিমল ঘোষ গ্রাফ)।

ফরোয়ার্ডে : সুধীর ঊলগানাথন, রণজিৎ মুখার্জী অশোক চন্দ (বি এন. আর (এরিয়ান) এবং সাবির আলি

অধিনায়ক : সুরজিত সে অধিনায়ক : রণজিৎ মুখার্জী।

প্রশিক্ষক : অরুণ ঘোষ

মহামেডান :

গোলে : আমেদ কমা (আসাম), ইরাদিয়ানাথন, (রাজস্থান)।

ব্যাকে : আনোয়ার হোসে কার, অশোক চক্রবর্তী দি সরকার (মোহনবাগান), অনি (আসাম), হাবিব খান ও আউ

লিংকম্যান : অমলরাজ র রাজ ও মহম্মদ খাব্বাজ।

ফরোয়ার্ডে : আজিজ, আ ফুদ্দিন, সুরিন্দার কুমার, নাসি মহম্মদ নাকিম।

অধিনায়ক ও সহ অধিনা নি। প্রশিক্ষক টি এ রহমান।

'রাত কত হল ? উত্তর মেলে না।' কথাগুলো যতই শুনতে ভাল লাগুক না কেন, যতই অর্থপূর্ণ হোক না কেন, ঐ মুহূর্তে এর ব্যবহারে চমক ছাড়া আর কিছুই নেই। অন্য দিকে মত্ত অবস্থায় যখন ঈশ্বর সীতার ঘরে ঢোকে তখন পর পর ৩০।৩৫টা শটে কোন সংলাপ নেই এবং তার পরেই ঈশ্বরের জন্তুর মতো চিৎকার। আমাদের কিন্তু কখনো এই দৃশ্যটি সংলাপ শূন্য মনে হয় নি। ছবির শেষাংশে ঈশ্বর ও বিনু যখন নতুন বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাচ্ছে, ঐ মুহূর্তের সংলাপ যেমন একদিকে সংযত, অন্য দিকে তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত ও আবেগময়। সংলাপের সার্থকতা প্রয়োগ এটাই। সংলাপ যেমন চিত্রনাট্যকে প্রাণবন্ত করে, চিত্রনাট্যকেও তেমনি উজ্জ্বল ও গতিশীল করে তার দৃশ্যাংশেরা। কিন্তু ছবির দৃশ্যগুলো যত বেশী বড় হয়, ছবি ততই তার উচ্ছলতা হারায়।

তাই সেদিকে লক্ষ্য রেখে দৃশ্যগুলোকেও চিত্রনাট্যকারেরা সেভাবে সাজান। এবং এই জন্যই ক্যামেরার দৃষ্টি-কোণ পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। চিত্রনাট্যের তাগিদেই আসে শব্দ, সঙ্গীত, সম্পাদনা, আলো ইত্যাদি। তাই দেখা যাচ্ছে মূল ব্যাপারটা চিত্রনাট্যকেই কেন্দ্র করে এবং এ যদি দুর্বল হয়, তাহলে ছবির সঙ্গীত, ক্যামেরা, সম্পাদনা, অভিনয় যতই জোরালো হোক না কেন ছবি দুর্বল হতে বাধ্য।

মুভি পাইওনীয়ার

ডি জি একটি বর্ণাঢ্য ও দুরন্ত চরিত্রের নাম। বর্তমান প্রজন্মের কাছে তিনি রূপকথা বিশেষ। ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এককথায় ডি জি, ভারতীয় চলচ্চিত্রে এক সংগ্রামী ও বিদ্রোহী চরিত্র। কয়েক বছর আগে তাঁর অলীক-বাবু দেখার সুযোগ এই আলোচকের হয়েছিল। অলীকবাবু আশ্চর্য করেছিল তার দুরন্তপনায়, অথচ চরিত্রাভিনেতা তখন আশীর কোঠা পেরিয়ে গেছেন।

ডি জি-র মধ্যে যে স্বাভাবিক চাঞ্চল্য, যে দুরন্তপনা, বিদ্রোহ, কৌতুক ইত্যাদির বাস, আলোচ্য ছবিটির কোথাও তা খুঁজে পেলাম না। অন্যদিকে এই বিতর্কিত চরিত্রের আরেক যে বিশেষ দিক, যেখানে আবেগ, দর্শন, কল্পনা খেলা করে, ছবিটি সেই জায়গাকেও স্পর্শ করতে পারেনি। ১৬শ ফিটের এই তথ্যচিত্রটির নামকরণের বাংলা তর্জমা, 'ডি জি : চলচ্চিত্র পথিকৃৎ'। কিন্তু সারা ছবিতে এই নামকরণের সার্থ-কতা কোথাও উপলব্ধি হয়নি। এই বিষয়টিকে এস্টাব্লিশড় করতে কিছু পেপার কাটিং, পোস্টার, ডি জি অভিনীত, পরি-চালিত ছবির স্টিলের সাহায্য নেওয়া হয়েছে, যা বড়জোর একটি মনোরম প্রদর্শনী হতে পারে, কিন্তু চলচ্চিত্র নয়। এ যেন ডি জি বিষয়ক একটি রচনা। চলচ্চিত্রের সঙ্গে তাহলে প্রবন্ধের তফাৎ কোথায় ? অথচ পরিচালিকার হাতে ছিল সেইসব মারাত্মক অস্ত্র—ইমেজ, সাউণ্ড এবং সর্বোপরি ডি জি স্বয়ং, যদিও বয়সের ভারে তিনি এখন বেশ অশক্ত ও দুর্বল।

ছবিটি শুরু হয়েছিল এক বিরাট সম্ভাবনা রেখে—মাঠে কলের ছবি দেখানো হচ্ছে, একটি ছেলে আদুড় গায়ে গলিপথ ধরে ছুটে আসছে—এখানে পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গীতের ব্যবহার দৃষ্টান্ত। তারপর একরকম একটাও শট খুঁজে পাইনি। সবই বলা হয়েছে, করা হয়েছে, কিন্তু কোথাও প্রাণ নেই, গভীরতা নেই, সব কেমন ভাসা-ভাসা। ডি জি এখানে কয়েকবার দাঁড়িয়ে-ছেন, পায়চারি করেছেন, আগের আমলের ক্যামেরায় চোখ রেখেছেন, বসে বসে কিছু লিখেছেন, কিন্তু তাঁর এই শারীরিক উপস্থিতিকে কোথাও ঠিকভাবে কাজে লাগানো হয়নি। তাঁর চরিত্রের যে মূল ... তা পরিচালিকা ধরতে অনেকটা ... হয়েছেন। ছবির সম্পাদনা, চিত্রগ্রহণ ... কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। এখানে ক্যা... কাজ কোন দৃষ্টিকোণের বিচার না করে ... তুলে যাওয়া ও সম্পাদনায় সেগুলো... মোটামুটি একত্রিত করা—এর বেশী ... নয়। নেপথ্য সংলাপ (রচনা ও ক... অত্যন্ত মামুলি। একমাত্র উল্লেখ... ভূপেন হাজারিকার আবহসঙ্গীত।

ছবির শেষে এক পক্ককেশ বৃ... সঙ্গে সাংবাদিকদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি... লেন উদ্যোক্তারা। তাঁর সেই কৌতুক... মুখ এখন সাদা দাড়ি গোঁফে ঢাকা। আ... উজ্জ্বল দুটো চোখ হাই পাওয়ারের চশ... আচ্ছাদিত। অশক্ত হাতে তিনি অ... বাদন জানাচ্ছিলেন। তিনিই ডি ... কিংবদন্তীর নায়ক ধীরেন গাঙ্গু... বুঝলাম সময় তাঁর কাছ থেকে অ... কিছুই কেড়ে নিয়েছে। বর্তমানের ... ডি জি আমার একেবারেই অপরিচি... আমাদের মতো চলচ্চিত্রপ্রেমী ছাত্রদের কা... তিনি এক স্বপ্নবিশেষ। তাই ঐদিন ... সঙ্গে আলাপের সুযোগ গ্রহণ করি... কেননা আমি এক দুরন্ত ডি জি-... আমার স্মৃতিতে ধরে রাখতে চাই। ... হয়তো সেই কারণেই এই তথ্যচিত্রটি ভুলে যেতে চেষ্টা করব।

আলোচ্য চিত্র : ডি জি : মু... পাওনিয়ার, পরিচালনায় লক্ষমী।

বিকাশ ...

নকল সুখ দুঃখের খেলায়

আর্ট আর বক্স ...অফিসের চিরকে... ঝগড়া মিটিয়ে যাঁরা একটা মাঝামাঝি ... করতে পেরেছেন তাঁদের মধ্যে বা... চ্যাটার্জি অন্যতম। তাঁর প্রথম ছবি 'সা... আকাশ'ই তাঁর পরিচিতির আকাশ ছোঁয়া... হামেশাই যা ঘটে তা নিয়েই তাঁর রসিক... আর ততোই তাঁর রসসৃষ্টি। অনেক টুক... ঘটনা জুড়ে তৈরী হয় তাঁর গল্প। গল্প... ঘিরে থাকে আপাত বাস্তবতার ... ঈষদচ্ছ মোড়ক, কিন্তু পারস্পর্য হা... থাকে হাতের মুঠোয়। সিনেমাকে তাঁ... একান্ত নিজের ভঙ্গীতে কথা বলান। প্র... থেকেই তিনি ট্র্যাডিশনের উল্টোমা... কিন্তু ট্র্যাডিশনাল দর্শকরা তাঁর দি... পিঠ ফিরিয়ে নেই। অনেককে অবাক ক... দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন কাতুকুতু ... দিলেও লোকে হাসে, মজা পায়, খুশী ... এবং আরো আশ্চর্য, কাউন্টারে লম্বা লা... লাগায়।

তাঁর এই ছবিও বক্স অফি... প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হয়নি। ... কাউন্টারে লম্বা লাইন, বড় বড় ... হরফের সদম্ভ ঘোষণা 'হাউস ফুল', ...

চারমে, দাদা একসটা আছে—
লাভের সবগুলো উপসর্গই ঢোকার
চোখে পড়ে। কিন্তু 'রজনীগন্ধা'
' বা বা ছোটিসি বাত-এর সেই
বাসু চ্যাটার্জিকে খুঁজতে গিয়ে ধন্দ
য় মাঝে মধ্যে।

বিপত্নীক অশোককুমারকে হাত
খেতে হচ্ছিল আর বিধবা পর্লের
মুখ) স্বামীর ইনসিওরেন্সের
ফুরিয়ে আসছিল এই অজুহাতে
য়ে করলেন। বিয়েটাকে মেনে নেওয়া
না কোন উপায় ছিল না তাঁদের
য়েদের। একসঙ্গে থাকতে গিয়ে
মধ্যে শুরু হল ঠাণ্ডা লড়াই। ছোট
াকে সুখে পারে ওরা এক হয়ে
ঘটনা মোটামুটি এই। এবং বাসু
র অধিকাংশ ছবির মতো এটিও
বিদেশী ছবির ভারতীয়করণ।

এর গল্প এক পার্সী পরিবারকে
পরিচালক কিন্তু পার্সীয়ানাকে
ছুঁয়েই গেছেন, জড়িয়ে ধরলে
হত। নতুন মুখ পর্ল পদমসির
আবির্ভাব যে নাটকীয় অভিনয়ের
বুঝতে দেরি হয় না (চোখ বাসু
বলেই যে তাতে চালশে ধরবে না
কান মানে নেই)। রাজেশ রোশনের
গানগুলো ভালো লাগার মত, তবে
প্রাচুর্য শেষের দিকে ক্লান্তি আনে।
একটি গানের প্রয়োগ উল্লেখের
—নতুন বাড়ীতে এসে রাত্তিরে
দাওয়ার পব বিছানায় গা এলিয়ে
বাজিয়ে গান ধরে এক ভাই।
সময়, পরিবেশ, সুর, কথা সব মিলে
গড়া শুরু হয়ে যায় বাবা আর মায়ের
বিবদমান দুদল ছেলেমেয়ের মধ্যে।
করে ক্যামেরা ঘুরে বেড়ায় দৃশ্য
শ্যান্তরে। গানের ভিতর দিয়ে ওরা
লোকে ছুঁতে পায়।

লাগছিল নকল দুঃখ সুখের
চাকরি ছাড়ানো, বাড়ী থেকে
—এসব প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপারেও
ছিল না, কেননা জানি বাসু
গল্প হাঁটে কল্পলোকের বেড়ার
তবু হোঁচট খেতে হল অশোক-
মারাত্মক বক্তৃতায়। সুর তাল
ছিঁড়ে ছড়িয়ে গেল। তাও সামলে
াম। কিন্তু প্রদীপকুমার যখন
তার ফিরে দেওয়া শ্বশুরবাড়ীতে
এলেন আছাড় খেলাম তখনি। তাঁর
ছিল এই ধরনের—'এতদিন
পয়সাতেই সব হয়, এখন দেখছি
রও জোর কম নয়' ইত্যাদি। এ কি
শেষে মরাল!

লোচ্য ছবি : খাট্টা মিঠা, পরিচালনা
চ্যাটার্জি।

বিমান দাস

কাল হামারা হ্যায় ছবির শ্যুটিং-এ আরতি ভট্টাচার্য ও পরিচালক গিরিশ রঞ্জন

বিহারে ছবি তৈরীর সূচনা

সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, রাজেন তরফদার, তপন সিংহ, তরুণ মজুমদারের কাছে হাতে কলমে শেখা দীর্ঘ চোদ্দ বছরের ফিল্ম-বিদ্যা এবার প্রমাণ করতে চলেছেন গিরিশ রঞ্জন। বিহারের তরুণ সে। কলকাতা-বম্বে ঘুরছেন প্রায় পনের বছর।

'মেরে মন মিতুয়া' (ভোজপুরী) ও 'ডাক বাংলো' ছবির পর গিরিশ রঞ্জন সত্যি সত্যিই এবার ফিরলেন বিহারে, নিজের জন্মের মাটিতে। ভারতের যে চারটি প্রদেশের (বিহার, ইউ-পি, এম-পি ও রাজস্থান) ভাষা হিন্দী, বম্বে বা মাদ্রাজে তৈরী হিন্দী ছবিগুলিতে সেখানকার বৈশিষ্ট্য কতটুকু থাকে?

এই অভিযোগ তুলে গিরিশ রঞ্জন বললেন, 'নিজের মাটির কথা, নিজের দেশের কথা নিজের মত করেই বলব এবার। সেজন্যই এসেছি বিহারে। তৈরী করেছি কজন মিলে এই 'সংযুক্তাক্ষর'—একটি কো-অপারেটিভ। সংযুক্তাক্ষরের প্রযোজনায় বিহারের প্রথম হিন্দী কাহিনীচিত্র 'কাল হামারা হ্যায়'-এর শুভ সূচনা হল পাটনা শহরে গত ২৭ মার্চ'।

সচিবালয়ের কাছে দেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরীর বিখ্যাত ভাস্কর্য নিদর্শন শহীদ স্মারকের সামনে ছবির মহরৎ শটটির ক্যাপস্টিক দিলেন বিহারের শিল্পমন্ত্রী ঠাকুর প্রসাদ। অব্যবহিত পরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মাননীয় মন্ত্রী জানালেন, বিহারে ফিল্ম তৈরীর প্রচেষ্টায় রাজ্য সরকার সর্বোতভাবে সক্রিয় সহযোগিতা করবে। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় তৈরী ছবির উন্নতমানের কথা উল্লেখ করে তিনি আরও বললেন, বাংলা ছবিই আমাদের অল্প খরচে ভালো ছবি তৈরীর পথ দেখিয়েছে। আমরা সেই পথ অনুসরণ করে বিহারের ছবিকে নতুন মর্যাদার আসন দিতে পারি। গিরিশ রঞ্জনের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে তার সাফল্য কামনা করলেন তিনি। উপস্থিত কলকাতার সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে নির্মল-কুমার ঘোষ (এন-কে-জি) এবং বাগীশ্বর ঝা ছবির সাফল্য এবং রাজ্য সরকরের সক্রিয় সহযোগিতাকে অভিনন্দন জানান।

পরিচালক গিরিশ রঞ্জন জানালেন—আমার এ ছবিতে বক্তব্য রেখেছি বর্ণ-ভেদের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে, শোষিতের পক্ষে।

কাল হামারা হ্যায় ছবি শুধুমাত্র বিহারের প্রযোজিত ছবি নয়, শিল্পী ও কলা-কুশলীরাও সবাই বিহারবাসী। এক সময় যাঁদের কাজের সন্ধানে বম্বের গোলক-ধাঁধায় ঘুরতে হয়েছে তাঁরা সবাই একজোট হয়েছেন এই ছবিতে। একমাত্র ব্যতিক্রম কলকাতার নায়িকা (জন্মসূত্রে তাঁকে বিহারী বলা যেতেও পারে) আরতি ভট্টাচার্য। নায়ক চরিত্রে আছেন পাটনা মঞ্চের তরুণ শিল্পী কুণাল।

নির্মল ধর

হিমালয়ের সরিষা প্রসব

কলকাতায় 'কিস সা কুরসিকা'র স্থায়িত্বকাল এক সপ্তাহ। আসতে না আসতেই বিদায় নিল এই বহুআলোচিত ছবি। জরুরী অবস্থাকালীন কয়েকজনের বোকামী ও স্বেচ্ছাচারী কাজের জন্য ছবিটি বেশ কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল। চলচ্চিত্রের সঙ্গে যাঁদের একেবারেই সম্পর্ক নেই, দৈনিক কাগজের কল্যাণে তাঁরাও এই ছবি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। শুনেছি বর্তমানের এই ছবিটি নিখোঁজকিসা কুরসিকার ট্রু কপি, এবং এ যদি হয়, তাহলে বুঝতে পারলাম না কোন কারণে এই ছবি তৎকালীন সরকারের রোষের কারণ হয়েছিল।

এটি একটি মামুলি ছবি ছাড়া কিছুই

অমৃত নাহাটার ছবি বহু বিতর্কিত কিস্‌সা কুর্সি কার একটি দৃশ্যে কোটি মির্জা ও নাসিরুদ্দিন শা

নয়। খুন, ধর্ষণ, আত্মহত্যা, নাচগান ইত্যাদি বোম্বাই ছবিতে যা সব থাকে, এই ছবিতেও সেসব বর্তমান। তবে পার্থক্য সেগুলোর তুলনায় আলোচিত এই ছবিটি বেশ বিশৃংখল ও দুর্বল। এর প্রতীক সংলাপ, ব্যঙ্গ ইত্যাদি ভিষণ স্থূল। জনগণের ওপর অত্যাচার বোঝাতে দেখানো হয় জনতারূপী শাবানা আজমীর ধর্ষণ।

বলা হয়েছিল এটি একটি রাজনৈতিক ছবি। কিন্তু রাজনৈতিক ছবি করার মূলে যে দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন, যে বোধ, যে মানসিকতা ইত্যাদি দরকার, আলোচ্য ছবিতে সেসব কিছুই নেই। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত হিংসা, ক্রোধ, আত্মাপরতা থেকে শুধু রাজনৈতিক ছবি কেন, কোন মহৎ সৃষ্টি হয় না।

পরিচালক অমৃত নাহাটার পক্ষে এটা সৌভাগ্যবিশেষ যে ছবিটিকে নষ্ট করা হয়েছিল। পয়সা ও পরিশ্রম ছাড়াই তিনি একটা বড় ধরনের প্রচার পেয়ে গেছেন। অবশ্য তিনি যদি ছবিটি পুনর্নির্মিত না করতেন, তাহলে তা হতো আরো লাভজনক। কেননা আমাদের মধ্যে এ সম্বন্ধে এক কৌতুহল জীবিত থাকত।

বিদেশী ছবি

মারডার বাই ডেথ (কলম্বিয়া)—এই শ্বাসরুদ্ধকারী কৌতুকপ্রবণ রহস্য ছবিটি সিনাভার অন্যতম আকর্ষণ। পৃথিবীর পাঁচজন শ্রেষ্ঠ রহস্যসন্ধানী এক খামখেয়ালী কোটিপতি বেনসনের ভিকটোরিয়ার প্রাসাদে উপস্থিত হয়েছে ডিনার খেতে এবং হত্যার রহস্যের অনুসন্ধান করতে। কিন্তু প্রাসাদের প্রবেশ মুখেই তাঁদের কারো কারো উপর মূর্তি ভেঙে-পরা থেকে কলিংবেলের মৃত্যুক্রন্দনপ আর্তনাদ ছবির পরিবেশকে আরো রহস্যময় করে তুলেছে। আর্টনিং রূমে জানানো হল ঠিক রাত বারোটায় এখানে যাঁরা উপস্থিত থাকবেন তাঁদের মধ্যে একজন ছুরিকাঘাতে নিহত হবেন। এই হত্যা-রহস্য যিনি উদ্ঘাটন করতে পারবেন, তিনি পাবেন পুরস্কারস্বরূপ এক মিলিয়ন ডলার। আর রাত বারোটার পরেই খুন হলেন একজন। এরপর রহস্য সন্ধানীরা রহস্য উন্মোচন করতে ব্যস্ত এবং সর্বশেষে ওঁরা কোটিপতি বেনসনের আসল রূপ আবিষ্কার করলেন যিনি কখনও অন্ধ কখনও বাবুর্চি, কখনও রমণী। পরিচালক এই রহস্যধর্মী ছবিতে রহস্যের সঙ্গে কৌতুক পরিবেশন করে ছবিটিকে স্যাটায়ারধর্মী করে তুলেছেন। শিল্পীদের উঁচুদরের অভিনয় এবং আঙ্গিক এক কথায় চমৎকার। বিশেষ করে অন্ধ বাবুর্চিরূপী পিটার সেলার্স এবং চাইনীজ রহস্যসন্ধানীরূপী পিটার সেলার্সের অভিনয়ের প্রশংসা না করে পারা যায় না।

দি আইগার স্যাংশন (ইউনিভার্সাল)—এলিট সিনেমায় মুক্তিপ্রাপ্ত এ ছবির অন্যতম আকর্ষণ হলো ১৩ হাজার ফুট উঁচু পর্বত জয়ের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। কিন্তু পর্বত জয়ের পিছনে লুকিয়ে আছে হত্যা রহস্য এবং অপরাধী ব্যক্তিদের উৎপীড়ন ও দুর্দান্ত অ্যাকশান। বিশেষ করে বরফে ঢাকা পর্বতমালা অভিযানের সময়, একাধিক অভিযাত্রী পা পিছলে মৃত্যুমুখে পতিত হন, ছবির নায়কও মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রায় মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিলেন। একদা চিত্রকলার শিক্ষক এক সরকারী ব্যক্তির মৃত্যুর রহস্য উদ্ধার করতে গিয়ে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো, সেই সঙ্গে আইগার পর্বত বিজয়ের ঘটনা মিশিয়ে পরিচালক সম্ভবত এ্যাডভেঞ্চার এবং রহস্যকে একীভূত করতে চে[...] পরিচালক ও নায়ক ক্লিন্ট ইস্টউ[ড] দায়িত্ব পরিচালনা করবার ব্যাপা[রে] ত্রুটি রাখেন নি। অভিনয় ও আ[ঙ্গিক] প্রথম শ্রেণীর।

অশোক

ফুল্লরা - কালকেতু

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী, রূপ[ায়ণে] পালা-সম্রাট ব্রজেন দে—নাটক কালকেতু। প্রাচীন ধর্মমূলক পাঠ হতে তখনও কিছুটা সময় বাকি পরিপূর্ণ হল। দর্শকরা অধীর অপেক্ষা করছে।

কনসার্ট শুরু হলো। কি পর্দা উঠে শুরু হলো নটরাজ নৃত্য উপস্থিত হলেন কালকেতু। নীলাম্বর ও তার স্ত্রী ছায়া মহাদেবে[র] শাপে মর্ত্যে জন্ম নিলেন ব্যাধ-এর ঘ[রে]। অভাব অনটনের মধ্যেও তাদের ভগব[ৎভক্তি] নষ্ট হয়নি। অবশেষে ভগবান সা[...] —কালকেতু নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠা[...] প্রতিটি মানুষের মধ্যে ভগবানকে প্র[...] দীনভাবে ন্যায় বিচার ও ক্ষমা[...] রাজারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। শাপভ্রষ্টদেব-দেবীরা একদিন স্বর্গে গেলেন।

দ[...] চট্টোপাধ্যায় পরি[চালিত] এই পৌরাণিক ধর্মমূলক পালা প[...] মন-প্রাণ দিয়ে উপভোগ করেছে। পরিশ্রমের মর্যাদা পেয়েছে [...] কোম্পানী। কালকেতুর ভূমিকায় [...]পাধ্যায়ের অনবদ্য অভিনয় মনে [রাখার] মতো। প্রতিটি দর্শক ব্যক্তিগতভাবে টিম ওয়ার্ক ও গানের [...] জন্য গুরুত্ব বেড়েছে।

ছোটখাটো এ মানুষটির কর্ম[...] ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে যে সৃজনশীল[তা] লক্ষ্য করা গেল তা সত্যই [...]

শংকর গা[...]

সংশোধন

চালের চোরাকারবারের [...] যেখানে বীরভূম, বর্ধমান ও [...] হেক্টর পিছু চালের গড় ফলন [...] ১৮, ১৭ ও ১৬ কেজি রয়েছে [...] ১৮, ১৭ ও ১৬ কুইন্টাল পড়[তে হবে]।

০ ০ ০

ইউ আই বি (স্ট্যান্ড রো[ড]) কর্মিবৃন্দ গত ২৫শে জান[ুয়ারি] [...]বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'শেষ থে[কে]' নাটকটি রঙমহলে কালীপদ [...] নির্দেশনায় অভিনয় করেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১০ পয়সা।

শুক্রবার ১৬ বৈশাখ, ১৩৮৪

Friday 29th April, 1977

১৬ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

ছবি এঁকেছেন : সুবোধ দাশগুপ্ত ও নিতাই ঘোষ

আগামী সংখ্যায়

গল্প লিখবেন

শিশির লাহিড়ী

চাণক্য সেনের কলম

স্নেহাকর ভট্টাচার্যের কবিতা

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পর্কে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

গোপাল সান্যালের স্কেচ

অমৃতের দৃষ্টিতে বিশদে

আলোচনা

সিনেমা, নাটক,

ছবি, যাত্রা, গান

আবার পড়লাম

সাক্ষাৎকার

বাংলার বাইরে বাঙালী

মফঃস্বল শহরতলী

প্রচ্ছদ কাহিনী

ব = বা
ও = উ
ল = ল
+ = ত(ট)

ইতিহাসের হারানো সুতো

লিখেছেন

সুধাংশুকুমার রায়

কলকাতার যমজ বোন

কলকাতার একটি যমজ বোন আছে, ঈষৎ কাব্যিক শোনালেও কথাটি সত্য। কিন্তু আমাদের আচার-আচরণে মনে হয় যমজ তো নয়ই সৎ-বোনও নয়, তার অস্তিত্বের বিষয়েই আমরা যেন সচেতন নই।

এই বোনটির নাম হাওড়া। একটু ভেবে দেখলেই টের পাওয়া যাবে শহরটির বিষয়ে আমরা কী পরিমাণে উদাসীন, অথচ কলকাতার অস্তিত্বের ব্যাপারে হাওড়ার অবস্থান ও অবদান অপরিহার্য। ইতিহাসের দিক দিয়ে হাওড়ার সূচনা ঘটেছে কলকাতার প্রায় সম-সময়েই, যদিও তার বিকাশ ও ব্যাপ্তি দেখা দিয়েছে কলকাতা প্রতিষ্ঠার পরে। আবার কলকাতাও যে এত বড় শহর হতে পেরেছে, সেটা হাওড়া ছিল বলেই। কলকাতার শহরতলী অঞ্চল সুবিস্তীর্ণ, কিন্তু এই বিশাল মহানগরীর চাপ তার চেয়ে অনেক বেশি। হাওড়া সেই চাপ অনেক পরিমাণে নিজের ওপর টেনে নেয় বলে রক্ষা, নয়তো বহু আগেই জনবিস্ফোরণে বিপর্যস্ত হয়ে যেত কলকাতার জীবনযাত্রা।

এবং কেবল তাই নয়। সময়ের সমুদ্র মন্থনে যতো কিছু সুখের অমৃত সবই বরাদ্দ হয়েছে কলকাতার জন্য, হাওড়ার কপালে জুটেছে কেবল বিষই। সত্যি বলতে কি, গোটা হাওড়া শহরকেই মস্ত একটি শহরতলী বললে বাড়িয়ে বলা হয় না। অথচ ঠিক এরকমই হবে এটা নিয়তিনির্দিষ্ট নয়, অন্যরকম হলেও পারত; অন্যরকমও হতে পারে। হাওড়ার বিষয়ে সেইটেই সব থেকে বড় কথা।

পৃথিবীর মানচিত্রে তাকালে দেখা যাবে অনেক মহানগরীর মাঝামাঝি দিয়েই নদী বয়ে গেছে। হয়তো এমন হতে পারে যে, প্রথমে কোনো কোনো শহর নদীর একটি পাড়েই গড়ে উঠেছিল, কিন্তু জনসংখ্যার চাপবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে অন্য পাড়ে। কিন্তু সেই কারণে হাওড়ার মতো 'কাব্যের উপেক্ষিতা' হয়ে থাকতে হয়নি, তার প্রতিও বরাদ্দ হয়েছে সমান সুবিচার। ওপারের শহরকে এপারের থেকে আলাদা মনে হয় না তাই, নদীর ওপারে গেলেই মনে হয় না সেটা অন্য শহর।

কলকাতা আর হাওড়া মিলেও হয়তো হতে পারত সেইরকম একই শহর। এখনও তা হতে পারে। হওয়াটাই উচিত।

কলকাতার উন্নয়নের জন্যে পরিকল্পনা এখন বহুমুখী। কিন্তু তার সঙ্গেই হাওড়ার উন্নয়নকেও যদি ত্বরান্বিত করা হয়, কলকাতারও তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে অল্প আয়াসে।

রাস্তাগুলো চওড়া করে পরিবহনের সুব্যবস্থা করা হলে, বস্তির বদলে বহুতলবিশিষ্ট সরকারী আবাস তৈরি করা হলে, এবং রাজ্য সরকারের কিছু অফিস নদীর ওপারে সরিয়ে নিলে দুটি শহরের সামনেই খুলে যেতে পারে ক্রমবিকাশের পথ। আমাদের পরিকল্পনা তৈরি করেন যাঁরা, কেন-যে তাঁরা সমস্যাটি এভাবে দেখছেন না সেইটেই আশ্চর্য।

হাওড়াকে যদি আলাদা শহর না ভেবে কলকাতার সঙ্গে অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হয়, দুটি শহরই তাহলে হতে পারে সুখী ও সুসমৃদ্ধ। এক বৃন্তে দুটি ফুলের মতো দুটি শহরই হতে পারে সুন্দর।

কাগজের দেবীদের কাছে প্রার্থনা
দেবাঞ্জলি মিত্র

দূরে এবার দেখা যাচ্ছে বইয়ের দেশটা
আরো দূরে দূরে উড়ন্ত বিশাল পাহাড়
এখান থেকে খুব ছোটো ছোটো
যেন দূরবীনের ওপারের রাজ্য!

বইয়ের দেশের পথে পথে
সাদা কাগজের দেবীরা পাতার ঝারি নিয়ে
হাল্কা ফিনফিনে জলের অক্ষর ছড়াচ্ছে।
সরস্বতীর বাড়ীর ছাদে
ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা
'ত'-বর্গ 'প'-বর্গের ঘুড়ি ওড়াচ্ছে
আমি ছোট্ট জাপানী মেয়ের মত
একরাশ আলোর মধ্যেও
জাপানী লণ্ঠন দিয়ে পথ কেটে চলেছি।....
বইয়ের পাহাড়ে হঠাৎ এ—কি
আগ্নেয়-লাভা উঠছে
লক্ষ লক্ষ বৈশ্বানর ফণা তুলে এদিকেই ছুটে আসছে।....
কে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক
উদাত্ত স্বরে গান গেয়ে উঠলেন
আবার সব আগের মত চুপচাপ—
আগুনের শব্দ একেবারে শান্ত হ'য়ে গেছে।.... ....

আমি ক্রমাগত চলতে চলতে এখন
বইয়ের দেশে পথ হারিয়ে ফেলেছি
হে সর্বশুক্লা কাগজের দেবীরা
এখন মূক হ'য়ে থাকো
আমায় কেউ কখনো আর
পথ ব'লে দিও না।

গ্রাম : ১০
দীপক হালদার

তামার ভীষণ দুঃখ
ধ ঘরের চার দেয়ালের মতন তুমিও ছুটি চাও
তামারও দরকার চাবির মতন এক নাকছাবি
া না হ'লে
ভেতর মহলের স্বন্দকে এড়িয়ে
কিছুতেই দাঁড়াতে পারো না খোলা বারান্দায়
পগুজবের মতন সাবলীল সঙ্গীও মেলে না তোমার
তামার বড্ড ভয়
ধারের মতন নিঃসাড় পড়ে থাকো গরীব কাঙাল
টে গেলে তুমিও দিনের মতন তুলো বীজ
দিগন্তে ছড়াও

তে পাও লাটাইয়ে সুতো
শির হুইলে
তুমিও খেলাতে পারো রাঘব বোয়াল

মুহূর্ত
মতি মুখোপাধ্যায়

একেকটা মুহূর্ত যেন সৈন্য নামায় শরীরের অলিতে গলিতে
জলপাই গাড়ি সারি বেঁধে ছুটে যায় বাতাসেরও আগে
ভয়ে দ্রুত হাঁটে মানুষ যে যার আয়নার ভেতরে
সমুদ্রের গাঢ় ফেনার মতো তার উত্তেজনা
কষ বেয়ে নামে, ক্রমাগত যেন প্যাডকে পা ঠুকছে ঘোড়া
সুষুম্না থেকে শিশ্ন থেকে পায়ের নখাগ্রে যেন
অবলীলায় চলে যাচ্ছে মানুষের উত্তেজনা ও অস্তিত্ব।

হায়, সবটাই তার ভ্রান্তি, নাকি তাৎক্ষণিক বিলাস
তারে জমা জলের ফোঁটার মতো এইসব ক্ষণ
উইকেটে আসামাত্র ফিরে যায়, শুধু
টান টান স্নায়ু হরধনু ভাঙার বিফলতায়
একদিন মঞ্চে শোনা শিশির ভাদুড়ীর সেই স্মরণীয়
'সীতা....সীতা' শব্দের প্রতিধ্বনি তোলে।

মুহূর্ত তখনি ডোবে দশমীর দুঃখ নিয়ে জলে।

অন্ধকার
গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার কথা মনে হ'লে অন্ধকার ভুলে যাই
আলোয় ভাঙে তার প্রতিবাদহীন মনস্কতা
তুমি নিভাঁজ শয্যায় শরীর ডুবিয়ে আছো, লিরিল এর
গন্ধ ভাসছে বাতাসে
নিজস্ব নিয়মে দেখো পড়ে আছে আদুত চুল
তোমার শরীরের লাস্য
তুমি নিভিয়ে দিলে আলো
তোমার শাড়ির ফাঁসে বেঁধে ফেলছো অহংকার
একঝলক জ্যোৎস্না তোমায় করছে আলিঙ্গন।

কয়েকটি টুকরো

গুল্ম

পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ, রক্তে জল ছলছল করে
নৌকোর গলুই ভেঙে উঠে আসে কৃষ্ণা প্রতিপদ
জলজ গুল্মের ভারে ভরে আছে সমস্ত শরীর
আমার অতীত নেই, ভবিষ্যৎও নেই কোনোখানে।

ঝড়

ঝড়ে-ভাঙা লাইটপোস্ট একা পড়ে আছে ধানখেতে
শিয়রে জোনাকি, শূন্যে কালপুরুষের তরবারি
যুদ্ধ হয়ে গেছে শেষ, নিঃশব্দ প্রহর দশ দিকে
যেদিকে তাকাও রাত্রি প্রকাণ্ড নিকষ সরোবর।

ঘুম

চোখের পাতায় এসে হাত রাখে শ্লথ বেলপাতা
পাকা ধান নুয়ে পড়ে আদরে ঘিরেছে শরীরীকে
বালির গভীর তলে ঘন হয়ে বসে আছে জল
এখানে ঘুমোনো এত সনাতন, জেগে ওঠা—তাও।

ঘর

ঠাণ্ডা পাথরের ঘর, কবুতর অন্ধ খোপে খোপে
থামগুলি উঠে গেছে প্রাঞ্জল শিখরে, শীর্ষে আলো
নীল কাঁচ ভেদ করে বুকে ছুটে আসে বর্তমান
হাজার হাজার বর্শা ছেঁড়া-পালকের গন্ধে ভরা।

শব

ভাসন্ত শবের মুখে বসেছিল দক্ষিণের পাখি
সূর্যের অন্তিম হাত মুছে দিয়েছিল দুঃখরেখা
পলিতে পলিতে দেশ ছেয়ে যাক। যায় নি এখনো ?
ভাসন্ত শবের পাখি সূর্যের কুহরে উড়ে যায়।

শিকড়

আর্তনাদ করে ওঠে, দুহাত ছড়িয়ে বলে : এসো
এসো সর্বনাশে এসো আগ্নেয় গুহায় এসো বোধে
এসো ঘূর্ণিপাকে বীজে অন্ধের ছোঁয়ায় এসো এসো
শিকড়ে গরল ঢেলে শিখরে জাগিয়ে দেব জ্বালা।

সমালোচনা

শংখ ঘোষ। জন্ম ১৯৩২।
পেশা ঃ অধ্যাপনা

এমারজেন্সি যখন তুঙ্গে, সেইসময় শ্যামবাজারের কাছাকাছি একজন কবি লিখছেন, 'কথা তবু থেকে যায়/ কথার মনেই কঠোর বিকল্পের পরিশ্রম নেই।' এর সঙ্গে স্মর্তব্য, ১৯৬৬ থেকে লিখতে শুরু করে ১৯৭৭ পর্যন্ত একবারও না-পিছিয়ে ক্রমাগতই এগিয়ে যাওয়া এই কবি কিন্তু মাঝখানে, শেষ-পঞ্চাশ ও প্রথম-ষাটে কলম থামিয়ে রেখেছিলেন।

কিন্তু এই নয় যে রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার অচলতার বিরুদ্ধে কয়েকটি তীক্ষ্ণধার কবিতা আর টানা আট বছর লেখা ছেড়ে দিতে পারার কবি-চরিত্রই শংখ ঘোষের একমাত্র উপার্জন। যেখানে সমসাময়িক অন্যান্য লেখকরা হয়তো আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার আগিদে আর রবীন্দ্রনাথ পড়ছেন না, সেই সময়ের সেই দেশেই তাঁদের একজন সতীর্থের ভূমিকায় শংখ ঘোষের রবীন্দ্রবর্গ প্রায় প্রবাদতুল্য ও জনপরিচিত। এই অর্থে, সব থেকে বড়ো ঝুঁকি নিয়েও শংঘ ঘোষ এ পর্যন্ত তাঁর কবিতায় সফল রয়েছেন—তাঁর কবিতার খ্যাতি আমাদের জীবনযাপনের সর্বাঙ্গে জুড়ে রয়েছে।

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

ভারতীয়ত্ব ও পিতৃতান্ত্রিকতার সমস্যা

শওকত ওসমানের গদ্যরীতির সঙ্গে আমাদের আগেই পরিচয় ছিল, এবং আমরা জানতাম, পশ্চিম বাংলার গল্প-উপন্যাসের গদ্যের সঙ্গে পূর্ববাংলার আরও অনেক গদ্যলেখকদের মতই শওকত ওসমানের ভাষার একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। পশ্চিমবাংলার কোন সতর্ক সমসাময়িক লেখক গল্প-উপন্যাসের গদ্যে হঠাৎ তৎসম শব্দের ব্যবহার ঘটান না, যেমন শওকত ওসমান ঘটান 'আমার দুই পা আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে গেল মন্দিরসংলগ্ন জঙ্গলে', 'জন-চক্ষে যিনি আমার বাবা'---জাতীয় বাক্য বা বাক্যাংশ লিখে। এই গদ্য সময়ে সময়ে কতটা রেটিসেন্স দিতে পারলেও, বেশীর ভাগ সময়েই কর্কশ। শওকত ওসমানের চেষ্টায়ও, এই গদ্য লেখিকার অনুবাদকে কখনও কখনও ধারাল করেছে আর কখন কখনও একটু বেশী সাহিত্যিক করে তুলেছে।

এ সত্ত্বেও শওকত ওসমানের কাছে আমরা প্রতিফলিতভাবে কৃতজ্ঞ, কেননা অমৃতা প্রীতমের একটি চমৎকার উপ-ন্যাসকে তিনি নির্বাচন করেছেন। উপ-ন্যাসটির ঘটনা যদিও এক দ্বিধাপত্তাবিশিষ্ট যুবকের হীনমন্যতা, অ্যাগনি আর অ্যাসেটিক জীবনযাপনের ভঙ্গী—যুবকটির মায়ের স্বামীর সঙ্গে একটু নাটকীয় কথোপকথনেই যুবকটির উপলব্ধি যদিও জমায়, তাও উপন্যাসটি শেষ পর্যন্ত উপন্যাস। দেবানুগ্রহের রূপক হিসেবে একটি ছেলেকে অ-পারিবারিক জীবন কাটাতে হচ্ছিল — এখানেই গল্পটির বিশ্বাসাত্তা এসেছে, যার জন্যে, মন্দির-সেবায়েৎ এই নায়কের চরিত্রটিকে আসলে কোন লেখক-চরিত্র বলে সন্দেহ হয় না। তার সন্দেহজর্জর গন্ধমাদনী জীবন বা তার এই দৈবানুগ্রহের ঋণ (শিবের কাছে ধর্ণা দিয়ে তার জন্ম হয় ঃ পরে সে জানতে পারে তার শরীরের জনক তার পিতা নন) শোধ করে দেয় মানুষের প্রতিবেশীতাই। সমস্ত অস্তিত্বের পশ্চাদভূমি হিসেবে দাম্পত্যকে সে দেখতে পায়, যা তার কাছে কৈলাসের অনুষঙ্গে ফিরে আসে। অমৃতা প্রীতম মূল চরিত্রটির সমস্যাকে একটা ব্যাপ্তি দিতে পেরেছেন। যদিও চরিত্রটি কাজ করে না, টুকরো-ভাবনাই বেশী ভাবে। তার আশ্রমিক জীবনযাপনের বর্ণনা, তার চিন্তার পদ্ধতি বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে অমৃতা কতকগুলি সত্যে পৌঁছতে পেরে-ছেন, যে সত্য আমাদের বেঁচে থাকাকে সমর্থন করে। তাঁর ইমেজ বা ঘটনাকল্প নির্বাচন তাঁর দর্শনকে ঠিক মত রোদ-জল-হাওয়াও দিয়েছে। এই কারণে, পাইকায় ছাপা চুরানব্বই পাতার বই হয়েও, লেখাটা একটি উপন্যাস পড়ার অবস্থা তৈরি করে দিতে পারে। বাঙালী পাঠকদের যা সব থেকে খুশী করতে পারে তা হল অমৃত প্রীতমের আয়রনির বোধ। শিবের কাছে ধর্ণা দিয়ে পাওয়া বালকের সঙ্গে তার বালিকা অনুরাগিণীর হঠাৎ দেখা হলে, মেয়েটি বলে ওঠে, 'ওই যে আমার পুরোন আমার যোগী।'

এই গদ্যটি ভারতীয়ত্ব ও পিতৃ-তান্ত্রিকতার রূপ ও সমস্যা সম্বন্ধে সচেতনতার জন্যে সেই ধরনের দুর্লভ গভীরতা পেয়েছে, যা আমরা এখনকার বাংলা উপন্যাসে বিশেষ পাই না।

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

সন্তানের স্বীকারোক্তি—অমৃতা প্রীতম। অনুবাদ ঃ শওকত ওসমান। অনন্য প্রকাশন।

পত্রিকা

অনিকেট। শিশু সাহিত্য সংখ্যা। সম্পাদক ঃ বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৯।১।১এ, লক্ষ্মী দত্ত লেন। ৭০০০০৩।

সাহিত্য সংস্কৃতি ত্রৈমাসিক অনিকেট-এর ঊনবিংশ সংখ্যাটি শিশু সাহিত্য সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত। প্রচ্ছদ থেকে শেষ পর্যন্ত পত্রিকাটি দৃষ্টিনন্দন, বিষয় বিচারেও রয়েছে সুসম্পাদনার পরিচ্ছন্ন ছাপ। গোড়ায় স্বপক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে বলা হয়েছে এই সংখ্যায় প্রকাশিত লেখাগুলি আগাপাশতলা ছোটদের জন্যই।

দীপংকর চক্রবর্তীর বর্ণ পরিচয়—বর্ণমালা নিয়ে ছড়ার মালা। যোগীন্দ্রনাথ সরকার এ ব্যাপারে এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। রবীন্দ্রনাথ অননুকরণীয়। এর পরেও অনেকে চেষ্টা করেছেন তেমন জমেনি। দীপংকর পুরনো পথে না গিয়ে নতুন মেজাজে বর্ণমালার ছড়া শুনিয়েছেন—তাঁর যা কিছু কৃতিত্ব সে শুধু এই কারণেই। কিন্তু ছড়াগুলি প্রায়ই ছোটদের জন্য নয়। উড়তরে কোন শুয়ে হাতি? ঊনিশতলার জ্বলছে বাতি। এই দুই পংক্তি কি ছোটদের পক্ষে বোধগম্য? উত্তর (উত্তর) ছত্রপতি (ছত্রপতি) গলপো (গল্প) সনধ্যা (সন্ধ্যা)

ফমীদ (ফদিদ) বনদুক (বন্দুক)—সংযুক্ত বর্ণ ভেঙে এই রকম বানান লেখার মানে? ছোটদের পড়তে অসুবিধে হবে? তাহলে সংযুক্ত বর্ণ পরিহার করাই উচিত ছিলো।

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাগলা রাজা একটি চমৎকার সংযোজন। ১৪৪ লাইনের পদ্যে পাগলা রাজার কাণ্ড-কারখানা ছোট-বড় সবাইকে মাতিয়ে রাখে। ছড়ার মজা ও গল্পের রস—দুই-ই মেলে। অন্নদাশংকর রায়ের হুকুম অবশ্যই ছোটদের জন্য অনবদ্য একটি ছড়া। আরও ছড়া লিখেছেন অমলকান্তি ভট্টাচার্য, করুণাময় বসু, প্রশান্ত রায়।

মঞ্জু ভট্টাচার্যের বিদেশী গল্পের ছায়ায় জীবজন্তুর গল্প হৈ হৈ করে পড়ে হৈ চৈ করে মেতে ওঠার মতো। ভাল্লুক ভায়ার এ্যাকটিং গ্র্যাফজোর বাঁদরামি জল-ইঁদুরের ঘর-গেরস্থালি—চমৎকার। শিবরাম চক্রবর্তী, তারাপদ রায় বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের রচনার শেষে তাঁদের বই-এর বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটি অভিনব হলেও এই সংখ্যার তেমন মানানসই হয়নি। প্রশান্তকুমার দাসের তোমাদের গল্পের আসর বৈঠকী মেজাজে অনেকটা অবন ঠাকুরের স্টাইলে লেখা একটি আশ্চর্য সুন্দর রচনা। খুশী খুশী মন নিয়ে পড়তে বসে অনায়াসে কত কী গুরু-গম্ভীর বিষয় আপনিই জানা হয়ে যায়। অনেক দিন মনে থাকবে এই লেখাটি।

অমিতাভ চক্রবর্তী

ফাল্গুনাস, ফুলের বাগান। ২য় খণ্ড। দাম ৫ টাকা। ১১।২ টেমার লেন, আইডিয়াল বুক এজেন্সী কলিকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক: সত্যরঞ্জন বিশ্বাস।

ফুলচাষের বাংলা বইয়ের খুব অভাব। ফুলের বাগান ২য় খণ্ডে গোলাপ চাষ কিভাবে হাতে কলমে করতে হয় তা তো আছেই আর আছে ডাল ছাঁটাই, গাছের কলম তৈরি, ডাইব্যাক রোগ, পোকার আক্রমণের প্রতিকার নানা বিষয়ে লেখা আছে। এ ছাড়া আছে রজনীগন্ধা, চন্দ্রমল্লিকা, বেল, গন্ধরাজ হাসনুহানা ছাড়াও আছে গ্লাডিওলাস সম্বন্ধে একটি বড় রচনা আর আছে ছাদে বাগান নিয়ে লেখা। বীজ থেকে চারা তৈরির ওপর বিশেষ রচনা লিখেছেন ডঃ পার্থরঞ্জন দাশগুপ্ত, গোলাপ নিয়ে লিখেছেন—সাধন রায়চৌধুরী, অজিত দেওয়ান, সুভাষ গুহনিয়োগী, অজয়কান্ত রায়চৌধুরী, কমল চক্রবর্তী, নমিতা গুহনিয়োগী প্রমুখ। গ্লাডিওলাস নিয়ে লিখেছেন ডঃ রাধাগোবিন্দ মাইতি। প্রকৃত ফুলচাষীদের বইখানি গাইড হিসাবে কাজে লাগবে।

অনুক্ত

পত্রপত্রিকা

উত্তরসূরি—সম্পাদক: অরুণ ভট্টাচার্য। ৯বি-৮ কে সি ঘোষ রোড। কলকাতা-৫০।

মূল্যবান প্রবন্ধ ও সুনির্বাচিত কবিতা প্রকাশ করে উত্তরসূরি বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে সম্প্রতিকালে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। এক সময় ছিল যখন, উত্তরসূরির প্রকাশিত সংখ্যা সংগ্রহ করা ছিল গৌরবের। সম্পাদক শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য সুধী পাঠকের ধন্যবাদ পাবেন এ কারণে। অনিয়মিত প্রকাশই পাঠক ও পত্রিকার মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করেছে ইদানিং। বর্তমান সংখ্যা দুটি (২৩বর্ষ ৩য়-৪র্থ এবং ২৪বর্ষ ১ম) হাতে নিয়ে সেই পুরোন দিনের কথাই মনে পড়ে। এক-নাগাড়ে ২৪ বছর সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করা কম গৌরবের নয়। দুটি সংখ্যার মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়, বার্টরান্ড রাসেল এবং অহোবাদের ধারণা), অমলেন্দু ভাদুড়ী (আনা কারেনিনা ও গৃহদাহ), মণি বাগচী (আনন্দ-কেন্টিস কুমারস্বামী) বিজয় দেব (খুঁজে নিও মনতাজে), অরুণ ভট্টাচার্যের কবিতার ভাবনা (২য় পর্যায়)। বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী: অপ্রকাশিত কুলপঞ্জিকাটি মূল্যবান। প্রতিষ্ঠিত ও তরুণ কবিদের কবিতা আছে দুটি সংখ্যায়। কয়েকটি অনুবাদ কবিতা আছে।

অন্যত্র

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পতাকার সৃষ্টি অতি আকস্মিকতার মাঝে, এবং বিদেশের মাটিতে। বিনয় মুখোপাধ্যায়। ডাক দিয়ে যাই।

নারী তুমি শরীর ওড়াও সাংকেতিক সমবেত ছন্দবন্ধে কি পায়রা কি পিজিওন—যা ওড়ে, তা শান্তির প্রতীক চেনো না? অনন্যা রায়। গাঙেয়।

এতো বড়ো কইল কেতাটা, কিন্তু এট্টুসও মাটি নেই কো। অশোক বিশ্বাস। অতন্দ্র।

সইরে তোর নাক ছাবিতে
শিশির দোলে দুটো
একটা বুঝি খাঁটি এবং
আরেকটা তো ঝুটো

বাসুদেব দেব। এলাটিং বেলাটিং!

মৃত্যুর আগে মানুষ বাঁচতে চায় হাওয়ার মত, আলোর মত। ঘরের সব কটা জানলা খুলে দিতে চায়। মৃগাল সেন। ঋতম।

নিজের ভেতর যদি একটা দুর্দান্ত রানওয়ে থাকে সেখানে অস্পষ্ট রোমান্টে অন্য কেউ হামাগুড়ি দিচ্ছে এটা ঠিক নয়। কল্যাণ চক্রবর্তী। সৈকত।

আর মেঘ থেকে এখন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে আরেকটা মেঘ, কম কথায় এখন কী গভীর রাত্রি

শ্যামলকুমার রায়। পিরামিড।

রবীন মণ্ডল

জন্ম ১৯৩২। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। কলকাতার ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজ এবং আশুতোষ মিউজিয়ম থেকে শিল্পশিক্ষা লাভ করেন। ক্যালকাটা পেন্টার্স-এর প্রতিষ্ঠাতা সভ্য। ১৯৬১ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রথম একক প্রদর্শনী মারফৎ রসিক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পরবর্তীকালে কলকাতা এবং দিল্লীতে তাঁর একাধিক একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন শহরে গ্রুপ প্রদর্শনী মারফৎ অংশ গ্রহণ করে আসছেন। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় প্রদর্শনী এবং তৃতীয় ভারতীয় ত্রি-বার্ষিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশে বিভিন্ন শিল্পান্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত এবং কলকাতার শিল্প মেলার প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর একাধিক শিল্প-প্রাসঙ্গিক রচনা প্রকাশিত হয়ে থাকে। 'টুয়েন্টি বাই ফোরটিন কনটেমপোরারী আর্টিস্টস অফ বেঙ্গল' বইটির প্রকাশনার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। দিল্লীর মডার্ন আর্ট গ্যালারী এবং মনিপুর স্টেট কলা আকাডেমীতে তাঁর চিত্র সংগৃহীত আছে। এছাড়া ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ায় একাধিক ব্যক্তিগত সংগ্রহে তাঁর কাজ আছে।

রবীন মণ্ডল তাঁর রেখাচিত্রটিতে বিচ্ছিন্ন এলোমেলো রেখার সংযোজনে এক নিজস্ব পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। রেখার বাহুল্য তাঁর বক্তব্যবিষয়কে অতিক্রম করেনি। অঙ্কিত বস্তু তার সামগ্রিক দ্যোতনা ভারসাম্য হারায়নি। রবীনের ছবিতে একক অস্তিত্বের নিঃসঙ্গ মানসিকতা সম্বন্ধে অনেক অব্যক্ত যন্ত্রণার কথা বলে। এই রেখাচিত্রটিতেও নিঃশব্দ অস্তিত্বের ঘোষণা আছে—যা আপন মহিমায় উজ্জ্বল। রবীন তাঁর স্বভাবজাত আদিমরীতির প্রতি আনুগত্য দেখালেও তাঁর স্বকীয়তা চিত্রটির সর্বত্র সুস্পষ্ট।
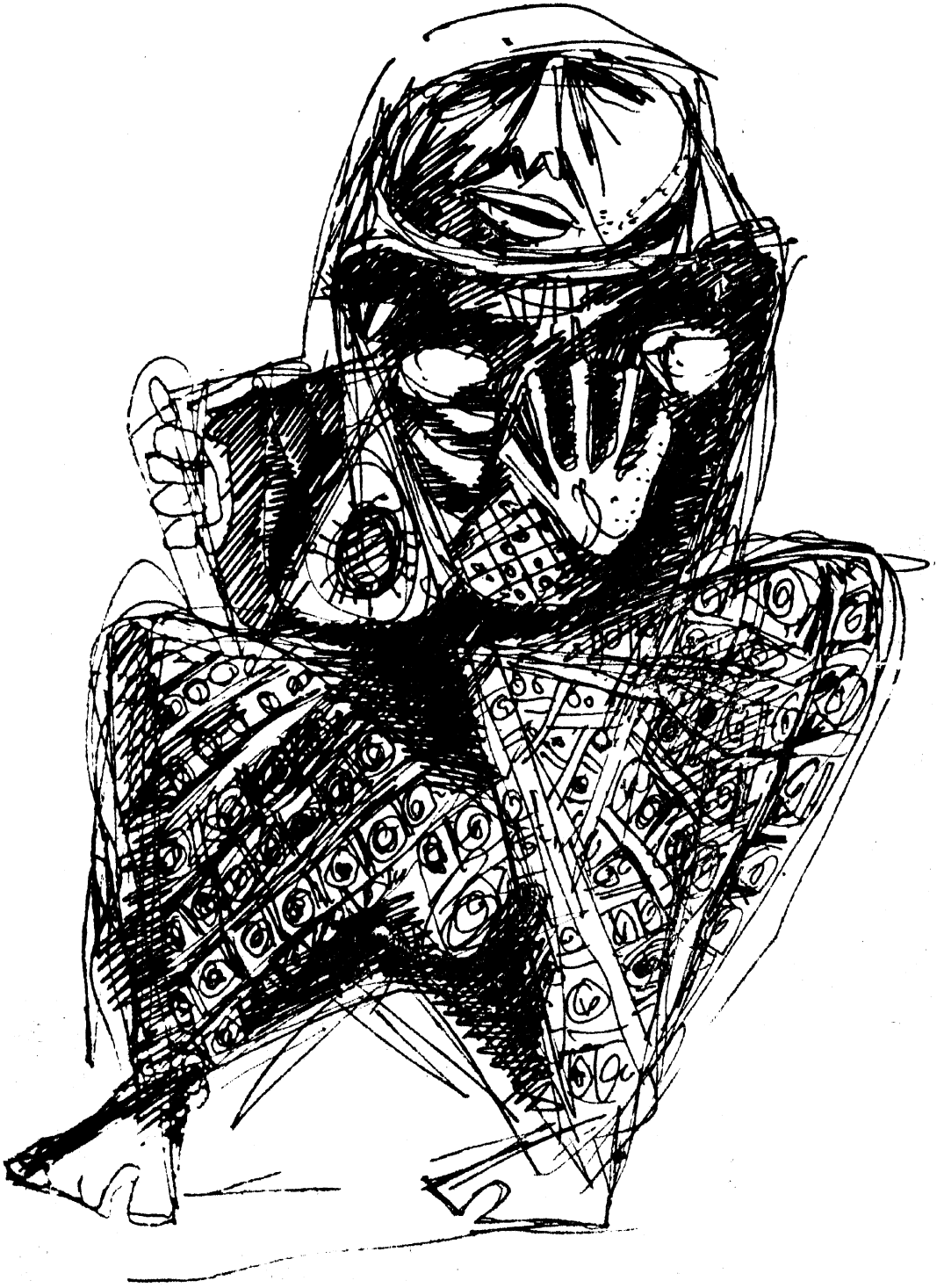
তিন কবি

মানস রায়চৌধুরী

বয়স কম-বেশি ত্রিশ, কিন্তু এরি মধ্যে কলমের জোরে বাংলা কবিতায় স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছেন এমন তিনজন কবি ভাস্কর চক্রবর্তী, দেবারতি মিত্র ও পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল। গত বিশ বছর বাংলা কবিতায় অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, উত্তেজনা-অবসাদ, দেখা গেছে। ভাস্করের ভাষায়—'অনেক দাপাদাপির পর বাংলা কবিতায় এক রুগ্ন সৌন্দর্য এসেছে এখন'। এই সময়ের শেষের দিকে এই তিনজন কবি আমাদের সামনে এসেছেন। প্রায় সম-বয়সী এঁরা, ভাস্কর জন্মেছেন ১৯৪৫-এ, দেবারতি ১৯৪৬ এবং পার্থপ্রতিম ১৯৪৯, কিন্তু ভাবনায়, দেখার ভঙ্গিতে এঁরা ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা। কবিতা, চারপাশের জগৎ, নিজের ভিতরকার জগৎ এই ধরনের কিছু প্রশ্ন সামনে রেখে এঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলাম: 'কবির সঙ্গে সাধারণ মানুষের কি প্রভেদ?' এই প্রশ্নে খানিকটা বিস্মিত হয়ে পার্থপ্রতিম বললেন, আমার বিচারে সাধারণ মানুষ বলে কিছু নেই। প্রতিটি মানুষই কোন না কোনভাবে অসাধারণ। আপনার মনোবিজ্ঞান কি বলে? প্রত্যেক কবিও স্বক্ষেত্রে অসাধারণ। অর্থাৎ মানুষ হিসেবে এবং কবি হিসেবে আরো বেশি স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী সর্বকনিষ্ঠ এই কবি। দেবারতি অবশ্য এ ব্যাপারে অন্য কথা ভাবেন। পুরু চশমার আড়ালে দু চোখে রহস্য আসে। বলতে থাকেন : চারপাশের জগতের ও জীবনের সুখ-দুঃখ, নানা ঘটনা কবির মনে এক ধরনের জটিল, ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না, এমন রাসায়নিক ক্রিয়া করে—যার ফলশ্রুতি কবিতা। সাধারণ মানুষের মধ্যে এ জাতীয় কোনো ক্রিয়া হয় কিনা, জানি না। হয়তো হয়, কিংবা হয় না, কিন্তু তার ফল কিছু নেই। অর্থাৎ সেই ক্রিয়ার কোনো প্রমাণ পাই না আমরা। ভাস্করের বক্তব্য অনেক বেশি সমাজ-নির্ভর সচেতনায় জড়ানো। তিনি বিশ্বাস করেন, চিন্তায় কবি নিশ্চয়ই সাধারণ থেকে পৃথক। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? জৈবিক পার্থক্য নেই কিছুই। কবি প্রথমত সাধারণ মানুষ, পরে কবি। অতএব জীবনের কাছে কবির দাবী বেশি হবে কেন?

ভাস্কর ছ' ফুটের মত লম্বা, চওড়া কাঁধ, মুখে এক ধরনের পুরুষালী লাবণ্য যা ইতালিয়ান ছবির নায়কদের থাকে। চোখে পড়ার মত চেহারা ভাস্করের। কবি হয়েও খেতে তিনি ভালবাসেন, অবেলায় ঘুমোতে আবার ঘুম না এলে ইলেকট্রিক বিল বাড়িয়ে কবিতার খসড়ায় কাটাকুটি করে রাত জাগতেও অরাজি নন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাচেলর অব আর্টস এবং যতদূর জানা যায় এখনো ব্যাচেলর ভাস্কর পত্রপত্রিকায় প্রচুর লিখলেও, কবিতার বই তাঁর মাত্র একটি 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা' এবং কবিতার মত গদ্যের বই 'প্রিয় সুব্রত'। একটি পাণ্ডুলিপি 'মানুষের দেশে' ত্রৈমাসিকের ধুলো খাচ্ছে প্রকাশকের অপেক্ষায়। উত্তর শহরতলীর এক বনেদী স্কুলে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম তখন 'বিরু স্যার' (ভাস্কর তাঁর ডাকনাম) বোর্ডে অঙ্ক কষাচ্ছেন।

দেবারতি মিত্র তিন মেধাবী বোনের মধ্যমণি হয়ে সেদিন পর্যন্ত পিত্রালয়ে ছিলেন। সম্প্রতি কবি-জায়া হয়েছেন। কবিতার বই দুটি 'অন্ধ স্কুলে ঘন্টা বাজে' এবং 'আমার পুতুল'। কিন্তু বহুল-প্রচারিত সাপ্তাহিকের মাধ্যমে সম-বয়সীদের মধ্যে রীতিমত বিখ্যাত দেবারতি। যথেষ্ট মৌলিকতা সত্ত্বেও খুবই বিনয়ী এই কবি—'আপনি এইসব সাহিত্যের প্রশ্ন করবেন আগে জানলে বই-টই দেখে বাড়ি থেকে তৈরি হয়ে আসতাম'...এই কথায় আমি কম অবাক হইনি।—আপনার সাহিত্য অভিজ্ঞতা কি কোনো বইয়ে ছাপা হয়েছে? আমার প্রশ্ন।

পার্থপ্রতিম চাকুরি করেন একটি প্রচার-সংস্থায়, বছরখানেক হলো সংসারী হয়েছেন। মাত্র একটি কবিতার বই 'দেবী'-র সাহায্যে

ঘাসের বিছানা তার

ফাগুন চোতের হাওয়া
কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যায়
বাঁ হাতে রেখেছে মাথা
ঘাসের বিছানা তার
চুপচাপ শুয়ে—
শুধু ছায়া, শুধু ছায়া
ছায়ার ফোয়ারা
ঝিঁঝির মতন গাছ গুনগুন করে
তারায় আলপিন ঝরল
ছেলেটির খোলা চোখে
তা দেখে আমিও পাতায় পাতায় ঘেরা হাসফুল
ফুটো করে ঢুকি

এত অশরীরী তবু আমাকে
সে বাঁধে
আমিও আলোর মতো
আমার দেওয়াল, লম্বা বিচ্ছুরণ চাই
কেঁপে চলে যেতে থাকি
দূরে, দূরে, দূরে, শেষ দূরে
কত যে সময় লাগে
কত যে সময় লাগবে আরো!

পৌঁছব না কোন দিন
পৌঁছবে না কোথাও
ফাগুন চোতের হাওয়া
তারার আলপিন।

—দেবারা

তাঁর নিজস্ব কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়েছেন। এক-মাথা কোঁকড়া চুল, থুৎনিতে হো-চি-মিন দাড়ি, প্রশ্নোত্তরের সময় কখনও সরস কখনও তিক্ত হয়ে উঠেছে তাঁর গলা। কবিতা রচনায় অবচেতন প্রেরণার কথা তুলতেই পার্থপ্রতিম লাজুক হয়ে উঠলেন, 'হালকা ঘুমের মধ্যে অন্তত গোটা ছ-সাত কবিতা আমি পেয়েছি। গোটা কবিতাই মুদ্রিত অবস্থায় (নিদেন নিজের লেখা ব্লক করা অবস্থায়) পেয়ে গেছি। আরও আশ্চর্য, এমনভাবে পেয়েছে যে সেগুলো এতটুকু বাড়ানো কমানো দরকার হয়নি।' অর্থাৎ প্রেরণা, চেতন বা নির্জ্ঞান পার্থপ্রতিমকে নাড়া দিয়ে যায়, ফুলে-ফলে ভরে দিয়ে যায় তাঁর গাছের ডালপালা। দেবারতি পেতে চান 'বাইরের ধাক্কা', কোনও একটা সুখদুঃখ, আনন্দ বা উত্তেজনার ঘটনা, মানুষের জীবনের খুঁটিনাটি চমকপ্রদ ব্যাপার দেখে বা শুনে তাঁর কবিতা অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। এটাকেই প্রেরণা বলতে পারি।

—গল্প-উপন্যাস না লিখে কবিতা কেন লিখছি? ভাস্কর পুরু লেনসের ভিতর দিয়ে তাকালেন,—বোঝানো সোজা নয়, শব্দেরও ধার ক্ষয়ে গেছে, 'অমোঘ' একটা টান আমাকে কবিতাই লিখতে বাধ্য করে। দেবারতির ঘটনা একটু আলাদা, কিছুটা ব্যক্তিগত—ছোটবেলায় সবার সঙ্গে মিশতে পারতাম না। সঙ্গী সাথী তেমন কেউ ছিলো না। কবিতা লেখার সময় এক অদৃশ্য সঙ্গ পেতাম। কবিতাই আমার বন্ধু ছিলো অনেক কাল।—বিয়ের পরও? —হ্যাঁ বিয়ের পরও। তবে, বলতে পারেন সে বন্ধুত্ব বিয়ের পর কিছুটা হয়তো ফিকে হয়েছে। কবিতা বড়ো অভিমানী দোসর, তবু তার সঙ্গই বেশি পাই। পার্থপ্রতিমের কবিতা লেখার দুটি কারণ, এক সুবিধা-অসুবিধা—কবিতার আয়তন ছোটো, খুব বড়ো লেখার প্রকাশক কে হবে? দুই, ব্যক্তিগত রুচি। কবিতা রচনায় যে মানসিক ঝুঁকি, যে বিপদ-সংকুলতা আছে তা আমাকে টানতে থাকে।

—আপনার কবিতা কি কারো উপকারে লাগে, আপনার নিজের?

পার্থপ্রতিম বললেন, 'উপকার' শব্দটা অস্পষ্ট, কবির দীর্ঘকাল চর্চা ও প্রকাশের পর উপকার-অপকারের প্রশ্ন ওঠে। যেমন জীবনানন্দের কবিতার উপকারিতা নিয়ে এখন কথা তোলা যেতে পারে। আর আমার কবিতা, আমার নিজের উপকারে-বা লাগছে কই?

ভাস্কর : আমার নিজের উপকারে অবশ্যই লাগে। একটা কবিতা শেষ করার পর, অল্প সময় হলেও উৎফুল্ল থাকি। অন্যেরা যদি কোনদিন এরকম উপকার পায়, সেটা তাদেরও আমার পরমভাগ্য। দেবারতি ভাস্করের মতই বললেন, কবিতায় নিজেকে প্রকাশ করে হাল্কা হই, সেটাই ব্যক্তিগত উপকার। অন্যের কি উপকার লাগে ঠিক জানি না, মনে হয় লাগে না।

কেমন করে কবিতা জন্মায়, লেখার প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি, যা নিয়ে পাঠকের প্রশ্ন ও বিস্ময়ের অন্ত নেই—সে ব্যাপারে ভাস্করের কথা : চটক সত্ত্বেও মানতে খারাপ লাগে না, কবিতা ম্যাজিকমাত্র। এবং রসায়ন এবং দক্ষতা। (র‍্যাঁবোর উক্তি) পরিশ্রমটা খুবই জরুরী, জরুরী ভিতরের পরিবেশ যা জাদু সঞ্চার করে। কোনো কবিতা এক দু লাইন করে দীর্ঘদিন ধরে লিখেছি।

দেবারতি মিত্র

'কবিকে বিয়ে করিনি, বিয়ে করেছি একজন পুরুষকে'
বা 'কবিতা লেখার সময় এক অদৃশ্য সঙ্গ পাই'
বা 'জীবন আমাকে ধাক্কা দিয়ে লেখায়'

শীতকাল কবে আসবে...' একবারে বসে লেখা। দেবারতি ও পার্থপ্রতিম ভাস্করের সঙ্গে একমত। কোনো সময় দরকার হলে রোজ বসি ও লিখি। আবার দীর্ঘ ছেদও পড়ে। গভীর রাত, খুব ভোর বা নির্জন দুপুর, শীত বা বর্ষা ভালো কবিতা লেখার বিশেষ সময়ের কথা তিনজনের কেউ মানেন না। মাদক? 'কোনও কোনও কবিতার যোগ থাকতে পারে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়' (পার্থপ্রতিম) দেবারতি- ব্যাপারটা ঠিক বুঝি না। ভাস্কর বললেন। নেশা করতে মন্দ লাগে না। মনটা বিস্তৃত হয়, বন্ধুদের গভীরভাবে পাই। কিন্তু তাতে কবিতার প্রত্যক্ষ কিছু হয় কি? মনে হয়, হয় না।

প্রসঙ্গ পালটিয়ে চলে আসি, প্রেম ও বিবাহের কথায়। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ভাস্করের : ও নিয়ে ভাবিনি। নিজের আলস্য নিয়ে ব্যস্ত আছি। পার্থপ্রতিম যাঁকে ঘরণী করেছেন তিনি লেখিকা নন। প্রেম ও বিবাহ তাঁর মতে, অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও কখনো হয়, কখনো হয় না। কোনো কোনো কবিতাংশ লেখার সময় মনে হয়েছে প্রেম ও দাম্পত্যের একটা শারীরিক ধারণা থাকা দরকার কবিদের, বিশেষ করে রূপক, অলংকার ইত্যাদি নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান।

এ প্রসঙ্গে দীর্ঘতম মতামত দিয়েছেন দেবারতি। তাঁর বিচারে, প্রেম ও বিবাহ দুটি আলাদা ব্যাপার। প্রেম তাঁকে কবিতার

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

'রাষ্ট্র মানে রাজ্য, কবিতা নৈরাজ্যের'
'প্রেম ও দাম্পত্যের শারীরিক ধারণা দরকার কবিদের'
'কবিতার ভবিষ্যত আছে যদি মানুষের ভবিষ্যত থাকে'

জন্য অনেক দিয়েছে। 'পরবর্তী সময়ে দাম্পত্যের কাছে অতো পাইনি। প্রেম ও কবিতা হাতে হাত রেখে চলে, কিন্তু দাম্পত্য নয়। কবিতা লেখার ব্যাপারে বিবাহ আমাকে কি দিয়েছে জানি না। তবে বলতে পারি, বিবাহ এক শূন্যতার অবসান ঘটিয়েছে। আজকাল, মনে হচ্ছে জীবন কবিতার চেয়ে অনেক বড়ো। ছেঁদো কথা শোনাচ্ছে, তা শোনাক। সেই বড়ো জীবনের প্রয়োজনে আমি দাম্পত্যের কাছে হাত পেতেছি। আর আমি, কোনো কবি বা লেখককে বিয়ে করিনি। বিয়ে করেছি একজন পুরুষকে যিনি প্রসংগত আমার প্রেমিক'।

বাংলা কবিতায় রাজনীতির অনুপ্রবেশ পুরোনো বিষয়। কবিতা ও রাজনীতির সহযোগের প্রসঙ্গ তুলতেই ভাস্কর বললেন, কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য-কার্ড নিইনি। কথা বলবেন। লেখারীতি—কখনো পার্টিদ্বারা অনুপ্রাণিত হইনি! আমার কবিতায় ওসব প্রসঙ্গ অবান্তর। পার্থপ্রতিম একটু ঘুরিয়ে উত্তর দিলেন, কবিতা লিখতেই হবে এমন কথা রাজনীতি কখনো কাউকে বলে না। অতএব এ সহযোগের কথা উঠছে কেন?

কবির সামাজিক স্বীকৃতি, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা. জীবিকা ও উপজীবিকার সমস্যা এবং কবিদের প্রতি রাষ্ট্রের মনোভাবের প্রসঙ্গ তুলতেই এই তিন কবির মনোভঙ্গির পার্থক্য আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। পার্থপ্রতিমের কথা আগে বলি : অকবি প্রতি-বেশীরা, মনে হয়, চান আমি সত্বর কবিতা লেখা ছেড়ে দিই। কিংবা কবি হিসাবে যথেষ্ট যশ অর্জন করি বা তাদের দৃষ্টিতে চরম প্রাপ্তি। অথবা এসব বোধহয় আমারই কল্পনা, ওরা আমার কবিতা লেখা নিয়ে কিছুই ভাবে না। টাকার কথায় বলবো, সজ্জন মধ্য-বিত্তের মতই হওয়া উচিত তার জীবন। আর কবিতাই তার মূল জীবিকা। কিন্তু এদেশে সৎ সাহিত্যের ব্যবসায়িক ভিত্তি জলো নয়—কবিতারও সেই দশা। —তাহলে কবি কি করবে? পার্থপ্রতিম একটা সিগারেট ধরানোর সময় নিয়ে, তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, খুবই সাদা উদাহরণ দিচ্ছি। জানেন বোধ হয় শ্যামবাজার-বারাসত বা বসিরহাট রুটে একটা টেম্পো ভাড়া খাটিয়ে একজন নিজের জীবনধারণের উপযোগী পয়সা কামাতে পারে। মাসের পনেরো দিন কাজ করলেই খাওয়াপরার খরচা উঠে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন, কবির এই ব্যবসারের অন্য সঙ্গীদের সহ্য হবে তো? রাইটার্সে

আমার যা কিছু

আমি শুধু দারিদ্র্যের কথা জানি—
আর কোনো কথাই জানি না।

দেখেছি কিশোরী তা'র ম্লান মুখ—
আমি আর কিছুই দেখি নি।

আমি শুধু
ভালোবাসবার কথা বুঝি—
আর কোনো কথাই বুঝি না।

—ভাস্কর

পশ্চিম রহস্য

চাঁদের মিনার থেকে, ও রহস্য, নেমে এসো ওল্ড কোর্ট স্ট্রিটে
নেমে এসো—ডালহাউসি যেদিকে মিশেছে এসপ্লানেডে,
বিজ্ঞাপনে-থাকা
অতিমানবিক ছেলেটির মতো স্মার্ট হয়ে বাড়িঘর ভিতরে ভিতরে
প্রাক্তন নক্‌শাল ওই শরীরের কাছে যাও, দেখো, সে এখন
রেললাইনের ধারে বসে, গাঁজা খায়—চামড়ায় ভাঁজ-পড়া
বিহারিরমণী দেখে, চাঁদ, উঠলে, তার শ্বেতসন্ত্রাসের কথা
মাত্র মনে পড়ে—চলে যাও, মোহনদাসুর মতো কোনো বাড়ির ভিতরে
প্রৌঢ়াটি গোপনে তার বুক দেখছে,
অসমর্থ স্তনে কালো করুণার ছাপ
গর্ভ নয়, সময়ের, বালিকাটি পাকা ব্যবসায়িনীর মতো
খুঁটিয়ে ভাবছে ব্র্যাপ্যান্টির রেখায় যৌবন কতো দিন—
আর, কল্লোলের
ফেয়ারের ঢিলেঢালা—বাঙালি লেখকদের মতো তাকে বেশি
বেশি সময় দিও না, ও রহস্য, তাহলে যে স্পষ্ট হয়ে যাবে।
যাও, দ্রুত দৌড়ে চলো সামনেই সামনেই দক্ষিণের বঙ্গোপসাগর
নোনাজলকৌতুকের মধ্যে ধ্বনির সঙ্গে কি বিষম শব্দের জাল
লাফ দাও ওর পর; ভাঙো, গুঁড়ো হতে থাকো,
প্রাক্তন নক্‌শাল থেকে
ওই ডালহাউসিপ্রৌঢ়া এসপ্ল্যানেডতরুণী দেখুক
জলে ও জ্যোৎস্নায় কোনো সন্ধি নেই, আক্রমণ আছে।

—পার্থপ্রতিম

চাকুরিও তাই। বিভূতিভূষণ যা পারেন আমি তা পারি না। কিংবা পাগলা হাসপাতালে আপনি যা পারবেন আমি তা মানাতে পারবো না। জীবিকার জন্য সহকর্মীদের মানবিক সম্পর্ক নিয়েই যতো ঝামেলা। সাংবাদিকতা কারো পক্ষে ভালো কারো বা খারাপ। গাঙ্গুলি মশাই-এর চটুল উপন্যাস তাঁর কবিতার কোনো ক্ষতি করেনি বলেই আমার ধারণা। যেমন পোস্টমাস্টারী অমিয়ভূষণের উপন্যাসে কোনো ছায়া ফেলেনি। হয়তো তাঁরা কাজও লেখাতে আলাদা রাখতে পেরেছেন।

—আর রাষ্ট্রের নজর?

—বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থা মানুষের সঙ্গে মানুষের দূরত্ব সৃষ্টি করে, বিচ্ছিন্নতা বাড়ায়। অতএব রাষ্ট্র যদি কবিদের দিকে দৃষ্টি দেন তাতে ক্ষতিই হবে। কিছু মনে করবেন না, পার্থপ্রতিম থামলেন এবং পলকের হাসি, মজাদার করে বলা যায়, রাষ্ট্র মানে রাজা, কবিতা ব্যাপারটা নিতান্তই নৈরাজ্যের।

দেবারতি এসব প্রশ্নে খুবই ঘরোয়া জবাব দিতে থাকেন। বেশি টাকা হলে কতো সুবিধে, ইচ্ছেমত বই কিনতে পারি, বেড়াতে যেতে পারি যখেচ্ছ।' ভাস্কর বললেন, সাধারণ মানুষের যা লাগে কবির তারচেয়ে বেশি লাগবে কেন। শুধু কবিতা লিখে জীবনযাত্রার উপযোগী টাকা যে রোজগার করা যায় না এব্যাপারে দুজনেই একমত। —কবিতা বাদ দিয়ে কবি আর কি কাজ করতে পারে? দেবারতি বললেন, কবিতা ও সাহিত্যের সংস্রব বর্জিত কিছু কাজ। না, না সাংবাদিকতাও নয়। ভাস্করের সোজা কথা— য় কোনো জীবিকা নিয়ে আড়ালে থেকে ভালো লিখে যেতে চাই। ছন্দের কথা বলছেন? শুয়ে থেকে ভাবতে এবং কবিতা লিখতেই একমাত্র লাগা উচিত কবির। আমারতো লাগে। তবু অর্থনৈতিক দিক থেকে মাস্টারীটা চলে কেননা পাওয়া যায় ছুটিছাটা এবং কিছু ব্যক্তিগত সময়।

—রাষ্ট্রতো কবিদের দেখবেই। কিন্তু সঠিক কবিকে খুঁজে র করবে কোন দফতরের মন্ত্রী? ভাস্কর তিক্ত গলা ছুঁড়ে দিলেন। দেবারতি নরম গলায় বললেন—না, না কবিদের ফোকাসে না থাকাই ভালো। তাদের নিয়ে বেশি হৈ-চৈ হলে কবিতারই ক্ষতি হবে। আপনি যা-ই বলুন। কবিতা নিয়ে যত খুশি আলোচনা হোক, কবিদের নিয়ে নয়।

পূর্বসূরীদের প্রসঙ্গ আসতেই তিনজনই গম্ভীর হয়ে গেলেন, কিছুটা অসহায়ও। —"কতজনের নাম করবো। আপনারা অনেকেই তো ভাল লিখেছেন এবং লিখছেন।" ভাস্কর আরো বললেন, তবে পূর্বসূরী বলতে যাঁদের কথা আসে তাঁদের আজকাল যথার্থ পূর্বসূরী বলে মনে হয় না। পার্থপ্রতিম অবশ্য নাম করলেন, জীবনানন্দ এবং অজিতকুমার মজুমদার আমাকে আচ্ছন্ন করেন। দেবারতি কিছুটা কুণ্ঠা নিয়ে স্বীকার করলেন, পূর্বসূরীদের কবিতা পড়ি মন দিয়ে কবিতায় কি উচিত-অনুচিত তা বুঝতে তাঁরা আমাকে সাহায্য করেন। সবচেয়ে বড় সাহায্য করেন আমি কি রকম "লিখবো না" তা বুঝে নিতে। বিহারীলাল জীবনানন্দ পড়ে আমি ঠিক করে নিই আমার কিরকম লেখা উচিত, অন্তত তাঁদের মত তো নয়ই। আর কবিতা বা সাহিত্য

সনেট

রূপকথা শুনেছে বলে নাতিনাতনীরা
বুড়ি ঠাকুমার কোল ঘেঁষে আছে বসে;
রাত্রি হাসে জ্যোৎস্নার জ্যোৎস্নার মাঠে মাঠে
রাত্রি, হাসে অন্ধকার বুকের কবাটে...

কোন্ গল্প তোরা শুনেছিস, অবোধ পাখিরা?
রাজপুত্র-রাজকন্যা-দানবেরাক্ষসে
তোদের নতুন ঘুমে জ্যোৎস্না দিয়ে যাক;
যে জ্যোৎস্না আমাকে বলে, কথা চেপে রাখ্

তোর জানা মিশিয়ে দে বাদুড়ের ভিড়ে—
অন্ধকারে-বুড়োপুরুষের বিড়বিড়ে—
তুই তো জানিস, রাজপুত্রই রাক্ষস
আর, রানী? বয়েস হয়েছে, আফসোস

রাখিস না—সে রাক্ষসী, সে-ও খুব জানে;
তা-ও, মিছে বলে, মিথ্যাশিশুরে সম্মানে।

—পার্থপ্রতিম

কোনো কিছু থেকেই আমি কবিতার প্রেরণা পাই না। আগেই বলেছি, জীবন আমাকে ধাক্কা দিয়ে লেখায়।

এতো আলোচনার পর এক অবধারিত প্রশ্নের সামনে এসে দাঁড়াই আমরা। ভাস্করই কথাটা তুলেছিলেন, বলুনতো, কবিতার কোনো ভবিষ্যৎ আছে? আমার মতে, অতীতে কবিতার যেমন স্বল্প-সংখ্যক পাঠক ছিলো কিংবা শ্রোতা, ভবিষ্যতে তার কোনো পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না। পার্থপ্রতিম বললেন, ভবিষ্যৎ থাকতে পারে যদি মানুষের কোনো ভবিষ্যৎ থাকে। দেবারতি একটা পুরোনো গান মনে করিয়ে দিলেন, কালের এক বাজারেতে সোনার জহুরী। নিকষে ঘসবে কমল, আ মরি মরি। কবিতা

এসো সুসংবাদ এসো

দিনগুলো, কেমন চাকার মতো,
অযথা আমাকে

পিষে যায়....।
—বাস থেকে নেমে মনে হ'লো
বিদেশেই আছি। তবু,
কে ওই মেয়েটি?

আমাদের
ঘরের মেয়ের মতো মনে হয়।
হয়তো মিনুর বোন হবে। এসো,
সুসংবাদ এসো—
আর কোনো ইচ্ছে নেই, শুধু, ওই
মেয়েটির সঙ্গে যেন
আমাদের
তরুণ কবির বিয়ে হয়।

—ভাস্কর

চিরকালই এক জাতীয় লোক পড়বে। মুষ্টিমেয় হলেও সেই বাছাই-করা পাঠকই আমার কাম্য। বেশি হৈ চৈ ভয় পাই। আপনি পান না?

জীবন ও কবিতা সম্পর্কে এই তিনজন কবির ধারণা জানতে পারার পর প্রশ্ন জাগে কেমন কবিতা লেখেন এঁরা।

ভাস্কর চক্রবর্তীর লেখা অনেক নীচু সুরের, ব্যক্তিগত বিশ্বের রহস্যে ভরা। মনে হয় ভাস্কর, সদর্থেই, সব পাঠকের কথা ভাবেন নিজের অসম্পূর্ণ অর্ধসমাপ্ত ভালবাসার কথা, ভাবেন, এমন এক শীত ঋতুর কথা যেখানে প্রথাগত কবিতার ছাঁদে গাছপালা প্রকৃতি এমনকি তুষার-তুহিনেরও উপস্থিতি নেই, আছে কোনো মানবীর উড়ন্ত চুল, বাঁ হাতে ধরা টেলিফোন, পায়ের কাছে হাই তুলছে বিড়াল আর শীতের ঝর্ণা "ডেকে ডেকে ফিরে যাচ্ছে আমাদের।" এক বিস্ময়কর ও সাংকেতিকতাভরা নিজস্ব পৃথিবীর ছবি আছে ভাস্করের রচনাগুলিতে। একেক সময় মনে হয় ভাস্করের দুঃখভারহীন নিস্পৃহ, প্রেম-অপ্রেমের কবিতাগুলি আমাদেরই চুরি-করা দীর্ঘশ্বাসের শৈল্পিক রূপ। তাই 'স্তব্ধতা' বিষয়ে ভাস্কর ভাবেন না কোনো বিশাল ঘটনা, ভাবেন শুধু "পোড়া কয়লা, এদিক ওদিক, জ্বল জ্বল করছে মেঝেতে।" চেনা অথচ স্থাপনার গুণে অচেনা ভাস্করের আলো-আঁধার। আমাদের মতই এই নাগরিক কবির "স্বর্গ নেই, সারিডন আছে" এবং আমাদের

ভাস্কর চক্রবর্তী

'প্রেম? নিজের আলস্য নিয়ে ব্যস্ত আছি'
'কবিতা শেষ করার পর কিছুক্ষণ উৎফুল্ল থাকি'
'আড়ালে থেকে কিছু ভালো লিখতে চাই'

কে সে

কে সে

কেবলি গোধূলিপল্লী একাসন্নিহান দেখে এসে

হাসে
হাহাকার বেহাগের খাদে-তারে সাগরিকা হতে পাশে আসে...

পায়
পার্থিব ডেরায়

ঘর
ঘনকৃষ্ণপরমাণু অন্ধকারে বিছানা, নির্ভয়

আ-চরণমাথা শরীরের বোধে চৈতন্য ফিরিয়ে দেওয়া স্বাদ...
আহা

তার
অজ্ঞা তাতার

চুপ—
চুম্বনের প্রান্তে এসে সম্ভব হবে কি, যার রূপ

মেঘ—
মেদুরশূন্যকে দেখে ভীত-ওড়া পাখিদের গোয়েন্দা আবেগ—

কে সে
কেবলি গোধূলিচুম্বী জেনলে দেয় সন্দেহের, সংশয়ের শোধ

—পার্থপ্রতিম

সব অভ্যাস কাঁপিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন—"আপনি জানেন, কে আবহাওয়ায় বাঘের চামড়া মোটা হয়?" আসলে ভাস্কর চক্রবর্তী সব কবিতাই হয় একজনের সঙ্গে, নয় নিজের সঙ্গে কথাবার্তা এই কথোপকথন যখন সাম্প্রতিক কবিতায় মলিন অভ্যাসে রূপান্তরিত, তখন ভাস্করের নিজস্ব বাক্‌ভঙ্গি ও অভাবিত সব ছবি ও প্রসঙ্গ, বাঁধা সড়ক ভেঙে নতুন রাস্তা চেনাতে থাকে পাঠককে। তাঁর কবিতা বহু-আলোচিত না হওয়ার একটি কারণ, ভাস্করের অন্তঃশীল চেতনা-প্রবাহকে উপভোগ করার প্রয়োজনীয় নির্জনতা আমরা এখনো অর্জন করিনি।

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল যে কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে 'দেবী কবিতাগ্রন্থ দ্রষ্টব্য আমাদের সামনে হাজির হয়েছিলেন, ভাবতে অবাক লাগে, তার মূল বিষয় ভক্তিরস—সাধনা ও শাক্ত বিশ্বাস একজন সাম্প্রতিক কবি, যাঁর বয়স, এখনো তিরিশের নীচে, তাঁ মাতৃবন্দনা আমাদের চমকে দেয়। মাতৃপূজক বাঙালী প্রাত্যহি জীবনে নিত্যই স্মরণ করে থাকেন কালী, তারা, দুর্গা, চণ্ডীকে পার্থপ্রতিমের কল্পনায় এইসব দেবীমূর্তি ভিন্নরূপ পরিগ্র করেছে: তাঁর ভাষায় "প্রসীদ...। চণ্ড আক্রোশে নিঃশব্দ করো অ নির্বাপিত হোক পৃথিবীর শোক।" খড়্গমুণ্ডধারিণী, অসুরমর্দি

দুর্গার কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু যখন তিনি বলেন "শুধু অপমান দাও রাজবাল, অবশেষে রাখো দীর্ঘ বেণী। দেবী জানো। বনবাসে আর অজ্ঞাতবাসে তুমি পরবাসিনী, মুছে থাকে" তখন মনে প্রশ্ন জাগে ইনি কি পাঞ্চালীর প্রতিরূপা? উনিশ শতকে বিহারীলাল চক্রবর্তী যেমন দেবী সরস্বতীকে নিজের মানসী রূপে সৃষ্টি করেছিলেন "সারদামঙ্গলে", ব্যক্তিগত কথাবার্তা চালিয়েছিলেন, পার্থপ্রতিমের দেবী কোন কোন ক্ষেত্রে সেরকমই হয়ে উঠেছে। পার্থপ্রতিমের শব্দ ব্যবহার পুরাণ সংস্কৃতভিত্তিক যেমন ক্ষুরপ্র, রৌরব, কিংবা সংস্কৃত বাক্যাংশ 'প্রসীদ'—প্রসন্ন হও অর্থে নিশ্চিতভাবে চোখে পড়ার মত। কিন্তু তাঁর অতি-সাম্প্রতিক রচনাবলী বাঁক নিয়েছে অন্য পথে যেখানে ভিন্ন স্বরক্ষেপে দেখা দিচ্ছে আরেক পার্থপ্রতিম। সেখানে আমাদের চিরচেনা চাঁদ পুরোনো অনুষঙ্গের পশ্চিম আকাশ ভেঙে নেমে আসছে বাস্তবে, রেল লাইনের ধারে-বসা প্রাক্তন নকশাল যুবকের বুকের মধ্যে যার চাঁদ দেখলে 'শ্বেত সন্ত্রাস' ছাড়া আর কিছু মনে পড়ে না। জ্যোৎস্নার সিঁড়ি বেয়ে রহস্য নামছে বঙ্গোপসাগরের লোনাজল-কৌতুকের মধ্যে—আর আশ্চর্য অন্তিমে এই কবির মনে হচ্ছে 'জলে ও জ্যোৎস্নায় কোনো সন্ধি নেই, আকিঞ্চন আছে।'

দেবারতি মিত্র-র প্রথম দিককার কবিতায় এক বিশেষ ধরনের শব্দ-ব্যবহারের সংযম ও চাপা আবেগ আছে। শব্দের যে অন্তঃশীল শক্তি অধিকাংশ কবির দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, দেবারতি জানেন সেগুলিকে প্রয়োজন মতো তীরন্দাজদের মত ব্যবহার করতে। অথচ তাঁর কবিতা আবেগতপ্ত আঙুরের মত, অনুভূতিকে যেভাবে শাসন করলে তা আমাদের মর্মমূলে প্রগাঢ় বাসনার বীজ হয়ে দেখা দেয়, সেই শাসনে বাঁধা তাঁর রচনা। অনেকেরই, আমার মতো, চমক লাগতে পারে যখন দেখি সাম্প্রতিক কবিতার ট্র্যাডিশনের কথা ভুলে গিয়ে, দেবারতি কোন এক কিশোরের সঙ্গে তরুণী পিয়ানোর 'আনচান প্রগলভতার' কথা বলেন, যে পিয়ানো কিশোরের 'আঙুল শাসন করে'। এই কবি আমাদের কবিতা পড়ার অভ্যাস ভেঙে দিতে দিতে দেখাতে থাকেন 'কেবল পাতালে বৃষ্টি' যেখানে 'ক্ষণে ক্ষণে বিশাল জ্বলন্ত লাল মেঘ। বজ্রাঘাত পাতালে বর্ষণ?' অথবা 'অষ্ট ধাতুর মেঘ' যার অনুষঙ্গে আমরা দেখতে পাই বেদেনী দুর্গার মূর্তি, বাসতেল চাপচাপ...বুনো অতসীর বীজ চারিদিকে ভাসে। দেবারতি তাঁর পরবর্তীকালের রচনায় হয়ে উঠেছেন আরো বেশি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, উপমার ব্যবহারে আরো মৌলিক অথচ নিবিড় আবেদন সঞ্চারী—নিষ্পাপ আশ্বিন তাঁর অনুভবে রক্তস্রোতে নীল সাদা। নিজের কথা এরকমভাবে কোন তরুণ কবি এভাবে বলছেন

একটি বাজনা গাছ

সে যেন আরম্ভ হল এইমাত্র
ঘিরেছে শ্যাওলা পাথরের কথা বলা বনভূমি
কেশর ফাটানো ফুল, তার রেখা
স্ফুলিঙ্গের মতো ঝরে রেণু

থু থু শব্দে চারদিক কেঁপে ওঠে...
অনেক গ্রীষ্মের শেষে
তোমাদের আমলকী বাগানে
জং ধরা শিকল জড়ানো পরিত্যক্ত কুয়ো
বহু দূরে
লুপ্তবালিকার চাউনির মতো চুপ জল
আকন্দপাতায় কাঁপা হালকা কর্পূর কণাকণা
আবছায়া তারা ফুটকি সাপ।

আলতো সবুজ ঝিঁঝিঁ থোকাথোকা
সমস্ত গা গুঞ্জরণময় একটি বাজনা গাছ
গোল ফোয়ারার মতো আকাশের নিচে
সে যেন আরম্ভ হল এইমাত্র...

—দেবারতি

এই সময়—'টকটকে উগ্র লাল লিচু যেরকম টক গন্ধে ফেটে পড়ে জ্যৈষ্ঠমাস। আমার নিশ্বাস নয় সেরকম আজকাল। সব সৎ কবির কাছে যা আমাদের কাম্য দেবারতি তা পূরণ করেন অবলীলাক্রমে। তা হলো সত্য কথন। 'পুঞ্জীভূত জোনাকি বা ধুনো—পুজো হবে অর্থাৎ মিলন'—অথবা 'শরীর অসম্ভব শরীরী এখন... গভীর মদস্রাবী নির্জন ছাতিম গাছে। দুলতে থাকে সূর্যাস্ত। আমি এখন কেবল চুম্বন করি।' স্মরণ করা যেতে পারে এই কবিতার প্রথম লাইন —সূর্যাস্তের দৃশ্য, আমি তোমাকে চুম্বন করি।' কৃত্তিবাস আমাদের কমলালেবু বাগান' কবিতায় শেষ ক'টি লাইন—সর্বে ছুঁড়োছি কমলালেবু লোফালুফি করি। এ ওর দিকে। এ ওর কাছে শিখছি খেলা সমস্ত দিন। এ ওর ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে টানি। চিনচিন করে মদ আসে, আসে মিষ্টি রক্তকমলালেবুর। গাছের শিকড় আর কতদূর?

এ ধরনের প্রগাঢ় শরীরী রক্তোচ্ছ্বাসে গড়া অথচ নির্জনের শিকড়-ছুঁয়ে-থাকা বহু কবিতাই দেবারতি মিত্র-র রচনারীতির স্থায়িত্ব ও খ্যাতি নির্ধারিত করেছে।

ক্লান্তি

আজ কোনো কথা তুমি আমাকে বোলো না।
এবছর, শীতের সামান্য আগে, বসন্ত বাতাসে
ঝরা-পাতাটির মতো ভেসে-ভেসে গিয়েছি রাস্তায়
আজ কতো কাজ ছিলো,
আজ কোনো কাজ নেই আর—

আজ রাতে নিমন্ত্রণ, ঘুম, ডাক দিচ্ছে বিছানায়।

—ভাস্কর

সিঁড়ির বাঁকটা ঘুরেই বিমল দেখল, বারান্দায় একটি মেয়ে রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে পাঁচ নম্বর ঘরের দরজা খোলা। ভেতরের ফ্যানের হাওয়ায় দরজার পর্দাটা ফুলে ফুলে উঠছে। বিমল বুঝল, মেয়েটা পাঁচ নম্বর ঘরে উঠেছে। এক ঝলকে যতটুকু দেখা যায়— দেখে, মেয়েটাকে স্বাস্থ্যবতী ও সুশ্রী বলেই মনে হল তার। সে সরু বারান্দা ধরে মেয়েটার গা ঘেঁষে নিজের ঘরের দিকে হেঁটে গেল।

ঘরে ঢুকতেই নির্মল লাফিয়ে উঠল, 'আরে বিমলদা, আসুন, আসুন। দেখেছেন, কি চাঁপা...।'

সঙ্গে সঙ্গে বাকী সকলে সম্মতিসূচক চোখে বিমলের দিকে তাকাল। বোঝা যায়, সকলেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আড্ডা-জমানোর জন্য কাউকে আজ আর গল্প-গাপ্পা চালতে হবে না। আড্ডার গাছপালা এমনিতেই ছড়িয়ে পড়েছে বেশ। সে কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে দেওয়ালের পেরেকে ঝুলিয়ে দিল। দেখল, যথারীতি তার খাবারটা টেবিলে ঢাকা দেওয়া। সে জামাপ্যান্ট ছাড়তে ছাড়তে ওদের কথাবার্তা শুনল।

অত্যুৎসাহী নির্মল তখন বলে চলেছে, 'না, মাইরী। সেবারকার ভাইবোনের মতো নয়। মেয়েটা সত্যিই দারুণ দেখতে।'

নির্মল কলেজে পড়ে। কেমিস্ট্রি। ছোটগল্প পড়া এবং হিন্দী ও ইংরেজী সিনেমা সে গোগ্রাসে গেলে—একথা না-জানলে তার মঙ্গল হত। তাহলে দিনের অনেকটা সময় নিন্দা করা ছেড়ে সে অন্য কিছু করতে পারত। আগে চোঙাপ্যান্ট পরত, এখন বেল-বটস পরতে তার ঘৃণা হয়। সে সেমি বেলবটস পরে।

অনিমেষ বলল, 'ছেড়েই রাখ না, কি হবে। ম্যানেজারের কাছে শুনলাম, ওরা ভাইবোন আছে।'

বিভাসবাবু সিগারেটের শেষটা টেনে জানলার বাইরে ছুঁড়ে দিলেন। তারপর ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'দূর মশাই, ওসব ছাড়ুন তো। সেবার ওরা দুজন ম্যানেজারের খাতায় লিখেছিল, ভাই-বোন। তারপর তো দেখলেন, বোর্ডিঙের সকলের সামনে জল-জ্যান্ত ভাই-বোন একটা বাথরুমে চান করতে ঢুকল।'

নির্মল উঠে পাশের রুমের শীতলবাবুকে ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝাতে গেল। বিভাসবাবুর কথায় অনিমেষ দমে গিয়ে চুপ করল। বিমল গামছা ও সাবানা হাতে ঘর থেকে বেরিয়েই দেখল, ওপাশে মেয়েটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে। অল্প অল্প হাসছে। পাশে একটা ছেলে বেশ শক্তসমর্থ যুবকোচিত চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে নিচের রান্নাঘরের দিকে আঙুল তুলে মেয়েটাকে কি একটা দেখাচ্ছে। ছেলেটাও হাসছে। সে একমুহূর্ত দেখেই বাথরুমে ঢুকে পড়ল। বাথরুমে হাত-পা ধুতে ধুতেই সে শুনতে পেল নিতাই-এর গলা।

তিনতলা থেকে নিতাই চেঁচিয়ে বলছে 'কি রে, নির্মল। কোন বাগানের ফুল?'

এরপর নির্মলের গলা। 'এখনো জানতে পারিনি। দোতলায় আয় না। এখানে বেশ জমেছে।' গলা শুনে বিমল বুঝতে পারল না, নির্মল শীতলবাবুর ঘর থেকেই বলছে নাকি বারান্দায় বেরিয়েছে।

'না, ভাই। এখনো খাওয়া হয়নি। পরে যাচ্ছি।'

এইসময় বিমল বাথরুম থেকে বেরোল। দেখল, ছেলেটা-মেয়েটা ঘরে ঢুকে পড়েছে ও ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করা।

ঘরে ঢুকে বিমল দেখল, তিনতলা থেকে সমীরবাবু নেমে এসেছেন। বিমলকে দেখে তিনি বলে উঠলেন 'দেখেছেন, ম্যানেজারের কাণ্ডটা! আবার এই সমস্ত ছেলে-মেয়েকে ঢুকিয়েছেন। না মশাই আমরা ভদ্রলোকের ছেলে। বোর্ডিং বাড়িতে থাকি বলে কি, এসবও সহ্য করতে হবে।'

বিমল অত্যন্ত শান্তগলায় বলল, '... আমাকে কি করতে হবে?'

অনিমেষ ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজি... পড়ে। সে মনে করে, সে যথেষ্ট আধুনিক... ও উদারনৈতিক ছেলে। কর্ডের প্যান্ট পরে... ও কফিহাউসে বিদেশী বই-হাতে আড্ডা... মারে।

অনিমেষ বলে উঠল, 'ঠিকই তো... বিমলকে এসব বলার মানে কি। ও ... গার্জেন?'

বলে চকিতে বিমলের দিকে তাকা... সে। এবং আবার বলে, 'তবে মিছিমি... এইসব ভাইবোন বা রিলেশনে... না-বলে, সোজাসুজি বলাই ভালো... আমরা এসেছি, দিনকয়েক থেকে যা... নয় কি?'

বিমল কোনো উৎসাহ না দেখিয়ে খে... বসল। রুটিগুলো ঠাণ্ডা, কুমড়োর তরকা... ও কুলের চাটনি। কোনোরকমে ক... রুটি শেষ করে সে ডিমটা তারিয়ে তারি... খেল। এসময় নির্মল শীতলবাবুকে নি... বিমলের ঘরে ঢুকলে আবার হৈ হুল্লো... শুরু করল।

'দেখুন না, মেয়েটাকে ফেলে কো... সময় টুক করে ছেলেটা কেটে পড়বে।'

শীতলবাবুর বিজ্ঞজনোচিত এই ক... তাঁরই অফিসের বিভাসবাবু সজোরে প্রতি... বাদ করলেন। 'কক্ষনো না। এরকম মে... ছেড়ে কেউ পালায় শীতলদা?'

শীতলবাবু হেসে বললেন, '... আছে ভাই। বয়স তো কম হল না... শেষ হলেই সব আবেগ উড়ে যাবে। ... নিও।'

অনিমেষ অবজ্ঞার চোখে শীতলবাবুর দিকে তাকাল। 'কি বলছেন শীতলবাবু। আপনি কি করে জানলেন যে ... নিয়ে ওরা আসেনি? রোজ... পারে, কিন্তু করবে না—এটাই ...

দিচ্ছেন কেন? আসলে, আপনারা এরকম ভাবতে পারেন না।'

শীতলবাবু 'ঠিক আছে, দেখা যাক' বলে উঠে পড়লেন। সমীরবাবু, 'আরে বসুন বসুন। এতো তাড়া কিসের। বরং সকালবেলা, চলুন, সবাই মিলে ম্যানেজারবাবুকে বলি যে, এসব চলবে না। বলুন, বলাটা উচিত কিনা?' বলতে বলতে পাঞ্জাবির পকেট থেকে চার্মিনার বের করে ধরালেন।

শীতলবাবু প্রথমে থমকে গিয়ে পরে চলে যেতে যেতে বললেন, 'দেখুন, যদি পারেন তো। আমি, মশাই, এসব নোংরামির মধ্যে নেই।'

বিভাসবাবু দ্রুত উঠে ঘরের কোণ থেকে বললেন, 'আরে, দাঁড়ান, শীতলদা। অফিসের ব্যানার্জির কেসটা কি করবেন কাল?'

শীতলবাবু ঘুরে দাঁড়িয়ে, 'কি আর করব। ফাইলটা সুপারিন্টেন্ডেন্টের ঘরে পাঠাতে হবে। যা' করার, উনিই করবেন।' বলতে বলতে চলে গেলেন।

বিমল সিগারেট ধরিয়ে সকলের মুখের দিকে তাকাল। প্রায় সকলেই শান্ত হয়ে এসেছে। সে ঘড়ি দেখল: সাড়ে এগারটা।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে অন্ধকারে ফ্যানের শব্দ শুনতে শুনতে বিমলের মনে হল, মেয়েটা সুন্দর। অনেকদিন আগে সে একটা স্বপ্ন দেখেছিল। এখনো ভুলতে পারেনি। এখন চেষ্টা করেও স্বপ্নের পুরোটা মনে করতে পারল না সে। বিমল পাশ ফিরে শুল।

সকালে ঘুম ভাঙতেই বিমল সাইরেনের শব্দ শুনতে পেল। সে ধীরে-সুস্থে উঠে বসল। তার ঘরের দরজার সোজাসুজি বারান্দার ওপ্রান্তে বাথরুম। বিছানায় বসেই সে দেখল, বাথরুম খোলা ও তার ভেতরে গতকাল-রাতের মেয়েটা কিছু কাচাকাচি করছে। সাবানের ফেনা হাতে কপালের চুল সরাতে গিয়ে মেয়েটার কপালে কিছুটা ফেনা লেগে গেল। অগত্যা কলসীর জলেই মুখ ধুতে হল বিমলকে।

বিমল পলিটিক্যাল সায়েন্সে এম-এ পরীক্ষা দিয়েছে। রেজাল্ট এখনো আউট হয়নি। সে চাকরির চেষ্টা করে যাচ্ছে। দেশের বাড়িতে মায়ের জন্য তাকে মাঝে-মাঝে যেতে হয়। গেলে সে বিব্রত হয় এবং অনন্যোপায় হয়েই ফিরে আসে। চা খেয়ে সে জামা-প্যান্ট পরে বেরিয়ে গেল।

(২)

দুপুরবেলা বোর্ডিংএ ফিরে পাঁচ নম্বর ঘরের সামনে দিয়ে সে যখন হেঁটে আসছে, বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে একটা ধস্তাধস্তি ও চাপা চেঁচামেচি শুনে বিমল একটু কৌতূহলী না হয়ে পারল না।

'তুমি এরকম......ওঃ। ছাড়াও অসভ্যের....'

'কি দেখাবে? আরে, আমার ঘড়িটা?'
'উঃ, ফেলে দিলে আমাকে।'

এসময় একটা ধাতব শব্দ। মনে হয় গ্লাস ছুঁড়ে মারা হয়েছিল, কিন্তু গ্লাসটা দেওয়ালে লেগেছে।

'আর একটু হলে কি হত। অসভ্য মেয়ে...'

'আমি অসভ্য? মা-কে একটা টেলিফোন করলে তোমার কি অবস্থা হবে জানো?'

'মা দেখাচ্ছো? কাচ থুকি আর কি। ঘড়িটা কোথায়?'

'জানি না।'
'এই তো ড্রয়ারে। জানি না, বলছো?'
'হ্যা, জানি না। ভল্লুক, পাজি। একটা সামান্য ঘড়ি....তুমি আমাকে....?'

বিমল আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে করতে সে এসে ঘরে ঢুকল। এসময় বোর্ডিংএ কেউ নেই। সবাই যে যার কাজে চলে গেছে।

বিকেল হয়ে গেছে। বোর্ডিংএ এখনো কেউ ফেরে নি। বিমল চুপচাপ বসে আছে। সে উঠে রাস্তার দিকের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

একটা কুড়ি নম্বর ট্রাম ধেয়ে আসছে শেয়ালদা থেকে। পার্ক সার্কাস যাবে। এন্টালি মার্কেটে ট্রামটা দাঁড়াল না। স্টপেজে একটি মাত্র লোক দাঁড়িয়ে ছিল। দাঁড়াল না দেখে, প্রাণপণ ছুটে ট্রামটা ধরার চেষ্টা করল সে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিমল ঝুঁকে পড়ে লক্ষ্য করছে, ব্যাপারটা কি হয়। লোকটা উঠতে পারবে কি? সে দেখল, অনেকটা ছুটে গিয়ে লোকটা উঠে পড়েছে। ছোটার সময় লোকটার চেহারা দেখে তার হাসি পেল। সে আরও একটু ঝুঁকে, জেম সিনেমার ভিড় দেখল। এখন ইন্টারভ্যাল। অনেক লোক বাইরে বেরিয়েছে। পৃথিবীর ব্যস্ততাময় সময়গুলোর মধ্যে এই সিনেমার ইন্টারভ্যাল একটি। বিমল ঘরের মধ্যে এল। রাস্তার দিকের দরজা বন্ধ করল। বিছানায় বসে বসেই পাশের কোনো ঘরের দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল।

ভিতরের দিকের দরজাটা বিমলের খোলাই ছিল। ওদিকের বারান্দায় দেওয়াল ঘেঁসে একটা বেড়াল গুটিসুটি মেরে পড়ে আছে। ঘুমোচ্ছে বোধহয়।

দরজার আড়ালটা যেতেই মেয়েটাকে দেখতে পেল বিমল। বাথরুমে যাচ্ছে। ঘুম-ভাঙা মুখে একটা ভারী ছায়া পড়ে থাকলেও মেয়েটাকে ভীষণ হাল্কা মনেই হচ্ছে। কাছাকাছি আসতেই দাঁড়িয়ে

হয়ে বেড়ালটাকে আদর করল। তারপর এদিক ওদিক চাইতেই বিমলকে দেখতে পেল সে। একটা পাতলা হাসি-হাসি চোখ। পুরো ব্যাপারটা ঘটল টুক করে। মেয়েটা বাথরুমে ঢুকে পড়ল। বেড়ালটা তখনও সেই জায়গাতেই পড়ে আছে। তবে, নড়ে-চড়ে ভঙ্গীটা পালটে নিয়েছে, এই যা।

ঘটনাটা দেখে বিমল একটু অবাক হল। তার মনে পড়ল দুপুরের ঝগড়াঝাটির কথা।

(৩)

সন্ধ্যেবেলা বিমল শুনল যে, মেয়েটা আন্দুলের। কলকাতায় হস্টেলে থেকে কলেজে পড়ে। চিত্ত ওদের ঘরে ঝাট দিতে গেছল, সেই শুনেছে। ছেলেটার বাড়ি কোথায়, জানা যায়নি। বিমলের টিউশনি যেতে ভালো লাগল না। সে শুয়ে রইল। বুঝতে পারল, চিত্তকে ওরা মিথ্যা কথা বলেছে।

কিছু পরে নির্মল বোর্ডিঙে ফিরল। বিভাসবাবুও। তারা বিমলের ঘরে এলে বিমল যেমন ছিল, তেমনিই রইল। নির্মল নিজের সিটে শুয়ে পড়ে বলল, 'কোনো খবর পেয়েছেন, বিমলদা ?'

কীসের ?

বিভাসবাবু খেঁকিয়ে উঠলেন। 'আপনি, মশাই, গেছেন। কী করছেন সারাদিন? শুধু তো শুয়েই থাকেন। খবরটাও তো নিতে পারেন।'

বিমল আস্তে আস্তে উঠে বসল। 'আপনি কি মেয়েটার পাত্র দেখবেন! নাকি পুলিশে খবর দেবেন?'

'আশ্চর্য! কী কথার কী উত্তর। কৌতূহলও তো মানুষের থাকে।

'শুনুন তাহলে, মেয়েটি অত্যন্ত ভালো। নম্র, সুন্দর ও ছেলেটাকে যথেষ্ট ভালোবাসে। ছেলেটাও শক্তসমর্থ; মেয়েটির ভালোবাসা নেওয়ার যোগ্য পাত্র। ছেলের বাড়ি, জানি না। মেয়ের বাড়ি, আন্দুল। কলেজে পড়ে এখানেই এবং হস্টেলে থাকে। বিভাসবাবু, এবার আপনি আসুন।'

এরকম কথাবার্তায় বিভাসবাবু থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়ালেন। একবার শুয়ে থাকা নির্মলের দিকে চাইলেন। তারপর 'ঠিক আছে, ঠিক আছে' বলতে বলতে বিমলদের ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বিমল অনেকক্ষণ বসে রইল। একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘন ঘন টান দিল। গলাটা খুসখুস করছে বলে রাগের মাথায় জোরে একটা টান দিয়ে সিগারেটটা ফেলে দিল। এসময় হঠাৎ নির্মল উঠে দাঁড়াল। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'শুনছেন, পাঁচ নম্বরে বোধহয় চেঁচামেচি হচ্ছে। দেখি, দেখি।' প্রায় লাফ দিয়ে নির্মল চলে গেল।

বিমল শুয়ে পড়ল। হঠাৎ তার মনে হল, মাথাটা ধরেছে। ঘাড়ের কাছটা ঝিমঝিম করছে। চোখ ভারী হয়ে আসছে। সে চোখ বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে রইল।

খাবার দিয়ে গেলে বিমল উঠে বসল। চোখে-মুখে জল দিয়ে বাথরুমে যেতেই সে বারান্দা থেকে দেখল, নিচে, রান্নাঘরের সামনে চাকর-বাকরেরা দু-ফালি লম্বা-লম্বা কাপড় ভাঁজ করার ভঙ্গীতে, ঠিক ধোপাদের মত, ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা হাসাহাসি করছে। একটু লক্ষ্য করতেই বিমল বুঝতে পারল, কাপড়ের লম্বা ফালি দুটো, আর কিছুই নয়, মেয়েটারই শাড়ি। যে শাড়িটা পরে মেয়েটা দুপুরবেলা বেড়ালটাকে আদর করেছিল, সেই শাড়িই মনে হল। ঠিক সমান-সমান দুভাগে ছেঁড়া। শাড়িটা দামীই হবে। ওদের টুকটাক কথাবার্তায় বোঝা গেল, ছেলেটার-ও একটা শার্ট ও একটা গেঞ্জি ছিঁড়েছে। সেগুলো বিমল দেখতে পেল না। সে একবার পাঁচ নম্বরের বন্ধ-দরজাটা দেখল। কোনো শব্দ নেই। বিমলের পাশের রুমে ক্যারাম-খেলা চলছে এবং ঐ বিষয়ে কথাবার্তা। বিমল কান দিল না। সে বাথরুমের দিকে হেঁটে গেল।

বাথরুমে টিকটিকি কোনোদিন দেখতে পায়নি বিমল। তাদের বাথরুমে মাঝে-মধ্যে কেন, প্রায়ই আরশোলা দেখা যায়। আজ, জলের চৌবাচ্চাটার দিকে, তার মাথা সমান উঁচুতে, একটা টিকটিকি দেয়াল আঁকড়ে শুয়ে আছে, সে দেখল। দেখে, সে অবাক হল। নিতান্তই কৌতূহলবশতঃ বিমল বাথরুমের বাকি দেওয়ালগুলোতে চোখ বুলিয়ে নিল। না, আর কোথাও টিকটিকি নেই। বন্ধ টিনের দরজার মাথায় একটা আরশোলা ঘোরাফেরা করছে। সে হিসেব করে দেখল, তার ডানদিকের দেওয়ালে টিকটিকি ও বাঁ-দিকের দেওয়ালে, না দেওয়ালে নয়—দরজায়, আরশোলা। হঠাৎ একটা ফর্ ফর্ শব্দ হল। আরশোলাটা সম্পূর্ণ বাথরুম অতিক্রম করে, উড়তে উড়তে, বিপরীত দেওয়ালের নির্লিপ্ত টিকটিকির মুখে গিয়ে পড়ল। এরপর টিকটিকির কর্মপদ্ধতি অত্যন্ত স্বাভাবিক। ঘটনার এই আকস্মিকতায় বিমল হতচকিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল। এর একটা অর্থ খুঁজতে গিয়ে, ক্লাশের কে-জি-র কথা তার মনে পড়ল। সে হাসল।

মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে বিমলের ঘড়ি দেখা অভ্যেস। টেবিল থেকে [illegible] ঘড়িটা নিয়ে সে টেবিল-ল্যাম্প জ্বালায়। দুটো সাঁইত্রিশ। ঘড়িটা রাখতে রাখতে মনে পড়ল, ঘুম ভাঙার আগে সে কী-একটা স্বপ্ন দেখছিল। খুব ছোট্ট স্বপ্ন বলেই তার মনে হল। কিন্তু, স্বপ্নটা কীরকম, সে মনে করতে পারল না। উঠেইছে যখন, পেচ্ছাপটা সেরে-ফেলাই যুক্তিযুক্ত—এই ভেবে দরজা খুলতে গিয়ে পাশের সিটের ঘুমন্ত নির্মলকে একবার দেখল। পাখার হাওয়ায় নির্মলের চুলগুলো অল্প-অল্প উড়ছে। ঘরটা ছোট বলে টেবিল-ল্যাম্পের আলোটুকুতেই ঘরের পুরোটা দেখা যায়। দেখল পড়তে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়েছে নির্মল। ওর হাতে শুধু একটা বই ধরা আছে।

বইটা নির্মলের টেবিলে রেখে দিয়ে দরজা খুলে বিমল বাথরুমে গেল। বাথরুম থেকে ফেরার পথে পাঁচ নম্বরের বন্ধ দরজাটা চোখে পড়ল তার। অকারণে, সে বন্ধ দরজার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। লক্ষ্য করল, বন্ধ দরজার দুই কপাটের মাঝখান দিয়ে পর্দার প্রান্তটা একটুখানি বেরিয়ে আছে। দরজা বন্ধ করার সময় বোধহয় খেয়াল করেনি ওরা। অথবা পুরুষেরই দেয়

নি। দেখতে দেখতে হঠাৎ সে সচেতন হয়ে ওঠে। দ্রুত ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে সে শুয়ে পড়ে।

(৪)

পরদিন সকালে কলরব শুনে বিমলের ঘুম ভাঙল। ঘড়িতে দেখল নটা পঁচিশ। কলরবের কারণটা বুঝতে তার কিছুক্ষণ সময় লাগল।

তিনতলার গুপ্তদা বাড়ি গিয়েছিলেন। সকালের ট্রেনে কলকাতা আসার সময় থানা-জংশনে একটা বড় রকমের এ্যাক্সিডেন্ট ঘটে। যে-ট্রেনে আসছিলেন, সেই ট্রেনটা লাইনচ্যুত হওয়ায়, অনেকে আহত হয়। তবে শেষের কয়েকখানা বগি ঠিকই ছিল। এবং সৌভাগ্যবশতঃ, গুপ্তদা পিছনের দিকের কমপার্টমেন্টেই ছিলেন। বিমল তিন-তলায় গুপ্তদার ঘরে গিয়ে দেখল, সবাই উদগ্রীব হয়ে গুপ্তদার কথা শুনছে এবং উভ্রান্ত গুপ্তদা যতটা সম্ভব গুছিয়ে দুর্ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছেন।

অনিমেষ এতোক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। এবার সে অতর্কিতে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা গুপ্তদা, যে মুহূর্তে টের পেলেন যে, এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, সেসময় কী মনে হয়েছিল আপনার?'

গুপ্তদা প্রথমে অনিমেষের, পরে সকলের দিকে তাকিয়ে একটু চুপ করে রইল। তারপর এলোমেলো চুলের মধ্যে বাঁ-হাতটা চালিয়ে হেসে ফেলে বলল, 'অতসব মনে নেই, ভাই।'

'সে কী, সেই মুহূর্তে যদি মারা যেতেন, ধরুন, মারা গেছেন, তাহলে শেষতম ভাবনা বা আতঙ্ক—যাই হোক—সেটা যে কী ছিল, তা আমরা জানার সুযোগটুকু পেয়ে যাচ্ছি। এটা আমাদের বাড়তি পাওয়া। অবশ্য যদি আপনি মনে করে বলতে পারেন।' বলে সকলের দিকে তাকিয়ে 'কী বলুন, পাচ্ছি না?' বলল অনিমেষ।

উপস্থিত সকলেই বিব্রত বোধ করল। গুপ্তদা হাসিটাকে এখনো ধরে আছেন। বিমল ওখান থেকে চলে এল। তিনতলার বারান্দায় গিয়ে সে একটু দাঁড়াল। রাস্তায় অফিস-যাত্রীর ভিড়। বাসস্টপেও প্রচুর লোক। সে দেখল, পাঁচ নম্বরের ছেলেটা বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে বোর্ডিংটার দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছে। তার চাউনি দেখে বিমল একটু ঝুঁকে পড়ে দেখল যে, দোতলার বারান্দায় মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে। সে শুধু মেয়েটার মাথা, একটুখানি নাক, দুই কাঁধ ও বুক দেখতে পেল। এসময় একটা ডবলডেকার এল। প্রচুর ঠেলাঠেলির মধ্যে ছেলেটা পাদানিতে ঝুলতে ঝুলতে একটা হাত তুলে মেয়েটাকে বিদায় জানাল। মেয়েটাও ডান হাতটা অল্প একটু তুলে নামিয়ে নিল। আঁচলটা ঠিক করল। এসময় ট্রাফিক সিগন্যাল না-পাওয়ায় বাসটা এঞ্জিন বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। ছেলেটা অন্য অনেকের সঙ্গে নেমে গিয়ে উপরে তাকিয়ে হাসল। মেয়েটাও হাসল। সিগন্যাল পেয়ে বাস স্টার্ট দিল। সবাই উঠে পড়ল। আবার ছেলেটা হাত তুলে বিদায় জানাল ও বিদায় জানাতে জানাতে চলে গেল। এরপরও মেয়েটা বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকল।

বিকেলে কফিহাউসে বিমল দু'তিনজন বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা মারছে; এমন সময় দেখল, পাঁচ নম্বরের মেয়েটা একা-একাই কফিহাউসে ঢুকছে। বিমল অবাক হল। এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে বিমলের সঙ্গে তার চোখাচোখি হল। তখনও মেয়েটা হাঁটছে, কিন্তু মনে হল, থমকে গেছে। বিমলও অস্বস্তি অনুভব করল একটু। কিন্তু, ব্যাপারটা গ্রাহ্য করল না। আড্ডা মেরে যেতে লাগল। এবং সে যে বিশ্বাস-যোগ্যভাবে আড্ডা মেরে যেতে পারছে—এই ব্যাপারটা ফুটিয়ে তোলার জন্য আরো বেশী করে আড্ডায় জমে-যাওয়ার চেষ্টা করল।

এরই ফাঁকে সে লক্ষ্য করেছে, মেয়েটা ভেতরের দিকের কোনায় একটা টেবিলে একা-একাই বসে আছে। বেয়ারা জল দিয়ে গেছে। বিমল 'বাথরুম থেকে আসি' বলে উঠে গেল। বাথরুম থেকে বেরোলেই, সে জানে, মেয়েটার মুখোমুখি তাকে হতে হবে। সে প্রস্তুত হয়েই ছিল।

বাথরুমে থেকে বেরিয়েই সে দেখল, মেয়েটা টেবিলে নেই। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে গোটা কফিহাউসে সে তন্ন-তন্ন করে চোখ বোলায়। আশ্চর্য গেল কোথায়! কফিহাউসে যতটা সম্ভব দ্রুত হেঁটে সে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে। একটা

ট্যাক্সি এসে গেটের কাছে দাঁড়াল। পরপর দুটি ফাঁকা রিকসা সংস্কৃত কলেজের দিকে চলে যেতেই 'এ্যাই নিখিল', বলে একটা ছেলে কাকে যেন চেঁচিয়ে ডাকল।

এরপরই বিমল দেখতে পেল। রাস্তার ওপাশের মোড়ে একটা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। সাদা রঙের এ্যামব্যাসাডর। তারই আড়ালে একটা ছেলের সঙ্গে...না, একটা নয়, দুটো ছেলের সঙ্গে মেয়েটা দাঁড়িয়ে কী যেন কথাবার্তা বলছে। একটা ছেলে কথা বলছে, আরেকটা পাশে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। ছেলেটা কী একটা বলতে বলতে ইউনিভার্সিটির দিকে আঙুল তুলে মেয়েটাকে কিছু দেখাল। এরপর অপর ছেলেটাও একটা কায়দায় হাত তুলে ধরল সেইদিকে। সিগারেটের আগুনটা ছেলেটার উত্তেজিত দু' আঙুলের ফাঁকে, বিমলের মনে হল, ধক ধক করে উঠছে। এরপর তারা তিনজনে ইউনিভার্সিটির দিকে হাঁটতে হাঁটতে আড়াল হয়ে গেলে, বিমল আরও কিছুক্ষণ একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল। এক সম হঠাৎ তার মনে হল, দুটো অচেনা ছেলের সঙ্গে মেয়েটা কোথায় যেতে পারে!

বাস-ধরার জন্য যখন সে কলেজ স্ট্রিটে দাঁড়িয়ে আছে, সেসময় ইভনিং শো ভাঙল। গ্রেস সিনেমা থেকে হুড়মুড় করে লোকজন বেরোচ্ছে দেখে বিমল মত-পরিবর্তন করল। বোল নম্বর বাসে যাবার কথা সে ভেবেছিল; কেননা, বাসটি দ্রুত যায়। এই শো-ভাঙা ভিড় দেখে হাতের কাছে একটা ছাব্বিশ নম্বর ট্রাম পেয়ে, সেটাতেই উঠে পড়ল সে। সুবিধামতো একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে সে কফিহাউসের ব্যাপারটা আগাগোড়া মনে করার চেষ্টা করল। প্রথমেই তার মনে হল, মেয়েটা কি কফিহাউসে প্রায়ই আসে? তাহলে সে এতোদিন দেখতে পায়নি কেন! যদি না আসে, তবে এরকম হঠাৎ আসার মানেটা কী? কোনো এক কলেজে পড়ার সুবিধায় সে কফিহাউসে আসতে পারে; কিন্তু বিমলের চোখে একদিনও পড়ল না কেন? এ ব্যাপারে আর বেশীদূর এগোতে পারল না বিমল। হঠাৎ তার সকালের ঘটনার কথা মনে পড়ল। অনিমেষের প্রশ্নের পর গুপ্তদাকে দেখে বিমলের গা-টা কীরকম করে উঠেছিল—সেকথাও মনে পড়ল। 'সেই মুহূর্তে যদি মারা যেতেন, ধরুন, মারা গেছেন...'শুনে গুপ্তদার হাসিটা নির্বোধের চেহারায় রূপান্তরিত হয়েছিল, সে বিষয়ে একতিলও সন্দেহ নেই। তিনি যে বেঁচে আছেন, এই বেঁচে-থাকাটা যে তাঁর অপরাধ—এটা তাঁর হাসি দেখেই বোঝা গিয়েছিল।

রাত্র খাওয়া-দাওয়ার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে বিমল রাস্তার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। বারান্দা থেকেই সে শুনতে পাচ্ছিল বোর্ডিঙের হৈ-চৈ। আড্ডার মূল প্রসঙ্গ হিসেবে মেয়েটা ছেলেটা তো আছেই। মাঝে-মধ্যে ট্রেন দুর্ঘটনা, রাজনীতি, সিনেমা ও আশা ভোঁশলের প্রসঙ্গ যথারীতি এসে পড়ছে। এছাড়া, যাঁরা চাকরি করেন, তাঁদের অফিসের টুকটাক কথাও না আসবে কেন!

বিমল তার দরজা থেকে সরে গিয়ে পাঁচ নম্বরের দরজার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল। ফাঁকা রাস্তা। মোড়ের সিগারেটের দোকানটা এখনো খোলা আছে। ওপাশের ফুটপাতের গাড়ি-বারান্দার অন্ধকার থেকে একটা বাচ্চা মেয়ে 'না-আ' বলে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচাতে চেঁচাতে কোনাকুনি ছুটে বরিয়ে এল। তার পিছন পিছন সম্ভবতঃ তার মা, ছেঁড়া শাড়ি সামলানোর বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে ছুটেছে এবং বলছে, 'হারামজাদী, থাম্। যাবি কোন্ খানে।' অনেকদূর থেকে মেয়েটিকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে মহিলাটি। একটা ফাঁকা রিকসা অত্যন্ত ঢিমেতালে শেয়ালদা থেকে আসছে। রিকসাওয়ালা হাত দুটো আলগা করে গলা ছেড়ে তার দেশোয়ালী ভাষায় কী একটা গান ধরেছে। অনেক কষ্টেও বিমল কিছুই বুঝতে পারল না।

এমন সময়, পাঁচ নম্বরের দরজার খড়-খড়ির ফাঁক দিয়ে ভেসে এল তক্তার বিশ্রী ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ। কলসী থেকে জল ঢক্ ঢক্ করে গ্লাসে পড়ছে বিমল বুঝতে পারল।

'আমাকে একটু দিও।' মেয়েটার গলা শোনা গেল।

আবার জল-ঢালার শব্দ। কিছুক্ষণ চুপচাপ। মেঝেয় গ্লাশ রাখার শব্দ এবার। কেউ একজন চেয়ার টানল। তার শব্দ বিমল শুনতে পেল। বোধহয় বসার জন্য। ঘরে আলো জ্বলছে এটা খড়খড়ির ফাঁকের আলো দেখে বোঝা যায়। বিমল বন্ধ দরজাটা একবার দেখল।

'বিকেলে বেরিয়েছিলে?'
'কেন?'
'তোমায় না নিষেধ করেছিলুম!'
'আমি বেরিয়েছিলাম, কে বলল?'
'চিত্ত বলেছে আমাকে। এদের চাকরটা। তুমি কি ভেবেছ, আমি খোঁজ রাখব না?'

'আমাকে অবিশ্বাস করছ? আমি কি সারাদিন দরজা বন্ধ করে এই ঘরে বসে থাকব! ছেলেগুলো কীরকম তাকায় লক্ষ্য করনি?'

'হ্যাঁ, এই ঘরেই থাকবে। অমিতের জন্য কষ্ট হচ্ছে নাকি?'

'শুভ্র, তুমি চুপ করবে? ঐ রাস্কেলটার কথা আর একবার বললে তোমায় মেরে ফেলব বলছি।'

'ঠিক আছে। কিন্তু, কোথায় গেছলে?'
'কফি-হাউসে।'
'বেড়াতে?'

'দরকার ছিল?'
'বলার মতো নয়? দেখ, আমি সারাদিন টাকার জন্য ঘুরছি, আর তুমি এভাবে...'
'আঃ, চুপ কর। বলছি তো দরকার ছিল।'

'ঠিক আছে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। নিচের রাস্ত একটা কুকুর ছুটে পাশের গলি থে বেরিয়ে এল। পিছন পিছন আরেকটা প্রথমটা লাইটপোস্টের গোড়ায় নাক ঠেকি শুঁকল। তারপর এদিক-ওদিক করে লাইট পোস্টের গোড়াতেই ঠ্যাং তুলে পেচ্ছা করল। অন্য কুকুরটা 'ভে-ও-উ' করে লম্ব একটা ডাক দিল।

'টাকা পেয়েছ?'

'কাল পেয়ে যাব। ম্যানেজার যদি সকাে জিজ্ঞেস করে, বলে দিও, অফিস থে ফিরলেই পেয়ে যাবে।'

'পয়লা তারিখে বেতন হয় ন তোমাদের?'

'দু-তারিখে। নাও, আলো নেভাবে ঠিক করে শোও।'

(৬)

পরদিন বিকেলে কফি হাউসে আবা মেয়েটার সঙ্গে দেখা। বিমল সারাদি দুতিন জায়গায় ঘুরে ক্লান্ত হয়ে যখ কফিহাউসে উঠছে, সিঁড়িতে দেখা হ ওদের। মেয়েটা নামছিল। দেখে, প্রথমে একটু অসতর্ক হয়ে পড়েছিল বিমল পরক্ষণেই সাবলীলভাবে পাশ কাটিয়ে উ গেল কয়েক ধাপ। ঠিক সেসময় পিছন থেকে মেয়েটা ডাকল, 'শুনুন।'

চকিতে বিমল ঘাড় ফিরিয়ে বুঝল এতো দ্রুত না তাকালেই হত।

'আমাকে বলছেন?'

মেয়েটা কয়েক ধাপ উঠে বলল, হ্যাঁ আপনি তো শ্রীবিলাস বোর্ডিং হাউে থাকেন। বসবেন কফি-হাউসে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু, আপনি তো নেে যাচ্ছিলেন।'

'চলুন, বসা যাক।'

বেয়ারা জল দিয়ে গেছে। বিমল দুটো কফির অর্ডার দিল। একটা গ্লাশ তুলে অর্ধেকটা জল খেয়ে বিমল প্রশ্ন করল 'আপনাদের বাড়ি কোথায়? আপনার?'

মেয়েটা কীরকম হাসল। কোনো উত্ত দেবার আগেই বিমল আবার বলল,

'প্রথমে শুনলাম, আন্দুলে। প আপনার মুখে মাকে টেলিফোন করার কথা শুনলাম। জানি, এক্ষেত্রে সত্যি বলা অসম্ভব।'

মেয়েটা উপরের ঘুরন্ত পাখার দিে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, 'এখানে আমার বাড়ি। ঢাকুরিয়ায়। আমাকে আ কিছু প্রশ্ন করার দরকার আছে কি? আমি উঠছি।'

বলে বিমলকে কিছু বলার সুযোগ না-দিয়ে হন্ হন্ করে মেয়েটা টেবিল ছেড়ে উঠে চলে গেল। বিমল ডাকতেও পারল না— এতোই হতভম্ব হয়ে গেছে তখন। এসময় বেয়ারা দুটো কফি দিয়ে গেলে, কফি-ভর্তি দুটো কাপের দিকে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। এরকম বিব্রত বহুদিন বোধ করে নি বিমল।

না-খেয়ে, কফির দাম দিয়ে সে উঠে পড়ল।

ইউনিভার্সিটি থেকে দলে দলে ছেলে-মেয়ে বেরোচ্ছে। একটা ছুটন্ত ট্রামের সামনে দিয়ে দৌড়ে রাস্তা পার হল একটা মেয়ে। আরো একটু এগিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বিমল দেখল, কলুটোলায় সেই জ্যোতিষীটি আজও বসে আছে। অফিস ফেরতা কেরাণীর দল উঁকি দিচ্ছে তার দিকে। মেডিকেল কলেজে এক নম্বর গেটটা বন্ধ হয়ে গেছে দেখে, সে বিপদে পড়ল। ভেবেছিল, ভিতরে গিয়ে কলেজ ক্যান্টিনে খেয়ে আসবে। এখন তাকে ঘুরে দুনম্বর গেট হয়ে যেতে হয়। অসহ্য ক্লান্তি থেকে অনিচ্ছা এসে তার পথরোধ করে দাঁড়াল। সে দেখল এক নম্বরের পাশের ফাঁক দিয়ে একটা বাচ্চা ছেলে ভিতরে ঢুকে পড়ল; বিমল কিছুটা নিশ্চিন্ত হল। এদের ক্যান্টিনে খাবার-দাবার বেশ সস্তা। শুধুমাত্র এ-কারণেই বিমল জায়গাটাকে বেছে নিয়েছে। গেটের পাশে দাঁড়িয়ে বিমল আরও বিপদে পড়ল। মূঢ়তায় ছেয়ে গেল তার মুখ। ভিতরে দু'একটি মিটমিটে বাল্ব জ্বলছে; অথচ এখনো তার দরকার নেই। সেই দিকে চেয়ে বিমলের মূঢ়তা অনেকক্ষণ স্থির হয়ে রইল। ফাঁকটা অত্যন্ত সরু।

সন্ধ্যেবেলা বোর্ডিংএ ফিরে জামাকাপড় ছেড়ে বিমল বাথরুমে গেল। বেরিয়ে এসে শীতলবাবুর ঘরে সে বসল। নির্মল অনিমেষ শীতলবাবু এবং চিত্ত রয়েছে, সে দেখল। সবাই বসে এবং চিত্ত দাঁড়িয়ে ছিল। বিমলকে দেখে সবাই কোনো একটা প্রসঙ্গ প্রায় গোড়া থেকে টেনে আনছে দেখে, বিমল আসছি বলে বাইরে এল। শীতলবাবুর ঘর থেকে ম্যানেজারের ঘরটা পুরো দেখা যায়। বিমল দেখল, ম্যানেজারের ঘরে বসে আছে মেয়েটা। বসে গল্প করছে ম্যানেজারের সংগে। তার কোলে বেড়াল।

এসময় ছেলেটা ঢুকল ঘরে। সংগে সংগে মেয়েটা খেঁকিয়ে ওঠে, 'তুমি এখানে কেন? যাও, ঘরে যাও।'

ছেলেটা কোনো কথা না শুনে চেয়ারে বসে পড়ে। ম্যানেজারকে আস্তে আস্তে কী একটা বলল সে। ম্যানেজার খাতা খুলে কিছু হিসেব করছেন মনে হল। মেয়েটা একদৃষ্টে ছেলেটার দিকে চেয়ে আছে। ছেলেটা ম্যানেজারের দিকে। হঠাৎ মেয়েটা সোফা থেকে উঠে, প্রায় লাফিয়ে ছেলেটার চুল ধরল খামচে। তারপর তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, যাও, বলছি। ইডিয়ট কোথাকার। যাও। সব সময় ফলো-করা!'

এরপর হুটোপুটি। অনেকেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে বারান্দায়। প্রত্যেকের চোখ বড়ো বড়ো। ম্যানেজারের ঘর থেকে টানাটানি করতে করতে বারান্দায় এল ওরা। মেয়েটার আঁচল খসে গেছে। কাঁধের একদিকে ব্লাউজ ধরে ছেলেটা টান দিল এই মুহূর্তে। সেলাই ছেঁড়ার শব্দ হল। অর্ধেক শাড়ি লুটোচ্ছে বারান্দায়। মেয়েটার হাতে এক গোছা চুল। ছেলেটার। ফেলে দিতে পারে নি। দুজনেই হাঁপাচ্ছে, চিৎকার করছে, এ-ওকে মারছে।

ম্যানেজারবাবু 'একী একী, আপনারা ঘরে যান। ছিঃ, ছিঃ, ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ে। আরে ভাই ঘরে গিয়ে যা খুশি করুন তো। এটা কি আজে বাজে বোর্ডিং পেয়েছেন আপনারা! যান।'

মেয়েটা ককিয়ে উঠল, 'কোথায়? কোথায় যাব?' তারপর উপস্থিত সমস্ত বোর্ডারের দিকে চেয়ে, আসুন আসুন আপনারা। বাঁচান আমাকে। রাস্কেলটা মেরে ফেলল।' চুলগুলো এলোমেলো। সারা মুখে উড়ো চুলের ভয়ানক আঁকিবুকি। শুধু ব্লাউজে ঊর্ধাংগ ঢাকা। প্রচণ্ড হাঁপাচ্ছে আর গড়িয়ে-পড়া আঁচল তুলে মাঝে মাঝে নাক মুছছে। বিমল কয়েকজনকে পাশ কাটিয়ে নিজের ঘরে এসে ঢুকল। পাখা চালিয়ে দিল জোরে। আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল। বাইরে বারান্দায় তখন ভীষণ চেঁচামেচি। সারা বোর্ডিঙের লোক জড়ো হয়ে গেছে।

'এ্যাতো বড়ো সাহস। আমার গায়ে হাত তোলো? তোমায় চিবিয়ে খেয়ে ফেলবো।'

'এাাই বাঁদরী, চুপ। এক চড়ে বারান্দা থেকে ফেলে দেব।'

এরপরই হুটোপুটির শব্দ। এবং ম্যানেজারের গলা। কী পেয়েছেন আপনারা? বুঝলেন মশাই, ছেলেটা কিছুই করেনি, বিলটা আনতে আমার ঘরে গেছল। মেয়েটা, কী বলবো, পাগল; তা না হলে ঐভাবে কেউ শুধু শুধু চুলে ধরে মারতে আসে?'

'কী? আমি পাগল? ইউ, আপনিই পাগল। যান, আমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে আসবেন না। আপনি পাগল, পাগল, পাগল। হয়েছে?' এরপর দড়াম করে কী একটা শব্দ হল এবং মেয়েটা আর্তনাদ করে উঠল।

'উঃ মাগো।' করে কাঁদতে লাগল জোরে জোরে।

মেয়েটার একটানা কান্না, সমবেত সকলের তীক্ষ্ণ কথাবার্তা, ম্যানেজারের খেদোক্তি ও ছেলেটার নৈঃশব্দ থেকে, বাইরের রাস্তায় এক-আধটা গাড়ির শব্দ ও গাড়ির হর্নের শব্দ থেকে, মাথার উপরের ঘূরন্ত পাখা ও পাখার ব্লেডের ছায়া থেকে অনেক দূরে যেতে যেতে বিমল একবার মাত্র নিজের ডুবে যাওয়া মুখটা দেখতে চাইল।

আসামে শরৎচন্দ্র

গোপালচন্দ্র রায়

স্বাধীনতা লাভের আগে আসামের শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলার ছাত্ররা একত্রে এক সময় প্রতি বছর সুরমা ভ্যালি স্টুডেন্টস কনফারেন্স করতেন। এই কনফারেন্স প্রথম বছরে হয়েছিল কাছাড়ের সদর শহর শিলচরে দ্বিতীয় বছর শ্রীহট্টে। এইভাবে এক বছর শিলচরে, পরের বছর শ্রীহট্টে করে বদলে বদলে কনফারেন্স হত।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ ও ২০ জুন তারিখে সুরমা ভ্যালি স্টুডেন্টস কনফারেন্সের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয় শিলচরে। সেবার ঐ অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন—শরৎচন্দ্র।

আসামের বহু বিখ্যাত ব্যক্তি সেই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে এবং অনেকে সম্মেলনে যোগদান করতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে উদ্যোক্তাদের কাছে চিঠি ও তার পাঠিয়ে ছিলেন।

প্রথম দিনের সভায় শরৎচন্দ্র এসে পৌঁছুতে না পারায় সেদিনের জন্য সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন শ্রীহট্টের স্বরাজ দলের নেতা বসন্তকুমার দাস এম-এল-সি মশায়। সভা হয়েছিল শিলচরের রীডিং এণ্ড ড্যামাটিক ইনস্টিটিউশনের হলে। এই উপলক্ষে হলকে বিশেষভাবে সুসজ্জিত করা হয়েছিল।

২০ তারিখের সকালে শরৎচন্দ্র এসে পৌঁছলে অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যবৃন্দ রেল স্টেশনে বন্দেমাতরম ধ্বনি দিয়ে তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানান। তারপর সাদর আহ্বানে তাঁকে তাঁর বিশ্রাম স্থানে নিয়ে আসেন। বিকালে ছাত্রদের সভায় ছাত্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি একটি বক্তৃতা দেন।

পরে এক সভায় ছাত্ররা শরৎচন্দ্রকে একটি মানপত্রও দিয়েছিলেন। সেই মানপত্রটি আমি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি। সেটি এই—

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মহাশয়ের করকমলে—

মানুষের মর্মতলের অনুভূতি তোমার লেখনীর মোহনস্পর্শে মূর্তিলাভ করিয়াছে। নারীত্বের তেজোময়ী মহিমা দিয়া তুমি বঙ্গভারতীর পূজা করিয়াছ। শিল্পি! আমাদের নমস্কার গ্রহণ কর।

শৃঙ্খলার নামে শৃঙ্খল তৈরি করিয়া সমাজ মানুষের অন্তরের দেবতাকে অপমানিত করিতেছিল, তুমি নাগপাশ কাটিয়া দিয়াছ, দেবতাকে বন্ধন মুক্ত করিয়াছ। নির্ভীক! আমাদের নবীন প্রাণ তোমাকে বরণ করিয়া লইতেছে। নমস্কার গ্রহণ কর।

চিরাচরিত পথের চিন্তাহীন আরামে অন্ধযুক্তির জটাজালে মূঢ় ভক্তের দল শিকল দেবীর পূজা করিতেছিল। তোমার অতর্কিত আবির্ভাব তাহাদিগকে আতঙ্কিত করিয়াছে। তুমি তাহাদের সুপ্তি ভাঙ্গিয়াছ। কশাঘাতে জর্জরিত তাহারা বিষ উদ্গীরণ করিতেছে। প্রবীণ তোমাকে মানিতে চায় না। তুমি তরুণের নত হৃদয়ের নতি গ্রহণ কর।

সংকীর্ণতা সুন্দরকে কুৎসিত বলিয়া প্রচার করিতেছিল। দেবপূজার ফুলকে ধূলি মলিন করিয়া রাখিয়াছিল। দ্রষ্টা! জঞ্জাল স্তূপের অন্তরাল হইতে তুমি তাহা খুঁজিয়া বাহির করিয়া দেবতার পূজা করিয়াছ। যাদুকর! তোমার কোমল স্পর্শে বঙ্গবাণীর পুষ্পকাননে পারিজাত ফুটিয়াছে। আমাদের বিস্ময়াপ্লুত চিত্তের নিবেদন গ্রহণ কর।

সৃষ্টির ধারা মানুষের নীতির নিয়ম অনুবর্তন করে না। তাহা উপলব্ধি করিয়াছ বলিয়া তুমি বিদ্রোহী। বিদ্রোহী তোমাকেই অগ্রদূত করিয়া শঙ্খ-নিনাদে আমরা মুক্তির বার্তা প্রচার করিব। ধরা কাঁপাইয়া তুলিব। নেতৃত্ব স্বীকার কর—আমাদের নমস্কার গ্রহণ কর।

শিলচর গুণমুগ্ধ—
৬ আষাঢ়, ১৩৩৩ বাং। শিলচর ছাত্র সংঘ

এই মানপত্র প্রদানের সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন শিলচর নর্মাল স্কুলের শিক্ষক অঘোরনাথ অধিকারী মশায়। অঘোরবাবু এক সময় (সম্ভবতঃ হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে) শরৎচন্দ্রের শিক্ষক ছিলেন। সেদিনের সভা প্রসঙ্গে অঘোরবাবু লিখেছেন—

একবার এক সাহিত্য-সভায় শরৎচন্দ্রকে একখানি মানপত্র দিবার আয়োজন হয়। ঐ সভায় ঘটনাচক্রে আমাকেই সভাপতি হইতে হয়। ঐ সভাক্ষেত্রেই সর্বজন সমক্ষে শরৎচন্দ্র আমার পায়ের ধুলা লইয়া শ্রোতাদিগের নিকট তাঁহার এই অযোগ্য মাস্টার মহাশয়ের এরূপ সুখ্যাতি করিয়াছিলেন যে, শ্রোতৃ-

শরৎচন্দ্রের স্মৃতিবিজড়িত ভবনের সামনে লেখক

মণ্ডলীর মধ্যে একজন উঠিয়া শরৎবাবুর এই ব্যবহারকে গুরুভক্তির একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলিয়া উল্লেখ করেন।

শরৎচন্দ্র সেবার শিলচরের ছাত্র সম্মেলনে এসে এখানে কয়েকদিন ছিলেন এবং শিলচরের আশেপাশে ঘুরে দেখেছিলেন। তখন শিলচর ও এর নিকটস্থ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ও আলাপ করতে এসেছিলেন। সেই সময়কার এক দিনের একটি ঘটনা সম্পর্কে পূর্বোক্ত অঘোরনাথ অধিকারী লিখেছেন—

শরৎচন্দ্র একবার শিলচরে এক সাহিত্য-সভায় সভাপতিত্ব করিতে গমন করিয়াছিলেন। সে সময়ে আমিও শিক্ষকতা কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শিলচরে বাস করিতেছিলাম। ঐ শহরের কতিপয় ভদ্রলোক শরৎচন্দ্রের সহিত সামাজিকভাবে আলাপ-পরিচয় করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আমাকেই ঐ কার্যের ব্যবস্থা করিতে বলেন। আমি তাঁহাদিগকে এক সান্ধ্য-ভোজে আমার গৃহে নিমন্ত্রণ করি। আহারাদির পর তাঁহারা শরৎচন্দ্রকে লইয়া আলাপ করিতে বসিলেন। বাহিরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি। আসামের বৃষ্টি একবার আরম্ভ হইলে শীঘ্র থামিতে চায় না। রাত্রি ৯টা পর্যন্ত সাপ ও সাপ ধরার গল্প চলিল। এটার সময় বৃষ্টি থামিলে তাঁহারা সকলে একত্রে শরৎচন্দ্রকে তাঁহার বাসস্থানে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য রওনা হইলেন। ঐ দুর্যোগের রাত্রিতে গাড়ি পাওয়া গেল না। তাঁহারা হাঁটিয়াই রওনা হইলেন। যে বাড়িতে শরৎচন্দ্রের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল সে বাড়ি আমাদের বাড়ি হইতে প্রায় অর্ধমাইল দূরে। তাঁহারা অর্ধপথ গিয়াছেন এমন সময় শিলচরের নর্মাল স্কুলের সম্মুখে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন একটা সাপ রাস্তার এধার হইতে ওধারে যাইতেছে। শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সেই সাপটিকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তখন মোহিনীমোহন লাহিড়ী ও নির্মলচন্দ্র দত্ত ইহারা দুইজনেই সে সময় শিলচরে পোস্টাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। তাঁহারা শরৎচন্দ্রের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—সাপকে আমরা ইন্দ্রনাথের মত কিছু নয় মনে করি না—বরং ওটাকে একটা বড় কিছুই মনে করি। যদি এই সাপ ধরিতে গিয়া আপনার কোনও বিপদ ঘটে, তবে সমস্ত বাংলাদেশের লোক আমাদের মুখে চুনকালি দিবে। শরৎচন্দ্র এইরূপ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া একটু দুঃখিত হইয়াছিলেন। পরদিন জানা গেল যে, সেটা গোখুরা সাপ। শিলচর নর্মাল স্কুল ও কমিশনার অফিসের কম্পাউন্ডের মাঝখানে একটা গর্তে দুইটা গোখুরা সাপ ছিল। তাহার একটা সাপকে কমিশনার অফিসের দপ্তরী গুলি করিয়া মারে। অপরটি তাহার সঙ্গী খুঁজিবার জন্য মাঝে মাঝে রাত্রিতে বাহির হইয়া থাকে। শরৎচন্দ্রের এই সাপ ধরিবার বাতিক বৃদ্ধকাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

এই লেখাটি শরৎচন্দ্রের সাপ ধরার বাতিক নামে ১৩৫০ সালের ভাদ্র সংখ্যা

পাঠশালা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। লেখার সঙ্গে লেখকের নাম ছিল না। তবে আমি জেনেছি, এটি অঘোরবাবুরই লেখা।

শরৎচন্দ্র শিলচরে থাকার স আসামের চা-বাগান দেখেছিলেন এবং তাঁর দর্শনার্থীদের সঙ্গে আলাপের সময় অনেকের কাছে এখানকার চা-বাগান সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিয়েছিলেন। এরই ফলে তিনি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস শেষ প্রশ্নের মূল চরিত্র কমলের এইখানেই সন্ধান পেয়েছিলেন।

কমলের জন্ম এই আসামেরই চা-বাগানের এক বড় সাহেবের ঘরে। তার বাপ ছিল ইংরাজ ও মা ছিল বাঙ্গালী। কমলের প্রথম বিয়েও হয়েছিল এখানকারই এক অসমীয়া ক্রিশ্চানের সঙ্গে।

এই কমলকে বাংলার বাইরের কোন পরিবেশে ফেলে গল্প রচনা করবার জন্য শরৎচন্দ্র আগ্রায় গিয়ে কিছুকাল কাটিয়েও এসেছিলেন। এবং সেখান থেকেও উপন্যাসের প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন।

গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে আসামের কাছাড় জেলায় হাইলাকান্দিতে 'হাইলাকান্দি মহকুমা শরৎ জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি'র আমন্ত্রণে সেখানে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম। হাইলাকান্দি যাওয়ার পথে শিলচরে বিমান থেকে নেমে সেখানে একদিন ছিলাম। থাকার উদ্দেশ্য ছিল, ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র শিলচরে এলে তখন তাঁকে কাছে থেকে দেখেছিলেন বা তাঁর সঙ্গে মিশেছিলেন, এমন কেউ জীবিত থাকলে তাঁর সঙ্গে দেখা করা।

স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তায় এ বিষয়ে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সন্ধানও পেলাম। তিনি শিলচর কোর্টের নিষ্ঠাবান উকিল নাম প্রিয়নাথ দেব। ভক্তিমাধববাবুকে সঙ্গে নিয়েই প্রিয়নাথবাবুর কাছে গেলে তিনি বললেন—

এখানকার রিডিং অ্যান্ড ড্রামাটিক ইন্সটিটিউশন হলে বা আর ডি আই হলে সুরমা ভ্যালি স্টুডেন্টস কনফারেন্স হয়েছিল। ঐ হলেই কনফারেন্সের পরের দিন শিলচর ছাত্র সংঘের পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রকে যে মানপত্রটি দেওয়া হয়েছিল, সেই মানপত্রটা সেদিন আমিই পড়েছিলাম। মানপত্রটা লিখেছিলেন—শিলচরের সাহিত্য-প্রেমিক স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ শ্যাম।

মানপত্রের ভাষা ও বিষয়বস্তু শরৎচন্দ্রের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। ঐ মানপত্রে একটা কথা ছিল—শরৎচন্দ্র নারীত্বের তেজময়ী মহিমা দিয়ে বঙ্গ সাহিত্যের সেবা করেছেন। —এই কথাটা তাঁর মনে খুব দাগ কেটেছিল। তাঁর সেদিনকার ভাষণে তিনি এই উক্তি বিষয় বিশ্লেষণ করেছিলেন তিনি সেদিন বলেছিলেন যে, তাঁর উপন্যাসের কোন নারীচরিত্রই একেবারে কাল্পনিক নয়। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে যা দেখেছেন বা জেনেছেন, তার উপর ভিত্তি করেই তিনি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন।

শরৎচন্দ্র শিলচরে এসে এখানকার বিশিষ্ট নাগরিক স্বর্গত রায়বাহাদুর হেমচন্দ্র দত্তর বাড়িতে ছিলেন। হেমবাবুর বৈঠকখানাতে বসে তিনি প্রথমে যে উক্তিটা করেছিলেন, তা আমার আজও মনে আছে। তিনি বলেছিলেন —আপনারা যে সবাই বাংলাতে কথা বলছেন তার মানে কি?

তাঁর ধারণা ছিল, শিলচর যখন আসামে, তখন শিলচরবাসীরা অহমীয়া ভাষাভাষীই হবেন। তাঁকে যখন বলা হল যে, শ্রীহট্ট ও কাছাড় দুটো জেলা নিয়েই সুরমা উপত্যকা এবং অধিকাংশ বঙ্গভাষী, তখন তিনি বললেন—এ সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না।

প্রিয়নাথবাবু শেষে বললেন—হেমবাবু বা নগেন শ্যাম এঁরা তো বেঁচে নেই। তবে শরৎচন্দ্র এখান থেকে গোহাটীতে গিয়েছিলেন। আমাদের কোর্টেরই এক উকিল চন্দ্রেশ্বর চৌধুরীর সঙ্গে আপনি দেখা করুন। শরৎচন্দ্রের গোহাটীতে অবস্থানের কথা তিনি আপনাকে কিছু বলতে পারবেন।

এরপর আমরা গেলাম চন্দ্রেশ্বরবাবুর বাড়িতে। তিনি শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে যা বললেন, তা এই—

শরৎচন্দ্র যখন গোহাটী যান, আমি তখন সেখানে 'ল' কলেজে পড়তাম। তিনি গেলে ওখানকার অসমীয়ারা বলেন—শরৎচন্দ্র আমাদের কারও বাড়িতে থাকবেন; আবার বাঙ্গালীরা বলেন—আমাদের কারও বাড়িতে থাকবেন। এই অবস্থায় পড়ে শরৎচন্দ্র তখন ওখানকার মিউনিসিপ্যালিটির হেল্থ অফিসার সিলেটি (শ্রীহট্টবাসী) মনোরঞ্জন চক্রবর্তীর বাড়িতে থাকেন। তাঁর বাড়ি ছিল গোহাটীর উজান বাজারে। শরৎচন্দ্র গোহাটীতে দিন দুই ছিলেন। গোহাটী টাউন হলে তাঁকে একদিন সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল। আর্ল ল কলেজের প্রিন্সিপাল, কটন কলেজের ইংরাজির অধ্যাপক পি সি রায় প্রমুখ সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের ওখানে থাকার সময় একদিন গোহাটী শহরের কামাখ্যা মন্দির দেখতে ও কামাখ্যা দেবীর পূজা দিতে গিয়েছিলেন। একদিন আমরা কয়েকজন ছাত্র তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম—আপনার 'দেনা পাওনা' উপন্যাসে কতটা সত্য আছে?

উত্তরে তিনি বলেছিলেন—আমি একবার বীরভূম গিয়েছিলাম। সেখানে একটা চণ্ডীর মঠ দেখি। তার মধ্যে জমিদারের কুকীর্তি জড়িত ছিল। জমিদার নাকি কার সম্পত্তি পেয়েছিল। দেনা-পাওনার জীবনানন্দও তাই।

আমরা তাঁকে আরো অনেক প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি সে সবেরও উত্তর দিয়েছিলেন। কিন্তু সেগুলো আজ আর মনে নেই।

চন্দ্রেশ্বরবাবুর বাড়ি থেকে ফিরে ভক্তিমাধববাবুর বাড়িতে আয়োজিত প্রধানতঃ অধ্যাপকদেরই এক সভায় আমাকে শরৎচন্দ্র নিয়ে বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। সেখানে অধ্যাপক উদয়ন ঘোষ আমাকে বলে গেলেন—শরৎচন্দ্র শিলচরে এসে এখানকার বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভায় একদিন সভাপতিত্ব করেছিলেন। আমার মা অনেকের সঙ্গেই শরৎচন্দ্রের হাত থেকে সেদিন পুরস্কার নিয়েছিলেন।

শিলচরে একদিন থেকে এই প্রিয়নাথবাবু ও চন্দ্রেশ্বরবাবুর সঙ্গে দেখা করা ছাড়া হেমচন্দ্র দত্তর বাড়ি, অঘোরনাথ অধিকারীর বাড়ি, আর ডি আই হল, নর্মাল স্কুল স্কুলের সামনে যেখানে শরৎচন্দ্র একটা সাপ ধরতে গিয়েছিলেন—সবই ঘুরে দেখেছিলাম।

সম্প্রতি কলকাতার শরৎ সমিতি আয়োজিত শরৎচন্দ্রের কলকাতার বাড়িতে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ আয়োজিত কলকাতার পার্কসার্কাস ময়দানে দুটি শরৎচন্দ্র সম্পর্কীয় প্রদর্শনী হয়ে গেল। ঐ দুটি প্রদর্শনীতেই নানা জিনিসের সঙ্গে শরৎচন্দ্রকে প্রদত্ত একটি মানপত্রও দেখলাম। মানপত্রটি দিয়েছিলেন—শিলং প্রবাসী বাঙ্গালীরা। মানপত্রটি এ পর্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয়নি; তাই সাধারণের অজ্ঞাত সেই মানপত্রটি এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম—

বাঙলার নবযুগের শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক ডঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একষষ্টিতম জন্মোৎসবে অভিনন্দন

হে সারস্বত সাধনায় সিদ্ধ তাপস,

তোমার একষষ্টিতম জন্মদিনে আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর। তোমার সাহিত্যদীপ্তি যখন বাংলায় ধীরে ধীরে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছিল, তখন সুদূর আসামপ্রবাসী বাঙ্গালীরা সানন্দে সে গৌরবে গর্বানুভব করিয়াছিল। আজ যখন স্বদেশের নানা প্রতিষ্ঠান তোমাকে বরণ করিয়া ধন্য হইতেছে, এবং বিদেশে তোমার সাহিত্য নবোদিত তপনের ন্যায় প্রকাশোন্মুখ, তখনও প্রবাসী আমরা তোমার ভাস্বর মহিমায় আপনাদিগকে পুণ্যস্নাত মনে করিতেছি।

হে শিল্পি,

বঙ্কিম-রবীন্দ্রের ধারা বাহিয়া সাহিত্যে যে পথের সন্ধান তুমি আনিলে, বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা অভিনব। যাহা হীন, যাহা তুচ্ছ, পতিত দলিত যাহা, তাহার অন্তর্লীন অদৃশ্য মহিমা তুমি উদ্ঘাটিত করিয়াছ।

হে দরদি,

লোকচক্ষুর অন্তরালে দুর্গম গভীরে তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি; কলুষ কালিমা, পাপ পঙ্কিলতা, তোমার বেদনা-বিদ্ধ হৃদয়ের সকরুণ সহানুভূতি লাভ করিয়া তাহার দুর্বোধ্য অনিবার্যতায় প্রথাগত তীব্রতা হারাইয়া আমাদিগকে ক্ষমায় প্রীতিতে স্নিগ্ধ করিয়া তোলে। হে নির্ভীক, তোমার সাবলীল স্বচ্ছন্দতার মধ্য দিয়া যে জিজ্ঞাসা তুমি আনিলে, আজ তাহা বিশ্বের সমস্যা! তোমার দৃষ্টিতে আজ আমরা আমাদিগকে চিনিলাম; কৃতজ্ঞ আমরা, তোমাকে প্রণাম জানাই।

হে স্বাদেশিক,

শুধু সাহিত্য সেবা নহে, দেশ সেবাব্রতও তুমি গ্রহণ করিয়াছ; গভীর একনিষ্ঠ তোমার দেশপ্রীতি। তোমার বাহিরের শান্তসৌম্য আনন্দদীপ্তি তোমার অন্তরের একাগ্র সাধনার পরিচয় দিতেছে। তোমাকে নমস্কার।

ঋতুচক্রের আবর্তনে তোমার জীবনে নব-নব জন্মদিন, তাহার নবীন প্রভাত লইয়া আসুক, আর সঙ্গে সঙ্গে লইয়া আসুক তোমার অলৌকিক প্রেরণা ও চরম সার্থকতা, —ইহাই বিশ্বপিতার নিকট আমাদের একান্ত প্রার্থনা। ইতি—

শ্রদ্ধাবনত
শিলং প্রবাসী বাঙ্গালীগণ

শিলং
১৮ই আশ্বিন, ১৩৪৩ বাং

শরৎচন্দ্রের জন্মতারিখ ৩১ ভাদ্র। ১৩৪৩ সালের ৩১ ভাদ্র কলকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানে এবং আরও কোন কোন স্থানে শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসব পালিত হয়। আর ঐ বছরই ১১ আশ্বিন তারিখে সুশীল মুখোপাধ্যায়ের দমদমের অলকা ভবনে সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সংস্থা 'রবিবাসর' শরৎচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিল। এবং ২৫ আশ্বিন উপাসনা-সম্পাদক অনিলকুমার দেব বেলেঘাটার বাগান বাড়িতে রবিবাসরের সভায় রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

শিলংপ্রবাসী বাঙালীদের প্রদত্ত মানপত্রে ১৮ আশ্বিন তারিখ দেখে মনে হচ্ছে, শরৎচন্দ্র হয়ত ওঁদের আমন্ত্রণে তখন শিলং গিয়েছিলেন। নয়ত নিজের কোন প্রয়োজনে শিলং গেলে সেখানকার বাঙ্গালীরা তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন।

চিঠিপত্র

বৈকুণ্ঠ পাঠক শরৎচন্দ্রের প্রতি বিরূপ —সমালোচনায় উৎসাহ দিচ্ছেন

অমৃত ১৬ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যায় শরৎ প্রসঙ্গে সাতখানি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। সে জন্য সর্বাগ্রে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই সম্পাদক মহাশয়কে। পত্রলেখকও সংশ্লিষ্ট নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে একজন বিষয় সমিতির সদস্য হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। একালের জনপ্রিয় লেখক শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বক্তব্য রাখার সময় যখন শতবর্ষের ঐতিহ্য গৌরব ও মূল্যায়নের মূলে সম্ভবতঃ নাড়া দেবার জন্যই কিছু নতুন কথা শোনালেন, তখন যতখানি না বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হয়েছি, ততোধিক হয়েছি পীড়িত। কেননা যে সাহিত্যিক জনপ্রিয়তার স্তর অতিক্রম করে ক্রমশঃ দেশে-বিদেশে কি বিশ্বের সর্বপ্রান্তে সম্মান ও স্বীকৃতি পাচ্ছেন তাঁর প্রতি দুজন গুণী মানুষের এমন বিরূপ মন্তব্য সাধারণ মানুষকে স্বভাবতই ধাঁধাঁ লাগিয়ে সাময়িক বিভ্রান্ত করবে। তবে আশা ছিল শিক্ষিত রুচিবান পাঠক যাঁরা সাহিত্যানুরাগী বা সাহিত্য চর্চা করেন তাঁরা এ মন্তব্যকে নির্বিকারভাবে মেনে নেবেন না। অমৃতের পাতায় প্রতিবাদ দেখে আমরা ভাবতে পারি মানুষ এখনও সত্য সম্বন্ধে সচেতন, এমন কি যান্ত্রিক জীবনের অনিবার্য টানাপোড়েনে জর্জরিত হয়েও কোন মিথ্যা উদ্দেশ্য প্রণোদিত মন্তব্যে বিভ্রান্ত [illegible]। এই মর্মে [illegible] মহাশয়ের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ অন্ততঃ শরৎ প্রসঙ্গে প্রাপ্ত সমস্ত পত্রগুলিই ধারাবাহিকভাবে যেন ধৈর্য সহকারে প্রকাশ করেন। কারণ, বিষয়টি বাঙালী তথা ভারতবাসীর কাছে বিশ্বাস প্রীতি ও গৌরবের প্রশ্ন জড়িত। এক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের প্রতি অন্য কোন 'গভীর বিশ্বাসের স্বীকৃতি' নতুন কিছু মূল্যায়ন এনে দেয় কিনা, জানা যাবে।

উক্ত সংখ্যার ৩র চিঠিখানির মাধ্যমে শ্রীবৈকুণ্ঠ পাঠক তাঁর বিশেষ প্রিয় লেখকদ্বয়কে (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও সন্তোষকুমার ঘোষ) শ্রদ্ধা জানাবার অবকাশ পেয়ে, পরোক্ষে শরৎচন্দ্রের প্রতি বিরূপ সমালোচনাকে খানিকটা উৎসাহ দেবারও প্রয়াস পেয়েছেন। দোষ কি এতে। তবে শ্রীপাঠকের বক্তব্যে বোধহয় কিছু হেঁয়ালী আছে—যেমন শরৎ রবীন্দ্রনাথকে ভিৎসুদ্ধ তুলে দিয়ে (অর্থাৎ অগুণতি মানুষের অন্তর আসন থেকে নীচে নামিয়ে, অবশ্যই যুক্তিপূর্ণ সমালোচনার দ্বারা, তবে তা সম্ভব কি?) যদি সংগোপনে বলা যায় 'শরৎ বা রবীন্দ্রনাথ তোমার ও তোমার সৃষ্টির কাছে আমরা নত মস্তকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।' শ্রীপাঠকের শ্রদ্ধা পোষণ ভাব এরকম কি? আর শ্রীপাঠকের বিশ্বাস সুনীল গাঙ্গুলী এবং সন্তোষ ঘোষ যেহেতু সাহিত্য সৃষ্টি করেন, যেহেতু ওঁদের লেখা পাঠক পড়ে থাকেন, এবং যেহেতু শরৎ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হন, সেইহেতু ওঁরা কোন গভীর বিশ্বাস থেকে শরৎ প্রিয়তায় সংক্ষেপে কথা বলেছেন। তাহলে এও জেনে রাখা দরকার, পাঠকেরা স্বভাবগত কারণেই বহু লেখকের লেখা পড়ে থাকেন শুধু পড়া ও জানার আনন্দে। কিন্তু অন্তরে গ্রহণ করেন গভীর আনন্দে ও শ্রদ্ধায় কখনও কদাচিত কাউকে। শরৎচন্দ্র এখানে এই 'কদাচিত কেউ'-এর একজন। তিনি শুধু বাংলা ভাষা ও বাঙালীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নন, তাঁর সাহিত্য বিভিন্ন ভাষা-ভাষী সাহিত্যিক ও মানুষদের উপরেও কি রকম প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে তার প্রমাণ তো সুনীলবাবু স্বয়ং নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে উপস্থিত তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, মালায়লম, মারাঠী, গুজরাতী প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী সাহিত্যিকদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছেন। নাকি তাঁরা যেহেতু শরৎ বিরোধী কথা না বলে কেবল বিপরীতভাবেরই প্রকাশ করেছেন, সেইহেতু শ্রীপাঠকের মতো পাঠকসমাজে শরৎচন্দ্রের মত এঁরাও অপাংক্তেয়? শরৎ সাহিত্যে বর্ণিত গ্রামের অস্তিত্ব বা চরিত্রেরা সুনীলবাবু এবং সন্তোষবাবুর কাছে অবাস্তব রূপকথার সামিল। কিন্তু আমার প্রশ্ন এই নমস্য লেখকদ্বয় গ্রাম কখনও দেখেছেন কি? তাহলে দেখেছেন,

সেই পল্লী-সমাজের গ্রাম, সেই দত্তার গ্রাম আজও হুবহু আছে। পণের অভাবে বিয়ে না দিতে পারার বর্তমান সমস্যা আজও জ্ঞানদার মা বাবাকে চিন্তিত শঙ্কিত করে তোলে। রমেশের মত ছেলে হয়ত এখনকার সমাজে বিরল, কিন্তু বেণীমাধব ঘোষালেরা আজও বেঁচে আছে আমাদেরই আশেপাশে। আর শরৎ সাহিত্য যে আধুনিক সাহিত্যিকদের উপরও কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারে তা তো এ যুগের শক্তিশালী লেখক সমরেশ বসুর আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত স্বীকারোক্তির মধ্যেই প্রমাণিত—'শরৎচন্দ্রের কাছে আমি ঋণী।' অতএব এই লেখকদের বক্তব্যগুলির উপর সুধিজনেরা যদি একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত করেন তবে দেখবেন কার বক্তব্যে সত্যের আলো প্রকাশিত, আর কার মন্তব্যে মিথ্যার সঙ্গে মাখামাখি হয়ে আছে অসৎ ঈর্ষাচ্ছন্ন আঁধার।

শ্রীঘোষের ভাষায়—'একটা বয়সে শরৎচন্দ্রকে ভাল লাগত। এখন লাগে না।'... এই ভাল লাগা না লাগা তার ব্যক্তিগত অভিরুচির ব্যাপার, অবশ্য আপামর মানুষের অভিরুচীর কথা ব্যক্ত করা তার অভীপ্সও ছিল না। এমন কি তা একজন মাত্র দিকপালের অভিমত ও বিচারবোধের উপরও নির্ভর করে না। অন্য অংশে শ্রীঘোষ বলেছেন, 'সাহসও ছিল না ভদ্রলোকের। ভালবাসার কথা বলেছেন, বিয়ে দিতে পারেন নি।' প্রথাগত পথে শরৎচন্দ্র সমাজ সংস্কারক হয়ে আসেন নি এ সমাজে। তিনি একজন বোদ্ধা শিল্পীর স্বভাবে তাঁর সমগ্র সাহিত্যভাণ্ডারে, শিল্পরসের মাধ্যমে অসহায় নরনারীর সামাজিক বাধা বঞ্চনা ও অত্যাচারের মর্মস্পর্শী আর্তি প্রতিফলিত করে তুলেছেন—কি প্রেমে, কি বিপ্লবে, কি ধর্মে বা দেশাচারে। সামাজিক কুসংস্কার ও বিধি-নিষেধের গোড়ায় কুঠারাঘাত না করে সাময়িক সমাধানের সুযোগ হয়ত তিনি নিতে পারতেন (শ্রীঘোষের মত লেখকের মনোভাব নিয়ে) বিধবা রমাকে রমেশের প্রেমের কাছে সমর্পণ করে, বিবাহরীতির মাধ্যমে। বালবিধবা মাধবীর অনুচ্চার প্রেম আত্মভোলা সুরেশকে আপনত্ব দিয়েও বাঁচিয়ে তুলতে পারত। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাৎক্ষণিক সমাধানের পথে না গিয়ে, শিল্পীর দূর-দৃষ্টিতে তিনি মানুষের জীবনকে দেখেছেন সৌন্দর্যের পাশে বেদনার মূর্তিতে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে। এই ব্যথা বেদনার বঞ্চিত জীবনটি তিনি ধরেছেন পাঠকের হৃদয়বেত্তা ও বুদ্ধি-বেত্তার কাছে। এবং তার এই প্রয়াস জনচিত্তকে সামাজিক অন্যায় ত্রুটি অবিচারের বিরুদ্ধে যতদূর বিচলিত করে সমাজ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছে, বোধ করি কোন সমাজ সংস্কারের কর্তব্য ভূমিকার চেয়ে তা আজও অধিক সার্থকতা ও গৌরব দাবী করে।

অতুল রায়
জব্বলপুর। মঃ প্রঃ

(২)

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠানে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং সন্তোষ ঘোষের মন্তব্যের অভিযোগে শরৎপ্রেমীদের যে বিক্ষোভ চিঠির আকারে প্রকাশিত হয়েছে তা পড়লাম। আমিও সেই ক্ষোভ এবং বেদনার তালিকায় নিজেকে যুক্ত করলেও একটা সান্ত্বনার আলো দেখতে পেয়েছি যে, পৃথিবীর যত বড় কবি, শিল্পী, দার্শনিক হোন না কেন—তিনি সকলকে সমভাবে নাড়া দিতে নাও পারেন। তবে সুনীলবাবুরা ভালভাবেই জানেন জনমানসে শরৎ-সৃষ্টির গভীরতা এবং ব্যাপকতা কতখানি এবং সাহিত্যে তার শিকড় কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

অনেকের অনেক কথার মধ্যে শ্রীসন্তোষ ঘোষের ধারণা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীঘোষ বলেছেন—'সাহসও ছিল না ভদ্রলোকের (শরৎচন্দ্র) ভালবাসার কথা লিখেছেন, বিয়ে দিতে পারেন নি।' এর উত্তর দিতে বলতে হয়, সাহসের অভাবে ভালবাসার নায়ক-নায়িকাদের বিয়ে দেন নি তা নয়। মানুষ শরৎচন্দ্র সেদিনের হৃদয়হীন সামাজিক চোখরাঙানী উপেক্ষা করে বহু অসহায়া নারীকে আলোর তীর্থে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। সেই শরৎচন্দ্রের আমল [illegible]

শুধু সাহসের অভাবেই সেদিনের পাঠক সমাজে রমার সঙ্গে রমেশের, দেবদাসের সঙ্গে পারুর বা রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে শ্রীকান্তের বিয়ে দেওয়া গেল না—এ আজগুবী মন্তব্য বিশ্বাস করা যায় না। কথাশিল্পী নায়ক-নায়িকার মধ্যে ব্যবধান ও বিচ্ছেদ দেখিয়ে বেদনার সঞ্চার করিয়েছেন। জনমনে দীর্ঘশ্বাস সৃষ্টি করিয়েছেন। সামাজিক আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধনের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। এটাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। যার ফলস্বরূপ পরবর্তীকাল সহানুভূতির ও যুক্তির ভেতর দিয়ে হৃদয়হীন সামাজিক পাথরটাকে আস্তে আস্তে সরিয়ে দিতে পেরেছিল। বাঁদি কঙকন গুপ্ত, ধানবাদ, বিহার।

(৩)

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে' শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে একালের দুই প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের মন্তব্য ঘিরে আলোচনার ঝড় উঠেছে! আমার মনে হয়—এ নিছকই চায়ের পেয়ালায় তুফান...। ৪ ফেব্রুয়ারীর সাপ্তাহিক অমৃতে শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষের...'লিখছি না কারণ হিতৈষীরা শীতল...' মন্তব্যটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। প্রবীণ সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক শেষ পর্যন্ত এই 'শীতল হিতৈষীদের' ঘুম ভাঙাবার জন্য অতি সহজ একটি পথ বেছে নিয়েছেন,—সাহিত্য প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের সম্বন্ধে উল্টো মন্তব্য করা—যেমন 'শেষ প্রশ্ন কোন উপন্যাসই নয়, পথের দাবীর সব্যসাচী কোন চরিত্রই নয়—এছাড়া ঐ সাহিত্য সম্মেলনের মন্তব্য তো আছেই...। ব্যাপারটা খুব নৈরাশ্যজনক আর দুঃখকর নয় কি? এই সহজে বাজিমাৎ করার পথে এ [illegible]ছেন শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও। বক্তা তাঁর মন্তব্যও দুঃখজনক। শরৎচন্দ্র জীবনের বৃহৎ অংশ কাটালেন গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে—তিনি গ্রাম চিনলেন না! আশ্চর্য! নিভা দে. দুর্গাপুর-৫।

সব্যসাচী
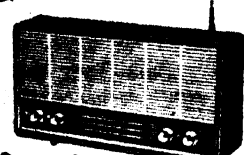
অমৃত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় পীযূষ বসুর 'সব্যসাচী' ছবির সমালোচনা পড়লাম. ছবিটি আমি দেখেছি। শ্যামল চক্রবর্তী ঠিকই লিখেছেন, পীযূষ বসুর 'সব্যসাচী' শরৎচন্দ্রের নয়।

পীযূষবাবু তাঁর নিজের কল্পনার আদলে যে সব্যসাচী দর্শকদের দেখিয়েছেন, সে আগাগোড়াই উত্তম। তাঁর হাসি, আচরণ ও কথা বলার সেই একই নাটকীয় মেজাজে সারা ছবিতে উত্তমবাবু তাঁর নিজস্ব ইমেজ বজায় রেখেছেন। এমনকি পুলিশের নজর ফাঁকি দিতে তিনি যেসব রূপ নিয়েছেন, সেখানেও তাঁর সেই একই ইমেজ।

এভাবে শরৎচন্দ্রের সব্যসাচী হারিয়ে গেছে। বাঙালী দর্শকসমাজ পীযূষবাবুর এই দুঃসাহস কি খুশীমনে মেনে নেবেন? তপতী মোদক, শিবপুর, হাওড়া।

হৃদয়ের শবদ

নবকুমার বসু

কথাটা শুনেই খরায় বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল। ও বিশ্বসাই করতে পারল না সুজিত এখান থেকে চলে যাবে। মাথাটা এ-পাশ ও-পাশ দুলিয়ে, ও অবিশ্বাসী লজ্জা লজ্জা মুখটা নীচু করে হাসল। চায়ের কাপে চিনি মিশিয়ে নাড়তে নাড়তে বলল—দাদাবাবু, তুমি আমার সাথে রহস্য করতেছ। তুমি এখান থেকে যাবে নাই আমি জানি।

সুজিত চেয়ারে বসে ক্লান্ত, ভারি পা দুটো বিছানার ওপর তুলে দিল। বাঁ হাতটা টেবিলের ওপর খুঁটির মত রেখে মাথাটা হেলিয়ে দিয়েছিল পেছন দিকে। দক্ষিণের জানালাটা আজকাল খোলাই থাকে। শীত চলে গেছে। সন্ধ্যাবেলার ফুরফুরে হাওয়াটা বেশ লাগে। কাঁপা কাঁপা শাল-গাছের পাতায় চাঁদের আলো চক্ চক্ করছিল। আর ক'দিন পরেই বোধহয় দোল-পূর্ণিমা। সিগেরেটে আলতো একটা টান দিয়ে সুজিত বলল—না রে খরা, এবার আর উপায় নেই। যেতেই হবে। বুঝলি না, এবার একেবারে ডবল নোটিশ।

খরা চায়ের কাপ আর প্লেটে কয়েকটা নোনতা বিস্কুট, কাজু নিয়ে সুজিতের সামনে টেবিলে রাখল।

—লুটিস ত দাদাবাবু, তোমার কাছে রোজই কত আসতেছে। তাই বলে তোমায় যেতে হবেক? তুমি সরকারের কত পেয়ারের নোক। মাটি খুঁড়ে, পাথর কেটে সোনা খুঁজে বার করতেছ। তোমার ওপর কথা?

বাইরে জংলী জ্যোৎস্নার দিকে চোখ রেখে সুজিত হেসে ফেলল।—তোর ব্যাটা মাথায় কিছুছু নেই। বললাম না, এবার ডবল নোটিশ। একটা অফিস থেকে, আর একটা একই সঙ্গে বাড়ি থেকে। সেই যে বললুম, এ মাসেই মা ঠাকুরণ সব ঠিক করে ফেলেছেন, বলে চিঠি দিয়েছেন।

খরা একেবারে লজ্জায় কুঁকড়ে গেল। লুকোন মুখে হাসতে হাসতে বলল—সে ত কত বড় আনন্দের কথা গ!

একটু চুপ করে থেকে খরা বোধহয় মনে মনে নিজের স্পর্ধাটা একটু মেপে নিল। মেঝেটা ঝাঁট দিতে দিতে আস্তে আস্তে বলল—বৌদিদিমণিকে নিয়ে তুমি আবার এখানে এসেই থাকবে, এ আমি বলতেছি। এত ভাল বাড়ি, সামনে সুবর্ণ-রেখা, জঙ্গলের ফুরফুরে বাতাস, মিষ্টি মিষ্টি পাখীর ডাক....এছাড়া তোমার মন টিঁকবেই না।

খরা দাদাবাবুর ওপর নিজের আস্থাটা প্রমাণ করতে চাইল। সুজিত কোন উত্তর দিল না। ওর জন্য বুকটার কোথায় একটু মোচড় দিয়ে উঠল। কিন্তু কিছু করার নেই। মা এবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বাবার একটা স্ট্যাটাক হয়ে গেছে। দুই দিদিরও বিয়ে হয়ে গেছে। কলকাতায় সিটি অফিসে ট্রান্সফারের কথা শোনামাত্রই মা এবার কথা পাকাপাকি করে ফেলেছেন। সামান্য কিছু আপত্তি সুজিতের যে ছিল না, তা নয়। কিন্তু গতবার কলকাতায় গিয়ে, যখন আলাপ পরিচয়ের সূত্রে কল্যাণীকে একবার দেখেছিল তখন থেকেই জিওলজিস্ট সুজিত শর্মনের দেহমনের বিভিন্ন কোনায় পিয়ানোর টুংটাং আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল।

জানালার বাইরে হাওয়ায় ভাসা চাঁদনী রাতের জঙ্গল দেখতে দেখতে সুজিত আপন মনেই নিজেকে সেই দিনটায় কল্পনা করল। যেদিন সকাল থেকেই ওদের সারা বাড়িটায় সানাইয়ের আওয়াজ ভেসে বেড়াবে, গেটের দু' পাশে ঘটের ওপর কলাগাছ পোঁতা থাকবে, বাড়িটা রঙীন আলোয় ঝলমল করবে, বাইরের রাস্তায় সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকবে, আত্মীয়স্বজন-বন্ধুরা একে একে এসে ঢুকবে, আস্তে আস্তে রাত্তির আরও বাড়বে.... সুজিত গুন গুন করে গেয়ে উঠল—আজি খুলিও হৃদয় দ্বার খুলিও....।

খরা মাঝে মাঝে নিজের মনে কথা বলে। পাশের সাজান ছোট্ট রান্নাঘরে ও রান্নায় ব্যস্ত থাকলেও সুজিতের গান শুনে আপন মনেই বলে ফেলল—দাদাবাবুর ভাব লেগেছে। কি সুন্দর গান করতেছেন।

গুন গুন করতে করতেও সুজিতের কান খাড়া ছিল। গান থামিয়ে ঘর থেকেই জোরে বলে উঠল—হ্যাঁরে ব্যাটা, ভাব লেগেছে—তোর মুণ্ডু। আবার রসিকতা হচ্ছে! মাংস যদি আজ ঠিকমত সেদ্ধ না হয়—তাহলে বুঝবি।

কি ভেবে একটু চুপ করে থেকেই সুজিত আবার ডাকল খরাকে।

—খরা, একটু এদিকে শুনে যা ত।

—এই আসতেছি দাদাবাবু। —বলে আরও খানিকক্ষণ খরা নিজের মনেই একা একা কথা বলে চলল।.... এই হল মাংস কষা। এবার দেড় পো জল। গরম মশলা কুটেই রেখিচি। হ্যাঁ, আঘ্রাণটা ভালই আসতেছে। আটা মাখাই আছে। কুঁজোর জলটা ছাঁকা....।

গামছায় হাত মুছতে মুছতে আর মুখে বিড় বিড় করতে করতে খরা ঘরের মধ্যে এসে পড়ল। —এই যে এসিচি, দাদাবাবু। বল।

সুজিত সোজা ওর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর মুখ করে বলল—হ্যাঁরে, তুই টুনটুনিকে কি বলেছিস? ও সকালবেলা এসেছিল, তুই তাড়িয়ে দিয়েছিস?

খরার বিড়বিড় করা হাসি হাসি মুখটা মুহূর্তের মধ্যেই যেন টুনটুনি নামটা শুনে একবার জ্বলেই নিভে গেল। মুখটা কঠিন আর গম্ভীর করে ফেলল। মেঝের দিকে তাকিয়ে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নিঃশব্দে হাতের ওপর হাত কচলাতে লাগল।

সুজিতের ঠোঁটের কোণে একটু মিট-মিটে হাসির রেখা ফুটে উঠল। গলাটা তবু গম্ভীর করেই বলল—কি রে চুপ করে আছিস কেন? কি হয়েছিল? সিগারেটটা নিবিয়ে ও এ্যাসট্রের মধ্যে গুঁজে দিল।

খরা মাটির দিকে চোখ রেখেই বলল—ও আমার সাথে ফষ্টিনষ্টি করতে আসেই বা কেনে। আজ বাতাবি নেবুটা, কাল মহুয়াটা, পরের দিন একটুকু গাইয়ের দুধের ক্ষীর....এসব কি আমি উকে আইনতে বুলেচি আমার জীনা?

খরার উত্তেজনা বেড়ে চলে কথা বলতে বলতে।—তারপরে কথাটা যবে তোমার কানে কেউ তোলবে, তখন আমার মানটা কুথায় যাবে? কি চোখে তুমি আমারে দেইখবে?

সুজিত চেষ্টা করেও এবার আর হাসি চাপতে পারল না। বলল—তুই ব্যাটা একটা গাধা। একটা অমন ডাঁটো, যুবতী মেয়ে তোকে ভালবাসে, লুকিয়ে লুকিয়ে তোর সঙ্গে এসে দেখা করে, খাবার নিয়ে আসে—আর তুই তাকে গালাগালি করে তাড়িয়ে দিলি? আজকেও ও তোর জন্য মধু নিয়ে এসেছিল, জানিস। যা বেরো, আমার সামনে থেকে। তোর দ্বারা জীবনেও কিস্যু হবে না।

খরা বক বক করতে করতে বেরিয়ে গেল।—না, না আমি ওসব বুঝিসুঝি না দাদাবাবু। সোমত্ত মেয়েছেলে দুপুরবেলা লুকিয়ে লুকিয়ে একটা যোয়ান মরদের সঙ্গে কথা কইবে? লোকে আমার চরিত্তিরের দোষ দেবে নাই?

সুজিত পা দুটো টান করে আর একটা সিগারেট ধরাল। হাসতে হাসতেই বলল—তুই ব্যাটা তোর চরিত্তির ধুয়েই জল খা।

দুটো দিন সুজিতের খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটল। জামশোলা ব্রিজের ওপর দিয়ে ক্যাম্প পর্যন্ত বার বার ওর জিপ ছুটে চলল। ওর হাতীবাড়ি বাংলো থেকে ড্রিলিং সাইট প্রায় এগার কিলোমিটার। ওরই তত্ত্বাবধানে পুরো বহড়াগোড়ায় ড্রিলিং অপারেশন চলছিল গত দেড় বছর ধরে। এখন কাজ প্রায় শেষ। বাকী যা কাজ, তা জিওলজিস্ট ছাড়াই শেষ হবে। ওরা মাটির নীচে দেড় হাজার মিটার পর্যন্ত ড্রিলিং করে দেখেছে, এ অঞ্চলে কপার বেশ ভালই পাওয়া যাবে। সিংভূম জেলার এই জায়গাটার ওরা নাম দিয়েছে—কপার বেল্ট। এখন শুধু পাথরের স্পেসিমেন-এর মধ্যে গভীরতা অনুযায়ী কপারের পরিমাণ এবং অবস্থান দেখে হিসেব নিকেশ করতে হবে। কেননা, এক্সট্রাকশনের খরচের সঙ্গে বাজার দরের সঙ্গতি থাকলে তবেই সেখানে কাজ আরম্ভ হবে।

সবাইকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিয়ে সুজিতের কাজ এখন প্রায় শেষ। ওর পাঁচ বছরের চাকরি জীবনে এটা একটা বড় রকমের সাফল্য। হয়ত সিটি অফিস থেকে দিল্লীতে ওর একটা প্রমোশনেরও সুপারিশ হবে।

সুজিত আজ চলে যাবে। দুপুর থেকেই ও আর খরা মালপত্তর গোছাচ্ছিল। খরা প্রথমে বিশ্বাস করতে না পারলেও শেষ পর্যন্ত মানতে বাধ্য হয়েছে। ওর মনটা যদিও ভেঙে গেছে, মুখটা সরল অভিমানে থমথম করছে, তবুও ওর বিশ্বাস—দাদাবাবু বৌদিদিমণিকে নিয়ে আবার এই হাতীবাড়ির বাংলোতেই উঠবে। খরা জানে, কলকাতার জল হাওয়া আর খাওয়া-দাওয়া দাদাবাবুর আজকাল আর সহ্য হয় না। পেট ব্যথা করে, নাক বন্ধ হয়ে যায়, চোখ জ্বালা করে।

সাড়ে পাঁচটা নাগাদ হাতীবাড়ি বাংলোর উঠোনে এয়ার বোর্ন মিনারাল বোর্ডের জিপ এসে দাঁড়াল সাহেবকে সিটি অফিস পৌঁছে দিতে। পশ্চিমে ঢলে পড়া বিকেলে লাল নিস্তেজ সূর্য তখনও শাল আর ইউক্যালিপটাসের পাতার ফাঁক দিয়ে ঝাঁকিঝাঁকি উঁকি দিচ্ছিল। হাওয়া আরম্ভ হয়েছে একটু।

এদিক ওদিক মুখ লুকিয়ে, থরা দু-একবার ফোঁসফাঁস করে চোখ মুছেছে। কিন্তু ওর কাজেও বিরাম নেই। দাদাবাবুর জামা-কাপড় থেকে আরম্ভ করে কাগজের বাণ্ডিল, পাথরের টুকরো, স্কেল, কম্পাস যাবতীয় জিনিষ সব গুছিয়ে একটা একটা করে জিপে তুলে দিয়েছে। সুজিত হাত-মুখ ধুয়ে, জামা-কাপড় পরে বেরুতে বেরুতে সূর্য ডুবে গেল। অন্ধকার হয়ে এলো। ইচ্ছে ছিল, দিনের আলো থাকতে থাকতেই বেরুবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত হল না।

থরার জন্য ওর বুক একটু মুচড়ে উঠল কিন্তু মুখে প্রকাশ করল না। ওর হাতে টাকা পয়সা দিয়ে, গেট দিয়ে বেরুতে বেরুতে পিঠে হাত রেখে খুব হালকাভাবেই বলল—কি রে ব্যাটা, মন খারাপ করছিস আবার। ভালভাবে থাকিস। কারুর সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করিস না। তোর সঙ্গে আবার দেখা হবে।

সুজিত জিপে উঠে পড়ল। যন্ত্র গর্জন করে উঠল। গাছপালার ফাঁক দিয়ে জোরাল আলো ফেলে এঁকেবেঁকে জিপ এগিয়ে চলল।

পাঁচ-সাত মিনিটের কাঁচা রাস্তার পর ন্যাশানাল হাইওয়ে। বিহার-উড়িষ্যার বর্ডার—জামশোলা ব্রিজ থেকে সোজা পূব দিকে দু কিলোমিটার গিয়ে তেত্রিশ আর ছ নম্বর ন্যাশানাল হাইওয়ে মিশেছে বহড়াগোড়ায়।

থরা জোরে জোরে পা ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে জিপের পেছনে চলল ব্রিজ পর্যন্ত। হাইওয়ের ওপর পড়েই জিপ একটা গোঁ—শব্দ করে ছুটল সামনের দিকে ফাঁকা রাস্তায়। সামনে জোরাল তীব্র আলো, পিছনে নিকষ কালো অন্ধকারে থমকে দাঁড়িয়ে থরা দেখল—ছোট্ট লাল আলোটা আর গর্জনটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে।

শাল গাছের মাথায় রুপোর থালা হয়ে চতুর্দশীর চাঁদ উঠল। জামশোলা ব্রিজের নীচে সুবর্ণরেখার জল চিকচিক করে উঠল। ফাঁকা, পাহাড়ী রাস্তার ধারে পাথরের ওপর থরা একা বসে রইল। গলায় ঘণ্টি বাঁধা দুটো গোরুর গাড়ি রাস্তার পাশ দিয়ে শাক-সব্জী নিয়ে ঠুন ঠুন করে চলে গেল। রাত বেড়ে চলল।

থরা উঠল না। হাওয়া বইছিল জোরে। ওর বুকটার মধ্যে ধূ ধূ ফাঁকা আর মরুভূমির মত শুকনো মনে হল। কিন্তু কান্না বেরুল না একটুও। আর কোন কাজ নেই। দু দণ্ড কথা বলার একটা লোক নেই। দাদাবাবু বিয়ে করতে চলে গেল, থরা কি করবে।

দুটো হাঁটুর মধ্যে মাথাটা গুঁজে বসে থাকতে থাকতে থরার এখন হঠাৎ টুনটুনির কথা মনে হল। সঙ্গে সঙ্গেই ওর মাথার মধ্যে হাজার হাজার হাউই ফেটে উঠল, চরকী বাজী ঘুরতে লাগল। দাদাবাবু বলেছিলেন, তোকে ও ভালবাসে, লুকিয়ে তোর সঙ্গে দেখা করতে আসে, আর তুই ওকে....

থরার মাথা থেকে পা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। দুঃখে, অনুশোচনায় এবার ওর মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করল। চোখের কোণ দুটো কুলকুল করে ছাপিয়ে উঠল। এতক্ষণে ওর গলা দিয়ে বুক ভাঙা কান্না সমস্ত নির্জনতা ভেঙে হাউ হাউ করে ঝরে পড়ল। সুবর্ণরেখার জল থেকে জঙ্গলের কোনায় কোনায় প্রতিধ্বনিত হল ওর নিঃসঙ্গতার হাহাকার। চাঁদনী রাতের আলোয় পাথুরে মাটির ওপর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে থরা ছুটে চলল বাংলোর দিকে।।

হয়ত টুনটুনি এখনও ওর জন্য মাটির ভাঁড়ে একটু মধু নিয়ে লজ্জা লজ্জা মুখ করে বাংলোর গেটে অপেক্ষা করে থাকবে।

বাঙলাদেশের উপন্যাস : একটি সমীক্ষা

দিলীপ মালাকার

বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্য সম্পর্কে কোনো তথ্যানুসন্ধান, পরিসংখ্যান এবং সমীক্ষা নির্মাণের প্রসঙ্গ এলেই সর্বপ্রথম আমাদের চৈতন্যে একটি জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় : বাংলাদেশের উপন্যাসের সূত্রপাত কোথায় এবং এই সূত্রপাত এবং বিকাশের ইতিহাস সমগ্র বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের সঙ্গে কতখানি সংশ্লিষ্ট এবং ওতপ্রোত ? এই প্রশ্নের যথার্থ জবাব বোধ করি এই যে, উনিশ শ' সাতচল্লিশের দেশ-বিভাগের ফলে বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলের ভৌগোলিক মানচিত্র দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পূর্ববাংলা যখন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলো, তখন থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হলো বাংলাদেশের উপন্যাস চর্চার। রাষ্ট্র-নৈতিক কারণে বাংলা সাহিত্যের কলকাতা কেন্দ্রিকতা থেকে বৃহত্তর বাংলার পূর্বাঞ্চল যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, অনিবার্যভাবে তাদের চৈতন্যে এলো নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টির প্রয়াস। দীর্ঘ চড়াই-উৎরাই ডিঙিয়ে উনিশ শ' একাত্তরে এসে এই পূর্বাঞ্চলীয় বাংলাই পরিণত হলো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে।

বস্তুত বাংলাদেশের উপন্যাসচর্চার এই প্রারম্ভিক মুহূর্তগুলো নানা কারণে সুস্থির ছিল না। প্রথমত দেশ-বিভাগ এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা বাঙালীর মৌলিক চিন্তা এবং চেতনার ফলশ্রুতি নয়। হৃদয়ের স্বাভাবিক সৌকর্যের তুলনায় একটি বিশেষ এবং ক্ষণকালীন উন্মাদনাকেই তারা প্রাধান্য দিয়েছিল। দ্বিতীয়ত ধর্মীয় সংহতিকেই তারা জাতীয়তার মূল উপাদান বলে মনে করেছিল। বাঙালীর নিজস্ব ভাবচেতনা এবং মূল্যবোধগুলো অবান্তর হয়ে গিয়েছিল তাদের বোধের পরিসীমায়। বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি-সমালোচক সৈয়দ আলী আহসান এসম্পর্কে একটি সুচিন্তিত মন্তব্য করেছেন এভাবে :

> 'তখন বাংলা কবিতার স্থান-প্রেক্ষিতকে দ্বিধাবিভক্তকরণের রাজনৈতিক উত্তেজনায় বাংলাদেশের কবিকুল উন্মনস্ক। কলকাতা-কেন্দ্রিক সাহিত্যজীবনের সঙ্গে প্রতি-যোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্যে এই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত প্রয়োজনীয় প্রেরণা সেদিনের জন্যে নানা কারণে অনিবার্য ছিল।.... কেননা, এই সময়ে বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে মুসলমানদের কোনো অধি-কারই ছিল না।....বাংলা সাহিত্যে মুসলমান জীবন যখনই চিত্রিত হয়েছে, তখন তা গ্লানিকররূপে চিত্রিত হয়েছে—মুসলমানদের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য না হলেও, অনেকাংশে সত্য। এজন্যে মুসলমান-দের নিজস্ব সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রের প্রয়োজন'

এই উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করে উন্মেষ যুগের বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকরা সাহিত্য সাধনায় নিয়োজিত হলেও, তাঁদের উদ্দেশ্যনির্ভরতা শেষপর্যন্ত টিকে থাকেনি। কেননা, বাইরের রাজনৈতিক আবহাওয়া, ধর্ম ও খণ্ডিত ঐতিহ্যবোধ কোনো সাহিত্যসাধকের সর্বশেষ কাম্য হতে পারে না। কেননা, আধুনিক উপন্যাসমাত্রেই চেতনার অন্তর্লোকে বিপ্লবের সংবাদ বহন করে আনে। জড়বাদী বিশ্বাস ও প্রাচীন মূল্যবোধগুলোকে ভেঙে দিয়ে পৃথিবীকে নতুন বিস্ময় এবং বিশ্বাসে দেখবার সুযোগ দেয়। যেমন মধ্যযুগে চিত্ত-বিকাশের অন্যতম অবলম্বন ছিল ধর্ম। ধর্ম তার পরিপূর্ণ প্রশ্বাস, নিষ্ঠাবোধ এবং আয়োজনকে নিয়ে মানুষের সমগ্র চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কিন্তু আধুনিক মননের পরিচর্যায় সে-ধর্ম হৃদয়তাপের অন্তরালে নিবিষ্ট হয়ে গিয়েছে। সীমাবদ্ধ পৃথিবী থেকে মানুষের মন নির্বাণ চেয়েছে স্থানোত্তীর্ণ জীবন-চর্যার অধিকারে। কালের এই বিশ্বাসকে সামনে রেখেই বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকরা তাঁদের সাহিত্যসাধনায় মনোনিবেশ কর-লেন।

দেশ-বিভাগের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের প্রবাহকে যাঁরা বাংলাদেশে টিকিয়ে রেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আবুল ফজল, আবু জাফর শামসুদ্দীন, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, সরদার জয়েনউদ্দীন, মাহবুবুল আলম, সত্যেন সেন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এ'দের মধ্যে একমাত্র সত্যেন সেন ব্যতিরেকে অন্য সকলেই উপন্যাসের বিষয়কে ধর্ম ও সম্প্রদায় সমস্যা, নতুন জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে-ছিলেন। সত্যেন সেন ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়কে উপন্যাসের উপজীব্য করে সম-সাময়িক কালে নতুন ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করলেন।

বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যের এই ধর্মকেন্দ্রিকতা এবং সাম্প্রদায়িক পরিচর্যার ক্ষেত্রে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন জন্ম দিলো এক নতুন মূল্যবোধের। বিশেষ উদ্দেশ্যমূলকতা যে সাহিত্যের সত্যমূল্যকে বহন করে না এবং ধর্মগত সংহতি যে জাতীয় চৈতন্যের যথার্থ পরিচয় নয়—একথা উপলব্ধি করলেন বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকরা। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাভাষাভাষীর মুখের ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা না দিয়ে পাকিস্তানী শাসকচক্র উর্দুকেই জাতীয় ভাষার স্তরে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন। এবং তখনই বাঙালীর চেতনা বিকাশের ইতিহাসে উদিত হলো নতুন সূর্য। তাঁরা সর্বান্তকরণে বুঝতে পারলেন বাঙালীর পৃথক অস্তিত্বের পরিচয় সাহিত্যে উদ্ঘাটিত না হলে জাতি হিসেবে তাদের বিশিষ্টতা বিলুপ্ত হবে। এই উদ্দেশ্যেই বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকরা ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে বাঙালী জাতির চেতনা স্ফুরণের দায়িত্ববোধ নিয়ে সাহিত্য চর্চায় মনো-নিবেশ করলেন। বাংলাদেশের উপন্যাসে পৃথকভাবে সমাজচেতনার উদ্ভবও এই সময়ে। এই চেতনাবোধ থেকেই ঔপ-ন্যাসিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন কয়েকজন শক্তিশালী লেখক। সংখ্যায় সুপ্রচুর না হলেও বিদ্রোহ এবং শিল্পগত ঔদার্যের প্রশ্নে এ'দের অবদান বাংলা-দেশের উপন্যাস পরিক্রমায় অবিসংবাদিত। নাম-তালিকার দিক থেকে এ'দের পরিচয় : আলাউদ্দীন আলআজাদ, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, রশীদ করিম, আবু ইসহাক, শওকত ওসমান, সৈয়দ শামসুল হক, জহুরুল হক, শওকত আলী, সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ, সুচরিত চৌধুরী, রশীদ হায়দার শহীদ আখন্দ, সরদার জয়েন উদ্দীন, জহির রায়হান, শহীদুল্লাহ কায়সার প্রমুখ।

বিষয় বিভাবের দিক থেকে এরা স্বগোত্রীয় হয়েও নিজেদের [illegible] বিভিন্নমুখী এবং প্রসারিত করলেন। যেমন ভাষা আন্দোলনকে সমাসার উপজীব্য করলেন সরদার জয়েন উদ্দীন তাঁর 'বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ' উপন্যাসে। শওকত ওসমান বাঙালীর শাশ্বত মূল্যবোধ-গুলোকে অনুসন্ধান করলেন উপন্যাসের পৃষ্ঠায়। এরই দৃষ্টান্ত তাঁর 'জননী' 'চৌর সন্ধি' প্রভৃতি উপন্যাস। আবার রূপকথা কিংবা লোককথার প্রেক্ষিতকে উন্মোচন করে সেখানে তিনি স্থাপন কর-লেন বাঙালীর জীবন-ভাবনা, তার কৃষ্টি এবং আচরণকে। 'ক্রীতদাসের হাসি' তাঁর এই শ্রেণীর উজ্জ্বলতম রচনা। আবু ইসহাক, শহীদুল্লাহ কায়সার প্রমুখ বাঙালীর আঞ্চলিক জীবনকে উপন্যাসবন্দী করলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মা নদীর মাঝি'র মধ্যে দিয়ে যে আঞ্চলিক জীবন-চিত্রণের সফল সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন সে পথে আরও কিছুটা সম্মুখে এগিয়ে গেলেন আবু ইসহাক এবং শহীদুল্লাহ কায়সার। আবু ইসহাকের 'সূর্যদীঘল বাড়ি' বাংলাদেশের একটি বিশেষ অঞ্চলের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। প্রতিদিনের ব্যবহৃত ভাষায়, সমাজজিজ্ঞাসা এবং লৌকিক আচরণে এই প্রতিচ্ছবি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শহীদুল্লাহ কায়সারের 'সারেং

বো' নৌজীবী সারেঙের জীবন-পরিচর্যার বাস্তব দলিল।

আলাউদ্দীন আলআজাদ এবং সৈয়দ শামসুল হক প্রমুখ উপন্যাসে বাঙালীর যৌন জীবনের ব্যর্থতা, অতৃপ্ততা এবং কামনা বাসনার সূক্ষ্মতম উপলব্ধিগুলোকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। আলাউদ্দীন আল আজাদের 'তেইশ নম্বর তৈল চিত্র', সৈয়দ শামসুল হকের 'খেলারাম খেলে যা' এই ধারার বিশিষ্ট রচনা।

শুধু উল্লেখিত বিষয়সমূহে সীমাবদ্ধ থেকে নয়, আরও বিস্তৃত পটভূমি এবং বিষয়ান্তরে প্রসারিত হয়েছে বাহান্ন পরবর্তী বাংলাদেশের উপন্যাস। কখনো উপজাতীয় জীবন এসেছে তার সকল কোলাহল নিয়ে। কখনো বাংলাদেশের কৃষিকর্ম জীবন আর নিসর্গ এসেছে তাদের সকল প্রাণবন্ত ভাষা নিয়ে। কখনো গ্রাম-জীবনের পাশাপাশি নগর-জীবনের অভিঘাত, সংঘর্ষ, ক্লান্তি, বিলাসিতা উপন্যাসের জীবনকে আশ্রয় করেছে। কখনো রাষ্ট্রনীতির নানা প্রসঙ্গ হয়েছে উপন্যাসের উপজীব্য। সমাজতন্ত্র আর সামন্তবাদের সংঘর্ষের চিত্রও এসেছে ঘুরে ফিরে।

অন্যদিকে উপন্যাসের শৈলী বিন্যাস টেকনিকের দিক থেকেও বাংলাদেশের উপন্যাসে বিভিন্ন বিবর্তন এসেছে এসময়ে। কেউ কেউ এবস্ট্রাকশান কিংবা বিমূর্ততাকে ঘটনার প্রকাশরীতির অন্যতম অবলম্বন বলে মনে করেছেন। আবার অনেকেই শুধু মাত্র গল্প বর্ণনকে উপন্যাসে প্রাধান্য দিয়েছেন। ফলে শুধু মাত্র বিমূর্ততা যেমন পাঠকের বোধগ্রাহ্যতাকে দুর্বোধ্যতার কষ্ট দিয়েছে, তেমনি শুধুমাত্র তরল গল্পবর্ণন উপন্যাসকে কাহিনীতে পরিণত করেছে। যে সকল শিল্পীত কৌশলের আরোপে কাহিনী উপন্যাসে পরিণত হয়—অনেক সময় সে সকল কৌশল দানা বেঁধে ওঠেনি। এজন্যেই আবুল ফজল, সরদার জয়েন উদ্দীন প্রমুখের অনেক উপন্যাস আকর্ষণীয় কাহিনী সত্ত্বেও উপন্যাস হয়ে ওঠেনি। অথচ সুসংবদ্ধ কাহিনী ব্যতিরেকেও সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর 'কাঁদো নদী কাঁদো' কিংবা জহির রায়হানের 'হাজার বছর ধরে' নিটোল উপন্যাসে পরিণত হয়েছে।

আধুনিক ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে সকল দর্শন এবং শিল্প আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে বাংলাদেশের উপন্যাসেও তার ছোঁয়া লেগেছে কম বেশী। পরাবাস্তব আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে, অস্তিত্ববাদী দর্শন, একসপ্রেসনিজম, ইমপ্রেসনিজম, ফবিজম, ফিউচারিজম, কিউবিজম এমন কি স্ট্রিম অব কনশাসনেস বা চেতনা-প্রবাহ—এর প্রত্যেকটিকে উপন্যাসে আরোপ করবার চেষ্টা করছেন বাংলাদেশের আধুনিক ঔপন্যাসিকরা। হতে পারে নানা কারণে এ সকল দর্শন আজ প্রবীণ তবু বাংলা কথা সাহিত্যে এ সকল দর্শন আসেনি সমকালেও। বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকরা এসকল শিল্প-দর্শনকে ধরবার চেষ্টা করছেন। যেমন সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ্ তাঁর 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসের কাদের মিয়াকে একটি অস্তিত্ববাদী চরিত্রে পরিণত করেছেন। কিংবা তাঁর 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের মোস্তাফা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে স্ট্রিম অব কনশাসনেস মূর্ত হয়ে উঠেছে। 'কর্ণফুলি' উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে আলাউদ্দীন আল আজাদ এঁকেছেন ইমপ্রেসনিস্ট ছবি। প্রশস্ত আকাশের নীচে তিনি এঁকেছেন প্রকৃতি আর মানুষের আলোছায়াময় কম্পোজিশন, যা অস্পষ্ট, দুরবোধ্য অথচ সম্পূর্ণ।

পঞ্চাশের দশকের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে আর দুজন শক্তিশালী ঔপন্যাসিক রশীদ করিম এবং রশীদ হায়দার। রশীদ করিম অত্যন্ত জীবনবাদী ঔপন্যাসিক। তিনি জীবনকে সার্জারীর ছোরা দিয়ে কেটে কেটে দেখেন। অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি এবং প্রগাঢ় ঔদার্য তাঁকে জীবনের অন্দরমহলে নিয়ে যায়। তাঁর এই ধারার উপন্যাস 'উত্তম পুরুষ', 'প্রসন্ন পাষাণ' এবং আমার যত 'গ্লানি'।

রশীদ হায়দার জীবনকে দেখেন নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে। মানুষ তার কাছে নিত্য-রহস্যময় অলৌকিক সৃষ্টি। এই উপলব্ধির পাশাপাশি তিনি প্রবেশ করেন সমাজ চেতনার ব্যূহে—যন্ত্রণার ক্ষতবিক্ষত হয়ে আবিষ্কার করেন অর্থনৈতিক আর সামাজিক সাম্যের মধ্যেই সমাজের মৌলিক নির্বাণ।

বাংলা দেশের উপন্যাসের এই বিকাশের ধারায় ষাট দশক বলে চিহ্নিত স্বতন্ত্র সময়-সীমার কোনো পৃথক তাৎপর্য নেই। মূলত পঞ্চাশের দশকের ঔপন্যাসিকরাই এই দশককেও মুখরিত করে রেখেছিলেন। কিন্তু সত্তুরের দশক এই প্রেক্ষিতে অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং কোলাহলমুখর। সংখ্যার মানদণ্ডে যেমন সৃষ্টিসাফল্যেও এই দশকের তরুণ ঔপন্যাসিকরা ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের ঔপন্যাস প্রবাহের চৈতন্যকে পাল্টে দিয়েছেন। সৃষ্টি করেছেন নতুন মূল্যবোধের ইতিহাস। উনসত্তুরের গণ অভ্যুত্থান সমগ্র বাঙালী জাতির চিত্ত বিস্ফোরণের নামান্তর। এই অভ্যুত্থানেরই ফলশ্রুতি উনিশ শ' একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা।

রাষ্ট্রনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি চেতনা বিকাশের সংগ্রামও এসময় গড়ে ওঠে বাংলাদেশের তরুণজন মনে। এরই যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে সমসাময়িক সাহিত্য বিচিন্তায়, শিল্পে এবং নানাবিধ সুকুমার বৃত্তির পরিচর্যায়। মাহমুদুল হক তাঁর 'জীবন আমার বোন' উপন্যাসে এসময়ের তরুণ চেতনাকে বাণীবদ্ধ করলেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে। এই দশকের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে আর যাঁদের নাম স্মর্তব্য এবং ইতিমধ্যেই যাঁরা নিজেদের আসনকে নিশ্চিত করে নিয়েছেন তাঁরা হলেন হুমায়ন আহমেদ, কায়েস মাহমুদ, সেলিনা হোসেন, সাজ্জাদ কাদির, ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ এবং শামসুল ইসলাম। উপন্যাসের বিষয় এবং শৈলী সম্পর্কে এঁরা সকলেই পরীক্ষারত এবং অনিবার্য কারণে অনির্দিষ্ট পথের যাত্রী। তবে একটি বিষয় সুনিশ্চিত যে কি বলছেন তার তুলনায় কিভাবে বলা উচিত এ নিয়েই তাঁরা নিরীক্ষা করছেন বেশী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ বিধেয় যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এদেশের উপন্যাসে যথার্থ ছাপ ফেলতে পারে নি। বরং ছোট গল্পের একটা বিপুল সংখ্যা জুড়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা প্রসঙ্গ এসেছে ঘুরে ফিরে। অগ্নিদাহন এবং যন্ত্রণা উত্তরণের যে সময়-সীমাকে অতিক্রম করে বাঙালী তার অস্তিত্বকে পুন প্রতিষ্ঠিত করলো—তার যথার্থ পরিচয় উপন্যাসে প্রতিচিত্রিত হয়নি। তবে স্বাধীনতা যুদ্ধ-কেন্দ্রিক উপন্যাস যে মোটেই রচিত হয়নি একথাও সত্য নয়। সংখ্যায় কম হলেও এ ধরনের উপন্যাস রচনার মধ্যে দিয়ে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন : এক, স্বাধীনতা অর্জনের স্মৃতি এবং অভিজ্ঞতা বাঙালী মানস থেকে মুছে যায়নি। দুই, ঘটনার অভিঘাতজনিত ক্ষয় এবং রক্তপাত যতই শুকিয়ে যাচ্ছে ততই প্রকাশের অধীরতা তীব্র হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার বিষয়কে অবলম্বন করে রচিত উপন্যাসসমূহের একটি তালিকা এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

১। শওকত ওসমান : 'নেকড়ে অরণ্য'
২। সুচরিত চৌধুরী : 'আলো দিয়ে গেল' [?]
৩। শওকত আলী : 'যাত্রা'
৪। হুমায়ন আহমেদ : 'অচিনপুর'
৫। মাহমুদুল হক : 'জীবন আমার বোন'
৬। ঝর্ণাদাশ পুরকায়স্থ : 'বন্দী দিন বন্দী রাত্রি'
৭। সেলিনা হোসেন : 'হাঙর নদী গ্রেনেড'

বাংলাদেশের উপন্যাস সম্পর্কে সমীক্ষা নির্মাণ করতে নিয়ে একটি বিষয় স্বীকার না করে উপায় থাকে না যে—উপন্যাসের এই বিচিত্র গতি বিবর্তনের মধ্যেও যথার্থ উপন্যাস আমরা পাইনি। দেশ বিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ যখন আলাদা হয়ে গেল তখন তা কেবল দু বাংলার ভৌগোলিক ব্যবধানকে সূচিত করেনি। দুটি ভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক প্রতিবেশকে লালন করে গড়ে উঠেছিল দু দেশের জীবন-প্রেক্ষিত। উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যদি জীবনচিত্রণ হয়ে থাকে এবং জীবনের নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ চিত্রণ তবে বাংলা দেশের উপন্যাসেও সে দেশের মানবতান্ত্রিক জীবন জীবন্ত হয়ে উঠা উচিত ছিল। ঔপন্যাসিকরা যেমনি বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে তাদের পরিক্রমণকে সক্রিয় রেখেছিলেন তেমনি গভীর অতল থেকে জীবনকে দেখবার চেষ্টা করেননি। এদিক থেকে পশ্চিম বাংলার উপন্যাস বাংলা দেশের উপন্যাসকে ডিঙিয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সত্যের অর্থে পরিপূর্ণ জীবন-পাঠ যেভাবে উন্মোচিত হয়েছে এদেশের উপন্যাসে বাংলা দেশের উপন্যাসে তা হয়নি।

শিল্পীর স্বাধীনতা

১৯৬২ সালে ভারত-চীন সংঘর্ষের কয়েক মাস পরেই কলকাতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। কয়েকজন লেখক মিলে একখানি চটি বই বের করেছিলেন। বই না বলে পুস্তিকা বলাই ভাল। একটি বার্ষিক সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সময় পুস্তিকাটি ঝকঝকে লাইনোতে ছেপে বিলি বা সামান্য দামে বিক্রি করা হয়।

তার নাম ছিল 'শিল্পীর স্বাধীনতা।'

যাঁরা লিখেছিলেন—তাঁদের কেউ কেউ বৈকুণ্ঠদের চেয়ে তিরিশ বছরের বড় ছিলেন। কেউ ছিলেন বছর এগারো-বারোর বড়। বৈকুণ্ঠদের অনেকেরই তখনো তিরিশ হয়নি। তাদের মোটে একখানা দুখানা করে বই বেরিয়েছে।

ওই সাংস্কৃতিক সম্মেলনে তখনো সংস্কৃতি ছিল। একজন দুজন নতুন গাইয়ে, ছবি আঁকিয়ে তখনো ওই সম্মেলনে আত্মপ্রকাশ করছিলেন। এখনকার মত তেলপুরি, সিঙাড়া, জুতোর দোকানের স্টলে ভরে যায়নি। পায়ে চাকা লাগানো হিন্দি ছবির গান বাজানো ক্লাউনদের ভীষ্ম তখনো পড়েনি সেখানে। উদ্যোক্তাদেরও বয়স ছিল কম। প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বয়স তখনো পঞ্চাশ হয়নি।

পুলি পিঠের দোকান থেকে সাহিত্য সম্মেলন অব্দি বৈকুণ্ঠরা একটা আদর্শের গন্ধ পেত। তার কবি বন্ধুরাও সেখানে স্টল নিত।

এই সময় শিল্পীর স্বাধীনতা পুস্তিকাটি বেরোলো। তার কয়েক মাস আগে খবরের কাগজে ব্যানার হেডলাইন ছিল—

বমডিলার পতন
চুসুলের জন্য তৎপরতা

পুস্তিকায় লিখেছিলেন বাঙালীর প্রিয় লেখকরা। শরৎ পরবর্তী অন্যতম প্রবীণ উপন্যাসিক থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপনের ভাষায় যাঁদের বুদ্ধিযোগী (? মানে কি?) বলা হচ্ছে—তাঁরাও লিখেছিলেন।

প্রবীণ ঔপন্যাসিক ইতিহাসের কিছু সত্য ঘটনা তুলে ধরেছিলেন। একমাত্র তাঁর লেখাটিই তথ্য গ্রাহ্য ছিল। অন্য অস্থির সময়ের কুযুক্তিকে তিনি আদৌ কোন প্রশ্রয় দেননি।

বুদ্ধিযোগীদের বাকি লেখাগুলো এতই অসার ছিল যে তা নিয়ে একজন বাঙালীও মাথা ঘামাননি।

বৈকুণ্ঠদেরও তখন একটি করে গল্প লিখতে বলা হয়েছিল। এমন গল্প—যাতে কিনা শত্রু সম্পর্কে পবিত্র ঘৃণা ছড়িয়ে পড়বে। দেশপ্রেমিকের পবিত্র ঘৃণা! উত্তরে সুদূর গিরিপথে রণাঙ্গন তখন কিন্তু বরফের নিচে। ঘন ঘন দিল্লি-পিকিং নোটবিনিময় চলছে তখন। কলকাতায় ট্রাম-বাস-জীবন রীতিমত অবিরাম।

বৈকুণ্ঠ কালিদাস নাগের স্কুল পাঠ্য 'স্বদেশ ও সভ্যতা' নিয়ে পড়তে বসলো। বই ঘেঁটে ঘেঁটে সে জানলো—

(১) হুন সেনাপতি কিংবা শাসক মিহিরগুল কাশ্মীরে পাহাড়ের ওপর থেকে জ্যান্ত হাতি খাদে ফেলে দিয়ে পড়ন্ত ওই বিশাল প্রাণীর মৃত্যু যন্ত্রণার গোঙানি শুনতে ভালবাসতেন।

(২) অজন্তা গুহাচিত্রের ভারতীয় শিল্পীরা চীনে গিয়ে অমন গুহাচিত্র এঁকেছিলেন। তাঁরা আর ভারতে ফেরেন নি। মধ্যপ্রদেশের শিল্পী হুনানে বংশ পরম্পরায় থেকে গেছেন।

সেই সময় বৈকুণ্ঠর মা হাসপাতালে। অপারেশন হবে। কিন্তু হচ্ছে না। কারণ, অপারেশনের জন্যে যাঁরা অজ্ঞান করবেন—তাঁরা সুদূর ওয়ালং-এর ফিল্ড হাসপাতালে চলে গিয়েছেন—আহত জওয়ানদের শরীর থেকে বুলেট বের করার আগে তাঁদের অজ্ঞান করতে। নয়তো ব্যথা লাগবে।

বৈকুণ্ঠর একজন নিকট আত্মীয়া তখন সন্তানসম্ভবা। এই অবস্থায় যদি চীনের বিমান এসে বোমা ফেলে। পারিবারিক ও চিন্তার জগৎ তখন তার কাছে অনিশ্চিত। সে যুদ্ধকালীন একটি রুশ গল্প খুলে পড়তে বসলো। হিটলারের আক্রমণের পটভূমিতে লেখা। গল্পের ওপরে একপাশে ইটালিকসে বাঁকা বাঁকা হরফে স্টালিনের একটি উদ্ধৃতি ছিল—শত্রুকে নিন্দা করলেই চলবে না—ঘৃণাও করতে হবে তাকে। প্রবল ঘৃণা—

লিখতে বসে বৈকুণ্ঠের কোন ঘৃণা এল না। পবিত্র তো দূরের কথা। হুন সর্দার নিষ্ঠুর মিহিরগুল, হাতির মরণ যন্ত্রণা আওয়াজ, অজন্তা গুহাচিত্রের শিল্পী হুনানে গুহাচিত্র আঁকছেন, অ্যানাসথেসিস্টের অভাবে মায়ের অপারেশন বন্ধ, ওয়ালংয়ে ফিল্ড হাসপাতালে না-জানি কত আহত জওয়ানকে অজ্ঞান করতে হচ্ছে, আসন্ন সন্তানসম্ভবা নিকট আত্মীয়া—সব মিলিয়ে গাঢ় বিষাদ মাখানো একটি গল্প বেরিয়ে এল। যার মূল কথা—যুদ্ধ ক্রোধ, সংঘর্ষ একসঙ্গে অসংখ্য মানুষকে কিভাবে জ্ঞানহীন করে দেয়। কিংবা জ্ঞানশূন্য—যাকে আমরা বলি অজ্ঞান।

গল্পটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদক চিঠি পেলেন—বৈকুণ্ঠবাবু সত্যিই আপনাকে অজ্ঞান করিয়া গল্পটি ছাপাইয়াছেন।

সেদিন বৈকুণ্ঠর হিসেবে কোন ভুল ছিল না। কারণ সেই গল্পটি আজও সে এবং পাঠক পড়তে পারে গল্পটি সমসাময়িকতায় জীর্ণ হয়নি বলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

আজ সেদিন থেকে পনর বছর পরে সেই—

(১) প্রবীণ ঔপন্যাসিক এখন স্বর্গত। (২) শিল্পীর স্বাধীনতার স্বপক্ষে লেখকরা কেউ (ক) এখন চুয়াল্ল কেউ চৌষট্টি, (খ) কেউ পরপারে এবং সঙ্গত কারণেই শিল্পী হিসেবে বিস্মৃত, (গ) কেউ এখন বেঁচে থেকেও বিস্মৃত (ঘ) কেউ বা শিক্ষা বিতরণের বৃহৎ সংস্থার প্রধান আমলা ও বেআইনীভাবে যোগ্যদের অস্বীকার করে অযোগ্যদের নিয়োগপত্র দিয়ে যাচ্ছেন, (ঙ) কেউ গণতন্ত্রের পুরোহিত বেশে এখন নকল শহীদ। সবাইকে এখন খুঁজেও পাওয়া যাবে না। তাঁদের জীবিকা থেকে আলাদা করে নিলে তাঁরা বাঙালীর আর কেউ নন। উর্দুতে যাকে বলে না-চীজ—তাই আর কি। কারণ বিগত পনর বছরে এঁরা এমন কিছু দেননি—যাতে এঁদের মৌলিক মানুষ হিসেবে গণ্য করা যায়। টিঁকে থাকার জন্যে এঁদের ঠাট-ঠমক বিস্তর। প্রত্যেকেই নিজ নিজ রচনা ওরফে শঠতায় নিমগ্ন।

সংস্কৃতি সম্মেলনের সেই পৃষ্ঠপোষক এখন স্বারোদ্ঘাটন ও সচিব-রচিত ভাষণ পাঠে সদাই ব্যস্ত। সম্মেলনের উদ্যোক্তারা বার্ষিক অনুষ্ঠানে মাসভোর ঘুরে ঘুরে স্টল ভাড়া আদায় করেন। তাদের মাইকে আধুনিক গীত বাজে। অনুষ্ঠান মণ্ডপ ঘিরে কাপড়ের দোকান, লটারির চাঁদমারি। লোকজন শীতের [illegible] গরম জামা গায়ে দিয়ে সপরিবারে এক দোকান থেকে আরেক দোকানে যায়। কাউন্ট ইজ এ হেডলেস মনস্টার—এ-কথাটা প্রমাণ করতেই যেন এবারের একটি নাটক বুঝতে না পেরে উগ্র পাবলিক চড়াও হয়ে অভিনয় ভেঙে দিল। পাবলিককে সম্মেলন এতকাল যে কিছুই দিতে পারেনি—রুচি তৈরিতে সাহায্য করতে পারেনি—এটা তারই প্রমাণ।

যে সম্পাদক একদিন চীনের বিরুদ্ধে বৈকুণ্ঠদের পবিত্র ঘৃণা তৈরির বরাত দিয়েছিলেন—সেই সম্পাদকের কাগজে এখন কয়েকটি পৃষ্ঠা চীনের ভূয়সী প্রশংসায় নিয়মিত প্লাবিত।

এখন বৈকুণ্ঠরা চল্লিশ পেরিয়ে গিয়েছে। তাঁদের পরবর্তীরাও পঁয়ত্রিশ পার। তাঁদের শিল্প? তাঁদের স্বাধীনতা? অবস্থাটা কিরকম এখন? এখন তো কোন যুদ্ধ নেই। কেউ তো ভারত আক্রমণ করেনি। [illegible] বৈকুণ্ঠরা স্বদেশবাসী পরিবার গণতন্ত্রীর পরিচয়

ড় যুগের ব্যবধানে

ন। দেশের মানিব্যাগে তিন
নশো চল্লিশ কোটি টাকার
। ডলার-ইয়েন-মার্ক-পাউন্ড স্ফী

ল্পীর স্বাধীনতার' শস্ত্রাণলো
কেঝকে করে ছেপেছিলেন—পবিত্র
ল্টির জন্যে যাঁরা বরাত দিয়ে-
—তাঁরা এখন আসর মাত করতে
বায়েন, কাঁশি, ফ্লুট—সবই
বর জন্যে আগাম বায়না করেন।

না করেই ক্ষান্ত নন্। ফতোয়া—
ণী, ভাই বাবা—সারা বছর বাবা
আমার আসরেই গাইতে হবে,
হবে, বাজাতে হবে। ভাব সমাধি
মার বারন্দাতেই হওয়াতে হবে।
কি করে হয় বড়বাবু? আমি যে
র দালানে এক সন্ধ্যে গাইবো বলে
ছে।

না তা চলবে না। তোমার পবিত্র
বিত্র ভালবাসা, পবিত্র অশ্রু—
মন যেমন বরাত দেয়—সবই
উঠানে ফেলতে হবে।

বাবু? তাহলে কি আমরা
র বাঁধা বাইজী?

বে দেখছো কেন বাবা সকল।
তোমাদের শিল্পী করেছি। আমি
স্র ভ্রষ্টা বানিয়েছি। দেখো
তোমাদের মনীষী করে দেব।
তোমরা সম্রাট হয়ে যাবে। সাহিত্য
চোদ্দ পয়েন্ট রোমান হরফে
ফাঁক দিয়ে। চাই কি সামনের
থেকে তোমাদের কয়েকজনকে
ভাগী করে দেব। ভাবনা কিসের
কল—

কারও দু'চার আসরে না গাইলে
মাদের গলা খেলে না বড়বাবু—
—

তাছাড়া কি বাবা সকল?

শাবলিক যদি ভুলে যায়
য়—

ভুলবে কেন? পাগল হয়েছো।
ভালোই গাইছো। আমাদের
কত লোক হয়। দূর দূর গাঁয়ের
গান শুনতে আসে। হাজার
য়ের মারকারি ল্যাম্প জ্বলে—

তাতে তো শুধু শ্যামা পোকা
বড়বাবু। আসল শ্রোতা ক'টা
আপনি তো কিসব রেকর্ড
মানুষজনের কান নষ্ট করে দিয়ে
ছেন।

স তো তোমাদের মুখ চেয়েই
করেছি। ওরা এখন শুধু তোমাদের গানই
শুনবে। আর কিরকম দক্ষিণা পাও বল।

শুধু দক্ষিণায় মন ভরে?
আবার কি চাও?

রসিক শ্রোতা। তাছাড়া আপনার
আসরের মত মারকারি আলো না
জ্বললেও লণ্ঠন জ্বালানো কিছু আসরে
—আপনার চেয়ে বেশি লোক গান
শুনতে আসে। গানের শেষে দক্ষিণাও
আপনার চেয়ে কম দেয় না। বরং কেউ
বেশিই দেয়—

তারা তো আমাদের মত প্রাইজ
দেয় না।

আপনার চেয়ে অনেক বেশি শ্রোতা
দেয়। আর তারা আপনার মত বাঁধা করে
রাখতে চায় না। সব আসরেই গাওয়া
যায়—

তবে গাও গিয়ে। যত—

উপায় কি বলুন। আপনি ও বড়-
বাবু লেজে খেলছেন—

কিরকম?

যতদিন গলা ততদিন তো
রাখবেন। তারপর তো ফেড়ে ফেলে
দেবেন।

তা কেন? ওই যে ছোট বিমলা,
রমা, সুনীতি, শীলা, শংকরী, নীর-
বালা, সমরসুন্দরী, গৌরী, সন্তোষিণী,
সুমতি—ওদের যে আসরে রেখেছি—
ওদের সবাই কি আর আগের মত নাচে
গায়? তবু তো রেখেছি। পুরো
খোরপোষ দিচ্ছি। কি বাড়িয়েছি।
পুজোয় কাউকে একখানা কম্বল—
কাউকে দুখানা দিয়ে থাকি। নিয়ম করে
পোষপার্বণে সায়া-সমিজ, নববর্ষে
বিছানার চাদর, র‍্যাপার—যা যাকে পারি
দিই। আমরা নেমকহারাম নই—

বড় বিমলার কথা ভুলি কি করে
বড়বাবু? নরেন্দ্রবালা তো আপনার
অবহেলায় কি মনোকষ্টে অকালে চলে
গেল। নইলে গাইতো কি সুন্দর বলুন।
জ্যোতিরাণী, সুবোধবালা দাসী—ও'রা
কি আপনার আসর একদিন মাত করে
রাখেনি?

রেখেছে। মানছি। কিন্তু সবাইকে
রাখি কি করে বল।

তবে আর আমাদের মত খেলো
জিনিস আসরের কানাতে সাজিয়ে রাখছেন
কেন?

সব জিনিস লাগে বাবা সকল।
কখন কে কী হয়ে হয়ে ওঠে তার ঠিক
কি। সুনীতি এক আসরে বারোখানা
গেয়ে দেবে। শংকরীর একই গান বারো-
বার শুনবে লোকে। শীলা যৌবনে
যোগিনী। কবে কালী যায় তার ঠিক
কি।

গৌরী, সন্তোষিণী, রমা, ছোট
বিমলা তো আছে আপনার—

ওদের এক এক জনের চাল এক
এক রকম। সন্তোষিণী আসর না বুঝে
ধ্রুপদ ধরবে। গৌরী খেমটা। তারপর
দেমাক আছে। রমার ঘুঙুর জোর করে
জমাচ্ছি আজকাল। নয়তো ভয়ংকর
গুমোট ওর গলায়। সঙ্গে সুধীর হারমো-
নিয়ম ধরে তাই সয়ে যায়।

ছোট বিমলা?

ওকে না রেখে আমার উপায় কি
বল। ও তো আমার আড়কাঠি। জিনিস
দেখে—জিনিস বাছে—তারপর আমি
টুপ করে তুলে নি। যাও আর কথা
বাড়িও না। আমার আসরে থাকলে অন্য
বারান্দায় গাওয়া চলবে না।

বদলি কি পাবো?

খেতাব। মণীষী, যুগন্ধর, উদীয়-
মান, যুগসূর্য—চাইকি যুগ্মিযোগীও
দিয়ে দিতে পারি।

শ্রোতা না শুনলে ওসব কি আমি
ধুয়ে খাবো?

আমার আসরে শ্রোতা কম
কিসের? আগেকার বিধবার বেশ ফেলে
দিয়ে আসরে এবারে টুনি ডুম দেব।

সেই তো শেষ পর্যন্ত এগারোশো
থেকে বেড়ে বড় জোর তেত্রিশশো।

তুমি তো দেখছি বাপু শ্যামলীর
মত বোলচাল দিচ্ছ। শ্যামলী না
জানতো গান—না জানতো নাচ। শুধু
দেমাকেই গেল মেয়েটা। ধৈর্য ধরে আমার
আসরে থাকলে একদিন মুজরো পেতো।
ঠাটঠমক ছিল কিন্তু।

থাকবে কেন? খেতাবের লোভে?
দক্ষিণা। সেটা কম কোথায়?
খারাপ না। কিন্তু ও বগলস
আমি গলায় দেব না।

বগলস বলছো কেন?
পুজোর সময় দেখেছি। আপনি
বগলস পরিয়ে চেন হাতে হাঁটতে
বেরোন ভোরবেলা। লোকে বলে বাবুর
বাড়ির জিনিস।

তাতো বলবেই। তোয়াজে থাকে।
দোবেলা ডুমো ডুমো মাংস। সঙ্গে
হলুদ মাখানো লাল চালের ভাত।

বৈকুণ্ঠ ভাবছিল—কার স্বাধীনতা?
শিল্পের? গানের? বড়বাবুর আসরের
বাবুর বাড়ির এক্সক্লুসিভ মার্কা
জিনিসগুলোর গলায় বগলস এঁটে ঘুরে
বেড়ানো?

না, বড়বাবুর? যে জন্যে এতসব
গালভরা কথা।

বৈকুণ্ঠ পাঠক

ফণীশ্বর নাথ রেণু

সুবিমল বসাক

অমরত্ব কথাটির ওজন বড় বেশি, অর্থ বিশাল ও ব্যাপক। অতিব্যবহার ও অপব্যবহারে এর ধার গিয়েছে কমে। কে আর এখন একটি বা দুটি লেখা লিখে অমরত্বের দাবি করে। তবুও আমরা, যারা রেণুপ্রেমী, ফণীশ্বর নাথ রেণু-র লেখার মুগ্ধ পাঠক, তাদের কাছে দেয়ালের একটা অংশ হুড়মুড় করে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল ১১-৪-৭৭ রাত ন'টায়।

১৯৫৮ সালে, এক অপরাহ্নে রেণুজীকে আমি প্রথম দেখি, পাটনায় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গীতা পাঠ করতে। আশ্রমে তিনি প্রত্যহ অপরাহ্নে, সন্ধ্যারতির সময়ে উপস্থিত থাকতেন। রামকৃষ্ণের ভক্ত, শিষ্যত্বও গ্রহণ করেছিলেন কোন মহারাজের। মনে পড়ে ১৯৬৫-র দিকে 'অনিমা'-য় প্রকাশিত একটি রিপোতার্জে রামকৃষ্ণ সম্পর্কে অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছিলেন: দেখলুম, একজন দীর্ঘাকৃতি, ঋজু, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, রিমলেশ চশমার ভেতর স্বপ্নিল চোখ, মাথায় আস্কন্ধলম্বিত ঘন কেশরাশি, সুপুরুষ, সপ্রতিভ ব্যক্তিত্ব আসন পেতে গীতা পাঠ করছেন—রেণুকে আমার সেই প্রথম দেখা, ঐ অবস্থায়। ময়লা আঁচল বেরিয়ে গেছে '৫৫, পরবর্তী অংশ পরতি পরিকথা—দু বছর বাদে। একটি গল্পসংগ্রহ ঠুমরি। উপন্যাস তখনও পড়িনি, কেবল কয়েকটি গল্প রসপ্রিয়া, তিসরী কসম, লালপান কি বেগম—পড়ার পর মনে মনেই তার সঙ্গে ইন্টারভিউ নিয়েছি বেশ কয়েকবার।

দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ ঘটে ১৯৬০-এ। তখন তিনি পাটনা আকাশবাণীর সঙ্গে যুক্ত। ময়লা আঁচলের ২টো পরিচ্ছেদ অনুবাদ করে নিয়ে গেছিলুম তাঁকে দেখাতে। বাংলা জানেন ভালো, অনেক বাঙালীর চেয়েও। প্রতি বছর শারদ সংখ্যা জমে উঠতো তাঁর টেবিলে, এবং তিনি তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন। বাংলা সাহিত্যে সেকাল ওদিক কি কি ঘটেছে, তাও তার নখদর্পণে। 'ভাদুড়ীজী' এবং 'ওহে! ক্যালকাটা আমার ক্যালকাটা'—এই শিরোনামায় তাঁর দুটি বাংলা মৌলিক রচনা অনেক বাঙালী লেখক এবং পাঠককে যুগপৎ আশ্চর্য ও মুগ্ধ করেছে। বহু তরুণ বাঙালী কবি ও লেখকের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল, পত্র বিনিময় হত।

ময়লা আঁচলই ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত। ১৯৬৩ অব্দি লাগাড়ে অবিচ্ছিন্নভাবে তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেছে। তুমুল আড্ডা, আলোচনা, গল্প, মদ্যপান। অমন আড্ডাধারী লোক আমি দেখিনি অদ্যাবধি। সঞ্চিত বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা খুলে ধরতেন তিনি, কখনও বোর্ড'ম মনে

হয়নি। রেণুজীর সঙ্গে অন্তত একবারও যার পরিচয় ঘটেছে, তাঁকে ভোলা অসম্ভব—এমন ছিল প্রখর ব্যক্তিত্ব। বাংলা, উর্দু, মৈথিলী, নেপালী ভাষায় অনর্গল, প্রায় মাতৃভাষার মত, কথা বলতে ও লিখতে পারতেন। সেবার, ১৯৭১, জগদীশ ঘিমিরে নামে নেপালী এক কবি-যুবক পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসেন, তাঁরই সহযোগিতায় আমি কিছু কিছু আধুনিক নেপালী কবিতার অনুবাদ করছিলুম, রেণুজীকে দেখেছি অনর্গল নেপালী (পাহাড়ী) ভাষায় কথা বলতে। পারিজাতের 'শিরীষ কা ফুল' নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতো। নেপাল রেডিও স্টেশনেও তিনি বেশ কিছুদিন কাজ করেছিলেন। নেপালের রাজনীতিতে, বি পি কৈরালার সঙ্গে তিনিও আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন বেনারস হিন্দু য়ুনিভার্সিটিতে পড়ার সময়। পূর্ণিয়ায় সতীনাথ ভাদুড়ীর সংস্পর্শে আসেন স্কুল ছাত্র অবস্থায়। সতীনাথ সম্পর্কে কথা উঠলেই বলতেন—আমার গুরুজী। রাজনীতি ক্ষেত্রে এবং সাহিত্য-ক্ষেত্রে। জেলে বাসকরাকালীন সতীনাথের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। বলতেন—উনি আমায় হাত ধরে লেখা শিখিয়েছেন। ওনারই উপদেশ এবং সাহস পেয়ে উপন্যাস লেখায় হাত দিয়েছেন। ময়লা আঁচল বেরোবার পর একদিন আবিষ্কার করলেন সর্বভারতীয় লেখক হয়ে গেছেন।

স্বাধীনতার পর, দীর্ঘ রোগভোগা-কালীন লতিকার সঙ্গে আলাপ হয়। আলাপ, প্রণয়, পরিণয়। লতিকাবৌদি সম্পর্কে তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। বলতেন—লতিকার ভূমিকা আমার জীবনে অসামান্য। একাধারে মা-র মত ঝড়-ঝাপ্টা আগলে রেখেছেন, অন্যদিকে প্রেরণা দিয়েছেন। নিজের গয়না বিক্রি করে 'ময়লা আঁচল' প্রকাশ করেছেন।

পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত ঔরাহি-হিঙ্গনা গ্রামের সেই শিশু, ১৯২১ সালে জন্ম, উত্তরকালে সেই গণ্ডী কাটিয়ে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। ময়লা আঁচল প্রায় ১১টি ভাষায় অনূদিত হয়। রেণুজীর সম্পর্কে প্রথম অভিযোগ তিনি খুব কম লিখতেন, এযাবৎ মোট ৫ উপন্যাস : দীর্ঘতপা, কিতনে চৌরাহে, জুলুস এবং অনধিক ৬০টি গল্প। তাছাড়া, বেশ কিছু রিপোতার্জ।

তাঁর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ ঘটে '৭৫ মে মাসে। পাটনা যখন জলমগ্ন। 'তিসরী কসম' গল্পসংগ্রহের পাণ্ডুলিপি দেখে তিনি অনুমতি দিয়েছিলেন। তারপর, যে দু-বার গিয়েছি, দেখা হয় নাই। গাঁয়ে ছিলেন জেল থেকে বেরিয়ে।

রাজনীতি থেকে সরে এসেও ৭২-এ

আবার তিনি রাজনীতিতে যুক্ত হলেন সক্রিয়ভাবে। জয়প্রকাশ নারায়ণের আহ্বানে। তিনি নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। কেন, তিনি রাজনীতিতে নামলেন, এই প্রশ্নের কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন কলকাতায় ৭৫-এ ফেব্রুয়ারী মাসে একটি ঘরোয়া বৈঠকে। সেবারই 'প্যারালাল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে' পালন করেছিলেন পাটনায়। গর্দানীবাগ স্কুলে পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। ৭৫-এ তিনি সরকার প্রদত্ত খেতাব 'পদ্মশ্রী' প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, এবং বরাদ্দ মাসোহারা—প্রতিবাদ-স্বরূপ। সেবার তাঁর মন বড় বিষণ্ণ ছিল, গাঁয়ের বাড়িতে চুরি হয়। অন্যান্য সবকিছুর জন্য তেমন দুঃখবোধ ছিল না, যতটা ছিল একটা স্যুটকেসের জন্য। স্যুটকেসে ছিল দুটি পাণ্ডুলিপি এবং একটি সমবয়সী ঝর্ণা কলম। ঐ কলমের অভাবে কিছুই লিখতে পারছেন না। আত্মজীবনীমূলক রচনা 'ঈশ্বর রে মেরে বেচারে' এবং 'তব শুভ নামে জাগে'—এই দুটি পাণ্ডুলিপি।

রেণুর 'অচ্ছে লোগ', রেণুর 'টেবিল', রেণুর 'লকড়া' এসব গল্প বার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রায় অনুবাদ নিতুম। 'পল্টুবাবু কা গলি' নামে একটা ধারাবাহিক রচনা বার হচ্ছিল একটি পত্রিকায়, সম্ভবতঃ শেষ হয়নি। আরও কত গল্প তিনি বলেছেন, হ্যাঁ, লিখবে একটু ফুরসৎ পেয়েনি।

এবার পাটনায় গেলে তাঁকে আর দেখতে পাবো না, কফি হাউসে 'রেণুস্ কর্ণার' সেই রকমই ভিড় থাকবে, কিন্তু দেখতে পাবো না সেই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি আস্কন্ধলম্বিত কেশরাজি, রিমলেশ চশমা-শোভিত রেণুজীকে।

ওহে! ক্যালকাটা আমার ক্যালকাটা

ফণীশ্বরনাথ রেণু

...'কলকাতা এলে লোক আর কলকাতা ছাড়তে চায় না গো।'—বলেছিলেন ভবানীপুরের এক বিরাট বনেদী বাড়ীর বিধবা পিসিমা। সে দশ বছর আগেকার কথা। আমি দাদখানী চালের ভাতের সঙ্গে রুই মাছের ঝোল মাখতে মাখতে বলেছিলাম—'পিসিমা— আসল কথা—কলকাতাই ছাড়তে চায় না যে....।'

হ্যাঁ, কলকাতা ছাড়তে চায় না। ছাড়াছাড়ির ব্যাপারে এবারেও তাই হল। সেই কলকাতা ছাড়বার সময় মনে হতে লাগলো—ছাড়তে পারছি না। ছাড়াতে পারছি না। কিন্তু, এবারকার টান যেন একটু বেশী বেশী—নাড়ীর টানের মত।

এবারেও চিড়িয়াখানা আর দেখা হ'ল না, বিড়লা প্ল্যানিটোরিয়মও নয়, ন্যাশনাল লাইব্রেরিও নয়। ঠিক আছে। অন্য বার এসে সারা কলকাতা দেখে নেওয়া যাবে। সেই পিঁপড়ের মত যে মুখে চিনির এক দানা নিয়ে বাড়ি ফেরবার সময় বলেছিল—অন্য কোনো দিন এসে গোটা চিনির পাহাড়টাকেই বয়ে নিয়ে যাবে।

এ যাত্রায় শুধু 'কৃত্তিবাস-দফতর' দেখে এলাম। কৃত্তিবাসী কবি লেখকদের আড্ডায় কিছুক্ষণ ছিলাম। সুনীলশক্তি শ্যামলপূর্ণেন্দুপার্থসারথিসুবিমলদের কথা এখন থাক। সবার আগে সন্দীপনের কথাই বলব।...রাজকমল চৌধুরী সম্পাদিত 'মরাল'-এর (কাশী থেকে প্রকাশিত এবং কাশীতেই কাশীলাভ করা এক হিন্দী মাসিক পত্রিকা) বাংলা নবলেখন বিশেষ সংখ্যায় আমার এক লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। আমি বাংলার 'নবলেখকদের' 'প্রোফিল' প্রস্তুত করেছিলাম— *শক্তিসুবিমলসন্দীপনসুনীল* সমীর তারাপদমলয়সুভাষ ঘোষ উৎপল ইত্যাদির লেখা এবং ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধে ছোট ছোট স্কেচ। লেখা প্রকাশিত হবার পরে আমি সন্দীপনের একটা পোস্টকার্ড পেয়েছিলাম। নিজের সম্বন্ধে এ লিখেছিল—'আমি কাওয়ার্ড' অর্থাৎ ভীষণ ভীত।' ওর হাতের লেখা এবং সই আমার চেনা ছিল। 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসীর' এক কপি আমার হাতে এসেছিল যার প্রথম অধ্যায়ের মাথায় খালি জায়গায় লেখা ছিল—'শ্রীসমীর রায়চৌধুরী ও শ্রীমতী বেলা রায়চৌধুরী করকমলেষু।'

এবার ২৬ জানুয়ারী আমরা পাটনায় 'প্যারালাল ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে' পালন করেছিলাম। পতাকা উত্তোলনের সময় বার বার সন্দীপনের ওই বই-এর ভূমিকার(?) শেষ লাইনগুলো মনে পড়েছিল—'আমাদের কেবলি মনে পড়ে শৈশবের সেই স্বাধীনতা দিবস যখন পতাকা উত্তোলন হ'ত—যখন পরাধীন আমরা— সেই উড্ডীয়মান পতাকাকে দেখতাম—শীতে দাঁড়িয়ে। শৃঙ্খলিত করজোড়ে...।'

রবিবাবু বা কাজি নজরুলের কোনো লাইন কেমন মনে পড়ল না বলতে পারছি না।

সেদিন অর্থাৎ ২৪ ফেব্রুয়ারী ৭৫ এর সন্ধ্যায় কফি হাউসে (সেন্ট্রাল এভিনিউ) গিয়ে—কৃত্তিবাসীদের কাউকে না পেয়ে খোঁজখবর নেওয়ার সময় জনৈক অবাঙালী লেখকের কাছে প্রায় 'জবাবদিহী' দিতে হয়েছিল—কেন ওদের জন্য এত ব্যস্ত আমি। ..কৃত্তিবাসের 'দফতর' তো খুব কাছেই। ওখানে গেলেই ওদের সব খবরাখবর সঠিক পাবেন। তরুণ প্রেসে চলে যান—অক্রুর দত্ত লেন তো খুব কাছেই।

হয়তো কফি হাউস থেকে অক্রুর দত্ত লেন খুব কাছেই হবে। কিন্তু, কোনো লেন-বাইলেন বা গলি খুঁজতে গিয়ে যা হয়—এমন কি অক্রুর দত্ত লেনের বাসিন্দারাও ঘাড় নেড়ে বলে দেয়—'জানি না।.. মালুম নেহি।... কোন দত্ত লেন বললেন? গড়ুর দত্ত..!' কলকাতায় বা অন্য কোনো মহানগরে লেন-বাইলেন বা গলি খুঁজতে গিয়ে যা হয়....।

এই খোঁজাখুঁজির সময় মনে পড়ে যায়—প্রায় তিরিশ বছর আগেকার এক বর্ষণমুখর দিনের কথা। আর মনে পড়ে গেলেই নিজের বোকামির জন্য নিজেই লজ্জিত হয়ে শুধু হাসি। সেই—রামতনু লাহিড়ী লেনের মেস খুঁজে বেড়ানোর বোকামি। শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের একটি গল্পে রামতনু লাহিড়ী লেনের এক 'মেসে' বর্ষার দিনে ফিস্টিতে খিচুড়ী আর চিংড়ী মাছের কাটলেটের রসনারোচক বর্ণনা পড়েছিলাম। তাই সেবার বর্ষাকালে কলকাতায় পেঁছে পরদিনই বৃষ্টি মাথায় করে রামতনু লাহিড়ী লেনের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিলাম। শেষে হেঁটে হেঁটে হয়রান, ভিজে ভিজে নাজেহাল (বেহাল?) এদিকে রিকশায় উঠতে পারছি না ভয়ে। (মানুষে টানা রিক্‌শা। রিক=মানুষ; শা=টানা) রিক্‌শর ঠুংঠুং শব্দ শুনলেই আমার গা শিউরে উঠে। এই রিক্‌শভীতিরও কারণ একটা কাহিনী। প্রায় চল্লিশ বছর আগে কোনো মাসিক পত্রিকায় (প্রবাসী না ভারতবর্ষ না শনিবারের চিঠি?) পড়া এক গল্প। লেখকের নামও আর মনে নেই। শুধু মনে আছে—কাহিনী 'ফার্স্ট পারসনে' লেখা। একবার একটা অদ্ভুত রিকশাওয়ালার সঙ্গে লেখকের পরিচয় হল। রিক্‌শাওয়ালা দুজনকে রিক্‌শায় বসায় না।....রিকশাওয়ালার জীবনে এই কলকাতা শহরে একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটেছিল। একবার দুজন 'বাবু' ওর রিক্‌শায় উঠলো। অনেক দূরে যাওয়ার পরে এক অন্ধকার এবং নির্জন জায়গায় গিয়ে ও টের পেয়েছিল যে ওর রিক্‌শায় দুজন বাবু নয়। রয়েছে মাত্র একজনের লাশ—রক্তারক্তি কাণ্ড। তারপর থেকে ওর মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে সে সারা জীবন সেই লাশটিকে রিকশায় বয়ে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে পচা গন্ধও পায়। দুজনকে তাই বসায় না। ঠুংঠুং...এবারেও একটা ছাত্তিসার রিক্‌শর শব্দ শুনে গা ছমছম করে উঠেছিল। জীবনে আমি মানুষটানা রিক্‌শাতে কোনো দিন উঠিনি।....

খোঁজাখুঁজির আরও একটা ঘটনা মনে পড়ে। এমনি একবার 'বাজে শিবপুর হাওড়া' গিয়ে রাস্তায় এক বাঙ্গালী বৃদ্ধ ভদ্রলোককে জিগ্যেস করেছিলাম—'মশায়। এই বাজে শিবপুরে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোথায় থাকতেন বলতে পারেন?'

...আজে লেখক শরৎবাবু...চরিত্রহীন
স শ্রীকান্ত....।'

আমার প্রশ্ন শেষ হবার আগেই যে
ক-খাঁকে জবাব পেয়েছিলাম, সারা
মনে থাকবে—'তবে এ পাড়ায় কেন
ছোকরা ওদিকে সোনাগাছির কোনো
মুখীর কাছে যাও না কেন ?....গলা
লে দুধ বেরোয়—এদিকে শরৎচন্দ্র
খুঁজে বেড়াচ্ছেন।'

শেষে সাড়ে আটটার (রাত্রে) অক্রুরদত্ত
তরুণ প্রেস আর কৃত্তিবাস কার্যালয়কে
সেই পাওয়া গেল। কিন্তু ওখানে
র একমাত্র পূর্বপরিচিত কৃত্তিবাস
দক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে পাওয়া
না।

অফিসে উপস্থিত অপরিচিতদের কাছে
র পরিচয় নিবেদন করে জানতে
াম—'সুনীলবাবু আছেন কি ?'

উনি এই একটু আগেই বেরিয়ে
ন। বোধ হয় কোনো ফিল্ম ফেসটি-
র বই দেখতে....।' —তরুণ প্রেসের
ণশবাবু কথার 'শ্রীগণেশ' করলেন।
তু ওঁকে মাঝখানেই বাধা দিয়ে থামিয়ে
কাঁধে ঝোলা ঝুলিয়ে কাছেই
নো রাজকমল চৌধুরীর মত উন্নত-
ট একজন। সে সামনের কাগজের উপর
দিয়ে খস-খস করে কিছু লিখে দিল
া! বেচারা বোবা ? বোবার দুশমন
!) গণেশবাবুও একটু অপ্রস্তুত।
য় পড়ে বললেন—'সুনীলবাবু
ান বই দেখতে গেছেন। আপনি বসুন
ন্তু তোমার হয়েছে কি ? কথা বলছো
কেন সন্দীপন ?'

আচ্ছা। আপনি সন্দীপনবাবু ?
সন্দীপন কাগজে লিখে জানাল—
র আজকে মৌনব্রত—আমি সপ্তাহে
দন কাউমিট খাই এবং কথা বলি
' আমি হেসে শুধু বললাম—বাহ।
কিন্তু কথা পড়ে চমকে গেলাম না।
তু ভাবতে হল। সন্দীপন 'বীফ বা
মাংস' না লিখে—কাউমিট লিখেছে।
তা হটডগ-এর মত কোনো....। যদি
দীপন আমাকে চমকাবার জন্য এই
মিট বোমা' ছেড়ে থাকে তো সেটা—
ফু-সু-স অর্থাৎ 'মিসফায়ার' হয়েছে
। বাঙালী কবি নিশিকান্ত বাঘের
খেয়েছিলেন। 'এর উপকারিতা বো-
সঙ্গে সপ্তাহে অন্তত একদিন ঝগড়া
না।'— সন্দীপন লিখে বোঝাল।
আমি বললাম—'এক মাসে অন্তত
দিন। বাহ!'
'আমি সুনীলকে ডেকে আনি।'—
ব্রতধারী সন্দীপনের কলমের ডগা দিয়ে
বেরুল।
আমার এ লেখালেখির খেলা হঠাৎ খুব
লাগতে শুরু করেছে। বেশ মজার
ার। এ যেন প্লানচেটের ভৌতিক
া। সন্দপন মিডিয়াম মাত্র। লিখছে
ন। এই সময় এসে পড়লেন শান্তি
লাহিড়ী। মুখে বেশ হাসিখুশী মাখা
শান্তিও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—
'তোমার আজ হঠাৎ কথা বন্ধ হল কি
করে ?'

আমি বললাম—'অভিনব ওইনোবা
ভাওয়ে।'

আশ্চর্যচকিত শান্তির জন্য সন্দীপনের
কলম লিখে দিল—'ফোন করেছিল একটু
আগে। প্রেমিকার সঙ্গে কথা বলিনি।'
আবার কাছের বন্ধুর দিকে দেখিয়ে
লিখল—'আস্ক হিম' তারপর আবার—
'আমি সুনীলকে ডেকে আনি।'

আমি বারণ করলাম—'উনি বই
দেখতে গিয়েছেন। কেন মিছে ডিস্টার্ব
করা ?'

এবার গণেশবাবু বললেন—'তোমরা
রেণুশ্রী কে উপরে— অফিসে নিয়ে যাও।'

আমরা সবাই উপরে কৃত্তিবাস
কার্যালয়ে গেলাম। পার্থবাবু এলেন।
পরিচয় হল। কিন্তু উনিও সন্দীপনের
কথা বলা বন্ধ দেখে বিস্মিত হয়ে
গেলেন—'আরে, ছাড়ো এসব। আজ রেণুশ্রী
এসেছেন।'

'দফতরে' আমাকে ওরা জোর করেই
সম্পাদকের চেয়ারে বসালেন। সন্দীপনের
লেখনী বন্ধুদের আদেশ দিল—'তোমরা
রেণুশ্রীর সঙ্গে কথা বল। এটা ভদ্রতা ।'
আবার—'আমি সুনীল কে ডেকে
আনি।'

আমি আবার বারণ করলাম—'আপনি
বসুন।'

'আজ দু ঘণ্টা প্রেমিকার সঙ্গে এভাবে
কথা বলছি। লিখে।' 'বাহ।'

'আপনি মহান। আপনি আন্দোলন
করেন....।'

আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম—
'মহান ? সে আবার কি ?'

সন্দীপনবাবু ঠোঁট বন্ধ করে মুক-
হাসি হাসলেন। লিখলেন—'এটা মহান যে
আপনি মিটিং করতে এসেছেন।'

'মিটিং করতে মোটেই নয়। এসেছি
হঠাৎ কলকাতায় একটা সুযোগ পেয়ে।
মিটিং করতে নয়, আপনাদের সঙ্গে দেখা-
সাক্ষাত এবং কথা বলতে ?'

'কামু বলেছিলেন—'

লেখার মাঝখানেই আমার ইচ্ছে হল
বলি—'আমাদের মধ্যে কামুকে আবার কেন
টেনে আনা ?' কিন্তু কিছু না বলে ওঁর
লিখিত বক্তব্য পড়তে লাগলাম—'
কামু বলেছিলেন—প্রত্যেক লেখকের লেখার
ইউনিয়ন করা উচিত।'

আমার মুখের বোকা ভাব দেখে
আবার লেখা বেরুল—'ইন্টারভিউ— মিথ
অফ সিসিফাস এর শেষে।'

চা এল। পার্থ এবং শান্তি আমার
সঙ্গে কথা বলছেন দেখে সন্দীপন আমাকে
বলল অর্থাৎ লিখল—'কাল আপনার সঙ্গে
অজস্র কথা বলব। আপনি বোধ হয় জানেন
না কলকাতায় আমি দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ বাচাল।'

শুধোলাম—'প্রথম শ্রেষ্ঠ বাচাল কে ?'
'রেডিও'

এবার সন্দীপন আমি সুনীলকে ডেকে
আনি লিখে বেরিয়ে পড়ল। ১০-১৫ মিনিট
পরে এসে লিখে জানাল— 'সুনীল আসছে।
আমি গিয়ে খবর লিখে ভেতরে পাঠিয়ে
দিয়ে এসেছি।'

কিছুক্ষণ পরেই সুনীল এলেন। আমি
চেয়ার ছেড়ে দিয়ে বললাম—আসুন।
আপনার চেয়ার দখল করে বসে আছি।'
সুনীল আমার কাঁধের উপর হাত রেখে
বসিয়ে দিলেন—'ও আপনারই চেয়ার।'

সুনীল পরিচয় করিয়ে দিলেন—
'স্বাতী।' সন্দীপনের কথা বন্ধ হওয়ার কথা
শুনে সুনীলবাবুর মুখে-চোখে লেখা কথা
আমি পড়তে পেরেছিলাম এবং তারপর
সন্দীপনের মুখের ভাবও....। সুনীল যেন
পুলিশ অফিসার—চোর ধরেছেন। আর
সন্দীপন যেন ধরা পড়ে ইশারায় ইঙ্গিতে
জানতে চাইছে—ঠিকই ধরেছেন স্যার।
আপনার প্রাপ্য কিন্তু....।

যাক। সুনীল এসে পড়াতে সন্দীপনের
লেখা ক্রমশঃ কমে গেল। আমি শক্তি-
বাবুর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। ভাল
আছেন এবং মৌজ মে হ্যাঁয় শুনে সুখী
হলাম। কবিদের মৌজ মে থাকার মানেই
হল—খুব লিখছেন লিখে যাচ্ছেন—
বেশ....।

শক্তির কথায় গালিবের কথা অর্থাৎ
'গালিবের কবিতা'র কথা এবং গালিবের
কথায় আয়ান রশীদের কথা এবং রশীদ-এর
কথায়—প্রস্তাব করা হল—'লেট আস গো
টু—রশিদ আলিপুরে উঠেছেন আপনি।
রশিদ আলিপুরেই থাকে।' দু-তিন গাড়িতে
বোঝাই হয়ে আমরা সবাই আলিপুরের
রশিদের বাসায় গিয়ে সাড়ে দশটা রাত্রে
উপস্থিত হলাম। ওখানে 'দৌর' চলছিল—
'জাম' ছলকাচ্ছিল। আমাদের দেখে রশিদ
এর 'মেহফিল' আরও 'গুলজার' হয়ে
উঠল....। উনকে দেখে সে যো আযাতি
হ্যায় মুঁহ পর রৌণক—উয়ো সমঝতে হ্যাঁয়
কি বীমার কা হাল আচ্ছা হ্যায়।

রশিদ আমাকে 'গালিবের কবিতা'র
এক কপি (হিন্দীতে লিখে) প্রেজেন্ট
করলেন। ধন্যবাদ দিয়ে আবার শক্তির
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ। কালকে সবার সঙ্গে
দেখা হবে। কালকে সবার সঙ্গে কথা হবে।
হ্যাঁ, পূর্ণেন্দু, শ্যামল, মতি নন্দী এবং
আরও অনেকের সঙ্গে। কালকে
'আনন্দবাজার পত্রিকা' এবং 'দেশ' এর
অফিসে যাব..। গুড নাইট—শুভ রাত্রি।

পরদিন শক্তি, পূর্ণেন্দু, শ্যামল
এবং মতি নন্দীর সঙ্গে দেখা হল। কিন্তু
কথা হল না। কবি শক্তির কবিতা শোনা
হল না। সন্দীপনের কণ্ঠস্বর শোনাই হল
না। এবার যখন কলকাতা আসব—সব
পেয়ে যাব—সব দেখে নেব শুনে নেব।....
আমিন॥

ফণীশ্বরনাথ রেণু

রসপ্রিয়া

ধুলোয় পড়ে থাকা দামী পাথর দেখে জহুরীর চোখে এক নতুন ঝিলিক ঝলমল করে ওঠে—অপরূপ রূপ।

রাখাল-ছেলে মোহনাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচকড়ি মৃদঙ্গিয়ার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে—অপরূপ রূপ!

....ক্ষেত, মাঠ, বাগান, গরু-বলদের মাঝে রাখাল মোহনার সৌন্দর্য!

মৃদঙ্গিয়ার ক্ষীণজ্যোতি চোখজোড়া সজল হয়ে ওঠে।

মোহনা হেসে জিজ্ঞেস করে—তোমার আংগুলে রসপিরিয়া বাজাতে গিয়ে বেঁকে গেছে, তাই না?

—অ্যা!—বুড়ো মৃদঙ্গিয়া চমকে ওঠে—রসপিরিয়া? ....হ্যাঁ....না। তুমি কি করে....তুমি কোথায় শুনেছ?....

'বেটা' বলতে গিয়ে সে থেমে পড়ে। ....পরমানপুরে সেবার এক ব্রাহ্মণের ছেলেকে আদর করে 'বেটা' বলে ফেলেছিল। গাঁয়ের সমস্ত ছেলেরা তাকে ঘিরে মারার জন্য তৈরি হয়েছিল—বরদার হয়ে হয়ে কিনা ব্রাহ্মণের ছেলেকে 'বেটা' বলবে? মার শালা বুড়োকে।....মৃদঙ্গ ভেঙে ফেল!

মৃদঙ্গিয়া হেসে বলেছিল—আচ্ছা, এবারটি মাফ করে দাও হুজুর। এখন থেকে আপনাদের বাপ-ই বলবো।

ছেলেরা খুশি হয়েছিল। দু-আড়াই বছরের একটা ন্যাংটো ছেলের থুতনি ধরে সে বলেছিল—এখন ঠিক হয়েছে তো বাপ?

বাচ্চারা অট্টহাস্যে হেসে উঠেছিল। কিন্তু এই ঘটনার পর কখনও সে কারো ছেলেকে 'বেটা' বলার সাহস করেনি। মোহনাকে দেখে বার বার 'বেটা' বলার ইচ্ছে হয়।

—রসপিরিয়ার কথা তোমাকে কে বলেছে?....বল বেটা।

দশ-বারো বছরের মোহনাও জানে, পাঁচকড়ি আধ-পাগলা লোক।....কে এর কাছে পেরে ওঠে! সে দূরে ময়দানে চরতে থাকা বলদের দিকে চেয়ে দেখে।

মৃদঙ্গিয়া কমলপুরের বাবুদের কাছে যাচ্ছিল। কমলপুরের নন্দবাবুর ঘরানায় এখনও মৃদঙ্গিয়ার দু-চারটে মিঠা কথা শোনা যায়। দু-এক বেলা ভোজন বাঁধা আছেই, মাঝে মাঝে রসচর্চাও শোনায় এখানে এসে। দু-বছর পর সে এই এলাকায় এসেছে। পৃথিবী খুব দ্রুত পাল্টাচ্ছে। ....আজ সকালে শোভা মিশিরের ছোট ছেলে পরিষ্কার বলেছে—তুমি কি বেঁচে আছো, নাকি ছ্যাচড়ামি করছো, মৃদঙ্গিয়া?

হ্যাঁ, এই বেঁচে থাকা কি বেঁচে থাকা? নির্লজ্জতা! ছ্যাচড়ামিরও সীমা থাকে।........গত পনেরো বছর ধরে সে গলায় মৃদঙ্গ ঝুলিয়ে গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়, ভিক্ষে চায়। .... ডান হাতের বাঁকা আঙুল মৃদঙ্গে বসে না মোটেই, মৃদঙ্গ বাজাবে কিসের! এখন তো, 'ধা তিও ধা তিও' বেশ কষ্ট করেই বাজে। অতিরিক্ত গাঁজা-সিদ্ধি সেবনে গলার স্বর বিকৃত হয়ে পড়েছে। কিন্তু মৃদঙ্গ বাজাবার সময় সে অবশ্যই বিদ্যাপতির পদাবলী গাইতে চেষ্টা করে। ফুটো ভাতিতে যেমন আওয়াজ বেরোয়, সে রকম আওয়াজ—সোঁ-স্ব........ সোঁ-স্ব।

পনরো-বিশ বছর আগেও বি[...] নামের কিছুটা চাহিদা ছিল। বিয়ে[...] যজ্ঞ-উপনয়ন, মুন্ডন-ছেদন ইত্যা[দি] কাজে বিদপাতিয়া মন্ডলীর ডাক [...] পাঁচকড়ি মৃদঙ্গিয়ার মন্ডলী সহ[...] পূর্ণিয়া জেলায় প্রচুর খ্যাতি অর্জ[ন] পাঁচকড়ি মৃদঙ্গিয়াকে কে না জানে! [...] জানে, সে আধপাগল। [...] বুড়ো [...] —হ্যাঁ, পাঁচকড়ি [...]ঙ্গিয়ার [...] সময় ছিল।

এই যুগেও মোহনার মত [...] আছে—সুন্দর, কমনীয় এবং [...] রসপ্রিয়া গানের প্রতি আগ্রহ [...] একটা রসপিরিয়া গাও নাগো, মৃদ[ঙ্গিয়া]

—রসপিরিয়া শুনবে? [...] শোনাবো। আগে বল, কে....!

—হে-এ-এ, হে-এ .... [...] বলদ পালাচ্ছে....! একজন রাখাল [...] থাকে—ওরে মোহনা, পিঠের চামড়া [...] নেবে, করমু!

—অ্যাই বাপ!—মোহনা পা[...]

গতকালই করমু ওকে সা[...] পিটেছে। বলদ দুটোকে সবুজ-[...] পাট ফসলের গন্ধ বার বার টেনে [...] যায়।........টর্কামণ্টি পাট।

পাঁচকড়ি হেঁকে বলে—[...] এখানে গাছের ছায়ায় বসছি। তুমি [...] তাড়িয়ে এসো। রসপিরিয়া শুনবে [...]

মোহনা যাচ্ছিল। সে ফিরে [...] না।

রসপ্রিয়া।

বিদ্যাপত নাচিয়েরা রসপ্রিয়া গা[...] মহারসার যোগেন্দ্র ঝা একবার [...] পতির বারোটা পদাবলী নিয়ে

ন্তকা ছাপিয়ে ছিল। মেলায় বেশ
ত হয়েছিল রসপ্রিয়া পুঁথির। বিদা-
নাচিয়েরা গেয়ে গেয়ে জনপ্রিয়া করে
ছিল রসপ্রিয়াকে।

ক্ষেতের আলে বুনো জামগাছের
য় পাঁচকড়ি মৃদঙ্গিয়া বসে আছে।
নার পথ দেখছে।....জ্যৈষ্ঠের চড়া
রে ক্ষেতে কাজ করা মুনিষরাও এখন
গায় না। কিছুদিন পর কি কোকিল
ন করতে ভুলে যাবে। এমন দুপুরে
চাপ কি কাজ করা যায়! বছর পাঁচ
গও লোকদের মনে আনন্দ-উৎসাহ
। প্রথম বর্ষায় ভেজা ধরিত্রীর বুকে
ময় চারা গাছ থেকে এক বিশেষ
নর গন্ধ বেরোয়। তপ্ত দুপুরে
মর মত গলে ওঠে—রসের ডালি।
গাইত বিরহা, চাঁচর, লগনী।
ত কাজ করতে করতে গাওয়া গীতও
-অসময়ের খেয়াল রেখে গাওয়া হত।
ষম বর্ষায় বারোমাসা, খাঁখড়ে রোদে
হা, চাঁচর আর লগনী—

রে, হল জোতে হলবাহা ভৈয়া রে!....
পী রে চলাবে....ম-জ-দু-র!
শেথ, ধানী মোরা হে রসলিয়া!'....

ক্ষেতে কাজ করা হলবাহক এবং
দের কোন বিরহী জিজ্ঞেস করে,
স্বরে—তার রসিক অভিমানী
কে এই পথে যেতে দেখেছো কেউ?
এখন দুপুর নীরস কাটে, কোন
া কাছে একটা শব্দের অবশেষ নেই।
আকাশে চক্কর কাটতে কাটতে চিল
করে ওঠে—টি-ই-হি-ক।

মৃদঙ্গিয়া গালাগালি দেয়—শয়তান!
তাকে ছেড়ে মোহনা দূরে পালিয়ে
। সে আতুর হয়ে প্রতীক্ষা করে।
য়, দৌড়ে তার কাছে গিয়ে ধাঁকিব
দূরে চরতে থাকা গরু-বলদের দলকে
ার অর্থহীন দেখার চেষ্টা করে। সব
যায়।

সে তার ঝুলি হাতড়ে দেখে—
আছে, মুড়ি আছে। তার ক্ষিদে
। মোহনার শুষ্ক মুখমণ্ডল মনে
যায় সঙ্গে সঙ্গে, তার ক্ষিদেও মিটে
।

মোহনার মত সুন্দর, সুশীল
কের খোঁজেই তার জীবনের অধিকাংশ
কেটেছে। বিদাপত নাচে নাটুয়ার
সন্ধান সামান্য ব্যাপার নয়। সবর্ণ
ই কেবল নয়, নীচু জাতের লোকেদের
মোহনার মত গোরেলি মুখের ছেলে
চর জন্মায় না। এরা অবতার গ্রহণ
সময়ে-অসময়ে, যদা যদা হি....

মৈথিল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও রাজ-
দের মাঝে বিদাপতঅলায়ের দারুণ
ান হত। নিজের ভাষায়—অর্থাৎ
লা-এ নাটুয়ার মুখ থেকে 'জনম
হম রূপ নিহারল' শুনে তারা
হয়ে পড়ত। এই কারণেই প্রতিটি
নীর মূল গায়েন নাটুয়ার খোঁজে
গাঁয়ে ঘুরে বেড়াত—এমন ছেলে,

মাকে সাজিয়ে টাঙিয়ে নাচে নাবানোর সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের মাঝে ফিসফিসানি শুরু হয়ে পড়ে।

—ঠিক বানুন-দিদির মত মনে হচ্ছে। তাই না ?

—মধুকান্ত ঠাকুরের মেয়ের মত....

—নাহ্! একেবারে ছোট চম্পার মত মুখ।

পাঁচকড়ি গুণী লোক। অন্যান্য মণ্ডলীতে মূল গায়েন ও মৃদঙ্গিয়ার আলাদা আলাদা স্থান। কিন্তু, পাঁচ-কড়ি মূল গায়েন ছিল এবং মৃদঙ্গিয়াও। গলায় মৃদঙ্গ ঝুলিয়ে সে বাজাতে বাজাতে গাইত, নাচত। সপ্তাহ খানিক নতুন ছেলেকে তালিম দিয়ে 'প্রবেশে' নামার মত নাচ শিখিয়ে নিত।

নাচ ও গান শেখানোর ব্যাপারে তার কখনও অসুবিধে হয় নি, মৃদঙ্গের স্পষ্ট বোল শুনেই ছেলেদের পা আপনা-আপনি থির থির করে কাঁপতে শুরু করত। ছেলেদের জেদী মা-বাবার সঙ্গে বোঝাপড়া করা অসম্ভব শক্ত ব্যাপার ছিল। বিশুদ্ধ মৈথিলীতে আরও মধু মিশিয়ে সে তাঁদের ফুসলাত।

হ্যাঁ, কৃষ্ণ-কানাইও নাচতেন। নাচ যে একটা গুণ। আরে যাচক বলো বা দণ্ডধারী বলো। চুরি, ডাকাতি ও কাটছাঁটেপনার চেয়ে নিজের 'গুণ' দেখিয়ে লোকেদের সাহায্যে দিন কাটানো অনেক ভালো।
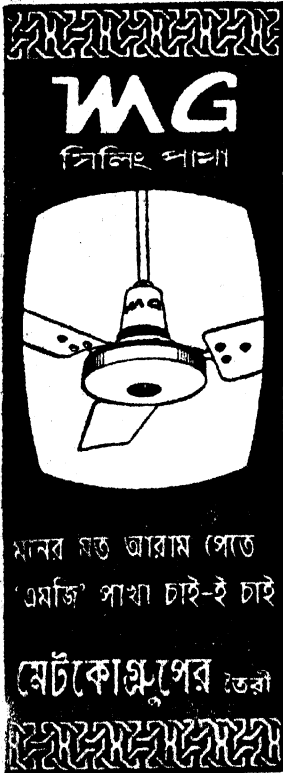
একবার অবশ্য তাকে ছেলে চুরি করতে হয়েছিল.......সে বহু পুরনো ঘটনা। এত মারধোর করেছিল যে, বহু পুরনো ঘটনা।

পুরনো বটে, তবে কথাটা খাঁটি। রসপিরিয়া বাজাবার সময় তোমার আঙুল বেঁকে গিয়েছিল। ঠিক কি না ?

মোহনা কখন ফিরে এসেছে।

মৃদঙ্গিয়ার চোখে-মুখে চমক ফিরে আসে। সে মোহনার প্রতি এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে, এই গুণী ছেলেটি নষ্ট হচ্ছে। লালচে ঠোঁটে বিড়ির কালো ছাপ পড়েছে। পেটে নিশ্চয়ই পিলে আছে।....

মৃদঙ্গিয়া বৈদ্যও। এক দল ছেলে-ছোকরার বাপ ধীরে ধীরে এক পারি-বারিক ডাক্তারের যোগ্যতা অর্জন করে ফেলে। উৎসবের বাসি-টাটকা ভোজ্যান্নের প্রতীকিয়া মাঝে-মধ্যে খুবই অশুভ হয়ে পড়ে। মৃদঙ্গিয়া নিজের সঙ্গে সর্বদা রাখত নমক-সুলেমানী, চাঁদমার পাঁচন এবং কুইনাইনের বড়ি। ছেলেদের সর্বদা গরম জলের সঙ্গে হলুদের টুকরো গেলাতো। পীপুল, কালো মরিচ, আদা ইত্যাদি ঘি-এ ভিজে মধুর সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যে জিভে ঠেকাতো........গরম জল!

ঝুলি থেকে মুড়ি আম বের করে মৃদঙ্গিয়া বলে—হ্যাঁ, গরম জল। তোমার পিলে বেড়ে গেছে। গরম জল খাবে।—

—তুমি জানলে কি করে? ফারবেশ-গঞ্জের ডাক্তারবাবুও বলছিলেন, পিলে বেড়ে গেছে। ওষুধ....

আর বলার দরকার নেই। মৃদঙ্গিয়া জানে, মোহনার মত ছেলেদের পেটের পিলে চিতায় গেলেই সারবে। কি হবে জিজ্ঞেস করে, কেন ওষুধপত্তর করছো না ?

—মাও বলে, হলুদের টুকরোর সঙ্গে রোজ গরম জল। পিলে সেরে যাবে।

মৃদঙ্গিয়া হেসে বলে—বড্ড সেয়ানা তোমার মা।

শুকনো কলার পাতায় মুড়ি ও আম বিছিয়ে গভীর স্নেহ কণ্ঠে বলে—এসো, এক মুঠো খেয়ে নাও।

—না, আমার ক্ষিধে নেই।

কিন্তু মোহনার চোখে থেকে-থেকে কেউ উঁকি মারছিল, মুড়ি ও আম এক সঙ্গে গিলে খেতে চাইছে। ক্ষুধার্ত, অসুস্থ ভগবান!

—এসো, খেয়ে নাও বেটা। রস-পিরিয়া শুনবে না ?

মা ছাড়া, আজ অব্দি অন্য কেউ মোহনাকে এমন আদর করে কখনও পাত সাজিয়ে ডাকে নি। কিন্তু অন্য রাখাল বালকেরা দেখে ফেললে মাকে বলে দেবে। ভিক্ষার অন্ন!

—না, আমার ক্ষিদে নেই।

মৃদঙ্গিয়া অপ্রতিভ হয়ে পড়ে। তার চোখ জোড়া আবার সজল হয়ে ওঠে। মোহনার মত ডজনখানেক বালকের সেবা মৃদঙ্গিয়া করেছে। আপন সন্তানকেও সম্ভবতঃ সে এত স্নেহ দিতে পারতো না।

.......আপন সন্তান! হুঁ!....আপ-পর? এখন সকলেই আপন, সকলেই

—মোহনা!

—কেউ দেখে ফেললে ?

—তাহলে কি হবে ?

—মাকে বলে দেবে। তুমি ভি-চেয়ে বেড়াও যে!

—কে ভিক্ষে চায়? মৃদঙ্গ-আত্মসম্মানকে এই সরল ছেলেটা অক-ঠেস দিয়েছে। তার মনের ঝাঁ-কুণ্ডলীকৃত ঘুমন্ত সাপ ফণা তু-ফোঁস করে। —অ্যাই শালা! মা-কষে এমন থাপ্পড় যে........

—এই! গালাগাল দিচ্ছ কে- মোহনা ভয়ে ভয়ে প্রতিবাদ করে। উঠে দাঁড়ায়, পাগলের বিশ্বাস কি?

আকাশে উড়ন্ত চিল আবার ডে-ওঠে—টিঁহি....ই....টিঁ....টি....ও।

—মোহনা! —মৃদঙ্গিয়ার কণ্ঠ গম্ভীর হয়ে পড়ে।

মোহনা একটু দূরে গিয়ে দাঁ-পড়ে।

—কে তোমাকে বলেছে, আমি ভি-করি? মৃদঙ্গ বাজিয়ে পদাবলি গে-লোকেদের আনন্দ দিয়ে পেট পালন ক-না, তুমি ঠিকই বলছো, ভিক্ষের অ-এটা। ভিক্ষের ফল এটা। আমি ে-না। তুমি বসো, আমি রসপ্রিয়া শোনা-

মৃদঙ্গিয়ার চেহারা ধীরে ধ-বিকৃত হতে থাকে। আকাশে উড়ন্ত-এখন গাছের ডালে এসে বসেছে।...-টিং-হিং টিং টিক্।

মোহনা ভয় পায়। এক পা দুই-দে দৌড়। সে পালায়।

কিছুটা দূরে গিয়ে সে চেঁ-বলে—ডাইনী বাণ মেরে তোমার আ-বেঁকিয়ে দিয়েছে। মিথ্যে বলছো-রসপিরিয়া বাজবার সময়।

—অ্যা! কে এই ছেলে? কে এ-মোহনা? রামপতিয়াও বলেছিল, ডাইনী বাণ মেরেছে।

—মোহনা?

মোহনা যেতে যেতে চেঁচিয়ে ওঠে—করলা!

আচ্ছা, তাহলে মোহনা এও জানে-মৃদঙ্গিয়াকে 'করলা' বললে ক্ষেপে যায়-কে এই মোহনা?

মৃদঙ্গিয়া আতংকিত হয়ে পড়ে। তা-মনে অজ্ঞাত এক ভয় ছেয়ে যায়। দে-থর থর করে কাঁপতে থাকে। কমলপুরে-বাবুদের কাছে যাবার উৎসাহ আর থাকে-না। সকালে শোভা মিশিরের ছেলে ঠিক-বলছিল।

তার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়াতে থাকে।

যেতে যেতে মোহনা ছোবল মে-যায়। তার অধিকাংশ শিষ্যও এরক-ব্যবহার করছে তার সঙ্গে। নাচ শেখা-পর ফুর্র্র্ করে উড়ে যাবার অজুহা-খোঁজা, প্রতিটি ছেলের কথা তার মনে-আছে।
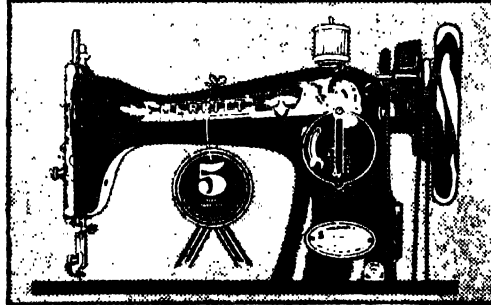
সোনমা তাকে গালাগাল করেছিল—অসুরগিরি করে, চোট্টা কোথাকার।

রামপতিয়া আকাশের দিকে হাত তুলে বলেছিল—হে সূর্য। সাক্ষী থেকো। মৃদঙ্গিয়া ফুসলে আমার সর্বনাশ করেছে। আমার মনে কখনও চোর ছিল না। হে সূর্য ভগবান। এই দশ-দুয়ারী কুকুরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন গলে পচে....।

মৃদঙ্গিয়া তার বাঁকা আঙুল নাড়িয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস টানে। রামপতিয়া ?, জোধন গুরুজীর মেয়ে রামপতিয়া। যে-দিন সে প্রথম-প্রথম জোধনের মন্ডলীতে ঢোকে—রামপতিয়া সবে বারোয় পা রেখেছে। বালবিধবা রামপতিয়া পদাবলীর অর্থ সবে বুঝতে পারছিল। কাজ করার ফাঁকে সে গুণ গুণ করে—'নব অনু-রাগিনী রাধা, কিছু নাহি মানয় বাধা।' আট বছর ধরে তালিম পাবার পর যখন গুরুজী স্বজাতি পাঁচকড়ির সঙ্গে রাম-পতিয়ার চুমৌনার (বিয়ের) কথা তোলে, মৃদঙ্গিয়া তখন সমস্ত তালমাত্রা ভুলে যায়। জোধন গুরুর কাছে সে নিজের জাত লুকিয়ে রেখেছিল। রামপতিয়ার সঙ্গে সে মিথ্যে প্রেম করেছিল। গুরুজীর মন্ডলী ছেড়ে সে রাতারাতি পালিয়ে যায়। গাঁয়ে ফিরে এসে সে নিজের মন্ডলী গড়ে তোলে, ছেলেদের নাচ-গান শেখায় এবং আয়-উপার্জন করতে থাকে। কিন্তু সে মূল গায়েন হতে পারেনি কখনও। চিরদিন যে মৃদঙ্গিয়া থেকে যায়। জোধন গুরুর মৃত্যুর পর একবার গুলাব-বাগ মেলায় রামপতিয়ার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল। রামপতিয়া তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। পাঁচকড়ি স্পষ্ট জবাব দিয়েছিল কেন মিথ্যে ব্যাপার জুড়তে এসেছো ? কমলপুরের নন্দবাবুর কাছে যাওনা কেন ? আমায় কি বোকা ঠাউরেছ। এদিকে নন্দবাবুর ঘোড়া রাত বারোটায়। আর্তনাদ করে উঠেছিল রামপতিয়া—পাঁচু। চুপ করো।

সেদিন রাতেই রসপ্রিয়া বাজাবার সময় তার আঙুল বেঁকে যায়। মৃদঙ্গে 'আলাপ' সেরে সে 'প্রবেশে'র তাল বাজাতে থাকে। নাটুয়া যখন দেড়মাত্রা বেতালে প্রবেশ করে, তখন তার মাথা ঘুরে যায়। প্রবেশের পর নাটুয়াকে যে ঝাঁঝি দেয়—অ্যাই শালা। থাপ্পরে গাল লাল করে দেবো।......এবং রসপ্রিয়ার প্রথম চরণই ভেঙ্গে পড়ে। মৃদঙ্গিয়া তাল সামলাতে খুব চেষ্টা করে। মৃদঙ্গের শুষ্ক চামড়া জেগে ওঠে, ডানদিকের পুরে মুড়ি-খই ফুটতে থাকে, এবং তাল কাটতে কাটতে ক্রমশঃ তার আঙুল বেঁকে যায়। বাঁকা আঙুল।....পাঁচকড়ির মন্ডলী চির-কালের জন্য ভেঙ্গে পড়ে। ধীরে ধীরে এলাকা থেকে বিদ্যাপতির নাচ-ই উঠে যায়। এখন আর কেউ বিদ্যাপতির চর্চাও করে না। ....রোদ-জলে কাটানো, পাঁচকড়ির শরীর ঠান্ডা ছায়ায় আরাম পায়। বেকার জীবনে এই মৃদঙ্গ তর খুব কাজ দেয়। বেকারীর একমাত্র আশ্রয়—মৃদঙ্গ।

এক যুগ ধরে সে গলায় মৃদঙ্গ ঝুলিয়ে ভিক্ষে চাইছে—ধা তিও, ধা তিও।

সে একটা আম তুলে চুষতে থাকে—কিন্তু, কিন্তু....কিন্তু....মোহনা কি করে ডাইনীর কথা জানতে পারল ?

আঙুল বাঁকা হবার কথা শুনে রাম-পতিয়া দৌড়ে এসেছিল, ঘন্টার পর ঘন্টা আঙুল ধরে সে কাঁদতে থাকে—হে সূর্য, কে এত বড় শত্রুতা করল ? তার মন্দ হোক। ....আমার কথা ফিরিয়ে দাও ভগবান। রাগের মাথায় কি বলে ফেলেছি। না, না। পাঁচু আমি কিছু করিনি। নিশ্চয় কোন ডাইনী বাণ মেরেছে।

মৃদঙ্গিয়া অশ্রু মুছে ঢলে পড়া সূর্যের দিকে তাকায়।...এই মৃদঙ্গ বুকের মাঝে জড়িয়ে রামপতিয়া কত রাত কাটিয়েছে।.... মৃদঙ্গকে সে বুকে জড়িয়ে ধরে।

গাছের ডালে বসা চিল উড়তে উড়তে নীচের জনকে কিছু বলে—টিং-টিং-হিংক।

—অ্যাই শালা।—সে চিলকে গালা-গাল দেয়। খৈনি ডলে মুখে রেখে, তারপর মৃদঙ্গের পুরে আঙুল নাচাতে শুরু করে—ধিরি নাগি, ধিরি নাগি, ধিরি নাগি, ধিনতা।....

পুরো আলাপটাও সে বাজাতে পারে না; মাঝখানেই তাল ভেঙ্গে যায়। অ-কি-হে-এ এ-এ হা—আ আ—হ-হা।

সামনে বুনো ঝাড়ের ওপারে কেউ কেউ সুরেলা কন্ঠস্বরে, মহাসমারোহে রস-প্রিয়ার পদাবলী তোলে।

'ন-ববৃন্দা-বন, ন-ব তরু-গণ,
ন-ব-ন-ব বিকশিত ফুল।...

মৃদঙ্গিয়ার গোটা শরীরে লহমায় স্রোত বয়ে যায়। তার আঙুল আপনা-আপনি মৃদঙ্গের পুরে কাঁপতে থাকে। গরু-বাছুরের পাল দুপুরের নেমে আসা ছায়ায় এসে জড়ো হতে থাকে।

মাঠের জন-মজুররা বলে—পাগল। মন যেখানে চায়, বসে বাজাতে থাকে।

—অনেকদিন পর ফিরেছে।

—আমি ভেবেছিলাম কোথাও মরে-টরে মিশে গেছে।

রসপ্রিয়ার সুরেলা রাগিনী তালে এসে কাটে। মৃদঙ্গিয়ার পাগলামী হঠাৎ থেমে যায়ই সে উঠে দাঁড়ায়। ঝোপ-ঝাড়ের ওপারে কে ? কে এই শুদ্ধ রসপ্রিয়া গায়ক ? এই যুগে রসপ্রিয়ার রসিক....? ঝোপের আড়াল থেকে মৃদঙ্গিয়া দেখে, মোহনা তন্ময় হয়ে দ্বিতীয় পদ তৈরী করছে। গুন-গুনানি থামিয়ে গলা পরিষ্কার করে। মোহনার গলায় রাধা এসে হাজির।....কি অপূর্ব।

'ন-দী বহ নয়নক নী....র।

আহো....পলাকি বহয়ে তাহি তী....র।'

মোহনা বিভোর হয়ে গাইছে। মৃদঙ্গের বোলে সে মাথা নাড়িয়ে গাইছে।

মৃদঙ্গিয়ার চোখ একদৃষ্টে তাকে লক্ষ্য ক
এবং তার আঙুল চরখীর মত নাচায়
ব্যাকুল হয়ে পড়ে।....চল্লিশ বছরের অ
পাগল লোকটা একযুগ পরে ভাবাবেশে না
থাকে। থেকে-থেকে সে নিজের বি
কন্ঠস্বরে দোহার দেয়—ফোঁয়-ফে
সোঁয়-সোঁয়। ধিরি নাগি ধিনতা।

'পুহু রস ম..য় তনু গুণে নাহি ও

লাগল দুহুক ন ভাঙ্গয় জো-ড়।

মোহনার আধো-কালো আধো-
ঠোঁটে নতুন হাসি খেলে যায়। পদ স
করে বলে—ইস্। বাঁকা আঙুলে
তেজ ?

মোহনা হাঁফাতে থাকে। তার
হাড়।

—ওফ্। মৃদঙ্গিয়া ধপাস্ করে মা
বসে পড়ে—কামাল। কামাল।...কার
শিখেছ ? কোথায় শিখেছ তুমি পদাব
কে তোমার গুরু ?

মোহনা হেসে জবাব দেয়—
আর কোত্থেকে ? মা রোজ গান...
আমার ভাল মনে আছে, কিন্তু এখন
সময় নয়।

হ্যাঁ বেটা। বেতালায় কখনও
না, বাজাবে না। যা কিছু শিখেছো
নষ্ট হয়ে যাবে।...সময়-কুসময়ের
রেখো। নাও এখন আম খাও।

মোহনা নিঃসঙ্কোচে আম
চুষতে থাকে।

—আরেকটা নাও।

মোহনা তিনটে আম খায়
মৃদঙ্গিয়ার বিশেষ আগ্রহে ... মুলো
চিবোয়।

—আচ্ছা, এবার একটা কথা
মোহনা, তোমার মা-বাবা কি করেন ?

...বাবা নেই, একা মা আছে।
বাড়ীতে ধান-চাল কোটা-পিষা করে।

—তুমি কাজ কর ? কার কাছে

—কমলপুরের নন্দবাবুর ওখা

—নন্দবাবুর ওখানে ?

মোহনা জানায়, তার যখ
বছর তিনেক আগে সমস্ত গ্রাম ক
পেটে চলে যায়। তখন তার মামা
নিয়ে নিজের মামাবাড়ীতে চলে
কমলপুর।

—কমলপুরে তোমার মায়ে
থাকেন ?

মৃদঙ্গিয়া কিছুক্ষণ চুপচাপ
দিকে তাকিয়ে থাকে।....নন্দবাবু
....মোহনার মা।

—ডাইনীর কথা তোমার মা

—হ্যাঁ। একবার সামদেও
ওখানে পৈতের তুমি

দর মৃদঙ্গ কেড়ে নিয়েছিলে।.... বাজিয়েছিল। ঠিক কিনা ?

দাঙ্গিয়ার মিশ্রেল দাড়ি সহসা যেন য় পড়ে। সে নিজেকে সামলে নিয়ে করে—তোমার বাবার নাম কি ?

-অজোধা দাস।

-অজোধা দাস ?

ড়ো অজোধা দাস, যার মুখে না না চোখে ধারা।....মন্ডলীতে -পুটলী বইত। বিনে পয়সার চাকর, অজোধা দাস।

—বেশ সেয়ানা তোমার মা।—স ফেলে মৃদাঙ্গিয়া ঝুলি একটা ছোট বটুয়া বের করে। লাল-কাপড়ের টুকরো খুলে কাগজের পুরিয়া বের করে সে।

মাহনা চিনে ফেলে—লোট ? কিগো,

—হ্যাঁ, নোট।

—কত টাকার নোট ? পাঁচ টাকার। শ টাকার ? একটু ছুঁয়ে দেখতে কোথেকে এনেছ ?—মোহনা এক সে সব কিছু জিজ্ঞেস করে—সব দশ নোট ?

—হ্যাঁ, সব মিলিয়ে চল্লিশ টাকা —মৃদাঙ্গিয়া ইতঃস্তত দৃষ্টি বুলোয়। ফিসফিসিয়ে বলে—মোহনা বেটা, গাঁয়ের ডাকতারবাবুকে দিয়ে ভালো লিখিয়ে নিও। ভালমন্দ পথ্য ...গরম জল নিশ্চয়ই খেও।

—টাকা আমাকে দিচ্ছ কেন ?

—তাড়াতাড়ি রেখে দে, কেউ দেখে।

মোহনাও একবার চারদিকে দৃষ্টি ঠোঁটে কালসিটে আভা আরও গভীর ড়ে।

মৃদাঙ্গিয়া বলে—বিড়ি-তামাক খাস ? র।

সে উঠে দাঁড়ায়।

মাহনা টাকাটা নেয়।

ভাল করে খুঁটে বেঁধে নে। মা-কে বলবি না।

—আর শোন, এটা কিন্তু ভিক্ষের নয়। বেটা, এ আমার উপায় করা টাকা। উপার্জনের।...

মৃদাঙ্গিয়া যাবার জন্য পা বাড়ায়।—মা মাঠে ঘাস কাটছে। চলো না—া আগ্রহ প্রকাশ করে।

মৃদাঙ্গিয়া থেমে পড়ে। কিছু ভেবে বলে—না মোহনা। তোমার মত ছেলে পেয়ে তোমার মা মহারানী... যে মহাভিখারী দশ-দুয়ারী। যাচক। ওষুধ কিনে যে পয়সা থাকবে, তা দুধ খেও।

মোহনার ডাগর চোখ জোড়া কমল-পুরের নন্দবাবুর চোখের মত।....

—মো-হ-না-রে-এ। বলদ কোথায় রে ?

—তোমার মা ডাকছে হয়তো—

—হ্যাঁ। তুমি বুঝলে কি করে ?

—রে-মোহনা রে-এ।

একটা গাভী সুরে সুর মিলিয়ে বাছুরকে ডাকে।

গরু-বলদের ঘের ফেরার সময় হয়েছে। মোহনা জানে, মা বলদ হাঁকিয়ে নিয়ে আসছে। মিছিমিছি তাকে ডাকছে। সে চুপ থাকে।

—যাও।— মৃদাঙ্গিয়া বলে—মা ডাকছে। যাও।....এবার থেকে পদাবলী নয়, রসপ্রিয়াও নয়, আমি শুধু নির্গুণ গাইবো। এই দেখো, আমার আঙুল সোজা হচ্ছে। শুধ রসপ্রিয়া কে গাইতে পারে আজকাল !

'আরে, চলুমন, চলুমন—

সসুরার যাইবে হো রামা,

কি আহো রামা,

নৈহর মে আগিয়া লগায়ব রে—কী।'

মাঠের আলপথ ঝোপঝাড়ের মাঝ দিয়ে বয়ে যায়। নির্গুণ গাইতে গাইতে মৃদাঙ্গিয়া ঝোপঝাড়ের আড়াল হয়ে পড়ে।

—ওমা। এখানে একা একা কি কি করছিস ? কে বাজাচ্ছিল মৃদঙ্গ ?—ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে মোহনার মা দাঁড়িয়ে থাকে।

—পাঁচকড়ি মৃদাঙ্গিয়া।

—অ্যাঁ, সে এসেছে ? এসেছে সে ? —তা মা বোঝা মাটিতে ফেলে জিজ্ঞেস করে।

—আমি তার তালে-তালে রসপিরিয়া গেয়েছি। বলছিল, এত শুধ রসপিরিয়া আজকাল আর কে গাইতে পারে।....তার আঙুল এখন ঠিক হয়ে যাবে।

মা অসুস্থ মোহনাকে আহ্লাদে বুকে জড়িয়ে ধরে।

—কিন্তু তুমি সে সবসময় তার নামে গাদাগাদা অভিযোগ করতে, বেইমান, গুরুদ্রোহী, মিথ্যেবাদী।

সত্যিই তো। এমন লোকেদের সঙ্গত ভালো নয়। খবরদার, ওর সাথে কখনও যদি যাস। দশদুয়ারী যাচকের সঙ্গে মেলামেশা করলে নিজেরই লোকসান হয়।....চল, বোঝা তোল।

মোহনা বোঝা তোলার সময় বলে—যাই বলো না কেন, গুণী লোকের সঙ্গে রসপিরিয়া....

—চোপ। রসপিরিয়ার নাম নিবিনা।

আশ্চর্য এই মা। রাগলে পরে একেবারে বাঘিনী, আবার যখন খুশী হয়, গরুর মত হাম্বা-হাম্বা করে বুকে জড়িয়ে ধরে। তাড়াতাড়ি খুশী, তাড়াতাড়ি রাগ।....

দূর থেকে মৃদঙ্গের শব্দ আসে—ধা তিঙ, ধা তিঙ।

মোহনার মা মাঠের উবর-খাবর পথ ধরে হাঁটছিল। ঠোকর খেয়ে পড়তে পড়তে রক্ষে পায়। ঘাসের বোঝা পড়ে গিয়ে খুলে যায়। পেছনে মোহনা ঘাড় নত করে যাচ্ছে। বলে—কি হয়েছে মা ?

—কিছু না।

—ধা তিঙ, ধা তিঙ।

মোহনার মা মাঠে পথের উপর বসে পড়ে। জ্যৈষ্ঠের বিকেলের দিকে যে পুব-বাতাস বয়, ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে পড়ে।... মাটির সোঁদা সুগন্ধ বাতাসে ঢুকে পড়ে ক্রমশঃ।

—ধা তিন, ধা তিন।

—মৃদাঙ্গিয়া আরও কিছু বলছিল নাকি, বেটা ? —মোহনার মা আর কিছু বলতে পারে না।

—বলছিল তোমার মত গুণী ছেলে পেয়ে তোমার মা মহারানী, আমি যে দশ-দুয়ারী..।

—মিথ্যুক বেইমান।—মোহনার মা অশ্রু মুছে বলে—এমন লোকেদের সঙ্গে কখনও সঙ্গত করবি না।

মোহনা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

অনুবাদ—সুবিমল বসাক

কৃতজ্ঞতা : আবহ ।। কলকাতা
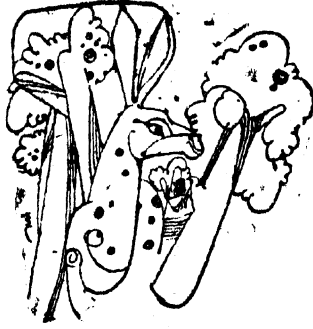
বনবিবি উপাখ্যান

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

।।ছয়।।

এর পর এক এক করে সাতটা দিন ঝড়ের বেগে বয়ে গেছে এই মুষ্ঠিমেয় লোকগুলির উপর দিয়ে। একে একে সংক্রামিত হয়েছে বসন্ত। জল হাওয়ার ভাঁজে ভাঁজে বসন্তের বীজ ছড়িয়ে পড়েছে। যেখানে ছোঁয়া লাগছে, সেখানেই যেন গুটি বসে যাচ্ছে। প্রথমে গুটি পরে রোগের অন্যান্য লক্ষণ।

ঈশানের কাছ থেকে সেই গুটি সংগ্রহ করল বিশু মিশ্র। শয্যা নিতে হল ওকেও। দিন দুয়েকের মধ্যে আরো কয়েকজন ঢলে পড়ল।

এর মধ্যে রজনী বা দয়াল ঘোষের অসাক্ষাতেই আর একটি ঘটনা ঘটে গেল। দ্বিতীয় দিন রাতে সকলের চোখে ফাঁকি দিয়ে ভেড়ির ওপর উঠে এল ছায়ামূর্তির মতো দুটো লোক। একজন মকবুল অন্যজন জগন্নাথ। পরস্পর মুখ চাওয়া-চাইয়ী করল কিছুক্ষণ, পরে ভেড়ির উপর থেকে নৌকার নোঙর টেনে তুলে কাদায় নেমে পড়ল দুজনে। তখনো ডিঙির নিচে অল্প কিছু জল। নৌকাটাকে ধাক্কা দিয়ে ভাসিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হল না ওদের।

আশ্চর্য! ডিঙির ভেতর থেকে এতটুকু শব্দ পেল না ওরা। কে জানে মরেই পড়ে আছে কিনা মেয়েটা। কিম্বা হয়তো নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে এখন।

সামান্য ধাক্কাতেই ডিঙিটা ভেসে গেল অনেকখানি দূরে। পরে পাক খেতে খেতে জোয়ারের টানে উত্তরমুখো ভেসে চলল।

শীতের বাতাসে রিরি করে কেঁপে উঠেছিল ওরা। তবু শীতের মধ্যেই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নৌকাটার দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। অবশেষে শ্লথ পায়ে ওরা ফিরে এল ডেরার দিকে।

গৌরী যেন অভিশপ্তা। এসে হাজির হয়েছিল এ উপকূলে। আবার ভেসে চলল অন্য কোথাও।

বিশু মিশ্র জ্বরের প্রকোপে ভুল বকতে শুরু করল। কার এমন বুকের পাটা ওর পাশে বসে ওকে সান্ত্বনা দেবে, সেবা করবে। যে যার নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত এখন।

দয়াল ঘোষ কলকাতায় ছোটকর্তার কাছে খবর পাঠালেন। চিঠিতে তিনি বিশেষ করে পরিস্থিতির কথা লিখে জানালেন। জানালেন, তিনি এ অবস্থায় ছোটকর্তার নির্দেশের জন্যই অপেক্ষা করবেন। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে তাঁর নিজের পক্ষে কোন সিদ্ধান্তেই পৌঁছন সম্ভব নয়। বন সাফাইয়ের কাজ পুরোপুরি বন্ধ রাখতে হয়েছে এখন। এই ছোঁয়াচে রোগের দাপট না কমলে কাজের কথা মুখে আনা সম্ভব নয়।

রজনীর বিক্ষোভ ক্রমশ বাড়তে শুরু করল। দয়াল ঘোষের বুদ্ধির দৌড়েই আজ এ অবস্থা।

—তখনই বলেছিলাম, ডিঙিটা ভাসিয়ে দেই, শুনলেন না। এখন সামলান আপনি। কেউ যদি মারা যায় দায়িত্ব আপনার।

দয়াল ঘোষের মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া গতি নেই। যা ঘটবার তা ঘটবেই। এখন কি করলে বাঁচা যায় সে কথাই ভাবা উচিত সকলের।

রজনী বলল, আমাদের কথা শুনুন, এখনো বাঁচার উপায় আছে।

—কি কথা?

রজনী পরিষ্কার গলায় বলল, কাঠ বোঝাই নৌকা দুটো খালি করার হুকুম দিন আগে। তারপর—

—তারপর?

—তারপর ওতে করে সটান ক[...] চলুন যদি বাঁচতে চান।

—পালাব! দয়াল ঘোষ এক[...] ভাবলেন, আবাদের কি হবে?

—চুলোয় যাক আপনার [...] প্রাণে বাঁচলে তবে তো আবাদ।

দয়াল ঘোষের মনে হল, রজন[ী] অপমান করতে চাইছে। রোগের ভয়ে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার মতো মানু[ষ] মন। গলার ঝাঁঝ মিশিয়ে বললে[ন] তো তোরা যেতে চাস যা। আমি থাকব এখানে। পাহারা দেব।

—আপনার মাথা খারাপ হয়ে[...] রজনী দয়াল ঘোষের চোখের ওপ[র] তুলে কথা বলল।

মকবুল এক পাশে দাঁড়িয়ে[...] বোঝাবার চেষ্টা করল, আজ [...] বিশুকেই ধরেছে, কাল যখন [...] ধরবে! আমাদের কথা রাখুন দ[...] চলুন এক সঙ্গে আমরা ফিরে যাই।

—আমি তো বলেছি, আমি [...] যেতে পারি না। এতগুলি রুগী [...] জঙ্গলের মধ্যে ফেলে স্বার্থপর হয়ে [...] পারি না। তোরা যেতে চাস যা।

দয়াল ঘোষের কথায় যুক্তি [...] তবু প্রাণের মায়া বড় মায়া। মকবু[ল] করে গেল।

চতুর্থ দিন বিশু মিশ্র মা[...] সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দ্বীপটাই যেন [...] করে ফাঁকিয়ে উঠল। খবরের কার[...] ভিতরে শিহরণ শুরু হল। দয়াল [...] এত সহজেই যে এ[...] লোক ম[...] পারে, কে ভেবেছিল। শেষ [...] চৌধুরীদের আবাদ করতে এসেই [...] মারা গেল। রজনী কোথায়, রজনী[...]

গজল মাঝি মাথা নিচু করে [...] ছিল, আঙুল তুলে ভেড়ির দিকটা [...] দিল।

দয়াল ঘোষ পাগলের মতো [...] দিকে এগিয়ে এলেন। জোয়ারের [...] ফেঁপে ফুলে একাকার হয়ে আছে [...] ঘাটের দিকে কে ওরা! দয়াল ঘোষ [...] হাজার বারোশ'-মনী নৌকো দুটো [...] কয়েকজন চলাফেরা করছে। [...] নৌকো দুটো কাঠে বোঝাই হয়ে [...] কাঠগুলি কি আবার ওরা নামা[...] করছে! তবে কি দয়াল [...] নিয়েই আর এক ধাপ এগিয়ে গে[...] একটা কিছু ষড়যন্ত্র চলছে! [...] অসুবিধা হল না দয়াল ঘোষে[র] চড়াৎ করে রক্ত ছড়িয়ে পড়ল [...] দুটোর কাছাকাছি উনি এগিয়ে এ[...]

—কি হচ্ছে শুনি?

রজনী এগিয়ে এল, দেখ[...] পাচ্ছেন কি হচ্ছে॥

—বটে।

রজনী গলা নামিয়ে বলল, আগে ...বিন পরে জমিদারি। ছোটকর্তার কাছে ...ব বলব আমরা।

—আর রুগীদের কি হবে?

—দরকার হয় আলাদা নৌকোয় ওদেরও তুলে নেব। জঙ্গলের মধ্যে ওদের একা ফেলে যাবো না।

দয়াল ঘোষের মনে হল, পায়ের নিচে মাটি কাঁপছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল ওঁর। রজনী যেন অপমানের চাবুক কষিয়ে দিয়েছে ওর গায়ে। কিন্তু অবস্থা যা তাতে এখন এটুকু হজম করা ছাড়া উপায় নেই।

বিশু মিএগকে কবর দিতে দিতে বিকেল গড়িয়ে এল। কাঠুরেরা অত্যন্ত শান্তভাবে বিশুকে কবর দিয়ে এল জঙ্গলের ভিতর। মকবুল ভাঙা ভাঙা গলায় কোরানের বাণী উচ্চারণ করল ওর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে। বিশুর জন্য খোদার কাছে প্রার্থনা করল মকবুল।

রজনীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল। দয়াল ঘোষের মুখেও কোন শব্দ নেই। অসম্ভব চাপ অনুভব করছিলেন উনি বুকের ভেতর। বেশিক্ষণ এই দৃশ্যের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। সরে এলেন।

গোড় দেওয়ার কাজটুকু শেষ হওয়ার পর তার জেরটুকু চোখেমুখে অবসাদ হয়ে ছড়িয়ে রইল।

সমস্ত কিছুই এমন দ্রুত গতিতে ঘটে গেল যেন পূর্বাপর আর চিন্তা করার অবসর নেই কারো। না দয়াল ঘোষের, না রজনীর। প্রতিক্ষণেই এখন গায়ের চামড়ায় হাত বুলিয়ে দেখতে হচ্ছে, গুটি ধরা পড়ছে কিনা।

রজনী আবার ছুটে এল ভেড়ির কাছে। আর সময় নেই রে বাপু। যদি বাঁচতে চাস তাড়াতাড়ি হাত চালা। নৌকা খালি কর আগে।

ষষ্ঠ দিন সকালে দয়াল ঘোষ জানতে পারলেন, কাঠুরের সংখ্যা দশ-বারোজন কমে গেছে। কি করে কমল। পালাল। কি করে পালাল! কোন পথে পালাল! জঙ্গল ডিঙিয়ে নদী ডিঙিয়ে নির্ঘাৎ অন্য কোন আবাদের দিকে পালিয়েছে ওরা। হিংস্র জন্তু জানোয়ারেরও কি ভয় নেই লোক-গুলির। নদীর জলে ভুলেও তো পা ছোঁয়ায় না কেউ, ওরা পার হল কি করে। কোন সাহসে ওরা এত বড় বিপদের ঝুঁকি মাথাপ নিল। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন গোলমেলে মনে হল দয়াল ঘোষের।

কলকাতায় গিয়ে ছোটকর্তার কাছে এর একটা কৈফিয়ৎ দিতে হবে দয়াল ঘোষকে। কিন্তু উনি কি করবেন, লোকগুলি যদি নিজেদের ভালোমন্দ নিজেরাই বুঝে নেয়, ওঁর পক্ষে কি করার থাকে তাহলে!

মকবুল এসে গোপনে খবর দিয়ে গেল, এখনও যদি মত না পাল্টান দয়ালবাবু, একটা লোকও থাকবে না, সব পালাবে।

—পালাবে মানে? কোথায় পালাবে?

—শুনতে পেলাম, আগের লোকগুলি ঘোষবনের দিকে চলে গেছে।

—কিভাবে গেল? নৌকো পেল কোথায়?

—নদী সাঁতরেই পার হয়ে গেছে দয়ালবাবু।

—নদী সাঁতরে! অসম্ভব। ওপারে আর যেতে হবে না, তার আগে কুমিরের পেটেই যেতে হবে।

—এখানে থাকার চেয়ে নদীকেও ওরা নিরাপদ ভেবেছে দয়ালবাবু।

দয়াল ঘোষ কিছুক্ষণ থমকে রইলেন। তারপর মিয়োন গলায় শুধোলেন. তা আমাকে কি করতে হবে শুনি?

মকবুল কিছুটা আশায় আলো দেখতে পেল। কিছুটা আত্মসমর্পণ করার ভঙ্গিতে বলল, আমাদের বাঁচান দয়ালবাবু। আমরা আপনার ভরসাতেই এসেছি, আমাদের বাঁচান।

—বেশ তো তোরা যদি মনে করিস দ্বীপ ছেড়ে পালান ছাড়া আর কোন আশা নেই, তবে তাই কর।

—সেই ভালো দয়ালবাবু। আপাতত কিছুদিন এখান থেকে সরে থাকাই ভালো।

—বেশ, তাই বন্দোবস্ত কর। তবে রুগীদের এখানে ফেলে রাখা চলবে না। সবাইকে যদি সঙ্গে করে নিতে পারিস তবে আমি তোদের সঙ্গে আছি।

—সবাইকেই সঙ্গে নেব। নিশ্চয়ই নেব। মকবুল উৎসাহে ছুটে বেরিয়ে গেল রজনীর খোঁজে।

তারপর সপ্তম দিন ভোরবেলার ঘটনা। যে ডিঙি নিয়ে সপ্তাহে একদিন করে কাঠ-বোঝাই করে কলকাতার দিকে ছুটে যায় মাঝিরা, সেই ডিঙির ওপর একে একে সবাই উঠে বসল। ছইয়ের ভেতর বিছানা পেতে দেওয়া হল রুগীদের। বৈঠার অভাবে হাতে হাতে গরানের ডাল উঠল। দয়াল ঘোষ উঠলেন, রজনী উঠল. উঠল মকবুল, জগন্নাথ, গজল... একটা লোকও বাদ রইল না এখানে।

না, বাদ রইল না বললে ভুল হবে। জঙ্গলের ভিতর মাটির নিচে বিশু মিএগ এখন চিরকালের মতো ঘুমে মগ্ন।

দিন দুয়েক আগে হিসেব থেকে যে দশজন কাঠুরে কমে গেছে, তাদেরও আর খোঁজখবর করার কথা মনে পড়ল না এসময়।

অবেশেষে নৌকো দুটো জোয়ার আসার সঙ্গে সঙ্গে মাটি ছাড়ল। দুলুনি খেয়ে উঠল বেবাক মানুষ।

দয়াল ঘোষ কাছারি বাড়িটার দিকে অপলক তাকিয়ে রইলেন। কয়েকদিন ওটা নির্জনে অবহেলায় পড়ে থাকলে জঙ্গল এসে আবার ওকে গ্রাস করবে। আবার সহস্র-বাহু মেলে ভেড়ির গা অবধি এগিয়ে আসবে অরণ্য। কে জানে, আবার এখানে কোনদিন ফিরে আসতে পারবে কিনা দয়াল ঘোষ! যদি আবার কোনদিন উনি দলবল নিয়ে ফিরে আসেন, শুরু করতে হবে প্রথম থেকে। এ যেন সত্যি সত্যি পরাজয় হল দয়াল ঘোষের। হ্যাঁ পরাজয় কথাটাই বার বার করে মনে আসছিল ওঁর।

আর বনের লতায় পাতায়, ঝোপে ঝাড়ে, খ্যাপা বাতাস যেন সত্যি সত্যি জয়ের উল্লাসে মেতে উঠেছে। যেন বলতে চাইছে, হেরে গেছে, হেরে গেছে,....দুয়ো দুয়ো.... ঐ যাচ্ছে, পালিয়ে যাচ্ছে, দুয়ো........। সনসন, সনসন,........হা হা ....হিহি........ সমস্ত বনভূমিই জয়ের দমকে নৃত্য শুরু করেছে বলে মনে হল দয়াল ঘোষের।

বুড়ো বাসুকি নদীর বুকেও উল্লাস। বন্য হয়ে উঠেছে নদী। চটাস চটাস করে জিহ্বা মেলে ভেড়ির গা চেটেও যেন স্বস্তি নেই। ভেড়িটাকে ধ্বসিয়ে দিয়ে অরণ্যের সঙ্গে আবার গলায় গলায় মিতালী করতে চায় বুড়ো বাসুকি।

আর নৌকোদুটোর অবস্থা তখন করুণ, পালা পালা। জান বাঁচাতে চাস তো পালা। ঊর্ধ্বশ্বাসে বড় নদীর দিকে পালাতে শুরু করল নৌকো। পালাতে শুরু করল ছোবল খাওয়া মানুষগুলো।

(চলবে)

আলাপে তাল থাকে না, কিভাবে না কিভাবে যেন ছন্দ রক্ষা হয়। কথার উপর কথা; আশ্চর্য এক ছন্দ। সে তো দীর্ঘদিন হল। সময় দীর্ঘ এবং শ্লথ। এখন কথারা খুঁড়িয়ে হাঁটে। আলাপে আর ছন্দ নেই, সরগম বিচ্ছিন্ন হয়ে এখানে সেখানে। দুজন এখন বাক্যহীন। সরগমের ছায়া নিখোঁজ।

একজন ওঠে হাওড়া থেকে। গোমো প্যাসেঞ্জার। অল্প দূরত্ব অনেক সময়ে পার হয়। হরেকরকম মানুষ। ট্রেন যায় মেদিনীপুর বাঁকুড়া পুরুলিয়া হয়ে সানতালডি পেরিয়ে একটু ওধারে। রুখু সুখু নিভাঁজ মানুষ সব। ওর বেশ লাগে। নিরিবিলি ট্রেন, জায়গা অঢেল। এই ট্রেনে ওর কেমন বিদেশ যাচ্ছি বিদেশ যাচ্ছি মনে হয়। ও জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। গোটাকয় স্টেশন পর মৌরিগ্রাম থেকে উঠে আসে আর একজন। উৎসুক চোখে সে পরিচিত মুখ খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ ছেঁড়া রোদের মত উঠে আসবে আলো আঁধারি কামরায়। ওরা দুজন।

ওরা কেউ কোন দিন দূরে যায়নি। ওরা কেউ কোন দিন পাহাড় দেখেনি। মানুষ যাবে পুরুলিয়া, সানতাল-ডি, সেসব জায়গায় পাহাড় আছে। সেসব লাল মাটির দেশ, অরণ্য পাহাড়ের দেশ। আবার কোন কোন দিন—যেমন যে সময় শীতবুড়ি দমকা গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠায় কোত্থেকে এলোমেলো বাতাস উড়ে আসে, দিনরাত্রি প্রেমিকের ভাল-বাসা প্রেমিকার উষ্ণতা পায়— হাল্কা হাওয়ায় এক ঝাঁক মানুষ উঠে আসে। হয়ত সমুদ্রে ঘুরে এল বা সমুদ্রের দিকে। দুজন কখনো সমুদ্র দেখেনি, দেখা হয়ে ওঠে নি। দুজন একই রকম সোমবার যায় শনিবার ফেরে। একই স্টেশনে নামে না, একই স্টেশন থেকে ওঠে না। ওরা, নির্মাল্য আর কমলা।

—আমার নামটা যেন কেমন, ম্যাড়মেড়ে, ভাল লাগে না।

একদিন মেয়েটি একথা বলেছিল। এখন আর বলে না। দুজন নিশ্চুপে বসে থাকে। সাদামাঠা চেহারা আর চাকরীও। নামটা অনায়াসে ভাল রাখা যেত, ভাল হয়নি। কমলা ছোট্ট একটা গঞ্জের মত জায়গায় স্কুলের মাস্টার। নির্মাল্য বি ডি ও অফিস-এর ক্লার্ক।

—কাল রাতে জমকা শীত পড়েছিল, না!
—হুঁ, মেয়েটি নিশ্চুপ।

অতঃপর, 'জানো সেদিন যা হয়েছে না।'
—কি?

তেমন কিছুই নয়। কমলা মেয়েলি চাপল্যে বয়স্ক সারল্যে একটা সামান্য ঘটনা বর্ণনা করে যায়। যুবকটি হাসে—হাসতে চেষ্টা করে। পারে না। অদ্ভুত এক বিষণ্ণতায় ডোবে। আগে তো এ রকম ছিল না। এই রকম ভাবা যায় নি। কথা ছিল পুরবীর মূর্ছনায় অথচ আলাপেই ছন্দ ভেঙে যায়। সরগম ঠিক থাকে না।

ট্রেন দাঁড়িয়েছে কোন এক প্লাটফর্মে। চারদিক হঠাৎ বেজে উঠেছে অজস্র শব্দে। এখন কমলা উচ্ছল, দেখ দেখ। সে সরগম বাঁধতে চেষ্টা করে। নির্মাল্য সামান্য হাসে। ম্রিয়মাণ হাসি, বেশ। তেমন কিছুই না। কোন এক সদ্য বিবাহিত [illegible] দম্পতি মন্দ চরণে উঠে যাচ্ছে পাশের কামরায়। হলুদ ফুল সবুজ তোরঙ্গ—উদ্ধত পদক্ষেপ বিবাহিত মানুষটির। দুজনে যা দেখার দেখে একাগ্র দৃষ্টিতে। ট্রেন চলছে। নির্মাল্য সিগারেট ধরায়। আশপাশে নানারকম শব্দ মিলেমিশে চড়া সাংগীতিক পরিবেশ। ওরা আস্তে আস্তে কথা বলছিল। সেইসব কথার এই রকম—এইটা ভাল ওইটা খারাপ, এই রকম হওয়া উচিত, তুমি অন্যদের দেখ এইভাবে প্রাচীন কথাবার্তা নতুন ক[illegible] ব্যবহার করতে গিয়ে ওরা ব্যর্থ হয় কেনন[illegible] কমলার চোখে মুখে অবসাদ নামাচ্ছে। অ[illegible] মন্থরে দু চোখ জড়িয়ে আসছে। ক্লান্তি[illegible] কঠিন। নির্মাল্য নিশ্চুপ বাইরের মাঠ দেখতে থাকে। হাওয়ায় কমলার রুক্ষ চুল উড়ছে চুলের উপর ছিটকে আসা মিহি রো[illegible] কাঁপছে কাঁপছে। সে তন্দ্রাহত।

আমাদের বয়স কত হল? তোমা[illegible] আমার। সেই প্রথম পরিচয়ের দিনগুলো মনে আছে?—নির্মাল্যর এমন ভাবনার মা[illegible] কমলা ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়ে। চোখ [illegible] ঠিকঠাক হয়ে যায়, 'ঘুম এসেছিল, কি বল[illegible] ছিলে যেন?'

—নাহ কিছু না, তোমার বাড়িতে এখন গর মত...।

কথা শেষ করতে দেয় না কমলা, তো, রোজরোজ এক কথা জিজ্ঞেস কর ।?' ঝংকার দিয়ে ওঠে। তারপর সামান্য বতা, কাল একটা ছবি দেখলাম।

—কি বই?

কমলার উত্তরে নির্মাল্য বলে, 'ওহ আমি থছি।'

—বলনি তো, জান কাল অর্চনার সংগে া হয়েছিল, ওহ তুমি ওকে চেন না, এক- আলাপ করিয়ে দেব, একসংগে পড়তাম রা, অর্চনার ছেলেটা না কি সুন্দর ছে।

—হ্যাঁ...

—ও, না—। মাথা ঝুলে পড়েছে এক- শ। নির্মাল্যর চোখের উপর তুলতুলে নরম ।। ঘুম নয় নির্জন বিষাদ। নির্মাল্য ার ভিতর হাঁটছে। নিঃসংগ বহুদূরে।

ওর চুল পাতলা হয়ে এসেছে। কেমন ঘন রাশ চুল ছিল ওর। চোখে মুখে কেমন ন্ন বিষাদ। আমাদের বয়স কত হল, ার তোমার! কমলা ভাবনার ভিতর সঙ্গ হাঁটছে।

ওরা শনিবার এই ট্রেনে ঘরের দিকে র আসে। সোমবার যায়। এইভাবে প্রায় র চারেক হল। আরো অনেক আগে পরি- নির্মাল্য আরো অনেক দূরে চাকরীতে ল চেষ্টা চরিত্র করে কাছাকাছি আসা ছে। একসঙ্গে দেখা হয় ফেরা যায় আসা । এইটুকুই লাভ। প্রতিটি সপ্তাহে টি মাসে....গ্রীষ্মে বর্ষায়। এখন সব বলা শেষ হয়ে গেছে। নতুন কোন কথা । একই কথা কতবার বলা যায় সুতরাং নে ঝিমুনি আসে। নতুন কোন কথা, ঘটনা থাকলে ক্লান্তি আঁকড়ে ধরে শরীর। ই কথা—উপরঅলার প্রতি বিযোদ্গার, নৈতিক অস্বাচ্ছল্য। অনেক রকম ার শেষে দুজনের ঘরের কথা ব। চারটে চোখের ভিতর দুটো রক্ষ বিবার ঝলসে যাবে। বন্ধ বন্ধ্যা অনড় বতী কর্মহীন যুবক। বিষণ্ণতা নামে। কজন চলে যাবে অন্যজন জানালায় বসে। গে কামরার দরজায় এগিয়ে আসত াল্য, কখনো কখনো প্লাটফর্মে নেমে ত। এখন আর নয়। কমলা একা একাই মে যায়। এখন আর আগের মতন কেউ ই। জানালা দরজা বন্ধ হাল্কা আঁধারে স আছে দুজন। ওরা নৈঃশব্দে চারদিক ধর।

তারপর কোত্থেকে উড়ে আসল টাল- টাল হাওয়া টলতে টলতে ছুটে এল লো আঁধার ঘরে নৈশব্দ্য ভাংগাতে ভাংগাতে টফর্মের তির্যক ভঙ্গিমার গাছে ফুটল চারটে আরক্ত শিমুল। কামরার বুড়োটার যের চাদর উঠে গেল, উসখুসে হাত-পা ঠাং করতে লাগল রোদ্রে। সমুদ্রে থয়। সমুদ্র ফেরা মানুষের সংখ্যা কমে ল। আর শীত নেই। এই শীতটা চলে লে উদাসী হাওয়ার সঙ্গে ছুটে এল আর

—এই নির্মাল্য, কতদিন পরে দেখা, চিনতে পারিস?

—আরে অমল!

এক সময়ে অনেক বছর আগে আমরা একসংগে বড় হয়েছিলাম। এই রকম বড় হওয়া। একসংগে বর্ষা শরৎ কাটিয়ে শীত বসন্ত কাটিয়ে গ্রীষ্ম থেকে হেমন্ত পার হয়ে ধূ ধূ প্রসারিত মাঠে দৌড়তে দৌড়তে কে কোথায় ছিটকে গেছি বুঝতে পারিনি। প্রয়োজন হয়নি বোঝার। আমরা নিজেদের দেখতেই অতি ব্যস্ত। আজ অনেক দিন পর। এখন আর প্রয়োজন আছে কিনা আমরা জানি না কেউ তেমন। দেখা যাক।

—কি করিস?

—এল, এম, ই, টা পাস করেছিলাম কোন রকমে, হাতুড়ি পেটাই। এখন আমাদের শৈশবের কথা হবে। দুদ্দাড় শৈশব কৈশোরের। যৌবনেরও কিছু কিছু। আসলে শৈশবই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। তাই আমরা দুজন, আমি আর কমল যৌবনের কথা তেমন বলি না—দিন যাক তখন দেখা যাবে।

যাবি কোথায়, প্রতি সপ্তাহে আসিস?

—হুঁ, এখন আসি।

—এই ট্রেণেই?

—হ্যাঁ।

—বাহ্ বেশ ভাল হল।

অতঃপর কমলা মৌরিগ্রাম থেকে ওঠে। নতুন মানুষ দেখে কেমন লাগে। এ কেমন। কিরকম ধরণধারণ। কোমরে ঝুলে ঝুলে প্যান্ট আধময়লা শার্ট গায়ে ঘষটে চলা জীর্ণ চটি, মাথায় তেল পড়েনি কতদিন। শীতকালভর গায়ে খড়ি উঠেছিল, চামড়া খসখসে। কমলা দেখে, দাড়ি গোঁফের ভিতর দুটো চোখ জ্বল জ্বলে। কোন এক কারখানায় যেন কাজ করে এলোমেলো উদাসী মানুষটা।

—আলাপ করিয়ে দিই...।

এ উদাসী অথচ সতর্ক। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চারদিকে। বিচ্ছিন্ন সরগম একত্রিত হয় আবার। আলাপে ছন্দ ফিরতে থাকে। সজীব বাক্যরা চারদিকে খেলা করে। অমল উদ্- ভ্রান্তের মত কথা বলে। কত কথা। উজ্জ্বল উচ্ছল স্রোত। এমন স্রোতে কতকাল অব- গাহন হয়নি।

একদম ভাল লাগে না, ম্যানেজারটা যা- তা আরম্ভ করেছে, দেব কোনদিন চাকরী ছেড়ে, বুঝবে।
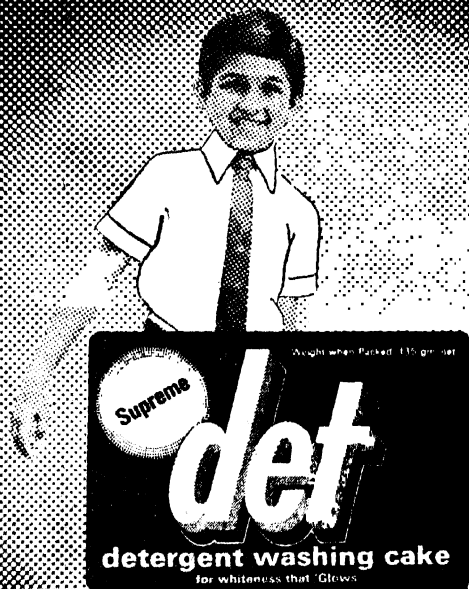
মুখ টিপে টিপে হাসতে হাসতে কমলা উচ্ছল হেসে ফেলে। মেঘের আকাশে আলো গলছে সন্ধ্যায়। নির্মাল্যও হাসছে। সব কেমন জোড়া লাগছে।

আচ্ছা ধরুন, এই ট্রেনটা যদি অসীম গতিতে কোথাও না থেমে একটা পাহাড় অরণ্যের ভিতর গিয়ে ক্লান্ত হয়ে ঝিমোয়, লোকালয়হীন জায়গা, ব্যাপারটা ভাবুন তো। সব কেমন জোড়া লাগছে। কামরার দরজায়, প্লাটফর্মে নেমে পড়ছে নির্মাল্য। কমলা হাত নাড়ছে। হাওয়ায় হাওয়ায় ওর আঁচল উড়ছে। কমলা চ'লে যাওয়ার পর দু'জনে আবার কথা বলছে; নির্মাল্য আর অমল।

—বিয়ে করছিস কবে?

—ঠিক নেই, সব গুছিয়ে উঠতে পারছি না, দেখা যাক কি হয়। নির্মাল্য আস্তে আস্তে কথা বলে। তারপর একটু থেমে মাথা তুলে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে অমলকে প্রশ্ন করে, 'তুই'?

অমল জানালা দিয়ে বাইরে চোখ মেলেছে। দূর বহুদূরে কালো ছায়ার মত গ্রাম, হাল্কা ধূসর পাহাড় রংয়ের ঝোপঝাড় উজ্জ্বল মেঘপালক এইসব।

বদ্ধ জলাশয়ে তরঙ্গ উঠেছে। শীত এখন বিলীয়মান। নির্মাল্য আর কমলা, দুজন কেমন চঞ্চল। বেশ লাগছে বেশ। সেই সেই দিনগুলোর মত। প্রথম কাছাকাছি আসার সময়ের মত। বুকের ভিতর আস্তে আস্তে তরঙ্গ উঠছে, কথায় কথায় আরক্তিম হয়ে উঠছে কমলা। আঙুলে আঙুলে হাতে হাত ঠেকে যাচ্ছে। হাল্কা হাওয়ায় ভাসছে দুজন। রোদের উপর পা ফেলে ফেলে দুজন উঠে যাচ্ছে কোথায়। এখন দু'জনের কত কথা। কথার ভিতর ডুবে যাচ্ছে কমলা।

'অদ্ভুত মানুষ, বাউন্ডুলে, কি রকম কথা বলে না।' মেয়েটি হাসতে থাকে।

'হ্যাঁ ছোট্টবেলা থেকে ও ঐ রকম'।

অমলকে নিয়ে কথা হয় দু'জনের।

'তোমার মত গোমড়ামুখো নয়।' কমলা নির্মাল্যর চুলে টান দেয়।

'অ্যা-ই'। দু'জন অন্যরকম হাসিতে চারদিক মুখর করে তোলে।

যা কথা হয় সব ঐ উড়নচণ্ডী মানুষটাকে নিয়ে। চারপাশের জানালা-দরজা খুলে গেছে। বাতাস খেলছে হু হু ক'রে। মন উড়ছে মন উড়ছে।

—হ্যাঁ সময় তো পেরিয়ে যাচ্ছে না, বিয়ে করলেই হ'ল...। কমলা আশ্বাস দেয়।

—শিখার বিয়েটা আর অভির চাকরীটা হয়ে গেলেই...। নির্মাল্য কমলাকে দেখে।

ছিল দু'জন। হ'ল তিনজন। একজন স্কুলে যায়, একজন বি, ডি ও অফিসে — গ্রামে গ্রামে কাজ। শেষজন যায় কারখানায়। কর্মস্থলের মানুষ ওদের চাঞ্চল্য বুঝে গেছে।.... কমলা এখন যেন বড় খুশী, এত পরিপাটী, এত চঞ্চল। কমলা এখন দর্পণে নিজেকে দেখে, সকাল সন্ধ্যায় নিজেকে সাজায়। তার বয়স কমে গেছে— কমলা কিশোরী। মনের আকাশে মেঘ, বর্ষার মেঘ এসেছে। বর্ষণ আরম্ভ হবে এখনই। উদ্দামতা আসছে দুকূল ছাপিয়ে। দু'জনের ভিতর কি যেন ঘটে গেছে। বাউন্ডুলে বাতাস হা-ঘরে জ্যোৎস্না সব কিছু অন্যরকম লাগছে। বুকের ভিতর আশ্চর্য অনুভূতি। সেই প্রথম দিনগুলোর মত। কমলা আলো, কমলা বাতাস, কমলা জল, কমলাই নির্মাল্যর পৃথিবী এখন।

এক একদিন তৃতীয়জন কিছু একটা করে বসে। দুম করে কমলাকে জিজ্ঞাস করে, 'গান জানেন গান?'

'নাহ্, ছবি আঁকার শখ ছিল শেখা হয়নি।' কমলা বিষন্ন।

'আপনি গান জানলে খুব ভাল হ'ত,' অমল মন্দ উচ্চারণে বলে।

কমলা সব বোঝে না কিছু বোঝে। নির্মাল্যও। অমল কখনো ত্বরিত কখনো মন্দ লয়ে কত কথা বলে। সারাদিন হেঁটে কোন পাহাড়ে ঝর্ণার খোঁজে গিয়েছিল সে। পাহাড়ের নাম বারিডুংরি, আর কি-কি সব, মনে নেই। পাহাড়ে পথ হারিয়েছিল। তারপর কিভাবে কোন কাঠুরে তাকে পথ দেখিয়েছিল। ঘন অরণ্যের রহস্যময়তা......সাঁওতালি গ্রাম। ওরা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখে এই বাউন্ডুলে মানুষটাকে।

এই মানুষটা পথ হারিয়েছিল একদিন। আমরা কোথাও যাইনি অথচ পাহাড় অরণ্য আমাদের স্বপ্নের ভিতরে আছে। আমরা দু'জনেই বুকের ভিতরে পাহাড়ের ছবি এঁকে নিই।

—জানেন সেবার দীঘার সমুদ্রের আশি মাইল ভিতরে......

এই মানুষটা মধ্যসমুদ্রে গহীন রাতে ইলিশ মাছ ধরা দেখেছে। এই মানুষটা সমুদ্র দেখেছে। আমরা কেউ পাহাড় সমুদ্র অরণ্য থেকে যোজন দূরেও থাকি না অথচ ওসব আমাদের দেখা হয়নি। এই মানুষটা এরই মধ্যে ভারত দেখে ফেলেছে, কোথায় নালন্দা কোথায় অজন্তা, পুরুলিয়ার কোন গ্রামে ছৌনাচের দল। ওরা বিষন্ন।

কমলা আর নির্মাল্য অনেক গল্প সল্প করে। তখন এই হবে ওই হবে, ওখানে যাব সেখানে যাব, কতদূরে! অনেক অ-নে-ক দূরে। সরগম বাঁধা হচ্ছে। ছন্দ ফিরছে। কোন এক সপ্তাহে অমলের সঙ্গে দেখা না হওয়ায় ওরা উত্কণ্ঠিত। ও কোথায়? কেউ কারো ঠিকানা জানে না। এত কাছাকাছি থাকলে ঠিকানা নেওয়া হয় না। অফিসে ছুটি নেই। কারোর অবসর নেই। অতঃপর দিনকুড়ি পরে এক সোমবার খররৌদ্রে পুড়ে সে উঠে আসল মধ্যের কোন এক স্টেশন থেকে। এক গাল দাড়ি, চোখমুখ উজ্জ্বল জ্বলছে।

—এতদিন ছিলি কোথায়?

—সে এক কাণ্ড বটে, অমল বসতে বসতে বলে।

—কি ব্যাপার আপনার, এই রকম ঝড়ে ভাঙা চেহারা? কমলা জিজ্ঞাসা করে।

অফিসে গোলমাল......।

অবাক কাণ্ড। সে ত্বরিতে সব বলে যায়। তাকে যুদ্ধ ফেরত সফল সৈনিকের মত দেখায়।

—কি ভাবে না কিভাবে যে দিন কেটে যাচ্ছে বুঝছি না, উষ্ণতার দিন এল, অসহ্য!

অমল প্রসঙ্গ বদলে ফেলে।

—কোন ফাঁকে বসন্তটা চলে যাচ্ছে আপনার, বুঝছেন? কমলা মুখ টিপে বলে।

—নাহ্, উষ্ণ রৌদ্রে ভেসে ঠিক একদিন আবার পৌঁছে যাব বসন্তে।

কি সব বলে, কমলা বোঝে না। বেশ লাগে। ওর চোখেমুখে যেন সমুদ্র পাহাড় অরণ্যের ছায়া। কমলা নির্মাল্যর কাছে অমলের গল্প করে। নির্মাল্য নিশ্চুপ। কথা আসে না মুখে। ভিতরে ভিতরে কথা বলে। বুকের ভিতরে একরকম ঝাঁঝালো আবহাওয়া তৈরি হয়। সেই সব নিঃসঙ্গ দিনগুলোই বোধ'য় ভাল ছিল। নিশ্চুপে কমলার নেমে যাওয়া, টুকরো টুকরো দিন যাপনের কথাবার্তা, উষ্ণতাহীন ভালবাসা। অমল এসে পড়ায় সব প্রথমত যেমন উজ্জ্বল মনে হয়েছিল এখন আর তা নয়। সহ্য হয় না এত উত্তাপ। এখন অমলকে যেন পাহাড় মনে হয়ই এই পাহাড় পেরিয়ে কমলার কাছে পৌছন! সে এক কঠিন পথ।

সুতরাং একদিন নির্মাল্য হুস করে বলে ফেলে কমলাকে, 'জান'?

—কি?]

—শিখার বিয়েটা বোধহয় এবার হয়ে যাবে, পছন্দ হয়েছে

—দীতাই।

—অভির অ্যাপ্রেনটিসশিপটাও।

আলাপ দ্রুতলয়ে শেষ হয়ে সুরের মূর্ছনা আরম্ভ হয়। পুরবীর মূর্ছনায় কমলা হুহু করে আঁচল উড়িয়ে দিল আকাশে। যুবকটি তার বুক নিয়ে ব'সে থাকে। এই সুখ কেমন বুক চাপা, কেমন যেন শিহরণ।। অস্পষ্ট বিঁধে থাকা কাঁটা সময়ে।

অতঃপর সেই দিন রৌদ্র খরতর। মেলার দিন। রোদে পুড়ে মাথা ঝিম ঝিম করে। বসন্তটা পুড়ে যাচ্ছে। গোটা পলাশ শিমুল কালিবর্ণ। চারদিক তেতে পুড়ে খাঁক হয়ে যাচ্ছে। হাওয়ায় হাওয়ায় আগুন। এক পুরুষের বুকে তপ্ত হাওয়া ঢুকে পড়েছে। ভিতরটা পুড়ে যাচ্ছে। নির্মাল্য চঞ্চল। তৃতীয় মানুষ পৃথিবীর উষ্ণতায় উষ্ণ হয়েছে, টান টান শরীর। সে আগের মতই উজ্জ্বল উচ্ছল। এ মেয়ে বুক চেপে হাসে। অমলের কথাবার্তা অনেকটাই শিশুর মত অনেকটাই প্রাজ্ঞজনেরা যেমন। এর মধ্যবর্তী কিছু নেই। নির্মাল্যকে কিছু বোঝা যায় না। কি যেন হয়েছে তার। এমন রুক্ষতা দেখেনি কোনদিন কমলা। এই রকম ভালবাসায় স্বস্তি আসে না। এক নির্জন দুপুরে তপ্তকণ্ঠে সে অনেক কথা বলে যায় কমলাকে। পুরু হয়ে বসে থাকে। কি যে রাগ ওর! উষ্ণ মাঠ পৃথিবীর সঙ্গে সেও পুড়ে গেছে। বুক কাঁপছে। হাত পা ঠিক থাকছে না। কি যে উষ্ণ ক্রোধ! সে কমলাকে ভালবাসতে চায়। কমলা ওকে নিবারণ করতে পারে না। থির থির থির থির কাঁপতে থাকে। বাইরের নিমগাছটায় নিঃসঙ্গ কাক ক্রমাগত ডেকে যায়। দুপুরটা অদ্ভুতড়ে হয়ে ওঠে। নির্মাল্যর চোখমুখ জ্বলছে কাঁপছে। ভালবাসার এক খেলার মেলা। তারপর একটা সময় আসে নৈঃশব্দ্যে ডুবে পাশাপাশি বসে আছে দুজন। শব্দ কোথায়! শব্দ নেই। পৃথিবীর স্বচ্ছতা লয়ের পথে যায়। অপরাহ্নের শেষ। স্তব্ধ পৃথিবী এ ঘরের বাইরে নিঃসাড়। অতঃপর শব্দ আসে। শব্দ নির্মাল্যর কণ্ঠস্বর। ক্রমে তার দুচোখ রক্তবর্ণ, কমলা আনত মুখে ব'সে। এমন তো হয়নি কোনদিন। এই রকম কঠিন শব্দ শুনতে হয়নি কোন দিন।

—'অমলকে আমি দেখতে চাই না আমাদের মধ্যে' নির্মাল্য টান টান ব'সে আছে। এমন লজ্জা এ মেয়ের আর কখনো হয়নি। মনের লজ্জা! মনের ভয়! কমলা ভয় পায়। মনের গহনে কোথায় কোন আঁধারে থির থির ভাসছে লম্বা ঝুল ঝুল প্যান্ট রুখুসুখু চুল একগাল দাড়ি নিয়ে এক বাউন্ডুলে মানুষ। কি রকম হাল্কা হাওয়ায় ভেসে আছে। কবে কখন কি ভাবে ঢুকে পড়েছে মনের নিভৃতে তা সে বোঝে না। জানে না। লজ্জায় সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে চায়। শ্লথ শরীরে ব'সে থাকে। রক্তিম অপরাহ্ন কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হয়। নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় জাগতিক সমস্ত স্বচ্ছতা।

যথারীতি আবার দেখা। কমলা পাথর। নির্মাল্য চঞ্চল অতঃপর হঠাৎ অমলকে ব'লে ওঠে, 'জানিস আমরা বিয়ে করছি'। কমলা স্থির চোখ নামিয়ে দেয় নিচের দিকে। আর অমল উচ্ছ্বাসে ফেটে প'ড়ে চাপড়ে দিল নির্মাল্যর পিঠ, 'ব্রাভো'। তারপর কমলা দিকে চেয়ে, 'তা অনুষ্ঠানটা হচ্ছে কবে?'

—এই তো এই বৈশাখের শেষে নির্মাল্য উত্তর দেয়

—যাহ্, তারপর কি কথা নেই যে মু... এবার দুজনে মোহানার দিকে ভাসলেন কমলা এ কথায় কুঁকড়ে যায় লজ্জায়, ভয়ে সে মাটির দিকে চেয়ে বিষন্ন হাসে।

—আর দেখা হওয়া কষ্টকর, আমার দুজনে ছুটী নিচ্ছি, ঠিকানাটা দে। বিয়ে চিঠি দেব।

—কেন? বিয়ের আগে কি আ... একবারও........

'না', কঠিন কণ্ঠে নির্মাল্য অমলকে থামিয়ে দেয়।

তৃতীয় মানুষ তখন থমকে গেছে জানালা দিয়ে রোদপোড়া আকাশ দেখ... আকাশ মাটি। কে কি ভাবছে এখন কেউ জানে না। কমলার আর দেখার সাহস নেই। নির্মাল্য নিস্তসাড় পড়ে যায়।

আমার আর সেইসব কথা শোনা হয় না। পাহাড় সমুদ্র কারখানার কথা। বাস ... ইঁলিশ ধরার গল্প। কিছুই শোনা হয় না। আমি বুঝছি না-বুঝছি না, কিন্তু বুঝছি না। কমলা ঠোঁট আর দাঁতে সকলের সামনে কথা চেপে থাকে। চোখের সামনে এক বন অরণ্য পুড়ে গিয়ে কঙ্কালসার চেহারা নিচ্ছে।

মন্থরে সময় যায়। একজন ওঠে ... পোকে। পোড়া প্যাসেঞ্জার। ... ওঠে ... সময় যায়। ... অসামঞ্জস্য। সেইজন্য ... পায় না এরা। ... তৃতীয় মানুষ রোদেশের আরম্ভে ... পরবর্তী জানালায় ব'সে থাকে। ... নিঃসঙ্গ মেয়ে যায়। কথাবার্তা আগের মত সীমায়িত। ভাল লাগে না অনেক কিছুই যেন ওরা হাসফাস করছে দাঁতের অন্তর্জনার পর। না। ওদের বিয়েটা এই বৈশাখে হয় নি। অভির অ্যাপ্রেনটিসশিপ, শিখার বিয়ে কোনটাই নয়। সবটাই নির্মাল্যর মনগড়া। জানালা দরজা বন্ধ ক'রে ওরা স্থির নিস্তরঙ্গ। হাওয়া খেলে না চারপাশে রোদ পোড়া চকচকে ট্রেনলাইন বেয়ে দুজন চলছে-চলছে। শুনো হাওয়ার দমকা ঘুর্ণি ওঠে। টকটকে শিমুলে পুড়তে পুড়তে একে একে ঝরে পড়েছে মাটিতে। এখন অমলকে মনে পড়ে দুজনের। তখনতো এমন ছিল না। মেয়েদের কষ্ট হয়। নির্মাল্যর বুকে শত কাঁটা বিঁধে আছে। তাই হঠাৎ কোন দিন কমলা যখন বলে ফেলে, 'ও বেশ ছিল না!' নির্মাল্য অনায়াসে মাথা হেলায়। চোখে আগের মত তন্দ্রা নামছে আস্তে আস্তে।

(৪৫)

কনস্টান্টিনোপল্। নভেম্বর। ১৯০০

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

আমি এখানে ভাল আছি। আশা করি তুমিও ডেট্রয়েটে ভাল আছো।

সতত তোমাদের বিবেকানন্দ

(৪৬)

Athens, November 1900

Great fun! I write without the possibility of being written to as I am ghanging (?) place all the time. How do pou do?

Vivekananda

(৪৭)

বেলুড় মঠ। হাওড়া জিলা।

বাংলাদেশ। ভারতবর্ষ। ১৯ ডিসেম্বর, ১৯০০

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

ইউরোপের অন্য পার থেকে একটি স্বর 'কেমন আছ?' আশ্চর্য হচ্ছ তো? সত্যি, আমি হলুম এক ঘুরে-বেড়ানো পাখী। আনন্দোচ্ছল ও বাক্যমুখর প্যারিস, বিষণ্ণ প্রাচীন কনস্টান্টিনোপল্, ছোট্ট উজ্জ্বল এথেনস্, পিরামিডময় কায়রো সব পেছনে ফেলে মঠে গঙ্গার ধারে আমার ঘরটিতে এসে পড়েছি। জায়গাটি এত শান্ত এবং......যে প্রশস্ত নদীটিও উজ্জ্বল সূর্যকিরণেও স্বপ্ন দেখছে। মাঝে মাঝে মালবাহী নৌকার বৈঠার আওয়াজ পাওয়া যায় জলের মধ্যে, নীরবতা ভঙ্গ করে।

এ-দেশের এটা শীতকাল কিন্তু দুপুরবেলাটা বেশ গরম হয়। সূর্যও খুব প্রখরোজ্জ্বল তখন।

দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ার শীতকালটাও এই রকম। চারিদিকে সবুজ ও সোনালী রংয়ের ছড়াছড়ি। মখমলের মত দূর্বাঘাস। বাতাস ঠাণ্ডা, শুষ্ক, মনোরম।

মাসকয়েক ভারতবর্ষে বিশ্রাম নিয়ে আগামী গ্রীষ্মে আর একবার ইংলণ্ডে যাবার ইচ্ছে। নিবেদিতা এখনও পৌঁছয়নি। আশা করছি শীঘ্রই আসবে। আমি কখনও ভ্রমণ, কখনও বিশ্রাম নিচ্ছি—চলছে একরকম। যতটা খারাপ ব্যাপার মনে করেছিলুম, ততটা নয়।

ভালবাসাসহ

বিবেকানন্দ

(৪৮)

বেলুড় মঠ, হাওড়া জিলা।

বাংলাদেশ। ৪ঠা এপ্রিল। ১৯০১

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

পরবর্তী কার্যপ্রণালী এমন আকর্ষণীয় মনে হল এবং ইদানীং উৎসাহ এত তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠল যে, আর বাক্যস্ফূর্তির জো থাকল না। মিসেস বুল্ তোমাকে একটি মিষ্টি চিঠি লিখেছেন জেনে খুশী হলাম। উনি একজন দেবদূত। তুমি

আনন্দে ও শান্তিতে আছ জানলাম। ভাল কথা। আমিও এখন সেইদিকে। শিগগীরি চন্দ্রনাথে তীর্থভ্রমণে যাচ্ছি। তোমার কাছ থেকে একটি চিঠির জন্য খুব উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি কিন্তু মনে হচ্ছে সে-চিঠি কখনও পাবো না। আমি সুখী হব নিশ্চয়ই। এত দুর্ভোগের পর তার সুফল আসতে বাধ্য। কাজের ফল তার নিজের নিয়মে আসবে, সময় নেবে। বুঝতে পারছি আমারই উৎসাহিত হওয়া উচিত—হচ্ছিও যতটা পারি। তুমিও তো আমাকে সাহায্য করতে পারো, মাঝে মাঝে সুন্দর সুন্দর চিঠি লিখে? করবে তো?

মার্গট ইংলণ্ডে খুব ভাল কাজ করছে মিসেস্ বুলের সাহায্যে। কাজকর্ম ভাল চলছে। আমি আজকাল ভাল ঘুমোচ্ছি, সাধারণ স্বাস্থ্যও খারাপ নয়।

চিরস্থায়ী ভালবাসা ও আশীর্বাদসহ

বিবেকানন্দ

পুঃ—মিসেস্ ওয়াল্‌ডোকে কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগের প্রকাশনার বিষয় জিজ্ঞাসা কোরো তো।

(৪৯)

বেলুড় মঠ। জিলা হাওড়া
বাংলাদেশ। ১৩ই মে। ১৯০১

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

গতকাল মঠে পৌঁছেছি। আজ সকালে তোমার ছোট্ট চিঠিটি পেলাম। তুমি নিশ্চয় ইতিমধ্যে আমার চিঠি পেয়ে গেছ এবং আশা করি 'সাইলেন্স ইন গোল্ড' এই কথাটার স্বাদ এবারে পেয়েছ।

আজ সকালে অনেক জায়গা থেকে সুন্দর সুন্দর চিঠি পেয়েছি এবং সেজন্য খুশীতে আছি। গত দু'মাস আসাম ও পূর্ববাংলার বিভিন্ন জায়গায় কাটিয়ে এলাম। এ-দেশের কল্যাণবরে পাহাড় এবং জলের দৃশ্য তুলনারহিত। হয় এই গ্রীষ্মে আমি ইউরোপ যাবো এবং সেখান থেকে যুক্তরাষ্ট্রে নতুবা তুমি ভারতবর্ষে আসবে। সে-বিষয় সমস্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 'মা' জানেন তিনি কী করবেন।

একটা বিষয় আমি নিশ্চিন্ত। খুব নিশ্চিন্ত এবং আশা করছি এই মনোভাব দীর্ঘদিন থাকবে এবং তুমি হবে আমার সবচেয়ে বড় সহায় ও ভরসা। হবে তো?

পরে চিঠিতে আরও লিখব। এখন কেবল এইক'টি লাইন। সেজন্য একশোবার মার্জনা চাইছি ছোট্ট চিঠি বলে। তবুও নীরবতা অজস্র বক্তৃতার চেয়ে অনেক সময় যথেষ্ট বেশি সরব।

ভালবাসা ও আশীর্বাদসহ
ঈশ্বরের চিরশরণাগত
তোমাদের বিবেকানন্দ

(৫০)

বেলুড় মঠ। জিলা হাওড়া
বাংলাদেশ। ভারতবর্ষ।
তারিখ ?]

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

তোমার অভিনন্দনপূর্ণ চিঠি এইমাত্র পেলাম। ক'দিন আগে একটি মূল্যবান ছোট কবিতাও পেয়েছি। ভাবছি আহা, তুমি যদি এই কবিতার রচয়িতা হতে। যাই হোক। আসলে আমরা অনেকেই অনুভব ঠিকই করি, কিন্তু প্রকাশ করতে পারি না। তার ওপরে এমন সব চিন্তা যা 'দেয়ার আর থটস্ দ্যাট লাই টু ডীপ ফর টিয়ারস্'।

নিয়মানুযায়ী কাজ করা তো আমার জীবনযাত্রায় একেবারে অচল, তবে তার মানে তোমাকেও যে অনিয়মিত হতে হবে এমন নয়। আমি চাই তুমি প্রায়ই আমাকে ২। ৪ লাইন চিঠি নিয়মিত লিখবে। আর আমি যখন এ-দেহে থাকব না—সে-খবর তোমার কাছে নিশ্চয় পৌঁছবে—তখন আর তোমাকে চিঠি লিখতে হবে না।

মিস্ ম্যাকলিয়ড চান তাঁর সঙ্গে আমি জাপানে যাই। আমি সে-বিষয় এখনও সুনিশ্চিত নই। সম্ভবতঃ যাবো না। বিশেষ করে আগামী নভেম্বরে আমি তাঁকে ও মিসেস্ ওলিবুলকে ভারতবর্ষে আশা করছি। জাপানে যাওয়া-আসায় দু' মাস কাটবে, থাকা মাত্র একপক্ষ। নাঃ, পোষাবে না।

হ্যাঁ, বেজায় মোটা হয়ে পড়ছি। বিশেষ করে শরীরের মধ্যভাগ। হায়!

মিসেস সেভিয়ার এখন ইংলণ্ডে, তবে কয়েকমাসের মধ্যেই ভারতবর্ষে ফিরবেন। উনি মিসস্ বুল ও অন্যান্যদের হিমালয়ে তাঁর অতিথি হিসেবে আসতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমি চাই ওঁরা গ্রীষ্মকালে হিমালয়ে থাকুন।

আমার দেশের সমতলের প্রচণ্ড গরমকে আমি পুরুষের শক্তিতে সহ্য করে নিয়েছি। এখন বন্যার মত বৃষ্টিধারাকে সহ্য করছি। জানতে চাও আমি কীভাবে বিশ্রাম করছি? আমার গোটাকয়েক ছাগল, ভেড়া, গরু, কুকুর এবং সারস আছে। তাদের তত্ত্বাবধানে সমস্ত দিন কাটে। আমি যে সুখী হবার চেষ্টায় এইসব করছি তা নয়। কেন তা করব? মানুষ দুঃখী বা হবে না কেন? দুটোই তো সমান অর্থহীন। আসলে কেবল সময় কাটানো উদ্দেশ্য।

তুমি কী মিসেস্ বুল বা নিবেদিতার সঙ্গে পত্রালাপ করো? আমার জন্য ঘাবড়িও না, চিন্তা কোরো না। 'মা' হলেন আমার রক্ষাকর্ত্রী, আশ্রয়দাত্রী। সবই খুব তড়াতাড়ি ঘটবে এমন কী আমার সর্বশ্রেষ্ঠ রঙীন স্বপ্নের চেয়েও ভালো।

অনেক ভালবাসাসহ
বিবেকানন্দ

(৫১)

৬ই জুলাই। ১৯০১
মঠ। হাওড়া জিলা। বাংলাদেশ

আমার কাজের ঝোঁক চাপে ফিটের মত। আজ আমার চিঠি লেখবার ফিট। অতএব প্রথম কাজই হল তোমাকে কয়েক লাইন লিখে ফেলা। আমাকে সবাই নার্ভাস প্রকৃতির বলে জানে। আমি চিন্তা করি বেশি, কিন্তু প্রিয় ক্রিস্টিনা, তুমি আমার চেয়ে কিছু কম নও। আমাদের একজন কবি বলেছেন—
"Even the mountains will fly. the fire will be cooled, yet the heart of the great will never change" আমি নিজে অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু জানি তুমি অতি মহৎ। তোমার খাঁটি হৃদয়টি সম্বন্ধে আমার পূর্ণ বিশ্বাস। আমি অনেক ব্যাপারে বিচলিত হই কিন্তু তোমার সম্বন্ধে কখনও নয়। তোমাকে মায়ের শ্রীচরণে নিবেদন করেছি। তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন, চালনা করবেন। কোন ক্ষতি তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। কোন বাধা তোমাকে মুহূর্তের জন্যও কাবু করতে পারবে না। আমি জানি।

মিস্ ম্যাকলয়েড তাঁর জাপান ভ্রমণ খুব উপভোগ করছেন। আমিও তাঁর পিছু পিছু যেতে পারতুম, কিন্তু এরকম দুর্বল স্বাস্থ্য নিয়ে লম্বা সাগরপাড়ি দিতে চাই না। বরং ভারতেই থাকতে চাই।

তারপর তোমার চিঠি। নিজের সম্বন্ধে কোন খবরই দাওনি। তুমি কী করছ? কেমন আছ? মোটা হয়েছ, না রোগা? উপস্থিত ছুটিটা কী করে কাটাচ্ছ ইত্যাদি কিছুই জানাওনি—শুধু আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা জানিয়ে ২। ৪ লাইন—ব্যস্।

মিসেস্ বুলের সঙ্গে কোন যোগাযোগ আর হয়েছে কী? আমি যতদূর সম্ভব নিষ্কর্মা থাকতে চেষ্টা করি। আমার গোটা-কয়েক ছাগল ও ভেড়া আছে এবং একটা হরিণ ও গুটিকয়েক গরু। তাছাড়া ফুলের কেয়ারী, মাছের পুকুর এবং তরকারির বাগান। খুব সকালে উঠি, তারপর ছাগলের দুধ দোয়াই, তাদের খেতে দিই। একটা কুকুর ও তার সুন্দর কালো বাচ্চা আমার বিশেষ আদরের। একজোড়া ডাম্বেল নিয়ে ব্যায়াম করি। তারপর

উত্তাপ থাকলে একটা স্টেক্রারে বেলা দশটা পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে কাটাই। আমাদের দুটো মস্ত আমগাছ আছে এবং একটা কাঁঠাল ও একটা নিমগাছ—সবশুদ্ধ সুন্দর একটি ছায়াঘেরা কুঞ্জ মঠের ঠিক সামনেই। তার ছায়াতল হল আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় স্থান। ফলের সময় এখন পেরিয়ে গেছে। ঐ দুটো আমগাছ থেকে আমরা অন্ততঃ হাজার কয়েক আম খেয়েছি। কাঁঠাল এখনও কিছু আছে। তুমি কখনও কাঁঠাল দেখনি। মস্ত বড় বড় ফল হয়। কোন কোনটা এতবড় যে, একজন শক্তসমর্থ লোক একা একটা তুলতে পারে না। কখনও ওরা এত বড় হয়ে যায় যে........ফেটে গেলে সুগন্ধ বেরোয় এবং তখন বোঝা যায় কোথায় ফলটি আছে।

এটা আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট আমের সময়। পুরো দুনিয়ায় এমন জিনিস কোথাও পাবে না ক্রিস্টিনা। তারপর নদীতে আমাদের শুশুক মাছ। এই যে তোমাকে চিঠি লিখছি আর ঢেউ-গুলো বাড়ির নীচের দিকে উত্তাল হয়ে এসে ধাক্কা দিচ্ছে আর শত শত ছোট নৌকাগুলি শুশুক ধরবার ধান্দায় নদীতে ঘুরছে। আমাদের শুশুক তোমাদের আমেরিকার শুশুক-এর চেয়ে বহুগুণে শ্রেয়ঃ। তারপর স্টিমার। ঐ স্টিমারগুলো আমাকে বড় বিরক্ত করে। ছোট ছোট স্টিমারগুলো অনবরত নদীতে আসছে, যাচ্ছে আর আওয়াজ করছে।

এ-বছর বর্ষা এখনও তেমন শুরু হয়নি। মাত্র কয়েকবার বৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু আমরা চাই প্লাবন। লোকে বেশ চিন্তিত সেজন্য। মেঘের দল পুঞ্জীভূত হয় কিন্তু বৃষ্টির নাম নেই। ক'দিন অন্ততঃ দিবারাত্রির ধারা নামা একান্ত প্রয়োজন কিন্তু 'মা' জানেন। তবুও আমরা আশা করে আছি। বর্ষাকাল আমার সহ্য হয় না তাই আমার পক্ষে এটা ভাল। তবুও বৃষ্টি দেখবার জন্য তীব্র ইচ্ছে আমার। কতদিন যে বাংলাদেশের বর্ষা দেখিনি—বোধহয় ১০ (?) বছর, কী তারও বেশি।

বাংলাদেশে তরকারি কী রকম তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে দেখবার জন্য তোমার এখানে আসা দরকার। আমরা বাগান ঠিক-মত পরিষ্কার রাখতে পারি না, ঘাস, আগাছা ইত্যাদি তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে।

কাগজে পড়লুম, নিউইয়র্কে নাকি ভয়াবহ রকম গরম এবারে। ডেট্রয়েটে কেমন? নিজের শরীর ঠাণ্ডা রেখো স্নেহের ক্রিস্টিনা, খুব সরবৎ খেও এবং সন্ধ্যের দিকে বা যখন সময় পাও হ্যামাকে শুয়ে দুলে দুলে বিশ্রাম কোরো, আর আমাকে সুন্দর করে লম্বা লম্বা চিঠি লিখো। এখন বিদায়।

ঈশ্বরের চিরশরণাগত
তোমাদের বিবেকানন্দ

(৭)

আমাদের এই দলটিকে নিয়ে উনি গভীর রাত্রি পর্যন্ত আলোচনা করতেন। রাত্রি যত গভীর হত, উনি যেন আরও উঁচুতে চলে যেতেন। কখনও রাত্রি ২টো বেজে যেত। কখনও আমরা চাঁদকে উঠতে দেখতাম, আবার ডুবতেও দেখতাম।........ মাঝে মাঝে উনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হতেন। সে-সময় আমরাও কখনও বা ধ্যানে বসতাম, অথবা গভীর নীরবতায় চুপ করে বসে থাকতাম। অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত। একে একে অনেকেই চুপচাপ উঠে চলে যেতেন। কারণ জানতেন যে, এরপরে উনি আর কথা বলতে চাইবেন না। কখনও বা অল্পক্ষণ একটু ধ্যানের পরেই আবার উৎসাহিত করতেন আমাদের প্রশ্ন করবার জন্য। মাঝে মাঝে আমাদেরই মধ্যে কারুকে বলতেন প্রশ্নের উত্তর দিতে। হোক সে উত্তর ভুল। তাতে কিছু এসে যেত না। উনি চাইতেন, হাবুডুবু খেয়ে সাঁতরে আমরা সত্যের কাছাকাছি যাতে উপনীত হতে পারি। তারপর সামান্য ক'টি কথায় আমাদের সংশয়মুক্ত করে দিতেন।

এই ছিল ওঁর শিক্ষার পদ্ধতি। উনি জানতেন, শিক্ষার্থীর মনকে কী করে উদ্বুদ্ধ করতে হয়, এবং কী করে তাকে স্বাধীন চিন্তার পথে এগিয়ে দিতে হয়। কী ধৈর্য আর স্নেহের সঙ্গে তিনি এ-কাজ করতেন, মনে হত যেন স্বর্গের আশীর্বাদ।

ওঁর উদ্দেশ্য ছিল, এই দলটিকে এমনভাবে তৈরি করে দেবেন যাতে তারা আমেরিকাতে তাঁর প্রচারকার্য চালাতে পারে। উনি কী জানতেন যে, যদি আমরা ওঁর উপস্থিতিতে নিজেদের আত্মসচেতনতা বোধকে জয় করে নিতে পারি, ওঁর মত জগদ্বিখ্যাত বক্তার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারি, তাহলে কোথাওই কোন শ্রোতা আমাদের অস্বীকার করতে পারবে না?' রীতিমত কষ্টসাধ্য পরীক্ষার পালা চলল। একজন একজন করে তাঁর সামনে এসে বক্তৃতার পরীক্ষা দিতে হত। নিস্তার নেই। স্থানকাল আমাদের কাছে যেন উবে গেল।

ভারতবর্ষে ফিরে হিমালয়ের কোনো স্থানে বসে তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিষ্যদের একসঙ্গে নিয়ে আরও ব্যাপক শিক্ষা দেবেন—এই ইচ্ছে ছিল স্বামীজীর। থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড-এর বাড়িতে (সেবার গ্রীষ্মকালে) আমাদের দলটিও ছিল বিচিত্র

রকমের। প্রথম ওখানে পৌঁছবার পর এক দোকানদারকে যখন জিজ্ঞাসা করছিলাম বাড়িটা কোন্‌দিকে, সে উত্তর দিয়েছিল, 'হ্যাঁ, পাহাড়ের ওপরে ঐ বাড়িটাতে বেশ কিছু অদ্ভুত ধরনের লোক থাকে আর তাদের সঙ্গে একজন বিদেশী ভদ্রলোকও আছেন।'

মিস্ এস ই ওয়ালডো, মিস্ রুথ এলিস এবং ডাঃ উইট এই তিন বন্ধু প্রথম নিউইয়র্কে স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে একসঙ্গে গিয়েছিলেন। এঁরাই ছিলেন থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডের বাড়িতে। নতুন যাঁরা আসতেন তাঁদের কাছে, ডাঃ উইট খুব গম্ভীরভাবে বলতেন, ত্রিশ বছর ধরে তিনি যেখানে যতরকম দর্শন ও ধর্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা শুনে আসছেন কিন্তু এইরকম ধর্মমতের কথায় কাছাকাছি সামান্যতমও তো কোথাও শোনেননি।

মিস্ ওয়াল্‌ডো দীর্ঘদিন ধরে এইসব বক্তৃতা শুনে শুনে সেগুলিকে সংক্ষিপ্তাকারে লিখে নিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতার সংকলনটি হল আমাদের ইনস্পায়ার্ড্ টক্‌স্। সেই বছরে যখন স্বামীজী ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন, তখন মিস্ ওয়ালডোর ওপরেই কিছু কিছু ক্লাস নেবার দায়িত্ব দিয়ে যান। ফিরে এসে দেখলেন, একটি অমূল্য সম্পদ। ওঁর পাতঞ্জলী বাণীটি উনি একেই উৎসর্গ করেছিলেন। আমাদের কর্মযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি যেসব বই আমরা লিখেছিলাম, তাতে মিস্ ওয়াল্‌ডো যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। ওঁর যুক্তি-বিশ্লেষণী মন এবং পূর্ণভক্তি ওঁকে আদর্শ সাহায্যদাত্রী হতে প্রেরণা দিয়েছিল।

রুথ এলিস নিউইয়র্কের কোন খবরের কাগজে সংবাদ-দাতা ছিলেন। উনি খুব শান্ত, স্বল্পভাষী এবং একটু সরে সরে থাকতেন। তবুও সবাই বুঝতে পারত, ওঁর ভক্তি-ভালবাসা ছিল অপরিসীম। উনি 'Little Old Dacie Wight'-এর (ঐ নামেই আমরা ডাক্তারবাবুকে ডাকতাম) কন্যাস্থানীয়া

ছিলেন। ও'র সত্তরের ওপর বয়স হয়েছিল, কিন্তু একটি বালকের মত ছিল সর্বকিছুতে আগ্রহ ও উৎসাহ।

প্রত্যেকটি ক্যাসের শেষে একটুক্ষণ বিরতি থাকত। সেই সময় বুড়ো ডকি নীচু হয়ে টাকে হাত বুলিয়ে নাকিসুরে বলতেন, 'তাহলে স্বামীজী মোদ্দা কথা হল গিয়ে—আমি সেই পরমব্রহ্ম!' আমরা ঠিক এইটি শুনব বলে অপেক্ষা করে থাকতাম। স্বামীজী একটুখানি পিতৃসুলভ স্নেহের হাসি হেসে ঘাড় নেড়ে জানাতেন 'হ্যাঁ।' এ-সময় ঐ তেত্রিশ বছরের মানুষটিকে ঐ সত্তর বছরের বৃদ্ধের তুলনায় (বয়েস না হলেও) জ্ঞানবৃদ্ধিকে যথেষ্ট প্রাজ্ঞবিজ্ঞ মনে হত। মাঝে মাঝে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন, 'আমার নিজেকে তিনশো বছরের বলে মনে হয়।'

নীচের ঘরটিতে থাকত স্টেলা। কদাচিৎ কখনও ওপরে এসে ক্যাসে যোগ দিত। আমাদের বোঝাতো যে, ও কৃচ্ছ্রসাধনের অভ্যাস করছে। আমাদের খুব কৌতূহল হল। শেষে অনেক কিছু জানতে পারলাম। ও আসলে একজন অভিনেত্রী ছিল। পূর্বের সংস্কার এত সহজে তো মুছে যাবার নয়। ওর অনেক কিছুই ছিল 'অভিনয়' ও স্বামীজীর সুমহান শিক্ষার বিকৃত অর্থ করা।.... স্বামীজী ওকে 'বেবি' বলতেন যাতে ও ওর মিথ্যা অভিনয় ও চাতুরী ত্যাগ করে সত্যিই শিশুসুলভ সরল হতে পারে। এই জন্য ওকে গোপাল পুজো করতে দিয়েছিলেন। গ্রীষ্মকালে আমাদের দল ভেঙে গেলে ও চলে গেল ছোট একটি দ্বীপে আর্চার্ড লেকে বসবাস করতে। সেখানে একখানি ঘরের বাড়ি তৈরি করে একাই থাকত। ওর সম্বন্ধে নানারকম গুজব শোনা যেতে লাগল। মাথায় পাগড়ি পরত এবং বিদঘুটে কী সব অভ্যাস করত—তাকে বলে 'যোগ'। তখন কেউ যোগাভ্যাস কথার মানে জানত না। এটা একটা বিদেশী শব্দ—ভারতবর্ষ থেকে এসেছে রহস্যজনক এবং গোপনীয় ব্যাপার। খবরের কাগজওয়ালারা এল ওর সঙ্গে দেখা করতে। একজন বিখ্যাত লেখক তাঁর নিজের কাজের প্রথম সফলতার কথা বলেছিলেন আমাদের। তিনি বালকবয়সে একজন 'লিফটম্যান' ছিলেন। এই মহিলাটির ইত্যাদির বিষয় লিখে ইনি ডেট্রয়েট ফ্রি প্রেসে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, তারা রচনাটি গ্রহণ করেছিল।

এর পরে নিজের সম্বন্ধে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে উনি ভেবেছিলেন, উনি যা লিখবেন তাই বুঝি তৎক্ষণাৎ গ্রাহ্য হবে। হায় রে! যশের পথ অত সহজ নয়। অনেক উত্থান-পতনের পর তবে ও'র নাম সত্যি প্রতিষ্ঠা পেল এবং ও'র পাণ্ডুলিপি আদৃত হল। সেই থেকে উনি 'যোগ' শব্দের আসল অর্থ বুঝলেন এবং ভারতবর্ষ ও'র চোখে পবিত্র স্থান যেখানে লোকে পর্যটক হিসাবে নয় তীর্থযাত্রী হিসাবে যায়। ও'র প্রথম উপন্যাসের পটভূমি অনেকখানি ভারতবর্ষ। কী গভীর অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টিতে ভারতের গ্রামের বর্ণনা দিয়েছেন যেখানে সন্ধ্যার দিকে কাহিনীর নায়কের প্রবেশ।.... ...

রচনাটি পড়লে মনে হয়, লেখক এই গ্রন্থ রচনা খানিকটা অন্ততঃ স্বামীজীর প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন—বিশেষ করে তাঁকে যখন ব্যক্তিগতভাবে জানতেন। নিজেও বলেছেন "There is a glow about everyone who was in any way associated with Vivekananda.

স্টেলা এরপরে সাধারণভাবে জীবনযাপন করতে চলে গেল। আমরা ওর কথা আর কিছু জানতে পারিনি। একেবারে পেলাম মৃত্যুসংবাদ। আমাদের সকলের থেকে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হয়ে, এমনকি যিনি ওর মধ্যে প্রথম বীজটি বপন করেছিলেন, জলসিঞ্চন করেছিলেন, তাঁর থেকেও, ও কী পেয়েছিল, জীবন ওকে কী দিয়েছিল সেই ত্রিশটি বছর—কে জানে।

বিশ্বাস না করে উপায় নেই, যে বীজ ওর মধ্যে বপন করা হয়েছিল, তার ফল নিশ্চয় ও পেয়েছিল—বীজ বপন সার্থক হয়েছিল।

(চলবে

মোরগ ছানা

ওর চেহারাটা উড়ুক্ক পাখির মতো উড়ুক-ফুড়ুক। সাঁইবাবার চুলের ঝাঁপ-গোলাকার আর ওরটা লম্বা-চালের। হাঁটা-চলা তিড়িং-তিড়িং। ম্যেট্যালি ওকে দেখলে যে এফেকটা মনে হয় তা অমিতাভ চৌধুরীর ছড়া ইয়া একটা মোরগ-ছানা তুম-না-নানা-তুম না-নানা করে চড়বড় করে এগিয়ে চলেছে। —এরকমটা।

মোরগছানাটার নাম সিদ্ধার্থ বসু। ওর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হাওড়ার একটা সাহিত্য পাঠের আসরে। প্রথম দিনই বুঝকে দিয়েছিল। মেজাজে আসরে নিজের একটা জোরালো গল্প নামিয়ে দিয়ে বলে উঠেছিল—আপনাদের অনেকক্ষণ বোর করলাম। এবার তার বিনিময়ে একটু আনন্দ দোব। বলেই নাচতে শুরু করেছিল।—আর মুখ দিয়ে বিদঘুটে আওয়াজ করতে করতে—ড্যাম কুড় কুড় চ্যাং কুড় কুড় কুড়ুর-কুড়ুর কুড়ুর-কু-অ্যা-কু....। মাঝে একবার সভাপতির দিকে হঠাৎ কুকুরের মত মুখ করে হ্যা-হ্যা-হৈ করে তেড়ে গিয়েছিল। সভাপতি ভড়কে গিয়ে পেছন দিকে উলটে গিয়েছিলেন। তার পরেই একজন 'রাগী' কবির দিকে....। —তুমি ব্যাটা এঁতেল, বিপ্লবী। তোমার এঁতলেমির ছাদ্দ করব। তোমাকে কামড়াবো আজ। বলে কামড়াতে গেল 'রাগী' কবিকে। কবিটি অমনি হাঁউ মাঁউ করে উঠেছো।— ওরে বাবারে আমাকে কামড়ে দিল-রে। অ্যাই সিদ্ধার্থ ভালো হচ্ছে না। আমি রাগী কবি, অ্যাঁ রেগে যাবো কিন্তু এবার বলছি। ....কেঁদে ফেলব....অ্যাই সিদ্ধার্থ ভয় পাচ্ছি।..

অমন হিটিয়ালি কাণ্ড দেখেই আমি লেপটে গিয়েছিলুম ওর সঙ্গে। আরও অনেক হিটিয়ালি সব দেখেছি। একবার রেস্তোরায় ওকে নিয়ে খেতে ঢুকেছি। ও হঠাৎ গম্ভীর মুখ করে অর্ডার দিল—বোয় কাম-অন ব্যাটা-ছেলে, একঠো সাপ-ভাজা! সমঝা! সাপকো ভাজা! —আশপাশের সবাই চমকিত বিস্মিত। পাগল টাগল ভাবল। একবার একটা মেয়েকে, কলেজের বান্ধবীকে ভীষণ নিষপাপভাবে বলেছিল—এই কিছু মনে করিস না, বিশ্বাস কর, আমার মধ্যে কোন পাপ নেই। আচ্ছা মেয়েদের বুকটা কতটা নরম হয় জানি না রে! মেয়েটা হেসে ফেলেছিল—তুই ভীষণ ইয়ে-ভ্যাট তারপর ছেলেই মুদু ভেংচি কেটেছিল। একবার বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে উনিশ বছরের মোরগছানাটা তার পোশাক-আশাক খুলে রেখে মায়ের সামনে একপাক ঘুরে চলে এসেছিল। মা তো চেঁচিয়ে-চিল্লিয়ে আকুলা-ওরে আমার চণ্ডীটা পাগল হয়ে গেলরে— অ্যাই চণ্ডী-বুড়ো খোকা-কী কাণ্ড হচ্ছে। ....ট্যোটালি ভীষণ ডেসপারেট ছেলে।

অথচ ঐ ডেসপারেট মোরগছানাটাই একবার একটা খারাপ মেয়েমানুষের সামনে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেলেছিল ঝরঝর করে। —পরে সবাইকে বলেছিল—দ্যাখ ওকে দেখে, আমার চোখের সামনে যে দৃশ্যটা ভেসে উঠেছিল তা—একসার পুরুষ কসাইয়ের সামনে একটা মেয়েমানুষ দাঁড়িয়ে আছে, যার মরা মাছের মত চোখ, সারা মুখ জুড়ে শুধুই বিশদনিদ্রার গ্লানি আর অসহায়তার পাথর-ক্লান্তি। পুরুষ কসাইরা পাশব উল্লাসে তাদের ছুরিতে শান দিচ্ছে মেয়েমানুষটার মাংস ছিঁড়ে খাবে বলে।....আমার কান্না পেলোরে....ভীষণ কান্না। ওদের বড় দুঃখ, বড় কষ্টের জীবনরে! ওদের নিয়ে আমি লিখবরে। যে লেখা পড়ে সবাই কাঁদবে। সবাই....।

গৌতম ভট্টাচার্য

মানুষের মন বড় জটিল, অনেকটা জট
...লে যাওয়া সুতোর গোলার মতো। বহু
...তু চিন্তা বাসা-ভাঙা পিঁপড়ের মতো
...র সমতলে ঘোরাফেরা করে, মাঝে মাঝে
...ড়ায়। এর মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক হলো
...য়ে থাকা অপরাধ-বোধ। যে অপরাধ
...মি নিজে করিনি, তাও কখন সংক্রমিত মনে
...র মতো সঞ্চারিত হয়ে যায়। সেইজন্যেই
...শ আজ দশ বছর পরেও কোনো কোনো
...ন অনেক রাত্তিরে ঘুম ভেঙে যায়, আর
...ম আসতে চায় না, অপার্থিব প্রহরে জেগে
...গে শুনতে পাই স্তব্ধ রাত্রির নিরুপদ্রব
...ন্ততাকে ভেদ করে ওপার থেকে ভেসে
...সছে অনেক মানুষের আর্ত কণ্ঠস্বর।
...ই কোলাহলকে আটকাবার জন্য আমি
...াতে প্রাণপণে কান চেপে ধরি, শুয়ে পড়ি
...লিশে মুখ গুঁজে। কিন্তু একটুও
...মিত হয় না আর্ত কান্নার ঢেউ। তখন
...ঝতে পারি এই শব্দ উঠে আসছে আমার
...জের একেবারে অন্তস্তল থেকে, একে
...মি আটকাতে পারবো না কোনোমতেই।

নাঃ, এভাবে ব্যাপারটা আমি বোঝাতে
...রবো না। তার চেয়ে যেমনটি ঘটেছিলো
...ভাবেই গুছিয়ে বলি।

তখন ডিগ্রি কোর্সের ফার্স্ট ইয়ারে
...। যে মাসের দারুণ গরম এক দুপুরে
...রে ভেজা গামছা জড়িয়ে শুয়ে আছি, হঠাৎ
...শের বাড়ির ছেলেটা জানালা খুলে ডেকে
...লো, তারাদা, আপনার টেলিফোন
...সছে, তাড়াতাড়ি আসুন।

একটা জামা গলিয়ে দৌড়ে গিয়ে
টেলিফোন ধরলাম।

—হ্যালো, কে ?

—সুমিত বলছি। শোন, আজ সন্ধ্যে-
বেলা সাড়ে-সাতটায় পুরী এক্সপ্রেস-এ
আমি, ব্যোমকেশ আরো কেউ কেউ পুরী
যাচ্ছি। সাতটার মধ্যে ধারটার করে পয়সা
জোগাড় করে প্ল্যাটফর্মে চলে আসিস।
আচ্ছা, সন্ধ্যায় দেখা হবে তাহলে।

কট করে ফোন ছেড়ে দেবার আওয়াজ
এলো।

ভালো মজা। কোথাও কিছুর ঠিক
নেই, কোনো পরামর্শ করা নেই—হঠাৎ এমন
টেলিফোন! তাও কিনা আজই বিকেলে।
সময়ই বা কোথায় ?

কিন্তু সেটা প্রথম যৌবন। বাধা তখন
বাধা ছিলো না।

সেই রোদ্দুরে দৌড়োলাম মুকুলেশ
বাড়ি। শোনামাত্রই সেও যেতে রাজি। দুজনে
নানা উপায়ে কিছু টাকা বিকেল চারটের
ভেতর যোগাড় করে ফেললাম। মাথাপিছু
পঁচাত্তর টাকা করে হলো। তাই সই। এতে
পুরী তো পৌঁছনো যাবে, তারপরে যা হবার
হোক।

প্ল্যাটফর্মে সুমিত, ব্যোমকেশ ও
কেষ্টর হাসিমুখ। বেশ ভিড় রয়েছে। এখনো
গাড়ি দেয়নি, একটা কুলিকে ডেকে দুটো
টাকা কবুল করতে সে জায়গা করে দেবার
প্রতিশ্রুতি দিল।

পেলাম দুটো আস্ত বাংক। তড়বড়
করে উঠে আমরা জমিয়ে বসে গেলাম। নতুন
সিগারেট ধরেছি, বাড়িতে দু-বেলা খাবার
পর একটু বাইরে বেরুতে হয়। এখন
স্বাধীনভাবে বেড়াতে বেরিয়ে সিগারেট
খাওয়াটা স্বাধীনতার প্রধান লক্ষণ হয়ে
দাঁড়ালো। আমরা সবাই ঘন ঘন সিগারেট
খেতে লাগলাম। গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।
সুমিত আমার সামনের বাংকে বসেছে, তার
নিচের লম্বা বেঞ্চটা জুড়ে চলেছে এক
বাঙালী পরিবার। ভদ্রলোকের চেহারা
বিশাল, দৈর্ঘ্যের চেয়ে প্রস্থ বেশি। গায়ের
রংও বিচিত্র কালো, এত সুনিবিড় কৃষ্ণবর্ণ
হঠাৎ দেখা যায় না। পাশে একখানা ব্ল্যাক-
বোর্ড রাখলে সেটাকে ফর্সা দেখাবে। বছর
পঞ্চাশ বয়েস। বৌও প্রায় তাই, তবে গিন্নী
গিন্নী চেহারা। সঙ্গে দুটো বাচ্চা, তারা
'আর কখনো খেলিব না' ধরনের মুখভার
নিয়ে চুপ করে বসে আছে। সুমিতকে
চোখের ইঙ্গিত করে নিচে তাকাতে বললাম।
ও ঝুঁকে দেখলো, তারপর আমার দিকে
তাকিয়ে হেসে বলল, দুধে-আলকাতরা রং
মাইরি।

আমি একটু লজ্জা পেলাম। জোরে
বলবার কি আছে ? এমনি দেখলেই তো
হতো। ভদ্রলোক শুনতে পেলে কি ভাব-
বেন। অবশ্য মানুষটাকে দেখে আমার শ্রদ্ধা
হয়নি আদৌ। এরকম চেহারা দেখলেই মনে

হয় চিটেগুড়ের ব্যবসা করে হঠাৎ বড়লোক হয়েছে।

সুমিত আর কেউ একটা মজা পেলে সহজে থামতে চায় না। আমাদের বাংকগুলো ফাঁক ফাঁক কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি। সারারাত ওরা দুজন সেই ফাঁক দিয়ে নিচে বাদামের খোসা আর সিগারেটের ছাই ফেললো। আমার খারাপ লাগছিলো। হোক সে চিটেগুড়ের ব্যবসাদার—তা বলে এই-রকম করাটা—

আদ্রাপুরে সুমিত সবার জন্য চা নিলো। রেল কোম্পানীর ছাপ মারা পেয়ালায় চা দিয়েছে। আমরা সবাই কাপ ফেরত দিয়ে সিগারেট ধরিয়েছি, সুমিত একটু একটু করে চুমুক দিচ্ছে তো দিচ্ছেই। শেষে ট্রেন ছেড়ে দিলো, কিছুক্ষণ আমাদের কামরার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গালাগাল দিয়ে পিছিয়ে পড়লো চা-ওয়ালা। আমি বললাম, ধাঃ, এটা কি করলি সুমিত ? দিয়ে দিলেই পারতিস কাপটা। ও বেচারার মাইনে থেকে দাম কেটে নেবে হয়তো—

দাঁত বার করে হেসে সুমিত বললো, তুই একটা বামুনের বিধবা মাইরি। বেড়াতে বেরিয়েছি, এটুকু ফুর্তি করবো না ? তা নয়, খালি নীতিকথা। কেমন বড় কাপটা। নীট লাভ।

আসল কথায় আসবার আগে এসব বলে নিচ্ছি তার কারণ আছে। এতে আমার সঙ্গে যারা ছিলো তাদের চরিত্র পরিষ্কার করে বোঝা যাবে। তাছাড়া পুরনো দিনের প্রসঙ্গ উঠলে মানুষ মাত্রেই একটু বেশি কথা বলে থাকে, আমিও ব্যতিক্রম নই।

শেষ রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ভোরে মুকুল ঠেলে তুললো—ওঠ, ওঠ, এখুনি সূর্য উঠবে। সূর্যোদয় দেখবি না ?

তখন গুম গুম শব্দ করে গাড়ি বৈতরণী নদীর ব্রীজ পার হচ্ছে। ঘুমচোখে কামরার দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। উঁচু-নীচু একটা রুক্ষ প্রান্তরের ওপর দিয়ে গাড়ি ছুটেছে, ঠান্ডা স্বচ্ছ আলোয় ভরে আছে পৃথিবী। কিন্তু কোনদিকটা পুব দিক ? সূর্য কোনদিক দিয়ে উঠবে বুঝবো কি করে ? মুকুল হেসে বলল, দিক গুলিয়ে যাচ্ছে, না ? ভয় নেই, এই দেখ—

পকেট থেকে ব্যান্ডহীন মেয়েদের ঘড়ির মতো কি একটা জিনিস বের করলো মুকুল। অবাক হয়ে বললাম, এটা কি ?

—কম্পাস। কলেজের ল্যাবোরেটরী থেকে নিয়ে এসেছি। এই দ্যাখো, তোর মুখ কাঁচুমাচু হয় যাচ্ছে কেন ? চুরি করিনি, বাড়ি ফিরে আবার ফেরত দিয়ে দেবো।

পুবদিক ভরে সূর্য উঠলো একটু বাদেই। তারপরই খুরদা রোড। জিনিসপত্র বাঁধাবাঁধি, যাত্রীদের মধ্যে হৈ চৈ। এরই মধ্যে আবার একদল পাণ্ডা উঠলো যজমান বাগাতে। মুকুল বললো, সেরেছে !

বললাম, চিন্তা নেই। দেখ না মজাটা। একজন মোটাসোটা ভালোমানুষ গোছের পাণ্ডা আমার কাছে এসে নমস্কার করতেই আমি খুব আশ্চর্য হবার ভান করে বললাম, ওয়েল, সনি, হোয়াট বিজ্নেস ইউ হিয়ার ?

লোকটি থতমত খেয়ে বাংলা-ওড়িয়া মেশানো খিচুড়ি ভাষায় আমাকে কি যেন বললো। তখন কলেজে সদ্য ... তোড়ে শেকসপীয়ার পড়াচ্ছেন। ... লোকটাকে থামিয়ে দিয়ে ভয়ানক ... গলায় বাঁকা উচ্চারণে বললাম, ... হ্যামলেট, হ্যাভ ইউ সীন ইওর ... গোস্ট ?

পাণ্ডাদের মহৎ গুণ, তারা ... বোঝে। এখানে লাভ হবে না দেখে ... পড়লো।

পুরীতে নামবার একটু আগে ... বেশের কালোমতো ভদ্রলোক ... জিজ্ঞাসা করলেন, বাবারা সব ... যাচ্ছো ?

—হ্যাঁ।

—কি করা হয় ?

—পড়া হয়। আপনার কিসের ...

চিটেগুড়ের ব্যাপারটা আমি ... মুখের কাছে দাঁড়িয়ে কাল ... সুমিতকে বলেছিলাম।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বলতে ... আমার তো কোনো ব্যবসা নেই ... বললো তোমাকে ?

—তবে কি করেন আপনি ?

ভদ্রলোক কোলকাতার কোনো ... বিখ্যাত কলেজ অফ মেডিসিনের ম... বললেন, আমি সেখানকার প্রিন্সিপ...

সুমিত বিষম খেয়ে সিগারেট ... ফেললো, আমি স্তম্ভিত হয়ে গ... চিটেগুড়ের ব্যবসাদারকে দেখছি। ... সকালে কলেজ অফ মেডিসিনের প্রি...

গিয়েছে। সুমিত বললো, আপনি রিপার্ভেশনে গেলেন না কেন ?

রিজার্ভেশন পাইনি। তাছাড়া এমনিতে রকমের মানুষ দেখা যায়, এই যেমন দের দেখলাম—

ও'র ঠোঁটের কোণে কি সূক্ষ্ম হাসি ? নি।

পুরী। সারাদিন সমুদ্রে স্নান করি, য়ে খেয়ে হোটেলের সামনে বসে য়ে থাকি সমুদ্রের দিকে, বিকেলে র হেঁটে বেড়াই বেলাভূমিতে। শুক্ল- র রাত, বেশ চাঁদের আলো থাকে খ রাত্তিরেই। আমাদের ছায়া পড়ে র ওপরে। সুমিত, কেষ্ট—ওরা ভিড়ের ক মেয়ে দেখতে যায়। ব্যোমকেশটা লাটে কোথায় ঘোরে আপনমনে কাউকে না। আমি আর মুকুল বি এন আর টেলের দিকে কিছুটা হেঁটে নির্জনে র ওপরে বসি। সামনে ঢেউয়ের মাথায় ন স্বতঃপ্রভ ফসফরাস জ্বলে। জ্যোৎস্নাহীন রাত হলে আরো ভালো বোঝা য়। সমুদ্রের একটানা গর্জনে, চাঁদের লোয় মিশে আমাদের বুকেতে যেন নেশা রে দেয়। মুকুল বলে, আর আর টেলে ফিরবো না, কোনোদিনই ফিরবো । এইখানেই চাঁদের আলোয় শুয়ে কবো।

জামা-গেঞ্জি খুলে মুকুল বালির পরে চিত হয়ে শুয়ে পড়ে। আমি বলি, মিও ফিরবো না। শুয়ে পড়ি মুকুলের শে। অনেক রাত্তিরে সুমিত আর কেষ্ট সে আমাদের খুঁজে বের করে—এই দেখ, ন্যাসী দুটো এইখানে এসে আধান্যাংটা য়ে শুয়ে আছে। নে উঠে পড়—আর কামি করে না।

দুদিনের বেশি পুরীতে থাকার পয়সা লো না আমাদের কাছে। তিনদিনের দিন কালে উঠে আমরা হোটেল ছেড়ে দিয়ে য যার ব্যাগ কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কেষ্ট বলল, পুরী একসপ্রেস সেই সন্ধ্যে- বেলা। এতক্ষণ কি করবো ? চল কোনারক ঘুরে আসি। যাতায়াত পাঁচ টাকা বাস ভাড়া। কুলিয়ে যাবে এখন—না হয় দুপুরে খাবো না।

হিসেব করে দেখা গেল খাওয়াও হবে। কাজেই আমরা কোনারকের বাসে টিকিট কেটে চেপে বসলাম।

উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। আজকের মতো রকেট সার্ভিস নয়। যেখানে-সেখানে বাস থামছে, হুড়মুড় করে বোঁচকা-বুঁচকি ছাতা-লাঠি হ্যারিকেন নিয়ে গ্রাম্য মানুষেরা উঠছে নামছে। পথ আর ফুরোয় না।

কোনারকে পৌঁছোলাম ঠিক দুপুর- বেলা। ড্রাইভার বলে দিল দু ঘণ্টার মধ্যে দেখা শেষ করতে সেই সময় বাস ছাড়বে।

কোনারকের মন্দির তখন সারানো হচ্ছিল। দড়িদড়া পাইতি শাবল পড়ে আছে—কিন্তু আমরা যখন পৌঁছোলাম

সেই সময়টায় কুলি-মজুর কাউকে দেখলাম না কাছাকাছি। বোধহয় খেতে গিয়েছে।

চারদিকের নিরবচ্ছিন্ন শান্তির মধ্যে চুপ করে মহাকালের প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল সূর্যমন্দির। সুমিত মন্দিরের গায়ের ভাস্কর্য দেখে ভারি খুশী, কেষ্টকে কিসব অশ্লীল রসিকতা শোনাতে লাগলো ক্রমাগত।

আমি আর মুকুল একটু আলাদা হয়ে মন্দিরের চত্বরে উঠলাম। কালা- পাহাড়ের উপদ্রবে হাতভাঙ্গা সূর্যমূর্তিটা যেখানে রয়েছে সেইখানটায় রোদ্দুর নেই। অনেক ওপর থেকে একটা দড়িবাঁধা বালতি পেন্ডুলামের মতো অল্প অল্প দুলছে। আমরা সেইখানে একটু বসলাম।

নিচে উঠোনে মধ্যগ্রীষ্মের তপ্ত বাতাসে ছোট ছোট বালির ঘূর্ণি উঠছে। সমুদ্রের দিকে সারি সারি ঝাউগাছে মর্মর শব্দ বাজছে ঘুমপাড়ানি সুরের মতো। কোনারকের প্রাচীনত্ব আমাদের আবিষ্ট করে রেখেছে।

মুকুল বলল, এবার তো আর হলো না, এরপরে একবার তুই আর আমি এসে চাঁদনী রাত্তিরে থাকবো এখানে। দেখিস মাঝ রাত্তিরে নিশ্চয় সেকালের লোকেরা দেখা দেবে। দেবেই।

আমি রাজি হয়ে যাই।

আজ দশ বছর হয়ে গেলো। আমরা কথা রাখতে পারিনি।

দু ঘণ্টা ফুরিয়ে গেলো। চাটাইয়ের বেড়ার হোটেলে মাংস ভাত খেয়ে আমরা ফের বাসে চেপে বসলাম।

এবারে আসল ঘটনা এসে পড়েছে—যে জন্য এত ভূমিকা।

আগের মতোই থামতে থামতে বাস চলেছে। মানুষজন ওঠা-নামা করছে। উড়িষ্যার গ্রাম দেখতে ভারি সুন্দর। পরিষ্কার করে নিকোনো উঠোন, মাটির দেওয়ালে শাদা রং দিয়ে সুন্দর আলপনা দেওয়া। দেখতে দেখতে চলেছি।

পুরী আর কোনারকের মাঝখানে এক জায়গায় একটা ছোট্ট গ্রামে বাস হঠাৎ কেন যেন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। লোকজন ওঠানামা শেষ, আর দাঁড়াবার কোনো কারণ থাকতেই পারে না। অথচ ড্রাইভারকে দেখতে পাচ্ছি গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে নিশ্চিন্ত আলস্যে বিড়ি খাচ্ছে। বাস থেমেছে একটা বিরাট বাড়ির পাশে। পাড়া- গাঁয়ের বাড়ি, গায়ে গায়ে লাগা দশ-বারোটা ঘর মাঝখানে উঠোন, উঠোনে বড় বড় খড়ে ছাওয়া চারটে ধানের গোলা। পুরো বাড়িটার চালও খড়ে ছাওয়া। সম্পন্ন গৃহস্থের পরিচয় ফুটে বেরুচ্ছে। উঠোনে খেলা করছে একটা ন্যাংটো বাচ্চা, তার কোমরের ঘুনসিতে একটা ফুটো পয়সা বাঁধা।

যাত্রীরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। প্রায় কুড়ি মিনিট হয়ে গেল। সুমিত চটে বলল, ব্যাটারা ট্রেন ফেল করাবে নির্ঘাত।

কেষ্ট বলল, নেমে দেখ না কি হয়েছে।

সুমিত বাস থেকে নেমে ড্রাইভারের কাছে গিয়ে কি যেন জিজ্ঞাসা করলো, তারপর ফিরে এসে বললো, ভালো মজা। এই বাড়িটা হচ্ছে বাসের মালিকের শালার। তার কি মাল উঠবে বলে দাঁড়িয়ে আছে। আর এদিকে আমাদের—আচ্ছা, দেখাচ্ছি মজা।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, না-না, এখানে কিছু করিস না কিন্তু। ওরা এমনিতেই বাঙালীর ওপর চটা—

না করবো আর কি। এমনিই বলছিলাম, বলে সুমিত রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগলো।

আরো মিনিট কয়েক পরে তিনটে ধানের বস্তা এসে উঠলো বাসের ছাদে। এই মালের জন্যই এতো দেরি। বস্তাগুলো নাকি বাঁধা হচ্ছিলো। পুরো পঁয়ত্রিশ মিনিট গচ্চা।

ড্রাইভার এসে স্টার্ট দিলো গাড়িতে। বাস চলতে শুরু করলে লাফ দিয়ে উঠলো সুমিত।

আমি বাঁচলাম। সুমিতটা যা গোঁয়ার।

পুরী পোঁছে কোনোরকমে দৌড়ে ট্রেন ধরলাম। ট্রেন যখন খুরদা রোডের কাছাকাছি, তখন সুমিতকে বললাম, খুব বাঁচিয়েছিস তুই। আজ ওখানে গোলমাল শুরু করলে আর দেখতে হতো না। কি করে চেক করলি রে ? তোর যা মাথাগরম।

আমার দিকে কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে সুমিত বলল, তখন চেঁচামেচি করবি বলে বলিনি, এখন বলছি। সুমিত বিশ্বাস কখনো রাগ ভোলে না। প্রতিশোধ আমি তখনই নিয়ে নিয়েছি। তোরা বুঝতে পারিসনি।

আমার গলার কাছটা উৎকণ্ঠায় কেমন আঠা-আঠা হয়ে গেল, বললাম, কি করেছিস তুই ?

—সিগারেট খাচ্ছিলাম দেখেছিলি তো ? বাসে ওঠবার আগে জ্বলন্ত সিগারেটটা ওদের খড়ের চালে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছি। এতক্ষণে সব পুড়ে ছাই। শালা, আমার সঙ্গে চালাকি। জোর হাওয়া দিচ্ছিলো ও আগুন সহজে নিভবে না।

দশ বছর আগেকার কথা। এখনও আমার মনের মধ্যে পরিষ্কার নিকোনো উঠোনে খেলা করে কোমরে ঘুনসিবাঁধা এক উলঙ্গ শিশু। উঠোনের পাশে তার বাড়ি। হঠাৎ আগুন লাগে সে বাড়িতে। শত শত লোভী জিভ বের করে আগুন গ্রাস করে গৃহস্থের স্বপ্নকে।

ঘুম ভেঙে মাঝরাতে আমি জেগে উঠি। রাত্রির স্তব্ধতার ওপার থেকে অসহায় আর্ত নর-নারীর করুণ কণ্ঠ ভেসে আসে। তাদের বাড়িতে আগুন লেগেছে।

আমার দোষ নেই কিন্তু, আমি দলে তো ছিলাম। কতদিন অনুতাপ করলে ওই কান্না আমাকে আর স্পর্শ করবে না ?

বিচিত্রা

বাঘ বাড়েনি ?

অমৃতে পিনাকী চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঘ চকুকোত্তির সংসার' পড়ে প্রীত হলাম। সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, গাছপালা, জীবজন্তু, মানুষের জীবিকা এবং সর্বোপরি বাঘ নিয়ে ভ্রমণ কাহিনীর মত যে মনোজ্ঞ নিবন্ধটি লেখক 'অমৃত' পাঠকদের উপহার দিলেন তার জন্য ধন্যবাদ।

তবে এই নিবন্ধে বোধকরি লেখকের অনবধানতাবশত কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গেছে বলে মনে করি।

পিনাকীবাবু একস্থানে বলেছেন, 'শুরু করেছি গোসাবার একটি শোক সভা দিয়ে'। কিন্তু প্রথমেই তিনি আরামপুরের শোক সভার উল্লেখ করেছেন। গোসাবা এবং আরামপুর যে দুটি পৃথক স্থান তাঁর নিবন্ধে তা একাধিকবার প্রকাশ পেয়েছে। নিবন্ধে ডাকতার বর্মনের হাতে চার ব্যাটারীর

ঘেটে লাঠির মত একখানা টর্চ ছিল বলে জানা গেল। কিন্তু এদেশে কোন টর্চ কোম্পানী চার ব্যাটারীর টর্চ তৈরি করে বলে তো শুনিনি। সেটি কি কোন বিদেশী কোম্পানীর তৈরী? বাংলাদেশের যশোহর জেলায় কপোতাক্ষ নামে একটি নদ রয়েছে, যার উল্লেখ কবি মধুসূদন দত্ত স্বীয় পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু নিবন্ধে কপোতাক্ষী কেন বলা হল ঠিক বোধগম্য হল না। এই নিবন্ধে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৩ সালে সুন্দরবনের আয়তন ১০ বর্গ কি মি বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ বাঘের সংখ্যা সেই ১৮১ তেই রয়ে গেল। এক বছরে কী বাঘের সংখ্যা একটিও বাড়েনি? এটি অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

১৯৭৪-এর ৪ মে এক পরিচিত দৈনিকপত্রে বাঘ সুমারীর এক সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের বাঘের সংখ্যা উল্লেখ করে পশ্চিমবঙ্গের খণ্ডিত সুন্দরবনে কম করেও ২০০টি বাঘ রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। এই সংখ্যা ১৯৭৩-এর বাঘ সুমারী অনুযায়ী। কোনটি সত্য, লেখক এ বিষয়ে আলোকপাত করলে বাধিত হব।

—প্রবোধকুমার দত্ত, মুরারই, বীরভূম।

লাল মুলো :

১৮ ফেব্রুয়ারীর অমৃতে বৈকুণ্ঠ পাঠকের 'অতি বৃহৎ লাল মুলো' সুন্দর। কামাখ্যা দাস, গৌহাটি।

দিলীপ সরকারের প্রেসক্রিপশন

জীবন কল্লা বৈকুণ্ঠ পাঠকের অরুচির জন্য ডাকতার যে প্রেসক্রিপসন করেছেন তাতে আমি তেমন খুশী হতে পারিনি ডাকতারের বয়স কত? সত্তর দশকে একবারও বাইরে যায় হননি না কি? ঘরে বসেও তো মেডিক্যাল জার্নাল পড়া যায়। শুধুমাত্র প্রমাণিত নিরাপদ ওষুধ গুলিই ব্যবহার করলে নতুন ওষুধ-টষুধ চালু হবে কি করে। নতুনের সাথে অনেক কিছু জড়িত যে। যেমন— ডাক্তারের নাতি বা বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ে। কাজেই আমি গত কয়েক বছরের ভেতর আবিষ্কৃত কয়েকটি ওষুধ দিয়ে একটি বিকল্প প্রেসক্রিপসন তৈরী করতে চাই। প্রেসক্রিপশনটির মাপ একই :

১। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'যুদ্ধ' গল্পটি রাতে শোবার আগে সাতদিন একটানা।

২। শীর্ষেন্দু-র 'যাও পাখি'তে নেশা-গ্রস্থ অধ্যাপকের সঙ্গে সোমেনের,— অধ্যাপকের ফ্ল্যাটে থাকবার জায়গাটা। রোজ ভোরে তিনদিন পরপর।

৩। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'বৃষ্টিতে দাবানল' এবং বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'লোহার সিন্দুক' এবেলা ওবেলা—টানা এক মাস।

৪। মতি নন্দীর 'ফেরারী' উপন্যাস আগাগোড়া তিনবার রিডিং— নির্জনে।

৫। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'এক জীবনে' উপন্যাসে যেখানটায় অসুস্থ মাঝি ওষুধ ও আশ্রয় ছেড়েও ঝড়-বৃষ্টির ভেতর নদীতে—নৌকায় চলে যাচ্ছে—সেখান-টায় বিকেলের দিকে মাদুর পেতে বসে শুধু তাকিয়ে থাকতে হবে। তার নীরবে ছবিটি ভাবা।

৬। রাচি ফিরে আসার মুখে ম সমরেশ মজুমদারের 'বড় পাপ হে' সক ও বিকেল একবার করে পর প সাত দিন।

এই ওষুধ সেবনের সম অনুপান হিসেবে দেবব্রত, ঋতু শম্ভু মিত্রের আবৃত্তি এবং ১৪ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ (৭৭) যতগুলি সম্ভ সংবাদপত্র অবশ্য সেব্য। চিকিৎসার বা কদিন, বৈকুণ্ঠবাবু, দেখুন না এ প্রেসক্রিপসানটা মেনে।

দিলীপ সরকার
কেরানীপাড়া
জলপাইগুড়ি

ভি সি সুশীলবাবু

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য, সবসময়ে কর্মব্যস্ত, প্রায় ছফিট লম্বা, স্বাস্থ্যবান, নিরভিমানী বাষট্টি বছর বয়সে আন্তর্জাতিক নামী বিজ্ঞানী সুশীল-কুমার মুখোপাধ্যায়, শুনে দিনে মাত্র ... আহার করেন, রাতেও তাই, অথচ অফুরন্ত উৎসাহ তাঁর, ক্লান্ত হন না, বিরক্তি নেই, জোরে কথা বলেন না কখনো।

আজন্ম শিক্ষক আপনি, এ দায়িত্বশীল প্রশাসনিক কাজে এলেন?

'এ কাজ একদম ভালো লাগে না, তবে দায়িত্ব এসেছে, অনিচ্ছা সত্ত্বে নিয়েছি।' হেসে বললেন, 'কাউকে না কাউকে তো নিতেই হবে দায়িত্ব।'

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে এই বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে চালানো সম্ভব, আপনি বলেছিলেন, এ কি ভাবে? —ইন টিউন যদি থাকে, সবাই যদি মনে করে কাজটা তুলে দিতে হবে তবে কোনো কাজই কঠিন নয়। কাজ গুলো ভাগ করে দিতে হবে। মানুষের সংখ্যা বেশী হলেই সমস্যাও আসে নানা ধরণের, মানুষ তো মেশিন নয়, প্রত্যেক আলাদা ইউনিট, তাই শ্রম বিভাগ চাই। আপনি বলেছেন, বিজ্ঞানের গবেষণার চেয়ে আমাদের কলাবিদ্যায় গবেষণার মান নীচু, এটা কিভাবে ঠিক করা যায়?

...ঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

'এটা কিন্তু এখনকার অবস্থার ...থা বলছি। আগে কলা শাখার ...বেষণার মান খুবই উঁচু ছিলো। এখন ...দেশে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ...বিজ্ঞানের জন্য। এটা বোঝা যায়, অন্যান্য দেশের গবেষকরা, লেখকরা ...াঁদের লেখায় বিজ্ঞান শাখার উল্লেখ ...রেন বেশী, এটাই স্বীকৃতির প্রমাণ।'

আপনার অবসর সময় কিভাবে ...াটে ?—'হ্যাবিট কীড়ার নই, তবে ...ড়তে ভালো লাগে সাহিত্য। তার মধ্যে ...ায়-বিজ্ঞান আমার প্রিয়। এক সময় প্রতি বছরই একটি করে ভাষা শেখা আমার নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাছাড়া, বিজ্ঞানের পড়াশুনা, গবেষণায় এমন ব্যস্ত থাকতে হয়, সাহিত্য পড়ার সময় পাই না।' হেসে বললেন, 'খুব কবিতা পড়তাম এক সময়। জীবনানন্দ, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে পড়তাম, ভালো লাগতো। অবশ্য সব কবির সব লেখা ভালো লাগতো না।'

অবসর সময়ে ম্যাথমেটিক্যাল পাজল খুব ভালো লাগে। এ নিয়ে সময় কেটে যায়। বিজ্ঞানের বাইরের পড়ার বিষয়ে সিসটেমেটিক হবার সময় পাইনি।

ছাত্রদের রাজনীতি ? —'আমি দর্শ বিশ্বাস করি না। ছাত্ররা রাজনীতি করবে তবে, পড়াশোনাও করবে, আগে যেমন ছিলো। রাজনীতি ছাত্রকে ব্যবহার করবে, এটা ভালো লাগে না, আগে এভাবে ব্যবহৃত হত না তারা। ...দলের দাবিদাওয়ার ডিমান্ড নিয়ে আসবে, আমি ছাত্র ছাত্রদের অভাব অভিযোগ, ...

কোন কোন শিক্ষক ছাত্রদের প্রশ্নে বিরক্ত হন দেখেছি, আমি অ্যাপলায়েড সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে ভালো ছাত্র পেয়েছি। ... করেছে, উত্তর দিয়েছি—ভালো লাগতো। ছাত্রদের প্রশ্নের উত্তর না দিলে তাদের ক্রিয়েটিভিটি নষ্ট হয়।

আমেরিকাতে দু' বছর গবেষক ছিলেন, ইন্দোনেশিয়াতে ফ্যাকালটি অফ্ ন্যাচারাল সায়েন্স ও ম্যাথমেটিকস এবং ফ্যাকালটি অফ এ্যাগ্রিকালচার গড়ে তুলবার কাজ নিয়েছিলেন ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে। দিল্লিতে জাতীয় কৃষি কমিশনের সদস্য ছিলেন, কল্যাণী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য, বোস ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ছিলেন। তার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। এতো সব থাকা সত্ত্বেও তিনি শিক্ষক, জাত-শিক্ষক, পড়াতে ভালোবাসেন। একজন কৃষিবিশেষজ্ঞ বলেও আন্তর্জাতিক খ্যাতি এই দেশবরেণ্য বিজ্ঞানীর।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

কৃষ্ণা ঘোষ

কৃষ্ণা ঘোষ সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ে (১৯৬২-৬৫)পড়াশুনা করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি বসন্তকুমার গাঙ্গুলীর অধীনে থেকে কাজ করেন। আকাদেমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারীতে তাঁর ১৪খানি তৈলচিত্র ঝোলানো হয়েছিল। সেই সঙ্গে ছিল তাঁর পাঁচ বছরের মেয়ে দেবযানী ঘোষের চারখানি জল রঙের ছবি।

এই প্রদর্শনীতে শ্রীমতী ঘোষের দুটি স্টিল লাইফ, একটি পোর্ট্রেট ও একটি ল্যান্ডস্কেপ ছাড়া আর সব ছবি ছিল মূলত বৃত্ত ও ত্রিভূজাকৃতি আবর্তনে আঁকা। কিছু মৌলিক ও যৌগিক রঙের সংমিশ্রণে, রেখা ও আকৃতির সাযুজ্যে যে ভারসাম্য ধরা পড়েছে তাতে কোন ভর ও ঘনত্বের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় নি। কোন কোন ক্ষেত্রে বিমূর্ত অবয়বের সারল্য বেলুনের আদল নিয়ে সমস্ত পট জুড়ে ভেসে বেড়াচ্ছে বলে মনে হয়েছে। বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় রঙ নির্বাচন ও সাযুজ্য আরোপের ক্ষেত্রে শিল্পী দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিক ডাইমেনশন আনার চেষ্টা করেছেন, ফলে মুখাবয়বের সঙ্গে অন্য প্রত্যঙ্গের সাদৃশ্য এবং একই পটের ওপর রেখার বিন্যাসের সঙ্গে বিস্তার ও যোজনা আনার ক্ষেত্রে একাধিক দুর্বলতা ধরা পড়েছে।

তাঁর স্টিললাইফ দুটি ও পোর্ট্রেটটি মোটামুটি ভালো। কিন্তু 'শিলং' নামের ল্যান্ডস্কেপটি সেরকম উৎরায়নি। বিশেষ করে শিলং-এ ঐ জাতীয় সরলাকৃতি ঝাউগাছ দেখা যায় না। ল্যান্ডস্কেপটি অনুজ্জ্বল ও ম্রিয়মাণ। 'ফুল' নামের তৈলচিত্রটিতে আছে একটি কিশোরী ফুল নিয়ে খেলছে কিন্তু আমার মনে হয়েছে ফুলেরা খেলছে কিশোরীটিকে নিয়ে—খুব সুন্দর ছবি। সেই অনুপাতে তাঁর 'রহস্যময়' নামের তৈলচিত্রটি দুঃখ দিয়েছে।

শিল্পীর পাঁচ বছরের মেয়ে দেবযানী ঘোষের জল রংয়ের ছবিগুলি ভালো লেগেছে। বিশেষ করে একটি তো খুবই ভালো। ছবির নাম বা নম্বর না থাকার জন্য উল্লেখ করা গেল না।
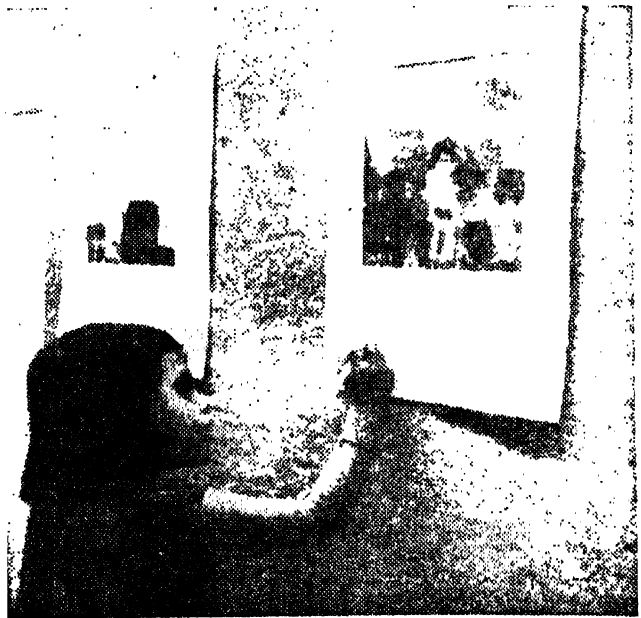
দেবযানী ছবিতে নাম সই করছে

বাঙলার বাইরে বাঙালী

নয়াদিল্লি

প্রবাসী বাঙালীর সাহিত্য-সাধনা পুরোনো খবর। বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন চিরস্মরণীয় কথাশিল্পী প্রবাসী ছিলেন। একজন বাঘা সাংবাদিকও বটে। এর মূলে কোন প্রেরণা কাজ করত নিশ্চিতভাবে তা নির্ণীত হয়নি। তবে সম্ভবতঃ অনেকেই একমত হবেন প্রবাসী বাঙালীর সাহিত্য-সভা বা আড্ডা এ-ক্ষেত্রে অনেকখানি কার্যকর থেকেছে। শরৎচন্দ্র, শরদিন্দু, রামানন্দের নাম এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে।

বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই, আজও তেমনি সাহিত্য-সভা বা আড্ডার প্রচলন প্রবাসে অব্যাহত রয়েছে। এবং সর্বার্থে তা কলকাতার আড্ডা থেকে স্বতন্ত্র রূপে এবং ধর্মে। দিল্লির কথাই ধরা যাক। বাংলার বাইরে বাঙালীর এত সমাগম আর কোথাও নেই। সরকারী ভাষায় যা 'পূর্ব' পাকিস্তান উদ্বাস্তু সাধারণের কলোনী', পুরসভার ভাষায় সেটাই 'চিত্তরঞ্জন পার্ক' এবং দিল্লির তাবৎ অবাঙালীর কাছে সেটাই 'বাংগালী কলোনী' বা 'বেঙ্গলী কলোনী', আনুমানিক ১৫ হাজার বাঙালী এই এলাকায় বাস করে। অবাঙালীর সংখ্যা এক শতাংশেরও কম।

এমন একটি কলোনীতে সাহিত্য-সভা বসবেই, ধরে নেওয়া যায়। না হলেই আমরা বিস্মিত হতাম। এছাড়া বাঙালী অধ্যুষিত কারোল বাগ, বিনয় নগর, গোল মার্কেট, রামকৃষ্ণ পুরম, কাশ্মিরী গেট এলাকা তো আছেই। তাছাড়া আছে প্রথম সারির লেখকদের আড্ডা। আসলে দিল্লিতে এমন একটি ছুটির দিন মিলবেই না যেদিন কোথাও-না-কোথাও সাহিত্য-সভা বসবেই।

কলকাতায় সাধারণতঃ যে আড্ডা বসে, যতদূর জানি তা প্রতিষ্ঠিত লেখক এবং প্রতিষ্ঠা অভিলাষী পূর্বোক্ত লেখকদের কিছু স্তাবকদের আড্ডা হয়। দিল্লির ক্ষেত্রে এই ছবিটা একেবারেই আলাদা। এটা ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে, স্রেফ আড্ডায় উপস্থিত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যেই লেখকরা লেখেন। লেখা থেকে প্রশংসা-নিন্দা ইত্যাদির দেনা-পাওনার পরই সব ফাঁকা। আয়োজন পরবর্তী আসরের।

দিল্লির সাহিত্য-সভার ধর্মটাও কেমন আলাদা। যুগের ফারাক জরাট করেই বিছানো হয় আসরে বসবার চাদর। চিত্তরঞ্জন পার্কের গত ফেব্রুয়ারির সাহিত্য-সভাকেই ধরা যাক। একটি বিদগ্ধজনের অ-সাহিত্যমূলক রচনার সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠলেন তরুণ দল। যুক্তি-তর্ক-ঝড়। মাথা নোয়ালেন বয়স্ক লেখক। তরুণ কবি তড়িৎ মিত্রের কবিতা নিয়ে চুলচেরা বিচারে নিশ্চিধায় বসে গেলেন দুই প্রবীণ কথাশিল্পী ও কবি। আপাতঃ দৃষ্টিতে একে যুগের লড়াই মনে হয়। কিন্তু গভীরে পারস্পরিক শ্রদ্ধা স্পষ্ট।

এক অর্থে এর মানে নেই। কেননা, কোন রচনাই ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হবে না। কোথাও না। তবু লড়াই, তর্ক। যাকে বলা যায় চর্চা। প্রকৃত চর্চা। এসব আসরে চমকে দেবার মতো কবিতা, গল্প বা প্রবন্ধ পাঠ হয় না এমন নয়। কিন্তু পীঠস্থান কলকাতার দূরত্ব এবং প্রকৃত বিদগ্ধজনের সঙ্গে এদের আরও দূরত্ব এদের উৎসাহের জন্মই দেয়নি বলে বোধ হয়।

তবে কেন? প্রশ্ন করেছিলাম কয়েকজন উদ্যোক্তাকে। উত্তর: এমনি। বাঙালীর কৃষ্টিকে ধরে রাখা। বাংলার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখা। উত্তরটা আমার যথেষ্ট মনে হয়নি। আসলে, এ স্বভাব। বাঙালীর স্বভাব। বাঙালীর সাহিত্য-সাধনা।

চিত্তরঞ্জন পার্কের কয়েকজনের পরিচয় দিলে আমার বক্তব্যটা পরিষ্কার হবে।

মণি রায়। গল্প লেখেন। পাঁচ ফুট উঁচু। মিলিটারি ডাক্তার। অবসরপ্রাপ্ত মেজর। বাড়ি বাড়ি খোঁজ নেন: মেয়ে কেমন আছে? ছেলেটা খাওয়াদাওয়া করছে ঠিকঠাক? একে বাড়িতে নিয়ে এসো, টিকাটা দিয়ে দেবো। ঘরে স্ত্রী। একটি মেয়ে। বিয়ে দেওয়া দরকার।

ফণি বসু। পেশা: ডাক্তারী। নেশা: শিল্প-সংগ্রহ। মনন: কবি। দুটি কবিতার আর একটি প্রবন্ধের বই প্রকাশ করেছেন। কবিতাকে ভালোবাসেন। দীর্ঘ কবিতা কম লেখেন।

স্বপনপ্রসন্ন রায়। চৌত্রিশ বয়স। বাংলার অধ্যাপক। ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনানন্দ বানান লিখতে না পারায় জব-স্যাটিসফ্যাকশন নেই। যে-কোন সাহিত্য রচনাকে সমালোচনা করেন। আসরে ওকে চাই-ই চাই।

হিমাদ্রি দত্ত। চারুকলার ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। ঠাস বুনুনির কবি। শব্দ খেলিয়ে কবিতা লেখেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জন্য 'জান' দিতে রাজি।

মিহির রায়চৌধুরী। এককালের হাংরী জেনারেশন সদস্য। অচলপত্রের এককালের নিয়মিত লেখক। তির্যক দৃষ্টি। খেলাধুলোর ওপর কয়েকখানা বই বের করেছেন। নিজের পকেট থেকে খরচা করে 'কাগজ' বের করেন। বাজার-গবেষণায় বাস্তব-অভিজ্ঞতা রয়েছে। পাঠকের চাহিদা নিয়ে সমীক্ষা করেছেন বিস্তর। রম্যরচনায় ইনি শিবরামে অনুসারী। পেশায় বাংলার অধ্যাপক

তড়িৎ মিত্র। চারুকলার ফাইনা ইয়ার। ওর কবিতার একটি লাইন 'তড়িৎ তড়িৎ কোথায় তুলেছ ভিত

আসরে উপস্থিত প্রত্যেককেই কিছু না-কিছু পড়তে হয়। সেই সংখ্যা প্রা তিন। কাউকে কিন্তু বলতে শুনিনি আমি অমুক পত্রিকার লেখাটা পাঠাতে চাই।।

অরুণ চক্রবর্তী

শহরতলী

মফঃস্বল

আদিবাসী সম্মেলন

সম্প্রতি তিনদিন ধরে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম শহরের কাছে ইন্দির ময়দানে (বেতকুন্দরী গ্রামে) সার ভারতের আদিবাসী সাঁওতালদের এব সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রায় বিশ হাজার প্রতিনিধি এসেছিলেন। সম্মেলনে সাঁওতালি শিক্ষা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচী প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা হয়। বিভিন্ন বক্তা এই আলোচনায় যোগদান করেন। আদিবাসী সাঁওতালদের উন্নতি বিষয়ে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

বার্ষিক সমাবর্তন

গত ২৬ ফেব্রুয়ারী ঝাড়গ্রামে দেবেন্দ্র-মোহন হলে 'ঝাড়গ্রাম সঙ্গীতায়ণ'-এর পঞ্চদশ বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবটি বীরেন্দ্রবিজয় মল্লদেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ করা হয়।

কৃষি ও শিল্পের আলোচনা সভা

মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার কাপগাড়ী সেবা ভারতীতে গত ২৬ ফেব্রুয়ারী থেকে তিনদিনব্যাপী এক অনুষ্ঠানে ইনস্টিট্যুট অফ এডুকেশন এ্যান্ড সোস্যাল গ্রোথ-এর পরিচালনায় এক জাতীয় কৃষি ও শিল্প আলোচনা সভা এবং প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। আলোচনার বিষয় ছিল জাতীয় পরিকল্পনার সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের উৎস ও তার পুনর্গঠনে গ্রামীণ প্রভাব। ঐ আলোচনা সভায় ভারত সরকারের পদস্থ কেন্দ্রীয় অফিসার, পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গের কৃষি কমিশনার শ্রীএস কে ঘোষ প্রভৃতি আলোচনা করেন।

আদিত্যকুমার বাকুলী

ভাজুনী

কৃষি সংক্রান্ত বিভাগে শুধু চাষ ও চাষী নিয়ে আলোচনা করলেই তো হবে না। কৃষি ও কৃষকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রামে এমন অনেক সম্প্রদায় আছেন, তাঁদের কথাও চিন্তা করতে হবে।

যেমন ধরুন ভানকী মেয়েদের কথা। আগে গ্রামে ঘরে ঘরে ঢেঁকি ছিল। অভাবী মেয়েরা ঢেঁকিতে ধান ভেনে সংসার চালাতেন।

দুজন ঢেঁকিতে পাড় দিতেন। গৃহস্থের একজন সেঁকুর দিতেন (ধানে হাত বুলিয়ে গড়ে ফেলে দেওয়াকে সেঁকুর দেওয়া বলে)। যাঁরা পাড় দিতেন তাঁরা পেতেন শলিতে (এক শলি ধান সমান এখন আধ মন) এক সের চাল। দু শলি ধান ভানা হলে এক কাঠা (দু সেরে এক কাঠা) চাল তাঁদের পাওনা হত। আর পেতেন দু শলি ধানে এক কাঠা মুড়ি (শলিতে এক সের মুড়ি, এ সের ওজনের সের নয়। মাপের বেতের তৈরী সের)। দু পলা নারকেল তেল মাথায় মাথার জন্য।

এখন গ্রামে গ্রামে ধান ছানা কল হয়ে গেছে। তাই ঢেঁকি প্রায় উঠেই গেছে।

কারণ দু শলি (মানে এক মণ) ধানে কলের মজুরী এক টাকা মাত্র। সেখানে ঢেঁকিতে ভানতে গেলে ভানকী মেয়েদেরই দিতে হবে এক কাঠা চাল। যার ওজন প্রায় দু কেজি। যার দাম চার টাকা। তার সঙ্গে এক কাঠা জল খাবার মুড়ি। তাও ওজনে আড়াই শো গ্রাম হবে। তার দামও এক টাকা হবে। দেখা যাচ্ছে যেখানে কলে ধান ভানালে এক মণে এক টাকা খরচ হয়, সেখানে পাঁচ টাকা চলে যাচ্ছে ঢেঁকিতে।

আবার গৃহস্থের একজন মহিলাকে সঙ্গে লেগে থাকতে হবে সেঁকুর দেওয়ার জন্য। এক মণ (দু শলি) ধান ঢেঁকিতে ভানতে কয়েক ঘন্টা লাগবে।

এই কারণেই গ্রামের ভানকী দুঃস্থ মহিলারা আজ নিঃসহায়।

অনেকে ভাজুনীর কাজ করে সংসার চালাবার বৃথা চেষ্টা করছেন। ভাজুনীর কাজ হল মুড়ি ভাজার কাজ।

গৃহস্থের বাড়ীতে মুড়ি ভাজেন। প্রতি খোলা (দু কাঠা চাল। প্রায় ৪ সের) মুড়ি ভাজার জন্য তাঁদের পাওনা প্রনের পয়সা। এক সের মুড়ি (মাপের)। যার ওজন এক শো গ্রামের কিছু বেশী। আর পাবেন এক পলা সরষের তেল।

একজন ভাজুনী দিনে বড় জোর ৩-৪ খোলা পর্যন্ত মুড়ি ভাজতে পারেন। কিন্তু একঘরে তো আর রোজ ৪ খোলা মুড়ি ভাজা হয় না, তাই এ-ঘর সে-ঘর করে কাজ যোগাড় করে নিতে হয়।

সমস্ত দিন পরিশ্রম করে ৪ খোলা মুড়ি ভেজে তাঁর পাওয়া হয় নগদ ষাট পয়সা, দু'কাঠা মুড়ি ও ৪ পলা সরষের তেল।

ঐ মুড়ি ভাজুনীদের সাধারণতঃ বাঁধা ঘর থাকে। কার ঘরে কবে ক-খোলা মুড়ি ভাজতে হবে, এঁরা খবর রাখেন। পরিবর্তে তাঁদের ঐ পাওনা। আর পাওয়া পিঠে-পার্বণের সময় (বাউনিতে) একটা নারকেল, এক পোয়া গুড় আর একপোয়া চাল। এছাড়া যে গৃহস্থের ঘরে দুর্গা লক্ষ্মী কালীপুজো আছে, তাঁদের ঘর থেকে পুজোর সময় কাপড় একখানা। তাও আবার সকলে দেন না।

এই রোজগারে কি সংসার চলে? তবুও করতে হচ্ছে পেটের দায়ে, না করে উপায় কি? না করলে উপোষ দিয়ে মরতে হবে যে। কে আর সহজে মরতে চায় বলুন!

বিজয় অধিকারী

আবার পড়লাম

কলেজপাড়া হলেই বোধহয়, কপালকুন্ডলা আমাকে ততো টানে না। বেশী বয়সে দেবী চৌধুরানী খুব ইচ্ছাপূরণের খেলো নাটক মনে হয়েছে। আনন্দ মঠ উদ্দেশ্য প্রণোদিত, বিষবৃক্ষ লেস ইম্প্রেসিভ, দুর্গেশনন্দিনী নাটুকে, মেলোড্রামাটিক। যা আজো সমান ভালো লাগে, লাগছে—তা রাজসিংহ।

রাজস্থানের পার্বত্য দেশে ক্ষুদ্র রাজ্য রূপনগরের রাজা বিক্রম-সিংহের অন্তঃপুরে এল এক তসবির-ওয়ালী। তাকে ঘিরে পুরবাসিনীদের অনেক রসিকতা হল। তসবিরওয়ালী রাজকন্যা চঞ্চলকুমারীর রূপে স্তম্ভবাক হয়ে প্রণাম জানাচ্ছে। এ প্রণাম রাজকুলকে নহে—এ প্রণাম সৌন্দর্যকে। বুড়ী যে সৌন্দর্য দেখিল, তাহা দেখিয়া প্রণত হইতে হয়।'

অন্তঃপুরের অসাধারণ নিখুঁত বর্ণনার পরেই এই লাইনটিতে এসে বার বার থেমে গেছি আমি।

ঔরঙ্গজেব ও রাজসিংহের দুটি তসবির ও চঞ্চলকুমারীর মনে ভিন্নমুখী প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা থেকেই নিপুণ শিল্পী বঙ্কিম আভাস দিয়েছেন উপন্যাসের মূল ক্রাইসিসের। পরে ধীরে ছড়িয়েছে কাহিনীজাল। আমরা পেয়েছি নির্মলকুমারীকে। দরিয়াবিবিকে। অশ্বারোহী সেনানায়ক মবারক। ও বিলাসিনী কূট বুদ্ধি জেব-উন্নিসা। সে ভাবে আল্লার বহুবিধ বিধি কাফেরের জন্য, গরীবের জন্য, বাদশাহজাদীর জন্য নয়। তার কোনো পাপপুণ্য বোধ নেই। জেব-উন্নিসার সঙ্গে দরিয়ার কথোপকথন অনেকবার পড়েছি। দরিয়া বলছে—'আবার আসিব— আবার জ্বালাইব—আবার মার খাইব— আবার টাকা নিব। তোমার সর্বনাশ করিব।' জেব-মবারকের প্রেমালাপ বাংলা সাহিত্যের গর্ব।

মবা। আল্লা তবে বাদশাহজাদীদিগকে কি জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন?
জেব। সুখের জন্য।
ভালোবাসা দুঃখ মাত্র।

চঞ্চলকুমারীর আলমগীর চিত্র-পদদলন কাহিনী তসবিরওয়ালীপুত্র—দরিয়াবিবি— জেব-উন্নিসা— উদিপুরী বেগম মারফত ঔরঙ্গজেবের কানে গেল। প্রতিশোধ স্পৃহায় চঞ্চলকুমারীর পাণিপ্রার্থী হলেন বাদশাহ আলমগীর। চঞ্চলকুমারী অপরিচিত মহারানা রাজসিংহকে এক অসামান্য পত্র লিখলেন। পথে পত্রবাহক অনন্ত মিশ্র ও দস্যু (পরে রাজসিংহের একান্ত অনুগত) মানিকলালের কাছ থেকে তা উদ্ধার করলেন রাজসিংহ স্বয়ং। সেনানায়ক মবারক চঞ্চলকুমারীকে দিল্লি নিয়ে যাচ্ছিলেন। সুচতুর মানিকলালের সাহায্যে শীর্ণ গিরিপথে ইঁদুরের মত দু-হাজার মোগল সৈন্যকে পিষে মারলো মাত্র একশো রাজপুত সৈন্য। বঙ্কিমের এই মিলিটারি উইট অন্য কোনো উপন্যাসে নেই। সপ্তম খন্ডে এই মিলিটারি উইটের আরো ডিটেল পরিচয় আছে। পর্বতরুদ্ধ আবদ্ধ আলমগীর সেখানে অনাহারে মারা যেতে যেতে নির্মলকুমারীর কাছে রুটি ভিক্ষা করে পায়রা পাঠাচ্ছে। পরে 'মহিষী, কন্যা ও খাদ্য পাইয়া ঔরঙ্গজেব বেত্রাহত কুক্কুরের মত বদনে লাঙ্গুল নিহিত করিয়া রাজসিংহের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিলেন।

রাজসিংহ কখনো নীরস ইতিহাস ও কখনো ঘটনাবহুল উপন্যাসের সমন্বয়। রাজা, রাজকন্যা, বাদশাহ-বেগমের কথা ছাড়াও এখানে আছে উন্মাদিনী দরিয়াবিবি যাকে কিছুতেই ভুলতে পারিনি, আছে বিলাসিনী জেব-উন্নিসার বিলাপ ও প্রেম, আছে বাদশাহ আলমগীরের সঙ্গে 'অসাধারণ-বুদ্ধিমতী নির্মলকুমারীর দুর্ধর্ষ, নির্ভীক আলাপের মত পরিচ্ছেদ। আছে একই সঙ্গে নাটক, উত্তেজনা, যুদ্ধ, প্রেম ও চাতুরালি।

সোমক দাস

কানাকানি

সুলতা

বাংলা ছবির ভ্যাম্প সুলতা চৌধুরী এখন তাঁর ভ্যাম্পিশ ইমেজ ঝেড়ে ফেলতে ভয়ানক ব্যস্ত। চরিত্র নেবার সময় আজকাল নাকি সেজন্য তিনি একটু বাছবিচার করছেন। 'এই পৃথিবী পান্থনিবাস'-এর ওড়িয়া চাকরানী যৌতুকীর চরিত্র থেকেই তাঁর এই চেষ্টার প্রমাণ মিলবে। তাছাড়া তিনি এখন অবসর সময়ে নিয়মিত কথক নাচের পাঠ নিচ্ছেন শ্রীমতী বেলা অর্ণবের কাছে। খুব শিগ্‌গিব যদি সুলতাকে রবীন্দ্রসদনে একক কোনো নৃত্যানুষ্ঠানে দেখেন অবাক হবেন না যেন!

* * *

রণজিৎ মল্লিক নাকি স্থির করেছেন আর তিনি 'পরগাছা' হবেন না। অর্থাৎ তেমন প্রয়োজন না হলে এক-দুই নম্বর শিল্পীর সঙ্গে একই ছবিতে কাজ করবেন না। ছবিতে চিত্রনাট্যের ক্ষীরটুকু নাকি তাঁরাই নিয়ে নেন। বাংলা ফিল্মের নাবালক নায়ক সাবালক হচ্ছে তাহলে! রণজিৎবাবু, আপনার সিদ্ধান্ত সত্যি হলে সাধুবাদ জানাতে হয়, এতদিন লাগল আত্মবিশ্বাস অর্জনের জন্য। কিন্তু একটা প্রশ্ন—এই সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারবেন তো!

* * *

'আনন্দ' বা 'নমক হারাম'-এর শিল্পী অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে আজকের অমিতাভ বচ্চনের কোনো মিল নেই,—বলেছেন সতীর্থ রাজেশ খান্না।

* * *

ধর্মেন্দ্র-হেমার জুটি কি এবার ভাঙনের মুখে? অনেকের মুখেই এই রসাল খবরটা শোনা যাচ্ছে। পর্দায় এবং পর্দার বাইরে এতদিন দুজনে একই দোলনায় দুলতেন। এখন নাকি হেমার দোলনার সঙ্গী বদল হতে চলেছে। নতুন সঙ্গীটি কে জানেন? কবি - গল্পকার - চিত্রনাট্যকার গীতিকার-সংলাপ রচয়িতা-পরিচালক মীনাকুমারীর প্রাক্তন প্রেমিক, রাখীর স্বামী, বস্কির বাবা শ্রীগুলজার। 'মীরা' এবং 'কিনারা' ছবি দুটিতে হেমাকে পরিচালনা করতে গিয়েই নাকি দুজনের এই 'গভীর' বন্ধুত্বের সূত্রপাত।

* * *

জর্জ বেকার। নামটি শুনেছেন কি? টি-ভিতে অসমিয়া ছবি 'চামেলী মেমসাহেব' দেখলে হয়তো বা নামটা চেনা লাগতে পারে। নচেৎ নয়। এই জর্জ বেকার এখন চামেলী মেমসাহেবের বাংলা, হিন্দী দুটো ভার্সানেই কাজ করছেন। জাতে আইরিশ, নাগরিকত্বে ভারতীয় এই তরুণই বোধহয় একমাত্র শিল্পী যিনি তিনটি ভারতীয় ভাষায় একই ছবিতে কাজ করছেন।

জর্জ বেকার

* * *

জীর্ণ বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্টিতে নতুন প্রযোজক প্রয়োজন, প্রয়োজন টাকার। কিন্তু নতুন প্রযোজক কোন রংয়ের টাকা নিয়ে কি উদ্দেশ্যে টালিগঞ্জ পাড়ায় ভিড় করছেন সেটা জানবার কি কোনো উপায় বার করা যায় না? বহু অভিযোগ শোনা যাচ্ছে যে, উটকো কিছু লোক কাঁচা টাকার থলি হাতে এসে ঝটিতি পাঁচ-ছ খানা ছবির মহরৎ করছেন টালিগঞ্জে, দু-চারদিন সুটিংও নাকি হচ্ছে তারপরই সব ফক্কা। এঁরা তো আসলে ইন্ডাস্টির শত্রু। এঁদের নিধন বোধহয় আশু প্রয়োজন।

ছবিপদ দর্শক

বছর পাঁচেক

ওষুধ ছুঁইনি

পর পৃষ্ঠার ছবিটা কোন বিকলা[ঙ্গের] নয়। ছবিটা যার সে আপনার আ[মার] মতোই চলাফেরা-করা পূর্ণদে[হী] মানুষ। বিশ্বাস করুন, একদিন আই পি রোডে ওকে চলন্ত বা[সে] লাফিয়ে উঠতেও দেখেছি। তা সত্ত্বে ছবিটা দেখে আপনার মনে যদি প্র[শ্ন] জাগে, ঘাসের বিছানায় শুয়ে গোড়া[লির] বালিশে মাথা রেখে শরীরটাকে দুমড়ে মুচড়ে ও কি করছে, তাহলে আম[ার] উত্তর, ছবির মানুষটি জেগে ঘুমুচ্ছে

ব্যাপারটা খুলেই বলা যা[ক।] প্রাচীনকালের সেইসব পৌরাণিক গা[থার] বিশাল জটাধারী বাকল-পরা মুনি ঋষিরা নাকি খুব অত্যাশ্চর্য ঘ[টনা] ঘটাতে পারতেন। ভগবানকে পা[বার] জন্য মুনি-ঋষিরা এতো ব্যাকুল ছি[লেন] যে, ঘুমিয়ে পর্যন্ত সময় নষ্ট কর[তে] চাইতেন না। তাই বিকল্প হিসেবে ও[রা] এমন একটা বিশেষ ব্যায়াম আবিষ্ক[ার] করেছিলেন, যা মিনিট পনের ক[রলে] ঘণ্টা ছয়েক নিদ্রাদেবীর কোলে বিশ্[রাম] নেবার কাজটা মিটত।

ছবির মানুষটি অবশ্য মুনি-ঋ[ষি] কেউ নয়, একজন হবু-ডাক্তার, তব[ে] ঐ বিশেষ ব্যায়ামটা—যার নাম বি[...] যোগনিদ্রাসন—আয়ত্ত করে[...] প্রতি[...] যোগিতায় চমক দেবার [...] দিয়েছে ভালমত এবারে। পাতিয়ালায় জাত[ীয়] যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতাতে—যাতে [...] মতো নম্বর থিয়োরী ও প্র্যাকটিক[্যাল] মিলিয়ে আর কেউ পায়নি। আ[...] এতক্ষণ ভারত চ্যাম্পিয়ন যোগব্যায়া[ম] বীর স্বপন রায়ের কথাই বলছি।

বিধান শিশু উদ্যানের লাইব্রেরী[তে] বসে স্বপন আমার সাথে কথা বলছি[ল।] তার কিছু আগেই শ' দুয়েক বাচ[্চা] ছেলেমেয়েকে যোগব্যায়াম শেখাতে গি[য়ে] হিমসিম খাচ্ছিল ও। খুব দ্রু[ত] গতিতে যোগব্যায়াম জনপ্রিয় হচ্ছে—স্বপন ওর অভিমত জানাল আমাকে। দশ বছর আগে বাংলাদেশের পাব[না] জেলা থেকে স্বপনদের পরিবার [...] করেকজন কলকাতা এসে আস্তা[না] গেড়েছিলেন। ঠাকুর-দেবতা ভক[্ত] ওর বাবা যোগব্যায়াম করতেন দেখে দেখাদেখি স্বপনও চেষ্টা করত। কল[ক]াতায় একদিন কলেজ স্ট্রীট ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হ[লে] করেকজনকে যোগ করতে দেখে একটি মনে মনে স্বপনের পাম্মাগানবত [...]

যোগনিদ্রায় স্বপন রায়

প্রতিমূর্তিটা ভেসে ওঠে। সঙ্গে ও ভেতরে ঢুকে পড়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্য টেনার কমল ভাণ্ডারী জানিয়ে দেন, স্কুলের পড়ুয়াদের ন শেখানো হয় না। কলেজের ছাপ াই। স্বপন এই যোগব্যায়ামের সেই হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে ানুদাস কলেজে ভর্তি হবার পর- হাজির হয় ইউনিভার্সিটি স্টিটিউট হলে।

মানিকতলার প্রতাপচন্দ্র হোমিও- ক কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র স্বপন। পড়াশুনার ক্ষেত্রটা হঠাৎ ন ফেলল কেন এ-কথা জিজ্ঞাসা ে স্বপন উত্তর দিল—'হোমিও- থ পড়তে গিয়েছি যোগব্যায়ামের ই। জানেন নিশ্চয়ই, যোগব্যায়ামে রের অনেক রোগ সারানো যায়। াপ্যাথি এবং হোমিওপ্যাথির ংসা যেখানে শেষ, আমাদের সেখানে শুরু। আমি নিজেও যোগব্যায়াম ু করার আগে ছোটখাট অসুখে ুগতাম। বছর পাঁচেক আর ডাক্- রের কাছে যাই না। আসন করলে গ সারে কিন্তু অ্যানাটমি, ফিজিও- জি সম্বন্ধে যদি জ্ঞান থাকে, তাহলে গব্যায়ামকে মাধ্যম করে আমার পক্ষে রো নিশ্চিতভাবে রোগ সারানো ভব হবে। সেই কারণেই হোমিও- াথি পড়ছি।

স্বপন জানাল, বেলেঘাটায় বাড়ির মনে ও নিজস্ব পদ্ধতির দাওয়াইখানা লেছে। তিন-কামরার ডাক্তার- নাটির নাম দিয়েছে 'সুস্বাস্থ্য'। শিশি বোতল, আলমারি, চেয়ার- টেবিল, ওষুধপত্তর—ওর ডিসপেন- সারীতে কিছুই নেই। শুধু সারি সারি গদি পাতা—জাঙ্গিয়াপরা ডাক্তারবাবু প্রেসক্রিপসন দেন। আপনার ডায়বেটিস আছে, কিংবা হাঁপানী? অথবা হজমের গোলমালে অনেক মধুর মুহূর্ত আপনার কাছে বিস্বাদ হয়ে যায়। স্বপনের কাছে সব বেয়াপ্পা অসুখ- গুলোরই দাওয়াই পাবেন। দীর্ঘজীবী হতে চান? রোজ অর্ধমৎসেন্দ্রাসন করুন, তাহলে আপনার জন্য পৃথিবীর আলো-বাতাস অনেকদিন ধার্য থাকবে। সারাদিনে দশ মিনিটের কয়েকটি যোগ- ব্যায়াম করুন— আপনার 'স্ট্রোক' হবে না।

যোগব্যায়াম বিদেশেও যেমন জন- প্রিয় হচ্ছে, তেমনি এখানেও। মধ্য- শিক্ষা পর্ষদ পরীক্ষায় কুড়ি নম্বর ধার্য করেছে যোগব্যায়ামের জন্য। এতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহ বাড়বে। কিন্তু সিলেবাস সম্পর্কে স্বপন মোটেই সন্তুষ্ট নয়। ও বলেছে, 'কয়েকটি যোগব্যায়াম সিলেবাস থেকে বাদ দেওয়া উচিত। ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে ওগুলো মানানসই নয়। আমার মতে ঐ বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য কয়েকটি এমন যোগব্যায়াম নির্দিষ্ট রাখা উচিত যা শুধু পরীক্ষার নম্বরের জন্য ছেলে- মেয়েরা করবে তাই নয়—শরীরটা নীরোগ রাখার জন্যও করবে।'

রূপক সাহা

নড়বড়ে চিত্রনাট্য

জীবনের পথে হাঁটতে হাঁটতে দুজন তরুণ-তরুণীর প্রেমের আকাশে কিভাবে হঠাৎ ছড়িয়ে পড়েছিলো অন্য এক মহিলার দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ—তাই নিয়েই 'চলতে চলতে' ছবি। অত্যন্ত সাধারণ, বোম্বাই ঘরানার আর পাঁচটা ছবির মতই, তবু কেন যেন সেই ভাগ্যা- হতা নারীটি মনের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ ছাপ রেখে যায়। মনে থেকে যায় সেই গানটি: চলতে চলতে/মেরে ইয়ে গীত ইয়াদ। রাখনা।কভী আলভিদা না কহে না। তার কারণ হয়ত শ্রীমতী সিমি গাড়ওয়ালের সফল অভিনয়। হয়ত কিশোরকুমারের অসামান্য কণ্ঠস্বর। কিংবা হয়ত দুইই।

তার মানে অবশ্য এই নয় যে চলতে চলতে আলাদা কিছু। আমি শুধু বলব বাণিজ্যিক পরিচালকদের মধ্যে এই ছবির কর্ণধার শ্রীসুন্দর দার কিছুটা বুদ্ধিমান। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য নড়বড়ে চিত্র- নাট্য, অপ্রয়োজনীয় গান, যৌন উৎকোচ, এসব আছে ঠিকই। কিন্তু এর পরেও কোথাও কোথাও সামান্য মাত্রাবোধেরও পরিচয় আছে। যেমন সিমির প্রেম ও বিবাহের পর্ব অযথা দীর্ঘায়িত করা হয়নি। দৃষ্টিকটু ভাঁড়ামিও হিন্দী ছবির তুলনায় অবিশ্বাস্যভাবে কম।

বাপী লাহিড়ীর সংগীত পরিচালনা নিয়ে কোন কথা না বলাই ভালো। তবে সুরকার হিসেবে তিনি অন্ততঃ দুটি ভালো গান উপহার দিয়েছেন।

সিমি আশাতীত ভালো অভিনয় করেছেন। ঈর্ষা ও কামনায় দগ্ধ অপকৃতিস্থা রমণীর অভিব্যক্তি আমাদের সহানুভূতি পায়।

গলায় লাল রুমাল উড়িয়ে প্রায় দেব আনন্দ ভঙ্গীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এই ছবির নবীন নায়ক বিশাল। প্রেমিকাকে কারণে-অকারণে আদর করায় তাঁর তৎপরতা যেমন সুপ্রমাণিত, অভিনয়ক্ষমতা তেমন নয়।

ভারতবর্ষ মূলত যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ ও এই দেশে অঙ্গাবরণ বাহুল্যমাত্র, এটা বোঝা গেল নায়িকা নার্জাননকে দেখে। যথাসম্ভব কম পরিধেয় ব্যবহার করে তিনি শরীরে এমন সুষমা খুলেছেন যে দর্শককে রুদ্ধশ্বাস হতে হয়।

মোট কথা, যদি ভুলে যাওয়া যায় যে, পশ্চিমাঞ্চলেও এখন সাথু, মণি কাউল বা কুমার সাহনির মত পরিচালকরা আছেন আর দর্শকের যদি শিল্প-সম্পর্কিত দাবি না থাকে, তবে এই ছবি খারাপ লাগবে না।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

উত্তম কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য!

কুমাগত রাজা এবং জমিদার সেজে বাংলা ছবির নড়বড়ে রাজ্য শাসন করবার পর ক্লান্ত উত্তমকুমার এখন হয়েছেন বাগবাজারের ভোলা ময়রা। টালীগঞ্জে এ বড়ো অদ্ভুত ব্যাপার। এ্যান্টনী যিনি, তিনিই আবার ভোলা।

সুপ্রিয়া

আরও বলা যেতে পারে—তিনিই শ্রীকান্ত এবং সন্ন্যাসী রাজা এবং আরও অনেক কিছু। তাই সাধারণভাবে আমরা ছবিতেও এ্যান্টনীকেও দেখি না, ভোলাকেও না। দেখি উত্তমকুমারকে।

উত্তমকুমারের এতদিনকার এ্যান্টনী ইমেজকে ভেঙে ভোলা ময়রা হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থিত করার কৃতিত্ব রাখলেন পরিচালক পীযূষ গাঙ্গুলী। এর জন্য শুধু যা দরকার হয়েছে তা হল বেশ পুরু একজোড়া গোঁফ। শেষের দিকে তারও আবার মানানসই পরিবর্তন ঘটেছে। তাই কাজকরা পাঞ্জাবি আর বাহারে ধুতি পরে সুদর্শন উত্তমকুমার যখন নেচে নেচে আসরে গান করেছেন তখন আর যাই হোক তাঁকে অন্তত একবারের জন্যও ময়রা বলে মনে হয় নি। যদিও তাঁর অভিনয় আর দশটা ছবির মত এখানেও দারুণ। কিন্তু চেহারায় তিনি চরিত্রটিতে কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য? অর্থাৎ অভিনীত চরিত্রটিতে শিল্পীকে কতটা মানাতে পারে—এটাই দেখা দরকার। এখানেও আমরা এক-সময়ে জানতাম বিদ্যাসাগর মানেই পাহাড়ী সান্যাল, মাইকেল উৎপল আর রামকৃষ্ণ গুরুদাস। কিন্তু এখন আর কেউ এ সবের ধার ধারেন না। যে কোনো বিখ্যাত চরিত্রেই এঁরা উত্তম কুমারকে ইনভেস্ট করতে প্রস্তুত। এর ওপর আবার কালী হয়েছেন সুপ্রিয়া দেবী।

ভোলা ময়রাতে শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ভোলার জীবনকে থাপছাড়াভাবে তুলে ধরা হয়েছে। চিত্রনাট্য অসংলগ্ন। তাই ভোলার জীবন ও পারিবারিক জীবন কোনোটাই তেমন জমতে পারে নি। ভোলা তার ছেলেবেলার সঙ্গিনী কালীকে কিভাবে পাপের রাজ্য থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করে তাই নিয়েই ছবির অনেকখানি। কালীকে কেন্দ্র করে ভোলার সংসারে অশান্তির ঝড় ওঠে। স্ত্রী এলোকেশী তাকে ভুল বোঝে। ভুল বোঝে কালীকেও। অবস্থা একসময় চরমে উঠলে কালীকে আত্মহত্যা করতে হয়। এর কিছু পর কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে ভোলাও মৃত্যুকে বরণ করে। তখন ছবিও শেষ।

পনেরো রীল দীর্ঘ ছবির বেশ কিছু রীল গানে গানেই কেটে যায়। যা পড়ে থাকে তার ভেতরেও আবার প্রথম দিকের সিনেমাটিক ঝড় ও বৃষ্টিতে অনেক ফুটেজ খেয়ে যায়। দিনের বেলার বৃষ্টির সঙ্গে রাতের বেলার আকাশ ও বিদ্যুতের চমক ছবির আর এক বিশেষত্ব। সাজসজ্জাও সেইরকম। কোনো কোনো সময়ে ভোলাকে রাজা বা জমিদার মনে হতে পারে। আর কালী না বলাই ভাল।

ছবিতে রয়েছে প্রচুর গান। যে ধরনের গানের সুর রচনায় অনিল বাগচীর জুড়ি মেলা ভার। গেয়েছেন মান্না দে, হেমন্ত, আরতি এবং আরও অনেকে। তবে সত্যিকারের কবিগানের মেজাজ পাওয়া গেছে কেবল ... হরিধন এবং নীলিমা দাসের মুখের গানগুলিতে। অন্যগুলো ত রাগ, তাল, লয় ও অলংকার সম্বলিত পরিপূর্ণ গান। আর গান যে ছবির সব মুহূর্তগুলিতে রসসৃষ্টি করতে পেরেছে এমন নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে এর অপপ্রয়োগের ফলে স্টোরীর স্রোত বাধা পেয়েছে।

তবুও ছবিতে ভাল লাগবার মত অনেক কিছু রয়ে গেছে। ভাল লাগবে উত্তম- সুপ্রিয়া- বিকাশ-অনুপ- হরিধনের অভিনয়, মান্না দের গান, ফ্ল্যাসব্যাকে কালীর জীবনের কিছু ইতস্তত ঘটনা, একটি মর্মান্তিক দৃশ্যে সতীদাহের (ওই সময়েও কি তা অত রব ছিল?) উপস্থাপনা এবং এলোকেশীর বাড়ীর কিছু ঘরোয়া দৃশ্য। আর সবচেয়ে ভালো লাগবে এলোকেশী লিলি চক্রবর্তীকে।

অসিতবরণ মিত্র

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

মূল্য ৭৫ পয়সা ॥ অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা ॥ ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য।

শুক্রবার ২৩ বৈশাখ, ১৩৮৪

Friday 6th May, 1977

১৬শ বর্ষ ৫০ সংখ্যা

প্রচ্ছদ ও ভিতরের ছবি এঁকেছেন সুবোধ দাশগুপ্ত

আগামী সংখ্যায়

চাণক্য সেনের কলম

শংকর গুহর স্কেচ

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের কবিতা

পাকদণ্ডী

বিশ শতকের শুরু থেকে

বাঙালী জীবনের স্মৃতিআলেখ্য

লিখেছেন

লীলা মজুমদার

শিশিরকুমার দাশের

বাঙালীর নাম

তারাদাস বন্দোপাধ্যায়ের

সরপুরিয়ার দেশে

গল্প লিখেছেন

সেলিনা হোসেন

প্রচ্ছদ কাহিনী

মেছোঘাতের পাঁচালী

লিখেছেন

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

শান্তিনিকেতনে

ভ্রান্তিবিলাস

বিশ্বভারতীর জীবনযাত্রার মধ্যে ছন্দোপতন ঘটতে শুরু করেছে এক যুগ আগেই। ইদানীং কিছুদিন স্তিমিত থাকার পর ঝাঁকুনির মাত্রা আবার রীতিমতো উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, জায়গাটির নাম শান্তিনিকেতন।

শান্তিনিকেতনের এই অশান্তির কারণ খুঁজে বার করার জন্যে একটি কমিশন নিয়োগ করা হয়েছে। কাজেই পরিস্থিতি নিশ্চয়ই জটিল।

ইতিমধ্যে যাতে নতুন কোনো ঘটনা ইন্ধন না জোগায় সেদিকেও নিশ্চয় নজর রাখা হচ্ছে। শান্তিনিকেতনের মতো জায়গায় লাঠালাঠি, খুনজখম এবং পুলিশী ধরপাকড়—আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এ এক অকল্পনীয় দুর্ঘটনা।

বিশ্বভারতী যখন স্থাপিত হয়, কতকগুলি উদ্দেশ্যের কথাও তখন চিন্তা করা হয়েছিল। বিশ্বভারতীর গঠনতন্ত্রের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছিল সেইসব ধ্যানধারণা। তারপর দিনে দিনে কবিগুরু শিক্ষার বিষয়ে অনেক কথা বলেছেন, বিশ্বভারতীও বিকশিত হয়ে উঠেছে দিনে দিনে। আজ এই প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে যদি নতুন করে ভাবতে হয়, নিশ্চয়ই এর পূর্ব-ইতিহাসের কথাও বিবেচনা করতে হবে।

একথা অবশ্য কেউই বলবেন না যে, রবীন্দ্র-তিরোভাবের পর্বে বিশ্বভারতী যেখানে ছিল সেখানেই তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক। কেননা তা করা হলে প্রতিষ্ঠানটি হয়ে দাঁড়াবে মনোরম একটি যাদুঘরের মতো। আমাদের প্রবহমান জীবনধারা থেকে সরে দাঁড়াতে হবে তাকে, আমাদের প্রতিদিনের অস্তিত্বের সঙ্গে তার কোনো নাড়ির যোগ থাকবে না।

কিন্তু সে তো হবে আমাদেরই অক্ষমতার পরিচয়। কেননা রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব নিয়ে এখনো আমাদের মধ্যে বর্তমান, রবীন্দ্র-ঐতিহ্য আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এখনো রয়েছে সমানই সতেজ, সক্রিয় এবং চলিষ্ণু।

বরং এই স্বীকৃতিই আজ আরো প্রাসঙ্গিক যে, আগেকার চাইতেও রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের প্রভাব এখন আরো বেশি ব্যাপক ও গভীর। এবং সবথেকে যা গুরুত্বপূর্ণ কথা, রবীন্দ্র-উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হলে আমাদের জাতীয় ঐক্যের একটা প্রধান বন্ধনই যাবে ছিন্ন হয়ে, আন্তর্জাতিক চিন্তাজগতেও হয়ে পড়ব আমরা গুরুত্বহীন এবং প্রাদেশিক।

কিন্তু বিশ্বভারতীকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার উপায় নিশ্চয়ই তাকে আর দশটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিদ্যাবিপণিতে পরিণত করা নয়। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে পরিবর্তন অবশ্যই কাম্য এবং সেটা অনিবার্যও। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশাতেও শুধু সাহিত্য শিল্পকলা ও গানের মধ্যে আটকা না রেখে বিশ্বভারতীরই সঙ্গে সংযোজিত করেছিলেন শ্রীনিকেতনকেও। তাছাড়া বিজ্ঞানের বিষয়েও কবির আগ্রহ যে কতো ঐকান্তিক ছিল তার পরিচয় তো বইয়ের মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু অসুবিধা হয়েছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ যা করতেন তাকে শিক্ষা ও জীবনচর্যার বিষয়ে তাঁর মূল ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেই স্থান দিতেন। আর, আমরা হয়তো হারিয়ে ফেলেছি পরিমিতি বোধ, অথবা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বকেই হয়তো মনের মধ্যে স্থান দিতে পারিনি আজো।

আর, আমাদের সেই ভ্রান্তিবিলাসের ফলেই হয়তো বারেবারে এত অশান্তি।
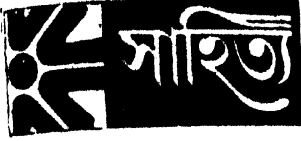
আবার একজন রবীন্দ্রনাথ চাই

আমাদের আবার একজন রবীন্দ্রনাথ দরকার। ভীষণ দরকার।

যিনি অ্যালবার্ট হলের সভায় তথাকথিত প্রগতির জোলো সেন্তের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলবেন। দরকারে সবার হাতে রাখী বেঁধে দিয়ে কলকাতার রাস্তা দিয়ে সদলে গাইতে গাইতে যাবেন।

চারিদিক খুব এলোমেলো হয়ে আছে। কারণ, গভীরভাবে শ্রদ্ধা করার মত কিছু পাওয়া যাচ্ছে না।

পোশাক, আহার, বাগভঙ্গী, ভাষা—সবই এখন নিশ্চরিত্র অবস্থা। কোন কলেজের কাছাকাছি রেস্তোরায় বসলেই এ অবস্থা পরিষ্কার বোঝা যায়। ঢোলা ট্রাউজার পরে অনেকেই বিস্কুটের গুঁড়ো মাখানো জুতোর সুকতলা ভাজা খাচ্ছে। বর বলবে ফিস্‌ফ্রাই। খেতে বসে এরা যে-ভাষা যে-ভঙ্গীকে ব্যবহার করে—তার সঙ্গে বাংলার কোন যোগ নেই। নাগপুরের প্রবাসী বাঙ্গালী এদের দেখে যদি অবাঙ্গালী ভাবেন—তবু তাঁকে কোন দোষ দেব না।

আমরা আবার একবার রবীন্দ্রনাথকে চাই। মনুমেন্টের বারান্দায় তিনি ঊনত্রিশ বছর বয়সের চেহারা নিয়ে ফিরে আসুন। শহীদ মিনারে এখনকার যুবকরা সমবেত হয়ে দেখুক—নিজের পোশাক পরলে নিজের বাচনভঙ্গীতে কথা বললে বাঙালীকে কত সুন্দর লাগে।

বঙ্গ এবং বাঙ্গালী কথাটা অনেক দিনের। বাঙালী হয়ে ওঠার ব্যাপারটি সেই অনুপাতে অল্পদিনের। বিশেষ করে জাতীয় আন্দোলন, বিদ্যাসাগরের স্বাদেশিকতা বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দ্রুত স্বাদেশিক করে তুলেছেন। ভালো স্বদেশী মানেই ভালো বাঙালী।

ঊনত্রিশ বছর বয়সটা বড় তেজী। এই বয়সেই কলকাতার আড্ডাধারী, জমজমাট, গাইয়ে বাজিয়ে, নাটক থিয়েটারের কবিতাকানন থেকে দেবেনবাবু তাঁর রবিকে মহাল দেখতে পাঠিয়েছিলেন। রবি এগারো বছর ধরে গাঁয়ের বসবাসকে কখনোই বনবাস মনে করেননি। গান, গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভূমি সংস্কার, কৃষি, শিক্ষা, গ্রামীণ ব্যাংক ইত্যাদির বীজ তিনি সেখান থেকেই বয়ে এনেছেন তাঁর চিন্তার পঞ্চবটীতে। ট্রেন ধরে কলকাতায় পালিয়ে এসে তিনি চাকরি খোঁজেননি। কিংবা গাঁয়ে চলো আন্দোলনের মোহান্ত সেজে বসেননি। গত পঞ্চাশ বছরে গ্রামময় স্বদেশের দিকে ফিরে তাকানোর জন্যে আমাদের কে আর অনুপ্রাণিত করতে পেরেছেন। আমাদের গ্রামের নবীন যুবক কলকাতায় এসে ম্যাগাজিনে কবিতা লিখতে চায়। যেকোন অফিসে করণিক হতে পারলে তাঁর আর কিছু চাই না। বাড়িতে তো ভাগচাষের ধান আছেই। তাতেই মা-বাবার চলে যাবে কায়ক্লেশে। আমি তো শহুরে হয়ে যাই।

ফলে আমাদের কবিতাগুলো, গল্প-কাহিনী, উপন্যাস ইত্যাদি আসলে ট্যাসগরু। তার কোন ইতিহাস বা ভূগোল নেই। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ বা ফেল—জুতো-পায়ে-দেওয়া, 'ক' শ্রেণীর রেশন কার্ড নির্ভর, ভাড়াটে বাড়ির বাসিন্দা কিছু অ্যামিরিক ও বাচাল বাঙ্গালীর পদ্য-গদ্য-শব্দকে সাহিত্য ও ফিল্মজ্ঞানে একটি দোআঁসলা জাতকে আমরা পরিবেশন করে চলেছি। ফলে এই শিল্পের পরিণাম—ঠোঙা।

আমাদের সিনেমার সবচেয়ে বড় চিন্তাশীল মানুষটির সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি, তাঁর কাছে আধুনিক বাঙ্গালী মননের প্রতিভূ চরিত্র যে অপু—তার ভাবনা-চিন্তার জগৎ বড়জোর ১৯৩৭।৩৮ অব্দি ব্যাপ্ত। তিনি সেই অব্দি আঁকতে ভালোবাসেন। অবশ্য একেবারেই ইদানীংকার কথাও তিনি একবার বলেছেন।

বাজনা বোঝাই বাংলা ছবির গানে কখনো গায়ক-গায়িকার শ্বাস-প্রশ্বাসকেও সাউণ্ড এফেক্ট হিসেবে কাজে লাগানো হচ্ছে। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা এখনো সাবালক হয়নি।

রামভোজ দত্তচৌধুরীর এক বংশধরের বাড়িতে খেতে বসে বুঝেছিলাম—উত্তর ভারতের এক বিশাল এলাকার বাসিন্দাদের জাতীয় কোন বাসনপত্র নেই। বগি থালা কিংবা পাথরবাটি নেই ওদের। সবই স্টেইনলেস। শুতে গিয়ে বুঝেছিলাম—কাঁথাও নেই ওদের। ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হয়েছিল—লুধিয়ানায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে। আধুনিক পাঞ্জাবের রবীন্দ্রনাথ—এম এস রানধাওয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তিনি সেখানে পাঞ্জাবের ইতিহাস নিয়ে একটি যাদুঘর গড়ে তুলেছেন। প্রচুর ফলনের কল্যাণসোনা গম বীজের উদ্ভাবক কল্যাণ গাঁয়ের ওঃ অটলের ছবি থেকে শুরু করে মোগল আমলের রান্নার বাসনপত্র এই যাদুঘরে রাখা হয়েছে।

সেদিক থেকে খাগড়াই জোগাড়ে, বালুচরী, তসরের বাঙালীর আজ এ কি অবস্থা। দীর্ঘদিন প্রবাসে থেকে কয়েক বছর হল একটি বাঙালী দম্পতি কলকাতায় বাসা বেঁধেছেন। তাঁরা মারাঠী যাত্রা, পুলা দেশপাণ্ডের হাসির নাটক, পার্সীদের ভাষান্তরিত নাটক, গুজরাটি স্টেজের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত। গত তিন বছর এই দম্পতি আকাদেমি রবীন্দ্রসদন কলামন্দিরে নাটক দেখছেন। তাঁরা বললেন, সব নাটকের সুরই তো একরকম। কাহিনীও এক। চোখ পচে গেল। সেই একই প্রতীকী বিপ্লব।

বললাম, শম্ভু মিত্রের চার অধ্যায় দেখেছেন?

না দেখিনি।

তাহলে অন্যরকম লাগতো আপনাদের।

এরকম অনেক ব্যাপারেই রবীন্দ্রনাথকে আবার টেনে আনা যায় দেখা যাচ্ছে।

যেমন: গান, নাচ, নাটক, পোশাক, ঘরসাজানো, মঞ্চ পরিকল্পনা—আরও কত কিসে। এমনকি ঘর সাজানোতেও।

বৈকুন্ঠ পাঠক

অন্যত্র

অমৃত—১ এপ্রিল, ১৯৭৭। তিনটি কবিতা লিখেছেন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়। দুটি কবিতার নাম যথাক্রমে 'যাও' এবং 'বাল্যবন্ধু'। তৃতীয় কবিতাটি নামহীন। তিনটি কবিতাই নিষ্প্রভ প্রতিভার সাক্ষ্য দিচ্ছে। নামহীন কবিতাটি ছড়াজাতীয় অথচ ছড়া হিসেবেও এটি উচ্চস্তরের মনে হল না বরঞ্চ তুলনামূলকভাবে সপ্তাহের কবিতা চারটি অনেকজ উজ্জ্বল। বিশেষ করে বুদ্ধ চক্রবর্তীর 'বংশ মর্যাদা' এবং তরুণ ভরদ্বাজের 'ভালোবাসা দূরে হলে, রক্তপাত'। ছোট গল্প এবারে দুটি—শৈবাল মিত্রর 'কুয়ো' এবং দীপংকর দাসের 'আবার একজন'।

'কুয়ো' গল্পটি বাঁধুনী বেশ আঁট সাঁট এবং বক্তব্যও সুন্দর।

'শরৎচন্দ্রের একজন ছোট বোন ছিলেন'—এ তথ্য সরবরাহ করেছেন শরৎ-বিশেষজ্ঞ গোপালচন্দ্র রায়।

'সাহিত্য বিভাগে' বৈকুন্ঠ পাঠকের 'একটি গল্প দাও গো যাদু' আধুনিক ছোট গল্প লেখকদের গাইড হিসেবে কাজ করবে।

অমৃত পত্রিকা অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ রচনায় সমৃদ্ধ হচ্ছে কিন্তু ছাপা বড় অস্পষ্ট। অনেক রনাই বেশ কষ্ট করে পড়তে এবং বুঝতে হচ্ছে।

দুর্গাপুর সংবাদ
৬ এপ্রিল ॥ ১৯৭৭

স্নেহাকর ভট্টাচার্যের কবিতা

যৌবন উড়িয়ে দেওয়া যায়

যৌবন উড়িয়ে দেওয়া যায় কিন্তু জরা তো পাথর, আমি তাই
ভাঙাচোরা প্যাকিং বাক্সের মতো পড়ে আছি পরিত্যক্ত একা,
একা—তবু বুকে ও গলায়
কফের মতোন কত কথা আর চিন্তা জমে ওঠে
নিজে নিজে কথা বলি, সামান্য বেরোয়
বাকিটা ভিতরে খুব কষ্ট দেয়, বিছানায় বালিশে চাদরে
জরার এবং মালিশের গন্ধ আছে জানি, সেটা কী এমন
যাতে বমিবমি পায়, সহজে আসে না কেউ, ওদের সবার
নিঃশ্বাস নেবার ভঙ্গি দেখে বুঝেছি, অথচ আগে....
কাকের কোরাস, যত দিনের ইঁদুর শিশুদের কিচমিচ
মানুষের আহ্লাদের শব্দ যেন গভীর দুরভিসন্ধিমূলক, সবাই
আমাকে তাড়াতে চায়, গলা মুচড়ে দিলে তবে শান্তি হতো বুকে,
হাতে পায়ে একটু জোর পেলে আমি খাট থেকে নেমে
ওষুধপত্রের তাকে চেয়ারে টেবিলে সারা সংসারের মুখে
দিতাম পেচ্ছাব করে, সকলই নিজের হাতে গড়া বলে আমি
কতদিন চুপ করে থাকবো, মেঝেতে বালতির শব্দ
কাজের স্ত্রীলোক এসে ঘর মোছে, আমাকে ভেংচায়
এবার খাটের নিচে অর্ধেক শরীর ঢুকে যাবে
পাছা শুধু উঁচু হয়ে দুলবে কাছেই
হাতে পায়ে একটু জোর পেলে....
খালি ঘুম পায় মাঝে মাঝে স্বল্পস্থায়ী মৃত্যু আসে
তেমন পছন্দমতো পাছা হলে আগেও বিশেষ অগ্রপশ্চাৎ বিচার
করিনি, একবার মনে পড়ে, এখন আর মনে নেই,
পাকাপাকি মৃত্যু বুঝি সহজে আসে না
আসলে আমার অবসাদও
কোনো কোনো স্ত্রীলোকের পাছার মতোনই খুব ভারী
রোদ্দুরে রোগের মতো বেড়ে ওঠে, মাথা ঝুলে পড়ছে, আমার
চিন্তা ও তন্দ্রার ফাঁকে ফাঁকে অধোবায়ু নিঃসরণ হতে থাকে।

সিংহের সৌন্দর্য নিয়ে

সিংহের সৌন্দর্য নিয়ে মৃত্যু এসেছিল একদিন।
আমাকে শঙ্কিত দেখে বনের গভীর দিকে চলে
গিয়েছিল। তারপর এই পৃথিবীতে মানুষের
সংক্রামক মৃত্যু-মলিনতা মেখে সিংহের সন্ধানে
সময় ফুরালো। আমি হয়তো জীবিত নই, তবে
শবের বিষণ্ণ স্বপ্নে এবং নীরব প্রার্থনার
অন্তিম বিদ্রোহে দেখি অলৌকিক সিংহের থাবায়
আমার হৃদপিণ্ড জ্বলে তীব্র কোনো প্রতীকের মতো।

তুমি চলে যাবে

তুমি চলে যাবে এবং যাবার ক্ষণ
বলে রেখেছিলে আমাকে অনেক আগে।
আমি যে রমণী-হৃদয়ের যত সাধ
সব ভালোবাসা মমতা দুর্বলতা
জানা হয়ে গেছে এমন অহংকারে
এত পাপ আর এত অপরাধ নিয়ে
তোমার ব্যথায় দুঃখে ও অভিশাপে
কোনো উদ্বেগ গ্লানিও রাখিনি বুকে।
অথচ যখন যাবার সময় হলো
স্মৃতিতে রক্তে নরকবাসের ভয়ে
কী লজ্জাহীন বুকের আর্তনাদে
সে-নারী তাকালো, কণ্ঠে করুণামাখা—
কেন ভয় পাও, এই ভালোবাসা জেনো
সৃষ্টিকে ধরে রাখে, কোনদিন ঠোঁটে
অভিশাপ যদি এসে থাকে তবু ছিল
অন্তরে ক্ষমা শত শতবার ক্ষমা।

জন্ম—১৯৩৩ : চাকুরীজীব

স্নেহাকর ভট্টাচার্য

লেখার শুরু পাঁচ-এর দশকেই, ভূমেন্দ্র গুহ, সমর চক্রবর্তী আর স্নেহাকর ভট্টাচার্য সেই তিন তরুণ যাঁরা জীবনানন্দের অতি ঘনিষ্ঠ ছিলেন, সম্পাদনা করেছিলেন ময়ূখের জীবনানন্দ সংখ্যা যা ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত ইতিমধ্যেই; ষাটের শুরুতেই এই তিন তরুণের কবিতা আর চোখে পড়লো না, জীবনের অন্য কোনো সার্থকতার টানে তাঁরা পাঠকের চোখের বাইরে; কিন্তু স্নেহাকর ভট্টাচার্য সেই অজ্ঞাতবাসকে কবিব্যক্তিত্ব গঠনের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন, তিনি আয়ত্ত করে নিয়েছেন নিজের বিশিষ্ট ভঙ্গি ও দেখার স্বতন্ত্র কোণ। তা জানা গেল অজ্ঞাতবাস থেকে সত্তর একাত্তরে তিনি যখন বেরিয়ে এলেন। তখন থেকেই তিনি অনিবার্য কবিব্যক্তিত্ব, যদিও প্রকাশ্য মঞ্চে তাকে দেখা যায় কদাচিৎ; ব্যক্তিগতভাবে বুদ্ধিদীপ্ত বাচনভঙ্গিতে কথা বলেন, সংযত, স্বল্পবাক কবিতাতেও এই একই চরিত্র প্রতিফলিত। একটিমাত্র কবিতার বই 'তৃষ্ণার তমসা', নাগরিক যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট তীব্র বিষ তাঁর কবিতায় তীক্ষ্ণ উপলব্ধি প্রোথিত শব্দে বেজে উঠল। সব অর্থেই নাগরিক, নগরপথিক একজন কবির দেখা পেলাম যার দুটো পা-ই মাটির উপর চলাফেরা করে, দেখে, বিশ্লেষণ করে, অনুভব করে; তাই রোমান্টিক ভাবালুতার বিরোধী স্নেহাকর, শ্লেষ ও ব্যঙ্গে মানুষের অসঙ্গত স্বভাবকে আঘাত করেন, পরমুহূর্তেই সমবেদনায় সেই ক্লিষ্টকর্মা মানুষের পাশেই দাঁড়ান পরম বন্ধুর মত।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

পল্লী বাঙলার দলিল

প্রচ্ছদ, মুদ্রণ এবং গ্রন্থের নাম এতই মেঠো এবং গ্রন্থপ্রণেতা এতই অপরিচিতা যে, এই বই আরো হাজারটা বাংলা বইএর ভীড়ে হারিয়ে গেছে। অথচ অজস্র মুদ্রণ প্রমাদের ভিতর দিয়ে পরিশ্রম করে এগিয়ে গেলে পাঠক এই বইতে ক্রমে ক্রমে রূপোর খনি, সোনার খনি ও হীরের খনির সন্ধান পাবেন।

এটি একটি পারিবারিক উপন্যাস। বাংলার এক অখ্যাত গ্রামের জমিদারবাড়ী এর পটভূমি। আজ থেকে প্রায় ষাট সত্তর বছর আগেকার সময়ের কথা। এক বালিকাবধূর দৃষ্টিতে জমিদার বাড়ীর অন্তঃপুর, অন্তঃপুরের মানুষগুলোর জীবন ও তাদের অন্তর্গত এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। এ ধরনের গ্রন্থে সাধারণত মেলোড্রামার প্রাধান্য থাকে, চরিত্রগুলি প্রায়শই অবাস্তব হয়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এ সবের কোন চিহ্নই এই গ্রন্থে নেই।

এই উপন্যাসের প্রায় সব উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলি মেয়েদের। বালিকাবধূ বিনু এর প্রধান চরিত্র তাকে কেন্দ্র করে আরো যে দশ-বারোটি নারী চরিত্র আছে, তাদের মাধ্যমে এক আশ্চর্য জগৎ আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। শ্বাশুড়ী, দিদিশ্বাশুড়ী, ননদিনী কুল, জমিদার বাড়ীর দাসী, নিজের মা—এরা সবাই মিলে আমাদের এমন একটা জগতে নিয়ে যায় যে জগৎ সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান এখনো আমাদের হয় নি। বাংলার পারিবারিক জীবনে শ্বাশুড়ী-বউ, অথবা ননদ-বউ-এর সম্পর্কের তিক্ততা কারো কাছে অবিদিত নয়। তেমনি অবিদিত নয় পুরুষ প্রধান সমাজের বনেদী পরিবারের অন্তঃপুরের অন্ধকারে তিল তিল করে ক্ষয়ে যাওয়া অগণিত নারীর জীবনের ইতিহাস। কিন্তু এ সবই আমরা জানতে বা বুঝতে চেষ্টা করি আমাদের শহুরে মূল্যবোধ দিয়ে। তার ফলে অনেক খুঁটিনাটি আমাদের দৃষ্টিতে হারিয়ে যায়। দূরত্ব এবং একটা আরোপিত মূল্যবোধের জটিলতায় বাস্তব নির্ভেজাল হয়ে ধরা পড়ে না।

এইখানেই এই গ্রন্থের বিশেষত্ব আত্মজীবনীমূলক এই উপন্যাসের ঘটনা এবং খান-কাল-পাত্রের বর্ণনায় কোন

সমালোচনা

অবাস্তব কল্পনার আশ্রয় নেই। ঠিক যেমনটি হত, তেমনিভাবেই সব কিছু এতে আছে। আর তার ফলেই চরিত্রগুলি অতিকায় হয়ে ওঠে নি। কেউই ঔদার্যে হিমালয় নয় অথবা হিংস্রতায় অসুর নয়। ঠিক যেমন সাধারণ চরিত্র হয়ে থাকে— সমাজ এবং কালের হাতের ক্রীড়নক।

তাই শ্বাশুড়ী মনোরমার জন্য অথবা দজ্জাল বাল-বিধবা মেজ ননদিনী সরস্বতীর জন্যও অন্তঃকরণ সিক্ত হয়ে ওঠে। ঠিক তেমনি ব্যথিত হতে হয় অনাদৃতা ঠাকুমা শিবসুন্দরীর জন্য। আর বালিকাবধূ বিনু? তাকে তো মনে হয় শত্রুপুরীর বন্দিনী রাজকন্যা। তার কোলকাতাবাসী যুবক স্বামী রাজপুত্রের মতই তাকে দিয়ে যায় মুক্তির আশ্বাস। সমান মমত্ববোধ দিয়ে এমন পরস্পর বিরোধী চরিত্রগুলির চিত্রায়ণ কী করে সম্ভব হল ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

লেখিকা একই প্রকার বাস্তবধর্মিতার পরিচয় দিয়েছেন বিনু এবং তার উনিশ-কুড়ি বছরের স্বামী প্রসাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বর্ণনায়। অতি-পরিচিত রোমান্সের লেশমাত্র নেই। অথচ দুটি-একটি ঘটনা, দুটি-চারটি সামান্য কথাবার্তা—এরই মধ্যে বিদ্যুতের মত হঠাৎ প্রেমের আলো দীপ্ত হয়।

একটি অত্যাশ্চার্য চরিত্র ঠাকুমা। অশিক্ষিতা এই রমণী হাজার নারকোলে কয় কুড়ি হয় জানেন না। কিন্তু যে কোন কথার পিছনে একটা যুতসই ছড়া বলতে তাঁর আর জুড়ি নেই। ছড়াই তার যুক্তি, ছড়ার মাধ্যমেই তিনি প্রকাশ করেন ক্রোধ, স্নেহ এবং ব্যঙ্গ। একদিন তিনি ছিলেন রায়বাড়ীর অন্তঃপুরের সম্রাজ্ঞী। আজ তাঁর কথায় দাস-দাসী-

গিরিবালা দেবী

ছাও মুখ টিপে টিপে হাসে। তবু তার রসবোধ যায় নি। তার কাছেই বন্দিনী বিন্দু প্রথম পায় স্নেহের স্বাদ। আর সেই স্নেহের রসে সিক্ত হয়ে রান্নাবাড়ীর অপরিচিত জগতে বালিকাবধু একটা আশ্রয় খুঁজে পায়।

এই গ্রন্থে অনায়াসে বাংলার পল্লীর সমাজজীবনের একটি নির্ভরযোগ্য দলিল হিসেবে পরিগণিত হবার দাবী রাখে। যাঁরা লোক সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করেন, তাঁরা এর মধ্যে পাবেন অমূল্য মণি-কাঞ্চন। প্রচুর অপরিচিত ছড়া, বাংলার পূজা-পার্বণের রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, মেয়েলী সংস্কার এবং পারিবারিক লৌকিকতা—ইত্যাদির আকর গ্রন্থ হিসেবে এই উপন্যাসটি ব্যবহার করা উচিৎ। বাংলার লোকজীবনের আলোচনায় এই উপন্যাসটির যে অসামান্য মূল্য আছে—সেকথা ভূমিকায় শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যও স্বীকার করেছেন।

এত তথ্য থাকা সত্ত্বেও উপন্যাস-টিতে শিল্পের প্রসাদগুণ সর্বত্রই বর্তমান। সাধু ভাষায় লেখা। অথচ ভাষা খুবই প্রাঞ্জল এবং অর্থবহ। চরিত্র-গুলি স্পষ্ট এবং বাস্তবধর্মী। নির্মোহ এবং স্বচ্ছ দৃষ্টি লেখিকার, অথচ মানুষের প্রতি তাঁর মমত্ববোধের অভাব নেই। বর্ষীয়সী এই লেখিকার কাছে আমাদের আরো দাবী রইল। কারণ, তিনি এমন একটা সময়কে জানেন, যে সময় সম্বন্ধে আমাদের সম্যক জ্ঞান নেই এবং যে সময়ের মানুষগুলোকে আমরা এখনো পুরোপুরি চিনে উঠতে পারি নি।

গৌতম ঘোষ

রান্নাবাড়ী—গিরিবালা দেবী। গ্রন্থ প্রকাশ। কলকাতা-৬। দাম : ১৪ টাকা।

চিরকিশোর কাহিনী

ডোম্বলের বয়েস সেই এক-জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। ১৯৪০এ যা, ১৯৭৭য়েও তাই। বছর কুড়ি আগে যখন আমি হ্যরিকেনের সামনে দুলে দুলে 'ওয়ার্ডবুক' মুখস্থ করতাম, তখন থেকেই 'ডোম্বল সর্দার' আমার চেনা। বাবার পুরোনো সেলফ থেকে বইটি পেয়েছিলাম। সেই ডোম্বল, যে কিনা নকল যুদ্ধের মহড়ায় সেনাপতির অভিমান ভুলে যায় না মাঝ নদীতে নৌকো ডোবার পরে সবাই যখন তাকে আরেকটা নৌকায় উঠতে বলে, সে জবাব দেয়, 'আমি সেনাপতি, সকলে না উঠলে আমি উঠবো না।' ট্রেন দ্রুত চলছে না দেখে দুরন্ত ছেলেটি মন্তব্য করে, 'খুব সম্ভব ড্রাইভার পাঁউরুটি খাচ্ছে, আর ফায়ারম্যান গাড়ি চালাচ্ছে।'

এই ডোম্বলকে কি কখনো ভোলা যায়।

যে আমার এক সময় 'ডোম্বল সর্দার' হতে ইচ্ছে করতো, সেই আমিও সেখান থেকে ১৫।২০ বছর পিছিয়ে এসেছি। কিন্তু এখনো বইটি আমার কাছে ততখানি রোমাঞ্চকর। এখনো কোন গভীর রাতে ডোম্বলের সঙ্গে একটা বাতাবি লেবু নিয়ে মেঠো পথ ধরে গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে যাই (প্রথম প্রকাশে [১৯৪০-এরও আগে] বইটির মলাটে সম্ভবতঃ এরকম এক ছবি ছিল), কখনো শালুকডাঙ্গা, কখনো বুড়ীর বাড়ী, কখনো বা পাগলাপাড়া—সে এক অদ্ভুত অ্যাডভেঞ্চার।

'ডোম্বোল সর্দার' সেই দুর্লভতম বই-এর একটি যা কোন দশকের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। যা কোনদিন পুরোনো হতে জানে না। এই বইটি এমন এক কিশোরের গল্প বলেছে, যে বাড়ীর চার দেওয়ালের মধ্যে নিজেকে আটকে রাখতে পারে না, পথে বিপদ জেনেও সে পথে দেয়। যে সময় 'ডোম্বোল সর্দার' রচিত সেই সময় কিশোর সাহিত্যে পক্ষীরাজ ঘোড়া আর রাজপুত্রের রাজত্ব (বহুলাংশে)। কিন্তু লেখক খগেন্দ্রনাথ মিত্র ডোম্বোলকে কোন কল্পনার রাজ্যে পাঠাননি। পাঠিয়েছেন এমন এক দেশে, যেখানে যে 'সে ধমাধম হাতুড়ি পিটবে, লোহালক্কর ঠেলবে, একদিন হয়ত একটা মটরগাড়ী, ডুবোজাহাজ বা এরোপ্লেনও তৈরি করে ফেলতে পারে।

'ডোম্বোল সর্দার' এই প্রথম তিন খণ্ড একত্রে প্রকাশ পেল। পাঠকদের এটা মস্ত বড় লাভ। কিন্তু বইটির বহিরঙ্গ সম্পূর্ণ আনন্দ দিতে পারেনি। ছোটদের জন্য যে বই, তার মলাটে যদি কোনো ছবি না থাকে, তাহলে তা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে বইকি। ভেতরে যে সব ছবি আছে তা অত্যন্ত দুর্বল ও বিশৃংখল টাইপের সঙ্গে একই কালিতে ছাপা। যেখানে প্রথম ও দ্বিতীয় পাতায় দুটো রঙ ব্যবহার হয়েছে, সেখানে ছবির ক্ষেত্রে এই ব্যবহার কেন বুঝলাম না। অসম্ভব মুদ্রণ প্রমাদ চোখে পড়ে। ক্ষুদিরাম বসু লিখিত ভূমিকা ছাড়া বইটি আগাগোড়া স্মল পাইকায় ছাপা, ছোটদের পড়ার পক্ষে অসুবিধে হওয়া স্বাভাবিক। এ সময় বাংলা বই প্রকাশনায় এত উন্নত হয়েছে যে তার কাছে এই বইটির প্রকাশ ভীষণ দায়সারা গোছের মনে হয়। প্রকাশক আরো যত্ন নিলে পারতেন।

বিকাশ জানা

ডোম্বোল সর্দার খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শিশু সাহিত্য প্রচার সংস্থা, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭। মূল্য ৮-০০।

গোপাল সান্যাল

জন্ম ১৯৩৩। কোলকাতার সরকারী চারু এবং কারু মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক। ১৯৫৯-৬০ সালে পেন্টিং-এ ভারত সরকারের জাতীয় বৃত্তিলাভ করেন। ক্যালকাটা পেন্টার্স-এর প্রতিষ্ঠাতা সভ্য। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত গ্রুপ এবং সর্বভারতীয় প্রদর্শনীর অংশ গ্রহণ করে থাকেন। ১৯৫৬ সালে কোলকাতায় একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দেশ বিদেশের বিভিন্ন সংগ্রহে তাঁর শিল্পকলা সুরক্ষিত আছে। বর্তমানে কোলকাতার ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে শিক্ষকতা করছেন।

যুদ্ধরত দুই পুরুষের ছবিতে গোপাল সান্যাল তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে এক বিষণ্ণ পরিবেশ তৈরী করেছেন। গোপাল তাঁর রেখার বিভিন্নতার বিচিত্র সহায়তায় ছোট ছোট রেখার সাহায্যে আপন বক্তব্য প্রকাশে সক্ষম হয়েছেন। এখানে জয়-পরাজয়ের চিত্রটি গভীরভাবে মানবিক আবেদনে পূর্ণ—যদিও সামগ্রিকভাবে গোপালের শিল্প-মেজাজের বিষণ্ণ দিক এখানে বেশ স্পষ্টভাবে উচ্চারিত।

চাণক্য সেনের কলম

এক এবং অনেক

'অমৃত' সম্পাদকের আতিথেয়তায় আজ থেকে প্রতি সপ্তাহে একবার আমি একটি 'কলম' লিখবার সুযোগ পেয়েছি। পত্রিকার এই পৃষ্ঠাটিতে আমি একা, এবং অনেক। লিখছি রাজধানী দিল্লীর বাঙালী পল্লীতে আমার বাস-গৃহের লাইব্রেরী-ঘরে; এখানেও আমি একা নই। অদূরে পথ থেকে নির্বাচনী মিছিলের সমবেত কণ্ঠধ্বনি ইলেক-ট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে চতুর্দিকে প্রসারিত হচ্ছে। আমার এই ঘরখানাতেই বই-এর মধ্যে জাগ্রত রয়েছে বহু দেশের বহু চিন্তাশীল মানুষের মননশীল অনুশীলন, বিষয় ও দৃষ্টিকোণের, কাল, দেশ, সমাজ-সভ্যতার গভীর ও ব্যাপক বিভিন্নতা সত্ত্বেও, যার প্রধান প্রসঙ্গ মানুষ। লেখক একা, কিন্তু একাকী নয়। লেখার মাধ্যমে সে পৌঁছতে চায় অনেকের কাছে, পৌঁছতে পারে না, যদি অনেকের মানসিকতার সঙ্গে তার সৃষ্টিশীল সংযোগ না থাকে। যদি-না তার লেখনী প্রতিধ্বনি করতে পারে বহুর চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রাম-সংঘাত, জয়-পরাজয়। এই বিচ্ছিন্নতার যুগেও লেখক মোটেই বিচ্ছিন্ন হতে পারে না পাঠক-সমাজের থেকে। লেখক, আর কিছু না হোক, যাত্রী ও পথিক। জীবনের পথে পথে তাকে ঘুরে বেড়াতে হয়। তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে বহু মানুষের মুখের রেখায় লুক্কায়িত অনুবেদন। অনেক হৃদয়ের তরঙ্গে যদি না সে উদ্বেলিত হয়, তার লেখনী পারে না সেই সীমান্ত অতিক্রম করতে যেখানে জীবন তার বিপুল রহস্য নিয়ে নিরন্তর অপেক্ষমান।

আজ এই 'কলম' শুরু করতে গিয়ে আমার মনে গুঞ্জরিত হচ্ছে মার্কিন বিপ্লবের কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের এক অবিনশ্বর কবিতার কয়েকটি লাইন।

> Walt Whitman am I, a kosmos, of
> mighty Manhattan the son,
>
> Turbulent, fleshy and sensual, eating,
> drinking and breeding;
>
> No sentimentalist—no stander above
> men and women, or apart from them;
>
> No more modest than immodest......
> I dote on myself, there is that lot of me
> and all so luscious.
>
> I hear the violencello, ('tis the young man's
> heart complaint.)......
>
> I believe a leaf of grass is no less than
> the journey-work of the stars.

হুইটম্যান যে বিস্ফোরক সত্য আবিষ্কার ও ঘোষণা করে-ছিলেন তার মর্মার্থ কি? মর্মার্থ হল : আমি কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান একা নই, তুচ্ছ নই, নগণ্য নই। আমি মহাজগৎ। ম্যানহাটান দ্বীপের সন্তান আমি, আমি তোমাদের সবারই মত দুর্বার, ভোগী, জীবন-লোলুপ, আমি কোনও মানুষের ওপরে নই, মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন নই, আমার আছে বিনয় এবং অহংকার; আমি নিজেকে ভালবাসি, আমি বিরাট, আমি কামুক; আমার কানে বেজে ওঠে যুব-হৃদয়ের অভিমান অভিযোগ; আমার কাছে একগুচ্ছ ঘাস আর ছিটকে-পড়া তারা সমান মূল্যবান।

এই কলম যাঁরা পড়বেন, তাঁদের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। এটা ভালো-মানুষের কলম হবে না। আমি নিজেকে ভালো-মানুষ মনে করি নে, যদিও ভাল মানুষ হয়ে

বেঁচে থাকতে চাই, চাই সবাই আমরা মানুষ হিসেবে নিজেদের কাছে খানিকটা গর্ব অনুভব করতে পারি। এটা ভীতু-মানুষের কলম হবে না : আমি ভয়হীন নই, কিন্তু ভীতুও নই। বুড়ো বুড়ো চোর ডাকাতদের এবং ছোট ছোট নানাবিধ কংসদের ভয়ে এ কলমের মুখ বন্ধ হবে না। এ কলম হবে না নয়ন-মুদে ধ্যানের, মনের কোণে জ্ঞান অন্বেষণের। আমি চাইব নির্ভয়ে নিভৃতে আপনাদের সঙ্গে চিন্তা-ভাবনা বিনিময় করতে।

কিসের চিন্তা? কি ভাবনা? বিনিময় কি সম্ভব এই বিচ্ছিন্নতার যুগে?

কে আপনি? আমাদের মনের দুয়ারে হাত পাতবার কি অধিকার আপনার?

আপনি লেখক? বুদ্ধিজীবি? আপনাদের, 'শিল্প আজ দুঃস্থের সংবাদ।'

উত্তরে বলব, যে চিন্তা-ভাবনা আমি-মানুষকে আঘাত করে, তার কিছু কিছু নিবেদন করব আপনাদের সামনে। এই বিশ্বাসে, ভরসায় যে তরঙ্গগুলি আপনাদের মানসিকতার তীরেও আছড়ে পড়বে, তাদের সঙ্গে তরঙ্গিত হবে আপনাদের মনও। বিচ্ছিন্নতার নদীতে সংযোগের খেয়া কি চলবে না? আমার বিশ্বাস চলবে। বিশ্বাস, আমরা এখনও বিচ্ছিন্ন নই পরস্পরের থেকে, ধনতান্ত্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার এ বিষ এখনও আক্রমণ করে নি আমাদের বিশেষ জোর নিয়ে।

উত্তরে বলব, আমি লেখক। আপনাদের হৃদয়ের ও মস্তিষ্কের ওপর আমার ভীষণ লোভ। হাত পাতব না, হাত বাড়াব। আপনাদের সঙ্গে আমার সংযোগ, 'সেই সত্যে জীবনের ঝোঁক,' সেই সত্যে জীবনের বিস্তার।

বুদ্ধিজীবির শিল্প কেন হবে দুঃস্থের সংবাদ? হয়েছে, মানতে রাজী। হতেই হবে, মানতে রাজী নই। ক্রমশ হবে-না, এ বিশ্বাস নিয়ে ভবিষ্যতের পথে দৃষ্টি রাখব। আমি এবং আপনারা।

আজ এই ছোট্ট মুক্তাঙ্গনে পর্দা তোলার দিনে সমস্যার অবতারণা করব না। আজ শুধু অঙ্গনের পরিবেশ বর্ণনা করব।

ক্ষুদ্র মঞ্চ। নগ্ন। দেওয়াল নেই। ওপরে আকাশ। নিচে সবুজ ঘাস। মঞ্চের এক কোণে একজন মানুষ তার নাম 'লেখক'। হাতে নোট বই, পেন্সিল।

মঞ্চের সঙ্গে প্রেক্ষাঙ্গনের স্তরভেদ নেই। প্রেক্ষাঙ্গন পরিপূর্ণ। মানুষে, পাঠক-মানুষ। প্রথম সারিগুলিতে যুবক-যুবতি, তরুণ-তরুণী কিশোর-কিশোরী, যারা আজকের বিঘ্ন-সংকুল পথ পেরিয়ে আগামীকালের পলাতক অঙ্গীকারের অনুসরণ করছে, এ-দেশে, বিদেশে, দেশে-দেশে। মধ্যের ও পেছনের সারিতে বয়স্করা, বৃদ্ধেরা একেবারে পেছনে।

পর্দা উঠবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম সারিগুলি থেকে যে ধ্বনি নির্গত হল, তাকে অভ্যর্থনা বলা যেতে পারে না। বলা যেতে পারে, অভিযোগ।

লেখক মুক্তাঙ্গনে সমবেত মানুষের চোখে দেখতে চাইল মুগ্ধ-দৃষ্টি। প্রশংসা। ভক্তি। স্তাবকতা।

দেখতে পেল, ক্রোধ। নৈরাশ্য। ঔদাসীন্য। নালিশ বর্জন।

লেখকের হাত থেকে নোট-বই আর পেন্সিল খসে পড়ল।

—আপনারা কারা? আপনাদের তো ডাকা হয় নি এখানে?

—ডাক শুনে কেউ আসে না আর আজকাল। আমরা নিজেরাই এসেছি নিজেদের গরজে।

—তারা কে, ঐ-যে ওরা, যারা আমাকে দেখা-মাত্র বিগলিত-নয়ন;

—তারা নেই।
—আপনারা কারা ?
—আমরা দাবীদার।
—দাবী ? লেখকের কাছে কোনও দাবী নেই কারুর।
—আমাদের আছে। আমরা আপনার পাঠক।
—কি দাবী আপনাদের।
—কৈফিয়ৎ।
—কিসের ? কার ? কেন ?
—লেখার কৈফিয়ৎ। কেন লেখেন ? কি লেখেন ? কি দেবার আছে আপনার ? শুধু কথা ছাড়া ?

পেছনের সারি থেকে জনৈকের ধ্বনি শোনা গেল : কৈফিয়তী কাল আর নেই।

সামনের সারিগুলি থেকে শক্ত আওয়াজ গর্জে উঠল, আছে, এবং থাকবে।

—এখন থেকে সবাইকে সবার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।
—শাসকগণকে শাসিতদের কাছে।
—নেতাদের জনতার কাছে।
—মালিকদের শ্রমিকদের কাছে।
—জমিদার-জোতদারদের কৃষি-শ্রমিকদের কাছে।
—লেখকদের পাঠকদের কাছে।

লেখক ভীত-চকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মানুষগুলির দিকে।

হঠাৎ সে এক অভিনব অনুভূতিতে চমকে উঠল।

সমবেত মানুষগুলির চোখ থেকে একটা নতুন দৃষ্টি সঞ্চারিত হল লেখকের চোখে।

শত শত হৃদয়ের উত্তাপ প্রবেশ করল লেখকের হৃদয়ে।

সহস্র স্নায়ুতন্ত্রীর সঙ্গীত সংক্রামিত হল লেখকের স্নায়ুতে।

লেখক নত হয়ে কুড়িয়ে নিল নোট বই আর লেখনী।

লেখনীতে চোখ পড়তে আঁৎকে উঠল।

চকচকে রুপালি ধার হঠাৎ এল কোথা থেকে এই ভোঁতা অর্থকরী যন্ত্রটিতে, বহু প্রসবে এই ক্লান্ত কলমে ?

লেখক ফিরে পেল অনেক দিনের হারান সম্পদ।

এবার সেও রুখে দাঁড়াল। প্রথম সারিগুলির সমবেত জ্বলন্ত দৃষ্টির সঙ্গে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল লেখকের জ্বালাময়ী দৃষ্টি।

অনেক হৃদয়ের সমবেত উত্তাপের সঙ্গে মিলল লেখকের অন্তরের উত্তাপ।

লেখক চেঁচিয়ে উঠল : শোনবার সাহস আছে আপনাদের ?

জবাব এল : আছে।

—যদি না থাকে, সে সাহস সৃষ্টি করুন আপনি, আপনারা।

লেখক বলল, যাদের নেই তারা যেতে পারেন।

উঠল না একজনও।

নির্বাসনের দিনরাত্রি

অভিজিৎ সিরাজ

হরিবোল ধ্বনি দিয়ে চলে যায় শবযাত্রী মানুষ,
সদ্য নেমেছে আঁধার—ছাঁকনিতে জ্যোৎস্নার স্রোত আটকে পড়ে,
ল্যাম্পপোস্টের
দীন আলো মেলে ধরে কাঁচুমাচু মুখে
করুণার মতো পথচারীদের চোখে।
এখন ক্যাথেড্রালের মাঠে স্মৃতির বহ্নুৎসব, গীর্জার ঘড়িতে
সময়ের টিকিবাঁধা পুরনো ইতিহাস—ধূসর আকাশে ক্রমশ
জেগে ওঠে ভাঙ্গা চাঁদ; দুখিনী মায়ের
কোলে রক্তহারা শিশু।
আমার চোখের সামনে হেঁটে যায় পরাজিতক নারী, যুবা ও প্রৌঢ়;
হাসপাতালের দেয়ালে সাজানো ভিখারীর সংসার—একটাও পয়সা
চায়নি আমাকে কোনও মলিন নারী; এখনও মানুষেরা
ততোবেশী ভালোবাসে
তাদের নিজস্ব আটপৌরে জীবন।
পোস্টাপিসের দরোজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, নিঃশব্দ ডাকবাক্সে
জমানো স্মৃতির গোপনে হেসে ওঠে—যেমন প্রতিটি ভাঙ্গার
অসুখে ফোটে অজস্র পপিফুল, সাদাটে ফুটপাতে জমে থাকে
দুঃখ বা সুখের বিষাক্ত প্রলেপ।
ধূসর আকাশে লটকানো ভাঙ্গা চাঁদ, প্রেয়সী ছায়ার মতো
আমাকে অনুসরণ করে—মাটিতে লুটোন তার বেহায়া আঁচল;
বাতাসে ভাসে স্মৃতির সোঁদা ঘ্রাণ,
আহত মানুষের মতো
আমি—পলাতক আসামী, কোন দিকে আছে আমার
নিজস্ব হেঁটে চলার পথ ?

শৈশব : সকাল

বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়

শৈশবের সকাল দেখবো বলে
বুকের মধ্যে হাত রাখলাম :
গির্জায় ঘন্টাধ্বনি শোনা গেলো
এক ঝাঁক সাদা পায়রা উড়লো আকাশে
পেঁজাতুলোর মতো।

তখন খুলে গেলো কপাট
নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো হাওয়া
সোঁ সোঁ করে ঢুকে পড়লো
শৈশবের পাটাতনে
সূর্য উঠলো গাছপালা ভেদ করে
রঙীন নির্যাসে।

তখন বুকের মধ্যে হাত রাখলাম
নাটাই-এর ঘুড়ি পায়রা হলো
সিন্ধুর তটে ধুলোবালি মেখে
হামাগুড়ি দিলো শৈশব : সকাল।

ইতিহাসের হারানো সুতো

সুধাংশুকুমার রায়

ধরে নেওয়া যাক বাংলা; 'সভ্যতা' শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ সিভিলিজেশন এবং 'সংস্কৃতি' শব্দের কালচার। মহামনীষী ফ্রাঙ্ক-ফোর্ট লিখেছেন 'একথা সত্য যে এ দুটি শব্দ প্রায় একই অর্থে সচরাচর ব্যবহার করা হয় বলে, অনেক সময় তা বিতর্কমূলক হয়। শব্দ দুটির ব্যুৎপত্তিগত কারণে এই বিতর্কের উদ্ভব।' বাংলা শব্দ দুটিরও ব্যুৎপত্তিগত কারণে তাদের প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রে বিতর্কমূলক হয়। এই বিতর্কের মধ্যে গেলে সময় নষ্ট হবে। কালচার শব্দের মত সংস্কৃতি শব্দ আদিবাসী উপজাতিদের আলোচনা বা তাদের আচার ব্যাবহারের ব্যাখ্যা বা বিবরণী লিখতে বেশী প্রয়োগ করা হলেও সিভিলিজেশন শব্দের মত সভ্যতা শব্দ বৃহত্তর জাতি বা দেশের, ক্রিয়া-কলাপ, শাস্ত্রীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠান, ধর্ম, লিপি ও সাহিত্য বিষয়ক বিবরণ লিখতেই সাধারণত ব্যবহার করা হয়। সভ্যতার মধ্যে লিপিবিদ্যা, সাহিত্য এবং এই দুটির উৎপত্তি, বিকাশ ও উন্নতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বা বিদ্বৎসমাজের (অ্যাকাডেমীর) সক্রিয় ভূমিকা থাকা চাই। সংস্কৃতি শব্দ যদি কালচার শব্দের প্রতিশব্দ ধরা যায় তবে সেখানে লিপিবিদ্যা বা সাহিত্যের, বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা নাও থাকতে পারে। লিপিবিদ্যা চিত্রবিদ্যার পরিপূরক। কালচার বা সংস্কৃতি চিত্রবাহন হলেও লিপিহীন হতে পারে। মূর্খের সংস্কৃতি আছে, সভ্যতা নেই। ভাষাতাত্ত্বিকরা তাই মনে করেন 'যে মুহূর্তে সুমেরীয় ও মিশরীয়রা তাদের ভাষায় লিখতে আরম্ভ করেছিল সেই মুহূর্ত থেকেই তাদের সভ্যতার আরম্ভ বা প্রকাশ হয়েছিল বলে ধরতে হবে।' প্রত্নতত্ত্ববিদদের অবশ্য অন্যমত। প্রত্নতত্ত্বীয় নিদর্শনগুলি কতখানি কলা-কৌশল ও উদ্যমের সাক্ষ্য বহন করে তার উপরই তাঁরা বিচার বিবেচনা করে সভ্যতার কাল বা মান নির্ধারণ করতে চান। আমার মনে হয় ঐতিহাসিক কারণে দুটি কালই নির্ণয় করা দরকার।

এখন প্রশ্ন হোল আমরা বাঙালীরা কখন অসভ্য থেকে সভ্য হয়েছিলাম? অর্থাৎ (১) কখন আমরা ভাতের হাঁড়ি, চালধোয়া ঝাঁজরা-খোলা, জলের কলস, গরুর জাবনা খাওয়া বড় গামলা ইত্যাদি মাটি দিয়ে তৈরী করতে শিখেছিলাম? কখন আমরা পট, পুতুল, খেলনা, কাঁথা, মাদুর, কাপড়, ঘর-বাড়ী তৈরী করতে আরম্ভ করেছিলাম? পাথরের অস্ত্র ফেলে কখন আমরা ধাতুর অস্ত্র তৈরী করতে শিখেছিলাম? লোহার কাস্তের আগে আমাদের হাতে কাঠের উপর পাথরের দাঁত বাধান কাস্তে ছিল কি? থাকলে সে কেমন বা কখন ছিল? (২) আমরা কখন লিখতে পড়তে শিখেছিলাম বা পরের কাছে ধার করে আরম্ভ করেছিলাম? সে কেমন লেখা— চিত্রাক্ষর না বর্ণাক্ষর? কেন লিখেছিলাম? মিস্রীয়রা লিখতে আরম্ভ করে চিত্র-পরিচয় (ক্যাপশন) দেবার জন্য আর সুমেরীয়রা ঠাকুরঘরের মালপত্রের হিসাব রাখার জন্য। আমরা? আদি ঐতি-হাসিক যুগের তো নয়ই—অতিকষ্টে খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীর কিছু নমুনা আমরা মাটি খুঁড়ে পেয়েছি। তাই নিয়ে আমাদের এখন সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

কিন্তু এ অভাব বাংলার বা বাঙালীর দোষে ঘটেনি। ঘটেছে বাংলাদেশে পেটরির মত প্রতিভাবান প্রত্নতত্ত্বজ্ঞের অভাবে। সে অভাব একদিন পূরণ হবেই। 'হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন'—আর এই রত্নগুলির প্রাচীনত্ব, মহিমা ও বৈচিত্র্য অপ্রকট থাকলেও তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। এক বিরাট, প্রাচীন ও উচ্চাঙ্গের সভ্যতার প্রত্নতত্ত্বীয় নিদর্শন আমরা উত্তর বঙ্গে খুঁজলে পাবই পাব। এই বিশ্বাসের মূলে রয়েছে বাংলার নৃতত্ত্ব। 'কলকাতার মেয়ে' জয় মায়ে লিখেছেন 'প্রত্নতত্ত্ব হল প্রাচীনকালের মানুষের সমীক্ষা, আর নৃতত্ত্ব হল আধুনিককালের মানুষের সমীক্ষা। একজন নৃতত্ত্ববিদ তাই অতীতকে অগ্রাহ্য করতে

৬ চিত্র। চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত মাটির সীলমোহর। আমার পাঠ এক থেকে উনিশ : ব। বই—ট। ঠ—সই—ন — ই — ক — ব — হ। হ— শ — ত — স — ং — র — জ — ঈ — ন — ব — ধ — চ। ক্। অর্থাৎ বটসৈনিক, বহুশত সমরজয়ী নাবধ্যক্। এই লিপি ব্রাহ্মীর অগ্রজ কিন্তু সিন্ধু-লিপির অনুজ। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতক।

খ চিত্র। নবদ্বীপের বুড়ো-হেলমেট মাথায় শিব-সম্রাটের মুণ্ডমূর্তি। কাঁচামাটির তৈরি কুম্ভকারদের এই মুণ্ডমূর্তি শিবরাত্রির দিনে কেবলমাত্র নবদ্বীপেই পুজো হয়। আশুতোষ মিউজিয়মের সংগ্রহে একখানি এই মূর্তি আছে। শ্রীনির্মল কারক কর্তৃক অনুকৃত চিত্র।
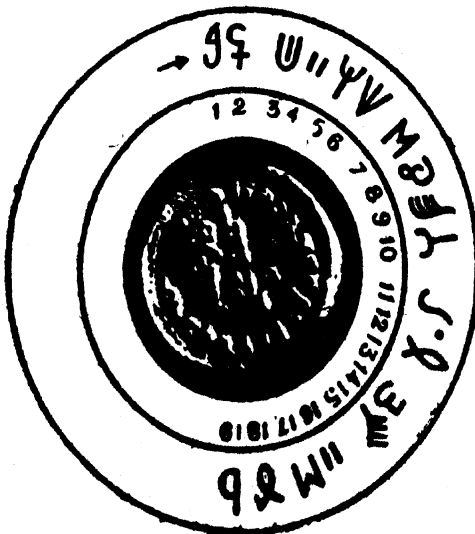
পারেন না, কারণ প্রত্যেক দেশের সংস্কৃতিতে পরম্পরাগত ধারা সর্বদা ক্রিয়াশীল, এবং একজন প্রত্নতত্ত্ববিদকেও তিনি যেখানে কাজ করছেন সে দেশের মানুষকে জানতে ও বুঝতে হবে, আর তা না হলে প্রাপ্ত দ্রব্যগুলির সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারবেন না।' (দি স্প্লেন্ডার দ্যাট ওয়াজ ইজিপ্ট, পৃঃ ২১-২২ অনুক্রমণিকা)। এখানে বলে রাখি যে এই মহীয়সী মহিলার জন্ম কলকাতার কাছে এক পাটকলের সাহেবের ঘরে। সিপাহী বিদ্রোহের মাত্র কয়েক বৎসর পরে জন্মে সতেরো বৎসর বয়স পর্যন্ত ভারতবর্ষে ছিলেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে মিসরতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন পেট্রির ছাত্রী হয়ে। মিসরতত্ত্ববিদদের মধ্যে একমাত্র তিনিই মিসরীয় সভ্যতায় ভারতের অবদান আছে বলে মনে করতেন। তাঁর মৃত্যুর মাত্র তিন মাস আগে, ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সে কথা আর একদিন বলব।

পরম্পরাগত ধারা আমাদের পট, পাটা, পুতুল, কাঁথা, মাদুর, বাকস, বিছানা, হাঁড়ি, থালা, বাসনে এখনও ক্রিয়াশীল। তাই আনন্দ কুমারস্বামী বাংলার লোকশিল্পের নিদর্শনগুলি দেখে লিখেছিলেন 'বাংলার লোকশিল্প ৫০০০ বৎসরের প্রাচীন শিল্পধারার ক্রমাগত অবাধ অবতরণের ফল।' একথা তিনি কেন বলেন? আরও দুটি উদাহরণ দিয়ে একথার জবাব দেব ম্যাকে যখন মহেঞ্জোদাড়োর খনন কার্য চালাচ্ছিলেন, তখন তিনি কিছু মাটির তৈরী মানুষের ও পশুর মুণ্ড পান। মুণ্ডগুলির গলা চার-পাঁচ ইঞ্চি করে লম্বা, নীচের দিকে গলার শেষ প্রান্ত মোটা, গলার ও মুণ্ডের মাঝে ছিদ্র। এই লম্বা গলা-ওয়ালা মুণ্ডগুলির তিনি কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। যদি নাড়াজোল বা কৃষ্ণনগরে যেতেন তবে বাঙালী পুতুল-ওয়ালারা তাঁকে এই মুণ্ডগুলির ব্যবহার কি তা দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারতেন। মুণ্ডহীন শরীরের মধ্যে—যা আলাদা তৈরী করা হয়—গলা-লম্বা মুণ্ডটিকে সুতা দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তারপর রং করে, দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে, দোলা-পুতুল হিসাবে বিক্রয় করা হয়। মাথায় টোকা দিলে গলা ঝোলা এ পুতুল দুলতে থাকে—দেখে ছেলেরা মজা পায়। বাঙালীর সাড়ে চার হাজার বৎসরের প্রাচীন এ পুতুল কোথায় পেল? এ তার নিজের আবিষ্কার না ধার করা? ধার করলেও কবে ও কোথায় করেছিল?

এবার দ্বিতীয় উদাহরণটি দেওয়া যাক। প্রাগৈতিহাসিক যুগের যেসব পাথরের অস্ত্র, দরজার ছিদ্রযুক্ত পাটাতন ইত্যাদি সুমেরে পাওয়া গেছে তার মধ্যে মাজা-সরু কিছু পাথরের ঢিলও (ওয়েস্টেড স্টোন) আছে। সুমের-তত্ত্ববিদরা এগুলির কী ব্যবহার ছিল তা জানতে পারেন নি। তাঁরা যদি সবং যেতেন তবে দেখতে পেতেন মাদুর বোনার সময় এই রকম ইঁটের মাজা সরু ঢিল টানার সুতায় বেঁধে মছলন্দীরা মাদুর বুনছে। প্রাগৈতিহাসিক সুমেরীয় মাজা-সরু ঢিল দিয়ে বাঙালীরা কবে থেকে মাদুর বোনা শিখেছে বা আরম্ভ করেছে? মাদুর বোনার ভাঁতই বা তাদের কে দিল বা কখন দিল?

ভগ্নী নিবেদিতা আমাদের পরম্পরাগত ধারাকে চিনতে পেরেছিলেন—আমরা পারিনি। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন 'সন্ধ্যাকালে আমরা বাগবাজারের ঘাটে উঠিয়া ভ্রমণ-বৃত্তান্তের আলোচনা করিতে করিতে যাইতেছি, এমন সময় একটা সাজিতে কতকগুলি মেটে পুতুল লইয়া একটা ফেরিওয়ালা বিক্রয় করিতে যাইতেছে দেখিয়া নিবেদিতা তাহাকে ডাকিলেন এবং পুতুলগুলি দেখিয়া আনন্দে একেবারে আত্মহারা হইলেন। পুতুল তিনটি এক পয়সায় বিক্রয় হয়, হলদে আর কালো রঙে রঞ্জিত, স্ত্রীমূর্তির মাথায় একটা খোঁপা ও জগন্নাথের হাতের মত ছোট অর্ধসমাপ্ত দুইখানি হাত, সেই হস্তদ্বয় হইতে স্তনদ্বয় বড়, পায়ের জায়গাটা মৃত্তিকায় শিবলিঙ্গ অথবা বেতের মোড়ার মত। এরূপ পুতুল তো শতশত অলিতে গলিতে পাওয়া যায়। বঙ্গের এমন বালক-বালিকা বোধ হয় নাই, যাহারা এরূপ পুতুলের দশ-বিশটা শৈশবে না ভাঙিয়াছে। এই পুতুল হাতে লইয়া ও অতীব আশ্চর্য' ক্রমাগত এইরূপ প্রশংসোক্তি করিতে লাগিলেন।...পরদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'পুতুলগুলি লইয়া কাল ওরূপ করিয়াছিলেন কেন?' তিনি বলিলেন—'আপনি ও বুঝিবেন না; ওর মত সুন্দর ও আশ্চর্য জিনিস আমি ভারতবর্ষে দেখি নাই।' এই বলিয়া অতি লুব্ধ চক্ষে তাহার একটি হাতে করিয়া দেখিতে লাগিলেন।...কিন্তু তিন দিন পরে মেজাজটা একটু পড়িয়া আসিয়াছিল, সেদিন হাসিয়া বলিলেন —'দীনেশবাবু, ওই পুতুল আমার এত ভাল লেগেছে কেন, শুনবেন? ৩০০০ খ্রীঃ পূর্বের অর্থাৎ এখন হইতে প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্বের অনেকগুলি জিনিস সম্প্রতি ক্রীট দ্বীপ হইতে জঃ ইভান্স আবিষ্কার করিয়া বিলাতে লইয়া আসিয়াছেন। আমি এবার

ঘ চিত্র! প্রোট-সিনাইটিক লিপির ছয়টি নমুনা। সুয়েজ খালের পূর্বে মিসরের সিনাই প্রদেশে এইসব লিপির প্রথম সন্ধান পান পেটরি। গার্ডিনার মাত্র চারটি অক্ষর নির্ভুল রূপে চিনতে পারেন; বাকিগুলি অপঠিত রয়ে যায়। আমার পাঠ প্রবন্ধের মধ্যে দেখুন। ১নং লেখা-টিতে পড়ছি 'বাঙালত-ঈ—বঈননিহ', অর্থাৎ বাঙালদেশের বণিক। ৩নং লেখাটিতে পড়ছি 'আগচচও বাঙাল যখ', অর্থাৎ আগচ্ছো বাঙাল যক্ষ। যক্ষকে বাঙাল বলা হোল কেন? খ্রীঃ পূঃ অষ্টাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে প্রস্তুত। তীর চিহ্ন পাঠ দিশারী।

বিলাত যাইয়া সেগুলি দেখিয়া আসিয়াছি. সেই সংগ্রহের ভিতর অবিকল এই পুতুলের মত পুতুল দেখিয়া আসিয়াছি।' (ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য)। কুমারস্বামী ও নিবেদিতা যে এইসব কথা বলতে পেরেছিলেন তার কারণ ঐ 'কলকাতার মেয়ে' মায়ের উক্তির মধ্যেই নিহিত রয়েছে—'পরম্পরাগত ধারা সতত ক্রিয়াশীল'। এই ধারাই প্রাচীন বাংলার গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতার সাক্ষ্য বহন করে নির্ভুলভাবে আমাদের কাছে, বর্তমান যুগের মানুষের কাছে, পৌঁছে দিয়েছে। তাই প্রাচীন বাংলার সভ্যতা যে খোঁজ করবে, সে পাবে।

যে অজ্ঞাত অতীত সভ্যতা প্রতিনিয়ত আমাদের নিকট তার অস্তিত্বের সংকেত পাঠাচ্ছে তার রাষ্ট্রীয় রূপও ছিল বিরাট, আর রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থাও ছিল জটিল। বাংলার সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত দক্ষিণ প্রদেশের শাসনকর্তার সরকারী পদবী ছিল—দক্ষিণেশ্বর বা দক্ষিণন্দার। জয়নগর-মজিলপুরে প্রস্তুত তাঁর পরম্পরাগত প্রতিকৃতি দেখে পাঁচ হাজার বৎসর পরেও আমি তাঁকে চিনতে পেরেছি। কথায় বলে 'ভাগ্যবানে দেখা পায়'—শ্রীচৈতন্যের সংগে তাঁর দেখা হয়েছিল। পুরী যাবেন নৌকায়, তাই সমুদ্রগামী নৌকা ও তার যাত্রার অন্যান্য বন্দোবস্ত করার অধিকার যাঁর, শ্রীচৈতন্যদেবকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হোল—'এই সে দক্ষিণের রায়।' দক্ষিণরায় তাঁকে যেতে মানা করেছিলেন কারণ তখন সমুদ্রে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছিল। তিনিই শেষ দক্ষিণন্দার (লাটসাহেব)।

জয়নগরের আবক্ষ প্রতিমূর্তিটির মাথায় রয়েছে দক্ষিণের শাসনকর্তার প্রতীক টুপি—মিসরতত্ত্ববিদরা যাকে বলেন 'হেট্ ক্যাপ'। মিসরে দক্ষিণের শাসনকর্তার রাজকীয় উপাধি হোল 'দক্ষিণন্দার' আমাদেরও তাই ছিল। বাঙালী দক্ষিণন্দার আঠারো জাটির রাজা, আর মিসরীয় দক্ষিণন্দার তিরিশ জাটির, অর্থাৎ শুল্ক অফিসের বড়কর্তা! যারা বাঙালী দক্ষিণন্দার সম্বন্ধে লিখতে চান, জানতে চান, তাঁদের আমি সাবধান করে দিই এই বলে যে এই মহামান্য দক্ষিণ প্রদেশের লাটসাহেবের (হিজ এক্সেলেন্সি দি গভর্ণর অব সাউথ বেংগল) যত হীন দশাই আজ দেখতে পাই না কেন—তাঁর পাঁচ হাজার বৎসরের অবহেলিত ধূলিমলিন রূপ ও সংসর্গ দেখে, তাঁকে চিনতে ভুল করা চলে না। (ক চিত্র দেখুন)

দক্ষিণন্দার প্রাচীন সিন্ধুদেশেও ছিলেন তা তাঁর ঘটচিত্র দেখেই বোঝা যায়। তবে প্রাচীন মিসরে, তাঁর সরকারি কাজ-কর্মের বিস্তৃত বিবরণ লেখা আছে বলে, সেই আলোকে আমরা বাংলা দেশের দক্ষিণন্দার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে পারি। আমরা নিজেদের অর্বাচীন মনে করি বলে তুলনামূলক আলোচনা করার সাহস মনে জাগে না। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলে গেছেন, 'বাঙালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি" শুনে বাইবেলের কথা মনে পড়ে—'ঈশ্বর একজাত পুত্রের কথা ভুলে যাবেন।' ঈশ্বরই যদি ভুলতে পারেন, তবে আমরা বাঙালীরা তো মানুষ! কিন্তু এ ভুল একদিন ভাঙাবেই, মনেও পড়বে। ভুল ভাঙাবে নৃতত্ত্ব আর মনে পড়াবে প্রত্নতত্ত্ব। যাই হোক, মিসরের দক্ষিণেশ্বরের বয়স ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ছিল পাঁচ হাজার বৎসর একদিন। মিসরে তিনি বহিরাগত আক্রমণকারী। বাঙালী দক্ষিণেশ্বরও কি বহিরাগত? তাঁর বয়স কত? মনে হয় তিনি ভারতীয়—বয়সে মিশরীয় দক্ষিণেশ্বরের চেয়েও প্রাচীন। অন্ততঃ তিনি দুর্গা-পূর্ব। নৃতত্ত্ব তাই বলে। মিশরের দক্ষিণেশ্বর স্থানীয় অধিবাসী অনুদের নিপাত করে ওদেশ জয় করে নেন। এই জয়ের ফল যাতে বরাবর বজায় থাকে তার জন্য প্রতিবৎসর 'অনুনিপাত উৎসব'—একপ্রকার যাদুক্রিয়া পালন করা হোত। আমরা বাঙালীরা পালন করি "ডোম নিপাত উৎসব"। সেঁজুতি ব্রতের মধ্যেই এই স্মৃতি বিধৃত। অনুদের মত, এই ব্রতে একজোড়া ডোম-ডোমনীর মাটির প্রতিমূর্তি হত্যা করা হয় প্রতি-বৎসর। দক্ষিণেশ্বরের প্রতিষ্ঠা ডোম রাজত্বের অবসান ঘটায়। ডোমই যোম বা যম। নদীমাতৃক বাংলায় যমই প্রথম চিল-পাখির দণ্ড, যা তাঁর পরিচয় চিহ্ন, নবোদিত দ্বীপগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। যমপুকুর ব্রতের অনুষ্ঠান সেই প্রথম দিনের, প্রথম রাজত্বের নৃতত্ত্বীয় বিবরণী বা রেকর্ড। মনে রাখতে হবে খ্রীষ্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দীতে 'জ' 'ড' হয়। যম আজ তাই ডম বা ডোম—যক্ষ, দক্ষ।

বাঙালী যম, বাঙাল যক্ষ। তাই বাঙালীর ইতিহাস আর বাঙালের ইতিহাস এক নয়। প্রবোধচন্দ্র সেন ঠিকই বলেছেন বঙ্গ শব্দ ও বাঙালা শব্দ এক নয়। বঙ্গনগরের নাম থেকে বঙ্গ রাজ্যের নামকরণ হয়েছিল। ডায়মণ্ডহারবার—কলকাতা রোডের উপর, ডায়মণ্ডহারবারের চার-পাঁচ মাইল আগেই বঙ্গনগর। এখন আর তার সে প্রাচীন রূপ নেই। চাষীরা উঁচু-নীচু জমিগুলো কেটে সমান ধানের জমিতে পরিণত করে ফেলেছে। তবুও যখনি খোঁড়া হয় তখনি মাটির তলা থেকে পাওয়া যায় প্রত্নতত্ত্বীয় নিদর্শন—খোলা-ভাঙা, হাঁড়ি, পুতুল, বাটুল—প্রায় সবই মাটির তৈরী। সেসব সংগ্রহ করে বি বি লালকে আমি দিল্লীতে নিয়ে দেখিয়েছিলাম। তাঁর মতে সেগুলি শিশুপাল গড়ের সমসাময়িক। মনে হয় বঙ্গ-নগরের অধিকাংশই গঙ্গার 'দুর্জয়-মগরা' গ্রাস করে ফেলেছিল—তাই তার রাজকীয়, বৈষয়িক ও ব্যবসায়িক গুরুত্ব নষ্ট হয়ে যাওয়ায়—সে এখন নামে নগর, কাজে গ্রাম হয়ে, সকলের চোখের আড়ালে

ক চিত্র! দক্ষিণদ্বারের আবক্ষ মূর্তি। জয়নগরের মাহিষ্য কারিগররা পুরুষানুক্রমে এই মূর্তি ছাঁচে তুলে তৈরি করেন। ছাঁচে-গড়া হয় বলে মূর্তির প্রাচীন রূপ সম্পূর্ণ অবিকৃত রয়ে গেছে। পোড়াবার পর সুন্দর রঙ করা হয়। আশুতোষ মিউজিয়মে একটি মূর্তি রক্ষিত আছে। হাতে গড়া হয় বলে কুচল কুমারদের তৈরি মূর্তির মধ্যে প্রাচীন রূপ অনেকটা বিকৃত হয়ে পড়েছে।

অজ্ঞাত রয়ে গেছে। যা আছে তার থেকেও আমরা হয়তো অনেক কিছু পাব।

সরকারি কাগজ-পত্রে বা ম্যাপে গ্রামটিকে বগনগর বলে উল্লেখ করলেও এর ডাকনাম ব্যোমনগর। যেমন পাণ্ডুয়ার ডাকনাম পেঁড়ো। পেঁড়ো বাংলাদেশে অনেক আছে। শব্দটি অতিপ্রাচীন। তাই পাণ্ডুয়া থেকে পেঁড়ো হয়নি, পেঁড়ো থেকেই পোশাকী নাম পাণ্ডুয়া হয়েছে—ব্যোম থেকে হয়েছে বঙ্গ। ব্যোম শব্দ প্রাচীন, বঙ্গ শব্দ বয়সে নবীন। বঙ্গ শব্দের আদি অর্থ তাই আকাশ। শিব ব্যোম ভোলানাথ—স্কাই গড। তিনি রুদ্র, কারণ রাঢ়ীয়। তাঁর হাতে 'ডমরু'—তার দুই মুখ, উত্তর ও দক্ষিণ। দুই রাজ্যের মধ্যে দামোদর নদ—দামন উদর=দামোদর নয়, দামন দ্বার। দামন দ্বার। দামন নদের দক্ষিণে গভর্ণর 'দক্ষিণদ্বার' শাসন করেন বগ্‌দ বা দক্ষিণ রাঢ়। আর উত্তরে? সে এখন বলা যাবে না, কারণ সেখানে শনিদেব। তিনি দেখতে পেলে তার মুণ্ড উড়ে যাবে, যেমন গণেশের উড়ে গিয়েছিল। সেখানে তাই সাবধানে যেতে হবে। আমি তাঁকে দেখিনি, কেবল তাঁর গলার 'মালা' দেখতে পেয়েছি। শনির পুজারী সেই জন্য লোহার কড়াইয়ে তাঁর তামার গড়া মূর্তি তেলে চুবিয়ে পাড়ায় পাড়ায় দেখিয়ে ভিক্ষা করে। তেলে দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে—কোপদৃষ্টি লাগে না। দুই রাজ্যের দুই অধীশ্বরের উপরে শিব সম্রাট। তাঁর রাজকীয় পদবী মহাদেব। মিসরের সম্রাটও মহাদেব (গ্রেট গড)। শিব মহৎ দেব বলে মহাদেব নন - সম্রাট বলে। উত্তরাধিপতি ও দক্ষিণাধিপতি তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী। তাঁর রাজধানীর নাম বড়-দামন বা বড়-ডোমন, যার ইংরেজী করলে হয়—দি গ্রেট দামন। আজকাল আমরা যাকে বলি বর্ধমান। কাঞ্চননগর বর্ধমানের এক পাড়া হলেও হয়। সেখানে দামোদর নদ নিয়ত পাড় ভেঙে প্রত্ন-সামগ্রী গ্রাস করছে। কুড়াবার কেউ নেই। বহু প্রাচীন কাল আদিবাসী সাঁওতালরা মৃতের অস্থি আজও বিসর্জন দিতে আসে দামোদরে, সোনামুখীর ঘাটে।

শিব আদি দেবতা, তাঁর পরনে বাঘছাল, গায়ে ভস্মমাখা। আদিবাসী ডোমেরা এর বেশী তাঁকে আর কি দিতে পারতো? কাপড় ছিল না, তৈরী করতে পারে নি, তাই বন থেকে বাঘ মেরে ছাল এনে দিয়েছিল। কি করে প্রাচীনকালে বাঘের ছাল পরতো তা খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বৎসরের পুরাতন কবরের গায়ে খোদাই করা মিসরীয় সরকারি কর্মচারী আবু-নসুতের ফলক দেখলে বোঝা যায়। আবু-নসুতকে দারুন স্মার্ট দেখায়—বাঘছালে তাকে বন্য মনে না হয়ে পৌরুষসম্পন্ন যোদ্ধা বলে মনে হয়। শিবও তাই ছিলেন। আর ছাই? হেরোডোটাস তাঁর জবাব লিখে রেখে গেছেন। মিসরের 'গ্রেট গডের' চাই এক ধামা ছাই--ছাই আনতে পার তবে রাজদর্শন মিলবে, নইলে নয়। পাট-পচা জলাভূমি বাঙালী 'গ্রেট গড' উঁচু করবো কি দিয়ে? আনো ছাই—ঢালো ছাই, তবে যদি দর্শন পাই! বাঙালী গায়ে ছাই মাখেনি, তার বাড়ী ছাইয়ের গাদার উপরে। অনেক দিন ভেবেছি ঘাটালে গিয়ে গম্ভীরনগরের কয়েকটা ছাইয়ের গাদা খুঁড়ে দেখি কিছু পাই কিনা। হয়তো সেখানেই 'গম্ভীরে আছেন মহাদেব'।

গম্ভীরনগরে না থাকলেও তিনি নবদ্বীপে ছিলেন--এখন আমার দৌলতে আশুতোষ 'মিউজিয়মের শোকেসে' তাঁর মাথায় রঞ্জ (রঙের) হেলমেট, তার উপরে উভয় রাজ্যের যুক্ত মুকুটের সম্রাট চিহ্ন। (খ) চিত্র দেখুন, যে বাঘছাল পরে সে বজ্র হেলমেট পেল কোথায়? আদিযুগের নয়—এ তাম্র বা ব্রঞ্জযুগের মূর্তি। রাজধানী বড়-দামন থেকে সরে নবদ্বীপে বা নদের গিয়েছিল। বাঙালী তখন দামোদরবাসী নয়, সে গঙ্গাতীরবাসী। দামোদরের তীরে পড়ে রইল ডোম, ধর্মরাজ ঠাকুর আর তাঁর ধর্ম। যম 'ধর্ম-রাজ'। যম থেকে যেমন ডোম শব্দের উৎপত্তি, 'ডোমরাজ' থেকে ধর্ম ও ধর্মরাজ শব্দ দুটি তেমনিই নিষ্ক্রান্ত। ন্যায়বিচার, দুষ্টের 'দমন' সুনীতিই ছিল আদধর্মের মূল কথা। তাই সন্দেহ হয়—এই রাজ্য কি সুমেরীয়দের মত ধর্ম-ভিত্তিক ছিল? আদিতে হয়তো তাই ছিল, পরে দেবরাজতন্ত্রে পরিণত হয়। মিশরীয় সভ্যতার মূলে দেবরাজতন্ত্র, সুমেরীয় সভ্যতার মূলে ধর্মরাজতন্ত্র। ধর্ম-ভিত্তিক ডোমরাষ্ট্রের মুখে আগুন দিয়ে মা কালী দেব-ভিত্তিক রাষ্ট্রের প্রচলন করেছিলেন। সেইজন্য বাঙালীর লক্ষ্মী ও সরস্বতী ভিন্ন দেবতা

চ চিত্র। পাণ্ডুরাজার ঢিবি খুঁড়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব-অধিকার এই মাটির হাঁড়ি-ভাঙা খোলা পেয়েছে। এর উপর উৎকীর্ণ লিপি অতি প্রাচীন ধরনের। বাঁদিকের ধনেশ পাখির 'ধ' আর শেষ অক্ষরটি জল-রেখার, অর্থাৎ নদীর 'ন'। শব্দটির মূল্য তাই 'ধন' বলে পড়তে হবে। উপরে ধন শব্দটি সিন্ধুলিপির অক্ষর দিয়ে লিখে তুলনা করা হয়েছে। সিন্ধুলিপির অক্ষর টানা রেখায় সংক্ষেপিত, কিন্তু পাণ্ডু-রাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত লিপির অক্ষর চিত্রময়। সেই কারণে প্রাচীন। ফিনিশীয় ও গ্রীক 'ডি' এই পাখি থেকে উৎপন্ন, কিন্তু রোমান 'ডি' ধনুক থেকে। দুটি এক নয়। এরকম লেখা আমাদের আরও চাই—খুঁড়ে বের করতেই হবে!
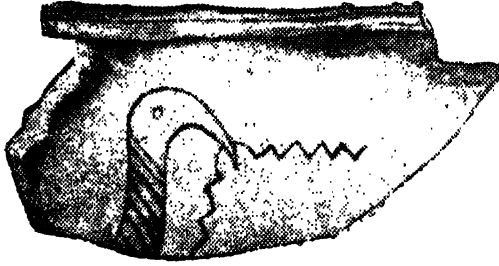
দেবদেবী নেই; সে দেবরাজতন্ত্রের প্রজামাত্র। দেবত্ব ও নরত্বের মধ্যে যে যোগাযোগ তা সূক্ষ্ম ও মানসিক এবং এই কারণে অদৃশ্য। তাই নর-দেবতাদের মূর্তিগুলির মধ্যে নষ্ট রাজচিহ্ন দেখে, সেই গল্পের হাতি যেমন করে রাজচিহ্ন দেখে পূর্বাদৃষ্ট ও অপরিচিত রাজকুমারকে চিনে নিয়েছিল, তেমনি করে তাঁদের চিনে নিতে হবে। মহাদেবের বুকের উপর পা তুলে দাঁড়ালে তার কি অর্থ হবে? এ তো সেই পুরাতন 'মোটিফ' যা আমরা প্রাচীন মিশরে পাই—এর অর্থ সম্রাটের মৃত্যু ও সাম্রাজ্যের পতন। মা কালী লজ্জায় লকলকে জিব বের করেননি—কিসের লজ্জা? —তাঁর শিল্পীরা তিনি দেশ জয় করার সময় যে অভূতপূর্ব গণহত্যা করেছিলেন, তারই স্মারক চিত্র বা মূর্তির 'মোটিফ' হিসাবে ঐ উৎক্রান্ত জিহ্বার প্রয়োগ করেছিল। ব্যাপক গণহত্যার মৃতদেহ-গুলি শৃগালের ভোগাবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। অশোকের গণহত্যার খবর আমরা জানি, মাকালীর গণহত্যার বিবরণ আমরা বিস্মৃত হয়েছি। এখন প্রশ্ন, জিব বের করে কারা? আর কেনই বা করে? 'প্রটুডিং টাঙ' বইখানা আমি বাঙালীদের পড়তে বলি। মাকালীকে চিনতে পারবেন। তিনি প্রোট-সিথিয়ান, শাকা বা শাকিনী—মাদুর্গাও তাই, তিনিও শাকম্ভরী। শাকেরা আর্য-ভাষাভাষী। তাই বাঙালীরা আর্যভাষায় কথা বলে। পাঠশালায় গুরুমশাইয়ের কাছে মার খেয়ে যেমন আমরা বর্ণপরিচয় করি, তেমনি মাকালীর হাতে মার খেয়ে আমরা বাঙালীরা, বাংলা লেখাপড়া শিখেছি। এই আর্যভাষী আদি-শকদের আদিবাড়ি হিমালয়। আর্যাবর্তের তারাই অধিকর্তা। বুদ্ধ এদেরই মধ্যে জন্মেছিলেন—তিনি তাই শাক্য!

দেবরাজতন্ত্রের উদাহরণ মিশর, তাই দেবতা ও রাজা সেখানে এক। রাজা নররূপে নারায়ণ। বাঙালীর নর-নারায়ণ রাজত্বের ব্যাখ্যা দিতে হলে বা বুঝতে হলে মিশরতত্ত্ব জানতে হবেই। সেখানে নরদেবতাদের চলন-বলন, ঠাট বাট শুধু আঁকা নেই, লেখাও আছে। মিশরের ইতিহাস থেকেই নৃতত্ত্বের প্রথম সূত্র 'দেব-মানবত্বের' প্রকৃত ব্যাখ্যা আমরা জানতে পেরেছি। সে-ব্যাখ্যা যে জানে না, সে বাঙালীর সভ্যতার হদিস পাবে না—আমার এত বকবকানিও তার কাছে আজগুবী লাগবে। ডঃ মারের সঙ্গে আমি বিলাতে ওয়েলিংগ্রামের হাসপাতালে গিয়ে দেখা করেছিলাম। তিনি অসুস্থ বলে হাসপাতালে ছিলেন না, ছিলেন শতবর্ষের বৃন্দাবনে। উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'এক-একটি চিহ্ন বা সিম্বল নিয়ে তার চলাচল ও গতিপথ খুঁজে বের করতে হবে, তাকে চিনতে পারবে তখনই, যখন তার সব ইতিহাস তোমার জানা হবে।' এ সেই ছেলেবেলার প্রজাপতি ধরার মত মাঠে মাঠে ঘোরার কথা। সে কোন দেশের গুটিপোকা থেকে উড়ে গিয়ে কোন দেশে ডিম পেড়েছিল, তার সব ইতিহাস না জানলে তাকে চেনা যাবে না। আমি সামান্যই জানি, তবুও বলব, 'পাঁচ হাজার বছর পরেও আমি চিহ্ন দেখে নির্ভুলরূপে দক্ষিণদ্বারকে অতীত বাঙলার শাসনকর্তা বলে চিনতে পেরেছি।' গঙ্গার মোহনায় তাঁর অবস্থিতি, তাঁর মাথার হেট-মুকুট, তাঁর রাজকীয় পদবী, শুধু যে তাঁকে চিনতে সাহায্য করে তাই নয়, অতীত বাঙলার রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পূর্ণ পরিচয়ও জ্ঞাপন করে। বাঙালীর প্রাচীন সভ্যতার, ফ্র্যাংকফোর্টের ভাষায়, 'ফরম', রূপ বা কাঠামো, দক্ষিণদ্বারই আমাদের কাছে সাংকেতিক কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় প্রথম ব্যক্ত করেছেন। সে সংকেত না বুঝলে?

চলন্তিকায় সংস্কৃতি শব্দের অর্থ দিয়েছে 'শিক্ষা বা চর্চা দ্বারা লব্ধ বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্প, কলা, রুচি, নীতি ইত্যাদির উৎকর্ষ।' কিন্তু স্থান ভেদে চর্চার অবকাশ নাও থাকতে পারে পূর্ববঙ্গ নদীমাতৃক, পশ্চিমবঙ্গ পর্বতমাতৃক। পূর্ববঙ্গের সংস্কৃতি তাই নৌকাভিত্তিক, পশ্চিমবঙ্গের শকটভিত্তিক। এই দুই সংস্কৃতির সাফল্য বঙ্গীয় সভ্যতার 'ফরম' সৃষ্টির মূলে। যে মাঝি নৌকায় চড়ে ঘর ছেড়েছে, উজান, ভাটিতে ভাটিয়াল গানে যুবতী কন্যার প্রতি তার প্রেমের নিবেদন। গরুর গাড়ির গাড়োয়ান সে-গান করলে বিপদে পড়বে, কারণ, যুবতী মেয়েরা গ্রামেই আছে—ও-গান গেয়ে তাই গ্রামের মধ্য দিয়ে গাড়ি চালান যায় না। পশ্চিমবঙ্গে তাই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার গান চলে। সে-গানে প্রেমের প্রসঙ্গ ধর্মের চাদরে মোড়া। পূর্ববঙ্গের আছে শস্য, পশ্চিমবঙ্গের ধাতু। দুইদিকের সম্বল, দুইদিকে বদল দিয়েই বাণিজ্য—তাতেই দুইজনের জীবিকা। গোলমাল বাট্টা নিয়ে—তাই এ ওকে দেখতে পারে না। পাহাড়ী রয়ালাসীমার লোক ব-দ্বীপের অধিবাসীদের সেই একই কারণে দেখতে বা বিশ্বাস করতে পারে না। মিশরেও তাই—এ এক পুরাতন গল্প। গজকচ্ছপ-রূপী দুই ভ্রাতার যুদ্ধ পুরাণে বিধৃত। জলচর ও স্থলচর মানুষের মন ও সংস্কার আলাদা।

পূর্ববঙ্গের লোকদের পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা বলে 'বাঙাল'। কিন্তু শব্দটির অর্থ জানে না। পূর্ববঙ্গবাসী অতীতে বাঙাল দেবতার উপাসক ছিল, তাই সে বাঙাল। বাঙাল দেবতার স্ত্রীর নাম বাঙালত। তিনি সুবর্ণ-লক্ষ্মী। বাঙালা বা বাঙারা, দেশের কিংবা রাজ্যের নাম। বাঙারা নদী সুন্দরবনে প্রবাহিতা। বাঙালা শব্দের অর্থ সুবর্ণ বা সোনা। কর্ণাটীরা শব্দটির অর্থ জানেন। তাঁদের শহর বাঙালোরের প্রকৃত উচ্চারণ বাঙাল-উরু, অর্থাৎ

সুবর্ণ-নগরী। মাগড়ী ক্যাম্পে গোড়া কর্ণাট জয় করে এই শহরের পত্তন করেছিলেন। সে কখন তা কেউ জানে না। গোড়া কি গৌড়ীয় ছিলেন? বাঙাল শব্দ বাংলা না দ্রাবিড়? গার্ডিনার বলছেন সেমিটিক।

পশ্চিমবঙ্গের লোক বাঙালকে কলকাতার হাইকোর্ট দেখায়। চাটগাঁয়ের বাঙাল লণ্ডন, নিউইয়র্ক, রোম দেখায় না, নিজে দেখে। সে জাহাজ নিয়ে যায়নি, এমন দেশ পৃথিবীতে নেই। সে কেবল আজ নয়—চার হাজার বৎসর আগেও মিশরীয়দের সে বালাম ধানের খৈ ভেজে খাইয়েছে। এইবার শুনুন গার্ডিনারের মুখে, তারপর শুনবেন আমার মুখে। 'সে প্রায় পঁচিশ বৎসর আগের কথা, মিশর অনুসন্ধান সমিতি আমাকে ও অধ্যাপক পিট্‌কে মধ্য সিনাইয়ের সেরাবিত এল-খাদিমে আবিষ্কৃত শিলালিপিগুলির পেট্রি-কৃত নকল পরীক্ষা ও প্রকাশ করতে অনুরোধ করেছিলেন। এগুলির মধ্যে দশখানি শিলালিপির অক্ষর কিছু মিশরীয় হায়রোগ্লিফিক-এর মত কিন্তু বাকিগুলি নয়।....সব নিয়ে এ-লেখার অক্ষর ৩২টির বেশি ছিল না—কাজেই ধরে নিতে পারা যায় লেখার পদ্ধতি 'অ্যালফাবেটিক' ছিল। তাই যদি হয়, তবে লেখার মধ্যে অক্ষরগুলির পৌনঃপুনিক ব্যবহার বা প্রয়োগ লক্ষ্য করা যেতে পারে, আর তা থেকেই শব্দের (ওয়ার্ড) আন্দাজ করতে পারা যাবে। এইরূপে চারটি অক্ষরে লেখা একটি কথা সহজেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল—কারণ, কথাটি ছয়বারেরও বেশি লেখা হয়েছিল (গ চিত্র দেখুন)। নিয়ম মতো প্রথম অক্ষরটিকে আমি 'ব' বলে পড়লাম। দ্বিতীয় অক্ষরটিকে 'ঙ' ও শেষ অক্ষরটিকে 'ত' বলে ধরতে পারা গেল, 'ঙ' ধ্বনিযুক্ত শব্দ ইংরেজীতে শোনা যায় না, এই ধ্বনি গলা থেকে ওঠে। কিন্তু তৃতীয় অক্ষরটি আমায় চিন্তায় ফেলে দিল, কারণ এর রূপ পরিষ্কার বোঝা গেল না। যাই হোক, সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অগ্রাহ্য করে আমি ফিনিশীও 'ল' অর্থাৎ 'ল্যামেধ' বলে অক্ষরটিকে ধরে নিয়ে পড়লাম 'বাঙালত' অর্থাৎ স্ত্রী-বাঙাল—পরিচিত ও প্রধান সেমিটিক দেবীর পদবী।' (লিগ্যাসি অব ইজিপ্ট, পৃঃ ৫৬-৫৭)। আধুনিক বাংলা ভাষায় বলে 'বাঙালনী'। গার্ডিনার আর একটাও অক্ষর পড়তে পারেন নি। প্রোট-সিনাইটিক লেখার পাঠোদ্ধার দুরূহ, কিন্তু অনতিক্রমণীয় নয়। ব্রাহ্মী এ লিপি পড়তে অত্যন্ত সাহায্য করে—এমন কি 'ব' অক্ষরটি তো অবিকল ব্রাহ্মীর 'ব'। আসলে এই লিপি ব্রাহ্মীর পূর্বজ বাঙাল-বণিক। লিপির ভাষাও সংস্কৃত ঘেঁষা। লিপিকারও বাঙাল। এক হাতে ব্রাহ্মী, আর এক হাতে ফিনিসীয়ান (যা গার্ডিনারের হাতে ছিল) ধরে আমি পড়ছি সেই খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টাদশ—ত্রয়োদশ শতকের বাঙাল বণিকের বাঙালনী দেবীর পায়ে রাখা নৈবেদ্যর ফিরিস্তি। (ঘ চিত্র দেখুন)। 'বাঙালত-ঈ-বঈনানিহ'; 'আগচ্চও বাঙালতও'; 'আগচ্চও বাঙাল বধ'; '"গনশ'ত অঙাড়মমঅঙা'; 'রাব্জ জঈ'; 'গনত জঅ/গম-যব-লাজ-বন্জ-বলমড়-খঙা'। এইসব কথার অর্থ অতি পরিষ্কার; ভাষা প্রাচীন বাংলাও বটে আবার প্রাকৃত ধর্মী সংস্কৃতও বটে। একদিকে শিলালিপি, অক্ষর ও ভাষা, অন্যদিকে বাঙালদেশের বাঙারা নদী, বাঙাল দেবতার উপাসনা, প্রমাণ করে 'বাঙাল' শব্দটি দেশজ। ময়মনসিংহে বলে 'বাঁয়াল', কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে যে পূজা হয় তা 'বাঙাল দেবতার' নামেই হয়। যাই হোক, শব্দটির মালিকানা নিয়ে পরে মামলা লড়বো—এখন শুধু বলতে চাই, জানতে চাই, ভাষাতত্ত্বীয় মতে আমরা কখন সভ্য হয়ে উঠলাম? অর্থাৎ কখন আমরা অক্ষর তৈরি করে লেখাপড়া করা আরম্ভ করলাম? আর যদি প্রাচীনকালে লেখাপড়া করে থাকি, তবে সে লেখা কেমন ছিল, তার অক্ষরের ধাঁচই বা কেমন ছিল?

রাজগৃহের শেললিপি পশ্চিমবঙ্গেও চলতো। শুশুনিয়া পাহাড়ে শেল বা শঙ্খলিপির নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। এ লিপির পাঠোদ্ধার হয়নি; তাই কে লিখেছিল, কি লিখেছিল, সেসব জানা যায়নি। আদৌ ভারতীয় কি না তাও বলা যায় না; আবার দেশজও হতে পারে। মোট কথা এ লিপি হতবুদ্ধিকর। আদৌ দক্ষিণদ্বারের নয়, তার ধাঁচ আলাদা হবে। একি আদি-ডোমনদের ধর্মলিপি? এরপর হতবুদ্ধিকরে 'প্রোট-বেঙ্গলী' লিপি। মেদিনীপুর ও চব্বিশ-পরগণা জেলার নানা স্থান থেকে পাওয়া গেছে পোড়ামাটির সীলমোহরের উপর উৎকীর্ণ 'আদিবঙ্গ' লিপির বহু নিদর্শন। কেউ পড়তে পারেনি। অক্ষরগুলির ধাঁচ বাংলা হাতের টানা টানা লেখার মতো। তাই নামকরণ হয়েছে 'প্রোট-বেঙ্গলী' লিপি। মিউজিয়মের বাক্সে বন্ধ আছে—কেউ তা ছাপেওনি, আলোচনাও করেনি।

বহু প্রকার লিপির সন্ধান পেয়েছি আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খনন কার্যের ফলে। চন্দ্রকেতুগড়ের দান অনেক। এখান থেকেই পাওয়া গেছে বাঙালী নাবন্ধকের সেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, মাটির সীলমোহরটি। প্রয়োজনীয়, কারণ এর লিপি ব্রাহ্মী ও সিন্ধুলিপির মধ্যবর্তী যোজক। একদিকে ব্রাহ্মীলিপির জন্মের ইতিহাস উদ্ঘাটনে সাহায্য করে, অন্যদিকে সিন্ধুলিপির পরিচয় বিজ্ঞাপিত করে আমাদের পাঠোদ্ধারে সক্ষম করে তোলে। সে লিপি ব্রাহ্মীর অগ্রজ কিন্তু সিন্ধুলিপির অনুজ। শুধু তাই নয়—সীলমোহরের অক্ষরগুলি সেমিটিক অক্ষরের জন্ম রহস্যের উপর নূতন আলোকপাতও করে। প্রমাণ করে যে, ব্রাহ্মী কারও ধার ধারে না। এও বলতে সাহায্য করে যে প্রাচীন ভারতীয় লিপি থেকেই সেমিটিক ও ব্রাহ্মী, উভয় লিপিরই জন্ম হয়েছিল। (চ চিত্র দেখুন)। সীলমোহরটি এক বলদর্পিত বাঙালী নাবিকের। তাঁর প্রতিচিত্রের পায়ের কাছে জাহাজের দুটি নোঙর রাখা আছে। খাড়া মাস্তুলের উপর উড়ছে পতাকা। এই চিত্র পরিবেশ পঠিত শব্দগুলির সত্যতা প্রমাণ করে। পতাকার উড্ডয়ন-মূলে পাঠের দিক নির্ণয় করে। অর্থাৎ উপরের ডান কোণ থেকে পড়ে পড়ে ক্রমশঃ নীচে ঘুরে নামে যেতে হবে। মধার কথা এই যে, অক্ষরগুলির মাথা সর্বদা উঁচু দিকে রেখে লেখাতে, তাদের পার্শ্ব পরিবর্তিত হয়নি। আধুনিক কালের ...ড়র লেখার মত না করে, মাথা উঁচু দিকে রেখে অক্ষর বিন্যাস করা হয়েছে। অক্ষরগুলি যাতে স্পষ্ট পড়া যায় তার জন্য চিত্রে অনুলিপি দেওয়া হয়েছে। অনুলিপির অক্ষরগুলি ঘুরিয়ে গাড়ির লেখার মত বলয়াকারে দেওয়া হয়েছে। আমার পাঠ এই—বটনৈসিক-বহুশত-সমর জয়ী-নাবধক; 'বট সৈনিক' কি তাঁর নাম ছিল? সেনাবাহিনীর উপাধীও হতে পারে। তিনি বহুশত সমর জয়ী নাবধ্যক্—এ পাঠে সন্দেহ নেই। সীলমোহরটি পঞ্চ-দশ-দশম খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীর বলে মনে করি। কিছু পূর্বের হলেও আশ্চর্য হবো না।

গ চিত্র। গার্ডিনার প্রোট-সিনাইটিক লিপির মাত্র চারটি অক্ষর চিনতে পারেন। শব্দটির অর্থ বাঙালত, অর্থাৎ বাঙাল দেবতার স্ত্রী। শেষের 'ত' স্ত্রী-বাচক। 'বা' ও 'ত' ব্রাহ্মীর সঙ্গে তুলনা করুন।

যেমন দক্ষিণেশ্বর আমায় অতীত বাঙলার সংস্কৃতি ও সভ্যতার অস্তিত্ব বিষয়ে অবহিত করে তুলেছে তেমনই পান্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত একখানি সামান্য মাটির হাঁড়ি-ভাঙ্গা খোলা তার উৎকীর্ণ—মাত্র দুটি অক্ষর সম্বলিত লিপি দিয়ে প্রাচীন বাংলার ভাষা ও লিপি-পদ্ধতির স্বরূপ সম্বন্ধে শুধু অবহিত নয়, আশ্চর্যান্বিত করেও তুলেছে। (চ চিত্র দেখুন)। এ লিপি তো আমাদের হায়রোগ্লিফিক। তবে সেটা (বাম থেকে ডাইনে চলে) লেখা। সিন্ধুতে ডাইনে থেকে বামে চলে। এ লেখা বাংলাদেশে কে আনলো? দক্ষিণেশ্বরকে যে এনেছিল নিশ্চয়ই সেই। লেখার ফরম বা ধাঁচ সিন্ধুলিপির চেয়েও পুরাতন। সেখানে পাখির মুন্ড আছে, ধড় নেই, আমাদের পাখির ধড়ও আছে মুন্ডও আছে। পাখীর চঞ্চুতে ধৃত জল-রেখা নদীর আদ্যাক্ষরণ। ধনেশ (বা দসর ?) পাখির ধ দিয়ে পড়তে হবে ধন। মাটির হাঁড়িতে রেখেছিল ধনরত্ন, অলংকার। সে সব ধন পেলাম না বটে—পেলাম মাত্র দুটি মহামূল্য লিপি-ধন। যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি তাহারি খানিক—ঈশ্বর এখনও আমাদের হাতে দেন নি। দুটি দানায় পেট ভরবে না, কিন্তু রকম দেখে বুঝেছি বঙ্গমাতার ভান্ডারে লুকানো আছে অতি প্রাচীন ও প্রচুর লিপি-রত্ন।

এই আশা আরো বৃদ্ধি পায় যখন দেখি ভারত-বর্ষের দুখানি মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত আরম্ভ হচ্ছে গঙ্গা ওগঙ্গাতীরবর্তী মানুষদের গল্প দিয়ে—সিন্ধু বা সিন্ধু-তীরবাসীদের গল্প দিয়ে নয়। গঙ্গা-শান্তনুর মিলনজাত পুত্র ভীষ্ম। গঙ্গাপুত্র ভীষ্মই পিতামহ—সিন্ধুপুত্র নয়। মহাভারতে সে তুচ্ছ। সাগর রাজার ষাট হাজার পুত্রের কপিল মুনির আশ্রমে আগমন ও নির্গমনের গল্প দিয়েই আরম্ভ রামায়ণের। সে আশ্রম ছিল বাঙালীর। মহাভারতীয় সভ্যতা তাই গাঙ্গের—সৈন্ধব নয়। প্রত্নতত্ত্ব, লিপিতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব দিয়ে এই গাঙ্গেয় সভ্যতার ইতিহাস আমাদের গড়ে তুলতে হবে। দক্ষিণেশ্বর সংকেত পাঠিয়েছেন, তাঁর হাতে পান্ডুরাজার ধন—ভারতের পবিত্র লিপি।

অমৃত প্রসঙ্গে

আপনাদের ২৫ মার্চ ১৯৭৭ সংখ্যার সাপ্তাহিক অমৃতে নাচ গান বাজনা শীর্ষক—সঙ্গীত সমালোচনা প্রসঙ্গে সুচিত্রা মিত্রর ৩-৩-৭৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একক সংগীত অনুষ্ঠান সম্পর্কে লিখেছেন শ্রীকৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়। একটি গান সম্পর্কে কিছু ভুল তথ্য দেওয়া আছে বলে এবং আমার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে এই চিঠি লেখা।

গানটি 'শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ পথে পথে।' প্রথমতঃ গানটিতে দশ মাত্রার যে তাল ব্যবহৃত হয়েছে, এবং যে তালে শ্রীমতী মিত্র গানটি গেয়েছিলেন সেটি ঝাঁপতাল নয়, সুরফাক্তা। দ্বিতীয়তঃ, এ গানটি মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথকে শুনিয়ে কবি ৫০০ টাকার চেক পান নি। কারণ চুঁচুড়ায় মহর্ষিকে কবি গান শোনান মাঘ ১২৯৩।১৮৮৭তে বয়স তখন ২৫। (দ্রঃ জীবনস্মৃতি)। কিন্তু আলোচ্য গানটির রচনাকাল ১৩০৯।১৯০৩ যখন কবির বয়স ৪১ এবং মহর্ষি তখন জীবিত ছিলেন না।

দ্বিজেন চৌধুরী; কলকাতা-২৬।

গভীরতর অসুখ

অনেকের মুখেই শুনতাম, অমৃতের আঙ্গিক পাল্টাচ্ছে। তারপর এক এক করে কয়েকটা সংখ্যা পড়ে ফেললাম। পড়ার পর উপলব্ধি করলাম, পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ আজ, হলেও, ভালো মাঝে বাংলা সাহিত্যকে প্রকৃত সত্যবাদীর ভূমিকায় দাঁড় করানোর নির্লোভ অথচ সাহসী পদক্ষেপ অমৃত রাখছে। এবং কবিদের পরিচয়সহ তাঁদের কবিতা নতুন এক আবেদন রাখছে।

শর্মিষ্ঠা মজুমদার, শ্রীরামপুর।

প্রশস্তি নয় :

গতকয়েকটি সংখ্যার 'অমৃতে' বিভিন্ন বিভাগীয় তরতাজা রচনা আমার মনকে নাড়া দিয়েছে। এটা প্রশস্তি কিংবা আপ্তবাক্য নয়, মূলত যেটা সত্যি সেটা হোল, 'অমৃত' তর গতানুগতিক খোলস পাল্টিয়ে বাংলা সাহিত্যের নব-আন্দোলনে এক বলিষ্ঠ শরিক হোল। বৈকুন্ঠ পাঠক তাঁর 'সাহিত্য' বিভাগে যেমন ঝড় তুলতে ব্যস্ত, ঠিক তেমন-ই শান্ডিল্য চতুর্বেদী তাঁর 'মানুষ' শিরো-নামের লেখাগুলিতে সেই ঝড়কে বাড়িয়ে দিতে তৎপর। **পরিতোষ নন্দী, গোবর-ডাঙা।**

বৈকুন্ঠকে কিছু কথা

'অমৃত' ১লা এপ্রিল হাতে আসতেই অন্যমনস্কভাবে পাতা ওল্টাতে গিয়ে বৈকুন্ঠের 'একটি গল্প দাও গো' চোখে পড়ে। ভীষণ আগ্রহ নিয়ে পড়তে শুরু করি। পড়ার পর যেসব কথা মনে আসে তা এরকম—

(১) মাঝে মাঝে আমাদেরও বৈকুন্ঠের সংগে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে সাধ যায় 'একটি গল্প দাও গো'।

(২) তিনি গল্পের সমন্ধে বলেছেন, যে গল্প পড়তে গিয়ে হোঁচট লাগে না। পড়তে পড়তে আবিস্কারের আনন্দ পাবো।....

এর পরই তিনি লিখেছেন—যেখানে ১৯৭৭ ধরা পড়ে। যা কিনা ১৯৮৭-র হাতছানি দেবে।

যতদূর মনে হয় এর উত্তর পাওয়ার জন্য বেশীদূর যাওয়ার দরকার পড়ে না। উক্ত সংখ্যাতেই দীপংকর দাস হাজির আছেন। উক্ত গল্পে কি ১৯৭৭ ধরা পড়ে না ভীষণ-ভাবে ? কিম্বা ১৯৮৭-র ভয়াবহ দিনগুলোর ছবি স্পষ্ট করে না ? অথবা নকুল রায়কে আমাদেরই একজন মনে হয়না ? তাছাড়া আনন্দ পাবার মতো গল্পও নিশ্চয়ই আছে। সেসব গল্প আমাদের ভাবায়। কাঁদায়। হাসায়। যেমন সন্তোষের গল্প। যেমন সমরেশের গল্প। যেমন শীর্ষেন্দুর গল্প।

(৩) এরপর বৈকুন্ঠ লিখেছেন—সে কয়েকটি গল্প পড়ে দেখলো। পড়ে তার রাগ,আনন্দ—কোন প্রতি-ক্রিয়াই হলো না। ?'

বৈকুন্ঠ কার গল্প পড়লেন ? কি গল্প পড়লেন ? কোথায় পড়লেন ? বৈকুন্ঠ কি 'আধুনিক' চিহ্নিত কোন নবীন লেখকের (!) লেখা পড়লেন ? যা আমাদেরও কষ্ট দেয়। এই এক জিনিষ চালু হয়েছে. 'আধুনিক' ট্রেডমার্ক লাগিয়ে কতকগুলো মানুষ কেবল শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে বলে থাকে—'এই [illegible] মডার্ন গল্প। না বুঝলে বুঝবো তোমাদের শক্তি নেই।'

এসবই সত্যি। বৈকুন্ঠ যদি এদেরই লেখা পড়ে থাকেন, তবে কিছু বলার নেই। কিন্তু—হ্যাঁ, যদি সত্যিই আধুনিক নামের যোগ্য কোন লোকের লেখা পড়ে বৈকুন্ঠ এই কথা বলেন, তার সোচ্চার প্রতিবাদ হবেই।

এই যেন শীর্ষেন্দু, সমরেশ, বিমল ইত্যাদি (?) এ'দের লেখা, এ'দের গল্প পড়ে কি বৈকুন্ঠের কিছু মনে হয় না ? শুধুই কি মনে হয়—সবই 'রক্তহীন—অপুষ্ট, অকালে ভূমিষ্ট কিছু গদ্যের বাচ্চা ?'

বৈকুন্ঠের ডাক্তার যে প্রেসকিপ-শন দিয়ে দেন তাতো উপযুক্ত বটেই, তবে বৈকুন্ঠের মনের মাঝে 'আরো কিছু' আছে যা ওই ডাক্তারের কাছে ধরা না পড়াতে বলবো, অন্য কোন ভালো ডাক্তারের কাছে বৈকুন্ঠের যাওয়া উচিত।

বিনীত—
প্রবীর ভট্টাচার্য
কুলটি

তিরুলির মেলায় হঠাৎ কেশব হাটির সঙ্গে দেখা।

আমি চিনতেই পারিনি। কেশবই চেনা দিল। হাসি হাসি মুখে হাত জোড় করে নমস্কার করল কেশব। —বাউন পাড়ার নিধু ঠাকুরের বেটা সিধু ঠাকুর মনে হচ্ছে।

অচেনা জায়গায় বাপ-চোদ্দপুরুষের নাম ধরে কেউ ডাকলে চমকে উঠতে হয়। আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘন গোঁফদাড়ি আর জটার মতন চুলের জঙ্গল থেকে যে মুখখানা নিরীক্ষণ করে আবিষ্কার করলাম, সে মুখ কেশব হাটির।

আরে, কেশবদা যে। তুমি এখানে।

আমার কথার উত্তর না দিয়ে কেশব পাল্টা প্রশ্ন করল, তুমি এখানে কেন ঠাকুর ?

ব্রাহ্মণ সন্তানদের ঠাকুর বলা কেশবের স্বভাব। আমি গলা নামিয়ে বলি, এই মেলার ওপর একটা লেখা লিখতে হবে, তাই এসেছি।

কেশব ঘাড় নাড়ল। বুঝেছি। বাপ তাই বলেছিলেন বটে। ছেলে আমার তিনটে পাশ দিয়ে, লেকাজোকার কাজ করে।

—আমি বোকার মতন হাসি। কেশব আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তা কোথায় উঠেছ্যালে ঠাকুর!

—কাল রাত তো মেলা ঘুরতে ফিরতে আর আউল-বাউলদের গান শুনতে শুনতেই কাবার। আজ দিনটাও তো দুপুর গড়িয়ে গেল। ভাবছি সন্ধ্যের দিকে ফিরে যাব।

কোতায় যাবে ? কোলকেতার গাড়ি তো সেই সকালে। রাত কাটাতে হলে পটাসপুরের পাইস হোটেলে কাটাতে হয়। না হয়, আজ রাতটুকু এখানে থেকে, কাল ভোরেই রওনা দিতে হবে। আমি কেশবের মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, তা যা বলেছ। দেখি কি হয়!

কি আবার হবে! —তোমার কাম চুকেছে!

একরকম।

একরকম দুরকম জ্যানতাড়া জেমনি ঠাকুর। হাতের কাজ চুকে থাকলে আমার সঙ্গে চল। এই মাঘের শীতে পরপর দুরাত্তির খোলা আকাশের নিচে কাটালি নিঘ্ঘাত নিয়্যমুনি।

আমি হেসে ফেললাম। কেশব হাটির ইতিহাস শোনা আছে। গঞ্জের বাজারে কাটা কাপড়ের দোকান, তেজারতি কারবার, জমি-জিরেৎ সব ছেলেপিলেদের হাতে তুলে দিয়ে স্বেচ্ছায় নির্বাসন গ্রহণ করেছে কেশব। পয়সার হেলদোল ছিল না কেশবের। দুবেলা মাছের মুড়ো আর জামবাটি ভর্তি দুধে গোঁফ ডুবিয়ে খাওয়াদাওয়া সারত কেশব। দু সংসার। সাকুল্যে গুটি সাতেক ছেলেমেয়ে। কেশবের ছোটছেলে তারিনী গ্রামের স্কুলে আমার সঙ্গে একসঙ্গে পড়ত। বড় বউ এখনও জীবিত। ছোট বউ মারা যাবার পর কেশবের কি রকম মতিচ্ছন্ন হল। কাজ কারবার ছেড়েছুড়ে দিনরাত তীর্থভ্রম

করে বেড়াতে লাগল। শেষে একদিন বাড়িতে এসে ঘোষণা করল, কেশব সন্ন্যাস নেবে। কে যেন এক সন্ন্যাসী হাত দেখে বলেছে, কেশবকে গৃহত্যাগ করতেই হবে।

তখন কেশবের বয়স বছর সাতান্ন। বাড়িতে মড়া-কান্না উঠল। কিন্তু কেশবের এক কথা। —যাব যখন বলেচি, তেখন যাব। কেশব হাটির এক কতা, দু কতা বলতে সে শেখেনি।

আমি হেসে বললাম, মিছিমিছি আবার কষ্ট করবে কেন কেশবদা। —একটা রাত তো যেমন তেমন কেটেই যাবে।

কেশব একগলা জিব বার করে দাঁতে কাটল। অমন কতা বোলনি ঠাকুর, বললে প্যাতক হব। সেই সেবার উনিশশো উনষাট সনে, তোমার বাপ না থাকলে কেউ এই কেশব হাটিকে থানা পুলিশ থেকে বার করে আনতে পারতনি। একটু গলা নামাল কেশব, চাপাস্বরে বলল, বাতাসীর কেসে ফেঁসে গিইছিলুম না। ওর বাবুটাকে ধরে কষে রগড়ে দিতেই হাঙ্গামা। ব্যাটা মরেই জল ঘুইলে দিলে যে।

মানুষের কৃতজ্ঞতা বোধের অন্ত নেই। কোন দুর্দিনে একবার আমার পিতাঠাকুর কেশব হাটিকে সাহায্য করেছিলেন, তা আজ সুদে আসলে পুষিয়ে দেবার জন্যে কেশব উৎসুক। কিন্তু কোথায় যাব? কেশব তো স্বেচ্ছায় নির্বাসন নিয়েছে। মেলার এই ঝোপড়ির চেয়ে কেশবের সেই থাকবার জায়গা কি আরও মনোরম হবে। এখানকার এই খাদ্যের চেয়ে কেশবের দেওয়া খাদ্য কি পরম রমণীয়, না একই গু-এর এপিঠ ওপিঠ।

আমি কেশব হাটিকে কাটাবার তালে বললাম, না কেশবদা, আমার যাওয়া হবেনা। আমি পটাশপুরেই চলে যাব।

কেশব হাসল। যাব বললেই কি আর যাওয়া হয় ঠাকুর। আজ যখন তোমাকে পেয়েচি আর ছাড়চিনি। ধম্মের কাচে পাতক হব, এমন কোন অপরাধ তোমার বাবাঠাকুরের ছিচরণে নিচ্চয় করিনি। দেখি, আজ তুমি কেমন করে যাও।

আমি কেশবের মুখের দিকে তাকালাম। বোম্বাই কুলের মতন দুটো গুলি-গুলি চোখে কেশব হাটি নিস্পলকে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছে। গায়ের গেরুয়া আচ্ছাদন মাত্র, শরীরে এখনও বিষম জোর। কথা কইতে কইতে হাতের শির দপদপিয়ে উঠছিল। কে দেখে বলবে, কেশব হাটির বয়স ষাট হতে চলল। এই লোকটা এক-সময়ে খুনী কেসের আসামী, অন্য সময়ে শান্ত গৃহস্থ, গ্রামস্থ পঞ্চজনের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। সুখের সংসার নিজের হাতে ছেড়ে কোন অন্য সুখকে সে আবার ধরতে চেয়েছে। মানুষ সম্বন্ধে আমার যদি বিন্দুমাত্র অনুসন্ধিৎসা থাকে তাহলে আজ কেশবের সঙ্গে যাওয়াই ভাল। অন্তত নূতন কিছু অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে পারব।

আমি হাসলাম। বেশ চল। তোমার যখন এত ইচ্ছে, তখন তোমাকে না করব না। তবে আধ ঘন্টাটাক দেরি হবে। মেলা সেক্রেটারি সাহেবের, সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে আমাকে।

কেশব দাড়ি কাঁপিয়ে হাসল। আধঘন্টা কেন, ঘন্টাখানেক পরে এলেও চলবে। ও ঘোড়া নিম গাছের তলায় দেখতি পাবে। সামান্য কিচু গল্প করতে হবে ঠাকুর, পোড়া পেট তো মানবে নি।

আমার কাজকর্ম সেরে ঘন্টাখানেক বাদে আমি বাইরে এলাম। এক ভাঁড় চা খেয়ে একটা সিগারেট ধরাই। মেলার বাইরে মন্ডপের সবচেয়ে বড় ঘোড়ানিম গাছের কাছে কেশব দাঁড়িয়ে। তেল কুচকুচে একটা মস্ত লাঠির ডগায় গামছা বাঁধা জিনিসপত্র, বাতাসে কেশবের দাড়ি ফুরফুর উড়ছিল।

আমাকে দেখে কেশব হাসল। কিসে যাবে গো ঠাকুর, হাঁটতি পারবে? তারপর নিজেই কাটান দিল, না হাটৌরী অব্দি রিকশায় চল, তারপর না হয় হাঁটা দিলেই হবে।

আমাকে কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে একটা রিকসায় চড়ে বসল কেশব। অগত্যা আমি অনুসরণ করে যথাস্থানে বসি।

দুধারে রুক্ষ প্রান্তর। শীতের দিনে যে সবুজ সজিক্ষেতের চিত্র পাওয়া যায়, এ মাটিতে তার চিহ্নমাত্র নেই। কেন নেই আমি জানি না, অন্তত থাকা উচিত ছিল। যেখানে হাজার হাজার মানুষ কর্মহীন, সেখানে মানুষ কেন সবুজ-বিপ্লব ঘটাবার জন্যে উঠেপড়ে লাগেনা, আমার জানা নেই। এই পড়ন্ত রোদে সবুজের তারুণ্যহীন মাটি ঝলসাচ্ছে, এটা যেন চোখের পক্ষে দুঃসহ। আমি পকেট থেকে রোদ-চশমাটি বার করে চোখে পরি।

কেশব আমার দিকে তাকাল। চোখে ঠুসি পরলে কেন ঠাকুর, মা-মাটির এই রূপ বেশ বুঝি ভাল লাগছেনি।

আমি ঘাড় নাড়লাম। কেশব আমার উত্তর সমর্থন করে বলল, এসব তো বাঁজা সন্নেসীদের দেশ, কে কার কড়ি ধারে।

—আমি বেঁকা চোখে তাকাই। তুমিও তো তাদেরই একজন।

কেশব হাসল। হেসে বলল, আমার কতা আলাদা। আমার তেনকাল গিয়ে একে কাছে ঠেকেচে, কিন্তু মানুষের এই বেপরো বড় বুকে বাজে ঠাকুর।

—বাজে!

—বাজবেনি। কেশব সজোরে প্রতিবাদ করল। মা-লক্ষ্মীরা সাজগোজ করে থাকলে যেমন সোন্দর দেখায়, উদোম হয়ে থাকলে কি তেমন দেখতে নাগে, না লজ্জা করেগো।

লজ্জা থাকলে আমাদের এই দশা হয়!

হাটৌরী আসতে মিনিট দশের বেশি সময় লাগল না। বেলা পড়ে আসছে। রোদের টানে ঝিম ধরেছে। আর ঘন্টাখানেক বাদে বিকেল নামবে। তারপর দেখতে দেখতে বিকেল ফুরিয়ে সন্ধ্যা। সন্ধ্যা নামলে সে এক অসহ অন্ধকারে রাত্রি জোয়ার ভেসে আসবে। সারা রাত্রি ধরে বু

থাকতে হবে নতুন প্রভাতের নতুন সূর্য-দয়ের অপেক্ষায়।

কেশবের এই আতিথ্য গ্রহণ ভাল হল কি মন্দ হল আমি বুঝতে পারছিলাম না। কেশব আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু অনুমাণ করবার চেষ্টা করছিল। কেশব হাসির গলায় বলল, তোমাকে দেখে ঠাকুর আজ আমার তারিণীর কথা মনে পড়চে। হাঁটবার নাম শুনলে সে বেটাও এমনি কান্নি মেরে দাঁইড়ে থাকত।

আমি হাসলাম। সংসার আশ্রমের কথা তাহলে মনে পড়ে?

—মনে পড়বোনা। যে দিনগুলো সেখানে কাটুটে এলাম, সে কি এটটুখানি। না যে সুখ পেইচি, সে কিছু কম ছেল আমার।

তবে সুখ-সুবাদে সব ত্যাগ করে বনবাসে এলে কেন?

কেশব ঘাড় নাড়ল। বনবাস নয় ঠাকুর, বানপ্রস্থ। শুনেচি সেকালের রাজা-রাজড়ারা রাজত্বি শেষ করে বানপ্রস্থ গেরহন করতেন, আমি তাই করেচি। ভগবানের নাম করি, যা দুটো পাই খাই, আর সকাল সন্ধে বলি, এ জম্মে যা পেনু ভগবান তা সবই তোমার দয়ার দান।

হাঁটতে হাঁটতে গাঁয়ের রেখা পেরিয়ে এলাম। হাত ঘড়িতে সময় এখন চারটে দশ। আকাশের মাথায় শংখাচল, বাতাসে শীতের গন্ধ। গায়ের সোয়েটারটা আর একটু টানটান করে বলি, আর কতদূর কেশবদা?

কেশব হাসে, দূরে আর কোথায় ঠাকুর। এসেই পড়েচি। আর পোয়াটাক হাঁটলেই অধমের নিবাসে পোঁচে যাবে—নিব্বান আশ্রম।

নির্বান আশ্রম! বাহ্! বেশ নাম। সব দুঃখের শেষ করে, শেষ দিনটির জন্যে যেখানে অপেক্ষা করা তাই তো নির্বান আশ্রম। কামনা বাসনা রহিত সে তো সুখের স্বর্গোদ্যান।

চশমাটা খুলে ফেলি। গাঁয়ের শেষ চালা আধ মাইলটাক দূরে। নিশ্চিহ্ন জনমানব শূন্য দ্বীপে হঠাৎ যেন এক সবুজ ভূখণ্ড জেগে উঠেছে। একটি সবৎস ধবল দুধেল গাই ঘাড় উঁচু করে দেখছিল। কেশবকে দেখে হঠাৎ কেমন যেন হাম্বারবে চিৎকার করে ডাক পাড়ল। বাছুরটা তিড়িং তিড়িং কয়েকটা লাফ মেরে কেশবের পাশ দিয়ে বার-দুয়েক ছুটে চকিতে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। গুটি দুই নেড়ি কুকুর কোথ থেকে আবির্ভূত হয়ে অকস্মাৎ তীক্ষ্নস্বরে ডেকে, কেশবের পায়ে লুটোপুটি খাচ্ছিল। বসুজ টিয়াপাখি রং একটি শাড়ির আঁচল এক-মুহূর্তের জন্যে ঝলসিয়ে আবার অরণ্যে মিলিয়ে গেল।

আমি চোখ মুছে নিলাম। সবুজ দেখতে চেয়েছিলাম বলে কি, ভুলের সবুজ দেখছি। গেরুয়াধারী এই কেশব হাটির বানপ্রস্থভূমি নির্বান-আশ্রমে কোথা থেকে সবুজ শাড়ির অধিকারিণীকে ধরে আনবে।

কেশব আমার চোখে বিস্ময় দেখে হাসি চাপল। নরম গলায় বলল, ঠাকুর এসে পড়েচি। চল একেকবারে দুধ-পুকুর থেকে হাত-পা-মুখ ধুয়ে দাওয়ায় উঠব।

শস্যক্ষেতের মধ্যে দিয়ে আমরা হাটছি। বকুলতলা পার হলাম। হাঁসের একটি ছোটট্ দল প্যাক প্যাক করতে করতে উঠান দিয়ে যাচ্ছে। পুকুরের ধারে যেতে যেতে কেশব চিৎকার করে উঠল, গয়ার মা গামচা-টুকু আনতো দেকি। হুঁ্যা হুঁ্যা যে সে নয়, নিধু ঠাকুরের বেটা সিধু ঠাকুর আজ তোর আশ্শ্রমে পায়ের ধুলো দিয়েচে গয়ার মা। তোর অশেষ পুন্ণি!

হাত-পা-মুখ ধুয়ে দাওয়ায় উঠে বসলাম।

ছোট একখানা একানে ঘর। পাতায় ছাওয়া। দাওয়ার কোনে বাঁশ-বেকারি দিয়ে একটুকু রসুইশ্রীর। গোবর নিকানো ঝকঝকে মেঝে ঘরের দেওয়াল টেওয়াল। দেওয়ালের গায়ে পিটুলিগোলায় আঁকা লক্ষ্মীর পা বিচিত্র সব নকসা। এত অল্প পরিসরে, এত সামান্য আয়োজনে এমন সুন্দর চোখ মাতানো যে ঘরদোর হতে পারে, কে জানতো।

আমার কেমন আশ্চর্য লাগছিল। দোতলা নিবাসী এই বৃদ্ধ লোকটি একদা গ্রামাঞ্চলে বিশেষ সমচ্ছন্ন বলেই গণ্য হত। দুই পত্নী, উপপত্নী, সন্তান-সন্ততি সব মিলিয়ে বাড়-বাড়ন্ত লক্ষ্মীর সংসার।' সংসারে মানুষের যে কিভাবে পয়সা আসে জানি না। তবে সব পয়সাই বোধ হয় কেশব হাটির সৎপথে আসেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নানা উপায়ে যখন লোকে দুহাতে রোজগার করেছে, তখন কেশবের বয়স বড়জোর ছাব্বিশ সাতাশ। কিন্তু পুরুষ কারিৎকর্মা হলে, তার মার নেই। কেশব ধুলো ধরেছে, সোনা হয়েছে। তারপর একদা বীতস্পৃহ কেশব, নিজের হাতের গড়া সাম্রাজ্য থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসন নিয়েছে। কোথায় কে যেন বলল, 'বেলা গেল' আর কেশব দ্বিতীয় কোন জিজ্ঞাসা না রেখেই পিছু-

বিনাকা স্টারডাস্ট ট্যাল্ক

U-BT/11/7.ben.

নের সবটান মুছে নিশ্চিন্তে বাইরের এই বিশৃঙ্খল সমুদ্রে নিতান্ত দরিদ্রের মতই পা রেখে চলে এল। স্ত্রীর ক্রন্দন, পুত্র কন্যাদের আকুল মিনতি কোন কিছুই গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না কেশব।

হয়ত ছোট গিন্নীর মৃত্যু কেশবের দিকনির্দেশ করেছিল। কিন্তু সংসার-ত্যাগী মানুষের নিরাসক্ত উদাসীন দৃষ্টি তো কেশব হাটির চোখে দেখতে পাচ্ছি না। বরং এক সুখী, স্নেহ-মমতায় জড়ানো, নিতান্ত সাধারণ গৃহস্থের মুখ উঁকি মারছে কেশবের গোঁফ-দাড়ি আর জটার আড়াল থেকে।—কে ওই গয়ার মা? কেশবের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ? ঘোমটার আড়ালে কালোকোলো চিকণ একটি মুখের যে আদল দেখেছি, অনুমানে তার বয়স পঁচিশের উর্ধ্বে হবে না। চেহারায় ধার আছে, ভার নেই। লজ্জায় একেবারে নুইয়ে পড়া লতা নয় গয়ার মা, তবু একটি বিনম্র ভঙ্গী যে গয়ার মার সর্বাঙ্গে জড়ানো একথা না তাকিয়েও বলা চলে।

বেতের চাঙারিতে মুড়ি এল, সেই সঙ্গে সাদা বাতাসা।

কেশব উবু হয়ে বসে কৃতার্থ হাসি হাসতে বলল, ঠাকুর একটুকুন সেবা কর। গরিবের বাড়িতে রাতে দুটি ভাতেভাত— আর তো কিছু পার্বোনি।

গয়ার মা ঘোমটার ভেতর ফোঁস করে উঠল। ক্যানে পার্বোনি। আম্মো বিউলির ডাল, প্যাজপোস্ত রাধব।

কেশব একগাল হাসল। হাসির ভারে চোখ মুদে এল কেশবের। চা এনেচি গয়ার মা। একটুকুন চা কর দেকি বাপু।

গয়ার মা হাসল। সাদা দাঁতের আলো এক লক চোখের সামনে ঝলসে উঠল। আম্মো করলে চা আর খেতি হবেনি। নিজে বাইনে নেও।

বুড়ো মানুষকে আবার খাটতে মারবি।

গয়ার মা হাসির শব্দ চাপতে পারল না। খিলখিল শব্দে বেজে উঠে বলল, তুমমো যদি বুড়ো হওগা তবে মন্দ কারে বলেগো।

কথাটা বলে একগলা জিব কাটল গয়ার মা। বাইরের লোকের সামনে অসমীচীন এই উক্তি করে হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেওয়া উচিত হয়নি গয়ার মার।

কেশব খুক খুক করে কেশে হাসি চাপল। আমি উঠে পড়লাম। এই বৃদ্ধ এবং এই যুবতীর মধ্যে অসামাজিক এক সম্পর্ক যে গড়ে উঠেছে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। ভুল স্বর্গের কোন উর্বশী মেনকা গয়ার মা নামক এই মানবীয় রূপ-সজ্জায় কেশবের বৈরাগ্য সাধনকে পতিত করতে জন্ম নিয়েছে। হায় কেশব। বৃথাই

তোমার সংসার ত্যাগ, বৃথাই তোমার বানপ্রস্থ।

সন্ধ্যে পুইয়ে অন্ধকার নামছিল। আমি সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। যে লোকটার একদিন সব ছিল, সব ছেড়ে, সে কেন আবার নতুন করে এক বন্ধনের মধ্যে পড়তে গেল একথা কিছুতেই আমি বুঝে উঠতে পারছি না। তবে কি মানুষ ভাবে এক, ভগবান আরেক করেন।

ঠিক ভগবানকে আমার চিন্তায় টানতে ইচ্ছে হল না। আমার মনে হচ্ছিল, কেশবের সেই উদগ্র নারীমেদের আকাংখা আজও মেটেনি। গেরুয়া বসনের অন্তরালে সে মনটাকে চাপা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু ধিকি ধিকি আগুন জ্বলতে জ্বলতে একদিন প্রবল প্রতাপে জেগে উঠেছে। সে আগুনের দাহিকা শক্তির কাছে পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে কেশব। এখন মুখে সান্ত্বনা ও তৃপ্তির আলো জেলে নিজেকে এই বনবাসে কোনরকমে মানিয়ে নিয়েছে।

তবুও আমি আশ্চর্য না হয়ে পারছিলাম না। কেশব আর গয়ার মার সম্পর্কের মধ্যে গর্হিত যদি কিছু থাকবে, যদি লজ্জার কিছু থাকত, তবে গলা বাড়িয়ে কেশব আমায় ডাক দিল কেন? আমাকে চেনা না দিলে, চেনবার কিছুই ছিল না। আমার থেকে কেশবের ভয় থাকলেও, ভয় পাবার অবকাশ পায়নি কেশব। বরং সাগ্রহে সে আমাকে ডেকে এনে আশ্রয় দিয়েছে। তবে কি পূর্বাশ্রমের স্মৃতি এখনও পীড়া দিচ্ছে কেশবকে? না নূতন অর্জিত এই সুখ-শান্তির লীলাভূমি, পরিচিত কাউকে না দেখিয়ে পুরো স্বাদ পাচ্ছিল না কেশব?

কখন যেন ধীর পায়ে হাঁটছি। স্তব্ধ বনভূমি। নির্জন অন্ধকার। গরু-দুটো গাছতলায় সামান্য আচ্ছাদনের নিচে, বোধহয় জাবর কাটছে। হাঁসেরা খোঁয়াড়ে। কুকুরগুলো কোথাও, মাঝে মাঝে তাদের ডাক শোনা যাচ্ছিল। বাতাস এলোমেলো, ভীষ্মপাত, শীত করছিল।

গয়ার মা রান্নাঘরে। সামান্য কুপি জ্বালিয়ে রাঁধতে বসেছে। কেশব দাওয়ায় বসে। অন্ধকার ক্রমশ আমার আর কেশবের মাঝখানে একটা দূরত্ব সৃষ্টি করছে। দাওয়ায় বসা কেশবের মুখখানা কোন এক অতল কৃষ্ণসাগরে হারিয়ে যাচ্ছে, আমি ঠিক চিনতে পারছি না।

কেশব কখন যেন ধীর পায়ে উঠে এসেছে। কাছে এসে বলল, নুইলে ঠাকুর দা-কাটা তাকে এখনও গলায় লাগে। তোমার একটা কাঁইচি দেও দেকি, আয়েস করে টানি।

আমি সিগারেট বাড়িয়ে লাইটার জ্বালি। কেশব একটানে সিগারেটের মাথা থেকে পা পর্যন্ত আগুনে নামিয়ে এনে বলল, ঠাকুর কিছু বলবে বলবে ভাবতেচ, বলতে পারচনি।

আমি পাতলা ঠোঁটে হাসলাম। এই জন্যেই তুমি কি সংসার ত্যাগ করে বানপ্রস্থ নিয়েছিলে কেশবদা?

কেশব কিছু বলল না। অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, হয়ত এই জন্যি ঠাকুর, না হলি তো গয়ার মার সঙ্গে দেখা হোতনি।

গয়ার মা কে তোমার কেশবদা?

কেশব হাসল বোধহয়। উকিলের বেটা তো, বেশ একখান জবর কথা পিগেশ করেচ। কে সে, তাকি আমিই জানি ছাই।

এসব ভাবের কথা হয়ে যাচ্ছে। লোকে যদি কৈফিয়ৎ চায়, তবে তুমি কি বলবে কেশবদা?

কেশব তৎক্ষণাত আমার কথার উত্তর দিল না। একটু চুপ করে থাকল। ভুকতাবশিষ্ট সিগারেট হাত থেকে ফেলে দিয়ে বলল, দাওয়ায় চল, বাতাসে বিষ্টির গন্ধ লিচচে।

আমরা পাশাপাশি হাঁটছি। কেশব হাঁটতে হাঁটতে বলল, গয়ার মা আমার পেরাণের পেরাণ ঠাকুর, গয়ার মা আমার ভালবাসা।

আমি চমকে উঠলাম। একটু অসতর্ক হলেই বোধহয় পড়েই যেতাম। কিসের প্রাণ গয়ার মা? কেশবের শরীরের! মনের! না অ-ধরা যে অন্য সুখকে ধরতে চেয়েছিল কেশব, সেই অন্যসুখের প্রাণ গয়ার মা!

আমার চমকানি বোধহয় অন্ধকারেও লক্ষ্য করল কেশব। তারপর বলল, গয়ার মা আমাকে নতুন কতা ভাবতে শিখিয়েচে ঠাকুর, হক কতা।

কি তোমাকে ভাবতে শেখাল এমন, যে তুমি আবার বাঁধা পড়লে।

বাঁধা তো পড়িনি ঠাকুর! চলে যাবার পথ খোলাই আচে। কিন্তু যেতে আর মন সরেনিকো।

তোমার এ সেই মুনির গল্প হয়ে যাচ্ছে কেশবদা। ইঁদুরে কৌপিন কাটল বলে, বেড়াল এল। বেড়ালের দুধের জন্যে গাই। গাই দেখতে গৃহিণী। আর শেষে সকলের জন্যে চাষবাস। আমি হাসলাম।

ও তো না না করতি করতি হাঁ হাঁ করা। আমার তেমন বিরত্তান্ত নয় ঠাকুর।—তোমাকে তেখন বাঁজা সন্নোসীদের কতা বলেচি না, আমিও তো তেমন ছিনু, গো।

আমি হাসতে হাসতে বলি, তোমার সন্ন্যাসদশা কাটল কি করে?

ঐ গয়ার মা। কেশব সরল স্বীকৃতি জানাল, কানে এমন মন্তর দিলে ঠাকুর, আমি এক্‌করে অন্য মানুষ হয়ে গেনু গো।

নিজের কথা নিজে বলে চলল কেশব, আমি শুনে যাচ্ছি। আশ্চর্য! আমি দাওয়ায় উঠে এলাম। অন্তরালবর্তিনী গয়ার মার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। নিচু হয়ে একমনে সে ভাতের ফ্যান গালছে।

দু'দিন দাঁতে কুটো কাটিনি, গাছতলায় পড়ে আচি। কোত্থেকে কাদের মেয়ে গয়ার মা, এক বিকেলে এয়ে বলল, এই বুড়ো এমনি করে মরবি নাকি। মরতে মাগ্যি পেলিনি আর।

আমি বলনু, ভগমান যেখানে নে যাবে, যাব। যেখানে থাকতি দেবে থাকব, খেতি দিলি খাব, নইলে মরণই সই। তা ঠাকুর গয়ার মা খিলখিল করে হাসল! বলল, তবে মরগে যা বুড়ো। ভগমান একবার গতর দেচে, এখন বুড়োখোকাকে দুদ খাওয়াতে এসবে। বলি লজ্জা নাগে না বলতি।—তুই মানুষ না মাগীর বুড়ো।

কেশব চক্ষু বোধহয় রক্তবর্ণ করল। —বুইলে আমি কেশব হাটি, বাপের নাম গগন হাটি, ঠাকুর-বাপ ভেঁকুলে হাটি আমায় কিনা এমন কতা। আমি দাঁত খিচুটে বলনু, —ভাগ! তা আমার দাঁত দেকে কি হাসি। বললে, তা দাঁত বার করতি লজ্জা নেই, কাজের বেলায় দাঁত কপাটি। মর! মর! চিমড়েপোড়া শকুকে মর! গো-ভাগাড়ে সবাই যেদি সন্নোসী হয়, তবে পিথিমি থাকবে কি করি! ওলাউঠো হয়ে মর তুই! শকুনে খাক!

আমি যেন কেমন হয়ে গেনু ঠাকুর, কেমন হয়ে গেনু। মাতার মদ্দি ভোঁ ভোঁ করতিছে, আমি বলনু, এটটু তুলে ধর দেকি! —তা ঠাকুর, সেই যে ধরেচে আজও ছাড়ান নেই।

আমি হাসলাম। তা ভালই করেছে গয়ার মা। আচোট্‌ জায়গায় ফসল ফলিয়েছে, গোহালে গাই, মাথার উপরে ঘর। লক্ষ্মী উপচে পড়ছে কেশবদা!

কেশব বুকের ওপর হাত বোলাল। বুইলে ঠাকুর, আমার এটটা শিক্ষের দরকার ছেল। তা তেমনি শিক্ষে দেল গয়ার মা। মেয়েরা, বুইলে শক্তির জাত। শক্তির রূপচয় দেখলে মহামায়ার মাতায় আগুন ধরে যায় গো!

আমি চুপ করে থাকি। কেশব তার পতনের ইতিহাসকে যুক্তি দিয়ে উজ্জ্বল করবার চেষ্টা করুক। কিন্তু মনে মনে গয়ার মাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারি না। হাত-পা-ওয়ালা যে মানুষগুলো দিনরাত নুলো হয়ে ভগবানের আশীর্বাদ চাইছে, তাদের চেয়ে খেটে-খাওয়া মানুষ যে ঈশ্বরের অনেক প্রিয়, একথা যেন বুঝছিলাম। তবু আমি মুখ টিপে হাসি চেপে বললাম, গয়ার মার গয়া কোথায় কেশবদা!

কেশব হা হা করে হেসে বলল, আমাকে কেন, গয়ার মাকেই জিগোও না ঠাকুর।

ভারতবর্ষ।
৬ অগাস্ট। ১৯০১

কোন কোন চিঠি অনেক সময় প্রিয় ক্রিস্টিনা, ঈশ্বরের আশীর্বাদের মত মনে হয়—যে লেখে এবং যে পায় উভয়ের পক্ষেই।

তুমি যে স্থির শান্ত হতে পেরেছ আগের মত—যা তোমার স্বভাব, সেজন্য আমি খুব খুশী হয়েছি। 'মা' জানেন অবশ্যই—তবে শুধু জানেন না, শীঘ্রই আমার জন্য খুব ভাল একটা কিছু করবেন, আমি জানি।

এই সংসারে আমার জন্য 'খুব ভাল' কী করবেন বলে তোমার মনে হয়? অনেক সোনারূপো দেবেন আমাকে? ফু! তারচেয়ে অসংখ্যগুণে ভাল জিনিস আমি পেয়েছি, তবে আমার রত্নরাজি সাজিয়ে রাখবার জন্য খানিকটা সোনা খুব বেমানান হবে না। এবং সেটুকু আসছেও। তোমার কী তাই মনে হচ্ছে না? আমি একটু বেশী ভাবিত হই—কিন্তু প্রতীক্ষা করে থাকি ঠিকই। শেষ পর্যন্ত আপেলটি আপনিই আমার মুখের মধ্যে এসে পড়ে। অতএব সে আসছে, আসছে, আসছে।

এবারে বল তুমি কেমন আছ? শুধু রোগা হয়ে চলেছ, অ্যাঁ? ভাল সময় আসছে সেই সম্ভাবনার আনন্দে ভাল খিদে, ঘুম, হচ্ছে কী? সেই সম্ভাবনাকে স্বাগত জানাবার জন্য নিজেকে ঠিক রাখতে হবে না?

এ বছর গরমটা কেমন ছিল? আমেরিকার 'গরম' সম্বন্ধে আমরা তো ভয়াবহকেম সব গল্প পড়ছি! পৃথিবীর উত্তাপমাত্রার রেকর্ডকে পর্যন্ত তোমরা নাকি হার মানিয়ে দিয়েছ। একেই বলে ইয়াংকীদের উদ্যম।

হ্যাঁ, রুচি সম্বন্ধে তুমি যা লিখেছ, ঠিক। আমি সোনার হলুদাভা ও রুপোর শুভ্রতাকে ত্যাগ করে Amber। রংকে গ্রহণ করেছি। এইটাই আমার রুচি। Amber ও Carol এ দুটো আমি একেবারে পছন্দ করতুম না! কিন্তু ইদানীং আমি এদের সৌন্দর্য বুঝতে পারছি। মানুষ জীবনের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই শিক্ষা পায়। কী বল?

আগামীকাল দার্জিলিংএ যাচ্ছি দিন কয়েকের জন্য। সেখান থেকে তোমাকে চিঠি লিখব।

এখন Gutchacht (শুভরাত্রি) and
all revior for the present
সতত তোমাদের বিবেকানন্দ

২৭ অগাস্ট, ১৯০১। বেলুড় মঠ।
হাওড়া জিলা। বাংলাদেশ।

তোমার কাছ থেকে একটা দারুণ লম্বা চিঠি আশা করে আছি এবং আমার সব আশার মত এ আশাটিও অপূর্ণ থাকবে বলে ভয় হচ্ছে। যাক, তোমাকে আমার সেই একঘেয়ে প্রশ্নবলীর দ্বারা বিরক্ত করব না—যথা, 'কেমন আছ,' 'সারা গ্রীষ্ম-কালটা কী করলে' ইত্যাদি। আমি নিশ্চিত জানি 'মা' তোমাকে অন্তত শারীরিক কুশলে রাখবেন।

এখন শোনো ক্রিস্টিনা, এই চিঠিখানি খুবই সংক্ষেপে লিখছি। একটি বিশেষ কারণ আছে এই চিঠির। চিঠিটি পাওয়া মাত্র তুমি আমাকে তোমার একটি সাম্প্রতিক ফোটো পাঠাবে।

তুমি কী মিস ওয়ালডোকে বইয়ের প্রকাশনার বিষয় কিছু লিখেছিলে? আমি তার কাছ থেকে কোন সংবাদ বা যেটা আরও প্রয়োজনীয় কথা—বিক্রির টাকা পয়সা কিছুই পাইনি (এই কথাটুকু অবশ্য শুধু তোমার আমার মধ্যেই থাকবে)।

তুমি কী মার্গট বা মিসেস বুলের কোন খবর পেয়েছ? তুমি কী খুশীতে আছ? আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আমি খুশীতে আছি আবার কখনও সব মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সবই শারীরিক, বস্তুজগতের ব্যাপার।

বিদায়। ভালবাসা ও আশীর্বাদসহ
তোমাদের বিবেকানন্দ।

পুঃ—যতশীঘ্র সম্ভব ফটো পাঠাবে।
V.

(৫৪)

বেলুড় মঠ। হাওড়া জিলা।
বাংলাদেশ। ভারতবর্ষ। ৭ সেপ্টেম্বর
১৯০১

উটের পিঠে যে কুঁজটা আছে তাইতে যদি জলভরা থাকত কী ভাল হোত বল ত? যারা আমার মত তার পিঠে চড়তে বাধ্য হয় নিরুপায় হয়ে, তারা বসবার জন্য একটা জলভরা আরাম-দায়ক চামড়ার কুশান পেতো!!

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কুঁজটা শুধু হাড্ডিসার, সামান্য কিছু মাংসল। হতভাগার জল জমা করবার জন্য একটা স্পেশাল জায়গা আছে পেটের মধ্যে বিরক্তিকর না?

তারপর ক্রিস্টিনা, আমি তোমাকে এই সপ্তাহেই একটা চিঠি লিখেছি। আজ তোমার লম্বা একটা চিঠি পেলাম। আপাতত করবার মত কোন বিশেষ কাজ কিছু নেই, তাই আজ আবার লিখছি।

আমরা সবাই ফিটের ঝোঁকের বশে কাজ করি। চেষ্টা করি উৎসটাকে চেপে রাখতে কিন্তু কোনটা কোন উপলক্ষ্যে উৎসটা (জলের) ঘূর্ণিবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বেগে উৎসারিত হয় চিন্তা, স্মৃতি, লেখবার ইচ্ছে ও হিজিবিজি লেখা। এই আর কী।

এই ইচ্ছে ঝোঁকটা হঠাৎ দেখা দেবার কারণ একটি ফোটো অনেক, অনেকদিন আগে একটি বন্ধু দিয়েছিল। তারপর আর একখানি ছবি আমাকে দেবার মত যোগ্য আর সে আমাকে মনে করে না। (এটা হল পিঁপড়ে এবং উইপোকার সময়। অতএব আমি বাঁ হাতে পিঁপড়ে মারছি আর ডান হাতে চিঠি লিখছি। এজন্য খারাপ হাতের লেখা মার্জনা করে নিও।

আবার সেই ফোটোর কথা তুলছি। আমি হলুম Oliver-Twist এর মত সময় 'আরও চাই'। আর আমার বন্ধুরা তো জানে আমার ভিক্ষাবৃত্তির সীমা নেই। অতএব সীমাহীন আমার দাবী—যতক্ষণ না বন্ধু বিমূঢ় হয়ে যাবে। আমি হলুম ভিক্ষুক সন্ন্যাসী (friar) অতএব আমার ধর্মপ্রথা ভুললে তো চলবে না।

এবারে বৃষ্টির কথা। এখন যথারীতি বাদলধারা শুরু হয়েছে। চারিদিক প্লাবিত—দিবারাত্রি অঝোর ধারায় ঝরঝর বাদলের ধারা। নদী ফুলে ফুলে উঠছে তীরভূমি প্লাবিত করে, পুকুর ঝিলে জল উপছে উঠেছে। আমি এইমাত্র একটা গভীর নালা কেটে আসছি—যাতে মাঠের জমি থেকে জলটা নেমে যায়। এক-এক জায়গায় বৃষ্টির জল কয়েক ফিট পর্যন্ত উঁচু হয়ে জমে আছে। আমার বিরাট সারস-পাখীটি আনন্দে আত্মহারা। আমার হাঁসেরাও (ducks & geese) ভারী খুশী। তবে সারসবেচারী সঙ্গিহীন একলাটি হবার দরুন ওর লাফালাফি নাচানাচি সবই অর্থহীন। আমার পোষা হরিণটিরও সেই একই অবস্থা। আশ্রমজীবনের নিঃসঙ্গতায় তিক্তবিরক্ত হয়ে ও সঙ্গিনীর খোঁজে আশ্রম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল।। ওকে খুঁজে বের করতে কদিন আমাদের বেশ দুশ্চিন্তায় কেটেছে। আমার একটি হংসিনী কাল মারা গেল। প্রায় সপ্তাহখানেক ধরে ওর শ্বাসকষ্ট চলছিল। আমাদের একজন রসিক সন্ন্যাসী বললেন, মশায় এ কলিযুগে বাস করে কোন সুখ নেই। এ-যুগে বৃষ্টি ও স্যাঁতার ভুগে হাঁসের হয় সর্দি আর ব্যাং-রা হাঁচে। একটি রাজহংসিনীর পালক ঝরে যাচ্ছিল। কী করব বুঝতে না পেরে একটা টবের মধ্যে সামান্য একটু কার্বোলিক জলে মিশিয়ে ওকে তার মধ্যে ছেড়ে দিলাম কয়েক মিনিটের জন্য! ভাবলুম এইতেই ও হয় মরে যাবে নয় সেরে উঠবে। সেরেই উঠল!

আমি বড় ভিজে গিয়েছি। আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ আমি বড় বেশী রেগে যাই এবং রেগে ভায়োলেন্ট হয়ে পড়ি। ফলে এখানে ছেলেরা আমাকে সহ্য করতে পারে না। আমি চাই যে তুমি আমাকে একবার ঐ অবস্থায় দেখো—যাতে এরপর থেকে তুমি আমার থেকে দূরে (নিরাপত্তায়) সরে থাকবে।

আপাততঃ বিদায় তবে ছবিটার কথা ভুলো না।

ভালবাসা ও আশীর্বাদ সহ
বিবেকানন্দ

"He himself . . . . said that he was at his best in Thousands Islands. Now he felt that he had found the channel through which his message might be spread, the way to fulfil his mission, for the Guru had found his own disciples"

ডেট্রয়েট থেকে স্বামীজী গেলেন নিউইয়র্কে। ভেবে-ছিলেন কৃষ্টি ও সভ্যতার কেন্দ্র বড় শহর আমেরিকা, যেখানে হয়ত কাজকর্মের ব্যবস্থার উপায় সহজে হবে। সেখানে বেশ কিছু ধনী বন্ধু তাঁর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে ওঁকে ভাল-বেসেছিলেন, মুগ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু ওঁর বাণী সম্বন্ধে কোন মাথাব্যথা তাঁদের ছিল না। এদিকে ওঁকে খুব বিলাসিতার মধ্যে রেখেছেন, খাওয়াচ্ছেন, কাপড়-জামা দিচ্ছেন তাঁরা। স্বামীজী যেন পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত গর্জে উঠলেন। বললেন—

"Not this, not this, I can never do my work under these condition."

তখন ভাবলেন আলাদা থেকে প্রচারের ক্লাস খুলে সকলকে আহ্বান জানান শ্রেষ্ঠ পন্থা। ল্যান্ডসবার্গকে বললেন, একটি সস্তার বাসা খুঁজতে ওঁদের দুজনের জন্য। পাওয়া গেল ৬৪নং পশ্চিম তেত্রিশ রাস্তার বাসাটি (৬৪ ওয়েস্ট ৩৩ স্ট্রীট)। অঞ্চলটি মোটেও সুবিধার নয় এবং জানিয়ে দেওয়া হল মহিলাদের পক্ষে জায়গাটি বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁরা যেন না আসেন এখানে। কিন্তু তাঁরা ঠিক এলেন। সব রকমের স্ত্রী-পুরুষ সেই নোংরা বিশ্রী ঘরে উপস্থিত হতেন। তাঁরা চেয়ার পেলে চেয়ারে বসতেন। চেয়ার খালি না থাকলে টেবিলের ওপরে, হাত ধোবার স্ট্যাণ্ডে, এমন কী সিঁড়িতে পর্যন্ত। কোটিপতি ধনী মহিলারা ওঁর পায়ের নীচে মেঝেতে বসতেন খুশী মনে।

বক্তৃতার জন্য পয়সা নেওয়া হত না। এবং ঘরের ভাড়া দেবার পয়সাও ওঁদের থাকত না। তখন স্বামীজী ভাবলেন কিছু আলাদা করে বক্তৃতা দিলে হয়ত উনি কিছু পয়সা উপার্জন করতে পারবেন। সমস্ত শীতকালটা খুব খাটলেন। প্রায়ই শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যেত। খুবই সংকটের মধ্যে দিয়ে এই প্রচারকার্য চালাচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে মনে হত এবার বুঝি কাজকর্মের পালা সাঙ্গ করতে হবে।

এই সময় কিছু ব্যক্তি ওঁর এই কাজের জন্য অর্থ ব্যয়ের দায়িত্ব গ্রহণে আগ্রহী হলেন। কিন্তু শর্ত ছিল বক্তৃতা দিতে হবে 'ঠিক জায়গায়' এবং নির্বাচিত 'ঠিক লোকেরা' শুধু আসতে পারবেন। ওঁর মুক্ত সন্ন্যাসী-মনের কাছে এ

রকম শর্ত অসহনীয় মনে হল। এই জন্যই কী উনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন? এরই জন্য কী উনি নাম-যশের মোহ ত্যাগ করেছিলেন? না। আর্থিক সাহায্যের পরিবর্তে উনি এ রকম শর্তে রাজী হবেন না। কাজটা যখন ও'কে করতেই হবে, তখন উপায় আপনিই হবে। উনি অস্বীকার করলেন এই রকম প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সমঝোতা করতে। এই সময় নিম্নলিখিত চিঠিটি লিখেছিলেন,—

'অমুক' চায় আমাকে 'ঠিক ঠিক লোকেদের' সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। আমার জীবনের অভিজ্ঞতায় আমি বুঝেছি যে যাদের ঠাকুর পাঠান তাঁরাই 'ঠিক লোক।' একমাত্র তারাই আমাকে সাহায্য করতে পারে, বাদবাকীদের ঠাকুর তাদের একত্র করে আশীর্বাদ করুন—আমাকে রেহাই দিন।....হায় ঠাকুর, কী কঠিন কাজ তোমার দয়ায় বিশ্বাস রাখা! শিব, শিব! কোথায় সেই 'ঠিক লোকেরা' আর কোথায়ই বা 'বেঠিকরা?' সবই যে তিনি। বাঘের মধ্যে, ভেড়ার মধ্যে, সন্ত, পাপী, সকলের মধ্যেই ঈশ্বর। তাঁরই শরণাগত হয়েছি আমি—আমার দেহ চিত্ত, আত্মা। তবে কী এখন তিনি আমাকে ত্যাগ করবেন,—এত দিন ধরে আমাকে তাঁর পক্ষপুটে লালন-পালন করে?

ঈশ্বর যদি করুণাময় না হন তাহলে সমুদ্রে এক ফোঁটা জল থাকবে না, ঘন অরণ্য শূন্য হবে, কুবেরের ঘরে খুদকুঁড়োও থাকবে না। তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে মরুভূমিতে নদী হতে পারে এবং ভিখারীর ঘর ঐশ্বর্যে ভরে যেতে পারে।....হায় ঠাকুর, আমাকে এই সব লোকের সাহায্য চাইবার দুর্বলতা থেকে বাঁচাও। তুমি ছাড়া আর কারো কাছে যেন সাহায্য না-চাই।..আমি তোমার দাস। একমাত্র তোমারই। তুমি কী আমাকে অন্যের কুমতলবের হাতে ছেড়ে দিয়ে তাদের কু-চক্রে আমাকে লিপ্ত করবে? না। তুমি কখনই আমাকে ত্যাগ করবে না। আমি নিশ্চিত জানি।

এর পর কয়েকটি আগ্রহী ছাত্র ও'র আর্থিক দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করলেন। ফলে আর কোন অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয় নি। এর পরে উনি আবার লিখলেন, 'পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও কী পারে যে ধনীর দ্বারায় কোন মহৎ কার্য সম্পন্ন হয়েছে? হৃদয় এবং মস্তিষ্ক—এই দুটির দ্বারাই যা কিছু কাজ হয়, ধন দিয়ে নয়।'

সমস্ত শীতকালটা শিক্ষাদান চলল। গ্রীষ্মের মুখে দেখা গেল ভক্তের দল ক্লাস বন্ধ করতে চায় না। এঁদের মধ্যে একজনের সেণ্ট লরেন্স নদীর পাশে থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে একটি বাড়ী ছিল। তিনি স্বামীজীর কাছে প্রস্তাব করলেন গ্রীষ্মকালটা সেখানে থাকবার ব্যবস্থা করা হোক না কেন? ও'দের আন্তরিক আগ্রহ দেখে উনি অভিভূত হলেন এবং রাজী হলেন। নিজের একজন বন্ধুকে চিঠি লিখলেন—উনি ঐ ক্লাসে শিক্ষা দিয়ে কয়েকটি যোগী 'ম্যানুফ্যাকচার' করতে চান। উনি অনুভব করলেন এত দিনে সত্যিই ও'র কাজ শুরু হল এবং থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে যাঁরা ও'র ক্লাসে যোগ দিয়েছেন তাঁরা সত্যিই ও'র শিষ্য।

১৮৯৫ খৃস্টাব্দে উনি মিসেস ওলিবুলকে লিখছেন, 'এই সপ্তাহে আমার এখানকার ক্লাস শেষ হয়ে যাবে। আগামী শনিবার মিঃ লেগেটের সঙ্গে Maine-এ যাচ্ছি। সেখানে ও'র একটি সুন্দর লেক আছে। সেখানে ২।৩ সপ্তাহ থাকব। সেখান থেকে থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে যাব। ১৮ই জুলাই কানাডা-স্থিত টেরেন্টোর ধর্মসভায় কিছু বলবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছি। থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক থেকে ওখানে যাব আবার সেখানেই ফিরে আসব।'

'মিঃ লেগেটের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত এখানে এসেছি। এ পর্যন্ত যত সুন্দর জায়গা দেখেছি তার মধ্যে এই স্থানটি সেরা মনে হচ্ছে। ভেবে দেখুন ঘন বনানীর পাহাড়-ঘেরা একটি লেক এবং কেউ নেই, শুধু আমরা। যেমন মনোরম তেমনি শান্ত এবং নির্জন। নিশ্চয় বুঝতে পারছেন শহরের কোলাহলের পর আমি কতখানি খুশী হয়েছি।

এখানে এসে যেন নতুন করে জীবন ফিরে পেয়েছি। বনের মধ্যে একা একা চলে যাই এবং গীতা পড়ি। বড় আনন্দ পাই। দিন দশেক পরে এখান থেকে থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ডে ফিরে যাবো। এখানে এই কদিন একাকী বসে ঘন্টার পর ঘন্টা ধ্যান করব। The very Idea is ennobling."

জুনের প্রথমে ৩।৪ জন শিক্ষার্থী এলেন থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে এবং বিলম্বমাত্র না করে শিক্ষাদান শুরু হল। আমরা এসেছিলাম শনিবারে—৬ই জুন। স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পনা ছিল সোমবারেই আমাদের কয়েক জনকে দীক্ষা দান করবেন। রবিবার বিকেলে বললেন, 'আমি তোমাদের এখনও খুব ভাল করে চিনি না। অথচ তোমরা দীক্ষার জন্য প্রস্তুত কিনা সে বিষয়ে আমাকে নিশ্চিত জানতে হবে।' তারপর একটু লজ্জা-নম্রভাবে বললেন, 'আমার মধ্যে একটা ক্ষমতা আছে, যা আমি কদাচ ব্যবহার করি—আমি অন্যের মন পড়তে পারি। যদি তোমরা আমাকে অনুমতি দাও তাহলে আগে তোমাদের মন পড়ে নেব। কারণ সোমবারেই তোমাদের দীক্ষা দিতে চাই।'

আমরা সানন্দে রাজী হলাম।[১] উনি পরীক্ষার ফলে খুশী হলেন এবং আমাদের কয়েক জনকে মন্ত্রদান করলেন। আমরা ও'র শিষ্য হলাম। পরে যখন ও'কে জিজ্ঞাসা করা হল আমাদের মন পড়ে উনি কী বুঝলেন, উনি কিছু কিছু বললেন আমাদের। উনি দেখতে পেয়েছিলেন যে আমরা বিশ্বস্ত থাকব এবং আধ্যাত্মিক জীবনে আমাদের উন্নতি হবে। উনি কী কী দেখে-ছেন তারই কিছু কিছু বললেন,—সব কিছুর ব্যাখ্যা করলেন ....

........আমরা জিজ্ঞাসা করলাম এই শক্তি কী করে পাওয়া যায়। উনি বললেন যে কেউ এই শক্তি লাভ করতে পারে। মেথডটি বলতে খুবই সহজ....। উনি দেখেছিলেন আমাদের মধ্যে একজন ভারতবর্ষের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হবে।

বিশেষ এবং তুচ্ছ সব রকম ঘটনাই আমাদের বলা হয়েছিল এবং সে সব ঘটনা সত্যই ঘটেছিল। এই রীডিং-এ প্রত্যেকের গুণাবলী উন্মোচিত হয়েছিল—সাহস, ক্ষমতা, এবং চরিত্র। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর নিজের ওপরে অবিশ্বাস বা নিজেকে খাটো করবার সম্ভবনা থাকে না। যখনই সাময়িকভাবে মনে কোন সন্দেহ জাগে পরক্ষণেই স্বর্গীয় আত্মবিশ্বাস এসে পূর্ণ করে দেয়?

"Every momentary doubt is followed by a serene assurance. Has the personality not received the stamp of approval from the one being in the world?"

থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কের বাড়ীটা ছিল একটা পাহাড়ের মাথায়।[২] এর কী কোন গূঢ় অর্থ ছিল? বাড়ীটা সামনের দিকে দোতলা এবং পেছনের অংশ তিনতলা উঁচু। পাহাড়ের উপরে গাছগাছালিতে অরণ্যাবৃত, লোকালয় থেকে দূরে

---

১ এ বিষয় সেনমহাশয়ের স্মৃতিলিপিতে পাই—স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন 'আমি কী তোমার মন পড়তে পারি?' তৎক্ষণাৎ উত্তর পেলেন 'নিশ্চয়?' অবশ্য পড়তে পারেন।' 'বেস্ত গার্ল' স্বামীজী বললেন।' এর পর ক্রিস্টিনকে বললেন 'তোমার ওপরে মাত্র তিনটি পর্দা আছে? তোমার তৃতীয় চক্ষু এই জীবনেই উন্মীলিত হবে।' 'বাদল রাতে মিসেস ফাঙ্কে ও ক্রিস্টিন এসে-ছিলেন স্বামীজীর কাছে কিছু পেতে। স্বামীজী বলেছিলেন 'আমার যদি ক্ষমতা থাকত তোমাদের মুক্তি দেবার জন্য।'

নদীর ধারে একটি গ্রাম ছিল। নেহাৎ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবার শখে কদাচিৎ কেউ এদিকে আসেন। নচেৎ মানুষজনের মুখ দেখা যেত না। আমাদের কাজের পক্ষে বাড়ীখানির অবস্থান ছিল আদর্শ। কেউ ভাবতেই পারে না আমেরিকাতে এ রকম একটা জায়গা পাওয়া যায়। কী গভীর বাণী ধ্বনিত হয়েছে এই বাড়ীতে! কী পরিবেশই না গড়ে উঠেছিল? অপার শক্তি সেখানে জন্ম-লাভ করেছে! কোথাও গুরু তাঁর চিন্তার উচ্চতম স্থানে পোঁছেছেন! কোথাও তিনি তাঁর হৃদয়-মন আমাদের উন্মুক্ত করে দেখিয়েছেন।

"We saw ideas unfold and flower. We saw the evolution of plans which grew into institutions in the years that followed."

এমন অভিজ্ঞতা লাভ করা যেন স্বর্গের আশীর্বাদ! এই অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে মিস্ ওয়ালডো বলেছিলেন, 'কোন পুন্য বলে আমরা এই সৌভাগ্য লাভ করেছি?' আমরাও ঠিক সেই কথাই অনুভব করলাম!

প্রথমে ঠিক হয়েছিল সবাই মিলে একটা যৌথ আস্তানা গড়ে তোলা হবে। ঝি-চাকর থাকবে না নিজেরা ভাগাভাগি করে কাজ সারা হবে। দেখা গেল কেউই গৃহকর্মে পটু নয়। ফলতঃ ব্যাপারটা প্রথমে কৌতুককর এবং পরে সর্বনাশা রূপ নিল।....

....কী করে ছোট ছোট কাজের মধ্যে দিয়ে মানুষের চরিত্রের পরীক্ষা নেওয়া যায় সেটা বুঝতে বেশ কৌতূহল হয়? হয়ত কত দুর্বলতা, কত অক্ষমতা যা সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে কখনও বোঝা যায় নি, সেগুলো কেমন প্রকাশ্য হয়ে দেখা দিল এই যৌথ জীবনে। ব্যাপারটা রীতিমত ইন্টারেস্টিং। স্বামীজীর ওপরে এর প্রতিক্রিয়া অন্যভাবে হল। যদিও দলের মধ্যে একজনই ছিল ওঁর চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ, কিন্তু সকলের প্রতি বাবা, না—বরং মায়ের মত নরম ও ধৈর্যশালী। যখন দেখা যেত কাজটা খুব জটিল হয়ে পড়েছে, তখন খুব মিষ্টিভাবে বলতেন, 'আজ আমি তোমাদের সকলের জন্য রান্না করব।' এই কথায় ল্যান্সবার্গ আঁৎকে উঠে বলতেন, 'ভগবান আমাদের বাঁচাও!' তারপর সকলকে বুঝিয়ে দিতেন 'নিউইয়র্কে যেদিন স্বামীজী রান্না করতেন সেদিন নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করত। কারণ স্বামীজী রান্না করবার পর একগাদা বাসন ধোওয়া কী কম পর্ব ছিল!!

এই যৌথ সংসারে বারকয়েক নানা রকম অসন্তোষের অভিজ্ঞতার পর শেষ পর্যন্ত কাজের জন্য একজন লোক রেখে দেওয়া হল, এবং দলের মধ্যে ২।১ জন যাঁরা কাজের লোক তাঁরাও খানিকটা দায়িত্ব নিলেন। ফলতঃ আমরা শান্তি লাভ করলাম।

সাংসারিক কাজকর্ম মিটিয়ে আমরা যখন ক্লাস ঘরে বসতাম তখন পরিবেশ সম্পূর্ণ অন্য রকম হয়ে যেত। কোথাও এতটুকু গোলমাল নেই। মনে হত আমরা যেন শরীর এবং শারীরিক চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছি। আমরা অর্ধ-গোলাকারে বসে অপেক্ষা করতাম

'Which gate to the eternal would be opened for us to-day? What heavenly vision should meet our eyes?'

দুঃখহীন অজানা জগতের দ্বার যখন আমাদের সামনে খুলে গিয়ে চোখের সামনে তুলে ধরত সৌন্দর্য ও আশার দৃশ্য, তখন মনের মধ্যে শিহরণ বোধ করতাম।

'Vivekananda's flight carried us with him to supernal heights.'

আমাদের উপলব্ধির মাত্রা যতটুকুই হোক, বা না-হোক, কিন্তু একটা বিষয়, যা কখনও ভুলতে পারি নি, যে আমরাও মোজেসের মত উঁচু পাহাড়ের মাথা থেকে promised land দেখতে পেয়েছিলাম; এবং এর পরে সংসারের দুঃখ-কষ্টকে আর তেমনভাবে 'সত্য' মনে হত না।

....আলোচনাকালে রকমারী গল্প বলতেন! বলতেন সেই সুন্দর বাগানের গল্প যেখানে একজন প্রাচীরের ওপর দিয়ে সেই বাগানটি দেখে মুগ্ধ হয়ে প্রাচীরের ওপরে উঠে লাফিয়ে পড়ল; আর ফিরল না। এমনি সব গল্প একের পর এক। এইভাবে সকাল থেকে মধ্যরাত্রি হয়ে যেত। যখন দেখতেন এইসব গল্প এবং আলোচনা আমাদের মনের ওপরে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করছে তখন হেসে বলতেন, 'তোমাদের কেউটে ছোবল মেরেছে, নিষ্কৃতি নেই।' অথবা কখনও বলতেন, 'তোমাদের জালে ধরেছি, পালাবার পথ নেই।'

বাড়ীর কর্ত্রী কুমারী ডাশার ছিলেন গোঁড়া মেথাডিস্ট মহিলা। তিনি যে কী করে এই দলে জুটলেন সেটা অনেকের কাছেই বিস্ময়ের বস্তু মনে হত। বিশেষ করে যাঁরা জানেন তাঁর (স্বামীজীর) ভেতরে কী অসীম ক্ষমতা ছিল আকর্ষণ করবার এবং খাঁটি মানুষকে কাছে টেনে নেবার। একবার যে তাঁকে দেখেছে এবং তাঁর কথা শুনেছে তার কী তাঁকে অনুসরণ না-করে উপায় ছিল? একে কী তুমি দেহধারী ঈশ্বর বলবে না?

"The Divine which lures man on until he finds himself again in his lost kingdom?"

তবে যাঁরা প্রচলিত মতবাদে এবং ধর্মমতে গোঁড়া ছিলেন তাঁদের পক্ষে এই পথ কঠিন, এবং ভীতিজনক ছিল। সে ভদ্রমহিলার যা কিছু আদর্শ, ধর্মমত, জীবনের মূল্যায়ন সব যেন ধ্বংস হয়ে গেল তাঁর মতে। আসলে কিন্তু পরিশোধিত বা সংস্কারসাধিত হল।

মাঝে মাঝে ২।৩ দিন তিনি আসতেন না ক্লাসে। স্বামীজী বলতেন 'বুঝতে পারছ না—এ সাধারণ অসুখ নয়। এ হল মনের মধ্যে যে উত্তাল আলোড়ন চলছে তারই দৈহিক ক্রিয়া! মিস ডাশার যেন সবটা সহ্য করতে পারতেন না! একদিন ক্লাসে ওঁর (স্বামীজীর) কোন কথায় মিস্ ডাশার মৃদুভাবে কিছু প্রতিবাদ জানান। স্বামীজী বললেন,

'The Idea of duty is the midday sun of misery scorching the very soul'........

এইভাবেই চলত আমাদের শিক্ষাধারা। যাঁদের সত্য সত্যই গভীর গুরুভক্তি ছিল তাঁদের পক্ষে এমন কিছু কঠিন নয় ব্যাপারটা। সাপের খোলসের মত পুরোনোকে বর্জন করে নতুনকে গ্রহণ করতেন তাঁরা। কিন্তু যাঁদের বিশ্বাসের চেয়ে প্রাচীন সংস্কার ও গোঁড়ামী প্রবল তাঁদের পক্ষে এ শিক্ষা ভীতি-জনক ও রীতিমত সর্বনাশা।

[(চলবে)]

---

২ থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কের বাসভূমি ভগিনী ক্রিস্টিনের কাছে তীর্থস্থানতুল্য। এইখানে এসে তিনি প্রথম স্বামীজীর কাছে নিজের হৃদয় উন্মোচিত করেন। বাদল রাতে তাঁর কাছে এসে বলে উঠেছিলেন 'আমরা এসেছি!! যদি যীশু খৃষ্ট আজ থাকতেন তবে তাঁর কাছে এমনি করেই গিয়ে বলতুম 'আমাদের কিছু শেখান।'

।। সাত ।।

লোকগুলি পালিয়ে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে আবার একটা রাত্রি নেমে এল: কুয়াশার সজল একটা রাত্রি। ঝিমিয়ে পড়ল খুঙুর দানার মতো ছোট্ট ছোট্ট দ্বীপ। দ্বীপের চারপাশ ঘিরে নদীতে তখন থই-থই করছে জোয়ার। জঙ্গলের ঝোপঝাড় থেকে তেজী সাপের মতো শিস শিস শব্দ আসছে। এটাই যেন স্বাভাবিক এই সুন্দর-বনে। কিন্তু ঐ বিশাল আকৃতির নৌকাটা কোথায় যাচ্ছে গো? কার নাও? কে যায়?

কত নৌকোই তো যায় আসে। দিনে রেতে। উত্তরে-দক্ষিণে। কে অত হদিশ রাখে কার! নৌকাটা আকৃতিতে বিরাট। জল ছুঁই ছুঁই করছে কান। যেন যে কোন মুহূর্তেই ডুবে যেতে পারে।

শুকনো শামুক ঝিনুক, কাঁকড়া আর হাড়গোড় ডাঁই হওয়া নৌকোর পাটাতন। কতকালের শুকনো হাড়গোড় ওগুলো কে জানে। হয়তো নদীর চরা আর ভাগাড় খুঁজে খুঁজে সংগ্রহ করেছে ওগুলো মাঝিরা। পুড়িয়ে চুন করা হবে বোধ হয়। নৌকাটাকে গতিহীন বলে মনে হচ্ছে। মাল বোঝাই ভারি নৌকার গতি সব সময়ই মন্থর হয়। কিন্তু হালে কোন মাঝি দেখা যাচ্ছে না। তবে কি গলুইয়ের কব্জায় হালটাকে স্থিরভাবে গেঁথে রেখে মাঝিরা এখন বিশ্রাম করছে। নাকি ঘুমিয়ে পড়ে রাত্রির জোয়ারটুকু শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছে।

হবেও তাই। এই ঘন কুয়াশায় অপদেবীর অদৃশ্য ডাকে পথে বিপথে কেইবা আর ঘুরতে চায়।

কিন্তু তাই বলে ঘুমিয়েই বা থাকে কি করে মাঝিরা। সুন্দরবনের নদীপথের আইন-কানুন কি জানা নেই মাঝিদের। কার এমন বুকের পাটা, নৌকো নোঙর করে রাত্রি-যাপন করবে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে। কেবল কি তিমি, কেবল কি ডাকাত। সাঁতরে ওঠা সাপ, কুমীর নেই। কিন্তু জানি এ কেমন ধারা ব্যাপার!

সত্যি সত্যি হালের মাচার ওপর তখন কেউ ছিল না। দুর্লভ তো নয়ই, জলধর, দুর্গা, শরৎ ওরাও না। দুর্লভ ম্যাকডোনাল্ড হাল বায়। মাঝি। আর সবাই দাঁড়ের কাছির ওপর পা আটকিয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে দাঁড় টানে। এরা সবাই এখন বিশ্রামে এসেছে। নৌকো নোঙর করা রয়েছে। না করে উপায় নেই। একে কৃষ্ণপক্ষ, তায় কুয়াশা। স্তূপীকৃত শামুক ঝিনুকের নিচেতে সামান্য একটু স্থান করে নিয়েছে মাঝিরা। একটা কুপি সেই ফোকরের মধ্যে জ্বলছে। ঝকসানো আলোর রেখা শামুকের গায়ে আঘাত খেয়ে বীভৎস সব ছায়া সৃষ্টি করেছে।

দুর্লভ জেগে থাকবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ঘুমই কেবল জড়িয়ে জড়িয়ে আসছিল চোখে। চোখ টান টান করে একটা হাই কাটল দুর্লভ। জলধর, দুর্লভের হাইতোলা দেখে হেসে উঠল। তারপর হাসির কারণ ব্যাখ্যা করবার জন্য বলল, বুঝেছ দাদা, হাড়গোড় নিয়ে বাস করলেই ঘুম পায়।

দুর্লভ উত্তর দেওয়া অবান্তর মনে করল। মনে হল, জলধর যেন বলতে চাইছে শামুক ঝিনুকের শুকনো খোলগুলি বুঝি জাদু করে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চাইছে সবাইকে। অর্থাৎ মরে ভূত হয়ে গেছে যারা, রাত্রিশুদ্ধ লোককে তারা বুঝি মৃত অবস্থাতেই দেখতে চায়। দুর্লভ নিজের অজান্তেই বুকের উপর আঙুল টেনে ক্রুশ এঁকে ফেলল একবার।

—এই শালা দুর্গা ফের ঘুমুচ্ছিস?

—কৈ গো! দুর্গা প্রতিবাদ করে, কোথায় আবার ঘুমুতে দেখলে আমাকে?

তবে কি দুর্লভের দৃষ্টিভ্রম ঘটছে। এমন হয়, নদীপথে এরকম হামেশাই হয় মাঝিদের। নদীতে নদীতে পথ ভুল করে কতবার যে ওদের নাকানী চোবানী খেতে হয়েছে, কে অত লিখে রাখে। দুর্লভ আর এক ছিলিম তামাক সাজতে বসল।

রাত্রিটা এইভাবেই জেগে বসে কাটাতে হবে ওদের। দিনের আলো ফুটলে আবার ওরা বদর বদর করে নৌকো বাইবে। যতক্ষণ না ভাটার মুখোমুখি পড়ে ততক্ষণ একটা-নাগাড়ে নৌকো বেয়েই যেতে হবে। এমনি করে কয়েকটা উজান কয়েকটা ভাটা পেরিয়ে এক সময় ওরা এসে পড়বে হুগলির ঘাটে। তারপর মাল খালি করতে যেটুকু সময়। আবার ফিরে আসবে নদীপথেই খালি নৌকো নিয়ে। পাটাতনের চোরা পাল্লায় লুকিয়ে রাখবে বিকিকিনির টাকা।

এমনিভাবে কয়েক মাস পর পরই দুর্লভকে শামুক ঝিনুক নিয়ে নৌকো ছাড়তে হয়। দুর্গা দুর্গা! জলধর, শরৎ দুর্গা দাঁড়ের পাশে বসে যায়।

দুর্লভ ম্যাকডোনাল্ড হাঁক দেয়, বদর বদর।

জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার। তাই খ্রীস্টান হয়েও দুর্লভ বদর গাজীর নাম না নিয়ে নৌকো ছাড়ে না। এই নদীপথে বিপদে আপদে একমাত্র বদর গাজীই সহায়। ঐ নামেই ওরা অনায়াসে ঘোষবন থেকে হুগলি কিংবা কাকদ্বীপ যাতায়াত করতে পারে। দুর্লভ হুঁকোয় টান দিয়ে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যেই একরাশ ধোঁয়া ওর মুখটাকে ঢেকে ফেলে। বাঁ হাত দিয়ে ধোঁয়ার জঞ্জাল সরিয়ে কলকেটা এগিয়ে ধরে দুর্লভ। তারপর হাতে হাতে কলকে ঘোরা শুরু হয়।

বুড়ো বাসুকি ধরে এগিয়ে গেলে এখন দুধারেই কিছু না কিছু আবাদ চোখে পড়ে ওদের। চৌধুরী রাজাদের আবাদের কাজ সবে শুরু, কিন্তু মাইল পাঁচেক এগিয়ে এলেই জমজমাট আবাদ। আবাদের মাটিতে এখন হাল পড়ে। হালের ছোঁয়ায় মাটি ফেঁপে ফুলে গর্ভবতী হয়ে ওঠে। তবে শেকড় আর শুলোয় বাধায় হালের মুখ আটকে যায় এখনো। দা কাটারি কোদাল নিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষ। কিন্তু ফসল কোথায়। আরো দু দশ কোপ না কাটলে নাকি ফসল হা-ফসল করেই কাটাতে হবে। তাই আরো কয়েক কোপ [illegible] চাই। নুন কেটে জমি জমির মতো হওয়া চাই।

এই আশাতে আশাতেই আবাদে আবাদে বসতি বসেছে। দুর্লভ পাকাপাকিভাবে ঘরদোর তৈরি করে ফেলেছে ঘোষবনে।

ঘোষবনের জমিদারী স্বত্ব ছিল বর্ধমানের ঘোষদের। ঘোষবংশের নাম থেকেই এ আবাদের নাম হয়েছে ঘোষবন। বন আর নেই, নির্মূল হয়ে পুরোটাই এখন আবাদ। তবে ঘোষদের হাত থেকেও ইতিমধ্যে বেহাত হয়ে গেছে এই বাদা। স্মৃতিটাই শুধু রয়ে গেছে নামের মধ্য দিয়ে।

ঘোষবন এখন গুমতির রাজাদের সম্পত্তি। গুমতির রাজাদেরও হিস্যার অন্ত নেই। তবে ঘোষবন মাত্র একজনেরই সম্পত্তি। একজন বলতে, ছোটকুমার মহাবীর সিংহ রায়। হালে মহাবীরের কাছ থেকে এক বিঘা পত্তনি নিয়েছে পাদরী সাহেবরা। উদ্দেশ্য সেবা না জানিস্ত। চাষ আবাদ করবে না ভালো। স্কুল মক্তব করবে? ভালো। খ্রীষ্টান করবে ধরে ধরে? তাও ভালো। মহাবীর মুফতে ছাড়েনি জমি। কাগজপত্র তৈরি করে টাকাকড়ি গুনে নিয়ে তবে সে পাদরীদের জমিটুকু দিয়েছে। তার [illegible]

সে করেছে, এবার পাদরীরা যা ইচ্ছে করুক মহাবীরের তাতে প্রয়োজন নেই।

মাত্র কয়েক বছর হল এখানে এসেছে পাদরীরা। এরই মধ্যে তারা কয়েক ঘর খ্রীষ্টান বানিয়েছে। ম্যাকডোলাল্ড পদবী নিয়েছে দুর্লভ। প্রথমে প্রথমে নানা রকম কটুক্তি শুনতে হত ওকে। কেউ কেউ ডাকত, ও কালাসাহেব, খবর কি?, ভালো।

দুর্লভ উত্তর করত না। মনে মনে গজ গজ করত। খ্রীষ্টের কাহিনী যারা শোনেনি তারা ওরকমই ব্যঙ্গ করবে। দুর্লভ ছোটখাট অনেক প্রার্থনার গান মুখস্থ করে ফেলেছে এর মধ্যে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মনে মনে সেই গানগুলি আওড়ায় দুর্লভ। ফাদারদের মুখে নানা রকম গল্প শুনে দুর্লভ হতবাক হয়ে থাকে। এ বিশ্বাস ওর হয়েছে, মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে যীশু, আর ধর্মের শ্রেষ্ঠ খ্রীষ্টান। যীশু মানুষের ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনিই ঈশ্বর। যীশু মানুষকে ত্রাণ করবার জন্য পৃথিবীতে এসেছিলেন। এক যীশুই কালে কালে অগণিত যীশুতে পরিণত হবে। তেমন দিন আসতে আর দেরি নেই। তাই, সেই হয় পুণ্যব্যক্তি যে যীশুর কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে বেঁচে থাকে।

পাদরীরা সুদৃশ্য চার্চ তৈরি করেছে তাদের জমির ওপর। অনেক দূরদেশ থেকেও সেই চার্চের চূড়ো দেখা যায়। পাদরীদের জমির আশেপাশে খ্রীষ্টানদের কলোনী গড়ে উঠেছে। অ-খ্রীষ্টানরা বলে পাদরী পাড়া। ফাদাররা একটা স্কুলবাড়ি করার কথাও চিন্তা করছেন হালে। শিক্ষাই আলো, অন্ধ অশিক্ষিত হয়ে থাকা আর নরকে বাস করা একই কথা। বিনা বেতনে এই স্কুলে জাতিধর্ম নির্বিশেষে শিক্ষা দেওয়া হবে। এসব কথাই শোনা যাচ্ছে। দুর্লভ পাড়ায় পাড়ায় গেয়ে বেড়ায়, জানো গো, তোমাদের জন্য স্কুল করে দেবেন ফাদাররা। শিক্ষাই আলো, শিক্ষা না পেলে বেঁচে থাকাই বৃথা।

—তাই বুঝি। তবে তো বেশ কল করছে কালাসাহেব। তোমাদের ঐ পাদরী পাড়ায় পড়তে লিখতে ছেলে পাঠাই, আর ধরে ধরে তোমরা সবাইকে খ্রীষ্টান করে ছাড়ো এই তো।

—এ তুই কি বলছিস হারাণ। ফাদার-দের কখনো ওরকম ভাবিস না। একদিন এসে আলাপ করে দেখ না।

—যাও বাপু যাও। নিজে যা করছ কর, ভাঙা শিঙে আর গুঁতোতে এসো না বলে রাখলুম।

ঘোষবনের জমিদার মহাদেব সিংহরায় তাঁর নায়েব নকুল ভদ্রের মুখে সব খবরই পেয়ে থাকেন, ফাদাররা খ্রীষ্টান করা শুরু করেছে আবাদে। করুক গে। মাথা ঘামান না মহাবীর। স্কুলটুল যদি হয় আমাদের মঙ্গল হবে। মহাবীর শুধু একথাই বার বার স্মরণ করিয়ে দেন নকুলকে, দেখ বাপু, জমিজমা নিয়ে ওরা যেন কখনো বাড়াবাড়ি করতে না আসে, নিজের জমিতে বসে সাহেবরা যা করতে চায় করুক, আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

দুর্লভ বর্ষার কয়েক মাস জমি নিয়ে লড়াই করে। বাকি সময়টা তার হাড়গোড় কুড়োনই কাজ। তারপর মাল বোঝাই নৌকো নিয়ে সে বাজারের দিকে ছোটে। ঘোষবন থেকে হুগলি অবদি নৌকো বেয়ে এগিয়ে যায় দুর্লভ।

বুড়োবাসুকির জল থলবল করে নাচছে। শব্দটা জলতরঙ্গের মতো কানে এসে লাগছে ওদের। রাত্রিটা এইভাবে জেগে বসে তুড়ি মেরেই কাটাতে হবে। ভোরের সঙ্গে সঙ্গে আবার নোঙর তুলে 'হালের মাচায় উঠতে হবে দুর্লভকে। ফলে তন্দ্রা মতোই এসেছিল একটু। সহসা মনে হল, নৌকাটা যেন কেমন একটু টাল খেয়ে নড়ে উঠল। চমকে উঠে সকলেই কেমন হকচকিয়ে গেল।

লক্ষণটা মোটেই ভালো নয়। সঙ্গে সঙ্গে ওরা টাঙ্গি আর রামদা টেনে নিল হাতে। পরস্পর মুখ চাওয়া-চাইয়ী করতে করতে দু-এক মুহূর্ত অপেক্ষায় রইল।

নাহ্, আর কোন শব্দ নেই। তবে?

মুখ খুলল দুর্লভ, সাবধান মাঝি....

শব্দটা শামুক-ঝিনুকের গায় ঠোক্কর খেয়ে যেন আছড়ে পড়ল। কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর এল না। একটু যেন সাহস পেল দুর্লভ। পা টিপে টিপে ছইয়ের বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। চারদিকে আঁতি-পাঁতি করে খুঁজতে শুরু করল। কিছু চোখে পড়ছে না তো। মশাল জ্বালাল দুর্লভ। মশালের আলো কুয়াশার স্তর ভেদ করে খানিকটা জায়গাই শুধু আলোকিত করে রাখল।

এমন সময় চমকে উঠে জলধর দেখাল, ঐ ঐ—ঐদিকে।

হাত কয়েকের ব্যবধানে ছোট্ট একটা ডিঙি দুলে দুলে নাচছে দেখতে পেল সবাই। ডাকাতের ডিঙি নয় তো। ডাকাত দলের এমনিই ছোট ছোট ডিঙি হয়।

ডিঙিতে কোন আলো নেই। কোন লোকজনেরও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। হয়তো এখন ছইয়ের ভিতর ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে ওরা। শক্ত করে টাঙ্গিখানা হাতের মুঠোয় চেপে ধরল দুর্লভ।

নদীপথের রীতিনীতি সব কিছুই জানা আছে দুর্লভের। সত্যি সত্যি যদি ডাকাতের নৌকো হয়, ও পক্ষের সাড়াশব্দ না পেলে এদেরও মুখ খোলা উচিত নয়। ও পক্ষ থেকে যেমন গলায় কথা বলবে, এরা তেমন গলাতেই জবাব দেবে। ওরা যদি বলে, একটু আগুন দাও তো মাঝি। এরা বলবে, তা দিতে পারি তবে বাঁ হাতে। অর্থাৎ ডান হাতে থাকবে সড়কি বল্লম। ওরা যদি বলে, মাঝি অমুক জায়গায় ডাকাত পড়েছে জানো, নৌকো সামলে যেও কিন্তু। এরা বলবে, আর সে ডাকাত তো আমরাই সাঙাৎ।

হয়তো এটুকু আলাপেই ওরা বুঝে যাবে, এ পক্ষের জোর কত। তাই অবশেষে ওরা গলা নামিয়ে বলবে, কি যে বল মাঝি তার ঠিক-ঠিকানা নাই। তারপর ঝুপাং

ঝপাং করে দাঁড় ফেলে ওরা দূরে থেকে দূরে মিলিয়ে যাবে।

দুর্লভ ম্যাকডোনাল্ড নদী-পথের এই সব আইনকানুন চুলচেরা হিসেবে জানে। কিন্তু এ কেমন হল। ডাকাত দলের ডিঙি হলে কারো সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না কেন! দুর্লভ এবার গলা চড়িয়ে ডাক ছাড়ল, কার ডিঙি গো? বাঁয়ে যাও, বাঁয়ে।

তবু নিঃশব্দ।

দুর্গা বলল, ব্যাপার সুবিধের মনে হচ্ছে না কালাসাহেব। দাঁড়-মাঝি নেই, লোকজনেরও কোন রা পাওয়া যাচ্ছে না, তবে কি ঘাটের নৌকো ভাসতে ভাসতে চলে এসেছে?

হবে বা।

ডিঙিটা আবার পাক খেতে খেতে এগোচ্ছে। আবার তাই হাঁক ছাড়ল দুর্লভ। নৌকো সামলাও মাঝি, ও মাঝি, কে আছ?

দুর্লভ জানে, ছোট্ট ওই ডিঙিখানা ওদের এই নৌকোর সঙ্গে ধাক্কা খেলে ডিঙিটারই ক্ষতি। চাই কি বেকায়দা মতো ধাক্কা লাগলে বগ বগ করে জল ঢুকে ডুবেও যেতে পারে।

অথচ স্রোতের টানে নৌকোটা ঠিক এগিয়ে আসছে। হ্যাঁ এই দেখ, আবার একটা আঘাত করে বসল। ঠিক এই মুহূর্তেই কাত হয়ে ঝুঁকে ডিঙির গলুইটা চেপে ধরল দুর্লভ। তারপর আবার একটা হাঁক ছাড়ল, আরে ও মাঝি। কালা নাকি রে বাবা। কেউ আছ ডিঙিতে? না নেই?

নিশ্চয়ই কেউ নেই। থাকলে এরপর অন্ততঃ শব্দ পাওয়া যেত। দুর্গা আর শরৎ লাফিয়ে ডিঙির পাটাতনে উঠে পড়ল। তারপর মশাল হাতে ছইয়ের ভেতরেই ঢুকে পড়ল।

এ কি। এ কি দেখছে ওরা!

—ভেতরে লোক রয়েছে গো কালা-সাহেব। হ্যাঁ গো, কে তুমি?

—মরে আছে নাকি! দুর্গার ইচ্ছে হল, আপাদমস্তক ঢাকা দেওয়া মূর্তিটার গা থেকে চাদরখানা এক হ্যাঁচকায় টেনে সব রহস্য ভেঙে দেয়। কিন্তু চাদর সরালে যদি ভূত কিছু দেখে ফেলে ও।

মশাল এগিয়ে নিয়ে দুর্গা ধীরে ধীরে মূর্তিটার মুখ থেকে চাদরটা টেনে তুলল।

—এ কি! এ কি বিভৎস মুখ। চমকে খানিকটা সরে এল ওরা। ইস কি কদর্য এই মুখের চেহারা। চারজনেই পলক না পড়া চোখে তাকিয়ে রইল মূর্তিটার দিকে।

আরো অনেক পরে জ্ঞান ফিরল গৌরীর। কান পেতে লক্ষ্য করল কেউ যেন দাঁড় বাইছে ডিঙির। কে বাইতে পারে। তবে কি নিমাই ফিরে এল। না কি সেই কালো লোকটা। কি নাম যেন ওর, ঈশান। হ্যাঁ এই মুহূর্তে ওর ঈশানের কথাই মনে পড়ল। তবে কি ঈশান ওকে ছেড়ে যায় নি এখনো।

নাহ্, বিশ্বাস করতে পারছে না গৌরী। ওকে তো ভাসিয়েই দেওয়া হয়েছিল। তবে কে ওরা? ঝড়ের বেগে দাঁড় বাইছে লোকগুলি। একজনকেও চিনতে পারল না গৌরী।

যেই হোক। চিৎকার করে ওর বলতে ইচ্ছে হল, আমাকে তোমরা বাঁচিয়ে তোল গো, শুনছ, বড্ড যন্ত্রণা, বড্ড কষ্ট।

সঙ্গে সঙ্গেই আবার কুচিন্তা মাথায় ভর করে এল। এরাও যদি গৌরীকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। আবার যদি প্রাণের ভয়ে এরা ত্যাগ করে ওকে। এ রোগকে ভয় পায় না, এমন কে আছে পৃথিবীতে। আর্ত চোখে কেবল লোকগুলির দিকে তাকিয়ে রইল গৌরী।

চোখাচুখি হয়ে গেল দুর্লভের সঙ্গে। দুর্লভের মনে হল রুগীর জ্ঞান ফিরেছে। ঝিঙের খোসার মত অমসৃণ দেহটার দিকে এগিয়ে এল দুর্লভ।

—কোথা থেকে আসছ মা? এমন একা একা তোমায় কে ভাসিয়ে দিল?

গৌরীর চোখে জল। না বলতে পারল না গৌরী। অথচ ঠোঁঠ দুটো ওর নড়ছে, যেন অনেক কথাই ও বলতে চাইছে।

—বলো মা, ভয় কি বলো। আমি তোমার ছেলের মতো মা, বলো।

—ছেলে! কান্নায় আকণ্ঠ ডুবে এল গৌরীর। অবশেষে একটু প্রকৃতিস্থ হওয়ার জন্য ডুকরে ডুকরে উঠল, জল, একটু জল।

দুর্লভ হাঁড়ি থেকে ঠান্ডা জল তুলে এনে অল্প অল্প করে মুখে ঢেলে দিল গৌরীর। তারপর দাঁড়িদের লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে উঠল, জোরে, আরো জোরে চালা তোরা। তাড়াতাড়ি ফিরে চল। জ্ঞান হয়েছে মেয়েটার।

রাত না ফুরুতেই ওরা ফিরে এল ঘোষবনে। এসে খবরটা প্রচার করতেই পালে যেন বাঘ পড়ল।

দুর্লভের স্ত্রীর নাম কুন্তি। কুন্তি মাথায় হাত দিয়ে বসল। ওমা, কোথাকার কোন ঘাটের মড়া নিয়ে এলে গো। কে এ?

মেয়েটা যে কে—দুর্লভও ছাই কি জানে। দুর্লভ বলল, যেই হোক আগে ওকে শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা কর দেখি, বুঝব। ওকে যদি বাঁচিয়ে তুলতে পার, মানব জন্ম তোমার সার্থক হবে।

—কথা শোন। কোথা থেকে তুলে আনলে বলবে তো? নাড়ী নক্ষত্র জানি না, পরিচয় জানি না, তার উপর এই মহা রোগ, না বাপু আমার কেমন ভয় ভয় করছে।

দুর্লভ যতটুকু জানে খুলে বলল। বলল, ঘাগুলো দেখছ তো, শুকনোর মুখে। চন্দন বেটে বোলাও দেখি। নিম পাতা আনো, কাঁচা হলুদ আনো। তাছাড়া ওঝা-বদ্যি যা যা দরকার সব তোমার দায়িত্ব। আমাদের তো ছেলেপুলে কিছুই নেই, ওই আমাদের মেয়ের মতো।

—যাদের মেয়ে তারা টের পেলে ঠেঙিয়ে তোমার ভূত ছাড়াবে।

—সে সব তো পরের কথা। আগে আর সময় নষ্ট না করে কি ভাবে ওকে বাঁচান যায় সে কথা ভাবো। মরতে বসেছিল, জোর গলায় বলতে পারব বাঁচিয়েছি। মেরে ফেলি নি যে দোষ হবে।

কুন্তির তবু প্রশ্নের শেষ নেই। অসংখ্য প্রশ্ন। দুর্লভের দুর্বুদ্ধিতার জন্য নিজের ভাগ্যকেই দোষারোপ করতে শুরু করল ও।

(চলবে)

ব্লু ফিল্ম

অদ্রীশ বর্ধন
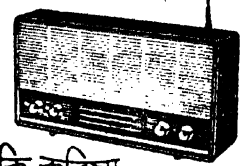
সাইকেল নীচে নামালেন। ব্রা ভেতরে রাখলেন—এমনভাবে যাতে হঠাৎ দেখলে মনে হবে দারুণ ভয়ে মেয়েটা পরবার সময়ও পায়নি—ফেলে পালিয়েছে। স্টেশনওয়াগনের দরজা বন্ধ করলেন। সাইকেলে চাপলেন। চলে এলেন। আর ভয় নেই। বিপদ আর আপনাকে ছুঁতে পারবেন না। অত সকালে ও অঞ্চলে কাকপক্ষী ছাড়া কেউ যায় না। গেলেও সাইকেলে কাউকে যেতে দেখলে ফিরেও তাকাবে না। তাই নির্ভয়ে সাইকেল চালিয়ে এলেন ভজগাড়ী পর্যন্ত। গাড়ীতে সাইকেল উঠিয়ে খুঁজে বার করলেন এমন একটা নির্জন জায়গা যেখানে সচরাচর কেউ যায় না। ঝোপঝাড়ের মধ্যে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড সাইকেল ঢুকিয়ে রেখে হাত ঝেড়ে এসে বসলেন গাড়ীতে। শেষ প্রমাণটুকুও বিসর্জন দিয়ে খুশীমনে ফিরে এলেন বাড়ীতে। মিঃ সামাদ, এবার বলুন কি বলবেন।'

'বললাম তো। সব মিথ্যে।'

বড় শক্ত বাদাম দেখছি, ভাঙতে বেগ দেবে। লোকটা যুগপৎ ঠিক আর বেঠিক চাল দিয়ে যাচ্ছে। অস্বীকার করে ঠিকই করছে। বেঠিক করছে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটুকুও না দেখিয়ে। হয়ত আমরা আর কি জেনেছি বুঝতে পারছে না বলেই ভয়ের চোটে চুপ করে আছে। কিন্তু আমার তূণের তীর এখনো ফুরোয়নি।

জোরের সঙ্গে বললাম—'সব করলেন কিন্তু ভাগ্য বিরূপ হল একটি ক্ষেত্রে। শুধু একবার। ছোট্ট একটা ভুল করে বসলেন।

ঘা দিলাম ঠিক জায়গায়। টলে উঠল অটল মনোবল। কিন্তু আমি সময় দিলাম। আমি তো জানি ওর উদ্বেগটা কোথায়! ফুলপ্রুফ মার্ডার করেও ভয় কখনো যায় না। কে জানে কোথায় কি ত্রুটি থেকে গিয়েছে। সামাদের মনেও সেই ভয় আছে বইকি! তাই কিছুক্ষণ পরে নিথর মুখে পেশীর কাঁপন দেখলাম।

বললাম—'সনাতন গুঁই যখন ঐ ছবি তুলেছে বলে মনে করানো হয়েছে, তখন কিন্তু গঙ্গার জোয়ার থাকার কথা। অথচ নেগেটিভে দেখা গিয়েছে ভাটার টান। তখনি বুঝেছি, নেগেটিভগুলো জাল। আপনি ফটো কপিতে একসপার্ট, মিঃ সামাদ।'

'বাজে বকবেন না।'

'বাজে কোথায় বকলাম! আপনি একসপার্ট, সেটাও কি মিথ্যে? ফটোর ফটো তুলছেন নিজের চোখে দেখেছি। নিজেও বলেছেন কি করছিলেন। তখন অবশ্য আপনার আত্মবিশ্বাস যতটা ছিল, এখন তা নেই।'

নড়েচড়ে বসল সামাদ। শুরু হয়েছে অস্বস্তি।

'কপাল মন্দ তো আপনি কি করবেন। সনাতন যে-মডেলের ফটো নিয়েছিল, তারই ফটো তাকে দিয়েছিল—আপনি জানবেন কি করে? তাই প্রিণ্ট হাতে নিয়েই বুঝলাম, ছবি তোলা হয়েছে কয়েক হপ্তা আগে। আর ডেডবডির পাশে পাওয়া ছবিগুলো তারই নকল—জালফটো। মিঃ সামাদ, ব্যাপারটা তুচ্ছ। কিন্তু ফেঁসে যাচ্ছেন।'

যেন কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছে, এমনিভাবে 'ননসেন্স' বলে উঠল সামাদ। কিন্তু এ-লক্ষণ আমি চিনি। পিছু হটতে হটতে দেওয়ালে যখন পিঠ ঠেকে যায়, তখন এমনিভাবেই শেষ চেষ্টা করে সবাই। সুতরাং চালিয়ে গেলাম আক্রমণ।

'গত শুক্রবারের কথা বলা যাক। সনাতনের বাড়ীতে আপনার গলা শোনা গিয়েছে। ঝগড়া করছিলেন সনাতনের সঙ্গে।'

'মিথ্যে কথা। আমি যাইনি।'

খোলায় চিড় ধরেছে। এতক্ষণেই এই প্রথম গলা চড়িয়ে রেগে জবাব দিল সামাদ।

'হ্যাঁ গেছিলেন!'

'না যাইনি', আর এক পর্দা চড়ল গলা।

'যাননি? তাহলে কোথায় গিয়েছিলেন?'

'খেতে। তারপর দুএকটা জিনিস কিনতে।'

'কটার সময়ে?'

'বারোটা নাগাদ।'

'ফিরলেন কখন?'

'জানি না। সব সময়ে ঘড়ি দেখার অভ্যেস আমার নেই।'

'না দেখলেও সময়ের আইডিয়া থাকে বই কি! একটু খাটুনি বাড়ল আর কি। আপনার রিসেপশনিস্টকে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে।'

'সে জানে না।'

'কেন জানে না?'

'বেরিয়েছিল... প্রিন্ট ডেলিভারী দিতে গিয়েছিল।'

থমকে গেলাম সেকেণ্ড কয়েক।

'ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট। স্টুডিওর বাইরে আপনি কতক্ষণ ছিলেন, রিসেপশনিস্টকে তা জানতে দেবেন না বলেই তাকে কাজ দিয়ে বাইরে পাঠিয়েছিলেন।'

'রাবিশ। বাইরে ওকে প্রায় যেতে হয়। ফুলটাইম রিসেপশনিস্ট রাখবার মত পয়সা আমার নেই। অর্ডার আনা আর মাল ডেলিভারী দেওয়ার জন্যে ওকে রাখা।'

'তা বেশ। সে ফিরল কখন?'

সামাদ জবাব দিল না।

'না বললে কিন্তু ওকেই জিজ্ঞেস করব।'

'তিনটের একটু পরে।'

'আই সী। এবার, বলুন 'আপনি' কখন ফিরলেন।'

'দুটো নাগাদ।'

কেন মিথ্যে বলছেন। আপনি স্টুডিও থেকে বেরিয়েছেন বারোটার অনেক আগে—ফিরেছেন আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে। সনাতন গুঁইকে খুন করার জন্যে গিয়েছিলেন গঙ্গার ঘাটে।'

'বাজে কথা। আমি কলকাতা ছেড়ে বেরোইনি।'

অমূল্য বরাটের দিকে তাকিয়ে বললাম—'স্যার, এবার বসা যাক। সারা রাত থাকতে হতে পারে।'

'আপত্তি নেই। ক্যারি অন, সুমন্ত।'

বলে বসলেন অমূল্যবাবু। পাইপ বার করে অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে তামাক ঠাসতে লাগলেন। আমি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম সামাদের সামনে। দৃশ্যটা সাজিয়ে নিলাম মাথায় একটা বদবুদ্ধি এল বলে। সামাদের ফাঁদেই সামাদকে ফেলতে হবে। কথা বললাম খুব সহজ সুরে।

'মিঃ সামাদ, আপনার কথামত শুক্রবার আপনি বারোটায় বেরিয়েছিলেন, কেন?'

'কারণ সেটা সত্যি বলে।'

'ফিরেছেন দুটোয়—আপনার কথামত কেন?'

'কারণ সেটাও সত্যি বলে।'

মাথা নাড়লাম।

'অ্যালিবি একটু মেজেঘসে নিলে ভাল জমত। আপনি জানতেন বারোটায় স্টুডিও থেকে বেরোলে একটায় সনাতনের বাড়ী হাজির হতে পারবেন না। টপ স্পীডে ড্রাইভ করলেও কম করেও এক ঘন্টা লাগে। সেখানে পৌঁছে ঝগড়া বাধিয়ে একটা নাগাদ খুন করতে গেলে বারোটার আরো আগে বেরোনো দরকা। আপনি বলছেন, ফিরেছেন দুটোয়। কেননা, আপনি জানতেন খুন সেরে লাশ লুকিয়ে ফিরতে আড়াইটে বাজবেই।'

সামাদ ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি কি ফাঁদে পা দিতে চলেছে। না বুঝলেও সন্দিগ্ধ হল। ও বুঝছে না হঠাৎ সময় নিয়ে এত চুলচেরা হিসেব করতে বসলাম কেন আমি। আমিও হুঁশিয়ার ছিলাম যাতে মুখ ফসকে ক্লু বেরিয়ে না যায়। এবার টান মারলাম ফাঁদের দড়িতে।

'এবার বলুন মিঃ সামাদ, আপনি ঠিক বারোটা থেকে দুটো বেছে নিলেন কেন? কেন বললেন না দশটা থেকে বারোটা? অথবা তিনটে থেকে পাঁচটা?'

চোখের পাতা পড়ল না সামাদের। কোটর থেকে যেন ঠেলে বেরিয়ে এল চোখ দুটো। ভুলটা বুঝল আস্তে আস্তে। মারাত্মক ভুল। মুখ খুলেল জবাব দেবে বলে—কিন্তু শব্দ বেরোলো না। আমি ঝুঁকে বললাম। খুব স্পষ্ট করে বললাম।

'সনাতন কখন মারা গেছে আপনি জানলেন কি করে?'

চেয়ারে হেলে পড়ল সামাদ। পরাজিত সে—সম্পূর্ণ।

বলল জড়িত স্বরে—'কাগজে ...

'কাগজে বেরোয়নি। কাগজে যেটুকু খবর ছাপতে দিয়েছিলাম, ইচ্ছে করেই তার মধ্যে খুনের সময় দিইনি। বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত স্টুডিওর বাইরে ছিলেন, একথা আপন নিজের মুখে না বলা পর্যন্ত ইচ্ছে করেই খুনের সময়টা আমিও বলিনি। আপনি জানতেন সনাতন মারা গেছে একটায়—কারণ আপনিই তাকে মেরেছেন। আপনার গলা শোনা গেছে তার একটু আগে। আপনার গাড়ী পার্ক করা ছিল বাইরে।'

মেঝের দিকে চোখ নামাল সামাদ। বিধ্বস্ত চেহারা। উঠে দাঁড়ালেন অমূল্য বরাট। পাইপটা হিপপকেটে গুঁজলেন।

বললেন সামাদকে—'আসুন। অফিসে বসে স্টেটমেন্টে সই দেবেন।' মিসেস দোপাটি নাগের ফ্রেমে বাঁধানো ছবিটা তুলে নিয়ে ফের বললেন এটা নিয়ে চললাম। আপনার মেয়েকেও জেরা করব—পরে। আপনার সঙ্গে পরলোকগত সনাতন গাঁইয়ের সম্পর্কটা কি পর্যায়ে পৌঁছেছিল, সে খবর সে-ই দিতে পারবে।'

সম্মোহিত মত সামাদের দৃষ্টি অনুসরণ করল ছবিটা। ফ্যাল ফ্যাল করে দেখল ছবিটা বগলে পুরলেন অমূল্যবাবু। রুক্ষ, শুষ্ক কয়েকটা শব্দ ঝড়ে ওড়া পাতার মত যেন উড়ে এল গলা দিয়ে :

'বাস্টার্ড! কিডন্যাপিংয়ে রেখেছিল মেয়েটাকে।'

অমূল্য বরাট বললেন—'ওহে সুমন্ত, কেসটাকে বেড়ে হ্যান্ডল করেছো।—ফার্স্ট ক্লাশ।'

কথা হচ্ছে অফিসে বসে। সামাদ সই দিয়েছে স্টেটমেন্টে। খুনের স্টেটমেন্ট। সনাতনকে সে-ই খুন করেছে। সই দেওয়ার পর এমন ভেঙে পড়ল যে অ্যামবুলেন্স ডেকে হাসপাতাল পাঠাতে হয়েছে। মেন্টাল শক। সামলে উঠতে পারলে হয়।

দিন কয়েক পরে ফোয়ারাকে হেড-কোয়ার্টারে ডেকে এনে নিয়মমাফিক জবানবন্দী লিখে নিলাম। সাক্ষী হতে হবে শুনে মুখ শুকিয়ে গেল বেচারির। কেননা, সনাতনের বাড়ী গিয়েছিল কেন বলতে হবে। তাহলেই ফাঁস হয়ে যাবে নুড ফটো তুলিয়ে সনাতন ব্ল্যাকমেল শুরু করেছিল তার বাপকে।

'সুমন্ত, ন্যুড ছবি তুলেছি স্বীকার করতে আপত্তি নেই। ওটা ফেস করতে হবেই। কিন্তু ফলে যে পাবলিসিটি হবে, তাতে ক্ষতি হবে বাবার।'

আমি নিরুপায়। অবিবেচনার দাম এই-ভাবেই দিতে হয়। নিস্তার নেই ফোয়ারার—আমারও কিছু করার নেই। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরে পুরো চিত্রটা পালটে গেল একটা ঘটনা ঘটায়। প্রতিশ্রুতি রাখলাম। গেলাম ওর কাছে। খবরটা এতই উপাদেয় যে ফোয়ারা খুশী হবেই। কৃতজ্ঞও হবে। তাই ভালবাম নিজেই গিয়ে বলি। আসলে, ওকে দেখতে ইচ্ছে করছিল।

ফোয়ারা ফোয়ারার মতই যেন ঝিরঝির করে উঠল আমাকে দেখে। সে কী আনন্দ। এবার দেখলাম এক বোতল হুইস্কি আর বরফ রেডি রেখেছে ফ্ল্যাটে।

এক ঢোক গিলিয়ে দেওয়ার পর বলল—'কি এমন পিলে চমকানো খবর এনেছো শুনি?'

নাটকীয়ভাবে বললাম—'হে আর্যকন্যা, তুমি শুনে প্রীত হবে যে মামলায় তোমাকে আর সাক্ষী দাঁড়াতে হবে না।'

কথার শুরুতে আমার দিকে পা বাড়িয়ে ছিল ফোয়ারা। কিন্তু দাঁড়িয়ে গেল মাঝ-পথে। হুইস্কি ছলকে পড়ে গেল গেলাস থেকে। ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে রইল অবিকল উজবুকের মত।

'কি হয়েছে গো?'

সময় বিশেষে এবং পাত্রীবিশেষে 'হ্যাগো'র 'গো'টি যে এতখানি মধুবর্ষণ করতে পারে কর্ণকুহরে, সে অভিজ্ঞতা আগে ছিল না। যেন সুরবাহারের প্রক্ষেপ-বিক্ষেপ-গমক-মূর্ছনা একই সঙ্গে কানের মধ্যে দিয়ে মরমে পৌঁছে গেল।

বললাম—'সামাদের মন আর শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে। কমপ্লিট ব্রেক-ডাউন। আত্মপক্ষ সমর্থন করা আর সম্ভব নয় তার পক্ষে। ডাক্তার রায় দিয়েছে, এ-জীবনে আর সুস্থ হতে পারবে না সামাদ। শেষ জীবনটা পাগলা গারদেই কাটাতে হবে। তাও বেশী দিনের জন্যে নয় —শরীর এত ভেঙে পড়েছে।' হেসে শেষ করলাম—'সুতরাং তোমাকে কোর্টে গিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আর বলতে হবে না দুদিন আগে কি রকম নটি গার্ল ছিলে।'

আনন্দের বিস্ফোরণে বিস্ফোরিত হয়ে দৌড়ে এল ফোয়ারা এবং সশব্দে চুম্বন করল আমাকে।

'সুমন্ত, সুমন্ত, বুক থেকে পাষাণ নেমে গেল সুমন্ত। ওয়াণ্ডার ফুল। বাবা শুনলে কি খুশীই না হবে।'

'শুনেছেন। খবর চলে গেছে। তোমাকে অফিস খবর পাঠাতো। কিন্তু ভাবলাম আমার মুখে শুনলে হয়ত আরো খুশী হবে।'

'খুশী...খুশী...খুশী!' গেলাস মাথার ওপর তুলে বোঁ করে একপাক ঘুরে নিল ফোয়ারা। 'সুমন্ত, তুমি রিয়্যালি একটা নাইস ম্যান। এসে ভালই করেছো। ভাব-ছিলাম কবে আসবে। আমারও অনেক কথা বলবার আছে।'

'কি কথা?'

'আই অ্যাম গ্রেটফুল টু ইউ। সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকব যা করলে আমার জন্যে।'

'ননসেন্স। আমি আমার—

'ডিউটি নিয়ে দয়া করে আর লেকচার ঝেড়ো না। গঙ্গারঘাটে নিয়ে যাওয়ার সময়ে ডিউটির সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলে।'

'আগে তো ঠিক এভাবে বলোনি।'

'তখন জানতাম না তুমি এত নাইস।'

এ ধরনের মেয়েলী যুক্তির কাছে কে কবে জিতেছে? আমিও হারলাম এবং দাঁত বার করে হেসে ফেললাম। হাসল ফোয়ারাও।

বলল—'সব শেষ। এবার কি বলবে সামাদকে ক্যাচ করলে কি করে?'

'খাম করেক জাল নেগেটিভ দিয়ে। জাল করা হয়েছে কিভাবে, সেটা বেরিয়ে পড়তেই ক্যাচ হয়ে গেল সামাদ।'

'একলাই সব করলে?

'একরকম তাই। তবে দুটি ভারী সুন্দর মেয়েছেলের অ্যাসিস্ট্যান্স পেয়েছিলাম।'

'দুজন?—আরেক জনাটা কে?'

'বন্যা লাল।'

'অ। সেই মেয়েটা। দেখতে খুব ভাল বুঝি?'

'তা একরকম ভালই।'

'সেও কি তোমার ক্যামেরায় পোজ দিয়েছে?'

'না। কিন্তু জরুল চিহ্নটা দেখিয়েছে।'

'তাই নাকি? কোথায় ছিল?'

ফের দাঁত বার করলাম।

'পিঠে।'

'পিঠে কোথায়?'

'কাঁধের কাছে—

'অ। ভালই। কিন্তু তার জরুল চিহ্নের সঙ্গে সনাতনের মার্ডারের কি সম্পর্ক?'

বুঝিয়ে বললাম কি সম্পর্ক।

ফোয়ারা বলল—'কপাল মন্দ সামাদের। কিন্তু খামোকা সনাতনকে মারতে গেল কেন?

'খামোকা নয়। স্টোরিটা খুব স্যাড। তা থেকে তোমারও শেখার আছে। নির্বোধ মেয়েরা ন্যুড পোজ দিতে গিয়ে বদনাম ফটোগ্রাফারের পাল্লায় পড়লে কি হয়—গল্পটা তাই নিয়েই।'

'জ্ঞান দিতে হবে না। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে পুলিশ ডাকলেই বদমাসি ঘুচে যায়। আমি হলে তাই করতাম। কিন্তু কনাতনকে সামাদ মেরে বসল কেন?

'সনাতন আর সামাদ দুজনে মিলে একটা নোংরা ছবির কারবার চালাচ্ছিল। সনাতন ভুলিয়ে ভালিয়ে মেয়ে এনে পোজ দেওয়াতো। এ ব্যাপারে সত্যি সে গুরুদেব। নইলে—'

'হয়েছে? লেবু বেশী নিংড়োলে [illegible] হয়ে যাবে।'

'সামাদ সেই ছবি প্রসেস করত। কথার মাঝে কথা বলো না। তারপর একদিন সামাদের মেয়েকে কব্জায় আনল সনাতন। নাম তার দোপাটি। হিঁদুর ঘরে বিয়ে করে নাম পর্যন্ত পালটে ফেলেছে। দোপাটি মডেল হতে চেয়েছিল—রাজী হয়নি সামাদ। হিঁদুর ঘরে বিয়ে দেওয়ার মত উদারতা থাকলেও পর্দানশীনতার গোঁড়ামি সামাদের মন থেকে যায়নি। মেয়ের ওপর অত্যাচারও করেছে এ ব্যাপারে। আমার বিশ্বাস, মেয়েদের ও ঘৃণা করত। আমাকে আর অমূল্যবাবুকে বলল—ওয়াইফ মারা গেছে। আসলে তা নয়। বউ পালিয়েছে আর একজনের সঙ্গে। খুব সম্ভব এই কারণেই অশ্লীল ছবি তোলায় সনাতনকে সাহায্য করতে পেরেছে মনের দিক থেকে।

'সত্যিই কি অশ্লীল? টেকনিক্যালি অবসীন?'

'হ্যাঁ। যতখানি হতে পারে।'

'গুড হেভেনস্। সনাতন যে এই টাইপের ভাবতেও পারিনি।'

'তুমি না ভাবলেও সে তাই। দোপাটির ফুলের মত নরম কানে গুনগুন করে যখন শোনালো ছবি তোলার প্রস্তাব, লাফিয়ে উঠল দোপাটি। এই সুযোগেই তো খুজেছে অ্যাদ্দিন। সনাতন আরও বলেছিল, দোপাটির মত বিউটিফুল ফিগার সে আগে কখনো দেখেনি।'

'কি মিথ্যুক! আমাকেও ঐ কথা বলেছিল।'

'সবাইকেই বলেছিল। তোমাদের মত মাথামোটাদের ঐ ভাবেই নর্দমার নামাতে হয়। যাক, তারপর কি হল কল্পনা করে নাও। প্রথমে কতকগুলো সত্যিই সুন্দর ছবি তুলল সনাতন। ন্যুড নয়—নির্দোষ। তারপর একটু একটু করে বুঝিয়ে রাজী করালো ন্যুড পোজ দিতে। সে ছবি একবার উঠে যেতেই সনাতনের কবজায় গিয়ে পড়ল দোপাটি। তখন আর বোঝানো নয়—ভয় দেখানো। ন্যুড শট সামাদকে দেখানো হবে। শুনেই ভয়ে প্রাণ উড়ে যেত দোপাটির। বাপকে যমের মত ভয় করত। সনাতন যা বলত, তাই করত সেই ভয়ে। আস্তে আস্তে সনাতন তাকে নিয়ে এল কদর্য ছবির কারবারে—শট নিল অত্যন্ত নোংরা বেশ কিছু সীনের।'

ভুরু তুলল ফোয়ারা।
'এত খবর তুমি জানলে কি করে?'

'সনাতনের ফাইলে দোপাটির ফটো দেখেছিলাম। সামাদের বাড়ী গিয়ে দেখলাম দোপাটির স্টুডিও পোর্ট্রেট। দেখেই চিনেছি—মুখের মিল দেখে ধরেছি নামটা হিন্দু মতে হলেও সে সামাদের মেয়ে। তার পরে ওকে হেডকোয়ার্টারে ডেকে পাঠিয়েছি দুবার। সব শুনলাম তখনি।'

'সনাতনের ফাইলে যখন আমার ফটো দেখেছিলে, তখন ওরও ফটো দেখেছিলে?'
'হ্যাঁ।'
'তখন দেখে বুঝতে পারো নি?'
'কি বুঝতে পারিনি?'
'দোপাটি আসলে কে?'

'না। ফটোতে নাম লেখা ছিল দোপাটি নাগ। বিয়ের পরের নাম। তাছাড়া, সামাদের মুখের সঙ্গে ওর মুখের মিল পাশাপাশি না দেখলে বোঝা কঠিন।'

'বিয়ের পরেও দোপাটি এই কারবার করে বেড়াতো?'

'আঁৎকে উঠো না। পোজ দেওয়া শুরু করেছিল বিয়ের আগে। কুমারীদের জপানোই বেশী সহজ—সনাতন তা জানে। বিয়ে হয়েছে তারপর।

'তারপরেও পোজ দিতে গেল কি মনে?'

'ডবল ভয়ে। বাবা আর স্বামীর। দুজনকেই ফটো দেখানোর হুমকি দেখাতো সনাতন।'

'আহারে! পিশাচ কোথাকার। এত নীচ ছিল সনাতন?'

'সনাতনের খারাপ দিকটা দেখবার দুর্ভাগ্য তোমার হয়নি, ফোয়ারা।'

'ভগবান বাঁচিয়েছেন। দোপাটির মত অবস্থা আমার হলে সুইসাইড করতাম।'
'সব মিঞাই তাই বলে।'
'কিন্তু, সামাদ জানল কি করে মেয়ের কীর্তি? কে বলল?'
'সনাতন।'

'সনাতন! বলো কি?'
'মুখে বলেনি—ফটো দেখিয়েছে—কায়দা করে। অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে, অথবা ইচ্ছে করে দেখাতে পারে। তোমাকে বললাম না, সনাতন ছবি তুলত—সামাদ প্রসেসিং করত। একদিন দোপাটির পুরো একসেট নেগেটিভ দিল সামাদকে। ভুল করে দিয়েছে মনে হয় না। ইচ্ছে করেই দিয়েছিল যাতে সামাদকেও কবজায় রাখা যায়। কিন্তু সামাদের মনের অবস্থাটা কল্পনা করতে পারো এনলার্জারে নেগেটিভগুলো ঢুকিয়ে প্রিন্ট করার পর? সনাতনের সব চাইতে জঘন্য চাল এইটা—বড্ড বেড়ে উঠেছিল—তাই ঘনিয়ে এল শেষদিন। সেই ফটো দেখেই পার্টনারকে খুন করবে পণ করল সামাদ।
'আহারে! পাগল হয়ে গেল ঐ জন্যেই।'

'খুনের নেশা চেপেছিল আরো একটা কারণে। সামাদের বদ্ধ ধারণা হয়ে গেছিল—সনাতন ওর মেয়েকে নাকি কেপ্ট রেখেছে।'
অবাক হল ফোয়ারা।
'কিন্তু সনাতন তো সে রকম নয়।'

'আমারও তো তাই মনে হয়। ধারণাটা মিথ্যে। দোপাটি নিজেও তাই বলল। তবে কি জানো, মন যার বিকৃত, সে এই সব জিনিসই বিশ্বাস করে—মনে মনে প্যাঁচ কষে পাগল হয়ে যায়—খুনের নেশা মাথায় চেপেছে এই ভাবনা থেকেই।'

সজোরে মাথা ঝাঁকিয়ে ফোয়ারা বললে—'চুলোয় যাক ওসব কথা। এস, আর এক গেলাস পান করা যাক। নরম ঘুরে এলাম মনে হচ্ছে।'

হুইস্কি ঢাললাম দুটো গেলাসে।
একটা গেলাস ফোয়ারার হাতে দিলাম। ও বললে—'তোমার জন্যে একটা খবর আছে। গুড নিউজ'
'বটে! কি খবর সখী?'
'বাবাকে আর সাক্ষী হতে হবে না, এ-খবর বাবা কবে জেনেছে আগে বলো।'

'কবে আবার, গতকাল।'
'তাই বলো। সেই জন্যেই।'
'সেই জন্যেই কি? অত রহস্য করার কি আছে?'

'কাল রাত্তিরে ফোন করেছিল বাবা। একদম অন্য গলায় কথা বলল। রাগ-টাগ একদম নেই। এখন বুঝেছি, সাক্ষী হতে হবে না জেনেই মনটা খুব হাল্কা হয়ে গিয়েছিল। তার মানে, আমার খারাপ কাজগুলোও নিজের কানে আর শুনতে হবে না—তা নিয়ে দেশ জুড়ে ঢেড়া পেটাও হবে না! তাই গায়ে পড়ে অত ভাল ভাল কথা বলল।'

'তা তো বলবেনই। কিন্তু কি রকম ভাল কথা বললেন?'

'বোম্বাইতে বাবার সঙ্গে আমি যে কোন দিনই থাকতে পারব না, বাবা নাকি অ্যাদ্দিনে তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে।'
'এটা কি একটা ভাল কথা হল?'

'আহা, শোনাই না। বাবা তাই আমাকে কলকাতাতেই রেখে দেবে : পার্মানেন্টলি—এম নাকি পাঁচ লাখ টাকাও দেবে আলাদা ব্যবসা করার জন্যে। কিন্তু দুটো সর্তে!'
'কি সর্তে?'

'এক, পোজ দেওয়া ছেড়ে দিতে হবে।'
'উত্তম সর্ত। দুই?'
'বিয়ে করতে হবে।'
সিগারেট বার করলাম।

'বিয়ে আর বিজনেস—দুটোই করতে হবে? একসঙ্গে?'

'হ্যাঁ।'

'কি বিজনেস?'

'কসমেটিকস্। বা আমাদের লাইন। আমার নিজেরও ন্যাক আছে।'

'বুঝলাম। লাইফ পার্টনারকে বিজনেস পার্টনার করে নেওয়া। গুড আইডিয়া। তুমি কি বললে?'

'কথা দিলাম।'

শুনেই বুকটা ধড়ফড় করে উঠল আমার। বাকীটুকু কি শুনতে কি শুনব ভাবতেই উদ্বেগে গলা শুকিয়ে গেল। ঢোক গিললাম। ফোয়ারা আমার দিকে এগিয়ে এল। চোখে তারায় ভেসে উঠল অদ্ভুত হাসি।

বলল 'কথা দিয়েছি জীবনে আর ক্যামেরার সামনে ন্যুড হব না।'

বুকে তখন ঢেঁকির পাড় পড়ছে। ইচ্ছে হল বলি, ন্যুড ফটো কিন্তু তোমার ও ভাল। বিয়্যালি আর্টিস্টিক। পৃথিবী অনেক বড় শিল্পীই ন্যুড স্টাডি করেছেন। তাঁদের সৃষ্টি কি আস্তাকুড়ে ঠাঁই পেয়েছে? কিন্তু কিছুই বলতে পারলাম না। কেমন ফোয়ারা আরও এক-পা এগিয়ে এল। চোখে হাসি নেমে এল ঠোঁটে।

'বাবাকে আরও একটা কথা দিয়েছি ডার্লিং'

'কি কথা?' সন্দেহ ঘনালো চোখে।
'পুলিশের হাতে আর ধরা দেব না!'

হেসে ফেললাম। আরও একপা এগি এল ফোয়ারা।

'কথাটা রাখতে পারবে তো?' প্র করলাম আমি।

গা ঘেঁসে দাঁড়ানো ফোয়ারা। জবাব দি না। আমিও ফের জিজ্ঞেস করতে পারলা না। ঠোঁটের ওপর একজোড়া নরম, গর মেয়েলী ঠোঁটচেপে বসলে কথা বলা যায় ন

(শেষ)

১৯৩২ সালের ১৯ ডিসেম্বর কলকাতায় রূপবাণী চিত্রগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। চিত্রগৃহের নামকরণ করেন রবীন্দ্রনাথ। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ একটি দীর্ঘ কবিতাও লেখেন, চিত্ররূপের বাণী, যেটি পরে পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়। সেলুলয়েডের জীবন বন্দিত হল এইভাবে :

দেহযুক্ত রূপের সঙ্গে যুগলমিলন হল
দেহমুক্ত বাণীর
প্রান্তরঙ্গিণীর তীরে, দেহনিকেতনের
প্রাঙ্গণে।

তিন বছর আগে রবীন্দ্রনাথ সিনেমা-শিল্প সম্পর্কে একটি চিঠি লিখেছিলেন, তাতে তিনি এই শিল্পের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছিলেন এর রূপের চলৎপ্রবাহের, দৃশ্যের গতিপ্রবাহের দিকে, বাণীর দিকে নয়। চিঠিটি লেখা হয়েছিল ১৯২৯ সালের ২৬ নভেম্বর শিশির ভাদুড়ির ছোট ভাই মুরারি ভাদুড়িকে। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে রক্ষিত বলে বর্ণিত চিঠিটি এই :

'উপকরণের বিশেষত্ব অনুসারে কলারূপের বিশেষত্ব ঘটে। আমার বিশ্বাস ছায়াচিত্রকে অবলম্বন করে যে নূতন কলারূপের আবির্ভাব প্রত্যাশা করা যায় এখনো তা দেখা দেয়নি। রাষ্ট্রতন্ত্রে স্বাতন্ত্র্যের সাধনা, কলাতন্ত্রেও তাই। আপন সৃষ্ট জগতে আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রত্যেক কলাবিদের লক্ষ্য। নইলে তার আত্মমর্যাদা অভাবে আত্মপ্রকাশ ম্লান হয়। ছায়াচিত্র এখনো পর্যন্ত সাহিত্যের চাটুবৃত্তি করে চলেচে, তার কারণ কোনো রূপকার আপন প্রতিভার বলে তাকে এই দাসত্ব থেকে উদ্ধার করতে পারেনি। করা কঠিন, কারণ কাব্যে বা চিত্রে বা সঙ্গীতে উপকরণ দুর্মূল্য নয়। ছায়াচিত্রের আয়োজন আর্থিক মূলধনের অপেক্ষা রাখে, শুধু সৃষ্টিশক্তির নয়।

'ছায়াচিত্রের প্রধান জিনিসটা হচ্ছে দৃশ্যের গতিপ্রবাহ। এই চলমান রূপের সৌন্দর্য বা মহিমা এমন করে পরিস্ফুট করা উচিত যা কোনো বাক্যের সাহায্য ব্যতীত আপনাকে সম্পূর্ণ সার্থক করতে পারে। তার নিজের ভাষার মাথার উপরে অন্য একটি ভাষা কেবলি চোখে আঙুল দিয়ে মানে বুঝিয়ে যদি দেয় তবে সেটাতে তার পঙ্গুতা প্রকাশ পায়। সুরের চলমান ধারায় সঙ্গীত যেমন বিনা বাক্যেই আপন মাহাত্ম্য লাভ করতে পারে তেমনই রূপের চলৎপ্রবাহ কেন একটি স্বতন্ত্র রসসৃষ্টিরূপে উন্মেষিত হবে না? হয় না যে সে কেবল সৃষ্টিকর্তার অভাবে এবং অলসচিত্ত জনসাধারণের মূঢ়তায়, তারা আনন্দ পাবার অধিকারী নয় বলেই চমক পাবার নেশায় ডোবে।'

বলাই বাহুল্য, তিন বছরে রবীন্দ্রনাথের মত পাল্টে গিয়েছিল। সিনেমাকে বাক্যের সাহায্য ব্যতীত সম্পূর্ণ হতে হবে, এই ধারণা পাল্টে হল, সিনেমা 'চিত্ররূপের বাণী', 'রূপবাণী'।

এই পরিবর্তনের কারণ সম্ভবতঃ একটিই। ১৯২৯ সাল পর্যন্ত চলচ্চিত্র ছিল নির্বাক, ১৯৩২ সালে চলচ্চিত্র হল সবাক। মুরারি ভাদুড়িকে চিঠি লেখার সময় পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে চলচ্চিত্র দেখেছেন, তাতে চিত্রপ্রবাহের মধ্যে মধ্যে সাদা পর্দায় কথোপকথনের মুদ্রণ থাকত, দর্শককে গল্প বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। রবীন্দ্রনাথ এটাকেই অপ্রয়োজনীয় এবং শিল্পবিরোধী মনে করেছিলেন। বাক্য দিয়ে বোঝাতে হবে কেন, চলমান রূপের যুগে যখন সবাক চলচ্চিত্র এল, তখন বাণীর ব্যবহার স্বাভাবিক হয়ে এল, শিল্পকে পঙ্গু না করে তাতে আর একটি মাত্রা যোগ করল।

এই প্রসঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় রবীন্দ্রসাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণের একটা হিসেব নেওয়া যেতে পারে।

রবীন্দ্ররচনা নিয়ে প্রথম চলচ্চিত্র তোলেন তাজমহল ফিল্ম কোম্পানি। এই ছবির নাম 'মানভঞ্জন', মুক্তিলাভ ১৯২৩ সালে। পরিচালক নরেশচন্দ্র মিত্র, চিত্রশিল্পী ননী সান্যাল, অভিনয়শিল্পী দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ মিত্র, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, তিনকড়ি চক্রবর্তী, নীলিমারাণী।

এর আগেই অবশ্য 'বিসর্জন' নাটকটির চলচ্চিত্ররূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ম্যাডান কোম্পানির রুস্তমজি দোতিওয়ালা। তিনি তখনকার হায়দরাবাদের আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে অনুরোধ করেছিলেন এই চলচ্চিত্র পরিচালনা করতে। তিনি তখনও চলচ্চিত্রজগতে আসেননি। ডিজি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এলেন, রবীন্দ্রনাথ কোনো অর্থ দাবি করেন নি। মহিলাশিল্পী পাওয়া গেল না বলে বিসর্জন তোলা হল না। এটা ১৯২০ সালের কথা।

ডিজি রবীন্দ্রনাথের পূর্বপরিচিত। তাঁর ভাই নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরাকে বিবাহ করেন ১৯০৭ সালে। ১৯১৪ সালে ডিজি চলচ্চিত্র বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য বিলেত যাবার উদ্যোগ করলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একটি পরিচয়পত্র লিখে দেন। তবে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় ডিজির তখন বিলেত যাওয়া ঘটে নি।

১৯২৯ সালে ইস্টার্ন ফিল্ম সিন্ডিকেট রবীন্দ্রনাথের বিচারক ছবির কাজ শুরু করেন। পরিচালনায় শিশির ভাদুড়ি। চিত্রগ্রহণে নীতিন বসু, অভিনয়ে শিশির ভাদুড়ি, বিশ্বনাথ ভাদুড়ি, যোগেশ চৌধুরী, কঙ্কাবতী, শেফালিকা। তবে এই ছবি ১৯৩১ সালের আগে মুক্তি পায় নি।

রবীন্দ্রনাথের গল্প দ্বিতীয় চলচ্চিত্রে রূপ পায় ১৯২৯ সালে। এই বছর ক্রাউন (বর্তমান শ্রী) চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করে গিরিবালা। ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেডের প্রযোজনায়, মধু বসুর পরিচালনায়, যতীন দাসের চিত্রগ্রহণে এই ছবিতে অভিনয়ে অংশ নেন ধীরাজ ভট্টাচার্য, নরেশ মিত্র, তিনকড়ি চক্রবর্তী, লীলাবতী, শান্তি, ললিতা। মধু বসু এই বিষয়ে লিখেছেন, 'চিত্রনাট্যটি সম্পূর্ণ হবার পর গুরুদেবের........শরণাপন্ন হই। তিনি পরম যত্নে ও পরম স্নেহে গিরিবালার (মানভঞ্জন অবলম্বনে) সিনারিওটি আদ্যোপান্ত সংশোধন করে দেন।.... ক্রাউন সিনেমায় 'গিরিবালা' চিত্রের উদ্বোধন দিবসে গুরুদেব স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এবং ছবি দেখে খুশী হয়ে আমাকে আশীর্বাদ করেন।' (১৩৪৮ দীপালি, রবীন্দ্রজন্মোৎসব সংখ্যা)। এই সিনারিওটি মধু বসু পরম যত্নে রক্ষা করতেন।

তাঁর রচনা নিয়ে তোলা ছবি রবীন্দ্রনাথের নিজের কিরকম লাগত সেবিষয়ে আর একটি নির্দেশিকা আমরা পাই সত্যু সেনের লেখায়। 'আত্মস্মৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' গ্রন্থে সত্যু সেন বলেছেন : 'চোখের বালি আত্মপ্রকাশ করলে চলচ্চিত্রটি দর্শনান্তে কবি আমাকে ভূয়সী অভিনন্দন জানিয়ে একটি পত্র দিয়েছিলেন।' সত্যু সেন দুর্ভাগ্যক্রমে চিঠিটি হারিয়ে ফেলেন।

তবে এইসব প্রশংসাবাক্য রবীন্দ্রনাথের কতটা আন্তরিক সেবিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক করে আর একটি ঘটনা। সে প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে।

রবীন্দ্রনাথের গল্প নিয়ে তৃতীয় চলচ্চিত্র দালিয়া। ২৬শে জুলাই, ১৯৩০ ক্রাউন

চিত্রগৃহে মুক্তি পায় দালিয়া। ম্যাডানের প্রযোজনায়, মধু বসুর পরিচালনায়, যতীন দাসের চিত্রগ্রহণে, এই ছবিতে অভিনয় করেন রাজহংস এবং কার্তিক।

১৯৩০ সালে বিট্রিশ ডোমিনিয়ন ফিল্মস্ তপতীর চিত্ররূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। পরিচালক নিযুক্ত হন 'ডিক্রি'। কিন্তু শেষপর্যন্ত তপতী তৈরি হয় নি।

১৯৩২ সালের ৩রা জুন মুক্তিলাভ করে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চম চলচ্চিত্র, নৌকাডুবি, কর্ণওয়ালিশ (বর্তমান উত্তরা) চিত্রগৃহে। পরিচালক নরেশ মিত্র এবং অভিনয়-শিল্পী নরেশ মিত্র, ধীরাজ ভট্টাচার্য, কুঞ্জলাল চক্র, কণকনারায়ণ ভূপ, শিশুবালা, সুনীলা।

নির্বাক যুগে রবীন্দ্রনাথের এই পাঁচটি চলচ্চিত্র মুক্তি পায়। এই যুগে বঙ্কিম-সাহিত্য অবলম্বন করে তোলা হয় নয়টি ছবি : বিষবৃক্ষ (১৯২২); কৃষ্ণকান্তের উইল (১৯২৭); দুর্গেশ-নন্দিনী (১৯২৭), যুগলাঙ্গুরীয় (১৯২৯); রজনী (১৯২৯); রাধারাণী ; (১৯৩০); রাজসিংহ (১৯৩০); মৃণালিণী (১৯৩০); দেবী চৌধুরানী (১৯৩১)। একই যুগে শরৎসাহিত্য নিয়ে তোলা হয় ছটি : আঁধারে আলো (১৯২২); চন্দ্রনাথ (১৯২৪); দেবদাস (১৯২৯); শ্রীকান্ত (১৯৩০) চরিত্রহীন (১৯৩১); স্বামী (১৯৩১)।

রবীন্দ্রনাথের রচনা অবলম্বনে পরবর্তী চলচ্চিত্র নটীর পূজা (১৯৩২), কিন্তু এটি সবাক এবং এর মধ্যে তাঁর চলচ্চিত্র ভাবনার জগতে গুরুতর ঘটনা ঘটে গেছে। সেটি হল তাঁর জার্মানি এবং রাশিয়া ভ্রমণ।

১৯৩০ সালে অমিয় চক্রবর্তী মিউনিক থেকে একটি চিঠিতে জানাচ্ছেন, রবীন্দ্রনাথ একটি চিত্রনাট্য রচনায় ব্যস্ত। ১৩৩৭ কার্তিকের প্রবাসীতে তিনি লিখছেন, 'রবীন্দ্রনাথ সারাদিন ধরে ইংরেজিতে একটা নূতন রকম টেকনিকে ফিল্মের জন্য নাটক লিখছেন। ছবির মতো এও তাঁর নূতন সৃষ্টির নেশা। ২৪শে জুলাই, ১৯৩০।'

যে নাটকটির কথা অমিয় চক্রবর্তী লিখেছেন, সেটি আর শেষ পর্যন্ত নাটক হয় নি, সেটি 'দি চাইল্ড'। ২৩শে জুলাই ব্যাভারিয়ার 'ওবারআম্মারগাউ' গ্রামে খ্রীষ্টের জীবনের শেষ পর্ব নিয়ে রচিত প্যাশন প্লে দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি কবিতা দি চাইল্ড। এর আগেই জার্মানির ইউফা কোম্পানি রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিল একটি মৌলিক চিত্রনাট্যের জন্য। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে ম্যাক্সমুলার ভবন থেকে প্রকাশিত Rabindranath Tagore in Germany -তে এই কবিতার ভূমিকায় লেখা হয়েছে।

> Tager was very much impressed by this play (Passion Play), and when he was asked by a German film company for a script dealing with Indian life, he composed this poem in one night in Berlin....the plan of producing a film based on a script by Tagore never materialized"

রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জীতে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কিন্তু লিখছেন, রবীন্দ্রনাথ দি চাইল্ড লেখেন ২৩ জুলাই এবং মিউনিকে। প্রভাতকুমার বলেছেন এবং ম্যাক্সমুলার ভবন থেকে প্রকাশিত গ্রন্থেও বলা হয়েছে এক রাত্রির মধ্যেই দি চাইল্ড লেখা হয়েছিল। কিন্তু অমিয় চক্রবর্তী ২৪ জুলাই লিখছেন, রবীন্দ্রনাথ সারাদিন ধরে ফিল্মের জন্য নাটক লিখছেন। এটা কি কারও ভ্রমবশতঃ ঘটছে, না, রবীন্দ্রনাথ দি চাইল্ড ছাড়াও এটা অবলম্বন করে কোনো নাটক বা স্ক্রিপ্ট লিখেছিলেন? লিখে থাকলে সেই স্ক্রিপ্ট কোথায় গেল?

ইউফা কোম্পানি কেন চলচ্চিত্রটি করে নি জানা যায় না, কিন্তু কালীশ মুখোপাধ্যায় তাঁর বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস গ্রন্থে লিখছেন 'ইউফা স্টুডিওতে কবিগুরুর গান ও আবৃত্তির সবাক্ চিত্রগ্রহণ করা হয়। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দেই কলকাতায় কবিগুরুর সবাক্ চিত্রটি দেখানো হয়। সঠিক তারিখটি উদ্ধার করা যায় নি। এদিক থেকে সবাক্ চিত্রের সঙ্গে কবিগুরুর সর্বপ্রথম যোগ সংঘটিত হয়।'

১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েট ইউনিয়নে ভ্রমণের রাশিয়ার সরকারি নথিপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের দিনপঞ্জীর দুই দিনের রোজনামচা এবিষয়ে প্রাসঙ্গিক।

১৫ সেপ্টেম্বর। সন্ধ্যায় চলচ্চিত্র-কর্মীদের সঙ্ঘ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চলচ্চিত্র-কর্মীদের আলাপের ব্যবস্থা করে। কবিকে 'ব্যাটলশিপ পতিওমকিন' আর 'পুরাতন ও নূতন' ছবিদুটির অংশবিশেষ দেখান হয়। দুটি ছবিই বিখ্যাত সোভিয়েট চলচ্চিত্রকার স-ম্-আইজেনস্টাইনের তোলা। দুটি ছবিই রবীন্দ্রনাথের খুবই ভালো লাগে।

তারপর রবীন্দ্রনাথ ও সোভিয়েট চলচ্চিত্রকর্মীদের মধ্যে আলোচনা হয়। [illegible] রবীন্দ্রনাথের রচিত সিনারিও নিয়ে [illegible]চিত্র করার কথাও ওঠে। উপস্থিত সকলে তাঁর রচিত সিনারিওতে অত্যন্ত আগ্রহ অনুভব করেন।

২৫ সেপ্টেম্বর। রবীন্দ্রনাথ 'সমুজ কেনোর চলচ্চিত্রকর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন। চলচ্চিত্রের জন্য তাঁর সিনারিও বিষয়ে আরো কথাবার্তা বলেন।

১৯৩০ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে কোনো সিনারিও লিখেছেন বলে জানা যায় না। সুতরাং অনুমান করা সঙ্গত, যে-সিনারিও নিয়ে তিনি রাশিয়ায় আলোচনা করেন তা পূর্বোক্ত The Child অবশ্য এই কবিতাকে স্ক্রিপ্ট, সিনারিও, স্ক্রিনপ্লে কোনটাই বলা যাচ্ছে না, কিন্তু কবিতাটি লক্ষ্য করলে যেটা প্রথমেই চোখে পড়ে তা হল ছবির বর্ণাঢ্য ইমেজের শোভাযাত্রা। রবীন্দ্রনাথ কখনও সিনারিও-রচনার তালিম নিয়েছেন বলে শোনা যায় না, যদিও মধু বসুর 'গিরিবালায়' সিনারিও সংশোধন করেছিলেন ১৯২৮-২৯ সালে। কিন্তু 'দি চাইল্ড' কবিতা যে ফিল্ম করার জন্যই কল্পিত তা অনুমান করা অসঙ্গত নয় এর ইমেজ-এর অজস্র প্রাচুর্য দেখে।

এমন কি এটাও মনে হয় এই প্রাচুর্য কবিতা-পাঠককে ক্লান্ত করে তোলে, কোনো দৃশ্যে স্থিত হতে দেয় না। এই দৃশ্যবহুলতার জন্য অবশ্য পরে কবিতাটিকে নৃত্যে রূপ দিতে কোনো অসুবিধা হয় নি।

কিন্তু রাশিয়াতে রবীন্দ্রনাথ যে সিনারিও নিয়ে আলোচনা করেন তা যদি দি চাইল্ড বা এই কবিতা অবলম্বনে সিনারিও হয়, তাহলে জানতে হয় উফা কোম্পানি ওই সিনারিও যে নেবে না তা রবীন্দ্রনাথ জানতেন, নাহ'লে তিনি এই ছবির সিনারিও নিয়ে রাশিয়াতে আলোচনা করতেন না এবং রাশিয়ার চলচ্চিত্র-কর্মীরাও তা নিয়ে উৎসাহী হত না। কিন্তু তাহলে সেই সিনারিও নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের কাছেই ছিল। অথচ কেউ তার সন্ধান জানেন না। এ থেকে এটাই অনুমান করা যেতে পারে, সিনারিও রবীন্দ্রনাথ আদৌ লেখেন নি, দি চাইল্ড-টিকেই সিনারিও হিসেবে গণ্য করছেন।

১৯৩২ সালে তোলা হল সবাক্ 'নটীর পূজা'। এই প্রসঙ্গে পরে আসছি। ১৯৩২ সালেই আর একটি চলচ্চিত্র মুক্তি পেল, চিরকুমার সভা। ২৮ মে চিত্রায় মুক্তি পায় এই ছবি। পরিচালনা : প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। চিত্রশিল্পী : নীতীন বসু। শব্দ গ্রহণ : মুকুল বসু। সঙ্গীত : রাইচাঁদ বড়াল। অভিনয় : তিনকড়ি চক্রবর্তী (অক্ষয়), মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (রসিক); অমর মল্লিক (চন্দ্র), দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (পূর্ণ); ইন্দু মুখোপাধ্যায় (শ্রীশ) ফণি বর্মা (বিপিন); নিভাননী (শৈলবালা); সুনীতিবালা (নীরবালা); অন্নপূর্ণা (নৃপবালা) মলিনা দেবী, চানী দত্ত, অনুপমা।

এর দীর্ঘ ছ বছর পরে মুক্তি পায় চোখের বালি (১৯৩৮)। অবশ্য ১৯৩৬ সালে পায়োনিয়ার-এর প্রযোজনায় নৌকাডুবি এবং মধু বসুর পরিচালনায় দালিয়া তোলার চেষ্টা হয়। ১৯৩৭-এও নিউ থিয়েটার্স 'চিরকুমার সভা'-র হিন্দি সংস্করণ করার চেষ্টা করে।

প্রভাতকুমার রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জীতে লিখেছেন ১৯৩৩ সালের ১৮ জানুয়ারি রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় মধু বসু পরিচালিত দালিয়া দেখেন। এটা সামান্য আশ্চর্যজনক। মধু বসু ১৯৩০ সালে নির্বাক দালিয়া তোলেন। ১৯৩৬ সালে আবার মধু বসু সবাক্ দালিয়া তোলার চেষ্টা করেন। ১৯৩৩ সালে কলকাতার সর্বত্র সবাক্ চলচ্চিত্রের প্রদর্শন আরম্ভ হয়ে গেছে। ১৯৩০ সালের নির্বাক দালিয়া তোলার তিন বছর পর রবীন্দ্রনাথ কী কারণে নির্বাক দালিয়া দেখতে গেলেন? ১৯৩৩ সালেই মার্চ মাসে এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে দালিয়ার নাট্যরূপ দেখতে যান রবীন্দ্রনাথ। এই নাট্যরূপ রবীন্দ্রনাথ সংশোধন করে দিয়েছিলেন। এই সংশোধন করার জন্যই কি রবীন্দ্রনাথ নির্বাক চলচ্চিত্রটি আবার দেখতে চেয়েছিলেন? অথবা দালিয়ার চলচ্চিত্ররূপ আগে তিনি দেখেনই নি?

'চোখের বালি' প্রযোজনা করেন বি পি মেহেরা, অ্যাসোসিয়েটড প্রোডিউসার্স-এর। পরিবেশনায় রীতেন অ্যান্ড কোং। পরিচালনায় সত্য সেন। চিত্রগ্রহণে ননী সান্যাল। শব্দগ্রহণে মধু শীল। সম্পাদনায় বৈদ্যনাথ ব্যানার্জি। রসায়নাগারিক : কৃষ্ণকিঙ্কর মুখার্জি। রূপশিল্পী : পঞ্চানন দাশ। ব্যবস্থাপক : অত্রি গুহঠাকুরতা। সঙ্গীতশিক্ষক : অনাদি দস্তিদার। আবহ সঙ্গীত : সুরেন দাস। অভিনয়ে : সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় (বিনোদিনী), ইন্দিরা রায় (আশা), রাজলক্ষ্মী (শান্তিলতা ঘোষ), রমা ব্যানার্জি (অন্নপূর্ণা), ডঃ হরেন মুখোপাধ্যায় (মহেন্দ্র), ছবি বিশ্বাস (বেহারী), মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (সাধুচরণ)। ১৯৩৮ সালে ৩০ জুলাই শ্রী চিত্রগৃহে ছবিটি মুক্তি পায়।

একই দিনে চিত্রায় মুক্তি পায় 'গোরা'। প্রযোজনা : দেবদত্ত ফিল্মসের দেবদত্ত শীল। পরিবেশক : প্রাইমা ফিল্মস। পরিচালক : নরেশ মিত্র। চিত্রশিল্পী যশোবন্ত ওয়াশীকর। শব্দযন্ত্রী : সত্যেন দাশগুপ্ত। সঙ্গীত পরিচালক : কাজী নজরুল ইসলাম, সহকারী কালীপদ সেন। অভিনয় : জীবন গাঙ্গুলী (গোরা), রাণীবালা (সুচরিতা), প্রতিমা দাশগুপ্তা (ললিতা), রমলা (লাবণ্য), রাজলক্ষ্মী (আনন্দময়ী); দেববালা (হরিমোহিনী); মোহন ঘোষাল (বিনয়), নরেশ মিত্র (হারাণবাবু), মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (পরেশবাবু), রবি রায় (মহিম), বিপিন গুপ্ত (কৃষ্ণদয়াল), মনোরমা (বরদাসুন্দরী)।

১৯৩২ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের রচনা নিয়ে চলচিত্র হয় চারটি। এই একই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা নিয়ে হয় পাঁচটি : কৃষ্ণকান্তের উইল (১৯৩২), কপালকুণ্ডলা (১৯৩৩); রজনী (১৯৩৬); বিষবৃক্ষ (১৯৩৬); ইন্দিরা (১৯৩৭), এই সময়ে শরৎ-রচনা নিয়ে হয় নয়টি ছবি দেনাপাওনা (১৯৩১), পল্লীসমাজ (১৯৩২), দেবদাস (১৯৩৫), গৃহদাহ (১৯৩৬) বিজয়া (১৯৩৬); পণ্ডিতমশাই (১৯৩৬) বড়দিদি (১৯৩৯), পরিণীতা (১৯৪২)। এই সময়ে শরৎচন্দ্রের পাঁচটি উপন্যাসের হিন্দি চলচিত্রও ওঠে : দেবদাস (১৯৩৬), মঞ্জিল (গৃহদাহ) (১৯৩৭), চিংগারি (পণ্ডিত মশাই) (১৯৪০)। বড়দিদি (১৯৪০), পুজারিন (দেনা-পাওনা) (?)।

কালীশ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন 'নটীর পূজা' মুক্তি পায় ২২ মার্চ ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে, চিত্রা চিত্রগৃহে। চিত্রপঞ্জী দ্বিতীয় সংখ্যা, মাঘ, ১৩৬৮ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে কালীশ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে কয়েক রাত্রি ধরিয়া নটীর পূজা অভিনীত হয়। শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীরা ও কবিগুরু স্বয়ং এই অভিনয়ে পাদপ্রদীপের সামনে বাহির হইয়াছিলেন। অভিনয় সুন্দর হইয়াছিল। সম্প্রতি নিউ থিয়েটার্স লিঃ সেই অভিনয়ের সবাক ছবি তুলিয়েছেন। শীঘ্রই কলিকাতায় প্রদর্শিত হইবে।'

১৯৩১ সালের ২৮, ২৯, ৩০ ডিসেম্বর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নটীর পূজা অভিনীত হয়, যাতে রবীন্দ্রনাথ 'উপালির' ভূমিকায় অংশ নিয়েছিলেন। চিত্রপঞ্জীর বিবরণের ভাষায় অনুমান করা যায়, জোড়াসাঁকোর অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রগ্রহণ হয়নি, পরে নিউ থিয়েটার্স এর চলচ্চিত্র গ্রহণ করে। তাহলে কি শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীরা পুনরায় অভিনয় করেছিলেন চলচ্চিত্রের জন্য? যদি করেন, কোথায়?

হিরন্ময় দাশগুপ্ত কর্তৃক ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস, ৯।৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত, প্রকাশিত ও সম্পাদিত 'চিত্র-জগৎ' পত্রিকার ১৯৭৬ সালের প্রাক উৎসব সংখ্যায় একজন সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথের চিত্র পরিচালনা সম্পর্কে একটি কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ পেশ করেছেন। নিউ থিয়েটার্স-এর বর্তমান অন্যতম কর্ণধার দিলীপ সরকার তাঁর সংবাদের উৎস। এই সংবাদের দুটি অংশ উদ্ধৃতিযোগ্য।

(১) অতীতে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর কাহিনীর চিত্ররূপের পরিচালক নির্বাচনের ব্যাপারে অত্যন্ত রক্ষণশীল হয়ে ওঠেন এবং অনেকেই তাঁর কাহিনীর মর্মার্থ না বুঝে ছবি করছেন এই অভিযোগও করেন। তাঁর উষ্মা লক্ষ্য করে নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার বীরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ জানান তাঁর নির্বাচিত রবীন্দ্র-কাহিনীর চিত্রনাট্যগুলি যদি তিনি নিজে দেখে দেন। রবীন্দ্রনাথ তাতে রাজি হন না এবং শ্রীসরকার মশাইকে জানিয়ে দেন যে চলচ্চিত্র নির্মাণের সময় কী কী ত্রুটির জন্য তাঁর কাহিনী যথাযথ পর্দায় উপস্থাপিত হচ্ছে না তা বোঝার জন্য নিজেই নিজের পরিচালনায় একটি ছবি করতে চান। তিনি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁর 'নটীর পূজা'র কাজ শুরু করবেন নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে।

(২) ক্যামেরাম্যান, কলাকুশলিরা অস্থির। কলাকুশলজ্ঞানবিহীন মানুষটি (রবীন্দ্রনাথ) নাটকেরই মত প্রায় এক জায়গায় ক্যামেরাকে অনড় রেখে চিত্রগ্রহণের নির্দেশ দিচ্ছেন। কেউ তাঁকে ভয়ে বলতে পারছে না চলচ্চিত্রের জন্য একটি মূল দৃশ্যকে বিভিন্ন দৃশ্যাংশে ভাগ করতে হয় যাকে বলা হয় ক্যামেরা সেট আপ। অভিনীত দৃশ্যের পাত্র-পাত্রীদের চলাফেরার প্যাটার্ণ অনুযায়ী মুভি ক্যামেরাকে কখনো কাছে কখনো দূরে বসিয়ে চিত্রগ্রহণ করাকে শট ডিভিসন করা বলে। যাই হোক এইভাবে কয়েকটা দিন কাটল। স্টুডিওর বদ্ধ গরমে, অসংখ্য আলোর উত্তাপের মধ্যে কাজ করতে করতে রবীন্দ্রনাথ ক্লান্ত বিরক্ত হয়ে পড়লেন। নাটকের মতো ছবির কাজ শেষ করে একদিন তিনি সেই ছবি দেখতে চাইলেন। তাড়াহুড়ো করে চিত্রিত ছবির প্রিন্ট তৈরি করে তাঁকে দেখানো হলো। ছবি দেখে তিনি বললেন, এই ছবি আমি করেছি। না, আর ছবিতে ডিরেকশন দেওয়া নয়। ছবিটি রিলিজও হয়েছিল। মিউজিক ছিল দিনু ঠাকুরের—সেই ছবি দেখে দর্শকরাও হতাশ হয়েছিলেন, তবে কেউই গলা তুলে তাঁর সমালোচনা করতে পারেন নি।....এরপর থেকে রবীন্দ্রনাথ নিজেও জোর গলায় তাঁর কাহিনীর চিত্র- দাতাদের সমালোচনা করতে পারেন নি। তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন, চলচ্চিত্র একটি ভিন্ন মাধ্যম—এর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ভিন্নধর্মী।

এই সংবাদ যদি সত্য হয় তাহলে ...নতে হয়, নির্বাক যুগে তাঁর রচনা নিয়ে ...তোলা চলচ্চিত্র দেখে তিনি তৃপ্ত হননি, ...দিও মধু বসু বলেছেন রবীন্দ্রনাথ গিরি-...লা চলচ্চিত্র দেখে খুশী হয়েছিলেন। ...ৌখিক ভদ্রতা বজায় রাখা রবীন্দ্রনাথের ...বশ্য চরিত্রগত বৈশিষ্ট ছিল। প্রভাতকুমার ...খোপাধ্যায় যেমন উদাহরণ দিয়েছেন ...কটি।

"পরে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে দালিয়া গল্পটি ...মঞ্চে অভিনয়ের জন্য অপরেশচন্দ্র ...খোপাধ্যায় নাটকাকার দান করেন। ১৯৩৩ ...র্চ মাসে দালিয়ার পুনরাভিনয় হয়: ...পূর্বে দালিয়ার কপি কবির কাছে পেশ ...া হয়। সেবার কবিগুরু মূল কাহিনীটাকে ...পূর্ণ নতুন করে নাটকাকারে লিখে দেন। ...কালীন এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে নাটকটি ...ভনীত হয় গুরুদেব অভিনয় রাত্রে ...পস্থিত ছিলেন এবং অভিনয় দর্শনে ...শেষ আনন্দ লাভ করেন। অথচ প্রতিমা ...বীকে লিখিয়াছেন, দালিযাটা ভালো ...গল না।"

যদি 'চিত্রজগতের' সংবাদটি সত্য হয়, ...হলে মানতে হবে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩২-এর ...গে তোলা মানভঞ্জন, গিরিবালা, বিচারক, ...নয়া এবং নৌকাডুবি দেখে খুশী ছিলেন ... এই ছবির পরিচালকেরাও, নরেশ মিত্র, ... বসু, শিশির ভাদুড়ি, তাঁর মনঃপুত ...লেন না; তাঁর রচনা চলচ্চিত্রে যথাযথ ...স্থাপিত হচ্ছে না, এই ছিল রবীন্দ্র-...থের অভিযোগ।

চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ... সময় কতটা অবহিত ছিলেন, তা ...ঝার জন্য জানার জন্য প্রয়োজন সে সময় ...বাদেশের চলচ্চিত্রের অবস্থা কী ছিল। ...১৬-৯৭ সালে কলকাতায় প্রথম ...চিত্রের প্রদর্শন শুরু হয়। স্টিফেন্স ...হব স্টার থিয়েটারে নাট্যাভিনয়ের মধ্যে ... খণ্ড খণ্ড চিত্র প্রদর্শন করতেন। ...র যন্ত্রের নাম ছিল বায়োস্কোপ—যে ... চলচ্চিত্রও পরিচিত হল বায়োস্কোপ ...। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য সীতা দেবী ...'ত একটি ঘটনা। পুণ্যস্মৃতিতে তিনি ...খছেন:

"এই সময়ই বোধহয় (১৯৩২-এর ...নুয়ারি মাসে) কলিকাতা আর্ট কলেজে ...ার অঙ্কিত চিত্রাবলীর একটি প্রদর্শনী ... তিনি তখন শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দের ...ধিরূপে কলিকাতায়ই ছিলেন। দ্বিতীয় ...কে লইয়া দিদির সঙ্গে তাঁহার সহিত ...াৎ করিতে গেলাম। শিশুটিকে দেখিয়া ...ন অতিশয় প্রীত হইলেন ও অনেক ...র করিলেন। সেইদিন 'নটীর পূজা' ...মটি তাঁহাকে দেখাইবার জন্য নিউ ...টার্সের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে ...ত্রণ করিয়াছিলেন। নাতনী স্থানীয়া ...কটি বালিকা উপস্থিত দেখিয়া কবি ...ালেন, 'এদের কিছু খাইয়ে দিলে হত। ...া চলো, বায়োস্কোপ দেখিয়ে আনি।'

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সকলকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন ছবিখানি দেখাইতে।" নটীর পূজার মুক্তিলাভ হয় চিত্রায় ২২ মার্চ। অর্থাৎ যে ঘটনাটির কথা সীতা দেবী বলেছেন, তা হয়ত নটীর পূজার প্রেক্ষা-গৃহে প্রদর্শনের নয়, রবীন্দ্রনাথকে আগেই সম্ভবত ছবিটি দেখিয়েছিলেন নিউ থিয়েটার্সের কর্তারা। তবে লক্ষণীয় রবীন্দ্রনাথ হাল্কা সুরে চলচ্চিত্রকে বায়োস্কোপই বলছেন।

১৮৯৬-৯৭ সালে স্টার থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে দেখা যায় 'পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য! বায়স্কোপ। ছবির মানুষ জীবজন্তু জীবন্ত প্রাণীর ন্যায় হাঁটিয়া ছুটিয়া চলিয়া বেড়াইতেছে।'

এই সময়েই সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ফাদার লাফোঁ সিনেমাটোগ্রাফ মেশিন আনিয়ে শিক্ষাদানের জন্য ছবি দেখানোর বন্দোবস্ত করেন।

১৮৯৮ সালে হীরালাল সেন রয়েল বায়োস্কোপ গড়ে তোলেন এবং সিনেমা দেখাতে শুরু করেন। বিভিন্ন মঞ্চসফল নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যের খণ্ড খণ্ড চলচ্চিত্র তুলতে থাকেন হীরালাল সেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেরও প্রামাণ্য ছবি তোলেন তিনি।

১৯১২ থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত বাংলা চলচ্চিত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল ম্যাডান থিয়েটারের। বিদেশ থেকে ছবি আনিয়ে ম্যাডান কোম্পানি ছবি দেখাত। দাদাভাই ফালকে যখন ১৯১২ সালে প্রথম পূর্ণাঙ্গ ভারতীয় ছবি হিন্দিতে নির্মাণ করেন, তার পর থেকে ম্যাডান হিন্দি ছবি আনিয়ে বাংলায় টাইটেল লিখে দেখাতেন। বাংলার প্রথম পূর্ণাঙ্গ ছবি উঠল 'বিল্বমঙ্গল', মুক্তি পেল ৮ নভেম্বর ১৯১৯ সালে কর্ণওয়ালিস অর্থাৎ উত্তরা চিত্রগৃহে। আর প্রথম সবাক্ বাংলা পূর্ণাঙ্গ ছবি উঠল জামাইষষ্ঠী, মুক্তিলাভ করে ১১ এপ্রিল, ১৯৩১ সালে ক্রাউন (বর্তমান শ্রী) চিত্রগৃহে। নির্বাক ও সবাক ছবি ম্যাডান তোলে প্রায় একশো, চিত্রগৃহের মালিক ১৭২টির। এই ম্যাডান

কোম্পানিই তোলে রবীন্দ্রনাথের গিরিবালা, দালিয়া আর নৌকাডুবি।

ভারতবর্ষে বিদেশি সবাক্ ছবি প্রথম প্রদর্শিত হয় ২৬ মার্চ ১৯২৭ সালে। কলকাতার গ্লোব থিয়েটারে ফনোফিল্ম নামে একজাতীয় সবাক্ ছবি দেখায়। ১৯২৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেস (বর্তমান মিনার্ভা) খোলা হয় 'মেলডি অফ লাভ' বিদেশি সবাক্ ছবি দিয়ে। এই চিত্রগৃহেই দেখান হয় 'বিহাইন্ড দি কারটেন' সবাক্ ছবি। যাতে ছিল 'কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে' বলে একটি বাংলা গান। সেই বাংলা গান শুনবার জন্য প্রচণ্ড ভিড় হয়। প্রথম ভারতীয় সবাক্ ছবি 'আলম আরা', ১৯৩০ সালে।

রবীন্দ্রনাথ চলচ্চিত্র দেখার ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিলেন বলে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁর রচনা নিয়ে পাঁচটি নির্বাক্ ও চারটি সবাক্ ছবি তোলা হয় তাঁর জীবদ্দশায়। সুতরাং এবিষয়ে তিনি যে একেবারে অনবহিত ছিলেন, তা-ও বলা যায় না। বরং চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাঁর আস্থাই ছিল মনে হয় তাঁর চিত্ররূপের বাণী কবিতা, মুরারি ভাদুড়িকে চিঠি, এবং ইউফা কোম্পানির জন্য চিত্রনাট্য লেখার প্রয়াস থেকে। ১৯৩৮ সালে তিনি অমিয় চক্রবর্তীকে চিঠি লিখছেন :

"কিছুদিন থেকে সমস্ত চণ্ডালিকাকে গানময় করে তুলতে ব্যস্ত আছি। খ্যাতির দিক থেকে এর দাম নেই বললেই হয়। প্রথমত বিদেশী হাটে রপ্তানি করবার মাল এ নয়, দ্বিতীয় দেশের মাতব্বর লোকেরা এর বিশেষ খাতির করবেন বলে আশাই করিনে, যদি করেন তবে প্রভূত মুরুব্বি-য়ানা মিশিয়ে করবেন।.... খ্যাতি যখন না চাইতে আসে, তখন তার আয়োজনের বিশেষ খরচা বেঁচে যায়। ইতিমধ্যে তার পরিচয় পেয়েছি। বিদেশ থেকে নামজাদা অতিথি যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা এখানকার গীত নৃত্য দেখে বলে গেছেন এমন কিছুই তাঁরা কোথাও দেখেন নি; সংখ্যাতত্ত্ববিৎ ফিশার বলেছেন এর পরিচয় যদি সিনেমাযোগে সমুদ্রপারে পাঠানো যায় সে এক বহুমূল্য পদার্থ হবে।' (২১।১।৩৮)।

১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন ইওরোপ ভ্রমণ করছেন সে সময় প্রমথেশ বড়ুয়াও ইওরোপে। প্রমথেশের ইচ্ছা, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একটি পরিচয়পত্র দেন। রবীন্দ্রনাথ দিলেনও। যার সাহায্যে প্রমথেশ ফ্রান্সের ফক্স স্টুডিওতে চলচ্চিত্র বিষয়ে শিক্ষা নেন।

১৯৩৭ সালে প্রমথেশের 'মুক্তি' ছবি তোলা হয়। এই ছবির নামকরণে সাহায্য করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যখন তিনি পঙ্কজ মল্লিকের মুখে স্ক্রিপ্টের ট্রিটমেন্ট শোনেন। পঙ্কজ মল্লিক লিখেছেন, 'স্ক্রিপটের প্রথমেই ছিল নায়ক একের পর এক দরজা খুলে এগিয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ সেটা শুনে বললেন, প্রথমেই স্বারমুক্ত। লোকটি বোধহয় মুক্তি চাইছে কিছু থেকে।'

'পঙ্কজ মল্লিক আরও লিখেছেন, 'দিনের শেষে' গানটা আরও একবার শোনালাম ওঁকে। উনি সেদিন পুরনো কথা তুললেন। বললেন, সেদিন চলে গিয়েছিলে কেন? তোমার গান আমার বেশ ভাল লেগেছিল। সুন্দর সুর দিয়েছ তুমি। তোমাদের ছবিতে ব্যবহারের অনুমতি দিলেম। তবে দু-একটা জায়গায় পরিবর্তন কোরো। ওই যেখানে আছে ফুলের বার ওটাকে কর ফুলের বাহার, নেইকো যার-এর জায়গায় নেইকো যাহার, ফসল যার-এর জায়গায় যাহার, আর চোখের জল কথাটা বাদ দিয়ে দাও, ওখানে কর অশ্রু যাহার।

....রবীন্দ্রনাথ বললেন, আরও দু-একটি গান রেখো। 'আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে' গানটি আমার বড় প্রিয়। ওটা রাখা যায় কি না ভেবে দেখো।

আমি তখন আমার অনেক দিনের সযত্ন লালিত একটি আর্জি পেশ করেছিলাম। বলেছিলাম, গুরুদেব, আপনার গানে তালবাদ্য ব্যবহার করলে কি আপনি রাগ করবেন?

রবীন্দ্রনাথ বললেন, কেন, তালবাদ্য ছাড়া গানে কি মাধুর্য আনা যাচ্ছে না? ওটা থাক না।

আমি বললাম, এমন কিছু কিছু গান আপনার আছে যেখানে তালবাদ্যের সঙ্গত পেলে সুরটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ একটু হাসলেন। বললেন ঠিক আছে। তেমন বুঝলে ব্যবহার কোরো কিন্তু সতর্ক থেকো। গানের ভাবমাধু যেন তাতে নষ্ট না হয়।'

মুক্তি ছবিতে রবীন্দ্রনাথের 'দিনে শেষে', 'সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে' গা দুটো ছাড়াও আরও দুটি গান প্রযু হয়েছিল, 'আমি কান পেতে রই' এবং 'তার বিদায় বেলার মালাখানি' এ ছবিতে ভাটিখানার মালিকের চরিত্রটি তৈরি হয় 'দিনের শেষে' এবং 'আমি কান পে রই' গানের উপযুক্ত করে।

রবীন্দ্রনাথের রচনা নিয়ে প্রথম য চলচ্চিত্র তোলার কথা হয়, অর্থাৎ ডি বিসর্জন নাটকের ছায়াচিত্র গ্রহণ কর অনুমতি নেন, তখন রবীন্দ্রনাথের ব প্রায় যাট। চলচ্চিত্রের জন্য যখন প্র কবিতা লেখেন, অর্থাৎ 'দি চাই যখন লেখা হয়, তখন রবীন্দ্রনাথের ব সত্তর। তার এক বছর পর তিনি 'নট পুজো' পরিচালনা করেন বলে দাবি ক হয়েছে। শিল্পের এক নতুন মাধ্যম নি এই পরিণত বয়সেও উন্মাদনা অনুভব ক রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিস্ময়কর বা অপ নয়, চিত্রশিল্প নিয়ে মগ্ন হয়ে যাও ঘটনা তাঁর পরিণত বয়সেই ঘটেছিল। কি তার থেকেও সম্ভবত বড়ো কথা য চলচ্চিত্র যে-সময় ভদ্রসমাজে অচ্ছুত ছি সেই সময়েও রবীন্দ্রনাথের মনে কোনর ভীত সংস্কার ছিল না। ১৯২০ স বিসর্জন তোলা যায় নি, কারণ কো মহিলাশিল্পী পাওয়া যায় নি। ব চলচ্চিত্র যে কতখানি অপাংক্তেয় ছিল একটা নিদর্শন, ১৯২৯ সালের নির্বাক 'পঞ্চশর' তোলার সময় প্রমথেশ বড় অনুরোধ করা হয়েছিল যখন অভিনয় ক জন্য, তখন প্রমথেশ বড়ুয়া আঁতকে উ ছিলেন, সমাজের লোকেরা সিনেমায় দেখলে কী ভাববে, তা অনুমান ক রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের কোনো সং ছিল না। না থাকাই সম্ভব, কারণ তি বাঙালি সমাজের প্রতিকূলতার বির বাঙালি মেয়েদের নাচগান শিখিয়ে নামিয়েছিলেন।

১৯২৯ সালে রবীন্দ্রনাথ মনে ক সিনেমা তখনো নতুন কলারূপ পায় ১৯৩১ সালেও তিনি বাংলা সিনারি চলচ্চিত্র পরিচালনা নিয়ে সন্তুষ্ট ছি না। কিন্তু সিনেমার উপর তাঁর আস্থা অন্তর্হিত হয় নি, তা অনুমান করা ১৯৩৮ সালে অমিয় চক্রবর্তীকে চিঠিতে প্রকাশিত ধারণা থেকে, 'চণ্ডা সিনেমায় রূপ দিলে তা একটি বহু পদার্থ হবে।'

বিচিত্রা

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম জীবনে কৃতী সিভিলিয়ান, চাকুরিজীবনের শেষের দিকে ক বছর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এখন ১নং বালীগঞ্জ টেরাসে অবসর জীবন যাপন করছেন। স্মৃতিচারণ করছিলেন আমাদের কাছে।

আমাদের প্রশ্ন ছিল, লেখাপড়ার প্রতি আকৃষ্ট হতে কে কে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন ছেলেবেলায়।

বললেন, পারিবারিক পরিবেশই এর মূলে। মার সাত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। বাবাই মাকে লেখাপড়া শিখিয়ে নেন। তিনি ছিলেন অধ্যাপক। পরিবারে বাবাকে কেন্দ্র করে বিদ্যাচর্চার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, যার মধ্যে অনুপ্রেরণার অভাব ছিলো না। আমরা এই পরিবেশে মানুষ, পড়াশুনাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম।

আপনার মার প্রভাব পড়েনি আপনার ওপর? 'মার কাছে কতোটা ঋণী বলতে পারবো না। বড়ো পরিবার। চৌদ্দজন ভাইবোন। মার ওপর সব কর্তব্য দায়িত্বের ভার। শুধু পরিবারের সবার সুখ-সুবিধে দেখতেন না, প্রতিবেশীর দিগেও ছিলো সমান দৃষ্টি। মার দৃষ্টান্ত আমাদের মুগ্ধ করতো, অনুপ্রাণিত করতো।

আচ্ছা, আপনার ছেলেবেলার পড়াশুনা শুরুর দিনগুলো মনে পড়ে?

আমরা বালীগঞ্জের আদিবাসিন্দা। এ অঞ্চলে স্কুল বলতে কিছুই ছিলো না, কোন দূরে, সেই ভবানীপুরে সাউথ সাবার্বান স্কুল। যাবো ক করে? আমার যখন আট বছর বয়স, স্কুল হল, জগবন্ধু স্কুল। ভর্তি হলাম ওখানে।

ওই সময় একজন শিক্ষক, কুমার চন্দ্র রানা আমাকে প্রভাবিত করেছেলেন। প্রায়ই আসতেন আমার কাছে, এই বছর তিনেক গত হয়েছেন। ও'র প্রভাব আমার উপরে পড়েছল।

পড়াশুনা করে কোন দিকে কি বৃত্তি বেছে নেবেন ভেবেছিলেন? 'বড়ো আশ্চর্য জিনিষ—বললেন হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। যে সারথী রথ চালান, তিনি আমাকে বাঁকা পথে টেনে নিলেন। বি-এ পাশ করার পর সাত দিনের মধ্যে ঠিক হল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে হবে।

বলেত গেলাম। ফরে এসে সিভিল সার্ভিসে। ইংরেজদের সঙ্গে খাপ খেতো না আসলে আমি ঠিক শাসক হতে পারিনি, মানসিকতা শাসকের ছিলো না।

বারো বছর জেলা শাসক ছিলাম প্রধানত পূর্ববঙ্গেই।

কোন জায়গার কথা আপনার বেশী মনে পড়ে?

পাবনা আমার বেশী ভালো লাগতো। ওখানেই প্রথম পরিপূর্ণ জীবনের স্বাদ পেয়েছি, দুর্ভিক্ষের সময় দুর্গতদের সাহায্য করেছি। সরকারী সাহায্য পাইনি। চাঁদা দিয়েছি সবাই মিলে। সাহিত্য চর্চা ছিল। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হত শাসন কাজে ইস্তফা দিই। রাজনীতিতে যোগ দিই। কিন্তু কি করবো, বাবা যে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন।

এই বলে, বল্লেন, ওটা কিন্তু লিখবেন না। ওসব দুর্বলতা জানাজানি হয়ে যাবে।
আমি বললাম, তা জানুক না লোকে। বড়ো মানুষের দুর্বলতা কেমন ধরনের।

তবে হ্যাঁ চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলাম একবার, ডকটর রায় ছাড়লেন না। রবীন্দ্রনাথের প্রতি আপনার আকর্ষণ কখন কি ভাবে হল?

বড় লাজুক ছিলাম। প্রেসিডেন্সী কলেজে কবি আসতেন মাঝে মাঝে। ও'র নৃত্যনাট্য হত সেখানে। দেখেছি, তবে আলাপ করেনি।

রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসতে শুরু করি পাবনা থেকে। উনি মারা যান একচল্লিশে। আমি ঐ বছরের শেষের দিকে পাবনা যাই। ওখানকার লাইব্রেরীতে বিয়াল্লিশে রবীন্দ্রজয়ন্তী হল। সাতদিন ধরে উৎসব। লাইব্রেরিয়ান রবীন্দ্র ভট্টাচার্য বললেন, রবীন্দ্রনাথের দর্শন নিয়ে কিছু লিখুন। আমি লিখতে বসলাম, তখন থেকে পড়া শুরু। যতো পড়ি ততো অনুরাগ বাড়ে। 'রবীন্দ্রদর্শন' বইটি বরুলো। ১৯৬২ যে How thow singest my master বেরুলো। কিছুটা খ্যাতিও হল—বলে বিনীতভাবে হাসলেন একটু।

তারপর আবার বললেন, ৮ মে ৬২-তে রবীন্দ্রভারতী গড়বার দায়িত্ব নিলাম। ডাঃ রায়ের পরামর্শে। এ প্রসংগে একটা সকল বলছি শুনুন। চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পরে তাঁর শবদেহ দাহ করলেন গান্ধীজী নিজের হাতে। মানুষের কাঁধে চড়ে তিনি দেখাশুনা করছিলেন। ঠিক হল, তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্য চাঁদা তোলা হবে। এই প্রসঙ্গে ঠিক হল চিত্তরঞ্জনের শায়িত মৃতদেহের একটি আলোকচিত্র-বিক্রি করা হবে। কিন্তু শুধু মৃতদেহের চিত্র মহাত্মার মনঃপুত হল না। পরামর্শ করে ঠিক হল রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে কিছু বাণী লিখিয়ে তার সংগে জুড়ে দেওয়া হবে। রবীন্দ্রনাথের বাণী সংগ্রহের ভার ডাক্তার রায়ের উপর পড়লো। উনি জোড়াকাঁকোর বাড়িতে গিয়ে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের প্রস্তাব কবির কাছে রাখলেন। তা শুনে ডাক্তার রায়কে তিনি বলেছিলেন, ওহে ডাক্তার, এ কি রোগী দেখা, যে স্টেথোসকোপ বুকে বসালেই কলমের ডগা দিয়ে প্রেসক্রিপসন বেরিয়ে আসবে? তারপর বলেছিলেন, আচ্ছা বসো, দেখি কি করতে পারি। এই বলে ডাক্তার রায়কে একতলায় বসিয়ে রেখে তিনি দোতলায় উঠে গেলেন, আধ ঘন্টা পরে নেমে এসে এক খন্ড কাগজে লেখা বাণীটি দিয়েছিলেন যা সকলের জানা। তারপর বলেছিলেন, দেখো তো, এতে চবে? ডাক্তার রায় তা পড়ে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, খুব ভাল হবে।

এ ঘটনা থেকে যে গভীর শ্রদ্ধা রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর হয়েছিল তাই রবীন্দ্রভারতী স্থাপনের প্রেরণা। এই ঘটনাটির কথা একাধিক বার আমাকে ডাক্তার রায় বল্লেছিলেন।

এখনকার সাহিত্য পড়েন কিনা জানতে চাইলে তিনি বললেন, এখনকার

সাহিত্য প্রাণবাণ, কথা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। বিষ্ণু দে বুঝি না।

জীবনানন্দ স্বচ্ছ, আমাকে স্পর্শ করে। এখনকার লেখামননশীল, কবিতা অনুভূতির ব্যাপার। আর বিজ্ঞান দর্শন গড়ে উঠছে কৈ?

আপনি রসসাহিত্য লেখেন নি? হেসে বললেন, উপন্যাস গল্প লিখেছিলাম কবিতাও, ছেড়ে দিলাম।

কেন? মনে হল ঠিক হচ্ছে না।

উনি আরও বললেন এখন নটা থেকে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত লেখাপড়া করি। গবেষকদের সাহায্য করি। রাত্রে নাতনিকে পড়াই। ৫।৬ ঘন্টা কাজ করতে পারি। পড়াশুনো খুব ভালো লাগে।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

বিজয়া: টাইপ-শিল্পী নন

কেবল বেতারেই নয়, বিভিন্ন সঙ্গীতানুষ্ঠানেও শোনা যায় শ্রীমতী বিজয়া চৌধুরীর গান। শ্রীমতী চৌধুরীর গান গাওয়ার বিশেষত্ব এই যে, তিনি কোন গানেরই 'টাইপ' শিল্পী হয়ে যান নি। তাঁর স্পষ্ট বাচনভঙ্গি এবং উদাত্ত সুরেলা গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত যেমন অনায়াসে শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে, তেমনি মীরা, সুর দাস, তুলসীর ভজনেও ফুটে ওঠে ভক্তিপূর্ণ নিবেদনের ভাব যা শ্রোতাকে আপ্লুত করে। ১৯৭৮ সালে বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত 'সুর সিঙ্গার' সঙ্গীতানুষ্ঠানে শ্রীমতী চৌধুরীর পরিবেশিত ভজন গান সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস লিখেছেন—'তাঁর কন্ঠে ভজন-সম্রাজ্ঞী যূথিকা রায়কে খুঁজে পাওয়া যায়।'

তিনি যে কোন ধরনের গান সম পারদর্শিতা এবং অনুরাগের সঙ্গে গাইতে পারেন। সুবিখ্যাত মণিপুরী নৃত্য-শিল্পী জাভেরী সিসটারদের পরিকল্পিত গৌরাঙ্গলীলা নৃত্যনাট্যে কীর্তনাঙ্গের গানগুলি গেয়ে বোম্বাই-এর শ্রোতৃমন্ডলীকে অভিভূত করেছেন।

শিল্পীর সঙ্গীত - জীবনের শুরু অতি শৈশব থেকেই। তাঁর সঙ্গীত-জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে বাংলার বাইরে, এমন কি ভারতের বাইরেও। শৈশবে দেশ বিভাগের আগে ছিলেন শিলেটে, তারপর আসেন শিলং-এ। এই সময় তাঁর সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন কুমুদরঞ্জন গোস্বামী। ঐ অল্প বয়সেই তিনি শিলং বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং ভজন পরিবেশন করতেন।

১৯৫৫ সালে সাগর পাড়ি দিলেন। বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করলেন, কিন্তু শিল্পীজীবনের সঙ্গে আগের মতই জড়িয়ে রইলেন। ছ বছর বিদেশ বাসের সময় তিনি নানা সঙ্গীতানুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।

১৯৬১ সালে ভারতে ফিরে আসেন। ১৯৬৫ সালে তাঁর প্রথম রেকর্ড হয়, রবীন্দ্রসঙ্গীতের। তখন উনি দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে গান শিখছিলেন। ভারত প্রত্যাবর্তনের পর তিনি সন্তোষ সেনগুপ্তের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত প্রভৃতি বাংলা গানের তালিম নেন। ভজন গান শেখেন পন্ডিত শিবরাম এবং রঘুনাথ শেঠের কাছে।

কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত শরৎ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে অতুলপ্রসাদের গান গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন।

শিল্পীজীবনের বাইরে, সামাজিক জীবনে তিনি বিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানীর ফিনান্স ডিরেক্টর নগেশ চৌধুরীর সহধর্মিণী এবং কিশোর কবি অমিতপ্রকাশ চৌধুরীর জননী।

বাঁকুড়া কি পৃথিবীর বাইরে?

'সর্জান লো সর্জান।
কি কল বানিয়েছে, সাহেব কোম্পানী'

বিহারীলালের সেই উক্তি বাঁকুড়ার রেলপথ সম্বন্ধে আজও প্রযোজ্য। প্রাক্তন রেল কোম্পানীগুলি বাঁকুড়াতে যে রেলপথ খুলেছিল, আজ স্বাধীনতার পর প্রায় তিরিশ বছর হতে চলল, সেই রেলপথগুলির আজও কোন পরিবর্তনের চেহারা চোখে পড়ল না।

কাগজে কলমে বাঁকুড়ায় দুটি রেলপথ চালু আছে। একটি বাঁকুড়া-দামোদর রিভার রেলপথ ও অপরটি দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের দুটি লাইন যা বাঁকুড়ার উপর দিয়ে ছুটে চলেছে। প্রথমটি ন্যারোগেজ রেলপথ—যেটি বাঁকুড়া থেকে রায়না পর্যন্ত প্রায় ৬৫ মাইল পথ পাড়ি দেয়। এই রেলপথে জনসাধারণ মোটেই লাভবান নয়। এর গতি ঘন্টায় ১২ মাইল। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাসগুলি কিন্তু লাভবান হচ্ছে। জনসাধারণ অনেক কম সময়ে দ্রুতগামী বাসের উপযোগিতা অনুভব করেন। রেল কর্তৃপক্ষের কাছে জানা যায়, এই রেলপথ প্রতি মাসে লোকসান দেখাচ্ছে। সরকার এবং রেল-

সঙ্গীত পরিবেশন করছেন বিজয়া চৌধুরী

পথটি অধিগ্রহণ করে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের আদ্রা বিভাগের অধীনে এনেছেন। কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো। দেখা গেছে, কার্যক্ষেত্রে দুটি সমান্তরাল প্রশাসন ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। শুধুমাত্র কয়েকজন স্টাফকে ব্রডগেজ লাইনে বদলী করা হয়েছে।

অন্য দিকে সেই মান্ধাতার যুগ থেকে দঃ পূঃ রেলপথের গাড়িগুলিরও কোন উন্নতি হয় নি। বাঁকুড়া থেকে কলকাতার দূরত্ব রেলপথে ১৪৪ মাইল। রেলে সরাসরি কলকাতা যেতে হলে মাত্র দুটি প্যাসেঞ্জার ট্রেণ আছে। একটি সকাল ১০টা নাগাদ ছাড়ে, অন্যটি রাত্রি ৯-৩০টায়। এগুলির হাওড়া যেতে প্রায় ৮ ঘন্টা লাগে। ফলে দিনে গাড়িতে চাপলে দিনটি পুরো নষ্ট এবং রাতের গাড়িতে পুরো রাতই চলে যায়। মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেন এদিকে আজও চালু হয়নি। বৈদ্যুতিক ট্রেন স্বপ্নেও ঠাঁই পায় না। বাঁকুড়ার মানুষ স্থানীয় পত্র-পত্রিকার সাংবাদিক, জেলা প্রেস ক্লাব মাঝে মাঝেই রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে রেল ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পরামর্শ দিয়েছেন—ফল হয় নি।

বাঁকুড়াতে অনুষ্ঠিত মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-পুরুলিয়া আঞ্চলিক সাংবাদিক সমিতির চতুর্থ সম্মেলনেও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সব প্রস্তাবের মধ্যে বাঁকুড়া দামোদর নেভার রেলপথটিকে ব্রডগেজে রূপান্তরিত করা এবং এর শেষ প্রান্তের স্টেশন রায়না থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত মাইল পনের দূরত্বের সংযোগ সাধন করার প্রস্তাব রাখা হয়। বলা হয় তাহলে এই রেলপথ দঃ পূঃ রেলের একটি লাভজনক অংশ বিশেষ করে দক্ষিণ বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশের মানুষের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এ অঞ্চলের সঙ্গে কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলের যোগাযোগ বেশ ঘোরাপথে। কাজেই বি ডি আর লাইনটি তারকেশ্বর থেকে বাঁকুড়াকে ব্রডগেজে যুক্ত করলে কলকাতা থেকে বাঁকুড়ার দূরত্ব অন্ততঃ ২৫।৩০ মাইল কমে যাবে। এমন কি, এই রেলপথ দিয়ে মেল ট্রেন তারকেশ্বর হয়ে বাঁকুড়া - আদ্রা - গোমোর পথে পশ্চিমের দিকে যেতে পারবে।

দ্বিতীয়তঃ বিষ্ণুপুর থেকে আরামবাগের ভেতর দিয়ে সাঁত্রাগাছি পর্যন্ত রেলপথ খোলার দাবিও উঠেছিল। এই রেলপথ বসানোর জন্য অতীতে জরীপও হয়েছিল। দুরন্ত দামোদর সেদিন বাধা ছিল—এখন কিন্তু দামোদর বাঁধা পড়েছে, সুতরাং অসুবিধে হবে না। সাঁত্রাগাছি-বিষ্ণুপুর লাইন বসানো হলে হাওড়া-বাঁকুড়ার দূরত্ব দাঁড়াবে ১০০ মাইল। সুতরাং কলকাতা থেকে বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর বা পুরুলিয়া অনেক কাছে এসে যাবে।

তৃতীয়তঃ কলকাতা কিংবা হলদিয়া থেকে বাঁকুড়ার উপর দিয়ে একটি পশ্চিমগামী দূরপাল্লার এক্সপ্রেস বা মেল ট্রেন চালু করা খুবই প্রয়োজন। এই এলাকার কাউকে দেশের পশ্চিমাঞ্চলে যাতায়াত করতে হলে কলকাতা বা আসানসোলে গিয়ে আসন রিজার্ভ করতে হয়, যা ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। হাওড়া-খড়্গপুর আদ্রা গোমো দিয়ে কিংবা ভুবনেশ্বর থেকে খড়্গপুর আদ্রা হয়ে একটি মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেন অনায়াসেই চালু করা যায়।

এ ছাড়া টাটানগর থেকে খাতড়া ইন্দপুর হয়ে দুর্গাপুর পর্যন্ত রেলপথে যোগ স্থাপন করাও যায়। এই সব উন্নয়ন ব্যবস্থা কার্যকরী হলে রেলের আয় বাড়বে এবং জনসাধারণেরও সুবিধা হবে।

সমুদ্রের নিচে শহর

ভূপৃষ্ঠে বেশির ভাগটাই সমুদ্র, স্থলভাগ মাত্র ২৮ শতাংশ। আমরা বাস করি এই সামান্য একটু স্থলভাগে। অথচপৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা ভীষণভাবে বেড়ে চলেছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, পৃথিবীর জনসংখ্যা ২০০০ সালের মধ্যে দ্বিগুণ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। তখন এত মানুষের ঠাঁই হবার জায়গা ভূপৃষ্ঠের এই সামান্য স্থলভাগে পাওয়া যাবে কি? ঠাসাঠাসি করে যদি বা যায়ও তারপরে আর চাষ করার মতো জমি পড়ে থাকবে না। মানুষ খাবে কি? এমনকি মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অতি প্রয়োজনীয় যে অরণ্যভূমি তাও কতটুকু বাকি থাকবে বলা শক্ত।

মহাকাশ - বিজ্ঞানীরা অবশ্য বলেন যে পৃথিবীর কক্ষপথে স্পেস-স্টেশন স্থাপন করার মতো তাঁরা বড়ো বড়ো শহর গড়ে তুলবেন। লক্ষাধিক মানুষ বসবাস করতে পারবে এমনি এক-একটি শহরে। আমেরিকান বিজ্ঞানীরা তো স্পেস-শহরের নকশা পর্যন্ত উপস্থিত করেছেন। তাঁরা আরো বলছেন আগামী একশো বছরের মধ্যে পৃথিবীর মানুষ চাঁদে গিয়ে বসবাস করতে পারবে. অন্য কোনো গ্রহেই বা নয় কেন? কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও ধরে নেওয়া গেল তাই হবে। ১৯৫৭ সালে ৪ঠা অক্টোবর তারিখে যখন প্রথম স্পুৎনিক আকাশে উঠেছিল তখন কি কেউ ভাবতে পেরেছিল ১৯৬৯ সালের ২০শে জুলাই তারিখে পৃথিবীর মানুষ চাঁদে পা দিতে পারবে? কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা এমনিভাবে আশু ভবিষ্যতে পৃথিবীর কতজন মানুষের জন্য ঠাঁই করতে পারবেন? ২০০০ সালের মধ্যেই অন্য কিছু ব্যবস্থা করাটা অতীব জরুরি।

তাহলে এই যে ভূপৃষ্ঠের ৭২ শতাংশ জুড়ে সমুদ্র রয়েছে সেখানে কি মানুষের ঠাঁই হতে পারে না? সমুদ্র তো বিরাট এলাকা, জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যদি সাতশো-কোটি হয় তাহলেও সেখানে অফুরন্ত জায়গা। সমুদ্রকে বলা হয় 'ইনার স্পেস', মহাশূন্য যেমন 'আউটার স্পেস'। আমরা এতকাল এই ইনার স্পেসের দিকে ততোটা নজর দিইনি। এবার বাঁচার তাগিদেই দিতে হবে। বিজ্ঞানীরা তাই দিচ্ছেন।

সমুদ্রবিজ্ঞানের বয়স একশো বছরও হয়নি। যদিও ব্যবসার প্রয়োজনে এবং খুবই সীমিতভাবে খাদ্য-যোগানের প্রয়োজনে সমুদ্রের ব্যবহার দু-হাজার বছর আগে থেকেই হয়ে আসছে। আর সমুদ্রের জলের নিচে নেমে দীর্ঘকাল কাটাবার উপযোগী একটা উপায় বার করার জন্য বিভিন্ন সময়ে অনেকেই ভাবনাচিন্তা করেছেন। স্বয়ং লিওনার্দো দা ভিঞ্চি জলের নিচে ডুব দেবার একটি যন্ত্রের নকশা রচনা করেছিলেন।

ডুবুরির পোশাক শ'দেড়েক বছর আগেও পাওয়া গেছে। কিন্তু তার সাহায্যে দীর্ঘ সময় জলের নিচে কাটানো যেত না।

১৯৪২ সালে প্রথম তৈরি হল আশ্চর্য একটি যন্ত্র—অ্যাকোয়ালাঙ। বাংলায় বলতে হয় জলের নিচের ফুসফুস। আসলে বাতাসে ঠাসা একটি

সিলিন্ডার আর নিরন্ধ্র একটি মুখোশ। এই দুয়ের সাহায্যে জলের নিচে সিলিন্ডারের বাতাস না ফুরনো পর্যন্ত ঘুরে বেড়ানো চলে।

কিন্তু জলের নিচে মানে কত নিচে? জলের নিচে এমনকি ত্রিশ মিটার নিচে নামলেও ওপরকার জলের এমন একটা প্রচণ্ড চাপ পড়ে যে মানুষের পক্ষে সহ্য করা শক্ত। বিশেষ ডুবুরির পোশাক পরে ২০০ মিটার পর্যন্ত নিচে নামা যেতে পারে। ডুবোজাহাজেও প্রায় ২০০ মিটার। আর বেথিস্কোপ নামে একপ্রকার গোলকের মতো আধার তৈরি হয়েছে যা প্রায় হাজার মিটার নামতে পারে।

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, সমুদ্রতলে মানুষের বাসোপযোগী শহর গড়ে তোলা বড়ো সহজ ব্যাপার নয়।

ইতিমধ্যে দুটি ঘটনা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ১৯৫৮ সালের ৩রা আগস্ট তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউক্লিয়ার ডুবোজাহাজ 'নটিলাস' জলের তলা দিয়ে উত্তরমেরু পার হয়েছে। ১৯৬০ সালের ২৩শে জানুয়ারি তারিখে দুজন ডুবুরি বেথিস্কোপের সাহায্যে সমুদ্রের বারো হাজার মিটার নিচে নেমেছেন।

তারপর থেকেই সমুদ্রের তলদেশে জীবনযাপনের সম্ভাবনা সম্পর্কে বহু পরীক্ষাকার্য শুরু। একদল গবেষক সমুদ্রের নয় মিটার নিচে একটি সিলিন্ডার-সদৃশ আবাস তৈরি করে বেশ কিছুদিন কাটিয়েও এসেছেন। তবে এখানে একটি কথা বলার আছে। গবেষকদের দৃঢ়তা সাধারণ মানুষের না থাকারই কথা। সাধারণ মানুষ যখন সমুদ্রের নিচে বাস করতে আসবেন তখন তাঁর জীবনে অনেক কিছুই থাকবে না—না সূর্য, না চন্দ্র, না নক্ষত্র, না গন্ধ ও বর্ণ, না বর্ষা ও বাতাস। তবুও তাঁর জীবনটি স্বাভাবিক হওয়া চাই। বিজ্ঞানীরা বলেন, একালের নাগরিক মানুষ অনেক সময়ে এমনিতেই সমুদ্রের নিচে থাকার মতো অবস্থায় বাস করে থাকেন বহুতল অট্টালিকায় তাঁর অ্যাপার্টমেন্ট হয়ে থাকে জানলাবিহীন, তিনি যাতায়াত করেন মাটির নিচের রেলে, কর্মস্থলে থাকেন ঘেরাটোপের মধ্যে। সেখানে যন্ত্রের সাহায্যে বাতাস-চলাচল ও আলোর ব্যবস্থা করতে হয়।

বিজ্ঞানীরা তাই পরিকল্পনা করছেন, তীরভূমির কাছে দেড়শো মিটারের মতো গভীরতায় তাঁরা মানুষের বাসোপযোগী শহর গড়ে তুলবেন। সেখানে নিউক্লিয়ার শক্তির সাহায্যে কৃত্রিম বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি করা হবে। সমস্ত কাজের জন্য পাওয়া যাবে নিউক্লিয়ার শক্তির সাহায্যে উৎপন্ন বিদ্যুৎ। ঘরে ঘরে থাকবে রেডিও ও টেলিভিশন।

অমল দাশগুপ্ত

ঝোল-আলুটাও থাকত না

আমার ঠাকুমা পুরনো গল্পের ঝুড়ি খুলে নিয়ে বসতেন যেদিন, প্রায়ই একটা কথা বলতেন, "তোমাদের দাদু অনেক টাকা রোজগার করতেন, কিন্তু শেষবেলায় খাবার সময় আমরা (বাড়ির গৃহিণীরা) মাছের কণ্ঠা, ল্যাজার ভাঙা টুকরো ছাড়া পেতাম না, কখনও কখনও ঝোল-আলুটাও থাকত না।"

মধ্যবিত্ত পরিবারের এই চিত্র কিন্তু এখনও পাল্টায় নি। ঠাকমার সময়ে 'একান্নবর্তী পরিবার' কথাটির অর্থ ছিল অন্যরকম। সংসারে দুবেলা চল্লিশজনের পাতপড়াটা ছিল স্বাভাবিকতার অঙ্গ। কিন্তু এখন পাঁচ ভায়ের তিন ভাই আর কলেজে পড়া অবিবাহিত বোনটি যদি একসঙ্গে থাকে, তাহলেই তাকে আমরা একান্নবর্তী সংসার বলি। এই সমস্ত সংসারে মা যদি কর্মক্ষম থাকেন, তাহলে তিনিই গৃহিণী—না হলে বউদের মধ্যে কার্য-বিভাগ থাকে। যেমন বড়বউ'র দায়িত্ব স্কুল-কলেজ-অফিসের ভাত সামলানো, মেজবউ রাতের পাট আর ছোট বউ চা-জল খাবারের দায়িত্বে। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে খরচের কোন শেষ নেই। যা রোজগার তার তুলনায় প্রয়োজন অনেক বেশী। সংসারের নিত্য-নৈমিত্তিক খরচ ছাড়াও, অতিথি, অসুখ-বিসুখ, স্কুল-কলেজের খরচ, আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ লেগেই আছে। কোথাও কম হলে চলে না: আর তাই টান পড়ে রোজকার বাজারে। এতগুলি লোকের জন্য ঠিক

যতখানি বাজারের প্রয়োজন, মানিব্যাগ তা সম্মতি দেয় না। বাজারে মাছের থেকে শুরু করে কাঁচালঙ্কার দাম সবটাই কল্পনা ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা উর্ধ্বে গিয়ে দাঁড়ায়। বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারে মাছ খাওয়াটা বিলাসিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায়। বাজার প্রতিদিন যা আসে গৃহিণীদের সচেষ্ট পরিশ্রমে এটা দিয়ে ওটা চালিয়ে কোনক্রমে চলে যায়। কিন্তু যা প্রয়োজন, তার তুলনায় কম বাজার থাকলে কত আর ঠিক করা যায়? ফলতঃ শেষবেলায় যাঁরা খেতে বসেন তাঁরাই সবচেয়ে কম পান। অধিকাংশ দিনই তাঁদের ভাগ্যে মাছের টুকরোটি থাকে না। ডালের তলানি আর তরকারীর উচ্ছিষ্ট অংশ দিয়েই তাঁরা পেট ভরান। শেষবেলায় খেতে বসেন বাড়ির বউ আর গৃহিণীরা আর কাজের লোকটি। তার ভিতর কাজের লোকটির জন্য একটু বেশীই দিয়ে দিতে হয়। ফলে গৃহিণীর পুষ্টির জন্য আর অবশিষ্ট থাকে না বিশেষ কিছুই। দুধ যা আসে, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ এবং বাড়ির কর্তাদের ছাড়িয়ে গৃহিণীদের পাতে রোজ পৌঁছয় না।

ফলে মধ্যবিত্ত সংসারের গৃহবধূরা অপুষ্টির শিকার। তাঁদের স্বাস্থ্য ভালো থাকবার মতন কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয় না। অথচ বাড়ির কর্তাটি যা পরিশ্রম করেন, গৃহিণীর কায়িক পরিশ্রম তার চেয়ে কম নয়। তার ওপর আছে নানা ধরনের মানসিক টানাপোড়েন। সংসারে সবটাই তাঁদের প্রাথমিক দায়িত্ব—ছেলেমেয়েকে স্কুলে দিয়ে আসা নিয়ে আসা, ছোট ননদটি কলেজ থেকে এসে ভাত ছাড়া কিছু খাবে না, কর্তার সান্ধ্য আড্ডায় বার তিনেক চা করে পাঠানো—এতসব প্রাথমিক দায়িত্বের পর নিজের স্বাস্থ্যটি থাকে নিতান্তই অবহেলিত। আর আশ্চর্যের বিষয় সংসারের সকলের জন্য যে মানুষটির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, তাঁর স্বাস্থ্যের প্রতি কারো কোন নজর নেই, তাঁর নিজেরও না। ফলে তাঁর মেজাজ সর্বদা প্রায় সপ্তমে চড়েই থাকে, অল্প বয়সে তাঁকে বুড়ো হয়ে যেতে হয় আর সবচেয়ে মূল্য দেয় তাঁর শিশুগুলি যারা মাতৃগর্ভ থেকেই অপুষ্টিজনিত রোগে ভোগে।

বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের বউ বা গৃহিণীর খাওয়া নিয়ে একটা মানসিক অস্বাস্থ্যের লক্ষণও আছে। বউ যে ভালো খাবার, দুধ, ফল, মিষ্টি এসব নিজের অধিকারে দাবী করতে পারে বা যদি সংসারে উদ্বৃত্ত থাকে, তাহলে সে পাবে নতুবা তার ভাগ নেই। এ মনোভাব শুধু তার নয় বাড়ির আর পাঁচজনেরও। তাই, বাঙালী মধ্যবিত্ত গৃহবধূদের মধ্যে সেই অপুষ্টি আর অবহেলার ছাপ বড় হৃদয়বিদারকভাবে স্পষ্ট।
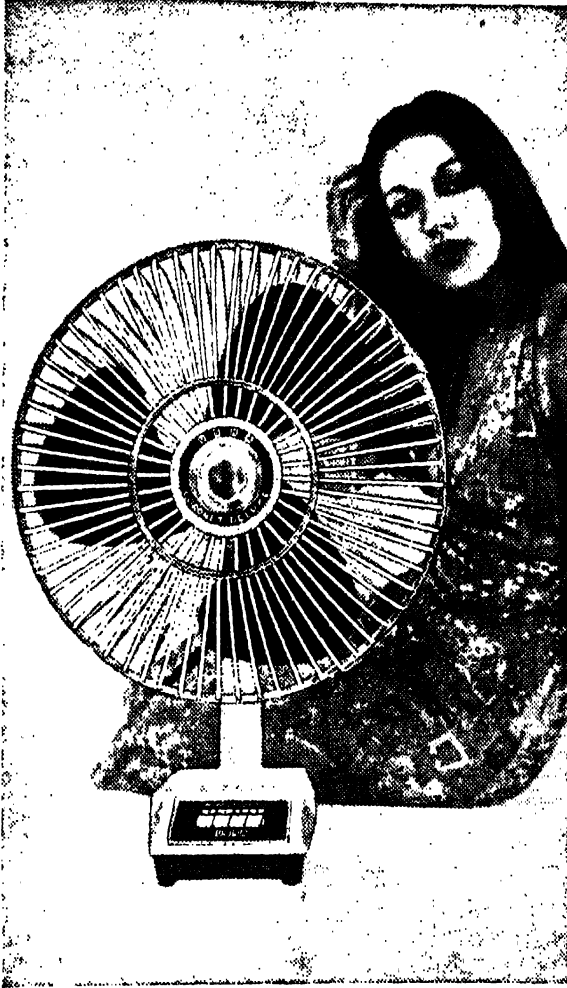
বোলান গঙ্গোপাধ্যায়

বাঁহাতি শিল্পীর প্রথম প্রদর্শনী

বাঁ-হাতে ছবি আঁকেন, এমন শিল্পী বোধহয় খুব কমই আছেন। এই নগণ্য সংখ্যক চিত্রকরদের মধ্যেই একজন হলেন হরিশংকর চট্টোপাধ্যায়। বছর তিনেক আগে কঠিন সেরিব্রাল থ্রম্বসিসে আক্রান্ত হয়ে তাঁর ডান দিক পঙ্গু হয়ে যায়। মঞ্চ থেকে চিরদিনের মত বিদায় নেন। শুরু করেন ছবি আঁকা। ডানদিক পঙ্গু। তাই হরিশংকরবাবু বাঁ-হাতেই রং-তুলি নিয়ে বসে পড়েন ক্যানভাসের সামনে। সামান্য ক' বছরেই স্টুডিও ভরে যায় ছবিতে।

এই বাঁহাতি শিল্পীর প্রথম একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হলো একাডেমি অব ফাইন আর্টস-এ—৭ থেকে ১৩ মার্চ। হরিশংকরবাবু তুলি ধরেছেন বেশী দিন নয়। কিন্তু এর মধ্যেই তাঁর হাতে যথেষ্ট মুন্সীয়ানার ছাপ দেখা দেখা গেছে। প্রদর্শনীতে মোট ছবি ছিল তেত্রিশটি। প্রায় সবগুলোই তেলরং। কলকাতায় ট্রামের তারের নীচে ট্রাফিক সিগন্যাল, গ্রামের ধানক্ষেত, নগ্ন রমণী সব কিছুই তাঁর ছবিতে স্থান করে নিয়েছে। আছে সমস্যাজর্জর মানুষ, তা থেকে উত্তরণের দৃঢ় প্রত্যয়ের কথাও।

শিল্পীর কিছু কিছু প্রতীকধর্মী ছবিও প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। 'আলো-আঁধারী'—টেবিল লাইটের নীচে একটি মানুষের মাথার খুলি বা 'বিশ্বপ্রেম'—ট্রামের তারের নীচে ট্রাফিক সিগন্যাল পোস্টের পাশে ফুটপাতের মানুষ। গ্রামের কুঁড়েঘর, নদী, পাহাড়, ঝর্ণা, এসবও হরিশংকরবাবুর শিল্পী মনকে স্পর্শ করেছে 'কলিকাতা—১৯৪৩' ছবির পাশেই স্থান পেয়েছে তার 'ক্ষেত পাহারা'—শস্যক্ষেতে মাচাং-এর উপর ঘর তৈরী করে কৃষক তার ফসল পাহারা দিচ্ছে। শিল্পীর কোন কোন ছবিতে রং-এর ব্যবহার সংযত মনে হয়নি। নিজের ছবি সম্পর্কে শিল্পীর বক্তব্য : সহজ সরল যা দেখে সবাই বুঝতে পারে তাই আঁকতে ভালোবাসি।

রোগাক্রান্ত হবার পর হরিশংকরবাবুর স্মৃতিশক্তিও অনেক লোপ পেয়েছে। এখন নিজের নামটিও না কি তাঁকে দেখে লিখতে হয়। কিন্তু এই অবস্থায়ও যে তাঁর শিল্পী-মন নিহত হয়নি—এটাই আশ্চর্যের।

পান্নালাল রায়

গম বনাম গাঁজা

অবিশ্বাস্য হলেও কথাটা সত্যি। গম নয়, গাঁজার চাষে ঝুঁকেছেন মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ ব্লকের নরেন ভট্ট। অনেকের মতো আমিও প্রথমে বিশ্বাস করতে পারি নি। লালগোলা প্যাসেঞ্জার থেকে নেমেই দেখা দীপকবাবুর সঙ্গে। শ্রীদীপক দাসগুপ্ত। চিফ এগ্রোনমিস্ট। ইন্দো-জারমান ফারটিলাইজার প্রজেকটে চাকরি করেন। কলকাতা থেকেই এসেছেন। প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলা কৃষিবিদ বিশ্বনাথ মিত্র। জেলার কাজ দেখতেই দীপকবাবুর আসা।

আমিও গিয়েছিলাম দরকারী কাজে। গম চাষের খবর সুধোতেই মিত্তির মশাই বললেন, মুর্শিদাবাদ জেলা গম চাষে এগুচ্ছে সন্দেহ নেই। তবে, বিকল্প কোন কোন চাষে চাষীবাসীর আগ্রহ বাড়ছে।

সাগ্রহে শুধোলাম কী সেই চাষ?

মিত্তির মশাই উত্তরে যা বললেন তাতে আমার চিত্তির জ্বলে উঠল। সকাল ৬টায় বাড়ি ছেড়েছি। বেলা দেড়টায় বহরমপুরে পেঁছে মনের অবস্থা কী দাঁড়ায় বুঝতেই পারেন। দানাপানি দূরে অস্ত। চানটাও সারতে পারি নি। রসিকতারও সময় পেলেন না ভদ্রলোক। গম্ভীর হয়ে গেলাম।

আমার গাম্ভীর্য দীপকবাবুর নজর এড়াল না। খবরটা তাঁরও জানা ছিল। বললেন, আসুন না আমাদের সঙ্গে আমরা তো আয়েশবাগেই যাচ্ছি। নিজের চোখে দেখে চাষীর কথা শুনে মিলিয়ে দেখুন সত্যি না মিথ্যে।

নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেলাম। সোজা গেলাম আয়েশবাগে। পথে চা-জলখাবার খেয়েছিলাম। আর যাই খাই গাঁজা কখনও খাইনি। সেই গাঁজার চাষ হচ্ছে আয়েশবাগে।

আয়েশবাগে ঢুকেই দেখা হল গাঁয়ের অনেকের সঙ্গে। তার মধ্যে নরেন ভট্টও ছিলেন। তাঁর দাদার নাম মণীন্দ্র ভট্ট। পেশায় শিক্ষক। চাষীবাসী পরিবার। বলা যায় বড় চাষী।

চাষী মাত্রেই সব রকমের চাষ থাকে। ও'দের চাষ রয়েছে ধান, পাট, আখ, গম, সব্জির। গম চাষে বিঘা পিছু ৭।৮ মণের বেশি ফলন পান নি। খরচ ওঠা দায়।

অথচ খরচ উঠেছে গাঁজার। শুধু ওঠা নয় ভাল লাভ হয়েছে। গাঁয়ের সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করলেন সে কথা। ৪০ বিঘার গাঁজায় চাষ করে ফলন পেয়েছেন ৫৪ কুইন্টাল। খান্দুয়া জাতের গাঁজা। বিক্রি হয়েছে সরকারের কাছে। কুইন্টাল পিছু রেট ২৭০০ টাকা। আবগারি কর বাবদ ৪৫০ টাকা কেটে নিয়ে ও'রা নগদ দাম পেয়েছেন ২২৫০ টাকা হিসাবে। এক কুইন্টাল গাঁজার দাম ২২৫০ টাকা হলে ৫৪ কুইন্টালের দাম কী দাঁড়ায় চিন্তা করে বের করতে গিয়ে মনে হল আমিই সেই গাঁজায় দম দিয়েছি। মাথা হিসাব মেলাতে পারব না কেন?

হিসাব করেই কিন্তু ভট্টমশাইরা চাষ করেছিলেন। দরখাস্ত করেছিলেন গাঁজার দপ্তরে। পারমিশন মিলল। পাহারাদার বসল। বিঘে পিছু খরচ দেড় হাজার টাকা। ৯ টাকা হিসাবে আড়াই কেজি বীজের দাম ২৩ টাকার মতো।

প্রচুর জৈব সার ও বিঘে পিছু এক কুইন্টাল নিম খোল দিয়ে বীজ বোনা হয়। চারা একফুট হলে ডোলি টানার দরকার। বোনার আগে মাটির সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে দেন সুফলা ২০ : ২০ : ০ সার ১০ কেজি। পটাশ ৫ কেজি। ইউরিয়া তিন কেজি।

পরিচর্যার মধ্যে নিড়ান, ডোলি টানা আর ৪।৫টি সেচ। ফুল আসা পর্যন্ত খরচ বিঘা পিছু সাত-আটশ টাকা। বাকি টাকা গাছ কাটার পর গাঁজা তৈরী করতে খরচ হয়। রোদ খাওয়ান, পায়ে করে মাড়ান, তুলে রাখা ইত্যাদি হাজারো ঝামেলা পুইয়ে মাল তৈরী হয়। তারপরেই বিক্রি। পরেশ পাল, হারাণ পাত্রদার, বাসুদেব তফাদার,

মোল্লাহার সেখ প্রমুখ সবাই বললেন এবার বলুন লাভ কিসে? গম চাষে না গাঁজায়?

তবে একটা কথা সকলেই স্বীকার করলেন, গাঁজার চাষ করতে প্রচুর টাকার প্রয়োজন। কাজ জানা লোক চাই। তাই সকলের পক্ষে এই লাভজনক চাষ সম্ভব নয়। বিঘে পিছু ৭০ কেজির কম ফলন হলে সরকারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে মোটা টাকা। তাই, ইচ্ছে থাকলেও এ চাষ সকলের করা সম্ভব হচ্ছে না। এমন কি খাবারও উপায় নেই। তদারকি অফিসারেরা দিন-রাত পাহারা দিচ্ছেন। তাঁদের চোখ এড়িয়ে গাঁজায় দম দেবার উপায় নেই। সবই যাচ্ছে সরকারের ঘরে।

গম চাষের খরচ পুষিয়ে লাভ করা যেখানে বেশ কষ্টকর বলে চাষীবাসীরা জানালেন সেখানে গাঁজা চাষ করে প্রচুর লাভ করতে দেখে এলাম নিজের চোখেই।

সুভাষ রায়চৌধুরী

সিজুনী

গ্রামে কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত ধান-সজুনীদের কথা আপনারা চিন্তা করছেন ক? ধান সিজুনী বলতে, গাঁয়ে-ঘরে গেরস্ত াড়িতে যেসব গরীব দুঃস্থ মহিলারা ান সিদ্ধ করে জীবিকা অর্জন করেন।

শ্রীমতী সখীবালা দাসী (দোলুই) াতিতে বাগদী। বাড়ি হুগলী জেলার মরপাড়ায়। বছর ছয়-আট আগে দুটি ছেলে । দুটি মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়েছেন।

স্বামীর জীবিত অবস্থায় মুনিষ খেটে রোজগার করতেন। সখীবালা এখন ভদ্র বাবু হস্থের ঘরে ধান সিদ্ধ করেন। যার যেমন সোর সেই অনুযায়ী কারুর বছরে ভাতের ড়ির জন্য ৬০, ৭০, ১০০ বা ১৫০ মণ র্যন্ত ধান লাগে। সেই সব ধান সিদ্ধ-কনো করে দেন। এমন ২।৩ ঘরের কাজ র রাখতে হয়।

তাঁকে প্রতিদিন খুব ভোরে উঠে এসে থমে ধানসিদ্ধ উনুনের পাশ তুলে সার ফেলার জায়গায় ফেলে দিয়ে জ্বালানী াগাড় করতে হবে। জ্বালানী বলতে াধারণতঃ পোয়াল মাড়া ফুটি ও আগড়া চিটে ধান) উনুনের গোড়ায় জমা করে তার-র ধান সিদ্ধ করতে লাগতে হবে।

গৃহস্থ ধান ওজন করে দেবেন। তারপর দি ভাতের ধান তৈরী করা হয়, তবে মাটির ড়িতে সামান্য (মাটির সরার দুসরা) জল য়ে ধান ভরে উনুনে চাপিয়ে জ্বাল দিতে ব পোয়াল ফুটি ও আগড়ার সাহায্যে ঠি দিয়ে ঠেলে ঠেলে।

ধানসিদ্ধ উনুন সাধারণতঃ ৪ পাকা হয়। র্থাৎ একসঙ্গে ৪টি হাঁড়ি বসে। কেউ কেউ তিন পাকাও করেন। অনেকে আবার মাটির হাঁড়ির বদলে ক্যানেস্তারা টিনও ব্যবহার করেন। তবে মুড়ির ধান সিদ্ধ করতে হলে টিনে চলে না। হাঁড়িই ভাল।

টিনের ধান তলারগুলো বেশী সিদ্ধ হয়ে যায়, উপরেরগুলো কম। ফলে মুড়ি খারাপ হয়। যদিও ভাতের ধান কেউ কেউ টিনে সিদ্ধ করান, মুড়ির ধান কখনই না।

ধানের হাঁড়িগুলো সম্পূর্ণ ভেপে গেলে সেগুলো মাটিতে ঢেলে ফেলা হয়। আবার ঐ হাঁড়িতে জল ও ধান দিয়ে ভাপানো শুরু হয়। প্রথম বারে ভাপানো ধানগুলি কিছুটা ঠাণ্ডা হলে বড় বড় ডাবায় তুলে দেওয়া হয় এবং ঐভাবে সমস্ত ধান ভাপানো হয়ে গেলে ডাবায় দিয়ে জল দিয়ে ভিজিয়ে দেওয়া হয়।

ভাতের ধান সিদ্ধ করার এই হল প্রথম দিনের কাজ। দ্বিতীয় দিনে আবার ডাবা থেকে ঐ ধান ছেঁকে, হাঁড়ি ভর্তি করে, এবার একটু বেশী করে সিদ্ধ করতে হয়। সিদ্ধ হয়ে গেলে ঐ ধান মাটিতে ঢেলে রোদে শুকোতে হয় এবং দিন-দুই ধরে ভালভাবে মেলে শুকিয়ে তারপর তুলতে হয়। ঐ ধান তখন গৃহস্থ কলে ভানাতে পাঠান।

মুড়ির ধানের ক্ষেত্রে, আগের দিন ধানকে ডাবায় ভিজিয়ে রাখতে হয়। ২৪ ঘণ্টা ভেজার পর ছেঁকে হাঁড়িতে ভরে সিদ্ধ করতে হয় ভালভাবে। সিদ্ধ হয়ে ধানের মুখ ফাটা-ফাটা হয়ে গেলে ধান নামিয়ে মাটিতে ঢেলে ঠাণ্ডা করে আবার ডাবায় নতুন জলে ভিজিয়ে দিতে হয়। তা না হলে মুড়িতে গন্ধ হবে।

সিদ্ধ করা ধান দ্বিতীয় বার জল পাল্টে ভিজিয়ে দেবার একদিন পরে আবার ছেঁকে নিয়ে তাকে মাটির হাঁড়িতে সিদ্ধ করে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে ২।৩ দিন ধরে। এই দ্বিতীয়বারের সিদ্ধ বেশ চাপ করে করতে হয়। না হলে মুড়ি ভাল হয় না।

একজন ধানসিজুনী দিনে দু-তিন মণ ধান সিদ্ধ করতে পারেন ভাতের ধান হলে। মুড়ির ধান হলে দু মণের বেশী কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না।

প্রতি বারে দু মণ ধান তুলতে দুদিন লাগে। ভাতের ধান হলে একদিন ভাপানো আর একদিন সিদ্ধ। প্রথমবার এবং দ্বিতীয়-বার সিদ্ধ করা নিয়ে মুড়ির ধানেও দুদিন।

এই কাজের জন্য সখীবালার মজুরী হচ্ছে, ভাতের ধানের বেলায় মণ প্রতি আট আনা। মুড়ির ধানের জন্য মণ প্রতি বারো আনা। প্রতিবারে গড়ে দু মণ করে ধান উঠলে ভাতের ধানের জন্য মজুরী পাচ্ছেন এক টাকা। আর মুড়ির ধানের জন্য দেড় টাকা। অর্থাৎ দিনে নগদ আট আনা থেকে বার আনা রোজগার। সঙ্গে পাবেন জল খাবার জন্য এক সের মুড়ি (আধ কাঠা, যার ওজন একপো গ্রামের কিছু বেশী), আর পাওয়া যাবে একপালা সরষের তেল। এই হল ধানসিদ্ধর জন্য পাওনা। যদি সেই ধানকে নেড়ে শুকিয়ে করে দেন, তবে পাওনা একবেলা ভাত খাওয়া।

অনেক সময় ভাজুনীদেরই জ্বালানী যোগাড় করতে হয়। তখন তাঁরা বাঁশপাতা খড়পাতা, আমপাতা এইসব বন-জঙ্গল খুঁজে যোগাড় করে আনেন সিদ্ধের জন্য। এর জন্য কোন মজুরী দেওয়া হয় না। বড়জোর গৃহস্থ পোয়াটাক খুদ দেন, তাঁর ছেলেমেয়ের খাওয়ার জন্য।

এই সামান্য আয়ে সখীবালার মতো অভাবী মানুষের সংসার চলে কিভাবে? তাও তো বার মাস কাজ হয় না। এটা একটা মরশুমের ব্যাপার। পৌষ মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ-মাস পর্যন্ত এ-কাজ চলে। তারপর? আমি একটি উদাহরণ দিলাম মাত্র। সখীবালার মত এমন ধানসিজুনী গ্রামে গ্রামে অনেক আছেন। তাঁদের কথাও ভাবতে হবে বৈকি!

বিজয় অধিকারী

আমীর খসরু আমের আঁটি এবং সানাই

অনেকের বিশ্বাস, এই অপরূপ বাদ্যযন্ত্রটি আলাউদ্দীন খিলজির (১২৯৬-১৩১৬ খৃষ্টাব্দ) সভাসদ, কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ আমীর খসরু উদ্ভাবন করেছেন। এই সৃষ্টির পিছনে কোনও ঐতিহাসিক সত্য আছে কি না জানি না, তবে, ভারতীয় সঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে আমীর খসরুর অবদান কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। নবসৃষ্টির কাজে তিনি নিজেকে এতো ব্যস্ত রাখতেন যে কোনো কিছুর সন্ধান পেলে অথবা গবেষণার অবকাশ দেখা দিলে তিনি নিস্পৃহ থাকতে পারতেন না। এই রকম একটি অবকাশের ফলেই সৃষ্টি হয়েছিলো সানাই, ভারতীয় মঙ্গল বাদ্যের শ্রেষ্ঠ রূপায়ণ।

কথিত আছে, এক দিন পথে যেতে যেতে তিনি দেখতে পেলেন একটি বালক আমের আঁটিতে ফুঁ দিয়ে সুন্দর সুর বার করছে। চিন্তার খোরাক জুটলো আমীর খসরুর। তিনি ভাবতে লাগলেন, আম -আঁটির ভেঁপুকে কিভাবে উন্নত করা যায়। প্রথমে তিনি একটি নল সংযুক্ত করে তিনটি স্বর নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করলেন। নলের গায়ে বাঁশির মতো তিনটি ছিদ্রপথে একাজ সমাধা করা হলো। প্রাথমিক চেষ্টায় সফলকাম হয়ে আমীর খসরু আম - আঁটির ভেঁপুকে পূর্ণাঙ্গ বাদ্যযন্ত্রে রূপায়িত করার চেষ্টায় মেতে উঠলেন। গবেষণার পথ সম্প্রসারিত হলো।

তারপর আম - আঁটির বদলে খাগড়ার পাত ব্যবহার করে আমীর খসরু অপ্রত্যাশিত ফল পেলেন এবং

তারপরই সপ্ত সুরের নল ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। পূর্ণাঙ্গ বাদ্য-যন্ত্রের আবির্ভাব এইভাবে সুনিশ্চিত হওয়ার পর বাদ্যটি নামকরণের ব্যাপারে আমীর উদ্বিগ্ন হলেন এই কারণে যে ভবিষ্যতে তিনি হয়তো আরও অগ্রসর হতে পারবেন। যেখানে বসে তিনি পরি-কল্পনা অনুযায়ী এই ধরনের কাজে নিজেকে লিপ্ত রাখতেন তার সামনেই ছিলো একটি ফুল বাগান। তার এক নিভৃত কোনে একটি গাছে ফুল ফুটতো আবাহমান কাল। ফুলের নাম সাহ্‌নাই, ফরাসী নাম।

বছরের পর বছর ধরে ফুল ফুটেছে, কখনও কোনো চিন্তা মনে জাগেনি। উৎকণ্ঠিত মন এই ফুলকে আশ্রয় করেই যেন খুঁজে পেলো সমস্যা সমাধানের পথ। ফুলগুলি দেখতে অনেকটা ধুতুরা ফুলের মতো। আমীর খসরু বাদ্যযন্ত্রটিকে সাহ্‌নাই ফুলের আকারে রূপান্তরিত করলেন এবং নামও রাখলেন সাহ্‌নাই। এই সাহ্‌নাই-ই আজ সানাই নামে পরিচিত।

মিয়াঁ বিসমিল্লা বর্তমানে সানাই বাদনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী। তাঁর সম্পূর্ণ নাম আমরুদ্দীন খাঁ বিসমিল্লা। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অঙ্গনে তিনি প্রবেশ করেন বড় ভাই সামসুদ্দীন খাঁ বিস-মিল্লার সহযোগিতায় এবং দুজনে একই সঙ্গে বাজাতেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্বে অগ্রজের মৃত্যু হওয়ার ফলে আমরুদ্দীন খাঁ বিসমিল্লা এখন একক ভাবেই সঙ্গীত আসরে অবতীর্ণ হন।

মিয়াঁ বিসমিল্লার জন্ম বারানসীর অন্তর্গত ভোজপুর গ্রামে ১৯০৮ সালে। পিতা পয়গম্বর বকসও ছিলেন সানাই বাদনের একজন প্রতিষ্ঠাবান শিল্পী। বালক বিসমিল্লার শিক্ষা সমাপ্ত হয় তিন পিতৃব্যের কাছে, নাম তাঁদের বিলায়তু হুসেন খাঁ, সাদিক আলী ও আলী বকস। বেশির ভাগ শিক্ষা বিস-মিল্লা পেয়েছিলেন আলী বকস-এর কাছে। এই আলী বকসই সর্বপ্রথম সানাই বাদন পদ্ধতির মধ্যে তার যন্ত্রের সমপ্রাকৃতিক 'ঝালা' নামক আঙ্গিক প্রবর্তন করেন। ঝালার প্রয়োগে বাদন পদ্ধতির মধ্যে যে উন্নতি সাধিত হলো তা-ই পরবর্তী কালে যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে সানাইর স্থান পাকা করে তোলে। বিলায়তু। সাদিক আলী ও আলী বকস-এর চেষ্টায় সানাই বাদনের প্রভূত উন্নতি সাধিত হলেও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত মহল এই বাদ্যযন্ত্রটির প্রকাশভঙ্গি সম্বন্ধে তেমন সচেতন ছিলেন না।

সানাই সম্বন্ধে এই নীচু নজরের বেড়া প্রকৃত ভাঙলেন মিয়াঁ বিসমিল্লা, বিদ্রোহ করে নয়, সুরের প্লাবন বইয়ে। খেয়াল গীতরীতির সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীতের আঙ্গিক মিশ্রণ করেই মিয়াঁ বিসমিল্লা একাজ সমাধা ন আলাপ তান, হলক, ছন্দবৈচিত্র্য সবই স্থান পেলো সানাই বাদনে। তার উপরে এলো যন্ত্র-সঙ্গীতের জোড় ও ঝালা।

বিসমিল্লার পিতৃব্য ও শিক্ষাগুরু আলী বকস-এর মৃত্যু হয় ১৯৪০ সালে। তারপর ইহলোক ত্যাগ করলেন অগ্রজ সামসুদ্দীন। সামসুদ্দীনের বাজনা ছিলো একটু গুরু প্রকৃতির; সুরের প্রয়োগ তিনি করতেন অপেক্ষা-কৃত জোরালো ফুঁ দিয়ে এবং হলক তানের প্রতি তাঁর আসক্তি ছিলো সমধিক। ছোট ভাই আমরুদ্দীনের বাজনা এই পরিবেশে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো সূক্ষ্ম রেখা নিয়ে ফুটে উঠতো। দুই ভাইর একত্র বাজনা যাঁরা শুনেছেন তাঁরাই একথা সমর্থন করবেন। খেয়াল শ্রেণীর বাজনায় সামসুদ্দীন ছিলেন সিদ্ধহস্ত, আমরুদ্দীন তার উপরই সূক্ষ্ম কারুকার্য করে সকলের মন হরণ করতেন।

অগ্রজের মৃত্যুতে আমরুদ্দীন এতোই নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিলেন যে কিছুদিনের জন্য তিনি বাজনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বন্ধু ও হিতৈষী-দের একান্ত অনুরোধে আবার তাঁকে মন বাঁধতে হয়, ফিরে আসতে হয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে।

শোনা যায়, বাল্য বয়সে আম-রুদ্দীনকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা পিতা অনেক করেছিলেন। কিন্তু অস্থির মতি বালকের মন সেদিকে একেবারেই যায় নি। বিরক্ত হয়ে পিতা শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দেন। সুযোগ বুঝে আমরুদ্দীন সোজা চলে আসেন পিতৃব্য ভবনে। এখানে সানাই শিক্ষার পূর্বে তাঁকে লক্ষ্ণৌর মহম্মদ হোসেন খাঁর কাছে খেয়াল, হোরী ও ধামার শিক্ষা করতে হয়। এই শিক্ষার ফলেই পরবর্তীকালে সানাই বাজনার মধ্যে গায়কির ঢং সংযুক্ত করা আমরুদ্দীনের পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে।

সানাইয়ে ঠুমরীর অপূর্ব রূপায়ণ আমরুদ্দীনের সম্পূর্ণ নিজস্ব। বারা-নসীর সঙ্গীতময় পরিবেশে বর্ধিত হয়ে পূর্বী ঠুমরীর ঢং তার মজ্জাগত বলা চলে। বাল্য বয়সে খেলনার বাঁশি বাজিয়ে পিতৃব্যদের কাছে বিদ্যা জাহির করা ছিলো তাঁর স্বভাব। ব্যক্তিগত-ভাবে কারও কাছে আমরুদ্দীন ঠুমরী শিক্ষা না করলেও আবদুল করিম খাঁর

ঠুমরীই তাঁকে প্রভাবিত করেছিলো সব চাইতে বেশি। কিন্তু এ-ঠুমরী পূর্বী ঠুমরী থেকে ভিন্ন, কারণ খেয়াল গানের প্রক্ষিপ্ত অলংকরণ আব্দুল করিমের ঠুমরী গানে পাওয়া যায়, যা পূর্বী ঠুমরীতে নাই বললেই চলে। পূর্বী ঢংএর সঙ্গে কিরানা ঢং মিশ্রিত হয়ে আমরুদ্দীনের সানাই যে প্রাণবন্ত ধারার সৃষ্টি করেছে তার বিশদ ব্যাখ্যা মনে হয় পাঠকদের দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

বেনারসের হিন্দু সানাই বাদকদের মধ্যে নন্দলালের স্থান সর্বাগ্রে। কলকাতার বিভিন্ন সঙ্গীত সম্মেলনেও তিনি অংশ গ্রহণ করে গেছেন। কিন্তু বিসমিল্লার তুলনায় তাঁর সমাদর তেমন প্রশস্ত নয়। অবশ্য গুণী হিসাবে তাঁর বাদনশৈলী অগ্রাহ্য করা যায় না। পিতা শুদ্ধলাল ছিলেন বেনারস রাজ-দরবারের সানাই বাদক এবং তাঁর খ্যাতির পরিমাণ সেখানেই সীমিত: পুত্রকে বংশগত ধারার উত্তরাধিকারী করবার কামনা নিয়ে বাল্য বয়স থেকেই নিজে শিক্ষা দেওয়া শুরু করেন। বংশগত এই শিক্ষার বাইরে নন্দলাল আরও শিক্ষাগ্রহণ করেন দিল্লীর ওস্তাদ ছোটে খাঁ, বেনারসের বড়ে রামদাস এবং বেনরসেরই অপ্রতিম ঠুমরী গায়ক মৌজুদ্দীন খাঁর কাছে। এঁরা সকলেই ছিলেন কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী এবং এবং সেই কারণে কণ্ঠসঙ্গীতের ধারা নন্দলালের সানাই বাদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়

ওড়িশি

যোগেশ মাইম আকাদামির সাহায্যার্থে পদাবলী আয়োজন করেছিলেন কলামন্দিরে রানী করনার ওড়িসি আর কথক নাচ। কলকাতার নাচের আসরে কথকই বেশি হয়। ওড়িসি তুলনায় কম। সহযোগিতায় ছিলেন রিতা লাহিড়ী (কন্ঠ), ইন্দ্রাণী চ্যাটার্জি (কন্ঠ), ওস্তাদ সঈদ খান (সেতার), ওস্তাদ ইফতিরাক মুরাদাবাদী (সারেঙ্গী), ওস্তাদ চমন খান (তবলা), গুরু কেলুচরণ মহাপাত্র (পাখোয়াজ) আর গ্রন্থনায় প্রদীপ ঘোষ।

পদাবলী সাত বছরের এক নতুন সংস্থা। মূকাভিনয় শিল্পচর্চার স্থায়ীত্ব চান। নাচের আসর জমিয়ে টিকিট বিক্রি আর আমোদ এঁদের লক্ষ্য বলে মনে হল না। দেশ-বিদেশের খ্যাতিসম্পন্ন আজকের যোগেশ দত্তকে কুড়ি বছর আগে দেখেছি ছোট বড় নানা আসরে মূকাভিনয় করতে বিচিত্র মেক-

রাণী করনা

আপ নিয়ে। চলতি জীবনের সাধারণ মানুষের অনেক সমস্যা সংকট দুঃখ আনন্দ যোগেশের নির্বাক মুখে আঁকা হয়ে গেছে। আজ এই শিল্প যোগেশ মাইম একাডেমির পাকাপাকি রূপ নেবার জন্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাধু প্রচেষ্টায় কালীঘাট পার্কের এক অংশে ভাবীকালের নিশানা টাঙ্গিয়ে রেখেছে। ট্রামবাসে যেতে আসতে সবাই রোজ দেখি। যোগেশ ও পদাবলীর সদস্যরা কলকাতার শিল্পরসিকদের ডাকছেন অর্থসাহায্য নিয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে।

প্রদীপ ঘোষ বাংলা ও ইংরেজিতে পরিচিতি দিয়ে জানালেন ক্ল্যাসিক ও লৌকিক ধারার মিশ্রণে ওড়িসি ভারতের প্রাচীন নৃত্যকলা।

রানী করনা ফুলের গয়না পরেছিলেন মণিবন্ধে কবরীতে। বেশভূষায় ছিল বসন্তরাসের স্পর্শ। সাবলীল ভঙ্গীতে এক একটি রচনায় নাচের রূপ দিচ্ছিলেন। মঙ্গলাচরণের ভক্তিরস দিয়ে শুরু। সাবেরী পল্লবী (শৃঙ্গার পল্লবী), অষ্টপদী ('চন্দনচর্চিত নীল কলেবর') ও দশাবতার স্তোত্র ('জয় জগদীশ হরে') প্রতিটি রচনাই মনোহর। রাণী করনার প্রণামের মুদ্রায় ভক্তি, কৃষ্ণলীলা ও রাসের ত্রিভঙ্গ ভাস্কর মূর্তির ভাঁজ, প্রেমপ্রকাশের সরস অনুভূতি—নাচ উপযোগী শরীরের ছন্দে অনুশীলন ও শিল্পবোধের ছাপ রেখে যাচ্ছিলেন শিল্পী। ভগবান কৃষ্ণের কূর্ম বরাহ ইত্যাদি অবতারের পৌরাণিক বর্ণনার রূপায়ণে নিখুঁত নৃত্যকলার পরিচয় দিয়েছেন এই সুন্দরী প্রতিভাময়ী শিল্পী। চোখ থেকে পা পর্যন্ত কোথাও কোনো জড়তা নেই। নাচের অলংকারকে ব্যবহার করতে জানেন রাণী করনা। গানগুলি সুগীত। ৪ মাত্রায় ও ১০ মাত্রায় সুবন্ধ একতাল ও ঝাঁপ-তালে পাকাহাতের পাখোয়াজ। মালকোশ বাগেশ্বরী দুর্গা সাবেরি ও রঞ্জন রাগের পদগুলির আরোহী অবরোহী স্বরের অনুসরণ করে বাঁশী ও সেতার বাজছিল। প্রাচীন মন্দির মন্দির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। মনে হচ্ছিল অনেক শতক অতীতে কোন এক সমুদ্র-তীর্থে বসে আছি।

সুরঙ্গমার চিত্রাঙ্গদা

'চিত্রাঙ্গদা' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি, 'সত্যের প্রথম উপক্রম সাজ-সজ্জায় বাহিরঙ্গে, বর্ণবৈচিত্র্যে—তারই আকর্ষণ অসংস্কৃত চিত্তকে করে অভিভূত। একদা উন্মুক্ত হয় সেই বাহিরাচ্ছাদন, তখনই প্রবুদ্ধ মনের কাছে তার পূর্ণ বিকাশ।' শিক্ষা ও অনুশীলনের প্রমাণ দিয়ে গত ১৭ এপ্রিলের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সদনে 'সুরঙ্গমা' কবির চিত্রাঙ্গদা সম্পর্কিত ঐ উক্তির অন্যথা করেন নি। অনেকবার অনেক সংস্থার 'চিত্রাঙ্গদা' দেখেছি। 'সুরঙ্গমা'র চিত্রাঙ্গদাও বৈশিষ্ট্যহীন নয়। সেদিনকার সুরমা অনুষ্ঠানটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি নাম। তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশারদ প্রাজ্ঞ সংস্কৃতিবান শৈলজারঞ্জন। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য গীতাভিনয়গুলি ভারতীয় ভাস্কর্য চিত্র-রীতির শিল্প গুণে নিটোল। অখণ্ড এদের রূপ। এদের ত্রিমাত্রিক শিল্প প্রকাশ সজীব ও চলিষ্ণু।

মঞ্চের তিন বিন্দুতে তিনটি সালংকার নক্সাচিত্র দ্যোতনাময়। ত্রুটি যে ছিল না তা নয়। অক্ষত রূপ শিল্প নন্দন লোকেই সম্ভব পৃথিবীতে নয়। এক। মঞ্চের অন্ধকার অংশ থেকে চিত্রাঙ্গদা অর্জুন সখীদের কণ্ঠস্বরকে নৃত্য শিল্পীদের দেহের ভাঁজে গড়িয়ে দিচ্ছিলেন। তাঁরা শিক্ষিত তবে অস্পষ্ট ভাষী। গানগুলি বহুশ্রুত। 'আমার পরাণ লয়ে' 'সকল ভাবনা ডুবানো ধারায় করিব স্নান' 'কী

মাধুরী সুগন্ধ বাতাসে যায় ভাসি'—এই চরণগুলির সুর স্বরলিপি কানে আসে, মর্মে প্রবেশ করে না তাদের কবিতা। ধ্বনি হয়, গান হয় না। আবৃত্তির বেলাতেও তাই। মাইকের সামঞ্জস্য সাধনের দুর্বলতা কি? দুই: 'কোন আলো লাগল চোখে'—পূর্ণিমা ঘোষের (প্রথম রূপে চিত্রাঙ্গদা) নৃত্য-মুদ্রণে ভঙ্গিমায় অনবদ্য। পূর্ণিমা স্থূলাঙ্গী, তবে নৃত্যপটীয়সী। চিত্রাঙ্গদার পুরুষোচিত দার্ঢ্য ফোটাতে তাঁর ভরতনাট্যম্ কথানুসারী অভিব্যক্তি নিখুঁত ভাস্কর্যে উজ্জ্বল। রূপকথার মত জনপ্রিয় 'রোদনভরা এ বসন্ত' গানটির পরিবেশনে শিল্পীরা লয়ের গোলমাল করেছেন: সঙ্গতকার খানিক সামাল দিয়েছেন। গানটি করুণ রসের। আক্ষেপানুরাগ অভিমানের জ্বালা নেই। 'অশান্তি আজ হানল'—এখানেও স্থায়ী ভাব করুণ। পূর্ণিমা যখন পাকসাট মেরে মালা ফুল ছিঁড়ে তাণ্ডবের আভাষ আনেন, তখন রসাভাস ঘটে। 'আমার এ রিক্ত ডালি'—এখানেও ধরতাই, লয়, গোলমেলে। বসন্ত আবাহন নৃত্যে কয়েক জোড়া পায়ে ঘুঙুরের তাল মিলছিল না সঙ্গতের দাগে দাগে।

তিন: অর্জুনে গোবিন্দন কুট্টি, নবরূপপ্রাপ্তা চিত্রাঙ্গদায় অনুরাধা শুধু নাচ দেখাননি, নাটরস ফুটিয়েছেন। গোবিন্দনের অর্জুন গোড়ার দিকে খানিক পুতুলনাচের মত। পরে রূপ-মোহ অশান্ত প্রেম অধীর ভাবনা ও বীর্যবত্তার পূর্ণ পরিণতির দিকে তিনি তাঁর নৃত্যাভিনয়কে শিল্পীর মহৎ গুণে পৌঁছে দিয়েছেন। মদনবেশী শুভাশিস চরিত্রানুগ সুনিপুণ। দস্যুভয়-ভীত গ্রামবাসীদের নৃত্য ছন্দ থেকে ব্যায়ামের কসরতের দিকে ঝুঁকেছে। তবলা ও খোল ছাড়া অন্য বাদ্যযন্ত্রের 'সাজেসশন' আমি পাইনি। গান আবৃত্তি স্বচ্ছতর হলে 'চিত্রাঙ্গদা'য় সুরসমার ভাবীকাল নির্মেঘ।

কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র

খেলা নিয়ে রাজনীতি দূর করব

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রি ডঃ প্রতাপ-চন্দ্র চন্দ্র আন্তর্জাতিক খেলার আসরে ভারতের প্রতাপ দেখতে চান। প্রতাপবাবু শিক্ষামন্ত্রকের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন আজ মাসখানেক। উনি ঠিক করেছেন ক্রীড়া প্রশাসন নিয়ে রাজনৈতিক ফুটবল খেলা বন্ধ করবেন। উনি চাইছেন—সারা ভারতের প্রতিটি কোণে কোণে 'জনতা' যেন খেলার সামিল হয়।

খেলাধূলার ব্যাপারে নতুন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী কি হবে তা জানার জন্য সেদিন হাজির হয়েছিলাম প্রতাপ-বাবুর নির্মল চন্দ্র স্ট্রীটের বাড়িতে ভোর ছটায়। ওর বৈঠকখানার বারান্দায় সেই সাতসকালেও শ'খানেক লোক তখন বসে। অত ভীড়ের মাঝেও আমার ডাক পড়ল কিছু সময় পর সবচেয়ে আগে। সবে স্নান সেরে এসে উনি সেদিনের ঠাসা প্রোগ্রাম শুরু করেছেন।

বিশাল ঘরটার চারপাশের দেওয়াল দেখতে পাচ্ছিলাম না। কাঁচের উঁচু আলমারির ভেতর থেকে শুষ্ক মলাটের আইনের বইগুলো উঁকি মারছিল। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল। প্রতাপবাবু জানলা বন্ধ করে চৌকির ওপর এসে বসেছিলেন।

আমি: ভারতের শিক্ষামন্ত্রি হিসেবে আপনি দেশের ক্রীড়ামন্ত্রিও। খেলাধূলার ব্যাপারে আপনি কি কি পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন?

প্রতাপবাবু: আমি মন্ত্রিত্ব পেয়েছি মাত্র কয়েকদিন। এরই মধ্যে সব কিছু খুঁটিনাটি দেখা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। শিক্ষা বিভাগ ছাড়াও খেলা এবং আরো দুটো দফতর আমার হাতে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এই মুহূর্তে শুধু খেলাধূলার ব্যাপারে কি করতে যাচ্ছি তা ডিটেলে বলা আমার পক্ষে সম্ভ নয়। তবে এটুকু বলতে পারি আমা কাছে ইতিমধ্যেই খেলা নিয়ে দলবাজি স্বজনপোষণ ইত্যাদি সম্পর্কে বহ অভিযোগ এসেছে। আমার প্রথম কাজ হবে এগুলো বন্ধ করা। খেলার মা রাজনীতিতে ছেয়ে গেছে। আমি তা দূ করতে চাই।

আমি: আপনি কি মনে করেন ন যে খেলাধূলায় ভারতের মান সন্তুষ্টি জনকে নয়?

প্রতাপবাবু: সে কথা আর বলা অপেক্ষা রাখে কি? ইন্টারন্যাশনা কম্পিটিশনে ভারতের পারফরমেন্সই বে বলে দেয় খেলার আসরে দেশের মা কত নীচু। এ প্রসঙ্গে বলতে পা আমাদের দেশে ট্যালেন্টের সদ্ব্যবহা হচ্ছে না দলাদলি, স্বজনপোষণ ইত্যাদি জন্য। দেশের প্রতিটি কোণ দে ট্যালেন্ট খুঁজে বার করে নিয়ে আসতে হবে এর জন্য চাই সার্বিক অংশগ্রহণ স্পোর্টস মাস্ট কাম টু দ্য লাইফ অ দ্য কমন পিপল। আমি দেখতে চা দেশের প্রতিটি লোক খেলাধূলায় সক্রি অংশগ্রহণ করুক। শুধু মাত্র দর্শ হিসেবেই তাঁরা যেন সন্তুষ্ট না থাকেন

আমি: কোন কোন গেমের ওপ জোর দিতে চান?

প্রতাপবাবু: আমাদের মত গরী দেশে সবাইকে খেলার মাঠে টেনে আনা গেলে ইনডিজেনাস গেমসের ওপর জো দেওয়াই উচিত। শুধুমাত্র আন্তর্জাতি খেলাধূলায় অংশ গ্রহণই খেলার মূ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। গ্রামে গ্রা খেলার প্রসার ঘটানোর জন্য ইনডি জেনা গেমগুলো মাধ্যম করা দরকার

আমি: আমাদের অভিযোগ ক্রী প্রশাসনে জড়িয়ে আছেন এমন একশ্রেণী কর্মকর্তাদের জন্য খেলাধূলার উন্ন হচ্ছে না। এ সম্পর্কে আপনার মন্ত কি?

প্রতাপবাবু: এই অভিযোগ আমার কাছে আসেনি তা নয়। ব্যাপার খুঁটিয়ে না দেখে মন্তব্য করা উচিত নয়। শুধুমাত্র বিদেশ ভ্রমণের জন্য কিছু কর্মকর্তা পা বাড়িয়ে থাকেন। আমার লক্ষ্য থাকবে ভারত বিদেশে কোন খেলায় অংশ নিতে গেলে টিমের সঙ্গে ভ্রমণেচ্ছু কর্মকর্তারা যাতে না যেতে পারেন। তাছাড়াও আমি চাই নিছক অংশ নেবার জনাই ভারত যেন বিদেশে প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় না যায়।

আমি: খেলার মান কিভাবে উন্নত করা সম্ভব—এ সম্পর্কে আপনার মত কি?

প্রতাপবাবু: আগেও বলেছি খেলুড়েদের উৎস ব্যাপক না হলে খেলার মান বাড়তে পারে না। কিভাবে এই উৎস বাড়ানো যায় এ সম্পর্কে

মনের মাসের প্রথম সপ্তাহে ব্যবস্থা ব। একটি পরিষ্কার জাতীয় ক্রীড়া-নীতি থাকা দরকার। নীতি নির্ধারণের াগে অবশ্য প্রাক্তন খেলোয়াড়, কর্ম-র্তা এবং সাংবাদিকদের মতামত নেব। তমধ্যেই 'স্নাইপসে'র (সোসাইটি ফর ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ ফিজিক্যাল ড্রুকেশন এ্যান্ড স্পোর্টস) কাঠামো দলে ফেলেছি। আগের চেয়ারম্যান দ্যাচরণ শুক্লার জায়গায় এসেছেন াবিনেট মিনিস্টার সিকান্দার বক্ত, নি আবার হকিও খেলেছেন ভারতের র।

আমি : খেলাধুলার মান নীচু ন—এ সম্পর্কে তদন্তের জন্য পূর্ব-ন সরকার লোকসভার সদস্যদের নিয়ে কটি কমিটি তৈরী করেছিলেন। সেই মিটি বিভিন্ন ক্রীড়াসংস্থার সঙ্গে থাও বলেছিলেন যদিও তার রিপোর্ট াজও প্রকাশিত হয়নি। জনতা সরকার রকম কোন তদন্ত কমিটি গঠনের য়োজনীয়তার কথা ভাবছে কি?

প্রতাপবাবু : (মৃদু হাস্যে) যদি কার হয় তাহলে আরেকটি পার্লা-ন্টারী এনকোয়ারী কমিটি বসানোর ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছি না; ন্ত পরিস্থিতিটা মাথায় না নিয়ে ছু ভাবতে পারছি না।

আমি : আরেকটি ব্যাপারে পনাকে অবহিত করতে চাই—সেটা লা, পশ্চিম বাংলায় ন্যাশনাল ইন্স-টিউট অফ স্পোর্টসের কোন শাখা ই। অথচ খেলাধুলা এই অঞ্চলে াচেয়ে জনপ্রিয়। এখানকার খেলোয়াড় কোচরা পাতিয়ালা বা বাঙ্গালোরে গিয়ে ক্ষাক্রম নিতে অসুবিধে বোধ করে। ধু বাংলার নয় সমগ্র পূর্বাঞ্চলের ক্ষ আপনার কাছে অনুরোধ যাতে পনি মন্ত্রিত্বে থাকার সময়ই খানে এন, আই, এসের মতো প্রতি-ন আমরা পাই।

প্রতাপবাবু : এ ব্যাপারে আমার াজাসুজি বক্তব্য খেলাধুলার ক্ষেত্র ঞ্চলিক অসাম্য আমি দূর করব। শের প্রতিটি অঞ্চল যেন খেলার সমান যোগ পায়। এন, আই, এস শুধুমাত্র র্বাঞ্চলেই নয় অন্য অঞ্চলগুলোতেও ত স্থাপিত হয় তার দিকে দৃষ্টি ব।

আর একটা কথা খেলাধুলার পারে আপনারা—সাংবাদিকরা অনেক জিখবর রাখেন। কোথাও অন্যায় বিচার ঘটলে অবশ্যই আমাকে নাবেন। চেষ্টা করব যাতে দেশের ক খেলাধুলার ব্যাপারেও ন্যায্যবিচার য়।

রূপক সাহা

শিবপুর ইনস্টিটিউটের ক্রিকেট দল এই মরশুমে দ্বিতীয় বিভাগীয় ক্রিকেটের নিম্নকুট বিজয়ী হওয়ার প্রথম বিভাগীয় লীগে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করে।

ব্যানারম্যানের সেঞ্চুরী

ইতিহাসের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ আরম্ভ হয়েছিল ১৮৭৭ খৃস্টাব্দের ১৫ মার্চ, দুপুর একটায়। অনুষ্ঠানকেন্দ্র রিচমন্ড প্যাডক, উত্তরকালে যেটি মেলবোর্ণ ক্রিকেট মাঠে রূপান্তরিত হয়। মেলবোর্ণের মতো বিশালকায় ক্রিকেট মাঠ সারা দুনিয়ায় আর একটিও নেই। নয় নয় করে আশী হাজার থেকে এক লক্ষ দর্শক এই মাঠে বসে ক্রিকেট দেখতে পারে। ১৯৫৬ সালে এই মাঠটিই বিশ্ব ওলিম্পিক ক্রীড়ার মূল অনুষ্ঠান কেন্দ্রের রূপ নিয়েছিল।

তবে প্রথম টেস্টের উদ্বোধন লগ্নে রিচমন্ড প্যাডকে বিশেষ ভিড় জমেনি। কুল্লে হাজার খানেক মানুষ। তবে তিন দিনের খেলা উপলক্ষে ভিড় ক্রমশঃই বাড়তে থাকে এবং শেষ দিনে বারো হাজার দর্শকের ঠাসাঠাসিতে মাঠের ফাঁক-ফোকর ভর্তি হয়ে যায়। ভিড়ের মাঝে সুবেশ রমণীর সংখ্যাও নেহাৎ কম ছিল না।

লিলি হোয়াইটকে টসে হারিয়ে অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক ডেভ গ্রেগরি নিজের দলকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠালে চার্লস ব্যানারম্যান টেস্ট ক্রিকেটের প্রথম বলটি খেলার সুযোগ পান। টেস্ট ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে ওই আসরে সর্ব-প্রথম সেঞ্চুরি করেও ব্যানারম্যান ইতিহাসে তাঁর আসন পাকা করে নেন। শুধু সেঞ্চুরি করাই নয়, ব্যানারম্যান প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে অপরাজিতই থেকে যান।

টেস্টে আবির্ভাব ঘটিয়ে ব্যানারম্যান হয়তো ডাবল সেঞ্চুরি করতে পারতেন। যদি না দ্বিতীয় দিনে উলেটের একটি জোর বলে তাঁর আঙুলের একটি হাড় ভেঙে যেতো। তখন তাঁর ব্যক্তিগত রাণ ১৬৫। তার আগে পর্যন্ত তাঁকে ধরে-বেঁধে রাখা ইংলন্ডের পেশাদার খেলোয়াড়-দের পক্ষে অসাধ্য হয়ে পড়েছিল। স্বচ্ছন্দে, যথেচ্ছ পিটিয়ে খেলতে খেলতে ব্যানারম্যান সেবার দর্শকদের চোখ দিয়ে-ছিলেন ধাঁধিয়ে। দলের আর কেউই কুড়ির ঘুড়ি পর্যন্ত ছুঁতে পারেন নি। ব্যানারম্যান একাই যেন একটি দল। মোট সংগ্রহের শতকরা প্রায় উনসত্তর ভাগই ছিল তাঁর অধিকারে।

আশ্চর্য এই যে টেস্ট ক্রিকেটে এমন সোরগোলের সাড়া জাগিয়ে তুললেও চার্লস ব্যানারম্যান আর কোনো খেলাতেই, টেস্ট অথবা প্রথম শ্রেণীর আসরে, সেঞ্চুরি করতে পারেন নি। তাঁর নবাবীপনা ওই একটি মুহূর্তে। আরও মজার কথা, জন্মসূত্রে ব্যানারম্যান ছিলেন ইংরাজ। কিন্তু প্রথম টেস্টের ঐতিহাসিক লগ্নে এই প্রবাসী ইংরাজ মাতৃভূমির কী শত্রুতাই না করে গেলেন। মূলতঃ তাঁর চেষ্টাতেই অস্ট্রে-লিয়ার প্রথম ইনিংসে রাণ ওঠে ২৪৫। যার জবাবে ১৯৬ তুলতেই ইংলন্ডের প্রথম ইনিংস মুড়িয়ে যায়।

ব্যাট হাতে ব্যানারম্যান প্রথম ইনিংসে ইংলন্ডের যে শত্রুতা করেছিলেন, অবিকল সেই পথই অনুসরণ করেন বল হাতে বিলি মিডউইথার। কী আশ্চর্য, মিডউইথারেরও জন্ম খাস ইংলন্ডেই। অথচ পাঁচ পাঁচজন ইংলন্ডীয় ব্যাটসম্যানকে অল্প রাণে তাঁবুতে ফিরিয়ে দিতে তাঁর স্বজাত্যবোধে বাধে নি।

দ্বিতীয় ইনিংসে খেলা আরও জমে ওঠে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় ক্ষুরধার। ভাঙা আঙুলে ব্যান্ডেজ জড়িয়ে মাঠে নামলে কী হবে, ব্যানারম্যানকে এবার মাত্র চার করেই ফিরতে হয়। অমন শক্ত খুঁটি নড়ে যাওয়ার পরিণামও হয় ভয়ংকর। অস্ট্রেলীয় ইনিংসে নামে ধস। মাত্র ১০৪এ-তেই দ্বিতীয় দফা গয়া।

শেষ দিনে ইংলন্ড যখন আবার ব্যাট করতে নামে তখন জয়ের জন্যে প্রয়োজন ১৫৪ রাণ। সব কজনের সামর্থ্য মিলিয়ে কিঞ্চিদধিক দেড়শ রাণ সংগ্রহ করা এমন কিছু কঠিন কাজ ছিল না। বিশেষতঃ যখন লিলি হোয়াইটের দলে ছিলেন নামী নামী পেশাদারেরা। কিন্তু দৃশ্যতঃ যে কাজ ছিল সহজসাধ্য সেই কাজই অসাধ্য হয়ে গেল টম কেনডেলের সবিক্রম প্রত্যাঘাতে।

টম কেনডল ছিলেন ন্যাটা ফাস্ট মিডিয়াম বোলার, জন্ম-কর্মসূত্রে খাঁটি অস্ট্রেলীয়। হঠাৎ এক উজ্জীবিত মূর্তি ধরে কেনডল বলে বলে ইংলন্ডীয় প্রতিনিধিদের নিধন করতে থাকলে ১০৮ রানেই ইংলন্ডের দ্বিতীয় ইনিংস খতম হয়ে যায়। এবং অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্ট জেতে ৪৫ রানের ব্যবধানে।

টম কেনডল দ্বিতীয় ইনিংসে এক রকম বিনা বিশ্রামেই ৩৩-১ ওভার বল করে সাতজনকে ফিরিয়ে দিলেন মাত্র ৫৫ রাণে। অথচ প্রথম ইনিংসে তিনি একটির বেশি দুটি উইকেটও নিজের ব্যাগে পুরতে পারেন নি। আরও উল্লেখযোগ্য যে, উত্তরপর্বে ক্রিকেটের আর কোনো বড় আসরে কেনডলের অস্তিত্ব খুঁজেও পাওয়া যায় নি। এক হিসেবে তাঁর ও চার্লস ব্যানারম্যানের ক্রীড়া জীবন যেন সমান্তরাল রেখা ধরেই এগিয়েছিল এবং ফুরিয়েও গিয়েছিল অনুরূপভাবে।

তবে উত্তর ইতিহাসে ব্যানারম্যান ও টম কেনডলের সন্ধান আর না পাওয়া গেলেও টেস্ট ক্রিকেটের আদি পর্বে তাঁরাই ছিলেন অবিসম্বাদী নায়ক। এক নায়ক ব্যানারম্যানের সম্মান মূল্য ধরে দিতে খেলা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই রিচমন্ড প্যাডকের দর্শকদের সামনে টুপী পেতে অর্থ সংগ্রহের তোড়জোড় পড়ে যায়। তাৎক্ষণিক এই চেষ্টায় যা কিছু সংগ্রহ হয় তা থেকে ৮৭ পাউন্ড ৭ শিলিং ৬ পেন্স ব্যানারম্যানকে এবং ২৩ পাউন্ড ৫ শিলিং তুলে দেওয়া হয় কেনডলের হাতে। কৃতজ্ঞ দেশবাসীর এই পুরস্কার ছিল আবেগসিঞ্চিত। সে দিনের হিসেবে অর্থমূল্যই কম ছিল না। যেহেতু মাত্র আধ পেনি উপুড় হস্ত করলেই তখনকার দিনে প্রমাণ সাইজের বিয়ার পাওয়া যেতো।

ভিক্টোরিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন বিজয়ী দলের প্রত্যেককে একটি করে খাঁটি সোনার পদক উপহার দিয়েছিলেন। দলপতি ডেভ গ্রেগরির ভাগ্যে জুটেছিল কিঞ্চিৎ বৃহদাকার স্বর্ণপদক—ওজনে ও দামে যা ছিল আরও ভারি।

বলাবাহুল্য যে প্রথম টেস্টে সাফল্যের পর সারা অস্ট্রেলিয়ায় নিরন্তর আনন্দ প্রবাহ বয়ে চলেছিল। জনমানসে এসেছিল উৎসবের আমেজ। আর সেই মেজাজকে ধরে রাখতে সিডনীর দৈনিক 'দ্য ডেইলি নিউজ'এ লেখা হয় 'এতোদিন বিশ্ব ক্রিকেটে ইংলন্ডই ছিল উত্তম পুরুষ। কিন্তু আজ পালের হাওয়া ঘুরে গেছে।'

অজয় বসু

বিশ্ব টেবল টেনিস

বার্মিংহামে সদ্য সমাপ্ত ৩৪তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার আসরে খেতাব জয়ের সূত্রে এশিয়া মহাদেশের মুখোজ্জ্বল করেছে চীন, উত্তর কোরিয়া এবং জাপান। প্রতিযোগিতায় মোট বিভাগ ছিল সাতটি—দলগত বিভাগ দুটি এবং ব্যক্তিগত বিভাগ পাঁচটি। প্রতিযোগিতার সাতটি বিভাগের ৬টিতে খেতাব জয়ী হয়েছে এশিয়া মহাদেশেরই এই তিনটি দেশ—চীন ৪টি (এর মধ্যে মেয়েদের ডাবলসে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে যুগ্ম-বিজয়ী), উত্তর কোরিয়া ২টি এবং জাপান ১টি। বাকি খেতাবটি পেয়েছে ফ্রান্স (মিক্সড ডাবলসে)। আর এক দিক থেকে এশিয়ার সাফল্য উল্লেখ করার মত। সাতটি বিভাগেরই ফাইনালে খেলেছিল এশিয়ার খেলোয়াড়রা এবং এই ৬টি বিভাগের ফাইনালে শুধু এশিয়ার খেলোয়াড়রাই খেলেছিল—সোয়েথলিং কাপ, করবিলন কাপ, এবং পুরুষ ও মেয়েদের সিঙ্গলস ও ডাবলসের খেলায়। মিক্সড ডাবলসের ফাইনালে জাপানের খেলোয়াড়দের হারিয়ে ফ্রান্স একারের আসরে এশিয়া মহাদেশের একচ্ছত্র আধিপত্য খুব জোর রোধ করে। ফলে ইউরোপের কিছুটা মুখরক্ষা হয়। এবারের আসরে চীনের সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রতিযোগিতার মোট সাতটি বিভাগের মধ্যে চীন ছটি বিভাগের ফাইনালে খেলে তিনটিতে এককভাবে খেতাব জয়ী হয়। মেয়েদের ডাবলসে তারা উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে যুগ্মভাবে খেতাব পায়। তাছাড়া পুরুষদের ডাবলসে চীনেরই খেলোয়াড়রা পরস্পরের সঙ্গে খেলে অসাধারণ নজির সৃষ্টি করে।

গতবার অর্থাৎ ১৯৭৫ সালে কলকাতার ৩৩তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার আসরে খেতাব জয়ী দেশ এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে এবারেও খেতাব জয়ী হয়েছে দুই দলগত বিভাগে চীন এবং মেয়েদের সিঙ্গলসে উত্তর কোরিয়ার পাক ইয়ং সুন। গতবারের মত এবারও পাক ইয়ং সুন মেয়েদের সিঙ্গলস ফাইনালে চীনের চ্যাং লীকে পরাজিত করেন। পাক ইয়ং সুনের উপর্যুপরি দুবার মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, ১৯৫৭ সালের পর মেয়েদের সিঙ্গলসে উপর্যুপরি দুবার খেতাব জয়ের নজির এই প্রথম সৃষ্টি হল। এবার পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন জাপানের মিৎসুরু কোনো। দশ বছর আগে স্টকহমের বিশ্ব টেবল টেনিস খেলার আসরে তিনি ফাইনালে পরাজিত হয়েছিলেন স্বদেশেরই খেলোয়াড় নোবুহিকো হাসেগাওয়ার কাছে। গতবার অর্থাৎ ১৯৭৫ সালে কোনো সেমিফাইনাল পর্যা খেলেছিলেন। সুতরাং কোনো এবারে এই সিঙ্গলস খেতাব জয় নিঃসন্দে বিশ্ব টেনিস খেলার আসরে এক স্মরণ প্রত্যাবর্তনের নজির।

বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিত আসরে এক সময় ইউরোপের সুদী একটানা প্রাধান্য ছিল। প্রতিযোগিত সূচনা ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৫১ সা পর্যন্ত (মাঝে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে জন্যে ৭ বছর খেলা বাদ ছিল) একটা ১৮টি বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগি তার আসরে ইউরোপের অন্তর্ভুক্ত দে গুলি অটুট প্রাধান্য বিস্তার করেছিল এই সময়ের মধ্যে ইউরোপের বাইরের দে হিসাবে ৯টি খেতাব জয়ী হয়েছি একমাত্র আমেরিকা। ১৯৫২ সা জাপানের চারটি খেতাব জয়ের এশিয়া মহাদেশের প্রাধান্যের সূচনা হয়। বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতি যোগিতার আসরে এশিয়া মহাদেশে পক্ষে জাপান এবং চীনের খেতাব জয়ে নজিরই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত জাপান ১৫ আসরে যোগদান করে মোট ১০৫ খেতাবের মধ্যে ৪৭টি খেতাব জয় হয়েছে—সোয়েথলিং কাপ ৭ বার, ক

বিলন কাপ ৮ বার, পুরুষদের সিঙ্গলস ৮ বার, মেয়েদের সিঙ্গলস ৭ বার, পুরুষদের ডাবলস ৪ বার, মেয়েদের ডাবলস ৬ বার (এর মধ্যে দুবার রুমানীয়ার সঙ্গে যুগ্মবিজয়ী) এবং মিকসড ডাবলস ৭ বার। জাপানের এই কয়েকটি বিশ্ব রেকর্ড আজও অক্ষুণ্ণ আছে : মেয়েদের দলগত বিভাগে সর্বাধিক করবিলন কাপ জয় (৮ বার), উপর্যুপরি সর্বাধিক বার সোয়েথলিং কাপ জয় হাঙ্গেরীর সমান ৫ বার) এবং করবিলন কাপ জয় (৪ বার) এবং একই বছরে সোয়েথলিং ও করবিলন কাপ জয় (৪ বার)। তাছাড়া জাপান ১৯৫৯ ও ১৯৬৭ সালে ৬টি করে (মোট সাতটির মধ্যে) খেতাব জয়ের সূত্রে একই বছরের আসরে সর্বাধিক খেতাব জয়ের বিশ্ব রেকর্ড করেছে।

চীন বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় প্রথম অংশ গ্রহণ করে ১৯৫৯ সালে। চীন এ পর্যন্ত ৮টি আসরে অংশ গ্রহণ করে ৫৬টি খেতাবের মধ্যে ২৫টি খেতাব জয়ী হয়েছে— সোয়েথলিং কাপ ৮বার, করবিলন কাপ ৩ বার, পুরুষদের সিঙ্গলস ৫ বার, মেয়েদের সিঙ্গলস ১ বার, পুরুষদের ডাবলস ৩ বার (এর মধ্যে একবার যুগ্মবিজয়ী) এবং মিকসড ডাবলস ২ বার।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিংগলস : মিৎসুরু কোনো (জাপান) ১৭-২১, ২১-৯, ২১-১৯ ও ২১-১৩ পয়েন্টে চীনের এক নম্বর খেলোয়াড় কুয়ো ইয়াও-হুয়াকে পরাজিত করেন।

মেয়েদের সিংগলস : পাক ইয়ং সুন (উত্তর কোরিয়া) ২১-১৫, ২৪-২২ ও ২২-২০ পয়েন্টে চ্যাং লীকে (চীন) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : লি চেন-সি এবং লিয়াং কো-লিয়াং (চীন) ১২-২০, ২১-১৮ ও ২১-১১ পয়েন্টে স্বদেশের লিয়াং হুয়াং এবং লু-উয়ান-সেংকে পরাজিত করেন।

মেয়েদের ডাবলস : পাক ইয়ং ওক (উত্তর কোরিয়া) এবং ইং ইয়াং (চীন) পরাজিত করেন সিয়ান উন চু এবং লী চ ওয়েকে (চীন)।

মিকসড ডাবলস : সেকরেটিন এবং কুড বারগারেট ২১-১৭, ২১-১৪ ও ২১-১৭ পয়েন্টে টোকিও টাসাকো এবং সাচিকো ওকোটোকে (জাপান) পরাজিত করেন।

জাতীয় ক্রিকেট

দিল্লির ফিরোজ শাহ কোটলা মাঠে ৪৩তম জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাই ১২৯ রানে দিল্লিকে হারিয়ে ২৭ বার রঞ্জি ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এই নিয়ে বোম্বাই ২৮ বার ফাইনালে খেলে ২৭ বার জাতীয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ান হল। অপরদিকে দিল্লির পক্ষে এই প্রথম ফাইনাল খেলা।

এবারের ফাইনালে বোম্বাই দলের নেতৃত্ব করেন সুনীল গাভাস্কার এবং দিল্লি দল পরিচালনা করেন বিষেণসিং বেদী।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

বোম্বাই : ৩১৭ রান (অশোক মানকাদ ৭৩, ট্যান্ডন ৬১ এবং ঘাউড়ি ৪৮ রান। বেদী ৯৮ রানে ৪ এবং মদনলাল ৫৬ রানে ৩ উইকেট)
ও ২২৪ রান (মানকাদ ৪৫ এবং কার্বন ঘাউড়ি নট-আউট ৭০ রান। বেদী ৯০ রানে ৫ এবং চৌহান ১৩ রানে ২ উইকেট)

দিল্লি : ২৯১ রান (সুরিন্দর অমরনাথ ৮১, মদনলাল ৪১, খান্না ৩৯ এবং শুক্লা নট-আউট ৩২ রান। ঘাউড়ি ১০৫ রানে ৬ এবং শিভালকার ৯২ রানে ৪ উইকেট)
ও ১২১ রান (এস অমরনাথ ৩২ রান। ঘাউড়ি ৩২ রানে ২ এবং শিভালকার ৫৫ রানে ৬ উইকেট)

ফাইনালে বোম্বাইয়ের জয়-পরাজয়

জয় ২৭ বার : ৭ বার রাজস্থানের বিপক্ষে, ৪ বার বাংলার বিপক্ষে, ৩ বার হোলকারের বিপক্ষে, ২ বার করে মাদ্রাজ এবং মহীশূরের বিপক্ষে এবং একবার করে নর্দার্ণ ইন্ডিয়া, বরোদা সার্ভিসেস, হায়দরাবাদ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, বিহার এবং দিল্লির বিপক্ষে।

পরাজয় ১ বার : ১৯৪৮ সালে হোলকারের বিপক্ষে ৯ উইকেটে।

বোম্বাইয়ের রেকর্ড

রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতায় বোম্বাই দলের এই রেকর্ডগুলি আজও অক্ষুণ্ণ আছে : (১) সর্বাধিকবার ফাইনালে খেলা (২৮ বার), (২) সর্বাধিকবার রঞ্জি ট্রফি জয় (২৭ বার) এবং (৩) উপর্যুপরি সর্বাধিকবার রঞ্জি ট্রফি জয় (১৫ বার—১৯৫৯ থেকে ১৯৭৩)

রঞ্জি ট্রফি বিজয়ী দল

এপর্যন্ত এই দশটি দল এইভাবে রঞ্জি ট্রফি জয়ী হয়েছে : বোম্বাই ২৭ বার, বরোদা ৪ বার, হোলকার ৪ বার, মহারাষ্ট্র ২ বার এবং একবার করে নওনগর, হায়দরাবাদ, বাংলা ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া, মাদ্রাজ (বর্তমানে তামিলনাড়ু) এবং মহীশূর (বর্তমানে কর্ণাটক)।

দর্শক

করুণাশংকরের যাদু

একটা টেবিলের এক পাশে আমি। আমার মুখোমুখি বসে আছেন গৌরবর্ণ নাতিদীর্ঘ সুনয়ন এক তরুণ। দেখলে মনে হয় তিরিশ পৌঁছতে এখনও বাকি গোটা দুই মধুমাস। আসল বয়স চল্লিশ। হাওড়ার ছেলে করুণাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় এখন খ্যাতনামা যাদুকর করুণাশঙ্কর। সদ্য ফিরেছেন অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে—সেখানে ম্যাজিকের কারিকুরি দেখিয়ে তাক লাগিয়েছেন হাজার হাজার দর্শককে। খবরের কাগজে বিস্তর প্রশস্তি।

চোখে মুখে কথা বলেন। কেবল কথার যাদুতেই মোহাবিষ্ট করতে পারেন সমবেত জনমণ্ডলীকে। ইংরাজি ছাড়াও ফরাসী ভাষায় কথা বলতে পারেন মাতৃভাষার মতোই।

কথা বলতে বলতে, সিগারেট খেতে খেতে অনায়াস ভঙ্গীতে দেখাতে পারেন তাসের রকমারি খেলা। দেখালেনও। হাতের মুঠোয় রুহিতনের নওলা ফুসমন্তরে হয়ে গেল ইস্কাবনের দহলা।

নয়াদিল্লির একটি বাণিজ্যিক সংস্থায় উঁচু পদে কাজ করেন। বিবাহিত। একটি পুত্র সন্তানের জনক করুণাশঙ্কর ম্যাজিক দেখাচ্ছেন ২০ বছর। কোন গুরুর কাছে নাড়া বাঁধেননি। পৈতৃক সূত্রে ম্যাজিকের প্রতি টান ছোটবেলা থেকেই। বাবা ডাক্তার। তিনি ছিলেন শখের ম্যাজিসিয়ান। বাবার কাছেই হাতে খড়ি। দাদা একজন নামী তান্ত্রিক। যোগাভ্যাস শিখেছেন তাঁর

কাছেই। যাদুর খেলায় যোগাভ্যাস খুব জরুরি। পরবর্তীকালে করুণাশঙ্কর খ্যাতিমান যাদুকরদের খেলা দেখেছেন শিক্ষার্থীর চোখ দিয়ে। বই পড়েছেন বিস্তর। সরঞ্জাম কিনেছেন। একলব্যের সাধনায় শেষ পর্যন্ত নিজেই যাদুকরের নামভূমিকায়।

ম্যাজিসিয়ান করুণাশঙ্করের অনেক কীর্তি। তিনিই প্রথম বাঙালী যাদুকর যিনি নিয়মিত দিল্লির অশোকা হোটেলে ফ্লোর শো দেখিয়ে থাকেন। ফ্লোর শো বড় কঠিন। খুব পাকা খেলোয়াড় না হলে ফ্লোর শো দেখানোর সাহস পান না কেউ। করুণাশঙ্কর সাহসের সঙ্গে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন। প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে একাধিকবার বিদেশী অভ্যাগতদের মনোরঞ্জনের জন্য ডাক পড়েছে করুণাশঙ্করের। কলকাতাতেও শো করেছেন নিয়মিত ১৯৬৮-৬৯ সালে ম্যাকসিম-এ। নিমিত যাদুশিল্পী দিল্লির টেলিভিশনের।

অস্ট্রেলিয়া সরকারের আমন্ত্রণে সম্প্রতি যাদু দেখিয়ে এলেন সিডনি থেকে। বিদেশে খেলা দেখিয়েছেন এর আগেও—নেপালে, সিঙ্গাপুরে। আমন্ত্রণ এসেছে ওয়ালর্ড ইউনিভার্সিটি সার্ভিস থেকে। পৃথিবীর প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাদুর খেলা দেখাবেন। নিমন্ত্রণ এসেছে নিউজিল্যান্ড থেকে, ফিজি থেকে। এখন ম্যাজিসিয়ান করুণাশঙ্কর দারুণ ব্যস্ত শিল্পী

কথায় কথায় বললেন, ভারতীয় যাদু-শিল্পের প্রতি বিদেশীদের আগ্রহের শেষ নেই। যেখানেই খেলা দেখাতে গিয়েছি, সর্বত্র আসন পূর্ণ। খবরের কাগজেও যাদুকরদের জন্য জায়গা দেওয়া হয় অনেকখানি।

অমিতাভ চক্রবর্তী

দর্শক তৈরি করা দরকার

কয়েক বছর আগে ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের তৎকালীন সভাপতি শ্রী বি কে করঞ্জিয়া এই কলকাতার রিৎজ হোটেলে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছিলেন — 'অনতিবিলম্বে কলকাতায় আর্ট থিয়েটার চালু করতে এফ এফ সি বদ্ধপরিকর।' তিনি এও বলেছিলেন, মধ্য কলকাতায় একাধিক প্রেক্ষাগৃহের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। সেই আলোচনা ফলপ্রসূ না হলে জায়গা কিনে নতুন হলই তৈরি করে নেবেন এফ এফ সি।

ঐ সাংবাদিক সম্মেলনের দু' বছর বাদে আবার করঞ্জিয়া সাহেব এসেছিলেন কলকাতায়। ইতিমধ্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রতিশ্রুত আর্ট থিয়েটারের কোনো সংবাদ আর আমাদের কানে আসেনি। দ্বিতীয়বারও তিনি এই প্রতিশ্রুতি শুনিয়ে গেলেন সকলকে। বাড়তি আরও একটি প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল তাঁর কাছ থেকে। এই কলকাতায় অনতিবিলম্বে এফ এফ সি-র শাখা অফিস খোলা হবে।

পরবর্তী দু' বছরেও এই দু'টি প্রতিশ্রুতির কোনো নীট ফল সম্ভবতঃ চোখে পড়ল না কারও। এফ এফ সি-র একটি 'নামকোয়াস্তে' শাখা অফিস অবশ্য ফিল্ম সেন্সর বোর্ডে খোলা হলো বটে, কিন্তু সেটি মূলতঃ ছিল ঋণ আবেদনের দরখাস্ত গ্রহণের ঠিকানা মাত্র। আর আর্ট থিয়েটার ?

সে তো তখন আকাশকুসুম কল্পনা।

ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের নিজ ঋণদানে তৈরি প্রায় কুড়িখানি ছবি তো এখন পর্যন্ত তার ঘাড়েই চেপে আছে। উপরন্তু আমদানি-করা প্রায় খান-পঞ্চাশেক ছবির ভবিষ্যৎ এখনও প্রায় অনিশ্চিত।

এমতাবস্থায় সারা দেশ জুড়ে যেখানে অন্ততঃ কুড়িটি আর্ট থিয়েটারের প্রয়োজন সেখানে এফ এফ সি-র মত একটি সরকারি সংস্থা একটি প্রেক্ষাগৃহও যোগাড় করতে পারেননি গত চার-পাঁচ বছরে।

অথচ পরীক্ষামূলক সৎ ছবি করার প্রচেষ্টাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন এফ এফ সি। এই জন্যে খরচ হয়েছে দু' কোটি টাকার মত। মণি কাউল, কুমার সাহানি, রাজ-মারবেরাস, কান্তিলাল রাঠোরকে ছবি করার জন্য অকৃপণ হাতে টাকা দিয়েছেন এফ এফ সি, কিন্তু ছবিগুলো যে কিভাবে বাক্স থেকে বন্দীত্ব ঘুচিয়ে পর্দায় ফুটে উঠতে পারে, তার কোনো গঠনমূলক চেষ্টা নজরে পড়েনি আমাদের।

দিনে দিনে এভাবে 'ব্যাড ডেট' বেড়েছে এফ এফ সি-র। সৎ উদ্দেশ্যমূলক ছবি দিয়ে দর্শক-রুচিতে পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টায় কুঠারাঘাত পড়ল গোড়াতেই। ছবিগুলি মুক্তি না পেলে দর্শকের রুচি পরিবর্তন হবেটা কি করে ?

যাই হোক যা হবার তা তো হয়েছেই।

অতি সম্প্রতি এফ এফ সি অবশ্য সেই বহু-প্রতিশ্রুত বহু-আকাংক্ষিত আর্ট থিয়েটার তৈরির পরিকল্পনায় প্রথম পদক্ষেপটি রেখেছেন। মধ্য কলকাতার মেট্রো প্রেক্ষাগৃহটি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে। এবং পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পড়েছে এফ এফ সি-র ওপর। এতদিনে ছবির প্রদর্শনী ব্যবসায়ে আসতে পেরে এফ এফ সি যেমন আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন, বাংলা ছবির জগৎ, কলকাতার চিত্রমহলও সমান খুশী। শহরের সবচাইতে ভাল প্রেক্ষাগৃহটি সরকারি নিয়ন্ত্রণে এলো—এটা তো নিশ্চয়ই আনন্দ সংবাদ।

আনন্দ সংবাদ আরও এই কারণে যে, এবার হয়তো মেট্রোর পর্দায় অ্যানা রে'নের **স্ট্যাভিস্কি**; জর্জ ফ্যানজুর **ম্যান উইদাউট ফেস**, জন শেলসিংগারের **এ কাইন্ড অব লাভিং**, সিডনি লুমেৎ-এর **মারডার ইন দি ওরিয়েন্ট একসপ্রেস** কিংবা কর্লে লিভ্জানির **দি লাস্ট ব্যাটল** ছবিগুলি ফুটে উঠবে এবং বহু-বিতর্কিত-আলোচিত মণি কাউলের **উসকি রোটি**, **দুভিধা**, **আষাঢ় কা একদিন**; কুমার সাহানির **মায়াদর্পণ**, প্রেম কাপুরের **বদনাম বস্তি**, রাজ মারবেরাসের **ত্রিসন্ধ্যাও আলো দেখবে** আর্ক কার্বনের।

যাই হোক, ছবি নির্বাচনের নীতি ও শর্তাবলী সম্পর্কে জানার জন্য মেট্রোয় এফ এফ সি-র প্রতিনিধি শ্রীযশোবন্ত নিংসুরের সঙ্গে যোগাযোগ করায় তিনি বললেন—'টার্মস এন্ড কন্ডিশনস্ আপাততঃ আগের মতই থাকছে। কোনো পরিবর্তন করতে হলে তা বোর্ড অফ ডিরেকটর্সের মিটিংয়েই হবে।' ছবি নির্বাচনের পলিসি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য—'সৎ রুচিপূর্ণ আনন্দদায়ক ছবিই বাছার চেষ্টা হবে। সেই সঙ্গে পরীক্ষামূলক চরিত্রের ছবিও যাতে রিলিজ পেতে পারে সে-চেষ্টাও চলবে।'

ইতিমধ্যে তাঁর কাছে বহু আবেদন আসছে বাংলা ছবির জন্য। তিনি সেগুলি বিচার-বিবেচনা করছেন। বাংলা ছবির নিয়মিত প্রদর্শনী হবে কিনা প্রশ্ন করতে শ্রীনিংসুরে বললেন—'একমাত্র বাংলা ছবিই চলবে—এটা বলা যাচ্ছে না। কারণ, এফ এফ সি-র নিজের হাতেই প্রচুর ছবি রয়েছে। সেগুলোকেও তো একে একে মুক্তি দিতে হবে।' তবে বাংলা ছবি যাতে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা পায়, সেদিকে নিশ্চয়ই নজর দেবেন এফ এফ সি।

এই প্রসঙ্গে এফ এফ সি এবং মেট্রো সিনেমার সামনে কয়েকটি প্রস্তাব রাখা নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক ঠেকবে না। যেমন—

(ক) ছবি চালানোর ব্যাপারে পরীক্ষামূলক উন্নতমানের বাংলা ছবিকে অগ্রাধিকার।

(খ) হোল্ড ওভার প্রোটেকশন ইত্যাদির জটাজাল ছিঁড়ে সুবিধাজনক শর্তে ছবি চালানোর ব্যবস্থা;

(গ) এফ এফ সি-র ঋণে তৈরি অদ্যাবধি মুক্তি না-পাওয়া [illegible] গুলির মুক্তির ব্যবস্থা;

(ঘ) এফ এফ সি-র আমদানি-করা ছবিগুলির মুক্তির ব্যবস্থা;

(ঙ) পরিবেশক-প্রযোজকের সঙ্গে আনুপাতিক হারে আয়ের বন্টন ব্যবস্থা;

(চ) ছবির নির্বাচনে রুচি ও সৎ-শিল্প সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে অগ্রাধিকার;

(ছ) তথাকথিত ব্যবসায়িক হিন্দী ছবির প্রদর্শনী থেকে দূরে থাকা।

সম্ভবতঃ এইসব প্রস্তাবগুলি কার্যকরী হলেই মেট্রো সিনেমা সত্যিকার আর্ট থিয়েটার হবার পথ প্রশস্ত করবে। সরকারের অধিগ্রহণের ফলে মেট্রো একটি লোকসানের বোঝা হোক—এটি কারও কাম্য নয়, সেই সঙ্গে এটিও আশাপ্রদ নয় যে, লাভ করাটাই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে। রুচিপূর্ণ সৎ শিল্প সৃষ্টির আবহাওয়া তৈরি করতে সুস্থ মনের দর্শক তৈরি করা দরকার সবার আগে। ফিল্ম ক্লাব আন্দোলনের ফলে এই কলকাতায় অন্ততঃ সেই কাজটি ইতিপূর্বেই শুরু হয়েছে। এক কথায় মাটি তৈরি। ভালো আরও ভালো ছবি বেশি সংখ্যায় দেখিয়ে দর্শক তৈরি শুরু করুন এফ এফ সি

নির্মল ধর

সত্যজিৎ অন্ধকারে

ফ্রাংক ক্যাপরার ছবির আসল আকর্ষণ ছিলো ও'র সহজ সরল গল্প বলার ভঙ্গিতে। গভীর বক্তব্যকে সুনিপুণ তীক্ষ্ণতায় দর্শকের মনের দরজায় পৌঁছে দিতে পারতেন তিনি। ইত্যাদি ইত্যাদি বলে স্মৃতিচারণা করছিলেন সত্যজিৎ রায় গত বুধবার (২০ এপ্রিল) ইউসিস-এর প্রেক্ষাগৃহে। ক্যাপরার ছবি নিয়ে তিন দিনের উৎসবের উদ্বোধনী দিবস সেটি।

দুম করে বিনা নোটিশে অন্ধকার নেমে এলো ঘরে। প্রথম চমক কাটিয়ে যখন বোঝা গেল রুটিন মাফিক লোড-শেডিং নামক প্রভাবশালী ব্যক্তিটির আবির্ভাব ঘটেছে তখন সত্যজিৎবাবুও বলে উঠলেন—অন্ধকার হলেও কথা শুনতে তো অসুবিধে নেই।

আবার শুরু করলেন তিনি হলিউডের স্তম্ভ ক্যাপরার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলী। অন্ধকার ভেদ করে তাঁর বজ্রগম্ভীর গলায় ঘোষিত হোল—'ক্যাপরাকে আমার ভালো লাগে শুধু গল্প বলিয়ে হিসাবে নয়, তিনিই প্রথম ফিল্ম তৈরীর কারখানায় পরিচালকের প্রাপ্য সম্মানটি আদায় করে নেবার মত সাহস দেখিয়েছিলেন বলে।'

সেই তিরিশের দশকে হলিউডে পরিচালক ছিলেন প্রযোজকের মাইনে করা কর্মচারী ছবির সৃষ্টিশীল ক্রিয়াকর্মে তাঁর অবদান ছিল অস্বীকৃত। ক্যাপরা প্রথম এই ব্যবস্থার প্রতি প্রতিবাদ জানিয়ে চলচ্চিত্র তৈরীর সিংহভাগ দায়িত্বটুকু কেড়ে নিলেন তাঁদের কাছ থেকে। পরিচালকের ক্ষমতা স্বীকৃত হোল। মর্যাদা পেলেন শিল্পী।

সত্যজিৎ রায় বললেন—'এদিক থেকে তাঁকে চলচ্চিত্রের জনক বলাও যায়।'

ইতিমধ্যে কোন্ যাদুতে জানি না সারা চৌরঙ্গী এলাকা ব্ল্যাক-আউটের চেহারা নিলেও ইউসিস-এর প্রেক্ষাগৃহ আলোয় ঝলমল করে উঠল। এতক্ষণ অন্ধকারে বসে থাকা দর্শক-শ্রোতারা দীর্ঘকায় সত্যজিৎ রায়ের মুখটি দেখতে পেয়ে ক্লান্তি সরানোর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বক্তৃতা শেষ সত্যজিৎবাবু ঘোষণা করলেন 'আই ডিক্লেয়ার দি ফিল্ম সেসন অফ ক্যাপরা ইজ নাউ ওপন।'

আবার আঁধার নামলো ঘরে, তার পর্দায় ফুটে উঠল ৮০ বছরের ফ্রাঙ্ক ক্যাপরার একটি মুখ। হাসিতে উজ্জ্বল, পাকা চুলে আর কুঁচকে যাওয়া চামড়ায় অভিজ্ঞতার বলিরেখা।

উৎসবের তিনটি দিন ক্যাপরার 'মিঃ স্মিথ গোজ টু ওয়াশিংটন', 'মিঃ ডিডস গোজ টু টাউন' ও 'লস্ট হরাইজন' তিনটি ছবি ছাড়াও দেখানো হয় পরিচালকের সঙ্গে দীর্ঘ চারটি সাক্ষাৎকার। প্রতিটি সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর ছবি-চরিত্র-সমাজের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বেপরোয়া ভঙ্গিতে আলোচনা করেছেন।

এই সাক্ষাৎকারগুলিতেও ক্যাপরাকে চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। তিনি বলছেন—'আমি প্রথমে চাই দর্শককে আনন্দ দিতে, শিক্ষা দান আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে আমার ছবিতে শিক্ষণীয় যে কিছু থাকে না তা নয়, থাকে দ্বিতীয় স্তরে।

প্রদর্শিত ছবিগুলি তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থনে হাজির ছিল আমাদের সামনে। মিঃ ডিডস বা মিঃ স্মিথ দুজনকেই আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এই আজকের মানুষ বলে চিনতে অসুবিধে হয় না। চল্লিশটা বছর পেরিয়েও ছবিগুলো তাই এখনও সবশ্রেণীর মনকে নাড়া দিয়ে যায়।

'লস্ট হরাইজন'-এর স্যাংগ্রিলা নামক সেই স্বপ্নের দেশ কাপরা দেখে যেতে পারলেন না, কেউই পারবে কি? কিন্তু মিঃ ক্যানওয়ের মত শ্যাংগ্রিলার খোঁজে সব দর্শকই বোধহয় প্রায় উন্মাদ।

ক্যাপরার ছবি থেকে বক্তব্যের এই ভারী বস্তুটিকে সরিয়ে রাখলেন সম্পাদকের কাঁচি, ক্যামেরাম্যানের কারিকুরি কিংবা ওভারঅল ছবির মাউন্টিং আজকের অনেক ছবিকে লজ্জায় ফেলতে পারে। বিশেষ করে বাংলা ছবির পরিচালকরা মুখ আড়াল করবেন লজ্জায় না ঈর্ষায় কে জানে!

উৎসবের অপর দুদিন ক্যাপরা সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছিলেন রঞ্জন ব্যানার্জি ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় দিনের বক্তা শ্রোতৃবৃন্দের বিরক্তির কারণ হয়েছেন অতি-কথনের অভ্যাসে এবং অযৌক্তিক কিছু মন্তব্যে। ছবি না দেখে ছবি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য করাটা বরদাস্ত করা যায় কি?

নির্মল ধর

জয় ছবিতে মাস্টার পার্থ ও পিকলু

জয় ভালো লাগবে

বাংলায় সরাসরি শিক্ষামূলক ছোটদের ছবি নেই। হরিদাস ভট্টাচার্যের পরিবর্তন দুজন কিশোরের সেন্টিমেন্টাল বন্ধুত্বের গল্প। গুপী-গা-বা-বা, সোনার কেল্লা, রায়জয়ন্তী বা হংসরাজ কোনভাবেই শিক্ষামূলক পর্যায়ে পড়ে না। এই দিক থেকে গুরু বাগচীর জয় একটা উল্লেখযোগ্য প্রথম প্রচেষ্টা। দ্বীপের নাম টিয়ারং থেকে শুরু করে সমান্তরাল, তীরভূমি, বিন্দুর ছেলে (রি-মেক), রাগের সুর্মাত ইত্যাদি ছবি করে সঙ্গে ছোটদের জন্যে একটা ভালো শিক্ষামূলক ছবি করার কথা অনেকদিন ধরে ভাবছিলেন তিনি। বহু অসুবিধে, বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে সম্প্রতি শেষ করেছেন 'জয়'।

জয় সান্যাল ক্লাশ সিক্সের একজন সৎ, নির্ভীক, দয়ালু ও স্পষ্টবক্তা ছেলে। মা-বাবা মারা যাবার পর তার বড়লোক পিসিমা তাকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। জায়গাটা ঘাটশীলা। প্রাণিরাজ লজের মেমসাহেব পিসিকে আন্টি বলতে শিখল জয়, জানলো এখানে ইচ্ছেমতো দৌড়ঝাঁপ লাফালাফি করতে নেই, বাগানের ফুলে হাত ছুঁইয়ে আদর করতে নেই, দুঃস্থ প্রতিবেশী বালকের দোলনায় চড়তে নেই, বাড়ির চাকরদের সঙ্গে বা নিচু স্ট্যাটাসের মানুষজনের সঙ্গে কথা বলতে নেই। আদর্শবান পিতার কাছে শেখা সমস্ত নিয়ম সেখানে অনিয়ম হয়ে গেল।

স্বভাবে সম্পূর্ণ বিপরীত, পিসতুতো ভাই পিকলু জয়ের পেছনে লাগলো। তারপর শেষপর্যন্ত কিভাবে দুর্দান্ত পিকলু, কিপ্টে বুড়ো ও অন্য সব্বাইয়ের মন জয় করল জয় সান্যাল—এই নিয়ে গল্প। গল্পটা সাজানো। লিখেছেন আনন্দ মুখোপাধ্যায়। সাজানো বলেই দু-একটি অংশ জোর করে চাপানো মনে হয়েছে। অন্ততঃ শেষ দৃশ্যে চাবুক খাওয়ার পরেই পিকলু যেভাবে জয়ের হাত ধরে 'সারাদিন ভালো হয়ে চলবো' ইত্যাদি গাইতে শুরু করল তা খুব বেমানান লেগেছে। গুরু বাগচী বললেন—যাদের জন্যে এই ছবি তাদেরকে যা বলতে চেয়েছি তা সহজে বলা গেছে এইভাবে। তাদের বুঝতেও সুবিধে হবে।

অভিনয়াংশে একটা বড় রকম রিস্ক নিয়েছেন পরিচালক। তিনচারজন ছাড়া সবই প্রায় আনকোরা নতুন মুখ। চমৎকার কাজ করেছে নামভূমিকায় পার্থ দাশগুপ্ত। অরুণাভ অধিকারীর পিকলু ছোটদের মনে দাগ কাটবে। পিকলুর দিদি সোমা মুখার্জি যথাযথ। কিপ্টে বুড়োর চরিত্রচিত্রণে জাত অভিনেতার ছাপ রেখেছেন বিকাশ রায়। আর ভালো লেগেছে অমলা সান্যালের ভূলো। রাণী মেমসাহেব সুলতা চৌধুরী আর একটু কম আড়ষ্ট হলে পারতেন।

পটভূমি ঘাটশীলা বলে ছবিতে অনেক সুন্দর দৃশ্য আছে। মনীশ দাশগুপ্তের ক্যামেরা বেশ পরিচ্ছন্ন। ছেলের দলের পিকনিকে যাওয়া ও কিপ্টে বুড়োকে খেপিয়ে কোরাস গাওয়া 'এক যে ছিল কিপ্টে বুড়ো'—এই দুটি দৃশ্যের ফ্রেমগুলি ভারি সুন্দর।

মানা দত্তর সম্পাদনা ছবিটিকে আরো গতি দিতে পারতো, যা প্রথমদিকে কিছুটা শ্লথ হলেও পরে পুষিয়ে গেছে। অবশ্য একজন বালকের সূক্ষ্ম প্রতিবেদন দেখাতে এই শ্লথগতি বেশ কার্যকরী হয়েছে।

যাদের জন্যে এই ছবি সেই শিশু ও কিশোরদের 'জয়' ভালো লাগবে।

সোমক দাশ

দেশ মুখার্জির দেশপ্রেম

ইংরেজীতে অনেক সময় বলা হয়ে থাকে—টু লিভ নো স্টোন আনটার্ণড। 'ইমান-ধরম' সে রকম প্রচেষ্টার একটি বিশিষ্ট প্রমাণ।

তারায় তারায় খচিত এই চিত্রটিকে আলোকিত করে রেখেছেন সঞ্জীবকুমার, অমিতাভ বচ্চন, শশী কাপুর, রেখা, উৎপল দত্ত ও অপর্ণা সেন। শুধুমাত্র এঁদের ফ্যানরা উপস্থিত থাকলেই কোন ছবি রজতজয়ন্তী উৎরে যেতে পারে। কিন্তু আমাদের পরিচালক কোন রিস্ক নিতে রাজী নন।

দেশটির নাম ভারত। সুতরাং ছবিতে ধর্ম আছে। আর ধর্ম যদি থাকে, ধর্মনিরপেক্ষতাও থাকবে। অতএব, গীতা শশী কাপুরকে রক্ষা করেছে ছোরা থেকে, কোরাণের সাহায্যে অমিতাভ ফাঁকি দিয়েছেন গুলিবৃষ্টিতে, নায়িকার গলায় ঝুলে থাকা ক্রশ থেকে ঠিকরে পড়া আলোতে চোখ ঝলসে গেছে অপরাধীর।
শ্রমিক সমস্যা, ভেজাল, কালোবাজার ইত্যাদি থেকে পথিমধ্যে মুসলমান ফকিরটির মৃত্যু ও অনতিকালের মধ্যে পায়রা উড়ে যাওয়ার দৃশ্য সবই রয়েছে।

এভাবে তালিকা না বাড়ানোই ভালো। ইমান-ধরমে সম্পদের পরিমাণ অজস্র। অমন যে সুন্দরী রেখা, তাঁকেও শেষ পর্যন্ত অসুরদলনীর ভূমিকায় নামতে হল। মাত্র কড়ি রিলের বিন্দুতে জাতীয় সংহতির সিন্ধু দর্শন করিয়ে অবশেষে দেশ মুখার্জি যখন সঞ্জীব কুমারের মাধ্যমে পুলিশ অফিসারের সঙ্গে শশী কাপুর ও অমিতাভ বচ্চনের পরিচয় করিয়ে দেন আজকের হিন্দুস্থান বলে, তখন পরিচালকের দেশপ্রীতি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ না জাগলেও নিজেদের বর্তমানের কথা মনে পড়ে।

মোহনকুমার সাকসেনা (শশী কাপুর) এবং তার বন্ধু (অমিতাভ বচ্চন) আদালতে মিথ্যা সাক্ষী সেজে পেট চালায়। একদিন এইভাবে তারা ফাঁসির পরোয়ানা লটকে দেয় নির্দোষ কবীর দাসের (সঞ্জীব কুমার) কপালে, যে স্বভাবতঃই দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ ও চক্রান্তের শিকার। কিভাবে বন্ধু দুজন

পথে ফিরল এবং সত্য জয়ী হল, সে সেই গল্প। মধ্যে তিনজনের সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান আছে।

ছবির একেবারে শেষদিকে ছাড়া সজীবতার শান্ত ও ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক। শশীর তুলনায় অমিতাভকে আমার বেশী সফল মনে হল। রক্ষণ ভারতীয়া কামিমের ভূমিকায় রেখা স্বচ্ছন্দ; বিশেষতঃ তার কথাবার্তার তামিল প্রভৃতিমধুর। অপর্ণা সেনের মধ্যে অন্ধ তরুণীর ম্লান অসহায়তা পরিস্ফুট।

একাধিক গান শুনতে ভাল লাগে। অন্যান্য কলা-কৌশল মধ্যম মানের।

ঈষৎ ক্লান্তিকর; না হলে ছবিটির জনপ্রিয়তার পথে কোন বাধা নেই। কেননা, আমি আগেই বলেছি, পরিচালকের সর্বগ্রাসী ক্যামেরা নানা ভাষা, নানা জাতি, নানা পরিধানের মহান মিলন প্রত্যক্ষ করে বোম্বাই শহরের ইমান রক্ষা করেছে। এমন কি সামরিক বাহিনীরও অভিমান করা উচিত নয়। শিবাবু পঙ্গুকে (উৎপল দত্ত) দিয়ে পর্বত লংঘন করান নি বটে তবু সে নৃত্যপটু।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

এবার রাজার পালা

সরাসরি 'এবার রাজার পালা'য় আসার আগে মনে করিয়ে দিই আর একটি কথা। 'সেকসপীয়রের সমাজ চেতনা' গ্রন্থে তাত্ত্বিক উৎপল দত্ত বেশ কয়েকটি বড় অংশে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, রাজা বা শাসকের শাসন ক্ষমতার পিছেন কোনভাবেই কোন অলৌকিক আভিজাত্য অথবা প্রশ্নাতীত ঈশ্বরদত্ত অধিকার নেই। অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যাখ্যায় কোন মোহচ্ছটায় আর তিনি বিশ্বাসী নন।

সম্ভবতঃ সেই যুক্তিতেই 'এবার রাজার পালা'র রাজাকে তাই প্রথমে যাত্রা-পার্টিতে। নকল পোষাক, অশিক্ষিত পটুত্বে বঙ্কু সেখানে অতি সাদামাটা, আটপৌরে মানুষ। অজস্র ভুল উচ্চারণ ও বিচিত্র সব অঙ্গভঙ্গীতে সে কেবলই কৌতুকের পাত্র। শুধু তাই নয়, তারই মূর্খ আস্ফালনে জানা যায়, সে কোন এক রাজার জারজ সন্তান—ফলতঃ অবজ্ঞারও পাত্র বটে। প্রাথমিক স্তরে এই কৌতুকমিশ্রিত অবজ্ঞাই বঙ্কুর প্রতি দর্শকের মনোভাবকে বেঁধে দেয়।

পরবর্তী পর্যায়ে বঙ্কুর সত্যিকারের রাজা হবার ঘটনাটা জোড়া হয়েছে অত্যন্ত খেলো, পাতলা আঠায়। মৃত রাজার দেওয়ান, হঠাৎই দূত হিসেবে, জানিয়ে যান—রাজার মৃত্যুকালীন উইল বলে সারা ভারতবর্ষে ছড়ানো তাঁর

সংগীতা ছবিতে শমিত
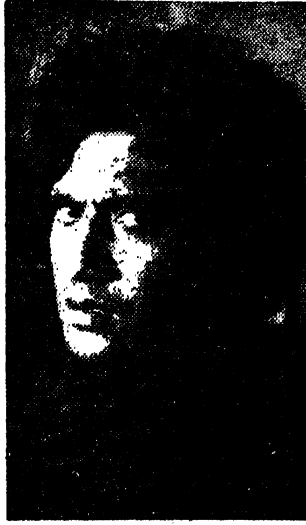
আটাত্তিরিশজন জারজ সন্তানের মধ্যে ম্যাকফেনুক্নো বঙ্কু জ্যেষ্ঠত্বের অধিকারে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী।

খটকা লাগে এইখানেই। রাজনৈতিক ক্ষমতার পিছনে অলৌকিক আভিজাত্য বা ঐশ্বরিক শক্তির সন্ধান শ্রীদত্তের মতেই তো, শোষণের মতলবে ছলনার চূড়ান্ত। এক্ষেত্রে রাজশক্তির উৎস সন্ধানে এই উৎকট আদিরস কি ঠিক উল্টো মেরুতেই ছলনার চূড়ান্ত নয়?

তবুও মেনে নিই শুধুমাত্র কৌতুকের খাতিরে। কিন্তু আশ্চর্য শ্রীদত্ত তা চাননি। তাহলে কৌতুকমিশ্রিত অবজ্ঞার পাত্র এই বঙ্কুকে ঘিরে তিনি 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'..., 'গুগাবাবা' বা আবোল তাবোল যাহোক কোন উদ্ভট রসের গল্প ফাঁদতে পারতেন। তা তিনি করেননি। বরং এই কৌতুক ও অবজ্ঞার পাত্রটি এরপর থেকে মারাত্মক কিছু ইংগিত করার ভান করে—যা মোটেই প্রচ্ছন্ন থাকে না।

বক্কেশ্বর ওরফে বঙ্কুর, অজস্র দুষ্কৃতি ঘটেই চলে অথচ চেতনার কোন স্তরে তা আমাদের ধাক্কা দেয় না। যাত্রাদলের সাঙ্গপাঙ্গ সমেত রাজকার্যে খেলার ছলে মারাত্মক সব কান্ড চালিয়ে যায় এই সদ্যপ্রাপ্ত রাজশক্তিতে অধিষ্ঠিত জারজ সন্তান। রাজ্য পরিচালনার দুরূহ প্রশ্নগুলিকে বঙ্কু স্রেফ নিরক্ষতায় ভেলকিতে কত সহজ কত এলেবেলে করে ফেলে। 'জরুরী অবস্থা' জারীর প্রস্তুতি তাই গোপালভাঁড়ের আদিরসের হুল্লোড় তোলে। অন্যদিকে 'বাহাত্তর দফা কর্মসূচীর ঘোষণা অথবা জেলখানা উদ্বোধন প্রসঙ্গে বঙ্কুর বক্তৃতায় দর্শককুল দমকে দমকে হাসে।

কারণ সমস্ত নাটকটিতে (উদাহরণ অনেক আছে, বাড়িয়ে লাভ নেই) কোথাও এমন একটি বাক্যও নেই, যা, আমাদের সেই দুঃস্বপ্নের স্মৃতিকে অল্পক্ষণের জন্যেও চাবুক মেরে জাগিয়ে তোলে। যা আছে তা কেবলই আটপৌরে, ছেঁদো সব অতিসরলীকৃত মুখরোচক ব্যাখ্যা। আর সেই মুখ-

রোচক রাজনীতির খিচুড়ী শিল্পের লোঙড়খানায় হোসপাইপে করে বিলি করেন বঙ্ক, অর্থাৎ রাজা বঙ্কেশ্বর চরিত্রে সমীর মজুমদার।

নাট্যকার পরিচালক শ্রীদত্তের মুন্সিয়ানা আগেই স্বীকৃত। দীর্ঘ-দিনের অভিজ্ঞতায় ভালোভাবেই ধরে ফেলেছেন— জরুরী অবস্থা, স্বাধীনতা হরণ বা স্বৈরতন্ত্র জাতীয় কোন বায়-বীয় ব্যাপার আসলে শয়ন, ভোজন, রমনে ব্যস্ত মানুষের কোন সমস্যাই নয়। এবার যা বাকী থাকে তা প্রযোজনার ফর্ম বা আংগিক সংক্ষেপে নাটকৌশল। একটিমাত্র সেটে সমগ্র ঘটনাবলীকে স্থান কালের পারস্পর্যে কেমন করে সাজাতে হয় তা উৎপল দত্ত বহুকাল ধরে দেখাচ্ছেন। 'ব্যারিকেড', টিনের তলোয়ারের' কথা মনে করলে 'এবার রাজার' পালা সেক্ষেত্রে মামুলি। আলোতে বিশেষ কোন সংকেত, মুহূর্ত অথবা মেজাজ গড়ে তোলার সুযোগ প্রায় ছিলোই না, একমাত্র গান গাইতে গাইতে ডোমের নিহত হবার ঘটনা ছাড়া। আবহসঙ্গীত কেবলমাত্র জংগী মেজাজ (পি, এল, টির বহুব্যবহৃত থিম মিউজিক) প্রতিষ্ঠায় পুনর্ব্যবহৃত।

চরিত্রের তালিকায় দ্বিতীয় ঘটকা ননীদা। তাঁর চরিত্রে প্রথমে পাই ব্যক্তিত্বহীনতা, মাঝে শুধুই তোষা-মোদ ও পরে প্রায় মন্ত্রবলে চেতনা-প্রাপ্ত এক মুক্তিকামী প্রাণ। তাঁর অলক্ষ্য ষড়যন্ত্র স্বৈরতন্ত্রের পতন ঘটায় অতিনাটকীয় ভঙ্গীতে, কিন্তু দর্শকের কাছে তিনি যুক্তিগ্রাহ্য নন। অভি-নেতা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ বাচনভঙ্গী সে ব্যাপারে কিছুটা দায়ী। মৃণালবাবু বড়বেশী যান্ত্রিক। সুন্দর অভিনয় দেওয়ানের। নিষ্ফল আক্রোশ ও অসহায় আত্মসমর্পণের দ্বন্দ্বে তিনি যে কোন উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত সরকারী অফিসারের ছবি দাঁড় করিয়েছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অথচ ব্যর্থ চরিত্র চাষী বিদ্রোহের নেতা। কারণ মূল নাটকে এই অধ্যায়টি খেলোচ্ছলে অব-হেলিত এবং অভিনেতার উচ্চারণ ও অতিসচেতনতা কোন বাক্যকেই স্পষ্ট পেঁছিতে দেয় না।

তবুও সব মিলিয়ে 'এবার রাজার পালা' প্রায় তিন ঘণ্টা একটানা দর্শককে নগদ বিদায় দিয়েই চলে। এ থিয়েটার সামনে ঝুঁকে উদগ্র আগ্রহে দেখার নয়—বরং নিশ্চিন্তে স্নায়ুকে শিথিল করে গা এগিয়ে তারিয়ে তারিয়ে 'জীবন যন্ত্রণার' ললি-পপ্ চোষার।

উদয়ভানু ভট্টাচার্য

ছায়ায় আলোয়

মঞ্চে নিয়মিত অভিনয়ের ক্ষেত্রে স্যাটায়ারধর্মী নাটকের সঠিক মেজাজটি ধরে রাখা রীতিমত দুরূহ ব্যাপার। কারণ সাধারণ দর্শকের প্রত্যাশা থাকে একটি সরল গল্পের সরল মঞ্চরূপ দেখার। যেখানে আবেগ থাকবে, ঘটনার মোচড় থাকবে, অর্থাৎ দর্শককে আপ্লুত এবং নাটকের কাহিনীর সঙ্গে একাত্ম করার মত যথেষ্ট মালমশলা থাকবে। সুজাতা সদনে অভিনীত ভারতী প্রোডাকসন্সের 'ছায়ায় আলোয়' নাটকে এসব তো আছেই উপরন্তু আছে ফল্গুধারার মত প্রবহমান স্যাটায়ার। তাই আপাতে হাসির নাটক হয়ে 'ছায়ায় আলোয়' দর্শকের মনকে ভাবনায় বিষণ্ণ করে তোলে।

তবে এ নাটকের কাহিনী নতুন কিছু নয়। একটি ক্ষয়িষ্ণু, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মার-খাওয়া পরিবারের সমস্যা এ কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু।

—নাটক অশোক মুখোপাধ্যায়, পরিচালক চিন্ময় রায়। অভিনয় এ নাটকের সম্পদ। প্রথমেই নাম করতে হয় শুভেন্দু চট্টো-পাধ্যায়ের। গৃহকর্তার মাতাল সঙ্গী বন্ধুর টাইপ চরিত্রে (চরিত্রটি অবশ্য নাটক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং কিছুটা অবাস্তব) তাঁর অভিনয় দর্শকদের দীর্ঘদিন মনে থাকবে। আর ভাল লাগবে ফ্রাসটেশনের শিকার ছেলের চরিত্রে কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়ের বেদনা-মাখা অথচ ঝাঁঝালো অভিনয়। অবশ্য দুটি চরিত্রই নাটকীয়। সেদিক থেকে অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং অসাধারণ অভিনয় করেছেন গৃহকর্ত্রীর চরিত্রে নীলিমা দাস, সংসারে একটু বেমানান সত্ত্বেও। নায়িকার চরিত্রে আলপনা রায় কিঞ্চিৎ আড়ষ্ট এবং সিনেমার অভিনেত্রীর অনুসারী। সাধনা রায়চৌধুরী মঞ্চে একটি নাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁকে সেইভাবে ব্যবহার করা হয়নি। দুটি নায়কই নির্জীব। ফলে চরিত্র দুটি সেই অর্থে বিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারেনি। গৃহকর্তার (সুজিত গুপ্ত) চরিত্রটি চড়া পর্দায় বাঁধা বলে দর্শকের সহানু-ভূতি তেমন পায় না। বরং তাঁকে দৃশ্য-বিশেষে কমেডিয়ানই মনে হয়েছে। এ নাটকের বড় আকর্ষণ ছিল চিন্ময় রায়। আরো কয়েকটি দৃশ্যে তাঁকে পেলে আশু-তোষ দর্শকরা খুশী হত।

তবু বলবো 'ছায়ায় আলোয়' দর্শনীয় এবং পরিচ্ছন্ন নাটক। আরও একটু কম-প্যাক্ট হলে নাটকটি দারুণ জমবে। অর্থাৎ যে সামাজিক মূল্যবোধের কথা এ নাটকে বলা হয়েছে তা দর্শকের হৃদয় স্পর্শ করবে।

নাটকের সেট পরিকল্পনা চমৎকার। বলা যায় অত্যন্ত আধুনিক। কিন্তু সঙ্গিল চৌধুরীর সেই চমক নেই। তাঁর সুরের একটি পুরনো গান বোধহয় নাটকে ব্যবহার করা হয়েছে। নায়িকার মুখের গান সুর ভাল হয়েও মনকে তেমন স্পর্শ করে না। তবে আবহসঙ্গীত স্থানবিশেষে ভাল

শান্তি চট্টোপাধ্যায়

সূর্যাস্তের পর

সূর্য অস্ত গেলেন, অর্থাৎ সূর্য-কুমার দত্ত নেই, এই দুঃসংবাদ শোনার জন্য ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না. এই তো কিছুদিন আগে এই নীলরতন সরকার হাসপাতাল থেকে অসুস্থতা কাটিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন কাঁচড়াপাড়ার বাড়িতে. এবং অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু সংবাদ আমাদের সামগ্রিক চেতনাকে বধির করে দেবে ভাবি নি।

ভেবেছিলাম আর অন্তত তিন বছর তিনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন, অর্থাৎ আমরা চেয়েছিলাম যাত্রা জীবনেই তিনি শতাব্দী রচনা করেন।

বয়স হয়েছিল ১০৪ বছর। ৭ বছর বয়সে যাত্রা জগতে আসেন নেহাতই জীবিকার সন্ধানে। তারপর দীর্ঘ ৯৭ বছরের ইতিহাসে কখন কীভাবে বাঁচে

...বিশাল মহীরুহ হয়ে ওঠেন তা ...কই জানেন।

আমরা কি শুধুই তাঁর শতাব্দীর জীবন চেয়েছিলাম, নাকি আমরা যাঁকে ভালোবাসি অন্তর দিয়ে, ...চেয়েছিলাম—সূর্যের সান্নিধ্য।

হ্যাঁ, শুধু সান্নিধ্যটুকুই। কেননা ...জানি আমাদের প্রিয় আকাশে ...দয় হয় নিয়মিত, সূর্যদেব থাকেন. ...দিনমানে, একদিনের সূর্যাস্ত তো ...মী দিনের সূর্যোদয়ের অপেক্ষারই ...দেয়।

আমরা এটাও জানতাম, এই ...স্ত তো আগামী সূর্যোদয়ের ...না ইঙ্গিত দেবে না।

তাই আমরা চেয়েছিলাম, তিনি ...ন আমাদের বসবাসকারী ...থবীতেই। আমরা তাঁর সান্নিধ্যে বা ...পে নিজেদের কিছুটা যোগ্য করে ...ল। আমরা তাঁর আশ্রয় ...রছিলাম।

সূর্যকুমার দত্ত, এমনই একটি ..., যাঁর সম্পদ—অভিজ্ঞতা আর ...জ্ঞতা, কিন্তু বিবর্তন, ক্রম-...বর্তন ইত্যাদির সমবেত ব্যক্তিত্ব। ...নি সটান দাঁড়িয়েছিলেন মাটির ...য় কেরোসিন তেলে ধানের তুষ ...ল তৈরি মশালের আলোকিত আসর ...কে বৈদ্যুতিক স্পট, বিমার ফ্লাড-এর ...লোকোজ্জ্বল অত্যাধুনিক আসরে—...বর্তী বহু গ্যাস লাইট হ্যাজাক ...ট্রোম্যাক্স বা ডায়নামোর আলো-কে ...ঙ্গ নিয়ে। তিনি দেখেছেন, মানুষের ...য়োজনে কমে যাওয়া পালাগানের ...রতন, তিনি বুঝেছেন, দাড়ি-গোঁফ ...মানো রাধার বদলে প্রকৃতই রাধা ...ই।

তিনি শিখিয়েছেন, নাচের মুদ্রা, ...ু জিভ বা দাঁতের ব্যবহারের ...ক্রিয়া—অর্থাৎ উচ্চারণ পদ্ধতি।

তিনি দেখিয়েছেন, পালা সম্পাদনা, ...দের্শনা এবং সঙ্গীত কৌশল।

জানি না, আমরা কতটা শিখতে ...পেরেছি, আর আমাদের শেখার ...যোগ্যতাও বা কতটুকু।

ইদানিং সূর্যচন্দনেরও বিজ্ঞাপিত ... প্রচারিত নামধাম পড়তে পড়তে ...আমরা কি ভুলে যাচ্ছিলাম প্রকৃত ...র্য-র বাসস্থান।

এই সূর্য-পতনের দৃশ্যে আমরা ...কৃত সূর্যের দিকে তাকালাম। ...র্যাস্তের রঙও কী মহান, উজ্জ্বল।

প্রভাত চৌধুরী

সূর্য দত্ত .
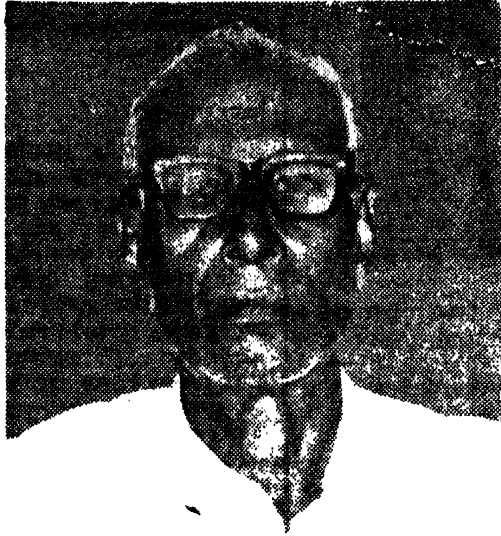
পালা গানের বিবেক

তেরো বছর বয়সে বিষ্ণুপুরের সাক্ষীগোপাল পাড়া থেকে কলকাতার শ্যামপুকুরে রাধাবিনোদিনীর বাড়িতে এসে উঠেছিলেন গোরাচাঁদ অধিকারী। বিবেকের গান বলতেই যাঁর কথা ইতিহাসের পাতা থেকে সটান উঠে আসে, সেই অধিকারীমশাই বললেন, 'সেকালের শক্তিমান অভিনেতা রেম্বোদর ভট্টাচার্য আমাকে নিয়ে এসেছিলেন রাধাবিনোদিনীর দলে। ১৫ টাকা মাইনে, খাওয়া-দাওয়া ছাড়া।

তখন দল বলতে যাদের খুব নাম-ডাক ছিল, তা হল, মথুর সাহার থিয়েটিক্যাল পার্টি, গণেশ অপেরা, সত্যাম্বর চাটুজ্যের দল সত্যাম্বর অপেরা আর সতীশ মুখার্জির দল।

আট ঘন্টার টানা পালা চলতো, কম হলে শ্রোতারা ক্ষুব্ধ হতেন। ট্রেন থেকে নেমে গরুর গাড়িতে মালপত্র যেত, আমরা পাশে পাশে হেঁটে। কলকাতায় দলের গান, লোক জমতো প্রচুর। দু-তিনদিন একনাগাড়ে পালা। ব্যাপারই অন্যরকম, রাজকীয়, টিকিট কেটে গান শোনা নয়, বাবু-বাড়ির গান।'

সতীশ মুখার্জির দল ঘুরে ১৬।১৭ বছর বয়সে সত্যাম্বর অপেরাতে আসেন অধিকারী মশাই। 'বাচস্পতি' পালাতে কোরাস গানের মূল গায়েন হন। তখন খুব নাচগান হত। আধ ঘন্টার মতো এক একটা কোরাস। সতীশবাবুর দলে তাম্রধ্বজ পালায় মূল চরিত্রে গান করে নাম ডাক হয়েছিল তার আগে।

'নন্দদুলাল আমার প্রাণের ভিতর লুকিয়ে কেন দেখা দাও হে' গেয়ে শোনালেন দু-এক কলি সেই গান। বাঁকুড়ার রামপুর থেকে পন্ডিত এবং সুলেখক রামদুলাল ভট্টাচার্য মশাই আসতেন প্রতি ভাদ্রমাসে, সঙ্গে আনতেন নতুন পালা, মহড়া দেখেশুনে পালা তৈরি হলে ফিরে যেতেন দেশে। তখন প্রতি দলেই বাঁধা পালাকার ছিল। রামদুলালবাবু সত্যাম্বরের, মথুর সাহার দলে হরিপদ ভট্টাচার্য, গণেশের ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী, সতীশ মুখার্জির দলে নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায়।

বিবেক কাঙাল বাবাজি বৃদ্ধ হয়ে পড়ায় গোরাচাঁদ অধিকারী মশাই প্রথম বিবেকের গান গান। 'শৈশবসাধনা' পালায়। খিদিরপুর বাজারে প্রথম আসর।

সেই সময় রাগপ্রধান শেখার বাসনা হয়, ওস্তাদ শিবশংকরের কাছে দর্জি-পাড়ায় তালিম নেন বছর চারেক। যাত্রা ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি রাগসংগীতের পালাতে দৈনিক ১৫ টাকার চুক্তিতে চর্চা করতে চেয়েছিলেন তিনি। বস্তু গান করতেন, মাঝে মাঝে।

গোরাচাঁদ অধিকারী

'মুকুটমুকুট' পালায় প্রথম সুর দেন। শেষ পালা 'এতো অবসান' ও 'দক্ষযজ্ঞ'।
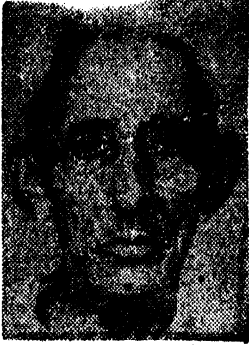
ওস্তাদ বাদল খাঁর কাছে নাড়া বেঁধেছিলেন। গুরুভাই ছিলেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রমুখ বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ।

জ্ঞান গোস্বামী ও ভীষ্মদেব বিভিন্ন গানের আসরে নিয়ে গেছেন গোরাচাঁদবাবুকে — ঠুংরি গাইতেন, কিছু দক্ষিণাও পেতেন।

হিন্দুস্থান গ্রামোফোন, জুপিটার থিয়েটার, মিনার্ভা এবং রেডিওতে বিভিন্ন সময় সুরমাস্টার, সুরকার বা শিল্পী হিসেবে কাজ করেছেন — যাত্রার বিবেক গোরাচাঁদ অধিকারী। বছর কুড়ি অবসর জীবনযাপন করছেন বিষ্ণুপুরে।

ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি এবং গজলের স্থিতি এবং বিস্তারের ব্যাখ্যা সহ আলাপ শুনতে শুনতে দেখছিলাম যাত্রার বিবেক গোরাচাঁদ অধিকারী মশাইকে।

প্রভাত চৌধুরী

সিনেমার ফিল্ম এখন দুষ্প্রাপ্য

এই লেখার সময় পর্যন্ত আমার কাছে খবর আছে, বিগত কুড়ি-পঁচিশ দিন ধরে কলকাতা তো বটেই, সমগ্র পূর্ব ভারতে সিনেমার কাঁচা ফিল্মের যে ব্যাপক ক্রাইসিস চলছিল, তা এখনও অব্যাহত আছে। নীট ফল : টালীগঞ্জ স্টুডিওতে ছবির শুটিং বন্ধ হচ্ছে। বড় বড় আউটডোর শুটিং, শীত থাকতে থাকতে যা শেষ করা দরকার, আচমকা ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে। আর কন্ট্রোলড্ রেটে বাঁধা ফিল্ম কালোবাজারে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। গোপনকরা স্টক ফুরিয়ে গেলে আর তাও পাওয়া যাবে না।

আমার অভিজ্ঞতায় এই ক্রাইসিস নতুন কিছু ঘটনা নয়; এর আগে অল্প-স্বল্প এরকম অনেকবারই হয়েছে। কেবল গুরুতরভাবে এই প্রথম হল।

বিদেশ থেকে আসে

ভারতে এক ফুটও কাঁচা ফিল্ম তৈরি হয় না। উটীতে কারখানা হয়েছে। চেষ্টা হচ্ছে দ্রুত উৎপাদনের। এখনও বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। আগে কোডাক পাওয়া যেত। আগফা পাওয়া যেত। গেভার্ট পাওয়া যেত। কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ কড়াকড়ি হবার ফলে উপরোক্ত ব্রাণ্ডের আমদানী দীর্ঘদিন বন্ধ হয়েছে। এখন সবটাই পূর্ব-জার্মান থেকে আসছে। পণ্যের বিনিময় সফট্ কারেন্সীতে চালু থাকায়, এখানে যারা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট নেগেটিভে ছবি করেন, তাঁরা ফিল্ম বলতে শুধুই 'ওরো' বোঝেন। দু'রকম নেগেটিভ; এন, পি —সেভেন এবং এন, পি—ফিফটিফাইভ। যথাক্রমে হাইস্পীড শ্লো-স্পীড ফিল্ম। ওরো'র রঙীন ফিল্মও আসছে, হাইস্পীডের—এন, সি—থ্রী। যারা ইস্টম্যানকালার কিনতে অক্ষম, তারা এন সি—থ্রীতে রঙীন ছবি তুলছেন। প্রথমতঃ দামে সস্তা এবং রেজাল্টও খুব খারাপ নয়।

হার্ড কারেন্সী

বোম্বে-মাদ্রাজের বড় বাজেটের ছবি তো বটেই, বেশীর ভাগ হিন্দী ছবি এখনও ইস্টম্যানকালার নেগেটিভে তোলা হচ্ছে। এই নেগেটিভ শুধু তাদেরই দেওয়া হচ্ছে যারা স্ট্রেটকাট বিদেশী মুদ্রা অর্জনের প্রতিশ্রুতি দিতে সক্ষম। বোম্বে-মাদ্রাজের হিন্দী ছবির বাজার বিদেশে এখন ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। মিডিল ইস্ট, ফার ইস্ট, আফ্রিকান কোস্টের পুরোপুরি এবং ইউরোপ, আমেরিকা, ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন পকেটে এখন হিন্দী ছবির ব্যবসা দারুণ রবরবা। ফলে ডলার এক্সচেঞ্জ রোজগার করা বিগবাজেট হিন্দী ছবির ক্ষেত্রে আজকাল যেন আর কোন ব্যাপারই নয়। সংখ্যাতত্ত্ব বলছে, হংকং-এ হিন্দী ছবি আমেরিকান ফিল্মের সঙ্গে বেশ তাগদের সঙ্গেই লড়ছে আজকাল। যেটা আঞ্চলিক ভাষার ছবির ক্ষেত্রে, মানে এক্সচেঞ্জ গ্যারাণ্টির প্রশ্নে—অসম্ভব। কেবল সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন এবং পশ্চিম, দক্ষিণের কয়েকজন খ্যাতিমান পরিচালকের ছবি ছাড়া। এন সি—থ্রী-র ক্ষেত্রে বিদেশী মুদ্রা রোজগারের গ্যারাণ্টি দিতে হচ্ছে না বলে আঞ্চলিক ভাষার ছবি এখনও ওই কম দামী অথচ চলনসই রেজাল্টের নেগেটিভেই সীমাবদ্ধ থাকছে।

হঠাৎ কেন এই ক্রাইসিস

ফিল্ম আসে জাহাজে। খবর নিলাম ও'রা বলছেন পর পর দুটো (জাহাজী চালান আটকে যাওয়ার ফলে প্রধানতঃ এ ক্রাইসিস দেখা দিয়েছে। এটা সাময়িক ফিল্ম এসে গেলেই যার যতটুকু প্রয়োজ —পেয়ে যাবেন। গণ্ডগোল চুকেবু যাবে। ক্রাইসিসের অ-প্রধান দিকটা তাহ কী? জানা গেল, স্টকে যে ফিল্ম ছিল তাতে এখানকার চলতি সিনেমার শু অনায়াসে চালিয়ে নেয়া যেতে পারত হ যদি না একযোগে আট থেকে দশটি ওড়ি ছবির শুটিং আরম্ভ হত। এটা আকস্মি ব্যাপার। ওড়িষা সরকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ছেন যে, গত পাঁচ বছর ধরে ছায়াছ থেকে সরকার যে প্রমোদকর আদায় করেছে —ওড়িয়া ছবির উন্নতিকল্পে সেই টা প্রযোজকদের এখন ফেরৎ দেওয়া হ হ্যাভক। আসাম সরকার অসমীয়া ছবি বেশ কিছুদিন যাবৎ ইনসেন্টিভ দিচ্ছে ফলে আসামেও একযোগে অনেক ছবির কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। এক হ্যাভক। সাতাত্তর সালে ওড়িয়া ছ সংখ্যা এক লাফে পঁচিশে চলে যাবে। অসমীয়া ছবি যাবে বিশ-বাইশে। বা ছবি পঁয়ত্রিশে থাকবে বলে অনুমা এছাড়া প্রত্যেক রাজ্য সরকারের নিজ সংবাদ ও তথ্যচিত্র তো থাকছেই। তাছ মণিপুরী, নেপালী, নাগা, মিজোর কাহিনীচিত্র একটি-দুটি হচ্ছিল ভবিষ্যতেও হবে।

পূর্ব ভারতে ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয় নেগেটিভ ফিল্মের চাহিদা সেদিন পর্য মাসে আড়াইশো থেকে তিনশো হা ফুটের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আর নেগেটিভের ডিমাণ্ড ছিল পঞ্চা ফুটের মধ্যে। হঠাৎ বেড়ে যাওয়া ফি হিসাব এর মধ্যে ছিল না। পশ্চিমভা এই স্টকের ফিল্ম প্রতিমাসে লাগছে দু হাজার ফুটের মত। আর দক্ষিণভা লাগছে সাড়ে চারশো হাজার ফুট। ক কাতা নিচ্ছে মূলে আমদানির মাত্র স বারো পার্সেণ্ট। বিদেশ থেকে ফি আমদানি এবং বণ্টনের দায়িত্ব ফি ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের ওপর। বি ডিলারের মাধ্যমে এই কেনাবেচা চল এফ, এফ, সি কেনাবেচার ওপর সার তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন যাতে কোন দুর্ন না হতে পারে। আমি খুব ভাল করে নিয়ে দেখেছি যে, এর মধ্যে কোন দুর্ন নেই। এফ এফ সি-র ব্যবস্থা নিখ এই ব্যাপারে ও'রা প্রশংসা পাবেন।

রঞ্জন মজুম

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

মূল্য ৭৫ পয়সা ॥ অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৯ পয়সা ॥ ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদ